দেশ

১৭ কার্তিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 3rd November, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

পাইকারী ও খুচরা দোকান : চণ্ডুলাল দুর্গা প্রসাদ, বাঁকিপুর, পাটনা-৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীবদ্রীনারায়ণ

সম্পাদকীয়

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১

শনিবার ১৭ কার্তিক ১৩৮০

SATURDAY, NOVEMBER 3, 1973.

আমাদের নতুন বছর

দেশ পত্রিকার চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। এই ঘটনা নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ, অসামান্যও বটে। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সাময়িকপত্র পাঠের অভ্যাস ও অভিরুচি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আজকের পাঠক সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন, সমসাময়িক সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিবিড়ভাবে জানবার জন্য উন্মুখ। অগণিত পাঠকের অভিরুচি ও আগ্রহের কথা চিন্তা করেই দেশ-এ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগ ও রচনা যুক্ত করা হয়েছে। দেশ পত্রিকা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। এই পত্রিকা কখনও উগ্র আধুনিকতার ধ্বজা ওড়াবার চেষ্টা করেনি, সময়ের সঙ্গে চলতে গিয়ে কখনও পিছিয়েও পড়েনি। সাহিত্যে ও শিল্পে প্রবীণ ও নবীনকে সকল সময়েই সমান মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে। মূলত সাহিত্য পত্রিকা হলেও দেশ-এ বর্তমান কালের সকল প্রসঙ্গই আলোচিত। সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের অধুনাতম নিরীক্ষাকর্ম এবং শ্রেষ্ঠ রচনাকে এই পত্রিকা বরাবর পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাস, গল্প ও কবিতার সঠিক পরিচয় লাভের জন্য দেশ অবশ্যপাঠ্য। চল্লিশ বছর অতিক্রম করে দেশ যে দীর্ঘায়ু হতে চলেছে তার মূলে রয়েছে পাঠকবর্গের প্রগতিশীল, উন্নত রুচি ও রসবোধ এবং তাকে সর্বদা তৃপ্ত করার জন্য দেশ-এর ঐকান্তিক প্রয়াস ও আগ্রহ।

চল্লিশ বছর পূর্তি শুধু দেশ পত্রিকার আয়ুষ্কালের হিসাব নয়, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসেও এক বড় ঘটনা। বাংলা সাময়িকপত্রের ঐতিহ্য মহৎ। দেশ পত্রিকা জন্মকাল থেকেই সেই ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত। প্রথম অবস্থায় এই পত্রিকা অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু প্রফুল্লকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেনের মতন কর্ণধারদের উপদেশ, সাহায্য ও পরিচালনায় এই পত্রিকা সকল সংকট উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। আজ শুধু গুণগত বিচারেই নয়, প্রচারসংখ্যার দিক থেকেও দেশ পত্রিকা বাংলা ভাষায় সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে এই পত্রিকা ভারতীয় যে কোন ভাষায় প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাময়িকপত্রের অন্যতম। সম্পাদনা ও রচনার মানের দিক থেকে দেশ স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। এদেশের পত্র-পত্রিকার আয়ু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ হয়নি। দেশ পত্রিকা সেক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে এই ঘটনার গুরুত্ব অনেক।

আধুনিক সমাজ ও জীবনের হৃদস্পন্দনটির সঙ্গে পাঠকদের সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেওয়াই দেশ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশ পত্রিকার একটি নিজস্ব আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটা অপর পক্ষের মতবাদের প্রতি মোটেই অসহিষ্ণু নয়। দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায় সকল মত প্রকাশেরই সুযোগ রয়েছে। দেশ-এর আলোচনা ও সমালোচনাকেও সর্বদা নিরপেক্ষ ও নির্ভীক রাখার জন্য আমরা সচেষ্ট। রাজনীতি, অর্থনীতি, রঙ্গজগৎ, খেলাধুলো চিত্রপ্রদর্শনী, সংগীত প্রভৃতি কোন বিভাগের সমালোচনাই পক্ষপাতদুষ্ট নয়। সে-কারণেই দেশ পত্রিকা বিরাট পাঠকগোষ্ঠীর বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা জানি, এই পত্রিকাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তোলার অবকাশ এখনো আছে। সদিচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না, সব অবস্থা আমাদের আয়ত্তের মধ্যেও নয়। তবু আমরা যা দিতে পারি অগণ্য পাঠক তা সাগ্রহে গ্রহণ করেন বলে আমরা কৃতার্থ। দেশ পত্রিকার এক-চল্লিশ বর্ষে পদার্পণের মুহূর্তে আমরা আমাদের লেখক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং অন্যান্য সকলের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম ঃ ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুলে
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৩৬·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	১৮·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৯·৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৪৪·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	২২·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	১১·৫০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৮৭·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	৪৪·০০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	২২·০০

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৬০·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	৩১·০০

লন্ডন অফিস মারফত

বার্ষিক	— টাঃ	১৭৪·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	৮৭·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৪৪·০০

পঞ্চম পরিকল্পনা
ভারতীয় বেলুন ক্লাবের উদ্যোগে দিল্লির আকাশে সম্প্রতি গরম-বাতাস-ভরা একটি বেলুন ওড়াবার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি — সংবাদ

বাদুড়

সর্বস্নেহধন্য পলিটিক্যাল পার্টি সি পি আই অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অব্—না, ইন্দিরা নয়, (ওটা দুষ্ট লোকের রটনা)—ইন্ডিয়া সম্প্রতি যে দুটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকায় উক্ত পার্টির সদস্য অসদস্য সমর্থক অসমর্থক গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহলে সবিশেষ আহ্লাদ দেখা দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত দুটি এই:

(এক) সি পি আই রাজ্যের অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার বামপন্থী চরিত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নভেম্বর মাসে আবার বাংলা বন্ধ ডাকবে।

(দুই) সি পি আই কংগ্রেস-সি পি আই মোরচার মর্যাদা রক্ষার জন্য আগামী উপনির্বাচনগুলিতে এই রাজ্যে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন জানাবে।

ইহাই বক্তব্য।

কিন্তু না, আমাদের আজকের আলোচ্য সি পি আই নয়, বাদুড়।

ছোট ছোট ভাইবোনেরা! তোমরা সকলেই বাদুড় দেখিয়াছ; চামচিকাও দেখিয়াছ। বাদুড় বড়, চামচিকা ছোট। চামচিকা ও বাদুড় ভিন্ন জাতীয় প্রাণী নহে; কয়েক রকম ছোট ছোট বাদুড়কেই চামচিকা বলে।

ইহাদের সহিত বানরবর্গের শরীরের অভ্যন্তরিক সাদৃশ্য খুব বেশী। বস্তুত বাদুড় ইনটেলেকচুয়াল হইলেই বানরে পরিণত হয়। আমাদের দেশে তাই ইনটেলেকচুয়াল বানরের এত ছড়াছড়ি। সেইজন্য জীবজগতে বানরবর্গের পরেই করপক্ষের অর্থাৎ বাদুড়ের স্থান। কি বিচিত্র না এই জগৎ!

তোমরা হয়তো বাদুড়কে পাখি মনে কর, কিন্তু বাদুড় পাখি নহে। পাখির গায়ে পালক থাকে, বাদুড়ের গায়ে পালক নাই—পশুর ন্যায় লোম আছে। বাদুড়ও ডানার সাহায্যে পাখির মত উড়িতে পারে বটে, কিন্তু সে ডানা পাখির ডানার মত নহে—তাহাতে পালক নাই। বাদুড়ের ডানা পাতলা চামড়ায় নির্মিত। ডানা দুখানা বাদুড়ের হাত হইতে পা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং হাত পা ও গায়ের সঙ্গে যুক্ত। ডানার মাঝে সরু সরু লম্বা হাড় দেখা যায়, সেগুলি বাদুড়ের হাতের আঙুল। অন্য সব আঙুলই বড়, কেবল বুড়ো আঙুলটি ছোট; তাহার ডগায় একটি বাঁকা নখ থাকে। ইহাদের হাতের অন্য
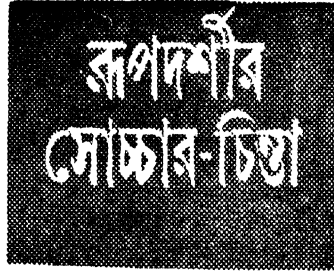
কোনও আঙুলে নখ নাই; কিন্তু পায়ের পাঁচটি আঙুলই নখযুক্ত।

তারপর দেখ, বাদুড়ের দাঁত আছে, কান আছে; কিন্তু পাখির দাঁতও নাই, কানও নাই। পাখিদের শক্ত ঠোঁট থাকে, বাদুড়ের সেরকম ঠোঁট নাই। ইহাদের মুখ ছুঁচালো—কতকটা শিয়ালের মুখের মত। সেই কারণেই বাদুড়কে ইংরাজীতে ফ্লাইং ফক্স বা উড়ন্ত শিয়াল বলা হয় কিনা জানা নাই। শিয়ালের সহিত কৌশল কথাটা যত খাপ খায় ঐ কথা বাদুড়ের সহিত ততটা খাপ খায় কিনা তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদরা বলিতে পারেন। তবে বাদুড়ের হাবভাব দেখিয়া মনে হয় কৌশল উহারাও জানে বটে।

তারপর, আর এক বিষয়েও বাদুড় ও পাখিতে প্রভেদ দেখা যায়। পাখিদের ডিম হয়, সেই ডিম ফুটিয়া ছানা হয়, কিন্তু বাদুড়ের ডিম হয় না; বিড়াল, গোরু, বানর, মানুষ প্রভৃতির মত একেবারে ছানা হয়। বাদুড়ের ছানা, ক্যাপিটালিসট দেশেরই হউক আর সোস্যালিসট দেশেরই হউক, মায়ের দুধ খাইয়া বাঁচে।

এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ, বাদুড় পাখি নহে। পৃথিবীতে অনেক রকম বাদুড় আছে। জাতি ভেদে সাদা, কালো, হলদে, কটা, ধূসর প্রভৃতি নানারকম বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়।

বাদুড় কোন দেশে নাই? ক্যাপিটালিসট দেশ, সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশ, সর্বত্রই বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। তবে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশসমূহেই বাদুড়েরা সহজে বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়। তাই এই সব দেশেই তাহাদের সংখ্যা বেশী। গুণগত দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় বাদুড়ই প্রকৃতপক্ষে বাদুড়দিগের নেতা। আবার ভারতীয় বাদুড়দের সেরা হইতেছে পশ্চিমবঙ্গের বাদুড়।

একমাত্র এই রাজ্যেই ইনটেলেকচুয়াল বাদুড়ের দেখা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে বাদুড়িয়া বলিয়া যে স্থান আছে তাহাই বাদুড়দিগের আদি জন্মস্থান বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। কারণ, তাহা না হইলে ঐ স্থানের নাম বাদুড়িয়াই বা হইতে যাইবে কেন? আমাদের মতে বিশ্বের প্রথম বাদুড়টি বাদুড়িয়াতেই জন্মগ্রহণ করে এবং কালক্রমে ঐ স্থান হইতেই বাদুড়গণ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে। এবং সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে এমন নানা ধরনের বাদুড় দেখা যায় যাহার সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

যেমন ধর, পলিটিক্যাল বাদুড়। বাদুড়ের এই আশ্চর্য প্রজাতি তোমরা আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। পশ্চিমবঙ্গের পলিটিক্যাল বাদুড় যদিও মূলত বাদুড়ই, তবুও উহাদের ক্রিয়াকলাপ উন্নত স্তরের জীবদিগের মত। উহারা পাখি এবং পশু এই উভয় জগতের সকল সুবিধা এমন কৌশলে ভোগ করে যে, মানুষেও উহাদের কাছে হার মানিয়া যায়। উহারা ডুড়ুও খায়, টামাকও খায়। উহারা গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায়। উহারা সরকারের বিরোধিতাও করে আবার সরকারের সহিত মোরচাও গড়ে এবং যাবতীয় সুবিধাজনক সরকারী দাক্ষিণ্য পায়ের নখে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দলে দলে হেঁট মুণ্ডে ঝুলিয়া থাকে।

হাঁ, অন্যান্য বাদুড়ের সহিত আপাতদৃষ্টিতে পলিটিক্যাল বাদুড়দের কোনও বৈসাদৃশ্য না থাকিলেও দুইটি বিষয়ে ইহারা সকলের আলাদা। তোমরা যদি কখনও কোনও পলিটিক্যাল বাদুড়ের দেখা পাও তবে উহার চোখ এবং কানের দিকে বিশেষভাবে নজর করিয়া দেখিও। দেখিবে উহাদের চোখের পাতা নাই এবং দু কান কাটা।

এই বিষয়ে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। তোমরা জান কিনা জানি না। একবার পশুসমাজ এবং পক্ষিসমাজের মধ্যে তুমুল লড়াই বাধিয়াছিল। পলিটিক্যাল বাদুড়েরা যখন দেখিল পশুরা প্রায় জিতিবে জিতিবে, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি গিয়া পশুদের সহিত যুক্ত ফ্রন্ট গড়িল। বলিল, আমরা তো পশু, আমরা ডিম পাড়ি না, আমাদের ছানা হয়। আবার পাখিরা যখন জিতিতে লাগিল তখন পাখিদের সহিত মোরচা গড়িল। বলিল, আমরা তো পাখি, আমরা তো ডানা মেলিয়া উড়ি। এইভাবে এই দলে একবার যায় এবং ঐ দলে আবার মেশে। শেষ পর্যন্ত উভয় দলই খেপিয়া উঠিল। এবং পাখিরা ঠোকর মারিয়া পলিটিক্যাল বাদুড়ের চোখের পাতা ছিঁড়িয়া লইল এবং পশুরা উহাদের কান কাটিয়া লইল। তদবধি পলিটিক্যাল বাদুড়ের চোখের চামড়া নাই এবং কানও কাটা। মিলাইয়া দেখিয়া লইও।

দেবরাজ

না সংগ্রাম না শান্তি

সতেরো দিন পরে পশ্চিম এশিয়ায় লড়ায়ের পালা সাঙ্গ হয়েছে। ২২ অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আরব ও ইহুদী-দের অস্ত্রসংবরণ করার ডাক দিয়ে যে প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে তাতে সাড়া দিয়েছে দু'পক্ষই। পরিষদের সে বৈঠকে হাজির ছিলেন মিশর আর ইস্রায়েলের প্রতিনিধি। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিতে তাঁরা কেউই আপত্তি করেননি। প্রস্তাব পাস হয়ে যাওয়ার পর অস্ত্রসংবরণের শর্ত মেনে নিয়েছেন মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত আর ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার। জর্ডন সরকারও তাঁদের দলে। লড়ায়ের আর এক পক্ষ সিরিয়া পরিষদের বৈঠকে গরহাজির ছিল, সাদাত আর গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তার রাষ্ট্রপতি হাফেজ আল আসাদ বৈঠকের প্রস্তাবে সায় দেননি। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ১৯৬৭ সনের যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবও সিরিয়া মেনে নেয়নি যদিও তার পক্ষে একলা লড়াই চালিয়ে যাওয়া শেষের সম্ভব হয়নি। এবার তার সঙ্গে এক পথের পথিক ইরাক। তার রাষ্ট্রপতি জেনারেল আহমেদ হাসান এল বকরও নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বিরোধী।

সে প্রস্তাবের তিনটে ধারা। পয়লা ধারায় যে সব দেশ লড়াই করছে তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে যে যেখানে আছে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে যেন লড়াই থামিয়ে দেয়, আর বারো ঘণ্টার মধ্যে সবরকম যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে। দু নম্বর ধারায় বলা হয়েছে অস্ত্রসংবরণের সঙ্গে সঙ্গেই সব পক্ষই যেন নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পুরোপুরি কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা করে। সে প্রস্তাবে ইস্রায়েলকে বলা হয়েছিল আরবদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সব এলাকা থেকে সরে যেতে। তিন নম্বর ধারার মোদ্দা কথা হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ায় ন্যায়ের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আলাপ আলোচনা শুরু করতে হবে যোগ্য [illegible] উদ্যোগে। কার কী [illegible] শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলবে তা স্পষ্ট করে বলা না হলেও [illegible] রাশিয়া আর আমেরিকা [illegible]। এই দুই মহাশক্তি ছাড়া পশ্চিম এশিয়া নিয়ে সে [illegible] আর কোনও দেশের বিশেষ মাথাব্যথা নেই।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বয়ান তৈরি [illegible] দুই [illegible]। পেশ করেছে একসঙ্গে। [illegible] পাসও হয়ে গেছে তাদেরই [illegible]। পনেরো জন সদস্যের [illegible] ভোট দিয়েছে প্রস্তাবের পক্ষে; কেবল চীন 'হাঁ-না' কিছুই বলেনি। তার ধারণা, যুদ্ধের আগুন ও প্রস্তাবে নিববে না, ছাই চাপা পড়বে মাত্র—গোলাগুলি যুদ্ধ চলবে না বটে তবে শান্তিও পাকাপাকি আসবে না—না সংগ্রাম না শান্তি গোছের একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি হবে পশ্চিম এশিয়ায়। প্রস্তাবটা তার মনে না ধরলেও চীন তার বিরোধিতাও করেনি, কেন না সে বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটা নাকচ হয়ে যেত, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে ওস্কানি দেওয়ার জন্যে তাকে সবাই দায়ী করতো। অতটা ঝুঁকি না নিয়ে চীন ভোটাভুটির মধ্যে যায়নি। বাকীদের কেউ কেউ দু'চারটে বাঁকা কথা বললেও ভোটের সময় দুই প্রধানের কথামতো হাত তুলেছে তাদের সঙ্গেই। আরব দেশগুলোর মধ্যে যারা প্রস্তাবের বিরোধী, যুদ্ধবিরতিতে যাদের আপত্তি তারা কেউ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয়, তাদের ভোট দেবার কথাই ওঠে না। কাজেই পরিষদের বৈঠকে রুশ-মার্কিন সমঝোতার জয়জয়কার হয়েছে।

এমন একটা প্রস্তাব যে নিরাপত্তা পরিষদে উঠতে চলেছে তার বিন্দুবিসর্গও কেউ টের পায়নি মস্কো আর ওয়াশিংটনের বাইরে। তার পনেরো জন সদস্যের মধ্যে অন্তত এগারো জন হকচকিয়ে গিয়েছিল বৈঠক বসার নোটিশ পেয়ে। ব্রিটেন আর ফ্রান্স হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল, বৈঠকের উদ্দেশ্যের আভাসও কিছু হয়তো তারা পেয়ে থাকবে। বাদবাকীরা কিন্তু ছিল একেবারে অজ্ঞানতিমিরে ডুবে। বৈঠকের এক মুহূর্ত আগেও তাদের প্রস্তাবের খসড়া দেখতে দেওয়া হয়নি এমনি ছিল দুই প্রধানের মন্ত্রগুপ্তি। তলে তলে একটা কিছু যে চলছে তা যে বোঝা যায়নি এমন নয়। রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন লুকিয়ে হঠাৎ হাজির হয়েছিলেন মিশরের রাজধানী কায়রোতে ১৬ অক্টোবর। সেখানে চারদিন থেকে তিনি যখন ফিরে গেলেন মস্কো তখন শোনা গেল তিনি চার দফার এক শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেছেন মিশরের রাষ্ট্রপতি সাদাতের কাছে। দু সরকার কিছু বলুক না বলুক বোঝা গেল যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা শুরু হয়েছে। সে ধারণা যে ভুল নয় তা বোঝা গেল যখন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কিসিংগার পাড়ি দিলেন মস্কো।

কিসিংগার রুশ মুলুকে এসে পৌঁছলেন ২০ অক্টোবর আর দু ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সলাপরামর্শ শুরু হলো রুশ কমিউনিস্ট দলের মহাসচিব ব্রেজনেভের সঙ্গে। কোসিগিন কিন্তু সে বৈঠকে যোগ দেননি। কী যে তাঁরা ঠিক করেছেন তার আভাসও কেউ পায়নি। ওদিকে লড়াই সমানে চলেছে, গোড়ায় কোণঠাসা হলেও ইহুদীরা আবার প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে আরবদের বিরুদ্ধে। আরবরাও সমান তেজে লড়ে যাচ্ছে। মিশর আর সিরিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইরাক আর জর্ডন। অন্য আরব দেশগুলো যুদ্ধের আসরে নেমে না পড়লেও যে যেমন পারে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে মিশর আর সিরিয়াকে। যুদ্ধবিরতির কথা কোনও পক্ষই তুলছে না—না আরবরা, না ইহুদীরা। সবাই বলছে এক কথা—হয় এস্পার, নয় ওস্পার, সন্ধি এবারে আর নয়। একদিকে লড়াই করছে আরবরা আর ইহুদীরা, আর একদিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর যুদ্ধের সরঞ্জাম যুগিয়ে যাচ্ছে রুশিরা আর আমেরিকা। একে অপরকে দোষ দিচ্ছে আর যে যার পেয়ারের দেশকে যোগান দিচ্ছে গোলা বারুদ, বিমান, ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র, যোগাযোগের সরঞ্জাম।

লোকে তাই ধরে নিয়েছিল শান্তির ফাঁকা বুলিই দুই প্রধানের দিকপালের আওড়াচ্ছেন যুদ্ধ থামাবার ইচ্ছে তাঁদের আদৌ নেই। নিরাপত্তা পরিষদের অমন একটা প্রস্তাবের জন্যে কেউই প্রায় তৈরি ছিল না সেই জন্যেই। আরবদের কিংবা ইহুদীদের মনের কথা যাই হোক না কেন এমন স্পর্ধা তাদের কারুরই নেই যে, তাদের মুরুব্বিদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় চালাবার শক্তিও তো তাদের নেই। টিকি তো মস্কোয় আর ওয়াশিংটনে বাঁধা। রুশীরা শুধু এইটুকু বোধ হয় প্রমাণ করতে চেয়েছিল আরবদের খরচের খাতায় লিখে রেখে বিষম ভুল করেছে আমেরিকা আর ইস্রায়েল। সেটুকু প্রমাণ হয়ে যেতেই শান্তি ফিরিয়ে আনতে তারা লেগে পড়েছিল। আমেরিকাও যখন দেখলে লড়াই করে আরবদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া যাবে না তখন লড়াই থামাবার ব্যবস্থা করতে সেও অরাজী হয়নি। কিন্তু আসল কথা তো আর অস্ত্রসংবরণ কিংবা সাময়িক শান্তি নয়, স্থায়ী শান্তি। তার ভিত কী গড়তে পেরেছে নিরাপত্তা পরিষদের দুই মোড়ল? খুশী আরবরাও নয়, ইহুদীরাও নয়। আরবদের পর ইহুদীদের রাগ যায়নি, ইহুদীদের পর আরবদের। যুদ্ধ থেমেছে বটে পশ্চিম এশিয়ায়, শান্তি কিন্তু কায়েম হয়নি।

নোবেল পুরস্কারের পুরনো গৌরব অনেকাংশে ম্লান হলেও এটি একটি বিশেষ সংবাদ। গত ১৮ই অক্টোবর সুইডিস অ্যাকাডেমী অব লেটারস ঔপন্যাসিক প্যাট্রিক হোয়াইটকে তাঁর এপিকধর্মী, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকী রচনার মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বসাহিত্যের সংগে পরিচয় ঘটানোর জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নোবেল পুরস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গত কয়েক বছর ধরেই মিঃ প্যাট্রিক হোয়াইটের নাম শোনা যাচ্ছিল। সাহিত্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইতিপূর্বে আর কোন লেখক নোবেল পুরস্কার পাননি—মিঃ হোয়াইট-ই প্রথম। মিঃ হোয়াইটের নাম ঘোষণা করতে গিয়ে সুইডিস অ্যাকাডেমী তাঁর কয়েকখানা উপন্যাসেরও উল্লেখ করেছেন।

মিঃ প্যাট্রিক হোয়াইটকে পেশাদার সমালোচকরা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। সমালোচকরা তাঁর শিল্পী-সুলভ একমুখীন মননশীলতাকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করেছেন, অন্য দিকে এই গুণের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অসংখ্য পাঠক তাঁর সংগে একাত্ম হয়েছেন—তাঁকে তাঁদের নিজের মানুষ, কাছের মানুষ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'হোয়াইট ইজ দি জিওগ্রাফিক্যালি রিমোট এ রাইটার'। আবার কেউ বা বলেছেন, 'হিজ স্টাইল উইল হ্যাভ এ ব্যাড এফেক্ট অন ইয়ং পিপল'। কিন্তু পাঠকরা গল্প-উপন্যাস থেকে আনন্দ পেতে চায়—সেই আনন্দ তাঁরা হোয়াইটের রচনা থেকে পেয়েছেন, তাই পাঠকের দরবারে প্যাট্রিক হোয়াইট মহান।

প্রতিভাবান লেখকমাত্রকেই সর্বদেশে সর্বকালে এই দুর্ভোগ সইতে হয়েছে। সমসাময়িক সমালোচকবর্গ হয় তাঁদের নিন্দাবাদ করেছেন, আর নয়ত ইচ্ছাকৃত অবহেলা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত জহুরীরা তাঁদের ঠিক সময়েই জয়মাল্য দিয়ে ভূষিত করেছেন।

প্রত্যেকেরই জীবন সমস্যাবহুল। কারও কম কারও বেশী। প্যাট্রিক ভিক্টর মারটিনডেল হোয়াইট, যাঁর নাম এ বছর নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর জীবনে সমস্যা শুরু হয়েছিল জন্ম থেকেই। মা-বাবা ১৯১২ সালে

প্যাট্রিক হোয়াইট

বেড়াতে গিয়েছিলেন লণ্ডনে। সেখানেই ২৮শে মে তারিখে জন্ম হলো তাঁর। বয়স যখন ছয় মাস মা বাবার সংগে ফিরে এলেন অস্ট্রেলিয়ায় যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষরা ১৮২০ খৃষ্টাব্দ থেকে বসবাস করছিল। ১৩ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া সেখানেই হলো। তারপর তাঁকে পাঠানো হলো ইংলণ্ডের চেলটেনহাম কলেজে। চেলটেনহাম কলেজের প্রভাব তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'দ্য টুইচিং কর্নেল'-এ পাওয়া যায়। চেলটেনহাম থেকে ফিরে এলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে 'শীপ-স্টেশনে' কাজ করেন তিন বছর। কাজ খুব ভালো লাগলো না। ফিরে এলেন। চলে গেলেন ক্যাম্ব্রিজের কিংস কলেজে ফরাসী ও জার্মান পড়বার জন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। কয়েকবার অস্ট্রেলিয়া আর ইংলণ্ড যাতায়াতের ফলে তাঁকে ঘুরে বেড়াবার নেশায় পেয়ে বসে। তাই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরলেন আর তারপরই এল বিশ্ব যুদ্ধ। ঘোরবার সুযোগ অযাচিত ভেবে এসে গেল। রয়েল এয়ার ফোর্সের ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে গ্রীস ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে কাটালেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বিচিত্র সংস্কৃতি ও সমাজের সংগে তাঁর পরিচিতি ঘটলো। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ঔপন্যাসিক হোয়াইটের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'হ্যাপি ভ্যালী'—১৯৩৯। এই উপন্যাসের মধ্যেই প্রথম তাঁর সংগ্রামী মনের পরিচয় ফুটে ওঠে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলেসের গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি তথ্যচিত্র যেন এই উপন্যাসটি। মানুষের নির্জনবাসের এবং একক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা

[illegible]। নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি সোনার খনি অঞ্চল যাকে স্থানীয় অধিবাসীরা হ্যাপি ভ্যালী নামে ডাকে তাকে ঘিরেই এই উপন্যাস। উপন্যাসে সোনার খনিটির অবশ্য কোন ভূমিকাই নেই। উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় লেখক গান্ধীজির উক্তি 'প্রোগ্রেস মেসারড বাই দ্য অ্যামাউণ্ট অব সাফারিং অণ্ডারগন' মনে রেখেছিলেন আর তাই তিনি সুখের পরিমাপ করেছেন দুঃখ-পাওয়ার মধ্য দিয়েই। হ্যাপি ভ্যালীর নায়িকা ডিক মোরিয়ারটির বিয়ে হয়েছিল হাঁপানি রোগগ্রস্ত এক স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে। আর অন্য দিকে স্থানীয় ডাক্তার মিঃ অলিভার হ্যালিডে—তার স্ত্রী রুগ্ন-ক্ষয়রোগগ্রস্ত দুই সন্তানের জননী। একদিকে ডিক মোরিয়ারটি অন্য দিকে অলিভার হ্যালিডে দুই জনের কেউই বিবাহিত জীবনে সুখ পায়নি। তারা যেন জীবনে শুধু কষ্ট করতেই জন্মেছে। আর এই দুই চরিত্রের সঙ্গে আর একটি চরিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য, সেটি হচ্ছে অ্যালিস। ঔপন্যাসিক হোয়াইট সৃষ্ট 'অ্যালিস' নারী চরিত্রটি অপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই উপন্যাসটিতে সংগীতেরও একটি ভূমিকা আছে। প্রথম প্রকাশের পরে হ্যাপী ভ্যালী উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল লণ্ডন (১৯৪০), নিউইয়র্ক (১৯৪০) এবং ফরাসী অনুবাদ প্যারী থেকে ১৯৫১। দ্বিতীয় উপন্যাস 'দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড' ১৯৪১, নূতন সং ১৯৬২। উপন্যাসটিতে লেখক জীবনের অতৃপ্ত কামনা বাসনাকে মূর্ত করে তুলেছেন। প্রথম উপন্যাসে [illegible] ছিল সামাজিক পুরুষ-নারীর হাত থেকে মুক্তির বাহন। এই উপন্যাসে [illegible] সংগীতের স্থান নিয়েছে। মিঃ হোয়াইট তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতেই যে 'ফিউটিলিটি' নামে ছোট্ট কবিতা লিখেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি আবার শোনা যায় 'দ্য লিভিং অ্যান্ড দ্য ডেড' উপন্যাসে।

'দ্য আণ্টস স্টোরি' লেখকের অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাস। তার কারণ লেখকের বিশ্বাস ও চিন্তার প্রতিচ্ছবি এতে আছে। লেখক বিশ্বাস করেন 'ফেসেস ইনহেরিট ফিচারস। থট অ্যান্ড একসপেরিয়েনস আর বিকুইথড।' লেখকের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব পরিস্ফুট। থিয়োডোরা ওডম্যান এই উপন্যাসের নায়িকা। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আবিসিনিয়া উপন্যাসের পটভূমি। থিয়োডোরা পুরুষ স্বভাবের নায়িকা আর তার চলনবলনে একটা পাগলামিস্বভাব। উপন্যাসটির প্রথম অংশে অস্ট্রেলিয়ার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় অংশে কতগুলো বিশিষ্ট চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। থিয়োডোরা ওডম্যান, সোকোলনিকভ ও মাদাম রাপালো চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সচরাচর দেখা যায় না। থিয়োডোরার চরিত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অভিপ্রকাশই সমালোচককে ভাবিয়েছে পাঠকের মন রসসম্পৃক্ত করেছে আর সম্পূর্ণ উপন্যাসটি লেখকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

'দ্য ট্রি অব ম্যাস (১৯৫৪)' উপন্যাসটি অস্ট্রেলিয়ার পটভূমিতে লেখা। আর তাই মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার পাঠকরা একে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই। অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস ও একটি পরিপূর্ণ চিত্র উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক কালে এ ধরনের উপন্যাস অস্ট্রেলিয়ায় আর কেউ লিখেছেন বলে জানা নেই। আর তাছাড়া এই উপন্যাসটি এপিক উপন্যাস নামেও পাঠকদের দ্বারা আখ্যাত হয়েছে। সমালোচকরা কিন্তু উপন্যাসটি অস্ট্রেলিয়ার পটভূমিতে লেখা হলেও 'আন অস্ট্রেলিয়ান' বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু জন ড্যাভেনপোর্ট এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন 'দ্য নভেল স্ট্যাণ্ডস আউট অ্যাবাভ মোস্ট কনটেমপোরারি ফিকসন উইথ দ্য ফাইন, ক্লিয়ার লাইনস অব এ বীচ এগেনস্ট স্কাব।" উপন্যাসটির মূল নায়ক নায়িকা যথাক্রমে স্টান পার্কার ও তার স্ত্রী অ্যামী ফিবেনস। স্টান পার্কারের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় উপন্যাসটি ঠাসা। উপন্যাসটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, প্রকৃতি ও ইতিহাস এর উপজীব্য। একে প্রতীকী উপন্যাস বললেও অত্যুক্তি হয় না।

[illegible] পরিচিত সেটি হচ্ছে 'ভস'—১৯৫৭।

এই উপন্যাসটি ইংরেজী-ভাষীদের কাছে পরিচিত, তার কারণ ১৯৫৯ সালে লেখক মিঃ প্যাট্রিক হোয়াইট 'ভস'-(ফস)-এর জন্য ডব্লিউ. এইচ. স্মিথ অ্যান্ড সন্স সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন—। উপন্যাসের নায়ক জার্মান 'ভস' বা (ফস) নায়িকা অস্ট্রেলিয়ান লরা ট্রেভেলিয়ন। উপন্যাসের নায়কের নামানুসারেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। নায়ক সদলবলে অস্ট্রেলিয়া এসেছিল এক বিশেষ দুর্গম অভিযানে। অভিযানের সঙ্গীরা বিদ্রোহী হয়। নায়ক তার গাইডের হাতেই মারা যায়। উপন্যাসের নায়িকা লরা ট্রেভেলিয়ানের সঙ্গে নায়কের পরিচয় বোনের পরিবারের মাধ্যমে যেখানে লরা ছিল আশ্রিত আর যারা নায়কের অভিযানে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। প্রথম পরিচয়ের পরই একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়। নায়ক অভিযানে চলে যায়—নায়িকার একাকীত্ব শুরু হয়। নায়ক মরুভূমি থেকে চিঠি লেখে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। প্রথম চিঠির পর আর কোন চিঠিই পাওয়া যায় না। লরা নায়কের কথা ভেবে অসুস্থ হয়। বর্তমান উপন্যাসে লরা হচ্ছে ঈভ, সেই-ভার্জিন মেরী এবং ১৮৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়ার নারী-সমাজের প্রতীক। কোন কোন সমালোচক মিঃ হোয়াইটের এই নারী চরিত্রটিকে তলস্তয়ের আন্না কারেনিনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। লেখক প্রতীকের মাধ্যমে স্বর্গ ও নরকের রূপও ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসটিতে।

ঔপন্যাসিক হোয়াইটের পরবর্তী উপন্যাস 'রাইডারস ইন দ্য চ্যারিয়ট' ১৯৬১, সমসাময়িক অস্ট্রেলিয়ান ঔপন্যাসিকদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এই উপন্যাসে আছে 'অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন' চারটি চরিত্র। চরিত্র কয়টির চিন্তাধারা ভিন্ন হলেও 'দয়া ও প্রেম' সম্পর্কে তারা সকলেই একমত। চারটি চরিত্র চার রকমের। একজন জার্মান ইহুদী, একজন ইংরেজ কৃষিজীবী মহিলা, একজন শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়ান, আরেকজন আদিবাসী চিত্রকর। এরা সকলেই সহযাত্রী—জীবন প্রতিষ্ঠাই সকলের লক্ষ্য। ধর্মীয় আচার ও রীতিনীতি উপন্যাসের একটা বিশেষ অংশ অধিকার করে [illegible] উপন্যাসটিকে [illegible] করেছে।
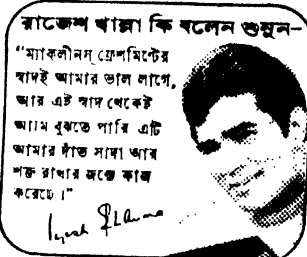
'দ্য সলিড ম্যান্ডালা'—১৯৬৬ মিঃ হোয়াইটের সাম্প্রতিক উপন্যাস। যমজ ওয়ালডো এবং আর্থার ব্রাউন এদেরই জীবন কাহিনী উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। আর্থারের চেহারা আর ওয়ালডোর চেহারার মধ্যে অনেক পার্থক্য। একজন লম্বা আরেকজন বেঁটে ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন সহজ সরল মানুষ আরেকজন অস্বাভাবিক চরিত্রের। মানব সম্পর্কের অনিশ্চিত জগৎ সম্পর্কে আর্থার স্বপ্ন দেখতে দেখতে মৃত্যুবরণ করে। প্রেমের রাজ্যে মুক্তি পেতে গেলে কারও কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে সেই বার্তাই সে সকলকে জানাতে চেয়েছে। 'ওয়ালডো' ও 'আর্থার' এই দুটি চরিত্র-চিত্রণে লেখক যে মুনসিয়ানা দেখিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। আর তাছাড়া উপন্যাসের সর্বত্রই সমাজের প্রতি লেখকের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতীকী ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় মেলে।

মিঃ হোয়াইট তাঁর অতি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থে 'দ্য ভিভিসেকটর' এবং 'আই অব দ্য স্টর্ম'—ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে ও ইঙ্গিতময় বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছোট গল্প ও নাটক রচনার ক্ষেত্রেও মিঃ প্যাট্রিক হোয়াইট তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'দ্য বর্নেন্ট ওয়ানস', ১৯৬৪ গল্প সংকলন এবং ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'ফোর প্লেজ' গ্রন্থটি পাঠকদের মন জয় করেছে।

ঔপন্যাসিক হিসেবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হলেও মিঃ হোয়াইট কিন্তু সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। 'দ্য প্লাউম্যান অ্যান্ড আদার পোয়েমস' এই কাব্য-সংকলনে তেত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। ছাত্রাবস্থায়ই কবিতা লেখা তিনি শুরু করেছিলেন। সংকলনটিকে 'নেচার-পোয়েট্রি' বলে আখ্যাত করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার বাইরে গ্রন্থটি দুর্লভ। তবে কবি হিসেবে কিন্তু তিনি বিশেষ খ্যাতি পাননি।

কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মিঃ প্যাট্রিক হোয়াইট আজ দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত। মিঃ হোয়াইটের মত ধ্রুপদী সাহিত্যিকবর্গ সাধারণত মৃত্যুর পরেই প্রকৃতরূপে সম্মানিত হন কিন্তু এক্ষেত্রে আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি জীবদ্দশাতেই বিশ্ববিখ্যাত সম্মানে ভূষিত হলেন। তবু বলব যে, এই সম্মান প্যাট্রিক হোয়াইটের প্রকৃত সম্মান নয়, আসল সম্মান কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে আরও বিস্তৃত হবে যখন অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য পৃথিবীর বিভিন্ন রসিক মহলের হাতে গিয়ে পৌঁছবে।

অভিমন্যু

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

খুব তাড়াতাড়ি তুমি বড় হয়ে উঠো না ; হে শিশু
হে আমার ঈশ্বরের অধিক আগ্রহ।
এখন তোমার হাঁটু ডুবে আছে আশ্বিনের নবীন শিশিরে,
ঘাস বারংবার পা ছুঁয়ে শিখছে তোমায়, তুমি কি
মন্দিরের সমান দেবতা ? সেই মাটি ছুঁয়ে নত ফিরে আসা
ব্যক্তিগত বিগ্রহের কাছে! আমি রোজ কিছু
নক্ষত্রকে নামতে দেখি তোমার দু চোখে
ভাবি, তুমি নিঃসঙ্গ বক্ষের কোন উদাসীন শ্লোক!

আমার চোখের জল শেষবার ঝরেছিল মায়ের প্রাচীন
অস্থির ওপরে, অগ্নিপরীক্ষিত ওই অসমাপ্ত হাড় যেন
নিষ্পলক চেয়েছিল নিঃস্ব এক প্রতিবিম্বের দিকে—সে কি আমি ?
আমি মাকে শহরের পাথরে এনেছি, আমি তাঁকে
কয়েকটি সাজানো ঘর ব্যবহার করতে শিখিয়ে
কেড়ে নিয়েছিলাম অনেক আত্মীয় গাছ, অভিভাবক নদী।

আমি তাঁর সমাপ্ত সন্তান : তুমি শুরু, বর্তমান,
তুমি আমার মায়ের শেষ ক্ষমা, আমি চাই তুমি
খুব আস্তে আকাশের দিকে গড়ে ওঠো। কেননা তোমাকে আমি
পারবো না দিতে সামান্য স্বাস্থ্যল অন্ন, প্রতিটি পথের মোড়ে
একাকী পেলেই ঘিরবে যন্ত্রের শ্লোগান, দেয়ালে তাকালে দেখবে
একজনের অক্ষরের ঠিক ওপরেই কি বিশাল
হয়ে উঠছে ঠিকানা হারানো মানুষের নতুন অক্ষর :
দেখবে, ক্লান্ত মুখের ভাষার বেশী স্বাধীনতা বেঁচে নেই
ভারতীয় সূর্যের সংগ্রহে।
তবু আমি তোমাকে এনেছি এই কুরুক্ষেত্রের দ্বিধায়, তুমি
প্রতিশোধ নেবে, তুমি ভয়ংকর জেগে উঠবে
আকাশ আছড়ানো প্রতিবাদে।
কিন্তু তার আগে কিছুদিন খেলা করো উদ্গত শিশিরে,
একা নক্ষত্রকে সংকেত পাঠাও, ধীরে খুব ধীরে
প্রায় জাতিস্মর অহংকার নিয়ে তুমি বেড়ে ওঠো
হে আত্মজ অভিমন্যু, সর্বস্ব আমার।

মরণেও কেন অ্যাতো সুখ

শান্তনু দাস

হাতের ওপরে আরো হাতের ওপরে
আরো হাত
আদিম অরণ্য হয়ে ছুঁয়ে থাকে আকাশের বুকে।
কি যে সুখ,
মরণেও কেন অ্যাতো সুখ।
কেন এই আনন্দ বিহীন এক মরণ-উৎসবে
জেগে থাকে শুভ্র বেলাভূমি।

আমরা পৃথিবী হতে চাই।
পৃথিবী কি মানুষের শব,
নেকাম্মা আবাস ?
এক সাথে থাকা, সহবাস
খেলা করে কোষের আঁধারে,
শব শবের ওপরে আরো শবের ওপরে
আরো শব—
আদিম অরণ্য হয়ে ছুঁয়ে থাকে নিমগ্ন আকাশ॥

মালব-কৌশিক

আশা দেবী

হাট শেষ হয়ে গেল—
ধীরে ধীরে থেমে এলো আলো হাসি গান।
আমি শুধু মনে মনে ভাবি
মরুঘেরা নীড় হতে মরুভূমি যাহাদের ডাকে—
মনের হরিণ যার চায় শুধু মায়া-মরীচিকা
তার পথ কোথা অবসান ?
হেথায় আমার ঘরে প্রদীপের মৃদু শিখা জ্বলে—
দেহহীন ভীরু প্রেম আমারে জড়ায়
বাতায়ন—পরপারে তারাগুলি হাসে লীলাভরে—
কালো জলে কালো চোখ করে জ্বলোজ্বল—।
পড়ে থাকা স্মৃতিগুলো পাকে পাকে আমারে জড়ায়
নেশাতুর নূপুরের মতন।
দূরে কে জাগিয়া উঠি শানি কোথা বাজে বহুদূরে
পথ হারা বৈরাগীর বন্দনায় কোন একতারা
বাজে বাজে মালব কৌশিক
তমোমগ্ন চক্রবালে আলেয়ার মরণ-সংকেত ॥

আমাদের মহাকাব্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটলেও কেলেঙ্কারি কাণ্ড কিছু ঘটে না। লঙ্কাপুরীতে সীতার কোন অবমাননা হয়নি, লঙ্কা সেদিক থেকে নিষ্কলঙ্ক। বিশেষ করে নারীঘটিত ব্যাপার বলতে যা বোঝায় সীতাহরণের ঘটনাটা আদৌ সে জাতীয় নয়। কিন্তু পশ্চিম দেশের মহাকাব্যে হেলেন হরণ ব্যাপারটি পুরোপুরি নারী-হরণের কাহিনী। সীতাহরণ হয়েছে বলপূর্বক, ব্যাপারটা শত্রুতামূলক। হেলেন হরণে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি; হেলেন স্বেচ্ছায় হরণকারীর অনুগামিনী হয়েছিলেন। আজকের ভাষায় হেলেন কুলত্যাগিনী, শুধু তাই নয়, গ্রীক পুরাণ মতে প্রণয়ী প্যারিস-এর মৃত্যুর পরে তাঁর এক ভ্রাতার সঙ্গে আবার হেলেন-এর বিবাহ হয়েছিল। অর্থাৎ সমস্তটা মিলিয়ে আজকের দিনে স্ক্যাণ্ডেল বলতে যা বোঝায় এটি তারই একটি নধর নিটোল দৃষ্টান্ত। দুই কাব্যের ঘটনাবলী অনেকটাই অনুরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ—এখানে স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস, ওখানে ট্রয় নগরী। এখানে সীতা উদ্ধার, ওখানে হেলেন উদ্ধার। উদ্ধারের পরে হেলেন আবার মেনেলসএর মহিষীরূপে সিংহাসন-পাশে বসেছেন, বাকি জীবন সুখে শান্তিতে বাস করেছেন। গ্রীক সমাজ স্ক্যাণ্ডেলটি দিব্যি হজম করে নিয়েছে। ওদিকে সীতা যখন অযোধ্যায় ফিরে এলেন তখন তাঁর নামে অযথা অপবাদ রটনা করা হল। অপবাদটা যে ভিত্তিহীন, কবিগুরু বাল্মীকিই তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। যে ব্যক্তি অপবাদটি রামের কর্ণগোচর করেছিল তার নাম দুর্মুখ। নামের মধ্যেই তার পরিচয়। আজকাল আমরা যাকে বলি scandalmonger, দুর্মুখ তারই আদি নাম। যাহোক, অপবাদ রটনা মাত্র রাজ্যময় এমন আলোড়ন উপস্থিত হল যে রামচন্দ্রের সিংহাসন টলে উঠল। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও প্রজারঞ্জন রাজা নিরপরাধ সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। আধুনিক মনের কাছে এটাই একটা স্ক্যাণ্ডেল। পরে অবশ্য এ দেশের লোক সীতাকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করেছে কিন্তু সেজন্যে তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। অপর পক্ষে অনেকে বোধ করি জানেন না যে, ওদেশে হেলেন-এর নামেও মন্দির নির্মিত হয়েছে তাঁকেও দেবী হিসাবে পুজো করা হয়েছে কিন্তু সেজন্যে তাঁকে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়নি। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে, স্ক্যাণ্ডেল সম্পর্কে বাল্মীকির চাইতে হোমার ঢের বেশি উদার। মনে হয় তিনি সে যুগের গ্রীক সমাজের দস্তুর মেনে চলেছেন। এদিকে বাল্মীকি ভারতীয় সমাজের দস্তুর মেনে চলেছেন এমন কথাও খুব নিশ্চিত করে বলা চলে না। কারণ এ বিষয়ে আমাদের মহাভারতের কবি হোমার-এর চাইতে কিছুমাত্র কম উদারতা দেখান নি। লঙ্কাকাণ্ডের মতো এখানেও কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে কেলেঙ্কারি কাণ্ডও কিছু কম ঘটেনি। কিন্তু তাই নিয়ে কবি যেমন কোন শোরগোল করেননি, সে যুগের সমাজেও তেমন কোন তোলপাড় হয়েছে বলে মনে হয় না। হলে, অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং পাণ্ডব ভ্রাতারাও সমাজে মুখ দেখাতে পারতেন না, জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে পথে ঘাটে টিটকিরি শুনতে হত। ওদিকে দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামী নিয়ে দিব্যি ঘর করে গেলেন। তাই নিয়ে খুব কি একটা শোরগোল হয়েছিল? আমাদের মহাকাব্যে এমন কিছু নারী চরিত্র আছে যাঁরা কলঙ্কিতা বলেই মহিমান্বিতা। তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া। তাঁদের নাম নিত্য স্মরণ করলে মহাপাতক-নাশনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কাজেই সে যুগে ভারতীয় সমাজ অনুদার ছিল এমন বলা চলে না।

সামাজিক কেলেঙ্কারি বা স্ক্যাণ্ডেল বলতে লোকে সাধারণত বোঝে নারীঘটিত ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ক্যাণ্ডেল-এর ক্ষমতা এরূপ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। বহুমুখী এর প্রতিভা, বহুবিস্তৃত এর কর্মক্ষেত্র। সামাজিক কোন আচার আচরণই তার আওতার বাইরে নয়। শব্দটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। ইংরেজি স্ক্যাণ্ডেল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক Skandalon শব্দ থেকে। শব্দটির মূলগত অর্থ পদস্খলন: এ ছাড়া অপর একটি অর্থেও কথাটি ব্যবহৃত হত—শত্রুকে কায়দা করবার উদ্দেশ্যে পাতা ফাঁদ। দেখা যাচ্ছে, কালক্রমে দুটি অর্থ মিশে গিয়ে বর্তমানে অর্থটা দাঁড়িয়েছে—কোন ব্যক্তির স্খলন পতন ত্রুটির সুযোগ নিয়ে লোকসমক্ষে তাকে হেয় বা হাস্যকর করবার জন্যে মানহানিকর রটনা। গোড়ার দিকে উদ্দেশ্যটা কিছু খারাপ ছিল না। কথাটা প্রধানত ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যবহৃত হত। কোন ধর্মগুরু বা ধর্মযাজক যদি এমন কোন কাজ করতেন যার ফলে ধর্মের প্রতিই লোকের মনে অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহলে সেই কাজকেই স্ক্যাণ্ডেল বলে গণ্য করা হত। কোন ব্যক্তি যদি মনে করতেন যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁর নামে অমূলক কুৎসা রটনা করা হচ্ছে, তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে এর বিচার হত ecclesiastical court-এ অর্থাৎ ধর্মীয় আদালতে। মধ্য যুগ পেরিয়ে ধর্মের চাইতে যখন রাজনীতি প্রবলতর হয়ে উঠল, তখন স্ক্যাণ্ডেল ধর্মকে ছেড়ে রাজনীতির উপর ভর করল। মাননীয় নেতৃবৃন্দের মান রক্ষা করা দায় হয়ে উঠেছিল। কুৎসা রটনা দমন করবার জন্যে ইংলণ্ডের রাজা এডোয়ার্ড দ্য ফার্স্ট আইন প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল কিছু হয় নি। মৌখিক রটনাকে দমন করা আইনের সাধ্যে কুলোয় না। লোকে বলে শতং বদ, মা লিখ। মুখের কথা প্রমাণসিদ্ধ নয়। লিখিতভাবে বললে libel-এর আওতায় পড়ে।

ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ ভক্তি এত বেশি যে, ভক্তরা সহজে গুরুস্থানীয় কারো বিরুদ্ধে স্ক্যাণ্ডেল রটনা করে না, অপরে করলেও সহজে তা বিশ্বাস করে না। চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে স্ক্যাণ্ডেলের ব্যবহার রাজনীতির ক্ষেত্রেই অধিকতর চালু। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, স্ক্যাণ্ডেল নানা

ক্ষেত্রে নানা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও নারী-ঘটিত স্ক্যান্ডেল অদ্যাবধি তার প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এটি যেমন মুখরোচক তেমনি শ্রুতিসুখকর। স্ক্যান্ডেল বাস্তবিক পক্ষে সভ্যতার সৃষ্টি। মানুষ যতদিন অসভ্য—বলতে গেলে বন্য ছিল—ততদিন স্ক্যান্ডেল ছিলনা। কারণটি সুস্পষ্ট; আদিম সমাজে পুরুষ ছিল, স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু স্ত্রী ছিল না। কোন স্ত্রীলোককে এক পুরুষ অপর পুরুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে সেটা বড় জোর জবরদস্তি বলে গণ্য হত কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্ন উঠত না। কারণ তখনও কারো উপরে কারও অধিকার সাব্যস্ত হয়নি। স্ত্রীলোক যেদিন স্ত্রী হল সেদিন থেকে তার উপরে বিশেষ পুরুষের বিশেষ অধিকার জন্মাল। আর সেই সঙ্গে সমাজে আরো দুটি নতুন জীব দেখা দিল—একটির নাম পরপুরুষ, অপরটির নাম পরস্ত্রী। এর থেকেই নানা জটিলতার সূত্রপাত। Sense of property বা possession যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে নানা ব্যাপারে একের প্রতি অন্যের ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছে। পরশ্রী-কাতরতার জন্ম যে ভাবে হয়েছে, পরস্ত্রী-

কাতরতার জন্য ঠিক সেভাবে। সমাজবদ্ধ মানুষের এ দুটি হল প্রধান রিপু। মাৎসর্যই মৎস্য নীতির জন্মদাতা। সামাজিক স্ক্যান্ডেলের মূলেও ওই দুই রিপু।

কলঙ্ক কাহিনী সমাজে নিন্দনীয় হলেও কাব্যে সাহিত্যে তার যথেষ্ট সমাদর। পরকীয় প্রেম সাহিত্যে অপূর্ব রসের সঞ্চার করেছে। কিন্তু এও এক মজার কথা—আমরা মুখে বলি সমাজ এবং সাহিত্য সমধর্মা, কিন্তু সাহিত্যে যার এত কদর সমাজে তার অনাদর কেন? কলঙ্কিনী রাই আমাদের রসসাহিত্যের সম্রাজ্ঞী। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সে কলঙ্ক-কাহিনীর নায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র তার কৃষ্ণচরিত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে গীতার শ্রীকৃষ্ণকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শুনেছি দ্বিজেন ঠাকুর মশায় দুঃখ করে বলেছিলেন, আহা, বঙ্কিমবাবু আমাদের রসরাজকে মেরে ফেললেন! ঠিক কথাই বলেছেন। বাঙালীর কাছে দ্বারকার রাজার চাইতে মথুরার রাজা ঢের বেশি প্রিয় অর্থাৎ কিনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চাইতে কেষ্ট ঠাকুর আমাদের ঢের বেশি আপনার জন। যাই বলুন, রসের দিক থেকে দেখলে স্ক্যান্ডেলকে উঁচু দরের জিনিস বলে মানতেই হবে। সত্যি বলতে কি, এর একটি স্বর্গীয় মাহাত্ম্য আছে। আমাদের পুরাণ কাহিনী পড়ে দেখুন, স্বর্গবাসী দেবদেবীদের ক্যান্ডেল-এর তুলনায় মর্ত্যবাসী আমাদের স্ক্যান্ডেল কোথায় লাগে? গ্রীস রোম-এর পুরাণ কাহিনীও অনুরূপ। গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো যে কবিদের প্রতি নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন তার অন্যতম কারণ প্রাচীন কবিরা তাঁদের গ্রন্থে দেবদেবীদের এমন সব বর্ণনা দিয়েছেন যার ফলে দেবধর্মে লোকের ভক্তি বিশ্বাস কমে যাবার আশঙ্কা। আমাদের দেশেও একটা চলতি কথা আছে—দেবতার বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন আমাদের বেলা। এর মধ্যেও দেবদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

এ কথা ঠিক যে, স্ক্যান্ডেল যদি না থাকত তো সমাজজীবন বড় নীরস হত। পরনিন্দা পরচর্চা সমাজজীবনের সব চাইতে উপভোগ্য জিনিস, অবসর বিনোদনের প্রধান উপাদান। পাড়ার ঠানদি আমাদের সমাজে একটি বিশিষ্ট চরিত্র, ওদেশে মিসেস গ্রাণ্ডি। কৌতুকের কথা এই যে, কেচ্ছা কাহিনী রটনার ব্যাপারে সব দেশে মেয়েদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, পাড়ার ঠানদি এবং মিসেস গ্রাণ্ডি—এই দুটি নামই পুরুষদের দেওয়া। ভাবটা যেন নিন্দা কুৎসা রটনায় মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবণতা—খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সময় কাটানো চাই তো—তা একটু কুৎসা ঘাঁটাঘাঁটি করুক। বলা নিষ্প্রয়োজন যে কুৎসা রটনায় পুরুষের আগ্রহ এবং উৎসাহ মেয়েদের চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়। যেখানে আড্ডা সেখানেই পরনিন্দা পরচর্চা। আমাদের চা-এর দোকানে, কফি হাউস-এ মেয়েরাও আছেন বইকি, তাহলেও প্রধান আড্ডাধারী ছেলেরাই। আমি নিজে আজীবন প্রচুর আড্ডা দিয়ে আর কিছু না হোক পরচর্চায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছি। আমার মতো যাঁরা চা-বিলাসী তাঁরা জানেন কিনা জানিনে যে, ইংরেজীতে চা-এর একটি মজাদার নাম আছে। চাকে তারা বলে scandal broth. ওদেশে চা পার্টি, "ডিনার পার্টি" সর্বত্রই পরনিন্দার প্রশস্ত অবকাশ, গল্প উপন্যাসে তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। [illegible] জিজ্ঞেস করছেন— [illegible] ner parties, [illegible] mongeries?"

[illegible] এবং নিন্দা [illegible] তবে স্বীকার [illegible] নিন্দনীয় কাজগুলিতে যতখানি [illegible] পাওয়া যায় অনিন্দনীয় কাজে ততখানি পাওয়া যায় না। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা [illegible]—নিন্দা-প্রচারে যতখানি আগ্রহ, কারো গুণকীর্তনে ততখানি নয়। অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যিক steele স্পেকটেটর-পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন— The unwillingness to receive good tidings is a quality as inseparable from a scandal-bearer as the readiness to divulge bad. কারো সম্পর্কে প্রশংসার বাক্য সহজে আমরা উচ্চারণ করি না। এর ফলে সমাজে আরেকটি বিপদ সৃষ্টি হয়েছে—নিজের ঢাক নিজে পেটানো। অপরে যদি প্রশংসা না করে তাহলে নিজের প্রশংসা নিজেকেই করতে হয়। শুনতে হয়তো ভালো শোনায় না, কিন্তু উপায় কি? আমরা যতখানি নিন্দামুখর ততখানি প্রশংসাকাতর। অপরের কাছে সুবিচার আশা করি না বলেই আত্মপ্রচারে বাধ্য হই।

স্ক্যান্ডেল জিনিসটাকে লোকে যতখানি নিন্দনীয় মনে করে বাস্তবিক পক্ষে ততখানি নিন্দনীয় নয়। লোকনিন্দার ভয় না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। নিতান্ত বেপরোয়া ব্যক্তিরাও স্ক্যান্ডেলকে ভয় না করে পারে না। স্ক্যান্ডেল এ দিক থেকে deterrent-এর কাজ করে এবং সমাজকে অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার থেকে রক্ষা করে। যে সমাজে স্ক্যান্ডেল নেই সে সমাজ মৃত, কেননা তাহলে বুঝতে হবে যথেচ্ছ ব্যবহারকেও সমাজ বিনা বাধায় মেনে নিচ্ছে। অবশ্য এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা রটনা সমাজে আগেও ছিল, এখনও আছে। স্বীকার করতেই হবে সেটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে এখন প্রতিদিনের বাস্তব জীবনে এমন সব গ্লানিকর ঘটনা ঘটছে যে অযথা মিথ্যা রটনার কোন প্রয়োজনই হয় না। সত্য ঘটনা মিথ্যা রটনাকে হার মানিয়েছে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রকম্পিত, প্রেসিডেণ্ট নিকসন-এর হৃৎকম্প দেখা দিয়েছে। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অ্যাগনুরও গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র হোয়াইট হাউস কালিমালিপ্ত, প্রেসিডেণ্ট-এর পরামর্শদাতারা একে একে প্রায় সকলেই ধরাশায়ী। একেই বলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। ইংলণ্ডের দু দুজন মন্ত্রীকে নারীঘটিত ব্যাপারে পদত্যাগ করতে হয়েছে। দুজনেই অপরাধ স্বীকার করেছেন। একজন দুঃখ করে বলেছেন, পার্লামেন্টমেম্বারদের কি প্রাইভেট লাইফ [illegible] জানেন না যে, [illegible] দিয়ে ঢিলিয়া ডুবে ডুবে জল খাওয়া।

প্রাইভেসির অবশ্যই একটা মর্যাদা আছে। স্ক্যান্ডেল সে মর্যাদা রক্ষা করে না। অথচ একথাও মানতে হবে যে স্ক্যান্ডেল-এরও একটা মর্যাদা আছে। ধর্ম নিয়ে স্ক্যান্ডেল হয়, রাজনীতি নিয়ে হয়, সবচেয়ে বেশি হয় রমণীদের নিয়ে। তিনটিই অতিশয় অভিজাত জিনিস। এ সব ব্যাপারে স্ক্যান্ডেল উদ্ঘাটন করতে পারলে স্ক্যান্ডেল-এরও মান থাকে। নিজের যদি মান না থাকে তাহলে সে অপরের মানহানি করবে কি করে? একবার ভেবে দেখুন, ভুষিমাল নিয়ে যদি স্ক্যান্ডেল ঘটে তাহলে স্ক্যান্ডেলেরই কি আর ইজ্জৎ থাকে? স্ক্যান্ডেলকে আমি কখনো হীন দৃষ্টিতে দেখি না। এক দিক থেকে ওকে বলা যায় সমাজের তত্ত্বাবধায়ক। ওকে সবাই সমীহ করে চলে, তাতে সমাজের ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ওই ভুষি স্ক্যান্ডেলে আমার মনটা বড় দমে গিয়েছে। কি ব্যাপার নিয়ে স্ক্যান্ডেল হয় তাই দিয়ে সমাজের গুণাগুণ বিচার। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি—ধর্মগুরুর অভাব কোথায়, রাজনৈতিক নেতা তো অলিতে গলিতে, রূপসী ললনা এবং রূপমুগ্ধ পুরুষের কি দেশে অভাব হল? এ সব ছেড়ে কিনা ভুষি। ভুষিমাল কথাটা আমাদের ভাষার একটা ইডিয়াম। অত্যন্ত অপকৃষ্ট জিনিসকে অবজ্ঞার ভাষায় বলে ভুষিমাল। বঙ্গদেশ কি অবশেষে ভুষিমালের দেশে পরিণত হল?

১৯৭৩ সালে অর্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ওয়াসিলি লিওনটিয়েফ

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানে উৎপাদন তত্ত্বের বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পদ্ধতি, এবং উন্নয়ন তত্ত্বের বিশ্লেষণে লিওনটিয়েফের Input-Output Analysis-এর প্রয়োগ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৭৩ সালের জন্য অধ্যাপক ওয়াসিলি লিওনটিয়েফকে (Wassily W. Leontief) অর্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া সার্থক হয়েছে। ১৯০৬ সালে রাশিয়ায় এই অর্থবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে (১৯৩১ সালে) আমেরিকার অর্থব্যবস্থার গঠন-প্রকৃতি ও তার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন উৎপাদনশীল উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেন, তা-ই পরবর্তীকালে আধুনিক input-output বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। লিওনটিয়েফের আগে প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী Leon Walras (১৮৭৭) সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব (General Equilibrium) এবং তার ভিত্তিতে দেশের অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু লিওনটিয়েফ সম্পূর্ণ নতুনভাবে উৎপাদনে নিয়োজিত উপাদানের প্রকৃত পরিমাণ (input) এবং উৎপাদনের সঙ্গে সেই উপাদানের সম্পর্ক নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা-লব্ধ এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ ও ১৯৪১ সালে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Structure of the American Economy 1919-1939" অর্থবিজ্ঞানের পরম সম্পদঃ input-output বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটা একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

অধ্যাপক লিওনটিয়েফ ১৯৪৬ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর input-output বিশ্লেষণ প্রবর্তিত হয় তারও আগে। লিওনটিয়েফের বিশ্লেষণের তিনটি বিশেষ দিক আছে। (১) ভালরাস (Walras) বর্ণিত সাধারণ ভারসাম্যের এটা-ই হল যত দূর সম্ভব সরলীকৃত বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ; এই বিশ্লেষণের ধরন এত সহজ যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অথবা পরীক্ষিত তথ্যগুলিকে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির প্রয়োগে পরিমাপ করা যায়। (২) জাতীয় আয়ের পরিমাপ বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে input-output বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়; কারণ টাকার প্রবাহ অথবা

সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করা এ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। (৩) Input-output তত্ত্বটিকে আধুনিক Linear Programming-এর একটি অংগরূপেও ব্যবহার করা হয়।

লিওনটিয়েফের input-output তত্ত্বটি হল মূলত উৎপাদনের সাধারণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রথম যুক্তি হল সম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়, এই ক্ষেত্রগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি জিনিসের সরবরাহ আসে একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে; এবং প্রত্যেকটি উৎপাদন ক্ষেত্র উপাদানের যে অংশটি উৎপাদনের কাজে লাগাবার জন্য ক্রয় করে থাকে (input) সেটা ওই উৎপাদন-ক্ষেত্রের প্রকৃত উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। ধরা যাক, কোন অর্থনীতিতে দুইটি উৎপাদন-ক্ষেত্র আছে—একটি হল কৃষি এবং অপরটি হল শিল্প-কারখানা। উভয় শিল্পেরই প্রয়োজন প্রাথমিক উপাদান হিসাবে কিছু শ্রমিক নিয়োগ করা। লিওনটিয়েফ বর্ণিত বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে দেখানো যেতে পারে। এই উদাহরণে উৎপাদন মিলিয়ন টনের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়েছে।

শিল্প	কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদান হিসাবে ব্যবহৃত উৎপাদনের অংশ	শিল্প-কারখানায় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত উৎপাদনের অংশ	চূড়ান্ত চাহিদা	মোট উৎপাদন
কৃষি	৩০	১৮০	৫০	২৬০
শিল্প-কারখানা	৫০	৩০	৬০	১৪০
শ্রমের অবদান (Labour Services)	১০	৪০	০	৫০

প্রথম সারিতে দেখানো হয়েছে মোট কৃষি উৎপাদন হল ২৬০ মিলিয়ন টন; তার মধ্যে ৫০ মিলিয়ন টন ক্রেতাদের চাহিদা মেটাবার জন্য রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট ২১০ মিলিয়ন টন সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে। তার মধ্যে ৩০ মিলিয়ন টন নিয়োগ করা হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে। কারণ, কৃষিজাত সামগ্রী কৃষি-

ক্ষেত্রেরই উৎপাদন বাড়াবার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। আরও ১৮০ মিলিয়ন টন নিয়োগ করা হয়েছে শিল্প-কারখানার উৎপাদন বাড়াবার জন্য। কৃষিজাত সামগ্রী শিল্প-কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার শিল্প-কারখানায় যে ১৪০ মিলিয়ন টন উৎপাদন হয়েছে তার মধ্যে ৫০ মিলিয়ন টন নিয়োগ করা হয়েছে কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে; ৩০ মিলিয়ন টন নিয়োগ করা হয়েছে শিল্প-কারখানায় উৎপাদনের কাজে এবং অবশিষ্ট ৬০ মিলিয়ন টন রাখা হয়েছে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাবার জন্য। এ ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রের মোট উৎপাদন নির্ভর করছে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত কৃষিজাত সামগ্রীর অংশ, কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শিল্প-কারখানার উৎপাদিত সামগ্রীর অংশ, এবং শ্রমের উপাদানের উপর। অনুরূপভাবে শিল্প-কারখানার উৎপাদন নির্ভর করছে এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিত সামগ্রীর অংশ, শিল্প-কারখানার উৎপাদিত সামগ্রীর নিয়োজিত অংশ, এবং শ্রমের উপাদানের উপর। ঠিক এভাবে একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখানো যেতে পারে।

উপযুক্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উপাদান ও উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই লিওনটিয়েফ প্রদত্ত Input-Output Analysis-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সূত্র খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির জনক হলেন অধ্যাপক ওয়াসিলি লিওনটিয়েফ। এই তত্ত্বের কয়েকটি অনুশাসন আছে, যেমন বিভিন্ন উৎপাদনের সহগ (Co-effecient) স্থির আছে বলে ধরে নিতে হবে। আবার, কোন শিল্পের মোট উৎপাদন যা হবে তা যেন উৎপাদিত সামগ্রীর যে অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে তার মোট পরিমাণ ও ক্রেতাদের মোট চাহিদার পরিমাণের সমষ্টির চেয়ে বেশী না হয়। লিওনটিয়েফর input-output বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা প্রচুর সম্প্রসারিত হয়েছে; বহু দেশে তার ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। আমাদের দেশেও চতুর্থ পাঁচসালা যোজনা তৈরি করার সময় থেকে যোজনা কমিশন দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিওনটিয়েফর input-output বিশ্লেষণ অবশ্যপাঠ্য; অর্থবিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ নতুন পথের দিশারী। যে-কোন অর্থব্যবস্থায় যতগুলি সম্ভব উৎপাদন-ক্ষেত্র ধরে নিয়ে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়েও অধ্যাপক লিওনটিয়েফ তাঁর নিজস্ব তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। লিওনটিয়েফের বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যা মোট রপ্তানি হয়েছিল তাতে মূলধনের উপাদান কম ছিল এবং শ্রমের উপাদান বেশী ছিল; অথচ আমদানির ক্ষেত্রে মূলধনের উপাদান আনুপাতিকভাবে বেশী ছিল এবং শ্রমের উপাদান আনুপাতিকভাবে কম ছিল। আমদানির ক্ষেত্রে শ্রম-বছর পিছু মূলধন (Capital per man-year) এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে শ্রম-বছর পিছু মূলধনের অনুপাত ছিল ১·৩০; অথচ এটা ১-এর কম হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাই মূলধনের প্রাচুর্য ও সেই অনুপাতে শ্রমের আপেক্ষিক স্বল্পতা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্বে এটা 'Leontief Paradox' নামে খ্যাত। লিওনটিয়েফের এই বিশ্লেষণ বহু সমালোচক গ্রহণ করেননি। তা ছাড়া ১৯৪৭ সালের আমদানি-রপ্তানিকেই এই বিশ্লেষণের ভিত্তি করা উচিত নয় বলে অনেকে মনে করেছেন। ১৯৫৬ সালে লিওনটিয়েফ এ ধরনের আরও ১২টি তুলনামূলক সুবিধার হিসাব (comparative advantage calculations) গ্রহণ করেন। তাঁর এ ধরনের বিশ্লেষণ অর্থশাস্ত্রের নতুন ধরনের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অর্থবিজ্ঞানী লিওনটিয়েফ-এর এটা একটি মৌলিক অবদান।

বহু মৌলিক প্রবন্ধ লিওনটিয়েফ লিখেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ নতুন চিন্তাধারা ও নতুন গবেষণার খোরাক জুগিয়েছে। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত প্রবন্ধ "Essays in Input-Output Analysis" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে "The Structure of the American Economy, 1919-1939", তাঁর সহযোগে লিখিত "Studies in the Structure of the American Economy" খুবই প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে "Domestic Production and Foreign Trade; The American Capital Re-examined" (Proceedings of the American Philosophical Society, September; 1953) এবং "Factor Proportions and the Structure of American Trade: Further Theoretical and Empirical Analysis" (Review of Economics and Statistics, November, 1956). অর্থবিজ্ঞানে গবেষণাকারীদের কাছে অমূল্য সম্পদ।

সুব্রত গুপ্ত

॥ এক ॥
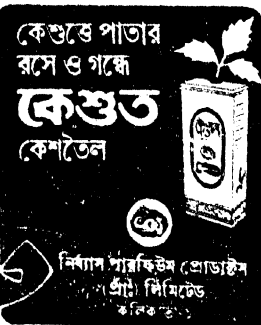
পুরানো পোড়োবাড়ির খপ্পর থেকে কলকাতার ফুটপাথে গিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে উঠলাম এসে মুক্তরামের মেসে—মালদহের তথাকথিত এক রাজপ্রাসাদ থেকে চোরবাগানের এই বামালদহে।

সে কথা ভাবতে গেলে আজ একটু অবাক লাগে বইকি!

মনে হয়, কবি অমিয় চক্রোত্তি নেহাত মিছে কন নি।

মেলাবেন তিনি মেলাবেন—পোড়োবাড়ির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াকে যিনি মেলান, মিলিয়ে থাকেন, তিনি মেলাবেনই—কখনো কাউকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে এনে চোরবাগানের অংশাবশেষের সঙ্গে তাঁর অপরূপ কৌশলে মেশাবেনই। দেখাবেনই তাঁর কারিকুরি। অমিয়বাবুর কাব্যকথায় কীর্তিত তাঁর কীর্তিকলাপের তুলনা হয় না।

এদিকে আমি সেই বাসায় জমিয়ে না বসতেই একটা মেসও বেশ জমে উঠল।

তারকনাথ চন্দ নামে এক একদা-বিপ্লবী মালিক আনন্দমোহন সাহার কাছ থেকে লীজ নিয়ে বাসা বাঁধলেন সেখানে। আনন্দবাবুর শর্ত ছিল আমাকে কক্ষচ্যুত না করার। তাঁর দৌলতে আমিও সেই মেসের একজনা হয়ে গেলাম।

তারকদার আকর্ষণে একাধিক দিকপাল সাংবাদিক, খাইয়ে ফুটবলার, অধ্যাপক এসে জুটেছিল এ বাসায়, তাঁদের কথাও, সুযোগক্রমে বলব এক সময়। এখানে নামমাত্র উল্লেখ করা যাক: ফুটবলার সূর্য চক্রবর্তী, ধ্রুপদী ভূতনাথ বাঁড়ুজ্জো, অধ্যাপক (তখন বিদ্যাসাগরের ছাত্র) উপেন ভট্টাচার্য—এঁরা ছিলেন আমার পাশাপাশি ঘরে। আর আমার ঘরে থাকতেন তারানাথ রায়, এক কালের বিপ্লবী, পরে নামজাদা সাংবাদিক—সাপ্তাহিক নবশক্তি ও দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক।

সেই পুরনো বাসাড়েদের কেউই আর নেই আজ। বোধহয় এক সুর্যবাবু ছাড়া প্রায় সবাই অস্তমিত—তবে অনেক দিন আগেই তাঁরা এ বাসা থেকে নড়েছিলেন, সেই প্রথম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কালেই। তার পরেও আরো দুবার সাজানো বাগান শুকিয়েছে, উপচে-ওঠা মেস উপে গেছে—পরের দু দশকের দুদুবারের দাঙ্গায়।

আমাদের বাসার ঠিকানাটা মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের হলেও, জায়গাটা চোরবাগান আর কলাবাগানের সঙ্গমস্থলে। এই সীমান্ত কিনারের এপারে-ওপারে গেলে হিন্দু মুসলমানের আর রক্ষা ছিল না, এই নো ম্যানস ল্যান্ডের ইয়েস ম্যানস ছিলাম একমাত্র আমি।

বাসা ভেঙে দুদুবারই পালিয়ে গেছে বাসাড়ুরা, আমি নড়িনি। নির্ভীক বলে নয়, নড়তে পারিনি বলেই। নড়ব কোথায়? কলকাতার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। যেতে হলে যেখান থেকে উঠে এসেছি সেইখানেই গিয়ে জুটতে হয় আবার। আমার সাবেক ঠিকানা সাকিম—কেয়ার অফ সেই ফুটপাথে।

বয়সের সঙ্গে আয়েস বেড়েছিল, রাস্তার গড়াগড়ির ধকল পোষায় না আর। একে একে ঝড় ঝাপটা সব কাটিয়ে মুক্তারামের সেই বাসাতেই এতদিন ধরে মুক্ত আরামে তক্তারাম হয়ে নট নড়ন চড়ন অটল রয়ে গেছি সেই থেকে।

আনন্দ সাহা মশাই অবশ্যি গোড়াতেই পরিষ্কার সচেতন করে দিয়েছিলেন আমায়। মানা করে দিয়েছিলেন পাড়ার কারো সঙ্গে কখনো কিছুতেই না মেলামেশা না করতে—

পাড়ার দক্ষিণ দিকটায় ছিল কলাবাগানের গুণ্ডা এলাকা, আর উত্তরে ছিল বেশির ভাগ খাপরার বস্তি—হিন্দুদের যদিও। এখন সে সব ভেঙে গিয়ে যত্রতত্র ধনী মাড়োয়ারির মহল উঠেছে। প্রাসাদোপম পাকা বাড়ি সব, তখন কিন্তু এমনটা ছিল না।

আনন্দবাবু বলেছিলেন, খুব সাবধান। এ-ধারের আধেক লোক হচ্ছে গাঁটগাটা আর আধেক ’

বলতে গিয়ে তিনি অর্ধপথেই থামলেন।

‘আর আধেক?’

আধেক পকেটমার আর আধেকের কাজ কোকেন পাচার।’

‘কোকেন কী বস্তু?’

কোকেনের নাম শুনিনি আমি আগে কখনো।

‘খাবার জিনিসই। তবে খাওয়াটা ঠিক নয়।

‘খাবার জিনিস যখন তবে ঠিক নয় কেন? খেতে তেতো নাকি? জিনিসটা খেতে কেমন আমি জানতে চাই।

‘কে জানে। আমি কখনো খেয়ে দেখিনি। কেন, তোমার খাওয়ার শখ হচ্ছে নাকি?

‘একবার চোখে দেখতে দোষ কী? খাওয়া ঠিক কিনা খেয়ে খতিয়েই তো তার মালুম হবে? বেচে কোথায়?

‘পুরিয়া বেঁধে বিক্রি করে, দ্যাখোনি এদিকটায়?’

‘চোখের ওপর দেখিনি ঠিক, তবে দেখেছি।’

‘কী দেখেছ?’

‘একজন কেউ এসে এক সময় সামনের বাড়িটার কোনো খাঁজে কোথাও দু একটা মোড়ক বাঁধা কী যেন রেখে যায়, তার খানিক বাদে আবার কেউ এসে সেটা তুলে

-দের, সেই জায়গায় কিছু পয়সা রেখে যেতে আমি দেখেছি...'

'তুমি দেখছ?'

'হ্যাঁ। তবে সে আমায় কী রাখে ধরতে পারিনি। মোড়ক বাঁধা ছিল না তো। কৌতূহল হতে একবার গিয়ে দেখলাম, সিকি কী আধুলি কিম্বা কিছু পয়সা রেখে গেছে সেখানে। একটু বাদে সেই আগের লোকটি ফের এসে তার রাখা পয়সাটি তুলে নিয়ে যায় তারপর।'

'দেখে তোমার আশ্চর্য মনে হয়নি।'

'চোরে কামারে দেখা নেই-এর মতন মনে হয়েছে বটে। চোরা কারবার নাকি কোনো?' আমি শুধাই— 'জিনিসটা হাতো-হাতি হতে দেখেছি. হাতে নাতে বেচা কেনা হতে দেখিনি কখনো। কী জিনিসটা? খাবার জিনিস বলছেন...হজমি জারকট্যারক নাকি?'

'হজমি জারক? হজমি জারক বলে মনে হলো তোমার?'

সেই রকমই পুরিয়া বাঁধা দেখলাম কিনা, চুরণওয়ালির ঠুন ঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে বেচে যায় না পাড়ায় একেক সময়? তা কিন্তু খেতে বেশ...সেই হজমি জারক।'

বলতে গিয়ে বলতে কি, নিজেকে সামলাতে পারলাম না। লালায়িত রসনার কয়েক ফোঁটা টপ টপ করে ঝরে পড়ল।

'হজমি জারকই বটে।' আনন্দবাবু জানান— ওই খেয়ে বাড়ি ঘর সব হজম করে ফ্যালে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হজম হয়ে যায় ও খেলে।'

'ওদের গুপ্তস্থান থেকে সরিয়ে খেয়ে দেখব একদিন তাহলে। আমার তো বাড়ি-ঘর হজম হবার ভয় নেই, ঘরবাড়িই নেই আমার।'

বাড়ি নেই তো কোথায় আছ যে ঘরে তুমি থাকো গো?' তিনি কন: 'আমার দেয়ালগুলোই হজম করবে দেখছি!'

'কি করে?'

'কোকেন খেলে চুন খাবার খিদে হয় বেজায়। খালি চুন খাবার ইচ্ছে করে কিনা।'

'তা, চুনের সঙ্গে দেয়ালের কী সম্পর্ক? চুনের তেষ্টা মেটাতে গিয়ে চুন ভ্রমে আমি আস্ত দেয়াল গিলে বসব? অমন লম্বা চৌড়া দেয়াল কেউ কখনো গিলতে পারে নাকি?' তাঁর দেয়ালায় আমি বিস্ময় মানি।

'কোকেন যে খায় না', তিনি কন: 'তার খালি চুনের খিদে পায়। চুনের জন্যে হন্যে হয়ে বাড়ির দেয়াল চাটতে শুরু করে। তিনি সবিশদে আসেন—নয় বাড়ির সব চুন-কাম করে দেয়ালগুলো। কদিন না যেতেই ফের আমায় নতুন করে কলি ফেরাতে হবে।'

'আবার চুনকাম করাবেন?'

'করব না? দুদিনেই তো তুমি দেয়াল-গুলো চেটে সাফ করে দেবে। —নিজের ঘরের দেয়ালগুলো অন্তত।'

'কি সর্বনাশ।' শুনেই আঁতকে উঠি।

—একটা তাহলে একটা মেলা বসবে। কোনো খবর টাবার নয়।...না, মেলা টেলার মধ্যে আমি নেই মশাই! ওসব আমার ধাতে পোষায় না।'

আনন্দবাবুর সৌজন্যে পরিবেশটা মোটা-মুটি জানলেও তখন অবধি কোনো বেশ পরির পরিচয় পাইনি আমি তা বটে। ঠন-ঠনের পরিধির-যতদূর আমার দৌড় পরি-ক্রমায় বেরিয়েছি, কিন্তু পাঁচপেঁচ চক্কর মেরেও কোন চক্রান্তেই একজন পরিরও দর্শন মেলেনি আদপে। কোনো অলিতে গলিতে নয়, আনাচে কানাচে না বাতায়ন অলিন্দের কোণেও নয়কো—এমনকি একটা চাঁদমুখের আধখানাও এই পোড়া চোখে পড়ল না!

তখন ভাবলাম পরিদর্শনে বেরুলেই হয় না, পরির অত সহজে দর্শন দেবার পাত্র নন। যখন দেবার, সময় হবে যখন, নিজ-গুণেই দেখা দেবেন।

দিলেনও তাই।

আমাদের বাসাটার সামনে বিরাট সবুজ—মার্কাস স্কোয়ার গ্রাউণ্ড। সেখানে এক বিকেলে বেড়াতে গিয়ে দেখি মোহনবাগানের মত জার্সিপরা একদল ছেলে খেলতে নেমেছে।

মাঠের চারধারে ঘিরে কিশোর বালক উৎসাহীরা খেলা দেখছে বসেছিল বসে, তারই এক ফাঁকে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়ালাম।

মোহনবাগানের এখানেও খেলে নাকি! বিস্ময়ভরে একটুখানি স্বগতোক্তি করে-ছিলাম হয়ত, আমার সামনের দর্শকদের কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল...

চেয়ে দেখলাম একটি মেয়ে।

'হাসলে যে! কী হয়েছে হাসবার?' আমি শুধাই।

'মোহনবাগান নয় মশাই! ইস্পোর্টিং ইউনিয়ন। দুদলের প্রায় এক রকমই জার্সি কিনা।'

'তাই নাকি? সেইজন্যেই আমার ভুলটা হয়েছে, বুঝলে। যাক্ গে'—কথাটাকে আমি

'তোমার চুল সামলাও। সুড়সুড়ি লাগছে আমার নাকে।'

স্থানভ্রষ্ট তার চুলগুলোকে আমার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল—'যা হাওয়া দিয়েছে না? কী করা যায়।'

'তা বটে! একটা তো চুল না, একটু তো চুল নয়। একমাথা, এমন চুল আমি দেখিনি কোনো 'ময়ের...' আমি কষ্ট: 'থাকগে, থাকতে দাও। লাগুক চোখে মুখে। এক চুলের এদিক ওদিকে কী হবে আর!'

'তোমার কাছে টাকা আছে একটা? কাছ ঘেঁষে কানের ওপর সে ফিস ফিস করল।—'দিতে পারো আমাকে এখন?'

'কাছে নেই, বাসায় আছে। কী করবে টাকা?'

'দরকার ছিল আমার, এনে দাও না। কদ্দূর বাড়িটা?'

'কাছেই বাসা আমার।' তার চোখের ওপর তাকালাম—'দাঁড়াও খানিক, এনে দিচ্ছি এক্ষুনি।'

'আমি যাবো তোমার সঙ্গে?'

'তুমি কোথায় যাবে! তুমি এখানে থাকো। আমি যাবো আর আসবো।'

কথা রেখেছিল, আমি ফিরতেই দঙ্গলের থেকে বেরিয়ে আগ বাড়িয়ে এসে টাকাটা নিল সে।

নিয়েই চক্ষের পলকে টপ করে নিজের ব্লাউজের ফাঁকে গলিয়ে দিয়েছে।

'কী কিনবে টাকাটায়? খাবে নাকি কিছু? আলুকাবলি, ছোলাবাদাম, নাকি অন্য কোনো?' আমি শুধালাম।

'খাব। তবে এখন নয়, এখানে নয়। কাজকে টিফিনের সময় ইস্কুলে—'

'ও টাকাটায় কিনে খেতে হবে না তোমায়। আমিই কিছু খাওয়াচ্ছি তোমায় এখন—কী খাবে বলো?'

'এখানে নয়। কাছেই তোমার বাড়ি বললে না, চলো তোমার বাড়ি যাই, দেখে আসি গে।'

'আমার বাড়ি নয়, মেস বাড়ি। একটা ঘর খালি আমার। তাও আমার ঘরটা খালি নয়। আরো দুজন মেম্বার থাকে সে ঘরে। সেখানে তুমি কী যাবে!'

'কেন, গেলে কী হয়? যাই না?'

'মেসবাড়িতে কি যেতে আছে মেয়েদের? আমি ঠিক জানিনে, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো, তিনি যদি বলেন তো আসবে না হয় একদিন। তিনি বললে পর।'

'মাকে বলতে যাব কেন? আমার যেখানে খুশি যাই তো।'

'আমি ঠিক জানিনে, তবে মনে হয়, ভদ্রমেয়েদের মেস বাড়িতে যেতে আসতে নেই। এ পর্যন্ত আমাদের মেসের কারো কাছে আসতে দেখিনি কাউকে। ওকথা থাক, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি শুনি?'

'ক্লাস নাইন!'

'ফাইন! আর বছর দুই গেলেই তো কলেজে পড়বে তখন। কী মজা! পাশ করে কী নিয়ে পড়বে কলেজে?'

'আমার তো ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার... কিন্তু মার ইচ্ছে আমি নার্স হই। মা আমার নার্স কিনা।'

'তাই নাকি?'

'ঠিক নার্স নয়। নার্সের নীচে, ধাই বলে না যাদের? হাসপাতালে বেড প্যান টান ধরে? তাই।'

'তাই মা তোমায় নার্স বানাতে চান বোধ হয়?'

'না। অল্পদিনের কোর্স তো, পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কাজ পাব। টাকা আনতে পারব বাড়িতে...'

'তোমাদের বাড়িটা কোথায়? কাছাকাছি কোথাও?'

'আমাদের বাড়ি কোথায়! আমাদেরও বাড়ি না, বাসাও নয়, এক উঠোন ঘিরে চালাখানা ঘর। আমরা বস্তিতে থাকি, বললাম না।'

'হ্যাঁ, বলেছ বটে। চলো, দেখে আসি।'

'না, এখন নয়। সে মা যখন ডিউটিতে থাকবে, নিয়ে যাব তোমায়? এখন দূর থেকে দেখিয়ে দেব কেমন?'

'তাহলে কারো বাড়ি গিয়ে কাজ নেই।' আমি বললাম, 'তোমার কি আমার কারো বাড়িই যাব না আজ। সে আরেকদিন। আজ বরং অন্য কোথাও যাই, কী বলো?'

'কোথায়?'

'মাঠ থেকে বেরিয়ে কোনো খাবার জায়গায় যাই। কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া যাক না হয়। তোমার খিদে পায়নি?'

'পেয়েছে তো। চলো তবে। বসন্তে কি দেলখোস কেবিনে। মোগলাই পরোটা আর মাটনচপ? খুব খাসা হবে।'

'তাতো হবে। কিন্তু—।' বলে আমি ওর অলক্ষ্যে নিজের পকেট হাতড়াই। সম্বল ছিল না তেমন, কম্বলের তলা হাতড়ে যা এনেছিলাম তাতে ওর টাকাটা দিয়ে আর এক আধ টাকাই ছিল কেবল, তাই নিয়ে কোনো কেবিনের বসন্তে কোথাও গিয়ে দিলখোস হওয়া যায় না। একটু-খানি কিন্তু হয়ে কই—না থাক আজ? আরেক-দিন হবে। পকেট একটু ভারী করে তবেই কোনো বড় রেস্তোরাঁয় যেতে হয়, বুঝলে?

'তাহলে চলো সেই গড়ের মাঠেই যাই না? সেখানে গিয়ে আলুকাবলি আর ফুচকা খাইগে। ভিকটোরিয়া মেমো-রিয়ালে তো ছেলেদের নিয়ে মেয়েরা যায় বলে শুনেছি।'

'শুনেছ? যাওনি কখনো?' তির্যক নেত্রে তাকাই।

'কবে আর গেলাম? কে নিয়ে যাচ্ছে?' ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলে সে বলে।

'তাই বা কী করে যাই?' আমি বলি: 'পকেটে গড়ের মাঠ থাকলে আর গড়ের

নতুন—ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করার প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়: ২০০ মি. লি. ও ৪০০ মি. লি.।

নতুন! ফসফোমিন আয়রন—মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন করমটাম প্রেমটাম প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
ক ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

মাঠে যাওয়া যায় না ভাই। ওখানে যাওয়া আসায় ট্যাক্সি ভাড়াই পড়ে যাবে পাঁচ টাকা।'

'তবে থাক। এই মাঠই ভালো। আমাদের এই মার্কাস স্কোয়ার খারাপ কী? সঙ্গে কেউ থাকলে, মনের মতন সঙ্গী কেউ থাকে যদি সব মাঠই গড়ের মাঠ।'

কথাটায় আমার কেমন ভাবোদ্রেক হয়—প্রহ্লাদের সেই ক-উচ্চারণে আ-কৃষ্ট হবার মতই যেন।

'যা বলেছ। সঙ্গে পরির মত কেউ থাকলে সব পথই পরিক্রমার। সব গতিই তীর্থের। সব মাঠই গড়ের মাঠ।'

বলতে বলতে আমার অন্তর থেকে ঢেকুরের মতই কী যেন একটা উদ্গারিত হল।

'ও আবার কী? কী হোলো তোমার?' সে চমকে ওঠে।

'ও কিছু না, একটা অব্যয় শব্দ। হাই তোলার মত উঠে যায় মাঝে মাঝে। আটকানো যায় না। হাই ক্লাস কিছু।'

'না না। তুমি কী আওড়ালে যেন মনে হোলো। মা মা করে কাতরে উঠলে কেমন। হোলো কি হঠাৎ?'

'ও কিছু না। গড়ের মাঠের কথা তুললে না তুমি? তাই হঠাৎ ঐ শব্দটা গড় গড় করে উঠল আমার।'

'অব্যয় শব্দ? ব্যাকরণের অব্যয়?'

'অব্যয় অনন্ত অক্ষয় যা খুশি বলো না। এক কথাই।'

'না না। তুমি ও মা মা গো বলে ডুকরে উঠলে না? অস্ফুটে স্বরে হলেও আমি স্পষ্ট শুনেছি যে।'

'আমার মা দুর্গাকে ডাকলাম একবার। এই আর কি।'

'মা দুর্গাকে?'

আমি বললাম।—'তুমি ঐ কী বললে যে? বললে না যে সব মাঠই গড়ের মাঠ? তাতেই আমার মনে পড়ে গেল, মনে মনে গড় করলাম।'

'কাকে গড় করলে?'

'কাকে আবার? আমার মাকে, তোমার মাকে, সবার মাকে, মা দুর্গাকে। আবার কাকে? গড় করবার কে আছে আবার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থেকে সব দেবতাই যাঁকে গড় করছে, সর্বদা যাঁর শরণাগত সেই দুর্গাকেই তো।'

'মহাদেব তাঁর বরও তোমার গড় করছেন নাকি?'

'করছেন না? তিনি তো মার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছেন গো! কেন, মার কালীমূর্তি দ্যাখোনি নাকি কখনো?'

'তা হবে, আমি অতো সব জানি না। তবে তুমি তো দেখছি বেশ সড়গড় এ বিষয়ে।'

তখন আমি কথাটা ঘোরাতে ওকে নিয়ে ময়দানে শুরু করেছি মাঠে। ফুটবলের হই-হল্লা মরশুমে রেখে চক্র পথের দর্শকদের প্রাচীরের ধার ঘেঁষে চক্কর দিতে লেগেছি বেশ করে বেশ করে—রেস্তরাঁয় নিয়ে ওকে খাওয়াবার কথাটা ভোলাবার তরেই।

'তা তো বুঝলাম।' চক্কর দিতে দিতেই কয় সে: 'তা যেন হোলো। কিন্তু আমার সঙ্গে মিশে এমন কী বিপদে পড়লে তুমি...মানে, বিপদে পড়লেই তো লোকে মা দুর্গাকে ডাকে—তাই না?'

'আর বিপদে না পড়লে ডাকতে নেই? বিপদে পড়ে ডাকলে বিপদটা কাটে আর বিপদের আগে, পড়ার আগে ডাক দিলে বিপদ আসতেই পায় না আর। মা তো সব সময় ডাকবার।'

'তা বটে।' বলতে গিয়ে সে কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

'শুধু বিপদে কেন, মা তো পদে পদে ডাকবার।' আমি বলি—'প্রতি পদেই তাঁকে ডাকবো তো। এখন আমি তোমার সঙ্গে প্রতি পদেই রয়েছি না?...' বলতে গিয়ে আমি থমকে যাই।

মা আমায় যেমন করে ব্যাকরণের সাহায্যে কত সহজ অত বড়ো তত্ত্ব জলের মতন বুঝিয়েছিলেন আমি তা পারব কি? তাঁর সেই অননুকরণীয় বাগ্‌বিভূতি আমি পাবো কোথায়?

মা বলতেন, প্রতি পদেই মাকে ডাকবি রে। যে কোনো পদক্ষেপের গোড়াতেই, বুঝেছিস? মাকে ডাকাই—তাঁকে ডাকাটাই তো পদক্ষেপ। মাকেই ডাকবি। মা-ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বপ্রথম। আদ্যাশক্তি। তাঁর শক্তিতেই সবার শক্তি, সব শক্তি। মাকে সম্বোধন করেই সব কিছুর শুরু। আর সেই জন্যেই সম্বোধনে প্রথমা। তিনিই প্রথমা। তিনিই কর্ত্রী। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। তার পরেই না কর্মের সূত্রপাত কর্মনি দ্বিতীয়া। করণে তৃতীয়া—প্রকরণে তৃতীয়া। করবার হেতুই যত করণ কারণ। আর, কী জন্যে এত সব করা? কার জন্যে করা? সেটা তাঁর জন্যেই—আর পরের জন্যেই। পর পর কিনা তাঁরই প্রতিমা। আর তাই হচ্ছে আমাদের প্রতিমা পূজো। সেই তাঁর কাছেই নিজেকে উজাড় করে দেবার জন্যেই—সম্প্রদানে চতুর্থী। তাকে আত্ম-সম্প্রদান, আত্মবলি—যাই কেন বল না। তার ফল? শ্রী-সমৃদ্ধি-সৌভাগ্য—সব কিছু। পঞ্চমীতেই শ্রীলাভ, শ্রীপ্রকাশ—শ্রীপঞ্চমী। আমাদের বাক্ বা ঐশ্বর্য, সঙ্গীত-কলা যত কিছু—লক্ষ্মীশ্রী আর বাগেশ্রী—ঐ পঞ্চমেই।

তারপর?

তারপর সম্বোধনে যিনি প্রথমা, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রেই ষষ্ঠী। সম্বন্ধে ষষ্ঠী—বোধন না উপকরণ নাকি?

সম্বোধনেই বোধন। সঙ্গে সঙ্গে বোধোদয়। বোধিলাভ—যা বলিস। মা বলতেন। সম্বন্ধে ষষ্ঠী—আমার ষষ্ঠীতেই মার বোধন বুঝেছিস?

এবং তার পরের ক্রমণিকায় সপ্তমীতে অধিকরণ, তাঁর কর্তৃক অধিকৃত হওয়া—আসলে, তাঁর পদ অধিকার করা। সেই পদাধিকার বলে বলী হওয়া। তার পরের কাণ্ডে...পরকাষ্ঠাই পরাকাষ্ঠা।

অষ্টমীতেই সেই সন্ধিক্ষণ।

আর সেই সন্ধিসূত্র ধরেই না নবজাগরণ, তাঁর সঙ্গে নিরাঞ্জিত হয়ে নিজের নবীকরণ। পুনর্নবার দোলাতে পুনরায় নবার।

কিন্তু ওকে আমি এই কথাটা অত সহজে বোঝাই কি করে? কি করে কই, প্রতিক্ষণেই আমরা নতুন হই, নতুন করে পাই, নুতুন হয়ে যাই? পুনঃপুনরায়।

এই যেমন তোমাকে এখন পেলুম না? আকাশের ছাপপর ফুঁড়ে পড়ার মতই হঠাৎ। পড়ে পাওয়ার এই চৌদ্দ আনা? কেমন করে পেলাম এমন হঠাৎ? কিছু না ভেবেই, না চেয়েই, অভাবিত এই প্রাপ্তিযোগ?

এই ক্ষণটির জনাই প্রতি ক্ষণই তো আমাদের প্রতীক্ষণ। তোমার মধ্যে—আমার সবার মধ্যে মাকে পাবার জনাই এই প্রতীক্ষা। মাকে—মার প্রতিমাকে—মার প্রতিমা কারো মধ্যে সেই পরমাকে পাবার পরমপ্রাপ্তি এই ত!

প্রতি মুহূর্তেই আমাদের নবজীবন সঞ্জীবন? মুহুর্মুহু তাঁর সঙ্গে সন্ধি আমাদের। পুরোপুরি পাওয়া—পুরোপুরি—অহরহ এই মহৎ প্রাপ্তি।

ক্রমশ

আলোকিত শতাব্দী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

—তুমি কে! মহিমবাবু চমকে উঠলেন। ভয় পাওয়ার মতন তাঁর গলার স্বর।

—কথা বলছ না কেন? বাইফোকাল লেন্স-এর ভিতর মহিমবাবুর তামাটে রঙের চোখের মণি ঈষৎ ফ্যাকাশে দেখাতে লাগল।

—আমি কে, আমি কী! বলতে গিয়ে যুবক ঠোঁটের কোণায় এমন করে হাসল, যেন মহিমবাবু, ইঞ্জিনীয়ার মহিম সেন, যিনি এতকাল সাদার্ন অ্যাভিনুতে ছিলেন, সম্প্রতি ভি আই পি রোডে নতুন বাড়ি করে চলে এসেছেন, যুবককে কত চেনেন অথচ হঠাৎ তিনি তাকে চিনতে পারছেন না বলে যুবক অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে দেখছে।

মস্তবড় একটা ঢোক গিললেন মহিমবাবু। সবে সকাল হয়েছে। ভিতর থেকে এইমাত্র চা খেয়ে এসে বসবার ঘরে কাজের টেবিলে বসে দরকারী কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন।

—বলো, কথা বলো। আমি একটু ব্যস্ত আছি দেখতে পাচ্ছ। এবার মহিমবাবুর

গলার স্বরে কিঞ্চিৎ স্নেহের ভাব ফুটে উঠল। কেননা সবে গোঁফ উঠেছে। উজ্জ্বল ঝকঝকে চেহারার তরুণ, খুবই অল্প বয়স, যেখানে মহিমবাবু পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছেন।—বলে ফেল, কেন এসেছ। হাতের পেন্সিলটা মহিমবাবু টেবিলে নামিয়ে রাখেন।

—আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না? দু হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি করে বিছিয়ে রেখে যুবক হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তার চোয়াল দুটো দেখে মহিমবাবু বুঝলেন বাইরেটা যত কচি নরম দেখাচ্ছে, মনের দিক থেকে ছেলেটি মোটেই তত শান্ত বা নরম নয়। বলতে কি, এক মিনিটের মধ্যেই তিনি ছেলেটির চোখের মধ্যে খানিকটা ঔদ্ধত্য দেখতে পেলেন। অস্বাভাবিক কিছু না, ভাবলেন তিনি, যা দিন কাল! কাজেই আবার একটু বিমর্ষ হলেন তিনি, ভয় পাবার মতন অবস্থা দাঁড়াল।

—এই, এদিকে কে আছিস! যেন চাকর দারোয়ানকে খুঁজলেন তিনি। তুমি বোসো, যুবকের চোখের দিকে তাকালেন তিনি। দাঁড়িয়ে কেন। আঙুল দিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখালেন। যুবক বসল না।

চাকর দরজায় উঁকি দিল।

—আমার চিঠিপত্র আছে? ডাক এসেছে? লেটার বক্স খুলে দেখেছিলি?

—এখনো ডাক আসেনি। চাকর বলল।

—যা কাজে যা। চাকর চলে গেল। মহিমবাবু আবার যুবকের মুখের দিকে তাকান।

—তারপর? কি ভেবে একটু হাসতে চেষ্টা করেন তিনি। তুমি কি চাকরিবাকরির চেষ্টা করছ?

—আমার চাকরি করার দরকার নেই।

—অ! মহিমবাবুর মুখের ছিদ্রটা একটু গোল হয়ে উঠল। কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন।

—তুমি কোথায় থাক? ফের প্রশ্ন করলেন তিনি।

—শ্যামবাজার। মোহনলাল স্ট্রীট।

—অ বেশ! মুখে বললেন 'বেশ', কিন্তু একটা অস্বস্তি নিয়ে মহিমবাবু বাঁ দিকের জানালাটা দেখেন। খুব শিউলি ফুটেছে। আশ্বিন মাস। বাতাসে শিউলির গন্ধ ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে।

—শুনুন! বুক থেকে যুবক হাত নামায়।

—বলো। মহিমবাবু চোখ ফেরান।

—আমি আপনার কাছে চাকরির জন্য আসিনি। আপনাদের ঐ বাজে ফার্মে কোনো দিন চাকরি করব তেমন অবস্থা যেন আমার না আসে ঈশ্বরকে বলুন।

মুখটা শুকনো করে মহিমবাবু চুপ করে রইলেন। এক সেকেন্ড। তারপর মৃদু হাসলেন। খানিকটা জোর করে যদিও। হেসে মাথা ঝাঁকালেন।

—খুব ভাল কথা। তুমি আরো বড় চাকরি করবে, ভাল চাকরি করবে, তা ছাড়া আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মটা ছোট—নতুন স্টার্ট দেওয়া হয়েছে, ভ্যাকেন্সিও এখন নেই।

যুবক হঠাৎ কথা বলল না।

—তুমি কি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছ, নাকি এখনো স্টুডেন্ট?

—আমি এম এ পড়ছি।

—বাঃ! সাবজেক্ট?

—পলিটিক্যাল সায়েন্স।

—আমার মেয়েরও তাই।

—আমি জানি। যুবকের চোয়াল দুটো আবার শক্ত হয়ে উঠল।

মহিমবাবু ঢোক গিললেন। ইতস্তত করলেন। —তুমি কি আমার মেয়েকে চেন?

—চিনি। হিমানী।

আবার মহিমবাবুর মুখে অস্বস্তি, কপালে কটা রেখা।

—আচ্ছা, তুমি কি জন্যে এসেছ বলো তো? বলতে গিয়ে হঠাৎ তিনি চোখ বড় করলেন। যেন তৎক্ষণাৎ একটা ভাবনার দ্যুতি মাথায় খেলা করে উঠল—অ, তাই বলো, তা হলে তুমি হিমানীকে চাইছ! আমার মেয়ের কাছে এসেছ?

যুবক মাথা নাড়ল।

—আমি আপনার কাছে এসেছি, হিমানীকে দিয়ে আমার এখন, এই মুহূর্তে দরকার নেই।

মহিমবাবুর মুখগহ্বর আবার গোল হয়ে উঠল। —তা হলে...

—হিমানীকে যদি দরকার হত, বুঝেছেন সার, এখানে এসেই সোজা আপনার বৈঠকখানায় ঢুকে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না। কলিং বেল টিপতাম, কেউ সাড়া দিলে জিজ্ঞেস করতাম হিমানী বাড়িতে কিনা, যদি থাকে দয়া করে ডেকে দিন।

যুবকের কথার ধরন ও গলার রুক্ষ স্বর মহিমবাবুকে আবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। আবার ঘাড় ফিরিয়ে তিনি শিউলি গাছটা দেখেন।

—শুনুন, এদিকে তাকান।

—হুঁ, বলো। মহিমবাবু চোখ ফেরান।

—হিমানী আজ বাড়ি নেই, তাই না? যুবক থুতনি নাচাল।

—হাঁ, হিমানী একটু—একটু বাইরে গেছে আজ।

—ফুলেশ্বর গেছে বলুন!

—হাঁ, ফুলেশ্বর গেছে, ভোরের ট্রেনে।

—সারা দিন সেখানে থাকবে!

—হাঁ, তাই যেন বলে গেল।

—অমলেন্দুর সঙ্গে গেছে। তাই না?

—অমলেন্দু! বাইফোকাল লেন্স-এর ভিতর মহিমবাবুর চোখ পিটপিট করে উঠল। তা হতে পারে, আমি কিন্তু অমলেন্দুকে চিনি না, কোনোদিন দেখিও নি।

—আপনার দেখার দরকার পড়ে না, আমি দেখেছি, আমি চিনি। যুবক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল।

একটু নড়েচড়ে বসলে ভাল লাগত মহিমবাবুর। কিন্তু পারছেন না, প্রকাণ্ড রিভলভিং চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন।

—দু দিন আগে থাকতেই ঠিকঠাক, আজ সারা দিন ওখানে থাকবে দুজন, চড়ুইভাতির মতন নিজেরাই রান্নাবান্না করে খাবে, গল্প করবে—লাস্ট ট্রেনে কলকাতা ফিরবে। একটু থেমে থেকে যুবক আবার বলল, ঐ আমেরিকান মেয়েরা আজকাল হরদম যা করছে আর কি, ডেটিং-মেটিং যা খুশি বলতে পারেন, আগে থেকে দিন তারিখ ফেলে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে পুরো একটা দিন, কি আস্ত একটা রাত বা বেশ কিছুটা সময় কোথাও কাটান।

মহিমবাবু নীরব।

—আপনাকে কি এত সব কথা বলেছে হিমানী? যুবক টেবিলের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—হাঁ। আমতা আমতা করেন মহিমবাবু। অনেকটা সে রকম আভাসই দিয়েছিল হিমু কাল রাত্রে, ওর কোন্ ফ্রেন্ডের সঙ্গে ফুলেশ্বর আজ বেড়াতে যাচ্ছে। সারা দিন সেখানে—

—বয় ফ্রেন্ড বলুন, লাভার।

—আমি ঠিক জানি না, তোমাদের মতন এতটা খোঁজখবর রাখি না।

লজ্জায় লালাভ হয়ে উঠল মহিমবাবুর গৌরকান্তি মুখ। ঘাড় গুঁজে তিনি টেবিলের কাগজপত্র দেখেন।

—খোঁজ খবর রাখতে হয়, আপনার মেয়ে, আপনি হলেন বাবা, মেয়ে কার সঙ্গে মেলামেশা করছে আপনার একটু জেনেটেনে রাখার দরকার আছে বইকি। যুবক বিজ্ঞের মতন হাসল। হাসির শব্দটা কিন্তু অদ্ভুত। যে জন্য মহিমবাবু তৎক্ষণাৎ কাগজ থেকে চোখ তুললেন। ভুরু কুঁচকেলেন।

—কেন, অমলেন্দু কি ভাল ছেলে নয়, কোথায় থাকে সে, ঐ ছেলেও কি হিমানী-দের সঙ্গে পড়ে?

—ঐ ছেলে এম এস-সি পড়ে, গড়পার থাকে, দারুণ ছাত্র, ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল।

—তাই নাকি! সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন মহিমবাবু, উৎসাহের আতিশয্যে চোখ দুটো বড় করেন, কিন্তু খুবই অল্প সময়ের জন্য। যুবকের থমথমে চেহারা, হাতের বন্ধ মুষ্ঠি এবং কুপিত চোখ তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে সংকুচিত বিষণ্ণ করে তুলল। হঠাৎ তিনি কথা বলেন না।

—বুঝলেন, ভাল ছেলে, ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট, গোল্ড মেডালিস্ট অমলেন্দুর কাছে আমরা কেউ দাঁড়াতে পারি না।

চিৎকার না, কেমন যেন একটা হুঙ্কার ছাড়ল যুবক। ব্রিলিয়াণ্ট অমলেন্দু! ব্রিলিয়াণ্ট!

মহিমবাবু এদিক-ওদিক তাকান। নিশ্চুপ নিস্তব্ধ তাঁর বাড়ি। ওপরে রুগ্না স্ত্রী শয্যাশায়িনী, দুটি চাকর দারোয়ান ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। ছেলেটির চেঁচামেচি তাঁকে পীড়িত করে তুলল।

—তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। ঠাণ্ডা গলায় যতটা সম্ভব সহিষ্ণু থেকে মহিমবাবু আঙুল দিয়ে আবার চেয়ার দেখান। বসে কথা বলো।

—আমি আপনার এখানে বসতে আসি নি।। ক্রুদ্ধ অমার্জিত স্বরে যুবক উত্তর করল।

যেন নতুন করে মহিমবাবু জব্দ হলেন।

—না, যে কথা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম। পর পর দুটো ঢোক গিললেন মহিমবাবু। হুঁ, ব্রিলিয়াণ্ট গোল্ড মেডেলিস্ট অমলেন্দু, আমি তাকে দেখিনি, আমি চিনি না তাকে, তোমার মুখে এখন শুনছি, তার সঙ্গে হিমানীর মেলামেশা, তবে কি তুমি

আজকাল দুধ নিয়ে সবারই অভিযোগ।
তবে আমাদের ঘরে চমৎকার ঘন দই! কি ভাবে?

আমূল মিল্ক পাউডার দিয়ে তৈরী দুধটা ফুটন্ত অবস্থা পর্যন্ত গরম করুন। তারপর ঈষদোষ্ণ ঠাণ্ডা করে নিন। আধ থেকে এক চায়ের চামচ ভাল দই মিশিয়ে বেশ ক'রে নাড়ুন। তারপর জমতে দিন। ঘন ক্রীমের মত দই পাবেন—প্রতিবারই।
আমূল মিল্ক পাউডার থেকেই আপনি অফুরন্ত পুষ্টিকর দুধ পেয়ে যাবেন। এই দুধ দিয়ে—চা বা কফি খান। সুস্বাদু পানীয়, মিষ্টি এবং পুডিং তৈরী করুন। ঘন ক্রীমের মত দই পাতুন—যে দই দিয়ে আপনি লস্সী, রায়তা, দইবড়া তৈরী করে নিতে পারবেন। দেখবেন কত সুবিধা, আর খরচও কত কম। ঘরে সব সময় এক কৌটো রাখুন।

ঘরনীর গোপন দুধের ভাণ্ডার—

আমূল
মিল্ক পাউডার
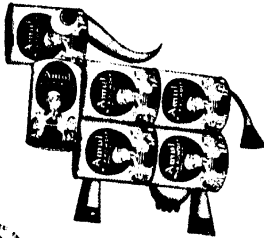
কাইরা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ, আনন্দ, গুজরাট

ASP/AMP-16

বলছ, মানে ইয়ে, স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে ওই ছেলের কোনো রকম—

—স্পটলেস। যুবক শব্দ করে হাসল। স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে অমলেন্দু ধোয়া তুলসিপাতা, দারুণ সাধু ছেলে, সিগারেটটা পর্যন্ত কেউ কোনোদিন খেতে দেখেনি—

—তা হলে, তা হলে—মানে, তুমি তবে কী বলতে চাইছ? অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি হয়ে মহিমবাবু মুখখানাকে প্রায় হাসি হাসি করে তুললেন। যেভাবে হুড়মুড় করে এখানে ঢুকলে, যেভাবে আমার মেয়ের ফুলেশ্বর বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কথাটা তুলেছ—

—কথাটা তুলেছি অনেক দুঃখে স্যার, কথাটা আপনাকে বলছি অনেক আঘাত পেয়ে, বুঝেছেন? দু দিন আগেও হিমানী আমাকে ভালবাসত, দু দিন আগেও বুকে টোকা দিয়ে আমি বলতে পেরেছি, আমি হিমানির লভার।

—ও হো হো হো। এবার মহিমবাবু হেসে তুলতুলে হয়ে ওঠেন। চোখ দুটো আধবোজা করে ফেলেন। তাই বলো, তোমাদের ভালবাসাবাসির দ্বন্দ্ব প্রেমের কি যেন বলে, ত্রিকোণ সমস্যা, আর তারই ফয়সালা করতে তারই একটা সুবিচার চাইতে সাত সকালে একেবারে আমার কাছে ছুটে এলে তুমি।

—হ্যাঁ, আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনি হাসবেন না। যুবক ধমক দিয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে একটা ঘুঁষি বসিয়ে চোখ লাল করে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। প্লিজ ডোণ্ট লফ।

—এই কে আছিস। ভয় পেয়ে মহিমবাবু গম্ভীর গলায় আবার যেন চাকরকেই ডাকতে উদ্যত হন।

—খবরদার কাউকে ডাকাডাকি করবেন না, কাউকে ডাকাডাকির গ্রাহ্য করে না অসিত মনে রাখবেন।

এক সেকেণ্ড চুপ থেকে যুবক শিউলিগাছটা দেখল। তখনি আবার চোখ নামিয়ে মহিমবাবুর দিকে তাকাল।

—ভাববেন না আমি নিরস্ত্র হয়ে আপনার ঘরে ঢুকেছি। কেউ এসে আপনাকে সাহায্য করবে, হুঁ? তার আগেই আমি আপনাকে ফিনিশ করে দিতে পারি। যুবক দাঁতে দাঁত ঘষল।

কাগজের মতন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলেন মহিমবাবু। পর পর তিনটে ঢোঁক গিললেন। পর মুহূর্তে কেমন যেন মরিয়া হয়ে শরীরটাকে শক্ত, যেন তার চেয়েও বেশি মনটাকে সুদৃঢ় সংহত করে তুলে—যেন ছেলেটি চমৎকার একটা প্রহসন করছে, আর তাই দেখে তাঁর হাসি পাচ্ছে, চোখে মুখে একটু খাঁটি অনুকম্পার হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

—তোমরা আজকালকার ইয়ংম্যান যা হয়েছ না! বোসো বোসো, না বসে কি এসব কথা—

—হাসবেন না, আবার বলছি ইডিয়েটের মতন হাসবেন না। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে যুবক এমনভাবে গলাটা বাড়িয়ে দেয়, যেন এখনি দুহাতে মহিমবাবুর মাথাটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি লাগাবে।—আপনার সঙ্গে আমি ইয়ার্কি করতে আসিনি মনে রাখবেন। যুবকের ঠোঁট কাঁপছিল।

মহিমবাবুর মুখের হাসি নিবে গেল! স্তব্ধ হয়ে রইলেন। টেবিল থেকে ঘাড়টা উঁচু করে ধরে যুবক সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা টিকটিকি ডেকে উঠল কোথাও। একটা ছোট্ট পাখি শিউলির ডালে এসে উড়ে বসতে ঝুরঝুর করে ক'টা শিউলি নিচে পড়ল। যেন সুন্দর দৃশ্যটা দেখতে যুবক সেদিকে ঘাড় ফেরায় আর সেই ফাঁকে মহিমবাবু আস্তে হাত বাড়িয়ে তাঁর ফোনের রিসিভারটা তুলতে যান। তখনি স্প্রীং-এর মতন যুবকের মাথাটা এদিকে ঘুরে আসে। খপ করে মহিমবাবুর হাতটা সে চেপে ধরল।

—কি করছেন, কাকে ফোন করছেন আপনি?

—থানায় ফোন করছি। মহিমবাবুর মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। কপালের রগ ফুলে উঠল।

যেন একটা সাংঘাতিক ঘৃণ্য কদর্য জিনিস মুঠোয় চেপে ধরেছে, চোখ মুখের এমন চেহারা করে যুবক তৎক্ষণাৎ মহিমবাবুর হাতটা ছেড়ে দিল।

—একটা ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আপনি যে এমন গরু মূর্খ জানতাম না।

অসহায় ফ্যালফ্যাল চোখে মহিমবাবু তাকিয়ে থাকেন। একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলেন।

—পুলিস ডেকে আমায় শায়েস্তা করবেন আপনি! ঘেন্নার ভাবটা তখনও কাটেনি, চোখ দুটো ছোট করে যুবক মহিমবাবুর মুখটা দেখল তারপর সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতন করে বলল, একদিন হিমানী আমায় ভালবেসেছিল, আমিও তাকে পাগলের মতন ভালবেসেছি—এতটা জেনেও ভদ্রলোক আমাকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে চাইছে, ওফ্!

একটু সময় ঘরের ভিতরটা বড় বেশি নীরব হয়ে রইল। তারপর চোখ নামিয়ে যুবক আবার মহিমবাবুর মুখটা দেখল। —বলেছি আপনাকে, পুলিশ আসার আগেই আমি আপনাকে শেষ করে দিতে পারি। আমার সেই ক্ষমতা আছে।

—ছোরা রিভলবার! ফ্যাকাশে হাসিটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে মহিমবাবু আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন। তাই তো বলছিলাম, ট্র্যাজেডী, কী নিদারুণ অভিশাপ নিয়ে প্রেজেন্ট জেনারেশনটা ভুগছে প্রত্যেকটা ইয়াংম্যান কেমন যেন—

—প্রত্যেকটা ইয়াংম্যানের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। ছোরা রিভলবারের ভয় দেখিয়ে আমি আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে আসিনি।

—আরে সে তো ভাল ছিল! এবার মহিমবাবু তাঁর রিভলভিং চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসেন ফ্যাকাশে হাসিটা সরে গিয়ে খানিকটা তাজা হাসি ঠোঁটে উঁকি দেয়। —দশ পাঁচশ হাজার দু হাজার—যা চাইতে তোমার হাতে তুলে দিয়ে এখান থেকে তোমাকে বিদেয় করতে পারতাম।

—না, সেভাবে বিদেয় হতে আমি এখানে আসিনি। আপনার টাকার ওপর আমার লোভ নেই।

—থাকলে ভাল হত। মহিমবাবু মিনমিনে গলায় বলেন, সমস্যাটার সহজে সমাধান হত।

—কি বললেন? ভাল করে বলুন, পরিষ্কার করে বলুন। যুবক আবার রুখে উঠল। ঝুঁকে দাঁড়াল।

মহিমবাবু নীরব।

—আশ্চর্য লোক বটে আপনি একটি! সবে সকাল, মহিমবাবু তখনও পাখা খোলেন নি। যুবক ঘামছিল। সরে গিয়ে জানালার শিউলি গাছটার কাছে সে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনি আবার টেবিলের কাছে চলে আসে। —শুনুন, এই ব্যাপারে টাকা দিয়ে আপনি আমাকে শান্ত করবেন, ঠাণ্ডা করবেন তা হয় না।

যুবকের গলার স্বর কাঁপছিল, যেন রুক্ষতা ও ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে বেদনার মতন কিছু একটা মহিমবাবুর কানে লাগল। ফলে তিনি আরও খানিকটা সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারেন। মুখের হাসিটা বড় করে তোলেন।

—তাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি, তুমি আমার কাছেই বা ছুটে এলে কেন, আর এই ব্যাপারে আমার কি করার আছে, কতটাই বা তোমাকে সাহায্য করতে পারি—বোসো, চা খাবে?

—না।

—হিমানী ফিরে এলে কি আমি তাকে বলব?

—কি বলবেন? যুবক ভুরু কুঁচকোলো।

—এই, তুমি যা বললে, তোমাদের দুজনের আগেকার লাভ অ্যাফেয়ার, তারপর এখন আবার অমলেন্দুর সঙ্গে ওর—

—আপনি এখনো একশ বছর পিছিয়ে, দুশ বছর—আজকের একটি মেয়ে, কুড়ির ওপর যার বয়স হল, এসব কথা জিজ্ঞেস করে তার কাছ থেকে সরল সিধে উত্তর পাবেন কি করে আপনি আশা করেন, অনেক জটিলতা অনেক আবর্তের মধ্যে আপনাকে
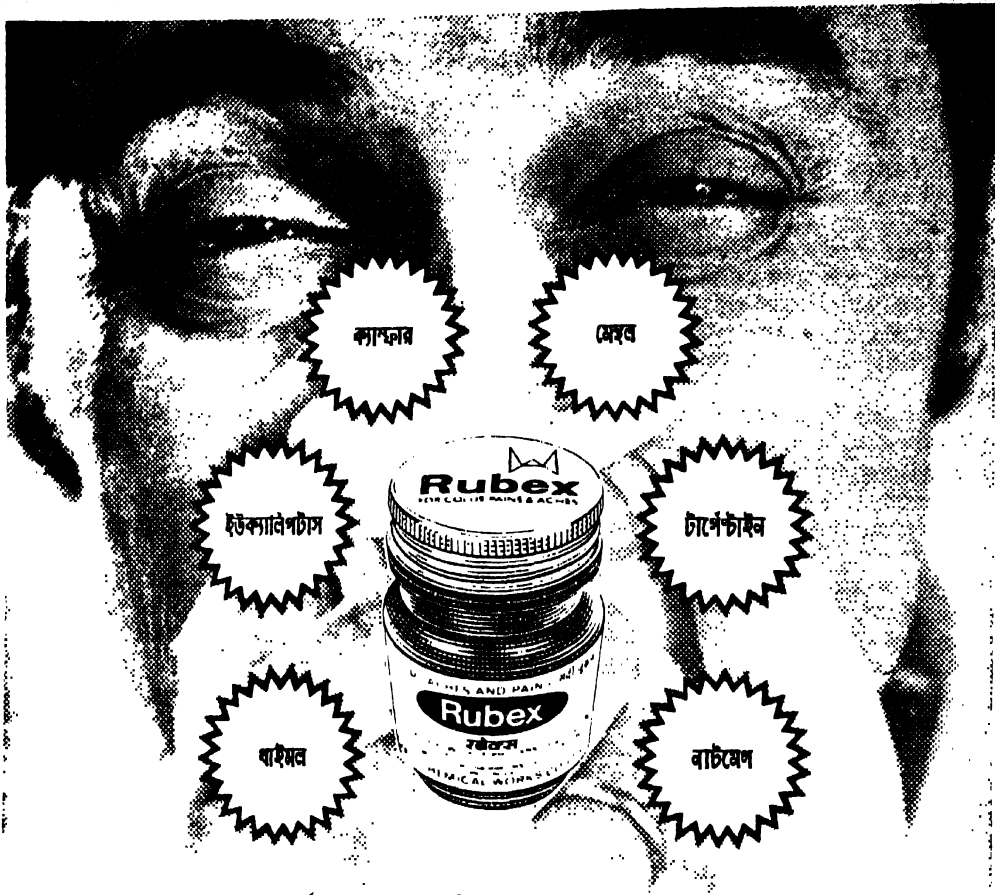
ক্যাম্ফার
মেন্থল
Rubex
ইউক্যালিপটাস
টার্পেন্টাইন
Rubex
থাইমল
নাটমেগ

টেনে নিয়ে যাবে মেয়ে, আপনার মূল প্রশ্নটাই সেখানে হারিয়ে যাবে।

মহিমবাবু অতিমাত্রায় বিস্মিত হন। যুবকের দু চোখ ছলছল করছে। এবার একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে তিনি খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। উদ্ধত দুর্বিনীত চরিত্র নরম হচ্ছে, মোমের মতন গলতে আরম্ভ করেছে। আর তাকে দিয়ে ভয় নেই, বিপদের আশংকা নেই। তা হলেও ভিতরের উল্লাসটা চেপে গিয়ে মহিমবাবু কিন্তু মুখখানাকে বিষণ্ণ করে তোলেন।

—এ কি, তুমি কাঁদছ—পুরুষের কি কান্না শোভা পায়।

—না, ব্যর্থ প্রেমিক কাঁদে না, হাসে। বিকৃত গলার স্বর, ভাঙাচোরা চেহারা নিয়ে যুবক আবার শিউলি গাছটার দিকে তাকায়, তার চোখ বেয়ে টপটপ জল পড়ছে।

—এই দ্যাখো, অ্যাঁ কী মুশকিল, সত্যি দেখছি তুমি কাঁদছ, অথচ, অথচ—মহিমবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসেন—একটু আগে বলছিলে তুমি সশস্ত্র, অস্ত্র বলে বলীয়ান, তোমার অসীম ক্ষমতা-–কোথায়, এখন দেখছি মেয়েছেলের মতন তোমার চোখে জল।

—সুযোগ পেয়ে আবার আপনি ঠাট্টা করছেন, আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন? দাঁতে দাঁত ঘষল যুবক, তার কান্নার চেহারা চোখের নিমেষে আবার উগ্র মূর্তি ধরল।

—আরে না না, ছি! ভয় পেয়ে মহিমবাবু আধখানা জিভ কামড়ে ধরেন। —বলছিলাম পুরুষের কি এত সহজে ভেঙে পড়লে চলে! তাকে শক্তিমান হতেই হবে।

—অ্যাঁ, অস্ত্র, শক্তি, তুমি আমার অস্ত্র দেখতে চাও মহিমবাবু, আমার অস্ত্র এখনো অটুট ক্ষমতা রাখে, অসীম তার শক্তি। যুবক এক টানে গায়ের জামা খুলে ফেলল।

কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে মহিমবাবু সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অস্ত্র বলতে যুবক কী বোঝাতে চাইছে, শক্তি বলতে সে কিসের ইঙ্গিত করছে!

যুবক প্যান্টের বোতামে হাত রাখল।

—এই এই তুমি করছ কি! মহিমবাবু প্রায় আর্তনাদ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। অ্যাঁ দ্যাখো, দ্যাখো, এমন উন্মত্ততা এমন বিকৃতি এমন নির্লজ্জতা কেউ কখনো দেখেছে—

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে যুবক সামনে দাঁড়িয়ে। মাথা নিচু করে মহিমবাবু দু হাতে চোখ ঢাকেন।

—অ্যাঁ, আমরা এই শতাব্দীর মানুষ, কতটা সভ্য উন্নত হয়েছি, কতটা এগিয়ে গেছি। এখনো সেই আদিমতা, সেই বর্বরতা সেই অন্ধকার—

—আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি মহিমবাবু, আমরা একচুল এগোতে পারছি না, আমি তুমি অমলেন্দু, তোমার মেয়ে হিমানী, কেউ না।

—জঘন্য জঘন্য! চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মহিমবাবু চিৎকার করে ওঠেন: বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে অসভ্য, জানোয়ার!

—আপনার মেয়ে আসুক, মুক্তেশ্বর থেকে আনন্দ করে বাড়ি ফিরে আমার শক্তি দেখুক, পৌরুষ দেখুক, তারপর আমি এখান থেকে যাব।

—অ্যাঁ, কী সাংঘাতিক কথা! ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মহিমবাবু থরথর কাঁপেন।—আমি এখনি পুলিস ডাকছি।

—পুলিস এখানে আসবে না, পুলিসের চক্ষুলজ্জা আছে, পব্লিক প্লেস নয় এটা, আপনার ঘর, এখানে এই অবস্থায় একটি যুবক দাঁড়িয়ে, নিশ্চয় তার কারণ আছে, বুঝতে পেরে পুলিস এখানে ঢুকবে না।

—আমি আমার চাকর দারোয়ানকে ডাকছি, ইতর অভদ্র!

—তাদেরও একটা স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ আছে, তারাও এখন এ-ঘরে আসবে না, আপনার মতন তারা নির্লজ্জ নয়।

যেন দারুণ অসহায় হয়ে মহিমবাবু এক সেকেন্ড চুপ করে থাকেন। তারপর বাধ্য হয়ে বীভৎস মূর্তিটার দিকে তাকান। তারপর চাপা কঠিন গলায়, বাইরের কেউ শুনতে না পায়, হিসহিস করেন: ওফ, তুমি কত বড় মূর্খ, তুমি কি জান না কেবল ফিজিক্যাল ফিটনেস গায়ের বল পশু-শক্তিই প্রেমের শেষ কথা নয়, সব নয়—তবে আর হৃদয় মন বলে কেন, ভালবাসা কেন! যদি তোমার ভালবাসার জোর থাকত হিমানী এমন করে ছিটকে তোমার কাছ থেকে সরে যেত না।

—তা-ও গেছে তোমার গুণী মেয়ে মহিমবাবু, আমার ভালবাসার উদ্দাম ঢেউ ডিঙিয়ে তার রুচি-বিকৃতি তার ক্ষুধা তাকে পাখির মতন উড়িয়ে নিয়ে গেছে অন্য দিকে।

—আমি বিশ্বাস করি না। মহিমবাবু জোরে মাথা ঝাঁকান। ভালবাসার জোর থাকলে—

—অহো, ভালোবাসার জোর, আমার ভয়ংকর তীব্র ভালবাসা তুমি দেখতে চাও মহিমবাবু! যা তোমার হিমানীর জন্য এতকাল বুকের ভেতর জমিয়ে রেখেছিলাম? যুবক হো হো করে হেসে উঠল। হেসে উঠল কি কেঁদে উঠল মহিমবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না। উন্মত্ত নগ্ন শরীরটা টেনে নিয়ে সে দেওয়ালের কাছে ছুটে গেল।

দুম্ দুম্ দুম্! মহিমবাবু হতভম্ব। তাঁর চোখের পলক পড়ছে না। ঘরের চারটে দেওয়াল কাঁপছে মেঝেটা কাঁপছে সিলিং কাঁপছে। দুম্ দুম্।

—এই, তুমি করছ কি! মহিমবাবুর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। পাথরের মতন স্থির স্তব্ধ হয়ে থাকেন তিনি।

ভালবাসা ভালবাসা! অস্পষ্ট গুমগুম আওয়াজ বেরোচ্ছে যুবকের গলা দিয়ে। বার বার দেওয়ালে মাথাটা ঠুকছে। চোখ বেয়ে ঠোঁট বেয়ে গলা বেয়ে গলগল রক্ত ঝরছে। এভাবে একদিন একটা কুকুরকে দেখেছিলেন মহিমবাবু। পাগল সন্দেহ করে পাড়ার ছেলেরা ক্রমাগত মাথায় বাড়ি মারছিল। অবিকল সেই ছবি। রক্তস্নান করে কাঁপতে কাঁপতে যুবক মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।
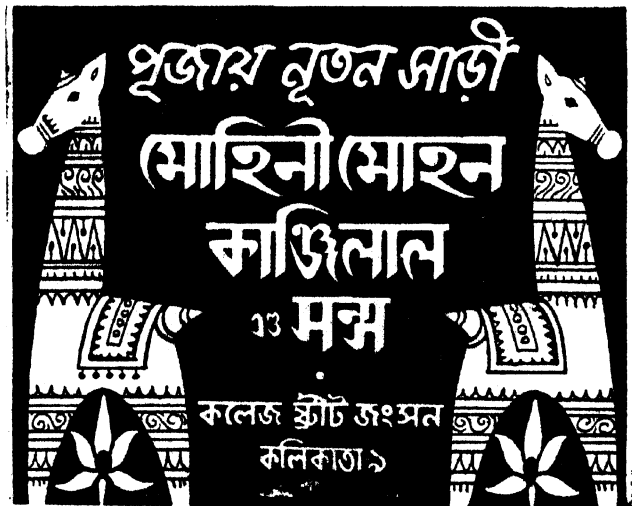
আপনার মন মজাবে রিচব্রু
যেমন সরেস তেমনি গাঢ় তেমনি কড়া
একমাত্র
প্যাকেটের চা-ই
থাকে তরতাজা,
থাকে স্বাদেগন্ধে
ভরপুর।
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA
লিপটনের রিচব্রু
LKC-11/72 BEN

আলুতে বিপত্তি

বিপত্তির পর বিপত্তি! ভেজাল, পচা আর নকল আমাদের দৈনন্দিন বিপত্তি। তার একটা তালিকা বা ফর্দ তৈরী করলে দেখবেন সংখ্যা নিত্যই বাড়ছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে পড়লাম আলু নাকি আবার বিপত্তির তালিকাভুক্ত হয়েছে। দরের বিপত্তির ঠেলায় আমরা আলুর সর্বশ্রেষ্ঠটি সব সময় কিনতে পারি না, অথচ রোগদুষ্ট আলুতে ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে। বছরখানেক আগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পর্যন্ত রোগদুষ্ট আলু খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে সরকার বিশেষভাবে খারাপ আলু খেতে সবাইকে মানা করেছেন। শুনেছি সে দেশে নাকি দোকানীদের এখন খারাপ আলুর উপর লিখে দিতে হয় যে সে আলু কোথা থেকে এসেছে। যে কৃষকের কাছ থেকে তা এসেছে, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, থ্যালিডোমাইড-এর মতন সংক্রামক ক্ষয়রোগ বা blight গ্রস্ত আলু গর্ভস্থ ভ্রূণ-এর ক্ষতি করতে পারে। শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। ডাঃ রেনউইক নামে বৈজ্ঞানিক রোগগ্রস্ত আলু সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। আলুর ক্ষয়রোগের বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ Phytophthora infestans। এটি একরকম ছত্রাক বা fungus। এই ক্ষয়রোগের দ্বারা কিভাবে ভ্রূণ বিকলাঙ্গ হতে পারে তা এখনও খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। থ্যালিডোমাইডও প্রথম বাজারে খুব বিকোচ্ছিল। থ্যালিডোমাইড প্রস্তুতকারী কোম্পানি প্রচুর পয়সা কামিয়ে নেবার পর দেখা গেল থ্যালিডোমাইড প্রথম গর্ভাবস্থায় যে সব মায়েরা খেয়েছেন তাঁদের সন্তানদের অনেকে বিকলাঙ্গ।

আলুর ক্ষয়রোগ কিভাবে মানুষের গর্ভস্থ ভ্রূণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা পুরোপুরি না জানলেও খারাপ আলু যেখানে বেশী সেখানে দুটি সাংঘাতিক রোগ হতে দেখা গেছে। দুটি রোগই হলো ভয়ানক। Anencephaly রোগদুষ্ট শিশুর মস্তিষ্ক অর্থাৎ brain থাকে না। অন্য রোগটি Spina bifida। মেরুদণ্ড অপূর্ণ থেকে যায়। সাধারণত এ রকম ক্ষেত্রে গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়।

আলু মানুষের প্রধান খাদ্যের মধ্যে একটি। অন্যান্য খাদ্যশস্যের চেয়ে আলুর খাদ্যগুণ বা energy বেশী। আলুতে আছে শতকরা ৭৬·৮ জল, ২০ ভাগ শর্করা অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট, ২ ভাগ প্রোটিন এবং ১ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে। অর্ধ কিলো আলুতে ৩৫০ ক্যালরি আছে। আলু কবে কোথায় এবং কিভাবে আবিষ্কার হয়েছিল জানা নেই। আলু খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে পরিচিত ছিল। আন্দিজ পর্বতে ছয় হাজার থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চতায় আলু জন্মাতো অকর্ষিত অনাবাদী জমিতে। সেই আলু সংগ্রহ করে উষ্ট্রজাতীয় পশু লামার পৃষ্ঠে সমতলভূমিতে আনা হতো খাদ্য হিসাবে। পেরু দেশের অজানা নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখলে বোঝা যায় খ্রীষ্টজন্মের সমসাময়িক কাল থেকে আলুর চাষ আরম্ভ হয়েছে। পরিত্যক্ত জনপদের কবর থেকে পাওয়া গেছে পুষ্পাধার। তার গায়ে আলুর চাষের ছবি আছে। সংরক্ষিত খাদ্য বা preserved food-এর সূত্রপাতও আলু থেকেই হয়েছিল। পেরুর সমাধিগুলিতে পাওয়া গেছে সংরক্ষিত আলু। ঠাণ্ডা করে এবং চাপ দিয়ে সংরক্ষিত আলুর একরকম কঠিন মোটা খণ্ড তৈরী হতো। রেড ইণ্ডিয়ানরা তার নাম দিয়েছিলেন "চুনো"। "চুনো" কিন্তু চুনোপুঁটি ছিল না। তার খাদ্যমূল্য স্বীকৃতি পেয়েছিল আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মাঝে। আলুর আদিমতম নাম Papas। ইউরোপে আসার পর Papas-এর বদলে নাম হলো বাটাটা। হয়তো মিষ্টি আলু বা বাটাটার সঙ্গে গুলিয়ে গিয়েছিল নাম। বাটাটা থেকে Potatoর উৎপত্তি।

ষোড়শ শতাব্দীতে আলু ইউরোপে এসেছে। বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল আমেরিকার ভার্জিনিয়া থেকে আলু ইউরোপে এসেছে। তা ঠিক নয়। কারণ ভার্জিনিয়াতে আলু উৎপন্ন হয়েছে ১৬৯১ সালে, আর স্পেনে আলু এসেছিল ১৫৭০ সালে। ঠিক ৭০ বছর আগে।

ব্রিটেনে আলু কে এনেছে তা নিয়েও নানা মত আছে। কেউ বলেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক আলু এনেছিলেন উত্তর আমেরিকায় হানা দেবার পর। কেউবা মনে করেন তিনি স্প্যানিশ তরণীবহর থেকে পেয়েছিলেন আলু। যেই এনে থাকুন, আলু আয়ারল্যাণ্ডে প্রথম পৌঁছেছিল। ১৫৮৭ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে আলু আসে। আলু সেদিন থেকে আইরিশ মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ১৮৪৬ সালে আলুর ক্ষয়রোগে আয়ার্ল্যাণ্ডে ভীষণ অন্নকষ্ট হয়। পাঁচ লক্ষ আইরিশ কৃষক অনাহারে অর্ধাহারে মারা যান, আর তিন লক্ষ আমেরিকায় চলে যান। মহারানী ভিক্টোরিয়া গীর্জায় গীর্জায় আলুর জন্য প্রার্থনা জানাতে সাধারণকে অনুরোধ করেন। স্কটল্যাণ্ডে কিন্তু আলু জনপ্রিয় হয়নি। বাইবেলে আলুর উল্লেখ নেই, অতএব আলু অখাদ্য। এ মনোভাব বহুদিন ছিল। দু শ বছর হলো সেখানে আলু চলেছে।

আলুর উদ্ভিদ বিদ্যা সংক্রান্ত নাম Solanum Fuherosum। টোম্যাটো এবং আলু একই পরিবারভুক্ত। একই পরিবারভুক্ত night shade বিষাক্ত। আলুও সবুজ, গাঁজানো বা পুরোনো হলে বিষাক্ত হতে পারে।

ভারতবর্ষেও রোগদুষ্ট আলুর প্রবেশ হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ ভাগে। কিভাবে আলুর ক্ষতিকর প্রভাব মাতৃগর্ভস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ করে তার হদিস হয়নি। অনেকে মনে করেন, ত্বক দিয়ে অথবা নাসিকা পথেও ক্ষতিকর জিনিস প্রবেশ সম্ভব। বাজার দরের দায়ে আমরা কেনাকাটা করতে জিনিসের মান দেখবার আগে দাম দেখি। অথচ কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে আছে জানতেও পারি না। আলুর মত কত শাকসব্জী হয়তো সামান্য হেরফের থেকে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। খেসারি ডালই দেখুন না কেন। একটু সামান্য ত্রুটিতে কি বিষময় ফল ফলে যায়।

টুকিটাকি

যে দ্রব্য দেহে সঞ্চারিত হলে স্বাস্থ্যহানি বা মৃত্যু হয় তাই হলো বিষ। অথচ এমন বিষ আছে যা সামান্য পরিমাণ ব্যবহার হয় ওষুধ হিসাবে। আর্সেনিক, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি তো টনিকেও ব্যবহার হয়। অথচ পরিমাণ বেশী হলে মৃত্যু হয়।

বিষকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। Corrosive অর্থাৎ ক্ষয়কর বিষ পুড়িয়ে দেয়। কড়া অ্যাসিড, যেমন হাইড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড এবং কড়া ক্ষারজাতীয় পদার্থ, যেমন অ্যামোনিয়া এই জাতীয় বিষ। ডিমের শ্বেতাংশ জল মিশিয়ে ফেটিয়ে ব্যবহার করা হয় প্রতিষেধক হিসাবে। কার্বলিক অ্যাসিড বীজাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার হয়। বেশী হলে তীব্র বিষ। মিন্ট লেবুর সরবৎ প্রতিষেধক।

উত্তেজক বা irritant বিষ-এর মধ্যে আর্সেনিক একটি। আর্সেনিক কখনও কখনও দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিষ হয়ে যায়। তেমনই বিষ নষ্ট করতে দীর্ঘ সময় লাগে।

তৃতীয় পর্যায়ের বিষ Nerve poison স্নায়ুর ক্ষতি করে। স্নায়ু আক্রমণ করা বিষই সবচেয়ে সাংঘাতিক। Potasium Cyanide স্নায়ু আক্রমণ করে। বহু ওষুধ এ পর্যায়ের মৃদু বিষ। অ্যাসপিরিন, নানা ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি বেশী হলে nerve poisoning হয়। সে জন্যই সাধারণত প্রশান্তিদায়ক বা sedative ডাক্তারের ব্যবস্থা ভিন্ন ব্যবহার করা ভাল নয়।

চতুর্থ হচ্ছে গ্যাস অর্থাৎ বিষাক্ত গ্যাস। বিষাক্ত গ্যাস দুরকম। ক্লোরিন, ব্রোমিন গলা এবং ফুসফুস আক্রমণ করে। কার্বন মনোক্সাইড অক্সিজেন-এর মানব দেহে প্রবেশকে ব্যাহত করে। কয়লার গ্যাস, মোটরের গ্যাস ইত্যাদি কার্বন মনোক্সাইড। এজন্য বন্ধ ছোট ঘরে কয়লার উনুন বা চুলা থেকে অনেক দুর্ঘটনা হয়। ফুসফুস অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না বলে শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুর কথা প্রায়ই শোনা যায়।

যাদের চুলের ডগা ফাটে তাদের জন্য লেনোলিন (Lanolin) মিশ্রিত শ্যাম্পু উপকারী। সবার সব শ্যাম্পু সমান সহ্য হয় না। কাজেই শ্যাম্পু যদি বাজারে কেনেন তা হলেও ভাল করে বুঝে দেখে কিনবেন। ঠিক শ্যাম্পু হলে অল্প দিনেই চুলের স্বাস্থ্য ফিরে যাবে।

শ্রীমতী

॥ মেল ॥
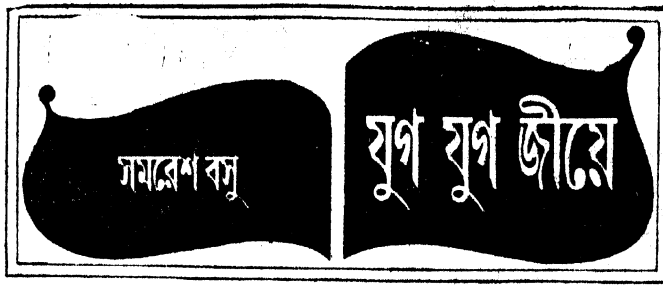
রশীদ বিরক্ত, হয়তো ক্রুদ্ধও ত্রিদিবেশের প্রতি। ইতিমধ্যে গাড়ির কামরা প্রায় খালি হয়ে যায়। ত্রিদিবেশ তখনো বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে। এই সময়ে দুইজন চীনা কামরার মধ্যে ঢোকে, এদিকে ওদিকে তাকায়, দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা, কিছুটা সন্দেহ ও আর সংশয়। এদের শরীরে কোনো আঘাতের দাগ নেই। ত্রিদিবেশ প্রায় চিৎকার করে হাত তুলে বলে ওঠে, 'দেয়ার, হি ইজ দেয়ার, ইন দ্য বাথরুম।'

দুই চীনা যুবক, ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে জুতোয় শব্দ তুলে বাথরুমের দিকে ছুটে যায়। একজন দরজায় জোরে করাঘাত করে চিৎকার করে ডাকে, 'সেয়ং! সেন্ সেয়ং—সেয়ং!' .....

এ সময়েই আবার হন্তদন্ত হয়ে গার্ড সাহেব ঢোকেন, এবং কথা তাঁর মুখে, 'আঁ? এখনো খোলে নি? বেরোয় নি? হা ঈশ্বর!'

'সেয়ং! সেয়ং!...চিৎকারের ডাক আর দরজায় করাঘাত বাজতে থাকে।

ত্রিদিবেশের মনে হয় এখন প্রকৃতই ওর নিশ্বাস গলার শ্বাসনালিতে টিপে ধরা। চীনা তার ভাষায় আরো কিছু বলে ওঠে। এ সময়ে আর একজন কামরায় ঢুকে বসবার বেঞ্চির ওপর দিয়ে হেঁটে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। চীনা না, মনে হয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। কয়েকজন যাত্রী কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েও বাথরুমের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। উদ্বেগের থেকে তাদের চোখে কৌতূহল বেশি এবং কারোর কারোর মুখে হাসি এবং একজনের গলা শোনা যায়, 'বলেছি, পটল তুলছে।'

রশীদ এবার বদ্ধপরিকর, শক্ত হাতে ত্রিদিবেশের হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে যায় দরজার দিকে এবং একটি প্রচলিত গালাগালি দেয়। নিশ্চয় করে ত্রিদিবেশকেই বলে কী না বোঝা যায় না, সকলের উদ্দেশেই বলতে পারে, এমন কি পৃথিবীর উদ্দেশেও, এবং রাগ না করে হাসতে হাসতেও উক্ত গালাগাল দেওয়া যায়। রশীদ বা ত্রিদিবেশও তা দিয়ে থাকে, যেমন 'শালা' বা 'কালা না' বা 'খচ্চর' বলা হয়ে থাকে, যদিচ সত্যি কেউ কারোর শালা না, অশ্বতরও কেউ না এবং কালানে যে আদপে কী, তাও বোধ হয় সঠিক কেউ জানে না। ত্রিদিবেশ চেষ্টা করে রশীদের হাত ছাড়াবার, শেষ পরিণতি জানবার জন্য ও উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাস, কিন্তু রশীদের গায়ের জোর অনেক বেশি এবং এখন ও প্রকৃতই বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ আর ত্রিদিবেশকে নিয়ে নেমে যেতে বদ্ধপরিকর। রশীদের চোয়াল শক্ত, চোখ জ্বলজ্বলে, কপালে চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখের রঙে রক্তের আভা। ত্রিদিবেশ কিছু বলতে চেষ্টা করে, রশীদ নিচু রুদ্ধ স্বরে ঝেঁঝে বলে, 'এবার তোকে প্যাঁদাবো।'

বলতে বলতে ত্রিদিবেশকে নিয়ে দরজার কাছের ভিড় ঠেলে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়ে। ভিতরে তখন চিৎকার শোনা যায়, 'সেয়ং সেয়ং!' সেই সঙ্গে দরজায় প্রচণ্ড আঘাত এবং সে আঘাতে যে দরজা ভেঙে পড়বে সন্দেহ নেই। গার্ড সাহেবের আর্তনাদ শোনা যায়, 'হা ভগবান!'

'শালা।' রশীদ গর্জন করে ত্রিদিবেশকে টেনে নিয়ে যায় প্ল্যাটফরমের বাইরে যাবার গেটের বিপরীত দিকে।

'পটল।' কারোর গলায় এইটুকু শোনা যায়।

ত্রিদিবেশ এখন আর জোর না করে অনেকটা রশীদের শক্ত টানে ভেসে যায়। ওর মুখ ঘামে ভেজা, সাপের ফণার মতো পাকানো পাকানো চুল কপাল ঢেকে অবিন্যস্ত। রশীদ প্ল্যাটফরম পেরিয়ে রেল লাইনের ওপর এসে পড়ে। ত্রিদিবেশের কানে এখনো 'সেয়ং সেয়ং!'...এবং বলে, 'লোকটা নিশ্চয় মরে গেছে।'

'তোর বাপের কি তাতে।' রশীদ এবার গলা খুলে ধমকায় এবং আরো তিক্ত স্বরে বলে, 'শালা বাপের ইয়ে থেকে। এত বড় একটা গ্রেট ওয়ার চলছে, রোজ শালা হাজার হাজার লোক মরে যাচ্ছে, উনি একটা চীনেম্যানের দুঃখে মরে যাচ্ছেন, শালা—।'

শালার পরের গালাগালটা সকলের সামনে বলা যায় না এবং সামনে দূরে লোকো আর রেলরোড ওয়ার্কার ছাড়া কেউ নেই, তারা শুনতেও পায় না। রশীদ তখনো ফুঁসতে থাকে, 'এদিকে নিজের চাকরির ধান্দা, শালা না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে, তার ওপরে শিউলীটাকে ফাঁসিয়ে বসে আছে—।'

'অ্যাঁ?' রশীদের কথার মাঝখানেই ত্রিদিবেশ চমকে ওঠে এবং যেন একটা ভয় চকিত জিজ্ঞাসার শব্দ করে।

রশীদের মুখ আরো শক্ত হয়, বলে, অ্যাঁ আবার কী রে শালা, মারবো মুখে এক ঘুষি বদন বিগড়ে দেব। কাল রাত্রেও তো চাঁদমারির ঘরে বসে শিউলীর কথা বলতে বলতে ভিরমি যাচ্ছিলি। একটা চাকরি জোগাড় করে শিউলীকে নিয়ে চম্পট দিতে না পারলে নাকি তোকে গলায় দড়ি দিতে হবে। আর এখন একটা চীনেম্যান মরলো কি বাঁচলো তাই নিয়ে মাথা ব্যথা হচ্ছে। শালা গাধা, তোকে গলায় দড়িই দিতে হবে।'

রশীদ যেন মন্ত্র পড়ে আর সেই মন্ত্রের গুণে ত্রিদিবেশের মুখের অভিব্যক্তি বদলায়। রশীদ এখন আর ওর হাত ধরে নেই, ও রেল লাইনের স্লিপারের ওপর দিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে চলে এবং রেলের কামরা ওর চোখ মুখ থেকে বিদায় নেয়, আশেপাশে তাকায়। পার দিকের একটা লাইনে অনেকগুলো বগীতে গোরা ফৌজ ঠাসা গাড়ি। তার কোনো এঞ্জিন নেই, অথচ চারদিকেই কয়লার ধোঁয়া ওড়ে। আকাশে মেঘের স্তর, রোদ নেই, বাতাসও যেন নেই এবং এই প্রথম ত্রিদিবেশের মনে হয়, প্ল্যাটফরম থেকে নেমে ওরা রেল লাইনের ওপরে। ও রশীদকে জিজ্ঞেস করে, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

রশীদের দৃষ্টি পুবের সৈন্যবোঝাই গাড়ির দিকে। সকলেই সশস্ত্র, ধোঁয়ায় আর আশ্বিনের গুমোট গরমের ঘামে বিবর্ণ, তথাপি কলকল কণ্ঠে শিস দেয় এবং অনায়াসে দাঁড়িয়ে বোতাম খুলে প্রাকৃতিক কাজ করে। লোকো আর লাইনসম্যানের কর্মীরা কেউ কেউ অবাক চোখে দেখে। রশীদ বলে, 'কোথায় আবার! বাঁ দিক দিয়ে গেট টপকে কাইজার স্ট্রিট দিয়ে বেরিয়ে যাবো।'

ত্রিদিবেশের মনে পড়ে যায়, কথা সেই রকমই ছিল, কারণ টিকেট কাটা হয় নি। চাঁদমারি—রুজভেল্ট টাউন থেকে শিয়ালদহ, ছ আনা ভাড়া। রশীদের কাছে পয়সা ছিল, টিকেট কাটা হয়নি। দুজনের ছ' আনা ছ' আনা বারো আনা, অনেক পয়সা, কম করে দু দিন পেট ভরে খাওয়া যাবে, এই ভেবে টিকেট কাটা হয় নি। বিনা টিকেটে ফাঁকি দিয়ে পালানো সম্ভব, না খেয়ে থাকা কঠিন। রশীদের ঠোঁট-বাঁকানো বক্তব্য, 'উইদাউট টিকেটে শেয়ালদা যাবে, এমন আর কী কথা। ও সব ফন্দী আমার জানা

আছে। আর ধরা যদি পড়ি, কয়েক দিন গারদে থাকবো। মাহ্‌মুদ সাহেব তো আর দেখতে আসছে না।'

মাহ্‌মুদ সাহেব রশীদের বাবা। চাঁদমারিতে দু দিন ধরে রশীদের কাছে শোনা অনেক কথা ত্রিদিবেশের মনে পড়ে যায়। রশীদ লোহার রেলিং-এর সামনে দাঁড়ায়। রেলিং-এর অগ্রভাগ বর্শার মতো তীক্ষ্ম এবং বেশ উঁচু। রেলিং-এর ওপারে দূরে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের বিল্ডিং আর কোয়ার্টার। দোতলা কোয়ার্টারের এক ব্যালকনিতে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে দেখা যায়, নিচের দিকে ঝুঁকে কারের সঙ্গে কথা বলে। ত্রিদিবেশ যখন রেলিং টপকানোর জন্য উদ্বেগ বোধ করে, রশীদ তখনই রেলিং-এর একটা চওড়া পাতের শিক সরিয়ে দেয়। যেন ম্যাজিক। দু ইঞ্চি ফাঁকের জায়গায় এক ফুট ফাঁক হয়ে যায়। ত্রিদিবেশের চোখে মুখে অবাক খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে; রশীদকে মনে হয় ম্যাজিসিয়ান। ও সব জানে, কোথায় কী আছে না আছে, কিন্তু ও হাসে না গম্ভীর ভাবেই বলে, 'নে, গলে যা।'

ত্রিদিবেশ গলে যায়, যেন এক বিপজ্জনক সীমান্ত অতিক্রম করে। রশীদ ফাঁক দিয়ে গলে আসে এবং শিকটা যথাস্থানে ঠেকিয়ে দেয়। শিকের নিচের দিকটা খোলা, ওপরের দিকটা আটকানো। সরিয়ে ফাঁক করে সহজেই যাতায়াত করা যায় এবং না জানা থাকলে বোঝবার উপায় নেই রেলিং ফাঁক করা যায়। একমাত্র বোঝবার উপায় এখানে পায়ে চলা পথের একটা দাগ স্পষ্ট, আর রেলিং-এর শিকটি চকচকে, কারণ নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় এরকম একটি নিষিদ্ধ চলাচলের ফাঁক কী করে সম্ভব? ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করে, 'এখানে যে ফাঁক আছে, কী করে জানলি?'

রশীদ পকেট থেকে আমেরিকান ভার্জিন তামাকের সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে, 'খুঁজলেই জানা যায়। প্যাসেঞ্জাররা জানে না, রেলের লোকেরাই এটা করে রেখেছে, নিজেদের যাওয়া আসার জন্য।'

হয়তো আশেপাশের লোকের কাছে ত্রিদিবেশ আর রশীদও রেলের লোক। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে না। ত্রিদিবেশ রেল কোয়ার্টারের দোতলার বারান্দার দিকে তাকায়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি নিচের দিকে ঝুঁকে এখনো হেসে আর কথা বলে। মেয়েটি টকটকে ফরসা না, কালোও না। আঠারো উনিশ বছর বয়স হতে পারে। কালো ঘাড়ছাঁটা চুল, কালো চোখ। রশীদের কথার পর থেকেই শিউলীর চিন্তা মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীল। কোনো মেয়ে দেখলে শিউলীর কথা আগে মনে পড়ে, কিন্তু— ত্রিদিবেশের ভুরু কুঁচকে ওঠে, চোখে উৎকণ্ঠা। রশীদের দিকে তাকিয়ে বলে 'তুই তো কাল রাত্রে বললি, শিউলীর কিছু হবে না।'

'মোটেই তা বলি নি।' রশীদ ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে বেশ ধমকের স্বরে বলে, 'আমি বলেছি হবেই এমন কথা বলা যায় না। নাও হতে পারে।'

ত্রিদিবেশ বলে, 'কিন্তু তুই তখন বললি, আমি শিউলীকে ফাঁসিয়েছি। তার মানে কী?'

'ন্যাকরা!' রশীদ ঠোঁট উলটে বলে, রেল কোয়ার্টারের দোতলার বারান্দার দিকে তাকায়। নিচের বাগানটা উঁচু মেহেদীর বেড়া দিয়ে ঘেরা, দোতলা থেকে মেয়েটি যার সঙ্গে কথা বলে তাকে দেখা যায় না। রশীদ ফুঁ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'ফাঁসানো কাকে বলে তুই জানিস না শালা, বদমাইস, লম্পট।'

লম্পট! ত্রিদিবেশ অবাক চোখে রশীদের দিকে তাকায়। রশীদ ওকে এতো খারাপ গালি দিতে পারে! ত্রিদিবেশ লম্পট! রশীদ গাল চুপসে সিগারেট টানে, ওর চোখ দুটো বাজপাখির মতো দেখায়। ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলে, 'শালা মিনমিন করে কথা বলে দেখে মনে হয় একটা পাজল আর ক্যাবলা। কালকা যোগী, গোঁফ গজায় নি, অত বড় একটা মেয়েকে জড়িয়ে বসে আছে। কোন্‌ সাহসে তুই ও কাজ করলি?'

ত্রিদিবেশের মুখ থমথমিয়ে ওঠে, আতে দৃষ্টিতে রাগ ফুটে ওঠে। দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'শালা নেড়ে, লম্পট কাকে বলছিস তুই? তুই কী ভাবিস আমাকে?'

'একটা ন্যাকা চৈতন ভাবি তোকে।' রশীদ এক পা এগিয়ে ত্রিদিবেশের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'বল্‌ না, কোন্‌ সাহসে তুই এমন একটা কাণ্ড করেছিস। শিউলীর মতো এত বড় একটা মেয়ে—ওর না হয় গরম হতে পারে, তুই শালা—।'

রশীদের কথা শেষ হবার আগেই ত্রিদিবেশ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে রশীদের মুখ লক্ষ করে একটা ঘুষি ছোঁড়ে। রশীদ এ ব্যাপারে অত্যন্ত চতুর আর ক্ষিপ্র, অনায়াসেই ঝটিতি নিজের হাত ছুঁড়ে ত্রিদিবেশের ঘুষিকে নিষ্ফল করে দেয়। ত্রিদিবেশ এমনিতে শান্ত, সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু এখন ও রুদ্ধ ঝাঁজালো স্বরে বলে, 'শালা নেড়ে, ছোটোলোক, ইতর, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশিস নি, তুই আর ভালো কী বলবি।'

এরা তখন কাইজার স্ট্রিটের মসজিদের সামনে রাস্তার ওপরে। মৌলবীর মতো একজন বুড়ো লোক, মাথায় সাদা সুতির কাজ করা টুপি, বালে পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা, ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকায়। ত্রিদিবেশের চোখ যেন ধক্‌ধক করে। রশীদ দু' পা দূরে দাঁড়িয়ে বলে, 'দাঁড়িয়ে পড়লি কেন, আয়।'

ত্রিদিবেশ ফুঁসে বলে, 'আমি যাবো না তোর সঙ্গে, তুই যা।'

রশীদ সাদা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসে বলে, 'রেগে গেছিস মাইরি?'

ত্রিদিবেশ তেমনই ফুঁসে বলে, 'তুই মনে করেছিস তোর সঙ্গে না গেলে আমার চলবে না? তুই চাকরি জুটিয়ে না দিলে জুটবে না?'

রশীদের দাঁত তেমনি ঝকঝক করে, বলে, 'আমি কি তা-ই বলেছি নাকি? আমি খালি তোর সাহসের কথা বলেছি। তোর যে এতো সাহস হতে পারে—।'

'সাহস আবার কী। এতে সাহসের কী আছে?' ত্রিদিবেশ রশীদের কথার মধ্যেই খেঁকিয়ে ওঠে।

রশীদ বলে, 'সাহস না? আমি তো ভাবতে পারি না। এই বয়স, চাকরি বাকরি করিস না, লেখাপড়া শিখিস নি, বেমালুম শিউলীকে—।'

রশীদ কথা শেষ করে না। ত্রিদিবেশ ক্রুদ্ধ কিন্তু হঠাৎ যেন ওর দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা ফোটে, এবং পরের মুহূর্তেই আবার বলে, 'যা, তোর সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।'

রশীদ এখন আর হাসে না, বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, কিছু বলবো না আর, চল্‌।'

'না আমি তোর সঙ্গে যাবো না।' ত্রিদিবেশ ফুটপাথের দিকে সরে যায়।

রশীদ ত্রিদিবেশের দিকে এগিয়ে যায়, বলে, 'আরে, আমি কি সত্যি সত্যি কিছু বলেছি নাকি? আমি খালি তোর সাহসের কথা বলছি। তোর কি ভয় হচ্ছে না?'

ত্রিদিবেশ রশীদের দিকে সজোরে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'ভয় না হলে তোকে বলতে যাবো কেন? যখন বলেছিলাম, তখন তো এ সব কথা বলিস নি? তখন তো আমাকে খুব দয়া দেখাচ্ছিলি, শিউলীর জন্য ভেবে মরে যাচ্ছিলি। আর এখন শিউলীকে নিয়ে বাজে নোংরা কথা বলছিস, ছোটলোক ইতর।'

রশীদ ত্রিদিবেশের দিকে এগিয়ে যায়, 'নোংরা কথা আবার কী বললাম। শিউলীর এখন যা বয়স, তাতে ওর অনেক কিছু মনে হতে পারে। ওর এখন বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, তুই তো ছেলেমানুষ।'

ত্রিদিবেশ কোনো জবাব না দিয়ে সার্কুলার রোডের দিকে হাঁটতে থাকে। রশীদ হাত দুয়েক পিছনে পিছনে চলে। ত্রিদিবেশ মোটেই শান্ত না, ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা, রশীদের জবাবে অনেক কথা তোলপাড় করতে থাকে এবং ভাবে, কাল এবং পরশু, রাত্রে রশীদ সমস্ত ঘটনা শুনে এ ধরনের কথা বলে নি। ত্রিদিবেশ অপমান

বোধ করে, কারণ রশীদ শিউলীর সম্পর্কে অপমানসূচক কথা বলছে বলে ওর মনে হয়। ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে বলে ওঠে, হ্যাঁ, আমি ছেলেমানুষ, আমি মুর্খ তবু আমি শিউলীকে বিয়ে করবো দেখিস। তবু তোর মতো নিজের বাপের বিবিকে খারাপ কিছু করবার কথা ভাবি না, বুঝেছিস?'

রশীদের দাঁত আবার ঝকঝকিয়ে ওঠে, বলে, 'আমি কি খারাপ করবার কথা কিছু ভেবেছি?'

'কাল রাতে কী বলছিলি? তুই বলিস নি, তোর যে মাসীকে তোর বাপ আবার বিয়ে করেছে, তার সঙ্গে তোর বিয়ে হলেই ঠিক হতো?' ত্রিদিবেশ রুখে দাঁড়িয়ে বলে।

রশীদ হাসতে হাসতেই বলে, 'সে তো মাসীর বয়সের জন্য বলেছি। ওর বয়স মাত্র চৌদ্দ, বাবার বয়স পঞ্চাশ।'

ত্রিদিবেশ কোনো কথা না বলে মাথা ফিরিয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে, রশীদ পিছনে পিছনে চলে। চাঁদনীর রেস্টুরেন্টে টানা দু' দিন দু' রাত ধরে ত্রিদিবেশ আর রশীদ কেবল নিজেদের দুঃখের কথা বলেছে। রশীদের ঘর ছাড়ার কারণ মাহমুদ সাহেবের আবার বিয়ে করা। ত্রিদিবেশ জানতো না, কারোর মুখে শোনেও নি মাহমুদ সাহেব আবার শাদী করেছেন। শহরের কেউই বোধ হয় জানে না। রশীদই বলেছে, সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে একেবারে হঠাৎ এবং চুপচাপ। মাহমুদ সাহেবের শ্বশুর-বাড়ি চুঁচুড়ায়। তিনি কলকাতায় যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন, ফিরেছিলেন রশীদের ফুফা অর্থাৎ পিসির মেয়ে কোহিনুরকে নিয়ে। একেবারে বিয়ের পাট মিটিয়ে এবং রশীদের মাকেই তাঁর বোনকে বরণ করে ঘরে তুলতে হয়েছিল। রশীদ ওর মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান, ওরা সাত ভাই বোন। রশীদ ভেবেছিল ওর মা কান্নাকাটি করবেন, মাথা খুঁড়বেন। ওর মা সে রকম কিছুই করেন নি, কেবল নাকি মাহমুদ সাহেবকে বলেছিলেন, 'এটা তো আপনি আমাকে আগে বললেই পারতেন।' মাহমুদ সাহেব হেসে বলেছিলেন, 'তোমার একটা কাজের লোক নিয়ে এলাম, ভাবলাম, একটু চমকে দেব।' নিতান্তই ছলনা কাজের লোকের কথাটা। মাহমুদ সাহেবের বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই। তিনি শহরের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি। তাঁর গৃহে নোকর খিদমদগারের ছড়াছড়ি। রশীদের ভাষায়, মাহমুদ সাহেব তার বিবির থেকে অনেক বেশি বোকা। বুড়োটা নিজের মতলবের কথা ঢাকতে গিয়ে চালাকের মতো কথাও বলতে পারে না। মা হেসে বলেছিল, 'আমার কাজের লোক নিয়ে এলেন? সাহেব এতো বাজে কথাও বলতে পারেন। তার চেয়ে বলুন, আপনার ছেলেমেয়েদের একটা খেলার সঙ্গী নিয়ে এলেন! আমার কাজের লোকের অভাব তো আপনি রাখেন নি।' রশীদের মায়ের মুখে সে কথা শোনার পরেই মাহমুদ সাহেবের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, বলেছিলেন, 'যেভাবেই নাও, বাড়িতে একজন লোক বাড়লো, তাকে নিয়ে সবাই মিলেজুলে থাকো।'

রশীদ প্রথম থেকেই ব্যাপারটাকে ভালো ভাবে নেয় নি, যদিচ ধর্ম বা সামাজিক দিক থেকে মাহমুদ সাহেব অন্যায় কিছু করেন নি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার আকস্মিকতাই ওকে বিমূঢ় করে তুলেছিল। ও আশা করেছিল ওর মা ওর কাছে দুঃখ করবেন, কাঁদবেন। তিনি তা কিছুই করেন নি, কেবল বিষণ্ণ গম্ভীর আর সকলের সামনে যেন কেমন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলেন। রশীদ ওর বাবার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনিতেই ওর বাবার সঙ্গে ব্যবসা দেখা-শোনা নিয়ে মতান্তর চলছিল। ব্যবসা দেখাশোনা ও কখনো করতে চায় নি। ওর লক্ষ ছিল সামরিক বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং— ইউরোপে গিয়ে কিছু শেখা। বিশেষ কোনো উচ্চ পদাধিকারের প্রতি ওর আকাঙ্ক্ষা মাহমুদ সাহেব যে কখনোই পছন্দ করতেন না। ধনী ব্যবসায়িক পরিবারের ছেলে হয়েও রশীদের মনে কেন এরকম একটা আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল বোঝা যায় না। একেবারে বোঝা যায় না তা ঠিক না। এমন কথাও বলেছে, মুসলমানকে এ দেশে সম্মান পেতে হলে ব্যবসা করলে চলবে না, কোনো বিগ্ পোস্টে বসতে হবে।

রশীদ ওর বাবার সঙ্গে এমনিতেও বেশি কথা কখনোই বলতো না। কোহিনুরকে বিয়ের পর ও দৃঢ়ভাবেই মাহমুদ সাহেবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যে-ভঙ্গিতে স্পষ্টতই ছিল বাধ্যতার অভাব। কোহিনুর যখন কথা বলতে এসেছিল, শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয় নি, বলেছিল, 'বাড়ির বাঁদীর সঙ্গে আমি কথা বলি না। মাহমুদ সাহেব বলেছেন, তিনি আমার মায়ের একজন বাঁদীকে এনেছেন।' অতঃপর, স্বাভাবিক-ভাবেই, পিতাপুত্রে মুখোমুখি হয়েছিল, এবং মাহমুদ সাহেব একটি কথাই বলেছিলেন, 'কমবখ্ত। অভি ঘরসে নিকাল যাও।' অতএব রশীদ এখন গৃহত্যাগী। এ কথা ঠিক, রশীদ হেসে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'কোহিনুরের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। মাহমুদ সাহেব তো বুড়ো হয়ে গেছে।'

ত্রিদিবেশ একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল, বাবার সম্পর্কে ছেলের মুখ
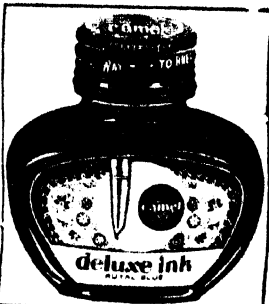
থেকে এরকম কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, ভালো লাগে না।'

ত্রিদিবেশ।' রশীদ পিছন থেকে ডাকে।

ত্রিদিবেশ কোনো জবাব দেয় না, হাঁটতে থাকে এবং এখন ও সোজা বাজারে ওর এক মাসীমার বাড়ি যাবার কথা ভাবে। রশীদ এগিয়ে ত্রিদিবেশের পাশে আসে, আবার ডাকে, 'এই ত্রিদিবেশ।'

ত্রিদিবেশ নিশ্চুপ, সার্কুলার রোডের মুখে এসে পড়ে। রশীদ ওর হাত টেনে ধরে। ত্রিদিবেশ ঝটকা দিয়ে মুক্ত হতে চায়। রশীদ ছাড়ে না। ত্রিদিবেশ তথাপি জোর করে, ফলে দুজনের মধ্যে রাস্তার ওপর একটা ধস্তাধস্তি লেগে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত ত্রিদিবেশ রশীদের গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। ওদের খেয়াল নেই ইতিমধ্যেই ওদের আশপাশে কয়েকজনের ভিড়। রশীদ হেসে বলে, 'শালা।'

ত্রিদিবেশ চলে যেতে উদ্যত হয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভিড়ের দর্শকরা হতাশ হয়, কারণ অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রশীদের হাসি তারা আশা করে নি, প্রত্যাঘাতে ঘটনার নাটকীয়তার উত্তেজনা বাড়বে, এই প্রত্যাশা ছিল। এ সময়েই একটি আপ-এর ধাবমান ট্রাম দেখে রশীদ ঝটিতি ত্রিদিবেশের হাত টেনে ধরে ছোটে, বলে, 'ওঠ্, উঠে পড়।'

ঘটনার আকস্মিকতায়, কিছু বুঝে ওঠার আগেই, ত্রিদিবেশকে লাফিয়ে ট্রামে উঠতে হয়, কারণ ধাবমান ট্রামের দরজায় রশীদের হাত তখন ওর হাত চেপে ধরা। না উঠে পড়লে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। রশীদ বলে, 'আমি কখনো শিউলীকে খারাপ বলতে পারি?'

ত্রিদিবেশ রশীদের মুখের দিকে তাকায়, চোখে সন্দেহ, অনুসন্ধিৎসা। বলে, 'তবে ওইসব বাজে বাজে কথা বলছিলি কেন?'

রশীদ বলে 'বাজে বাজে বলিনি, লোকে যা বলতে পারে তাই বলেছি। কিন্তু সত্যি, তোর ভীষণ সাহস।' 'সাহস!' ত্রিদিবেশ যেন ক্রুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করে, কিন্তু তারপরেই ওর গলার স্বর নিচু আর রুক্ষ শোনায়, রশীদ ত্রিদিবেশের হাত চেপে ধরে। ত্রিদিবেশ দরজার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রশীদ বলে, 'আসলে তোকে আমার হিংসে হচ্ছে। শালা তোর গোড়ে সালাম। শিউলী তো আমার বন্ধুর বউ।'

ত্রিদিবেশ আবার রশীদের দিকে তাকায়। রশীদ বলে, 'তোদের জন্য, আমার জান কবুল।'

রশীদের মুঠির মধ্যে ত্রিদিবেশের হাত শক্ত হয়ে ওঠে। আবার বলে, 'তবে ওই চীনেম্যানের ব্যাপারে আমার খুব রাগ হয়েছিল। চিয়াং কাইশেক খারাপ লোক। কিন্তু শিউলীর কথাই আমাদের ভাবতে হবে। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। তুই যখন ভয় পাসনি, আমিও ভয় পাই না।'

'আমি ভয় পাচ্ছি।' ত্রিদিবেশ বলে, 'ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমি জানি না, শিউলীর কী অবস্থা, কেমন আছে। আমি—।'

ত্রিদিবেশ চুপ করে যায়, ওর মুখে আতঙ্কের ছায়া। ট্রাম মৌলালি থেকে ধর্মতলার দিকে মোড় নেয়, কণ্ডাকটর এগিয়ে আসে, 'টিকেট!'

রশীদ পকেটে হাত দিয়ে বলে, 'পার্ক সার্কাস—।'

'পার্ক সার্কাস? এটা এসপ্লানেডের ট্রাম।' কণ্ডাকটর বিরক্ত স্বরে বলে।

রশীদ চমকে ওঠে, 'ওহ্ তাই নাকি? চলে আয় ত্রিদিবেশ।'

বলেই ত্রিদিবেশকে নিয়ে, ধীরগতি ট্রাম থেকে নেমে পড়ে। ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'পার্ক সার্কাস যাবি কেন? অন্য জায়গায় যাবি বলেছিলি তো, জোড়াবাগান না কোথায়?'

রশীদ হেসে বলে, 'জোড়াবাগান ছাড়া বুঝি বাগান নেই?' আমরা যাবো ধুকড়িবাগান।'

'সেটা কোথায়?'

'চল্ না, গেলেই দেখতে পাবি। এ পর্যন্ত বিনা পয়সায় আসা গেল। এবার হাঁটবো। বেশি দূরে না, কর্পোরেশন স্ট্রিট দিয়ে যাবো।' রশীদ হাসতে হাসতে বলে।

ত্রিদিবেশ এতক্ষণে বুঝতে পারে কণ্ডাক্টরকে পার্ক সার্কাস বলার কারণ টিকেট না কাটা। দক্ষিণে এগিয়ে ডাইনে কর্পোরেশন স্ট্রিট ধরে দুজন হাঁটে। ওয়েলেসলির মোড় পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে রশীদ ত্রিদিবেশকে নিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢোকে। রানী রাসমণির বাড়ির আগেই সরু গলিটা। খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে যে বাড়ির মধ্যে রশীদ ঢোকে তার পাশের একটা গলিতে দশ বারোটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তারা কেউ বিড়ি টানে, গান করে এবং একজন একটি পুরুষের ধুতির কোঁচা টেনে ধরে খিলখিল করে হাসে। রশীদ ত্রিদিবেশকে টেনে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বাঁ দিকে টিনের আড়ালের বাইরে শানের ওপর একটি নগ্ন মেয়েকে বসে থাকতে দেখে। ত্রিদিবেশ অবাক হয়ে এবং খানিকটা বিচলিতভাবে মুখ ফেরাবার আগেই নাক চ্যাপটা ছোট-চোখ মেয়েটি যেন লজ্জা পেয়ে হাসে এবং টিনের বেড়ার আড়ালে চলে যায়।

ত্রিদিবেশ রশীদের দিকে তাকায়। রশীদ ডানদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে ত্রিদিবেশকে টেনে নিয়ে ওঠে, বলে, 'শালা নরক।'

ক্রমশ

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলেও পিতা ডঃ আমেদ হোসেনের কড়া শাসনে তা সম্ভব হয় নি। ডঃ হোসেন বলতেন, কামাল, তুমি রাজনীতি কর আমার আপত্তি নেই। আগে পড়াশুনো শেষ কর। তারপর তোমার কোন কাজে আমি বাধা দেব না। বরং পিতার সব সাহায্য পাবে। ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। শের-এ বাংলা ফজলুল হক শহীদ সুরাবর্দি, তরুণ শেখ মুজিব ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের তোড়জোড় করছেন। সে বছর ডকটর কামাল ঢাকা থেকে ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছেন, ফল বের হওয়ার আগেই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি অক্সফোরড থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। তারপর ১৯৫৯ সালে ব্যারিসটার হয়ে সোজা ঢাকা ফেরে।

মাত্র কয়েক দিন আগে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বিতলের কোণার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডকটর কামাল হোসেনের সঙ্গে। ডকটর হোসেন এই উপমহাদেশের নবজাত রাষ্ট্রের বয়সের দিক থেকে সর্ব কনিষ্ঠ বিদেশ মন্ত্রী। তরুণ হলেও তিনি তরুণ তুর্কী নন। ধীর, স্থির, শান্ত। অথচ তেজী।

আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথার মধ্যে বললেন, এই কলকাতা শহরেই তাঁর জন্ম। ১৯৩৭ সালে এপরিল মাসে। ছেলেবেলা কেটেছে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে।

আইনের ছাত্র কামাল আজ উপমহাদেশের একটি নাম। মুজিব মন্ত্রিসভায় প্রথমে আসেন আইন ও সংসদীয় দফতরের ভার নিয়ে। বাংলাদেশের গণপরিষদ ৩৫ জন সদস্যের সংবিধান রচনার এক কমিটি নিয়োগ করেন। কামাল ছিলেন তার চেয়ারম্যান। ২৫ বছরে পাকিস্তানে যা সম্ভব হয়নি, ১৮০ দিনের মধ্যে তা সম্ভব করলেন কামালের নেতৃত্ব। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করলেন।

সংবিধানের চারটি আদর্শ—(এক) গণতন্ত্র, (দুই) সমাজতন্ত্র, (তিন) জাতীয়তাবাদ ও (চার) ধর্মনিরপেক্ষতা।

ডকটর কামাল হোসেনের ভাষায়—এ দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানের আদর্শ করা কঠিন কাজ। ২৫ বছর এবং তার আগে মুসলিম রাজনীতি ছিল সাম্প্রদায়িকতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে। ১৯৬৯ সালে আওয়ামি লীগের নির্বাচন ইসতাহার তৈরির কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন ডকটর হোসেন। ইয়াহিয়ার জঙ্গী জমানায় আওয়ামি লীগ ইসতাহারে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে আওয়ামি লীগ শতকরা ৯৯টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন। কামাল কিন্তু সেবার নির্বাচনে প্রার্থী হন নি। পরে অবশ্য শেখ সাহেবের ছেড়ে দেওয়া একটি আসন থেকে উপনির্বাচনে জিতেছিলেন।

ডক্টর হোসেন বলেন, পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী —হিন্দু মুসলমান পৃথক করে দেখানোর কত চেষ্টাই না হয়েছে। ইসলামের নাম করে পশ্চিমীরা এ দেশে শাসন চালাতেন। কিন্তু তাঁদের সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এখন এ দেশে মুষ্টিমেয় কিছু লোক গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে নানা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। এদের মদত দিচ্ছেন সেই সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা অস্ত্রের ব্যবসা করেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এই সব শক্তির নাম করবেন? একটু হেসে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী জবাব দিলেন, আপনি জানেন, আমিও জানি। নাম করে তিক্ততা বাড়াতে চাই না।

প্রশ্ন করলাম, আপনাদের দেশের কোন কোন বামপন্থী দলও আজ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিচ্ছেন। এবার ডকটর হোসেন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বামপন্থী বলতে আপনারা যে শক্তি বোঝেন, এ দেশে তার অভাব আছে। এখানে বাম আর দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলের মধ্যে কোন তফাত খুঁজে পাবেন না। বাংলাদেশে মুসলিম বাংলা আন্দোলন সম্পর্কে ডকটর হোসেন বলেন,

ডঃ কামাল হোসেন

দেশের জনগণ থেকে পরিত্যক্ত এক শ্রেণীর উগ্র সাম্প্রদায়িক লোক চেষ্টা করছেন মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একটা কিছু গোলযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এরা কোন সমর্থন পাচ্ছেন না।' ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে ডকটর হোসেনের অনুরোধ, মুসলিম বাংলা নিয়ে 'আপনারা হইচই করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশের জনগণের সমর্থন ছাড়া কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না।'

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পুনরুল্লেখ করে বিদেশ মন্ত্রী জানালেন, এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আমরা পরস্পর দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। দেওয়া-নেওয়া বড় প্রশ্ন নয়। আপনার দেশের বীর জওয়ানরা আমার দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রক্ত দিয়েছেন। ১২০০০ হাজার জওয়ান শহীদ হয়েছেন। এ সব তো ইতিহাসের কথা। দুষ্টচক্রীরা চেষ্টা করবে, তাতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? বাস্তব পরিস্থিতিকে মনে রেখে সাহসের সঙ্গে এগোতে হবে। আপনার আমার উভয় দেশে দারিদ্র্য আছে। আছে ক্ষুধা। যদি আমরা এই সব অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারি তবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাদের বন্ধু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আপনা থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। নির্বাচনের সময় মাত্র চার মাস আগে এই সব শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয়, এ দেশের লোক এই সব শক্তিকে সমর্থন করে না।

পররাষ্ট্র নীতির প্রসঙ্গে ডকটর হোসেন বললেন, দ্বিপাক্ষিকতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের লক্ষ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র-গুলির সঙ্গে 'কনফ্রনটেশন' নীতির পরিবর্তে আমরা শান্তির সীমানা চাই। এই নীতি কায়েম হলে আমাদের আভ্যন্তরীণ বহু সমস্যার সমাধান হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি।

ডকটর হোসেন—সরদারজী একজন বিরাট ব্যক্তি। রাজনীতিতে প্রবীণ এবং প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর সঙ্গে বহু আলোচনা হয়েছে, কখনও আমাদের মধ্যে মতের অমিল হয়নি। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিদেশ বিভাগের ভার নেওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রথমে দিল্লি যাই। এবং সরদারজীর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা দুজনে ১৭ এপ্রিল যৌথ ঘোষণা করি। এই ঘোষণায় উপমহাদেশের মানবিক সমস্যাগুলি সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করছি। পরস্পরকে আরও কাছ থেকে জেনেছি। ডকটর হোসেন বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের এবং নেতা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য সরদারজী সারা পৃথিবীতে ঘুরে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে বাংলাদেশের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে দাঁড়িয়ে সরদারজী একাধিকবার বাংলার মানুষের বক্তব্য বলিষ্ঠ-ভাবে বলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যৌথ উদ্যোগে অনেক ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। সরদারজীকে বাংলার জনসাধারণ, এমন কি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরম আত্মীয় বলে মনে করি।

ডকটর হোসেন এই প্রসঙ্গে আরও বললেন, 'দেখুন, আপনাদের ম্যান-পাওয়ার এবং বিশেষজ্ঞরা এক একটি যেন স্তম্ভ। আপনাদের পররাষ্ট্র বিভাগের বহু অফিসারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এদের মেধা ও পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ।

ডকটর হোসেন বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য অনেকে হয়তো ভাল চোখে দেখেন না। তাতে অবশ্য ভারতের কিছু আসে যায় না। ভারতের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত তার লক্ষপথে এগিয়ে যাবে। শান্তির চেষ্টায় ভারত সব সময় বাংলাদেশকে পাশে পাবে।

ডকটর হোসেনকে চীন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্নটি ছিল, চীন

আপনাদের কবে নাগাদ স্বীকৃতি দেবেন। —চীন কবে আমাদের স্বীকৃতি দেবেন তা বলতে পারব না। তবে বিভিন্ন সূত্রে যে সব খবর আসছে তাতে দেখা যায়, পিকিং এশিয়ায় তার নীতির [illegible] অনুসরণ করছেন। কোন দেশের [illegible] সম্পর্ক কি হবে তা পর্যালোচনা করে দেখছেন। স্বীকৃতি না দিলে আমাদের কিছুই করার নেই। তবে ইতিমধ্যে শতাধিক রাষ্ট্র আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। বহু দেশের সঙ্গে আমরা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে দূতাবাস খুলেছি। আরও কয়েকটি দেশে দূতাবাস খোলার ইচ্ছা আছে।

কামাল হোসেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বিদেশ মন্ত্রী কিনা তা তিনি নিজেও জানেন না। তবে তিনি যতদূর জানেন দক্ষিণ ইয়েমন, বুলগারিয়া ও অ্যালজিরিয়ার বিদেশ মন্ত্রীরাও বয়সে তরুণ। তিনজনেরই বয়স চল্লিশের নিচে। আলজিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল আজিজের বয়স ৩৫। কামালের বয়স ৩৬।

কলকাতার বিশেষ গুণের কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি বছরে একাধিকবার কলকাতায় এসেছেন। ১৯৫১ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। যদিও বরিশলের সায়েস্তাবাদের মানুষ। পিতা ডাঃ হোসেন শহীদ সুরাবর্দি সাহেবের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। সেই সূত্রে কলকাতায় তাঁদের পরিবারের বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। কলকাতার কয়েকজন নামী চিকিৎসক ছিলেন কামালের পিতৃবন্ধু।

কামালের খুব ইচ্ছা কলকাতায় এসে কয়েক দিন থাকেন। পুরানো সহপাঠীদের সঙ্গে একটু হইচই করেন। কিন্তু কাজের চাপ এবং প্রোটকল সব মিলিয়ে তা সম্ভব হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলাম, কলকাতা শহরের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নজরে পড়েছে কিনা। এবার ডকটর হোসেনের জবাব, 'কলকাতা' 'কলকাতা'। পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরেছি। বহু শহর দেখেছি। কিন্তু কলকাতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯৬৫ সালে দিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাতায়াতের পথে কামাল কলকাতায় আসেন। সাত বছর পর ১৯৭২ সালে এসেছিলেন। '৬৫ সালে দিল্লি সম্মেলনে ভারতের পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব শ্রী পি এন ধর, ও হ্যানয়ে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীশিশির গুপ্ত। সম্প্রতি হ্যানয় সফরকালে শ্রীগুপ্তের সঙ্গে কামালের দেখা হওয়ায় কামাল খুশী।

শেহেরা (৬), জিনাথ (৪ই)—দু কন্যার জনক কামাল। ছোট পরিবার। শ্রীমতী হামিদা কামাল সিন্ধু প্রদেশের। সংগ্রামে সব সময় কামালের পাশেই থাকেন। স্বামীর খাওয়ার রান্না নিজেই করেন। পাকিস্তানের আমলে 'ফোরাম' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করতেন।

আইন ব্যবসায় কামাল পাকিস্তানের প্রথম সারির একজন ছিলেন। ঢাকা করাচি [illegible] সর্বত্র সুনাম। করাচির [illegible] সঙ্গে পরিচয়। তারপর '৬৫ সালে [illegible] সংযোগ। ডকটর হোসেন [illegible] ছিল যে আইন ব্যবসা শুরু করেননি। ১৯৬[illegible] সালে ঢাকার দৈনিক [illegible], '৬৯ সালে আয়ুবশাহীর [illegible] আগরতলা মামলায় কামালের প্রচুর নাম হয়।

শহীদ সুরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে একাধিক মামলায় তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৎকালীন পাকিস্তানে তাঁকে অনেক খ্যাতির সম্মান পৌঁছে দিয়েছে। তবে এই সময় তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। আওয়ামি লীগের সঙ্গে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এক সময় আওয়ামি লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হলে কামাল জেলের ভেতরে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এবং মামলা পরিচালনা করে সাফল্য লাভ করেন।

ডকটর হোসেন জানালেন, ১৯৭১ সালে ৪ এপ্রিল অর্থাৎ ২৫ মার্চের ৯ দিন পর তাঁকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা গ্রেফতার করে। এক দিন পর বিমানে করাচি নিয়ে যায়। সেখান থেকে হরিপুর কেন্দ্রীয় জেলে। জেলেই সংবাদ পান শেখ সাহেবও পশ্চিম পাকিস্তানে কোথাও আটক আছেন। স্ত্রী হামিদা কামাল এপ্রিল মাসের শেষ দিকে করাচি হয়ে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই সময় পাক কর্তৃপক্ষ তাঁর পাশপোর্ট কেড়ে নেন। এবং করাচিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখেন। '৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর তাঁকে পিন্ডির কাছে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে শেখ সাহেবকেও সেখানে আনা হয়েছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বিশেষ বিমানে ওঁদের লনডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বিমান ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে স্ত্রী হামিদা এবং কন্যাদের বিমানে তুলে দেওয়ার আগে তিনি জানতে পারেন নি ওঁরা কোথায় ছিলেন।

প্রায় একশ' বিশ মিনিট ধরে নানা কথা বলে যখন বেরিয়ে আসছি, করমর্দন করে ডকটর হোসেন একটি অনুরোধ করলেন, উভয় দেশের সম্পর্ক যাতে শক্তিশালী হয় সেজন্য যেন আমরা চেষ্টা করি। তিনি এ কথাও বললেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের, বিশেষ করে কলকাতার সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এবার এই সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য তাঁদের দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে কলম ধরতে হবে।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

‘শ্রেষ্ঠ ছাত্র’ মেডেল পেয়েছে সুজাতা: ‘হরলিক্‌স’ তাকে সববিষয়ে চালাক ও চটপটে ক’রে রাখে।

রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে—স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

সুজাতা সব সময়েই চালাক আর চটপটে। আর সেটা বজায় রাখতে ওর মা রোজ ওকে খেতে দেন হরলিক্‌স, যা খেলে শরীরে বল হয়, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে আর আসে বাড়তি শক্তি।

সুচিত্রা দেবী আর দুনিয়ার অন্য সব মায়েদের মত আপনিও আপনার পরিবারের সকলকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে হরলিক্‌সের ওপর বিশ্বাস রাখুন। প্রায় ১০০ বছর ধরে ডাক্তাররাও এটি খেতে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

‘হরলিক্‌স’—
পুষ্টি যোগাতে
অতুলনীয়

“সারা পরিবারের জন্যে ‘হরলিক্‌স’ হল পুষ্টির মূল উৎস। পুষ্টিকর প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস্, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের এটি এক অপূর্ব মিশ্রণ—যা স্বাস্থ্য ভাল রাখতে খুবই সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে। তাছাড়া, হরলিক্‌স হজম করাও খুব সহজ। আমার পরিচিত সুস্থসবল পরিবারের সকলে রোজ হরলিক্‌স খান।”

হরলিক্‌স
রেজিষ্টার্ড
ট্রেডমার্ক

HL 5595 A-B-B
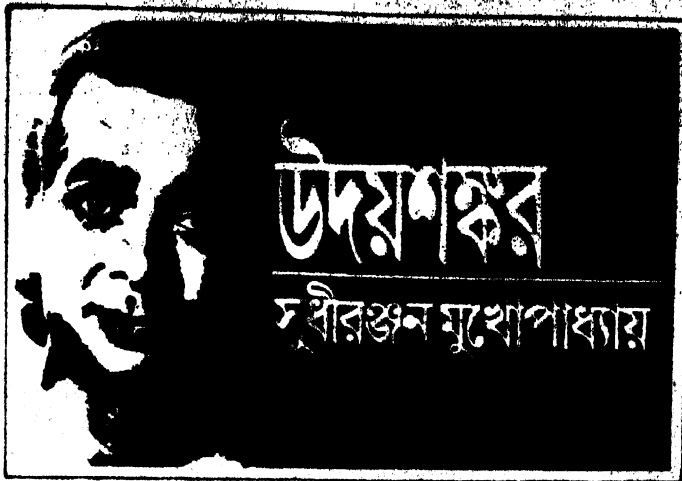
॥ চৌত্রিশ ॥

উদয়শঙ্কর একদিন সিমকীকে বলল, "প্যারিসে আমরা যা হোক কিছু করতে পেরেছি, এবার ফ্রান্সের বাইরে কোথাও যেতে পারলে বোধ হয় ভাল হত—"

সিমকী জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যেতে চাও?"

"ধর, সুইজারল্যাণ্ডে। দেশটা যেন টুরিস্টদের জন্যেই তৈরী। সব ঋতুতেই সারা পৃথিবী থেকে লোক যায় সেখানে। আমাদের নাচ দেখতেও নানা দেশের লোক মনে হয় আসবে।"

সিমকী নিঃসন্দেহ হয়ে বলল, "নিশ্চয়ই আসবে।"

একদিন উদয়শঙ্কর আর সিমকী প্যারিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ওরা প্রথমেই এল তুষারমণ্ডিত সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে। শীত ঋতু তখন বলে যাই-যাই!

কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের কঠিন শীতের বিদায়কালীন মূর্তি বড় ভয়ংকর। ঠাণ্ডার প্রকোপ যদিও কমে এসেছে তবুও যেন হিমের প্রকাণ্ড একটা পাহাড় ভেঙে চুরে খান-খান হয়ে যাচ্ছে। ধারালো হাওয়ার ঝাপটায় ছুটোছুটি করে চলেছে হালকা তুলোর মতন অজস্র তুষারকণা।

যেদিকে তাকায় সিমকী আর উদয়শঙ্কর শুধু তুষার আর তুষার। শেষ তুষারের। মাটি তুষারে। এক-একটি ঋজু পাইন গাছ তুষারে-তুষারে যেন শুচিশুভ্র হয়ে উঠছে। পাইনের পাতায়-পাতায় হাওয়ায় বেজে ওঠে ঐকতান আর এক পশলা ক্ষণিক বৃষ্টির মতন ঝরঝর করে ঝরে পড়ে তুষার।

এক সুইস পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে উঠেছে সিমকী আর উদয়শঙ্কর। যদিও তুষারপাত এদের কারুর কাছেই নতুন নয় তবুও বাইরে তাকিয়ে উদয়শঙ্কর যেন একটা গভীরতর উপলব্ধির ভিতরে নিমগ্ন হয়ে যায়।

তার মনে পড়ে যায় প্যারিসের এক রাতের কথা। আর্থিক সঙ্কটে সে তখন বড় বিব্রত। সিমকী, মিসেস এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে তার সবে আলাপ হয়েছে। অ্যানা পাভলোভার সঙ্গে যখন আমেরিকা সফরে গিয়েছিল উদয়শঙ্কর তখন বস্টন শহরে তার সঙ্গে আলাপ হয় আনন্দ কুমারস্বামীর। তিনি তাকে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

সেদিন আনন্দ কুমারস্বামী একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন উদয়শঙ্করকে। তাঁর

রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও মিসেল দ্য ম্যুর

নিজেরই লেখা। নাম, মিরর অব জেশ্চার। অভিনয় দর্পণের ইংরেজী অনুবাদ। প্যারিসে এক রাতে হঠাৎ বইটি টেনে বের করে দেখতে থাকে উদয়শঙ্কর।

ঐ বই-এ নটরাজের একটি ছবি ছিল। উদয়শঙ্কর বহুক্ষণ ধরে দেখেছিল সেই ছবি। দেখতে দেখতে সে বিমোহিতের মতন হয়ে গিয়েছিল। কোন ধর্মীয় ভাব নয়, তার মনের মধ্যে অদ্ভুত এক প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। উদয়শঙ্করের মনে হয়েছিল নটরাজের এই মূর্তি থেকে যেন অনেক নতুন ভঙ্গি আবিষ্কার করা যায়। এবং একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সে প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে নৃত্য করেছিল সকলের অলক্ষ্যে, একা-একা।

অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা আবছায়া এক রহস্যময়ী নারীর মতন যে-কোন ঋতুতে দেশ-দেশান্তরের হাজার হাজার ভ্রমণ-বিলাসীকে দু বাহু মেলে আমন্ত্রণ জানায় নিসর্গের সৌন্দর্যলোক সুইজারল্যাণ্ড। তাই সর্বত্র আছে কাফে, পান্থশালা এবং আমোদ-প্রমোদের নানা আয়োজন।

উদয়শঙ্কর ও সিমকীর নৃত্যের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান হবে বার্ন শহরের স্টেট থিয়েটারে সকাল সাড়ে আটটায়। দিনটা ছিল রবিবার। এদিনেই বার্নে সাধারণত এইরকম প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। রবিবার সকালে ইউরোপের বেশির ভাগ মানুষের উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট। গির্জা থেকে ফেরবার পথে লোকে সুবিধামতন ঢুকে পড়ে রঙ্গালয়ে।

এ তথ্য জানা থাকলেও প্রথমে খুব দমে গিয়েছিল উদয়শঙ্কর। সাতসকালে কে আর আসবে নাচ দেখতে! হয়তো একটি দর্শকও আসবে না, রঙ্গালয় থাকবে একেবারে শূন্য। অনুষ্ঠানের সময় যতই এগিয়ে আসে ততই বিমর্ষ হয়ে পড়ে উদয়শঙ্কর। ভয়ে-ভয়ে বারবার সে উঁকি মেরে বাইরে তাকায়। হায়, সব আসনই যে শূন্য।

কিন্তু আস্তে আস্তে দর্শক আসতে লাগল একটি-দুটি করে এবং সাড়ে আটটা বাজবার আগে-আগে রঙ্গালয় পূর্ণ হয়ে গেল কানায়-কানায়। একটি আসনও আর খালি থাকল না। যবনিকা উঠল যথাসময়।

এর মধ্যে উদয়শঙ্করের তালিকা কিছু নতুন নৃত্য সংযোজিত হয়ে আরও দীর্ঘ হয়েছে। সিমকী শিখেছে নতুন এক একক নৃত্য। নাম, পূজা। গভীর মনোযোগ সহকারে উদয়শঙ্করের মুখে সে যেমন শুনেছে। শিব-পার্বতীর দীর্ঘ উপাখ্যান, শুনেছে—যে ছিল সতী, সেই উমা, সেই গৌরী, সেই পার্বতী—তেমন করেই শুনল হিন্দু নারীর পূজোর কাহিনী। শুনল এবং অনুভব করল তার প্রতি রোমকূপ দিয়ে।

এই রকম সূক্ষ্ম অনুভূতি যার তেমন ভক্ত-শিল্পীর দেখা পাওয়া যে-কোন রস-স্রষ্টার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। রাজপুত বধূ নৃত্যও সিমকী শিখে নিল। আরও দু-একটি যুগ্ম নৃত্যও সংযোজিত হয়েছে। কোন বিশেষ প্রদেশের নৃত্য নয়, মুদ্রা ও ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ উদয়শঙ্করের কল্পনা-প্রসূত হলেও নর্তক ও নর্তকী—দুজনের পোশাকই রাজস্থানের। বার্ন শহরের স্টেট থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্য অনুষ্ঠান-সূচীতে থাকল, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, কৃষ্ণ, পূজা, রাজপুত বধূ, রাধাকৃষ্ণ, কিছু একক ও যুগ্ম লোকনৃত্য এবং শিব-পার্বতী।

এই ধরনের নৃত্য, ঐকতানের এমন মিষ্টি সুর, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতন এক-একটি দৃশ্যপট এবং নর্তক-নর্তকীর সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গি দর্শক-সাধারণের চোখে ফুটিয়ে তুলল মুগ্ধ বিস্ময়। এক-এক নাচের পর যখন যবনিকা নামে তখন রঙ্গালয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত দর্শকদের করতালির প্রচণ্ড আওয়াজ।

কিন্তু সব শেষে বড় মজার এক কাণ্ড ঘটে গেল। উদয়শঙ্করের নাচ শেষ। শেষ যবনিকা নামবার আগে সিমকী আর উদয়শঙ্কর অভিবাদন জানাচ্ছে দর্শকদের, আর মুহুর্মুহু করতালির আওয়াজ উঠছে—এমন সময় পিছন থেকে মঞ্চের ওপর উঠে এল এক ভারতীয় ভদ্রলোক।

উঠে দর্শকদের উদ্দেশ করে বলল, "আমি একটা ভারতীয় ছবি তৈরি করেছি। আপনারা সকলে দয়া করে দেখতে আসবেন। ফিল্মের নাম, লাইট অব এশিয়া—বুদ্ধের জীবনকাহিনী।"

উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে ভাবল, কে এই ভদ্রলোক? বলা নেই, কওয়া নেই—হুপ করে তার স্টেজের ওপর উঠে নিজের প্রচার-কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় স্টেট থিয়েটারের ম্যানেজারের অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু তা নিজেও সৌজন্যের খাতিরে তাকে একবার জানান উচিত ছিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ম্যানেজারও চেনেন না ভদ্রলোককে। সে চোখ বড় বড় করে উদয়শঙ্করকে বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম উনিও আপনাদের দলের কেউ—"

"আমি ওকে চিনি না, কখনো দেখিনি" —উদয়শঙ্কর বেশ বিরক্ত হয়ে বলল।

যা হোক, ভদ্রলোক ভারতীয়—উদয়শঙ্কর ভাবল, বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা ভাল দেখায় না। ভদ্রলোকের স্ত্রীও ছিল সঙ্গে।

বার্ন থেকে জুরিক।

সেদিন যদি জুরিকে না আসত উদয়শঙ্কর, সোজা প্যারিসে ফিরে যেত তা হলে তার ভাগ্যচক্র হয়তো ঘুরে যেত অন্য দিকে এবং ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ না করে সে কোথায় গিয়ে পৌঁছত সে-সময়, তা-ও বলা কঠিন।

তবে উদয়শঙ্করের নিয়তি চিরদিনই তার প্রতি প্রসন্ন। হতাশা, ব্যর্থতা তার জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। নিয়তি তাকে দিয়েছে তার মনস্কামনা পূরণের সুবর্ণসুযোগ একাধিকবার। সে-ই তাকে দিয়েছে অপরিমেয় যশ। দিয়েছে বিপুল অর্থ। দিয়েছে বিশ্বের অসংখ্য নরনারীর অকুণ্ঠ ভালবাসা।

উদয়শঙ্করের অনুষ্ঠান হবে জুরিকের কুরশাল থিয়েটারে। এই রঙ্গালয়ের একটা বিশেষ আভিজাত্য আছে। কুরশালে বিচিত্র অনুষ্ঠান যেমন হয়, তেমন হয় ক্যাবারেও। তবে কুরশালের ক্যাবারে রুচিবান দর্শকদের জন্যেই। সুলভ রসিকতা এখানে চলে না। বেশ উচ্চ শ্রেণীর নৃত্যগীতই পরিবেশিত হয়।

এক রাতে কুরশালে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর জিনিসপত্র গোছগাছ করে সিমকী আর উদয়শঙ্কর বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরী, ঐকতান বাদকেরা বিদায় নিয়েছে—এমন সময় কুরশালের ম্যানেজার প্রবেশ করল সাজঘরে। বলল, "একজন মহিলা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান—"

উদয়শঙ্কর উৎসাহ প্রকাশ করে বলল, "কোথায় তিনি?"

"উনি একটু খাওয়া-দাওয়া করছেন। কয়েকজন সম্মানিত অতিথিও আছেন তাঁর সঙ্গে। আপনারা আসুন।"

সিমকী আর উদয়শঙ্কর মঞ্চের সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় এল।

ম্যানেজার ওদের নিয়ে একটা টেবিলের কাছে আসতেই এক মহিলা উদয়শঙ্করের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসলেন, করমর্দন করে বললেন, "আমার নাম অ্যালিস বোনার। আমি খুব দুঃখিত। তোমাদের শুধু শুধু কষ্ট দিলাম। তবে সব ক'টি নাচ আমার এত ভাল লেগেছে যে, তোমার সঙ্গে আলাপ না করে পারলাম না।"

উদয়শঙ্কর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীমতী বোনারের দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বলল, "আমার সৌভাগ্য। অনেক ধন্যবাদ।"

"বস বস, তোমাদের সময় আছে তো? কিছু খাও। কি খাবে?"

উদয়শঙ্কর আপত্তি করল না। প্রথম দর্শনেই শ্রীমতী বোনারকে তার মহীয়সী মহিলার মতন মনে হল। যে-ক'জন বন্ধু ছিল তাঁর সঙ্গে তাঁরাও রীতিমত সম্ভ্রান্ত। উদয়শঙ্কর আস্তে বলল, "কফি আর সঙ্গে সামান্য কিছু—"

খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। শ্রীমতী বোনার তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে উদয়শঙ্কর আর সিমকীর আলাপ করিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, "ভাগ্যিস আজ কুরশালে এসেছিলাম! জান, ভারতবর্ষের শিল্প আর ভাস্কর্য সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়াশুনো করেছি। আজ তোমাদের দেখে অনেক কিছুই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি নিজেও একজন ভাস্কর।"

উদয়শঙ্কর বলল, "আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল আপনি [illegible] কিংবা শিল্পী—এইরকম একটা কিছু হবেন—"

"কেন মনে হয়েছিল বল তো?" শ্রীমতী বোনার বিস্মিত দৃষ্টিতে উদয়শঙ্করের দিকে তাকিয়ে মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

"কেন, তা বলতে পারব না—" উদয়শঙ্কর আস্তে গরম কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "এক-একজন থাকেন যাঁকে দেখলে এইরকম একটা কিছু মনে হয়।"

"তোমার চেহারাও কিন্তু শিল্পীর মতনই।"

সিমকী এবার কথা বলল। সে শ্রীমতী বোনারকে জানিয়ে দিল উদয়শঙ্করের ছাত্রজীবনের ইতিহাস। বলল যে, সে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইনের অতি প্রিয় ছাত্র ছিল।

শুনে খুব খুশী হলেন শ্রীমতী বোনার। বললেন, "যাক, তোমার কাছ থেকে তোমাদের দেশের শিল্প আর ভাস্কর্যের অনেক তথ্য আমি জেনে নিতে পারব। আর ক'দিন আছ জ্যুরিকে?"

"ভাবছি মাসখানেক থাকব।"

"তা হলে প্রায়ই দেখা হবে। একদিন এস আমাদের বাড়িতে। লাঞ্চ, ডিনার—কি খাবে বল? কবে আসবে?"

উদয়শঙ্কর হাসল, "অনেক ধন্যবাদ। আপনিই বলুন না?"

শ্রীমতী বোনার একটু ভেবে বললেন, "পরশু দিন লাঞ্চ খেতে এস।"

উদয়শঙ্করের একটি মূর্তি নিজের হাতে গড়েছিলেন শ্রীমতী অ্যালিস বোনার। সেদিন উদয়শঙ্কর বুঝেছিল ভাস্কর্য শিল্পে তিনি প্রতিভাময়ী।

শ্রীমতী বোনার শুধু ভাস্করই নন, তিনি সব শাখার সব শিল্পীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে ইউরোপের অনেক যন্ত্রশিল্পী, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পেয়েছে। তাদের সংকটকালেও তিনি অকাতরে অর্থসাহায্য করেছেন।

অগাধ বিত্তশালিনী শ্রীমতী অ্যালিস বোনার। তাঁর বাবা সুইজারল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি। অ্যালিসের আরও দু বোন আছে। মিস্টার বোনারের বয়েস হয়েছে। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তাঁর তিন মেয়েকে সব দায়-দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। শিগগিরই মিস্টার বোনার প্যারিসে একটা বাড়ি নেবেন। মাঝে মাঝে সেখানে যাবেন অবসর যাপন করতে।

উদয়শঙ্কর জাত শিল্পী, শ্রীমতী বোনার ভাস্কর। একজন প্রাচ্যের আর একজন পাশ্চাত্ত্যের। একজন দীর্ঘকাল বসবাস করেছে ইউরোপে, আর একজনের প্রবল উৎসাহ ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি। সুতরাং দুই শিল্পীর ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি হল না। অনেক কথা হল, অনেক আলোচনা হল। উদয়শঙ্কর কয়েকবার গেল শ্রীমতী বোনারের উদ্যান সংলগ্ন প্রাসাদতুল্য ভবনে, তিনিও এলেন প্যারিসে।

কথায় কথায় শ্রীমতী বোনার শুনলেন উদয়শঙ্করের কাহিনী—তার শিল্পক্ষেত্র পরিবর্তনের ইতিহাস। শুনলেন তার সুখ দুঃখ সংগ্রাম আঘাত এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। সব শুনে তিনি বুঝতে পারলেন উদয়শঙ্করের ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার কথা। এবং আগে যেমন তিনি বহু শিল্পীকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ দিয়েছেন, উদয়শঙ্করের বেলায়ও হয়তো তেমন কিছু করবার কথা ভাবলেন।

একদিন শ্রীমতী বোনার উদয়শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, "শঙ্কর, এখন তুমি কি করতে চাও?"

উদয়শঙ্কর ইতস্তত না করে তার মনের ইচ্ছার কথা আবার প্রকাশ করল। বলল, "আপনি তো জানেন, আমি এখন ভারতবর্ষে ফিরতে চাই। সেখানে গিয়ে কিছু ভারতীয় যন্ত্রশিল্পী, আর কয়েকজন ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা দল তৈরি করব। তারপর আবার ফিরে আসব এ দেশে। ইউরোপের মানুষকে দেখাব ভারতীয় নৃত্য।"

শ্রীমতী বোনার বললেন "খুবই ভাল কথা। আমিও তোমার সম্বন্ধে এইরকমই ভাবছিলাম। এখানে তুমি যদি ভারতীয় নাচের দল নিয়ে আসতে পার তা হলে আমার মনে হয় এ দেশের লোক খুব আগ্রহ করে তোমাদের নাচ দেখবে—" একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, "ভাবছি আমিও তোমাদের দেশ দেখতে তোমার সঙ্গে যাব। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার দেখার অনেক সুবিধা হবে। তুমি আমাকে দেখাবে তোমাদের গোটা দেশ। ভারতবর্ষের পাহাড় সমুদ্র নদী অরণ্য মন্দির-মসজিদ, গ্রাম শহর গুহা মানুষের যা কিছু আছে—আমার সঙ্গে থেকে সব তুমি আমাকে দেখাবে—বুঝিয়ে দেবে।"

কৃতজ্ঞতার ভার স্থির হয়েছিল উদয়শঙ্কর। আবার ভারতবর্ষ। কত বছর পর। তার মনে হচ্ছিল সে যেন মধুর একটা স্বপ্নের ভিতরে ঘুরে ফিরছে।

সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন শিল্পীকুলের দরদী বন্ধু শ্রীমতী অ্যালিস বোনার। কিছু পরে ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়ার দিন স্থির হয়ে গেল। জাহাজের নাম, দি গ্যাঞ্জেস। সালটা উনিশ শো উনত্রিশ।

ভারতবর্ষে ফেরবার ঠিক আগে-আগে উদয়শঙ্করের সঙ্গে প্যারিসেই হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল এক ভারতীয় গুণী তরুণের। একা ঘুরতে ঘুরতে উদয়শঙ্কর এসে পড়েছিল সমস্ত অঞ্চলের ক্যাথেড্রাল সেক্রে কারে। একটু দূরে আর এক ভারতীয় তরুণকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করল তার সঙ্গে। বলল, "আপনি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ। আপনিও বোধ হয় ভারতবর্ষ থেকে?"

উদয়শঙ্কর তার নাম বলতেই তরুণ উৎসাহী হয়ে বলল, "আপনার খুব নাম শুনেছি। আপনি বিলেতে আসবার আগে বম্বেতে আপনাকে আমি দেখেও ছিলাম।"

"কোথায়?"

"আপনি কিছু বাদ্যযন্ত্র কিনেছিলেন আমার গুরু বিষ্ণুদিগম্বর পরিচালিত দোকান থেকে।"

উদয়শঙ্করের মনে পড়ে গেল পণ্ডিত শান্তশঙ্করের জন্যে সে কিছু বাদ্যযন্ত্র কিনে নিয়ে এসেছিল। তরুণকে জিজ্ঞেস করল উদয়শঙ্কর, "আপনার নাম জানতে পারি কি?"

তরুণ বলল, "আমার নাম বিষ্ণুদাস শিরালী। সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করতে আপাতত এখানে এসেছি।"

উদয়শঙ্কর বলল, "হঠাৎ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। খুবই ভাল লাগল। আমি ফিরে যাচ্ছি ভারতবর্ষে, নিজের ট্রুপ নিয়ে শিগগিরই আবার এখানে ফিরে আসব—" সে একটু চুপ করে থেকে পরে আবার বলল, "আপনাকেও আমাদের মধ্যে পেলে খুশী হব—"

শিরালী বলল, "আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার সহযোগিতা করব।"

"তবে আমরা ফিরে আসি, অপেক্ষা করে থাকুন।"

"নিশ্চয়ই করব।"

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

বিভিন্ন ও বিচিত্র রঙের নানা পোশাক-পরিচ্ছদ, সাবলীল ও বলিষ্ঠ নৃত্যভঙ্গীর নিভুল পদক্ষেপ ও ছন্দ এবং নরনারী পুরুষের অন্তর্নিহিত আনন্দরসের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে অ্যাকাডেমিতে অয়োজিত পুতুল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে অসীমা মুখার্জী সেদিন যেন সত্যিই এক অপরূপ নৃত্যলোকের সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের দেশের বিপুল সমষ্টিগত নৃত্যসম্ভারের নানা নিদর্শন ছাড়াও প্রদর্শনীতে দেশের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির প্রথাগত সামাজিক ঐক্যেরও নিদর্শন চোখে পড়ে। আমাদের দেশে নানা জাতি উপজাতির বাস—বিভিন্ন তাঁদের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক রীতিনীতি। অথচ দেশের নানাজাতীয় পার্থক্য তথা বৈচিত্র্য একটি নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধা। তাই জাতিগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের একটি সমষ্টিগত নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যেটি প্রকাশিত হয় দেশের সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত সামাজিক ও প্রথাগত নৃত্যধারা অবলম্বনে অসীমা মুখার্জী নানা শ্রেণীর পুতুল তৈরি করেছেন। পুতুল শিল্পে তিনি নিজ প্রতিভার গুণে খ্যাতি-লাভ করেছেন এবং ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। এবারের প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, নিদর্শনগুলি নিছক পুতুল নয়—এগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি সুপরিকল্পিত কম-পোজিশন বিশেষ। বিভিন্ন জাতির পুতুল তিনি কেবলমাত্র তাদের শরীরগত বিশেষত্বই প্রকাশ করেন নি, উপরন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্যে ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ ও যথাযথ প্রকাশভঙ্গিমাও নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি বহু প্রামাণিক বই পড়েছেন ও প্রামাণিক তথ্যাদির ওপর নির্ভর করেই তিনি বিভিন্ন নৃত্যরূপের পরিকল্পনা করেছেন। এক কথায় নানা প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্যধারার মধ্য দিয়ে অসীমা মুখার্জী সারা ভারতের সমষ্টিগত জাতীয় নৃত্য সম্ভারের পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানত তুলা ও ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো অবলম্বন তিনি পুতুলের কাঠামো রচনা করেন ও পরে প্রত্যেক জাতির পরিচ্ছদ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নানা রঙের সাজসজ্জা তৈরী করেন এবং শেষে ছাঁচের মধ্য দিয়ে কাগজমণ্ডের মুখ রচনা করেন। লক্ষণীয় এই যে, প্রত্যেকটি মুখেই প্রদেশগত পার্থক্য চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রেই সুনিপুণ তুলিরেখার দ্বারা মুখে চোখের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—ফলে প্রত্যেকটি পুতুলই যেন জীবন্ত মনে হয়। শুধু তাই নয়, উপরন্তু প্রত্যেকটিকে দেখে সনাক্ত করা যায় যে এটি কোন অঞ্চলের। এখানেই পুতুল শিল্পী হিসাবে অসীমা মুখার্জীর কৃতিত্ব। বিশেষ করে কথাকলি নৃত্যে পুতুলের মুখে সুস্পষ্ট অভিনয় ভঙ্গী ও নিখুঁত অঙ্গসজ্জা, মণি-পুরী নৃত্যে নারীর সাবলীল দেহছন্দ, কথক নৃত্যে চক্করের গতিশীলতা, ভরত-নাট্যম নৃত্যে অভিনয় গতি ও ছন্দ, ভাংগড়া নৃত্যে উদ্দাম উচ্ছ্বাস ও নাগা নৃত্য উপজাতির বিচিত্র অঙ্গসজ্জা ও নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গিমা—সবই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুতবিকই তাঞ্জোরের ডামি হর্স, মধ্যপ্রদেশের বাইসন ও বিশেষত মিজো নৃত্যের প্রামাণিক কম্পোজিশনের মধ্য দিয়ে এই পুতুল শিল্পী তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সুপরিচিত বিষয়বস্তু অবলম্বন রচিত নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন চণ্ডালিকা এবং কাবুলিওয়ালা ও মিনি। এই প্রসঙ্গে পূজারিণী মঞ্জরীর নিদর্শনগুলিও উল্লেখ্য। মাদার নিদর্শনমালার মধ্যে বিশেষ-করে মিশনারী পুতুল দেখে অনেকেই

নাগা নৃত্য —অসীমা মুখার্জি

অন্তর্ভুক্ত হন। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে চালচিত্র সমেত ঢাকি, হর ভারকনাথের সেবাদাসীপত্র নাম করা যায়। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ ভারতীয় নৃত্যোসজ্জার সমেত সমস্ত নিদর্শনই ক্রয় করেছেন। তবে এই অপূর্ব নিদর্শনগুলি অযথা গুদামজাত করার লক্ষ্য নেই। সরকারের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দিল্লীতে অবিলম্ব এই পুতুল প্রদর্শনীর আয়োজন করে এগুলির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়ং আর্টিস্টস ফেডারেশন তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য সমেত ১৬ জন সভ্য-শিল্পীর ৩৬টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। এই শিল্পী সংস্থার সভ্যবৃন্দ সকলেই তরুণ এবং সংস্থাটি স্থাপিত হবার পর থেকেই তাঁরা বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছেন। সুতরাং তাঁরা যে নিয়মিত ভাবে শিল্পচর্চা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সকলেই প্রগতিবাদী—প্রদর্শনীতে বিমূর্ত সমাবিমূর্ত সাররিয়ালিস্টিক নিদর্শনের

রাম-সীতা (কথাকলি নৃত্য)

সঙ্গে মিশ্র রীতির নিদর্শনও চোখে পড়ে। অধিকাংশ শিল্পীই পরীক্ষামূলক কাজ করেছেন—গত বছরের তুলনায় এবারের প্রদর্শনীর বিশেষ কোনও তারতম্য চোখে পড়েনি, যদিও প্রশংসনীয় নিদর্শন দেখা যায়—বিশেষ করে ভাস্কর্য ক্ষেত্রে। কয়েক-জনের ছবিতে পরিচিত শিল্পীর প্রভাব দেখা যায়—অবশ্য সেটা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কয়েকজনের শিল্পকর্মে প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা যায়। প্রথমেই অসিত মণ্ডল, সমীর ঘোষ ও অসিত পালের কয়েকটি নিদর্শন চোখে পড়ে। গণেশ পাইনের কিছু প্রভাব দেখা গেলেও অসিত মণ্ডল হান্টার-এর জন্য প্রশংসা দাবী করেন—এটির রেখা বৈচিত্র্য ও কারুকার্য লক্ষণীয়। সবুজ ও নীল রঙের স্বচ্ছতা থাকা সত্ত্বেও প্যালেটের রঙের বিষয়ে অধিকতর সচেতন হলে এই শিল্পীর এ ভিলেজ বেল রসোত্তীর্ণ হত। সমীর ঘোষ মুখোত কিউবিস্টিক রীতিতে ফ্যান্টাসি সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে নাইটমেয়ার উল্লেখ্য। ক্যাপটিভ-এ গগনেন্দ্র-নাথের প্রভাব থাকলেও শিল্পী আলোছায়ার খেলা ফোটাতে পারেন নি। অসিত পালের রচনা অ্যান্টিক জাতীয়। সুন্দর রঙীন কারুকার্যের মধ্য দিয়ে ওয়ান্স আপন এ টাইম-এ শিল্পী অতীত যুগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তপন বিশ্বাসের রচনায় যামিনী রায়ের প্রভাব ধরা পড়ে—কৃষ্ণ আণ্ড গোপিনিজ-এর এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। কাজল দাশগুপ্ত ইমেজারির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অতিরিক্ত মোটিফ ব্যবহার ও কারুকর্মের ফলে হরপার্বতী যেন জটিলতর হয়ে গেছে— এ বিষয়ে সচেতন হলে ছবিখানি সার্থকতর হত সন্দেহ নেই। কিউবিস্টিক প্রধান হলেও বিপুল গুহর একটি নিদর্শন অ্যান্টি আর্ট জাতীয় (ফ্রুটস অব উইজডম)। মুকুল প্রসাদের রচনা ইমপ্রেসানিস্টিক; উজ্জ্বলতর রঙ ব্যবহার করলে কয়েকটি বিশেষভাবে নজরে পড়ত। তা সত্ত্বেও রিফ্লেকশন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নন্দিতা রায় বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেছেন, বিশেষ করে দু একটি স্টিল লাইফ ভাল লাগে, যেমন বিউটি বাণ্ড। বিন্দুপ্রধান কারুকার্যের জন্য উজ্জ্বল দাশের ভিলেজ ম্যাডোনা অনেকের চোখে পড়ে যায়। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে বরুণ সিমলাইয়ের সেল্ফ পোর্ট্রেট, শুভেন্দু দাসের দি হান্টেড ও মৃন্ময় মুখার্জীর বিমূর্ত কম্পোজিশন ৩০-এর নাম করা যায়। ভাস্কর্য বিভাগে এবারে দুটি উল্লেখ্য পাথর খোদাই নিদর্শন দেখা যায়—কুণাল সাহার সাধু রিলিফ জাতীয়, অন্তিম সরলতা দ্রষ্টব্য। সত্যেন মজুমদার আবজক্টড-এ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মাথাটি দুটি হাঁটুর মধ্যে রেখে একটি নারী বসে আছেন—একটি নিরেট পাথর স্তূপ খোদাই করে ভাস্কর-শিল্পী সুন্দরভাবে এই বিশিষ্ট ভঙ্গীটি প্রকাশ করেছেন—বিশেষ করে অঙ্গহানিক সমতা ও সৌন্দর্যের দিক থেকে এটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে কৃষ্ণ ব্যানার্জীর আ্যাট রেস্ট-এর নাম করা যায়।
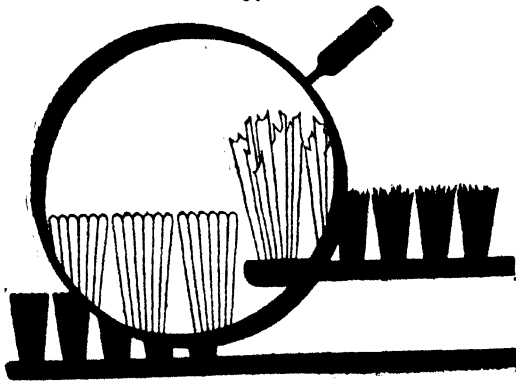
ইনটিগ্রেটেড সার্কিট

বিন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

[বর্তমান লেখক স্বর্গত অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের অধীনে লাউড স্পিকার উদ্ভাবনী প্রকল্পে এক সময়ে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪১ সালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সাইক্লোট্রন নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত হন। বর্তমানে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ ইলেকট্রনিক যন্ত্র নির্মাণে প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

ট্রানসিস্টর রেডিওর সঙ্গে আজ সকলেই পরিচিত। রেডিও ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সমঝদার ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, সঙ্কেত-বর্ধকরূপে আগেকার ভালব সার্কিটের আদর আর নেই। এর কারণ, আধুনিক ট্রানসিস্টর ভালবের সমকক্ষ তো বটেই উপরন্তু খুব সুবিধাজনক। ট্রানসিস্টর বেশি নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘায়ু। এটা চালাতে দেড় ভোল্ট বিদ্যুৎ চাপই যথেষ্ট। অথচ ভালবের লাগে অন্তত বেশি ভোল্ট। ট্রানসিস্টরে কারেন্ট কম, খরচও সেই সঙ্গে ক্যাথোড গরম করার বিদ্যুৎ-শক্তিও। সাধারণ ভালবে যার পরিমাপ এক ওয়াট। সামান্য বিদ্যুৎ চাপে কাজ চালনার ক্ষমতা থাকায় ট্রানসিস্টরের বর্তনীতে রোধক (Resistor) ও ধারক (Condenser) গুলিও অত্যন্ত ছোট মাপের করা চলে। সমতলীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন, আধুনিক ট্রানসিস্টরের মূল বস্তুটিও অনুবীক্ষণে দর্শনীয় সিলিকনের পাতলা পাতের একটি কণিকামাত্র। প্রায় এক ইঞ্চির এক শতাংশ মাপের একটি চতুষ্কোণ কুচি।

ট্রানসিস্টরের মাপের সঙ্গে তাল রাখতে অত্যন্ত ছোট রোধের ও ধারক উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার বস্তুগুলি উপযুক্ত অধঃস্তরে সংবদ্ধ ও সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তু দিয়ে সংযুক্ত করে বর্তনী গঠন করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। সুতরাং প্রথম যুগের মাইক্রো-সার্কিট অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। তাই বর্তনীর সংযোগ পথগুলি অধঃস্তরের উপর ছাপিয়ে প্রস্তুত করবার প্রস্তাব স্ক্রীন প্রিন্ট পদ্ধতিতে পালিস করে সমতলীকৃত অ্যালুমিনার অধঃস্তরে, সুপরিবাহী ও মন্দ পরিবাহী কালির ছাপ ফেলার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়। সুপরিবাহী কালি তৈয়ারি হল উপযুক্ত তরলে ভাসমান সোনা ও প্লাটিনামের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা দিয়ে। মন্দ পরিবাহী কালিতে দেওয়া হল রূপো ও প্যালাডিয়াম অক্সাইড এবং কাচের কণা। এই পদ্ধতিতে প্রথমে সুপরিবাহী কালি দিয়ে সংযোগ পথগুলি এবং রোধক, ধারক ও বহিঃ-সংযোগের চতুষ্কোণ পীঠগুলি ছাপা হয়। পাতগুলি বাহক চাদরে বাহিত হয়ে দীর্ঘ বেলনাকার বিদ্যুৎ চুল্লীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। ৮৫০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উন্নীত হলে এই কালি পাতে দৃঢ়সংবদ্ধ স্বর্ণের সুপরিবাহী সংযোগ পথ ও পীঠ-গুলি সৃষ্টি করে। পরে একই ভাবে মন্দ পরিবাহী কালির ছাপ দিয়ে রোধকপথগুলি গঠিত হয়। শেষে ধারক ও ট্রানসিস্টরগুলির কুচি তাদের পীঠগুলিতে ঝালিয়ে ধার কর

অপর প্রান্ত ও ট্রানসিস্টরের বেস ও এমিটর, স্বর্ণতন্তু দিয়ে যুক্ত করা হয়। স্বর্ণতন্তু, প্রচণ্ড শব্দাতীত কম্পনে উৎপন্ন তাপ ও চাপ সংনমিত হয়ে দৃঢ়সংবদ্ধ হয় এবং বর্তনীর সংযোগ সম্পূর্ণ করে। এইভাবে পুরু স্তরে গঠিত হাইব্রিড বা সংকর বর্তনী দিনে বিশ ত্রিশ হাজার করে উৎপন্ন হয়। আকারে এইগুলিও বেশ ছোট, দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি ও প্রস্থে সিকি ইঞ্চি অ্যালুমিনার পাতে পাঁচ সাতটি ট্রানসিস্টর, দশ বিশটি রোধক ও কয়েকটি ধারক দিয়ে উন্নতমানের অ্যামপ্লিফায়ার গঠন সম্ভব। পদ্ধতিটি জটিল এবং যন্ত্রগুলি ব্যয়সাধ্য হলেও মাথাপিছু দাম বেশি পড়ে না।

পাতলা স্তরের বর্তনী আরও
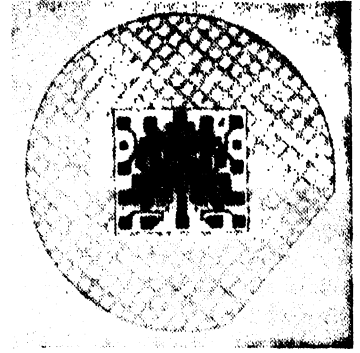
ইনটিগ্রেটেড সারকিট

ছোট ও নির্ভরযোগ্য। এগুলিও অ্যালুমিনার অধঃস্তরে ছাপা হয়। বায়ুশূন্য কক্ষে, বিদ্যুৎপ্রবাহে উত্তপ্ত টাংগস্টেন তারের উপর বাষ্পীভূত অ্যালু-মিনামের অণুগুলি, ঢাকনীর রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়ে ঋজুপথে ছুটে অধঃস্তরের উপর পড়ে এবং সংযোগ পথ ও পীঠগুলির জন্য পুরু স্তর গঠন করে। রোধকপথগুলি, অপর একটি ঢাকনী দ্বারা বাষ্পীকৃত নিক্রোমের পাতলা স্তরে গঠিত হয়। অ্যালু-মিনামের চতুষ্কোণ পীঠগুলির উপর, আর্গন অক্সিজেনের বাতাবরণে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাহিত ট্যান্টালাম অক্সাইড জমিয়ে ধারকের অপরিবাহী পাতলা স্তরটি গঠন করা যায়। এইগুলির উপরে দ্বিতীয় বার অ্যালুমিনামের পুরু স্তর জমিয়ে ধারক-গুলি গঠন করা চলে।

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও সস্তা মাইক্রো-সার্কিট উৎপন্ন হয় সিলিকনের পাতলা পাতের উপর ও ভিতরে, ট্রানসিস্টর উৎ-পাদনের সমতলীয় পদ্ধতিরই পরিবর্ধিত পরিকল্পনায়। বোরনের মৌল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে ট্রানসিস্টরগুলির বেস উৎ-পাদনের "সময়ই, একই পাতের ভিতর এবং তার কাছেই রোধকপথের নালীগুলিও সৃষ্ট

হয়। আধাপরিবাহী সিলিকনের পাতে, বিভিন্ন ট্রানজিস্টর ও রোধকগুলির বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরস্পর থেকে বিযুক্ত রাখা হয় বোরন মৌলের ঘন ও গভীর অনুপ্রবেশ দ্বারা নির্মিত "অভবপরিবাহী" গণ্ডীগুলির দ্বারা। এই গণ্ডীগুলিতে বিপরীত বিদ্যুৎ চাপ আরোপিত হলে রোধকপথ ও ট্রানজিস্টরগুলির বিদ্যুৎ প্রবাহ তাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকে। দশ বিশটি ট্রানজিস্টর ও প্রায় সমসংখ্যক রোধক দ্বারা নির্মিত এক থেকে ছয়টি একীভূত বর্তনী, দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির বিশ ভাগের এক ভাগ ও প্রস্থে পঁচিশ ভাগের এক ভাগ আয়তাকার কুচির মধ্যে গঠিত হচ্ছে। তিন ইঞ্চি ব্যাসের ও ইঞ্চির এক শতাংশেরও কম পুরু প্রতিটি সিলিকনের চাকতিতে এক হাজার কুচি পাওয়া যায়। সিলিকন কেলাসের অন্তস্থ, ট্রানজিস্টরের এমিটর, বেস ও কলেক্টরের সহিত সংযোগ হেতু চাকতির ডাই-অক্সাইডের ছাকের উপর বাষ্পীভূত অ্যালুমিনিয়াম জমিয়ে যে স্তর গঠন করা হয়, তা থেকে সংযোগের পীঠ ও পথগুলি রেখে অন্য জায়গার অ্যালুমিনিয়াম ফসফরিক অ্যাসিড দিয়ে দ্রবীভূত করা হয়। অতএব সংযোগ পথগুলি নিখরচায় পাওয়া যায়। এই জন্যই "মনোলিথিক" সিলিকনে নির্মিত মাইক্রোসার্কিট উৎপাদনের ব্যয় একটি ট্রানজিস্টরের উৎপাদন ব্যয়ের সমতুল্য।

"সমতলীয় পদ্ধতি" সফল হয় ষাট দশকের গোড়াতেই। এই সফল্য যে সম্ভাবনার দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তার মধ্যে 'একই পাতে সম্পূর্ণ বর্তনী' উৎপাদনের আকর্ষণই ছিল প্রবলতম। বিভিন্ন সংস্থায় ও নানাদেশে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, এবং সর্বাত্মক চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯৬৫ সালে বোম্বাইতে "আণবিক ইলেকট্রনিকস"এর যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, তার প্রবন্ধগুলিতে এই উদ্ভাবনের প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়নি। কিন্তু ছেষট্টি সালে সম্মেলনের প্রবন্ধ সংকলন যখন বের হয়, দেখা গেল, প্রচ্ছদপট তৈয়ারী হয়েছে নানা রঙে ছাপা একটি হিজিবিজি ছবি পাশাপাশি সাজিয়ে। অনুবীক্ষণের পাদপীঠে সিলিকন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের একটি চাকতি বসালে এই রকমই দেখাবে। প্রায় একই সময়ে, এ বিষয়ে অধ্যাপক ডীন যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তার মুখবন্ধে এই মন্তব্য পাওয়া যায় "ইলেকট্রনিকসে যুগান্তকারী উদ্ভাবন ট্রানজিস্টর নয়, এই সম্মান ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের প্রাপ্য। ট্রানজিস্টর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি পদক্ষেপ মাত্র।"

সেই বহুবিতর্কিত অগ্নিগোলক

৩০ জুন ১৯০৮ সকাল সাতটার কিছু পরে সাইবেরিয়ার টুনগুসকা উপত্যকার গভীর জঙ্গলের ওপর আকাশ থেকে অতর্কিতে একটি আগুনের গোলা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ পঁচিশ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের সমস্ত গাছপালা উপড়ে দিয়ে জায়গাটিকে একেবারে সমভূমিতে পরিণত করে দেয়। প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরের মানুষ তার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তার কম্পন পৃথিবীর সমস্ত মানমন্দিরের বায়ুচাপমান যন্ত্র এবং ভূ-কম্পনজ্ঞাপক যন্ত্রে ধরা পড়ে। এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ: বিস্ফোরণের পর বেশ কয়েক দিন সারা ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের আকাশ এক প্রস্থ হালকা রূপোলী মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আর সেই রূপোলী মেঘের পর্দার ওপর ছড়িয়ে ছিল গাঢ় নীল রঙের একটানা একটি পুচ্ছ। উত্তর দিক বরাবর। ঊর্ধ্বাকাশে জেট-প্লেন উড়ে যাওয়ার পর আকাশের গায়ে জেটের জ্বালানি গ্যাস যেমন পুচ্ছ রচনা করে ঠিক সেই রকম

কারণেই সেই নীলাভ পুচ্ছটি রচিত। মনে হয়, সেই নীল রঙের পথ ধরেই কোন বস্তু যেন পৃথিবীর দিকে এগিয়ে এসেছিল।

অতিনৈসর্গিক এই ঘটনা নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে নানা রকম বিতর্কের জাল রচনা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী নতুন এক একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে কী ভাবে ঘটনাটি ঘটল তার মীমাংসায় পৌঁছনর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের যুক্তি তর্কের মধ্যে সব সময়ই একটা কিন্তু থেকে গেছে। সম্প্রতি সেই অগ্নিগোলক সম্পর্কে আরও একটি নতুন, অভিনব এবং রীতিমত চমকপ্রদ তথ্য দাঁড় করিয়েছেন টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পদার্থবিজ্ঞানী—অ্যালবার্ট এ. জ্যাকসন-৪ এবং মাইকেল পি. রায়ান, জুনিয়ার। তাঁদের বক্তব্য, প্রচন্ড শক্তিশালী সেই অগ্নিগোলক আর কিছুই নয়, একটি ব্ল্যাক হোল। মাটির ওপর ঠিকরে পড়ার পর ওই ব্ল্যাক হোলটিই অমন সৃষ্টিনাশা কান্ডটি ঘটিয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্ল্যাক হোল এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু। নক্ষত্র অথবা নক্ষত্র-কণা। এবং বহুবিতর্কিত জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র এ ধরনের বস্তু আকছার ছড়িয়ে রয়েছে।

কী ভাবে ওই বস্তু বা বস্তু কণা তৈরি হয়ে থাকে?

তার ব্যাখ্যাটি এই রকম : অনেকেই জানেন, যে সব নক্ষত্র—আমাদের সূর্যও তাদের মধ্যে পড়ে—মহাকাশে দীপালির, রূপসজ্জা রচনা করে বিচরণ করছে নিরত তাদের মধ্যে পুড়ে চলেছে পারমাণবিক জ্বালানি। পুড়ছে থার্মোনিউক্লিয়ার বা তাপ-পরম ণুকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে। পরিবর্তে সৃষ্টি হচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণ শক্তি। যে শক্তি মহাজাগতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে মুখ্যত বিকিরণের মাধ্যমে। সাধারণ আলো, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি তাদের অন্যতম।

জেনারেল থিওরি অভ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকবাদের সাধারণ সূত্র অবলম্বন করে কেউ কেউ বলেছেন, নিয়ত প্রজ্বলনের ফলে অতিকায় কোন নক্ষত্রের পারমাণবিক জ্বালানি বা নিউক্লিয়ার ফায়েল যখন প্রায় শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেই সময় অতিকায় বিস্ফোরণ, যার ফল বর্তমান এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি—হয়ত সেই সময়েই ওই সব ক্ষুদ্রাকৃতি ব্ল্যাক হোলগুলি জন্মলাভ করে। অথবা এমনও হতে পারে সৃষ্টির পর একাধিক ব্ল্যাকহোল তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং ছোট ছোট ব্ল্যাকহোল তাদেরই ভগ্নাবশেষ।

জ্যাকসন এবং রায়ান-এর বক্তব্য, হ্যাঁ টুকরো টুকরো ওই ব্ল্যাকহোলেরই একটি সাইবেরিয়ার সেই দুর্ঘটনার কারণ, যার আয়তন ছিল মাঝারি ধরনের একটি উল্কাণুর মত। পৃথিবীর পরিক্রমণ পথকে সেটি ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে ভেদ করে সবেগে টুনগুসকার জঙ্গলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওঁরা হিসেব কষে দেখেছেন ওই ধরনের একটি ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ যতটা অভিঘাতজনিত উৎপাদন করে, তার পরিমাণ সাইবেরিয়ায় সেদিন যে পরিমাণ শক্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল তার সমান।

সম্প্রতি নেচার-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জ্যাকসন এবং রায়ান মন্তব্য করেছেন, বায়ুমন্ডলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় ব্ল্যাকহোল বাতাসকে আয়নিত করবে, তাত্ত্বিক দিক থেকে এটাই ঘটনা হওয়া উচিত। এর ফলে যে পথ ধরে সে অগ্রসর হয়, বায়ুমণ্ডলের সেই অংশ গাঢ় নীল রঙের পুচ্ছের মত দেখতে হবে—হ্যাঁ সে রকমটিই হওয়া উচিত। আর তা যদি হয়, ১৯০৮ সালের পর্যবেক্ষণ তাঁদের বক্তব্যকে সমর্থন করছে। কারণ সেখানকার উত্তর আকাশে ওই সময় নীল রঙের একটি পুচ্ছ সত্যিই দেখা গিয়েছিল। এ ছাড়াও জ্যাকসন এবং রায়ানের গণনায় বলা হয়েছে, ওই ব্ল্যাকহোলটির শক্তির পরিমাণ ছিল প্রায় দশ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার মত। হয়ত এর জন্যেই সাইবেরিয়ার যে জায়গাটিতে সেটি আঘাত করেছিল সেখানে ক্রেটার বা বড় রকমের কোন গর্ত গড়ে উঠতে পারে নি। এত শক্তি নির্গত হয়েছিল যার ফলে বস্তুটির পুরো অংশটিই ধ্বংস হয়ে যায়, কোন অবশেষ রেখে যেতে পারে নি।

চটকদার তথ্য সন্দেহ নেই। তবু এবারও সপ্রশ্ন হয়ে উঠেছেন কেউ কেউ। প্রতিপক্ষের বক্তব্য, টুনগুসকায় বিস্ফোরণের জায়গাটিই পরীক্ষা করে মনে হয়, মহাকাশ থেকে যা কিছুই সেখানে ঠিকরে পড়ুক না কেন, সেটি সেখানকার সমভূমির সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোণ করে ঠিকরে পড়েছিল। যদি সেই বস্তুটি সত্যিই ব্ল্যাকহোল হয় তাহলে তার নিজস্ব শক্তিতেই পৃথিবীর ভূস্তর ভেদ করে আরও হাজার মাইল দূরে মাটি ফুঁড়ে নোভাস্কোশিয়া অঞ্চল দিয়ে বুলেটের মত বেরিয়ে যাওয়ার কথা। আর তা যদি হয়, নোভাস্কোশিয়ার ওই অঞ্চলে সমুদ্রের নিচে তার অভিঘাতজনিত শক্তির চিহ্ন নিশ্চয় পড়ে থাকবে। হয়ত সেখানে গভীর নলকূপের মত কূপও থাকতে পারে যার ভেতর দিয়ে গেজারের মত ভূগর্ভস্থ জল বেরিয়ে আসছে। সেখানকার ভূস্তরও অনিয়ত অবস্থায় থাকার কথা? জ্যাকসন এবং রায়ান এর উত্তরে বলেছেন, উত্তর আটলান্টিকের গর্ভে ১৯০৮ সালে ঠিক যে জায়গাটিতে ওই সব ব্যাপার আশা করছেন ভবিষ্যতে সামুদ্রিক গবেষণা চালিয়ে হয়ত তাদের আবিষ্কার করা যাবে।

তখন তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে

নক্ষত্রটি হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এত প্রচণ্ড সেই সংকোচন, যার ফলে বিরাট সেই নক্ষত্রটি শেষ পর্যন্ত নিরেট এবং ক্ষুদ্রকার একটি গোলকে পরিণত হয়ে যায়। ওই অবস্থায় তার ব্যাস এসে দাঁড়ায় মাত্র দুই মাইলের মধ্যে। অত বেশি বস্তুসামগ্রী অত কম পরিসরে ঠাসা হয়ে পড়ায় নিরেট ওই গোলকের ঘনত্ব তখন কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যায়। এক ঘন সেণ্টিমিটারের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু তখন আঁটোসাটো হয়ে বাস করতে থাকে তার ভর কয়েক ট্রিলিয়ন মেট্রিক টনের মত। সঙ্কুচিত সেই নক্ষত্রটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানও এত বেশি বেড়ে যায় যে, সাধারণ আলোও সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করে তার কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি ধরেও নেয়া হয় সংকোচনের পরও কিছুটা বিকিরণ শক্তি দেবার মত জ্বালানি নক্ষত্রটির মধ্যে থেকে যায়, (যেমন নিবে যাওয়া চুল্লির ছাই-এর মধ্যেও সামান্য পরিমাণ তাপশক্তি থাকে) তাহলেও ওই বিকিরণ শক্তি তার প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে যে এগিয়ে আসবে তারও উপায় নেই। অথবা ধরুন, অন্য কোন নক্ষত্রের আলো তার ওপর গিয়ে পড়ল, —যেমন সূর্যের আলো গিয়ে পড়ে চাঁদ এবং অন্য সব গ্রহগুলির উপর—মুশকিল এই, এ ক্ষেত্রে চাঁদ অথবা গ্রহগুলি সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় বলেই তাদের আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সংকুচিত সেই নক্ষত্র অর্থাৎ ব্ল্যাক হোলের উপর বাইরে থেকে কোন রশ্মি গিয়ে পড়লে সেই রশ্মিও তার মাধ্যাকর্ষণের টানে বন্দী হয়ে পড়ে। ফলে সেখান থেকে বাইরের কোন আলো যে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে, তারও উপায় থাকে না। এর জন্যেই সংকুচিত সেই নক্ষত্র অদৃশ্য হয়ে পড়ে। এর জন্যেই ওই নক্ষত্র বা বস্তুকণাকে বলা হয় ব্ল্যাক-হোল।

*

প্রশ্ন এই, সংকোচনের ফলে আয়তন যত ছোট হোকই না যা কেন, তেমন একটি বস্তুর মধ্যে এত বেশি পরিমাণ শক্তি থাকে যে, তার সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ একটি মারাত্মক রকমের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। অন্তত সাইবেরিয়ায় সেদিন যে ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং তার দরুন যতটা ক্ষয়ক্ষতি দেখা গিয়েছিল, দুই মাইল ব্যাসের একটি ব্ল্যাক হোলের কথা ভাবতে গেলে ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে বলেই মনে হয়। কারণ তেমন একটি বস্তুর আঘাতে পুরো পৃথিবীটারই সাবাড় হওয়ার কথা, পঁচিশ মাইল ব্যাসের জঙ্গলকীর্ণ অঞ্চল তো কোন ছার!

কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন : এক সময়ে আমরা মনে করতাম, ব্ল্যাক হোলের ন্যূনতম ব্যাস সম্ভবত দু' মাইলের মতই হবে। এখন মনে হচ্ছে তার চেয়েও ক্ষুদ্রকার ব্ল্যাক হোল থাকা সম্ভব। যাদের আয়তন হয়ত ধূলিকণার মত। তারা হয়ত সৃষ্ট হয়েছিল আজ থেকে দশ পনের বিলিয়ন বছর আগে। ঠিক সেই সময়ে যখন মহাজাগতিক একটি বিস্ফোরণ ঘটে—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যার নাম রেখেছেন 'বিগ্যাব্যাং'।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক সময়ে মনে করেছিলেন, বিরাট একটি উল্কার পতনই হয়ত সাইবেরিয়ার সেই বিস্ফোরণের কারণ। কিন্তু জায়গাটিতে উল্কা অথবা উল্কার আঘাতজনিত কোন গর্তই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউরে বলেছিলেন, এসব আসলে ধূমকেতুর কাজ। জ্বলন্ত ধূমকেতুর সবটাই তো গ্যাস অথবা বাষ্প। হঠাৎ কোন কারণে কোন একটি ধূমকেতু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের মধ্যে পড়ে পৃথিবীর বুকে ঠিকরে পড়ে। গ্যাস দিয়ে গঠিত বলে সেই আঘাত কোন গর্ত সৃষ্টি করতে পারে নি। কেউ কেউ বলছেন, আণ্টি ম্যাটার বা প্রতিবস্তু পিণ্ডের সংঘর্ষই ওই বিস্ফোরণের কারণ। অনির্দিষ্ট কোন লক্ষ পথ থেকে একখণ্ড প্রতিবস্তু পৃথিবীর বুকে আঘাত করার পর পৃথিবীর বস্তু এবং সেই প্রতিবস্তু পরস্পর মিলিত হয়। সৃষ্টি করে প্রচণ্ড শক্তি। ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক আধান পরস্পর মিলিত হয়ে যেমন আধানের বিলুপ্তি ঘটায়, পরিবর্তে আলো, শব্দ প্রভৃতি শক্তি সৃষ্টি করে, এ ব্যাপারটাও যেন কতকটা তাই। বস্তু এবং প্রতি-বস্তুর মিলনে উভয়ের বিলুপ্তি এবং বিভিন্ন ভৌতিক শক্তির সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, পরে এ ধরনের তত্ত্বও নাকচ হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক, জ্যাকসন এবং রায়ান ধোপে কতটা টেকেন।

সমরজিৎ কর

মল্লভূমের মনসাপূজা ও ঝাপান

মানিকলাল সিংহ

সমগ্র রাঢ়বঙ্গে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত। কিন্তু তাহারই মধ্যে মল্লভূমের মনসাপূজার সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ রীতি ও সংস্কার জড়িত রহিয়াছে। মল্লভূমের মনসাপূজার বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা দরকার মল্লভূম তথা দক্ষিণরাঢ়ের সর্পদেবতার মূল কোথায়? খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহাবীর রাঢ়ে জৈন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া দেখা যায় যে, এখানে আদিনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ এবং মহাবীর—এই চারিজন তীর্থঙ্করের মূর্তিই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। বৌদ্ধ এবং হিন্দু তান্ত্রিকদের মতই পরবর্তীকালে জৈনতন্ত্রের প্রভাব রাঢ়ে প্রসারিত। জৈনতন্ত্র অনুযায়ী জৈন শাসন যক্ষ-যক্ষিণী এবং অন্যান্য দেবদেবীর প্রচলন ঘটে। পার্শ্বনাথের সর্পবিভূষিত মূর্তি মল্লভূমের বিভিন্ন গ্রামে সর্পদেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। পার্শ্বনাথের শাসনযক্ষিণী পদ্মাবতী দেবীর সম্বন্ধে দেখা যায় যে তিনি সর্পবাহনা, কণকবর্ণা, চতুর্ভূজা। তাঁহার দক্ষিণ করদ্বয়ে পদ্ম ও পাশ এবং বামকরদ্বয়ে ফল ও অঙ্কুশ রহিয়াছে। পদ্মাবতীর একাধিক মূর্তি মল্লভূমে মনসাদেবী রূপে পূজিতা হইতেছেন। জৈনদেবী গৌরী গোধাসন—'গোধাসনা ভবেৎ গৌরী'। মল্লভূমের জয়পুর থানার মধ্যে (বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত) রাউতখন্ড গ্রামের জগৎগৌরীর শিলা মূর্তি অঞ্চলপ্রসিদ্ধা সর্পদেবী। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের জগৎগৌরী, অযোধ্যা গ্রামের কালীবুড়ী, বিক্রডা্যা গ্রামের বিষহরি বিখ্যাত সর্পদেবী। বিষ্ণুপুরের দ্বারিকাবতী জামতড়গ্রামের জাগন্তসিনী এবং বাবাপেট্যা গ্রামের মাদমণী প্রভৃতি সর্পদেবী বিখ্যাত। এই সমস্ত সর্পদেবীর প্রাচীন শিলামূর্তি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মল্লভূমের তথা দক্ষিণ রাঢ়ের সর্পদেবী মনসার মূলে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এবং জৈনতন্ত্রোদ্ভূত পদ্মাবতী এবং গৌরীদেবী বিদ্যমান।

মল্লভূমের মৎসজীবী কেওট, জেলে, বাগদী, মাঝি, খয়রা ইত্যাদি জাতিগুলির কুলদেবী মনসা। এই জাতিগুলি বাদেও অনুন্নত গোষ্ঠীভুক্ত হাড়ি, লোহার, লায়েক, বাউরী, বারুই ইত্যাদি জাতিগুলির মধ্যেও মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। মল্লভূমের প্রায় সমস্ত গ্রামেই মনসা গ্রামদেবী এবং লোকদেবী রূপে পূজিতা হন। প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক মনসা মেলা দেখা যায়। মৎসজীবি গোষ্ঠীগুলির এবং অনুন্নত গোষ্ঠীভুক্ত বাউরি, হাড়ি, লোহার, লায়েক, বারুই ইত্যাদি জাতির মানুষের ঘরে ঘরে মনসার প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুপুরের চৌদ্দ পনের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাঁচমুড়ার কুম্ভকারদের তৈয়ারী পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার মেড় বা চাল, বারি এবং সর্পমূর্তিসমন্বিত ঘট-মনসা বিশেষ প্রসিদ্ধ। লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে উক্ত পোড়ামাটির দ্রব্যগুলি বর্তমানে পৃথিবীর বহুদেশে সমাদৃত। তাহাদের তৈয়ারী মনসামেড়, বারি, ঘট-মনসা ইত্যাদি মল্লভূমের অধিকাংশ অঞ্চলেই পূজিতা হন। কাঁচা মাটি দিয়া মনসা মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করার রীতি কদাচিৎ দেখা যায়। যাহারা খুবই দরিদ্র তাহারা গৃহের উঠানে তুলসীমঞ্চের নিকট সিজ-মনসার (গাছ) ডাল পুঁতিয়া মনসাদেবী রূপে পূজা করে। মনসার গানের মধ্যে রহিয়াছে—'কেউ বা পূজে সিজের ডাল মা কেউ ঘট বারি।'

মল্লরাজা বীরহাম্বির আচার্য শ্রীনিবাস গোস্বামীর দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর হইতেই মল্লরাজ পরিবারে এবং মল্লভূমের সর্বত্র বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটে। পাঁচমুড়ার কুম্ভকারদের তৈয়ারী মনসার মেড় বা চালের মধ্যে মনসা, মনসার দুই সহচরী, আস্তিক, জরৎকারু মুনি ও মনসার ভক্ত গুণিগণের মূর্তির সঙ্গে বৈষ্ণব কীর্তনীয়ার মূর্তিও নির্মিত হয়। মল্লভূমের অঞ্চলপ্রসিদ্ধা মনসাদেবীর পূজায় ছাগ বলির রীতি দেখা যায়—কিন্তু অনেক মনসার পূজায় বলি আদৌ হয় না। মল্লভূমে মনসা পূজার আরম্ভ হয় দশহরার দিন এবং সমাপ্তি হয় নলডাকা (আশ্বিন সংক্রান্তি) সংক্রান্তির দিন। দশহরায় গঙ্গাদেবীর পূজা হয়। মাতৃরূপা গঙ্গাদেবী সন্তানদের দশরকমের পাপ হরণ করেন। এইজন্য তিনি দশহরা নামে অভিহিতা। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে মনসা পূজার তাৎপর্য কোথায়? দশহরা হইতে বৃষ্টি বা বর্ষার আরম্ভ। বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম বন্যার

ঝাপান উপলক্ষে রজা সমীপে গুণীগণ

ঝাপান উৎসবের চিত্র

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় অঞ্চলের সর্পকুল সমতল এবং নিম্নভূমিতে নদনদী খাল-বিল বাহিয়া নামিয়া আসে। এই নবাগত সর্পকুলের সহিত মল্লভূমের মৎসজীবি গোষ্ঠীগুলির প্রথম পরিচয় ঘটে। মৎসজীবি গোষ্ঠীভুক্ত নরনারীর জীবনে প্রায়ই সর্পাঘাত এবং সর্পাঘাতজনিত মৃত্যু ঘটে। এই নিত্যবিপর্যয় এবং স্বাভাবিক সর্পভীতি হইতেই মৎসজীবি জাতিগুলির কুলদেবী মনসা এবং দশহরা হইতেই মনসাপূজার আরম্ভ। মনসার গানের মধ্যে রহিয়াছে—

ঝাড় হুড় করে দাড় দুড় করে,—
ভাঙা ঘরের কাঠ পড়ে—
তোমার ঘরে কিসের ভয় ডরকার॥

মল্লভূমের সর্বত্র গৃহস্থগণ দশহরার প্রভাতে নিজ নিজ বাসগৃহের দেওয়াল ও প্রাচীরগুলিকে বেষ্টন করিয়া গোময়ের গণ্ডী দেয়। ইহাকে "গোবর বেড়ি" বলে। প্রচলিত সংস্কার হইল, দশহরার দিন বস্তুকে ঘিরিয়া "গোবর বেড়ি" দিলে সারা বৎসরের মধ্যে কোন সর্পই বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। দশহরার দিন কেলেকড়া নামক একরকম বনজ ফল সামান্য দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দাঁতে না চিবাইয়া খাওয়ার সংস্কারও এই মল্লভূমে প্রচলিত। মানুষের বিশ্বাস, দশহরার দিন কেলেকড়া ফলের টুকরা খাইলে সারা বৎসরের মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে না।

দশহরার দিন মল্লভূমে আর একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত। এই দিন ঘুড়ি উড়ান এবং ঘুড়ির সুতা কাটাকাটির রেষারেষি হইয়া থাকে। দশহরার দিন সচরাচরই বৃষ্টি হয়। এই দিন সুবৃষ্টি হওয়া শুভ বলিয়া বিবেচিত। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে মানুষ বিশ্বাস করে যে, দশহরার দিন সুবৃষ্টি হইলে বিষধর সর্পগুলির বিষ ধুইয়া যায়। অযোধ্যা গ্রামের অঞ্চল-বিখ্যাত সর্পদেবী কালীবুড়ীর দশহরা উপলক্ষে উৎসব হয়। উক্ত দেবী ওই দিন দ্বারকেশ্বর নদের জলে স্নান করেন। কোন বৎসর দশহরা উপলক্ষে দ্বারকেশ্বরের বন্যা না হইলে দেবীর স্নানে ত্রুটি রহিয়া গেল বলিয়া মনে করা হয়। দশহরার ঠিক পরবর্তী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে মনসাপূজা বা অষ্টনাগ পূজা। এই পূজা রাঢ়বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। এই দিন লাপুড় গ্রামের 'লাপুড়-সিনি' এবং বারপেট্যা গ্রামের 'মাদানি দেবীর (সর্পদেবী) উৎসব মল্লভূমের মনসা পূজাগুলির অন্যতম। কৃষ্ণাপঞ্চমী নাগ-পঞ্চমী বলিয়া পরিচিত। এই নাগপঞ্চমী দিনে মল্লভূমের তন্তুবায় এবং সরাক তাঁতিরা (জৈন শ্রাবক) তাঁত পূজার সঙ্গে অষ্ট-নাগের পূজা গৃহে গৃহে করিয়া থাকেন। দক্ষিণরাঢ়ীর তথা মল্লভূমের তন্তুবায় জাতি এবং সরাক তাঁতিদের উৎপত্তির কিংবদন্তীতে কথিত আছে যে, তন্তুবায় জাতির আদি-পুরুষ শিবের মানসপুত্র শিবদাস যখন মহাদেবের আদেশে তাঁত যন্ত্রটি খাটান তখন পৃথিবীতে কোথাও সুতো ছিল না। মহাদেবের আদেশে অষ্টনাগই তাঁত খাটানো ব্যাপারে সুতোর কাজ করিয়াছিল। সেই আদিম সংস্কারবশেই তন্তুবায় এবং সরাক তাঁতিরা তাঁতের পূজার দিন অষ্টনাগেরও পূজা করেন।

রাঢ়বঙ্গে বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং মনসা। সরস্বতী সুবিদ্যার দেবী—সেই জন্য তাঁহার পূজা মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে, আর মনসা জড়ি, বড়ি, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি কুবিদ্যার দেবী বলিয়া তাঁহার পূজা হয় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাদিনের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে। সরস্বতী শ্বেতপদ্মের পক্ষপাতী, কিন্তু মনসার তুষ্টি রক্তপদ্মে বা জবাফুলে। এই দুই বিদ্যাদেবীর পূজার দিনেই অরন্ধন। সরস্বতী পূজায় পঞ্চমীর পরদিন ষষ্ঠী দিন বাসি ভাত তরকারি খাওয়ার রীতি। মনসা দেবীর বিশেষ পূজা শ্রাবণ সংক্রান্তিতে—এই দিনটি মল্লভূমে 'মা-খল' বলিয়া অভিহিত। খলরূপিণী মাতার পূজা—তাই 'মা-খল' বলিয়া পরিচিত। মল্লভূমের অধি-বাসিগণ কেহ কেহ শ্রাবণ সংক্রান্তির পূর্ব-দিন রান্না করিয়া মা-খল দিনে বাসি ভাত-তরকারি আহার করেন। আবার কেহ কেহ শ্রাবণ সংক্রান্তিতে রান্না করিয়া ১লা ভাদ্র তারিখে বাসি ভাত-তরকারি খায়। সরস্বতী পূজার অরন্ধন দিনে শিল-নোড়ার বিরতি। মনসা পূজার অরন্ধনের দিন উনোনের বিরতি। ওই দিন উনোনের মধ্যে পাঁচ বা সাতটি পত্রযুক্ত সিজমনসার ডাল রাখিয়া তেল-সিঁদুর দিয়া পূজা করা হয়। দুধ ও চিঁড়ার ভোগ দেওয়াও হয়।

নাগপঞ্চমীর পরে যখন মল্লভূমে ধান্য রোপণের কাজ শেষ হয় তখন যে কোন শনি বা মঙ্গলবার ধরিয়া "খই-ধারা" বা মনসার "পালন" অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই দিন গৃহস্থগণ খই, দই, মিষ্টি ফল ইত্যাদি আহার করিয়া থাকেন। এই দিন গরম ভাত, লুচি, রুটি ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ। সর্পদেবী বংলবুড়ি এবং ধন-

বৃদ্ধির সহায়ক। সাপের স্বপ্ন সৌভাগ্যের এবং বংশবৃদ্ধির পরিচায়ক। 'ধই-ধারা' বা মনসার 'পালন' অনুষ্ঠানের মধ্যে উর্বরতা-বাদের (ফার্টিলিটি কাল্ট) আদিম সংস্কার পরিস্ফুট। ধই-ধারার অর্থ হইল—'ধন এবং বংশ ধারার মত বর্ধিত হউক।' অনুরূপ সংস্কার বিবাহের আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের পর "বসুধারা"। বাস্তুভিত্তিতে হলুদরঞ্জিত ন্যাকড়া, গোবর ও কড়ি দিয়া মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া ঘৃতের ধারা দেওয়া হয়। বিবাহের ফলস্বরূপ সন্তান ধারার মত বর্ধিত হউক—এই কামনা লইয়াই এই অনুষ্ঠান করা হয়। প্রাচীনকালে চেদি রাজা উপরিচর বসু ইহার প্রবর্তন করেন। তাই ইহা তাঁহারই নামানুসারে 'বসুধারা' হইয়াছে। ধই-ধারা মল্লভূমের লোকসংস্কার হইতে উদ্ভূত। ধই-ধারার পরবর্তী শনি বা মঙ্গলবারে মল্লভূমের অধিবাসীরা ক্ষীর-পিঠা বা মনসার 'পালন' অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ক্ষীর শব্দের অর্থ ঘন দুধ অথবা অমৃত। ক্ষীরোদ সাগর হইতে লক্ষ্মী ও সুধা উঠিয়াছিল। মনসার উৎপত্তির কিংবদন্তীতে বলা হয়, মনসা ক্ষীর নদী হইতে উদ্ভূতা। মল্লভূমে প্রচলিত মনসার গানের মধ্যে রহিয়াছে—

"যাকে আনতে যাব ক্ষীর নদীর কূলে।"

মল্লভূমের অধিবাসীদের ক্ষীরপিঠে (পরমান্ন ও পিষ্টক) বা মনসার 'পালন' অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্পদংশনজনিত বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষীর বা অমৃতের কামনা। মনসা ক্ষীর-নদী হইতে জাতা—অতএব তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত "পালন" অনুষ্ঠানে ক্ষীরপিঠা খাইলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে না।

শ্রাবণ সংক্রান্তি বা মাসের শেষ দিনে মল্লভূমে বিভিন্ন গুণী সাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাপ-খেলা দেখান। এই উৎসবটিকে "ঝাঁপান" বলা হয়। ঝাঁপান শব্দটির অর্থ চতুর্দোলা। গুণীরা চতুর্দোলায় বসিয়া সাপের খেলা দেখান বলিয়া ইহাকে "ঝাঁপান" বলে। ঝাঁপানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল "বাঘ-ঝাঁপান"। চতুর্দোলার উপর রক্ষিত জীবিত বাঘের পিঠের উপর বসিয়া গুণীদের সাপ-খেলা দেখাইতে হয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী মানুষে বিশ্বাস করে "বাঘ-ঝাঁপান" করা কঠিন কাজ—সকলের ইহা সহ্য হয় না। নানা অকল্যাণ বা অঘটন ঘটে। খুব বড় গুণী না হইলে "বাঘ-ঝাঁপান" করিতে কেউ সাহস করেন না। ঝাঁপান উৎসবে মল্লভূমের বিভিন্ন গুণী দল চতুর্দোলায় চাপিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন। রাজাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গুণী দল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। আপন আপন দলের সংগৃহীত সর্পগুলির নানাবিধ খেলা দেখাইয়া প্রত্যেকটি দল আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চান। গুণীদের সাপের

ঝাঁপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে জনৈক গুণীর সর্পক্রীড়া প্রদর্শন

খেলা আরম্ভ করার পূর্বে যথাবিধি প্রত্যেকে মনসাদেবীর বন্দনা গাহিয়া দেবীকে আপন আপন আসরে আহ্বান করেন। আবাহনের গান অতীব করুণ। ভক্তহৃদয়ের গভীর আকুতি ও আর্তি ইহার অক্ষরে অক্ষরে যেন ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

"একবার এসো মা আমার আসরে—
ধুলোয় পড়ে কাতর হ'য়ে ডাকি মা তোমারে।
একবার এসো মা.........মাগো...।"
ইত্যাদি।

আবাহনের পর গুরুবন্দনা, দেবদেবী বন্দনা, ভাসান ইত্যাদি গীত হয়। তাহার পর গুণীরা প্রথমে এক একটি করিয়া সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুলিতে থাকেন। পরে একই সঙ্গে অনেকগুলি বিষধর সাপের কোনটিকে মাথায়, কোনটিকে গলায়, কোনটিকে কাঁধে, কোনটিকে বাহুতে জড়াইয়া শিবের মত সাজিয়া খেলা দেখান। সাপ খেলানো অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ করার জন্য গুণীরা সাপগুলিকে নাকের ডগায়, কানের পাতায়, হাতের আঙুলে এবং ঠোঁটে ঝুলাইয়া দেন। সাপগুলি এই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকে। এই সময় গুণীরা খেলার মাঝে আপন আপন বিদ্যার বড়াই করিতে থাকেন আর "বিষম ঢাকি" বাজাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন—"বাজুক বিষম ঢাকি চলুক ঝাঁপান।"

ঝাঁপানে গুণীদের নিজ নিজ বিদ্যার পরীক্ষা অনেকটা একালের ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষার মত। ঝাঁপানে যে গুণী সাপের খেলা দেখানোতে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন তিনি সেই বৎসরের শ্রেষ্ঠ গুণী বলিয়া মল্লভূমে পরিগণিত হইবেন। মল্লরাজা তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দিয়া সম্মানিত করেন। পূর্বে জমিজমার বৃত্তি দিয়া বা টাকাকড়ি দিয়া সম্মানিত করিতেন। গুণীদের কৃতিত্ব দুই রকমের—(১) সাপের খেলা দেখানোর সময় সাপগুলিকে ইচ্ছানুযায়ী খেলানো, (২) অন্য দলের সাপ খেলানোতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। গুণীরা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া মারণ, চালন, কাটান এবং উড়ান ইত্যাদি মন্ত্র বলিতে থাকেন। অন্য দলের গুণীদের আক্রমণ করা, অন্যের মন্ত্রের কাটান করা, অন্যের মন্ত্রের আক্রমণ প্রতিহত করা যুগপৎ চলিতে থাকে। নিম্নে মল্লভূমে

প্রচলিত তিন শতাধিক বৎসরের ও প্রাচীন স্নাপন, চালন, উড়ান এবং কাটান মন্ত্রের কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হইল। মন্ত্রগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথিশালায় সংরক্ষিত মন্ত্রের প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃতঃ—

(১) পঙ্কী-সরবর চারিখানি ঘাট।
গোরু মানুষ জল খেতে নাই পায় বাট।
শুন শুন মাগো বিসের কাহিনী।
মন্তস্বরূপে আল্লাকার অন্টাণের—
কালকুটীর বিস হএ আলি পাণি।
ওঃ ডংক চিআও॥

(২) ভাউকার বৌড়ি চলিলেন ধান।
সরুআ কাপড়ে লাগিলেন ঘাম॥
সরুআ কাপড় নয় বিপরিত রা।
বাহুড় বাহুড় বিস মাণিক উপাড়॥
মাণিক উপাড়িতে মুক্তা ঝরে।
কালকুটীর বিস আজ্ঞাকে কংসরে॥
ওঃ ডংক চিআও॥

(৩) বিস-বান্দা—অমৃতকুণ্ডের বিস
জলে সরে বাট।
মহাদেবের আজ্ঞায় বিস
কুণ্ডলী দিয়ে থাক॥

(৪) ঐ কাটান—গঙ্গা দুর্গা কাদিএ বিকুল।
কুণ্ডলি ভেঙে বিস
আজ্ঞাক তুল॥
ঐ গঙ্গাসার—আধে লটপট চৌরে রহ
ছোর্ত্রিশ বিসকে
নির্বিষ কর।
ঠকাকে ঠকর হে চৌরে বাপ
ঘট বারিকো দুহাই॥

(৫) গুরী তেল মুণ্ডি তেল।
রঘুনাথ মাখি তেল।
বাগ তেল বাগিনী তেল।
বাগ কাঁপে বাগিনী কাঁপে।
লাগ ভেল্কি লাগ॥
রাজা কাঁর প্রজা কাঁর।
প্রজাকে কাঁর সাঁআল॥
ডাহিনে বাঁএ বসে আছে।
তাদিগে কাঁর কুজ্জার বিরাজ॥
কার আজ্ঞা—রাজা ভোজের আজ্ঞা॥
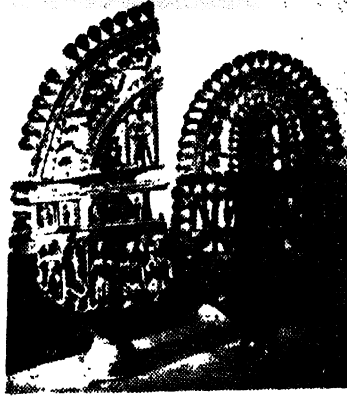
বৈষ্ণব কীর্তনীয়ার প্রতিমূর্তিসহ মনসারবরি
(সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত)

(৬) হু হু কপালা বিকট দাড়।
ছু ছু খাঁখি ঘোর অন্ধকার॥
আখর খাখর খোপাবন্দ।
ছায়াবন্দ মায়াবন্দ আনকুটি তৃসকোটি
রম্ভাবলী বন্দ॥
দেখন্তার চক্ষুবন্দ শুনন্তার কর্ণবন্দ।
মারন্তার বাহুবন্দ—কার আজ্ঞা
বড় বিস বাপ নরসীংহের আজ্ঞা॥

মল্লভূমের ঝাঁপান উৎসবে মনসা-মাতার আবাহন, ভাসান ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে মল্লভূমে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীতের তাল, লয়, রাগরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাঁপানে গীত গানগুলি জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, পাহাড়ী, খাম্বাবতী প্রভৃতি রাগের ছায়া-পুষ্ট। একদিকে উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, অন্য একদিকে শ্রীনিবাস আচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত কীর্তন—এই দুইয়ের আবেশে ঝাঁপান সমৃদ্ধ। ঝাঁপান গানে ব্যবহৃত তাল ধামার তালের অপভ্রংশ। ১৪ মাত্রার ধামারকে ভাঙিয়া বাঁকমগতি ১৮ মাত্রার একটি তাল ঝাঁপানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কীর্তন গানে ঝিঁঝিট রাগের প্রভাব সর্বাধিক। বৈষ্ণবধর্ম প্লাবিত মল্লভূমের ঝাঁপান গানে ওই সুরের অনুরণন তাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জয়জয়ন্তী রাগটি বর্ষার মেদুরতা ও কারুণ্য লইয়া সবহারানোর ব্যথা সৃষ্টি করে—পাহাড়ী রাগের মধ্যে সর্বহারাদের উদাস নৈরাশ্য অভিব্যক্ত। মল্লভূমের মৎস্যজীবী নরনারীর জীবনে সর্পাঘাত এবং সর্পাঘাতজনিত মৃত্যু নিত্য ঘটনা। মৃত্যুর আশংকা এবং মৃত্যুকে লইয়া রচিত ঝাঁপান গানে তাই উক্ত রাগ-রাগিণীর ভাবরূপ বার বার মূর্ত হইয়া উঠে। আসন্ন মৃত্যুর আশংকা আর মৃত্যু লইয়া এমন হৃদয়স্পর্শী, এমন মর্মান্তিক, এমন আকাশ বাতাস কাঁদানো সুর ঝাঁপান গান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন গানে আছে কি না সন্দেহ।

মল্লভূমের এখন শিকার করে উঠিয়া গিয়াছে। ১লা মাঘ ('এখান' বলিয়া মল্লভূমে অভিহিত) তারিখে মাছ খাওয়ার মধ্যে স্মৃতিটুকু রহিয়াছে। কিন্তু মা-খল দিনে (শ্রাবণ সংক্রান্তি) মল্লভূমের গুণীদের নিজ নিজ সর্পবিদ্যার পরীক্ষা পর্বটি আজও টিকিয়া আছে। মহারাজা চৈতন্য সিংহের আমলে মল্লরাজ্য ভাঙিয়া টুকরো টুকরো হইয়া যায়। একে একে সমস্ত সম্পত্তি ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। তারও বহুদিন পরে আজ মল্লরাজত্ব স্বপ্নসম টুটিয়া গিয়াছে। আজ আর মল্লরাজবংশের বংশধরগণ মল্লভূমের শ্রেষ্ঠ গুণীকে ঝাঁপান দিনে পুরস্কৃত করিতে পারেন না। বড় জোর একটি পুষ্পমাল্য দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তবুও ঝাঁপান আজও চলিতেছে—আজও নিয়মিত শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মল্লরাজ কেল্লার মেঘমেদুর সান্ধ্য আকাশ ঝাঁপান গানের করুণ মূর্ছনায় বেদনাবিধুর হইয়া ওঠে। যতদিন মল্লভূমির গুণীরা বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন ঝাঁপান হইবে। মল্লরাজা নষ্ট হইয়াছে। প্রবলপ্রতাপ মল্লাবনীনাথ বীর হাম্বীর, রঘুনাথ সিংহ, বীরসিংহ, দুর্জনসিংহ আজ মাত্র ইতিহাসের বস্তু। কাল সর্বস্ব হরণ করিয়াছে—কিন্তু লোক-সংস্কৃতিকে হরণ করিতে পারে নাই। মল্ল-ভূমের মনসাপূজাকে ঘিরিয়া খই ধারা, গোবর-বোঁড়, ক্ষীরপিঠে, পান্তা ভাত, মনসার ভাসান, আবাহন গান সেই একই কথা, একই সুরে, রাগ-রাগিণীর ভাবরূপে, তাল-লয় লইয়া যুগান্তরের বাধগুলিকে অতিক্রম করিয়া একইভাবে বহিয়া চলিয়াছে। মল্লরাজাদের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপানের আড়ম্বর, জৌলুশ কমিয়াছে। কিন্তু আজও ঝাঁপান দিনে গুণীরা মল্লরাজাকে সম্মান দেখান—আর আজও গুণীরা পুষ্পমাল্য-ভূষিত হন। যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রজার হৃদয়রাজ্যে—প্রেম ভক্তি নিষ্ঠার মধ্যে যাহার সুদৃঢ় বনিয়াদ, প্রবল রাজনৈতিক বিপর্যয়েও তাহার ক্ষয় নাই।

॥ ৮৬ ॥

অনেকদিন বাদে সূর্যকে আজ আবার খুব অস্থির মনে হচ্ছে। তোলপাড় চলছে বুকের মধ্যে। মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে যাচ্ছে চোয়াল, চোখের দৃষ্টি ধারালো। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে রূপলাল কত কিছু বলে যাচ্ছে, কিছুই শুনছে না সূর্য।

সূর্যর এই অস্থিরতা কিসের জন্য? তা সে নিজেই জানে না। এক সময় সে মাঠে মাঠে ঘুরেছে, না খেয়ে থেকেছে, জেল খেটেছে, হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে না গেলে তার ফাঁসীও হতে পারতো—কিন্তু সেই সব দিনগুলির জন্য তো তার মনে কোনো গর্ববোধ নেই। সে তো বিনিময়ে কিছু চায় নি কখনো। শুধু তার যে সব পরিচিত ব্যক্তি মারা গেছে, অজ্ঞাত থেকে গেছে, তাদের কথা মনে পড়লেই তার নিশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়। ওরাই ছিল সূর্যর বন্ধু, আর কেউ নেই এখন। সূর্যর মনে হচ্ছে বারবার, সে নিজেও যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় দুজন মন্ত্রী ভোট ভিক্ষা করছিল নির্লজ্জভাবে, এটা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। বারবার তার মনে হচ্ছে, একবার অন্তত মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ঐ শ্রীবাস্তব আর শাকসেনার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত ছিল। পরক্ষণেই আবার ভাবছে, না, না, আমার ওসব করা উচিত নয়। ওরা যা খুশী করুক, দেশটা জাহান্নামে নিয়ে যাক। আমি একা কি করতে পারি?

সূর্য যখন প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল, তখন সে ছিল প্রায় কিশোর। অনেকখানিই ছিল জেদ আর গোঁয়ার্তুমি। এরপর অনেকগুলো বছর গেছে, বাস্তব সম্পর্কে তার জ্ঞান হয়েছে, বই টইও পড়েছে অনেক। এখন সে জানে, এই পৃথিবীতে মানুষের অধিবাসের মধ্যে কত জটিলতা। মানুষের মঙ্গলের জন্য যে সমজব্যবস্থা তৈরি হয়, সেটাই আবার এক সময় মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। দু'এক শতাব্দী পর পর মানুষকেই সেই জন্য আবার সেই সব ব্যবস্থা ভাঙতে হয়। যারা এই ভাঙার কাজে অগ্রণী হয়ে পড়ে, তাদের সহজে ফেরার পথ থাকে না। কেউ সেই পথে খানিকটা এগিয়ে আবার ছিটকে পড়লে, তার মতন নিঃস্ব আর কেউ নেই। সে কোথাও আশ্রয় পায় না।

ভারতের এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য এই কথাই টের পাচ্ছে, তার নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। কোথাও সে মিলেমিশে থাকতে পারবে না। সে পরিত্যক্ত। অথবা, এখন তার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় সে অন্যদের আঘাত করে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে ওদের, সে ভাঙার কাজে নামতে পারে। অথবা মিশে যেতে পারে প্রতিবাদহীন গড্ডালিকার স্রোতে। এ বিষয়ে মনঃস্থির করাও সহজ কথা নয়।

রূপলাল বললো, এই তো দানোলি বাজারে এসে গেছি। আপনি কোন্ বাড়িতে যাবেন?

সূর্য দেখলো, দোকানপাট অধিকাংশই বন্ধ, পথে লোকজন কম, মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

সূর্য রূপলালের কথার কোনো উত্তর দিল না। একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। তার কিছুই মনে নেই। কোথায় সে বাড়ি খুঁজবে?

অন্ধ যেমন রাস্তা চিনে চিনে যায়, সূর্য সেইরকম ঘুরতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একটা সাদা রঙের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, এই যে!

বাড়িটা দোতলা, পুরোনো আমলের, সামনের দিকে এখন একটা কাপড়ের দোকান। দোকান বন্ধ, ওপর তলাটাও অন্ধকার।

রূপলাল জিজ্ঞেস করলো, এই বাড়িতে আপনার চেনা জানা কেউ থাকে?

সূর্যর এতক্ষণ কিছুই মনে পড়ছিল না, কিন্তু এখন তার কোনো সন্দেহ নেই,

এই বাড়িতেই তার শৈশবের কয়েকটা বছর কেটেছে। সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে, বাড়িটা দু' মহলা, সামনের দিকটা পার হলেই একটা সিমেন্ট বাঁধানো বড় চাতাল, তার এক পাশে একটা ইঁদারা। ইঁদারার উল্টো দিক থেকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরে টানা বারান্দা। বারান্দার পাশে একটা ছোট ছাদ।

সূর্য অন্যমনস্কভাবে তার বাঁ হাতের কনুইতে হাত দিল। একটা গভীর কাটা দাগ, অনেক দিনের পুরোনো। সূর্য একবার ঐ ছোট ছাদটায় আছাড় খেয়ে পড়ে হাত কেটেছিল।

হঠাৎ কি করে এসব মনে পড়ে যায়? কোথায় থাকে এসব স্মৃতি? তার একথাও মনে পড়লো, একদিন সে বাবার হাত ধরে মিঞা তানসেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিল। বাবা ওখানে প্রায়ই যেতেন, সংগীতের ওপর খুব ঝোঁক ছিল।

সূর্য রূপলালকে জিজ্ঞেস করলো, তানসেনের সমাধিটা কোথায়?

রূপলাল এই যুবকটির ধরন ধারণ বুঝতে পারছে না। সে বিস্মিতভাবে বললো, সেখানে যাবেন? এখন কি টাঙ্গা মিলবে?

সূর্য বললো, না, সেখানে যাবো না। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

—এ বাড়িতে যাবেন না?

সূর্য ভাবলো, তার জন্মস্থানটি দেখে তার কি খুব রোমাঞ্চ হবার কথা ছিল? বাবা কেন এখানে আসতে বলেছিলেন? অসুখের ঘোরে প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না। এখানে এসে তার তো নতুন কিছু বোধ হচ্ছে না। সামান্য কৌতূহল ছাড়া।

তারপর মনে পড়লো, তার জন্ম তো এ বাড়িতে নয়। তার মা তো অন্য বাড়িতে থাকতেন। মা মারা যাবার পর সূর্যকে এ বাড়িতে আনা হয়। কিন্তু আগের বাড়িটা চিনে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব, তখন সে খুবই ছোট ছিল।

সে বললো, না, এ বাড়িটা এমনি দেখতে এলাম। আচ্ছা, রূপলালজী, অনেকদিন আগে একজন মারা গেছেন, তিনি কোন্ বাড়িতে থাকতেন, সেটা কি খুঁজে বার করা যায় এখন?

রূপলাল বললো, কে?

সূর্য বললো, তাঁর নাম ছিল নাসিম আরা বানু। ডাক নাম বুলবুল। তিনি খুব নাচ গান জানতেন।

রূপলালের চোখ চকচক করে উঠলো। বললো, বাঈজী?

নিজের মা সম্পর্কে এরকম পরিচয় অপরের মুখে শুনতে কারুর ভালো লাগে না। কিন্তু সূর্য বিচলিত হলো না। বললো, হ্যাঁ।

—কারুকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।

—সেটা এ পাড়ায় নয়। বোধহয় জনকগঞ্জের দিকে।

—আমি বাঈজীপাড়া চিনি। যাবেন সেখানে?

—চলুন।

এ ব্যাপারে রূপলালের খুব উৎসাহ দেখা গেল। সে সূর্যকে নিয়ে চলে এলো অন্য একটা রাস্তায়। নিচু গলায় বললো, যে মারা গেছে তার খোঁজ নিয়ে কি হবে? আমার চেনা জানা দু'একজন বাঈজী আছে, গান টান শুনবেন? গোয়ালিয়র ঘরানার গান বড় মিঠি।

একটা বাড়ির সামনে একজন মোটা মতন লোক দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল। রূপলাল তাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। সে আবার রূপলালকে নিয়ে গেল অন্য কয়েকজনের কাছে। অনেক রকম কথা বলাবলি হলো। রূপলাল ফিরে এসে সূর্যকে বললো, না, ওরা ও নামে কারুকে চেনে না।

সূর্য একটু হাসলো। সে শুনেছিল, তার মায়ের রূপ এবং নৃত্যপ্রতিভার খুব খ্যাতি ছিল। একবার দেখে কেউ তাকে ভুলতে পারতো না। মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর এখানকার কেউ তাকে মনে রাখেনি। সূর্যর ইচ্ছে হচ্ছে, তার মায়ের সমাধির জায়গাটা একবার দেখে আসতে। মায়ের মুখখানাও তার মনে নেই।

সে রূপলালকে জিজ্ঞেস করলো, আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন। পুরোনো লোকেরা বোধহয় চিনতে পারবে।

এদিক ওদিক ঘুরে কয়েক জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হলো। কেউ কিছু জানে না, মৃত নর্তকীর সম্পর্কে কেউ উৎসাহই দেখাতে চায় না।

একজন শুধু বললো, আপনারা বুলবুলের কথা বলছেন তো? আমি জানি—আসুন, আমি বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

লোকটি খুব রোগা এবং লম্বা। মুখখানা ভয়-পাওয়া মানুষের মতন। হাঁটবার সময় বারবার পেছন ফিরে তাকায়। লোকটির বয়েস বছর পঞ্চাশেক, এ হয়তো জানতেও পারে।

লোকটা ওদের নিয়ে একটা মস্ত বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সূর্য তার স্মৃতিকে মুচড়ে মনে করবার চেষ্টা করলো, এই বাড়িতেই সে জন্মেছিল কিনা। কিছুই মনে পড়ছে না।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এলো দোতলায়। কয়েকটা ঘরের ভেজানো দরজা থেকে সরু আলো দেখা যাচ্ছে এখন, ভেতরে হার্মোনিয়াম ও ঘুঙুরের শব্দ।

একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল লোকটা। ঝলমলে শালোয়ার কামিজ পরা একটি যুবতী মেয়ে দরজা খুলে বললো, কি?

রোগা লোকটা বললো, মেহমান এসেছে।

রূপলাল হেসে বললো, কিন্তু বুলবুলের কাছে নিয়ে এসেছে। আপনার নাম বুলবুল বুঝি?

মেয়েটি হেসে বললো, জী।

রূপলাল কৌতুকের সঙ্গে সূর্যকে দেখিয়ে বললো, আমার এই দোস্ত আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইনি বলছেন, ইনি আপনাকে চেনেন।

মেয়েটি সূর্যর হাত ধরে বললো, আমিও তো অনেকদিন ধরে এঁকে চিনি। আইয়ে, অন্দর আইয়ে।

সূর্য একবার তাকালো মেয়েটির হাতের দিকে। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় তার হাত ধরেছে। সূর্য হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে। নিল না। মুখ তুলে মেয়েটির চোখের দিকে দৃষ্টি রাখলো। ঝকঝকে দুটি চোখ। গভীর ভুরু। মসৃণ কপাল। কানের লতির পাশে ঢেউ খেলানো দুই গুচ্ছ চুল। শিশুর মতন চিবুক। চিবুকটি সত্যিই বড় সুন্দর। হাত ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি রহস্যময়ভাবে হেসে বললো, পরদেশী, আমায় চিনতে পারছেন না? আমার নাম বুলবুল।

সূর্যও হেসে বললো, হ্যাঁ, চিনতে পারছি।

(ক্রমশ)

অর্থ ও অনর্থ

অবনীমোহন কুশারী

ইহুদী জাতির তুচ্ছার্থ (pejorative) নিয়ে Oxford English Dictionary-র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশেষ্য রূপের একটি অর্থ ত কঠিন সুদখোর বটেই, অপর অর্থটি আরোপ করা হয়েছে 'জ্যু' শব্দকে ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত করে, যার মানে লোকঠকান। এই অপপ্রয়োগ ইংরজী ভাষাভাষীদের এক দেশদর্শিতার নিদর্শন বটে, তবে একথাও সত্য যে ইহুদী জাতির আত্মাভিমান,—যথা 'বৃত জাতি', 'জাতি সমূহের লাবণ্য',—প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং সম্ভবত ভিন্ন জাতির লোকমুখে পালটা জবাবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এথেকে অনুমান করা যায় বাচ্যার্থ বহুলাংশে স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর এবং প্রচলিত শব্দেরও একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক আছে যার মধ্যে অর্থের ব্যাপ্তি ও বিভিন্ন সময়ের মূল্যায়ন বিধৃত রয়েছে এবং যা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের পছন্দ অপছন্দের ধার ধারে না। শুধু ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাকুল প্রকাশের চেষ্টা মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে আনন্দসূচক ধ্বনি, আর্তনাদ ও অন্যান্য অঙ্গভঙ্গীতে পর্যবসিত হয় কিন্তু সেই পুঞ্জীভূত আবেগ নিষ্ঠুর ভাবে দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ—দেহের দরজা অতিক্রম করে অপরের কাছে সহজে বোধগম্য কোন প্রতীকে (symbol) পরিণত হয় না। মানুষেরও কিছু আনন্দ-বেদনার ব্যক্তিগত (private) ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ; তার সঙ্গে কিছু ইঙ্গিত জুড়ে দিলেও অপরের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মে না, সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। ভাষার ব্যবহার তখনি সার্থক যখন এক-ভাষাভাষীদের মধ্যে তা দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রকাশ পায়।

একথা প্রায় সর্বসম্মত যে গদ্য-পদ্যের সীমারেখা অনিশ্চিত হলেও ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার কবিতায়। আমাদের বিষয়কর্ম স্বতন্ত্রধর্মী ভাষা। নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মত কিন্তু সেই একই শব্দসমষ্টির সঙ্গে আবেগ যুক্ত হলে তার পারম্পর্য বদলে যায়, জলে ঢেউ ওঠে এবং একটি নতুন রূপ চোখে পড়ে। আবেগ যেহেতু দেহমনেরই ধর্ম, ভাষার এই রূপ পরিবর্তনে কোন দেহাতীত পরম বা চরম সত্তার প্রকাশ নাই। এই আন্দোলন হয়ত জীবনধর্মেরই প্রতিফলন, জীবনের অন্তর্গত রহস্যেরই শিহরণ। মানবেতিহাসে লিপিবদ্ধ ভাষায় কবিতা গদ্যের অগ্রগামী, একথার এই মানে অসংগত নয় যে সভ্যতার উন্মেষে আবেগ যত জোরাল ছিল মনন তত নয়। এই প্রসঙ্গে স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে, আধুনিক কবিদের কবি প্রসিদ্ধির ব্যবহারে এত অনীহা কেন, কেন তাঁরা নতুন শব্দ সমষ্টির সন্ধানে হাতড়ে বেড়ান; পদে পদে হোঁচট খান।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের ভাষাকে যেভাবে গড়েছিলেন তার প্রাথমিক অভিঘাতকে প্রায় বিস্ফোরণ বলা যায়, কিন্তু অনুগামীদের বহু ব্যবহারে তার কিঞ্চিৎ মূল্যহ্রাস হয়েছে। টাঁকশাল থেকে বের হওয়ার সময় মুদ্রার যে দীপ্তি এবং ব্যঞ্জনা থাকে তা ক্ষীয়মাণ হওয়া স্বাভাবিক। যতদূর মনে পড়ে, শব্দরূপ মুদ্রাকে নতুন করে ঢালাই করা এবং পুরাতন ভাষাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে তার দ্যোতনার উৎকর্ষ সাধন কবিদের অবশ্য-করণীয়, একথা ফরাসী কবি স্তেফান মালার্মে বলেছিলেন, যাঁর আরেকটি স্মরণীয় উক্তি হচ্ছে যে কবিতা ভাব দিয়ে লেখা হয় না, শব্দ দিয়ে লেখা হয় অর্থাৎ ভাব যতই অভিনব হোক না কেন, উপযুক্ত প্রকাশভঙ্গী ব্যতীত তার অভিঘাত দুর্বল এবং অসার্থক। স্বভাবের লক্ষণগুলি মোটা-মুটি অপরিবর্তিত থাকলেও আবেগপূর্ণ বাক্যের কোন স্থায়ী রূপ নাই; কবি তাকে অভূতপূর্ব নব কলেবর দিতে পারেন। এই রূপান্তরের উপায়, ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর মতে 'ইন্দ্রিয়সমূহের সুচিন্তিত বিশৃঙ্খলা-সাধন (raisonne' dereglement de tous les sens—বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদ)। মরমী কবিদের কথা আপাতত না তুলে মৌলিকতার স্বরূপ কি এ-প্রসঙ্গে আশা যাক। যা নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সম্পর্ক নিরূপণ করে অথবা পুরাতন

তত্ত্ব ও তথ্যের নতুন সম্পর্ক রচনা করে তাকে মৌলিক বলে নির্দেশ করা যায় (relation of new facts or new relation of facts—) উভয় প্রকার মৌলিকতাই বিজ্ঞানের অভিপ্রেত। কবিকে নতুন তত্ত্ব এবং তথ্যের আবিষ্কারক বলা হয়ত যথাযথ নয়, বরঞ্চ তাকে পুরাতনের মধ্যে নতুন সম্পর্কের রচয়িতা বলে ভাবলে তার স্বভাব আমাদের কাছে সহজ বোধগম্য হয়। আবেগ এবং শব্দের সুচিন্তিত সংযোজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবের মাঝে কিরূপে নতুন সম্পর্ক রচনা করে তার কয়েকটি উদাহরণ এ-বিষয়ের দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে।

শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যে ভাবোন্মাদনা বঙ্গদেশকে ভাসিয়েছিল তার সঙ্গে সম্পৃক্ত অসংখ্য বৈষ্ণব কবিতা বহুলাংশে ছন্দমিল-যুক্ত মামুলী কথার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়, যদিও এতে বিষয়বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে যমুনাতীরবর্তী বংশী-ধ্বনির ধার করা সুর শোনা যায়। কিন্তু বিদ্যাপতির মত আকাশগঙ্গা সেখানে না থাকলেও কয়েকটি উজ্জ্বল তারকা চোখে পড়ে। "চলিতে না চলে পা/কিবা সে হিজল গা/রাজপথে নিতাইর নাট" (জ্ঞানদাস)। শুধু পথ চলার বর্ণনা, তা থেকে লোকটির মত্ততা অনুমেয়, সংস্কৃত-বহুল বাক্যের ঝংকার থেকে বঞ্চিত সাদা-মাটা কয়েকটি বাংলা শব্দযোজনা; পা সম্পূর্ণ ইচ্ছার বশবর্তী নয়, শরীর মাধ্যাকর্ষণে বিপর্যস্ত—সব মিলিয়ে একটি মাতাল মূর্তি কবির উদ্ভাবনে জন্ম নেয় যাকে নতুন সৃষ্টি বলা যায়। "সেই প্রেম দৃষ্টি-পাতে/এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অঙ্গেতে পড়ে/সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়/বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা....../" (রবীন্দ্র-নাথ—চিত্রাঙ্গদা)। চোখের দৃষ্টি দিয়ে স্পর্শন করিয়ে দেওয়া বৈষ্ণব কবিতায় একটি কবি প্রসিদ্ধিতে পরিণত হয়েছিল; রবীন্দ্র-নাথ সেখানে প্রয়োগ করলেন একটি চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি। তুলি ও রং-নামক বস্তুর সাহায্য ছাড়াই কল্পিত লাল রং স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে, যেখানে সে-রং শরীর মধ্যস্থিত হৃদয় নামক উৎস থেকে কামনা বাসনার তাড়নায় উৎসারিত হচ্ছে। "নাথুলা-সংকটে হাঁকে তিব্বতী হাওয়া/প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুম্বলহরি/হুগ্‌লি সায়র কার বহিত্র বাওয়া/অপর্ণ বলে দিয়েছে রহস ভরি/" (সুধীন্দ্রনাথ—জাতিস্মর)। নেহাত নিসর্গ বর্ণনা কিন্তু কয়েকটি শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগের ফলে জীবন্ত; হাওয়া তিব্বত থেকে আসছে তার exotic আকর্ষণ নিয়ে; নাথুলা গিরিসংকট তার সংকোচন দ্বারা তিব্বতীকে তীক্ষ্ণ ও বেগবান করছে; হুগ্‌লি সায়র বহির্জগতের ভাষায় আমেজ বয়ে আনছে; অপর্ণ বল পরোক্ষ-ভাবে বলে দিচ্ছে স্থানটির উচ্চতা। "শোনা গেল লাসকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে; কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে/যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/মরিবার হলো তার সাধ;/ (জীবনানন্দ—আট বছর আগের একদিন) পরবর্তী পঙ্‌ক্তিসমূহে যার বহুবিধ উচ্ছ্বাসের চিন্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ব্যবচ্ছেদাগারে সে শুধু বিচ্ছিন্ন হাড়গোড় ও রক্তমাংসের টুকরো—আপাতদৃষ্টিতে জীবনের এই পরস্পর-বিরোধী রূপ কবি উদ্‌ঘাটন করেছেন কয়েকটি অতি সাধারণ কথায়। জীবনের অদম্য আকর্ষণ সূচিত হয়েছে ফাল্গুন ও পঞ্চমীর যৌথ ইঙ্গিতে যা বসন্তোৎসবের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আত্মঘাতের রহস্যকে আরো ঘনীভূত করে।

যে অনুভূতি জড় ও জীব জগতের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং সে-হেতু যথার্থ, তা যতই অভিনব ও স্বতন্ত্র হোক না কেন, আত্মপ্রকাশের ভাষা তৈরি করে নেবেই এবং সর্বজনীন অবগতির জন্য জনসাধারণের দরবারে হাজির হবেই। এরূপ ক্ষেত্রেই কবির উদ্ভাবন শক্তি ভাষার পুনর্বি[illegible] করে নতুনের সৃষ্টি করে। এ-বিষয়ে [illegible]-রসায়নের (biochemistry) এক [illegible] প্রকার যোগের উল্লেখ করা যেতে পারে যার নাম isomer অর্থাৎ যে সব বস্তু কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমান সংখ্যক মূল ধাতুর সন্নিবেশে তৈরি কিন্তু জৈব পদার্থ হিসেবে সম্পূর্ণ পৃথক। কয়েকটি খুঁটিকে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে অনেক রকম ভাবে সাজানো যায়ই; বস্তুজগতে স্থান স্বভাবত ত্রিমাত্রিক হওয়াতে এই বিন্যাসের সংখ্যাকে বহু গুণে বর্ধিত করা যায়। শব্দ-গোষ্ঠীকে isomer সদৃশ ভাবলে তার প্রচ্ছন্ন উদ্ভাবন শক্তির সম্ভাব্যতা যে প্রায় অনন্ত তা স্বীকার করতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন এমন সংবেদনশীল মনের যে পুনরাবৃত্তিকে পরিহার করবে এবং নতুনকে গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত এমন পরিবেশ রচনা করবে।

মরমী কবিরা কি রূপরসগন্ধ-স্পর্শ-লব্ধ অভিজ্ঞতার বাইরে কোন অতীন্দ্রিয় জগতের সংবাদ আমাদের দিতে পারেন? তাঁদের দাবী অন্তত তাই, যেজন্য অনেকের মতে মরমী কবি এবং সাধক সমার্থবাচক। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য সাধন এবং ভক্তিবিহ্বলতা উভয়কেই বর্জন করতে চেয়েছেন এবং তার পরিবর্তে কান পেতে রয়েছেন আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে, যেখানে শুনতে পেয়েছেন গোপনবাসীর কান্নাহাসি, নিঃসঙ্গ নিশাচর পাখীর গান, বিবাগী ভ্রমরের গুঞ্জন এবং অনুভব করেছেন এমন একটি সত্তার অস্তিত্ব যা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম না হলেও সত্য হিসেবে কবির গানে রূপায়িত হয়। মরমী কবির এই আবেগ নিসর্গ প্রেম, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াশ্রয় থেকে বঞ্চিত একথা মনে করার কোন জরুরী কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে এমন মানুষ বিরল যে অশান্ত জীবনে একটি স্থায়ী আদর্শ বা আশ্রয় অনুসন্ধান না করে। মরমিয়া অনুভূতি এমন একটি প্রবোধ

বাক্যস্বরূপ বা জগতজগৎরূপতার ভীতিকে আড়াল করতে সাহায্য করে এবং অমরত্বের আশ্বাস দেয়। মানুষী দুর্বলতার কারণে এই আবেশ কখনো কখনো বৈজ্ঞানিককেও জন্মান্তরের স্বপ্ন দেখায়। জন্ম জন্মান্তর যতক্ষণ পর্যন্ত এই জনমেই ঘটে ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে তার কোন বৈপরীত্য নাই। এই চিন্তাপদ্ধতি সর্বজনীন সূত্র (Universal laws) অনুসন্ধানের নৈর্ব্যক্তিক অস্ত্র যা জড় ও জীব জগতের সর্ব স্তরে আলোকপাত করতে পারে। সৌন্দর্য এবং শ্রেয়বোধ জীবন-সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি এ প্রকার জড়বাদ মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদাবোধের হানি ত করেই না, বরঞ্চ মহৎ কর্মের প্রেরণা যোগায় এবং অনেক রকম কৃত্রিম আচরণ ছেঁটে ফেলতে সাহায্য করে। যদি নালীহীন গণ্ডনিঃসার (secretion of ductless glands) মানুষের মনে তুরীয় ভাবের সঞ্চার করতে পারে তবে সে-ভাবের উৎপত্তিস্থানকে স্বীকৃতি দিতে এমন কি আপত্তি থাকতে পারে?

আমাদের দেশে একজন বহু পঠিত ইংরেজ লেখকের নাম Aldous Huxley যিনি অতি আধুনিক য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ক্রোড়ে লালিত হয়েও শেষ জীবনে অদ্বৈতাশ্রম, যোগাভ্যাস প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের দেহমন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। মূলত ঔপন্যাসিক বলে তাঁর মতামতের নিগূঢ়ার্থ অনেক সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে; তাহলেও মানব মনের রহস্য তাঁকে নানা দেশের মরমিয়া সাধক এবং কবিদের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রাণ-রসায়নের মাধ্যমে মানুষ নিজের জড়ত্বের ভিতের সাহায্যে নিজেকে শূন্যে তুলে মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে কিনা এ বিষয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধ —"Drugs that shape men's minds" এই শিরোনামায় American Review-এর সৌজন্যে The Illustrated Weekly of India (July 8, 1973)-তে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এতে প্রাণরসায়ন ও জীববিদ্যাসংক্রান্ত যেসব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, বিশেষত L S D শব্দটি, তাতে মনে হয় প্রবন্ধটি তাঁর মৃত্যুর (1963) অনতিপূর্বে লিখিত। তাঁর মতে ড্রাগ গলাধঃকরণের মাধ্যমে মনের তুরীয়, তত্ত্বমসি (thou art That) বা সালোক্যের অনুভূতি প্রাপ্তি মানবেতিহাসের তুল্য পুরানো; এ পথের যাত্রায় বহু লোক অপরাধ এবং অনবধানতাজনিত দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে; প্রাণরসায়ন এবং জীববিদ্যার অগ্রগতির ফলে শীঘ্রই এমন নিরুপদ্রব পিল বাজারে চালু হবে যে মানুষের "chemical self transcendence"-এর পথে কোন সামাজিক বাধা থাকবে না। এর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাও হাক্সলিকে ভাবিয়েছে —মোক্ষের পিল যদি মানুষের সব রকম স্নায়বিক পীড়ন থেকে তাকে জীবন্মুক্ত করে দেয় তবে তার কর্মের প্রেরণা এবং দক্ষতার অপকর্ষ ঘটবে না ত? কোন একনায়ক জনসাধারণকে সস্তা পিলে অভ্যস্ত করে তাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা অপহরণ করবে না ত? মনের উপরে পিলের প্রভাবের সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি যোগ করলে উচ্চতর চৈতন্যবিশিষ্ট মানুষ তৈরি করা যায় কিনা তাও তিনি ভেবেছেন। হাক্সলির উপসংহার সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যাক:

"Those who are offended by the idea that the swallowing of a pill may contribute to a genuine religious experience should remember that all the standard mortifications—fasting, voluntary sleeplessness and self-torture—inflicted upon themselves by the ascetic of every religion for the purpose of acquiring merit are also, like the mind-changing drugs, powerful devices for altering the chemistry of the body in general and the nervous system in particular ....The breathing techniques taught by the yogis of India result in prolonged suspensions of respiration. These in turn result in an increased concentration of carbon dioxide in the blood; and the psychological consequence of this is a change in the quality of consciousness....But as Hebb, John Lilly and other experimental psychologists have recently shown in the laboratory, a person in a limited environment, which provides very few external stimuli, soon undergoes a change in the quality of his consciousness and may transcend his normal self to the point of hearing voices or seeing visions, often extremely unpleasant, like so many of Saint Anthony's visions, but sometimes beatific."

মনে হয় মরমিয়া অনুভূতির উৎস দেহের সীমারেখার বাইরে নয়, তা সে স্বতঃপ্রণোদিত বা পিল-প্রণোদিত হোক না কেন। মরমী কবিকে এমন শব্দসমষ্টি সঞ্চয়ন করতে হয় যাতে তাঁর বার্তা অনাবিষ্ট মনকেও স্পর্শ করে। এ প্রকার জীবনদর্শন স্বচ্ছন্দ দেহের এবং স্বতন্ত্র বুদ্ধির দ্বারা অধিগম্য। বেসুরো লাগে শুধু সেই উন্মাদনার দাবীকে যা প্রকাশ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ অস্বীকার করে কিন্তু আচারে ব্যবহারে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেয়, যেমন—"খুড়ো ধরো চশমাজুড়ি/আমি একটু দশায় পড়ি"। অস্তিত্বের একটি অখণ্ড রূপায়ণের প্রয়োজন স্বীকার্য হলে, জড়প্রকৃতি, জীবন এবং মানসের সামঞ্জস্য-বিধান মানুষের একটি কর্তব্য।

বিজ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবসমাজে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-বিচার থেকেই উদ্ভূত। বিশেষত ধর্মপ্রাণ এই ভারতবর্ষে রক্ত ও চারিত্রিক গুণাগুণ খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষ, প্রাণী ও জড় পদার্থকে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কাল্পনিক তারতম্য অনুসারে স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পবিত্র বা অপবিত্র বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছে মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের পরিপূরক কিংবা পরিপন্থী বিভিন্ন বস্তু ও আচার-বিচার। ধর্মীয় প্রেরণা প্রসূত পবিত্রতা ও অপবিত্রতার সামাজিক সংজ্ঞা তাই অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে অন্ধ কুসংস্কার বলে প্রমাণিত হয়। অথচ বিজ্ঞানবিরোধী এই ধর্মের কুসংস্কারের শেকড় যুগ যুগ ধরে এ দেশের সমাজের গভীরে প্রবেশ করে নিঃশেষ করছে আমাদের জীবনীশক্তি আর স্তব্ধ করছে আমাদের জাতীয় প্রগতি।

প্রথমে তথাকথিত চারিত্রিক পবিত্রতার কথাই ধরা যাক। এ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের গভীর বিশ্বাস যে, জন্মগতভাবে মানুষ কতকগুলি চারিত্রিক গুণাগুণের অধিকারী হয়। প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রচার করে আসছেন যে, ব্রাহ্মণ প্রধানত সত্ত্ব গুণের অধিকারী আর তেমনিভাবে রজ গুণ ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের, তমঃ গুণ ক্রমবর্ধমান হারে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের চরিত্রের প্রধান উপাদান। এ ধরনের কাল্পনিক চারিত্রিক পবিত্রতার ধারণার উপরই অনেকাংশে এ দেশে সেই ভ্রান্ত সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে যার উপর ভর করে অল্প সংখ্যক তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে চিরদিন শোষণ ও উৎপীড়ন করে আসছে। অথচ ঐতিহাসিক কিংবা বৈজ্ঞানিক কোন দিক থেকেই এ ধারণার বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বহিরাগত আগন্তুক আর্যরা এ দেশের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে চতুর্বর্ণ প্রথার সৃষ্টি করেন। কালক্রমে পেশা, ধর্ম, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থিক পটভূমি, সামাজিক আচার-বিচার প্রভৃতি বহু জটিল কারণ সমাবেশের ফলে দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চতুর্বর্ণ প্রথা সহস্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত জাতিভেদ প্রথায় পর্যবসিত হয়। চতুর্বর্ণ সৃষ্টির আদিপর্বে কিংবা পরবর্তী জাতিভেদের মূলে কোথাও চারিত্রিক পবিত্রতা বা অপবিত্রতা কাজ করেনি। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত যে মানুষ জন্মগতভাবে কোন চারিত্রিক গুণাগুণ অর্জন করতে পারে। এ তত্ত্ব আজ সমাজবিজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত যে, জন্মগতভাবে নয়, সামাজিক পরিবেশ থেকেই মানুষ আশৈশব চারিত্রিক গুণাগুণ আহরণ করে, আর পারিবারিক পরিবেশও এই সামাজিক পরিবেশেরই অন্তর্ভুক্ত। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণে মানুষের চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি এরূপ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তথাপি এ কথা প্রমাণ হয় না যে, জন্মগতভাবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক সত্ত্ব ও রজঃ গুণের অধিকারী, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাকী সবাই তমঃ গুণের ধারক ও বাহক। উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশই মানুষ উন্নত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী হয়, আর সমাজের সব মানুষের জন্য, বিশেষত পীড়িত গরিষ্ঠ অংশের জন্য, সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করাই মননশীল ও বিপ্লবী মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রমিক চারিত্রিক গুণাগুণের এই অলীক তত্ত্বের সঙ্গে রক্তের বংশানুক্রমিক চরিত্রবাহী ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিভিন্ন মাত্রার পবিত্র ও অপবিত্র রক্ত আছে, আর স্বকীয় পবিত্রতা বা অপবিত্রতার তারতম্য অনুসারে সে-রক্ত তার আধার রূপী মানুষের চরিত্র নিরূপণ করে, বিজ্ঞানবিরোধী এই উদ্ভট তত্ত্বের উপরই জাতিভেদভিত্তিক বিবাহ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, আর এ ধরনের বিবাহই জাতিভেদ প্রথার মূল উপাদান। এদেশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীরা আবহমান কাল ধরে এই তত্ত্ব প্রচার করে এসেছেন যে, পবিত্র রক্ত তাঁদের শরীরেই প্রবাহিত আর অপবিত্র রক্ত সব তথাকথিত নীচ শ্রেণীর লোকেদের শরীরেই বর্তমান। অর্থাৎ, এ দেশের মুষ্টিমেয় পরগাছা কুলের রক্ত পবিত্র, আর কোটি কোটি সব খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত অপবিত্র। তথাকথিত পবিত্র ও অপবিত্র লোকেরা প্রায় সবাই এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছে, আর নিজেদের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তরের পবিত্র ও অপবিত্র মানুষের শ্রেণীবিন্যাস করেছে। বংশানুক্রমিক রক্তের সঞ্চারের মাধ্যমে নিজেদের চারিত্রিক গুণ রক্ষার ভ্রান্ত প্রয়াসে সহস্র ভাগে বিন্যস্ত এবং অসংখ্য কুটিল আবর্তে আবদ্ধ জাতিভেদ প্রথাকে চিরায়ত করেছে।

কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে চরিত্রের সঙ্গে রক্ত কিংবা জীবকোষের কোনই সম্পর্ক নেই। রক্ত কিংবা জীবকোষ মানুষের দৈহিক আকার-প্রকার অনেকাংশে নির্ণয় করে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব কিংবা চরিত্রের সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। পারিবারিক ও সামাজিক

পরিবেশ, বিশেষত উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠিত হয়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে শূদ্র কিংবা অস্পৃশ্যের ঘরে উন্নত চরিত্রের অধিকারী মানুষ নিঃসন্দেহে গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিনিয়ত এ জিনিস ঘটছে। অপর পক্ষে, এসবের অভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ঘরে অনুন্নত চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব সর্বদাই সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জীববিজ্ঞানের মতে মানুষের রক্ত রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত এবং দূষিত কিংবা রোগমুক্ত বা বিশুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু পবিত্র বা অপবিত্র হতে পারে না। রোগাক্রান্ত রক্তযুক্ত মানুষ স্বাস্থ্যহীন হয় আর বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী স্বাস্থ্যবান হয়। এর সঙ্গে শ্রেণীভেদ জাতিভেদের কোন সম্পর্ক নেই।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতএব রক্তের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এবং তৎসংক্রান্ত চারিত্রিক উন্নতি বা অবনতি বলে কিছু নেই। ভারত-জাত এই বহুব্যাপ্ত ধারণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরোধী অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেও এই জাতীয় কুসংস্কার প্রাচীন কালে ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে একমাত্র ভারতেই এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাস প্রকট ও সর্বব্যাপী রূপে বর্তমান। বংশানুক্রমিক রক্তসঞ্চারেও অতএব তথাকথিত চারিত্রিক পবিত্রতার রক্ষণ কিংবা ক্ষতিসাধন সম্ভব নয়। জীবকোষের মাধ্যমে যা সঞ্চারিত হয় তা মানুষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রোগ বা স্বাস্থ্য, প্রকৃতি বা ব্যক্তিত্ব নয়। যে ব্রাহ্মণ পিতা স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শূদ্র পাত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ না দিয়ে রুগ্ন অশিক্ষিত এবং অনুন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন তিনি নিজ কন্যা এবং তার বংশধরদের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ শত্রু। তিনি পাপী, আর নরক ও বিদেহী আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তবে তিনি নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর সপ্তনরক গুলজার করবেন।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের মতে জীবকোষের সুদূরপ্রসারী সঞ্চারেই মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য উন্নত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকলে কালক্রমে জৈবিক অবক্ষয় দেখা দেয়। অনেক আধুনিক জীববিজ্ঞানী তাই উন্নত স্বাস্থ্যসম্পন্ন নির্বাচিত দম্পতির মিলনের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে উন্নত মনুষ্য জাতি সৃষ্টির পক্ষপাতী। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ প্রথা পবিত্রতার নামে মানুষকে অনিবার্য জৈবিক অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। খর্বকায়, শীর্ণদেহ, শক্তিহীন জাতির পক্ষে পৃথিবীর কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হয়ে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করা কদাপি সম্ভব নয়। দেশের বহুমুখী অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনও তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

(২)

খাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধেও অনুরূপ বিজ্ঞানবিরোধী কুসংস্কার আমাদের সমাজ জীবনকে দুর্বিষহ বাধা নিষেধে আড়ষ্ট করেছে, আর জনস্বাস্থ্যের করেছে নিদারুণ ক্ষতিসাধন। পবিত্র-অপবিত্র মানুষের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথা যেমন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের এক বেনজির বৈশিষ্ট্য তেমনি শুচি-অশুচি খাদ্যের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের জাতীয় খাদ্যাভ্যাসও জগতের মধ্যে এদেশের এক অবাক বৈশিষ্ট্য। এ কথা অনেক সময়ই আমাদের স্মরণ থাকে না যে, সারা দুনিয়ায় ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরামিষাশী। পরিব্রাজক ফা হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গুপ্তযুগের প্রথমেই ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল; বিশেষ করে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সকলেই নিরামিষাশী ছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহাত্মা গান্ধীর খাদ্য দর্শন, তাঁর ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদী নেতৃত্বের ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন পরোক্ষভাবে এক নিরামিষ প্রচার আন্দোলনে পরিণত হয়। গান্ধীজীর বিভিন্ন আশ্রম এবং সারা দেশময় হাজার হাজার গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র নিরামিষ আহারের প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করে। আমিষভোজীরা স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীতে পরিণত হন। পরবর্তীকালে সর্বোদয় আন্দোলনের মাধ্যমেও এ প্রচার অব্যাহত গতিতে চলেছে। অথচ একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশের সব মানুষই প্রধানত আমিষভোজী। সারা পৃথিবী অপবিত্র আর ভারতের এই কিছু মানুষই কি শুধু পবিত্র?

কি কারণে এ দেশে এমন বিস্ময়কর খাদ্যাভ্যাস গুপ্ত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে তা গভীর গবেষণার বিষয়। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধ জনমত গড়ে উঠেছিল এবং সে কারণেই নিরামিষ আহার এ দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। এ ব্যাখ্যা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর নয়। বুদ্ধদেব নিজেই মাংসভোজী ছিলেন এবং অতিরিক্ত পরিমাণে শূকরের মাংস ভোজন করে অসুস্থ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। সম্রাট অশোকের সময়েও খাদ্যের জন্য প্রাণিহত্যা অব্যাহত ছিল। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ দেশগুলিতে দেখা যায় যে, সেখানকার জনসাধারণ বহুকাল ধরেই গরু, শূকর সমেত সর্বপ্রকার আমিষ খাদ্য বিনা দ্বিধায় এবং সানন্দে গ্রহণ করে আসছেন। তা ছাড়া গুপ্ত-যুগে বৌদ্ধ ধর্ম এ দেশ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাল রাজাদের অধীনে যে বঙ্গদেশ একদা বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে নিরামিষভোজী নেই বললেই হয়। জৈন ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সম্ভবত গভীরতর। মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং নিরামিষ ভোজন উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। কিন্তু জৈন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকেরা ভারতীয় নিরামিষাশীদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

দ্বিতীয় প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, বৌদ্ধ, জৈন কিংবা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে নয়, হিন্দু ধর্মের অদ্বৈত দর্শনের প্রভাবেই এ দেশে নিরামিষ ভোজন চলে আসছে। কিন্তু এ যুক্তিও বুদ্ধিনির্ভর নয়। পূর্ণাঙ্গ দর্শন হিসেবে অদ্বৈতবাদ প্রধানত নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্যের সৃষ্টি। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই নিরামিষ আহার এ দেশে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। উপরন্তু দার্শনিক অদ্বৈতবাদ ইউক্লিডের আয়তনহীন বিন্দুর মতই একটি কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র। ইউক্লিডের বিন্দুর মতই যুক্তিতে কিংবা আদর্শ হিসেবে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও বস্তুত সমাজজীবনে এর রূপায়ণ সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃত সমাজজীবন দ্বৈতরূপেই বি[illegible]মান, যেমন প্রতিটি বিন্দুই বাস্তব ক্ষে[illegible] কিছুটা আয়তন নিয়ে বিরাজ করে। [illegible]রাচার্যের মত অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তাও শিবস্তোত্র প্রভৃতি দ্বৈতভাবাপন্ন শাস্ত্র রচনা করেছেন, এবং প্রার্থনা, পূজা প্রভৃতির সমর্থক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য বহু সাধক কালী প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপের উপাসক ছিলেন। এ সবই দ্বৈতভাবের উদাহরণ, কারণ অদ্বৈতভাবে শিব ও জীব, শক্তি ও শক্ত, উপাসক ও উপাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত অদ্বৈত দর্শনে এমনতর ভিন্ন ভি[illegible] নামই সম্ভব নয়। তান্ত্রিক মতবা[illegible] বিশ্বাসীরা অদ্বৈতবাদী হয়েও সবরক[illegible] খাদ্য গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বাম[illegible] বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি প্রখ্যা[illegible] সাধক অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হয়েও আমি[illegible] খাদ্য গ্রহণ করতেন। রামানুজের বিশিষ্টা[illegible] দ্বৈতবাদ এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদে[illegible]

ভিত্তিতে সংশোধিত শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব অদ্বৈতবাদে আমিষ আহারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যায় যে, অদ্বৈতবাদ উত্তমাংশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দার্শনিকের জ্ঞানযোগের ফলশ্রুতি হিসেবে চিন্তা-জগতের এক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। বাস্তব সমাজজীবনে স্বাভাবিক কারণেই এর কোন ঐতিহাসিক প্রতিফলন দেখা যায়নি। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্যকৃত 'সর্বদর্শন সংগ্রহের' প্রথম অধ্যায়ে চার্বাক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, নাস্তিকতাবাদ এবং পার্থিব ভোগবিলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দর্শনই জনসাধারণের প্রকৃত জীবনদর্শন এবং এই দর্শনের উচ্ছেদ সম্ভব নয় (দুরুচ্ছেদ্যং হি চার্বাক-দর্শনম)। মাধবাচার্যের মতে আমজনতা এই দর্শনে বিশ্বাসী বলেই চার্বাক দর্শনের আরেক নাম লোকায়ত দর্শন। অতএব অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টি চর-চরের সঙ্গে ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষ মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। যে বিরাট সাম্যময় বিশ্বচেতনার ফলে মানবেতর প্রাণীর প্রতি করুণায় মানব-নেত্রে অশ্রুবিন্দুর অভ্যুদয় ঘটে, অকল্পনীয় সে মহান চেতনার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এ দেশের সমাজজীবনে কোন কালে দেখা যায়নি। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাই তার সব-চেয়ে বড় প্রমাণ। এ দেশের যে করুণাসিন্ধু মানুষ মাছ, এমন কি ডিম খেতেও অস্বীকার করেন, যাঁদের দাবিতে গণতান্ত্রিক সরকার ভারতের বহু স্থানে আইন করে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ করেছেন, তাঁরাই অপর জাতের হাতের রান্না কিংবা জল খেতে ঘৃণা বোধ করেন, হরিজন শিশুকে পৈশাচিক উল্লাসে জীবন্ত দগ্ধ করেন, আর ঔষধ এবং খাদ্যে বিষ মিশিয়ে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করেন। ভণ্ডামিই কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য?

প্রকৃতপক্ষে আমিষ খাদ্য অপবিত্র আর নিরামিষ খাদ্য পবিত্র, এই ধর্মীয় কুসংস্কারই এ দেশে নিরামিষ খাদ্যের বহুল প্রচলনের প্রধান কারণ। ঠিক কবে থেকে এই কুসংস্কার এ দেশে দানা বেঁধে উঠেছিল বলা শক্ত। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য ধর্ম-শাস্ত্রে নিরামিষ ভোজনের কোন বিধান নেই। বরঞ্চ সবরকম খাদ্য গ্রহণই সে যুগে এ দেশে প্রচলিত রীতি ছিল। গুপ্তযুগ থেকেই সম্ভবত জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অন্যান্য কুসংস্কার জোরদার হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে পবিত্রতা-অপবিত্রতার তত্ত্বও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কালক্রমে উচ্চ জাতিদের অনুকরণে অনেক নীচ জাতিও নিরামিষ ভোজনের রীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতা কিংবা আরনলড টয়েনবি যাকে Indic Civilization বলেছেন, সে সভ্যতায় খাদ্যাখাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কুসংস্কার ছিল না। পরবর্তী কালের হিন্দু কিংবা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাতেই এ কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছিল।

এই কুসংস্কারের পেছনে আবার একটি অন্ধ বিশ্বাস কাজ করে। এবং তা হল এই যে, আমিষ খাদ্য কাম, ক্রোধ প্রভৃতি তমঃ গুণের বর্ধক, আর নিরামিষ খাদ্য সংযম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সত্ত্ব গুণের পরি-পূরক। গান্ধীজীও এই মতের প্রচারক ছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, বিশুদ্ধ নিরামিষ আহার ব্যতীত ব্রহ্মচর্য কদাপি সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান খাদ্যের এমন কোন চরিত্র উৎপাদনী শক্তি স্বীকার করে না। খাদ্য সহজপাচ্য কিনা, শরীরের পুষ্টি ও শক্তির পক্ষে সহায়ক কিনা, তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিবেচ্য বিষয়, আর এ দুদিক থেকেই আমিষ খাদ্য বিজ্ঞানের বিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। মহাত্মা গান্ধী আশৈশব বিশুদ্ধ নিরামিষাশী হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যৌবনে অতি মাত্রায় কামুক ছিলেন এ কথা তিনি নিজ আত্মজীবনীতেই লিখে গেছেন। আমিষ খাদ্য যে বিশেষভাবে কাম উৎপন্ন করে না, আর নিরামিষ খাদ্য যে মনুষ্যকে নিষ্কাম করে না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিরামিষাশী ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার। এ দেশের মনুষ্যের উৎপাদনী শক্তি যেন ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত থেকে সরে এসে শয়ন-কক্ষেই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছে। আধুনিক ভারতবাসী কিংবদন্তীর ষাট হাজার সন্তানের জনক সগর রাজারই যোগ্য বংশধর। নিরামিষাশী ভারতবাসীদের মত কামাসক্ত এবং যৌনজীবনে উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আর ক্রোধের কথাই যদি ধরা যায়, ফলমূলাহারী প্রাচীন মুনিঋষিদের যখন-তখন অভিশাপ বর্ষণ থেকে শুরু করে বর্তমান ভারতে জমি নিয়ে খুনোখুনি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যাপক রাজনৈতিক নরহত্যা ও ধ্বংসলীলা এবং হরিজন দাহ পর্যন্ত সবই বোধ হয় নিরামিষ ভোজনের সুফল। গভীর মহাবিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ অতিমানব স্বভাবসিদ্ধ করুণায় প্রাণি-হত্যা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকতে পারেন। কিন্তু এ-হেন মহামানব কদাচিৎ আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের নিরামিষ ভোজন শুধুই দুর্মর কুসংস্কার প্রসূত।

অনেকে অবশ্য খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্মীয় কুসংস্কারকে এই আপাতবৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেন যে, ট্রপি-ক্যাল বা গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতে আমিষ ভোজন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নিরামিষ ভোজনই উপকারী। এ যুক্তিরও প্রকৃতপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ট্রপিক্যাল জল-বায়ুতে অল্প কাজে তুলনাক্রমে অধিক শারীরিক শক্তি ব্যয়িত হয় এবং ফলে শরীরের পুষ্টির জন্য শীতপ্রধান জল-বায়ুর চেয়ে এ ধরনের জলবায়ুতেই প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। আর প্রধানত আমিষ খাদ্যই প্রোটিনের প্রয়োজন ভালোভাবে মেটাতে পারে। অতএব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-কোণ থেকে শীতপ্রধান জলবায়ুর চেয়ে গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতেই আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন বেশী।

এ দেশের আমিষভোজী মানুষের মধ্যেও খাদ্যবস্তুর পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে কুসংস্কারের অভাব নেই। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরোধী মনোভাব নিয়ে তাঁরা আবার বিশেষ বিশেষ আমিষ খাদ্যকে অপবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। অনেক গোঁড়া হিন্দুর কাছে আজ অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে, বিশেষত বৈদিক ভারতবর্ষে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কুসংস্কার আজকের চেয়ে অনেক কম ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বিভিন্ন বেদ, উপনিষদ, কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মনুসংহিতা, চরক-সংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রেই গরু খাবার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে বিভিন্ন ধরনের গরু বলি দেওয়া হত। গোমেধ যজ্ঞ ও মধুপর্ক অনুষ্ঠানে গোমাংস ভক্ষণ বহুল প্রচলিত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মেধাবী পুত্রকামনায় দম্পতিকে ঘি, ভাত ও বৃষমাংস এক সঙ্গে রান্না করে খেতে বলা হয়েছে। চরকসংহিতায় বলিষ্ঠ সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে গর্ভবতী নারীদের গোমাংস খেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চরক বলেছেন যে, গরু মহিষ ও শূকরের মাংস প্রতিদিনই ভোজন করা উচিত নয়। মনুসংহিতায় একমাত্র উট ছাড়া এক পাটি দাঁতযুক্ত আর সব প্রাণীকেই খেতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে অবশ্যই গরুও পড়ে। তা ছাড়া গণ্ডার ও অন্যান্য অনেক বন্য প্রাণী খেতে বলা হয়েছে যা আধুনিক হিন্দুরা শাস্ত্রমতে অখাদ্য জ্ঞান করেন। এমন যে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র, তিনিও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনিবর গোবৎস হত্যা করে অতিথি সৎকার করেছিলেন। 'উত্তররামচরিতে' লেখা আছে যে, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে

উপস্থিত হয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসকে যেন নেকড়ে বাঘের মত খেয়ে ফেললেন। সম্ভবত কারণেই অতিথিকে সে যুগে বলা হত গোঘ্ন। পরবর্তী কালে কৃষিপ্রধান দেশের আর্থিক প্রয়োজনে গোহত্যা বন্ধ হয় এবং এ নিষেধকে শক্তিশালী করবার জন্যই গরুকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়। গোমাংস ভক্ষণের সহস্র উদাহরণ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও নিজেদের হীনমন্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার প্রতি মৌলিক অন্ধভক্তিবশত এ দেশের কুসংস্কারগ্রস্ত সংস্কৃত পণ্ডিতেরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করে চলেছেন।

কিন্তু সে বিতর্ক নিরর্থক। প্রাচীন ভারতে গরু খাওয়া হত কিনা কিংবা মধ্যযুগীয় আরব দেশে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কিনা তা দিয়ে বর্তমান যুগের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাদ্যবিশেষ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা একমাত্র সে বিচারেই আধুনিক মননশীল মানুষের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করা বিধেয়। সেদিক থেকে খাদ্যের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা সম্পর্কে আমিষভোজীদের প্রায় কোন কুসংস্কারই ধোপে টেঁকে না। এই প্রসঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, একমাত্র হিন্দুরা ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশের সব মানুষই গরু খান এবং একমাত্র মুসলমানেরা ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব মানুষই শূকর খান, যদিও তথাকথিত উচ্চ জাতির হিন্দুরাও সাধারণত এ খাদ্য পরিহার করেন।

নিরামিষ আহার এক দিকে এ দেশের জনস্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করছে আর অন্য দিকে খাদ্য সমস্যাকে তুলছে তীব্র করে। প্রোটিন খাদ্যের অভাবে শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, উপযুক্ত পুষ্টি হয় না এবং সাধারণ শক্তিহীনতা দেখা দেয়। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ও উৎপাদনী উভয়ই হ্রাস পায়। আর স্বাস্থ্যহীন জাতির পক্ষে দেশের দ্রুত উন্নয়ন এবং অপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইকাফের (Econpmics Commission for Asia and the Far East) সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রাচ্য জগতের মানুষের চেহারায় কোমল-কান্ত শান্ত ও সৌম্য ভাব প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন খাদ্যের অভাবজনিত শারীরিক অপুষ্টিরই বাহ্যিক লক্ষণ। গুন্নার মিরডাল প্রমুখ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও এ তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ তথ্যের সত্যতা একদিন উপবাস করে আয়নায় মুখ দেখলেই সহজে বোঝা যায়। মানুষের প্রোটিন খাদ্যের পরিমাণ অনেক কম বলেই বোধ হয় তাদের চেহারায় শান্ত ও সৌম্য ভাব এত বেশী প্রবল।

আমিষ বর্জন কিংবা বিশেষ বিশেষ সহজলভ্য আমিষ খাদ্য পরিহার খাদ্য সমস্যাকে স্বভাবতই তীব্র করে তোলে। দুধ, ঘি, টাটকা এবং শুকনো ফল প্রভৃতি খাদ্যের মাধ্যমে প্রোটিন ও সাধারণ পুষ্টির অভাব পূরণ করা সম্ভব হলেও জনসাধারণের পক্ষে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ সমপরিমাণ পুষ্টির জন্য মাছ-মাংসের তুলনায় এসব খাদ্য অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়, আর অগ্নিমূল্য এসব দ্রব্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। একমাত্র ধনী নিরামিষাশীর পক্ষেই স্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব, কিন্তু তাঁরা আবার অতিরিক্ত দুধ-ঘি খাবার দরুন প্রায়ই মেদময়, বিপুলোদর এবং বিশালবপু হয়ে থাকেন। ফলে চাল, গম প্রভৃতির উপরই খাদ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার চাপ পড়ে এবং তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়, আর অভাব ও অপুষ্টি একই সঙ্গে মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে তোলে। প্রোটিনযুক্ত আমিষ খাদ্যও আজকাল দুর্মূল্য, কিন্তু তথাপি তুলনাক্রমে কম মূল্যে পুষ্টির উপযোগী পরিমাণ ক্রয় কিংবা সংগ্রহ করা বহু লোকের পক্ষেই সম্ভব, বিশেষ করে বিভিন্ন সহজলভ্য প্রোটিন খাদ্য সম্বন্ধে যদি কোন কুসংস্কার না থাকে।

আমাদের প্রতিবেশী চীন দেশেও জনসংখ্যা বিপুল। কিন্তু সেখানে খাদ্য সমস্যা আমাদের দেশের মত তীব্র না হবার একটি প্রধান কারণ এই যে, কুসংস্কারবর্জিত মহাচীনের মানুষ যে-কোন আমিষ খাদ্যই গ্রহণ করেন, এমন কি সাধারণ কীটপতঙ্গ থেকেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করেন। ফলে চাল-গমের উপর তাদের চাহিদার চাপ এ দেশের মত এত তীব্র আকার ধারণ করে না, আর জনস্বাস্থ্যও উন্নত হয়। খাদ্য সম্বন্ধে নানা কুসংস্কারের অজুহাতে এ দেশের মানুষের পক্ষে তাই চীনের জনগণের সঙ্গে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে হলে, দেশের আর্থিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে, আর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করতে হলে এ দেশের মানুষকে অবশ্যই খাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্বন্ধে প্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কার বর্জন করে বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস আচার আয়ত্ত করতে হবে।

(৬)

বিজ্ঞানবিরোধী পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাবশত স্পর্শ সম্বন্ধে বহু অন্ধ কুসংস্কারও যুগ যুগ ধরে আমাদের মনের গহনে বাসা বেঁধেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুসংস্কার বোধ হয় এই যে, তথাকথিত নীচ জাতিদের স্পর্শ করলে তথাকথিত উচ্চ জাতিদের শরীর ও মন কলুষিত হয়। এই অবমাননীয় কুসংস্কারে ভর করেই এ দেশের বিশ্ববিখ্যাত ও বীভৎস অস্পৃশ্যতা প্রথা হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর কোটি কোটি মানুষকে রেখেছে পশুর চেয়েও অধম করে। তথাকথিত উচ্চ জাতির পাষণ্ড হিন্দুরা গরু, কুকুর, বেড়াল ও অন্যান্য পশুপক্ষীকে বিনা দ্বিধায় স্পর্শ ও আদর করেন, কিন্তু অপবিত্র হবার ভয়ে কোটি কোটি মানবসন্তানকে স্পর্শ করেন না। এই স্পর্শ প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হলেও বিপদ ঘটতে পারে। অর্থাৎ, কোন নীচ জাতি যদি জল কিংবা খাদ্য স্পর্শ করেন এবং উচ্চ জাতি যদি সে জল কিংবা খাদ্য তারপর গ্রহণ করেন, তা হলেও স্পর্শ-দোষ থেকে অব্যাহতি নেই। অস্পৃশ্যতারই আরেক ভয়াবহ পৈশাচিক রূপ হল অনাগম্যতা বা কাছে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা, যার অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতেও ফাহিয়েন লক্ষ করেছিলেন। ভারতের অনেক জায়গায় আবার হরিজনদের উপর অদৃশ্যতা বিধি প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ উচ্চ জাতির লোকেরা তাদের চোখের সামনে আসতে নিষেধ করেন। ওড়িশা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি অনেক রাজ্যে হরিজনেরা এই নিয়মবশত রাত্রির অন্ধকারে কিংবা দিনের বেলা গলায় ঘণ্টা বেঁধে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। উচ্চ জাতিদের সঙ্গে এক রাস্তায় যাতায়াত করাও হরিজনদের নিষেধ, এবং এরকম সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধেই ত্রিবাংকুর রাজ্যের বাইকমে ১৯২৪ সালে এক বিখ্যাত সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া ভারতের সর্বত্রই হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা সর্বজনবিদিত। (পাছে হরিজনদের স্পর্শে বা নৈকট্যে দেবতা অপবিত্র হন!), এবং এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী আজীবন সংগ্রাম করেছেন, যদিও সে সংগ্রামের তীব্রতা সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে।

অস্পৃশ্যতা এবং তার চেয়েও ভয়ংকর এসব অমানুষিক আচার-বিচারের মূল কারণ এই অন্ধ কুসংস্কার যে, তথাকথিত নীচ জাতি বা ছোটলোকদের চরিত্র খারাপ, এবং তাদের স্পর্শ করলে, এমন কি সামনে পড়লে তথাকথিত উচ্চ জাতি বা ভদ্রলোকদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। সত্ত্ব এবং রজঃ গুণের অধিকারী উচ্চ জাতিরা তমঃগুণযুক্ত শূদ্রদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে অধঃপতিত হবেন, এই ভয়েই তাঁরা দূরে সরে থাকবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত। তিন গুণের সমাহারে মানবচরিত্র নির্মিত কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। সমাজবিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞান এ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই ঘোষণা করবে।

তথাকথিত ছোটলোকদের চেয়ে তথাকথিত ভদ্রলোকদের চরিত্র ভালো কিনা সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অনেকে সংগত কারণেই বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু সবার উপরে সত্য এই যে, অপর কেন মানুষকে স্পর্শ করে, তার ছোঁয়া খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণ করে, অথবা তার দৃষ্টির সম্মুখে পড়লে কোন লোকের চরিত্র কিংবা ব্যক্তিত্বের অবনতি হতে পারে, এই ভয়াবহ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এ-হেন ভয়ে যাঁরা সন্ত্রস্ত, প্রকৃতপক্ষে তাদের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব বলে কিছু আছে কিনা এ প্রশ্নই স্বাভাবিক।

ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত মানুষকে স্পর্শ করে কোন কোন ক্ষেত্রে শরীর রোগ-গ্রস্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার সঙ্গে পবিত্রতা-অপবিত্রতা কিংবা চারিত্রিক গুণাগুণের কোন সম্বন্ধ নেই, জাতিগত আচার-বিচারের তো নয়ই। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থানই এ ধরনের ছোঁয়াচে রোগের প্রসার বন্ধ করতে পারে। উচ্চ নীচ জাতির ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতার মাধ্যমে এর নিরোধ কিংবা প্রতিকার সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এ দেশের সমাজে সংক্রামক রোগের তুলনামূলক আধিক্যই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। নীরোগ কোন তথাকথিত অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করে উচ্চ জাতির লোক রোগাক্রান্ত হয়েছেন এমন কোন উদাহরণ নিশ্চয়ই কারও জানা নেই। অপর পক্ষে, রোগগ্রস্ত উচ্চ জাতির লোককে স্পর্শ করে নীরোগ নিম্ন জাতির লোকের পক্ষে রোগাক্রান্ত হওয়া খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে অতিভোজন বা অবৈজ্ঞানিক ভোজন, শ্রম-বিমুখতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলেই উচ্চ জাতির লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত হন। তুলনাক্রমে তথাকথিত নিম্ন জাতির লোকেরা খাদ্যাভাব এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপনের ফলেই রোগের কবলে পতিত হয়ে থাকেন। চরিত্রশুদ্ধি উচ্চ জাতিদের জন্যই বেশী প্রয়োজন। নিম্ন জাতিদের জন্য যা প্রয়োজন তা হল সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের ক্রান্তিকারী পরিবর্তন, জীবনমানের উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদের পুনর্বণ্টন, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং জনস্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন।

স্পর্শ সম্বন্ধে কুসংস্কার শুধু যে মানুষস্পর্শেই সীমাবদ্ধ তা নয়। বিভিন্ন দ্রব্যের কাল্পনিক পবিত্রতা কিংবা অপবিত্রতা অনুযায়ী স্পর্শের আইন তাদের প্রতিও প্রযোজ্য। আমিষ খাদ্যে চরিত্র পতনের ভয়ে যাঁরা ভীত, তাঁরা এরকম খাদ্য স্পর্শ করতেও আপত্তি করেন। এ দেশের একান্নবর্তী আমিষভোজী পরিবারের বিধবাদের প্রধানত ব্যয় সংকোচের উদ্দেশে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। অসহায় বিধবা মহিলারা শুধু যে এ অত্যাচার নীরবে মেনে নিয়েছেন তাই নয়, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অপবিত্রতার ভয়ে তাঁরা দৈবাৎ আমিষ বস্তু স্পর্শ করলে, এমন কি যে টেবিলে আমিষ আহার হয় সে টেবিল স্পর্শ করলে, স্নান করে পবিত্র হবার চেষ্টা করেন। মানুষের মলমূত্র অবশ্যই অপবিত্র গণ্য হয়, কিন্তু বড় রাস্তায়, অপরের জমিতে কিংবা অপরের বাড়ির সামনে মলমূত্র ত্যাগ করা কোন অপবিত্র কাজ নয়। নিজ বাড়ির মধ্যেও এ দেশের খুব কম পরিবারেই বাথরুম পরিচ্ছন্ন থাকে। এদিকে গরুর মলমূত্রের মত পবিত্র জিনিস হিন্দু শাস্ত্র মতে আর কিছুই নেই। পূজা-পার্বণ, স্নান-আচমন, প্রায়শ্চিত্ত, এমন কি পান ও আহারের জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা গোবর ও চোনা বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করেছেন। এই কুসংস্কার এতই গভীর যে, অনেক উচ্চশিক্ষিত আধুনিক হিন্দুকে এই উদ্ভট তত্ত্ব প্রচার করতে শোনা যায় যে, গোবরে মানবস্বাস্থ্যের পরিপূরক অনেক রাসায়নিক উপাদান আছে। আবার শুয়োর, ঘোড়া প্রভৃতি অন্যান্য জীবজন্তুর মলমূত্র অপবিত্র। কয়েক শ' বছর আগে থেকেই চীন ও জাপানে মানুষ ও শুয়োরের মল ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরাশক্তি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী। আর ভারতবাসীরা এসব অপবিত্র দ্রব্য জমিতে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বহুকাল ধরেই কৃষি উৎপাদনে প্রায় সব দেশের পেছনে পড়ে আছে।

(৪)

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যেই পৃথিবীর মানুষ এক দিকে আভ্যন্তরীণ আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি করে চলেছে, আর অন্যদিকে মহাবিশ্বের লোকে লোকান্তরে জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে। আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফলকাম হতে হলে ভারতবর্ষকেও বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর এ বিজ্ঞান-সাধনার প্রথম সোপান হল সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। সেদিক থেকে হাজার কুসংস্কারে প্রতিষ্ঠিত রক্ত, জীবকোষ ও প্রকৃতিগত পবিত্রতার ধারণা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, অনাগম্যতা, অদৃশ্যতা এবং বিভিন্ন খাদ্যাখাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা আর সাধারণ শুচিবাই বিজ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এবং অতএব ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি তথা আন্তর্জাতিক সফলতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। কুসংস্কারের এ মায়াজাল ছিন্ন করতে না পারলে কোন দিকেই ভারতের অগ্রগতি সম্ভব নয়। খর্বকায়, শীর্ণদেহ, জীবনীশক্তিহীন আমরা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থের বিয়ে হলে ব্রাহ্মণ পরিবার অপবিত্র হয় কিনা, এক কুয়ো থেকে উচ্চ জাতি ও নীচ জাতি জল তুললে উচ্চ জাতির জৈবিক ও চারিত্রিক অধঃপতন হয় কিনা, ডিম খেলে তমঃ গুণ বৃদ্ধি পায় কিনা, আর মাছ-খাওয়া টেবিল ছুঁলে বিধবার স্নান করা উচিত কিনা এসব বিচারে সময় কাটাব, বাইরের পৃথিবীর মানুষ তখন গ্রহান্তরে বসতি স্থাপন করবে। আর ধর্মপ্রাণ আমরা ছুঁতমার্গ আশ্রয় করে যুগ যুগ ধরে তাদের কাছে অর্থ আর অন্ন ভিক্ষা করে নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখব।

ব্যবহারিক ধর্ম প্রসূত অন্ধ কুসংস্কার ধ্বংস করে আমজনতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যাপক বিজ্ঞানভিত্তিক জনশিক্ষা। কিন্তু কেবলমাত্র জনশিক্ষার মাধ্যমে সমাজ-জীবনের গভীর কুসংস্কারগুলিকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষ, এমন কি বৈজ্ঞানিক জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, খাদ্যাখাদ্যের পবিত্রতা-অপবিত্রতা প্রভৃতি কুসংস্কারে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন। বিশেষত এ দেশের নারীসমাজে বিজ্ঞান-বিরোধী পবিত্রতা-অপবিত্রতার জ্ঞান এবং সাধারণ শুচিবাই অত্যন্ত প্রবল। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা যত শিক্ষিতই হোন না কেন। অতএব ব্যাপক বিজ্ঞানধর্মী লোকশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন এক বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সে বিপ্লবের বন্যা একই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ধর্ম, জাতিভেদ-শ্রেণীভেদ, অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার। বহুযুগসঞ্চিত ধর্মীয় কুসংস্কারের ভগ্নস্তূপের উপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে বিজ্ঞানের। আমাদের অন্ধকার মুমূর্ষু জীবনে ঘটবে নূতন আলোর সঞ্চার আর বিরাট শক্তির প্রকাশ। পেছিয়ে পড়া এই হতভাগ্য ভারতের পতাকা সেদিন ইতিহাসের মিছিলের প্রথম সারিতে উড়বে।

'আর্যদের দুর্গোৎসব'

দেশ পত্রিকায় (১২ই আশ্বিন ১৩৮০ সাল) শ্রীঅমলেন্দুনাথ ঘটক মহাশয় দুর্গা পূজা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আমি আমার কিছু মন্তব্য জানাইতেছি। পূজা শব্দের উৎপত্তি এইরূপ। তামিল বা দ্রাবিড় 'পু' শব্দের অর্থ ফুল—এবং 'জা' অর্থ উৎসর্গ করা—অর্থাৎ পূজার অর্থ পুষ্প উৎসর্গ করা। ঋগবেদ ১০।৯৭।৩ ও ১০।৯৭।১৫ অনুসারে পুষ্প অর্থ ফুল।

আর্যরা ভারতে আসার পূর্বে ভারতে দ্রাবিড় দেবতাদের 'পু' (অর্থাৎ ফুল) দিয়া সাক্ষাৎ করা হইত। আর্যদের দেবতা ছিল—ইন্দ্র, বরুণ, ইত্যাদি—। ইঁহাদের 'বলি' হিসাবে নাম বিভিন্ন ছিল, যদিও তাঁহার এক (ঋগবেদ ১।১৬৪।৪৬)। ইঁহাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি পাঠ ও ধন যশ পুত্রাদি কামনা হইত। বেদ ও বেদান্তে প্রতিমা পূজা নাই।

ঈশ ১২, যজুর্বেদ ৪০।৯ কেন ১।৬, ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১৫, শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।২১ প্রতিমা পূজার নিন্দা ও নিষ্ফলতার কথা বলিয়াছে। মৈত্রাউপনিষৎ ৬।৩ বলিয়াছে ঈশ্বরের অমূর্তরূপই সত্য—মূর্তরূপ মিথ্যা। গীতা ১৮।২২ ইহাই বলিয়াছে। তন্ত্রমতে দুর্গা পূজা হয়। মহা নির্বাণ তন্ত্র ১৪।১১২, ১১৮—১১৯, ১২৫ দেবী গীতা ৯।২৯—২৬, শিব সংহিতা, পীঠমালাতন্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে মাটি কাঠ, পাথরের মূর্তির পূজা—অধম এবং সর্বই বেদ বাহ্য। দুর্গা শব্দের উৎপত্তি তামিল 'তুর্কা' শব্দ হইতে। 'তুর্কা' শব্দের অর্থ "পৃথিবী"। শরৎকালে এই পূজা হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস শরৎকাল। দ্বাদশ মাসের মেষ হইতে আরম্ভ ও মীনে শেষ এই রাশিচক্রের সিংহ ও কন্যা রাশিতে যখন সূর্য অবস্থান করে তখন শরৎকাল। রাশিচক্রের ১২১ ডিগ্রি হইতে ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত এই রাশিদ্বয়ের অবস্থান। ইহার ঠিক পাশে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে—তাহার ইংরাজী নাম Centaurus—ভারতীয় মতে মহিষাসুর। ইংরাজী বা গ্রীক ভাষায় ইহার পরিচয় এইরূপ—মস্তক অশ্ব সদৃশ কিন্তু দেহ মনুষ্যাকৃতি। ভারতীয় মতে ইহার মস্তক মহিষ সদৃশ এবং দেহ মনুষ্যাকৃতি। বামন পুরাণ ১৭ ও দেবী ভাগবত ২।৫ অনুসারে ত্রিলোকী মহিষাসুরের জন্ম। একাক্ষর কোষ অনুসারে 'হা' শব্দ বা বর্ণের অর্থ শূন্য। বৌজগণিতানুসারে ইহার অর্থ শূন্য অয়ন যে স্থানে অর্থাৎ ক্রান্তিপাত বিন্দু, অগ্রহায়ণ শব্দের উৎপত্তি এইরূপ অগ্র—হা—অয়ন=

অগ্রহায়ণ মাস—ইহার অর্থ যে মাসের পূর্বে মাস ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ। উত্তর ক্রান্তিপাতে বৈশাখ এবং দক্ষিণ ক্রান্তিপাত হইতে কার্তিক মাস।

এইখানে মহিষ পশু মস্তক এবং দেহ মনুষ্য মানব দেহ হইতে এইরূপ জীবের জন্ম সম্ভব নহে। বায়ু পুরাণ ৬৬-৬৯, বিষ্ণুপুরাণ ২।১।৯ ও দেবী ভাগবৎ ৮ম মতে এই স্থান হইতে আশ্বিনের শেষ ও কার্তিকের প্রথম দক্ষিণায়ন আরম্ভ।

সিংহ কন্যা ও মহিষাসুর রাশি একত্রিত হইয়া শরৎকাল নির্দেশ করে। দুর্গা প্রতিমা তাহারই প্রতীক। এই কন্যা রাশিতে পেচক মণ্ডলী (coruws) নক্ষত্র বর্তমান। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার সময় সূর্য যখন এইস্থানে আসে তখন লক্ষ্মী পূজা হয়। এইজন্য পেচক লক্ষ্মীর বাহন। জগদ্ধাত্রী সিংহের পৃষ্ঠে কন্যা (জগদ্ধাত্রী বা জগতের অন্নদাত্রী) উপবিষ্টা। কুম্ভ রাশিতে যখন সূর্য আসে ফাল্গুন মাসে সরস্বতী পূজা হয়—কুম্ভ রাশি এই কালের নির্দেশক। কুম্ভ রাশির উভয় পার্শ্বে দুইটি নক্ষত্রমণ্ডলী আছে—একটির নাম বীণা (lute) অপরটির নাম হংস (cygnus)। দেবী সরস্বতী হাতে বীণা হংসে উপবিষ্ট। ভূমধ্য অঞ্চলে প্রস্তর খোদিত দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে—সেখানে ইনি কুমারী কন্যা (virgo) নামে পরিচিত।

হরপ্পা ও মোহেনজোদড়োতে ত্রিনয়ন বিশিষ্ট নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার মস্তকে মহিষ শিং আছে। ইনি ভারতের মন-খেমারদের উপাস্য দেবী ছিলেন। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, মন-খেমার কাস্পিয়ান, অস্ট্রেলয়েড, আলে পাইন নিগ্রো। ইহাদের হইতে ভারতের সিমারিরী (সাবর) তিব্বতী (মুণ্ডা), আসেরিয়ান (প্রাসুর) উৎপত্তি। ইহাদের বংশধরদের কাছে ক্রমাগত গরু যেমন পবিত্র হইয়াছিল ইঁহাদের কাছে মহিষও তেমনি পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। বেদানুসারে মন-খেমররা সম্বর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে সুম্ভ বা শাম্ভু, রামায়ণ ও মহাভারতে তাহারা শবর। ইহারা শরৎকালে শস্য সংগ্রহ কালের সময় মস্তকে মহিষ শিং পরিধান করিয়া নৃত্যগীত করিতেন। (The Racial History of India page 48 by Chandra Chakraborty.

সেই সময় তাহাদের অমূর্ত দেবী অনুত্তা (বসুন্ধরা) পূজিত হইত। অদ্যাপি ছোট নাগপুরে শরৎকালে দুইটি উৎসব হয়—একটির নাম সরুল, অন্যটি কর্মা।

প্রথমটি আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ—প্রচুর বারিবর্ষণ প্রার্থনা—অন্যটি কর্মা—ইহাতে প্রচুর শষ্য প্রার্থনা করা হয়। দুইটি উৎসবই শরৎকালে হয়। মন-খেমারদের নিকট হইতে ইহা দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত হয়। তামিল তুর্কা অর্থে পৃথিবী—ইহাই ক্রমক্রমে দুর্গা ও তৎপরে দুর্গায় পরিণত হইয়াছে। ইনি দুর্গা, অম্বা (মা), মরি অম্মা বা কোমতি কন্যা—অবিবাহিত কন্যা শ্রীবিদ্যা (লক্ষ্মী ও সরস্বতী) ললিথা অম্বিকা স্নেহময়ী মাতা। নবরাত্রি দশহারা ওনাম ইত্যাদি শস্য সংগ্রহকালের (harvest) উৎসব।

পাশ্চাত্য দেশে Virgoর (কন্যা রাশির কন্যার) দুই হাত। তিনি কুমারী কন্যা—তাহার এক হাতে 'যব' অন্য হাতে কাস্তে। ওই দেশের রাশিচক্রের কন্যার হাত—১০টি এবং নানারূপ অস্ত্রে সজ্জিত। Popular Hindu Astronomy Part 1 by Kalinath Mukhopadhyaya দ্রষ্টব্য ওই পরিবর্তন গণক কালিদাসের পুস্তকে দ্রষ্টব্য) পাশ্চাত্ত্য দেশে দেবী 'Demeter'—কৃষি দেবী। কৃষি দেবীর উৎসব (The festival of Demeter) গ্রীক প্রভৃতি দেশে শরৎকালে হইত। ইহাতে নৃত্য-গীত ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী হইত। একটি গরু উৎসর্গ করিয়া তিন নারীতে তাহা বধ করিত। Encyclopedia Britanica চতুর্দশ সংস্করণ 'Demeter' বলা হইয়াছে যে, তিনি দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাতা Great mother of the gods—Mater Deam Magna, earthly Ida—ইহার কারণ তিনি বিশ্বজননী ও অন্নদা। Crete দেশে ইনি পর্বতে অবস্থান করিতেন। সেই জন্য তাঁহার অন্য নাম পর্বত মাতা (mountain mother—Dictynna—যাহার অর্থ পার্বতী) তিনি সর্বদা দুই সিংহ দুই পার্শ্বে লইয়া চলিতেন। কথিত আছে Demeter যুবা Iasion (বিবস্বান—সূর্য) দেখিয়া কামোদ্দীপ্ত হইয়া পড়েন এবং crete যে ভূমি তিনবার কর্ষণ করা হইয়াছিল তাহাতে তিনবার সহবাস করেন। ইহার ফলে ধনদেব (Plutus) উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। গ্রীকেরা ইঁহার পূজা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ইহার নাম রাখেন সেরস (Ceres—ভারতীয় ভাষায় শ্রী)। রোমানদের মত ইঁহার আর এক নাম দেবী হার্থা (Hertha) যাহা হইতে earth শব্দের উৎপত্তি। (Encyclopedia Britanica 14th Edition—Heortha ও Demeter শব্দদ্বয় দ্রষ্টব্য)।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজশাহীর ভুঞ্যা রাজা কংসনারায়ণ খাঁ—তাঁহার পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব মত এই দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি 'বেদানুসারে চার রকম যজ্ঞ আছে। (ক) রাজসূয়, (খ) রাজপেয়, (গ) বিশ্বজিৎ, (ঘ) অশ্বমেধ। প্রথম চারি প্রকার যজ্ঞ স্বাধীন সার্বভৌম দিগ্বিজয়ী বীরের অনুষ্ঠান (কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ অচল। তবে আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য ঐরূপ এক যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া দিব।' (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য ডাঃ দীনেশ সেন দ্রষ্টব্য) শাস্ত্রী মহাশয়ই ওই পূজার বিধিগুলি লিপিবদ্ধ করেন। এবং ফসলী সনের পরিবর্তে ইহা বাংলাদেশে চালু হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১২।১২ ইহা শারদোৎসব বলিয়া বর্ণিত আছে।

দুর্গা দেবী কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে অম্বা বা অম্বিকা, গুজরাটে হিংগলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা, কুমারিকা প্রদেশে কন্যাকুমারী এবং অন্য স্থানে নবরাত্র উৎসবরূপে পালিত হয়। ওই নবরাত্র নেপাল, ভুটান, তিব্বত, সিকিম দেশে ইহা দুর্গা পূজার হেরফের। বৌদ্ধরও এই উৎসব করিয়া থাকেন। জাপানে একটি মন্দিরে চনণ্টী দেবী 'চণ্ডী' দেবীরই নাম। চীন দেশে ক্যানটন শহরে একটি শত হস্ত দেবীর মূর্তি আছে এবং বৌদ্ধ মহাযান বজ্রতারার উল্লেখ আছে। ইঁহার সহিত 'দুর্গা' দেবীর সম্বন্ধ সন্দেহজনক।

ঋগবেদের দেবীসূক্ত ১০।১২৫ ও কেনোপনিষদের ১।২।৪র সঙ্গে 'দুর্গা' দেবীর কোন সম্পর্ক নাই।

দুর্গাদাস পাত্র
রাঁচি-২

বিহারের বাংলা

দেশ পত্রিকায় গত ৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী মঞ্জুলি ঘোষের প্রবন্ধ এবং এ সম্বন্ধে গত ৩৮ সংখ্যায় আলোচনা স্তম্ভে শ্রীসুবিমল বসাকের এবং ৪১ সংখ্যায় শ্রীজয়ন্তকুমার দত্ত ও রথীন দে ও ৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী সুলেখা দে'র লেখার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করবার প্রয়াসী। শ্রীদত্ত মহাশয় লিখেছেন, ভদ্র বাঙালীদের মুখে তিনি হিন্দী মিশ্রিত বাংলা শোনেন নি।

আমি একজন প্রবাসী বাঙালী। বেশ কিছুদিন থেকে কর্ম-উপলক্ষে বিহারের সিংভূম জেলার কিরিবুরুতে অবস্থান করছি। যে কিরিবুরু শাল মহুয়া ও পলাশ গাছে ঘেরা বোনাই পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। এই অবস্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসাবে আমি এটুকু বলতে চাই, শ্রীদত্তের উল্লিখিত উক্তি শুধু অবাস্তবই নয়, আপত্তিকরও বটে।

বিহারের হিন্দী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসকারী বাঙালীদের বাংলা ভাষা হিন্দী দ্বারা প্রভাবিত হবে এটা স্বাভাবিক কথা। আশা করি এর জন্যে নতুন করে উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই।

বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাস যদি আমরা দেখি, তা হলে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ে, তা হল সময়ের অর্থাৎ যুগের সাথে সাথে বাংলা শব্দের রূপান্তর। আদি যুগে বাংলার 'ভনহ' (বলা অর্থে) মধ্য যুগে 'ভনে' এবং আধুনিক যুগে এই শব্দই রূপান্তর হয়ে হয়েছে, 'বলে'।

বহু বিদেশী ভাষা—আরবী, ফারসী, ইংরেজী, ডাচ, চীনা, জাপানী প্রভৃতি এবং ভারতের আঞ্চলিক ভাষা; হিন্দী, তামিল, গুজরাটি, ওড়িয়া প্রভৃতির অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ রচিত নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি দত্ত মহাশয় নিশ্চয়ই পড়েছেন বা শুনেছেন—

'পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে......'

দত্ত মহাশয়ের অবগতির জন্য জানানো যেতে পারে, 'বাদল' শব্দ প্রকৃতপক্ষে হিন্দী শব্দ, যা ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হচ্ছে। শুধু একটা শব্দই নয়, বহু বিদেশী শব্দ এবং ভারতের আঞ্চলিক ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শ্রীদত্ত মহাশয় কোন্ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এমনি ধরনের উক্তি করেছেন আমি জানি না। তাঁর অভিধানে ভদ্র বাঙালী এবং অভদ্র বাঙালী নির্ণয়ের সংজ্ঞা আরও কিছু আছে কিনা তাও আমার জানা নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজের মতামত প্রকাশ করা সাংবিধানিক অধিকারের বহির্ভূত নয়। আর নয় বলেই ব্যক্তিগত চিন্তাধারা পত্র-পত্রিক মারফত প্রকাশ করা চলতে পারে। তবে সেই চিন্তাধারা যদি বাস্তব এবং যুক্তিনিষ্ঠ না হয়ে, শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়—বিহারে বসবাসকারী এক বিরাট বাঙালী সম্প্রদায়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ করে তা হলে সেটা প্রকাশ করবার আগে ভেবে দেখা দরকার। শ্রীদত্ত মহাশয়ের অবগতির জন্য জানানো যেতে পারে, 'বিহার বাঙালী সমিতি' নামে সমগ্র বিহারে বসবাসকারী বাঙালীদের একটা সমিতি আছে। যে সমিতির সাথে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে যুক্ত। পাটনা, কদমকুঁয়া থেকে বিহার বাঙালী সমাজের মুখপত্র 'সঙ্কেত' প্রকাশিত হয়। দত্ত মহাশয় কি এই 'সঙ্কেত' পড়েছেন? মনে হয় না। কেননা, পড়লে এমন ধরনের উক্তি করবার প্রয়াসী হতেন না।

দত্ত মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদে শ্রীমতী সুলেখা দে বিহারবাসী বাঙালীর মিশ্রিত ভাষার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা বাস্তবতার দাবি রাখে। তবে শ্রীমতী দে, তাঁর লেখার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ পাঠকের প্রশ্ন এড়াতে সক্ষম হননি। কোন জীবন্ত ভাষা তথা বাংলা সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি যে আলোকপাত করেছেন সে বিষয়ে হয়ত বা কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু হিন্দী অধ্যুষিত এলাকায় মিশ্রিত ভাষার বাস্তব প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বিহারের হিন্দী অধ্যুষিত এলাকায়, হিন্দী শব্দ বাংলা ভাষায় যে স্থান করে নিচ্ছে, অর্থাৎ বিহারে বাংলা ভাষায় হিন্দীর অনুপ্রবেশে যে মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগ হচ্ছে, তা শ্রীমতী দের উপস্থাপিত বাংলা ভাষা সমৃদ্ধির দৃষ্টান্তের আওতায় পড়ে কি?

বাংলা ভাষার রীতি অনুযায়ী, হিন্দী শব্দ যদি বাংলা ভাষায় মিশ্রিত হয়, তা হলে চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু বিহারে হিন্দী অধ্যুষিত এলাকায় বাংলা ভাষার রীতি অনুযায়ী হিন্দী শব্দ মিশ্রিত হচ্ছে কি?

এ বিষয়ে গত জুন মাসের 'বিহার বাঙালী সমিতির মুখপত্র 'সঙ্কেত'-এ প্রকাশিত 'মাতৃ ভাষার নমুনা' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া চলতে পারে:

"বিহারে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছরের আই এ পরীক্ষার বাঙলার প্রশ্নপত্রে মাতৃ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক একটি রচনা লিখতে দেওয়া হয়। তার উত্তরে, বাঙলা ভাষার প্রতি বাঙালী ছাত্রদের যে অকৃত্রিম অনুরাগ এবং দক্ষতার নমুনা পাওয়া গেছে......।"

"মাতৃ ভাষা মাঁর ভাষা। মাতৃ ভাষার পড়াই করা সকলের কর্তব্য।......মাতৃ ভাষা ছোটদের বচপান থেকেই দেওয়া উচিত। মাতৃ ভাষাই শিক্ষার প্রথম চাড় বা ভিত্তি। মাতৃ ভাষার ভিত্ যদি কমজোড় থাকে তাহা হইলে সমস্ত জীবনটাই কমজোড় পড়িয়া যাইবে...।'

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে হিন্দী মিশ্রিত যে বাংলা ভাষা পাওয়া যাচ্ছে তা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবে, না বিকৃত করবে?

অতুলচন্দ্র মৈত্র
কিরিবুরু, বিহার

॥ ২ ॥

গত ৩৮ সংখ্যা (৫ই শ্রাবণ ১৩৮০) দেশে বিহারের বাংলা শীর্ষে শ্রীসুবিমল বসাকের লেখা পড়ে বেশ বিস্ময় বোধ করলাম। উনি কোথা থেকে ওই উদাহরণগুলি সংগ্রহ করলেন? আমরা জন্মাবধি বিহারেই আছি, কিন্তু ওই রকম বিচিত্রভাবে কাউকে কথা বলতে শুনিনি।

শ্রীবসাকের সমর্থনে শ্রীমতী সুলেখা দে'র লেখাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। উনি

ভারত শিল্প : নির্মলকুমার ঘোষ। ফর্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা। তিরিশ টাকা।

বাংলা ভাষায় শিল্প সম্বন্ধে পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম; চারুকলার সমীক্ষা পাঠ করার মত পাঠক এ-দেশে পাওয়া কঠিন মনে করে ওবিষয়ে কিছু লেখার কথা বড় একটা কেউ চিন্তা করেন না। পণ্ডিত লেখকের অভাব নেই, লেখকের অভাব। নির্মলকুমার ঘোষ সুপণ্ডিত এবং তাঁর লেখার ভাষাও মার্জিত, সুসংযত এবং স্পষ্ট। অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন যা আগে কোনও প্রবন্ধে পাওয়া যায় নি, অথচ তা ইংরেজি শব্দের যথার্থ প্রতিভাষ।

এ গ্রন্থে ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং কলা শাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে। লেখকের বিদ্যা পুঁথিগত নয়, বহু দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন জ্ঞান অর্জনে। সুতরাং ব্যক্তিগত মতামতও লেখক প্রকাশ করেছেন আত্মবিশ্বাসে ভর করে। ইতিহাসের ওপরেই জোর। ইতিহাস না জানলে প্রাচীনকালের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব নয়, লেখকের ঐতিহাসিক পর্যালোচনাগুলি পড়তে বস্তুতঃই ভাল লাগে। শুধু ভারতবর্ষের চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ নয় কথা প্রসঙ্গে নেপাল, সিংহল, তিব্বত, খোটান, ব্রহ্মদেশ মালয়, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, লাওস ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার শিল্পকলাও এসে পড়েছে। ওসব দূর প্রাচ্যের কলা-কৌশল এবং দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের আত্মীয়তা অনস্বীকার্য।

'স্থাপত্য তত্ত্ব' সম্বন্ধে যে অংশে পর্যালোচনা হয়েছে সেইটি বোধ করি পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

ব্যক্তিগত সমীক্ষা ছাড়াও শিল্পী বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত উপস্থাপিত করেছেন পুস্তকটিতে, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে আনন্দকুমার স্বামীর অভিমত। কুমার স্বামীর মতামতই আজ সারা পৃথিবীতে গৃহীত, সুতরাং মতান্তর নেই।

কোনও কোনও অংশে কিছু বিতর্কিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সন্দেহ হয়। আর কিছু মতামতও, যাঁরা ভারতশিল্প সম্বন্ধে কৌতূহলী এবং গবেষণা করছেন, হয়ত মেনে নিতে পারবেন না।

লেখক একই গ্রন্থে নানা বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন, কিন্তু সব সময় সব আলোচনা সম্পূর্ণ হয়েছে এ কথাও জোর করে বলা যায় না। তা হলেও প্রচেষ্টা সাধু এবং প্রশংসনীয়। শুধু আর্ট হিসট্রীর ছাত্রদের কাছেই নয়, শিল্পীদের কাছেও এই গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য হবে আশা হয়।

দর্শন

ABC of Satya Dharma & its Philosophy. Surendranath Sen Gupta. Das Gupta & Co. Private Ltd., Calcutta-12. Rs. 13.00.

গ্রন্থখানিতে সত্যধর্ম ও তার দার্শনিক বিচার ব্যাখ্যা বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সত্যধর্ম, ঈশ্বর, সৃষ্টি এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়—মোট চারটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদে গ্রন্থের বিপুল বিষয়বস্তু বিন্যস্ত। ব্রহ্মের উপাসনা, ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরসাধনায় সাধকের গুরু সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ, সৃষ্টিরহস্য, বেদান্তদর্শনের স্বরূপ, দেহ এবং আত্মার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি দুরূহ এবং জটিল বিষয়গুলি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সত্যধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লেখকের অভিপ্রেত হলেও প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় দর্শনচিন্তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কন করে বিষয়ের মধ্যে ব্যাপক এবং গুরুত্ব সৃষ্টি করতে লেখক প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে বিষয়বস্তু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, এজাতীয় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাসমৃদ্ধ গ্রন্থে সরসতা প্রত্যাশা করা যায় না। এতদ্বিষয়ে যারা অনুসন্ধিৎসু তাঁরাই এজাতীয় গ্রন্থপাঠে আনন্দ লাভ করবেন। তথাপি লেখকের পাণ্ডিত্য এবং মনীষার সঙ্গে সাধকোচিত উপলব্ধির এক বিরল অন্বয় ঘটায় এবং প্রতিটি বিষয় যুক্তিসহ এবং প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হওয়ায় বিষয়বস্তুর আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছে। যে কারণে, ভারতীয় ধর্ম-দর্শন বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকমাত্রের কাছেই গ্রন্থখানি আদরণীয় হবে।

ধর্ম

ভাগবতী কথা। বিভাবতী দেবী। প্রাপ্তিস্থান : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। দাম দশ টাকা।

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী ইতিপূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে ভক্ত পাঠকদের প্রশংসা-ধন্য হয়েছিলেন। সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্দের অনুবাদও পুস্তক করে প্রকাশিত হতে দেখে অনেকেই পরম আনন্দবোধ করবেন। অনুবাদিকার কাব্যশক্তির প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি, বর্তমান গ্রন্থে নতুন করে যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে, অতি সরলীকৃত ভাষায় সাহায্যে অনুপম চিত্রকল্প রচনা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী নিয়ে বাংলায় আরো কিছু বই আমরা পড়েছি, কিন্তু এই গ্রন্থের স্বাদ তাদের থেকে আলাদা। এখানে লেখিকার ভক্তিনম্র অথচ ব্যক্তিত্বের যেমন প্রকাশ আছে তাঁর রচনার মধ্যে, তেমনি আছে ঘটনা বর্ণনায় কৌতূহল ও নাটক গড়ে তোলার ক্ষমতা। তাই ধর্মগ্রন্থের আগ্রহী পাঠকরা বহুশ্রুত এই ঘটনাগুলিও একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়তে পারেন না। ভাষার মাধুর্য এবং ছন্দের সাবলীলতা ছাড়াও গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভক্তি ও ভাবের অনুপম সমাবেশ — যা পাঠকচিত্তকে অনায়াসে আপ্লুত করে। তিনটি স্কন্ধ ও মোট ৬২টি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা রহস্য যে রকম ভক্তি ও নিষ্ঠায় চিত্রিত তা এ দেশের বাংলা ভাষায় রচিত ধর্মপুস্তকের জগতে নিঃসন্দেহে এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুবাদ

বহুরূপী। এডগার ওয়ালেস। অনুবাদ: এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। ব্লু-বেল পাবলিশার্স। ১২৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। আট টাকা।

কোন একটি অভিজাত পরিবারে মালীর ছেলে হয়ে জন্মেছিল অ্যালান ওয়েমবারি। নিজের প্রতিভা এবং যোগ্যতায় সে হল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্পেকটর। পুলিসের ঝানু অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ওয়াল্‌ফোর্ড তারই ওপর দিলেন দুর্ধর্ষ অপরাধী 'বহুরূপী'কে খুঁজে বের করার দায়িত্ব। বিভিন্ন নামে এবং নানা ছদ্মবেশে এই লোকটি সারা লণ্ডনে যেন ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করে বসেছিল। বৈভব যখন শেষ হয়ে যায়, আভিজাত্যের প্রাচীর তখন আপনা থেকেই ভেঙে পড়ে। এবং ভেঙে পড়েছিল বলেই সেই অভিজাত পরিবারের একমাত্র সুন্দরী কন্যা মেরি লেনলের সঙ্গে তাদের মালীর ছেলে অ্যালানের সঙ্গে হৃদয় বিনিময়টি সহজ হয়ে উঠেছিল। আর যে মুহূর্তে সেটা ঘটল, মরিস মেস্টার নামে তরুণ আইনব্যবসায়ী এবং মেরিদের প্রতিবেশীর মনে হল মেরি সত্যিই যেন অনেক বেশী সুন্দরী হয়ে উঠেছে। মরিস মেরির ভাই জনির বাল্যবন্ধু। গরমিল যেটা সেটা এই: জনি অভিজাত বংশের ছেলে হয়েও ধসে পড়া বৈভবের তাড়নায় এখন দাগী আসামী। মরিসকে পুলিস জানে, আইনব্যবসায়টা তার বাইরের পোশাক। আসলে জঘন্য আসামীদের সে আশ্রয়দাতা। তাদের লুঠের মালের সে একজন মোটা অংশীদার। এমন কি, 'বহুরূপী'র সঙ্গে যে তার যোগাযোগ আছে, সে খবরও তারা রাখে। মরিস কামুক। সুন্দরী মেয়েই তার বড় রকমের দুর্বলতা। তার চোখ গিয়ে পড়ল মেরির ওপর। কিন্তু আভিজাত্যের কথা ভুলে গিয়েও শুধু মানবিক গুণের জন্যেই সে অ্যালানকে ভালবাসে। ফলে জটিলতার সৃষ্টি। সেই সঙ্গে বহুরূপীর আবির্ভাব। তার যথারীতি বেপরোয়া পুলিসকে বোকা বানানো, সন্ত্রাস সৃষ্টি।

মূলত এই পটভূমিকা নিয়েই 'বহুরূপী'র অত্যন্ত গতিশীল গল্পের সূচনা এবং পরিণতি। 'বহুরূপী' এডগার ওয়ালেসের 'দি রিংগার' গল্পের অনুবাদ। বলা বাহুল্য একসময়ে ওয়ালেসের লেখা [illegible] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যেত। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রাইম-গল্পের কায়দা-কানুন হয়তো অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু জটিলতার চমকপ্রদ সৃষ্টি না করেও এ ধরনের গল্প যে কত বেশী [illegible] করে তোলা যায়, ওয়ালেসের লেখা না পড়লে [illegible] হয়। বিশেষ করে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ অনুবাদের ফলে সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে বইটি ভাল লাগবে। এ কৃতিত্ব এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের সৃজনশীল লেখার স্পর্শে পুরো বইটির সর্বত্র মৌলিক রচনার ছন্দ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সাগ্নিকভ দেশ। ভ্লাদিমির ওব্রুচেভ। অনুবাদ: অশোককুমার সিংহ। বিংশ শতাব্দী। ২২এ, শ্রীঅরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৫। চার টাকা।

সাগ্নিকভ দেশ ভ্লাদিমির ওব্রুচেভ-এর এক অসামান্য কৃতিত্ব। মুখ্যত এটি একটি সায়েন্স ফিকশন। যার পটভূমিকা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের প্রাচীনতম সভ্যতার সন্ধান। জনৈক অভিযাত্রী সেই সভ্যতার সন্ধান পেয়েছে এমন একটি পরিবেশে যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে উষ্ণ জলের হ্রদ, যেখানে হ্রদের নিচে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, যেখানকার সভ্যতা আধুনিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, বন্দুকের গুলিকে যারা মনে করে ঐশ্বরিক কোন ব্যাপার। রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা এই গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকার মনকে এক বিচিত্র পৃথিবীতে যে টেনে নিয়ে যাবে, বলাই বাহুল্য। শ্রীঅশোককুমার সিংহ একজন পদার্থবিজ্ঞানী এবং সুলেখক বলেই শুধু গল্প নয়, বইটির বৈজ্ঞানিক তথ্যগত দিকগুলিও অনুবাদের সময় সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এর ফলে মৌলিকতার স্পর্শ পেতে অসুবিধে হয় না, গল্প পড়ার তৃপ্তিও পাওয়া যায়।

কবিতা

নীল দুপুরের ভয়। বার্ণিক রায়। স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, এম-টি ২৫/২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। চার টাকা ॥

কাব্যগ্রন্থে ভূমিকা আজকাল দেখা যায় না। অনেক কবি হয়তো পছন্দ করেন না। কখনো কখনো এই ভূমিকা কবিতাবিচারে সাহায্য করে। বার্ণিক রায় তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন 'বাংলাদেশের অভিশাপ লেখককে ভালো হোক মন্দ হোক অনবরত লিখতে হয়, নতুবা লেখকের নাম পর্যন্ত পাঠক ভুলে যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশে একটি কি দুটি বই লিখলে তার খ্যাতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। আমরা গুণের চেয়ে পরিমাণে বিশ্বাসী, অর্থাৎ ঔদরিক।' বলা বাহুল্য কবি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন কবির এরকম লেখা ঠিক নয়, অন্তত তাঁরই কাব্যগ্রন্থে। অনায় মানালেও মানাতে পারতো। তাছাড়া প্রশ্ন জাগে, ইনি কি সে-কারণেই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বার করলেন, যাতে পাঠক ভুলে না যায়? কোনো কবি অতসব ভেবে লেখেন কি? বরং এরকম বলা যায় যে ভুলে যাওয়ার হলে পাঠক তাঁকে ভুলবেনই, রাশি রাশি লিখলেও।

মোট কটাটি কবিতা নিয়ে এই গ্রন্থটি। বেশীর ভাগই ছন্দোবদ্ধ কবিতা। কয়েকটি চিত্রকল্পও বেশ [illegible]। 'খরগোশের লোমের মত ভীরু অন্ধকারে ধ্বনিময় আলো কেঁপে যায়' (পশ্যন্তী) বা 'চারিদিকে ঠাণ্ডা গন্ধে জল স্থির, তীরে তীরে সবুজ গাছের কলোরেখা/গম্বুজের মতো অনন্ত আকাশ ঢেকে আছে আমাদের' (পিকনিক), এরকম কয়েকটি লাইন বিক্ষিপ্তভাবে বেশ ভালো লাগে। অনেকের মতো এই কবিও 'হে ছলনাময়ী নারী' লিখে প্রেমজনিত যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। মিল দেয়ার প্রয়োজনে 'ডাকে না'-র সঙ্গে 'হাঁকে না' কিংবা তোশকের সঙ্গে দেমাকে'র প্রয়োগও লক্ষ্য করা গেল।

স্মারকপত্র

Rabindra Parishad (Silver Jubilee). Edited by Bhagaban Prasad Mazumdar.

পাটনার রবীন্দ্র পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় পঁচিশ বছর আগে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ আলোচ্য স্মারক পুস্তকটি প্রকাশিত করেন। গত পঁচিশ বছর ধরে পরিষদ রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে যে চর্চা ও অনুশীলন করেছেন তার বিবরণ পুস্তকটির মুখ্য রচনা। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরজী, বাঙলা ও হিন্দীতে প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীহরিনাথ মিশ্র, ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ, রঙীন হালদার, ডঃ শচীন সেন, ডঃ অনন্তলাল ঠাকুর, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হেমন্তকুমার চৌধুরী, নির্মলকুমার চৌধুরী, প্রবোধকুমার চৌধুরী হংসকুমার তিওয়ারী প্রভৃতি। রবীন্দ্র [illegible] ও তত্ত্বান্বেষীদের পুস্তকখানি সং[illegible] করে রাখার মতো।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৯৫৩ থেকে '৭৩—এই কুড়ি বছরের একনিষ্ঠ চর্চা ও সাধনার বেশ বাছাই সংকলন বংশীধারী দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ: **কোথায় পা রাখি** (রত্নাবলী, তিন টাকা)। কুড়ি বছর বড়ো কম সময় নয়, বিশেষত একজন তরুণ কবির পক্ষে, এবং সেই যুগে, আত্মপ্রতিষ্ঠার অস্থির নিরন্তর তাগিদে যখন দু-তিন বছর পরপরই পরিণতিহীন ফসল নিয়ে বেরোয় তরুণতর কবিদের কাব্যগ্রন্থ। বংশীধারী দাস সে তুলনায় হয়তো বেশী পরিমাণ সংযমই দেখিয়ে ফেলেছেন, হয়তো এই অতি বিলম্ব তাঁর কুণ্ঠা ও দ্বিধাকে আরও তীব্র করেছে, দশক থেকে দশকান্তরের

দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে হয়তো নিজস্ব ভূমিটি খুঁজে না-পাবার যন্ত্রণায় তিনি প্রশ্ন করে উঠেছেন : কোথায় পা রাখি? এবং প্রশ্নগুলিও, তাঁর মনে হয়েছে, ফিরে আসছে প্রতিধ্বনিত অবস্থায়, কবিতা ও শিল্পজিজ্ঞাসার চিরন্তন মূর্তি হয়ে : 'প্রশ্নগুলি প্রতিধ্বনি নিয়ে কেন বুকের ভিতর/ফিরে আসে দৃশ্য থেকে, কেন বুক থেকে ভেসে যায়/দৃশ্যান্তর প্রত্যাশায় কবিতায়, শিল্প-জিজ্ঞাসায়।

বস্তুত, বংশীধারীর এই দ্বিধা একদিক থেকে অলীক ও বিমূর্ত মনে হতে বাধ্য। তাঁর রচনার প্রকরণগত সৌন্দর্য যেমন অনায়াস করায়ত্ত, তেমনি স্বচ্ছ তাঁর চিন্তা-প্রক্রিয়া। সরল অথচ তাঁর গভীর পংক্তি নির্মাণ করতে পারেন তিনি, পারেন পংক্তিগুলিকে ছন্দোনিপুণ অলঙ্কারবহুল প্রসাধনে সজ্জিত করতে, সুদূর রোমান্টিক আবহ গড়ে তুলতেও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম—এ-কথা তাঁর গ্রন্থপাঠে বারংবার মনে হবে। মনে হবে পঞ্চাশের কবিকুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে—বিশেষত আরম্ভের মেজাজে ও ভঙ্গিতে। 'মৌমাছি মন দুরন্ত দিনের সৌরভে/চেয়েছে একটি সবুজ জীবন প্রান্ত/সূর্যের রঙে স্বপ্ন বুনেছে গৌরবে/আপন মনের সৌরভে উদ্‌ভ্রান্ত।' কিংবা 'গলানো পিচের পাথর পাশে, দ্যাখো./গ্রীষ্ম দুপুর পাঁজর ফাটিয়ে হাসে/কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত লাল হাসি।' এ-জাতীয় পংক্তিতে নির্ভুল সেই চিহ্ন ছড়ানো। একটা কথাই শুধু মনে হতে পারে, বংশীধারী হয়তো খুব বেশী পালটান নি, ছাপিয়ে ওঠেন নি নিজেকে, ভাঙেন নি যাবতীয় পরিপার্শ্বকে। কিন্তু তার প্রস্তুতি যে শুরু হয়েছে সে-রকম ইঙ্গিতও কি নেই শেষদিকের রচনায়? নিশ্চিত আছে, এবং সেই সুলক্ষণ হয়তো পূর্ণতর রূপ পাবে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে, এ-আশা করা অসঙ্গত হবে না।

*

পঞ্চানন ঘোষের ছোটগল্প-সংকলন **জন্ম-মৃত্যুর লক্ষিকণ**-এর (প্রাপ্তিস্থান : এস. চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স, পাঁচ টাকা) ভূমিকা পড়ে জানা যায় যে, বাংলা ছোটগল্পের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও ঐতিহ্যময় ধারা সম্পর্কে তিনি সচেতন। বিনয়ের সঙ্গে পঞ্চাননবাবু এ-ও জানিয়েছেন যে 'সামান্যতম ক্ষমতাকে সম্বল করে ব্রতী হয়েছি সেই ধারাকে সমৃদ্ধ করতে।' কিন্তু মুশকিল এই, পুরো বইটি পড়ে তাঁর এই বিনয়কে দুর্লভ আত্মসমীক্ষা ছাড়া কিছু মনে হয় না।

এই সংকলনে মোট ১৮টি গল্প রয়েছে। আকারেও গল্পগুলি নেহাত ছোট নয়। কিন্তু প্রত্যেকেই মনে হয়, লেখার সময় ঐতিহ্যটিতিহ্যর কথা মনে পড়েনি তাঁর। কখনো বিচিত্র তত্ত্ব, কখনো অদ্ভুত দর্শন, কখনো একভাবে আরম্ভ অন্যভাবে শেষ, কখনো উদ্দেশ্যহীন সংলাপ—ইত্যাদি নানান দুর্বলতা গল্পগুলিকে গল্পের রস থেকে সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় নিক্ষিপ্ত করেছে। উচ্ছ্বাস স্তিমিত করে সাধারণ গল্প লেখার দিকে ঝোঁক থাকলেও হয়তো দু-একটি গল্প উতরে যেতে পারতো।

*

ননীগোপাল চক্রবর্তীর **ইতিহাসের-কান্না** (পরিবেশক : শ্রীধর প্রকাশনী, তিন টাকা) যে 'ইতিহাস হলেও আসলে উপন্যাস' তা তিনি জানাতে চেয়েছেন। এও জানাতে ভোলেন নি যে, 'উপন্যাসের রসসৃষ্টির জন্য ইতিহাসের গন্ডী পেরিয়ে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে হয়েছে। সুতরাং ইতিহাস বহু স্থানে উপেক্ষিত হয়েছে, সাহিত্যও। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে যে অসার সৃষ্টিগুলি বাংলাসাহিত্যের আগাছা বৃদ্ধি করেছে, ইতিহাসের কান্না তার তুলনাতেও নীরস। একটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য)—জনৈক রহস্য-উপন্যাস লেখকের একচেটিয়া গুপ্ত মন্ত্র ছিল, একটি শব্দকেই বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে তাকে অনুচ্ছেদের মর্যাদা দিয়ে ননীগোপালবাবু কলেবর-বৃদ্ধির নবতম উপায় উদ্ভাবন করলেন—এটুকু কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

*

টুকরো শব্দ ব্যবহার বা বিচ্ছিন্নভাবে পংক্তি-নির্মাণে প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ যতটা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, পুরো কবিতায় বহু ক্ষেত্রে তেমন নয়। অন্তত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **বৃত্তে বাঁধো ক্রীতদাসী** (সংরাগ, চার টাকা) পড়ে এ-ধারণা তৈরী হতে পারে। তাঁর রচনা এমনিতে বেশ উজ্জ্বল, সপ্রতিভ; কিন্তু অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ। ছোট কবিতাগুলি বরং নিটোল, নিখুঁত, স্ফূর্ত, তাৎপর্যময়।

পত্রিকা

নন্দিনী। সম্পাদক : সঞ্জীব চৌধুরী। এইচ ৮৭, নেতাজী কলোনী, কলিকাতা-৫০। প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা।

পত্রিকাটির আলোচ্য প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'কলকাতার উত্তর ও উত্তর শহরতলী অঞ্চলে নামী-দামী লেখক-শিল্পী-সাংবাদিকের বসবাস সত্ত্বেও মোটা উচ্চাঙ্গের পত্র-পত্রিকার স্থায়ী প্রকাশ তেমন চোখে পড়ে না। প্রদীপের তলার সেই অন্ধকার-ভীতি, কাটাবার জন্যই এটির প্রকাশ। 'মোটা উচ্চাঙ্গের পত্র-পত্রিকা' বলতে সম্পাদকমণ্ডলী যা বোঝাতে চেয়েছেন এই সংখ্যাখানি থেকে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ পত্রিকাখানি মোটাও নয় এবং কয়েকজন নামী কবি ও কথা-সাহিত্যিকের রচনায় সমৃদ্ধ হলেও 'উচ্চাঙ্গ' বলে মেনে নিতে দ্বিধা জাগতে পারে। তবে কলকাতার উত্তরাঞ্চলের অনামী সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশে পত্রিকাখানি সহায়ক হলে এটির প্রকাশ সার্থক হবে।

স্বগতোক্তি। সম্পাদক : শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডল। ১২৬-এ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট (৩য় তল), কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

'বাংলা সাহিত্যের প্রচার, প্রসার অনুধ্যান, উৎকর্ষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে' লিটল ম্যাগাজিন-এর যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করার ব্রত নিয়েই এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব। আলোচ্য প্রথম সংখ্যাখানিতে কয়েকজন নামকরা কবি ও সাহিত্যিকের রচনা ছাড়া অধিকাংশ লেখক-লেখিকাই অখ্যাত। তবে তাঁদের রচনায়ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে অজ্ঞাত-পরিচয় প্রতিভা জনসমক্ষে উপস্থিত করে দিতে পারলে পত্রিকাখানি প্রকৃত সাহিত্য-সেবার কাজে খ্যাতি লাভ করতে পারবে।

রিং-এ বেস্ট বক্সার ক্লাসে বেস্ট বয়

সাউথ ক্যালকাটা ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের তরুণ বক্সার ভূতনাথ মুখার্জী আগেও বেস্ট ফাইটারের পুরস্কার পেয়েছে। এবার স্কুল অফ ফিজিকাল কালচারের রিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃ স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়নশিপে পেল বেস্ট বক্সারের প্রাইজ।

বলা প্রয়োজন, বেঙ্গলী বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার পরলোকগত ডাঃ আদিত্য গুপ্তের নামে এ বছর থেকেই রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে বেস্ট বক্সারের ট্রফি দেওয়া শুরু হয়েছে। বক্সিং সম্পর্কে ভূতনাথের আগ্রহ, তার লড়িয়ে মনোভাব এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে যে ডাঃ গুপ্ত ভূতনাথকে সব সময় উৎসাহ দিতেন, তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ট্রফিটি সর্বপ্রথম ভূতনাথেরই হাতে এসেছে।

বেস্ট ফাইটার এবং বেস্ট বক্সারের প্রাইজের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। একটি লড়াই ভাল লড়ার জন্য, সে লড়াইয়ে সিংহ বিক্রম দেখানোর জন্য বেস্ট ফাইটারের পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বেস্ট বক্সারের পুরস্কার পেতে হলে সব বক্সারদের উপর টেক্কা দিয়ে সব কিছুতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া চাই। অর্থাৎ ঘুঁষি মারা ও প্রতিপক্ষের ঘুঁষি এড়িয়ে যাবার টেকনিক, লড়িয়ে মনোভাব, ফুটওয়ার্ক, স্টাইল, চটুলতা, দম, দৃঢ়তা—সব কিছুর গুণাগুণ বিচারেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। মাত্র ষোলো বছর বয়সে ভূতনাথ যখন সে শিরোপা পেয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে বক্সিং ক্ষেত্রে ছেলেটির আরও অনেক কিছু প্রাপ্য আছে।

সব ছেলের মধ্যেই খেলাধুলো করার সহজাত একটা প্রেরণা থাকে। ভূতনাথের মধ্যেও ছিল। সব রকমের খেলাধুলোতেই ওর আগ্রহ ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন এখনো খেলে থাকে। ছয় ভাইয়ের সর্বকনিষ্ঠ ভূতনাথের বক্সিংয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মে দাদা বিশ্বনাথ মুখার্জী আর সাউথ ক্যালকাটা ফিজিকাল কালচারের সংগঠক অসিত ব্যানার্জী ও কোচ গোপাল দাসের অনুপ্রেরণায়। ১৯৬৫ সালে মাত্র ৮ বছর বয়সে ও যখন এই সংস্থায় ভর্তি হল তখন ওর সঙ্গে লড়বার জন্য ওর ওয়েটের প্রতিদ্বন্দ্বী বেশী খুঁজে পাওয়া যেত না। চুঁচুড়ায় এক প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যাকে পাওয়া গেল তার ওজন ওর চেয়ে ৯ পাউন্ড বেশী। আকারেও অনেক বড়। কোচের দ্বিধা দেখে ভূতনাথ বলে উঠল, 'আমাকে ছেড়ে দিন তো, ওকে আমি শেষ করে দিচ্ছি।' সেইদিন কোচ গোপাল দাস বুঝলেন মুষ্টিযুদ্ধের জন্য যে গুণের বড় প্রয়োজন, সেই সাহস ছেলেটির মধ্যে যথেষ্ট আছে। সেই থেকে মনের সাহস ও হাতের শক্তির জোরে ভূতনাথ প্রতিটি ফাইটে জিতে আসছে রাজ্যের আন্তঃ স্কুল এবং জাতীয় স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে। ব্যতিক্রম শুধু একবার। ১৯৭২-এ ভিলাইয়ে আয়োজিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে (১০৫ পাউন্ড ওজন বিভাগ) পরাজয় স্টিল প্লান্টের বক্সার এস জি রাওয়ের কাছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মুষ্ট্যাঘাতে গায়ে মুখে যত না আঘাত পেয়েছিল তার চেয়ে ভূতনাথ অনেক বেশী আঘাত পেয়েছিল মনে। ঠিক করেছিল আর মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়ে উঠবে না। মুষ্টিযুদ্ধ ছেড়ে দেবে। কলকাতায় ফিরে এসে বাড়িতেই বসে ছিল। কিন্তু বেশী দিন চুপ করে থাকতে পারল না। সংঘের সংগঠক অসিত ব্যানার্জী আবার ওকে ক্লাবে টেনে নিয়ে গেলেন। বোঝালেন, জীবনে যেমন জয় আছে, তেমন পরাজয়ও আছে। পরাজয়ের মূল্যবোধ থেকেই তো জয়ের মূল্যবোধ জন্মে। তোমার এ পরাজয়ের প্রয়োজন ছিল জয়ের মূল্য আরও ভালভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে।

বেস্ট স্কুল বক্সার ভূতনাথ মুখার্জী

ব্যাস। দ্বিগুণ উৎসাহে ভূতনাথ আবার অনুশীলন শুরু করল। ১১০ পাউন্ড দৈনিক ওজনের ফলে এ বছরই ভূতনাথ ফ্লাইওয়েট ক্যাটাগরিতে এসেছে। সব কটি ফাইটই জিতেছে সহজ ভঙ্গিতে। তার মধ্যে আন্তঃ স্কুল রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইনালে দুর্গাপুর স্কুলের গোপাল মুখার্জীকে প্রচন্ড মুষ্ট্যাঘাতে ভূলুণ্ঠিত করা ওর এক বড় কৃতিত্ব।

চেৎলা কৈলাস বিদ্যামন্দিরের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র ভূতনাথ রিংয়ে যেমন বেস্ট বক্সার, ক্লাসেও তেমন বেস্ট বয়। বরাবর প্রথম হয়ে ক্লাস প্রোমোশন পায়। সে কারণে স্যারদেরও সুনজরে পড়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যার বক্সিংয়ের জন্য যাবতীয় পোশাক দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন,

খেলার দিকে বেশী নজর দিতে গিয়ে পড়াশুনায় যেন অবহেলা করোনা—। বলা বাহুল্য, পড়াশুনার প্রতিও ভূতনাথের সমান আগ্রহ।

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ভূতনাথের ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা। বায়োলজি ফোর্থ সাবজেক্ট আছে। ক্লাবের আদর্শের সংগে সামঞ্জস্য রেখেই ভূতনাথ এগিয়ে চলছে।

খেলাধুলা করানো ছাড়াও ওখানে সভ্যদের সংসাহস লাভ ও চরিত্রগঠনে অনুপ্রাণিত করা হয়।

—মুকুল

গ্রাণ্ড প্রিকস টেনিসে বিজয়ের জয়

নাম বিজয়, উপাধি অমৃতরাজ। দীর্ঘকায় কুড়ি বছর বয়সী কৃষ্ণকায় ভারতীয় ছেলেটির জয়ের সংবাদে পুণ্যবান-দের কাছে মহাভারতের কথার মত ক্রীড়ামোদীদের কাছে দিল্লি গ্রাণ্ড প্রিকস টেনিসের কথা বোধ করি অমৃতসমান হয়ে উঠেছে। অন্তত খেলাধুলায় ভারতের গৌরবময় ভূমিকার দিক দিয়ে তো বটেই। কেননা ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম আয়োজিত ওপেন টেনিস, অর্থাৎ পুরস্কার-অর্থের এই প্রতিযোগিতায় বিদেশীদের উপর টেক্কা দিয়ে বিজয় অমৃতরাজ আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ক্ষেত্রে ভারতকে এক মহাসম্মান এনে দিয়েছে।

স্বীকার করছি, বিশ্ব টেনিসের শীর্ষ-সারির কয়েকজন খেলোয়াড় দিল্লি গ্রাণ্ড প্রিকসে খেলতে আসেনি। তবু যারা এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম কিছুকাল আগেও আন্তর্জাতিক টেনিসের রথীমহারথীদের সংগে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ফ্রেড স্টোলে, ম্যাল অ্যান্ডার্সন। আবার এমন কিছু খেলোয়াড় এসেছিল যারা বিশ্ব টেনিসের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের পংক্তিভুক্ত হবার জন্য সিংদরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং টেনিসের তারকা সম্মেলনে বিজয়ের জয় নিঃসন্দেহে এক বড় কৃতিত্ব। ভারতে টেনিস খেলার প্রসার প্রচার এবং তরুণদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির দিক দিয়েও দিল্লি গ্রাণ্ড প্রিকস এবং বিজয়ের জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অতীতে পৃথিবীর দিকপাল টেনিস খেলোয়াড়রা মাঝে মাঝে ভারত সফরে এলেও অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে বাধার প্রাচীর উঠে যাবার পর বড় মাপের বেশী খেলোয়াড় ভারতে আসেনি। শুধু ডেভিস কাপের খেলাকে কেন্দ্র করেই টেনিসে কিছু আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের সংস্থা আয়োজিত গ্রাণ্ড প্রিকসের এশীয় সার্কিটে প্রতি বছরই ভারতে বড় টেনিসের একটি আসর বসবে এবং দিন দিন বাড়বে সে আসরের জলুস। এবার এশীয় সার্কিটে ভারতের এই প্রতিযোগিতাকে অবশ্য 'বি' শ্রেণীতে ফেলা হয়েছিল। সবসুদ্ধু পুরস্কার-অর্থ ছিল পঁচিশ হাজার ডলার। আশা করা যায় এর পর ভারতের প্রতি-যোগিতা 'এ' শ্রেণীতে উন্নীত হবে, পুরস্কার-অর্থেরও পরিমাণ বাড়বে।

বিদেশের একুশজন এবং ভারতের এগারোজন—মোট ৩২ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে দিল্লি গ্রাণ্ড প্রিকসের সিংগলসের তালিকা তৈরী হয়। বাছাই তালিকা তৈরী হয় নিম্নলিখিতভাবে।

১। বিজয় অমৃতরাজ (ভারত), ২। ব্রায়ান গটফ্রিড (আমেরিকা), ৩। ম্যাল অ্যান্ডার্সন (অস্ট্রেলিয়া), ৪। ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া), ৫। রাউল র‍্যামিরেজ (মেক্সিকো), ৬। পল গার্কেন (আমেরিকা), ৭। মাইক এস্টেপ (আমেরিকা) ও ৮। ইয়ান ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া)।

এই আটজন বাছাই ছাড়া আমেরিকা থেকে এসেছিল জেফ ব্রাউইক, জিম ম্যাকমেনাম, ফ্রেড ম্যাকনেয়ার, বিল ব্রাউন, কেন ম্যাকমিলান ও ডিক ডেল। অস্ট্রেলিয়া থেকে বব গিল্টানন, সিড বল, কিম ওয়ারউইক ও জন বার্টলেট। নিউজিল্যাণ্ড থেকে জেফ সিম্পসন এবং যুগোস্লাভিয়া থেকে জেলকো ফ্রানুলোভিক।

বিজয় অমৃতরাজ

ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে বর্ষীয়ান কৃষ্ণন তো ছিলই। আর ছিল সবাই। যেমন জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল, বিদ্যুৎ গোস্বামী, শ্যাম মিনোত্রা, চিরদীপ মুখার্জী, জয় রয়াপ্পা, বলরাম সিং, গৌরব মিশ্র, আনন্দ অমৃতরাজ প্রভৃতি। ২৪ বছর বয়সী ভারতের অপর খেলোয়াড় যশজিৎ সিং, যে চার বছর ধরে আমেরিকায় ছিল এবং আন্তর্জাতিক টেনিসে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, গ্রাণ্ড প্রিকসের মুখেই সে দিল্লিতে এসে পৌঁছয় এবং খেলাতেও যোগ দেয়।

বলা প্রয়োজন, জেলকো ফ্রানুলোভিক যুগোস্লাভিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড়। রাউল র‍্যামিরেজের মেক্সিকোয় শীর্ষস্থান, যদিও র‍্যামিরেজ বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছে। গৌরবের দিন অস্ত হলেও ম্যাল অ্যান্ডার্সন এখনো ডেভিস কাপে অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত খেলোয়াড়। এবারও মাদ্রাজে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের খেলায় অ্যান্ডার্সনের কাছে বিজয় অমৃতরাজকে স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়েছে। ফ্রেড স্টোলে সম্পর্কেও প্রায় এক কথা। ১৯৬৩-৬৪-৬৫—পর পর তিনবারের উইম্বলডন রানার্স ৩৫ বছর বয়সী ফ্রেড স্টোলে এখনো ইন্দ্রপতন ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রায়ান গটফ্রিড সম্ভাবনাময় শীর্ষ খেলোয়াড়। এত তারকা সমাগমের মধ্যে বাছাই তালিকায় ভারতের বিজয় অমৃতরাজকে শীর্ষস্থান দেওয়ায় কোন কোন মহলে কিছুটা কটাক্ষ করা হয়েছিল। বিশেষ করে এশীয় সার্কিটে ওসাকা গ্রাণ্ড প্রিকসে বিজয় দ্বিতীয় রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার পল ক্রনকের কাছে এবং টোকিও গ্রাণ্ড প্রিকসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে পশ্চিম জার্মানীর হ্যানস

জুরগেন পোচম্যানের কাছে হেরে যাওয়ায়। কিন্তু এবার উইম্বলডন এবং ফরেস্ট হিলস-এর কোয়ার্টার ফাইনালে বিজয়ের প্রশংসনীয় খেলা এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা জয়ের কথা বিবেচনা করেই বাছাই কমিটি বিজয়ের উপর আস্থা রেখে তালিকা তৈরি করেন।

খেলার ফলই বলে দিচ্ছে তাঁদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। অবশ্য সূচনায় বিজয় তার খ্যাতির সঙ্গে তাল রেখে খেলতে পারেনি। প্রতিযোগিতা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, তার র‍্যাকেটেও স্ট্রোক এসেছে। শেষ দিকে সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলাও হয়েছে সমানে সমানে। পূর্ণ পাঁচ সেটের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে প্রায় এক চুলের ব্যবধানে। সংগ্রামী টেনিসের সংঘর্ষের মধ্যে বিজয়ের সাফল্য তাই আরও গৌরবময়, শক্তি শৈলী ও সাধনার পুরস্কার।

একদিক দিয়ে বিজয় ফাইনালে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের বিল ব্রাউন, জিম ম্যাকমেনাম, ৮ নম্বর বাছাই অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান ফ্লেচার এবং ৫ নম্বর বাছাই মেক্সিকোর রাউল র‍্যামি-রেজকে পর পর পরাজিত করে। অপরদিক দিয়ে ফাইনালে উঠতে ম্যাল অ্যান্ডারসনকে পরাজিত করতে হয় স্বদেশীয় জন বার্টলেট, ভারতের আনন্দ অমৃতরাজ, যুক্তরাষ্ট্রের পল গার্কেন ও মাইক এস্টেপকে। দীর্ঘ তিনঘণ্টা পনেরো মিনিট তীব্র সংগ্রামের মধ্যে পাঁচ সেটের ফাইনাল খেলায় বিজয় ৬-৪, ৫-৭, ৮-৯, ৬-৩ ও ১১-৯ গেমে ম্যালকম অ্যান্ডারসনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন-শিপের সঙ্গে পায় পাঁচ হাজার ডলার (সাড়ে ৩৭ হাজার টাকা) পুরস্কার অর্থ। অ্যান্ডারসন পায় ২৮০০ ডলার।

দিল্লি জিমখানা কোর্টের সাড়ে চার হাজার দর্শকের বিজয় অভিনন্দনের মধ্যে ফাইনাল খেলা শেষ করার কিছু পরেই দুই ভাই বিজয় ও আনন্দকে ডাবলস ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় জিম ম্যাকমেনাম ও রাউল র‍্যামিরেজ আমেরিকা-মেক্সিকো জুড়ির সঙ্গে। কিন্তু শ্রান্ত বিজয় আর আগের মত খেলতে পারে না। ম্যাকমেনাম-র‍্যামিরেজ জুড়ি ৬-২ ও ৬-৩ গেমে অমৃতরাজ ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করে ডাবলস জয়ীর পুরস্কার হিসাবে ১২০০ ডলার পায়। পরাজিত বিজয় ও আনন্দ পায় ৮৫০ ডলার।

সিংগলস ও ডাবলস ফাইনালের মাঝে সেমিফাইনালের পরাজিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাউল র‍্যামিরেজ ও মাইক এস্টেপের তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলার কথা ছিল। কিন্তু আগের দিন সেমিফাইনালে অ্যান্ডারসনের কাছে পরাজয়ের নৈরাশ্যে মার্কিন খেলোয়াড় মাইক এস্টেপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ফলে মেক্সিকোর রাউল র‍্যামিরেজ পেয়েছে তৃতীয় স্থান অধিকারীর ১৫০০ ডলার পুরস্কার।

দিল্লি গ্রান্ড প্রিকসের বিশেষত্ব প্রতি-যোগিতা এগুবার সঙ্গে সঙ্গে খেলাগুলিও আকর্ষণীয় হতে থাকে। শেষদিকে সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হয় রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে।

কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ নম্বর বাছাই অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান ফ্লেচারও অবশ্য বিজয়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টাই ব্রেকারে হেরে যায়। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আনন্দ অমৃতরাজও জোর লড়াই করে অ্যান্ডারসনের সঙ্গে। কোয়ার্টার ফাইনালে ৬ নম্বর বাছাই পল গার্কেনকে পরাজিত করতেও অ্যান্ডারসনকে ৯২ মিনিট ধরে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু দুটি সেমিফাইনালে ও ফাইনালে সংগ্রামী টেনিসের যে পরিচয় মিলেছে টেনিস কোর্টের বিরল ঘটনার সঙ্গে তা তুলনীয়।

বিজয় ও র‍্যামিরেজের সেমিফাইনাল খেলার কথা প্রথম বলা যাক। মেক্সিকোর কুড়ি বছর বয়সী সৌম্যদর্শন খেলোয়াড় র‍্যামিরেজ টেনিসের নিপুণ শিল্পী। মাথায় উঁচু ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। হাতের সার্ভিসও জোরালো। ভারতের রামনাথন কৃষ্ণন ও তিন নম্বর বাছাই ফ্রেড স্টোলেকে হারিয়ে সে যে খ্যাতি অর্জন করে সেই খ্যাতি বজায় রেখেই সে সেমিফাইনালে বিজয়ের কাছে হেরে যায় তিন ঘণ্টা লড়াই করে। দুজন পর্যায়ক্রমে সেট দখল করার পর পঞ্চম সেটে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়। শেষ সেটের সূচনায় র‍্যামিরেজই ৩—০ গেমে এগিয়ে থাকে। কিন্তু অসাধারণ মনোবল এবং ফোরহ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ডের কয়েকটি চোস্ত পাসিং শটের বলেই নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে বিজয় র‍্যামিরেজকে পরাজিত করে ৫-৭, ৬-৪, ২-৬, ৬-৩ ও ৮-৬ গেমে।

ম্যাল অ্যান্ডারসন এবং মাইক এস্টেপের সেমিফাইনালও বিরল টেনিসের দৃষ্টান্ত। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার দুই খেলোয়াড়ও পাঁচ সেট লড়ে তিন ঘণ্টা আট মিনিট ধরে। ৩৮ বছর ৮ মাস বয়সী ম্যাল অ্যান্ডারসন যে কত অভিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী তার প্রমাণ মেলে মাইক এস্টেপকে ম্যাচ পয়েন্টের মুখ থেকে বঞ্চিত করে ম্যাচ জেতায়। এ খেলাতেও দুজন দুটি সেট দখলের পর মীমাংসাসূচক পঞ্চম সেটে এস্টেপ ৭-৬এ এগিয়ে যায় এবং নিজের সার্ভিসে এগিয়ে যায় ৪০-৩০ পয়েন্টে। ফাইনালে খেলার অধিকার পেতে আর একটি পয়েন্ট বাকি। কিন্তু সে পয়েন্ট আর পেল না মাইক এস্টেপ। ডিউস করে ওখান থেকে পয়েন্ট তুলে এনে ৫-৭, ৬-৩, ৬-৪, ৩-৬ ও ৯-৭ গেমে জিতে ফাইনালে গেল অ্যান্ডারসন। এই খেলাটির সঙ্গে কলকাতার সাউথ ক্লাবে ভারত ও ব্রাজিলের ডেভিস কাপ সেমিফাইনালের খেলার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের কৃষ্ণন ঠিক এইভাবেই ব্রাজিলের টমাস কককে ম্যাচ পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত করে ম্যাচ জিতেছিল। ভারত পেয়েছিল সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার সম্মান।

বিজয় অমৃতরাজ এবং ম্যাল অ্যান্ডারসনের ফাইনাল খেলাটিতে তীব্র সংগ্রামের কথা আগেই বলেছি। বিজয় এবং অ্যান্ডারসনের মধ্যে বয়সের বিরাট পার্থক্য। বিজয়ের ১৯ বছর ১০ মাস। অ্যান্ডারসনের ৩৮ বছর ৮ মাস। বিজয়ের চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী অস্ট্রেলিয় প্রতিদ্বন্দ্বী এক সময়ে ২-১ সেটে এগিয়ে থেকে এবং মীমাংসাসূচক পঞ্চম সেটের ১৬তম গেমে ম্যাচ পয়েন্টের মুখে এসেও শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে বিজয়ের তারুণ্যের তেজে। যদিও অ্যান্ডারসন শরীরকে তাজা ও কর্মক্ষম রাখার জন্য এখনো প্রতিদিন দুই তিন মাইল দৌড়য়, নিয়মিত ব্যায়াম করে, স্কোয়াশ র‍্যাকেট খেলে। টেনিস কোর্টে প্র্যাক্টিস তো আছেই। তবু বয়সের ব্যবধানটা বড় বেশী। সম্ভবত পর পর দুদিন সেমিফাইনাল ও ফাইনালে প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা খেলার ধকল সহ্য করে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে এ বছর ডেভিস কাপের খেলায় যে বিজয় অ্যান্ডারসনের কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে গিয়েছিল, কয়েকমাস আগের সে বিজয়ের সঙ্গে এ বিজয়ের পার্থক্যও দেখা গেছে অনেকখানি। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার ফলে বিজয় আগের চেয়ে অনেক দক্ষ। চোয়াল শক্ত করে খেলায় এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক পাওয়ার টেনিসে এখন অনেক পরিণত।

বিজয় ছাড়া ভারতের আর যে খেলোয়াড়ের গ্রান্ড প্রিকসে কিছুটা গৌরব-ময় ভূমিকা সে হচ্ছে আমেরিকা থেকে সদ্য আগত যশজিৎ সিং। যশজিতের কাছে দুই নম্বর বাছাই আমেরিকার ব্রায়ান গটফ্রিডের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয় প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বিস্ময়কর ফল। কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য যশজিৎ মাইক এস্টেপের কাছে হেরে যায়। প্রথমদিকে ভারতের শ্যাম মিনোত্রা, বিদ্যুৎ গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ বিদেশীদের কাছে হেরে গেলেও রীতিমত লড়াই করেই হেরে যায়। মোটের উপর ভারতের প্রথম গ্রান্ড প্রিকস টেনিসে বড় মাপের বেশী খেলোয়াড় না এলেও উন্নত ও সংগ্রামী টেনিসে আসর জমেছে। খেলার স্মৃতিও সহজে মন থেকে মুছবার নয়।

একলব্য

মতামতের মন্তাজ

ছবি তৈরির জন্য যে ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়া যাচ্ছে সেটা ভরসার কথা। ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়ার জন্য কী-ধরনের শর্ত পালন করতে হয় সেটা অবশ্য আমাদের জানা নেই। টাকার জন্য কার গ্যারানটি প্রয়োজন কিংবা কতদিনের মধ্যে ঋণ শোধ করতে হবে অথবা সুদের হার কত ইত্যাদি বিষয়ে হয়ত চিত্রনির্মাতারা ওয়াকিবহাল আছেন। জানা গেল, সম্প্রতি একটি ব্যাঙ্ক ফিলম ফিনানস করপোরেশনের গ্যারনটি স্বীকার করে নিয়েছেন। চিত্র-প্রযোজকদের এতদিন এফ-এফ-সিই একমাত্র ভরসাস্থল ছিল। অবশ্য কতজনের ভরসা পূর্ণ হয়েছে বলা কঠিন। বিভিন্ন অঞ্চলের

আবেদনকারীদের টাকা ধার দেবার পর এফ-এফ-সি'র ভান্ডারে বাংলা ছবির জন্য খুব একটা অবশিষ্ট কখনই থাকে না। বাংলা ছবি একেবারেই বঞ্চিত একথা অবশ্য বলা যায় না, তবে হিন্দীচিত্র যে-পরিমাণ এফ-এফ-সি'র মদৎ পেয়েছে বাংলা ছবি ততটা পায়নি। আবার ইদানীং শোনা যাচ্ছে, ছবির আবেদন গ্রাহ্য হওয়ার পরও নাকি টাকা জুটছে না। কারণ, এফ-এফ-সি'র ভান্ডার নাকি এখন শূন্য। সম্প্রতি এফ-এফ-সি'র ত্রয়োদশতম বার্ষিক সভায় এফ-এফ-সি'র লক্ষ্য ও কৃতিত্বের কথা বেশ সোচ্চারে বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে এফ-এফ-সি'র প্রধান কাজ নতুন প্রতিভার আত্মবিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। কথাটি কতখানি সত্য সেটা সংস্থার ঋণদানের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রপরিচালকের ছবি একাধিকবার এফ-এফ-সি'র টাকা পেয়েছে এমন নজিরও আছে।

* * *

প্রশ্ন উঠবে গোড়াতেই। এফ-এফ-সি নতুন প্রতিভা চিনে নেবেন কী-করে? শুধু স্ক্রিপট দেখে কি? এর জন্য দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন। এই দৃষ্টি যে এফ-এফ-সি'র নেই সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। সত্যিকারের নতুন প্রতিভাও এফ-এফ-সি'র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এফ-এফ-সি'র সাহায্যপ্রাপ্ত

"দেবী চৌধুরানী" (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে সুচিত্রা সেন

বাংলা ছবির তালিকায় দেখা যাবে যে তাতে একেবারে নতুন বা নবাগত পরিচালকের ছবি নেই। যদিও বা থাকে তবে সেই পরি-চালক চিত্রপরিচালনার আগে অন্যভাবে বিখ্যাত। অতএব নতুন প্রতিভা সন্ধানের কাজটি কলকাতায় ক্ষেত্রে বিশেষ দেখা যায়

অচেনা ফুলের নামে প্রতিদিন বারনারীদের নাম বদলায়। খদ্দের যে ফুলের নাম করে সেই দিনকার সেই নামের পতিতার কাছে তাকে পাঠানো হয়। সেই পতিতা ওই ফুলের রঙের শাড়ি পরে আসে। এই পদ্ধতি বা সাজসজ্জায় চমক থাকতে পারে কিন্তু তাতে পতিতাবৃত্তির মর্যাদা বাড়ে না।

অবশ্য প্রথানুগ ভাবে নাট্যকাহিনীকার বেশ্যাদের সভ্য-ভব্য রমণী হিসাবেই অঙ্কিত করেছেন। তাদের প্রতি মমত্ব ও সহানুভূতিরও অন্ত নেই! এই দেবপল্লীর ভামতীই (সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়) ছবির নায়িকা। শ্যামলীকেও (নীলিমা দাস) এক অর্থে নায়িকা বলা যায়, যে নারায়ণের প্রেয়সী এবং দেবপল্লীর প্রধান পতিতা। অর্থের লোভে নারায়ণ শ্যামলীকে আবার ওই অঞ্চলেরই ব্যবসায়ী ঘনশ্যামের রক্ষিতা করে দিয়েছিল—শ্যামলীর অন্তত সেটাই উক্তি। এহেন আড়ম্বরী বিষয়ের নাটক দেখে দর্শকের তৃপ্তি পাওয়া কঠিন। প্রেমের মূল গল্প যেটি আছে বঙ্গালী জিওলজিস্ট ও ভামতী যার নায়ক-নায়িকা তাও মামুলি। ভামতী নায়ককে ভালবেসে তপস্বী ভলার জন্য যে দূরে সরে গেছে তাও গতানুগতিক। এই গল্পটি আবার ত্রিকোণ—তৃতীয় ব্যক্তি নটবর জন। সংগীতপ্রেমিক এই ব্যক্তিও ভামতীকে ভালবেসেছিল। অবশ্য সে কুমতলবী নয়, তাই শেষ অবধি ভামতীর নতুন প্রেমের ব্যাপারে বাদ সাধেনি। ভামতীকে তার দরকার ছিল শুধু শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতে। সবিতাব্রত দত্ত এই চরিত্রের শিল্পী। চরিত্রটি যত অস্বাভাবিকই হোক, সবিতাব্রত এই ভূমিকায় উপস্থিত বলে দর্শক স্বভাবতই চরিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাছাড়া শ্রীদত্ত পর পর [illegible] প্রভৃতি শিল্পীদের গান শুনিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন।

উপরন্তু দেবীপল্লীর মহিলারা ছাড়াও এমন সব ব্যক্তিকে এই নাটকে দেখা গেছে যাদের রক্ত-মাংসের মানুষ ভাবতে কষ্ট হয়। এক মস্ত গুণীকেও নাটকে দেখা গেল, যিনি হঠাৎ নাচ দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন। অনুরাধা গুহের কুচিপুড়ি নাচ অবশ্য মন্দ লাগেনি।

এই অবস্থাতেও নাটকটিকেও মোটামুটি উপভোগ্য করে দিয়েছেন পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত। দেবীপল্লীতে বিভিন্ন ঘরে দেবীদের নৃত্যগীত এক ঝলকে দেখিয়ে দেবার প্রয়োগকৌশলটি দেখবার মত। নাটকটি সুপ্রযোজিত এবং গতিসম্পন্ন। তাপস সেনের আলোকসম্পাত খুব একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেনি। সুপ্রযোজনার কয়েকটি লক্ষণের মধ্যে শিল্পনির্দেশ (সুরথ দত্ত ও সন্তোষ সরকার) উল্লেখযোগ্য।

"জনপদবধূ"/নীলিমা দাস

শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয় নাটকের বেশ কিছু দুর্বলতা পুষিয়ে দিয়েছে। নায়িকা হিসাবে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রাণদীপ্ত। তাঁর কথা বলার ধরনটি বেশ। বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় ও দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণও সপ্রাণ। ওঁরা যথাক্রমে গান শুনিয়ে ও নাচ দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। শ্যামলীর চরিত্রে কিছুটা যন্ত্রণা আছে। সেটা সুন্দর প্রকাশ করেছেন নীলিমা দাস। ভামতীর মায়ের চরিত্রে গীতা দে জননীসুলভ স্নেহ ও মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা ভালই দেখিয়েছেন। নায়কের চরিত্রে সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের অভিনয় মনে তেমন রেখাপাত করে না। তাঁর কথা বলার ও চলাফেরার কৃত্রিম মানসিকতা চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। অন্যান্যদের মধ্যে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, গোপাল সিংহ রায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনীত চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন।

তিমিরবরণের সংগীত পরিচালনা এবং সাধনা বসুর নৃত্য পরিকল্পনা নাটকটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। এই নাটক প্রায় জনায় বিশেষ কোন ত্রুটি নেই দর্শকের তাৎক্ষণিক সুখপ্রাপ্তির উপকরণও আছে, আসল দুর্বলতা শুধু কাহিনী ও নাট্যবস্তুতে।

"জনপদবধূ"/বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

পূজা-রেকরড

এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়া পুজো রেকরডের প্রধান সম্ভার বাংলা আধুনিক গান। ফিল্ম ছাড়া একমাত্র পুজো-রেকরডই বাংলা আধুনিক গানের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে। ফিল্মের গান সিচুয়েশন-নির্ভর, রেকরডে বাংলা গানকে নিজস্ব পরিচয়ে পাওয়া যায়। তাই পুজো-রেকরডের তাৎপর্য যেমন বেশি, গ্রামোফোন কোম্পানির দায়িত্বও তেমনি অনেক। কোম্পানি এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন বলছি না, কিন্তু প্রতিবারেই কিছু গান ও কিছু কথা শুনে আশংকা হয় পুজোর বাংলা গানের মান উন্নয়নের উপর যেন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বাংলা গানের কথা যে ক্রমেই সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রসের গভীরতা হারাচ্ছে সে-সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। এবারেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। বাংলা গানে পশ্চিমের সুর বসালে ছেলেদের পছন্দ হতে পারে, কিন্তু বাংলা কাব্য সংগীত যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের মর্মপীড়া অনিবার্য। তা-ছাড়া, বোমবাই ফিল্মের কিংবা যে-কোন সিনেমার অভিনেত্রীর গ্ল্যামার বা নাম-ডাক থাকলেই তিনি বাংলা গান গাওয়ার অধিকার অর্জন করতে পারেন না। একাধিক বোমবাই শিল্পী বাংলা আধুনিক গানকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা বড় গায়িকা। যেমন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, উষা মঙ্গেশকর প্রভৃতি। সেটা যে-কোন নামকরা অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়। কোম্পানি এবার হেমা মালিনীর গানের রেকরড বের করেছেন। তাঁর গ্ল্যামার ও অভিনয় হয়ত অনেকেরই পছন্দ, তাঁর গানও যদি তেমন ভাল লাগত তবে কোন ক্ষোভের কারণ ঘটত না। অথচ এখনো অনেক সুগায়িক রেকরডে গানের সুযোগই পাচ্ছেন না।

অন্য বছরের তুলনায় অবশ্য এবার দেশীয় ভাব গানের সুর ভাল। যদিও কোন কোন শিল্পী একটি পাশ্চাত্য ধাঁচের গান গাওয়ার প্রলোভন ছাড়তে পারেননি। এই প্রলোভন হয়ত সুরকারেরও। পুজো রেকরডে ক্যাবারে বা রক-এর প্রভাব খুব একটা সফল দেয় কিনা জানি না। যে শিল্পী শুধু ওই জাতীয় গানই গেয়ে থাকেন তাঁর কথা অবশ্য আলাদা। কোম্পানী শ্রাবন্তী মজুমদারের গলায় এ জাতীয় গান কিছুকাল যাবত পরিবেশন করে যাচ্ছেন। তাঁর গাওয়া 'থাক অনেক শুনেছি ও কথা' কিংবা 'আজ কী তারিখ মা?' এবার যথারীতি পরিবেশিত। **এই সব গানের কথাও দুঃখ একেবারেই**

(হ্যলেন), নীলিমা দাস (সাকিনা), শোভা সেন (ফাতিমা), অপর্ণা সেন (মরজিনা) অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ ভট্টাচার্য ও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকরড-নাট্যরূপে (প্রণব রায়-কৃত) গীতি আছে, অভিনয় ও গান নাটকে সুসংবদ্ধ। গানের অন্য শিল্পীরা হলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সুমিত্রা রায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, চিন্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচি, উদয়বরণ, রাজকুমার বিশ্বাস, কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় ও গীতা মুখোপাধ্যায়।

পলিডর রেকরডের পুজো উপচারেও এবার নানা বৈচিত্র্য। নজরুলের গান, আধুনিক গান, ছড়া গান, পপ্ গান, হাস্যকৌতুক এবং গীটার ও সেতারের মোট বারখানি রেকরড তাঁরা এই পুজোয় প্রকাশ করেছেন। এঁদেরও শিল্পী-তালিকায় জনপ্রিয় চিত্রতারকা মালা সিনহা রয়েছেন। কিন্তু তাঁর গান খুব একটা ভাল হয়নি। সুকুমার মিত্র নজরুলের গান গেয়েছেন (মদির আঁখির সুধায়/নিশি রাতে রিম্ ঝিম্) বেশ দরদ দিয়ে। আধুনিক গানের শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসা পাবেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য "পৃথিবীর কোণে কোণে"/"ওগো আমার সুকন্যা" (কথা ও সুর : সমীর দেব) এবং কুমকুম চট্টোপাধ্যায় "সে পথে যেতে যেতে"/"তাই এমন দিনে বন্ধু আমার" (কথা : অমিয় চট্টোপাধ্যায়, সুর : রতু মুখোপাধ্যায়) গানগুলির জন্যে। দুই শিল্পীই সুকণ্ঠের অধিকারী এবং গানে প্রয়োজনীয় আবেগ সঞ্চার করেছেন। সুরে ও কথার বৈচিত্র্যে গানগুলিতে লক্ষণীয়। সনৎ সিংহ এবার বড়দের জন্য গেয়েছেন। তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছোটদের জন্যে গেয়েছেন জপমালা ঘোষ। বাচ্চাদের জন্য গাওয়া তাদের নিশ্চয় ভাল লাগবে তাঁর গান। বাপী লাহিড়ী পপ গানের মেজাজটা ঠিক ঠিক ভাবে এনে দিয়েছেন তাঁর রেকরডে। আধুনিক গানের অপর দুই শিল্পী মানস মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলী বসু। হাস্যকৌতুকে জহর রায়ের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর এবারের রেকরডও বেশ জনপ্রিয় হবে। বটুক নন্দী একটি ইপি রেকরডে চারখানি জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর বাজিয়েছেন। আর একটি ইপি রেকরডে কার্তিককুমার সেতারে ধুন এবং কীর্তনের সুর বাজিয়েছেন। এই শিল্পীর হাতটি সত্যিই মিষ্টি।

ভারতী রেকরড পুজোয় আটখানি রেকরড প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে নবীন ঘোষ ও সম্প্রদায়ের গাওয়া "দশাবতার স্তোত্রম্" (জয়দেব) ও "শ্রীনাম সংকীর্তন" (নরোত্তম দাস) ইপি রেকরডটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভক্তিভাবের সঙ্গে সংগীত-রসের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে গান দুখানিতে। আধুনিক গানের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ করা চলে রঞ্জিৎ বসুরায়, অজয় মুখোপাধ্যায় ও নিমাই ঘোষের নাম। শেষোক্ত শিল্পীর সতেজ কণ্ঠস্বরেরও উল্লেখ করতে হয়। মলয় রাহার হাস্যকৌতুক (প্রতিমা দর্শন ছয় দফা দাবী) জনপ্রিয় হবে। রাগপ্রধান গীতির রেকরড করেছেন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, মিলন সেনগুপ্ত ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া এঁদের আধুনিক গানের অপর দুই শিল্পী হলেন মনোজ মুখোপাধ্যায় ও উমা দাশগুপ্তা।

"ববি" (পরিচালনা : রাজ কাপুর) ছবিতে ডিম্পল ও ঋষী কাপুর

অন্য রেকরড

আধুনিক গানের জগতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেন দুই জনপ্রিয় নাম। মেগাফোন রেকরডে এবার এঁদের গান শ্রোতাদের আগের মতোই খুশি করবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সতীনাথের 'দিবস রজনী যায় গো' এবং উৎপলার 'এ আমার কী যে হল'।

হিন্দুস্থান ইপি রেকরডে অমর পালের গাওয়া চারটি লোকসংগীত (প্রভাত সময়ে, সব লোকে কয় [লালন ফকির] নদীতে [ভাটিয়ালি] এবং ও বাঁকা শ্যাম) চমৎকার। তাঁর গানে সত্যিকারের গ্রামীন মেজাজ পাওয়া যায়।

কিছুকাল আগে কলম্বিয়া রেকরডে প্রদীপ ঘোষ নজরুলের চারটি কবিতা (মানুষ, অগ্নানের ফালোকি জুটে, সর্বহারা ও দোদুল দুলে) আবৃত্তি করেছেন। তাঁর ভাবদীপ্ত উচ্চারণ প্রশংসনীয়। একাধিক কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে আবহসংগীতের কী প্রয়োজন ছিল? নজরুলের দুটি গানের (মোর প্রিয়া হবে/কোন প্রিয়া) এইচ-এম-ভি রেকরড প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। গান দুটি সুন্দর মেজাজে গেয়েছেন মৃণালকান্তি ঘোষ।

নাট্যকার জে বি প্রিস্টলে 'হোম ইজ টুমরো' নামে একটি মহৎ নাটক লিখেছিলেন। 'কালের কুলায়' সেই নাটকের অনুসরণে রচিত। ফলে নাট্যকার প্রিস্টলের মহৎ ভাবনা এবং মানবপ্রেম এই নাটকেও প্রধান বিষয়।

অনুসরণের কাজটি এখানে বেশ স্বচ্ছন্দ এবং গতিশীল। কিছু কিছু অংশের রচনা তো প্রায় মৌলিকতার স্বাদ দেয়। তবুও সুখের বিষয় মূল নাট্যকার জে বি প্রিস্টলে এখানে কদাচ উপেক্ষিত হন নি। তাঁর ভাবনার স্বাক্ষর নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে প্রতিফলিত। এ কাজে নাট্যকার সৌমেন চট্টোপাধ্যায় খুবই যত্নবান। 'মাম্বিয়া' নামক একটি আধা সভ্য দেশে সর্বাত্মক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে ইউ এন মিশনের একটি দল। এই দলের নেতা সত্যবাহন চান এই দেশ আর দশটা সভ্য দেশের মত শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাক তাঁরা সভ্য মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। কিন্তু ইউ এন মিশনের বিরোধী দল দেখা গেল খুব সক্রিয়। যারা সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায় দ্বীপটিকে নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। এই দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষই নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি ডেকে আনে।

নাটকের মধ্যে সভ্যতা এবং মানবসভ্যতা বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব অবশ্যই পরিস্ফুট। কিন্তু প্রযোজক দলের যতখানি শ্রম আর নিষ্ঠা ব্যয় করলে এই নাটক আমাদের খুশী করতে পারতো ঠিক ততখানি এখানে ব্যয়িত নয়। ফলে কোথাও কোথাও আমাদের মন ভরল ঠিকই, তবুও পরিপূর্ণতার স্বাদ পাওয়া গেল না। মাত্র তিনজন শিল্পী ছাড়া অধিকাংশ শিল্পীই কেবল নির্ভুল সংলাপ বলে গেলেন, আমাদের মর্মমূলে পৌঁছতে পারলেন না। আবহ সংগীত এবং আলো নাটকটিকে অতিরিক্ত কোন সাহায্যই দিল না। দৃশ্যপটের দৈন্যতাও চোখে লাগে। ইউ এন মিশনের কার্যালয় আরেকটু সাজানো গোছানো হতে পারত না কি? অভিনয়ে সবচেয়ে আগে মনে পড়বে 'ক্যাসিয়স' বেশে নাট্য-নির্দেশক জগমোহন মজুমদারকে। পরবর্তী দুজন শিল্পী হলেন হারাধন চক্রবর্তী (শেরম্যান) ও ভবানী পালচৌধুরী (সত্যবাহন)। নাটকটির মধ্যে যতটুকু প্রাণের উত্তাপ ছিল তা এই তিনজনের সু-অভিনয়ের ফলশ্রুতি। অন্যান্য শিল্পীরা কেউ তেমন দাগ কাটতে পারেননি। শেষে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতা পাঠের প্রয়োজন কেন হল? ওইরকম নিষ্প্রাণ কবিতা পাঠ কি কোনভাবে প্রযোজনাকে সাহায্য করতে পারে?

নাট্য-সমালোচক

"বেদন ভরা বসন্ত" (পরিচালনা : সুশীল মুখোপাধ্যায়) ছবিতে বনশ্রী নন্দী

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার

'জলসাঘর' গোষ্ঠীর আয়োজনে আমরা কিছুদিন আগে রবীন্দ্র সদনে সেতারশিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছিলাম। ওঁর সঙ্গে সঙ্গতে পেলাম পণ্ডিত কিষেণ মহারাজকে। এই জুটির মুখ্য সম্পদ শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য এবং ঐ প্রতিশ্রুতি ওঁরা পুরোপুরিই রক্ষা করেছিলেন বাজনায়।

আমরা পেলাম নিখিলবাবুর কাছ থেকে চিত্রা গৌরী, গৌরী মঞ্জরী এবং ঠুংরী-অঙ্গে খাম্বাজ। তবলায় পেলাম নিখুঁত লয়ের সঙ্গত, গতের কায়দা এবং হিসেবের খেলা।

চিত্রা গৌরী সন্ধিপ্রকাশ রাগ, পূরবী ঠাটের অন্তর্গত। এর যোজনায় আছে কোমল রেখাব, কোমল ধৈবত এবং দুটি মধ্যমের বিশেষ প্রসঙ্গ। এবং নিখিলবাবু তাঁর বাজনায় সেনী ঘরানার সম্মোহিনী শক্তিকে অটুট রেখেছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় এই রাগের বিষয়ে অন্তরাকোর অধিকারী। এঁদের কাছেই তালিম আছে নিখিলবাবুর। আলাপ-জোড়ে নিবেদিত এই রাগে শিল্পী ম গ ম প গা, প ধ নি প, গ ম রে সা কম্বিনেশনগুলিতে বিশেষ অভিনিবেশ দেখিয়ে রাগের ভাববেদনার রূপটিকে নিবিড় সংগীততে মেলে ধরেন।

পরে গৌরী মঞ্জরীর হাল্কা গত্-চলনে গম্ভীর চিত্রা গৌরীর একটা ব্যঞ্জনাময় কন্ট্রাস্ট খুঁজে পাওয়া যায়। এ রাগ ওস্তাদ আলি আকবর খাঁয়ের তৈরী। গতের সুন্দর মুখ দুটির কোমল নি-তে মোমস্পর্শ মনে রাখার মতই। কিষেণ মহারাজ এই সময়ে আহ্লাদের সঙ্গত শোনান।

নিখিলবাবুর ঠুংরী অঙ্গের খাম্বাজ ভারী মেজাজে ধরা ছিল। ৭ মাত্রার তালে কিষেণজীর সঙ্গত তাকে আরও সৌকর্য এনে দেয়। খাম্বাজের সুরবিহারে সুরের পিটগুলো বেশ দৃঢ় এবং মনোহর। পুনঃ পুনঃ শ্রোতার কাছে সে সুর থেকে সুরান্তরে যাত্রা ভীমসেন যোশীর খেয়াল গানের মতই ঠেকেছে। ভাব এবং অনুভবের এ এক বিরল পরিণয়। শাস্ত্রবিৎ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈল্পিকতার এ এক নতুন দিগন্ত। এক অর্থে এ আসর তাই একটা আবিষ্কার।

সংগীত-সমালোচক

গ্রামীন গীতি সংস্থার 'আরণ্যক'

গ্রামীণ গীতি-সংস্থার 'আরণ্যক' আঙ্গিক এবং পরিবেশনার দিক থেকে একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা। নৃত্যগীতের মাধ্যমে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা যায় কিনা, এ-বিষয়ে গ্রামীণ গীতি সংস্থার দুঃসাহসিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এর আগেও বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' ওঁদের তৃতীয় প্রয়াস। স্বাভাবিকভাবেই এতে ওঁরা অধিকতর আত্মপ্রত্যয়শীল। গানের সুর, নাচের ছন্দ, পাত্রপাত্রীদের চলনে এবং ভাবভঙ্গিমায় বেশ কিছু বৈচিত্র্য এসেছে। এর ফল অবশ্য সর্বত্র শুভ হয়নি। পূর্ণিয়া জেলার স্থানীয় মানুষের কণ্ঠে কখনো কখনো এমন সুর শোনা গেছে, যা পদ্মাপারের বাংলাকে মনে করিয়ে দেয়।

পঃ বঙ্গের নতুন খাদ্যনীতি বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। শুক্রবার এ মরশুমের খাদ্যনীতি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন : চালের বেসরকারী ব্যবসা অধিগ্রহণ করার সম্ভাবনা আর দূরে নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা এবার চালের মজুত গড়ে তুলবেন। পাঁচ লক্ষ টন তো নিশ্চয়ই, তার বেশী চালই তাঁরা সংগ্রহ করবেন। রাজ্য সরকার এবার খুব কঠোরভাবে লেভি তুলতে চান। রাজ্যের বাইরে চাল পাচার প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ এলাকায় রেশন থাকবে। থাকবে করডন। চাল সংগ্রহের সুবিধার জন্যই নবেম্বরে রেশনে চালের পরিমাণ বাড়তে পারে। রাজ্য সরকার সমস্ত বেআইনী হাসকিং মেশিন সিল করে দেবেন। প্রয়োজনে চাষীর উদ্বৃত্ত ধান-চাল আটক করবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন; রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার অঞ্চলের প্রতিটিতে তাঁরা পুলিস ক্যাম্প বসাবেন। বৃহত্তর কলকাতা, শিল্পাঞ্চল এবং আসানসোল-দুর্গাপুরে শহরাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশন বলবৎ থাকবে। চালকলগুলির উৎপাদনের ওপর ধার্য লেভির পরিমাণ বাড়ানো হবে। বর্তমানে সেচযুক্ত এলাকায় ৭ একরের বেশী ও সেচবিহীন এলাকায় ১০ একরের জোতে যারা ধান চাষ করেন তাঁদের বর্তমান অবস্থা বহাল থাকবে। প্রয়োজনে উদ্বৃত্ত সপ্তয় রিকুইজিশন করা হবে। সবরকম ধানেরই সংগ্রহ মূল্য কুইনটাল প্রতি প্রায় নয় টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দেশী সংবাদ

১৫ অকটোবর—আজ কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক শ্রেণীর বেশ কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ করে বলেন, এঁরা অন্যায়ভাবে অভাব-অসুবিধার সুযোগ নিচ্ছেন। তা না হলে গত বছরে খরা, উৎপাদন-ঘাটতি ইত্যাদি অসুবিধা সত্ত্বেও জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে যাওয়ার কোন কারণ আছে বলে সরকার মনে করেন না।

আগামী ১ নবেম্বর থেকে রেশনে চালের দাম বাড়বে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে চালের নতুন বিক্রয় মূল্য জানিয়েছেন। এই মূল্য আগের মূল্যের তুলনায় ২৫ শতাংশ থেকে ৩৩½ শতাংশ বেশী।

১৬ অকটোবর—পূর্ব-রেলের শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলি স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় আজ সকাল প্রায় সাড়ে নটায় চারজন চোরাই চাল পাচারকারী চলন্ত ট্রেনের উপর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। ডাউন তারকেশ্বর লোকালের ছাদে ওই সব চোরাই চালানকারী চাল নিয়ে আসছিল।

আজ একটি বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবরে ছিল যে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক প্রয়াস চালানোর ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত [illegible] আছে। কিন্তু ভারত সরকারের [illegible] একজন মুখপাত্র বলেছেন, না খবরটি ঠিক নয়।

১৭ অকটোবর—[illegible] কয়েক মাস ধরে বৈঠক, [illegible] আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত [illegible] [illegible] সিদ্ধান্তে [illegible]। ১ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আন্দোলনের ঢেউ [illegible] [illegible] ফিরিয়ে আসবে।

[illegible] উপলক্ষে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পয়সা এবং নোট [illegible] [illegible] সম্ভবত অন্ততঃ ৫৫ দিন লাগবে। উৎসব শুরু হয়েছে আজ থেকে ৫ দিন আগে।

দেবস্থানের প্রধান অফিসে ওই সব টাকা-কড়ি আনতে ৬৫টি চটের থলের দরকার হয়েছে। এ বছরের প্রণামীর পরিমাণ ১৩ লাখ টাকারও বেশী হবে বলে মনে হচ্ছে।

১৮ অকটোবর—বেবি ফুড থেকে শুরু করে তেল, ডাল, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার অভিযোগে গত আট মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট এগারশ অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে এক কলকাতায়ই ধৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৭০০।

প্রখ্যাত শিশু চিকিৎসক ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী গত মঙ্গলবার কিছুদিন রোগ ভোগের পর দেরাদুনে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি পত্নী ও এক পুত্র রেখে যান। তাঁরা ছিলেন চার ভাই। এখন রয়েছেন তিন ভাই—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী এবং আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী শ্রীবিনোদ চৌধুরী।

১৯ অকটোবর—গাজীপুরে পুলিশ একটি দলের জাল নোটের কারবার সম্প্রতি ফাঁস করেছে। উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সব জাল নোটের ব্যাপক ও ফলাও কারবার চলছিল। পুলিশের সদর দফতরে এই খবর এসেছে। জাল নোটগুলি ছাপা হত কলকাতায় দমদম বিমান বন্দরের কাছে অবস্থিত একটি ছাপাখানায়।

শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, অথচ বেবি ফুড গুঁড়ো দুধ হিসাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। চৌদ্দ টাকা তেইশ পয়সা দরের এক কিলোর টিনের বিনিময়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী একুশ, বাইশ টাকা কিলো দরে বেবি ফুড গুঁড়ো দুধ হিসাবে বিক্রি করছেন।

২০ অকটোবর—কলকাতা বন্দরের বয়ার আলো (নেভিগেশন্যাল লাইট) চুরি ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় রাত্রিবেলা জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ হতে চলেছে। ফলে এই বন্দরের অর্থনৈতিক বিপদ আরও বেড়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ এই বিপদ সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন—এই চুরি বন্ধ কর, না হলে তাঁরা কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চালাতে পারবেন না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে আগ্রাসী ইজরায়েলের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত আরব দুনিয়ার প্রতি ভারতের পূর্ণ সহানুভূতির কথা আবার ঘোষণা করেছেন।

২১ অকটোবর—কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় দরুন মানিকতলা থানা এলাকায় স্টেট বাসের একজন কনডাকটরের বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে বিভিন্ন দামের ১৫ হাজার ভুয়া টিকিট ধরা পড়ে। এ সম্পর্কে পুলিশ ১১, ১১এ রুটের একজন কনডাকটর এবং একজন চেকারকে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তিদের নাম ধনঞ্জয় গড়াই ও অমিয় সরকার।

বিদেশী সংবাদ

১৫ অকটোবর—গতকাল থাইল্যান্ডে গোলমাল শুরু হওয়ার পর আজ তা আরও ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানী ব্যাংককে চরম বিশৃঙ্খলা। বিভিন্ন স্থান থেকে একের পর এক হিংসাত্মক কার্যকলাপের খবর পাওয়া গিয়েছে। সরকারী অফিসগুলি তিনদিনের জন্য বন্ধ রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১৬ অকটোবর—আজ অসলোতে ঘোষণা করা হয় মারকিন পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ হেনরি কিসিংগার ও উত্তর ভিয়েতনামের পলিটব্যুরোর সদস্য লি ডাক থো-কে ১৯৭৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সরকারীভাবে অবসানের ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াসের স্বীকৃতিতে এই পুরস্কার।

১৭ অকটোবর—বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনকে (বি বি সি) বয়কট করার কথা ভাবছে। স্থায়ী ইসলামিক সেকরেটারিয়েটের আগামী বৈঠকে এ নিয়ে সম্ভবত আলোচনা হবে। ইরান, পাকিস্তান, কুয়াইত ইরাক এবং অলজেরিয়া ইতিমধ্যেই বি বি সি-র সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ না রাখার মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

১৮ অকটোবর—এবার সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার গেল অস্ট্রেলিয়ায় গেল এই প্রথম। পুরস্কার পেয়েছেন প্যাট্রিক হোয়াইট, বয়স ৬১। পুরস্কার প্রাপ্ত বইয়ের নাম 'আয়ারবিক'। হোয়াইট গল্প, নাটক সবই লেখেন কিন্তু তিনি মূলতঃ একজন ঔপন্যাসিক।

১৯ অকটোবর—ইজরায়েলে ২০০ কোটি টাকার ওপর জরুরী সামরিক সাহায্যের জন্যে প্রেসিডেন্ট নিকসন আজ কংগ্রেসকে বলবেন। আজ ওয়াশিংটনে সরকারী সূত্রে একথা জানানো হয়।

২০ অকটোবর—দু' সপ্তাহের লড়াইয়ের পর সিরিয়া ও মিশর দাবি করেছে তারা ৩৭০টির মত শত্রু বিমান ও হেলিকপটার মাটিতে ফেলে দিয়েছে। ইজরায়েলের কিন্তু আদৌ অত বিমান বা হেলিকপটার নেই। যা আছে—আরবদের দেওয়া এই সংখ্যা তার থেকে বেশী।

২১ অকটোবর—আরব ইজরায়েল যুদ্ধে মারকিন নীতি নিয়ে ইয়োরোপের গোষ্ঠিবদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতের অমিল রয়েছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম এ তথ্য জানিয়েছেন।

DESH WEEKLY,
REGD. NO. C 2109

Cover Printed by Ananda Offset Private Ltd., Calcutta

৪১ বর্ষ] শনিবার, ২৪ কার্তিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 10th November, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ

সূচীপত্র

শেভার স্যুইশ

আর বি.ঘা.বি.গু.স.*-এর সদস্য

* বিশ্ব ঘাতক বিপ্লবী গুপ্তচর সঙ্ঘ।

mcm/ci/26a/ben

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

লেখক　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীপ্রাণেশকুমার মণ্ডল

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২৪ কার্তিক ১৩৮০
Saturday 10 November 1973

সরকার বনাম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়

কাগজপত্রে অভিযোগ উঠেছে, কলকাতার একদল ব্যবসায়ী সরকারকে বিপন্ন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এটা অবশ্য এমন কিছু নতুন কথা নয়; ভারতের সর্বত্রই সরকার বনাম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি ঠাণ্ডা লড়াই ইদানীং প্রবল হয়ে উঠেছে। কলকাতা তার থেকে বাদ যাবে এমন কোনো কারণ নেই। আসল কথাটা বোধ হয় এই যে, ব্যবসায়ীরা চান মুনাফা এবং বাজার-দর বাঁধার ব্যাপারে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, নচেৎ তাঁরা সরকারকে পদে পদে হেয় করবেন। জিনিসপত্রের অভাব ক্রমশই বাড়ানো এবং প্রত্যহ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি তারই একটি বড় রকমের প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া যায়। আমাদের দেশে কোনো কিছুর অভাব এখন নেই একথা কেউ বলছে না। প্রাচুর্য নেই বলেই বছরের পর বছর—বিশেষ করে গত দু তিনটি বছর আমাদের এই দুরবস্থা। কিন্তু যতটা অভাবের কথা বলা হয় তাও সঠিক নয়। অভাবকে আরও তীব্র করে তোলার কারসাজি চলছে বলেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এত হাহাকার এবং অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। পুজোর আগে কলকাতার কিছু ব্যবসায়ী হাওড়ার মালগুদামে ডাল বার্লি ভুট্টা এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের আট ন হাজার টন মাল জমিয়ে রাখেন। অর্থাৎ মালগুলি কলকাতার জন্যে এসেও হাওড়ার গুদামে পড়ে থাকল, খালাস করানো হল না। হাওড়ার গুদামের তখন এমন অবস্থা যে নতুন মাল এসে পৌঁছলে তা রাখার উপায় নেই। ফলে কলকাতার বাজারের জন্যে আনা চারশো খাদ্যশস্যের মালগাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল, খালাসের উপায় থাকল না। ব্যাপারটা যখন চরমে, সরকার থেকে শুরু করে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা পর্যন্ত হইচই শুরু করলেন তখন মাল খালাস শুরু হল। কিন্তু পুজোর মুখে যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়েছিল তার কিছু ফায়দা ব্যবসায়ীরা ওরই মধ্যে যতটা পারেন উঠিয়ে নিলেন। এর পর এঁদের চাল হল একেবারে উলটো: এবার আর মালগুদামে জিনিস ফেলে রাখা নয়, আমদানি বন্ধ রাখা। জানা গিয়েছে, অনেক ব্যবসায়ী অন্য রাজ্যে তাঁদের সগোত্রদের জানিয়েছেন, কলকাতায় মাল পাঠানো বন্ধ করো। ইদানীং হাওড়ায় মাল আমদানি হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-ধরনের বেশ কয়েকটি অভিযোগও পেয়েছেন। এই যে মাল আনা বন্ধ করে বাজারে অভাব জিইয়ে রাখার কারসাজি এটাও নতুন নয়, বোম্বাইয়ে সেদিনও একই ফন্দি করে তেল এবং চিনির আমদানি বন্ধ রাখা হয়েছিল। এমন কি, রাস্তা থেকেই যেখানকার মাল সেখানেই আবার ফেরত পাঠানো হয়েছে।

প্রশ্ন হল, ব্যবসায়ী মহল যে-ধরনের কারসাজি রপ্ত করে ফেলেছেন—এটা কী যথারীতি এদেশে চলতে থাকবে, নাকি তার কোনো প্রতিকার হবে? পশ্চিমবঙ্গে মিসায় আটক এবং অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। গত ন' মাসে আড়াই কোটি টাকার বে-আইনি মালও এনফোর্সমেণ্ট পুলিস আটক করেছে, তার মধ্যে চাল গম ডাল বেবিফুড কেরাসিন তেল থেকে পেট্রোল পর্যন্ত আছে। এসব সত্ত্বেও কী হয়েছে? কলকাতা বলে নয়, পশ্চিমবঙ্গে কোন জিনিসটা সহজপ্রাপ্য? কোন নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য স্বাভাবিক মূল্যে পাওয়া যায়? কী কারণে কৌটোর গুঁড়ো দুধ খুলে নিয়ে প্যাকেটে ভরে বেশী দামে বিক্রী হয়? এমন কোন সংগত কারণ আছে যার জন্যে আসানসোল কোলিয়ারী এলাকার কয়লাও কলকাতায় এসে পৌঁছতে পারে না, যদি বা আসে তার দামের কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না?

এদেশে সরকার এবং ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে তা আমরা জানি না; তবে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে তাতে সরকার যে সুবিধে মতন যুঝতে পারছেন তাও মনে হয় না। সন্দেহ হয়, যে দ্বিধাহীন নীতি এবং কাঠিন্য থাকলে এ যুদ্ধে জেতা যায় তা বোধ হয় সরকারের নেই। ফলে মৌখিকভাবে যতটা হুঙ্কার শোনা যায় কার্যক্ষেত্রে তার সামান্য মাত্র আমাদের চোখে পড়ে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সুপ্রাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ ৩৬.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ ১৮.৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ ৯.৫০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ ৪৪.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ ২২.৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ ১১.৫০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ ৮৭.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ ৪৪.০০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ ২২.০০

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ ৬০.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ ৩১.০০

লণ্ডন অফিস মারফত

বার্ষিক	— টাঃ ১৭৪.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ ৮৭.৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ ৪৪.০০

‘দিল্লি দূর অস্ত’

দুধেল গাই

সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে উন্নত পশু প্রজনন পরিষদের (ইহা একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা) জনৈক মুখপাত্র আমাদের সঙ্গে জানান, তাঁরা এক উন্নত জাতের দুধেল গাই আমাদের উপহার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। প্রজনন বিজ্ঞানে এ এক যুগান্তকারী সংযোজন।

উক্ত মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, "এই দুধেল গাই খায় কম, নাদে বেশী এবং ইচ্ছেমত একে দোহন করা যায়। আর যতই দোহন করুন, একবারও চাঁট ছোঁড়ে না। দোহন বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী সেই সব রাজনীতি-সেবী, যুব ও ছাত্র নেতা, বড় আমলা ও ছোট ব্যবসায়ী, শ্রমিক-সখা, প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টর, বারোয়ারির মাতব্বর, সংস্কৃতিজগতের পাণ্ডা, শিক্ষা-জগতের তুখোড় কারবারী, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, বল কোম্পানি, বাস কোম্পানি, ট্যাক্সিওলা, ভিস্তিওয়ালা, এমন কি পথের ভিখারী পর্যন্ত এই উন্নত ধরনের দুধেল গাইকে একযোগে অথবা একে একে অনায়াসে দোহন করতে পারবেন। এর রসের উৎস কখনোই শুকোবে না।"

জনৈক সাংবাদিক : বলেন কি! এ তো দারুণ ব্যাপার! আচ্ছা, এই দুধেল গাইয়ের লংজিভিটি কত? মানে এক একটা গাই বাঁচে কত দিন?

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : যত দিন দোহন করতে চাইবেন তত দিন বাঁচবে। এই দুধেল গাইয়ের আরেকটা বিশেষত্ব এই যে, একে পোষবার জন্য দোহনকারীদের কোনও খরচ করতে হয় না। এরা নিজেরাই বিচরণ করে। শহর ও গ্রামে এরা যাতে সমভাবে বিচরণ করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

জনৈক সাংবাদিক : আচ্ছা মহাশয়, যে উন্নত জাতের দুধেল গাইয়ের কথা আপনি বলছেন, এগুলো কি আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি?

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : আরে না না। ওসব জায়গার গাইকে কি এমন যখন তখন দোহন করা যায়? না তারা তা সহ্য করে? এ হচ্ছে একেবারে আমাদের ঘরের জিনিস। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলি। আপনাদের বুঝতে সুবিধে হবে। দোহনবিদ্যা সব দেশেই আছে। তবে আমাদের দেশে দোহনের মাত্রাটা ব্যাপক। আমাদের গবেষণা এই সূত্রটাকে কেন্দ্র করেই আমরা চালিয়ে গিয়েছি। অর্থাৎ দোহনের সর্বগ্রাসী এবং বিচিত্র ধরনের যে চাহিদা আমাদের এখানে রয়েছে, আমাদের এখানে বলতে আমি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরছি,
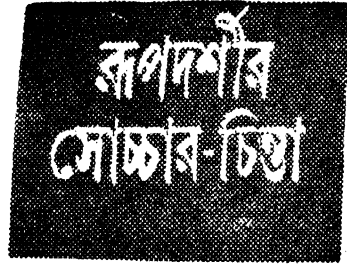
সেই চাহিদা কিসে পূরণ করা যায়, আমাদের গবেষণার লক্ষ্য ছিল তাই। গত পঁচিশ বছরের গবেষণার ফল আমাদের এই উন্নত জাতের দুধেল গাই। কিন্তু দুধেল গাই তো মশাই কতই আছে। আমরা ত্রিশ জাতের বাছা বাছা গাই নিয়ে গবেষণা চালিয়েছি। বিদেশী-দেশী কিছুই বাদ রাখিনি। কিন্তু কি দেখলাম জানেন। সব এসে এক জায়গায় ঠেকে যাচ্ছে।

সাংবাদিকগণ : কি রকম?

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : অবাধ দোহনে কেউ রাজী হচ্ছে না। একবারের বেশী দুবার দুইবার জন্য বাঁটে হাত ঠেকিয়েছেন কি আপনাকে লক্ষ্য করে চাঁট ছুঁড়ছে। তা ছাড়া আরও একটা জিনিস দেখা গেল, প্রচলিত যে-সব দুধেল গাই আছে তাদের সকলেরই দেবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেউ দু' সের দেয়, কেউ বা বিশ সের, তফাত শুধু এই। কিন্তু যে দু' সের দেয় তার কাছ থেকে আড়াই সের বের করতে যান দেখি, সেও যেমন চাঁট ছুঁড়বে আবার যে বিশ সের দেয় তার বাঁট থেকে সাড়ে বিশ সের বের করতে গেলে সেও তেমনি চাঁট ছুঁড়বে। কিন্তু আমাদের এখানে ঐরকম মাপা দোহনে কাজ কি করে চলবে? আমাদের এখানে দোহনের সিসটেমই যে আলাদা। প্রথমেই ধরুন মন্ত্রী মহোদয়েরা ঘটি হাতে এলেন। তাঁরা দোহন করবেন। তারপরে বিরোধী দাদারা আসবেন। দোহন করবেন। তারপরে আসবেন জাতির ভবিষ্যৎ যুব ও ছাত্রনেতারা। দোহন করবেন। তারপরে শ্রমিক নেতারা আসবেন। দোহন করবেন। পলিটিকাল দোহন শেষ হল তো অর্থ-নৈতিক ফিল্ডের দোহন বিশারদরা এগিয়ে আসবেন। বড় মহাজনরা দোহন করবেন। তিনি যাবেন তো আসবেন মাঝারি মহাজন। দোহন করে তিনি যাবেন তো আসবেন ছোট মহাজন। তিনি দোহন করবেন। তারপর ক্রমে ক্রমে আসবেন অন্যান্য ফিল্ডের দোহনবিদেরা। মনে রাখবেন একই বাঁট থেকে পর্যায়ক্রমে এখানে দোহন চলে। কাজেই আমাদেরও এমন দুধেল গাইয়ের কথা ভাবতে হল যার ভাণ্ডার হবে অফুরন্ত এবং যার বাঁটে হরেকরকম হাত পড়বে কিন্তু সে চাঁট ছুঁড়বে না।

সাংবাদিক : এ তো কামধেনু মশাই।

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : আমাদের এই উন্নত জাতের দুধেল গাই তার চাইতেও এক কাঠি সরেস। এ দু' পায়ে চলে।

সাংবাদিকগণ : দু' পায়ে চলে!

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : হ্যাঁ মশাই। তবে আর বিপ্লব কি? এই নিয়েও কি আমাদের কম ভুগতে হয়েছে! সত্য বলতে কি, এইটেই ছিল আমাদের সব চাইতে বড় বাধা। প্রায় দুরতিক্রম্য বাধাই বলতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞানের কৃপায় সে বাধাও আমরা অতিক্রম করেছি। আখেরী সমস্যাটা দাঁড়িয়েছিল এই : যখন অন্যান্য সমস্যাগুলো একে একে সমাধান করে ফেললাম তখন দেখা গেল চাঁট ছোঁড়ার সমস্যাটা রয়ে গিয়েছে আর রয়েছে উপযুক্ত ফডার অর্থাৎ খাদ্য আবিষ্কারের সমস্যা। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে দুটোর সমাধানও বের করে ফেললাম। আগে চাঁটের সমস্যাটার কথা বলে নিই। বিশেষ করে লক্ষ্য করা গেল গোরু চারপেয়ে জানোয়ার বলেই তার চাঁট ছুঁড়তে অত সুবিধে। এবং সে সর্বদাই দু' পায়ে ভর রেখে বাকি দু' পা দিয়ে চাঁট ছোঁড়ে। তখন থেকেই বুঝতে পারলাম, আমাদের এই উন্নত জাতের দুধেল গাই-এর চাঁট খাওয়া থেকে যদি রেহাই পেতে হয় তা হলে তাকে দুই পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। এবং আমরা তারপর সেই পরীক্ষায় হাত দিলাম। আমরা সব জাতের গোরু নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছি। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র একটা জাতের গোরুই শুধু দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, আর কেউ না।

সাংবাদিকগণ : কোথাকার গোরু? কোন গোরু? কি গোরু?

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : বাঙলী গোরু। এই পশ্চিম বাংলার জন-ধেন। তারা যে শুধু দু' পায়ে চলে তাই নয়, এও দেখা গেল যে, অবাধ, অবিরাম এবং নির্বিচার দোহনও তাদের মত আর কেউ সহ্য করতে পারে না।

সাংবাদিকগণ : আচ্ছা স্যার, নিউজের সুবিধের জন্য আপনার কথাটাকে যদি এই-ভাবে লেখা যায়, যথা—"বাঙালী গোরুই বিশ্বের প্রথম দু-পেয়ে গোরু" তা হলে কি ভুল হবে?

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : মোটেই না। বিজ্ঞানত কোনও ভুল হবে না।

সাংবাদিক : থ্যাংক ইউ। এবার খাদ্য। খাদ্যের কথাটা বলুন। ওদের খাদ্য কি?

প্রজনন বিশেষজ্ঞ : স্তোক বাক্য। শুধু ঐ খেয়েই এই সব দুধেল গাই বেঁচে থাকতে পারে। আছেও।

দেবরাজ

শান্তি নিয়ে অশান্তি

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল ছিলেন জাতে সুইডিশ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ডিনামাইট আর ওই রকম আরও অনেক বিস্ফোরক তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। বিস্তর টাকা নোবেল কামিয়েছিলেন তাঁর আবিষ্কারের পেটেণ্ট থেকে। রুশিয়ায় বাকু এলাকায় তেলের খনির মালিকানাতেও তাঁর ভাগ ছিল। তা থেকেও বেশ দু পয়সা তাঁর আয় হয়েছিল। বিয়ে থা তিনি করেননি, আপনার বলতে তাঁর কেউ ছিল না। মারা যাবার আগে তিনি তাঁর অগাধ সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে পাঁচটা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করে যান।. চারটে দেওয়া হয় দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানী আর সাহিত্যিকদের। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা কিংবা চিকিৎসাবিদ্যা আর সাহিত্যচর্চার জন্যে বছরে বছরে গুণী-জ্ঞানীদের বাছাই করে সুইডেনের তিনটে সংস্থা। পাঁচ নম্বর পুরস্কার দেওয়া হয় শান্তির জন্যে। সেটা দেওয়ার ভার নরওয়ের পার্লামেণ্টের নিয়োগ করা নোবেল কমিটির। হালে নতুন আর একটা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। সেটা দেওয়া হচ্ছে দুনিয়ার সেরা অর্থনীতিবিদদের। সে পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছে ১৯৬৯ সনে। বাকীগুলো চালু হয়েছে ১৯০১ সনে।

এত ব্যাপার থাকতে বিশ্ব শান্তির জন্যে কেন যে নোবেলের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল তার কোনও হদিশ তিনি দিয়ে যাননি। হয়তো বা মরণের কারবারী নোবেল চেয়েছিলেন লড়ায়ের সরঞ্জাম যুগিয়ে তিনি যে পাপ করেছিলেন তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে শান্তির পূজারীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে। উদ্দেশ্য তাঁর যাই থাকুক না কেন, তিয়াত্তর বছর পরেও অশান্তি দুনিয়া থেকে দূর হয়নি, বরঞ্চ বেড়েই চলেছে। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার সে অশান্তির আগুনের আঁচ একটুও কমাতে পারেনি। ও পুরস্কার পাবার আশায় কেউই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে কোথাও কোমর বেঁধে লাগেনি, পুরস্কার পাবার পরেও কেউ যে অশান্তি দূর করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন এমন নজিরও নেই। বরঞ্চ শান্তি পুরস্কার নিয়ে বারবার অশান্তিই দেখা দিয়েছে। তার ফলে পুরস্কারের মর্যাদাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শান্তি পুরস্কার দেওয়া যতবার মুলতবি রাখা হয়েছে তত আর অন্য কোনও পুরস্কারের বেলা হয়নি। অন্তত আঠারো বার নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়নি।

এ বছর অবশ্য নোবেল কমিটী শান্তি পুরস্কারের জন্যে লোক বাছাই করে ফেলেছেন। কিন্তু সে কমিটীর কাণ্ড দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে তামাম দুনিয়ার। নরওয়ের গোপাল ঠাকুররা শালুক চিনেছেন বটে। সার্থক শান্তির সৈনিক হিসেবে গৌরব-টীকা তাঁরা এঁকে দিয়েছেন মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট অর্থাৎ পররাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরি কিসিংগারের কপালে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামাবার জন্যেই তাঁর এই পুরস্কার। তবে ব্যাপারটা যে নেহাতই একটা কেলেঙ্কারি হতে চলেছে এই ভেবে বুঝি আরও একটা নাম তাঁরা জুড়ে দিয়েছেন ডঃ কিসিংগারের সঙ্গে। শান্তি পুরস্কারের জন্যে বাছাই হয়েছেন একা ডঃ কিসিংগার নন, তাঁর দোসর হচ্ছেন উত্তর ভিয়েতনামের লে ডুক থো। তাঁর দেশের সরকারের তরফ থেকে প্যারিস চুক্তিতে সই করেছেন তিনিই। যুদ্ধ থামাবার উপায় আর শর্ত নিয়ে কথাবার্তা তিনিই চালিয়েছেন মার্কিন আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। চার তরফের সে আলোচনায় আর এক শরিক ছিল ভিয়েত কং। পুরস্কার কিন্তু তাদের বরাতে জোটেনি, দক্ষিণ ভিয়েতনামীরাও বাদ পড়েছে এ দাক্ষিণ্য থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেটকে এই প্রথম শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো না। এর আগে আরও তিনজন সেক্রেটারি অব স্টেট নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। সব প্রথম ওই পুরস্কার পান ১৯২৯ সনে ফ্রাংক বি কেলগ, তারপর ১৯৪৫ সনে কর্ডেল হাল, আর ১৯৫৩ সনে মার্শাল প্ল্যানের জর্জ সি মার্শাল। বিশ বছর বাদে আবার সে পুরস্কার জুটলো আর একজন মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটের ভাগ্যে। তাতে অবশ্য মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, ডঃ কিসিংগারকে কী সুবাদে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে? ভিয়েতনামে যুদ্ধ আমেরিকার তরফ থেকে থামিয়েছেন রাষ্ট্রপতি নিক্সন, তাঁর তখনকার পরামর্শ-দাতা ডঃ কিসিংগার নন। কিসিংগার আলাপ আলোচনা করেছেন, দূতিয়ালি করেছেন, শেষ পর্বে দলিলে সইসাবুদও করেছেন। কিন্তু সে সবই তো কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কর্তা যদি জেদ ধরতেন লড়াই তিনি চালিয়ে যাবেনই তা হলে ডঃ কিসিংগার যত কেরামতিই দেখান না কেন, ভিয়েতনামে লড়াই থামতো না।

নিক্সনেরও যে ভিয়েতনামের দুঃখে প্রাণ কেঁদেছিল এমন নয়। সে দেশে মার্কিন বর্বরতার উলঙ্গ রূপ দেখে সারা দুনিয়া শিউরে উঠলেও আমেরিকার চৈতন্য হয়নি। যুদ্ধ থামাতে নিক্সন রাজী হয়েছিলেন সে লড়াই জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে। জেতার সম্ভাবনা থাকলে কোনও শর্তেই তিনি লড়াই থামাতেন না। ডঃ কিসিংগারকেও শান্তিদূত সাজিয়ে প্যারিসে-হ্যানয়ে পাঠাতেন না। তবুও লড়াই তিনিই বন্ধ করেছেন। পুরস্কার যদি দিতেই হয় আইনমাফিক তা তো তাঁকেই দেওয়া উচিত। কথাটা বুঝেছেন কিসিংগারও। আসলে নোবেল কমিটী পুরস্কার দিয়েছেন তাঁর প্রভু নিক্সনকেই—প্রভুর বেনামদার হিসেবেই পুরস্কার নিতে হচ্ছে তাঁকে। তাতে তাঁরও গৌরব বাড়েনি, নিক্সনেরও নয়, নোবেল কমিটীর তো নয়ই। ভিয়েতনাম চুক্তির জন্যে পুরস্কার যদি সেখানকার নাটের গুরু মার্কিন প্রতিনিধির পাওনা হয় তা হলে হিটলার আর চেম্বারলেন কী দোষ করেছিলেন? মিউনিখ চুক্তির জন্যে ১৯৩৮ সনের শান্তি পুরস্কার তো তাঁদের জুটিকে দিলেই ঠিক তো! শান্তি বজায় রাখার জন্যেই তো হিটলার আর চেম্বারলেন চেকোস্লোভাকিয়াকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন সেবার।

কিসিংগার শান্তি পুরস্কার নিতে রাজী হলেও সরাসরি "নেবো না" বলে দিয়েছেন উত্তর ভিয়েতনামের লে ডুক থো। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা, ভিয়েতনামে শান্তিই আসেনি তার জন্যে আবার পুরস্কার, প্যারিসে শান্তিচুক্তি সই হলেও তার সব শর্ত যে মানা হচ্ছে এমন কথা বলা যায় না। কথাটা মিথ্যে নয়। খাস উত্তর ভিয়েতনামে অবশ্য কোনও গোলমাল নেই, লড়াইয়ের পালা সেখানে চুকেছে, লোকে তাদের কাজকর্ম দিব্যি শান্তিতেই করে যাচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণে শান্তি এলো কই? দক্ষিণী থিউ সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সংঘর্ষ লেগেই আছে। থো এর জন্য দায়ী করছেন দক্ষিণী সরকারকেই, কিন্তু অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারও কিছু ধোয়া তুলসী পাতা নন। দক্ষিণের মুরুব্বি আমেরিকা, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের উত্তর ভিয়েতনাম। শান্তি পুরস্কার নিয়ে থো দক্ষিণী সরকার কিংবা আমেরিকার দোষ খণ্ডাতে চান না—তাদের মনোভাবই যে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার বাধা এটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তা ছাড়া যারা তাঁর দেশের মাটিতে রক্ত ঝরিয়েছে একটানা আঠারো বছর বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে শহর-গাঁ গঞ্জ-বন্দর তাদেরই একজন চাঁইকে শান্তির অবতার বলে মানেন তিনি কি করে?

ইংরেজিতে ভারতীয় কবিতা

ভারতীয় সাহিত্য বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আছে, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে এছাড়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেকে সরাসরি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন—এঁদের নামকরণ হয়েছে ইন্ডো-অ্যাংলিয়ান রাইটারস। এবং একথাও এখন বলা যায়, ভারতীয়দের রচিত ইংরেজি সাহিত্য ক্রমশ একটা আলাদা রূপ নিচ্ছে, কোনোক্রমে আর ইংরেজি-সাহিত্যের অন্তর্গত হবার প্রয়াস নেই—আমেরিকান সাহিত্য যেমন সম্পূর্ণ অন্যরকম, ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের সেই রকম একটা চেহারা ক্রমশ পরিস্ফুটিত হচ্ছে।

আগে ইংরেজি ভাষার লেখকদের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেরও কোনো যোগ ছিল না। অপরিচয়ের দূরত্ব ছিল অনেকখানি। এখন সেটা কমে আসছে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষ কবিরা অনেকেই এখন নানান ভারতীয় ভাষার লেখকদের রচনার অনুবাদ কাজেও সময় ব্যয় করছেন, এতে আঞ্চলিক সাহিত্যগুলির পারস্পরিক পরিচয়ের পথও বেশ সুগম হচ্ছে। সাহিত্য একাদেমি এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু সুরাহা করতে পারেন নি, বরং অনেক বেশী কাজ হয়েছে ঐসব কবিদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এ প্রসঙ্গে প্রীতীশ নন্দীর নাম সুবিদিত।

প্রীতিশ নন্দী অত্যন্ত তরুণ বয়েসেই আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকেও সমাদরের সঙ্গে ছাপা হয়। ব্যক্তিগত সাফল্য ছাড়াও তিনি অন্য নানা কাজে ব্যস্ত। কলকাতা থেকে 'ডায়ালগ' নামে তিনি একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যাতে ইংরেজি মৌলিক কবিতার পাশাপাশি ছাপা হয় অনুবাদে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল।

ডায়ালগ—(৫ পার্ল রোড, কলকাতা-১৭) আর একটি উদ্যোগ, আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন কবির পৃথক কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা। এরকম চারটি গ্রন্থ আমাদের হাতে সম্প্রতি এসেছে, এগুলি আকারে কৃশ হলেও বেশ সুস্বাদু।

এখানে আমরা পেয়েছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সৌভাগ্যকুমার মিশ্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। বাঙালী তিনজনের পরিচয় এখানে জানানো নিষ্প্রয়োজন। সৌভাগ্যকুমার মিশ্র ওড়িয়া ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি, তিরিশের ঘরে বয়েস, ভুবনেশ্বরের একটি কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'আত্মনেপদী' এবং 'মধ্যপদলোপী'। এঁর কবিতাগুলির অনুবাদ করেছেন জয়ন্ত মহাপাত্র, এঁর মৌলিক ইংরেজি কবিতা বহু বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবলী অনুবাদ করেছেন প্রীতীশ নন্দী। এটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কোনো বাংলা কাব্যগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়, নির্বাচিত কবিতা, মলাটেই রয়েছে বহু পরিচিত বাবর আলির চোখের মত আকাশ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চাশটি সনেট অনুবাদ করেছেন মনীশ নন্দী। মনীশ নন্দীর ইংরেজি রচনার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এবং তাঁর অনুবাদ ক্ষেত্র এত বিপুল যে তার একদিকে আছে আধুনিক কিউবার কবিতা, অন্যদিকে কালিদাসের ঋতু সংহার কাব্য।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাবলী অনুবাদ করেছেন কবি নিজে কিছুটা এবং শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। শেষোক্তজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক এবং শুভরঞ্জন, যিনি এই সংকলনের সম্পাদক—গত কয়েক বছরে তাঁর অনেকগুলি ইংরেজি কবিতা এবং কয়েকটি বাংলা কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ইনি কলকাতা বিষয়ক একটি অনুবাদ কাব্য সংকলনেরও যুগ্ম-সম্পাদক।

এই তো হলো পুস্তিকাগুলির পরিচয়। এখন কথা হচ্ছে, অনুবাদগুলি কেমন হয়েছে? যাঁরা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা আলাদা ভাবে বিচার করবেন। যে-হেতু আমার ভুল ধরার ক্ষমতা নেই, তাই বলতে পারি আমার বেশ ভালো লেগেছে। যখন এই রকম পড়িঃ

where are you hiding
Suleiman's mother
amidst this maze of lanes
in Calcutta?
where have you built your home
Suleiman's mother
beneath the sky
like the wild eyes of mad Babar Ali?

তখন এতে সুদূর ইংরেজি সাহিত্যের গন্ধ লাগে না, কিন্তু ইংরেজি ভাষার ঐশ্বর্যে আমরা খুঁজে পাই আমাদের চেনা জগৎ।

আমরা এই উদ্যমকে স্বাগত জানাই।

সনাতন পাঠক

চিঠি

বাংলা বানান

দেশ পত্রিকার ৪০(৪৮) সংখ্যায় সনাতন পাঠক 'সাহিত্য সংবাদ' অংশে বাংলা বানান সম্পর্কে বাঙালী লেখকের ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা বানানের নানা সমস্যার কথা অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, অম্বজিত রায় প্রভৃতিও উল্লেখ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। দুটি প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭।২।১৩৮০ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ২৩(৮) সংখ্যা) আমি বাংলা বানানের জন্য সুনির্দিষ্ট সূত্রের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃত বাংলা বানানের সূত্র খুব কম লেখকের কাছে সম্মান পায়। যে কোন দেশের ভাষা শক্তিশালী হয় ঐ ভাষার সৎ লেখকদের প্রচেষ্টায়। প্রতিটি লেখক নির্ভুল বানান লিখতে পারেন একটি নির্ভরযোগ্য অভিধানের সাহায্যে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে যে অভিধানটি প্রকাশ হওয়ার কথা খবরের কাগজে প্রকাশ হয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানাই। এই প্রসঙ্গে বাঙালী লেখকদের উচিত হবে সমস্ত মতবিরোধ ভুলে গিয়ে মাতৃভাষার প্রতি ন্যূনতম মমত্ববোধে যেন এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। যতদিন অভিধান প্রকাশ না হচ্ছে ততদিন যেন প্রতিটি পত্রিকার সম্পাদক এক শব্দের একটি বানানকেই গ্রহণ করেন এবং তাঁর পত্রিকার প্রতিটি রচনায় যাতে ঐ বানান প্রকাশ হয় তার ব্যবস্থা করেন। তাহা হলেই কিছু উন্নতির আশা করা যায়।

—ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র
কলকাতা-৫৫

॥ ২ ॥

সনাতন পাঠক সাহিত্য সংবাদ বিভাগে (৪৮ সংখ্যা, ১২ই আশ্বিন) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটা দামী কথা বলেছেন। "এখনো পর্যন্ত বাংলা বানানের কোনো নির্দিষ্ট নীতি ঠিক হলো না"—বলে তিনি আক্ষেপ করছেন। বোম্বাইতে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে অবাঙালীদের বাংলা শেখাতে গিয়ে বারবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে—"কেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন বানান অনুসৃত হচ্ছে—বর্ণপরিচয়ে যে বানান শিখলাম—পরে অন্যান্য বইতে অন্য বানান পড়তে হচ্ছে কেন?" শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, শিক্ষকেরা সদুত্তর দিতে গিয়ে অসহায় বোধ করছেন। এ অবস্থার অবসান হোক।

তবে সনাতন পাঠক বাংলা ভাষার সর্বব্যাপী অভিধান রচনার প্রস্তাবে আশান্বিত বোধ করছেন না কেন জানি না। আমি ওঁকে অনুরোধ করব হিন্দী-ইংরেজী অথবা ইংরাজী-হিন্দীর একটা সর্বাধুনিক সংস্করণে চোখ বোলান; তাহলেই বুঝতে পারবেন আমরা কত পেছিয়ে আছি—

—সুকৃতি রায়চৌধুরী
বোমবাই-১৪

দক্ষিণ খোলা বাড়ি

সমীর রায়চৌধুরী

এক একটা লোক সামনে আসে
প্রথমে প্রণাম করে নাম ঠিকানা বলে
তারপর পরতে পরতে খুলতে থাকে
ভাঁজে ভাঁজে একেক রকম দেখায়
খুব মেশামেশি হয়ে যায়
মনে হয় না আরেকজন কাছে আছে

এক একটা লোক সামনে আসে
আচ্ছা চলি তবে, বলেই চলে যায়
পেছন ফিরে ভুলেও দেখে না
যখনই দেখা হয় ঐ এক কথাই বলে
লোকটাকে বসিয়ে রাখা কঠিন
চা কফি পান সিগারেট মিহিদানা
কিছুই খাবে না,
আসলে বসতে চায় না, বসাতে পারি না বলে;

এক একটা বাড়িতে ঢোকে
আমার যে কোনো এক রকমই হচ্ছে হয়
সুদিনে দুর্দিনে

ডালপালা

রত্নেশ্বর হাজরা

গাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে যদি একটু আলো আর
হাওয়া পায়, একটু জল পেলে
ফুল ও ফলের মধ্যে গাছ বাড়ে—সুখী হয়
শিকড় ছড়িয়ে, আর বৃক্ষের সন্ততি
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বাড়ে—গাছগুলো—যুবকযুবতী
বিভিন্ন প্রদেশে আর বিভিন্ন ঋতুতে
অরণ্যে গাছেরা বাড়ে—ডালপালা রোজ বেড়ে যায়—

মাঝেমধ্যে পোকা লাগে গাছে আর অসুখেবিসুখে
ম্লান পাতা—ব্যর্থতা ব্যর্থতা
ফুল নেই ফল নেই—শিমুলে কিংশুকে
লাল নেই, আহা
গাছ খুব দুঃখ পায়। দুঃখ যায় রোজ
নিরক্ষরেখার দিকে। দুঃখের সন্ততি
এদিকে মানুষে বাড়ে—মানবগোষ্ঠীতে যত বাড়ে
যুবকযুবতী হয়
ডালপালাগুলো
একটুখানি হাওয়া চায়—জলবায়ু—সুখদুঃখ পেলে
যুবকযুবতী বাড়ে—ডালপালাগুলো বেড়ে যায়......

দিনের রঙে শরৎ

শিশির ভট্টাচার্য

হারিয়ে গেল ভোরবেলাকার ফোটা শুকতারাটা
দ্বিপ্রহরে সূর্যমুখী নত,
মেঘ-বিকেলে গাঢ় স্মৃতির কত বকুল ফুলে
আধফোটা সব ইচ্ছেগুলো ঝরে।

ফুরিয়ে গেল রাত্রিভোরে দেখা স্বপ্নটুকু
সন্ধে বেলায় ভালোবাসার যূঁই,
দিনের রঙে প্রখর আঁচ চেনা চোখের আলোয়
সহজ হারায় অনভ্যাসের মায়ায়

আমি রূপান্তরে

প্রতিমা সেনগুপ্ত

যখন কোন হৃৎপিণ্ড কামড়ে সবটুকু বিষ ঢেলে দিই
রূপান্তর ঘটে যায় আমার।
খালি করি শরীরের সর্পিল ঠান্ডা সবুজ।
চোখের রোহিণীর মত টলটল; হৃদয়ে থাকে একরাশ
অশ্রুর শিশির।
যেন ডোবা ভর্তি নীল।
সেই নীলে শুরু হয় শ্যাওলা জমতে
ঘন চাপাচাপি ভীরু বিষ শ্যাওলা।
মুখ ঘষিয়ে অন্য হৃৎপিণ্ডের খোঁজে
চলাফেরা শুরু করি।

'এটা কি ঠিক, আমি মেয়েটার গায়ে [illegible]' ও নিজের মনেই জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু পরিষ্কার করে, কিছুই মনে করতে পারছে না। পারা সম্ভবও না। কারণ এখন ওর অবস্থা অনেকটা, অনেকগুলো কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত, দংশিত, ছিন্নভিন্ন করা কুকুরের মতো। ঘটনার স্থান থেকে, ও এখন অনেকটাই দূরে. তা ছাড়া, ওকে যারা মেরেছিল, তারা সকলেই, একই বাসে করে চলে গিয়েছে, যে বাসের ভিড়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছিল। এখন ও হাজরার ওপারে, পার্কের রেলিং-এর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সামনে রাস্তার লাইটপোস্টের আলোটা খারাপ, জ্বলেনি, ওর গায়ে নরম ছায়া।

হাজরা রোডে ঝাপসা

সমরেশ বসু

জগদীশ, ওর নাম। নাক দিয়ে এখনো, মাঝে মাঝে সর্দি'র জল গড়িয়ে পড়ার মতো রক্ত পড়ছে। রক্ত মোছা, ময়লা রুমালটা দিয়ে, জগদীশ তা মুছে নিচ্ছে। হাত দিয়ে, দুদিকের গাল টিপে দেখলো, কোনো দাঁতের গোড়া ব্যথা করছে কী না। করছে। যে যে-ভাবে পেরেছে, সে সেইভাবেই মেরেছে। একটা দাঁত যে নির্ঘাত নড়েছে, সেটা ও টের পেয়েছিল, ঘুষিটা গালে পড়তেই। একটা দাঁত মাড়ির সঙ্গে, গোড়া থেকে কাত হয়ে পড়েছিল, ও জিভ দিয়ে ঠেলে বসিয়ে দিয়েছিল। রক্তপাত হয়েছিল, তবে দাঁতটা অক্ষত ছিল। কেউ কেউ চুল টেনেছিল, দু'চার গোছা ছিঁড়েও নিয়েছে। টানবার মতো চুল ওর আছে, বেশ ঘন আর দীর্ঘ। কিছু চুল পেকে গিয়েছে, তা বলে, যারা মারে, তারা যে কোনো রকম রেয়াত করে, তা না। তারা কাঁচা পাকা চুলের জন্য, কিছু মানে না। কেউ কেউ জামা টেনে ছেঁড়বারও চেষ্টা করেছে, এবং ছিঁড়েছেও। যেন একেবারে মেরে ধরে উলঙ্গ না করে দিলে, তাদের শাসন করার মানে হয় না। শুধু তাই না, একেবারে নিঃস্বও করে দিয়েছে। পকেটে সর্বসাকুল্যে প্রায় তিন টাকার মতো ছিল। আগামী কাল সকালে এক কেজি আলু, কিছু শাকপাতা কেনা যাবে, এটা মনে ছিল। গাড়ি থেকে মেরে নামিয়ে দেবার পরে, জগদীশ পকেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, হাওয়া। একটি পয়সাও নেই। পকেটমার যদি মেরে থাকে, তা হলে বলতে হবে, সে খুব উপযুক্ত ব্যক্তির পকেটই মেরেছে। সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, জগদীশের গায়ে মেরেছে, পকেটও মেরেছে। সুযোগ বুঝে আরো কারোর মেরেছে কী না, সেটা লোকেরা পরে টের পাবে। জগদীশ তা কোনোদিন জানতে পারবে না।

বাসের ভিড়ের মধ্যে, কে কখন কীভাবে মেরেছে, যে মার খায়, তার পক্ষে মনে রাখা অসম্ভব। জগদীশের তা মনে নেই, তবে ভুরু আর চোখের কোণে প্রচণ্ড ঘুষিটা পড়তেই, ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, ও বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। যায়নি। কেউ ওর দুই উরুতের মাঝখানে, হাঁটু দিয়ে মারতে চেয়েছিল, পারেনি। আঘাতটা লেগেছিল কুঁচকি ঘেঁষে। অব্যর্থ-ভাবে লাগলে, কী হতো বলা যায় না, [illegible] এতক্ষণে বোধ হয় হাসপাতালেই যেতে হতো। সেটাও হতো একেবারে করুণাহীন, যদি জানতে পারতো, কেন পাবলিক তাকে এভাবে মেরেছে। হয়তো চিকিৎসা না করেই বলে দিতো, 'এ রকম লম্পটের মরাই উচিত।'

জগদীশ এখন সেটাই মনে করবার চেষ্টা করছে, ও কি সত্যি মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছিল? প্রাইভেট বাস বলেই, তারা এ ধরনের হুল্লোড় হাঙ্গামার মধ্যে, গাড়ি বেশিক্ষণ থামিয়ে রাখতে চায় না। তা ছাড়া, জগদীশও এক সময়ে, অনুভব করেছিল, এমন একটি জীবন, হারালে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এক সময়ে ওর মনে হয়েছিল, ওকে মেরেই ফেলবে। ও অনেক কিছুই বলবার চেষ্টা করেছিল, কেউ শোনেনি। কিন্তু এক সময়ে ও, মৃত্যু নির্ঘাত বুঝে, চিৎকার করে বলেছিল, 'আমি একজন ইস্কুল শিক্ষক, মনে রাখবেন। মিথ্যা আপনারা আমাকে মারছেন।' সত্যি কথা বলতে কি, তখন কিন্তু, ক্রুদ্ধ মারমুখো হাতগুলো, একটু থমকে গিয়েছিল। সেই ফাঁকেই কণ্ডাক্টর, গাড়ি থামবার সংকেত

ঘণ্টা বাজিয়ে, জগদীশকে ঠেলে ঠেলে দরজার দিকে নিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'হটো হটো, হটাও সব ঝুট ঝামেলা।' সেই মুহূর্তেই একজনের সন্দিগ্ধ গলাও শোনা গিয়েছিল, 'ও শালা বললো, আর আপনারা বিশ্বাস করলেন, ও ইস্কুলের টিচার? কখনোই না।'

তৎক্ষণাৎ আবার মার মার শব্দে ধাওয়া। জগদীশ তখন প্রায় দরজার সামনে। সেখানেই আবার ঘাড়ে পিঠে, কয়েক প্রস্থ পড়েছিল, এবং বাসটা থামতে, কেউ ওর পশ্চাদ্দেশে, একটি পদাঘাতে একেবারে নিচে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু ও রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়েনি, কোনো রকমে সামলে নিয়েছিল। তবে এসব কথা ভেবে বিশেষ লাভ নেই। এই যে, শরীরে এতো যন্ত্রণা, প্রায় সর্ব শরীরে, এবং তা পাবলিকের প্রহারের দরুন, এর জন্য বিশেষ কারোকে ও দায়ী করতে পারছে না। জনতার মার, কোনো ব্যক্তিবিশেষের তো না, ও কার ওপর রাগ করবে, কাকেই বা ঘৃণা করবে? মেয়েটাকে?

জগদীশ একটু সুস্থ মস্তিষ্কে, সেটাই ভেবে দেখতে চায়। তবে, সন্দেহপরায়ণ রাগী ব্যক্তিটি ভুল বলেছিল। ও সত্যি একজন ইস্কুল শিক্ষক। সকলে যদি মেয়েটির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, স্ফুরিত অধর, স্ফীত নাসিকা এবং সর্বোপরি তার যৌবনমণ্ডিত স্বাস্থ্যোদ্ধত শরীর আর একটি লাবণ্যে ঢল ঢল মুখের দিকে তাকিয়ে, জগদীশের প্রতি রাগে ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে না উঠতো, ভালো করে জগদীশের দিকে তাকিয়ে দেখতো, তা হলে বিশ্বাস করতো, জগদীশ প্রকৃতই একজন দরিদ্র ইস্কুল শিক্ষক। যার বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তখন বারুদের পলতেয় আগুন লেগে গিয়েছে, ফেটে আর জ্বলে উঠতে যা দেরি ছিল। প্রথম থেকে বললেও, নিগ্রহ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো না, কারণ, মেয়েটির ফুঁসে ওঠা রাগের মধ্যে, একটি অতি বিশ্বাসযোগ্য নিষ্পাপ অভিব্যক্তি ছিল, এটা ওর নিজেরও অস্বীকার করার উপায় নেই। অবিশ্যি তা সত্যি না হলেও, অনেক সময়, আচরণকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়। জগদীশ নিজেই তা অনেকবার নানা কারণে করেছে। ও চাকরি করে বেসরকারি ইস্কুলে, মাস গেলে মাইনে কিছুতেই ঠিক মতো পায় না। মাঝে মাঝে কিছু সরকারি গ্রাণ্ট পাওয়া যায়। ওর মতোই ইস্কুলটাও হতদরিদ্র উঞ্ছ তা না হলে আর এমন ইস্কুলেই ওকে শিক্ষকতা করতে হবে কেন। ও অনেক সময়েই হেডমাস্টারের কাছে, স্ত্রীর মরণোন্মুখ অবস্থার কথা বলে হাত পেতেছে, জেনে শুনে, যে ওর মতো অনেক শিক্ষকই সন্তুদিনের মধ্যে পাঁচটা টাকাও পায়নি। কিন্তু ওর মিথ্যা আচরণ করণ ব্যবহার, বাক্য বিন্যাস, সবই এমন নিষ্পাপ নিখুঁত, যে অন্যান্য শিক্ষকেরাই যা হোক কিছু ওর হাতে তুলে দেয়। সন্তানদের ব্যাধির এতো রকমারি ব্যাখ্যা ও দিয়েছে, তাদের এতোদিন বেঁচে থাকার কথা না। কার্যসিদ্ধির পরে, প্রত্যেকবারই ও ঈশ্বরের কাছে, স্ত্রী সন্তানদের আয়ু ভিক্ষা করে নেয়, বলে, 'তুমি জানলে, আমি ওদের জন্যই এই মিথ্যা কথা বলেছি।'

অতএব, মেয়েটির নিষ্পাপ অভিব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য দেখাতে পারে, মূলে তা সত্যি কী না, সে বিষয়ে জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য দেখিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেন না ও অস্বীকার করতে পারে না, মেয়েটির সেই অভিব্যক্তির মধ্যেও একটি অনন্য সৌন্দর্য ফুটেছিল। নাকের ভিতর থেকে রক্তের টোপানি নামছে,

টের পেয়ে, ও পকেট থেকে ময়লা রক্তমাখা রুমালটা বের করে, নাক মুছলো, চোখে পড়লো, বুকের জামায়, কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছে। ওর প্রহৃত হওয়ার সংবাদটা কোনোরকমেই গোপন করা যাবে না। সেটা কী ভাবে বলা যাবে, ভাববার আগে, প্রহারের কারণটাই ভেবে নিতে চায়। প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরে, মস্তিষ্ক এখনো যেন অনেকখানি চিন্তাশূন্য। চিন্তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, বাসের ভিড়ের মধ্যে, সেই অবস্থার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, বিষয় মনে করতে হবে।

একটি লোক ওর পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়, নাকে একটা গন্ধ গেল। বহুদিনের পুরনো গন্ধ, ওর বড় বিলাসের, আর ভালবাসার, এবং আকাঙ্ক্ষার গন্ধ। গন্ধটি একটি বিশেষ কেশতেলের। ও যখন দেশ বিভাগের পরে এ দেশে আসে, তখন কলেজে ভরতি হয়েছিল। শক্ত বুরুশে, ভালো পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা, একটু সুগন্ধ সাবান দিয়ে ঠাণ্ডা জলে চান করা, আর গামছার বদলে তোয়ালে দিয়ে গা মোছা, তারপরে মাথা মুছে, মাথায় সেই তেলটি লাগানো, ওর কাছে ছিল সব থেকে বড় বিলাস। এখন অনেকটা রাজার বিলাস বলে মনে হয়, কিন্তু তখন বাবার কল্যাণে সে সব ঠিক জুটে যেতো, এবং বাবাও দিয়ে খুশি হতেন, কারণ জগদীশ লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না, ওর প্রতি অনেক আশা ছিল। জগদীশ নিজের ওপর, নিজেও অনেক আশা পোষণ করতো। সে-আশা যে এমন মরীচিকা হবে, কখনো ভাবতে পারেনি, এখনো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ও সুস্থ মস্তিষ্কেই জীবনযাপন করছে তো? নাকি না জেনে শুনে, কোনো ভুল রাস্তায় চলেছে? তা না হলে, এতো বিড়ম্বনা কিসের? এম-এ পরীক্ষা শেষ করবার আগেই, ট্রামের তলায় চাপা পড়ে বাবার মৃত্যু, গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায়, কিছুদিন ভালো করে চলা, দাদার বিরক্তি, আলাদা হয়ে যাওয়া। দুই ভগিনীর বিবাহ, ছোট ভাইকে নিয়ে মায়ের দাদার কাছে চলে যাওয়া, তথাপি মমতার সঙ্গে ওর প্রেম, এসব তো যেন অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই ঘটে যাচ্ছিল।

মমতা—হ্যাঁ। মমতাকে মা পছন্দ করতো, দাদা করতো না, কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশাই পছন্দ করতো না, বোনেরাও মমতাকে বিশেষ পছন্দ করতো না। সেটা মমতা ফরসা বলে, নাকি গরীব বলে, নাকি স্বাস্থ্য কখনোই দলমলে ছিল না বলে, ও বুঝতে পারে না। দাদা আলাদা হয়ে যাবার আগেই ও মমতাকে বিয়ে করার ইচ্ছা জানিয়েছিল। কারোরই মত ছিল না, মা চেয়েছিল, একটা চাকরি না পেলে বিয়ে করা ঠিক হবে না। সাময়িক-ভাবে একটা চাকরি পেয়েছিল, টালিগঞ্জের একটা ইস্কুলে, একজনের বদলিতে। সে সময়েই দাদা আলাদা হলেন, আসলে জগদীশকে নিজের রাস্তা দেখতে বললেন। জগদীশ আশাবাদী, বাড়ি ছাড়লো, মমতাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করলো, অ্যাডভান্স মাইনে নিয়ে, কিছু বন্ধুবান্ধবকে খাইয়েও ছিল। প্রায় বস্তির মতো, একটি বড় পুরনো বাড়ির অন্ধকার ঘর ভাড়া নিয়েছিল। মমতার পিত্রালয় থেকে কোনো বাধা আসেনি, গলগ্রহ নিপাতে সকলে স্বস্তি বোধ করেছিল। তারপরে মমতা যখন যে-দিনটিতে ঘোষণা করলো, ও সন্তানসম্ভবা, সেইদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখেছিল, ও যার বদলে কাজ করছিল, সে বন্ধুদের আপ্যায়ন অভ্যর্থনায় হাসছে। প্রীতি, সুখের বিষয়, জগদীশও খুব হেসে কথাবার্তা বলেছিল। লোকটির কাছে ও বিশেষ কৃতজ্ঞ। অবিশ্যি ও যে কিছুটি পায় না, একথাটা প্রায়ই উঠতো, কিন্তু বিশেষ কেউ ঘাটাতো না।

ভুরুর কাছটা খুব দপদপ করছে। জগদীশ আলতো করে সেখানে আঙুল ঠেকালো। ভীষণ গরম। সারা গায়েই ব্যথা, দাঁতের গোড়াটা কনকন তো করছেই, মনে হয়, আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে। একটি দম্পতি আস্তে আস্তে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। বউটি ওর দিকে একবার তাকালো, কিন্তু মুখের কোনো ভাবান্তর হলো না। এরা বোধ হয় সাতপাক ঘুরে বিয়ে করেছে। তেমন একটা ইচ্ছা ওর কখনো হয়নি, হলে বোধ হয় ভালোই লাগতো। ও পাশ ফিরে বউটিকে আবার দেখলো, চলাটা সুন্দর। বাসের মধ্যে, সেই মেয়েটির মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মেয়েটি কি বিবাহিতা ছিল? হ্যাঁ, মনে আছে, তার শ্যামপুর ফাঁপানো ঘন চুলের সিঁথেয় সরু করে সিঁদুর লাগানো ছিল। আরো মনে পড়ে মেয়েটির শাড়ির রঙ ছিল লাল। দেখে বোঝা ওর পক্ষে মুশকিল, শাড়িটা [illegible] কিন্তু যেহেতু কয়েক-[illegible] শাড়ির [illegible] পিছলে ওর [illegible] পড়েছিল, [illegible]ছিল, এক ধরনের [illegible] এবং তা যেন একটি, অসম্পূর্ণ। [illegible] বলতে যেরকম [illegible] বোঝায়, তা না। এতোখানি বোঝবার কারণ, আঁচলের

প্রত্যেকটি পতন, প্রত্যেকবারই ওকে চমকে দিয়েছে, প্রত্যেকবারই ও তুলে ধরতে গিয়েছে, কেন না, ওর মনে হচ্ছিল কিছু একটা ফসকে পড়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি—হ্যাঁ, মেয়েটিই বলা ভালো, তার বয়স পঁচিশের বেশি না, কণার থেকে বছর পাঁচেক বেশি হতে পারে। কণা ওর মেয়ে। বাসের সেই মেয়েটির নাম ও কখনো জানতে পারবে না। মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল একটি ডাবল সীটের পিছনে ঠেস দিয়ে, ডান হাত দিয়ে সীটের ওপর অল্প ব্যালান্স রেখে। জগদীশ দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই, কিন্তু ওর মুখ ছিল বিপরীত দিকে, ডান হাত দিয়ে রড ধরেছিল। এবং ফাঁক প্রায় না থাকা সত্ত্বেও, ওর ডান পাশে ওকে ঠেসে দাঁড়িয়েছিল আর একজন। সামনে পিছনে আরো লোক তো ছিলই। ঘটনাটা ঘটে, বাসের ডাবল সীট যেখানে শেষ, পিছনের সেই সীমান্তে।

আঁচল পতনের প্রত্যেকবার সেই চমকে উঠে তুলে ধরতে যাওয়ার মধ্যেই—এখন মনে হচ্ছে, বিপদের বিদ্যুচ্চমক লুকিয়েছিল। মেয়েটি প্রত্যেকবারই ওর আচরণে, সুরমা টানা আয়ত চোখে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ-

ছিল। চোখ দুটি সত্যি সুন্দর, ঝকঝকে, কালো, টানা। এখন মনে হচ্ছে, আসলে ও চমকাচ্ছিল, মেয়েটির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের জন্য। না, মেয়েটির দিকে ও সর্বক্ষণ তাকিয়েছিল না, কিন্তু, না তাকিয়েও মনোযোগী হয়েছিল, এবং প্রত্যেকবারই মনে হয়েছিল মেয়েটিরই কিছু বোধ হয় পড়ে যাচ্ছে, তা-ই তুলতে যাচ্ছিল। ও একবারের জন্যও কল্পনা করেনি, আঁচলটি মেয়েটির, স্লিভলেস্ জামার কাঁধে তুলে দেয়, কারণ সেটা অকল্পিত, এ বোধটুকু ওর আছে। মেয়েটি যদি সেরকম সন্দেহ করে থাকে, তবে সে বোকা। অমসৃণ অথচ সিল্কের আঁচল, অমন ঘনঘন পড়েই বা যাচ্ছিল কেন, এখনো ওর মাথায় আসে না। বাসের ভিতরে বাতাসও তেমন ঢুকছিল না, ভিড়ে গরমে ভ্যাপসানিতে, একটা যাচ্ছেতাই অবস্থা। মেয়েটিকে সেই ধরনের মেয়ে বলেও মনে হয়নি, যাদের আঁচল বারে বারে খসে যায়, আবার তোলে, খসে—তোলে, তোলে—খসে এবং আজকাল সিনেমায় যেমন দেখা যায়, আঁচল তুলতে গিয়ে, অর্ধেক উঠে যেন ফ্রিজ্ হয়ে যায়। কেবল অল্প বয়স না বেশি বয়সের মহিলাদের অনেক সময়, ওরকম খেলতে দেখা যায়। রথীনবাবুর কথা মনে পড়ে যায়। হাসিও পায়। এবং সত্যি সত্যি, হাসির উদ্রেকে গালের ভিতরের মাংসপেশীতে একটু চাপ লাগতেই, প্রায় উপড়ে যাওয়া দাঁতে গোড়ার মাড়িতে তীব্র যন্ত্রণা বোধ হলো, জিভের ডগা তৎক্ষণাৎ সেখানে স্পর্শ করতেই বোঝা গেল, ভয়ংকর ফুলে উঠেছে। জগদীশ আস্তে আস্তে বাঁ দিকের গালে হাত বুলিয়ে দেখলো, বেশ ফুলেছে, আর গরম হয়ে উঠেছে। হাত দিয়ে আলতো করে, সমস্ত মুখে স্পর্শ করে দেখলো, গরম। হাত দিয়ে, হাত স্পর্শ করে দেখলো, ঠাণ্ডা, তার মানে জ্বর এসে গিয়েছে। নিজের চেহারাটা ও দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে, খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল, ও এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, মারের ধকলটা সামলাতে। কিন্তু মনে হচ্ছে, রেলিং-এর হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে কেঁপে যাবে। নিজের অঞ্চলে ফিরে গিয়ে, বাড়ি ঢোকবার আগে, নগেন ডাক্তারের কাছে একবার যেতেই হবে। ওষুধ না খেলে, এ ধকল সামলানো যাবে না, কিন্তু সেও তো এখানে না, অনেকখানি হেঁটে যেতে হবে। পাবলিক যখন তাকে মারছিল তখনই তার সর্বস্ব গিয়েছে, পকেটে একটি পয়সাও নেই। ভাবা যায় না, একটা পকেটমারও আজ পাবলিকের ভূমিকা পালন করে গেল। এ পর্যন্ত জগদীশ তাদেরই ট্রামে বাসে মার খেতে দেখেছে। টাকা কটা থাকলে, একটা রিকশ ভাড়া করতে পারতো।

জগদীশ ভাবতে যাচ্ছিল, রথীনবাবুর কথা, ওরই সহকর্মী শিক্ষক, প্রায়ই টিচার্স রুমে বসে গুনগুন করে গান করেন, 'নীবিবন্ধ খুলেখুলে যায়।' জাজমেন্ট করেই গান। কারণ কেউ শুধরে দিয়ে যদি বলে, 'ওটা বাজুবন্ধ' তাহলে উনি হেসে বলেন, 'ওই হইল গিয়া, বা বায়ান্ন, হেই তেপান্ন।' তা বাসের মেয়েটির সেইরকম আঁচল খুলেখুলে যায় ভাব মোটেই ছিল না। সম্ভবত হালকা শাড়ির আঁচল তাঁর মসৃণ, কাঁধে থাকছিল না। বাসের ভিতরের ছবিটা আবার চোখের সামনে জাগলো। নীল—না, নীল না সবুজ না, এরকম রঙের একটি জামা মেয়েটির গায়ে ছিল। সরু স্লিভ্, বড় করে কাটা, বুক কাঁধের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল এবং আঁচলটা তুলে দেবার সময়ে, তার পেটের অনেকখানি অংশও চোখে পড়েছিল। সীটের পিছনে ঠেস দিয়ে থাকা তার বাঁ কোমরের সঙ্গে, গাড়ির ঝাঁকুনিতে, ওর বাঁ কোমরেও অনেকবার লেগেছিল। ও ফিরে তাকায়নি, সংকোচ বোধ করছিল এই কারণে, ওর মাংসহীন শরীরের হাড়ের খোঁচা লাগছিল মেয়েটির স্ফীত নরম অঙ্গে। এটাও মনোযোগেরই লক্ষণ, তা না হলে, সে কথা ভেবে, সঙ্কুচিত হবে কেন। ভিড়ের বাসে উঠলে, ওরকম কতোই তো হয়, জগদীশের মতো কেউ সঙ্কুচিত হয় না। এটাও এখন ওর মনে পড়ছে, যে কবারই ও মেয়েটির দিকে তাকিয়েছে, ততোবারই তার রঙীন জামার নিচেই, হালকা গোলাপী রঙের অন্তর্বাসের অংশত চোখে পড়ছিল, এবং সেই সঙ্গে বক্ষান্তরের ঢোল। তার অল্পদৃষ্টি সিঁথির সব চুল পিছনে টেনে, একটি মোটা বেণী পিছনে ছিল। হ্যাঁ, মেয়েটি সুন্দর স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল, এবং ফরসাও, কিন্তু গায়ে হাত দেবার কথাটা আসছে কী করে?

জগদীশ হাজরা রোডের রাস্তার আলোয়, যানবাহন লোকজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো, কিন্তু সে আলো যানবাহন লোকজন কিছুই দেখতে পেলো না। সে দেখতে পেলো, মেয়েটার কাঁধে তার কালো হাড্ডিসার হাত। না, টাল সামলাবার জন্য ও হাত রাখেনি, যদিও একথা ঠিক, ওর ডান পাশের যুবকটি যে কী করতে চাইছিল, ও জানে না, ডান দিকের পাঁজরায় একটা চাপ লাগতেই, ও সম্পূর্ণরূপে মেয়েটির দিকে ফিরেছিল, অর্থাৎ ওর সামনেই মেয়েটি, তখন আর পাশাপাশি না। তখন ওর বুকের কাছে মেয়েটির কাঁধ, বেগুনি রঙের বটুয়া ধরা হাতটি তার কোলে, বড় একটি ঘড়ি কবজিতে চকচক করছিল। তখন মেয়েটির দিকে ওর চোখ স্বভাবতই বেশি পড়ছিল। কতোক্ষণ সে অবস্থায় ও দাঁড়িয়েছিল, এখন মনে করতে পারে না। ভাবলে খুব অবাক লাগে, মানুষের যে কতোরকম বিভ্রান্তি আসে, তা না হলে, কোন-একদিন বাসের ভিড়ের চাপে, অন্য একটি মেয়ের কথা মনে হবে কেন। এবং কেন ভাবতে হয়েছিল, নারীরা কী সহনশীলা। শুধু তা-ই না, বাইরে তাকিয়ে থাকা, আজকের মেয়েটির মুখের এক পাশ দেখে হঠাৎ-ই কেমন মনে হলো, তার সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটি নিবিড় করুণা রয়েছে, যেন একটি স্বর্গীয় সহানুভূতিতে টলমল করছে, মনে হলো, সে যেন জগদীশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ও মেয়েটির কাঁধে একটি হাত তুলে দিল।......হাজরা রোড ঝাপসা দেখাচ্ছে। জ্যামের জন্যই বোধ হয় পর পর গাড়িগুলোর ঘন ঘন তীব্র ব্রেককষার শব্দ শোনা যায়।

॥ ২ ॥
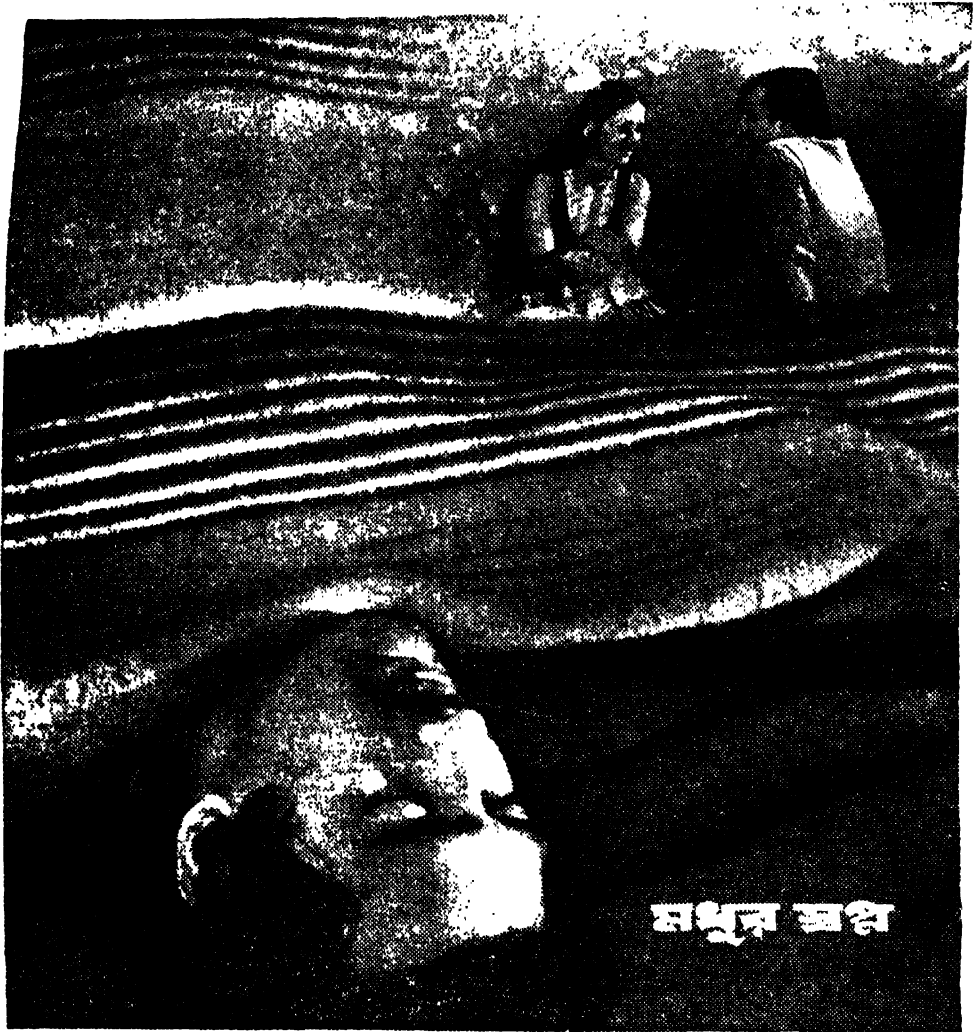
কর্তার প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী প্রভৃতি কে না জানে? পঠদ্দশায় পণ্ডিতমশায় আর ব্যাকরণের কৃপায় কার অজানা? কানমলার সাহায্যে কানের ভেতর দিয়ে কার না মরমে গিয়ে পশেছে? কিন্তু তার মর্ম যে এই, তার ভেতরে যে এত রহস্য, মা না বলে দিলে কি জানতে পারতাম কখন? মার রহস্য মা না হলে কে জানাবে? তাঁর পরিচয় শুধু তাঁরই জানা—স্বয়ং তিনিই দিতে পারেন।

ফলং ফলে ফলানি, বলে বটে উপক্রমণিকায়; কিন্তু পরীক্ষার খাতায় তা ফলাতে গেলেই পাই গোল্লা! মার বোধনাতেই কেবল তা ফলাও হতে পারে। পরমহংসদেব বলেছিলেন না যে, পাঁজিতে লেখা থাকে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি নিঙড়ে তার ভেতরে থেকে একে ফোঁটাও বের করা যায় না—সেইরকম আর কি! জল চাইলেই মেলে না, মাকে ডাকলেই উত্তুঙ্গ পর্বতের থেকে পার্বতী স্নেহধারা ভাগিরথীর ঢল হয়ে নেমে। অন্তরের প্লাবণ্য হন্যে হয়ে আসে বন্যা হয়ে। তখন জলে জলাকার! চার ধার থই থই!

সম্বোধনে প্রথমা। সম্বোধন সেই প্রথমাকেই। প্রথম জিজ্ঞাসাই সেই—কস্মৈদেবতায়—? আর কোনো দেবতাকে নয়, কারো কাছে না; সব দেবতার সঙ্গে সমানে একত্রে করজোড়ে সেই মহাদেবীকেই। সর্বদেবময়ী দেবী সর্বরোগ-ভয়াপহাং—বিশ্বজননী সেই জগন্মাতাকেই। ভমবত্যাঃ পরং কৃতঃ ভগবান নহি বিদ্যাতে!

মার বানানো সেই সূক্ত, আমার বাবার কাছে নেহাত বিরস ঠেকলেও এখনো যেন আমার কানে মধুবর্ষণ করছে। শুনতে পাচ্ছি এখনও।

সম্বোধনের থেকেই সম্বোধি। সেই বোধি—বোধে বোধ—এই বলে যার ব্যাখ্যানা দিয়েছিলেন পরমহংসদেব। সম্বোধনের থেকেই সম্পর্ক স্থাপন, সম্বোধ ষষ্ঠী—বোধনের ষষ্ঠী সেই। যার পরেই তাঁর অধিকরণের সপ্তমী—অষ্টমীর গৌরীদান—সেই সন্ধিক্ষণ—নিজেকেই দিয়ে দেওয়া। তাঁর নিত্য নবরূপের নবমীতে আমার নবীকরণ। তাঁর সঙ্গে নিরঞ্জন লাভ। সমাধি।

অতো দূরে আমি যেতে চাই না; পেতে চাইনে—মহা সমাধির মহাসমাধানলাভে এই ভবলীলা সাঙ্গ করার সাধ নেই আমার! সন্ধিক্ষণের দৃষ্টিপ্রসাদ আর নিত্য নবমীর মহাপ্রসাদ পেলেই আমি বর্তে যাই!

ভগবত্যাঃ পরং কৃতঃ...না, তাঁর ওপরে আর কোনো ভগবান নেই, তাঁর তলাতেই যতো ভগবানের গড়াগড়ি—ছড়াছড়ি! মহাদেব এই মহৎ তত্ত্ব তাঁর হাড়ে হাড়ে পাঁজরায় পাঁজরায় টের পেয়েছেন, পাচ্ছেন। তাঁর সেই হাড়ে হাড়ের বোধোদয় আমি প্রতি নিয়তই জানতে পাই আহারে আহারে।

তবে তাই হোক—একটুখানি আহারাদির চেষ্টা করে আরেকটু টের পাওয়া যাক না! কিন্তু লাটের আগে মুখবন্ধের একটু ভূমিকা...ধান ভানতে শিব গীতের মত ভোজের পাত। পড়ার আগে মুখপাতের ভণিতা?

'তোমার নামটা কী বললে যেন, ভুলে গেলাম এর মধ্যেই!' মেয়েটির দিকে তাকালাম।

'নাম বললাম কখন? নাম তো বলি নি এখনও আমার।'

'বলই নি নাকি? তাহলে নামটা কী, জেনে রাখি।'

'আমার নাম লালি।'

'লালি? অদ্ভুত নাম তো! লালিমা হবে বোধহয় ওটা। ডাকাডাকিতে ধার ক্ষয়ে ভেঙে গিয়ে ঐ দাঁড়িয়েছে।'

'না না, লালিই আমার নাম। তার সঙ্গে মা-ফা কিছু নেই। আমার বোনের নাম কালী কিনা।' সে বলল। 'তাই দিদির সঙ্গে মিলিয়ে আমার এই নাম রাখা।'

'কালী বুঝি তোমার দিদির নাম? মা ঠনঠনের কাছে মানত করে হয়েছিল বোধ হয়!'

'কে জানে! মনে হয় সে একটু কালো বলেই হয়তো ঐ নামটা?'

'তাই বুঝি! তা, কালো হলেও দেখা যায় একেকটা মেয়ে এমন হয় যে দেখে চোখ ফেরানো যায় না।'

'আমার দিদিও সেইরকম। কালো হলেও তার বেশ ঝলক আছে।'

'থাকে একেকটা মেয়ের।' আমি সায় দিই ওর কথায়—'রূপের ঝলক বলে না? তেমনি ঐ ঝলকটাই একটা রূপ আবার।'

'দেখবে তাকে?'

'দেখব এক সময়। এখন নয় [illegible] যাকে দেখছি তাকেই [illegible] ভালো করে দেখা যাক।...তোমাদের বাসাটা তো [illegible] এখনো।'

'দেখাব তোমাকে [illegible] বোনের সঙ্গে আমার ভাব করিয়ে [illegible] আগে।'

'আমার বোন? বোনই নেই আমার। মা আমায় কোনো ভগ্নীরত্ন উপহার দেন নি। বোধ হয় বলেছেন বিশ্বময় ছড়ানো আছে, বেছে নে তোর বোন তোর মনের মতন!' একটু ঢোক গিলে বলিঃ 'এই যেমন তোমাকে পেয়ে গেলাম এখন না!'

'আমার মতন কাউকে পাও নি এর আগে?' তির্যক নেত্রে তাকায় সে।

দুজনের মাঠচষার মাঝখানে এই বটপাকা প্রশ্নে আমি থমকে চমকে যাই—থমকে দাঁড়াই।—পেয়েছিলাম একজন... একজনকেই কেবল। সে কিন্তু আমার বোন ছিল না, ভাইফোঁটা দিয়েছিল যদিও

—প্রায় বন্ধুর মতই ছিল বরং। তার কাছে আমি অনেক অনেক ঋণী।'

তার নামোচ্চারণেই পলাতকা সেই হরিণী আমার সর্বাঙ্গে যেন শিহরিণী হয়ে দেখা দেয়। রোমাঞ্চিত হয়ে বলি—'বোনই হোক আর বন্ধুই হোক্। একথা আমি বলব, তার মতন মেয়ে আর হয় না।'

'দেখতে খুব সুন্দর ছিল বুঝি?'

'সুন্দর তো ছিলই। ছিল তারও বেশি ছিল দারুণ...তবে তুমিও খুব সুন্দর।'

'দূর! আমি আবার সুন্দর কোথায়?

'বেশ সুন্দর। সব মেয়েই সুন্দর। তুমিও!...তবে তার চেহারাটা ছিল তোমার চেয়ে হালকা। তাকে আমি এমনি করে দু হাতে উঁচুতে তুলতাম। তুলতে পারতাম।'

'আমাকেও পারবে। তুলে দ্যাখো না!'..

'পারব কি?' আমি ইতস্তত করি।

জানি তো, সব মেয়ে কখনই তুল্য মূল্য নয়। সবাই তুলনীয় হয় না। কারু সঙ্গে তুলনা চলে না কারো। অতুলনা ওদের প্রত্যেকজনাই।

আগুপিছু করতে হয় স্বভাবতই। যদি তুলতে গিয়ে ওকে নিয়ে উলটে পড়ি তাহলেই তো মাটি! মাঠ শুদ্ধু লোকের চোখের ওপর সে এক কেলেঙ্কারি! সবাই মিলে ছুটে এসে ধরে আমায় পেটন যদি নাও লাগায়—প্যাঁট প্যাঁট করে চাইবে তো!

তাহলেও বলা তো যায় না কখন সেই পরম লগ্নটি এসে যায়—সেই কণ্ঠলগ্ন হবার কাল?

মনে হোলো এই হয়ত সন্ধিক্ষণ! যার কৃপাকটাক্ষের সেই মুহূর্ত! সম্বোধনের পর বোধন হয়ে শুভোদয়ে কখন সে সন্ধিক্ষণের সময় এসে যায় কেউ বলতে পারে?

মনে মনে মাকে ডেকে দু' হাতের এক হ্যাঁচ্‌কায় ওকে মাথার ওপরে তুলে ধরি। বেশ ভারী আছে মেয়েটা। রিনির মত পলকা নয়, খুদে হস্তিনীর মতন না হলেও হরিণী নয় কখনই!

নামাবার বেলায় টাল সামলাতে পারা গেল না। গাল ঘেঁষে বুক ঘষড়ে মুখের ওপর এসে পড়ল যেন মেয়েটা।

'আমি জানতেম...আমি জানতেম... আমি জানতেম!' খিল খিল করে হেসে ওঠে সে।

'কী জানতে? জানতেটা কী শুনি?' আমি জানতে চাই।

'এমনি করে নামাবে তুমি আমায়। তালে রয়েছো তুমি—আমি জানতাম। এই ফাঁকে খেয়ে নেবে আমাকে।'

'তাই নাকি?' তার কথায় তাক লাগে আমার।—'তুমি তো জানতে, আমি কিন্তু জানতেই পারিনি। কখন যে খেলাম কী খেলাম কি করে খেলাম টেরও পেলাম না তার।'

'না পেয়েছো সেই ভালো।'

খাবে। তাকি হয় নাকি? কেনো কিছু আধা খাওয়া হবে নাকাটা কি ভালো? একটু খেয়ে রাখা...আধখানা খাওয়াটা কি ঠিক?' আমার মিনতি: 'অতিথিকে বিমুখ করা—না খাইয়ে রাখা আমাদের হিন্দুধর্মে লেখে কি? খেতে দিলে পেট ভরেই খেতে দিতে হয়।'

ধর্মের কথায় ওর মন টলে বোধ হয়। ধর্মের কল যেমন বাতাসে নড়ে তেমনি তার কলের নড়ায় একটু হাওয়াও হয় নিশ্চয়। একটুখানি সে উন্মুখ হয় বুঝি।

'তুমি কামড়াবে না তো?' সে বলে।

'কামড়াবো? কামড়াবো কেন?' অবাক হয়ে বলি: একি কামড়াবার জিনিস নাকি? রসগোল্লা তো নয়...?'

'এটা কিন্তু আমি আধঘণ্টা ধরে খাবো।

ডাক্তাররা বলেন, ৩ মাসের পর, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে আপনার বাচ্চার চাই শক্ত আহার

ফ্যারেক্স আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাকে ফ্যারেক্স কত কি দেয় দেখুন! সহজপাচ্য প্রোটিন। সেই সঙ্গে, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রণ আর কার্বোহাইড্রেট।

আপনার বাচ্চার জন্যে কি অনুপাতে ফ্যারেক্স বাড়ানো প্রয়োজন:

বাচ্চার বয়েস	ফ্যারেক্সের পরিমাণ
৩-৬ মাস	১-২ চায়ের চামচ দিনে দুবার
৬-৯ মাস	৩-৪ চায়ের চামচ দিনে তিনবার
৯ মাসের পর	৪-৬ চায়ের চামচ দিনে চারবার

বিনামূল্যে ফ্যারেক্স পুস্তিকার জন্যে এখানে লিখুন: ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্ট বক্স ১৬৫৫৮, বম্বে ১৮ ডবলিউ বি, সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন। (যে ভাষায় চাই জানাবেন)

ফ্যারেক্স
গ্ল্যাক্সোর তৈরী

CMGF-35-175 BN

দুহাত দিয়ে ধরে নাগালে এনে মুখে তুলি ওকে—'রসগোল্লা নয় তবে রাজভোগ তো বটেই! একটু একটু করে অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খাবার জিনিস।'

'হয়েছে। আর কতো? ছাড়ো এবারটি...'

'না—না না না—না!' আমার মুখোমুখি জবাব।

টুক করে মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে: 'এইবার আমি খাবো।' এক পলকের মধ্যে চোখে মুখে নাকে পর পর অনেকগুলো খেয়ে নিয়ে সে ছাড়ে।

'বাব্বাঃ!' আমি হাঁপ ছাড়ি—ছাড়া পেয়ে।

'বেলা পড়ে এসেছে। বাড়ি যেতে হবে এবার। বেরুনো যাক এখান থেকে।'

ঘুরতে ঘুরতে গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম আমরা। স্কোয়ার থেকে বেরুলেম তারপর।

সেখান থেকে সোজা গেলাম এক মেঠাইয়ের দোকানে। মোড়ের মাথার সাধন-বাবুর বিখ্যাত সন্দেশের দোকানটাতেই।

ধারে দু ভাঁড় রাবড়ি নিয়ে খেতে খেতে চললাম দুজনায়।

সাধনবাবুর দোকানের অমৃতরসে সঞ্জীবিত হয়ে অসাধ্য সাধনের পথে এগুলাম।

সরকার লেনের কোণ ঘেঁষে কতকগুলি ছেলে জটলা পাকাচ্ছিল। আমাদের দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল।

কেমন যেন রোষকষায়িত বলে মনে হল ওদের।

'এই সরকার লেনেই তোমাদের বাড়িটা না?' আমি শুধোলাম: 'পাড়ার ছেলেরা তোমার ওপর এমন রেগে মেগে রয়েছে কেন গো?'

'আমার ওপর? না না, আমার ওপর নয়! আমার সঙ্গে তোমাকে দেখেছে কিনা... চটে গেছে তোমার ওপর।'

'আমার ওপর চটতে যাবে কেন? আমি চিনিই না ওদের। দেখিনি কখনো!'।

'দেখেছে নিশ্চয়, লক্ষ্য করেনি। এ পাড়ার মস্তান সব। গুন্ডামি করে বেড়ায়, জনতাই জোরামারা কিছুতেই ওদের আটকায় না।'

'এই পাড়ার মস্তান? এই পাড়াতেই থাকে। সবাই? তাই নাকি?'

যেপাড়ারও দুচারজন থাকতে পারে। আমাদের বস্তিরও দুচারজন রয়েছে ওর ভেতর।'

'বাড়ি গিয়ে এখন পড়তে বসবে তো? না কি...?'

'আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি এই পথেই ফিরবে না তো এখন?'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ওরা ছিঁড়ে রাখবে না তোমায়। মতলব এঁটেছে, ফিরবার পথে রামধোলাই লাগাবে তোমাকে।'

'তাহলে সেটা শিরামধোলাই হবে! কিন্তু ওদের মনের কথা তোমার ঠাওর হলো কী করে?'

'সাপের হাঁচি বেদের চেনে! বুঝেচ?' সে বলল—'এ পথ দিয়ে ফিরো না তুমি আজ। বুঝেচ?'

'কাল যদি এই রাস্তায় যাই?'

'তা যেয়ো। কিন্তু আজ নয়। আজ নয়। আজ ওরা তোমার ওপর গরম রয়েছে। কালকে ভুলে যাবে সব। একটু বাদেই ওদের রাগটাগ সব পড়ে যায়। যখনকার তখন।'

'আমি এ পথে ফিরছি না আজ। এখান থেকে সোজা যাব শ্যামবাজার ট্রাম চেপে। কোনো একটা সিনেমাটিনেমায়।'

'বেশ। চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিই। এই পাড়াটা পার করে দিয়াসি। শ্রীমানী বাজার পর্যন্ত যাই।'

'তোমার সঙ্গে মেশামেশা করা মুশকিল হবে দেখেছি। যে প্রাণটা নাকি তোমাকে দেবার তাই হাতে করে সব সময় কি ভাব করা যায়! তাহলে এই বিদায়! চিরবিদায়!!'

'না না। তা কেন? এর মধ্যে ওদের বলে রাখব যে তুমি আমার মাস্তুত পিস্তুত দাদা-টাদা কিছু—তাহলেই তাদের সন্দেহটা কেটে যাবে। আর ভাইফোঁটার দিনটিতেও এসো তুমি। ফোঁটা দেব তোমাকে। ওদেরও কেউ কেউ থাকবে সেদিন। তাহলেই ভাব হয়ে যাবে তোমাদের। ভাব না হোক, রাগটাগ থাকবে না।'

'ভেবে দেখব। ভাবতে হবে আমায়।'

'ভাববে আবার কী? সেদিন আমি পায়েস রাঁধব। দিদির রান্না ইলিশ মাছের পাতুরি খেলে ভুলতে পারবে না।'

মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমার—ইলিশের এক হাতুড়িতেই চুরমার!

শ্রীময়ী শ্রীমানি বাজারের কাছ পর্যন্ত এসে আমায় এগিয়ে দিলো।—'ওই তোমার শ্যামবাজারের ট্রাম থামল। ওঠো গে। আমিও যেতাম তোমার সঙ্গে সিনেমায়, কিন্তু ওরা কিছু ভাবতে পারে। ওদের কেউ হয়ত ফলো করেছে আমাদের, ঠাওর পাচ্ছিনে ঠিক। আচ্ছা চললাম।'

আমায় ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে সে পিছু ফেরে—'চললাম দাদা! বই নিয়ে বসতে হবে এখুনি। যাই। টা টা!'

ওর সংলাপটা অযথা একটু সমুচ্চ বিশেষ করে ওর ওই দাদা-শব্দটার ওপর জোরটা যেন একটু বেজায় বলে আমার বোধ হোলো। সেটা অনুসন্ধিৎসু ওর অনুসরণকারীদের উদ্দেশেই নিক্ষিপ্ত কিনা কে জানে।

ট্রাম থামল কিন্তু আমি উঠলাম না।

আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম শ্যামবাজার। ক্রাউন কর্নোয়ালিস সব সিনেমা হাউসের পাশ কাটালাম, উৎসাহ হোলো না ছবি দেখবার। জীবনের যে ছবি আমার কাছে সদ্য উন্মোচিত হয়েছে তাই যেন আমার মন কনায় কানায় ভরে দিয়েছিল!

ফিরতি পথে হেদোর কোনো নিরালা কোণে একটা বেঞ্চ বেছে ভাবতে বসলাম।

কতো কী ভাববার ছিল যে! ভাববার কোনো কূলকিনারা ছিল না যেন।

কিসের থেকে কী হয়ে গেল না আজ! কীসের থেকে কী দাঁড়ায় কোথায় গড়ায়—বলতে পারে কেউ?

মন এক আশ্চর্য মরুভূমি! ধু ধু বালিয়াড়ি আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ধুঁকছে! নায়গ্রার প্রপাত বয়ে গেলেও যেন ওর পিপাসা মেটে। আবার কখন আকাশ থেকে এক ফোঁটা পড়লেই সেই মরুভূমিতে যেন বান ডেকে যায় হঠাৎ, দুকূল ভেসে যায়, তার!

মার করুণার স্বাতী বিন্দুটি পেয়ে যাই যেন। চাতকের তামাম চাহিদা মিটে যায়।

ঈশ্বর থেকে পৃথিবীতে এলাম—পৃথিবীকে পেলাম। পৃথিবীর পরিচয়ে ভালোবাসাকে জানলাম। স্বাদ পেলাম ভালোবাসার।

আবার যা ভালোবাসায় থেকে পৃথিবীর পরিচয়ে ঈশ্বরকে চেনা—স্নেহের পরিচয় পাওয়া তাঁর।

কখনো রথ, কখনো বা উল্টোরথ। কিন্তু একই পথ—একটাই পথ—অনন্য গতি।

একই পথ—এই পৃথিবীর পথ ওই এক ভালোলাগার — ভালোবাসার। তাঁর গতি ধরে ফিরে সেই তাঁর দিকেই।

একই পর্ব—একই পরব একটানা। কোনো পর্বান্তর নেই জীবনের। জীবনভোর এক পার্বণ।

কখনো তাঁর দক্ষিণায়নে পৃথিবীর দাক্ষিণ্য বিলিয়ে আমার চোখের সামনে তাঁর উত্তরণ। কখনো বা তাঁর উত্তরায়ণে ভালো-বাসার ভেতর দিয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে তাঁর কাছে গিয়ে আমি উত্তীর্ণ।

ভারতীয় সংগীত বাদ্য

বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অসামান্য কৌতূহল আছে, কিন্তু একত্রিতভাবে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে তেমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের একান্ত অভাব। সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি সুন্দর প্রচেষ্টা করেছেন ডক্টর লালমণি মিশ্র তাঁর থিসিস 'ভারতীয় সংগীত-বাদ্য' গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি হিন্দী ভাষায় লেখা, এটি প্রকাশ করেছেন ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, বি ৪৫-৪৭ কনট প্লেস, নতুন দিল্লী। সম্প্রতি এটি আমরা সমালোচনার জন্য পেয়েছি।

গ্রন্থকার বৈদিক যুগ থেকেই বাদ্যযন্ত্রের ইতিবৃত্ত আরম্ভ করেছেন। ঋক তথা সাম মন্ত্রগুলির বিস্তৃততর গেয়রূপ যখন প্রবর্তিত হয়েছে তখন লৌকিক গীতবাদ্যের যথেষ্ট উন্নত অবস্থা। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যে সব বাদ্যের ব্যবহার হত তার মধ্যে বেশ কয়েকটি বীণার উল্লেখ দেখা যায়—এর মধ্যে বাণবীণা বা শততন্ত্রী-বীণার বিস্তৃত আলোচনা আমরা গানের আসরে কিছুকাল আগে করেছি। এগুলি লৌকিক বাদ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। চর্ম-বাদ্যের মধ্যে দুন্দুভির উল্লেখ বৈদিক শাস্ত্রাদিতে আছে। নানা ক্রিয়াকলাপে এটির ব্যবহারও যথেষ্ট ছিল। গ্রন্থকার এদের বিস্তৃত না হলেও মোটামুটি বর্ণনা প্রদান করেছেন।

বৈদিক সংগীতের সঙ্গে বাদ্যের আরও একটি সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, বেদগানের তথাকথিত স্বরগ্রামের প্রথম স্বরটিকে বেণুর মধ্যম স্বরে স্থাপন করা হয়েছিল। কণ্ঠে গানের যে সব পর্দা প্রতিফলিত হয় তা নানা কারণে যথার্থ নাও হতে পারে, কিন্তু যন্ত্রে এ সম্ভাবনা নেই। বৈদিক স্তোত্রের রূপায়ণে ভুলভ্রান্তি বহুল পরিমাণে ঘটত। এর কারণ, বৈদিক সংগীতের ধ্বনিগুলির কোনও নির্দিষ্ট মান ছিল না। উদাত্ত বলতে কতখানি উঁচু, অনুদাত্ত বলতে কতখানি নীচু এবং স্বরিত বলতে উক্ত দুই ধ্বনির কি আন্দাজে সমাহার হবে—তার কোনও নির্দিষ্ট বিধান ছিল না। ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ গুরুমুখী। যিনি যথার্থ শিক্ষা পেতেন তিনি সুরেলা গাইতেন, যিনি তা পেতেন না তাঁর আচরণ হতো বেসুরো। শিক্ষাকারগণ একটি নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন এবং এঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী নারদ বেণুর মধ্যমের সঙ্গে উদাত্ত স্বরের সামঞ্জস্য বিধান করে বৈদিক গানের স্বরগ্রামটি কি হবে, সেটি হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেন। এই বেণু হচ্ছে লৌকিক সুষির বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত বেণু। অর্থাৎ লৌকিক বাদ্যকে অবলম্বন করেই শেষ পর্যন্ত মন্ত্রগানের যথার্থ রূপায়ণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল।

গ্রন্থকার এই পরিপ্রেক্ষিতে যে স্বরগ্রাম প্রদান করেছেন (পৃ ২০) তার সঙ্গে কিন্তু এই নিবন্ধের লেখক একমত নন। শাস্ত্রানুসারে প্রথম স্বর থেকেই স্বরগ্রামের আরম্ভ, কুষ্ট থেকে নয়। কারণ, কর্ষণ করে যে স্বরকে চড়ানো হয় তাকে একটি নির্দিষ্ট পর্দার সঙ্গে সংযুক্ত করাটা সংগত নয়। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে বৈদিক সংগীতে মা গা রে সা এই পর্যন্ত অবরোহণের পর স্বরটি একেবারে নেমে আসত ধা-তে। এই খাদের ধৈবতটিই ছিল মন্দ্রস্বর এবং এই স্বরটিকে কর্ষণ করে নিষাদে চড়ানো হত। এই নি-টিকে বলা হতো অতিস্বার্য। আজকাল অনেক গ্রন্থে নারদী শিক্ষার টেকস্টকে পাল্টে দিয়ে অন্যরকমভাবে বৈদিক স্বরগ্রাম নির্ণয় করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ খয়রাগড়ের ইন্দিরা কলা সংগীত বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "ভারতভাষাম" গ্রন্থের ৩৮ পৃঃ এবং সম্পাদকীয় আপনাশার উল্লেখ করা যায়। এই ধরনের কার্যকলাপ নিরতিশয় আশংকার বিষয়।

গ্রন্থকার ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং সংগীত রত্নাকর থেকে সর্বাধিক তথ্য আহরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নাট্যশাস্ত্রই হচ্ছে আকর গ্রন্থ। মধ্যযুগে অপর বহু গ্রন্থ থাকলেও সংগীত-রত্নাকরই প্রধান বিবেচিত হয়। এর কারণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিপুণভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল এবং সন্নিবেশিত হয়েছিল। সংগীত-রত্নাকর প্রধানত সংগ্রহগ্রন্থ এবং এই সংগ্রহটি এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে আর্যযুগ থেকে হিন্দু যুগের অবসান পর্যন্ত বহু শতাব্দীর সাংগীতিক পরিচয় বিধৃত হয়। পণ্ডিত লালমণি মিশ্র তাঁর গ্রন্থে বিষয়-বস্তুর সন্নিবেশও প্রায় অনুরূপভাবেই করেছেন। যদিও তিনি বহুলাংশে আলোক-পাতের চেষ্টা করেছেন তথাপি তাঁর রচনা স্থানে স্থানে এই দুটি প্রাচীন গ্রন্থের "প্যারাফ্রেজ" বলে মনে হয়। আরও একটু আধুনিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে মনে হয় গ্রন্থের চিত্তাকর্ষতা বৃদ্ধি পেত।

প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রাদির আলোচনায় প্রাচীন বর্ণনা অনুসারে যন্ত্রগুলি কিরকম প্রতীয়মান হয় সেটি রেখাচিত্রে প্রদর্শন করলে গবেষণার ফলশ্রুতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যেত। অবশ্য এ গ্রন্থের শেষে বহু চিত্র রয়েছে; কিন্তু তাতে এই অভাব মেটে না। কেন মেটে না সেটা বলি।

সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে একতন্ত্রী বীণার একটি বৃহৎ বর্ণনা আছে। এটি দেবার হেতু এই যে, বীণা যন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (কম্পোনেন্ট) এই বর্ণনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এইটিকেই প্রতীক বীণা যন্ত্র হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া অঙ্গুল, হাত প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দে নির্দিষ্ট মাপ বোঝায়। সেগুলি স্পষ্ট করে না দিলে বর্ণনা যথাযথ হয় না। অতএব, একটি ড্রয়িং থাকলে সে যুগের বীণা যন্ত্রটি (যা লিউট পর্যায়ের) সম্বন্ধে একটি প্রত্যক্ষ ধারণা করা সম্ভব হত। ঠিক এইভাবেই বাণবীণার ফিগার থাকলে প্রাচীন ভারতের একপ্রকার হার্প-এর পরিচয়টিও পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষতর হত। এতদ্ব্যতীত স্বরমণ্ডল, রুদ্রবীণা প্রভৃতি প্রাচীন যন্ত্রের পরিচয় যতটা পাওয়া যায় নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে রেখাচিত্রে প্রতিফলিত করা আবশ্যক। এইখানেই প্রয়োগধর্মী গবেষণার বিশেষ সার্থকতা। এই সব রেখাচিত্র থাকলে বর্তমান বাদ্যযন্ত্রাদির সঙ্গে প্রাচীন বাদ্য-যন্ত্রসমূহের তুলনা করে বিবর্তনকে উপলব্ধি করা সহজ হত।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীতে বৃন্দবাদনের বর্ণনাও আছে। সেগুলির পরিচয় দিলে সেকালে যন্ত্রসংগীতের সমাবেশ কিরকম হত সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেত। নাট্যশাস্ত্র থেকে বহু বাদ্যবিধির বর্ণনা আমরা পাই, গ্রন্থকারও তার থেকে অনেক কিছু দিয়েছেন; কিন্তু নাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেমনভাবে এইসব বাদ্যবিধির পরিকল্পনা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা নেই। বাদ্যযন্ত্রের আলোচনায় কোন কোন প্রয়োজনার মাধ্যমে বাদ্যযন্ত্রগুলি উন্নতিলাভ করেছে তারও উল্লেখ থাকা দরকার। এ না হলে গবেষণা কেমন নীরস কারিগরী আলোচনায় পর্যবসিত হয়। প্রতিটি বস্তুই তার পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে; তাদের একত্র করে বস্তুটির মূল্যায়নেই তার প্রয়োজনীয়তা এবং অবস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে।

গ্রন্থকার মুসলিম সূত্র সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহের ভাব পোষণ করেন না বলে মনে হল; কিন্তু উক্ত সূত্রটি একপ্রকার অবহেলার যোগ্য নয়। রবাবের সংজ্ঞা নির্ণয়ে তিনি সংগীত পারিজাতের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন— 'বরং বর্তিত মদ্যাত্তো রবাবহঃ স্মৃতঃ' কিন্তু আরবজগতে প্রচলিত রুবব বা রবাব শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেননি। আমাদের দেশে অনেকে ভায়োলীন-কে "বাহুলীন" আখ্যা দিয়ে থাকেন:—তা বলে সেইটাই ঐতিহাসিক সংজ্ঞা নয়। 'ইসরাজ' শব্দটিকে ইসরার না এসরার বলা হত—। এ সম্বন্ধেও গ্রন্থে কোনও আলোকপাত করা হয়েছে বলে মনে হল না।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রন্থকার অপরের মতের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজে কোনও সমীচীন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। আলিঙ্গ্য শব্দটির সঙ্গে আলিঙ্গনের কোন যোগ নেই একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন (পৃঃ ৯০) কেন না এই চর্মবাদ্যটিকে সোজা রেখে কেবল তার একটি মুখই বাজানো হত; কিন্তু নামটা তাহলে আলিঙ্গ্য হল কেন সে সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যাই তিনি দেননি। এইরকম চর্মবাদ্য একাধিক [illegible] খাড়া রেখে কেবলমাত্র একটি মুখে বাজানো গেলেও কোলে শুইয়ে বা বগলের তলায় চেপে ধরে বাজানো হয়। আলিঙ্গ্য নামটির তো একটি তাৎপর্য আছে: সেটি কি?

খুঁটিনাটিভাবে আলোচনা করতে গেলে এইরকম নানা বিষয় চোখে পড়তে পারে এবং মতবিরোধ ঘটা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু গ্রন্থকার যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চোদ্দটি অধ্যায়ে যন্ত্রসংগীত সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন এইটিই প্রধান কথা। গ্রন্থটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা হিসাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গ্রন্থকার যে বহু পরিশ্রম করেছেন সেটিও সুস্পষ্ট। গ্রন্থের সরল ও সুবোধ্য হিন্দী ভাল লাগল। সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্য জ্ঞানপীঠ পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

শার্ঙ্গদেব

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

'বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'

রঙ্গালয়ের স্রষ্টাকে এই নমস্কার যিনি নিবেদন করলেন, ইনি হলেন আমাদের দেশের পাবলিক থিয়েটার নির্মাণের প্রধানতম উদ্যোক্তা, বিখ্যাত নট এবং একজন কৃতী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। যাঁর উদ্দেশ্যে এই নমস্কার নিবেদিত হল, তিনি হলেন দীনবন্ধু মিত্র। স্বীকার করতেই হয়, যাঁর নাটককে অবলম্বন করে একটি দেশের পাবলিক থিয়েটার গড়ে ওঠে, তাঁর নাটকের নিশ্চয়ই এক অসাধারণ সমসাময়িক মূল্য ছিল। তা না হলে এমন ঘটনা কখনো ঘটে না। আর গিরিশচন্দ্র কেবল 'রঙ্গালয়ের স্রষ্টাই' বলেননি, তাঁকে 'নাট্যগুরু' এই বিশেষণেও বিশেষিত করেছেন। সুতরাং বাংলা মঞ্চ এবং নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধুর অগ্রাধিকার কোনো তর্কের অবকাশ রাখে না।

আঠারশো বাহাত্তরে জোড়াসাঁকোতে মধুসূদন সান্যালের বাড়ি মাসিক তিরিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে প্রথম জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। প্রথম অভিনীত নাটকের নাম হল, 'নীলদর্পণ।' প্রথম রাতেই টিকিট বিক্রয় হয়েছিল সাতশ টাকার। অথচ সেদিন আয়োজন ছিল খুবই সামান্য। থিয়েটার বলতে আজ আমরা যা বুঝি, দর্শক হিসাবে সেদিন যাঁরা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তাঁরা অভিনয়ের সৌন্দর্য চাক্ষুষ করা ছাড়া আর কিছুই পাননি। না বসবার আরাম, না ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার সুযোগ—কিছুই না। ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে দারুণ শীতের রাতে এ অভিনয় হয়। মাথার ওপর কেবল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল মোটা ক্যানভাসের ছাউনি। বাস, আর কিছু না। তব, লোক জুটেছিল শয়ে শয়ে। সবিস্ময়ে তারা দেখে এসেছিল একটি যুগান্তকারী নাটক।

বাহাত্তরের এই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের স্মরণে আমরা আপ্লুত হই। গত বছরে আমরা তার শতবার্ষিকী পালন করেছি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই এর পরে আমাদের যা কর্তব্য, তা হল সেই নাট্যকারকে স্মরণ

করা, যাঁর হাতে বাঙলা নাটক একদা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে যে অভিনয় হল, তারপর এক বছর ঘুরল না। আঠারশো তিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের দেহান্তর ঘটল। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে। সে আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগেকার ঘটনা। এখন শতবর্ষের আলোকে তাঁকে একবার যাচাই করে দেখা যেতে পারে। বাঙলা নাটকে তিনি যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, সে প্রাণস্পন্দ আজো কী অনুভব করা যায়?

কলকাতা থেকে দূরে নদীয়া জেলায় কাঁচরাপাড়ার কাছে একটি অখ্যাত গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম। গ্রামটির নাম চৌবেড়িয়া। জন্ম সন সম্ভবত ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ। জন্মভূমি চৌবেড়িয়ার স্মৃতিতে কবি তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে লিখেছিলেন,

'পাক দিয়ে বেড়ে যান চৌবেড়িয়া গ্রাম,
বিনত দীনের যথা অতি দীন ধাম।'

বাবার নাম, কালাচাঁদ মিত্র। বাবার দেওয়া তাঁর নাম ছিল, 'গন্ধর্বনারায়ণ।' বাবা এই সন্তানকে জমিদারী সেরেস্তার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আট টাকা মাইনেতে। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর এ ভাগ্য পছন্দ হল না। কলকাতায় তখন নতুন সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে। তরুণ বাঙলা সেদিন 'হিন্দু কলেজ'-এ ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ভেতর দিয়ে জেগে উঠছে। নবযুগের এই দুর্বার টান দীনবন্ধুকে ঘর ছাড়া করল। তিনি পালিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। উঠলেন এসে কলকাতায়। বাবার দেওয়া 'গন্ধর্বনারায়ণ' নামটি পরিত্যাগ করে, নতুন নাম নিলেন—দীনবন্ধু। কেবল নামে নয়, চৌবেড়িয়ার ছেলেটির সত্যিই সত্যিই নব জন্ম ঘটল।

লঙ সাহেবের স্কুল ও কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল পেরিয়ে হিন্দু কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে দীনবন্ধু পাটনার পোস্টমাস্টার হয়ে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'সাধুরঞ্জন'-এর পাতায় কবিতা লিখে হাত পাকালেও দীনবন্ধুর সাহিত্যজীবনের প্রকৃত আরম্ভ কর্মজীবনের সূচনা থেকে পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কেন না, এই সালেই তাঁর 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। কেবল 'নীল-দর্পণ'-এর প্রকাশের জন্যই নয়, নানাদিক থেকে এই সময়টি সবিশেষ লক্ষণীয়। দীনবন্ধুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছেন, 'সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধি-স্থল। পুরান দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।'

'নীলদর্পণ' যে একটি ভীষণ আলোড়নকারী নাটক, একথা স্বীকার করতে বোধ হয় কারোরই আপত্তি নেই। সেকালে ঘরে ঘরে এটি পঠিত হয়েছিল, কাগজে কাগজে ঝড় বয়ে গেছে এই নাটকটিকে নিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত অনূদিত নাটক নিয়ে জেল খাটলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙ।—নীল-দর্পণকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটে গেল, তা একালের পাঠকদের কাছে অপরিচিত নয়। তাই বিস্তৃত তথ্য সে সম্পর্কে না দিলেও চলে। তবে সাহিত্যিকদের যে গুণ না-থাকলে সাহিত্য হয় না, সেই অপরিহার্য গুণ কিন্তু দীনবন্ধুর প্রথম রচনাতেই ধরা পড়ল। বঙ্কিম এ প্রসঙ্গে লিখলেন, 'অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীন-

বন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গল্পের রূপ নীলদর্পণ।'

দীনবন্ধুর সাহিত্য-জীবন মোট তেরো বছরের। তিরিশ বছরে যার শুরু, তেতাল্লিশে মৃত্যুর সংগে সংগে তার সমাপ্তি। নাটক-প্রহসনে মিলিয়ে মোট সাতখানি বই তিনি লিখেছিলেন। বাকি দুটি কবিতার বই। এ ছাড়া দুটি গদ্যরচনা এবং একটি প্রহসনও তাঁর রচনাপঞ্জীর ভেতর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

একেকটি করে দীনবন্ধুর নাটক প্রকাশিত হয়েছে, আর প্রায় সংগে সংগেই সেটি বাঙালীদের চিত্ত জয় করে নিয়েছে। প্রথম নাটকটি প্রত্যক্ষ বাস্তবের পটভূমিতে লিখিত হলেও, পরবর্তী নাটকগুলির অধিকাংশ রোমান্টিক আখ্যান ও বাস্তবের মিশ্রণে রচিত। এর ফলে দীনবন্ধুর নাটকে ব্যর্থতা এবং সফলতার যুগপৎ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই।

'নীলদর্পণ'-এর পর দীনবন্ধুর প্রকাশিত নাটক হল, 'নবীন তপস্বিনী'। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ বা উৎপীড়িত মানুষের সংগ্রামের চিত্র এই নাটকের বিষয়বস্তু নয়। এখানে এসে তিনি মানুষের ভেতরে প্রবেশের
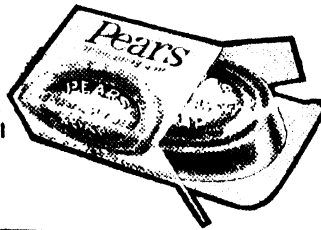
চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে আছে কৌতুকের দীপ্তি। বঙ্কিমচন্দ্র এই নাটকটির প্রসঙ্গে লিখেছেন 'নবীন তপস্বিনী'র বড় রানী ছোট রানীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।... প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তি চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোসগল্প' হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল কুত্কুতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; 'জলধর' 'জগদম্বা' Merry wives of windsor হইতে নীত।'—'নবীন তপস্বিনী' নাটক হিসাবে কতখানি সার্থক, তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। তবে কৌতুক সৃষ্টিতে তিনি যে কত নিপুণ, তার পরিচয় সর্বত্র অবারিত। প্রসঙ্গত একটি চিঠি উদ্ধার করা যেতে পারে। এ চিঠি নাটকের অন্যতম নায়ক 'হোঁদলে'র উদ্দেশ্যে লিখেছে তার প্রেয়সী :

হোঁদল কুৎকুতে মহাশয় সমীপেষু,
যদবধি হাঁদা পেট হেরেছি নয়নে,
পূর্ণচন্দ্র কার্তিকেয় নাহি ধরে মনে।
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে,
রসিক রতন বিনা রহিব কি করে?
হাবুডুবু খায় বামা বিরহ হোঁদলে,
হোঁদল কুৎকুতে বিনা আর কেবা তোলে?
শনিবার সন্ধ্যা পরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন।
হোঁদল কুৎকুতের প্রেয়সী।

নাটকের অন্তর্নিহিত কৌতুক ছাড়াও, এখানে একটি বাড়তি কৌতুক আছে। এ কৌতুকের উপজীব্য হলেন প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাবা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। আর 'শনিবারের সন্ধ্যা' সম্ভবত অফিসবাবুদের নিয়ে রসিকতা। দীনবন্ধু এ জাতীয় কৌতুকে ছিলেন অদ্বিতীয়। সত্যি কথা বলতে কী তাঁর আগে বা পরে কাউকেই এ জাতীয় রসিকতা করতে দেখা যায় না। দীনবন্ধুর এটি একবারে নিজস্ব ব্যাপার।

'নবীন তপস্বিনী'র পর একই সঙ্গে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুটি প্রহসন প্রকাশিত হল। প্রথমে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', পরে 'সধবার একাদশী।' প্রথমটি এক বিবাহ পাগল বৃদ্ধকে কেন্দ্র করে কৌতুক রসের উৎসার, দ্বিতীয়টি পানাশক্তির বিরুদ্ধে লেখা। প্রথম নাটকটি মোটামুটি নির্দোষ। কিন্তু দ্বিতীয়টি সমস্যার কণ্টকে পরিকীর্ণ। কেবল পানাসক্তি নয়, সভ্যতার নামে অসভ্যতা, মাতলামি, ডেপুটিদের কীর্তি-কলাপ, বাবুদের বারাঙ্গণা বিলাস, প্রতিভার অপচয় এবং সেই সঙ্গে অন্তঃপুরচারিণীদের সধবা হয়েও বৈধব্যের যন্ত্রণা—সবই তুলে ধরলেন। দক্ষ শিল্পীর মতনই প্রতিটি ছবি তিনি নিখুঁতভাবে আঁকলেন। তথাকথিত শ্লীল-অশ্লীলের মানদণ্ড স্বীকার করলেন না।

ফলে, চারদিক থেকে ভীষণ কলরব উঠল। এই নাটক সম্পর্কে 'ফ্রাই-ডে রিভ্যু' পত্রিকায় লাল বিহারী দে লিখলেন 'If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons' বামগতি ন্যায়রত্নের মত পণ্ডিত ও কৃতী সমালোচকও লালবিহারী দের ধ্বনি তুলে লিখলেন, 'সধবার একাদশী'খানি মদের কথাতেই আরম্ভ ও মাতালের কথাতেই পর্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বথামী ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ।...শুদ্ধ কতকগুলা বথামীর গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজার ও সোনাগাছী প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া দিলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত।'

'ভিক্টোরীয়-যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থের লেখক হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখলেন 'সধবার একাদশী'র লিপিকুশলতা ও চরিত্র চিত্রণ উৎকৃষ্ট হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিব, ইহার রুচি ও ভাব প্রশংসনীয় নহে,—বরং নিন্দারই বিষয়।'

না, কোন নিন্দা নয়, বিপরীত সমালোচনাও আছে। সেখানে 'সধবার একাদশী'র যে প্রশংসা করা হয়েছে, তা অতিশয়োক্তি বলে ভ্রম হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত এই বইখানি পড়ে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং বিমুগ্ধ চিত্তে

মিনাডেক্স সুস্থ রক্ত, মজবুত হাড়, ও ভালো দৃষ্টির জন্যে!

বলেছিলেন, 'আর্টিস্ট ভাষায় নাটকশ্রেণীর বহুতর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু 'সধবার একাদশী'র তুলনা কোথাও দেখিতে পাই নাই।'—লোকেন্দ্রনাথ কেবল এইটুকু কথা বলেছেন, তা নয়। মুখর নিন্দা ভাষণকে স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'সধবার একাদশী' কয়জন বুঝে? সংযমের অভাবে বিফলীকৃত শিক্ষার অপূর্ব চিত্র গেটে তাঁহার ফাউস্টে দেখাইয়াছেন। কলিকাতার ফাউস্টেও আমরা সেই চিত্র দেখিতে পাই; তবে মেফিসটোফেলিস অশরীরী হইয়া মদের বোতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।'

'টেম্‌পারেন্স সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ সরকার এই নাটকটি হাতে পেয়ে কী খুশিই না হয়েছিলেন! তিনি দীনবন্ধুকে অভিনন্দিত করে বলেছিলেন 'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে, এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।'

১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে ললিতচন্দ্রের সম্পাদনায় এই বইটি যখন নতুন করে প্রকাশিত হয়, তখন এর ভূমিকা লিখেছিলেন, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায় তিনি খুব সুস্পষ্টভাবেই লিখেছিলেন, 'এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিতে যাওয়াই বোধ করি একটা বাড়াবাড়ি।... বাঙলা সাহিত্যের ভান্ডারে এ একখানি জাতীয় সম্পত্তি।—এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভালো।'

'সধবার একাদশী'র পর ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হল 'লীলাবতী'।—একশ বিরানব্বই পাতার এই সুদীর্ঘ নাটকটি সম্পর্কে যদিও বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছিলেন, এবং যদিও এর ভেতর সে যুগের ছাপ খুব সুস্পষ্ট, তবু বলতে হয় এর সর্বাংশ সর্বোত্তম নয়। বঙ্কিম লিখেছেন, 'এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসূর্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতের সঙ্গে সমালোচকদের মতান্তর ঘটলেও 'গুলির আড্ডা'র হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের স্রষ্টাকে অবশ্যই সকলে স্বাগত জানাতে বাধ্য। যথেষ্ট প্রশংসা করলেও যেন সব বলা হয় না। এই নাটকে নদেরচাঁদের একটি বক্তৃতা আছে, এ বক্তৃতার তুলনা মেলা ভার। প্রসঙ্গত একটু উদ্ধার করা যেতে পারে,—

'প্রিয় বন্ধুগণ—প্রিয় বন্ধুগণ এবং প্রিয় বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানুষ।—অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পন্ডিত পার্টালির নিকটে—নিকটে—পার্টালির নিকটে—আমার বক্তৃতা করা কেবল, হাঁসিভাজা হওয়া—হাস্যভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লন্ড ভন্ড কান্ড উপস্থিত।...যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বলতে এমন—দানেন ন ক্ষরং যাতি স্ত্রী রত্নং মহাধনং—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল।...বিবাহ বলিতে গেলেই বন্ধুতা এসে পড়ে—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ, বন্ধুতা তার ফল। বিবাহের কত কৌশল তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বলতে পারে। আরো দেখুন সকাল দুই দুই, চন্দ্রসূর্য, রাতদিন, পথঘাট, হুঁকো-কল্কে, ঢাক ঢোল, হাতা-বেড়ী, শ্যাল-শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীব সকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে আপনা-আপনিই নিতম্বে দুদ এসে পড়ে—'

'জামাই বারিক' নাটকটি দীনবন্ধুর কৌতুকরসের আরেক উৎস। সেকালে কলকাতার বড়ো বড়ো ধনী পরিবারে ঘরজামাই রাখবার প্রথা ছিল। বাড়ির বাইরে বরাট ব্যারাক তৈরী করে তাতে জামাইদের রাখা হত। এই ঘরজামাইদের উপজীব্য করে দীনবন্ধু রচনা করলেন 'জামাইবারিক'। মৃত্যুর আগের বছর এটি প্রকাশিত হল।

'জীবন স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই বইটির কথা সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। তখন রবীন্দ্রনাথ কিশোর বালকমাত্র, এ বই পড়বার মতন বয়স তখন তাঁর হয়নি। এক আত্মীয়ার আঁচল থেকে চাবি চুরি করে কী ভাবে এই নাটকটি সংগ্রহ করেছিলেন, তার বিবরণ জীবন স্মৃতির পাতায় ধরা আছে। পরিশেষে আছে গ্রন্থপাঠের রসাস্বাদ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ... 'চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা।'

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক 'কমলে-কামিনী' তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আর 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নামে যে ক্ষুদ্র নাটিকাটি লিখেছিলেন, তা একটি সাময়িক ঘটনার ওপর লেখা। এ নাটিকাটি নাট্যকার

সকল সময়েই ভাল জিনিষ দেয়

আপনি **সিঙ্গার**-এর ওপর নির্ভর করতে পারেন — কারণ সেলাই কলের ব্যাপারে এই কোম্পানীর রয়েছে ১০০ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা। **সিঙ্গার** কোম্পানী আন্তর্জাতিক মানের জিনিষপত্র যুগিয়ে আসছে
মেরিট* সেলাইয়ের কল,
সিঙ্গার অল-পারপাস অয়েল,
সিঙ্গার ছুঁচ। তাই ভারতে এবং বিদেশে গৃহিনীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলাইয়ের আনন্দের জন্য যে **সিঙ্গার** ই পছন্দ করেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

সিঙ্গার সকল সময়েই ভাল জিনিষ দেয়

maa.SSM.2630.BEN.

তাঁর জীবিত অবস্থায় প্রকাশ করেন নি। 'বঙ্গদর্শন'-এ এবং 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় তাঁর দুটি গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়। 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' বের হয় প্রথমটিতে, দ্বিতীয়টিতে প্রকাশিত হল 'পোড়া মহেশ্বর'। এদের ভেতর 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' রচনাটি অবশ্যই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

এই সব রচনা ছাড়া দুটি খণ্ডে প্রকাশিত 'সুরধুনীকাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা'র কথা বর্তমান আলোচনায় অবশ্যই উঠতে পারে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, দীনবন্ধু এখানে তাঁর প্রতিভার অনুপযোগী বিষয়কে কাব্যের উপজীব্য করেছেন বলে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সমসাময়িক কালে দীনবন্ধু যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, সত্যি সত্যিই তার তুলনা নেই। গণ আন্দোলনকে তিনিই প্রথম নাটকের উপজীব্য করেন। অতি সাধারণ মানুষকে নাটকে নিয়ে এসেছিলেন তিনিই। ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে তাঁর নাটকই প্রথম সাগরপাড়ি দেয় এবং ওখানে গিয়ে আলোড়ন তোলে। আর জাতীয় রঙ্গমঞ্চ বা সামাজিক আন্দোলনে তাঁর দানের কথা না তোলাই ভালো। কেননা, এ দুটি ব্যাপারে তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তবু নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিভার একটি সীমায়িত স্বরাজ্য আছে। এই সীমানার ভেতর তিনি সম্রাট। বাইরে গেলেই তিনি ব্যর্থ। —একালে নাটকের আঙ্গিক নিয়ে চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আমাদের জীবনের জটিলতা যত বাড়ছে, ওখানে তত তার প্রতিফলন ঘটছে। রূপক-সংকেত-তত্ত্ব নাটকের পরিধি ছাড়িয়ে 'অ্যাবসার্ড-ড্রামা' ইত্যাদির ভেতর আমরা মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছি। মানুষের ভেতর আরেক মানুষকে খুঁজতে আমরা ব্যস্ত। —দীনবন্ধুর সময় এ সব ছিল না। তাঁরা মানুষকে সোজাসুজিই দেখতেন এবং শেকস্‌পীয়ারের নাটকের আদর্শে সোজাসুজি নাটক রচনা করতেন। তবু আধুনিকতাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। মানুষের অগ্রাধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর উপেক্ষিতদের তিনি নিয়ে এসেছেন সাহিত্যে। কেবল বিত্তহীন নয়, বুদ্ধিহীনদের তিনি তাঁর নাটকের সাতমহলা প্রাসাদে অবারিত দ্বার করে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই বৈশিষ্ট্যটিকেই ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।' —এই কারণেই তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে তোরাপ-রাইচরণ-আদুরী-পদী ময়রাণী। নদেরচাঁদ, নিমচাঁদ, ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে বাঙলা সাহিত্যে তিনি প্রথম প্রবেশাধিকার দেন। এদের ভণ্ডামি বা এদের নোঙরামিকে নিয়ে তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে ট্রাজেডি লিখতে বসেন নি। হাস্যরসের অবতারণা করে কৌতুক রসে সিঞ্চিত করে এদের অন্তর দিয়েছেন উদ্ঘাটন করে। বলা বাহুল্য, এটিও দীনবন্ধুর নিজস্ব। হাসির ভেতর দিয়ে তাঁর মত পৃথিবীকে আর কেউ কখনো দেখে নি।

ফলে, যা ঘটবার তাই ঘটেছে। সংলাপ-রচনায় দীনবন্ধু বেপরোয়া। কখনো অমার্জিত ও কখনো অশালীন। বার বার তিনি জীবনের তথাকথিত অশ্লীলতার বেড়া টপ্‌কে এগিয়ে গেছেন। —প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার তাঁর রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। —বলা বাহুল্য, এ সবই তিনি করেছেন উপেক্ষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী। রুচির মুখ রক্ষা করতে গিয়ে মনুষ্যত্বের সত্যকে তিনি কখনো উপেক্ষা করেন নি। আর করেন নি বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে পারি, 'তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।'

দুঃখের ব্যাপার এই, পরবর্তীকালে আমরা কিন্তু এই খণ্ডিত জিনিসই পেলাম। কেননা, দীনবন্ধু যে পথের পথিক সে পথে আর কাউকে আমরা দেখতে পাই না। অকাল মৃত্যু কেবল দীনবন্ধুর নয়, অকাল মৃত্যু হল তাঁর সাহিত্যাদর্শেরও। চলতে চলতে আমরা একশ বছর পার হয়ে এলাম, এখন কী আমরা নতুন করে দীনবন্ধুর পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি না?

ফুলের মত
সতেজ সৌন্দর্য্যে
উদ্ভাসিতা...
এ শাড়ী
প্রস্তুতকারী-
মনলোভা, অনুপম
বহুবিচিত্র ডিজাইন থেকে
পছন্দমত বেছে নিন।
ফুল-ভয়েল। সেমি-ভয়েল।
'টেরিন'/ কটন।
ল্যাপেট এবং বুটা।
এছাড়াও পাবেন:
• শার্টিংস্
• ধুতি
• পোশাকের নানান বস্ত্র
CHOICE FABRICS
শ্রী রাম মিলস্ লিমিটেড
গণপৎরাও কদম মার্গ, লোয়ার প্যারেল,
বোম্বাই ৪০০ ০১৩
OBM-0565-BEN

॥ সতেরো ॥

'এত বড় অন্যায় তুই করলি কী করে? একবার তোর মাথায় এলো না—'

'কিন্তু নিশিদা—'

—'কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। তুই যা করেছিস, তা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ঘোরতর শত্রুরাই করতে পারে।' নিশিকান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, এবং সবিতাব্রতর দিকে ধিক্কার হানা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বলেন, 'আমার সামনে কেউ জনযুদ্ধ পত্রিকা ছিঁড়লে, আমি ঘুঁষিয়ে তার দাঁত ভেঙে দিতাম।'

সবিতা নিশিকান্তর দিকে তাকাতে পারে না, মাথা নিচু করে নীরব থাকে। নিশিকান্ত সবিতাব্রতর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে টেবলের ওপরে তাঁর মোটা শক্ত মুঠি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে চাপেন যেন কী করবেন স্থির করতে পারেন না। তাঁর উজ্জ্বল বাদামী রঙের চোখের দৃষ্টি টেবলের ওপরে, যার ওপরে নানা ফাইলপত্র আর ব্রিফস এবং ইলিয়া এহ্‌রানবুর্গের ইংরেজি অনুবাদ ফল অব্ প্যারি, কিন্তু সে সব তিনি দেখেন না। শক্ত বলিষ্ঠ দোহারা নিশিকান্ত, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট, একটু মোটা তবু চোখা নাক, চওড়া কপাল, মাথার চুল মোটা ঘন আর শক্ত গোছা, শ্যাম্পুতে নরম করার চেষ্টা লক্ষণীয়, পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি। নিশিকান্ত গুপ্ত, সবিতাব্রতর মাসতুতো দাদা—তার থেকে বড় পরিচয়, কলকাতার বিখ্যাত লইয়ার, কংগ্রেসের সদস্য নরেন্দ্রনাথ গুপ্তের একমাত্র ছেলে। নিশিকান্ত ব্যারিস্টার, কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রথম লণ্ডনে এবং দীক্ষাও সেখানে। হ্যারি পলিটের প্রীতিভাজন ছিলেন। সবিতাব্রতর দীক্ষাও নিশিকান্তর কাছেই। প্রস্তাব ছিল, নিশিকান্ত পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সভ্য হবেন, হন নি। আদালতে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাবেন, প্রয়োজন, প্রধানত পার্টির মামলা মোকদ্দমার সাহায্যার্থেই—পার্টিরই সিদ্ধান্ত, কিন্তু তাঁকে নেতৃস্থানীয় কমরেডই বলতে হবে। সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সব সময়েই তাঁর যোগাযোগ থাকে। নেতারা কলকাতায় এলে অনেক সময় তাঁর বাড়িতেও আসেন। তার আগে অবশ্যই পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা ফয়সালা করে নিতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ একনিষ্ঠ কংগ্রেস সদস্য কিন্তু পুত্রের সঙ্গে কখনো তর্ক করেন নি। অথচ ক্রিমিনাল লইয়ার হিসাবে তাঁর সাবলীলতা বাকপটুতা এবং তীক্ষ্ণতা আর আইনের কূট কৌশল বিষয়ে তাঁর কুশলতা সর্বজনবিদিত। অবিশ্যি ইতিমধ্যেই নিশিকান্তও আইনজীবি মহলে একটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যখন জানতে পেরেছিলেন নিশিকান্ত শুধু ব্যারিস্টার না, কমিউনিস্ট আদর্শ নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসেছেন তখনো তিনি সে বিষয়ে পুত্রকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তির সৃষ্টি হয় নি।

নিশিকান্ত আইন পড়তে বিলাত যাবার মাস দুয়েক আগে বিয়ে করেছিলেন। ফিরে আসার পরে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি প্র্যাকটিস করতে চান কী না। তারপরে নিশিকান্ত তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন নরেন্দ্রনাথের কথা। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভানুকে (নিশিকান্তর ডাক নাম।) নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে বিলেতে যা করতে গেছলো, তা করে এসেছে আর সেটা বেশ ভালো ভাবেই করে এসেছে, অনর্থক সময় নষ্ট করে বাজে কাজ করে বেড়ায় নি। যেটা আমার মনে ভয় ছিল, বউমাকে নিয়ে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে কী না, তাও হয় নি, ওদের দাম্পত্য জীবন সুখেরই মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, ভানু নিয়মিত প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। এর চেয়ে আর কী ভালো আমি প্রত্যাশা করতে পারি।' নিশিকান্ত উৎকর্ণ হয়েই মায়ের কথা শুনেছিলেন এবং হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর কিছু বলেন নি? কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়ে?' মা বলেছিলেন, না, সে রকম কিছু বলে নি। খালি বলেছে, 'বড় হয়ে বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে যে যার মতে চলবে, তা নিয়ে কোনো কথা চলে না। আমি বলতেও চাই না।'

নিশিকান্ত তাঁর পিতাকে যতটুকু চেনেন, বুঝেছিলেন যা তিনি পারবেন না, সে চেষ্টা কখনোই করবেন না, এবং রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ে পিতার নীরবতাও যে আসলে একটা প্রতিবাদ এবং হেয় চিন্তা তাও বুঝেছিলেন। নিশিকান্ত মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন, কিন্তু অবলম্বন করেছিলেন পিতারই নীতি। তার অর্থ এই নয় পিতা-পুত্রের বাক্যালাপ ছিল না। নিশিকান্ত জানেন, তাঁর পিতা আগস্টের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগদান করেন নি, অথচ নিজের জীবিকার ভিতরে বাইরে তিনি তাঁর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসের সদস্যরা এ বাড়িতে প্রায়ই আসেন, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন, পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে যদি নিশিকান্তর বিষয়ে কোনো কথা হয়, নিশি-

কখনও তা জানেন না। সম্ভবত নরেন্দ্রনাথের মতো বাড়ি তা এড়িয়ে যান বা আলোচনার যোগ্য মনে করেন না। নিশিকান্ত নিজে এখন অনেকটা নির্বাক, যদিও, কংগ্রেসের প্রতি সমালোচনায় এবং আক্রমণের ভাষায় অত্যন্ত নির্মম। তিনি নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর বন্ধু কমিউনিস্ট নেতাদের এ বাড়িতে অসময়, বিরূপ কী না, এবং আপত্তি থাকলে, তিনি স্বেচ্ছায় এ বাড়ি ত্যাগ করতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, 'তুমি যদি এ বাড়িতে বসতে পারো, তোমার পার্টির বন্ধুরা কেন আসতে পারবেন না? আমার বাড়ি বলে? ছো? সেটা কোনো কথাই না। পলিটিক্সে তুমিও যা, তোমার বন্ধুরাও তাই। আমার থাকা তাদের অসময় তফাত কিছু নেই। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

বিরোধ হতে পারে বা তর্ক এ রকম কোনো কথাই নরেন্দ্রনাথ বলেন নি। এখন পর্যন্ত পিতা পুত্র, কংগ্রেস কমিউনিস্টের সহাবস্থান নির্বিরোধেই চলেছে।

নিশিকান্ত ঘরের অন্য প্রান্তে যান যেখানে সেফা সেট রক্ষিত। সেন্টার টেবল থেকে পাইপ তুলে নিয়ে নিবে যাওয়া অবশিষ্ট তামাকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে কয়েকটি টান দেন। সন্ধ্যা অসময়, আলো জ্বালবার কথা কারোরই খেয়াল হয় না। ল্যান্সডাউন রোডের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি চলার শব্দ ভেসে আসে, কখনো রিকশার টং টং। এ বাড়িরই ওপরের ঘরে রেডিওর গান বাজছে। শঙ্খধ্বনি ভেসে আসে হয় তো অন্য কোনো বাড়ি থেকে এবং কাঁসরের ঢং ঢং দূরের অন্য কোথাও থেকে। ঘরের মধ্যে অস্বচ্ছ আলো অন্ধকার অন্ধকার, উত্তেজনায় থমথমে। নিশিকান্তের গমগমে স্বরে এখনো উত্তেজনা, বললেন, 'অন্যায় স্বীকার করলেই সব অন্যায়ের ক্ষমা হয় না।'

সবিতাব্রত মুখ তোলে না, একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তীব্র অপরাধবোধের যন্ত্রণা ওর মধ্যে যেন বিষের মতো ক্রিয়াশীল। ওর সমস্ত চেতনা জুড়ে অপরাধবোধ। ও জানে এবং বিশ্বাস করে নিশিকান্তের প্রতিটি কথাই সত্যি ধ্রুব। একটা ধিক্কারের বশেই, ও জনযুদ্ধ পত্রিকা ছিঁড়ে ফেলেছিল। সেটাকে খানিকটা আত্মধিক্কার বলা চলে। থানার ও সি-র সেই হাসি আর কথা যেন বিদ্যুৎ হানার মতো ওর বুকে চিরে দিয়েছিল। কিন্তু সেই ধিক্কার আর অপমানবোধ বেশিক্ষণ ক্রিয়াশীল ছিল না। জেগেছিল দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। দ্বিধা ওর রাজনৈতিক বিশ্বাস, বারে বারেই মনে হয়েছিল জনযুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলটা ঠিক হয় নি। দ্বন্দ্ব, পুলিসের আচরণ—দয়ালকে মারা আর ওকে করুণা করা। বকুলতলা ক্লাব থেকে ও বাড়ির ভিতর পড়তে যেতে পারে নি, খেতেও না। নিষ্প্রদীপ অন্ধকার পথে পথে বৃষ্টির ফিরফিরে ছাট মাথায় নিয়ে ঘুরেছিল। রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারে নি। সকালবেলা কলকাতায় এসে অফিসে কাজে মন দিতে পারে নি কারণ তখন আর দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল না, অন্যায় আর অপরাধবোধ নির্ভেজাল করে তুলেছিল। অফিসের কাজ ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তখন কেবল নিশিকান্তের কথাই বারে বারে মনে পড়েছিল। একবার ভেবেছিল হাইকোর্টে যাবে নিশিকান্তের সঙ্গে দেখা করবে। আবার ভেবেছিল, পার্টি অফিসে যাবে, সেখানে গিয়ে সব বলবে। যায় নি। নিশিকান্ত ছাড়া কারোর কথা ভাবতে পারে নি।

নিশিকান্ত সব কথা শুনতে শুনতে দপদাপিয়ে উঠেছিলেন, এখনো তা-ই। তাঁকে

দেখলে বোঝা যায়, তিনি কেবল ক্রুদ্ধ না, একটু কষ্টে বিদ্ধ, কাতর। তার কারণ সম্ভবত, সবিতাব্রত তাঁর কাছেই দীক্ষিত, নিজের সৃষ্টির মধ্যে অনাসৃষ্টি দেখে, সম্ভবত তাঁর অবচেতনে সংশয়ের ছায়া, কিংবা একটা ভয়—অতএব ক্রোধ। নিবে যাওয়া পাইপটা সেন্টার টেবলে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে সবিতাব্রতর দিকে সবেগে ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, 'এ কমিউনিস্ট মাস্ট লার্ন টু অইডেন্টিফাই হিজ ফোজ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস্। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুই জবাব দে, সেখানে কে তোর বন্ধু ছিল? তোর ওই তথাকথিত আগাস্ট বিপ্লবী দয়াল না পুলিসের দারোগা?'

সবিতা অপরাধীর চোখে মুখ তুলে নিশিকান্তর দিকে তাকায়, নিচু স্বরে বলে, 'কেউ না, জানি, ঘটনাটা এমন হঠাৎ ঘটে গেল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই—।'

'তার মানে কী?' নিশিকান্ত কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, সবিতার দিকে এগিয়ে আসেন এবং আবার বলেন, 'হঠাৎ ওরকম সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠার একটাই কারণ, নিজের ভেতরে এখনো অনেক গলদ। তোর ভেতরটা আসলে বুর্জোয়া ভাববাদে এখনো ঠাসা। একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট কখনো এরকম কাজ করতে পারে না।'

সবিতা বলে, 'আমি সেটা পরে বুঝতে পেরেছি। পেরেছি বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

নিশিকান্ত সবিতার মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন এবং বোধহয় খেয়াল হয় ঘর অন্ধকার, কারণ সবিতার মুখ স্পষ্ট দেখতে পান না। তাঁর মুখ কোমল হয়ে ওঠে, সরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালেন। বই ঠাসা আলমারির কাচে ঝলক লাগে। নিশিকান্ত আবার পাইপটা তুলে নেন, বলেন, 'বোস।'

এই প্রথম সবিতাকে বসতে বলেন। পাইপ উপুড় করে ছাইদানিতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, 'দারোগাটা তোকে ওরকম করে বললো কেন? এটা তো স্পষ্ট, হতে পারে ও এই সরকারের পুলিস, কিন্তু পুলিস মানেই এই নয় কি যে আজকের কংগ্রেসের প্রতি তার সমর্থন নেই। পুলিসকে চিনতে ভুল হবার কী কারণ থাকতে পারে। বাইরের আচরণে হয় তো দেখাচ্ছে, সে খুবই সরকার ভক্ত, কংগ্রেস বা সোস্যালিস্ট কংগ্রেসিদের মেরে টিট্ করবে, আসলে মনে মনে তাদের ওপরেই সিমপ্যাথেটিক। ব্রিটিশের পরেই পুলিসের যদি কারোর ওপর ভক্তি থেকে থাকে, সে হলো বুর্জোয়া কংগ্রেসের ওপর। কমিউনিস্টদের ওপর ওরা কখনোই সদয় হবে না, কোনো কমিউনিস্টের তা ভাবাও উচিত না। নতুন রাজনৈতিক পটভূমিকা জন্ম নিচ্ছে, পুলিসের তা বোঝবার ক্ষমতা নেই। পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের। আয়, এখানে বোস।'

নিশিকান্ত পাইপের নল খুলে, নলে ক্লিনার ঢুকিয়ে পরিষ্কার করেন। সবিতা কাছে এসে একটা সোফায় বসে। নিশিকান্ত বলেন, 'আমি তো জানি, শুধু দারোগা কেন, অনেক বড় বড় পুলিসের কর্তারাই আমাদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, খারাপ কথা বলে। জনযুদ্ধওয়ালা বলে ঠাট্টা করে। আমাদের পেটাতে পারলেই ওরা খুশি, কিন্তু উপায় নেই, তাই পারছে না। কিন্তু সুযোগ পেলে যে কোনো দিন পেটাবে না, তা তো সত্যি না। চান্স পেলেই পেটাবে।'

সবিতা নিশিকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শোনে। অপরাধের থেকে ওর চোখেমুখে এখন গভীর আগ্রহের ভাব। নিশিকান্ত যা বলেন, ও যে তার কিছুই জানে না তা না, তথাপি মনে হয় এ সব কথা যেন ও নতুন শুনছে আর ওর ভিতরটা যেন তীব্র ঘৃণায় নতুন প্রত্যয়ে শক্ত হতে থাকে। নিশিকান্ত পাইপে তামাক ঠুসতে ঠুসতে বলেন, 'সাধারণভাবে পুলিসের চরিত্র কী? জুলুমবাজ, স্বার্থান্বেষী, প্রশাসনের দাপটে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আদায়ের ফিকিরে থাকে। তার মানে এই না, রাজনীতির ব্যাপারে ওদের কোনো রিঅ্যাকশন হয় না। নিশ্চয়ই হয়, আর আমি তোকে বলছি, সেই রিঅ্যাকশনের সবটাই কংগ্রেসের সমর্থনে। গভর্নমেন্টের যতো বড় বড় হোমরা চোমরা সব মনে মনে কংগ্রেসের দিকে। হয়তো দেখবি, যে পুলিস আগাস্টের দাঙ্গাবাজদের পেটাচ্ছে, তার বাড়িতেই লক্ষ্মীর পটের পেছনে গান্ধীর ছবি লুকানো আছে।'

বলতে বলতে নিশিকান্ত হেসে ওঠেন, পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তামাকে স্পর্শ করে টানেন। টেনে টেনে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, 'তোর গরম লাগছে না?'

সবিতার যেন হঠাৎ খেয়াল হয় ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গরম, বাইরে বোধহয় এখনো কুয়াশার মতো বৃষ্টি ঝরে। ঘামে ওর গা

ভেজা মুখ চটচটে। নিশিকান্তের কপালে চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সবিতা উঠে পাখার সুইচ টিপে দেয় এবং এখন অনেকটা সহজভাবে বলে, 'কিন্তু নিশিদা, পুলিশ যেভাবে দয়ালকে মারছিল, দেখে চুপ করে থাকা যায় না।'

নিশিকান্ত বলেন, 'ঠিকই, প্রতিবাদ করে হয় তো ভালোই করেছিস, কিন্তু কী লাভ? দয়াল আমাদের বন্ধু না বরং এখন ওরা পুলিশের থেকেও আমাদের বড় শত্রু। দে আর স্যাবোটিয়ারস। ওরা ওদের আন্দোলনকে বলছে বিপ্লব—রেভ্যুলিউশন। রেভ্যুলিউশন কাকে বলে ওরা জানে না, রেভ্যুলিউশনের নাম করে ওরা সর্বনাশ করছে, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর বিপ্লবী যুদ্ধের পিছন থেকে ছুরি মারছে। ওরা সারা পৃথিবীর সর্বহারার বিপ্লবীদের শত্রু। সোস্যালিস্ট শব্দটা ওদের কাছে একটা নতুন রঙচঙে পোশাকের মতো, ওরা তার মানেও জানে না। আসলে তো ওরা সোস্যালিজমের বিরুদ্ধেই লড়ছে। রিয়্যাল সোস্যালিস্ট হলে ওরা আমাদের পিপলস্-ওয়ারের লাইন মেনে নিতো। কী বলছি বুঝতে পারছিস?'

সবিতা দৃঢ় স্বরে জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই পারছি।'

'পারবি, না পারার কিছু নেই।' নিশিকান্ত বলেন, 'সেই হিসাবে দয়ালকে সিমপ্যাথি দেখিয়ে কী লাভ? ওরা জানে শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন, ওয়ার্ল্ড পলিটিকস্-এর কোনো খোঁজ রাখে না, বোঝেও না। ওরা জানে পৃথিবীতে একমাত্র শত্রু ইংরেজ, লড়তে হলে কেবল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। একমাত্র আমরা কমিউনিস্টরাই বাস্তব অবস্থাকে বুঝে ঠিক রাস্তা নিতে পেরেছি। আমরা এতদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি, কিন্তু ফ্যাসিস্টরা তার থেকেও বেশি সর্বগ্রাসী শত্রু; তারা সাম্রাজ্যবাদীদেরও ছেড়ে কথা বলে না। বললে, ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স তারা আক্রমণ করতো না, শুধু সোভিয়েট রাশিয়াকেই আক্রমণ করতো।'

নিশিকান্ত পাইপ টানেন, কিন্তু কথার স্রোতে তামাকের আগুন নিবে যায়। তার মুখ দেখে বোঝা যায়, কেবল সবিতাকে শোনাবার জন্যই যেন কথাগুলো বলেন না, নিজের চিন্তাকেই স্পষ্ট করতে চান। হাতে দেশলাই নিয়েও আর এক হাতে পাইপ নিয়ে আবার বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদের কথা বলে আমাদের ছেলেদের অনেক সময় বিভ্রান্ত করা হয়, তারা ঠিকমতো জবাব দিতে পারে না। কে বলেছে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে? বরং সাম্রাজ্যবাদীরাই বাঁচবার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে—মানে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে। দুশো বছর আমরা পরাধীন আছি, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না? আমরা কি ফ্যাসিস্টদের দালালি করবো? প্রত্যেকটা দেশ যেখানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়া, সেখানে এখন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। আমরা, কমিউনিস্টরা জাতীয়বাদে বিশ্বাসী না, আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। এই যে সুভাষ বোস, সেও তো আন্তর্জাতিকতাবাদীই, কিন্তু সে হলো ফ্যাসিস্ট দালাল, দেশ স্বাধীন করবার জন্য সে হাত মিলিয়েছে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে, আর আমরা লড়ছি আণ্ডার দ্য লিডারশিপ অব কমরেড স্ট্যালিন।'

সবিতার দুই আয়ত চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, 'স্টালিনগ্রাডে আমরা জিতছি। আজকের স্টেটসম্যানে সেই খবর আছে।'

নিশিকান্ত বলেন, 'নিশ্চয়ই জিতবো। এখন কথা হচ্ছে, এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সবাইকে ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের দালাল বা কুইসলিং সুভাষ বোসের নাম করে অনেকে আমাদের অনেক কথা বলবে, তার জন্য চুপ করে থাকলে চলবে না, পাল্টা জবাব দিতে হবে। আমাদের লড়তে হবে একদিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের বিরুদ্ধে, এমন কি ভ্যাসিলিয়েটিং পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধেও।'

নিশিকান্ত কথা থামিয়ে পাইপের তামাকে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরান, কয়েকবার টেনে বলেন, 'তোদের এলাকার থানার ও সি সম্পর্কে আমি খোঁজখবর করবো। দরকার হলে স্বরাষ্ট্র বিভাগকে আমাদের জানাতে হবে। আর তুই একটা কাজ করবি। তোদের এলাকায় যে কোনো মিটিংএ বক্তৃতার সময় একথা উল্লেখ করবি, কোনো দারোগা যদি জনযুদ্ধওয়ালা বলে বিদ্রূপ করে তার পরিণাম ভালো হবে না।'

নিশিকান্ত কথা শেষ হবার আগেই ঘরের দরজায় নারীকণ্ঠ শোনা যায়, 'একি, তখন থেকে তুমি নিচে বসে আছো? আর আমি জলখাবার নিয়ে হাঁ করে বসে আছি?'

কমলা নিশিকান্তর স্ত্রী। কথা বলতে বলতে ঘরের ভিতরে আসে এবং সবিতাকে দেখে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'সবিতা ঠাকুরপো, আপনি কখন এলেন?'

সবিতা হেসে বলে, 'অনেকক্ষণ।'

নিশিকান্ত বলেন, 'সবিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। চলো যাই।'

কমলা যখন ঘরে ঢোকে, তখন মাথায় ঘোমটা ছিল না। সবিতাকে দেখেই বোধহয় ঘোমটা টানে, কিন্তু ঘোমটা আবার খসে যায় এবং কমলা নতুন করে আর ঘোমটা টানে না, তার [illegible] করে বাঁধা খোঁপা নিতান্ত আটপৌরে ধরনের, আঁটো এবং তেল চকচকে না। প্রায় তেলহীন চুলে দুই বেণী, মাথার মাঝখানে চূড়োর মতো বাঁধা। সবিতা জানে না [illegible] কী খোঁপা বলে, কেবল একটি ছবি [illegible] ওঠে চোখের সামনে, কাননবালার ছবি, যার মাথায় এই রকম খোঁপা বাঁধা ছিল এবং কমলাকে দেখায় আরো অনেক সুন্দর। সবিতা দেওয়ালে বায়স্কোপের ছবি দেখে, বায়স্কোপ দেখতে যায় না। কমলার ধূসর আয়ত চোখ, খয়েরি তারা, একটু বড় কপাল, সরু ভুরু, টিকোলো নাক, দীর্ঘ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর, লালাভ ঠোঁট, মুখে সামান্য পাউডারের প্রলেপ, ঝকঝকে দাঁতের হাসি—সব কিছুর মধ্যে মেশানো যেন তার বিদুষী ঝলক। নিশিকান্ত বিলাত যাবার পরে নরেন্দ্রনাথ তাকে বি এ পাশ করিয়েছিলেন। নিশিকান্ত ফিরে এসে স্ত্রীকে এম এ পড়তে উৎসাহিত করেছেন, বিষয় ইংরেজি এবং সেই সঙ্গে ছাত্র আন্দোলন আর রাজনীতির প্রেরণা জুগিয়েছেন। সবিতার কাছে কমলা—কমলা বউদি নারীর আদর্শ, কমরেড কমলা গুপ্ত।

নিশিকান্ত সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করেন, 'বুধনটা কোথায়, তাকে একবারও এ ঘরে আসতে দেখিনি?'

কমলা হেসে বলেন, 'তোমাদের বুধন আজ সকাল থেকেই উধাও।'

কমলার দৃষ্টি সবিতার দিকে এবং দৃষ্টিতে ও হাসিতে রহস্যের ঝিলিক। নিশিকান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'উধাও মানে? কোথায় গেছে?'

'বোধহয় মুলুকে।' কমলা বলে, 'কারণ ওর লোটা আর টিনের সুটকেসটা দেখা যাচ্ছে না।'

নিশিকান্তর বিস্ময়ে এবার একটু উদ্বেগ ফোটে, বলেন, 'সে কি পালিয়েছে! কিছু চুরিটুরি করে নিয়ে যায়নি তো?

কমলা বলেন, 'খোঁজ করে সেরকম কিছু পাইনি।'

'কিন্তু কেন?' নিশিকান্ত জিজ্ঞেস করতেই সাইরেন বেজে ওঠে। বিপদ সংকেত আওয়াজ, ঢেউ দিয়ে দিয়ে সাইরেন বাজে।

কমলা একটু ত্রস্ত হয়েও হেসেই বলে, 'এই ভয়েই, মানে বোমার ভয়ে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। সম্ভবত ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকেই সমগ্র শহরের আলো নিবিয়ে দেয়। সাইরেনের বিপদ সংকেত বেজেই চলে।

ক্রমশ

'প্রগতির পরিশিষ্ট'

নারী প্রগতির বিশেষ লক্ষণ তাঁর উপার্জনের পথে পদক্ষেপ। রোজগার করার অর্থনৈতিক দিকটি বাদ দিলেও, মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতার পরম পরিচয় স্বরূপ —স্বচ্ছন্দ চলাফেরা এবং আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে অর্থ উপায় করা। এ সুযোগটুকুর জন্য মেয়েরা যুগ যুগ ধরে সাধনা করে এসেছে। সিদ্ধিলাভের পর এখন আবার নূতন প্রশ্ন উঠেছে। সন্তানের জননী ঘরের বাইরে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এলে ছেলেমেয়ের কতটা ক্ষতি হতে পারে। এ ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ বিশেষ আশংকা প্রকাশ করছেন। তাঁরা বলেন, এই যে দুনিয়ায় অপরাধপ্রবণতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং যুবসমাজ বেপরোয়া হয়ে উঠছে তার একটি কারণ শৈশবে বা কৈশোরে ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গ কম পায়। বর্তমান শহরবাসী পরিবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট্ট পরিবার। পিতা-মাতা ও তাদের সন্তান, এই নিয়ে সংসার। সেকালের যৌথ সংসারের ঠাকুমা পিসিমার আদর নেই, নেই মা জেঠিমার স্নেহ। কর্মব্যস্ত working mother সন্তানের জন্য কতটা সময়ই বা দিতে পারেন! ফলে, তার মানসিক অবলম্বন দৃঢ় হয় না। সমাজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করতে চায়। শিশু এখন চায় তার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখুক। স্বাভাবিক স্নেহ-স্পর্শের অভাব তার কাছে বিষময় ঠেকে। অনাদরের প্রতিক্রিয়ায় সে এমন কিছু করতে চায় যাতে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এমনকি পুলিসের দৃষ্টিও তার কাছে অনাদর ও অবজ্ঞার চেয়ে ভাল মনে হয়।

মেয়েদের উপার্জন করা ভিন্ন পথ এখন আর নেই। তাদের আয় থেকে সংসারের অনেক সুবিধা হয়। অভাবের বিরাট মুখ-ব্যাদান হয়তো বা কম ভয়াবহ হয়। এক-কথায় পারিবারিক উপার্জন বাড়ে এবং কেনাকাটার কিছু সুরাহা হয়। এও ফেলে দেবার কথা নয়। কিন্তু যদি মায়ের সঙ্গ না পেয়ে সন্তান ধ্বংসকারী বর্বর হয়ে যায়, তার বিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন ভয়াবহ আকার ধারণ করে তবে তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে লাভ-ক্ষতি ওজন করে দেখা দরকার। অথচ পাল্লায় ভারী হলে মেয়েদের জীবিকার জন্য বাইরে যাওয়া কি বন্ধ করা চলে? বোধ হয় তার পক্ষে বর্তমান সকল রকম পরিস্থিতিই প্রতিকূল। এমনকি পরিবার পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা বলেন, যে সব উৎসাহদায়ক কারণ পরিবার পরিকল্পনা সহজ করে তার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা এবং উপজীবিকা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। অধিক সন্তানের জননীর অসুবিধাগুলি তাঁরা উপার্জনের

অন্তরায় বলে মনে করেন। কাজেই মায়ের অযত্ন বা উপেক্ষাকে যুবসমাজের উচ্ছৃংখলতার কারণের একটি জেনেও নারী প্রগতির এদিকটির কণ্ঠরোধ করা সম্ভব নয়।

আধুনিক জীবনযাত্রার আর একটি লক্ষণ শহরমুখী সভ্যতা। যন্ত্রের যুগে nuclear family বা ছোট্ট পরিবার। যদি বলেন ছোট্ট পরিবারের নিঃসঙ্গ ছেলেমেয়ে বেপরোয়া হয়, কারণ তাদের একাকীত্ব সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রণোদিত করে। কিন্তু যৌথ পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের সংযোগ সত্ত্বেও অপরাধ কি হয়নি কখনও? এককালে যারা পেশাদার অপরাধী বলে খ্যাতিলাভ করেছে তারা সবাই সামাজিকভাবে বড় পরিবারভুক্তই ছিল। কাজেই ছোট্ট পরিবার সন্তানকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে কিনা বলা কঠিন। বড় পরিবারের দোষগুণ যাই থাকুক, আধুনিক শহরবাসের পক্ষে উপযুক্ত আর নয়। সেখানেও মায়ের উপার্জনের মতই পরিস্থিতিকে স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নেই। বিশেষ যখন আমরা হলফ করে বলতে পারছি না অপরাধপ্রবণতার ভিত এইখানে।

শহরবাসের নাকি আরও একটি সমস্যা আছে। তা হচ্ছে মুক্ত আলোবাতাসের অভাব। নগরগুলি জনাকীর্ণ, রাজপথ, জনপথ, যানবাহন ও জনচলের চাপে ক্লিষ্ট। ছোট ছেলেমেয়েরা মানসিক মুক্তির অভাবে সংকীর্ণ ও আবদ্ধ আবহাওয়ায় বাস করে। তাতে নাকি অপরাধপ্রবণ হওয়া সহজ। শহরের প্রলোভন এখন পল্লীতেও পৌঁছেছে। পণ্যদ্রব্যের বাহার ক্ষুদ্রতম গ্রামেও যাচ্ছে। সাইকেল, ট্র্যানজিসটার, হাতঘড়ি, চোঙ্গা প্যান্ট, বাবরি চুল—কোথায় নেই? কাজেই শহর আর গ্রামে অপরাধপ্রবণতার তফাৎ থাকার কারণ কি কে জানে। অপরাধের এক অংশকে তো স্বাভাবিক মনে করে নানা নামে আজকাল অভিহিত করা হচ্ছে। কি গ্রামে কি শহরে, পাশ্চাত্ত্য দেশের বড় দোকানে যাকে সংকোচন বলা হয়, তা আসলে হচ্ছে দোকানের কর্মচারী অথবা ক্রেতাদের চুরি। এ ধরনের বাকালঙ্কারও আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ।

কালো টাকার যেমন নূতন নাম হয়েছে হিসাবহীন আয়। অর্থাৎ হিসাব রাখলে টাকা সাদা, না রাখলে কালো। তবে দুইই উপার্জন।

বছর কয়েক আগেও চুরি সাধারণত দারিদ্র্যের সঙ্গে যোগ করা হতো। সে ধারণা যেতে বসেছে। অনাহার বা অর্ধাহারে মানুষ যতটা চুরি করে তার চেয়ে বেশী করে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যতার আওতায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি যে যুবসমাজের drug culture বা নেশা ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন, তার কোন্ অংশ দারিদ্র্য? তাদের mod জামাকাপড়, drug ইত্যাদির সঙ্গে যোগ হয়েছে mobility বা গতিময় অস্থাবরতার culture। রাস্তাঘাট ভরে উঠেছে তাদের চলাচলে। এরা সকলেই প্রায় rising middle class অর্থাৎ নূতন সমাজ। ছেলেমেয়েরা কখনও বা এমন ডুবে যায় যে, অপরাধ ভিন্ন আর গতি থাকে না। যখন তাদের সঙ্গতি বা সংস্থান সংকীর্ণ হয়ে আসে তখন চুরি করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রলোভন অপরাধের বড় একটি কারণ। তার জন্য শহরবাস, পল্লীবাস, মায়ের অযত্ন সবই একাধারে ফেলা যায়। ছোট ছোট বিলাসিতা, নানারকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ব্যাকুল বাসনা দমন না করতে পারাও আধুনিক অপরাধ-প্রবণতার অঙ্গ। এককালে utilitarian বা উপযোগবাদী সমাজ শাসনে মোটা প্রয়োজন basic needs ভিন্ন বিলাসিতাকে বাদ দিয়ে শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষাপদ্ধতি গঠিত হতো। এখন বিজ্ঞাপন এবং সংযোগের সহজ ব্যবস্থা বিলাসিতাকে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অর্থনীতির ভাষায় এই ছোট বিলাসিতার নাম conventional necessity। চলিত রীতির অনুসরণে বিলাসিতা করায় যুবসমাজ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে। এ যেন তার মনোগত প্রয়োজন। তবু মনোগত প্রয়োজনের তাগিদে সে ছুটে বেড়ায়। যা তার চাই তার জন্য যে কোন

মূল্য দেওয়া চলে। কারণ যাই হক, এখানেই অপরাধপ্রবণতার জন্ম। হয়তো বা মূলে মায়ের অযত্ন বা উপেক্ষা। সমাজের নানা পরিবর্তনও কারণ হতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নূতন জীবনের ধারা।

টুকিটাকি

খেলনা, রং-এর তুলি, বই ইত্যাদি সাজিয়ে তাক তৈরি করে ঘরের কোণে রাখলে ছোট ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্নতা শিখবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সময়মত সব কিছু হাতের কাছে পাবে। আট ইঞ্চি থেকে চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া তক্তা দিয়ে ঘরে বসে সেল্‌ফ দেওয়ালে লাগিয়ে নিতে পারেন। সেলফের মাপ ঘরের মাপ এবং জিনিসের মাপে করে নেওয়া ভাল।

সেল্‌ফের গায়ে গোঁজ লাগিয়ে নিত্য-ব্যবহার্য কাজের জিনিস টাঙিয়ে রাখা সুবিধাজনক। কাঁচি, চাবির গোছা ইত্যাদি পেরেকে রাখলে সর্বদা হাতের কাছে পাওয়া যাবে। ওই পেরেকে একটি ঝাড়নও রাখবেন। ছেলেমেয়েরা অবসর মত নিজেদের জিনিস ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে রাখতে পারবে। পেনসিল কাটার ছুরি, সেলোটে ইত্যাদি যাঁদের সর্বদা দরকার তাঁরা তা সাজিয়ে রাখতে পারবেন।

অনেক সময় বাচ্চাদের আলাদা আলমারি দেওয়া সম্ভব হয় না। সেল্‌ফ বানিয়ে তাতে তারের বা প্লাস্টিকের সাজি বা ডালা সাজিয়ে কাপড়-জামা ও অন্যান্য কাজের
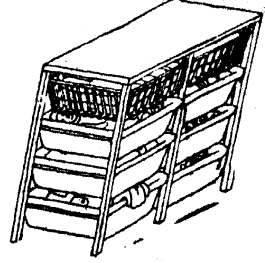
জিনিস রাখা যায়। বাইরে থেকে দেখা যায়, কাজেই বের করতে জিনিস এলোমেলো হবার ভয় নেই। একটি তাক একজনের জন্য আলাদা করেও দেওয়া চলে।

শ্রীমতী
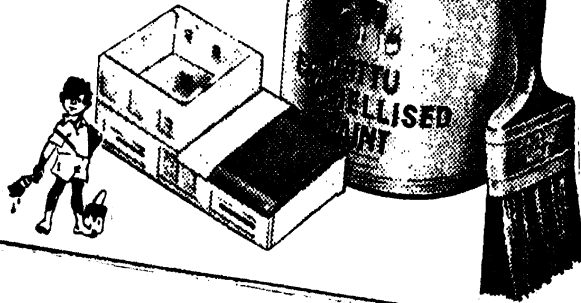
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

সে কতদিন আগেকার কথা—১৯৪৫ সালের ১২ অক্টোবর। ইংলণ্ডের ফুলহ্যাম থেকে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড জে ল্যাস্কি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের এক বাঙ্গালী ছাত্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন: 'দ্যাখো, ভারতবর্ষ সম্পর্কে মেকলের একটা কথা আমার খুব সত্যি বলে মনে হয়। বলেছিলেন, যেদিন গ্রেট ব্রিটেন ভারতকে বলতে পারবে, শুভ মুহূর্ত সমাগত, ভারত এখন তার জাতীয় জীবনের পথে গর্বের সঙ্গে একাই চলতে পারবে, সেদিনটাই হবে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কের ইতিহাসে সবচেয়ে গর্বের দিন। আমার মনে হয় সেই বিশেষ মুহূর্ত আগত ঐ। পরের বছর নির্বাচনের পরই স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখতে পাব বলে আমি অপেক্ষা করে আছি। আমি বিশেষভাবে আশা করি, ভারতের তরুণ মুসলমানেরা এখন উপলব্ধি করবেন যে সাম্প্রদায়িক সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টার চেয়ে সামগ্রিকভাবে ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভ করাটাই সবচেয়ে বড় দরকার।'

ব্রিটিশ লেবর পার্টির চেয়ারম্যান ল্যাস্কি চিঠিখানি যাঁকে লিখেছিলেন, তাঁর তরুণ প্রাণ তখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দুর্বার হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের আকাশে বাতাসে তখনও বারুদের গন্ধ। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। তরুণ বুঝতে পারছেন, স্বাধীনতার আর দেরী নেই।

কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী। ব্রিটিশ রাজশক্তি শেষ আঘাত হানবার চেষ্টা করবে। তার প্রতিরোধের জন্য সর্বশক্তি সংহত করতে হবে। প্রবল জনমত গড়ে তুলতে হবে ব্রিটিশ রাজশক্তির এই কেন্দ্রভূমিতে বসে।

তরুণের আশঙ্কাই সত্য হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের নামে—ভারতবাসীর প্রতি শেষবারের মত প্রতিশোধ নিতে চাইল ইংরেজ। সারা ভারতবর্ষ গর্জে উঠেছিল সেই বিচারের বিরুদ্ধে।

সেই বাঙ্গালী তরুণও চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। কেমব্রিজের ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য অর্থ সাহায্য তুলতে লাগলেন। বার করলেন একটি প্রচারপত্র। তাতে বলা হল, গণতন্ত্রকে বাঁচাও: যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের যে পবিত্র আদর্শের বুলি আওড়িয়ে বৃটিশ এ যুদ্ধে নেমেছিল, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শকে কামানের গোলায় চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। লখনৌতে ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে নিরস্ত্র, নিরপরাধ নারী ও ছাত্ররা নির্যাতিত হচ্ছে। এদের যুদ্ধপরাধী হিসাবে বিচার করা হোক। আজাদ হিন্দ ফৌজকে আজ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে কুইসলিং বলে। অথচ নাৎসি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছিল ওরাই না তাদের একদিন বলেছিল, 'দেশপ্রেমিক', অতএব গণতন্ত্রকে বাঁচান বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করুন—'সেভ ডেমোক্রাসি।'

ওই আবেদনপত্র সাতজন ভারতীয় ছাত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁদের নেতাই সেই বাঙ্গালী তরুণ। নাম সুব্রত রায়চৌধুরী: ট্রিনিটির ল' ট্রাইপসের ছাত্র। আর কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি মজলিশের সভাপতি।

কেমব্রিজ মজলিশ তখন ইংলণ্ডে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। মজলিশের ত্রৈমাসিক প্রোগ্রামের প্রথম পাতায় বড় বড় করে ছাপানো থাকে: আমরা বিশ্বাস করি, ব্রিটিশ নাগপাশ ছিন্ন করে ভারত একদিন স্বাধীন হবেই। সব শেষে লেখা থাকে কোটি কোটি কণ্ঠ থেকে নির্গত ভারতবাসীর সেদিনের প্রাণ-পাথেয়: বন্দে-

সুব্রত রায়চৌধুরী

মাতরম। ১৯৪৫ সালে মাইকেল মাস টারমে ১৩ দিনের প্রোগ্রামের মধ্যে চার-দিনের প্রোগ্রামই হল, মিটিঙ। বিষয়: ভারতের স্বাধীনতা। সে সময় কেমব্রিজ মজলিশের সভাপতি সুব্রত রায়চৌধুরীকে পুণা থেকে মহাত্মা গান্ধী লিখছেন, ভাই সুব্রত রায়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক এবং তোমাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের যথার্থ

একদম
নতুন

SAPPY
PEANUT CANDY
A QUALITY PRODUCT OF
DALMIA UDYOG

SAPPY
PEANUT CANDY
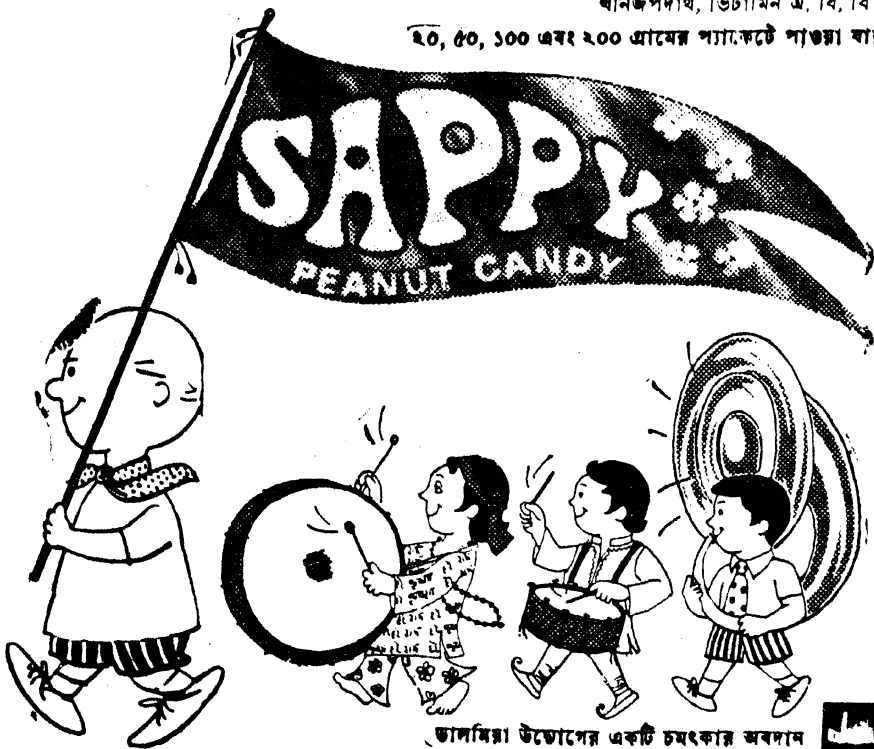
উপকার হোক। আনন্দ ভবন থেকে জহরলাল নেহর, লিখছেন, প্রিয় মিঃ চৌধুরী, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনি ইংলণ্ডে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এটা একটা বিরাট কাজ। আমিও একদিন কেমব্রিজ মজলিশের সদস্য ছিলাম। আমার সে সব দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আশা করি মজলিশ কেমব্রিজের অন্যান্য এশীয় ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ইজিপ্ট এবং উত্তর আফ্রিকার ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলাটা অত্যন্ত দরকার।

কেমব্রিজের ছাত্র সুব্রত রায়চৌধুরী আর একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নামে : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি টেগোর ইনসটিটিউট। সুব্রত রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। সভাপতি : ক্রাইস্ট কলেজের মাস্টার ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সি ই র‍্যাভেন। যুগ্ম সম্পাদক : স্বর্গীয় বিক্রম সারাভাইয়ের পত্নী শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাই ও শ্রীঅজয় মিত্র (শ্রীমিত্র এখন ইণ্ডিয়া টোবাকোর ডিরেকটর)। কোষাধ্যক্ষ যিনি তিনি আজ সারা ভারতে পরিচিত—কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা। কেমব্রিজের দিনগুলি থেকে ডঃ শর্মা আজও সুব্রতবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

ভাবতে বেশ গর্ব হয় ১৯৪৫ সালের মাইকেল মাস টার্মে ক্রাইস্ট কলেজের হলে রতন সরকার সেতার বাজাচ্ছেন। লেডি সিংহ ইংরাজীতে বলাকা কবিতা আবৃত্তি করছেন। জয়া দেবী আর অজয় মিত্র গাইছেন রবীন্দ্রসংগীত। অশোক রায়চৌধুরীর পিয়ানোতেও রবীন্দ্র সংগীতের সুর। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সমাপ্তি ভাষণ দিচ্ছেন মৃণালিনী সারাভাই।

টেগোর ইনস্টিটিউটের মধ্যে বিশ্ববরেণ্যদের অনেককে টেনেছিলেন সুব্রত রায়চৌধুরী। যেমন পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন, টি এস এলিয়ট, অলডাস হাকসলে, জন মেসফিলড, সমারসেট মম, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, লর্ড সিংহ, লেডি সিংহ। সহ সভাপতি ছিলেন, ই এম ফরসটার, এ এম উইলসন প্রমুখ। বার্ণাড শ শুধু এ ধরনের ইনস্টিটিউট গড়ার পক্ষে ছিলেন না। ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৫ সুব্রত রায়চৌধুরীকে একটি চিঠিতে শ লিখছেন : কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠা করাকে আমার অধিকতর অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। এই চেয়ারের নাম দেওয়া যেতে পারে টেগোর প্রফেশরশিপ। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এটা একটি উদাহরণ হবে। আলাদা করে একটি টেগোর ইনসটিটিউট আমার মতে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়—সত্যি কথা বলতে কি এটিকে আমার অপরিণত মস্ত শিশু বলেই মনে হচ্ছে।

*

কেমব্রিজের সেই দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে আজকের প্রথিতযশা ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরী আনমনা হয়ে যান। এই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি এখন তাঁর মনের সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে রয়েছে। ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরী তাঁর পুরনো ফাইলের ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে খণ্ড খণ্ড ইতিহাসকে বার করছিলেন। যেমন করে খনির গভীর থেকে লোকে সোনা তোলে তেমনি করে।

বর্তমান তাঁর চলছে সুশৃংখল গতিতে ঘড়ির কাঁটা ধরে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে তাঁর নিজস্ব চেমবার। তাঁর গৃহশয্যা নিখুঁত পরিপাটি। এক একটি ভোর হচ্ছে, বেল বাজিয়ে হাইকোরটের সাইকেল-পিওন এসে সেদিনের কোর্টের ছাপানো কেস লিসট দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সাতটা বাজতেই মোটর বাইক চালিয়ে ম্যাসাজ করতে আসছেন শ্রীসুধীর কুণ্ডু। ম্যাসাজের পর আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে চলে আসছেন চেমবারে। ব্রিফ ধরে ধরে আর একবার সেদিনের প্রোগ্রাম ছকে নেওয়া চলছে শেষবারের মত। ব্রেকফাসট খেয়ে যখন হাইকোরটের দিকে রওয়ানা হন তখন ঘড়িতে দশটা বাজে। চারটের সময় কোর্ট থেকে ফিরে এক ঘণ্টা ঘুম। তারপর এক ঘণ্টা ময়দানে ভ্রমণ। সাতটা থেকে তাঁর চেমবার জমজমাট। ক্লায়েনটরা আসছেন। জুনিয়ররাও এসে পড়েছেন। লাইব্রেরিয়ান এসে গেছেন। স্টেনো নোট নিচ্ছেন। খটাখট টাইপ হচ্ছে।

একটার পর একটা কনফারেনস। কখনও একই সঙ্গে একাধিক কনফারেনস চলে। সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দিনের কাজ দিনে শেষ করতে হয়। রাত গড়ায় চলে বারোটা একটা। এমন কি শনি-রবিবারেও বিরতি নেই। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও কোথাও সংহতি আর সমন্বয়ের অভাব নেই।

অথচ অতীত—যে অতীত তাঁর বর্তমানের চেয়ে কম গৌরবময় নয় তার প্রতি সুব্রতবাবুর খুব আসক্তি আছে বলে মনে হল না। কারণ তাঁর জীবনের একমাত্র অগোছাল অংশ হল তাঁর অতীত ইতিহাস।

স্মৃতির ঝুলি হাতড়ে হাতড়ে পুরানো চিঠিপত্র, অ্যালবাম, খবরের কাগজের ক্লিপিং, জীর্ণপ্রায় লিফলেট, পুস্তিকা জোড়া দিয়ে দিয়ে তবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন কাহিনী তৈরি করতে হয়। প্রচারবিমুখ শ্রীরায়চৌধুরীর জীবনে এই বোধ হয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী বর্ণনার প্রয়োজন হল। নেহাত উপরোধে পড়েই আপন কথা বলতে তিনি রাজি হলেন। নয়ত সাত আট বছরের অন্তরঙ্গ পরিচয় সত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে তাঁকে কোনদিন শুনিনি।

*

ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমার উলপুরের বিশিষ্ট বসু রায়চৌধুরী পরিবারে সুব্রত রায়চৌধুরীর জন্ম। ও'র বাবা গুণেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন। মা লীলাবতী দেবী বিক্রমপুরের বেলতলা গ্রামের মেয়ে। শ্রীরায়চৌধুরীর জন্ম ঢাকায়। বাবার বদলির চাকরি ছিল বলে স্কুল জীবন কেটেছে বিভিন্ন জায়গায়। কখনও হুগলি, কখনও কলকাতা, কখনও চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের সেণ্ট প্ল্যাসিডস স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন দেন ১৯৩৮ সালে। সংস্কৃতে লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

তারপর কলকাতায় এসে আই এ পড়ার জন্য সেনট জেভিয়ার্সে ভরতি হন। সুব্রতবাবুর বাবা ও জেঠামশাই উভয়েই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি গুণেন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগ সঞ্জীবিত হয়েছিল সুব্রতবাবুর মনেও। সেনট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ই সেই অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সুব্রতবাবুর অগ্রজ শুভব্রতও নাট্যকার হিসাবে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

সেনটজেভিয়ার্সে ছাত্র আন্দোলনের বড় পাণ্ডা ছিলেন সুব্রতবাবু। ছাত্র ইউনিয়নের অধিকার নিয়ে ওই কলেজে সে সময় যে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল সুব্রতবাবু তার প্রয়োজক

ছিলেন। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই তিনি সেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স লিটারারি সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন সুব্রতবাবু। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেদিন আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন : ‘কল্যাণীয়েষু, তুমি তোমার সতীর্থদের মনে বাংলা সাহিত্যানুরাগ উদ্বোধনের যে সংকল্প গ্রহণ করেছ তা সফল হয়ে তোমাকে ধন্য করুক এই আমি কামনা করি। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।’

এই কলেজে পড়তে পড়তেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখের সঙ্গে মিলে অনাগত নামে একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনাগত অনাগতই থেকে গিয়েছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিলেন। এবার পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি পেলেন। সেন্ট জেভিয়ার্সে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন। কিছুদিন পরে চলে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ওখানেও তখন ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। সুব্রতবাবু সে আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা হল। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সুব্রতবাবু একজন।

বি এ-তে অর্থনীতি অনার্সে প্রথম শ্রেণী পান। এম এ অর্থনীতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল সুব্রতবাবু ব্যারিস্টার হন। ওঁরও আবাল্য স্বপ্ন ছিল ব্যারিস্টার হবেন। তবে তার আগে—কেমব্রিজ। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রবল যুদ্ধের মধ্যে কেমব্রিজে গিয়ে পৌঁছলেন। ভর্তি হলেন ট্রিনিটি কলেজে। কেমব্রিজের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী কলেজ যার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং অষ্টম হেনরী। যুগের পর যুগ ধরে ট্রিনিটি থেকে বেরিয়েছেন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। আইজাক নিউটন, বায়রন, জহরলাল নেহরু। সুব্রতবাবু ট্রিনিটির ল ট্রাইপসে ভর্তি হলেন।

ল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন সুব্রতবাবু। আজ পর্যন্ত এশিয়ার খুব কম ছাত্রই ল ট্রাইপসে ‘ফারসট ক্লাস’ পেয়েছেন। ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে সম্মানিত করেন ল’এর একজিবিশনার নির্বাচিত করে। এর পর এক বছর কেমব্রিজে গবেষণা। ১৯৪৭ সালে লিংকনস ইন থেকে ফাইন্যাল ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিলেন।

বিলেতে থাকাকালে দুই মনীষীর জীবনদর্শন তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। একজন আয়ার্ল্যাণ্ডের ডি-ভ্যালেরা। ডাবলিনে গিয়ে নেতানায়কের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন নিয়ে কেমব্রিজ মজলিসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সুব্রতবাবু। ডি ভ্যালেরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা। তরুণ তুর্কীদের উপাস্য নায়ক।

আর একজন রাসেল। অধ্যাপক দার্শনিক, চিন্তাবিদ রাসেল। তিনি সেদিন ট্রিনিটির ফেলো। ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে খাচ্ছেন। অন্তরঙ্গভাবে মিশছেন। তাঁর নব্য মানবতাবাদের চিন্তাধারায় উজ্জীবিত করছেন কেমব্রিজের তরুণ প্রাণকে।

ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিয়েই দেশের পথে পা বাড়িয়েছিলেন সুব্রতবাবু। স্বাধীনতার দাবির আকাঙ্ক্ষা একদিন তাঁর কিশোর প্রাণকে মথিত করে তুলেছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে নতুন ভাব বিপ্লবের পুরোভাগে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিলেতে থাকতে লেবর পার্টির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতে ফিরে সমাজবাদী নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। জয়প্রকাশ, রামমনোহর লোহিয়া, আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখ নেতাদের সান্নিধ্যে এলেন তিনি। কলকাতায় হাইকোর্টে নাম ছিল। কিন্তু সেদিন তাঁর চিন্তার অনেকখানি জুড়ে রাজনীতি—সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। ১৯৪৮ সালে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংস্থা থেকে পরিষদ (২৪ চৌরঙ্গী রোডে অফিস ছিল) একটি পত্রিকা প্রকাশ করল : ন্যাশনালাইজেশন অব কোল ইন ইন্ডিয়া।

এই পত্রিকাটির লেখক শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী ও শ্রীজ্যোতি বসু, (সি পি এম নেতা নন)। আচার্য নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন ভূমিকা। ভারতে কয়লাখনি জাতীয়করণ [illegible] ঘটনা। কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারতের বিভিন্ন কয়লাখনি পরিদর্শন করে ১৯৪৮ সালে সুব্রতবাবুরা কয়লাখনি জাতীয়করণের পক্ষে যে সব অকাট্য যুক্তি দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। ওই পত্রিকায় তাঁরা এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে খনি জাতীয়করণের ব্যাপারটি ঝুলিয়ে রাখলে তাতে করে এই শিল্পের ক্ষতি হবে। কিছু কিছু খনির মালিক ইতিমধ্যেই উৎপাদন সাবোতাজ করতে আরম্ভ করেছে। অবিলম্বে সে সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। সুব্রতবাবুরা সেদিন যা আশঙ্কা করেছিলেন কয়লা শিল্পে আজ তা মর্মে মর্মে সত্য হয়েছে। যদিও সফল রাজনৈতিক নেতা হবার মত সব গুণই তাঁর ছিল : পরিচ্ছন্ন উদার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা, গৌরবময় ছাত্রজীবন, সাংগঠনিক ক্ষমতা, বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্য কিন্তু রাজনীতি সুব্রতবাবুকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারেনি। সফল সাংবাদিক হবার গুণও ছিল তাঁর মধ্যে। কেমব্রিজ থেকে ফিরে তিনি স্টেটসম্যানের নিয়মিত লেখক ছিলেন। বোমবাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নালে ক্যালকাটা লেটার লিখেছেন দীর্ঘদিন। বহু আন্তর্জাতিক সংবাদের ভাষ্য করেছেন। তাঁর কেমব্রিজের সহপাঠী জর্জ ভার্গিস তাঁর জেঠতুতো ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু রণজিৎ রায়, দুজনেই উত্তরকালে ভারতের দিকপাল সাংবাদিক হয়েছেন। কিন্তু সাংবাদিকতা থেকেও পরবর্তীকালে সরে এসেছিলেন সুব্রতবাবু। আইন ব্যবসায়ে একান্তভাবে মনোনিবেশ করেছেন। ১৯৪৯ পর্যন্ত সুব্রতবাবুর আইন ব্যবসায় থেকে এক পয়সাও রোজগার ছিল না। দিনগুলি কেটেছে প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বাবাও রিটায়ার করেছেন, থাকেন একান্নবর্তী পরিবারে। কাগজে লেখালেখি করে চুকটাক রোজগার করেন।

এদিকে বিলেত থেকে ফেরার সময় বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন নববধূ শ্রীমতী নোরাকে। ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারের মেয়ে শ্রীমতী নোরা [illegible] সঙ্গে তাঁর আলাপ কেমব্রিজে। জীবন সংগ্রাম ও কৃচ্ছ্রসাধনের সেই দিনগুলিতে এই বিদেশিনী মহিলা [illegible] ধৈর্য ও তিতিক্ষার সঙ্গে সব সহ্য করে স্বামীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছেন। ১৯৪৮ সালে দেশে ফেরার এক বছরের মধ্যে ওঁদের প্রথম সন্তান প্রদীপ ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

১৯৪৮ সালে সুব্রতবাবু বিখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীহেম সান্যালের জুনিয়র হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীসান্যালের কাছে কাজ শিখতে শিখতেই তাঁর পসার জমতে থাকে। শুরু হয় তাঁর আরোহণের কাল। আজ ভারতের সর্বোচ্চ আয়কর দাতাদের তালিকার মধ্যে তাঁর নাম। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীতে আইনের যা বই আছে তার দাম এখন দু লক্ষ টাকার মত।

আন্তর্জাতিক আইন, সংবিধান, ব্যাংকিং ল, শিপিং, ফরেন এক্সচেঞ্জ, কাস্টমস আইনের এইসব শাখায় সুব্রতবাবুর খ্যাতি এখন দেশ জুড়ে।

প্যারিসে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারস অব

কমন্সের সামনে একটি ভারতীয় কোম্পানির হয়ে একটি জার্মান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা লড়েন। সে মামলায় তাঁর ভারতীয় মক্কেলই জিতে ছিল। ১৯৬২ সালে রিজারভ ব্যাঙ্কের হয়ে চীনা ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনের মামলা তিনিই করেছিলেন। আজও তিনি রিজারভ ব্যাঙ্কের রিটেন কাউনসেল।

কেমব্রিজ ল জার্নাল ও লণ্ডনের প্রসিদ্ধ পাবলিক ল পত্রিকার তিনি লেখক। ১৯৬১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চারুচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের ওপর তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মিলিটারি অ্যালায়েন্স অ্যাণ্ড নিউট্রালিটি ইন ওয়ার অ্যানড পিস। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আইনের বিশ্বখ্যাত পত্রিকা ব্রিটিশ ইয়ার বুক অব ইনটার ন্যাশনাল ল-এর পুস্তক সমালোচনার দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন।

১৯৬৫ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সিডনিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কমনওয়েলথ আইন সম্মেলনে সুব্রতবাবু ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। দিল্লিতে চতুর্থ কমনওয়েলথ আইন সম্মেলনেও সুব্রতবাবু আমন্ত্রিত হয়ে প্লেনারি সেসনে বক্তৃতা দেন। দামাসকাস ও সোফিয়ার আন্তর্জাতিক আইন সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদল সুব্রতবাবু ছিলেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টিভিতে তিনি জার্মান শান্তি চুক্তির ওপর বক্তৃতা করেন। আন্তর্জাতিক ল অ্যাসোসিয়েশনের ভারতীয় আঞ্চলিক পরিষদ রাষ্ট্র সংঘের সনদ পরীক্ষার জন্য যে কমিটি করেছেন সুব্রতবাবু তার চেয়ারম্যান। তিনি ইণ্ডিয়ান ল ফাউনডেশনের গভর্নিং বডি ও ইণ্ডিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশনের গভর্নিং কাউনসিলের অন্যতম সদস্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সুব্রতবাবুর গভীর যোগাযোগ সর্বজনবিদিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাড়িতে দিনের পর দিন মুক্তিযোদ্ধারা থেকেছেন খেয়েছেন, পরামর্শ করেছেন। বেশ মনে আছে মুক্তিযুদ্ধ কভার করার সময় কৃষ্ণনগরে কুষ্টিয়া জেলার কোন এক কলেজের অধ্যক্ষকে দেখেছিলাম সব ছেড়ে এক প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এখানে কাউকে চেনেন না, জানেন না। হাতে একটা পয়সা নেই। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। সে ঘটনার এক মাস পরে সুব্রতবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি ওই অধ্যক্ষ বসে। বললেন, আমি এখন এ বাড়িতেই থাকি। তখন তিনি নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। এমনও হয়েছে, বহু লোক দিনের পর দিন থেকে গেছেন তাঁর বাড়িতে অথচ তাঁর সঙ্গে তাঁদের দেখাও হয়নি। এখনও ঢাকা গেলে কেউ কেউ সকৃতজ্ঞচিত্তে বলেন, আমরা চিনতে পারছেন না দাদা, আপনার বাড়িতে এতদিন কাটিয়ে এলাম। সুব্রতবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান।

বাংলাদেশের যুদ্ধবন্দীদের বিচার করা যে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে স্বীকৃত সেই তথ্য প্রচুর প্রমাণ সহকারে বিশ্বের সামনে প্রথম উপস্থিত করেন সুব্রতবাবু। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে তিনি অনেক বড় বড় মামলা ফিরিয়ে দিয়ে বই লিখতে বসেছিলেন। ভারত, লণ্ডন ও আমেরিকা থেকে তাঁর সেই প্রামাণ্য বই প্রকাশিত হয়েছে দি জেনোসাইড অব বাংলাদেশ। বাংলা সংস্করণ এখন প্রকাশিত হবে ঢাকা বাংলা আকাদেমি থেকে। এই গ্রন্থে তিনি পাকিস্তান সৈন্যদের বিরুদ্ধে ২০ দফা চারজ শীট তৈরি করেছেন এবং আন্তর্জাতিক আইনের কোন কোন ধারা অনুসারে সেগুলিকে যুদ্ধ অপরাধ হিসাবে গণ্য করা যায় তা দেখিয়েছেন। দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে গ্রন্থখানি।

*

ব্যক্তিগত জীবনে সুব্রতবাবু শিশুর মত সরল, অমায়িক। যে কোন মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারেন। আমার মত আইনের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ লোকের সঙ্গেও তিনি আইন আর সংবিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমার যেখানে বক্তব্য ছিল, জুডিশিয়ারির একমাত্র কমিটমেনট থাকা উচিত দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি, নইলে শাসকদের ধ্যানধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে যাওয়াটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

এই প্রসঙ্গে সুব্রতবাবুর অভিমত হল যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক লক্ষ্য। সেই অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ রেখেই বিচারকেরা বিশ্লেষণ করবেন কোন বিশেষ আইন।

: রাজনীতি আর আপনাকে আকর্ষণ করে না?

আমার প্রশ্নটা শুনে সুব্রতবাবু একটু ভাবলেন। তারপর বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলেন, দ্যাখো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা নিশ্চয়ই আমাকে আলোড়িত করে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার মত যোগ্যতা আমি এখনও অর্জন করতে পারিনি। অবশ্য আমার অনেক বন্ধুই আমাকে রাজনীতিতে টানবার চেষ্টা করেছেন। গণজীবনের সঙ্গে আদর্শ ও মানসিকতায় যেদিন একাত্মবোধ অনুভব করতে পারব সেদিনই রাজনীতিতে আবার যেতে পারি। তবে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা কী জান, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপনার চাকরি। —যদি পাই, তাহলে আমার জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

উদয়শঙ্কর প্যারিসে যেমন বিষ্ণুদাস শিরালীকে বলেছিল তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে সেইরকম সিমকীকেও বলে এসেছিল, "তুমিও অপেক্ষা করে থাক। যখন নিজের দল নিয়ে আবার ফিরে আসব এখানে, তখন তুমিও যোগ দেবে আমাদের দলে।"

কয়েক সপ্তাহ পরে উদয়শঙ্করের জাহাজ 'দি গ্যাঞ্জেস' নোঙর ফেলল বোম্বাই বন্দরে। তার সঙ্গে রয়েছেন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পপতির কন্যা অ্যালিস বোনার। তিনিই দিয়েছেন উদয়শঙ্করকে গুরু দায়িত্বের ভার—নিজস্ব একটি নৃত্যদল গঠন করতে হবে।

প্রায় সুদীর্ঘ দশ বছর ইউরোপে অতিবাহিত করে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এল উদয়শঙ্কর। বোম্বাই-এর সেই সমুদ্র-তীর। সেই ভারতবর্ষের প্রবেশ-তোরণ! ছেলেমানুষের মতন উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে উদয়শঙ্কর।

আস্তে আস্তে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে বন্দরের দিকে। দূর থেকে উদয়শঙ্কর মাটি দেখছে, বন্দরে দেখছে মানুষের ভিড়। দেখছে কত দৃশ্য। সব তার চেনা। কিন্তু সবই যেন নতুন নতুন। তার সঙ্গে যে-দেশ দেখতে এসেছেন শ্রীমতী বোনার, জাহাজ থেকে সে-দেশের টুকরো টুকরো মধুর দৃশ্য উদয়শঙ্করও যেন দেখে নেয় এখন নতুন আগন্তুকের মতন।

কিন্তু তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে, এই দীর্ঘ দশ বছরে ভিতরে ভিতরে কি সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের। বাইরের দৃশ্যাবলী—নদনদী গিরি কান্তার, মিনার প্রাসাদ তাজমহল যত সুন্দরই হোক—ভিতরে ধিকধিক করছে বিরাট অগ্নিকুণ্ড কন্যাকুমারিকা থেকে হিমাচল অবধি।

এক দিকে যেমন দেশবাসীর উপর দিনে দিনে নৃশংস হয়ে উঠছে বিদেশী শাসকের অত্যাচার, জীবনপণ করে তেমন এগিয়ে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, পণ্ডিত জওহরলাল, বাংলার বীর সন্তান অতিতরুণ সুভাষচন্দ্র, আরও বহু দেশপ্রেমিক এবং অসংখ্য তরুণ-তরুণী পরাধীনতার নাগপাশ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে।

১৯২০ সালে যখন ভারতবর্ষের বন্দর ছেড়ে যায় উদয়শঙ্করের জাহাজ তখন সদ্য লোকান্তরিত হয়েছেন লোকমান্য তিলক। পরের বছর শুরু হল দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। হল চাঁদপুরে কুলি হাঙ্গামা। ব্রিটিশের শোষণনীতি তখন করাল রূপ ধারণ করেছে। চা-বাগানের নিরীহ কুলিদের ওপর চলেছিল নীলচাষীদের মতন নির্মম অত্যাচার। অতিষ্ঠ হয়ে গৃহে ফেরার জন্যে তারা যখন ব্যাকুল তখন চলল লাথি, গুলি এবং বেয়নেটের খোঁচায় মৃত্যু হল গর্ভবতী রমণীর। চাঁদপুরে আবার সংঘটিত হল জালিয়ানওয়ালাবাগের মতন নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

আরও কয়েক বছর পরে বীরবিক্রমে প্রথম কারাবরণ করলেন নির্ভীক সুভাষচন্দ্র। ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে হল গুরুত্বপূর্ণ নিখিল ভারত কংগ্রেসের

তরুণ বয়সে উদয়শঙ্কর
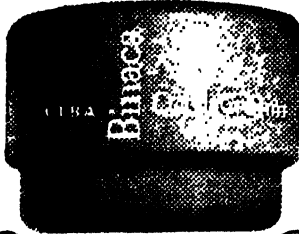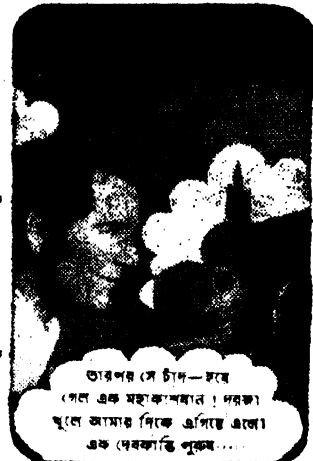
আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর…
বিম্বাকা কোল্ড ক্রীম তখন
সেই স্বপ্নকে সত্যি করে
তোলার জন্যে আপনার ত্বকের
গভীরে কাজে ব্যস্ত।
রোজকার মত সে রাতেও বিম্বাকা কোল্ড ক্রীম দিয়ে আমার মুখ পরিষ্কার করলাম, কারণ এ ত্বকের গভীরে পৌঁছে লুকোনো ময়লা বার করে আনে। ঘুমোনোর আগে আরেকটু মাখলাম।
মুখখানা এমন স্নিগ্ধ আর পরিষ্কার অনুভব করলাম যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো— গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম।
স্বপ্ন দেখলাম এক অন্তহীন রুপোলী সাগরের ওপর দিয়ে চলেছি আমি… তুষার শুভ্র চাঁদ আমার দিকে এগিয়ে এলো…কাছে থেকে আরো কাছে…
তারপর সে চাঁদ—হয়ে গেল এক মহাকাশযান! দরজা খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলো এক দেবকান্তি পুরুষ….
আমাকে সে টেনে নিলো তার কাছে। আমার মুখখানা দুহাতে ধরে বললে, "আজ পর্যন্ত বহু সুন্দরী দেখেছি…তুমি তার মধ্যে সেরা সুন্দরী।"
ঘুম ভেঙে নিজেই দেখলাম—আমার ত্বক সত্যিই শিশির-কোমল মোলায়েম হয়ে উঠেছে। শুধু স্বপ্ন নয় আমি সত্যিই সুন্দরী।

অধিবেশন। উন্মুক্ত প্রান্তরে কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম।

সে-বছর সুভাষচন্দ্রের যোদ্ধবেশ প্রথম দেখেছিল দেশবাসী। আগে আগে চলেছেন অশ্বারোহী সুভাষচন্দ্র। সৈনিকের বেশ তাঁর পরনে। মাথায় টুপি, দু হাতে অশ্ববল্গা। পিছনে বহু অশ্বসজ্জিত কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরুর রথ—চলেছে পার্ক সার্কাস ময়দানের দিকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র।

সেদিন কলকাতার রাজপথের উপর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভ্রুতে-সৈনিকের এই রাজকীয় রূপ যারা দেখেছিল তারাও প্রস্তুত হয়েছিল সংগ্রামের জন্যে, অনুপ্রাণিত হয়েছিল বীরত্বের মন্ত্রে।

স্বায়ত্তশাসন নিয়ে তখন চলেছে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অসন্তোষের আগুন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি জহরলাল স্পষ্টই ঘোষণা করলেন, "we have had much controversy about independence and dominion status and we had quarrelled about words. But the real thing is the conquest of power by whatever name it may be called. I do not think that any form of dominion status applicable to India will give us any power."

সে-বছর প্রথম স্থির করা হল যে, প্রতি ছাব্বিশে জানুয়ারি পালন করা হবে স্বাধীনতা দিবস।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি তরুণ দলের দুর্বার শক্তিকে আর দমন করে রাখতে পারছিল না। বিদেশী শাসকের নৃশংসতার প্রতিবাদ তারা জানাতে লাগল হিংসাত্মক আক্রমণে। জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন-হরিকথণ্ডের মতন যেসব বাংলার সন্তান, ব্রিটিশ সরকার তাদের নাম দিল টেররিস্ট। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা যে, বহু বাঙালী ও বাংলা সংবাদপত্র এই আখ্যার হুবহু অনুবাদ করে তাদের বলল সন্ত্রাসবাদী।

ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন-হরিকথণ্ডের মতন বাংলার অসংখ্য বীর সন্তান কাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল? 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি এদের উদ্দেশে ব্যবহার করবার আগে কোন বাঙালী সাংবাদিক কেন দ্বিধা করেননি—সেটাই আশ্চর্যের কথা।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে যে ঘনঘটা, যে-বিদ্যুৎঝলকানি, বজ্রের যে মুহুর্মুহু ডমরুগর্জন তার ছায়া পড়ল সাহিত্যে। দেশপ্রেমিকের উপর শাসকের অত্যাচারের মাত্রাধিক্য এবং নিরীহ নিষ্পেষিত মানুষের আর্তনাদে ব্যথিত হলেন রবীন্দ্রনাথ।

"আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট
রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের
অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে
ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল
মাথা কুটে॥"

শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'পথের দাবী'। বিদ্রোহী কবি নজরুল পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সংগ্রামী তরুণ দলের। তাঁর অগ্নি-লেখনী-নিঃসৃত এক-একটি গান, এক-একটি কবিতা শাণিত তরবারির মতন ঝকমক করে উঠছে। দৃঢ়তর হচ্ছে স্বাধীনতা-সৈনিকের মনোবল।

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের
করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল
কান্ডারী হুঁশিয়ার॥"

তখন গ্রামোফোন রেকর্ডেও ঘন ঘন প্রকাশিত হচ্ছে দেশাত্মবোধক গান—"স্বদেশ আমার, জননী আমার, আমি কি গাহিব তোমারই গান—" কিংবা "বংগ মা তোর শ্যামল গায়ে বাদল ঝরে দিন রজনী—" তরুণ সংগীতশিল্পী ধীরেন দাসের নতুন স্বাদের এক-একটি গান বারবার গ্রামোফোনে বাজত বাঙালীর ঘরে ঘরে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হলেও বাংলার শিল্পক্ষেত্রে তখন নতুন সম্ভাবনার স্পষ্ট ইঙ্গিতে উজ্জ্বল। রঙ্গমঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাট শিশিরকুমার। তাঁর সদলবলে আমেরিকা সফরের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। এদিকে ছবির নির্বাক যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে সবাক ছবি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছায়াচিত্র নায়ক সুদর্শন নট দুর্গাদাস।

সংগীতজগতে কৃষ্ণচন্দ্র দে সুপ্রতিষ্ঠিত। কে মল্লিক ও হরেন্দ্রনাথ দত্তর প্রায় সময়-সময় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে চলেছেন দিনু ঠাকুর, সাহানা দেবী, কনক দাস, সতী দেবী, অমলা দাশ এবং আরও কয়েকজন গায়ক-গায়িকা।

ভারতবর্ষের এই চরম সন্ধিক্ষণে, দুর্যোগের মহালগ্নে এবং সংগ্রাম ও অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের আলো-অন্ধকারে দীর্ঘ প্রবাস বাসের পর ফিরে এল উদয়শংকর। এল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে। গান নয়, অভিনয় নয়—তার অঙ্গে অঙ্গে সে বাজাবে বাঁশি। কলকাতার মানুষের কাছে উদয়শংকরের প্রথম উদয় সূর্যোদয়ের মতনই আলোকময়। কিন্তু এখন নয়। আর অল্প পরে। তার আগে আরও কিছু আছে।

অ্যালিস বোনারকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই থেকে উদয়শংকর এল কাশীতে। হেমাঙ্গিনী

বিষ্ণুদাস শিরালী

দেবী তখন ছিলেন বাঙালীটোলার বাড়িতে। পণ্ডিত শ্যামশংকর ভারতের বাইরে। অ্যালিস বোনার হোটেলে উঠলেন। নতুন দেশ, নতুন নিয়ম-কানুন তাই উদয়শংকরও থাকল সেই হোটেলে শ্রীমতী বোনারকে সাহায্য করবার জন্যে।

এত বছর পর উদয়শংকরকে দেখে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল হেমাঙ্গিনী দেবীর চোখ থেকে। তার সেই খোকা তার কাছে ফিরে এসেছে আবার। খোকা বেশ নাম করেছে বিদেশে। এখন তাকে চেনে কত লোক। যেন ছোট একটি ছেলে মনে করেই হেমাঙ্গিনী দেবী কাছে টেনে নিলেন উদয়শংকরকে।

মাকে দেখতে দেখতে উদয়শঙ্করের মনে হল তিনি যেন বেশ রোগা হয়ে গেছেন। রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর কত বড় হয়েছে। আর সেই ছোট্ট রবিশঙ্কর—উদয়শঙ্করের বিদেশ যাত্রার মাত্র কয়েক মাস আগে যার জন্ম হল—তাকে তো চিনতেই পারে না সে।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে বেশী দেরি হল না উদয়শঙ্করের। বিদেশে সে যতই নাম করুক, দেশে ফিরুক একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে—তার শিল্প যেন অতি নিকৃষ্ট

পর্যায়ের। নর্তক হিসেবে উদয়শংকরের খ্যাতি তার পরিবারের অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি।

কাশী থেকেই উদয়শংকর অ্যালিস বোনারের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রদেশের রাজা-মহারাজাকে চিঠি লিখল তাঁদের রাজ্য পরিভ্রমণের ইচ্ছায়। উত্তর এল যথাসময়ে। রাজা-মহারাজারা তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

এর মধ্যে অতি প্রাচীন শহর বারাণসী দেখা হয়ে গেছে শ্রীমতী বোনারের। উদয়শংকর একা নয়, তার সঙ্গে ঘুরেছেন তার ভাইরা, তার মা। একদিন কাশীর হোটেলে শ্রীমতী বোনারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উদয়শংকর শুনল রাস্তা থেকে থেমে থেমে ভেসে আসছে বড় মধুর শব্দ।

একটা লোক বাইরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সম্ভবত মিউনিসিপ্যালিটির কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে চলেছিল। তার ঢোলের আওয়াজ শুনে উৎসাহী হয়ে তাকে হোটেলের ভেতরে ডেকে পাঠাল উদয়শংকর।

ঢোলটা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখল উদয়শংকর। খুব ছোট। উদয়শংকর বাজাল। অদ্ভুত মিষ্টি শব্দ। সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "কত দাম তোমার এ ঢোলের?"

লোকটা কিছু বলবার আগে হোটেলের এক ভৃত্য বলল, "কত আর দাম হবে সাহেব, চার আনা-আট আনা হবে।"

উদয়শংকর জিজ্ঞেস করল, "বিক্রি করবে এটা আমার কাছে?"

লোকটা ইতস্তত করছিল। তার ঢ্যাঁড়া পেটানো এখনো শেষ হয়নি। হোটেলের ভৃত্য তাকে বলল, "আরে সাহেব চাচ্ছেন, দিয়ে দাও না হে। তুমি আর একটা কিনে নিও।"

সেই ছোট মাটির তৈরি ঢোল উদয়শংকর কিনে নিল এক টাকায়।

ঐকতান না থাকলে নৃত্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। উদয়শংকর কিছু দিন ধরেই মনে মনে চিন্তা করছিল নতুন ধরনের সুর-সংযোগের কথা। তার নৃত্যদলে কোন বিদেশী বাদ্যযন্ত্র বাজবে না। সব যন্ত্রই হবে প্রকৃত ভারতীয়। তাই তার শ্রবণ উৎকর্ণ, চোখ অনুসন্ধিৎসু।

অ্যালিস বোনারের সঙ্গে প্রায় সারা ভারত পরিভ্রমণ করতে লাগল উদয়শংকর। ভারতবর্ষের যে-সম্পদ, প্রকৃতির যে-রূপ—যার কথা সে বইতে পড়েছিল, লোকের মুখে শুনেছিল—এখন সে তা দেখল নিজের চোখে। দেখল আর অবাক হল। তার মনে হল, কি বিপুল সম্পদের অধিকারিণী তার জন্মভূমি ভারতবর্ষ!

এক সময় বরোদার রাজ-অতিথি হয়ে শ্রীমতী বোনারকে নিয়ে বরোদায় এল উদয়শংকর। রাজার পাঠাগার অতি বিরাট। নানা শাস্ত্রের বড় বড় বই সযত্নে সংরক্ষিত আছে এখানে। উদয়শংকর পাঠাগারে প্রবেশ করে বই নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। সঙ্গীত-শাস্ত্রের ওপরও হয়তো কোন বই-এর সন্ধান এখানে পাওয়া যেতে পারে।

লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ এক মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। তিনি একটি বই খুঁজে দিলেন উদয়শংকরকে। যত রকম ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে, ছবি সমেত প্রায় সব কটির বর্ণনা আছে এই গ্রন্থে। বইটি দেখতে দেখতে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা দেখে অবাক হয়ে গেল উদয়শংকর।

সে পড়ল, ঢোল আছে প্রায় দু শো আশি রকমের। তারের বাদ্যযন্ত্র আছে ষাট রকমের। ফুঁ দিয়ে যা বাজাতে হয়, অর্থাৎ বাঁশি জাতীয় বাদ্য আছে আশি-নব্বুই রকম। তা ছাড়া খোল-করতাল জাতীয় বাদ্য আছে তিরিশ-চল্লিশ রকম।

বরোদা রাজপ্রাসাদের পাঠাগারে বসে অদ্ভুত এক আবিষ্কারের আনন্দে উদয়শংকরের মন ভরে গেল। সে যেন সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। যতখানি সম্ভব, সে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে নানা রকম ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র।

অ্যালিস বোনারের সঙ্গে সারা ভারত পরিভ্রমণ করবার সময় উদয়শংকর তার একমাত্র নৃত্যগুরু শংকরন নাম্বোদ্রীকে প্রথম দেখে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপ্রাসাদে এক নৃত্যের অনুষ্ঠানে। তাঁদের সংবর্ধনার জন্যেই ত্রিবাঙ্কুরের রাজা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

মহাভারতের একাংশ—সম্ভবত দুঃশাসন বধ প্রদর্শিত হচ্ছিল নৃত্যে। উদয়শংকর লক্ষ করল, এই নৃত্যশিল্পীর অভিব্যক্তি অপূর্ব, তার ভঙ্গি অদ্ভুত এবং তার কথকলি মুদ্রার কোন তুলনা হয় না। উদয়শংকর মন্ত্রমুগ্ধের মতন দেখতে লাগল তার নৃত্য।

যত নৃত্যগুরু অংশ গ্রহণ করেছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজপ্রাসাদের সেই নৃত্য-অনুষ্ঠানে, পরদিন প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় হল উদয়শংকরের রাজভোজের আসরে।

গুরু শংকরন নাম্বোদ্রীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করল উদয়শংকর। করে বলল, "আমি আপনাকেই আমার নৃত্যগুরু বলে গ্রহণ করতে চাই। কথা দিন, আপনি আমাকে শেখাবেন?"

উদয়শংকরের বিনীত প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন গুরু শংকরন নাম্বোদ্রী। এবং তিনি তাকে কথা দিলেন, যখনই সে তাঁকে ডাকবে তখনই তিনি সাড়া দেবেন তার ডাকে।

ভারত পরিভ্রমণ শেষ করার কিছু পরে এই কলকাতায় এল উদয়শংকর। একটা ফ্ল্যাট নেওয়া হল পার্ক স্ট্রীটে। অ্যালিস বোনারও উঠলেন সেই ফ্ল্যাটে। বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হলেও বড় বড় হোটেলে দিন যাপন করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার বিপক্ষে ছিলেন শ্রীমতী বোনার।

তিনি বলতেন, "তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি, তা-ই দেখব ভাল করে। বড় বড় হোটেলে থেকে বেশী টাকা খরচ করে লাভ কি! সেই টাকায় আরও কত দেখা যায়!"

কলকাতা শহরের ছায়া-ছায়া এক রাস্তায় একটি দৃশ্য বেশ অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ চোখে দেখেছিলেন শ্রীমতী বোনার। ক্লান্ত এক ঝাঁকা-মুটে হাত-পা গুটিয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে তার ঝাঁকার মধ্যেই।

সে দৃশ্য দেখে শ্রীমতী বোনার বললেন উদয়শংকরকে, "কি সুখী লোক, দেখ শংকর! কত কম ওর চাওয়া!"

এই অল্পকালের মধ্যেই প্রতিভাময়ী বিদেশিনী নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছেন ভারতবর্ষের সঙ্গে। তিনি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন এই মহান দেশের শাশ্বত বাণী। নিসর্গের অপার সৌন্দর্য বারবার অনুরণন তুলেছে তাঁর শিল্পী-মনে।

উদয়শংকরের জন্মস্থান উদয়পুরের রূপ দেখে তিনি উক্তি করেছিলেন, "শংকর, এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে তোমার জন্ম হয়েছে বলেই বোধ হয় গড়ে উঠেছে তোমার শিল্পী-মন।"

যখন যেখানে গেছেন শ্রীমতী বোনার, সবখানেই মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় তিনি এঁকেছেন অসংখ্য স্কেচ। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ভারতীয় মেয়েদের দেখে। অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন তাদের সাজসজ্জার।

বিস্মিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী বোনার বলেছেন, "পৃথিবীর কোথাও এত রূপ, এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি, এমন সুন্দর বেশ আমি আর দেখিনি শংকর!"

কিন্তু এখনো উদয়শংকরের আসল কাজ বাকি। বিদেশে তার কিছু কিছু নাম হয়েছে বটে, কিন্তু তার নিজের দেশে সে তো একেবারেই অপরিচিত। বিদেশে দু-একজন রাজা-মহারাজা বলেছিলেন, ভারতবর্ষে ফেরার পর তাঁরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন—কিন্তু কি সাহায্য করবেন তাঁরা তাকে? প্রমোদ পরিবেশনের ক্ষমতা কি সকলের থাকে?

উদয়শংকর ঈষৎ বিব্রত হয়ে পড়ে। এ সময় কলকাতায় তার নৃত্যের একটা একক অনুষ্ঠান করতে পারলে সব দিক থেকে ভাল হতো। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? তার নিজের দেশেই এখন সে প্রবাসীর মতন।

কে তাকে উপস্থিত করবে দর্শকদের সামনে—সুযোগ দেবে নিজের পরিচয় দেওয়ার?

(ক্রমশ)

ব্রেকফাস্টে চাই নেস্‌কাফে

কাজে ঠাসা সারাটা দিন
শুরু হবার আগের
আলস্য মধুর
কয়েকটা মুহূর্ত।
মোহ কিছুতেই কাটে না
কাটে না পছন্দসই
এক কাপ কফির আকর্ষণ।
নেস্‌কাফে · উষ্ণ,
প্রাণরসে ভরপুর।

ব্রেকফাস্টের জন্য
এমন চমৎকার পানীয়
সারা পৃথিবীতে আর নেই।

সব সময়েই লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেস্‌কাফে

ACIL—114

বিশ্ববিজ্ঞান

এদেশে

মানসিক রোগের চিকিৎসা এখনও অবহেলিত

১৯৭১ সালে নতুন দিল্লীতে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার এক আলোচনাচক্রে ভারতের একজন বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক মন্তব্য করেছিলেন : এ দেশের যে কোন শহরেই দেখতে পাবেন ঠিক ঘর ছাড়া গরুর মত কিছু সংখ্যক উন্মাদ-রোগী ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। কিছুটা চৌর্যবৃত্তি তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভিক্ষে—একমাত্র এই তাদের জীবিকা। সারা ভারতে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। চিকিৎসার কোন সুযোগ এরা কখনই পায়নি। এ ছাড়া অবম-মান বা সাব-নরম্যাল মন নিয়ে নিয়ত বঞ্চিতের জীবন যারা যাপন করছে তাদেরও সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষেরই মত। এবং উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দীর্ঘমেয়াদী মৃগী রোগে ভুগছে প্রায় ২০ লক্ষের মত স্ত্রী এবং পুরুষ। বলা বাহুল্য, এ হিসেব শহর, আধা-শহর এবং অগ্রসর-গ্রামের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরও ব্যাপক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিসেব করলে তালিকা হয়ত আরও দীর্ঘতর হবে। শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও মানসিক রোগ এখন ক্রমপ্রসারমান। এই সব রোগী আর পাঁচটি স্বাভাবিক পরিবারের একজন হয়েও শুধু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় অবহেলিত এবং কখনও কখনও পরিত্যক্তের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের চিকিৎসার কোন সুষ্ঠু সুযোগ এখনও এদেশে গড়ে ওঠেনি। ঠিক কী কী কারণে এদেশে মনের রোগীর সংখ্যা এত বাড়ছে, ওই সব রোগীর মনসিকতার যথাযথ বিচার অথবা, যে সব মানসিক রোগীর চিকিৎসা চলছে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি ঠিক পথে চলছে কি না, এ সব অনুসন্ধান করার মত বিজ্ঞানসম্মত কোন পরিকল্পনাই এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

'এবং, তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার' জনৈক বিজ্ঞানীর মন্তব্য, 'চিকিৎসার পর একজন মানসিক রোগীর পুনর্বাসনের ব্যাপারে সবাই এখনও পর্যন্ত নির্বিকার।'

অথচ আধুনিক মনোচিকিৎসকদের মতে, তথাকথিত চিকিৎসার পর একজন মনের রোগীর আসল চিকিৎসা হয় তার বাড়িতে তার পারিপার্শ্বিকতায়, তার সমাজের মধ্যে। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই, একজন ইঞ্জিনিয়ার একটি ভেঙে-পড়া বাড়িকে সারিয়ে দিলেও সেই বাড়িকে বাসোপযোগী করে রাখার দায়িত্ব যেমন অন্যের হাতে বর্তায়, মানসিক রোগীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা তাই। সমাজের পাঁচজনের আন্তরিকতা এবং

এক নজরে
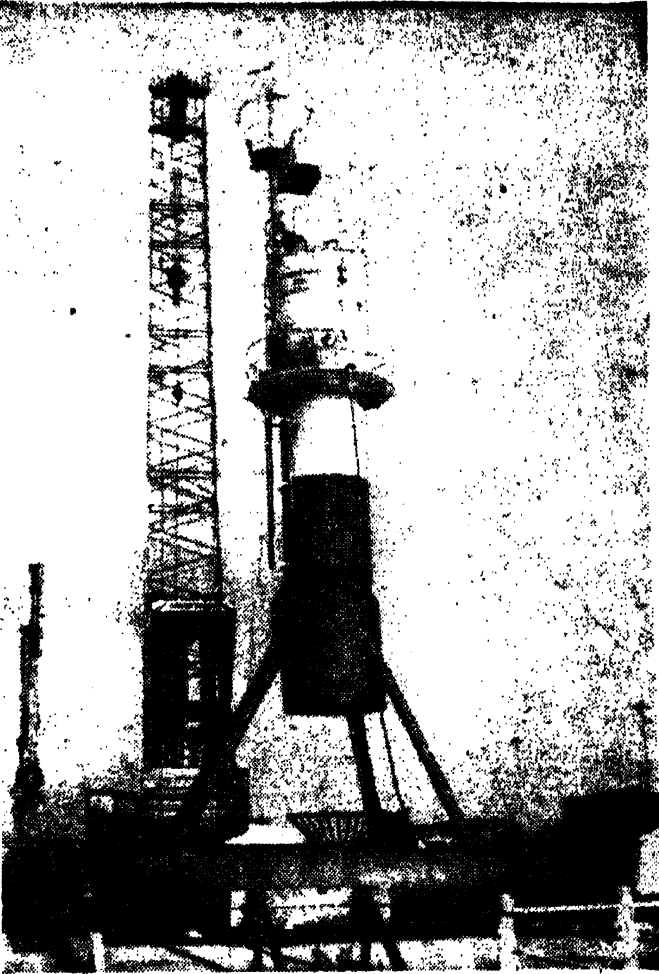
না, উৎক্ষেপণ মঞ্চের ওপর কোন রকেট বসান হচ্ছে না। আসলে এটি বিশেষ ধরনের একটি 'বয়া'। তৈরি করেছেন পশ্চিম জার্মানির কুশলীরা। এটির উচ্চতা ২৪ মিটার। ব্যাস ১০ মিটার। ওজন ৩০ টন। উত্তর সাগরের হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপের কাছে কোন একটি জায়গায় সমুদ্রে ভাসানর জন্যে এটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে ভাসমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই 'বয়া' জোয়ারজনিত প্লাবনের পূর্বাভাষ জানাবে। এ ছাড়া এর মধ্যেকার নানা রকম স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি থেকে জানা যাবে হেলিগোল্যাণ্ডের পরিমণ্ডলে প্রবাহিত বাতাসের গতি, গতিমুখ, বায়ুদূষিত করণের উপর নানা রকম তথ্য। প্রথম ছয় মাস বয়াটি ঠিকমত কাজ করলে পশ্চিম জার্মান সরকার আরও সাতটি এ ধরনের বয়া স্থাপনের কাজে হাত দেবেন এবং তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ওই বয়াগুলির সাহায্যে আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণা চালানর সুযোগ পাবেন। উল্লেখ্য, প্রথম বয়াটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে ২৫ লক্ষ মার্ক।

সহানুভূতিই সে ধরনের রোগীর জোড়া-লাগা মনটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে তুলতে পারে।

কী ধরনের মানসিক রোগী বাড়ছে?

জনৈক মনোচিকিৎসকের উত্তর : ম্যানিয়া এবং ডিপ্রেসন। প্রথমটির ক্ষেত্রে মানুষের আচরণে অস্থিরতা ধরা পড়ে। সব সময় খুঁত খুঁত ভাব। আত্মবিশ্বাসের অভাব, নিজের এবং অপরের প্রতি অনাস্থা, খিটখিটে স্বভাব ইত্যাদি সাধারণ উপসর্গ। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আচরণে সব সময় যেন অবদমিত স্বভাব। যেন মনে হয়, পৃথিবীর এই গতিশীল চঞ্চল পরিবেশে যেখানে প্রাণপ্রাচুর্য, অপার আনন্দ, সেখানে শুধু সেই মানুষটি, যে 'ডিপ্রেসনে' ভুগছে, একমাত্র সে-ই পরিত্যক্ত। আর পাঁচ জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রচলিত ধারণার মাপকাঠিতে বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে, সত্যিই সে একজন কৃতী মানুষ, সমাজে সে প্রতিষ্ঠিত, বৃত্তিতে পারঙ্গম এবং ইত্যাদি। তবু মনে হয়, সে পৃথিবীর এই গতিশীল ভূমিকায় একজন স্থবির নায়ক। পাথরের মত নিষ্প্রাণ। আসল কথা এই, সব কিছুতেই একটা মন-মরা ভাব, নিস্পৃহা। —এই হল ডিপ্রেসন বা অবদমিত মানসিকতার মানুষ।

'মুশকিল এই, এ ধরনের রোগীর রোগ নির্ণয় অত্যন্ত শক্ত কাজ।' বলেছেন আর একজন বিশেষজ্ঞ।

'হ্যাঁ, গোড়ায় আপনি ধরতে পারবেন না, আসল গোলমালটা কোথায়। হয়ত সাধারণ রোগীর মতই সে আসবে। সাধারণ রোগীর মতই হয়ত সে বলবে, ডাক্তারবাবু, মন মেজাজ খুব খারাপ যাচ্ছে। ঘুম হচ্ছে না। ভাল লাগছে না কিছু। হয়ত সে এমন কথাও বলতে পারে, তার সব সময় নাকি মাথা ধরে থাকে। অথবা কোন কোন শারীরিক উপসর্গ।'

'গোলমাল এখানেই।' আর একজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য। 'পরোক্ষ এই সব উপসর্গ দেখে সাধারণ চিকিৎসকরা এ ধরনের রোগীদের নানা রকম ওষুধ দিয়ে থাকেন। কেউ হয়ত সত্যিই মাথা ধরার ওষুধ দিলেন। অথবা পেট ব্যথার। অনেক সময় অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধও দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ এর সব কিছুই হয় অন্ধকারে আন্দাজের ওপর পা বাড়ান। এবং এ সব করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় রোগ সারান তো দূরের কথা, বরং রোগটিকে আরও পাকিয়ে তোলা হয়।'

এ সব করতে গিয়ে চিকিৎসকরা কোন কোন ক্ষেত্রে যে কী ধরনের দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, সম্প্রতি কলকাতার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যাবে।

ভদ্রলোক বললেন, কিছুদিন আগে বছর আঠারোর একটি ছেলেকে কলকাতার কোন

ভারতের কোন কারখানার এই শ্রমিকটি একদিন শক্ত পায়ে চলা ফেরা করত, শক্ত হাতে কাজ করত। সমাজে তার পরিচয় ছিল সে আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ বন্ধু। এখন সে জটিল মানসিক রোগের শিকার। সে নির্বান্ধব। তার সুস্থ পুনর্বাসন এখন অনিশ্চিত

একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে আনা হয়। ছেলেটির বাবা বললেন, কোন খাবারই তার ছেলে পেটে রাখতে পারছে না। যা খায়, তা-ই বমি করে ফেলে।

চিকিৎসক প্রথমে শুরু করলেন হজমের চিকিৎসা। কোন লাভ হল না। বরং নতুন একটি উপসর্গ দেখা দিল। তার সব সময়ই নাকি মাথা ধরে। চিকিৎসক এবার মাথা ধরার চিকিৎসা শুরু করলেন। তার কিছুদিন পরই দেখা গেল চঞ্চল সেই ছেলেটি হঠাৎ অদ্ভুত রকমের শান্ত হয়ে উঠেছে। কথা কম বলে। বরং মাঝে মাঝে রেগে যায় এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বাবা এবার চিকিৎসক পাল্টালেন। একবার নয়। পর পর। এবং প্রত্যেকবারই এলোপাতাড়ি আন্দাজী-চিকিৎসা। শেষের দিকে ছেলেটিকে প্রচুর পরিমাণ ঘুমের ওষুধ খাওয়ান হয়। ফলে তার কিডনি বা মূত্র-গ্রন্থি বিকল হতে শুরু করে। ছেলেটি শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

ভদ্রলোক বললেন, মুশকিল কি জানেন? রোগটি কতখানি মনের, কতখানি স্থূল শরীরবৃত্তীয়—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে সব যাচাই না করে কেন যে অত বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দেওয়া হল, জানি না। আসল কথা এই। যে কোন রোগীর মানসিকতায় ভারসাম্যের অভাব দেখে চিকিৎসা শুরু করার আগে যতদূর সম্ভব বুঝে নিতে হবে ওই অবস্থাটির যথাযথ কারণটি কী হতে পারে।

✻

সমস্যা এখানেই। কারণ মানসিক রোগ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ওই সব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে মানসিক রোগের মোট মূর্তি যে সমস্ত কারণ দাঁড় করান হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম : এক, সামাজিক কারণ। যেমন ধরুন, বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন সামাজিক পরিবেশে এসে নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ওই সমাজের বিশেষ ধরনের রীতি নীতি, সেখানকার মানুষের বিশেষ ধরনের অভ্যাস বা আচরণে নিজে অভ্যস্থ না হওয়ায় বা অপরিচিত হওয়ার নিজস্ব ব্যক্তিমনে দৈনন্দিন যে সংঘাতের ঝড়, সেই ঝড়ই শেষ পর্যন্ত তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। দুই, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা সম্ভব। এটা দুই ভাবে ঘটতে পারে। এক, নিয়মিত আর্থিক অভাব এবং তাকে পূরণ করার অসমর্থতা আত্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হেনে; এবং দুই, তথাকথিত বস্তু নির্ভর জীবন-বোধের উপর পর্বত প্রমাণ বিশ্বাস গড়ে তোলার ফলে আরও চাই—গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ এবং তথাকথিত পাশ্চাত্য

রীতিনীতি বজায় রাখার জন্যে অবিরাম সংগ্রাম-এর জন্যেও হতে পারে। তিন, ভৌতিক পরিবেশ। ধরুন, কেউ হয়ত এমন একটি কারখানার কাজ করেন, যেখানে সিসে নিয়ে কাজ করতে হয়। ওই সিসে নিয়মিত শরীরের মধ্যে যদি ঢেকে—সেটা বাতাস, খাবার বা জলের মাধ্যমেও ঘটা সম্ভব—তার ফলে ওই ব্যক্তির সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে কার্বন-বাইসাল-ফাইডও মানসিক রোগের অন্যতম কারণ। যাঁরা রেয়নের কারখানার কাজ করেন, তাঁরাও এমন কিছু কিছু রাসায়নিক যোগ জল, বাতাস এবং খাবারের ভেতর দিয়ে গ্রহণ করে থাকেন, যারা মনের রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। শুধু রেয়নই নয়, শিল্প সভ্যতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা অঞ্চলে আজ কত রকমের কারখানাই না তৈরি হচ্ছে। ওই সব কারখানা থেকে নিষ্ক্রান্ত অপদ্রব্যের কোন্ কোন্‌টি যে মানসিক রোগের আকর, অনেকেই এখনও পর্যন্ত সে সম্পর্কে সচেতন নয়। চার, যথেচ্ছা নানা রকমের ওষুধ ব্যবহার। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, আকছার ওষুধ খাওয়াটা আজকাল যেন ফ্যাশানের মত দাঁড়িয়েছে। একটু মাথা ধরল অথবা গা'টা ম্যাজ ম্যাজ করল, অমনি ওষুধ খাওয়া। এর ফল কখনও কখনও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। ইদানীং কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তেজক ওষুধের চল বেড়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে রাত জেগে পড়া বা খেলার মাঠে দৌড়ান অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করা—এ সবের ফলে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম কখনও বিঘ্নিত হয়। স্বাভাবিক হজম-চক্রের কাজ বাধা পায়। যা শেষ পর্যন্ত নানা রকম জটিল মানসিক পরিস্থিতির উদ্ভব করতে পারে।

কখনও কখনও দৈহিক বিকৃতির দরুনও মানসিক রোগের উদ্ভব হয়। কখনও বা মানসিক রোগ সংঘটিত হয় জন্মসূত্র, অন্যাক্রান্ত 'জীন'-এর মাধ্যমে।

'আসল ব্যাপার এই,' বলেছেন আর একজন বিশেষজ্ঞ, 'মানসিক রোগের কারণ নানা রকম হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা করার সময় কতকগুলি ব্যাপার কখনই উপেক্ষণীয় নয়।'

যেমন ?

'যেমন, মনের রোগ বাড়ছে। কিন্তু সে রোগের চিকিৎসার জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও এদেশে গড়ে ওঠেনি। মুষ্টিমেয় যাঁরা চিকিৎসা করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই উপযুক্তভাবে শিক্ষিত নন। দেশে বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে, কিন্তু বলুন, কোন্ হাসপাতালে মানসিক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা করার মতও একটি সুষ্ঠু বিভাগ রয়েছে? নেই।' এ অভিযোগ অন্য একজন বিশেষজ্ঞের।

'পাশ্চাত্যের অন্য দেশ আমাদের দেশের 'প্রবলেম' এক নয়।' বলেছেন জনৈক বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য, "ঠিক যে যে কারণে সে সব জায়গার সমাজে মানসিক রোগের উপসর্গ দেখা দেয়, তার সবগুলিই এ দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি সত্যিই মানসিক রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হতে হয়, তাহলে কতকগুলি বিষয়ের উপর এখনই আমাদের জোর দিতে হবে। এক, ঠিক কী কী ধরনের মানসিক রোগ এ দেশে বাড়ছে তার ওপর যথাযথ সমীক্ষা চালান। দুই, কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ একটি মানসিক রোগের প্রকোপ যদি বাড়ে, কেন বাড়ছে তার উপর অনুসন্ধান চালান। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কারখানায় যে সব বস্তু কাজে লাগান হয়, এ ব্যাপারে সে সব বস্তু ক্ষতি কারক কী না, পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তিন, বড় বড় হাসপাতালে মানসিক রোগের রুটিন মাফিক পরীক্ষার কাজ চালানার মত বিশেষজ্ঞ এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা। যে সব ইউনিট মানসিক রোগের চিকিৎসা করবেন তাঁদের উপর মুখ্যত দায়িত্ব থাকবে দুটি—এক, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা। দুই, রোগ নিরাময়ের পর, যাকে বলা হয় 'আফটার কেয়ার' সে ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গড়ে তোলা। শেষোক্ত এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল লিগ অফ সোসাইটিজ ফর মেণ্টালি হ্যাণ্ডি-ক্যাপড-এর সভাপতি ডঃ ইভেন পোলস্টারম্যান মন্তব্য করেছেন, মানসিক রোগীর যাঁরা স্বজন, রোগ চিকিৎসার সময় তাঁদের বিশেষজ্ঞরা কিছুটা প্রশিক্ষণ যদি দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে, মানসিক রোগের উপসর্গগুলি দূর হওয়ার পর রোগীকে স্বাভাবিক মনের মানুষরূপে গড়ে তুলতে গেলে যে ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন সে সম্পর্কে রোগীর স্বজনদের উপযুক্ত করে তোলা। এতে রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। বলা বাহুল্য, জন-স্বাস্থ্যের উন্নতি বজায় রাখার জন্যে ভারতে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যাপারটা তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত উপেক্ষিত। এখনই এ ব্যাপারে তৎপর না হলে নিকট ভবিষ্যতে মানসিক ভারসাম্যহীনদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশ আর একটি বড় রকমের ঝুঁকি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

সমরজিৎ কর

২টি রেনী চিবিয়ে খেলেই তাড়াতাড়ি পেটের যাবতীয় গোলমালের উপশম হবে।

আপনার পেটের গোলমাল কোন ধরনের ?	হ্যাঁ	না
১. আপনি কি খাওয়ার পর কখন কখন পেট ভার কিংবা পেটের অস্বস্তি বোধ করেন ?		
২. খাওয়ার পর কি পেট ব্যাথা করে ?		
৩. আপনার কি মনে হয় যে কোন বিশেষ খাদ্য পেট ব্যাথা ও অস্বস্তির কারণ ?		
৪. উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কিংবা বিপর্যস্ত অবস্থায় কি আপনার পেট ব্যাথা করে ?		
৫. বুকজ্বালার জন্য কি আপনার রাতে ঘুম হয় না ?		
৬. বেশী ধূমপান ও তেল খেলে কি আপনার বদহজম হয় ?		
৭. খিদে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি পেট ব্যাথা শুরু হয় ?		
৮. অসময়ে খেলে কি পেট ব্যাথা করে ?		
৯. সুরা কিংবা মদ্যপানের পর কি আপনার পেট ব্যাথা করে ?		

তিন বা তার বেশী যদি আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে সম্ভবতঃ আপনি বেশ গুরুতর অম্বলের ব্যাথায় ভুগছেন।

অম্বল কেন হয় ?

হজমের জন্য জরুরী এসিড বা অম্লরস পাকস্থলীতেই তৈরী হয়। কিন্তু অনেকেরই প্রয়োজনের তুলনায় বেশীমাত্রায় এসিড তৈরী হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত এসিডের জন্যই অম্বল, বদহজমের ব্যাথা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণে হজমের ব্যাঘাত, বুকজ্বালা ইত্যাদি রকমারি পেটের গোলমাল সৃষ্টি হয়। এই অতিরিক্ত এসিড সঙ্গে সঙ্গে কমিয়ে ফেলা অবশ্য প্রয়োজন। তার জন্য চাই রেনী, যা দ্রুত ও নিরাপদে কাজ করে।

অম্বলের চিকিৎসার কি উপায় ?

অম্বলের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা হল এমন একটি বড়ি যা দ্রুত ও সহজ ভাবে অতিরিক্ত এসিড নাশ করে—এর নাম, রেনী। ব্যাথা উপশমের জন্য যতটুকু এসিড কমানো প্রয়োজন, রেনী ঠিক সেই পরিমানে এসিড কমায়। ফলে, হজমের কাজ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। পেটের অস্বস্তিকর অবস্থার থেকে দ্রুত আরাম পাবার জন্য ২টি রেনী চিবিয়ে খান। সারা দুনিয়ায় বহু লোক রেনী ব্যবহার করেন।

পেটের গোলমালে রেনী খুবই উপকারী। কারণ যে কোন এসিড নাশক পদার্থের যে ছয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন, তার সবগুলিই রেনীতে আছে!

১. রেনী অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ও নিশ্চিত আরাম দেয়।
২. রেনী পেটে বায়ু হতে দেয় না।
৩. রেনী এসিডের সঠিক সমতা রক্ষা করে।
৪. রেনী হজমের স্বাভাবিক কাজে কোন বাধা দেয় না।
৫. রেনী পেটের ভিতরের অংশে প্রলেপ দিয়ে তা রক্ষা করে।
৬. বার বার রেনী খেলেও পেটের অসুখ বা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় না।

পিপারমিন্টের স্বাদে গন্ধে ভরা রেনী হাতের কাছে রাখুন।

২টি রেনী ট্যাবলেটেই আপনি যথার্থ আরাম পাবেন।

নিকোলাস—[illegible]—এর তৈরী

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৮৭ ॥

ঘরটি বেশ বড়। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার ওপর কয়েকটা লাল ভেলভেটের তাকিয়া ছড়ানো। দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের দু-তিনটি ছবি। একটা মোটাসোটা কাবুলী বেড়াল ঘরের কোণে চুপ করে বসে ছিল, ওদের দেখে পিঠ ফুলিয়ে দাঁড়ালো। ঘরটাতে সুন্দর ধূপের গন্ধ।

বুলবুল নামের মেয়েটি সূর্যর হাত ধরে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রহস্যভরা গলায় বললো, এতোদিন আসোনি কেন? আমি কতোদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি!

রূপলাল বললো, দেখুন, কিরকম ঠিক জায়গায় নিয়ে এলাম। মিছিমিছি এদিক ওদিক ঘুরছিলেন!

ওদের পথপ্রদর্শক লম্বা মতন লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। রূপলাল তাকে বখশিশ দিল পাঁচ টাকা। সে তবু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

বুলবুল সূর্যর বাহুতে চাপ দিয়ে বললো, তসরীফ রাখিয়ে। কুছ পিয়েংগে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম বুলবুল? তোমার ভালো নাম কি?

বুলবুল হাসিতে সারা শরীর দোলাতে লাগলো। নকল হাসি নয়। সে যখন তখন হাসতে ভালোবাসে। হাসতে হাসতেই বললো, বুলবুলের চেয়ে আবার ভালো নাম হয় নাকি? এ নাম তোমার পছন্দ হলো না? আর কি নাম চাও? আমার পাশের ঘরে থাকে পরীবানু, তাকে ডাকবো?

রূপলাল বললো, আরে না না, আমার দোস্ত তোমার কাছেই আসতে চেয়েছে। সারা সন্ধ্যে থেকে শুধু বুলবুল বুলবুল করছে।

সে সূর্যকে জোর করে বসালো। তারপর কোলের ওপর একটা তাকিয়া টেনে এনে বললো, গান শুনাবো, নাচ দেখাবো। দু' আড়াই ঘণ্টা বাদে ফেরার জন্য টাঙ্গা পাওয়া যাবে তো?

বুলবুল এবার মুখে রাগের ভাব আনলো। এটা কপট রাগ। বললো, আসতে না আসতেই যাবার কথা? তোমাদের আমি আজ সারা রাত আটকে রাখবো।

রূপলাল পকেট থেকে দশ টাকার কয়েকটা নোট বার করে বললো, কিছু আনাও টানাও।

বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, বীয়ার? না হুইস্কি? আমি বেরাণ্ডি ভালোবাসি।

রূপলাল বললো, যার তো দারু পিতে নেহি। এই বাঙালীবাবুকো পুছো। আমার জন্য কয়েক খিলি পান আনিয়ে দাও।

বুলবুল তখন সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি খাবে, মেহমান?

সূর্য মাথা নেড়ে বললো, কিছু না।

বুলবুল হাঁটু গেড়ে সূর্যর সামনে বসে পড়ে বললো, একদম কিছু না? একটা কিছু খাও!

সূর্যর শান্ত মুখখানা দেখলে মনে হয়, সে যেন এক নবীন সন্ন্যাসী। এক নর্তকী তার মান ভাঙাচ্ছে।

আসলে, বাইরে শান্ত ভাব দেখালেও সূর্য ভেতরে ভেতরে বিচলিত। সে তন্ন-তন্ন করে দেখছে মেয়েটিকে। মেয়েটির রূপের আকর্ষণ আছে, সূর্যর রূপ-পিপাসু মনটা জেগে উঠেছে। মেয়েটির চড়া লাল রঙের পোশাক, অভ্রের গুঁড়ো মাখা মুখ, রক্তবর্ণ আঙুলের নোখ, সব মিলিয়ে একটা ঝকমকে ব্যাপার। চোখের পাতায় ঘন করে আঁকা সুর্মা, ধারালো নাক, টুকটুকে ঠোঁট, গলায় একটা রঙিন পুঁথির মালা, কাঁচুলি বাঁধা বুক বড় বেশী উদ্ধত, সরু কোমর ও ভারী নিতম্ব, পায়ে রুপোর মল। এক্ষে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতেই ইচ্ছে করে।

বুলবুল লম্বা লোকটাকে কি সব আনতে দিয়ে আবার এসে সূর্যর কাছে

বললো। এবার অভিমান দেখিয়ে বললো, তুমি কোনো কথা বলছো না কেন?

রূপলাল বললো, তুমি একটা নাচ দেখাও। তখন মেজাজ সরীফ হবে।

বুলবুল বললো, তবলচিকে খবর পাঠিয়েছি। সে আসুক।

রূপলাল বললো, না, না, তবলচির কোনো জরুরৎ নেই। তুমি এমনিই নাচ দেখাও। কিংবা একটা গানা শুরু করো!

—তবলচি ছাড়া আমি নাচতেও পারি না, গাইতেও পারি না।

—ঘরে অন্য লোক আমার ভালো লাগে না। গুন গুন করে একটা গান করো। কিংবা তবলা দাও, আমি ঠেকা দিতে জানি। কাজ চলে যাবে।

—দাঁড়াও, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে পান টান আসুক। কি গো মেহমান, তোমার কি পছন্দ বললে না?

সুর্বে এবার ধীরে ধীরে বললো, তুমি নাচ দেখিয়ে কিংবা গান শুনিয়ে টাকা নাও, তাই না? লোকে টাকা খরচ করে তোমার রূপ দেখতে আসে। তোমার রূপের দাম কত?

বুলবুল আবার হাসিতে গড়িয়ে

পড়লো। বললো, কি অদ্ভুত কথা শোনো! রূপের আবার দাম! আমার রূপের কিম্মৎ দশ জুতি। যাবার সময় আমাকে দশ ঘা জুতো মেরে যেও, তা হলেই হবে।

সূর্য এরকম হেঁয়ালির কথার মানে বুঝতে পারলো না। বললো, না, তুমি তো সত্যিই সুন্দর। টাকা না নিলে তোমার চলবে কেন?

রূপলাল বললো, আরে দোস্ত, ওরকম ভাবে টাকার কথা বলতে নেই। যাবার সময় ওকে খুশী করে গেলেই হবে।

সূর্য একটা বিরক্তির মুখভঙ্গি করলো। সে তো দরদাম করতে চাইছে না, সে জানতে চাইছে।

বুলবুল বললো, আমি আবার সুন্দর নাকি? কেউ বলে না। এই দেখো না, আমার গালে বসন্তের দাগ!

ঘন প্রসাধনের জন্য আগে দেখা যায় নি। এবার সূর্য লক্ষ্য করলো, সত্যিই বুলবুলের গালে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে। কিন্তু এর জন্য তার রূপের তো কোনো হানি হয় নি। এর মুখে একটা সারল্য আছে। নিত্য নতুন অচেনা লোকদের মনোরঞ্জন করে কত রকম মিথ্যে কথা বলতে হয়। তবু মুখে এই সারল্য থাকে কি করে? এখনও কেউ এসে নতুন করে একে ভালোবাসতে পারে। সেই ভালোবাসার স্বাদ কি রকম?

বড় রেকাবির ওপর দশ বারো খিলি পান। তার থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে রূপলাল বললো, একটা গান শোনাও। একটা বেশ মিঠি ঠুংরি ধরো তো!

বুলবুল তাকালো সূর্যর মুখের দিকে। সূর্য দু-হাত মেঝেতে হেলান দিয়ে বসে আছে, চোখ বুলবুলের দিকে স্থির নিষ্পন্দ। যেন সে কোনো মানুষকে দেখছে না, দেখছে একটা সুন্দর মূর্তি।

রূপলালের অনুরোধ সত্ত্বেও বুলবুল সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, কি গান গাইবো?

সূর্য মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লো।

বুলবুল বেশ নিচু গলায় গান ধরলো:

বৈঠি শোচে ব্রিজবাম
নাহি আয়ে ঘনশ্যাম
ঘেরি আই বদরিয়া...

গানের কথা সামান্যই, লাইনগুলো ঘুরে ঘুরে আসে, কণ্ঠস্বর মুচড়ে মুচড়ে প্রণয় ও বেদনার সুর উচ্ছ্বসিত হয়। রূপলাল অনবরত মাথা দোলায় এবং সমের মুখে এসে হাঁটুতে চাপড় দেয়। সূর্য সঙ্গীতের রস তেমন বোঝে না, সে গানের বদলে গায়িকার দিকে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

গানের শেষে রূপলাল আহা-হা-হা শব্দ তুলে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। বুলবুল সূর্যর থুতনিতে হাত দিয়ে বললো, কি, তোমার কেমন লাগলো?

সূর্য সংক্ষিপ্তভাবে জানালো, ভালো।

বুলবুল হেসে বললো, আমি গান গাইতে জানিই না। লোকে আমার নাচ দেখতে আসে।

সূর্য বুঝতে পারলো, এইটিই বুলবুলের বৈশিষ্ট্য। তার রূপের প্রশংসা করলে সে বলবে যে সে সুন্দরী নয়। তার গানের প্রশংসা করলে সে বলবে, গান জানে না।

সূর্য বললো, তাহলে এবার নাচ দেখাও!

—তাও কি তোমার পছন্দ হবে? তুমি যা গম্ভীর! বুলবুল দুটি গেলাসে ব্রান্ডি ঢেলে একটা এগিয়ে দিল সূর্যর দিকে। সূর্য বললো, আমার জন্য দরকার নেই।

বুলবুল মিনতি করে বললো, একটুখানি! আমার জন্য!

রূপলাল বললো, খান না। একটু খেয়ে দেখুন।

সূর্য রূপলালের দিকে তাকালো। রূপলাল মদের ব্যবসা করে, কাল সে পারমিট আদায় করতে যাবে মন্ত্রীর কাছে। কিন্তু সে নিজে মদ খায় না, অন্যদের পেড়াপিড়ি করে।

সূর্য ওদের সঙ্গে তর্ক করলো না। গেলাসটা পাশে সরিয়ে রাখলো। কিছুক্ষণ আগে তার মাথার মধ্যে যে ঝড় বইছিল, এখন তা থেমে গেছে। এখন তার ভালো লাগছে।

বুলবুল অনেকখানি নিট ব্র্যান্ডি এক চুমুকে খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। দু'পা জোড় করে নূপুরের ঝংকার তুললো একবার। তারপর বাগতভাবে বললো, তবলিয়া ছাড়া নাচ হয়? তোমরা কেমন লোক গো!

রূপলাল ঘরের কোণ থেকে বাঁয়া তবলা জোড়া নিয়ে এসে বললো, আমি তাল দিচ্ছি, তুমি ধরো না।

তবলায় চাঁটি দিয়ে রূপলাল দেখলো, ঠিক মতন বাঁধা নেই। সুরে লাগছে না। খানিকটা হাতুড়ি ঠোকাঠুকি করে সে যখন আর কয়েকবার আওয়াজ তুললো, তখন বোঝা গেল সে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়, মোটামুটি কয়েকটা বোল তুলতে পারে।

বুলবুল একটু দূরে সরে গিয়ে হাত দুটো নিজের বুকের কাছে জোড় করে দাঁড়ালো। পা দুটো পর্যায়ক্রমে ঠুকলো কয়েকবার। তারপর খুব ধীর লয়ে নাচ শুরু করলো।

সূর্যর মনে হলো, ঘরটা যেন কিরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নাচের সময়ে ঘর ভর্তি লোক থাকবে, মাইফেলে যেরকম থাকে, এদিক ওদিক থেকে সবাই তারিফ করবে, তাহলেই যেন নাচ ঠিক জমে।

পরক্ষণেই তার মনে হলো, এ ঘরে রূপলাল এখন না থাকলেও পারতো। শুধু সে একা যদি বুলবুলের নাচ দেখতো, তা হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারতো। তবলা ছাড়া নাচ হয় না এ আবার কি অদ্ভুত নিয়ম।

সে তাকিয়ে রইলো বুলবুলের মুখের দিকে। মুখটা এখন অন্যরকম। এই ব্যাপারটা সূর্য আগেও লক্ষ্য করেছে। কোনো শিল্পী যখন তার নিজস্ব শিল্পের মধ্যে ডুবে যায়, তখন তাকে অন্য মানুষের মতন দেখায়। সেই মুখখানা চেনা কারুর মতন নয়।

বুলবুলের হাত ও পা ধারালো অস্ত্রের মতন চতুর্দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে। তার শরীরে এখন অনেক তরঙ্গ। তার উড়ন্ত গোল ঘাঘড়াটিকে মাঝে মাঝে দেখাচ্ছে একটা বিরাট ফুলের মতন।

নাচতে নাচতে বুলবুল যখন দু' একবার রূপলালের মুখের কাছে হাত কিংবা শরীর আনছে, রূপলাল মাথা হেলিয়ে সরে যাচ্ছে। সূর্য লক্ষ্য করলো, রূপলাল প্রত্যেকবারই খুব সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে বুলবুলের স্পর্শ। যেন সে একটা অচ্ছুত। ছেলেটি অদ্ভুত সত্যিই, সে মদ খায় না কিন্তু মদ কেনার জন্য টাকা দেয়। সে বাঈজীর নাচ দেখে ফুর্তি পায়, কিন্তু তাকে স্পর্শ করে না।

নাচ শেষ হবার পর রূপলাল বললো, ধুর, তোমার নাচের চেয়ে তোমার গানই বেশী ভালো। দুতে লয় ঠিক ছিল না!

বুলবুল অভিমান করে বললো, আমায় কেউ ভালো বলে না। আমায় কেউ পছন্দ করে না।

সূর্যর দিকে ফিরে বললো, তোমারও ভালো লাগেনি তো?

সূর্য বললো, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

বুলবুল কান্না কান্না গলায় বললো, মোটেই না। আমি ঠিক জানি! তোমরা পরীবানুর কাছে যাবে? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ঘর!

সূর্য বললো, না, কোথাও যাবো না। তুমি খুব সুন্দর।

বুলবুল গেলাসে অনেকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে লম্বা চুমুকে দিল। তারপর সেই এঁটো গেলাসটা সূর্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, খাও! আমি বলছি খাও!

সূর্য হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললো, কেন জোর করছো, আমি ওসব খাই না!

বুলবুল তীক্ষ্ণ গলায় বললো, আমি জানি, তুমি আমায় ঘেন্না করছো।

সূর্য আহতভাবে বললো, না, তা নয়।

বুলবুল গেলাসটা তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করে বললো, যাও তোমরা পরীবানুর কাছে চলে যাও! আমি কি তোমাদের ধরে রেখেছি?

এস্ট্রেলা-শক্তি
ESTRELA
132
122
112
POWER PACKED TO LAST
এমন শক্তি
যার আলো
আপনি নিজেই
দেখতে পারেন
আপনার ট্রানজিস্টার আর টর্চে এস্ট্রেলা-শক্তির বাহাদুরী দেখুন!

এতক্ষণ বাদে সূর্য স্বচ্ছন্দভাবে হাসলো। তারপর হাত বাড়িয়ে বললো, দাও—

সূর্য গেলাশটা নিয়ে একটা চুমুক দিল। বিষম লেগে গেল গলায়। তাই দেখে আবার হাসিতে লুটিয়ে পড়লো বুলবুল। সূর্যর উরুতে চাপড় মেরে বললো, ঠিক হয়েছে! জব্দ করেছি তো! আর খাবে?

রূপলাল হাই তুলে বললো, অনেক রাত হয়ে গেল। এবার ফিরতে হবে। চলুন ভাদুড়ীজী—

সূর্য এই সুযোগটা খুঁজছিল। মুখ তুলে বললো, আপনি যান, আমি এখানে থাকবো।

রূপলাল অবাক হয়ে বললো, এখানে থাকবেন? আর কতক্ষণ?

—তা জানি না। হয়তো অনেক দিন।

—কি বলছেন আপনি? আপনার জিনিস পত্তর।

—সে পরে ব্যবস্থা হবে।

সূর্য বুলবুলের দিকে ফিরে বললো, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দেবে?

বুলবুল বললো, সে আপনার মর্জি!

রূপলাল আরও কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করলো সূর্যকে ফিরিয়ে নেবার। ব্যর্থ হলো। অগত্যা সে উঠে পড়লো একাই চলে যাবার জন্য। বাঈজীর ঘরে রাত কাটাবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

রূপলালকে বিদায় দিয়ে এসে বুলবুল দরজা বন্ধ করলো। তারপর বললো, আমি আজ গান গাইবো না, নাচবো না, কিছু করবো না। আমি শুধু শরাব খাবো! মেহমান, তুমি এখানে থাকতে চাইলে কেন?

সূর্য বললো, আমি অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এলাম। তোমাকে না পেলে আমার সব কিছু নষ্ট হয়ে যেত।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। কাছে এসো।

বুলবুল দৌড়ে এসে সূর্যর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার একটু নেশা হয়েছে। অতি ব্যস্ততায় সে যেন সূর্যর ঠোঁট খুঁজে পাচ্ছে না। তার চোখ, কপাল, গাল চুমোয় ভিজিয়ে দিল।

সূর্য তাকে ধরে সামনে বসিয়ে দিয়ে বললো, শোনো, আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি।

বুলবুল পাগলাটে গলায় বললো, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আগে বলো, তুমি সত্যিই আমাকে খুঁজতে এসেছিলে?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—কে বলছে আমার কথা?

—কেউ বলেনি।

—আমি জানতাম, তুমি ঠিক একদিন আসবে। তুমি আমার ঘনশ্যাম। যদিও তোমার গায়ের রং খুব গোরা—

বুলবুল তার দুটো হাত চেপে ধরলো সূর্যর গালে। একেবারে মুখের সামনে মুখ! সূর্য চোখ বুজলো। কয়েক লহমার জন্য তখন মনে পড়লো সেই নারীর কথা, যে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যাকে সে কোনো দিন আর দেখবে না। যে তাকে বলেছিল, তুমি যেখানেই থাকো, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি।

সূর্য চোখ খুলে আপন মনে বললো, না, সে নেই। বুলবুল আছে।

একটানে সে বুলবুলকে নিয়ে এলো নিজের বুকের ওপর।

ওড়নাটা আগেই খসে গিয়েছিল বুলবুলের গা থেকে। সূর্য ওর কাঁচুলিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য টানাটানি করতে লাগলো। সহজে ছেঁড়ে না। বুলবুল নিজেই সেটা খুলে ফেলে বললো, কি চাও?

সূর্য বুলবুলের নগ্ন স্তনে মুখ রেখে বললো, তোমাকে। আর কিছু না।

বুলবুল বললো, এই তো আমি। আমাকে নাও।

সূর্য বললো, তুমি আমার ওপর রাগ করবে না? আমাকে তাড়িয়ে দেবে না?

বুলবুল বললো, আমার কি ভাগ্য, তুমি এসেছো। আমায় কেউ পছন্দ করে না। আমার মুখে বসন্তের দাগ—

—তারা অন্ধ, তারা তোমাকে দেখতে পায় না। আমি তোমাকে একটু ভালো করে দেখি?

সে বুলবুলকে সোজা করে বসিয়ে তার পিঠ ও কোমরে নিজের হাত রাখলো। বুলবুলের চোখে ঈষৎ রক্তিম ছটা, সে হাতে আবার ব্র্যাণ্ডির গেলাশ তুলে নিয়েছে। সূর্যর মধ্যে জেগে উঠছে অসম্ভব রতি সম্ভোগের ইচ্ছে। এখন আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

পুনরায় বুলবুল সূর্যর কণ্ঠলগ্না হয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালো। দীর্ঘস্থায়ী হলো চুম্বন। যেন পরস্পর জীবনী শক্তি বিনিময় করছে। বুলবুল উঠে এসে বসলো সূর্যর কোলের ওপর। সূর্য তার ঘাঘরার দড়ি খোলার জন্য হাত দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তোমার বয়েস কত?

বুলবুল বললো, বয়েস? একশো দুশো হবে।

সূর্য মনে মনে বললো, বুলবুলের বয়েস তিরিশের কাছাকাছি নিশ্চয়ই। ঠিক এই রকমই বয়েসে, আর একজন নর্তকী, তার নামও ছিল বুলবুল, তাকে দেখে তার বাবা আকৃষ্ট হয়েছিল। সূর্য যেন সেই একই জায়গায় ফিরে এসেছে।

বুলবুলের শরীরটা পাখির মতনই সূর্যর আলিঙ্গনের মধ্যে ছটফট করে। সূর্যর শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেলে তার বুকে মুখ ঘষতে লাগলো বুলবুল! বুলবুলের মসৃণ খোলা পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সূর্য জিজ্ঞেস করলো, বুলবুল, অনেক দিন আগে আর একজন বুলবুল থাকতো এখানে, সে-ও খুব ভাল নাচতো, তুমি তার নাম শুনেছো?

—না।

—তোমার মা-ও কি নর্তকী ছিল?

বুলবুল মুখ তুলে বললো, তুমি এত প্রশ্ন করছো কেন?

সূর্য তাকে আদর করে বললো, এমনিই। বলো না।

—হাঁ। আমার মা কোথায় চলে গেছে!

সূর্য আপন মনে হাসলো। সে আর বুলবুল তো একই। একজন নর্তকীর ছেলে হিসেবে সে যদি এখানেই থেকে যেত, তা হলে এতদিনে সে গুণ্ডা, দালাল কিংবা তবলচি হতো। কিংবা ব্যবসা করতো রূপলালের মতন। তার বদলে কতদূরে চলে গিয়েছিল সে! সেই দূরের জগৎটা বড় জ্বালা যন্ত্রণার। সে আর কোথাও যাবে না।

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান মাসে নতুন খাদ্যনীতি চালু করেছেন। গত বছর সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এ বছর ফলন খুব ভাল হয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের চিত্রই চলতি মরসুমে উজ্জ্বল, পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বছর খাদ্যনীতি তৈরি করার আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলগুলিকে আলোচনা-বৈঠকে আহ্বান করেছিলেন। সি পি এম এবং সেই দলের সহযোগী কয়েকটি দল মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক বর্জন করলেও ক'য়কটি বিরোধী দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সংগঠন কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক চালের পাইকারী ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে অধিগ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। মনে হয় গমের পাইকারী ব্যবসায় অধিগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে চালের ক্ষেত্রে সরকার সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিতে চাননি। তবুও একথা স্বীকার্য যে, বর্তমান বছরের খাদ্যনীতি পূর্ববর্তী বছরগুলিতে অনুসৃত খাদ্যনীতির অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার সংগঠন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহযোগিতা পেয়েছেন।

নতুন খাদ্যনীতি অনুযায়ী সরকার পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শেই এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ বছর যা ফলন হয়েছে তাতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা আরও একটু বেশি ধার্য করা যেত। এই পাঁচ লক্ষ টনের মধ্যে—তিন লক্ষ ষাট হাজার টন পাওয়া যাবে চাল-কলগুলির উপর ৬০ শতাংশ লেভি ধার্য করার মাধ্যমে, আগে এই লেভির পরিমাণ ছিল ৫০ শতাংশ। কোন চাল-কল কতটা চাল সরকারকে দেবে তা নির্ভর করবে প্রতিটি চাল-কলের ক্ষমতার উপর। ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে ক্রমপর্যায়ে মাসিক কর্মসূচী অনুযায়ী চাল-কলগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণে চাল খাদ্য কর্পোরেশনের কাছে বিক্রি করতে হবে। সরকারের দশ-দফা খাদ্যনীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল—কর্ডনিং ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকরী করা হবে, প্রতিটি চাল-কলে একজন দায়িত্বশীল অফিসার নিয়োগ করা হবে যাতে তিনি ওই কলের কাজ-কর্মের উপর লক্ষ্য রাখতে পারেন; লাইসেন্সবিহীন সব হাসকিং-কল বন্ধ করে দেওয়া হবে; প্রতিটি অঞ্চলে খাদ্য-সংগ্রহ নীতি যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করার

জন্য একটি পুলিশ-তাঁবু স্থাপন করা হবে এবং এ ধরনের মোট ৩৫০০টি পুলিশ-তাঁবু স্থাপন করা হবে। উৎপাদক অথবা উৎপাদক নয় এমন যাঁদের হাতে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য থাকবে তাঁদের কাছ থেকে সরকার খাদ্যশস্য নিয়ে নেবেন। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্যের বিক্রয়মূল্যে কুইণ্টাল প্রতি প্রায় নয় টাকা বাড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যা চাল উৎপন্ন হয় তার প্রায় ৮০ শতাংশ হল মিহি আমন ধানের চাল। এ ধরনের চালের সংগ্রহ-মূল্য গত মরসুমে ছিল কুইণ্টাল প্রতি ৬৪ টাকা; বর্তমান মরসুমে দাম বাড়িয়ে ধার্য করা হয়েছে কুইণ্টাল প্রতি ৭৩ টাকা। সবচেয়ে ভাল চালের (Superfine) ক্ষেত্রে সংগ্রহ-মূল্য ধার্য করা হয়েছে কুইণ্টাল প্রতি ৭৬ টাকা। আউস এবং বোরো ধানের চালের ক্ষেত্রে সংগ্রহ-মূল্য ধার্য করা হয়েছে কুইণ্টাল প্রতি ৭০ টাকা।

রাজ্য সরকার ফুড কর্পোরেশনকে বলেছেন, ডিসেম্বর মাসের ভিতর গরীব কৃষকরা যে চাল বাধ্য হয়ে বিক্রি করে ফেলে তা সংগ্রহ করার জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাতে এভাবে অন্তত ১ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা যায়। এ ধরনের চাল সংগ্রহকালে ফেকাশে লাল রঙের রসিদ দেওয়া হবে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদা রসিদ দেওয়া হবে। যাতে গরীব কৃষকগণ নিজেদের রসিদ জোতদারদের কাছে বিক্রি করে না ফেলতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে; অতীতে এ ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে। চাল-কলগুলির 'লেভি' অনুযায়ী চাল সরকারের কাছে বিক্রি করার পর যে-চাল অবশিষ্ট থাকবে তাও সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে নিয়ন্ত্রিত বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা হবে। যদি কোন চাল-কল সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'লেভি' অনুযায়ী চাল বিক্রি না করে অথবা লেভি-বহির্ভূত চাল সরকারের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত বাজারে বিক্রী না করে তবে সরকার সেই চাল-কলের ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে গ্রহণ করবেন বলে স্থির হয়েছে।

নতুন খাদ্যনীতিতে বলা হয়েছে যে, কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চলে এবং আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালু থাকবে ও রাজ্যের অন্যত্র আংশিক রেশনিং চালু থাকবে। উচ্চ ফলনশীল ধান যা গ্রীষ্মে অথবা শরৎকালে বোনা হয়েছে, তা উৎপাদকদের সেই ধানের গুণগত মা নির্ধারণের জন্য (সাধারণ, অথবা ভা অথবা অতি-ভাল শ্রেণী-বিভাগের জন্য আবেদন করতে হবে এবং সরক উৎপাদিত ধানের গুণগত মান নির্ধার করার পর তার সংগ্রহ-মূল্য প্রযুক্ত হবে বর্ধিত হারে সংগ্রহমূল্য ধার্য করার দরু উৎপাদকদের দামের উপর অতিরিক্ত কো বোনাস অথবা প্রিমিয়াম দেওয়া হবে না।

সরকারের নতুন খাদ্যনীতি আগেকা নীতির চেয়ে যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্ব সবাইকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ ধরনের খাদ্যনীতি কার্যকর করার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখী হতে হয় এবং তার মোকাবিলা করার জ প্রয়োজন হল সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাস ব্যবস্থা। সরকার প্রত্যেক চাল-কলে দায়িত্বশীল অফিসার নিয়োগ করার কথ এবং প্রত্যেক অঞ্চলে যে পুলিশ-তাঁব স্থাপন করার কথা ঘোষণা করেছেন নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁদের উপর তদারকি করার সম্পূর্ণ দায়ি

কি জেলা প্রশাসন নিতে পারবেন? সরকার চালের সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে ঠিক করেছেন; কিন্তু ৬০ শতাংশ লেভি অনুযায়ী চাল সরকারকে দেওয়ার পর চাল-কলগুলি যে উদ্বৃত্ত চাল বাজারে বিক্রি করবে তার দর কত হবে তা-ও অচিরেই ঘোষণা করা উচিত। গ্রামের কৃষকদের এবং এমন কি জোতদারদেরও ধান বিক্রি করতেই হবে; কেননা, ধান বিক্রি না করলে তাদের পক্ষে অন্যান্য ভোগ-সামগ্রী কেনা সম্ভব হবে না। সুতরাং সরকারকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সংগ্রহমূল্যের চেয়ে বেশী দামে কেউ খোলা বাজারে ধান বা চাল বিক্রি করতে না পারে যদি সরকার কঠোরভাবে খাদ্যনীতি ফলপ্রসূ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, যদি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দায়িত্বশীল অফিসারগণ ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে চাল-সংগ্রহ নীতিকে সফল করতে প্রয়াসী হন এবং চালের চোরাকারবার দমনে যদি পুলিশকে কঠোর হবার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে চলতি মরসুমে পাঁচ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী মঞ্জরী বোস তাঁর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেল রঙে রচিত ১৪টি শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়। ইতিপূর্বে কলকাতায় ও অন্যত্র অনুষ্ঠিত কয়েকটি প্রদর্শনীতে এই শিল্পী যোগদান করেছেন সুতরাং একেবারে অপরিচিতা নন। তাঁর সাম্প্রতিক কমপোজিশনগুলি এক্সপ্রেসানিস্টিক রীতিতে রচিত, যদিও কয়েকটিতে আদিম সরলতার আভাস মেলে। আবার অন্য কতকগুলি নিদর্শনে প্রতীক ও ইঙ্গিতের ওপর প্রাধান্যদানও চোখে পড়ে। তবে শিল্পী হালকা রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী ও অন্তত কয়েকটি রচনা দেখে বোঝা যায় যে শিল্পী রঙ নির্বাচন ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই একেবারে কাঁচা নন। কয়েকটি ইমেজারি জাতীয় ছবিও দেখা যায়—এক কথায় শিল্পীর রচনারীতি এখনও পরীক্ষা-মূলক ও মিশ্র শ্রেণীর। প্রদর্শনীটি দেখে বোঝা যায় যে শিল্পী ড্রয়িংয়ের চেয়ে রঙ ব্যবহারের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, ফলে কয়েক স্থলে রঙের চাতুর্য চোখে পড়লেও উপযুক্ত মৌলিক ড্রয়িংয়ের অভাবে ছবি সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হয়নি—যেমন কাভুস। রঙ ব্যবহারের দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও বাছুরগুলির মুখাকৃতির বিষয়ে আর একটু সচেতন হলে এই ছবিখানি উল্লেখ্য হত। ইমেজারি নিদর্শন হিসাবে সাম থটস-এর নাম করা চলে। মিশ্র নানা রঙের বিশেষ পৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে নীলরঙের দীর্ঘ টানগুলি দ্রষ্টব্য। আকার ও রঙের দিক থেকে বিচার করলে দু একটিতে একটি আদিমজাতীয় সরলতা ধরা পড়ে, যেমন হালকা নীলরঙের পরিপ্রেক্ষিতে নীলরঙে আঁকা দুটি মূর্তি (ইন জয়পুর)। তবে শিল্পীর দুটি কমপোজিশন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—পেন্টিং-১ ও নাইট। প্রথমটির হলুদ রঙের স্তরভেদের মধ্যে মধ্যে সাদা রঙের চমৎকার কারুকার্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয়টি সত্যিই সুন্দর। সুগভীর নীল রঙের অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে বড় বড় সারিবদ্ধ গাছ ও তারই মধ্যে নীলরঙের ইঙ্গিতপ্রধান একটি মূর্তি। ছবিতে সুগভীর রাত্রির স্তব্ধ, শান্ত রূপটি ফুটে উঠেছে। দু একটি ছবি প্রতীকপ্রধান, যেমন স্প্রিং। লাল ও হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকমূলক কয়েকটি মূর্তির মধ্য দিয়ে শিল্পী তার বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে ডেসপারেশন-এর নাম করা যায়।

*

পুজো উপলক্ষ কয়েকজন পরিচিত শিল্পী ছাপা শাড়ির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, ইতিপূর্বে এই বিষয়ে লিখেছি। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী আলো দত্ত আয়োজিত প্রদর্শনীটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রদর্শনীতে নানা ডিজাইনে ছাপা বহু শাড়ি নিদর্শন দেখা যায়। গত কয়েক বছর ছাপা শাড়ির প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে শাড়ি মুদ্রণশিল্পে আলো দত্ত সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আধুনিকতম রুচি অনুযায়ী নানা

ইন জয়পুর —মঞ্জরী বোস

রেখা ও মোটিফ সংমিশ্রণে সাধারণ সুতির শাড়িতেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। তাছাড়া কাপড়ের সুতা ও বুনানী অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ডিজাইন ব্যবহার করেন—ফলে এক এক শ্রেণীর শাড়িতে এক-একটি বিশেষ ডিজাইন সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আলো দত্তর আর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সুন্দর রঙ নির্বাচন। প্রচলিত ধারায় কেবলমাত্র শাড়ির পাড় ও আঁচল ছাড়া, অনেক স্থলে শাড়ির জমিতে চতুষ্কোণ ও নানা জ্যামিতিক বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত ডিজাইন ছেপে এক একটি শাড়িতে নতুন ও বিচিত্রতর রূপদান করেছেন। বিশেষ করে হালকা হলুদ ও বেগুনী রঙের পাড়, জমির কারুকার্য ও আঁচলের আধুনিকতম রেখা বৈচিত্র্যর গুণে কয়েকটি শাড়ি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব চেয়ে বড় কথা, রুচিসম্মত ডিজাইন ও কারুকার্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক শাড়ির মূল্যই ন্যায্য ছিল।

*

ওয়েস্ট বেঙ্গল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইসরি বোর্ডের উদ্যোগে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে আয়োজিত কুটীরশিল্প প্রদর্শনীটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দেশের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাগণ যাতে ঘরে বসে কাজ করে সসম্মানে জীবিকানির্বাহ করতে পারেন সেজন্য সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মহিলা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কাপড় ছাপা থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের জামা ফ্রক, সূচী ও পশম শিল্প, কাঁথা সুজনী, আসন, চামড়ার ব্যাগ তোয়ালে প্রভৃতি তৈরী করতে শেখানো হয়। কয়েকমাস শিক্ষালাভের পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানই তাঁদের নানাবিধ পোশাক-পরিচ্ছদের অর্ডার দেন ও তাঁরা ঘরে বসেই উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এগুলি প্রস্তুত করে দেন। ফলে, অযথা অন্যের ওপর নির্ভর না করে তাঁরা সসম্মানে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। প্রদর্শনীতে সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন, গঙ্গানগর মহিলা শিল্পশিক্ষামন্দির, অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন, সত্যভারতী, কর্মকুটীর, শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম, নবদ্বীপ কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান, মহিলা সেবা সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নানা মহিলার তৈরী ছাপা শাড়ি, চাদর, বাটিক শাড়ি, পুরানো কাঁথা, বাঁশের রঙীন ফুলদানি, তোয়ালে, দস্তানা, কাপড়ের পুতুল, ছেলেমেয়েদের রঙীন জামা ও ফ্রক এবং বিশেষ করে নানা জন্তুর মোটিফ আঁকা খেশ (মহিলা সেবা)

লাঞ্ছিত) নিদর্শন দেখা যায়। বস্তুত প্রত্যেক নিদর্শনই দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী এবং কয়েকটি আধুনিক রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী রচিত। দুঃখের বিষয়, বাজারে সচরাচর এ জাতীয় জিনিস চোখে পড়ে না—কেবলমাত্র বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত বিশেষ কোনও প্রদর্শনীতেই দেখা যায়। সুতরাং এ জাতীয় কুটীরশিল্প-সামগ্রীর অধিকতর প্রচার বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠানে তৈরী নানাবিধ কুটীরশিল্পসামগ্রী যদি প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অন্তত পূজার কিছুকাল পূর্বেই সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়, তবেই দেশের কুটীরশিল্প সামগ্রীর ব্যাপকতর প্রচার হবে, শহরের ক্রেতাব্যক্তি কুটীরশিল্প সম্ভার ও বৈচিত্র্য বিষয়ে সচেতন হবেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহিলাগণও অধিকতর কাজ তথা পারিশ্রমিক লাভের সুযোগ পাবেন। আশা করি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইসরি বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন।

চিত্রপ্রিয়

আমার যৌবন

"দেশ" শারদীয় সংখ্যা ১৩৮০"-তে শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত "আমার যৌবন (স্মৃতিকথা)" পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। আমার দু' বছরের অগ্রবর্তী হলেও বুদ্ধদেব বসু আমাদের সমসাময়িক। আমি ও আমার বন্ধুরা, বুদ্ধদেব বসু, "প্রগতি" মাসিক পত্রিকা এবং প্রগতি গ্রুপ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ এবং সচেতন সমালোচক ছিলাম এবং এঁদের নিয়ে গৌরব বোধও করতাম। বুদ্ধদেব ও অধ্যাপক কবি অজিত দত্ত 'প্রগতি' সম্পাদনা করতেন। অজিত দত্ত জগন্নাথ হল দক্ষিণের বাড়িতে আমার কাছাকাছি কক্ষে বাস করতেন। অজিত দত্তর বিখ্যাত কবিতা "কুসুমের মাস" জগন্নাথ হলের সাহিত্য বার্ষিকী "বাসন্তিকাতে" প্রথম প্রকাশিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎকালীন পারিপার্শ্বিক সাহিত্য সমাজের সুন্দর স্মৃতিচিত্রণ করেছেন বুদ্ধদেব। কোন আত্মম্ভরিতা, অহংকার, ক্ষোভ, বিদ্বেষ ইত্যাদির লেশমাত্রও নেই কোথাও। মানুষটি যেমন কোমল, মৃদুভাষী এবং সত্য কথা সুন্দরভাবে বলেন, লেখাটিও তেমনি মৃদু, স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত। কোন কোন বিষয় মূল্যবানও বটে। কোথাও একটু provocation নেই। এটি জীবনী-ভিত্তিক উপন্যাস নয়।

আমার মনে হচ্ছে, বুদ্ধদেব যেন ২।৪টি উল্লেখনীয় বিষয় বাদ দিয়েছেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অধ্যাপক মন্মথ ঘোষের নামটি "স্মৃতিকথা"য় নেই কেন? বরাবরই আমার ধারণা ছিল, মন্মথ ঘোষ বুদ্ধদেবের অন্তরঙ্গ এবং তৎকালে "প্রগতি"-পন্থী ছিলেন যদিও ছাত্র হিসেবে তিনি বুদ্ধদেবের এক বছর অগ্রবর্তী। সাহিত্যরসিক বলেও অধ্যাপক ঘোষের খ্যাতি ছিল।

আমার মনে হয়, ১৯৩০—৩১ সালে তৎকালীন প্রচলিত কলকাতার ইংরেজী দৈনিক "অ্যাডভান্স" কাগজে বুদ্ধদেবের একটা মারাত্মক, provocative রচনা প্রকাশিত হয় The Essential She এই শিরোনামায়। ভাষা style বিষয়-বিশ্লেষণ, শ্লেষ, কৌতুক সব দিক দিয়েই লেখাটা ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহলে সারা বাংলার কলেজীয় ছাত্রমহলে প্রচুর আলোড়ন ও কৌতূহল সৃষ্টি করে। বেশ কয়েকদিন "Advance" কাগজে Rejoinder উত্তর-প্রত্যুত্তর বেরিয়েছিল। সর্বত্র ছাত্রদের আড্ডায় আড্ডায় এটি ছিল আলোচ্য বিষয়। আমার ধারণা, কোন দৈনিক সংবাদপত্রে সেটাই ছিল বুদ্ধদেবের প্রথম লেখা। তাঁর যৌবন-স্মৃতি-কথায়

ওটা স্থান পাবে না? তার কিছুদিন পর আরও একটা লেখা বেরিয়েছিল তাঁর "Advance" কাগজে। শিরোনামা—"Dacca Vignette" সেটাও কি বিস্মৃত?

তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কৃতী-ছাত্র-বাঞ্ছিত "Chancellor's Gold Medal" দেয়া হতো ইংরেজী রচনা প্রতিযোগিতায়। মনে হয়, ৩০০০ শব্দ সম্বলিত সর্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখে বুদ্ধদেব সেই সম্মানটি পেয়েছিলেন। বিষয়-বস্তুটি আমার মনে নেই, তবে Dacca University Journal-এ তা প্রকাশিত হয়েছিল। যৌবন স্মৃতিতে এটা হারিয়ে যাবে কেন?

কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত বুদ্ধদেব কোন বড় সমাবেশে ভাষণ দেন নি, আমার ধারণা। "হিমাদ্রি" পত্রিকা সম্পাদক সাহিত্যিক প্রমথ ভট্টাচার্য তখন জগন্নাথ হল সাহিত্যসভার সম্পাদক ছিলেন। তৎকর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক বাংলা উপস্থিত ভাষণ (Extempore Speech) প্রতিযোগিতায় বুদ্ধদেব বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উপস্থিত-নির্বাচিত বিষয়ে উপস্থিত-ভাষণ দিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন ছাত্রজীবনে। একেবারে তুচ্ছ ঘটনা নয়।

"একটি মেয়ের জন্য" নাটক হিসেবে অভিনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব। নাটকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। আমার যতদূর স্মরণ আছে, আমরা অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন মঞ্চে তার অভিনয়ের বিরোধিতা করেছিলাম। নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া আমাদের ওরকম সিদ্ধান্তের কারণ ছিল। বুদ্ধদেব তখন ছাত্র।

তার কয়েক বছর পর, তখন বুদ্ধদেব ছাত্র নন, এবং মনে হয় কলকাতায় যাতায়াত করছেন, তাঁর লেখা "যেদিন ফুটল কমল" নাটকে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকা "নর্থব্রুক হলে" পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে আমি আগাগোড়া উপস্থিত ছিলাম। শ্রীমতী প্রতিভা সোম তথা রাণু সোম (তখনও বসু হননি) তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় ও কয়েকটি অনবদ্য গান দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, "ওগো আমার সুন্দর প্রিয়তম—", "রক্ত দিয়ে যাই একটি গানের ফুল—" প্রভৃতি নজরুল সংগীত ও কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত শ্রীমতী সোমের কণ্ঠে শুনেছিলাম। অনেকেই বলাবলি করেছিলেন, 'রাণু সোমের গানের জন্যই আসা'। জীবন উছয় গানে গানে

প্রকারান্তরে কমল যেন দেবতার চরণ প্রত্যাশিতভাবে প্রদত্ত হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীমতী বসুর জীবনে সেই অভিনয় উৎসবের অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' এবং 'East Bengal Times' কাগজে পুরো Report এবং appreciation বেরোয়। কিন্তু অন্য একটি সাপ্তাহিক "চাবুক" কাগজে বিরূপ সমালোচনা ও বিদ্রূপ বেরিয়েছিল।

তৎকালীন 'শনিবারের চিঠি' কাগজে বুদ্ধদেবের গদ্য ও পদ্য লেখা এবং 'প্রগতি' মাসিক পত্রিকা নিয়ে রসাল বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বেরোত। 'আমার যৌবনে' সে সব কথার উল্লেখ থাকা কি অনুচিত?

আমার এখন মনে হচ্ছে না, 'রবিবারের লাঠি' নামধেয় একটি যে কাগজ হঠাৎ তখন বেরিয়েছিল, তার সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন।

তখনকার ঢাকা আমাদের স্বপ্নের ঢাকা। কৃষ্ণচূড়া, গোলমোহরের নেশায় মেশা সবুজ রূপের ঢাকাতেই বুদ্ধদেব বসুর যৌবনের কাহিনী রচিত হয়েছিল। ইতি।

ভবেশ চক্রবর্তী
চিত্তরঞ্জন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজের নমুনা

৫ই আশ্বিন, ৪৭ সংখ্যায় নবারুণ গুপ্ত 'দৃশ্যপট' অধ্যায়ে 'সিদ্ধার্থবাবুদের কাজ' একটি বিতর্কমূলক বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

নবারুণবাবুরে যিনি সিদ্ধার্থবাবু তিনি আমাদের সমগ্র পঃ বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সিদ্ধার্থবাবু প্রায়ই বলেন: 'আমার সরকার কাজ করছে।' তার উত্তরে গুপ্তবাবু বললেন, 'সত্যিই যদি এটা অবস্থা........জয়ধ্বনি দিতে পারতাম।'

শ্রীগুপ্ত আরও বললেন, 'অতি দুঃখে বলতে বাধ্য হচ্ছি, পঃ বঃ সরকারের দফতরে দফতরে ঘুরে এমন একটা কাজের নমুনাও খুঁজে পাইনি।' আমি অন্য জেলার বিশদ বিবরণ দিতে পারব না কিন্তু মালদা জেলার সফল উন্নয়নমূলক কাজের কিছু নমুনা দিতে পারব। এবং পত্রিকা মারফত ছাপিয়ে সত্যাসত্য যাচাই করতেও পারেন?

অদ্যাপি এই জেলায় ৩০০টি নতুন স্কুল সরকারী অনুমোদন পেয়েছে এবং জয় বাংলা হতে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনের জন্য ৪৫টি আরও নতুন স্কুলের অনুমোদন শীঘ্রই পাওয়া যাবে। যথাযথ নিয়োগ প্রথায় ৩০০ জন নন-ট্রেনী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ৬৫৮ ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় কি কাজ হয়েছে তার নমুনা দিচ্ছি ৩১-৩-৭৩ পর্যন্ত। এই জেলায় ১৫টি ব্লক। এস টি কূপ খনন করা হয়েছে ৫১১৭টি এবং জমি উপকৃত হয়েছে ৫১১৭০ একর। ডি টি কূপ খনন করা হয়েছে ৬১টি। আর এল আই স্কীমের অধীন ১৯৭টি এবং মোট জমি এই সেচ পরিকল্পনায় উপকৃত হয়েছে ৯০৯২০ একর। বিস্তারিত বিবরণ দিলাম না। আগামী বছর ১২০০০০ একর জমি সেচ প্রকল্পে আনা হবে।

এই জেলার ৩৩০টি মৌজায় উপস্থিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে এবং এই জেলায় জমা প্রতি মাসে ৪৪৫৯২২ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ কিন্তু অন্য। চাঁচোলে ১০টি শয্যা বিশিষ্ট, আড়াইডাঙ্গায় ১০টি, মোথাবাড়ীতে ১০টি সুলতানগঞ্জ, মালতীপুর বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচক ১নং ব্লক ১০টি করে শয্যা বিশিষ্ট একটি করে হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ৫,৭৭,৩০৭ শ্রম দিবসে ক্র্যাশ প্রোগ্রামে ১৮,১৬,৯৬৯-১৩ পয়সা খরচ করে বহু রাস্তা তৈরি হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে ২,৯৮,৯৫০ টাকা। এই জেলায় 'মহানন্দা মাস্টার প্ল্যান' প্রকল্পে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে, জজকোর্ট, কালেকটরেট, ফরেস্ট প্রভৃতি দফতরে আড়াই হাজার ছেলে কাজ পেয়েছেন। সবই নবারুণবাবুর সিদ্ধার্থবাবুদের কাজ।

অপু আচার্য
মালদহ

বনস্পতির বৈঠক

গত ১২ আশ্বিনের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় 'বনস্পতির বৈঠক' অভিধাযুক্ত রচনায় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন: "তাঁর 'চরিত্রহীন' বা 'গৃহদাহ' বোধ হয় কোনও সাময়িক পত্রে বেরোয় নি।" নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায় যে, এই দুখানি উপন্যাসই প্রথমে সাময়িক পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। শরৎচন্দ্র লোকান্তরিত হওয়ার পর ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু কবি মনীষী ও সাহিত্যিকের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষের পক্ষে' শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রবোধবাবু নিজে। চৈত্র সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের একান্ত স্নেহের পাত্রী, 'দিদি' উপন্যাসের রচয়িত্রী নিরুপমা দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মদেশ থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শরৎচন্দ্র তাঁদের বহরমপুরের বাড়ীতে এসে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। "এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি চরিত্রহীন লিখিতে আরম্ভ করেন এবং 'যমুনা'য় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।"

(—"প্রথম যেদিন শরৎদা"—শ্রীনিরুপমা দেবী, —ভারতবর্ষ চৈত্র, ১৩৪৪, পৃঃ ৫১৭)

প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখ্য যে, 'প্রথম দিকে শরৎচন্দ্রের শুধু ছোট বা বড় গল্প' নয়, উপন্যাস এবং অনিলা দেবীর ছদ্মনামে লিখিত নানা প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল ফণীন্দ্র পাল সম্পাদিত যমুনা পত্রিকায়। 'চরিত্রহীন' ভারতবর্ষে প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হলেও 'গৃহদাহ' কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল ওই পত্রিকাতেই। প্রথম প্রকাশ : ১৩২৩ সালের মাঘ সংখ্যা। ধারাবাহিক রচনা প্রকাশে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ত। উপন্যাস-খানি সমাপ্ত হয় ১৩২৬ সালের মাঘ সংখ্যায়। পরে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২০ মার্চ, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, (ফাল্গুন, ১৩২৬)। এম সি সরকার প্রকাশিত শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ সপ্তম সম্ভারে 'গৃহদাহে'র প্রকাশকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

যে কয়েকজন সম্পাদক শরৎচন্দ্রের প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমেই মনে আসে, যমুনা-সম্পাদক সেই ফণীন্দ্র পালই লক্ষণীয়ভাবে অনুল্লেখিত রয়েছেন প্রবোধবাবুর রচনায়। 'বন্ধু' জলধর সেনের সঙ্গে পরিচিত হবার বহু আগে থেকেই ফণীন্দ্র পালের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় শরৎচন্দ্রের। প্রথম দিকে যমুনা পত্রিকায় শুধু যে তাঁর বেশির ভাগ রচনা প্রকাশিত হত তাই নয়, সুদূর রেঙ্গুন থেকে পত্রযোগে এই পত্রিকা সম্পাদনে সাধ্যমত সহযোগিতাও করতেন।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন শরৎচন্দ্র তখন যে দুজন তরুণ বয়স্ক সম্পাদক তাঁর বিশেষ প্রীতি-ভাজন হয়েছিলেন তাঁদের একজন বাতায়ন সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, অপরজন বেণু সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।

নলিনীকুমার ভদ্র
কলিকাতা ৯

॥ ২ ॥

'দেশ' সাপ্তাহিকে ক্রমশ প্রকাশিত সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'বনস্পতির বৈঠক' প্রতি সপ্তাহে খুব আগ্রহসহকারে পাঠ করি।

কিন্তু মনে হয়, লেখাগুলি সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর বলিয়া ইহাতে মাঝে মাঝে গুরুতর রকমের তথ্যগত ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি (২৯-৯-৭৩ তারিখের সংখ্যা) প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন—"শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' নামক উপন্যাস দুইখানি নাকি কোন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। ইহা তথ্যের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ভুল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সাহিত্যসাধক চরিতমালা"র চতুর্থ খণ্ডে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ প্রসঙ্গে নিম্ন-লিখিত বিবরণ দেওয়া আছে—'চরিত্রহীন' (উপন্যাস)—কার্তিক ১৩২৪, ১১ নবেম্বর, ১৯১৭—পৃঃ ৫৬৬।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সনের কার্তিক—চৈত্র ১৩২১ সনের 'যমুনায়' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্য ভাগে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের সহিত 'বাতায়ন' সম্পাদক স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের যে কথোপকথন হয় তাহা 'শরৎপ্রসঙ্গ' নামে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখের 'স্বদেশীবাজার'-এ বাহির হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র তাহাতে বলিয়াছিলেন—

"আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বলতে যা বোঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তখন ফণি পালের 'যমুনা' মাসিকপত্র খানা মরমর—আমিও সবেমাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণিবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্য কিছু লিখতে অনুরোধ করেন।

এই যমুনাতেই আমার চরিত্রহীন এর খানিকটা বেরিয়েছিল। ইহা ছাড়া, শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে মাতুল প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্মৃতিকথা" ১ম খণ্ডের ২০৭—২০৮ পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসখানা যে 'যমুনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে উল্লেখ আছে।

প্রাগুক্ত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র চতুর্থ খণ্ডে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস খানি সম্বন্ধেও নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া আছে—'গৃহদাহ' (উপন্যাস) ফাল্গুন ১৩২৬, ২০শে মার্চ ১৯২০; পৃষ্ঠা ৫৩২। ইহা ১৩২৩ সনের মাঘ-চৈত্র; ১৩২৪ সনের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ সনের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৬ সনের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ; পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে-এ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

কালীপদ সাহা
দিনহাটা, কুচবিহার

সাম্প্রদায়িকতার উৎস

শ্রী জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সাম্প্রদায়িকতার উৎস" (দেশ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) এমন একটি যুক্তি-শৃঙ্খলবদ্ধ প্রবন্ধ যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাটির বিশ্লেষণ করবার একটা ইচ্ছে জাগিয়ে তোলে। জয়ন্তানুজবাবুর এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, দুই ধর্মের মানুষের সংঘাতের বাহিরাবরণের ভেতরে রয়েছে অর্থনৈতিক আর সামাজিক শোষণের যন্ত্রণাজাত আর্ত চীৎকার।

জয়ন্তানুজবাবু হিন্দু আর মুসল-মানের একই সমাজের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানের যে চিত্রটি এঁকেছেন সেটি নিখুঁত নিশ্চয়ই। কিন্তু একথা বোধ হয় না বলে পারা যায় না যে প্রাক্-স্বাধীনতা বাংলাদেশে হিন্দু-মুসল-মানের ক্ষেত্রে ওটি পুরোপুরি সত্যি হলেও, ভারতের অন্য অনেক অংশে, বিশেষত উত্তর ভারতে, অবস্থাটা একটু অন্যরকম ছিল। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গতিময় বাংলাদেশের দিকে আমরা একটু তাকাই। বড়ো বড়ো জমি-দারেরা হিন্দু। তাঁদের কৃষিজমিতে খাটে গরীব মুসলমান আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা। সমাজের অগ্রণী শ্রেণীতে মুসলমান প্রায় নেই বললেই চলে। সাহিত্যিক, সঙ্গীত-শিল্পী, বড় রাজকর্মচারী, মন্ত্রী, অধ্যাপক, পসারওয়ালা উকীল সবাই প্রায় হিন্দু। গোড়ার দিকের স্বাধীনতা আন্দো-লনে পর্যন্ত হিন্দুর পুনরুত্থানের স্বপ্ন। এই পরিপার্শ্বিককে একজন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান খানিকটা দিশা-হারা। হিন্দুপ্রধান এই সমাজে তাঁর স্থান কোথায় এই প্রশ্ন তাঁর মনে জাগাই স্বাভাবিক। তাঁর মন আহত হয় যখন তিনি দেখেন এই সমাজে একজন হিন্দু একজন মুসলমানের ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত অশুচি মনে করে।

কিন্তু ওই সময়ে উত্তর ভারতে অভি-জাত মুসলমান শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। তাঁদের মধ্যে জমিদারও আছেন অনেক, যাঁদের প্রজারা দরিদ্র হিন্দু। ওই অভিজাত মুসল-মান শ্রেণী শিল্প-সংস্কৃতি, সঙ্গীত,

সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতেও অগ্রসর। উর্দু ভাষার বাড়বাড়ন্ত। শিক্ষিত হিন্দুরাও অনেকেই ওই ভাষায় সাহিত্য পড়েন, ওই ভাষায় লেখেন। কিন্তু মনে মনে ওই ভাষাকে মুসলমানের ভাষা ভেবে অস্বস্তি বোধ করেন। সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রভাব খর্ব হলে ওখানকার হিন্দুদের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা।

এই বিশ্লেষণ থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের রূপটা, যা ভারতের সর্বত্রই একই চরিত্রের নয়, পরিষ্কার হয়ে যাবে। জয়ন্তানুজবাবু বলেছেন যে, ইংরেজ আমলে সরকারী প্ররোচনায় এবং স্বার্থান্বেষী নেতাদের পরিচালনায় মুসলমানেরাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাথমিক আগ্রাসীর ভূমিকা নিতেন। এটা আংশিক সত্য হতে পারে, অর্থাৎ বাংলাদেশের বেলায় হয়তো কথাটা খাটে। এখানে দরিদ্র মুসলমানের ক্রোধ ও ঘৃণাকে ব্যবহার করা সহজ ছিল, বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে কিছু পাবার আশায় ঝিলিক দেখিয়ে। ঠিক একইভাবে ভারতের অন্য অনেক অংশের দরিদ্র হিন্দুকে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া কঠিন ছিল না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু আর উচ্চশ্রেণীর মুসলমান নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে কথার তুবড়ি আর লেখার হাউই ছোটালেও নিজেরা খুনোখুনিতে লিপ্ত হতেন না। দাঙ্গাটা মূলত শুরু হতো এক ধর্মের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের অপর ধর্মের উচ্চশ্রেণীর মানুষকে আক্রমণ দিয়ে।

জয়ন্তানুজবাবু বলেছেন যে, হিন্দু সমাজে আছে উদার পরমতসহিষ্ণুতা আর অভাব আছে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের। আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র তো হিন্দু সমাজে অস্তিত্বহীন নিশ্চয়ই, আর পরমতসহিষ্ণুতা অর্থে যদি অন্য ধর্মের লোককে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত না করার ইচ্ছা বোঝায় তবে এই মত গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়ই। ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম যেমন বিভিন্ন উপায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু হিন্দু সমাজ বোধহয় জন্মসূত্রে হিন্দু ছাড়া কাউকেই হিন্দু বলে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। যদিও কিছু কিছু বৈদেশিক জাতির বংশধরেরা ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মিশে যাবার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু সেটা কতকটা যেন অজানতে। বিধর্মীকে হিন্দুসমাজ মানুষের মর্যাদাই দিতে চায়নি। বিধর্মীর হাতে জল খেলে তার জাত চলে যায়। কোনো মুসলমান বা খৃষ্টান কোনো অভিজাত হিন্দুর বাড়ীর বৈঠকখানাতে ঢুকবার এবং বসবার অধিকার পেলেও, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হতো, এমনই অপবিত্র জিনিস সেই বিধর্মী, যদিও তিনি মানুষ। অনেক সাম্রাজ্যলিপ্সু মুসলমান শাসক হিন্দুর দেবালয় ধ্বংস করেছেন। কিন্তু একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে অশুদ্ধ মনে করে হিন্দু সমাজ নিশ্চয়ই কোনো মহত্ত্বের উদাহরণ রাখেনি। যাঁরা নিজের ধর্মের নিম্নবর্ণের লোকের ছায়া মাড়ালে জাত গেলো বলে চীৎকার করেছেন, যাঁরা নিজের ধর্মের কিছু মানুষকে কোনো কোনো দেবালয়ে প্রবেশ করতে দেননি, যাঁরা নিজ ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ শুনতে পর্যন্ত মানা করেছেন তাঁদেরই সমাজের একটি বিরাট অংশকে, তাঁদের কাছে পরমতসহিষ্ণুতা আশা করাই বোধহয় ভুল।

জয়ন্তানুজ হিন্দু সমাজে অগণিত ধর্মীয় মতের সহাবস্থানের কথা বলেছেন। কি রকম সহাবস্থান? শৈব ও বৈষ্ণবের সহবস্থান? এরকম সহাবস্থান তো প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক, শিয়া এবং সুন্নী, হীনযান ও মহাযান, অথবা, দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের মধ্যেও আছে।

আজকের এই পশ্চিম বাংলার দিকে তাকিয়ে ভারতের সকল অংশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কতটা গভীরে রয়েছে তা ঠিক বোঝা যাবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে উদারনৈতিক চিন্তাধারার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। গত দুশো বছরের ইতিহাসেই এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। 'যত মত তত পথ' এই বাণী শোনা গেছে এই দেশেরই মহাপুরুষের মুখ থেকে গত শতকের শেষ ভাগেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতের কোনো কোনো অংশে শিক্ষিত হিন্দু সমাজেও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা এবং বিধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট। এই বিদ্বেষ এমনকি ভিন্ন ভাষাভাষীর দিকেও ধাবিত। ওইসব অঞ্চলে বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনে পর্যন্ত ধর্ম আর জাতের প্রভাব যে কি পরিমাণে ভারী তা এই পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী প্রকৃতি দেখে বোঝা যাবে না। জয়ন্তানুজবাবুকে অনুরোধ, তিনি আরও একটি এইরকম চিন্তা স্বাক্ষরবাহী প্রবন্ধ লিখে এই অন্ধকার দিকটির ওপর আলোকপাত করুন। এই বিংশ শতকের শেষভাগেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব সুস্থ চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। বিদ্বেষ রূপ নেই বীভৎসতায়! কয়েক বছরের সংবাদপত্রের পাতাগুলোকে একটু মনে করুন, দেখবেন তারা সাক্ষ্য দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। দেখবেন সেইসব কাহিনী বড়ো করুণ, বড়ো মর্মস্পর্শী। দেখবেন সেখানে মানুষের কান্না, মানবতার কান্না।

অশোককুমার দাশগুপ্ত
রিজেণ্ট এস্টেট, কলকাতা

॥ ২ ॥

গত ১২ আশ্বিন সংখ্যার দেশ পত্রিকায় শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় "সাম্প্রদায়িকতার উৎস" প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি ও উহার সমাধান সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এরূপ নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ মত প্রকাশের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সম্বন্ধে তিনি যে কারণগুলির উল্লেখ করেছেন ইতিপূর্বে অনেকেও কমবেশী এই কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই সমস্যার যে সমাধান তিনি দিয়েছেন ইতিপূর্বে তা কেউ দিয়েছেন

বলে জানি না। তিনি লিখেছেন "এই সমস্যা দূর করতে হলে মানবতার উপরই রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা নয় ধর্মহীনতার উপরই মানবতার জয়স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব।" তার এই বক্তব্য সম্বন্ধে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ও রাষ্ট্রনায়কদের গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হবে না। তার প্রধান দৃষ্টান্ত ভারত। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের দুইটি প্রধান রাষ্ট্রীয় নীতি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ ২৬ বৎসরের চেষ্টায়ও ভারত থেকে এই অভিশাপ দূর করা যায় নাই। বাংলাদেশের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের চেষ্টার ব্যর্থতার পর বাংলাদেশে এই নীতি অবলম্বন সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ করা যাবে বলে যদি কেউ বিশ্বাস করেন তবে তিনি হতাশ হবেন। তাই আমার দৃঢ় ধারণা একমাত্র পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই এই অভিশাপ উভয় দেশ থেকে দূর করা সম্ভব। কারণ এই ব্যবস্থায় মানুষের মন থেকে ধর্মের প্রভাব শিথিল হবে এবং তার পরিবর্তে মানবতা বোধ বৃদ্ধি পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যও দূর হবে।

খোন্দকার কেরামত আলী
ঢাকা-১

॥ ৩ ॥

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ৪৮ সংখ্যার দেশে শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাম্প্রদায়িকতার উৎস' আগ্রহ সহকারে পড়লাম। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও তার টিকে থাকার কারণ সম্বন্ধে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যা লিখেছেন তা হয়ত সত্য। যেভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই সমস্যার উৎস তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তা তাঁর যুক্তিনির্ভর সংস্কার-শূন্য মনের পরিচয় দেয়। মানুষের শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে সাধুবাদ জানাবেন নিঃসন্দেহে।

তবু প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ পড়বার পর লেখকের নিজের মানসিকতায় একটা বৈপরীত্য লক্ষ্য করলাম। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান্ধীর প্রগতি-শীল ও আধুনিক সংস্কারশূন্য মনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, একে প্রশংসা করেছেন। তবু গান্ধী যে সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন এর কারণ "সাম্প্রদায়িকতাকে শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় বোঝাপড়ার ব্যাপার মনে করা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুতর ভুল এবং এক গভীর ও বহুমুখী সামাজিক সমস্যার অতি সরল ব্যাখ্যা ও সমাধানের প্রয়াস মাত্র" এবং এই জন্যই গান্ধী ভ্রান্ত পথে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন শুধু মিষ্টি কথা বা ধর্মচিন্তার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নয় অথবা কোন নকল মানবগোষ্ঠীর হৃদয়ের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। হয়ত ঠিকই লিখেছেন তিনি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের ব্যাপারে তাঁর মতামতও, যার আভাষ প্রবন্ধের শেষে তিনি রেখেছেন—একটা আদর্শ ও ভাববাদী চিন্তার ফলশ্রুতি মনে হয়েছে আমার। লেখক একটা সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব করেছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং লেখকের মতে ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বিজ্ঞান ও মানবতাধর্ম গ্রহণ করতে হবে—তাহলেই সামাজিক বিপ্লব সম্ভব। তাঁর একথা হয়ত ঠিক, কিন্তু ঠিক হলেও এটাও কি একটা মিষ্টি Slogan হচ্ছে না? শুধু কথাতেই বা ইচ্ছাতেই কি মানুষ বিজ্ঞান ও মানবতাধর্ম গ্রহণ করে ফেলবে তিনি বিশ্বাস করেন?

বিজ্ঞান যেখানে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের থেকে শতগুণে উন্নত ও ব্যাপক, সেই আমেরিকাতেও বর্ণবিদ্বেষ দূর করা সম্ভব হয় নি। আমেরিকার সবাই যদি আজ তাদের ধর্মের আসন তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, তবে আমিও বিশ্বাস করি বর্ণবিদ্বেষ দূর করা সম্ভব হবে। কিন্তু জনসাধারণকে মানবধর্ম গ্রহণে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা কিংবা তাদের হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা সমার্থক নয় কি?

দেবব্রত ঘোষ
আসানসোল

॥ ৪ ॥

'দেশে' প্রকাশিত "সাম্প্রদায়িকতার উৎস" শীর্ষক নিবন্ধে লিখিত কয়েকটি তথ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ আপত্তি জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে—'ভদ্রবেশী এই বর্বরতা আধুনিক যুগে ভারতীয় উপ-মহাদেশে ধর্মান্ধতা ও বিকারগ্রস্ত রাজ-নীতির যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বলি দিয়েছে আর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে করেছে খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত।' আমার মনে হয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই সাম্প্রদায়িকতা ভদ্রবেশ ধারণ করতে পারেনি। মুষ্টিমেয় অসামাজিক ব্যক্তির নিকট এটা সামাজিক আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এ কথা কি সত্য যে, সাম্প্রদায়িকতার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। এছাড়া আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে সাম্প্রদায়িকতা কোন সমস্যাই নয়, বরং নীতিবিহীন রাজ-নীতির জন্যই শত শত মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছে।

'পৃথিবীর সামনে রচনা করেছে এদেশের জন্য এক হীন স্থান'—এই কথাটির অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্য। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা যদি হীনস্থানের কারণ না হয় তাহলে কেবলমাত্র সাম্প্র-দায়িকতা ঠিকই এই হীনস্থানের কারণ হবে কি করে? ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা বর্তমানে দুর্বলতম সামাজিক শক্তি, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা আছে কিন্তু অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অনুপস্থিতির জন্য সেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। আবার ধর্মবর্জিত সমাজ-তন্ত্রী দেশেও রাজনৈতিক দাঙ্গা বিরল নয়। অতএব ধর্ম বর্জন করলেই 'হীনস্থান' পবিত্র স্থানে পরিণত হয় না। সমস্যাটি আরও গভীর, একথা নিশ্চয়ই মননশীল মানুষের অগোচর নয়।

প্রবন্ধটিতে আরও কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্যের পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি যদি এই সামাজিক রোগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণে সমর্থ হতেন তাহলে এই সমস্যা সমাধানের এত সহজ ব্যবস্থা দিতে পারতেন না বলেই মনে হয়।

মদনমোহন দে
মেদিনীপুর

যাদুবিদ্যা

যাদুবিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড)। অশোক রায়। লেখক কর্তৃক ১২/১ [illegible] রোড কলকাতা ২৫ থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ টাকা।

নিতান্ত শিশু বয়সে একটি বালকপাঠ্য যাদুবিদ্যার বইয়ে পড়েছিলাম, 'এক্স-রে আই' খেলাটির মূলে রহস্য নাকি পায়ে দড়ি বাঁধা। আপাত-অদৃশ্য ওই দড়ির অন্য প্রান্তে সাঙ্কেতিক টানের সাহায্যে সহকারী আড়াল থেকে যাদুকরকে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে দেন। খেলার বিস্তারিত বর্ণনা পড়ে মনে হয়েছিল, সত্যিই বেধহয় দিব্যদৃষ্টি লাভ হল। এর কিছুদিন পরই কলকাতার খোলা রাজপথে চোখ-বাঁধা অবস্থায় মোটর-সাইকেল চালিয়ে গেলেন তৎকালীন এক তরুণ যাদুকর। বই-পড়া বিদ্যে নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভেবেছিলাম, পায়ে দড়ি বেঁধে সহকারীর পাঠানো বার্তায় যিনি মোটর-সাইকেল চালাচ্ছেন তিনি বড়ো, না যে-সহকারী সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকে হাওয়ার থেকে দ্রুতগামী হয়ে প্রকাশ্য রাজপথের ওপর পাল্লা দিয়ে দৌড়ে চলেছেন তিনিই আরও বড়ো যাদুকর।

শুধু এই খেলার জন্যই নয়, পরবর্তী কালে কিছু-কিছু বিদেশী বই হাতে আসায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, বাংলা বই পড়ে ম্যাজিক শেখার চেষ্টা করা বাতুলতা। যাঁরা লেখেন তাঁরা জানেন না এমন-নয়, তবু জানাবার আগ্রহ তাঁদের একদমই নেই। হয়তো গুরুমুখী করে রাখতে চান এই কলাকে কিংবা অন্য কোনও গূঢ়তর কারণ রয়েছে। কিন্তু উইলফ্রিড জনসনের 'ম্যাজিক ট্রিক্স অ্যান্ড কার্ড ট্রিক্স' বা 'মিঃ স্মিথস গাইড টু স্লাইট অফ হ্যানড' কিংবা বিল টার্নারের 'দি কার্ড উইজার্ড' ধরনের প্রাথমিক বই লিখতে কি সত্যি কোনও অসুবিধা হবার কথা? এমন-কি বার্কের কিশোরোপযোগী অবসর-বিনোদন-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হ্যারি ক্লার্কের 'ম্যাজিক'-এর মতো একটি গ্রন্থও বাংলা-ভাষায় কেন চোখে পড়ে না, এর কোনোই সদুত্তর নেই। ফলে তথাকথিত যাদুচর্চার আদি পীঠস্থান ভারতবর্ষের কোনো উৎসাহী উদ্যোগী ইচ্ছুক যাদুকরের পক্ষে দেশী বই পড়ে ম্যাজিক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করাও সম্ভব নয়।

এই সব কারণেই শ্রীঅশোক রায়ের 'যাদুবিজ্ঞান' গ্রন্থটি হাতে নিয়ে প্রথমে কোনো বিরাট প্রত্যাশা বা কৌতূহল জাগে নি। মনে হয়েছিল তিনিও হয়তো চিরাচরিত রীতিতে কিছু লিখবেন। কিন্তু বইটি পড়ার পর সে-ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়েছে, একথা সানন্দে স্বীকার্য। সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবসম্মত রীতিতে 'যাদুবিজ্ঞান' গ্রন্থটি লিখেছেন তিনি। যাদুচর্চায় উৎসাহী যে-কোনো ব্যক্তির প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ ইন্দ্রজাল সৃষ্টির মূল রহস্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান গড়ে তোলার পক্ষে সত্যি-কারের সহায়ক গ্রন্থ বাংলাভাষায় তিনিই প্রথম লিখলেন, এ-কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য।

শ্রীঅশোক রায় নিজে প্রবীণ অভিজ্ঞ যাদুকর। তিনি সেই যুগের যাদুকর যখন যাদু শুধুই মঞ্চকেন্দ্রিক যান্ত্রিক কৌশল

বিষ্ণুপুরের পুরোনো তাস

ছিল না, ছিল না শুধুই বিনোদন, যখন অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রতিটি স্তরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যাদুকরের ব্যক্তিগত সাধনার উপর নির্ভর করতে হত। অভিনয়, বাক্-পটুতা, প্রদর্শনভঙ্গির সঙ্গে আবশ্যিকভাবে আয়ত্ত করতে হত হস্ত-কৌশল। গভীর অধ্যবসায়, অভিনিবেশ, পাঠাভ্যাস, নিষ্ঠা, চর্চা ও প্রস্তুতি ছাড়া বিভ্রমকে অলৌকিক ও অসম্ভবের স্তরে উত্তীর্ণ করা যায় না বলেই তখন স্বীকার্য করা হত। বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য সমস্ত কিছুকে নিয়েই যাদুজগত এবং এ-সমস্তকে ছাপিয়েই তার প্রতিষ্ঠা। যাদুও এক ধরনের শিল্পকলা, শুধুই প্রমোদকলা নয়—এ-বিশ্বাস না থাকলে এ-ধরনের বই রচনা করা সম্ভব নয়।

অশোকবাবু এ-কথা জানেন বলেই বিস্তৃত এই গ্রন্থে সার্থকভাবে পত্তন করতে পেরেছেন এগারোটি সুরচিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত সেই পরম শিল্পকলার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। যাদুচর্চার ধর্ম, উদ্দেশ্য, অবলম্বন, আয়োজন, রসসৃষ্টি ও সার্থকতার মূলে [illegible] বিষয়টির সন্ধান তিনি প্রথম অধ্যায়েই প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'তাসের ইতিবৃত্ত' অধ্যায়ে শুনিয়েছেন তাস-উদ্ভবের রকমফের, রেওয়াজ ও বৈজ্ঞানিক তথ্য। এরপর, নিজস্ব অভিজ্ঞতাবলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে স্তরে-স্তরে উত্তীর্ণ করেছেন বৃহত্তর পরিধিতে। শতাধিক ছোট-বড়-মাঝারি খেলা শিখিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন মঞ্চমায়ার গভীর রহস্যময় ব্যাপ্ত জগতে। শুধু কৌশল ব্যক্ত করেই কর্তব্য শেষ করেন নি তিনি, যাদু-পরিবেশ নির্মাণের প্রতিটি নিখুঁত নিখুঁত ভঙ্গি, সতর্কতার প্রতিটি স্তর সম্পর্কেও দিয়েছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী। যাদু-সরঞ্জাম তৈরীর উপকরণ ও পদ্ধতি প্রায় প্রতিটি খেলার সঙ্গে যোগ করেছেন। সহায়ক হিসেবে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য রেখাচিত্র—যা ফলিত এই বিদ্যার আরেকটি অপরিহার্য অঙ্গ। পরিসর যেখানে স্বল্প, যেমন 'দর্পণের যাদু' অধ্যায়—সেখানেও মূল নীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে অনুসন্ধানী মনকে কৌতূহলী করে তুলেছেন। মঞ্চমায়ার বহু কৌশল বর্ণিত হয়েছে এই খণ্ডে। কিন্তু এর পরিধি এত ব্যাপক যে, এ-নিয়েই স্বতন্ত্র কয়েকটি খণ্ড রচনা করা যায়। আশা করি, পরবর্তী খণ্ডে সেগুলিই প্রধানত উপজীব্য হবে। শ্রীমতী অর্চনা বসু

নিবিড় ভারতীয় বাদ্যের ক্রমবিকাশ অনুসন্ধিৎসু মূল্যবান সংযোজন।

আপাতভাবে গ্রন্থটি দুর্মূল্য মনে হতে পারে, কিন্তু যে-ঐকতানগুলির দেখানো হয়েছে কলকাতার কোনো বাদ্যের দোকানে তার মূল যন্ত্রগুলির কাঠামোর দামই এর দশগুণ বেশী—এ-কথা ভুললে চলবে না।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শুধু বিষয়ের জন্যই নয়, সর্বাধুনিক তথ্যের সংযোজনে আলোচনার পরিসরের ব্যাপকতায় এবং বর্ণনার সজীবতায় অজয় হোম রচিত **বাংলার পাখি** (প্রীতি প্রকাশনী, সাড়ে বারো টাকা) একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ রূপে গণ্য হবে। বাংলাভাষায় পাখি সম্পর্কে কোনও আধুনিক বই বহুদিন যাবৎ ছিল না। জগদানন্দ রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সত্যচরণ লাহা প্রমুখের বই দীর্ঘদিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য। সুধীন্দ্রলাল রায়ের "বাংলার পরিচিত পাখি' বোধ হয় এখনো পাওয়া যায়। বনফুলের 'ডানা'তেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা বেশী নয়, এবং সর্বোপরি, পাখি সম্বন্ধে সর্বাধুনিক তথ্য-সমৃদ্ধ একটি বইয়ের অভাব সত্যিই ছিল। বিদেশে সাধারণের উপযোগী নানান বিষয়ে যেভাবে বই বেরোয়, দেখলে অবাক হতে হয়। বাংলায় সেরকম হয় না। অজয় হোমকে ধন্যবাদ, তিনি বিশেষ একটি অভাব মিটিয়েছেন।

অজয়বাবু প্রবীণ পক্ষিতত্ত্ববিদ্। বাংলার পাখির প্রথম খণ্ডে এই বাংলার প্রায় দু'শো পাখির আলোচনা করেছেন তিনি। প্রায় প্রতিটি প্রধান পাখির ছবিও দিয়েছেন। তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য হল, বংশ ও বর্গ (অর্ডার) অনুসারে ভাগ করে নিয়ে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত পন্থা বজায় রেখেছেন। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক কিন্তু সাধারণ পাঠকও স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবেন বইটি। এর প্রধান কারণ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনার সজীবতা। প্রত্যেকটি পাখির আকৃতি, বাসস্থান, খাদ্য, স্বভাব, কণ্ঠস্বর অন্যান্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অল্প কথায় চমৎকারভাবে লিখেছেন তিনি। নিজস্ব অভিজ্ঞতার গল্পও জুড়ে দিয়েছেন মাঝে মাঝে। ফলে বইটি তথ্যপূর্ণ হয়েও কখনো নীরস মনে হয় না।

সত্যজিৎ রায়ের অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রটি গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

*

অমিয় সিংহ সম্পাদিত **কবিতা উল্লেখ্য '৭২** (মণি প্রকাশনী, সাড়ে চার টাকা) একটি সংকলন-গ্রন্থ। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত কবিতার একটি বাছাই সংকলন। এ-ধরনের উদ্যোগ অবশ্য নতুন নয়। কবিতা-পরিষদ-এর উদ্যোগে এরকম একটি প্রয়াস এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা কবিতা বার্ষিকী' কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল অনেকেরই মনে পড়তে পারে। কয়েক মাস আগে ১৯৭২-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা জাতীয় আরেকটি সংকলন গ্রন্থ আরও সুদৃশ্য চেহারায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতা, উল্লেখযোগ্য কবিতা এগুলি প্রায়-ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক। সম্পাদকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অনেকখানি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন, কবিতা উল্লেখ্যতে এমন বহু কবির নাম পাওয়া গেল যাঁরা ১৯৭২-এর শ্রেষ্ঠ কবিতায় স্থান পান নি। আবার ওই সংকলনে যাঁদের একাধিক রচনা শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্থান পেয়েছে এই সংকলনে তাঁরা অনুল্লেখ্য বিবেচনায় পরিত্যক্ত। একমাত্র ছ জন কবি ব্যতিক্রম, তাঁরা হলেন: তুষার রায়, দেবারতি মিত্র, বিনয় মজুমদার, বেলাল চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় (বর্ণানুক্রমিকভাবে লিখিত)। দু'টি সংকলনেই তাঁদের একই কবিতা স্থান পেয়েছে। অঙ্কের নিয়মে এঁরাই কী ১৯৭২-এর উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ কবি!

*

তারাপদ ভট্টাচার্যের **অন্ধকারে সর্প শিকার** (জ্যোতি গ্রন্থম, ছ টাকা) নামটি কবিতার মতো শোনালেও আসলে গ্রন্থটি উপন্যাস। চাকরির সূত্রে এক সীমান্তবর্তী গ্রামে গিয়ে শ্যামল আবিষ্কার করল একদা-অধ্যাপক দিব্যেন্দু প্রসাদ'কে। এক আশ্চর্য পুরনো প্রসাদের অন্দরমহলের প্রায়-অপ্রাকৃত পরিবেশে ইতিহাসের অধ্যাপক ও ছাত্র অযোধ্যার ভূতুড়ে পরিবেশ আরম্ভ। দিব্যেন্দুপ্রসাদের বংশের ইতিহাস এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। অপের্চ নারীর লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও পাপের এক বিচিত্র বংশে জন্ম তাঁর। সেই অভিশপ্ত দেবরায় পরিবারের গল্প শোনালেন দিব্যেন্দুপ্রসাদ ছাত্রকে। গল্পটি নিশ্চিত কৌতূহলকর, কেননা লুণ্ঠন, ব্যাভিচার; অত্যাচারের সোনার কাঠিতে যে-কোনো গল্পই কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকে জিইয়ে রাখতে পারে। তাছাড়া গল্পটি যেহেতু প্রাচীন জমিদার বংশের, সেখানে সমস্ত যুক্তিতর্কই নতজানু। তবু, শিক্ষিত দিব্যেন্দুপ্রকাশ কীভাবে বললেন এবং শিক্ষিত ছাত্র শ্যামল সারারাত জেগে কীভাবে হজম করল সে-প্রশ্ন নিশ্চিন্ত তোলা যেতে পারত। তবে কিনা, লেখক নবাগত। অটোমেটিভাবে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়বার মতো উপাদান যে তিনি পরিবেশন করেছেন তাই বা কম কী!

বিবিধ

কলিকাতা সমাচার। প্রণবকুমার ঘোষ। পার্থসারথি প্রকাশন। ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা-৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

এথেন্স, রোম, বারাণসী বা দামাস্কাসের তুলনায় কলকাতার বয়স যৎসামান্য হলেও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস কিন্তু কম চিত্তাকর্ষক নয়। কলকাতা কেবল বাংলারই নয়, দীর্ঘ দিন ভারতেরও রাজধানী ছিল। সে কারণে শহর কলকাতার ক্রমশ ও ক্রমান্বয় বিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। ইংরেজরাই স্বভাবিকভাবেই কলকাতার ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলস্বরূপ উনিশ শতকেই কলকাতা সম্পর্কিত কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থ আমরা পাই। পরবর্তী যুগে কয়েকজন বাঙালী ঐতিহাসিকও কলকাতার ইতিবৃত্ত রচনায় উদ্যোগী হন। সাম্প্রতিক কালেও এ শহরকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি গবেষণাগ্রন্থ। সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থটি প্রণবকুমার ঘোষ মহাশয়ের বর্তমান গ্রন্থটি।

ইংরেজ অধিকারের পূর্বযুগ থেকে উনিশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত এ গ্রন্থে কলকাতার সামগ্রিক জীবনের একটি রূপ-রেখা গ্রন্থকার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। 'কলকাতা' নামের উৎপত্তি, নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বিদ্বৎসভা, মঠ-মন্দির, সংবাদ-পত্র, নাট্যশালা, রঙ্গালয় প্রভৃতি বিষয় তিনি আলোকপাত করেছেন। আর সেই সঙ্গে আছে কলকাতায় গড়ে-ওঠা চারুকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য ও ধর্মীয় আন্দোলনের কয়েকটি তথ্যবহুল অধ্যায়। বর্তমান গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের প্রয়োজনে আসবে বলেই বিশ্বাস।

বিদেশী বই

Memorandum ইতালীয় কথা-সাহিত্যিক পাওলো ভলপোনির প্রথম উপন্যাস। জার্মান যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া এক যুবককে নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। অবশ্য কাহিনী বলতে যা বোঝায় এ উপন্যাসে তা খুব বেশী নেই। চমকে দেবার মত ঘটনা বা পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টাও খুব সামান্য। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের নায়ক তার জীবনের কথা বলে চলেছে। আপাতদৃষ্টিতে বিবরণ-ধর্মী এবং স্মৃতিকথার আদলে সাজানো প্রায় আড়াই শ' পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে জাঁক-জমকের আয়োজন খুবই কম। নিতান্ত সাদামাঠা সরলভাবে এগিয়ে চলে কাহিনী। কিন্তু ভলপোনির আসল বাহাদুরি এইখানে। আবেগহীন নিরুত্তেজ সেই বিবরণের মধ্যে তিনি তৈরি করে নিতে জানেন অদ্ভুত এক টান। তাঁর অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক অনুভূতি আর তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির জোরে কাহিনীর আকর্ষণ কখনোই ফিকে হয়ে পড়তে পারে না। ছড়ানো ছিটোনো স্মৃতির সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে উপন্যাসের নায়ক আমাদের ক্রমশ টেনে নেয় তার ব্যক্তিজীবনের গভীরতর এক সীমানায়। যেখানে চার-দিকের অনিবার্য অথচ অসুস্থ বাস্তবতার মোড়ক ভেঙে ফেলে সে সূর্যোদয়ের মত পবিত্র সুন্দর এক জীবনের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু ভলপোনির আসল অভিপ্রায় যতই গুরুগম্ভীর হোক তার চাপ লেখাটাকে কখনোই ভারী হয়ে উঠতে দেন না তিনি। কখনো চাপা কৌতুকের মেজাজ, কখনো বা সূক্ষ্ম শ্লেষের আবরণ, আবার কখনো অপূর্ব এক কাব্যময়তায় সমস্ত লেখাটা ঝকঝকে হয়ে থাকে। আর আধুনিক সভ্যতার প্রচলিত নকশাটাকে দুমড়ে মুচড়ে তার মধ্যে এক হাস্যকর অসংগতি দেখাতে দেখাতে লেখক নিজেও বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

কবি হিসেবে ভলপোনি আগেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রথম উপন্যাস এবং পরবর্তী 'The World Wide Machine' ইতালীয় কথাসাহিত্যে তাকে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আলোচ্য উপ-ন্যাসটি পড়তে পড়তে অবশ্য আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের এক ধরনের উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে প্রায় সব নায়কেরাই বড় বেশী নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ আর বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। অবিশ্বাসী, সন্দেহপ্রবণ সেই নায়কদের 'প্যারানোইয়া' পরবর্তী প্রজন্মের কথাসাহিত্যে, এমন কি হাল আমলের উপ-ন্যাসেও যেন রাজপাট বিছিয়ে বসে আছে। সন্দেহ নেই, এই মানসিক ব্যাধি প্রধানত দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফসল, কিন্তু অংশত হয়তো আধুনিক বুদ্ধিমানসের ব্যর্থ বিদ্রোহের, অবদমিত বাসনার গূঢ় প্রতিফলন। ভলপোনির নায়কের জীবন এবং অভিজ্ঞতা এই দুটি সূত্রের সংগেই সংবদ্ধ।

১৯৪৫ সালের কোন এক সময়ে জার্মান যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে ছাড়া পেয়ে

THE MEMORANDUM. Paolo Volponi. Calder and Boyars. London. 15s.

ইতালীতে ফিরে এল পঁচিশ বছরের একটি যুবক। তার নাম আলবিনো সালুগিও। জীবন সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত, দেহে মনে অসুস্থ সালুগিও আর-একবার নতুন করে সব কিছু আরম্ভ করতে চায়। ছেলেবেলা থেকেই সে বড় রুগ্ন আর ভাবুক প্রকৃতির। এখন জীবন সম্পর্কে সব বিশ্বাস প্রায় পঙ্গু হয়ে এলেও সেই স্বপ্ন দেখার স্বভাব থেকে সে মুক্তি পায় নি। নিকটবর্তী শহরের নামজাদা এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেল সালুগিও। এবং সেই মুহূর্ত থেকেই সে অনুভব করতে থাকে তার শরীরে এক নতুন যন্ত্রণা। দিনের পর দিন সেটা তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। ভীত অসহায় সালুগিও প্রাণপণ করে কঠিনভাবে প্রতিরোধ করতে চায় সেই কষ্টটাকে। কারখানার ডাক্তার আবিষ্কার করেন, সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত। সালুগিও প্রতিবাদ করে, তার মনে হয় এটা তার বিরুদ্ধে সমাজের এক নতুন ষড়যন্ত্র। কিন্তু আইন অনুযায়ী তাকে স্যানাটোরি-য়ামে যেতেই হয়। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে অনিচ্ছা এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে আবার যেতে হয় হাওয়া পরিবর্তনের জন্য এক স্বাস্থ্যনিবাসে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কারখানা তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। কিন্তু সালুগিওর কাছে এই বদান্যতা এক নির্মম ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করার এই বিরাট চক্রান্তের বিরুদ্ধে সে অবশেষে এক প্রতিবাদলিপি রচনা করে। ফ্যাক্টরির কর্তৃপক্ষের কাছে, পুলিস দপ্তরে এবং চার্চের বিশপকেও সে তার অভিযোগ জানিয়ে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু সবই নিষ্ফল। ফ্যাক্টরির আইন কারো বিকারগ্রস্ত ভাবনাচিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না। সালুগিও তাই কিছুতেই আর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের অধিকার ফিরে পায় না।

সালুগিওর রোগ আর যন্ত্রণা যেন একই সংগে বাস্তব আর প্রতীকী হয়ে

ওঠে। কখনো বা দুয়ের মাঝামাঝি এক রহস্যময় দুঃস্বপ্নে বিস্তারিত হয়। এমনি এক বিমর্ষ মুহূর্তে স্যানাটোরিয়ামের কারাগারে বসে জীবনের বিরুদ্ধে জমানো অভিযোগগুলি নিয়ে সে কবিতা লিখতে শুরু করে:

Ilness or treason/whichever it was/ kept me imprisoned/in this agony/ without company/away from my home/always alone.

স্যানাটোরিয়াম থেকে ছাড়া পেয়ে সে আবার কিছু দিনের জন্যে ফ্যাক্টরিতে যায় বটে, কিন্তু এক আবেগের মুহূর্তে প্রচণ্ড এক প্রতিবাদের তাগিদে বে-আইনী ধর্ম-ঘটের অংশীদার হয়ে শেষবারের মত তাকে চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয়। এক অসীম তৃপ্তি নিয়ে এবার বাড়ির পথে পা বাড়ায় সে। চোখে পড়ে শেষ বিকেলের আলোয় উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁক। ঝলমলে আঙুরের ক্ষেত। ঝোপের জলে বাতাসের খেলা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পায় সূর্যাস্তের রঙ মেখে গ্রামের বাড়িগুলো কি রঙীন হয়ে উঠেছে। আর ঠিক তখনি সালুগিওর মনে হয়, মানুষের কোন কলুষ এই সুন্দর দৃশ্যকে স্পর্শ করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে আর কিছুই প্রত্যাশা নেই তার। প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি—সবই তার কাছে অর্থহীন। কামুর আউটসাইডারের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু ভলপোনির সংগে তাঁর অমিলটাই বেশী। কারণ সালুগিও নিরাশ্রয় হলেও একটি আশ্রয়ের জন্য সংগ্রাম তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি সম্ভবত তার সেই প্রার্থিত আশ্রয়। ঈশ্বরের দিকেও সে তার হাত বাড়াতে চেয়েছে।

বিভূতি রায়

ম্যারাথন দৌড়ের বিস্ময় — বিকিলা

ফ্লাইং ফিন পাভো নুর্মির মৃত্যুর পর অ্যাথলেটিক জগতের আর এক বিস্ময়কর প্রতিভা আবেবে বিকিলাও মারা গেলেন। দুটি মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র তেইশ দিন। অক্টোবরের ২ তারিখে নুর্মি মারা যান হেলসিঙ্কিতে, বিকিলার মৃত্যু অক্টোবরের পঁচিশ তারিখে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায়।

ফ্লাইং ফিন অবশ্য পরিণত বয়সেই পরলোকগমন করেছেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে বিকিলার মৃত্যু বড় বেদনাময়। রোম ও টোকিও অলিম্পিকসের ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণ-পদক বিজয়ী আবেবে বিকিলা ১৯৬৯ সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে প্রায় জীবন-মৃত অবস্থায় কাল কাটাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। তার ফলে নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন। লণ্ডনে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরও আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। দৌড় ছিল যাঁর দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন —পায়ে ছিল অযুত অশ্বের শক্তি, জীবনের শেষ চারটি বছর তাঁকে চাকা লাগানো-চেয়ারে বসে চলাফেরা করতে হয়েছে। ওই অবস্থায়ই সম্মানীয় অতিথি হিসাবে গত বছর তিনি মানিখ অলিম্পিকে উপস্থিত ছিলেন। চলৎশক্তি রহিত অ্যাথলেটিক ইতিহাসের মহানায়কের কি করুণ সে দৃশ্য।

হ্যাঁ, অ্যাথলেটিক জগতের এক মহানায়ক ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা। পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রীকদের যুদ্ধ জয়ের আনন্দ সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য রক্তক্ষয়ী ম্যারাথন-এর রণ-প্রান্তর থেকে এথেন্স পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার (২৫·৮ মাইল) দৌড়ের ক্লান্তি ও উত্তেজনায় মহামৃত্যু বরণ করে গ্রীক বীর ফিডিপিডেস যেমন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন—তাঁর গৌরবময় মৃত্যুবরণকে কেন্দ্র করে যেমন আধুনিক অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ের প্রবর্তন হয়েছে, তেমন আবেবে বিকিলাও তিনটি কারণে অমর হয়ে থাকবেন।

প্রথম কারণ ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রতিযোগী হিসাবে পৃথিবীর প্রথম সারির প্রতিযোগীদের পরাজিত করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ডের কৃতিত্বে তাঁর ম্যারাথন রেস জয়। বিশেষ করে খালি পায়ে দৌড়ে। দ্বিতীয় কারণ রোম ও টোকিও, পর পর দুটি অলিম্পিকে ম্যারাথন রেসের স্বর্ণ জয়ী তিনিই পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র মানুষ। টোকিও অলিম্পিকেও নতুন রেকর্ডের কৃতিত্ব। তৃতীয় কারণ, বিকিলা অন্ধকারময় আফ্রিকায় খেলাধুলার নতুন পথের দিশারী।

বিকিলার দুটি অলিম্পিক রেস জয়ের পর বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের বিশ্ব পরিসংখ্যান-বিদ রবার্টো কুয়েরসিটানি লিখেছিলেন,

অন্ধকার আফ্রিকাকে আলোর পথে নিয়ে আসছে বিকিলা আবেবে। অ্যাথলেটিক জগতে আমেরিকার নিগ্রোদের অবদান অনস্বীকার্য। অপর জায়গার নিগ্রোরা, যেমন জামাইকার জর্জ রোডেন, জর্জ কার, হ্যারি জেরোম, ত্রিনিদাদের মর্টলে, পানামার লাবিচ, ক্যানাডার ফিল এডওয়ার্ডস প্রভৃতির অলিম্পিক পদক জয় আমেরিকার

আবেবে বিকিলা

কলেজগুলিতে কোচিং পাবার ফলে। আর্থার উইন্ট, ম্যাকডোনাল্ড বেলী, জ্যাক লণ্ডন প্রভৃতি নিগ্রো অ্যাথলীটরাও ব্রিটিশ কোচদের তত্ত্বাবধানে থেকে অলিম্পিক পদক জয় করেছে। কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রোরা নিজেদের শক্তিতেই আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। বিকিলাই তাদের বড় প্রেরণা। অস্বীকার করবার উপায় নেই আজ অ্যাথলেটিকসে ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা প্রভৃতি দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনেকখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন আবেবে বিকিলা।

দীর্ঘ দেহী, ক্ষীণকায় দৌড়বীর বিদেশেও পেয়েছেন রাজার সম্মান। টোকিও অলিম্পিকের সময় তাঁর দৌড় দেখবার জন্য পাঁচ লক্ষ মানুষ পথে বেরিয়ে এসেছিল। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে বলে নিই, ম্যারাথন দৌড়ের পাল্লা পথের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। সব দেশের পথ এক রকম নয় বলে ম্যারাথনে বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি নেই। বেস্ট টাইমের অবশ্যই স্বীকৃতি আছে। আর আছে অলিম্পিক রেকর্ডের স্বীকৃতি, যদিও সব অলিম্পিকের দৌড়পথ এক ধরনের নয়। যাই হক, রোমে কষ্টসাধ্য ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ পাল্লা টানতে বিকিলার সময় লেগেছিল ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ১৬·২ সেকেণ্ড। টোকিওতে সময় হয়েছিল ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১১·২ সেকেণ্ড। দুটি অলিম্পিকেই ওর বেস্ট টাইম এবং নূতন অলিম্পিক রেকর্ড করার কৃতিত্ব।

১৯৬৮তে চোটটা বেশীই ছিল। না হলে '৬৪তে টোকিওতেও কি সুস্থ শরীর নিয়ে দৌড়তে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। টোকিও অলিম্পিকের মাসখানেক আগে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস-এর জন্য তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। দেহে ছিল ক্ষত চিহ্ন। তবু, পৃথিবীর ৬৭ জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে সবার আগে ফিতে ছিঁড়েছিলেন।

শুধু কি তাই? দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ব্রিটেনের হিটলের চেয়ে ৪ মিনিট আগে বুক দিয়ে ফিতে ছিঁড়েই মাথা রাখলেন মাটির উপর, পা দুখানি শূন্যে ঊর্ধমুখী। আনন্দের আতিশয্যে শিশুর মত ডিগবাজি খেতে আরম্ভ করলেন। তার সঙ্গে আরও কিছু দৈহিক কসরৎ। যেন ২৬ মাইল দৌড়ের পরও তাজা প্রতিযোগী। শরীরে ক্লান্তির কণামাত্র ছাপ নেই। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের ৮০ হাজার মানুষ এক লাখ ষাট হাজার বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখ দেখল কি উপাদানে গড়া এই ইথিওপীয় দৌড়বীর। তার আগে ম্যারাথন রেস দেখার জন্য বিশেষ করে বিকিলাকে দেখবার জন্য পাঁচ লাখ মানুষ টোকিওর পথে বেরিয়ে এসেছিল।

—অনুকূল

খেলার মাঠে

ইস্টবেঙ্গলের আর একটি ট্রফি

গত মরসুমের ফুটবলে 'ট্রিপল ক্রাউন' বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল এবার লীগ ও শীল্ড জয় করে কলকাতা ফুটবলের 'ডাবল' পেয়েছে। দিল্লির ডি সি এম ফুটবল জয় করে আর একটি ট্রফি পেল।

নিশ্চয়ই তিনটি বড় প্রতিযোগিতা জয়ের কৃতিত্ব। কিন্তু 'ট্রিপল ক্রাউন' বলতে যা বোঝায় তা নয়, যদিও ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতার এখন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা এবং এখন আই এফ এ শীল্ডে যত নামী দল খেলে থাকে ডি সি এম-এ নামী দলের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। যাই হোক সর্বভারতীয় তিনটি বড় প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ড, ডুরাণ্ড কাপ ও রোভার্স কাপ জয়ের সুবাদেই ট্রিপল ক্রাউন জয়ের অলিখিত বিধান ফুটবল মহল মেনে নিয়েছে। এখনো রোভার্স, ডুরাণ্ড বাকি। ইস্টবেঙ্গল যেমন দাপটে খেলছে এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে উঠেছে তাতে কে জানে, এ বছরও ডুরাণ্ড, রোভার্স জয় করে ইস্টবেঙ্গল উপর্যুপরি দু বছর তথাকথিত 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভের অনন্য সম্মান পাবে কিনা।

এবারের ডি সি এম ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের দলগত সংহতি এবং ক্রীড়াদক্ষতার পুরস্কার। কিন্তু দু' দিনের ফাইনাল খেলতেও উত্তর কোরিয়ার ডক রো গ্যাং দলকে সরাসরি পরাজিত না করে, ওয়াক-ওভার পেয়ে ট্রফি লাভ জয়ের গৌরব কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। তার জন্য ইস্ট-বেঙ্গলের অবশ্য ত্রুটি নেই। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলার মত দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলাও গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর প্রতিযোগিতার নিয়ম ও রেফারির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অতিরিক্ত সময় খেলতে অস্বীকার করে ডক রো গ্যাং দল। রেফারি বারবার বাঁশি বাজানো সত্ত্বেও তারা খেলা শুরু করে না। টালবাহানায় কিছু সময় কেটে যায়। অনেক অনুরোধ-উপরোধের ফলে ডক রো গ্যাং যখন মাঠে নেমে খেলতে রাজী হয় তখন অনেকখানি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আলোও কমে এসেছে। ওই অবস্থায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট খেলানো যেত কিনা পৃথক প্রশ্ন। আসলে দিল্লির রেফারি টি এন লাও আর খেলা আরম্ভ করতে রাজী হননি, তাঁর নির্দেশ অমান্য করে ডক রো গ্যাং-এর খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে যাওয়ায় এবং বার বার বাঁশি বাজানো সত্ত্বেও খেলতে না আসায়। রেফারি শ্রীলাও বাঁশির আওয়াজ দীর্ঘ করে খেলা সমাপ্তির ইঙ্গিত জানানোর পর বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় কেটে যায়। ডি সি এম কমিটি রেফারির সঙ্গে পরামর্শ করে ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। ট্রফিটি তখনই দেওয়া হয় দর্শকদের তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে।

সুদৃশ্য ট্রফিটি হাতে ডি সি এম ফুটবল বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব খেলোয়াড়রা

স্বভাবতই কোরীয় দলের ম্যানেজার কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ইস্টবেঙ্গলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। তাঁরা অতিরিক্ত সময় খেলতে অস্বীকার করেননি, শুধু খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন কমিটির কাছে। তার জন্যই অতিরিক্ত সময়ের খেলায় যোগ দিতে তাঁদের দেরি হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের খেলায় দর্শকদের ইঁটের আঘাতে তাদের একজন খেলোয়াড় আহত হবার ফলেই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

সত্যি কথা, খেলার ৮৫ মিনিটে কর্ণার-কিক নেবার সময় কোরীয় দলের উন সাং দর্শকের ইঁটের আঘাতে আহত হয়ে আর খেলতে পারেনি। তার বদলে আর একজন খেলোয়াড় মাঠে নামে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১০ মিনিট খেলাও বন্ধ থাকে এবং ডক রো গ্যাং দল না খেলে মাঠ ছেড়ে চলে যাবারও উপক্রম করে। তার আগে, প্রথমার্ধে কোরিয়ার একজন খেলোয়াড়, লেফট আউট লী সন উ এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ব্যাক সুধীর কর্মকারের কান মলে দেয়। তার জন্যও কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। মোটের উপর খেলোয়াড়দের মেজাজ ছিল চড়া, খেলার মধ্যে উত্তেজনা ছিল যথেষ্ট।

যদিও বিদেশী খেলোয়াড়ের প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ বর্বর আচরণ ছাড়া কিছু নয়, তবু কোরীয় খেলোয়াড়দের ওই চড়া মেজাজই হয়তো ইঁটপাটকেল নিক্ষেপের কারণ। ওটা ফুটবল মাঠের অভিশাপের মত। পৃথিবীর সর্বত্রই দর্শক-সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হতে হয় খেলোয়াড়দের।

কিন্তু খেলোয়াড়দেরও মনে রাখা দরকার মাঠের মধ্যে মেজাজ দেখানোর অর্থ দর্শক-সমর্থকদের মধ্যে উষ্মার ইন্ধন যোগানো। খেলার মধ্যে মেজাজ দেখিয়ে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাওয়াও বোধ হয় অর্থহীন। আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি কেউ দিতে পারে? দর্শকদের উপর কমিটির কি কোন কর্তৃত্ব আছে?

সে কথা থাক। ১০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকার পর আবার যখন সুষ্ঠুভাবেই খেলা চলেছিল, তখন অতিরিক্ত সময়ের খেলায় নতুন করে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আর রেফারির সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি? রেফারির আদেশ অবশ্যপালনীয়। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলা নির্দিষ্ট সময়ে মীমাংসিত না হলে অতিরিক্ত সময় খেলা হবে এটা প্রতি-যোগিতার নিয়ম। সেই নিয়মানুযায়ী রেফারি যখন অতিরিক্ত সময় খেলার নির্দেশ দিয়ে বারবার বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করেছিলেন তখন কোরীয় দলের খেলা উচিত ছিল। টালবাহানা করে সময় নষ্ট করা উচিত হয়নি। পরে কোরীয় দল অবশ্য খেলতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু রেফারি না খেলিয়ে আইনের বিধানই পালন করেছেন। কোন দল তার খেয়াল-খুশি মত খেলতে রাজী বা গররাজী হতে পারে না। রেফারির আদেশ অবশ্যপালনীয়।

ক্রাইস্টচার্চ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য নর্থ ক্যালকাটা রাইফল রেঞ্জে আয়োজিত ট্রায়ালে ৬০০র মধ্যে ৫৮৪ পয়েন্ট পেয়ে পরিমল চ্যাটার্জি (ডান দিকে) এবং ৫৭৮ পয়েন্ট পেয়ে তারাপদ ব্যানার্জি (বাঁ দিকে) নির্বাচিত হয়েছে স্মলবোর প্রোন পজিশনের জন্য। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক তারাপদ ভারতের প্রথম সাংবাদিক, যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেল ফটো: জয়ন্ত ব্যানার্জি

আসলে কোরীয় দলের বদ মেজাজের ফলেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, যে মেজাজ তারা আগেও দেখিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে গ্রুপ লীগের খেলায়। ওই খেলায় ১২ মিনিট তারা মাঠের বাইরে ছিল। রেফারিকে হেনস্থা করেছিল। সম্ভবত অতিথি দল বলেই তাদের স্ক্র্যাচ করা হয়নি।

আই এফ এ শীল্ডে পিয়ং ইয়াং সিটি ক্লাব নামে উত্তর কোরিয়ার যে দলটি খেলে গেল, ডক রো গ্যাং সেই পিয়াং ইয়াং শহরের আর একটি ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার সময় পিয়ং ইয়াং সিটি ক্লাবের খেলোয়াড়দের বদ মেজাজও আমরা লক্ষ করেছি, দিল্লিতে ডক [illegible] দিয়েছে। অথচ খেলার মধ্যে তাদের শিল্পের ছাপ রয়েছে। সুন্দর যোগাযোগ, সহজ ছন্দে পায়ে পায়ে বল দেওয়া নেওয়া করে ছন্দের আক্রমণ রচনার কৌশল, পায়ের শট জোরালো, খেলার ছক প্রয়োজন অনুরূপ এবং বিজ্ঞানসম্মত। দৈহিক সামর্থ্য বোলো আনা। মগজ দিয়ে খেলে। কিন্তু মাথা গরম করে গোলমাল বাধায়।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, গতবারের ডি সি এম ট্রফি বিজয়ী উত্তর কোরিয়ার 'এপ্রিল ২৫' দলের এবারও ডি সি এম-এ খেলার কথা ছিল। তারা না আসায় ডক রো গ্যাং দলকে আনা হয়। ইরানের তাজ ক্লাব, যারা আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আসবে জানিয়েও শেষ পর্যন্ত আসেনি, ডি সি এম ব্যাপারেও তাদের একই আচরণ। আরও বলা প্রয়োজন, গত বছরও এপ্রিল ২৫ ও তাজ ক্লাবের মধ্যে ডি সি এম ট্রফির ফাইনালের জয়-পরাজয় মাঠের খেলায় মীমাংসিত হয়নি। প্রথম দিনের ফাইনাল ড্র হবার পর দ্বিতীয় দিন তাজ ক্লাব খেলতে অস্বীকার করে, তাদের কয়েকজন খেলোয়াড় আহত—এই অজুহাতে। এবারও মাঠের খেলার ফলে ফাইনালের ফয়সালা হল না।

এবারকার আই এফ এ শীল্ডের অনুকরণেই তিন ধাপে এবার ডি সি এম-এর খেলা পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে গ্রুপ ভাগ করে নক-আউট, দ্বিতীয় পর্যায় দুই গ্রুপের লীগ বেসিসে কোয়ার্টার ফাইনাল, তৃতীয় পর্যায়ে নক-আউটে সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল।

কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং, বোম্বাইয়ের চ্যাম্পিয়ন টাটা স্পোর্টস ও মফৎলাল গ্রুপ, জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব, বাঙ্গালোরের সি আই এল এবং কোরিয়ার ডক রো গ্যাং—কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের এই সাতটি দলই ফুটবলের রীতিমত শক্তিশালী দল। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাগুলিতে গোলের যেমন আধিক্য, ফলও যেন তেমন খাপছাড়া। যেমন এ গ্রুপে লীডার্স ক্লাব সি আই এল-কে ৭—০ গোলে হারাল, ডক রো গ্যাং লীডার্সকে হারাল ৭—০ গোলে, আবার সি আই এল-এর বিরুদ্ধে ডক রো গ্যাং একটির বেশী গোল করতে পারল না। বি গ্রুপে মফৎলাল বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন টাটা স্পোর্টসকে ৩—০ গোলে হারিয়ে ইস্ট-বেঙ্গলের কাছে ০—৫ গোলে হেরে গেল। অথচ টাটা স্পোর্টস পরম শক্তিশালী ইস্ট-বেঙ্গলের সঙ্গে ২—২ গোলে খেলা শেষ করে একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল। ইস্ট-বেঙ্গল সেমি-ফাইনালে লীডার্স ক্লাবকে ৩—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ডক রো গ্যাং ফাইনালে ওঠে সেমিফাইনাল খেলায় মফৎলালের বিরুদ্ধে ৪—০ গোলে জয়ী হয়ে। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ডক রোর কাছে ৩—১ গোলে এবং সি আই এল-এর কাছে ৪—০ গোলে হেরে যায়। শুধু ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে লীডার্সের সঙ্গে।

আগেই বলেছি, ডি সি এম ট্রফি জয় ইস্টবেঙ্গলের ক্রীড়া দক্ষতার পুরস্কার। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে পিয়ং ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে যে প্রাধান্য দেখিয়েছিল ডক রো গ্যাংয়ের বিরুদ্ধেও তেমন আধিপত্য বজায় রেখে খেলেছে। প্রথম দিনের ফাইনালে ইস্ট-বেঙ্গলের অন্তত চার-পাঁচটি গোল করা উচিত ছিল। দ্বিতীয় দিনের ফাইনালেও ইস্ট-বেঙ্গলের প্রাধান্য সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না।

একলব্য
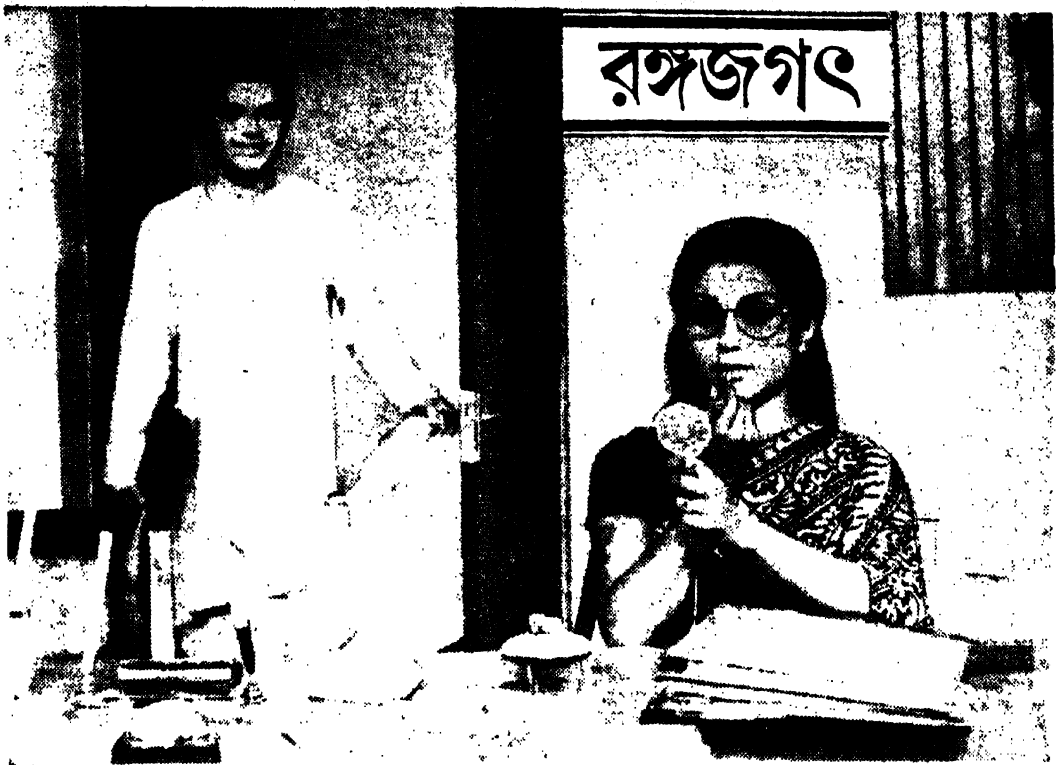
আলোর ঠিকানা (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন   ফটো—দেশ

মতামতের মন্তাজ

বাংলা সিনেমার মতো বাংলা নাটক নিয়েও আজ একই প্রশ্ন—এই শিল্প বাঁচবে কী করে? বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। নানা সভা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়ে শতবর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান সম্পন্ন। কিন্তু বাংলা নাটকের তথা পাবলিক থিয়েটারের উন্নতির কোন বিশেষ ব্যবস্থা হল না। অনেক প্রতিশ্রুতি হয়তো জড়ো হয়েছে, তবে সেগুলি কবে পূর্ণ হবে বলা মুশকিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি সরকার বরাবরই সহানুভূতিসম্পন্ন। বাংলা নাটক প্রমোদকর থেকে মুক্ত। পাবলিক থিয়েটার বা পেশাদার মঞ্চেও অভিনীত নাটকের জন্য প্রমোদকর লাগে না। সিনেমাও বাংলা নাটকের কোন ক্ষতি করেছে মনে হয় না। নাটক বরাবরই জনপ্রিয়। বেশ কয়েক শত রজনী ধরে নাটক চলার নজির সম্প্রতি অনেক দেখা গেছে। সুতরাং নাটক চলে না এটাই যদি প্রধান সমস্যা হয় তবে তার কারণ অন্যত্রও খুঁজতে হবে।

* * *

সমস্যাটা এখানে বাংলা ছবির মতোই। হিন্দী চিত্রের সাম্রাজ্যে বাংলা ছবি কোণ-ঠাসা। তবু সুখের কথা এই, সাধারণভাবে বাংলা ছবি বাঁচার পথ হিসাবে হিন্দী চিত্রের ক্রাইম বা ক্যাবারে কিংবা অসুস্থ যৌন উপকরণের আশ্রয় নেয়নি। বাংলা রঙ্গমঞ্চের কাছে এই সংযম দর্শক আরও বেশি আশা করেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা আরও বেশি, ঐতিহ্য অনেক পুরনো। বাংলা সিনেমা এমন নিদারুণ বাঁচার সমস্যার মধ্যেও যেখানে বিকৃত উপকরণের সঙ্গে আপস করেনি বাংলা রঙ্গমঞ্চ সেখানে তার ধর্ম হারাতে বসেছে। বাংলা থিয়েটার সিনেমা-অনুগামী হয়েছে অনেকদিন যাবত। কী প্রয়োগচিন্তায় কী কাহিনী নির্বাচনে পেশাদার বাংলা থিয়েটার দর্শকদের কাছে সিনেমা দেখার সুখ পরিবেশনে করতেই তৎপর। প্রত্যেক শিল্পের একটা আলাদা চেহারা ও বৈশিষ্ট্য আছে। তাকে তার নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখতে হবে। তার বিকাশ কিংবা বিনাশ ওই চরিত্রের মধ্যেই, এখানে কোন আপস চলে না। আশা হয়েছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির পর বাংলা থিয়েটার তার নাট্যচিন্তা রক্ষার প্রতিজ্ঞায় নতুন করে উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু না, পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে দুর্বল আপসের মনোভাব। হিন্দী সিনেমায় যে বস্তু দেখে দেখে অসুস্থ রুচির দর্শকের আশ মেটে না তাই আরও প্রকটভাবে রক্ত-মাংসের অস্তিত্বে দর্শকের কাছে উপস্থিত করার এক উগ্র প্রবণতা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে ক্রমে গ্রাস করে চলেছে। বাংলা থিয়েটারকে বেঁচে থাকার জন্য কি আজ অনর্থক যৌন উপাদানের উপর নির্ভর করতে হবে? এদিকে সৎ নাটকের উপরও যেন আস্থা কম। কাহিনীর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, ঘোর অবাস্তবতায় বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রায়শ আচ্ছন্ন। এই দুর্বলতা থেকে অবশ্য বাংলা সিনেমাও মুক্ত নয়। তবে সিনেমা-কাহিনীর সাজানো ঘটনা কিংবা নানা রকমের অকৃত্রিমতা পাদপ্রদীপের আলোয় দেখা যেন আরও কষ্টকর। এখন যেন কোন রকমে দর্শক আকৃষ্ট করাটাই একমাত্র কাজ, যে-কোন প্রতিশ্রুতি বা শর্তে। এই অবক্ষয়ের উৎকট প্রকাশ দেখা যাচ্ছে শত-বর্ষপূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই। ট্র্যাজেডি এই-খানেই।

• • •

অথচ বাংলা নাট্য-আন্দোলন আজ স্তিমিত একথা বলা চলে না। এখন এই আন্দোলন আরও জোরদার। পেশাদার মঞ্চের বাইরে আজ কত দল, কত সংস্থা। এক অর্থে হয়ত সকল সংস্থাই পেশাদার।

তবে এমন অনেক সংস্থা আছে যার শিল্পীরা অভিনয় করেন অভিনয়কে ভালবেসে, পরিশ্রমিকের জন্য নয়। পারিশ্রমিক তাঁরা নেন না। এঁদের শৌখিন দল বলা যেতে পারে, যদিও এই সব দলের নাটক দেখবার জন্য টিকিট পাওয়াই দায়। সে অর্থে এদের পেশাদার দল বলা যেতে পারে, কিন্তু এই সব দলের সভ্যরা পেশাদার শিল্পী নন। কলকাতায় এমন কয়েকটি নাট্যসংস্থা আছে যাঁরা বাংলা নাটকের গৌরব বাঁচিয়ে রেখেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তারাও সমান তালে চলেছে। আজ, সত্যি বলতে কী, সৎ নাটক বা সুস্থ নাটক তাঁরাই মঞ্চস্থ করছেন। নাটকের শুদ্ধতা ও চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। কোন কোন শৌখিন সংস্থা হয়ত বিশেষ এক রাজনীতিক মতবাদ প্রচার করাই অভিনয়ের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন। পোস্টার ড্রামা জাতীয় ওই সব নাটক রসজ্ঞ দর্শকরা বিরক্তির সঙ্গে বর্জন করেন। নাটকে যাঁরা রাজনীতি প্রচার করেন সেকথা তাঁরাও জানেন। কিন্তু তবুও ভাল সীরিয়স নাটক খুঁজতে হলে শৌখিন দলের প্রযোজনার তালিকাই দেখতে হয়। আর কিছু না হোক, মামুলি প্রমোদ বিতরণ কখনই তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। আজকাল নানা রকমের নিরীক্ষাকর্ম তাঁদের নাটকেই দেখা যায়। সেদিক থেকে বাংলা নাটকের কুলমর্যাদা কিন্তু তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। অথচ তাদের নাটক অভিনয়ের জন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক স্থায়ী মঞ্চ স্থাপনের কোন আগ্রহ বা সদিচ্ছা এখনও সরকারের তরফে দেখা যাচ্ছে না। এ-ধরনের কোন ব্যবস্থা হলে বাংলা নাট্য আন্দোলনেরও প্রভূত উন্নতি হত। বাংলা নাটকের অবিচ্ছিন্ন ধারার বাহক যে রঙ্গালয় তার কাছে অনেক আশাই ছিল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তির পর সে আশাও বেড়েছিল। হিন্দী চিত্রসুলভ হালকা উপাদান কিংবা যৌন রসদ আমরা বাংলা মঞ্চে কখনও চাইনি। পাদপ্রদীপের আলো অনির্বাণ রাখার জন্য যদি এই অন্যায় আপস জরুরী হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে কোথাও বুদ্ধিভ্রান্তি ঘটেছে।

হাথী-কে দাঁত

সমাজ-ব্যবস্থার গলদ দেখবার জন্য কি আর ঈশার খুবই উৎসাহ। তাঁর হাথী-কে দাঁত ছবিতেও বক্তব্যের ভাগ আছে কিন্তু গল্প বিশ্বাসযোগ্য না হলে বক্তব্যের বিষয়ও কেমন ফিকে হয়ে যায়, সাজানো মনে হয়। হাথী-কে দাঁত-এর প্রধান পুরুষ এক শিল্পপতি (ইফতিকার), হিন্দীচিত্রের জয়মলো অমদ্বারী [illegible] বাইরের জগতে

হাথী-কে দাঁত : রাকেশ পাণ্ডে ও আশা সচদেব

ইমানদার বা শরীফ বলে পরিচিত, আসলে বদমাশ। এই মামুলী চরিত্র দিয়ে কোন সামাজিক সমস্যাই দেখানো যায় না, তবে নাটক তৈরি করা যায়। সে কাজ পরিচালক মোটামুটি ভালই করেছেন। অবশ্য বিপত্নীক শিল্পপতি এবং তার একমাত্র পুত্র অশোকের (রাকেশ পাণ্ডে) অস্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে যে-পরিমাণ নাটকীয়ত্বের সম্ভাবনা ছিল তার দিকে পরিচালক বিশেষ নজর দেননি। অশোক ছোটবেলা থেকেই পিতার ভয়ে ম্রিয়মাণ, এটা এক ধরনের কমপ্লেক্স। তা নিয়েও পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে কোন জটিলতা দেখা গেল না। পিতা সময় বুঝে বউমা আশার (আশা সচদেব) সম্পত্তিহরণের জন্য তাকে পাগল বানাবার জন্য সচেষ্ট।

হিন্দীচিত্রের সুচতুর ভিলেনের কাজগুলি ইফতিকার সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। তাঁর হাতে এক ব্ল্যাকমেলার ও তার সঙ্গিনী যথাসময়ে নিহত। অন্য সব হিন্দীচিত্রে যেমন মারপিট থাকে এখানে তা নেই। ছবির শেষে ইফতিকার পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর ছেলেরও একটি ভূমিকা আছে। অশোকের মানসিক অসুস্থতা ও নিঃসঙ্গতা [illegible] গেছে। অশোকের [illegible] ব্যাপারে পত্নী আশা অনেক সাহস [illegible]। অশোক ও আশার বিবাহিত জীবনের দৃশ্যগুলি পরিচ্ছন্ন। এই চরিত্র রাকেশ পাণ্ডে ও আশা সচদেবের অভিনয়ও যথাযথ। ইফতিকারের মোনোলগ [illegible] দৃশ্যগুলিতে ঈশারা-চিত্রের প্রতিশ্রুতি অনেকখানি পূর্ণ, যদিও ঈশার এ-ছবিতে বেশ কিছুটা সংযম দেখিয়েছেন। টেকনিক্যাল প্রয়োগের কাজ আগাগোড়াই ভাল। দৃশ্যবিন্যাসের পরিকল্পনা এবং এডিটিং প্রশংসনীয়। খুব অল্প চরিত্র নিয়ে এবং ভিলেনির বাহুল্য বর্জন করে পরিচালক যেভাবে ছবিটি বানিয়েছেন তাতে একটু নতুনত্ব আছে। নায়ক-নায়িকার নাচ-গানের দৃশ্যও তেমন নেই। গান মাত্র দুটি। হিন্দী-

ছবির অনেক কিছু গতানুগতিক আমোদ-উপকরণ এখানে ব্যবহার করা হয়নি। তবে শিল্পপতি-শিল্পেরা এখানে যে খুবই স্বাবলম্বী এবং পাপকর্ম সাধনের জন্য নিজেই যে এখানে-সেখানে ছুটে বেড়িয়ে হন এটা কিন্তু হাস্যকর।

রঙমহলে অনন্যা

রঙমহলের নতুন নাটক অনন্যা-র পরিচালক জহর রায় কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। কৌতুক, রহস্য, ক্যাবারে ইত্যাদি সব কিছুই রেখেছেন। তা ছাড়া এমন নাট্যবস্তুও আছে যা যুক্তি দিয়ে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না অথচ দর্শককে তৎক্ষণাৎ আমোদ দেয়।

অনন্যা নাটকে স্বরূপ দত্ত ও বীথি গাঙ্গুলি

যখন যে কথা মুখ ফুটে বললে সব ঝামেলা চুকে যায় তখন অকারণ নীরবতাই যত অশান্তি ডেকে আনে। এই অশান্তি বা ভুল বোঝাবুঝি, যা মামুলী নাটকের নিয়ম, অনন্যা-নাটকের ভিত্তি। সাসপেন্স রচনা নয়, দর্শককে নিছক ধোঁকা দেবার জন্যই বুঝি একই পরিবারের দুজনের আলাপও রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার মতো। এদিকে চাকরির চেষ্টায় কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় কর্মপ্রার্থীর পকেটে কেন রিভলবার থাকবে সেটাও দুর্বোধ্য। তা ছাড়া এই ব্যক্তি পরে নাটকে যার নাম শোভন সেন, ছোটবেলা থেকেই সংগীতপ্রেমী, কিন্তু তার পকেটে রিভলবার। অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতার এমন ভূরি ভূরি নজির অনন্যা-য় আছে। তবু নাটকটি জমজমাট।

নাটকের সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই এমন ঘটনা বা পরিস্থিতিও অনন্যায় আছে। যেমন হোটেলের দৃশ্য বা ক্যাবারে এবং সেখানে এক গ্রাম্য প্রৌঢ়ের (জহর রায়) আগমন। বিচিত্রানুষ্ঠানে যেমন কমিক স্কিট থাকে তেমন কৌতুক-নকশাই জহর রায় পরিবেশন করেছেন, নাটকে যা মোটেই অপরিহার্য নয়। তবে জহর রায় যতক্ষণ মঞ্চে থাকেন ততক্ষণ প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসির প্রয়োজনে কিছু অশালীন উক্তি বা বিষয়ের উপর জোর অবশ্য দেওয়া হয়েছে। মোটা কৌতুক অন্যত্রও আছে—গ্রাম্য প্রৌঢ়ের ছেলের (ধীমান চক্রবর্তী) অস্বাভাবিক আচরণে।

নায়িকা বন্যা (জয়শ্রী সেন) তার স্বামী স্মরজিত (অসীমকুমার) এবং শ্বশুর বিজয় চ্যাটার্জিকে (কালী বন্দ্যোপাধ্যায়) নিয়ে অনন্যা রচিত। আসলে বিজয় চ্যাটার্জিকে কেন্দ্র করেই এই নাটক। বন্যা কেন মতেই অনন্যা নয়। সে অহেতুক স্বামীর কাছে সত্য গোপন করে নাটকের সৃষ্টি করেছে ঠিকই, কিন্তু নাট্যসূত্র রচনায় তার শ্বশুরেরই প্রাধান্য বেশী। তা ছাড়া এ ধরনের মেলোড্রামায় নায়িকাদের যে কারণে অনন্যা-জাতীয় বিশেষণে অভিহিত করা হয়, এই নাটকে তা অনুপস্থিত। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির চাইতে বরঞ্চ পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে নাটকের স্বাদ বেশী। এই দুই চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমকুমার চমৎকার অভিনয় করেছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় জায়গায় জায়গায় শুধু অভিনয়ের জোরে এমন একটি সাজানো বা নাটুকে কাহিনীকেও (কুনাল মুখোপাধ্যায় রচিত) জমিয়ে রেখেছেন। অসীমকুমারের অভিনয়েও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ সুন্দর। নাটকের অবসান আদালত-দৃশ্যে, বিবাহবিচ্ছেদের মামলায়। সেখানে কেন বন্যাকে গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে বোঝা দুষ্কর। যাই হোক, আদালত-দৃশ্যের পরিকল্পনাটি সুন্দর। বিচারককে না দেখিয়েও তার উপস্থিতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুপরিচালনার ও সুকৌশলী প্রয়োগের আরও কিছু লক্ষণ নাটকে আছে। সব চাইতে বড় কথা, নাটকটি গতিসম্পন্ন।

বন্যা-বেশিনী জয়শ্রী সেনকে রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে কিংবা বিয়ের আগে যত না ভাল লেগেছে তার চাইতে বেশী ভাল লেগেছে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর। তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ। স্মরজিত-বন্যার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনিমেষ ও দন্দ। ওদের চারজনকে নিয়ে কয়েকটি স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত রচিত। অনিমেষের চরিত্রে স্বরূপ দত্তের অভিনয় খুব স্মার্ট। তাঁর প্রণয়িনী ও পরে স্ত্রীর ভূমিকায় বীথি গাঙ্গুলী বেশ সাবলীল অভিনয় করেছেন। শিল্পিগোষ্ঠীর প্রায় সকলের অভিনয়ই ভাল। বিশেষ প্রশংসা পাবেন নির্মল ঘোষ

অনন্যা-য় রূপা ব্যানার্জি

(শোভন সোম) ও মৃণাল মুখার্জি (দয়াল)। অন্যান্যদের মধ্যে অজিত চ্যাটার্জি, কামু মুখার্জি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুঅভিনয় করেছেন।

প্রমোদ উপকরণের মধ্যে ক্যাবারে নাচ ছাড়াও গান আছে। গানগুলির সুর (চণ্ডী বসু-কৃত) ভাল, গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। বীথি গাঙ্গুলিও একটি গান গেয়েছেন। গান অনন্যার একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ বলা যেতে পারে। রূপা ব্যানার্জি যথাবিহিত ক্যাবারে মেয়ের মতোই সেজেছেন, তবে তাঁর নাচে শিল্পগুণ কম। নাটকটি সুপ্রযোজিত, বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনিল সাহার আলোক-সম্পাত।

বোম্বাই বিচিত্রা

আজ থেকে বছর পনের আগের কথা। আমার পরিচিত এক সাংবাদিক পয়লা এপ্রিল তারিখে এক বিশেষ গীতকারের সঙ্গে একটু বিশেষ ধরনের ঠাট্টা করে ফেলেন। ভদ্রলোক গীতকারকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান "অমুক সাংবাদিক সংস্থা আপনাকে এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতকার হিসেবে পুরস্কৃত করছে", গীতকার তো টেলিগ্রাম পেয়ে আহ্লাদে আটখানা: খানদশেক কাগজে টেলিফোন করে এই খবর ছাপিয়ে দিলেন মুহূর্তে মধ্যে। পরের দিন কাগজে কাগজে এ সংবাদ পড়ে, সাংবাদিক তো হতবাক। দৌড়ে গেলেন, গীতকারের কাছে, বললেন, মিষ্ট ভাষায় গালি গালাজ

অভিনয় ...... পাওয়া না। কেমন পারলেন না অজিতা? বেলে দীপ্তি মুখোপাধ্যায় তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে, সুমন্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আছে। অন্যথায় এই দুজন শিল্পীই, বিশেষ করে অসিতবাবুর সুঅভিনয় চরিত্রটিকে সজীব করেছে। এই নাটকে সব চেয়ে আকর্ষক অভিনয় সুশান্ত বসুর। তাঁর 'সুমন্ত' সাহসী, বিবেচক, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত প্রেমিক। দীপক চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানবর্ধন'ও ভালো লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে মনোযোগ কেড়েছেন হাসি রায়, রঞ্জিত মজুমদার, শিব ভট্টাচার্য, অজিত চক্রবর্তী, শম্পা ঘোষ, প্রিয় ঘোষ, সেনশর্মা, পীযূষ ঘটক, শান্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক বসু। আলোর কাজে অনাদি দে প্রশংসা পাবেন।

নাট্য সমালোচক

যাত্রিক পরিচালিত 'যদি জানতেম' ছবিতে কমল মিত্র, সুপ্রিয়া দেবী ও মণ্টু ব্যানার্জি

ফিরোজা বেগমের দু'টি আসর

নজরুলের গানে ফিরোজা বেগম একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর সুরেলা এবং আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে নজরুল-সংগীতের মর্মবেদনাটি খুব সহজেই উৎসারিত হতে দেখা যায় বলেই এই গানের ক্ষেত্রে ফিরোজা বেগম একটি স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন। নজরুলের গান যেমন, তেমনই হিন্দী গীত, গজল এবং ভজনেও যে তিনি একজন প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী। তার পরিচয় পাওয়া গেল সম্প্রতি কলামন্দিরে আয়োজিত দু'টি পৃথক একক-সংগীতের আসরে। প্রথম দিন তিনি কেবল নজরুলের গান শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন হিন্দী এবং উর্দু গীত, ভজন এবং গজলের এক মিশ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

একারের অনুষ্ঠানে অবশ্য নজরুলের গানের দিন ফিরোজা বেগম যেন কিছু নিষ্প্রাণ ছিলেন। অথবা, সেদিনকার নির্বাচিত গানগুলির বেশির ভাগই একটু হালকা ধরনের ছিল বলেই হয়তো মনে খুব গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। 'রুমঝুম ঝুমঝুম' কিংবা 'চমকে চমকে ধীরু ভীরু পায়'—এই ধরনের গানগুলিই সেদিন তিনি প্রধানত শুনিয়েছেন। বিভিন্ন গানের মাঝে পরিচিতিমূলক ভাষ্যের অবতারণাও মনে হয় কিছুটা বিরক্তিকরই। এ-ধরনের ভাষ্য রসোপভোগে সহায়তা করে না বরং নিরবচ্ছিন্ন রসস্ফুরণে কিছু বাধারই সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে এই বাধাটুকু ছিল না। দু' একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য, যেমন কোনটি কার লেখা গান, শিল্পী নিজেই বলে নিয়েছেন। এই দিনের বৈচিত্র্যধর্মী গান নির্বাচন, গভীর অনুভূতিময়তা এবং শিল্পীর একাগ্রতা সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলেছিল। বিশেষত মনে রাখবার মতন গান ছিল ভজনগুলি। দরবারী কানাড়ার সুরে কবীরের ভজন 'ঘুঘাট কা পট' বাগেশ্রী রাগের আশ্রয়ে রচিত 'বেলরে মধবন মে' ফিরোজা বেগমের ভক্তিরসপ্লুত কণ্ঠে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। কবীরের অপর একটি ভজন 'নায়নন মে রে তুমরি ওর' মালকোষের সুরে নম্র আকৃতির এক অনুপম দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও মীর্জা গালিব এবং ফৈয়াজ আহমেদ ফৈয়াজের গজলগুলিও তিনি দরদ দিয়ে গেয়েছেন। কয়েকটি হালকা ধরনের গীতও মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লেগেছে।

দু'টি অনুষ্ঠানেই তবলবাদ্যের সংগত আরও বলিষ্ঠ এবং নিপুণ হলে ভাল হোত। বাঁশি এবং বেহালার সুরের অনুষঙ্গ দ্বিতীয় আসরের গানগুলিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। এ প্রসঙ্গে বেহালায় দিলীপ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আনন্দবর্ধন

সংলাপ-এর অনুষ্ঠান

সংলাপ একটি নতুন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। কিন্তু বয়সে নবীন হলেও নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দক্ষতায় এঁরা প্রায় প্রবীণের সমকক্ষ। সম্প্রতি সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল-এ আয়োজিত এঁদের বার্ষিক উৎসব দেখতে দেখতে অনেক ত্রুটি যেমন চোখে পড়েছে ঠিক তেমনি এমন অনেক শৃংখলা ও পরিমিতিবোধও নজরে এসেছে যা প্রশংসা করবার। এ বছর অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্য এবং 'বিক্ষিপ্ত বাস্তব——বিক্ষুব্ধ' নামের একটি নাটক। 'মায়ার খেলা'র প্রযোজনা নিতান্তই মামুলী। গান এবং নাচ কোন ক্ষেত্রেই গতানুগতিকতার উর্ধ্বে ওঠার কোন চেষ্টা নেই। তবুও ওরই মধ্যে বিশেষ করে ভালো লাগবে মঞ্জুষা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রমদা'কে। অন্যান্যদের মধ্যে চন্দ্রালী গুপ্তা এবং কৃষ্ণা গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। মায়াকুমারীদের বেশে ছোটদের নাচ উপভোগ্য। সংগীতাংশে কাজরী চ্যাটার্জি, দেবী সিংহ, রবীন গাঙ্গুলী ও চিত্রা সিংহ ভালই গেয়েছেন কিন্তু মাইকের বিভ্রাট তাঁদের পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়মোহন চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত নাটক 'বিক্ষিপ্ত বাস্তব—বিক্ষুব্ধ' অকারণেই বড় বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। উপস্থাপনাগত কায়দা আর প্রয়োগের বাড়াবাড়িটাই নাটকের মূল বক্তব্য অনুধাবনে প্রধান অন্তরায়। নচেৎ নাটকটির বক্তব্য নিশ্চয়ই স্পর্শযোগ্য ছিল। অভিনয়াংশ কখনও কখনও বেশ ভাল, আবার কোথাও কোথাও অতি মন্থর। সব মিলিয়ে কিন্তু খুশী হওয়ার মতো হল না, অথচ সে সম্ভাবনা ছিল।

নাট্য সমালোচক

নটরাজের 'লম্বকর্ণ-পালা'

গত ৩০ সেপ্টেম্বর কলামন্দিরে নটরাজ পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা নিয়ে 'শরৎবরণ' এবং অবনীন্দ্রনাথের লম্বকর্ণ পালা। পরিচালনা করেন বিশ্বজিৎ রায়। মঞ্চসজ্জা জয়শ্রী রায়ের। 'শরৎবরণ' অনুষ্ঠানটি যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি আনন্দদায়ক হয়েছিল। নাচ গান আবৃত্তি সবই প্রথম শ্রেণীর। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

কলামন্দিরে নটরাজ পরিবেশিত লম্বকর্ণ পালার দৃশ্য

প্রমিতা ধারের 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' এবং জনাজিৎ রায়ের 'অমল ধবল পালে লেগেছে' গান দুটি।

'লম্বকর্ণ' পালাটি ইতিপূর্বে বোম্বাইয়ে অভিনয় করে নটরঙ্গ সুনাম অর্জন করেছেন। এবারেও জমেছিল পালাটি। তবে চমৎকার সুরের মজার গানগুলি আরও চড়া পর্দায় ধরালে মাত্রার মেজাজ মিলত। অভিনয় সকলের ভালো হয়েছে। অভীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বংশলোচন), কৃষ্ণা ঠাকুর (মানিনী), অরুণী ঠাকুর (টেঁপি), অনির্বাণ চৌধুরী (ঘেণ্টু), আলোকময় ঘোষ (বিনোদ), তপন মল্লিক (মিত্র), সুজিৎ দাশগুপ্ত (উদয়), রঞ্জন (নগেন), সুস্থির (চাটুজ্জে), অমিত বসু (চুকন্দর), সুবীর মিত্র, নিরঞ্জন গাঙ্গুলি, প্রিয়ব্রত রায়, চন্দ্রোদয় ঘোষ প্রভৃতি এবং সর্বোপরি নামভূমিকায় জয়োজিৎ রায় ভাল অভিনয় করেছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

সীমাবদ্ধ

উজ্জয়িনীর শিল্পীরা কয়েক দিন আগে (১২ সেপ্টেম্বর) বয়েজ ওন লাইব্রেরী মঞ্চে অভিনয় করলেন শংকরের "সীমাবদ্ধ"। নাট্যকার সমীর গাঙ্গুলি এখানে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছেন, দু'একটি চরিত্রও নতুন করে তৈরি করে নিয়েছেন। মূল উপন্যাস যাঁদের পড়া আছে কিংবা এই নামের ছবিখানি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এই নাটক দেখে, এর ভিন্নতর চেহারা দেখে কতটা খুশী বা অখুশী হবেন তা বলা মুশকিল। নাটকের প্রয়োজনে উপন্যাসের কিছু অদল-বদল অবশ্যই করা যায় কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচ্য পরিবর্তিত চেহারা রস-বিস্তারে সত্যি নতুন কোন মাত্রা সংযোজিত করছে কিনা।

এখানে নায়ক শ্যামলেন্দুর উচ্চাশা এবং তার জন্য তাঁর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম খুবই বাস্তব, কিন্তু শেষ দৃশ্যে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনা নিতান্ত সস্তা নাটকীয়তা। মূল উপন্যাসে শ্যামলেন্দুর আত্ম-অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছে দেহমনে এক পরাজয়ের অনুভব ছিল, শ্যামলেন্দুর পক্ষে ওইটুকুই সম্ভব, এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার সময় নীরবে চোখের জলও সে ফেলাতে পারে, কিন্তু রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করার মত ভয়ংকর সেন্টিমেন্টাল চরিত্র কী শ্যামলকে মানায়? কিংবা মাছের আড়তদার আর তার স্ত্রীকে নিয়ে শ্যামলেন্দুর ফ্ল্যাটে যে ঝগড়ার সৃষ্টি করা হয়েছে তাও রীতিমত কষ্টকল্পনা। অতি-কল্পনার ব্যাপারও কিছু কম নেই। মিসেস ডিফেনসন আর শ্যামলেন্দুর সম্পর্ক এই নাটকে যেন মধুচক্রের নায়ক-নায়িকার মত।

এই সব বাড়াবাড়ি আর কষ্টকল্পনা নাটকের ভারসাম্য অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে। একজন মধ্যবিত্ত যুবকের উচ্চাশা আর আকাঙ্ক্ষার চেষ্টা নিয়ে যে গল্প তাতে

এমন অনেক ব্যাপার নাট্যকার ঢুকিয়েছেন যেগুলো শুধু অপরিহার্য বলে অন্তত মনে হয়নি।

অভিনয় এবং প্রযোজনার দিকও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। যদি তা হতো তবে নাটকের অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার সহজেই ঢাকা পড়তে পারত। শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা অভিনয়ের সুযোগটুকু সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁরা হলেন কাজল মুখার্জি (দোলন-চাঁপা), শেলি পাল (বিবি), ভূদেব চক্রবর্তী (রায়ান), শক্তি মুখার্জি (শ্যামলেন্দু), মনীন্দ্র মিত্র (মিঠু সেন)। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা কাজ চালিয়ে গেছেন মাত্র। নাটকের নায়ক শেক্সপীয়রের ভক্ত, কিন্তু দেখা গেল এই নাটকের প্রায় সবাই কথায় কথায় ম্যাকবেথের 'কোটেশন' দিচ্ছে নির্ভুলভাবে। অথচ ততখানি নিষ্ঠায় কিন্তু অনেকেই নাটকের সংলাপ বলে যেতে পারল না। নাট্যনির্দেশনা মনীন্দ্র মিত্রের।

নাট্য-সমালোচক

সুরবাহারের অনুষ্ঠান

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে সম্প্রতি সুরবাহার প্রযোজিত একটি অনুষ্ঠানে সম্মেলক গান, শাস্ত্রীয় সংগীতাশ্রয়ী নৃত্যলেখা 'ঋতুবাহার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতা অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়।

ধ্রুপদী গান এবং নৃত্যের সংযোগে উপস্থাপিত 'ঋতুবাহার' সুরবাহারের একটি প্রশংসনীয় প্রযোজনা। দীপক রাগে গ্রীষ্মের আবহ, মেঘ এবং মেঘমল্লারে বর্ষার—এইভাবে বিভিন্ন ঋতুর পরিবেশ একদিকে আলাপে, গানে বিস্তারিত হয়েছে কৃষ্ণা সমাদ্দার এবং রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আর একদিকে কথক, ভরতনাট্যম প্রভৃতি নৃত্যে সেগুলি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন অনুরাধা মৈত্র এবং প্রদীপ্ত নিয়োগী।

'পরিশোধ' কবিতাটির নৃত্যনাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথ নিজেই আরোপ করেছেন ... 'পরিশোধ' নামেই এবং পরে বিস্তৃততরভাবে ইতিমধ্যে অসংখ্যবার অভিনীত 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে। এর কোনোটিকেই অবিকল অনুসরণ না করে, প্রধানত 'শ্যামা'র গানগুলিকে আশ্রয় করে সুনীল সাহা 'পরিশোধ' কবিতাটির নৃত্যনাট্যরূপ দিয়েছেন। শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্য পরিকল্পনা সুন্দর তবে লোকনৃত্যের প্রয়োগে তিনি আর একটু সংযমবোধের পরিচয় দিলে ভাল হত। বজ্রসেনের চরিত্রটি সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন সাধন গুহ। বজ্রসেনের গানও ভাল গেয়েছেন রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি অনুষ্ঠানই কমলেশ মৈত্রের আবহ সংগীত সমৃদ্ধ।

অনুপবর্মা

অরণ্যদেব
লী ফক

জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে একটা প্লেন এসে নামছে।
আমি যাচ্ছি। ওখানে একটা প্লেন পাঠাতে বলে দাও।
U.S. COAST GUARD

চোরাই আর্মি-হীরে-গুলোকে ওরা সম্ভবত প্লেনে করে পাচার করবে।
যেভাবেই পাচার করুক, আমরা ওদের ধরবই।
U.S. COAST GUARD

চমৎকার সব খাবার। কিন্তু আমি তো প্লেন থেকে ঝাঁপ দেবার আগে কিছু খাই না।
কিন্তু ডায়ানা, অনেক যত্ন করে এই সব খাবার তোমার জন্যে তৈরী করা হয়েছে।
যা হোক সামান্য-কিছু মুখে দাও।

বিজবিজ্ বিজ্...
!!
বেশ, খাচ্ছি। কিন্তু খুব অল্পই খাব।
লক্ষ্মী মেয়ে!

খাবার সময় নেই, আবহাওয়া পালটাচ্ছে, এক্ষুনি প্লেনে করে আকাশে উঠতে হবে।
অ্যাঁ, ও, আচ্ছা, কিন্তু প্যারাসুট-গুলো তো একবার পরীক্ষা করে নেওয়া চাই!
3/18

দরকার নেই। আমিই পরীক্ষা করেছি।
কখন পরীক্ষা করলে? আমরা তো এইমাত্র এলাম!
তাড়াতাড়ি করো!

উপকূল-রক্ষী জাহাজ...
ওই প্লেনটার পিছু নেবার জন্যে আমাদের প্লেনগুলোকে নির্দেশ দাও।
এদিকে আমরা ওদের জাহাজটা তল্লাস করে দেখি, হীরে-গুলো পাওয়া যায় কিনা।

ওদিকে...ডায়ানাদের বাড়িতে।
টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, সুতরাং ডায়ানা নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।
??

পশ্চিম এশিয়ায় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতি এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। যুদ্ধবিরতির জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১৪-০ ভোটে গৃহীত হয়। এদিকে সিরিয়া যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জানিয়েছে। সিরিয়ার বক্তব্য ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে এবং পরে সমস্ত অধিকৃত জমি ইজরায়েলকে ছাড়তে হবে। বিভিন্ন খবর থেকে জানা গিয়েছে ১৭ দিনের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে যুক্ত আরব বাহিনীর নিহত ও আহতের সংখ্যা ১৫ থেকে ১৬ হাজার এবং ইজরায়েলের হতাহতের সংখ্যা ৩৫০০ থেকে ৪ হাজার। ৪৫০টি আরব বিমান এবং ইজরায়েলের ১২৫টি বিমান ধ্বংস হয়েছে। আরব ২ হাজারটি ট্যাংক এবং ইজরায়েল ৯০০টি ট্যাংক এবং সাজোয়া গাড়ি এই যুদ্ধে হারিয়েছে বলে জানায়। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতির উপর কঠোর নজর রাখতে রাষ্ট্রপুঞ্জের পতাকাতলে অস্ট্রিয়ান, ফিনিস ও স‍ুইডিস বাহিনী পশ্চিম এশিয়ায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। যুদ্ধ বিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিম এশিয়ায় প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। প্রেসিডেনট নিকসনও নিরস্ত্র মারকিন শান্তি পর্যবেক্ষকদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুদ্ধবিরতি রূপায়ণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য দুপক্ষের সামরিক প্রতিনিধি-দের এক বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাবে ইজরায়েল ও মিশর রাজি হয়েছে। দীর্ঘ সতের বছর পর আরব ইজরায়েলের মুখোমুখি কথা হল ২৮ অকটোবর।

দেশী সংবাদ

২২ অকটোবর—পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবে নয়াদিল্লি খুশি। বিদেশ মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে একথা জানিয়ে বলেন, ভারত এ-বিষয়ে এতদিন যা ভেবেছে, ভারতের প্রধান-মন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী যা বলেছেন তার সঙ্গে প্রস্তাবের শর্তগুলির সঙ্গতি আছে। ভারত স্বভাবতই এতে সন্তুষ্ট।

আসন্ন ঈদ এবং দেওয়ালি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত দশ হাজার টন চিনি খোলা বাজারে ছাড়তে সম্মত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বনস্পতি উৎপাদকদের দ্বারা উপাদান হিসাবে সরষের তেলের ব্যবহার আগামী নবেম্বর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতেও রাজি হয়েছেন।

২৩ অকটোবর—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা আজ ভোরে ডায়মনডহারবার রোডে কলকাতা হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

পৌর বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জি রাজ্য মন্ত্রিসভার কাছে দুটি প্রস্তাব দিয়েছেন। ১। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। পৌরসভার কোন পদ সৃষ্টি করতে গেলে অথবা কাউকে নিয়োগ করতে হলে সরকারের অনুমোদন লাগবে।

২৪ অকটোবর—ভারতে সাবসমেরিন একটি মারকিন তেল কোমপানি দুটকি দিচ্ছে, ভারতে তার অশোধিত তেলের আমদানি সে কমাবে। কতটা কমানো হবে তা অবশ্য জানানো হয়নি। সন্দেহ করা হচ্ছে আমেরিকায় তেল পাঠানোর এটা একটা চেষ্টা। এই কোমপানিটির নাম ইণ্ডো ক্যালটেকস।

কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ তালতলায় এক ছাপাখানা থেকে আজ স্টেট বাসের তিন লক্ষ জাল টিকিট এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২ লক্ষ সার্টিফিকেট জাল করার মত সরঞ্জাম, ৬টি ব্লক ৮টি রবার স্ট্যাম্প এবং স্টেট বাসের দশ হাজার জাল ওয়েবিল আটক করে। এ-ব্যাপারে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২৫ অকটোবর—কংগ্রেস হাইকম্যানড উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতৃত্বের কোন

রকম পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী এখনও কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা রয়েছেন। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে দু' তিন দিনের মধ্যেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দুর্মূল্য-ভাতা বৃদ্ধির পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বাড়াতে হলে সরকারের আর্থিক সঙ্গতির উপর যে চাপ পড়বে তা মেটাবার সাধ্য এ সরকারের নেই। তাই রাজ্য সরকারের আশা—ষষ্ঠ অর্থ কমিশন বিষয়টি সুবিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন।

২৬ অকটোবর—কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের এনফোরসমেনট পুলিস এ বছরের গোড়া থেকে শুরু করে গত ৮-৯ মাসে প্রায় আড়াই কোটি টাকার মত বেআইনী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য আটক করে। এর মধ্যে রাজ্য এনফোরসমেনট ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার দ্রব্য ধরে।

শ্রীনগরের এক খবরে প্রকাশ: রাজ্যের কৃষি-মন্ত্রী শ্রীতিলোচন দত্তের পুত্র শ্রীভারত দত্ত এবং অপর দুই ব্যক্তি একটি ওলন্দাজ মহিলাকে অপহরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে। ২০ হাজার টাকা জামিনে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

২৭ অকটোবর—ঘন ঘন লোড শেডিংয়ে বিব্রত কলকাতা শহরে ২৬ নবেমবর থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। ইউনিট প্রতি কমপক্ষে ৩.২৫ পয়সা ও সর্বাধিক ৫.২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রতি ইউনিটের দাম ১৬.২৫ পয়সা। এখন যাদের মাসিক বিজলী বিল ৪.১৯ পয়সা পর্যন্ত (২৫ ইউনিট বা তার কম), তাদের এই বাড়তি দাম থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এই দেশে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার কথা অজানা নয়। কিন্তু একথাও ঠিক যে, যদি ঐক্য থাকে, দৃঢ়সঙ্কল্প থাকে, তাহলে কোন বাধাই আর বাধা থাকে না। তুচ্ছ হয়ে যায়। বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

২৮ অকটোবর—পাকিস্তানকে দিল্লি চুক্তি সঠিকভাবে মানতে হবে। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজে আরও আন্তরিকতা, আগ্রহ এবং ত্বরার পরিচয় দিতে হবে। প্রকাশ, ভারত ও বাংলাদেশ পাকিস্তানকে একথা শীঘ্রই জানিয়ে দেবে।

বিদেশী সংবাদ

২২ অকটোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে রুশ-মারকিন যুক্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় ভারতের প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন বলেন যে, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা না করেই দুটি বৃহৎ শক্তি নিজেরা প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে ফেলে। তিনি বলেন, বর্তমান প্রস্তাবের ফলে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি ঘটবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

২৩ অকটোবর—উত্তর ভিয়েতনামের শান্তি-বাদী নেতা লি ডক থো আজ নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। মারকিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরি কিসিংগারের সঙ্গে যুগ্মভাবে তাঁকে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

২৪ অকটোবর—প্রতিনিধি সভার স্পিকার শ্রীকারল আলবারট আজ সাংবাদিকদের কাছে বলেন, প্রেসিডেনট নিকসন ওয়াটার গেট সংক্রান্ত টেপগুলি দিন বা না দিন, তাঁকে দোষী করার অভিযোগ সংক্রান্ত প্রাথমিক শুনানী চলবেই।

২৫ অকটোবর—আজ পৃথিবীতে ছড়ানো সমস্ত মারকিন সামরিক ঘাটির কাছে নির্দেশ গিয়েছে: সতর্ক থাক। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে পরমাণু অস্ত্র-বাহিনীকেও। রাশিয়া পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতির জন্য এককভাবে তার সৈন্য পাঠাতে পারে, এই মর্মে ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেওয়ার পরই পেনটাগন আজ ওই নির্দেশ দিয়েছে।

২৬ অকটোবর—রাজনীতি করতে গিয়ে বিটেনের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনেককেই [illegible] বড় রকমের সংকটে পড়তে হচ্ছে। জনগণের সেবা করতে গিয়ে ঘরের সুখে জলাঞ্জলি। ঘর ভাঙছে। ডিভোরসে যার চূড়ান্ত। শ্রমিক দলের এম-পি শ্রীমতী রেনী সরট এই সংবাদ জানিয়ে বলেছেন, ইতিমধ্যেই ১৮ জন এম-পি-কে ডিভোরসের কবলে পড়তে হয়েছে।

২৭ অকটোবর—উগানডার প্রেসিডেনট ই ডি আমিন আজ বলেন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছিল, এমন প্রমাণ তার হাতে আছে। জেনারেল আমিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন: মারকিন প্রযুক্তিবিদ, পাইলট ও বিশেষজ্ঞরা এই যুদ্ধে একটা রণকৌশল পরীক্ষা করে নিয়েছেন।

২৮ অকটোবর—গত শুক্রবার দু'জন জাপানী পর্বত অভিযাত্রী বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেসটের চূড়ায় আরোহণ করেছেন। এঁরা হলেন ২৮ বছর বয়স্ক অফিস কর্মী হিশাহি ইশিগুরো এবং ২৪ বছর বয়স্ক ছাত্র ইয়াসাও কাতো।

Biswajit Ganguly '72

৪১ বর্ষ] শনিবার, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 1st December, 1973. মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়: ২৪০ মি. লি. ও ৪৮০ মি. লি.।

নতুন! ফসফোমিন আয়রন—মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন কথাটার [illegible] লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
® ই. আর. স্কুইব অ্যান্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Ben

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীবিশ্বজিৎ গাংগুলী

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫
শনিবার ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৮০
Saturday 1, December 1973

বন্‌ধ-এর পর

গত শনিবার, সতেরোই নভেম্বর, বাংলা বন্‌ধের যে ডাক সরকার-বিরোধী ন'টি বামপন্থী দল মিলে দিয়েছিলেন তার পরিণতি কী ঘটেছে সে-কথা আমরা নতুন করে বলতে চাই না। কাগজেপত্রে দু তরফের বিবৃতি এবং পালটা বিবৃতির সেই চিরপরিচিত বয়ানও সাধারণের নজরে না-পড়ার কথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা, জনসাধারণ অন্ধ নন, যে যাঁর নিজের এলাকাতেই দেখেছেন, বাংলা বন্‌ধ সফল অথবা ব্যর্থ হয়েছে। তবু এই বন্‌ধ সম্পর্কে কিছু কথা থেকে যায়।

এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, পশ্চিমবঙ্গে যখন নতুন কংগ্রেস সরকার আবার ক্ষমতায় এলেন তখন মানুষের প্রত্যাশা জেগেছিল নানাভাবে। শুধু প্রত্যাশা নয়—কংগ্রেস দলের ক্ষমতার ওপরও আস্থা ছিল অধিকাংশের। আজ আড়াই বছরের মধ্যে সেই প্রত্যাশা এবং আস্থা কোথায় এসে ঠেকেছে সেটা ভেবে দেখতে হবে। বলতে [illegible] উদ্যো- পাধ্যায় [illegible] প্রকাশ করার মনোভাব— [illegible] বিরক্ত ও হতাশ [illegible] সরকার-বিরোধী বামপন্থী [illegible] যখন বন্‌ধ ডাকেন তখন তাঁরা কাগজপত্রে যে-কথা বলেন মনে মনে সে-কথা ভাবেন না, বলেনও না। এই বন্‌ধ [illegible] আসল উদ্দেশ্য মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো বা খাদ্যের দাবি নয়, ওটা বাইরের কথা, ভেতরের কথা—মানুষের আজকের দিনের হতাশাকে কেমন করে কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা। একদিনের বন্‌ধ কোনো মুশকিল-আসানের অস্ত্র নয়, তাতে কোনো কিছুরই সুরাহা হয় না—উপরন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ আরও বাড়ে। তবু যখন এই বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়—তখন বামপন্থী দলগুলি চান, নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে আরও একটু সচেতন হতে। অর্থাৎ দেখতে চান: তাঁদের দিকে জনসাধারণের কতটা অংশ আবার ঝুঁকে পড়ছে মানসিকভাবে কিংবা সরকারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিস্পৃহ মনোভাব গ্রহণ করেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে বোধ হয় বলা যায়, ইদানীং সরকার-বিরোধী মিছিল-জমায়েতে লোকসংখ্যা সম্ভবত বাড়ছে। এটা কি হতাশার লক্ষণ নয়?

[illegible] কিন্তু [illegible] করে বলতে পারেন নি। তাঁর পক্ষে বলা [illegible] নয়—কারণ যে [illegible] দুর্গতি দেশের [illegible] দেখা দিয়েছে তা রোধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি—এই তিন দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে লড়বার অস্ত্র একা শ্রীরায়ের হাতে থাকার কথা নয়, আর পশ্চিমবঙ্গই শুধু এই তিন ব্যাধির কবলে নয়, সারা দেশই সে-ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকার যে কাজগুলি নিজে করতে পারতেন—তারই বা অবস্থা কী? অন্তত, পশ্চিমবঙ্গে যেসব শিল্পসংস্থা গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল—যার অনুমোদনও রয়েছে—সেগুলি আজও কাগজেপত্রে আটকে আছে কেন? এমন কোন্ লক্ষণ দেখা গেছে যাতে মনে করা যাবে, একটি যোগ্য, কর্মতৎপর সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমৃদ্ধির জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন? সরকার যদি মনে করে থাকেন, বিরোধীদের ডাকা বন্‌ধ ব্যর্থ হওয়ার অর্থ তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা অটুট থাকা—তবে মনে করি ভুল করবেন। বন্‌ধ কোনো আস্থা অনাস্থার প্রমাণ নয়, ওটা চলতি রাজনীতির অভ্যাস; আসলে সাধারণের আস্থা জয় করা এবং হারাবার বড় প্রমাণ অন্যত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সাধারণের আস্থা হারাতে চলেছেন, এটা অন্তত অসত্য নয়। সম্ভবত, এই সার কথাটুকু সরকার উপলব্ধি করবেন।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রী[illegible] ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
[illegible] আসাম ও ত্রিপুরায়
[illegible]
[illegible]

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৮.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.০০

আসামে ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২২.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.০০

[illegible]
[illegible] ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪৪.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২.০০
[illegible]
[illegible] ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৩১.০০

[illegible] ব্যতীত
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৮৭.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪.০০

আরব রাষ্ট্র
পশ্চিম এশিয়া
পুতুল-নাচের
বিদ্যুৎ শক্তির অভাবে প্রদর্শনী স্থগিত।
আমাদের পরবর্তী প্রদর্শনীর অপেক্ষা করুন।
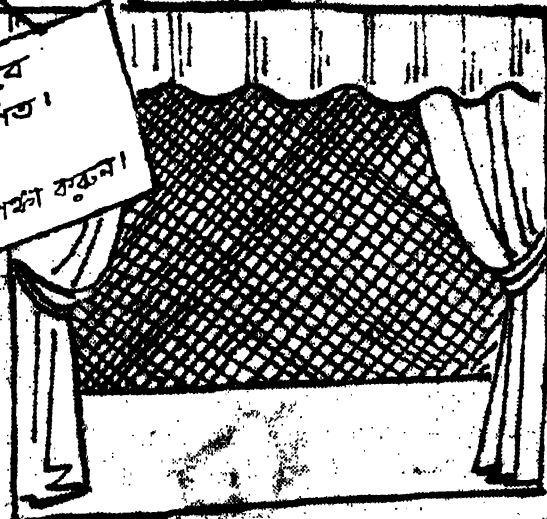
[illegible]

যাঁরা কর্মবিরতি বা বন্ধের আহ্বান করেছিলেন তাঁরাও যে এর চেয়ে ভিন্ন কোনও ফলাফল আশা করেছিলেন তেমন নয়। তাঁরা চিরকালই জানেন কর্মবিরতি বা বন্ধ করে জিনিসপত্রের দাম বা অভাব কমানো যায় না। তবু তাঁরা মাঝেমধ্যেই কর্মবিরতি বা বন্ধ ডাকেন। জনজীবনকে, কলকারখানার উৎপাদনকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিছু হবে না জেনেও তাঁরা তা করেন।

একেবারে কোনও কিছুই হবে না জেনে তাঁরা কর্মবিরতি বা বন্ধের ডাক দেন তা বলছি না। এর মাধ্যমে অন্য কোনও না কোনও ফললাভের আশা নিশ্চয়ই করেন। সেগুলি হল কর্মবিরতি বা বন্ধের আহ্বায়কদের রাজনৈতিক লাভের প্রশ্ন।

এই ধরনের বন্ধ বা কর্মবিরতি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে হয় না। হয় রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীগুলির প্রয়োজনে।

*

এবারের কর্মবিরতি এবং বন্ধও তাই। সি পি আই এই কর্মবিরতির আহ্বান দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনে। সি পি আইকে যে কোনওভাবে বামপন্থী ইমেজটা রক্ষা করতেই হবে। আবার সি পি আইকে কংগ্রেসের সঙ্গেও থাকতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বড় প্রগতিশীল অংশ আছে। তাই সি পি আই মাঝেমাঝে বন্ধ, কর্মবিরতি, গণ-ডেপুটেশন, গণ-অভিযান প্রভৃতি জিনিসগুলি করবেই এবং সেই সব কাজে কংগ্রেসের তথাকথিত একটা প্রগতিশীল অংশকে সঙ্গে পাওয়ার চেষ্টা করবেই।

সি পি আইয়ের এতে খুব অসুবিধা হওয়ার কথাও নয়। কারণ, রাজ্যের কংগ্রেস দল নানা ভাগে বিভক্ত। রাজ্য সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ তাঁরা বোঝেনও কম। আর, বুঝলেও তা প্রতিরোধ করার সাহস বা মনোবল তাঁদের নেই। নানা কারণে তাঁরা অনেকেই সি পি আইকে একটু সন্তুষ্ট রেখে চলতে চান। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাবে কিছু কংগ্রেস নেতা সি পি আইকে ভয় করেন।

অন্য দিকে, নানাভাবে কংগ্রেসের ভেতরের একটা অংশ এবং কিছু নেতাকে সি পি আই হাত করে ফেলতে পেরেছে। এই কংগ্রেসীরা সি পি আই নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন। কলাকৌশল নিয়ে গোপন শলাপরামর্শ করেন। এবং, বিপদে আপদে সি পি আইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

[illegible]

[illegible] সি পি আই বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন। এই সব কংগ্রেস নেতা প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন রাজ্য কংগ্রেসকে দিয়ে সি পি আই-এর ডাকা বন্ধ সমর্থন করাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না।

এবার অবশ্য সি পি আই নেতারা সফল হয়েছেন। কংগ্রেসের ভেতরের সি পি আই-সমর্থকদের সাহায্যে কংগ্রেস দলকে কর্মবিরতির আহ্বানে সামিল করতে পেরেছেন। দেখাতে পেরেছেন কংগ্রেসের ভেতরে একটা প্রগতিশীল অংশ আছে। সি পি আই নেতারা আরও মনে করেন, এইভাবে একটা কর্মবিরতির কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা দলের বামপন্থী ইমেজটাও রক্ষা করতে পেরেছেন।

*

সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি নয় বাম পার্টি যে বন্ধ ডেকেছিলেন সেটাও নিজস্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনে। প্রথম প্রয়োজন, সেটা নয় পার্টিরই প্রয়োজন, আস্তে আস্তে রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্বটা জাহির করা। দ্বিতীয় প্রয়োজনটা প্রধানত সি পি এমের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনটা হল দলের ভয় পাওয়া কর্মীদের মনে বল ফিরিয়ে আনা। তৃতীয় প্রয়োজনটা হল, কংগ্রেসকে এবং সরকারকে কিছুটা ব্যতিব্যস্ত করে তোলা—তাঁদের আত্মপ্রত্যয়টা কমিয়ে দেওয়া।

প্রধানত এই তিন রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নয় বাম এবার বন্ধ ডেকেছিল। এর আগে সি পি আই যে বন্ধ ডেকেছিল সেই বন্ধ নিয়ে সি পি এমের সঙ্গে আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি-র বেশ কিছুটা মতপার্থক্য হয়েছিল। তা নিয়ে আট পার্টি জোটও ভেঙে গিয়েছিল।

সব বামপন্থীরই এখন ধারণা, আর বেশী দিন চুপচাপ থাকা তাঁদের পক্ষে মারাত্মক হবে। নির্বাচনের পর একটা বছর তাঁরা একেবারে চুপচাপ ছিলেন। অভাবনীয় নির্বাচনী বিপর্যয়ে তাঁরা একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে নতুন কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতা, কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ কলহ, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি তাঁদের মনে সাহস জুগিয়েছে। তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন, জনসাধারণের মধ্যে নতুন কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার সম্পর্কেও হতাশা বাড়ছে। তাঁরা [illegible] করছেন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাবের ফলে জনসাধারণ চরম ক্ষুব্ধ। তাঁরা দেখতে

[illegible]

সি পি এমের আর একটা বাড়তি ভাবনা(?) আছে। বৃহত্তর কলকাতার বহু এলাকায় এখনও তাদের কর্মীদের পক্ষে সক্রিয় রাজনীতি করা সম্ভব নয়। এখনও তাঁরা অনেকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারেননি।

কিন্তু দলের কর্মীরা যতদিন নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে কাজ করতে না পারবে, যতদিন সি পি এম তার পুরনো সব শাখাকে কার্যক্ষম করতে না পারবে ততদিন দলের পক্ষে সামগ্রিকভাবে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। সি পি এমকে তাই সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

আর সেটা করা সম্ভব প্রধানত "জনপ্রিয়" বা আঞ্চলিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনের মাধ্যমেই। সি পি এম যদি আজ ব্লক(?) দলীয় রাজনৈতিক দাবি নিয়ে "নিষিদ্ধ" এলাকাগুলিতে ঢোকার চেষ্টা করে তা হলে তা কিছুতেই পারবে না। কিন্তু সি পি এম কর্মীরা যদি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ বা আঞ্চলিক জনপ্রিয় দাবিদাওয়ার আন্দোলনকে ভিত্তি করে পাড়ায় পাড়ায় আবার ঢুকতে চেষ্টা করে তা হলে তা ধীরে ধীরে পারবেই।

এই আন্দোলন, এই বন্ধের মাধ্যমে সি পি এম সেই কাজগুলি করতে সচেষ্ট।

বামপন্থী নেতারা আরও জানেন, রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল। রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো বলতেও তেমন কিছুই নেই। ভেতরে কলহও তীব্র। তাঁরা তাই মনে করছেন, বর্তমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সুযোগে যদি এই দলের উপর ক্রমে ক্রমে আঘাত হানা যায় তা হলে ফল পাওয়া যাবে। কংগ্রেস সংগঠন ও কর্মীরা দিশাহারা হয়ে পড়বে। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মনোবল ভেঙে যাবে। আস্তে আস্তে তাঁরা আসর থেকে সরে যাবেন।

নয় বামের নেতারা মুখে অবশ্য তা কিছুতেই স্বীকার করবেন না, কিন্তু বাস্তব সত্য হল যে, ভেতর থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বকে দুর্বল করে দিয়ে, কংগ্রেসের উপরতলার বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে, কংগ্রেসের ভেতরে নানা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করা। সি পি আই-ও এই ব্যাপারে নয় বামকে সাহায্য করছে।

কংগ্রেস দুর্বল হলে লাভ কিন্তু সি পি আইয়ের হবে না, লাভ হবে প্রধানত সি পি এমের।

১৯।১১।৭৩

নারায়ণ গুপ্ত

সিদ্ধার্থ রায়ের ছবি

বাংলা ছায়াছবির জগতে রায় বলতে এতদিন বিদ্বজ্জন লোক যে একটি মাত্র রায়কেই জানত, তিনি সত্যজিৎ রায়। সম্প্রতি দ্বিতীয় আরেকজন রায়ের আবির্ভাবে এবার সত্যজিতের একচ্ছত্র আধিপত্যের দিন যে শেষ হয়ে এল, সেকথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। এই দ্বিতীয় রায় হচ্ছেন সিদ্ধার্থ রায়। প্রযোজক ও পরিচালক হিসাবে বাংলা ছবির জগতে তাঁর চমকে দেওয়া আবির্ভাব শুধু মাত্র আকস্মিকতার দ্বারাই চিহ্নিত নয়, তা স্বাতন্ত্র্যেও ভাস্বর। সত্যজিতের কথা অবশ্য বটে, কারণ বাংলা ছবিতে আধুনিক-কালে তিনি একটা বড় রকমের মোড় ফেরান। সিদ্ধার্থের চিত্রভাবনা তেমনি আরেকটা বৈপ্লবিক বাঁক ফেরাল। এই কারণেই দুজনের নামকে এক সঙ্গে টেনে আনতে হল। এই মিলটুকু ছাড়া দুজনের মধ্যে আর মাত্র চার প্রস্থ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যথা—

(এক) উভয়েরই পদবী রায়,

(দুই) উভয়েরই নামের আদ্যাক্ষর স—সত্যজিৎ ও সিদ্ধার্থ,

(তিন) উভয়েরই ডাক নামের আদ্যাক্ষর ম—মানিক ও মনু,

(চার) উভয়েই দীর্ঘদেহী।

এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিল্প ভাবনার ক্ষেত্রে, আর কোনও মিল দুজনের আছে বলে আমার মনে হয় না। সিদ্ধার্থ রায়ের প্রথম ছবি "তোমাকে হিরো হতে দেব না, গুরু" দেখার সৌভাগ্য যখন আপনাদের হবে, যদি কখনও সে সৌভাগ্য কারও হয়, আশা করি তখন সকলেই বর্তমান সমালোচকের সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠবেন, "সত্যি এমনটি আর দেখিনি।" বাংলা ফিল্মে সিদ্ধার্থবাবুই যে "ন্যাচরালিজমের" জনক, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে।

দুঃখের বিষয় এমন একটা চিত্ত আলোড়ন-কারী ছবি আঞ্চলিক সেনসার বোর্ডের সদস্য-দের সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতার জন্য সাধারণে মুক্তিলাভ করতে পারছে না। এই ছবিটাকে ইউনিভার্সাল অর্থাৎ 'ইউ' সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, না অ্যাডাল্ট অর্থাৎ 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে আঞ্চলিক সেনসার বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। ছবিটি মুক্তি না পাবার কারণ নাকি তাই।

একটা প্রাইভেট শো-এ বর্তমান সমালোচকের "তোমাকে হিরো হতে দেব না, গুরু," ছবিখানি দেখবার সৌভাগ্য হয়। এটাকে ফিল্ম না বলে অ্যাবসার্ড ফিল্ম বা অ্যান্টি ফিল্ম বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই। প্রযোজক এবং পরিচালক সিদ্ধার্থ রায়ের বাহাদুরি এইখানে যে এটাকে কারও ছবি বলে মনেই হবে না। এমনই ন্যাচারাল হয়েছে জিনিসটা।
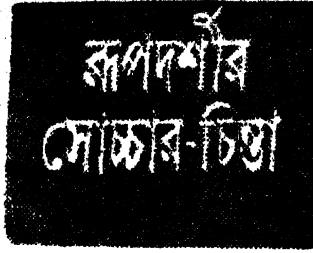
প্রযোজক ও পরিচালক সিদ্ধার্থ রায় তাঁর ছবিটা তুলতে আগাগোড়া প্রচলিত প্রথা ও প্রকরণকে এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁর ছবিতে যেমন কোনও ছকবাঁধা চিত্রনাট্য অনুপস্থিত, তেমনি ছবির সম্পাদনাও অপরি-কল্পিতভাবে বিশৃঙ্খল। তার ফলেই ছবিতে এমন আশ্চর্য রকমের একটা স্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে। টুকরো টুকরো ঘটনাবলীর মালা গেঁথে শ্রীসিদ্ধার্থ তাঁর "তোমাকে হিরো হতে দেব না, গুরু" ছবিটি গড়ে তুলেছেন। ছবিটি সিরিয়াস হলেও উপস্থাপনার গুণে একটা অন্তর্লীন ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রবাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রয়েছে।

তবে সব থেকে অবিস্মরণীয় ঘটনা হল ১৫ নভেম্বরের বাম সমাবেশ। প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীসিদ্ধার্থ বললেন, "আমি তিন-জন ক্যামেরাম্যানকে এমন কৌশলে লুকিয়ে রেখেছিলাম যে অভিনেতারা জানতেই পারেননি যে ফিল্ম তোলা হচ্ছে। ফলে অভিনেতারা তাঁদের কেরিয়ারে এই প্রথম ম্যানারিজম ছেড়ে স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।"

প্রশ্ন : এই সিকোয়েন্সটাতেই বা বিশেষ করে ক্যামেরা লুকিয়ে রাখতে গেলেন কেন?

শ্রীসিদ্ধার্থ : আমি দেখতে চেয়েছিলাম, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

প্রশ্ন : শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কি আপনি খুশি?

শ্রীসিদ্ধার্থ : নববামের আইন অমান্য ও নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারবরণ, এই এপিসোডটা দারুণ জমেছে। আমার মতে এই সিকোয়েন্সটি সিনেমায় বিপ্লব আনবে।

ছবিটা দেখবার পর, সত্যি বলতে কি, প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীসিদ্ধার্থের সঙ্গে একমত না হয়ে পারা গেল না।

দৃশ্যটা এই : একটা পার্ক থেকে মিছিল বেরুচ্ছে। মিছিলের মুখে কয়েকজন নব-বামের নেতা। নববাম নেতাদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে জনপ্রিয় ও ভেটারান নট জ্যোতি বসু, যতীন চক্রবর্তী, সুবোধ ব্যানার্জি এবং আরও অনেকে। মিছিল ধর্মতলা দিয়ে আসছে। ওদিকে এসপ্ল্যানেড ইস্টে পুলিসের কর্ডন। পাশে একটা পুলিস ভ্যান। ভ্যানের ওয়ারলেস আওয়াজ দিল, "দি ক্রাউড ইজ অ্যাবাউট টু আউটফ্লাড।" কাট্। মিছিল আসছে। মিছিল ধ্বনি দিচ্ছে। নেতারা আওয়াজ না করে শুধু ঠোঁট মিলিয়ে নিচ্ছেন। কাট্। ওয়ারলেস খবর দিচ্ছে, "দি ক্রাউড ইজ অ্যাবাউট টু আউটফ্লাড।" ক্যামেরা ঘুরল। এসপ্ল্যানেড ইস্টে পুলিস কর্ডনের কাছে লোক জমেছে। বাড়ির ছাদেও লোক। কাট্। মিছিল আসছে। কাট। ওয়ারলেস খবর দিচ্ছে, "দি ক্রাউড ইজ ওভার ফ্লোর আউটফ্লাড।" জনতা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। দেখা গেল নেতাদের নিয়ে মিছিল পৌঁছে গেছে। কাট। পুলিসের প্রস্তুতি। কাট। পুলিস অফিসার এগিয়ে এলেন। নেতারা থামলেন।

পুলিস অফিসার : স্যর, আপনারা গাড়িতে উঠুন।

জ্যোতি বসু : আমরা আইন অমান্য করতে এসেছি।

পুলিস অফিসার : আপনারা আইন অমান্য করে ফেলেছেন স্যার।

যতীন চক্রবর্তী (নিঃশ্বাস ফেলে) : বটে বটে! আমরা তাহলে আইন অমান্য করে ফেলেছি? ঠিক বলছেন?

পুলিস অফিসার : হ্যাঁ স্যর। আপনারা আইন অমান্য করেছেন।

যতীন চক্রবর্তী : তাহলে, ও জ্যোতি-বাবু, শুনছেন তো। এবার তাহলে গাড়িতে উঠি, কী বলেন?

জ্যোতি বসু : গাড়িতে উঠতে যাব কেন? আমরা আইন অমান্য করেছি, আমাদের গ্রেফতার করুন।

পুলিস অফিসার : আপনারা তো গ্রেফতার হয়েছেন স্যার! এবার আসুন, মিনিবাস রেডি।

সুবোধ ব্যানার্জি : মিনি বাস কেন? আমরা কি বরযাত্রী?

জ্যোতি বসু তারপর গর্জন করে বলেন, "চালাকি পেয়েছেন! এই কি আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার! ভাল চান তো আমাদের পুলিসের ভ্যানে তুলুন। নইলে এক পাও নড়াচ্ছি নে।"

"নইলে এক পাও নড়াচ্ছি নে", জ্যোতি-বাবুর এই সংলাপের উপর যখন তাঁর ক্লোজ-আপ ফুটে ওঠে তখন তাঁর অভিব্যক্তি এবং উচ্চারণে এত সিরিয়াসনেস যে পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে থাকে। পরক্ষণেই দুশো পদ-ক্ষেপের প্যারডি করে তিনি গাড়িতে গিয়ে ওঠেন আর দর্শক তখন বুঝতে পারে যে গোটা ব্যাপারটাই কমিক। তখনি হো হো করে তারা হেসে গড়িয়ে পড়ে। নিরে ধী নেতার সিরিও-কমিক ভূমিকায় জ্যোতি-বাবুর অভিনয়ের আজও কোনও তুলনা নেই। একথা স্বীকার না করলে তাঁর প্রতি তার অবমাননা করা হয়।

দেবরাজ

জোর বরাত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এখন চীন ততটা ডরায় না যতটা ডরায় রুশিয়াকে। যদিও পুঁজিবাদী আমেরিকা তার কাছে বেজাত আর সমাজবাদী রুশিয়া তার স্বজাত তবুও চীনের নেতারা মনে করেন না তাঁদের দেশকে আক্রমণ করার জন্যে মার্কিনীরা অস্ত্র শানাচ্ছে। বরঞ্চ তারা প্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। শোধনবাদী রুশীদের ওপর তাঁদের কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস নেই। তাঁর ধরে নিয়েছেন সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে কথাবার্তা যদিও রুশীরা চালিয়ে যাচ্ছে সুবিধে পেলেই তারা হামলা করবে প্রজাতন্ত্রী চীনের ওপর। তাঁদের হিসেবে রুশীরা তাদের বিরাট ফৌজের বেশীর ভাগটাই জড় করেছে চীন সীমান্তে। ইউরোপে যদি রুশীদের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলোর একটা বোঝাপড়া হয়ে যায় তা হলে আরও বেশী ফৌজ তারা নিয়ে আসবে চীনের কাছাকাছি। ইউরোপে পুব-পশ্চিম বোঝাপড়া হোক চীনের তা ইচ্ছে নয়, কেন না তা হলে বিপদ তার বাড়বে।

চীনের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে নিক্সনের আমেরিকার সঙ্গে তার যে মাখামাখি হয়েছে তা সে বজায় রাখতে চায়। তা হলে দুনিয়াতে রুশীদের ঠেকাবার সে একজন দোসর পাবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই তার মতলব। আমেরিকার ক্ষমতা হচ্ছে ষাঁড়ের শত্রু, যদি বাঘে মেরে দেয় মারুক—তার তাতে আপত্তি কিসের? মার্কিন-চীন দোস্তি তাই দিব্যি জমে উঠেছে। দু' বছর আগে সবাইকে তাক লাগিয়ে লুকিয়ে পিকিংয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন এখনকার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ হেনরি কিসিংগার। তাঁর লক্ষ্য ছিল নির্বিঘ্ন পুরীর পথ সরকারী খুলে দেওয়া যাতে খোদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন স্বচক্ষে এসে দেখে যেতে পারেন চীনে কম্যুনিস্টদের কাণ্ডকারখানা আর দোস্তি পাতাতে পারে চীনাদের সঙ্গে মার্কিনীরা। ডঃ কিসিংগার করিতকর্মা লোক। প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইকে তিনি পটিয়ে ফেলেছিলেন মাও সে তুংয়ের মনও তিনি ভিজিয়েছিলেন। এক বছরের অক্টোবরে জাতীয়তাবাদী চীনকে বিদেয় দেওয়া হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থেকে। তার জায়গায় সেখানে ঠাঁই হলো প্রজাতন্ত্রী চীনের।

একুশ বছর একঘরে থাকার পর জাতে উঠলো কম্যুনিস্ট চীন। গোটা চীন তার দখলে, আশপাশের অনেকগুলো দ্বীপও বাদে তাইওয়ান অর্থাৎ ফরমোজা। ওই তাইওয়ানেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন দলবল নিয়ে চীনের মূল এলাকা থেকে পালিয়ে চিয়াং কাই শেক ১৯৫০ সনে। সেই থেকে ওই দ্বীপেই তাঁর আস্তানা। তাঁর দাবি চীনের আসল সরকার তাঁরই, কম্যুনিস্টরা জবরদখল করেছে চীনের মূল এলাকা, সেখানে সরকার চালাবার এক্তিয়ার তাদের নেই। তাঁর সে দাবি আমেরিকা মেনে নিয়েছিল বলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঠাঁই হয়েছিল তাঁর সরকারেরই প্রজাতন্ত্রী সরকারের নয়। কম্যুনিস্ট দুনিয়ার বাইরে অধিকাংশই দেশই আমেরিকার দেখাদেখি স্বীকৃতি দেয়নি প্রজাতন্ত্রী চীনকে—তাইওয়ানের চিয়াং সরকারকেই গোটা চীনের আইনসঙ্গত সরকার বলে মেনে নিয়েছিল। একটা ডাহা মিথ্যেকে খাঁটি সত্যি বলে চালাবার এমন ব্যবস্থা ইতিহাসে কখনও হয়নি। কিন্তু যতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরূপ ছিল ততদিন প্রজাতন্ত্রী চীন আর তার বন্ধুদের সাধ্য হয়নি মিথ্যে কথার ওই জাল ছিঁড়ে তাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আসরে বসাতে।

সেটা সম্ভব হয়েছে আমেরিকার মর্জি পাল্টাতে। সেই থেকে ওয়াশিংটনের ওপর পিকিং খুশী। চীনা কম্যুনিস্ট দলের দশ নম্বর কংগ্রেসেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দে বিশেষ কেউ করেন নি—প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই তো নয়ই—কেবল উঠতি নেতা ওয়াং হুং ওয়েন ছাড়া। চীন সম্পর্কে আমেরিকার মতিগতি ইদানীং বদলেছে আমেরিকা সম্পর্কে চীনেরও নয়। বেকায়দায় পড়ে নিক্সন চাইছেন চীনের সঙ্গে সম্বন্ধটা বাগিয়ে নিতে, চু এন লাইও চাইছেন প্রমাণ করতে পুঁজিবাদী আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে ডেকে নিয়ে তিনি কিছু ভুল করেন নি। আবার ডাক পড়েছিল ডঃ কিসিংগারেরই। চার দিন চীন সফর করে তিনি আর একদফা চীনের নেতাদের ঘুচিয়েছেন সন্দেহ, রাষ্ট্রপতি নিক্সনের ভয়। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির রাহু নিক্সনের ক্ষমতার সূর্যকে গ্রাস করবে কিনা সে কথাই সম্ভবত জানতে চেয়েছিলেন কিসিংগারের মুখ থেকে মাও সে তুং আর চু এন লাই—তাঁদের দু'জনেরই সঙ্গেই অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছেন কিসিংগার। ঠিক তাঁদের কী বলেছেন কিসিংগার তা তিনি খুলে বলেননি, শুধু এইটুকু আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রশাসনে রদবদল যাই হোক না কেন চীনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

চীনের সঙ্গে আমেরিকার এত দোস্তি হলেও কূটনৈতিক গাঁটছড়ায় দু' দেশ এখনও কিন্তু বাঁধা পড়েনি। আমেরিকার চীনের রাষ্ট্রদূত নেই, চীনে নেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তবে দু' দেশেই দু' রাষ্ট্রের সংযোগ দপ্তর আছে। তাদের যাঁরা কর্তা মর্যাদা তাঁদেরও কিছু কম নয়। তবুও পুরোপুরি দূতাবাস না চালু হলে কূটনৈতিক সম্পর্কে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। তার বাধা হচ্ছে তাইওয়ানের সঙ্গে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেখানে মার্কিন সেনাদের আস্তানা। নিক্সনকে কম্যুনিস্ট সরকার সাফ বলে দিয়েছিলেন তাইওয়ানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক কিংবা সেখানে সেনা সমস্ত রাখলে রাষ্ট্রদূত পাঠাবার প্রস্তাব তাঁরা আমলেই আনবেন না। লোকে ধরে নিয়েছিল চীনের সঙ্গে ভাব রাখতে নিক্সন যেরকম উদগ্রীব তাতে বছর না ঘুরতেই হয়তো তিনি তাইওয়ানকে পথে বসিয়ে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ খারিজ করে দেবেন। সেখান থেকে মার্কিন ফৌজ দেশে ফিরিয়ে আনবেন। তা কিন্তু এতদিনেও হয়নি। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে তা হয়তো আপাতত হবেও না। কিসিংগারের পিকিং সফরের পর যে যুক্ত ইস্তাহার বেরিয়েছে তার বয়ানের ওই ভাবাই কূটনীতিকরা করছেন। তাইওয়ানের কপাল শাঁসিগরই বোধ হয় ভাঙছে না।

পিকিংয়ের ভয় ধরেছে তাইওয়ান থেকে মার্কিন ফৌজ চলে গেলে রুশীরা সেখানে ঢুকে না পড়ে। চিয়াংয়ের ছেলে আর তাঁর উত্তরাধিকারী চিয়াং চিং-কুয়ো নাকি মস্কোর খপ্পরে পড়তে পারেন। তা হলেই তো চিত্তির। এর চেয়ে বরঞ্চ তাইওয়ান আলাদা হয়ে থাকে সেও ভালো। দরকার হলে গোরাসি-পল্টন নিয়ে মার্কিন ফৌজও না হয় সেখানে থাকুক, কিন্তু শোধনবাদীরা যেন সেখানে নাক গলাতে না পারে ওই হচ্ছে চীনের ভাবনা। ১৪ নভেম্বরের যৌথ ইস্তাহারে বলা হয়েছে তাইওয়ান প্রণালীর দু' পারের চীনারা যে বলে তাইওয়ান মূল চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ আমেরিকা তা নিয়ে কোনও তর্ক তুলতে চায় না। সে ইস্তাহারে এমন কোনও শর্ত নেই যে পিকিং সরকারকে তালাক না দিলে কিংবা তাইওয়ান থেকে ফৌজ সরিয়ে না নিলে চীন আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত পাঠাবে না কিংবা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে চীনে আসতে দেবে না। আনেকের ধারণা তাইওয়ান সম্পর্কেও আগের উগ্র মনোভাব চীনের গেছে, সুর তার নরম হয়ে এসেছে। চীন দুটো নয় একটা এইটুকু আমেরিকা কবুল করলেই যথেষ্ট—এই ভাবই দেখাচ্ছে প্রজাতন্ত্রী চীন। এর পর আইনের ফাঁক দিয়ে দু' দেশের রাষ্ট্রদূত যদি দু' দেশে ঢুকে পড়েন তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু থাকবে না। ঘটনার স্রোত সেই দিকেই যেন বইছে।

গ্রন্থি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

দু-দিকেই খুলে যায় অথবা যায় না কোনো দিকে,
তৃতীয় বিকল্প কিছু নেই।
সুতোর সামান্য টানে হেরফের হয়ে যায়।
হয় দেখা যায় তার মুখ
দর্পণে যেভাবে পড়ে অবিকল মুখের আদল,
না হলে পারদ
তুলে ধরে অন্ধকার, স্বচ্ছতায় অনন্ত আড়াল।

তৃতীয় বিকল্প কিছু নেই।
সরাতে-সরাতে জল চিরকাল মাটি ও পাথর,
পারদের উল্টো দিকে ছায়া।
সুতোর সামান্য টানে হেরফের হয়ে যায়।
দু-দিকে সমান পথ, জট খুলে যায়, আলো পড়ে,
না হলে পাথর-মাটি-পারদের গ্রন্থিল আঁধার
চিরকাল।

স্বাগত নবীন জন্ম

আশিস সান্যাল

আবার নীরবে তুমি আবির্ভূত। প্রসন্ন ভোরের
যেমন বিজন স্পর্শে নির্মেঘ নীলিমা
ধ্বনিময় উদ্ভাসিত, তেমনি হে হিমাবতী দুর্গম সুখের
জলের মতন স্নিগ্ধ আঙ্গিক ভঙ্গিমা

দেখালে আবার তুমি। যেন দীর্ঘ বিষাদের পর
আবার তোমার নাম কল্লোলিত,
বেদনা আহত ম্লান ঘনীভূত রক্তের ভেতর।

আবার নির্ভরে তুমি অনুরত। মুগ্ধতায় ধ্বনি
বাতাসে যেমন কাঁপে শফেদার বন
তেমনি নির্জনে কাঁপে চোখে এক দূর প্রতিধ্বনি।
অন্তরালে বহমান মৃদু প্রস্রবণ

আবার দিগন্ত জুড়ে অবিরাম প্রতিশ্রুতিময়।
স্বাগত নবীন জন্ম, প্রতিজন্ম—
স্বাগত হে রূপাশ্রিত চেতনার বেগবান দীপ্র বরাভয়॥

মহিষাদলে, একদিন

পার্থসারথি চৌধুরী

কোনো একটা জায়গাকে আমার প্রতিপালন করতে ইচ্ছে হয়
যেমন করতেন পূর্বপুরুষেরা;
একখণ্ড ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ,
উত্তরাধিকার, বংশলতায় কালের মহীরুহ ছেয়ে যায়,
এমন একটি জায়গায় চার কি পাঁচ দশক,
দিনে দিনে প্রতিপালন।

একটা পুকুরের নতুন ঘোলাটে স্থাপনা থেকে
কাকচক্ষু বৃক্ষলতাপ্রতিবিম্বিত পরিণতি,
একটা লাল ইঁটের রাস্তার ব্যথিত বর্ষীয়ান রক্তিমতা,
একটা খালপাড়, খালের ওপর একটা পোল,
তার অবহেলিত ক্ষয়ে যাওয়া, দুর্বল উজ্জীবন।

এমন একটা বিশেষ জায়গাকে আমি ধীরে ধীরে
প্রতিপালন করতে চেয়েছিলাম,
সেখানকার আকাশ জলহাওয়া বৃক্ষলতা পরিজন
দোলমঞ্চ গড়খাই দেউড়ি রাজপ্রাসাদ রথযাত্রা
ইস্কুল মুগ্ধতা প্রত্যয় অমৎসর প্রেমানুভব,
সব নিয়ে কোনো একটা জায়গাকে আমি
প্রতিপালন করতে চেয়েছিলাম।

এ জীবনে ভিন্ন ব্যবস্থায় তা আর হয়ে উঠল না।

সেই নিস্তব্ধ মানুষ

সুবো আচার্য

বহুদূর চলে এসেছে আজ সেই নিস্তব্ধ মানুষ
ফেরার ইচ্ছে হয় না তার
সামনে এগোতে ইচ্ছে হয় না তার
থেমে থাকা অসম্ভব, নারী, তুমি এই সৃষ্টির অন্তরের
এককণা আশ্চর্য আগুন, আজ তুমিও
তার কাছে রহস্যময় বিস্মরণ!
কতদূর নিয়ে যেতে পারে নারী?

যতদূর মুগ্ধ পারে না
যতদূর ক্ষমতা পারে না
যতদূর ঐশ্বর্য পারে না
আজ সে নারীকেও বহুদূরে ফেলে এসেছে যেন,
তার সম্মুখে শ্মশানের মতো মহাসাগর পেছনে ধূর্ত বিস্মৃতি
মানুষের প্রতি ভালোবাসা আছে কিনা ভালোবাসা জানে,
সে তা জানে না, ভালোবাসা অবিশ্বাস যুগপৎ চুপ করে
চেয়ে থাকে তার শান্ত চোখের দিকে; যেরকম বেদনায় গল্প করে
দুঃখিত মানুষ সেরকম অবিশ্বাসে তারা পরস্পর
চেয়ে থাকে, কিরকম
আর্ত নিয়মে গোটা সৃষ্টি প্রবাহিত, কোথায় অনন্তকে ধরা যাবে
হাতের মুঠোয় কিংবা অসীমে সমস্ত ব্যথা আরক্তিম
ফুল হয়ে ফোটে
কিভাবে যে—ফোটে নাকি কোনোদিন? একবুকভরা অবিশ্বাস,
ধারালো নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় সেই নিস্তব্ধ মানুষ,
একবার আকাশের স্পষ্ট রহস্যের দিকে চোখ চেয়ে নামায় মাটিতে
তারপর মৃদু হেসে দুঃখ ও রক্তমাখা পৃথিবীর দিকে ফিরে যায়-

"উন্নয়ন ও বণ্টন" প্রসঙ্গে অধ্যাপক আর্থার লুইস

অনগ্রসর দেশগুলিতে সম্প্রতি উন্নয়ন-হার যথেষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। কোন কোন অনগ্রসর দেশে কয়েক বছর যাবৎ প্রায় ২০ শতাংশ হারে মাথাপিছু উৎপাদন বেড়েছে। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক এই উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারছে না। এমন কি অনগ্রসর দেশগুলিতে বহু লক্ষ লোক আগেকার চেয়ে এখন আরও বেশি দারিদ্র্যের ভারে জর্জরিত। একদিকে উন্নয়ন এবং অপর দিকে উন্নয়নের অসম বণ্টন, এই দুইয়ের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করাই অনগ্রসর দেশগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা। সম্প্রতি স্যার আর্থার লুইস বোম্বেতে ডোরাব টাটা স্মৃতি বক্তৃতামালায় "উন্নয়ন ও বণ্টন" নিয়ে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তাতে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণ হয়েছে যেগুলি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যাপক লুইস অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধ্যাপক লুইসের মতে বর্ধিত উৎপাদনের গঠন বা কাঠামো কী হয়েছে সে সম্পর্কে গভীর আলোচনায় না গিয়ে সাধারণভাবে বর্ধিত উৎপাদন দেশের উন্নয়নে কতটা ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তাই সর্বাগ্রে বিচার্য। এটা ঠিক যে, বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনের একটি বড় অংশ মূলধনী সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার কাজে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়েছে; অথচ গরীব জনসাধারণ যে সব ভোগ্যসামগ্রী ব্যবহার করে থাকে সেগুলির উৎপাদন বাড়াবার কাজে পুনর্বিনিয়োগের মাত্রা ততটা বাড়েনি। এটাও ঠিক যে, অনগ্রসর দেশগুলির বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগলব্ধ আয়ের পুনর্বিনিয়োগের ধারা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এর ফলে ধনীশ্রেণীর লোকেরাই বেশি লাভবান বা উপকৃত হয়েছে। তবুও এটা মানতেই হবে যে, ২০ বছর আগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে স্তর আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, আজ সে স্তর অনেক উঁচুতে চলে গেছে। সমাজের উপর এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বিচার করলে দেখা যাবে বহু অনগ্রসর অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া দূর হয়েছে, বসন্ত রোগের ব্যাপকতা কমেছে, শিশুদের মৃত্যুহার কমেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে বন্দরে কাজের আশায় চলে এসেছে ও আয় বাড়াবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক লুইসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমানভাবে অথবা ন্যায়সংগতভাবে বণ্টিত না হলেও এ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নেই যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে কোন সময়েই দেশের সব অধিবাসীকে সমানভাবে প্রভাবিত করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ায় বর্ধিত আয় কেন্দ্রীভূত হয় কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন নতুন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে, নতুন ভৌগোলিক অঞ্চলে অথবা নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রগুলি উন্নত হলে এবং দেশের অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দেবার মত শক্তি অর্জন করতে পারলে (Leading Sectors), এগুলি থেকেই আয়-প্রবাহ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের প্রাথমিক সুফল লাভ করেছে যে ক্ষেত্রগুলি, সেগুলি থেকেই উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায় নতুন আয়ের সৃষ্টি হয় ও কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ হয়। সরকারের রাজস্বের পরিমাণও তখন বাড়তে থাকে। এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুফল ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। কিন্তু এই সুফল এমনভাবে বণ্টিত হয়নি বা হয়নি যা থেকে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে অধ্যাপক লুইসের এই যুক্তি অনেকটা প্রযোজ্য। আমাদের দেশে পর পর চারটি পাঁচসালা পরিকল্পনা হয়েছে, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনা হয়েছে। গত বাইশ বছরে জাতীয় আয় যা কিছু বেড়েছে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীর মধ্যে। এক কথায় বলা যেতে পারে, বড়লোকেরা যত বেশি আরও বড়লোক হয়েছে সে অনুপাতে গরীবদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার অভাস-পত্রে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে বেকার সমস্যা ও আয়ের অসাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধ্যাপক আর্থার লুইসের মতে অনগ্রসর দেশগুলির এখন উচিত যতটা সম্ভব মেসিন পরিহার করে শ্রমের নিয়োগ বাড়ানো। তাঁর মতে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির উপর আরও গুরুত্ব আরোপ না করলে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না, এবং বেকার সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারলে উন্নয়নের সুফল লক্ষ লক্ষ গরীব লোকের ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না। যাঁরা গ্যালেনসন ও লিবেনস্টিন প্রদত্ত বিনিয়োগ-নীতির (Galenson-Leibenstein Investment criterion) সমর্থন করে ভারী শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে চান তাঁদের কাছে হয়ত অধ্যাপক লুইসের এই যুক্তি পছন্দ হবে না। কিন্তু আমাদের দেশে বেকার সমস্যা যে পর্যায়ে এখন উঠেছে তার মোকাবিলা করতে গেলে কি শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির কোন বিকল্প পন্থা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য?

অধ্যাপক লুইস আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, তা হল—উন্নয়ন কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের জন্য Shadow Pricing ব্যবস্থা চালু করা। কোন উপাদানের Shadow Price নির্ধারণ করতে গেলে তার প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি কত হতে পারে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তার দাম কত হতে পারে তা ধরে নিতে হয়। প্রকৃত বাজারদর থেকে তার যা পার্থক্য হবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার কর ধার্য করে অথবা খয়রাতি (subsidy) প্রদান করে সে পার্থক্য দূর করতে পারেন। কোন অর্থনৈতিক সম্পদ বা উপাদানের Shadow Price-এ তার দুষ্প্রাপ্যতাকালীন দাম কত হতে পারে তা প্রতিফলিত হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বা বিশেষ কোন উন্নয়নসূচীর রূপায়ণে এই তথ্য খুবই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন উপাদানের Shadow Price নির্ধারিত হলে সুদের হার নিরূপণ অথবা বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার প্রয়োজন নির্ধারণ করাও সহজ হয়। পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উপরেও অধ্যাপক লুইস বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে প্রায় সব অনগ্রসর দেশেরই কর ব্যবস্থার যথেষ্ট সংস্কার করা চাই। কর ব্যবস্থার এমন সংস্কার করা উচিত যেন বিনিয়োগ স্পৃহা

ব্যাহত না হয়, এবং আরও বিনিয়োগ করার কাজে ও সম্পদ বৃদ্ধির কাজে বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত হয়। অধ্যাপক লুইসের মতে শুধু কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় ও ধনের পুনর্বণ্টন করে দারিদ্র্য দূর করার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাঁর মতে দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করতে হলে ও দারিদ্র্য দূর করতে হলে সর্বাগ্রে উৎপাদনশক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। তাঁর মতে উন্নয়ন ও বণ্টন পরস্পরের শত্রু নয়। তাঁর লুইসের ভাষায় "Growth does not make distribution worse. People in the less developed countries would still be very poor even if the whole national product was distributed euqally among them. There was no way out of material poverty other than obtaining increases in productivity." পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় যখন দারিদ্র্য দূর করার প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য কর্মসূচী তৈরি হচ্ছে, তখন অধ্যাপক লুইসের প্রস্তাবটি সম্পর্কেও বিচার-বিবেচনা করা দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

আদার ব্যাপারী ও জাহাজের খবর

অন্নদাশঙ্কর রায়

"তুমি তো আদার ব্যাপারী। তোমার
হাজের খবরে কাজ কী?" এই প্রশ্নের
র আমি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে লিখিনে।
ন্তু আদার দাম যদি বেড়ে যায়, আমার
য়াকে যদি টান পড়ে তা হলে জাহাজের
র নিতে বাধ্য হই। অনেক দিন মুখ
জ সহ্য করেছি। আর পারছিনে।
জ থেকে পেট্রল ও কেরোসিনের দাম গেল
ড়। কেন এই দুর্ভোগ? লোকে যখন
নতে চাইবে তখন দেশের বুদ্ধিজীবী-
ও এর জবাব দিতে হবে।

গত দুই শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়
গুলির সঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলির
ড় সম্পর্ক। কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ
উঠেছে আমদানী রপ্তানীর দৌলতে।
শহরগুলিকে কেন্দ্র করে স্কুল কলেজ
বিদ্যালয় খবরের কাগজ মাসিকপত্র
খানা বইয়ের ব্যবসা থিয়েটার সিনেমা
তর সূত্রপাত ও বিস্তার হয়েছে। এই
র্কটা যাতে আমাদের পক্ষে অপমানকর
তিকর না হয় তার জন্যে আমরা
কাল সংগ্রাম করেছি, কিন্তু সঙ্গে
উপলব্ধি করেছি যে সম্পর্কটা যদি
রে কেটে যায় তা হলে আমরা
র মধ্যযুগে ফিরে যাব। আবার
ণ্ডুক হব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ
ত সব মনীষী একমত যে আমরা
নিক যুগে বাস করতে চাই, আধুনিক
র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই, অতীতে
ত চাইনে, ঘরকুনো হতে চাইনে।
কে ভালোবাসি। সেই সঙ্গে
কেও।

মমোহনকে ইউরোপে যেতে হয়েছিল
র দক্ষিণাংশ ঘুরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর
ভাগ্যবান। তিনি যান আফ্রিকা ও
র মাঝখানে অবস্থিত সুয়েজ যোজক
রে সুয়েজ খাল দিয়ে। তাতে সময়ও
রচও বাঁচে। ওই সংক্ষিপ্ত জলপথ
ও চোদ্দ দিনে ইউরোপে নিয়ে যায়
ত নিয়ে আসে। খরচ য পড়ে, তা
র তুলনায় অনেক কম। আমদানী
র দিক থেকেও অশেষ সুবিধে।
যে শুধু ইউরোপীয়দেরই হতো তা
তীয়দেরও হতো। কত সস্তায়
ই কাগজ পেতুম! আর কত কম
এখন হাওয়াই ডাক হয়ে সময়ের
দিক থেকে সুরাহা হয়েছে, কিন্তু খরচের
দিক থেকে নয়। অধিকাংশ বই কাগজ
ডাকেই আসা-যাওয়া করে। মালপত্রের
পক্ষে জলপথই প্রশস্ত। যাত্রীরা বিমানে
যাতায়াত করলেও তাঁদের মাল পাঠিয়ে দেন
জাহাজে করে। তা ছাড়া এখনো বিস্তর
যাত্রী বিমানের বদলে জাহাজই পছন্দ
করেন। তাঁদের হাতে সময় বেশী, পাথেয়
কম।

শতখানেক বছর ধরে সুয়েজ খাল হয়ে
উঠেছিল আমাদের জীবনের অঙ্গ। সে খাল
যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন আবার আমাদের
ফিরে যেতে হয় রামমোহনের যুগে।
জাহাজগুলো আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরে
যাওয়া আসা করে। আমদানী খরচ
বেড়ে যায়। সময়ও লাগে অনেক। বিলেত
থেকে আমার নামে যে পত্রিকা এক পক্ষ
কালের মধ্যে পৌঁছত আর সপ্তাহের পর
সপ্তাহ আসত সে হয়তো তিন মাস পরে
আসে এক সঙ্গে তিন চার সংখ্যা। মেল
স্টীমার বলে যেন কোনো পদার্থই নেই।
আর তার ডাকমাশুলও চড়েছে। এখন
আমাকে তিন পাউণ্ডের জায়গায় দিতে হয়
সাড়ে আট পাউণ্ড। তাও পাউণ্ডের দেড়া
দামে। ইউরোপের মনোজগতের সঙ্গে
সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে
হয়। হাওয়াই ডাকের সাহায্য নিলে সময়
নিশ্চয় বাঁচত, কিন্তু খরচও নিশ্চয় বাড়ত।
কোথায় পাই?

বুদ্ধিজীবীদের সম্বল অপরিমিত নয়।
কোনো মতে বেঁচে বর্তে থাকতেই যে
খরচাটা হয় তার উপরে সংস্কৃতির জন্যে
বাড়তি খরচ আমাদের অধিকাংশেরই
সাধ্যাতীত। পত্রিকার উল্লেখ করেছি।
পুস্তকের বেলাও একই কথা। বই একটু
দেরিতে পৌঁছলেও অত সহজে বাসি হয়ে
যায় না, কিন্তু তার দামও বেশী, সংখ্যাও
কম। এর পরিণাম নতুন এক অন্ধকার যুগ।
যাদের হাতে অঢেল টাকা তারা পড়াশুনো
করে না। যারা পড়াশুনো করে তাদের
পকেট খালি। ছেলেবেলায় আমরা এক
শিলিং দামের ওয়ার্লডস ক্লাসিক পড়েছি,
এভরিম্যানস লাইব্রেরীর অমর গ্রন্থ পড়েছি।
বারো আনার শিলিং। সে ছিল এক স্বর্ণ
যুগ। ভাবীকালের বুদ্ধিজীবীরা মানুষ
হচ্ছে কী পড়ে?

এখন ওই সুয়েজ খালের ব্যাপারটায় ফিরে আসি। ওটা যে এত দীর্ঘকাল পড়াবে, পৃথিবীর লোক পড়াচ্ছে দেখে সেটা আমার বিস্ময় হয়নি। ভেবেছিলুম এক বছর কি দু বছর। এতে যে কেবল আমাদেরি ক্ষতি হচ্ছে তা তো নয়। ক্ষতি হচ্ছে ইউরোপীয়দেরও। তারা কি বুঝতে পারছে না তারা কী হারাচ্ছে? কিন্তু কোনো দেশই পাঁচ সাত বছরে তার চিরাচরিত পলিসি পালটাতে পারে না। ভারতকে স্বরাজ দেওয়া নিয়েও ইংরেজ ত্রিশ বছর গড়িমসি করেছে। তার পরেও ব্যালান্স অফ পাওয়ারের খাতিরে দু ভাগ করেছে। সুয়েজ সম্বন্ধেও তেমনি এক গড়িমসি চলেছে। চলেছে আর কোথায়! অচল হয়েছে।

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশের মধ্যবর্তী হচ্ছে সুয়েজ অঞ্চল। আর ওই যে খালটি ওটি হচ্ছে জিব্রলটার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শৃঙ্খলের কেন্দ্রবর্তী অংশ। পৃথিবীতে ওর চেয়ে স্ট্রাটেজিক অঞ্চল আর নেই। আমাদের ছেলেবেলায় ওটা ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সামিল। তুরস্কের পরাজয়ের পর তার উত্তরাধিকার নামে বর্তায় আরবদের বিভিন্ন রাজ্যের উপরে, কিন্তু কার্যত ইংরেজ ও ফরাসীর উপরে। সুয়েজ খালের মালিকানার অধিকাংশ ছিল এদেরি অংশে। মিশর ছিল মক্ষীগোপাল। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যে ওরা লীগ অফ নেশনসের ছত্রতলে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট আদায় করে নেয়। সে অঞ্চলে আর কোনো শক্তিকে ঢুকতে দেয় না। তুরস্ক তো নিপাতিত। আরবরাও যে একত্র হয়ে একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এটাও তাদের ইচ্ছা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনসও গেল, ম্যাণ্ডেটও গেল, ইংরেজ ও ফরাসীর শক্তি হ্রাসও হলো। পরিবর্তিত অবস্থায় তারা ওই অঞ্চল ছেড়ে বিদায় নিল। কিন্তু সিরিয়া হলো দু ভাগ। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল লেবানন। প্যালেস্টাইন হলো দু ভাগ। একভাগের নাম হলো ইসরায়েল : অপরভাগ চলে গেল জর্ডানের মধ্যে। এ ছাড়া কিছু অংশ পেয়ে গেল মিশর।

কিন্তু এহো বাহ্য। ভিতরে ভিতরে যেটা ঘটে গেল সেটা হলো ইংরেজ ও ফরাসীর শূন্যতা পূরণের জন্যে ইসরায়েল তথা আমেরিকার উদয়। আরবরা সেটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করল না। তাদের ইচ্ছা তারাই শূন্যতা পূরণ করবে। কিন্তু তারা দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ও মধ্যপন্থী বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত। তাদের অধিকাংশই সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের দ্বারা শাসিত। আরবদের একতা ... আমার ... বছর আগে ভেঙে যায়। ... তারা পড়ে তুর্কদের ... মুসলমান ভাই ভাই ... শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়ে দেয়। ... পড়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসী ... শিকার। সেই নেপোলিয়নের আম... থেকে। স্বাধীন যদি বা হলো ত... বলকানের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে। ... কালে স্বপ্ন দেখলেন মিশরের মহান নে... নাসের। আরবদের তিনি চাইলেন একস... গাঁথতে। কিন্তু সিরিয়া ও মিশরকে এ... রাষ্ট্রে আনতে গিয়ে তাঁর দুই শিক্ষা ... তাতে তাঁর মন ভেঙে যায়। এক এ... রাজ্যের বিবর্তন এক একভাবে হয়েছে। সবাই আরবী ভাষায় কথা বললেও প্রা... সবাই ধর্মে মুসলমান হলেও আরব... আসলে সিরিয়ায় লেবাননে মিশ... লিবিয়ায় টিউনিসে আলজেরিয়ায় মরক্কো... বহিরাগত। জর্ডনও অতীতে সিরিয়া... অন্তর্গত ছিল। প্যালেস্টাইনও তাই। ভা... ও ধর্মের চেয়ে আরো গভীর এক ... আছে, সেখানে তারা এক নয়। তা ছা... তাদের সকলের রাজধানী হতে পারে এ... কোনো কেন্দ্রীয় স্থান নেই। কায়রো... প্রতিদ্বন্দ্বী বাগদাদ, দামাস্কাস, জে... রুজালেম। প্রত্যেকটিই ঐতিহ্যপূর্ণ। ... কায়রোই সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন। কা... সুয়েজের সন্নিকটে।

এক কথায় বলা যেতে পারে সু... যার কণ্ট্রোলে আরব জগত তারই কণ্ট্রো... শুধু আরব জগত নয়, পশ্চিম এশি... তারই কণ্ট্রোলে। নাসের এটা ভালো কা... বুঝতেন, তাই সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত ক... ইংরেজ ও ফরাসীদের বিতাড়ন কর... তারাও তেড়ে আসে ইসরায়েলকে স... করে। সে যুদ্ধ থেকে যায় রাশি... হুমকিতে ও আমেরি... হুঁশিয়ারি... তখন থেকে রাশিয়ার প্রভাব ক্রমে বাড়... থাকে। আমেরিকাও তার সঙ্গে ভারস... রাখার জন্যে ইসরায়েলকে মদত জোগা... কিংবা বলা যেতে পারে ইসরায়েল ... আমেরিকার উদয় রাশিয়ার উদ... অবশ্যম্ভাবী করে। সুয়েজ যদি পৃথি... সব চেয়ে স্ট্রাটেজিক অঞ্চল হয়ে থাকে ... সেখানে ইংরেজ ও ফরাসীর উত্তরাধিক... হতে চাইবে আমেরিকার ও রাশিয়া, সুপার-পাওয়ার। ইসরায়েল তাদের ... পক্ষের প্রতিভূ কিন্তু অপরপক্ষের প্র... কে হবে সেটা এখনো তত পরিষ্কার ... বোধহয় মিশর। সুয়েজ জলপথের মা... মিশর সিরিয়ার মতো বামপন্থী নয়। ত... জর্ডানের মতো দক্ষিণপন্থীও নয়। ... মোটামুটি মধ্যপন্থী। সে রাশিয়ার স...

মিলেও তার সঙ্গে এক শিবিরভুক্ত হতে নারাজ। আরব জগতে সিরিয়া, ইরাক ও আলজেরিয়া এই তিনটি দেশ বামপন্থীদের দ্বারা শাসিত, রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তবে এরাও রুশ শিবিরভুক্ত হতে কুণ্ঠিত। কারণ বিপৎকালে রাশিয়া এদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। মাঝখানে তুরস্ক ও ইরান বা ভূমধ্যসাগর।

গতবারের যুদ্ধে ইসরায়েল বাহিনী ছ' দিনের মধ্যে সুয়েজ খালের পূর্বদিকের দখল নেয়। এবারকার যুদ্ধে মিশর তাদের পূর্বদিকে পিছু হটতে বাধ্য করে, কিন্তু সতেরো দিন বাদে দেখা গেল তারা পশ্চিমদিকের খানিকটে জুড়ে বসেছে। যুদ্ধ এখন বন্ধ, কিন্তু যদি আবার বাধে তা হলে তারা সেটাকে সোপান হিসাবে ব্যবহার করবে। তাই ছাড়তে অনিচ্ছুক। যুদ্ধ যদি না বাধে তবে সেটাকে ওরা দর কষাকষির বেলা কাজে লাগাবে। সন্ধি না হলে সুয়েজ খাল অবিলম্বে খুলছে না। কে জানে আবার ক'বছর দেরি হবে!

তবে এবার বোধহয় তেমন দেরি হবে না। কারণ এবার আরবরা সবাই মিলে নতুন একটা হাতিয়ার প্রয়োগ করছে। তারা যদি পেট্রোল বন্ধ করে দেয় তবে ইসরায়েল যে শিবিরভুক্ত সে শিবিরের কলকারখানা রেল-স্টীমার-মোটর প্রভৃতির দম ফুরিয়ে আসবে। এখনো তারা পুরোপুরি বন্ধ করেনি। যেটুকু করেছে তারই ঠেলায় সকলে তটস্থ। আরব শিবিরে যদি ভাঙন না ধরে, যদি কেউ বেঁকে না বসে তবে এ হাতিয়ারেও কার্যোদ্ধার হতে পারে। যাদের অর্থ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা সবাই মিলে ইসরায়েলের উপর তথা আমেরিকার উপর চাপ দেবে। চাপ পড়লে কি ওরা ওদের বেসিক পলিসি বদলাবে? সুয়েজ অঞ্চল থেকে হাত গুটিয়ে নেবে? দেখা যাক। সুয়েজ অঞ্চল বলতে বেশ অনেকখানি জায়গা বোঝায়। তার মধ্যে পড়ে ইসরায়েল ও তার দ্বারা অধিকৃত ভূমি। সিনাই, গাজা, গোলান হাইটস, জেরুজালেম শহরের আরব এলাকা। চাপ কত প্রবল হলে কেউ এতে রাজী হবে? কিন্তু হয় যদি তবে আর যুদ্ধ বাধাতে হবে না।

এই তৈলসংগ্রাম একপ্রকার অহিংস সংগ্রাম। আমরা যারা এদেশে অহিংস সংগ্রাম দেখেছি তারা এর পরিচালনা প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি। বহুধা বিভক্ত দুর্বল পশ্চাৎপদ আরবদের প্রতি যাঁরা অনুকম্পা অনুভব করতেন তাঁরা এবার তাঁদের মত পরিবর্তন করবেন। ওরা যে একমত হয়ে একটা কিছু করতে পারে এইটেই আমার আনন্দের কারণ। সতেরো বছর আগে আমার আরব বন্ধুদের আমি ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছিলুম। ইসরায়েল এসেছে আরবদের ঐক্য শিক্ষা দিতে। ওরা যদি এক হতে শেখে ইসরায়েলও শিখবে কেমন করে আরবদের সঙ্গে কারবার করতে হয়। আর সেটা যেদিন তাদের মর্মে প্রবেশ করবে সেদিন প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত আরবদের সঙ্গেও মিটমাটের সূত্র পাওয়া যাবে। তারা চায় যে যার ঘরবাড়ীতে ফিরে যেতে। তাদের দাবী মেটাতে গেলে ইসরায়েলকে আরো একটা মূল নীতি বদলাতে হয়। ইসরায়েলের সৃষ্টি শুধুমাত্র ইহুদীদের জন্যে। সেদেশে আরবরা যদি আদৌ ঠাঁই পায় তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে কি তারা সহজে রাজী হবে? ইসরায়েলের বাইরে নতুন এক প্যালেস্টাইন রাজ্য সংস্থাপনের কথাও শোনা যাচ্ছে। কশিকায় সেই রাজ্য আরবদের সন্তুষ্ট করতে পারবে কি না সন্দেহ। ইসরায়েলীরা সেটাও হতে দেবে কি না বলা শক্ত।

তবে এই সঙ্কট যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, কী হবে অনুমান করা কঠিন নয়। ইতিমধ্যেই তার সূচনা লক্ষিত হচ্ছে। রুশ মার্কিন সমঝোতা। ওই দুই সুপার-পাওয়ার পশ্চিম এশিয়া নিয়ে মারামারি করতে চায় না। ভাগাভাগি করতে চায়।

অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, পরোক্ষে। কোন্‌টা কার-প্রভাবের ক্ষেত্র সে বিষয়ে তারা ভিতরে একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে যাবে। একপক্ষ অপরপক্ষের প্রভাবের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করবে না বলে অঙ্গীকার করলেই চুক্তিটা পাকা হবে। এখন কথা হচ্ছে প্রভাবের ক্ষেত্র কোন্‌টা কার? সুয়েজের মতো দুনিয়ার সেরা স্ট্র্যাটেজিক স্থান কার প্রভাবের ক্ষেত্র হবে? সুয়েজ খালটা কার প্রভাবাধীন হবে? মিশর নিজে কার দিকে বেশী ঝুঁকবে? খালটা যতদিন বন্ধ থাকবে ততদিন কারো প্রভাবের কোনো মূল্য নেই। যখন চালু হবে তখন দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যদি না তার আগেই একটা বোঝাপড়া হয়।

কোনো বৈদেশিক শক্তির প্রভাবাধীন নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এইটেই হচ্ছে আদর্শ। এই আদর্শ সামনে রেখে নাসের সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঈর্ষা ও চক্রান্ত তাঁকে চালমাৎ করে। খালটিকে তিনি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এখন সে খাল খুলতে চাইলে মিশরকে প্রচুর দন্ড দিতে হয়। সব দিয়ে থুয়ে যা থাকবে তাতে মিশরের হাতের মুঠো শক্ত হবে না দুর্বল হবে কে জানে!

এতক্ষণ আমি সমস্ত ব্যাপারটা সুয়েজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি। কিন্তু আরো একটা দৃষ্টিকোণ আছে। ইহুদীদের বদ্ধমূল বিশ্বাস প্যালেস্টাইন তাদের সনাতন বাসভূমি। সেখানে ফিরে যাবার অধিকার তাদের ইহুদী হয়ে জন্মানোর জন্মস্বত্ব। জাতিতে ইহুদী ও ধর্মে ইহুদী হলেই প্যালেস্টাইনের ন্যাশনাল হওয়া যায়। দু হাজার বছর বাইরে ঘুরে বেড়ালেও এর ব্যত্যয় নেই। অপরপক্ষে আরবদের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে প্যালেস্টাইন আরবজাতির ঐতিহাসিক বাসভূমির সামিল। সেখানে তারা প্রায় বারো শো বছর ধরে বাস করে এসেছে। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা যতকাল ইংলণ্ডে বাস করছে আরবরা ততকাল প্যালেস্টাইনে। হঠাৎ একদল কেলটিক যদি আয়ারল্যান্ড থেকে এসে হাজির হয় আর কর্নওয়াল থেকে অ্যাংলো-স্যাকসনদের হটিয়ে দেয় তা হলে ইংরেজরা কি কর্নওয়ালের উপর তাদের দাবী মেনে নিয়ে নিজেদের দাবী ছেড়ে দেবে?

ইহুদীদের যুক্তি মেনে নিলে কেলটিকদের যুক্তিও মেনে নিতে হয়। কেলটিকদের যুক্তি মেনে নিলে রেড ইন্ডিয়ানদের দাবী মেনে নিতে হয়। আমেরিকার সর্বত্র ছিল ওদের আদি বাসভূমি। তা হলে ন্যায়ের অনুরোধে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের ফিরে আসতে হয় ইংলণ্ডে ফ্রান্সে পর্টুগালে ও স্পেনে। রেড ইন্ডিয়ানদের গায়ের জোর নেই, এই যা তফাৎ। গত শতাব্দী অবধি ইহুদীদেরও গায়ের জোর ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়ন তাদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমান অধিকার দিয়ে যান। যাকে বলে ইহুদীদের এমানসিপেশন। তারা সৈনাদলেও প্রবেশ পায়। ফ্রান্সের অনুকরণে অপরাপর দেশে কনসক্রিপশন প্রবর্তিত হয়। ইহুদীদেরও কনসক্রিপট করা হয়। সেনাবিভাগে তাদেরও পদোন্নতি হয়। অবশ্য তার জন্যে তাদের হিংসাও করা হয়। দ্রেফুর উপর যে অন্যায় করা হয় তার জন্যে ফ্রান্সের জনমত উত্তাল হয়। পরে সে অন্যায়ের প্রতিকারও হয়।

ইউরোপের ইহুদীরা দেড়শো বছর ধরে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিভাগে তারা ইউরোপীয়দের সমকক্ষ। তারাও ইউরোপীয়। তারা না জানে এমন বিদ্যা নেই। আরবরা তাদের তুলনায় অর্ধশিক্ষিত ও অর্ধ আধুনিক। সংখ্যায় অধিক হলে কী হবে, অভিজ্ঞতায় অসমকক্ষ। ইসরায়েল হচ্ছে ইউরোপেরই একটি প্রত্যঙ্গ। সমুদ্রের এপারে ওপারে একই রকম শিক্ষাদীক্ষা কায়দাকানুন অভিজ্ঞতা। ইসরায়েল হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার জাপান।

ইহুদীরা পুরুষানুক্রমে তাদের আদি বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখে এসেছে, অথচ সেই রোমান আমল থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে মনে প্রাণে ইউরোপীয় বনে গেছে। সদর ছেড়ে মফঃস্বলে যেতে কে চায়! শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে কে চায়! সত্যি সত্যি ফিরে যাবার কথা যারা ভাবত তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বেশীর ভাগই চাইত ইউরোপের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে। সেখানে আশা না দেখলে আমেরিকায় পাড়ি দিত ও রাতারাতি উন্নতি করত। এখনো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে ষাট লাখ ইহুদী। আর খোদ ইসরায়েলে ত্রিশ লাখের মতো। এদের শতকরা তেত্রিশ জন ইউরোপীয়, বাদ বাকী ওরিয়েনটাল। অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী। ইউরোপ প্রত্যাগতরাই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত। তারাই সর্বঘটে।

ইহুদীরা যখন প্রথম ইউরোপে যায় তখনো সেখানে খৃষ্টধর্মের প্রবর্তন হয়নি। তারা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পায়। পরে যখন ইউরোপের লোক খৃষ্টান হয়ে যায় তখন ইহুদীদের সম্বন্ধে ওদের দুই বিপরীত ধারণা জন্মায়। তারা এব্রাহাম, মোজেস প্রভৃতি প্রোফেটের বংশধর বলে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের ধর্মগ্রন্থ ওলড টেসটামেণ্ট অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাদের হিব্রু ভাষার নামগুলিই খৃষ্টান পুত্রকন্যার উপযুক্ত নাম। যেমন জন বা মেরী। অথচ ওরা যে পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র ত্রাণকর্তা যীশুকে অসীম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে বা করিয়েছে এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। দুই বিপরীত ধারণার দরুণ ইহুদী কখনো হয়েছে নির্যাতিত কখনো সমাদৃত। যত নষ্টের গোড়া ইহুদী। আবার যত প্রগতির মূলেও ইহুদী। মার্কস না হলে আইনস্টাইন না হলে ফ্রয়েড না হলে আধুনিক ইউরোপ কার কাছে প্রেরণা পেত? সংগীতে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নৃত্যে নাট্যাভিনয়ে ওদের বাদ দিলে আলো নিবে যায়, রস শুকিয়ে যায়। হিটলার ওদের ধ্বংস করতে গিয়ে মধ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে বঞ্চিত করে দিয়ে গেছেন।

ইউরোপীয় মানস এখন অপরাধবোধে জর্জর। ইহুদীদের জন্যে খৃষ্টানরা এখন যেমন করে পারে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। "আহা, বেচারিরা নিরাপদে বাস করার জন্যে এক টুকরো জমি পেলে বর্তে যায়। দাও না কেন ওদের প্যালেস্টাইনের একাংশ?

আরবদের কত আছে। এটুকু হাতছাড়া হলে এমন কী ক্ষতি হবে! ক্ষতি হলে টাকা দেব।" কিন্তু আরবরা তাতে ভুলবে না। হিটলারের অত্যাচারের পূর্বেই ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে তাদের জাতীয় বাসভূমি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন করেছিল, ব্রিটেনের কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। পরিকল্পনাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর। সেই শতাব্দীর গোড়ায় নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের দিকে দিকে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। একদা যেমন সবাই ওরা খ্রীষ্টান হয়েছিল এবার তেমনি ন্যাশনালিস্ট হয়ে যায়। এই যে নতুন ধর্ম—এ দাবী করে সকলের আনুগত্য। তুমি যদি জার্মানীতে বাস কর তবে তোমাকে জার্মান ন্যাশনালিস্ট হতে হবে। যদি রাশিয়াতে বাস কর তবে রাশিয়ান ন্যাশনালিস্ট হতে হবে। যদি পোলাণ্ডে বাস কর তবে পোলিশ ন্যাশনালিস্ট হতে হবে। যারা এতে নারাজ তারা দেশান্তরে গিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করে। কিন্তু ইহুদীরা যাবে কোথায়? রাশিয়াতে ওরা খাপ খায় না, কিন্তু জার্মানীতেও কি খায়? জার্মানীতে খাপ খায় না, কিন্তু ইংলণ্ডেও কি খায়! ইহুদী সংখ্যা অল্পস্বল্প হলে ইহুদীদের হজম করতে পারা যায়। কিন্তু ইহুদীরাই যে হজম হতে নারাজ। একসঙ্গে লাখে লাখে ইহুদী আশ্রয় নিতে এলে দেশের লোক রেগে যায়। চারদিকে ইহুদীবিদ্বেষ ছড়ায়। ইহুদীরা তা হলে করে কী? অগত্যা এরাও চায় আলাদা একটি নেশন হতে। আলাদা একটি বাসভূমি পেতে। প্রথমে ওরা ভেবেছিল আফ্রিকায় বা অন্য কোথাও গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। কিন্তু পরে ওদের নেতারা বিধান দেন উপনিবেশ স্থাপন করার চেয়ে আদি বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যেমন একদল জায়নিস্ট হয়ে ওঠেন তেমনি আরেক জন তার অশুভ পরিণাম অনুমান করে স্বজাতিকে সতর্ক করে দেন যে আরবরা বাধা দেবে ও তাদের সঙ্গে বিরোধ বেধে উঠবে। [illegible]দের সঙ্গে চিরকাল সম্প্রীতি তাদের সঙ্গে [illegible]তা সমীচীন নয়। কিন্তু জায়নিস্টরা [illegible]খন রাশিয়ায় জার্মানীতে ও পূর্ব ইউরোপে জাতির অপমান দেখে এমন বিচলিত যে [illegible]বিষ্যতে কী হবে না হবে তা নিয়ে ভাবতে [illegible] পান না। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁদের এনে [illegible] অভাবিত সুযোগ। ইংরেজরা তাঁদের উপকার পায় তার প্রত্যুপকার স্বরূপ [প্যা]লেস্টাইনে একটি ন্যাশনাল হোমের প্রতি[শ্রু]তি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরবদেরও প্রতি[শ্রু]তি দেয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে [সা]হায্য করলে ইংরেজ দেবে স্বরাজ। পরে [যখ]ন এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রতিশ্রুতি [পাল]ন করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে তখন [ইহু]দীদের বলে, "প্যালেস্টাইনে ন্যাশনাল হোম দেব বলেছি, তা বলে এমন কথা তো বলিনি যে প্যালেস্টাইনটাই হবে তোমাদের ন্যাশনাল হোম।" ইহুদীরা চটে যায়। তখন দেশটাকে অবিভক্ত রেখে দুই স্বতন্ত্র অংশকে অটোনমি দেবার প্রস্তাব ফেঁসে যায়। মারামারি করে ইহুদীরা যে অংশটা পায় সেটার নাম রাখে ইসরায়েল। সেটা হয় স্বাধীন রাষ্ট্র। আর বাকীটা গ্রাস করে জর্ডান। প্যালেস্টাইন নামে আর কোনো রাজ্য থাকে না।

ঠিক এইরকম বিপদেই পড়তে হতো আমাদেরও, যদি না ইংরেজরা যাবার সময় দু'পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে যেত। প্যালেস্টাইনে সে কাজটি করা হয়নি। আরব ও ইহুদী ইংরেজের প্রস্থানের পর মারামারি কাড়াকাড়ি করে যে যা পারে দখল করে নিয়েছে। দখলের উপর দাঁড়িয়েছে তাদের স্বত্ব। স্বত্বের উপর দখল নয়। সেই থেকে ইহুদীদের মনে দুঃখ তারা তাদের দু'-হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের সনাতন বাসভূমি প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করতে পারেনি, জেরুজালেমের উত্তরাংশ ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। তেমনি গাজা থেকে। সিনাই, সেও তো তাদেরই হওয়া উচিত ছিল। সামনে বাইবেল খুলে রেখে দু' হাজার বছর ধরে যার ধ্যান করেছে তার কতক যে এখনো পরহস্তগত। বাইবেল যে চিরন্তন দলিল।

ছ' বছর আগে লড়াই করে তারা তাদের পূর্বপুরুষের পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। আরবরা বলছে এটা অন্যায়। দুনিয়ার বহু দেশ বলছে এটা অন্যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলছে যার জমি তাকে ফেরৎ দাও। কিন্তু জমিটা কি আরবদের যে ওরা ফেরৎ পাবে? মোটে তো বারো শো বছর ওদের দখল। কই, ওর পেছনে দলিল কোথায়? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে ওরাও ইয়াকুবের বা জেকবের বংশধর? ওরাও অবশ্য ইব্রাহিমের বা এব্রাহামের উত্তরপুরুষ। কিন্তু ওদেরকে তো অন্য বাসভূমি দেওয়া হয়েছিল। প্যালেস্টাইনে কে বলেছিল ওদের বারো শো বছর আগে আসতে? ওরাই অন্যায় করেছে।

ইহুদীরা যেটা করেছে সেটার আধুনিক নাম লিবারেশন। ও লড়াই লিবারেশনের লড়াই।

আরবরা বলছে অবিকল ওই কথা। এ লড়াই লিবারেশনের লড়াই। ইহুদীরা ছলে বলে কৌশলে জায়গা জমি বাড়িয়ে নিতে চায়। সমগ্র প্যালেস্টাইনটাই আরবদের পাওনা ছিল। সমগ্র জেরুজালেমটাই ছিল তাদের পাওনা। তাদের পাওনার অধিকাংশ থেকে তারা বঞ্চিত হয় ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়। পরে আরো কতক অংশ থেকে। ছ বছর আগে বাকীটার থেকে। তার উপরেও প্যালেস্টাইনের বাইরে সিরিয়া ও মিশরের কিছুটা ইসরায়েল বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার তো সংযুক্ত খালের পশ্চিম পারেও ছিনতাই করেছে। ওদের লোভের কি সীমা আছে? বেশ তো ছিল ওরা ইউরোপে। কেন ওরা ফিরে এল এশিয়ায় ও আফ্রিকায়? ওদের নিয়ে এল কারা? টিকিয়ে রেখেছে কারা? জিতিয়ে দিচ্ছে কারা? তাদের সবাইকার বিরুদ্ধে এবার জেহাদ। এ সংগ্রাম চলছে, চলবে। এছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামও আবার শুরু হবে। আরবদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা সমগ্র প্যালেস্টাইনটাই উদ্ধার করতে চায়। যেমন ইহুদীদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা চায় সমগ্র পিতৃভূমি। সমগ্র জেরুজালেমটাই উভয় পক্ষের চরমপন্থীদের চরম লক্ষ্য।

প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্যে একটা ন্যাশনাল হোম হবে এ ঘোষণা ১৯১৭ সালের ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফুরের। এই ঘোষণায় প্যালেস্টাইনের অপরাপর সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও ছিল। তা না হলে আরবরা প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করত না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন ছিল। তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও কি আরবরা ইংরেজদের সাহায্য করেনি? তারা কি জার্মানদের পক্ষে লড়েছে? কিন্তু প্রত্যেকবারই মহাযুদ্ধ শেষ হয় আর ইংরেজরা আরবদের অগ্রাধিকারটা উপেক্ষা করে। যেন ইহুদীদের জন্যেই তুরস্ককে হটানো। আরবদের জন্যে নয়। যেন ইহুদীদের জন্যেই নাৎসীদের ঠেকানো। আরবদের জন্যে নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের জনমত নির্যাতিত ইহুদীদের পুনর্বাসনের জন্যে ইসরায়েল ভিন্ন আর কোনো ঠাঁই খুঁজে পায় না। ইসরায়েলেই ওদের নতুন করে বসতে হবে। জার্মানীতে নয়, অস্ট্রিয়াতে নয়, হাঙ্গেরীতে নয়, বলকানে নয়। যেসব দেশে ওরা শত শত বৎসর ধরে বাস করছিল। রাশিয়ায় যারা ছিল তারা নির্যাতিত হয়ে থাকলে আক্রমণকারী নাৎসীদের দ্বারা হয়েছিল। রাশিয়ানদের দ্বারা নয়। তারা ইসরায়েল রাষ্ট্রে প্রস্থান করল না। পশ্চিম ইউরোপে যারা ছিল তারাও নাৎসী ভিন্ন কারো দ্বারা নির্যাতিত হয়নি। তারাও জার্মানী ভিন্ন আর কোনো দেশ থেকে প্রস্থান করল না। আমেরিকায় তারা তো বরাবরই স্বাগত। সেখান থেকেও তারা প্রস্থান করল না। ব্যতিক্রম কেবল তারাই যারা ইহুদী রাষ্ট্রের উৎসাহী সমর্থক। নির্যাতিত নয়, আদর্শনিষ্ঠ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা যা পাচ্ছি তা এই যে ইসরায়েলের বীজ বোনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। হিটলারের জন্মের পূর্বেই। বীজ থেকে অঙ্কুর হয়েছিল ১৯১৭ সালেই। হিটলারের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই। হিটলারের অত্যাচার যতই বাড়তে থাকে ইসরায়েলের চারা গাছটি ততই বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে ইউরোপের মাটিতে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে তাকে রোপণ করা হয় আরব দেশের মাটিতে। ইহুদীদের ক্ষতিপূরণ ইউরোপীয়রা করবে না। করবে আরবরা। তার কারণ তারা বহু শতাব্দীকাল তুর্কের সাম্রাজ্যে ও তার পরে ইংরেজ ফরাসীর অভিভাবকতায় বাস করে ছত্রভঙ্গ ও দুর্বল। হতো যদি তারা হাজার বছর আগেকার মতো দিগ্বিজয়ী তা হলে প্যালেস্টাইনের একাংশে ইহুদী রাষ্ট্র হতো না, বরকোটি জর্ডানের মধ্যে বিলীন হতো না। দশ লাখ আরব বাস্তুচ্যুত হতো না। এতদিনে তাদের সংখ্যা পনেরো লাখ হয়েছে। প্যালেস্টাইনে চিরকালই কতক ইহুদী ছিল। আরব জগতের সর্বত্র ইহুদীরা সহ অবস্থান করত। ইহুদীরা তাদের শত্রু ছিল না। শত্রু হয়ে উঠল তাদের প্রভু হয়ে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রবর্তকরা প্রধানত পূর্ব ইউরোপে লালিত। তাঁদের গায়ে লেগেছিল সমাজতন্ত্রের বাতাস। অথচ পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয় সম্পর্ক। তাই গণতন্ত্রও তাঁদের কাম্য। দেখতে দেখতে ইসরায়েল হয়ে ওঠে ডেমোক্রসী ও সোশিয়ালিজমের অন্যতম পীঠস্থান। ইহুদীরা দেশটাকে ধনধান্যে পুষ্পে ভরে দেয়। মরুভূমিতেও ফসল ফলায়, ফুল ফোটায়। আরবদের বড়ো বড়ো দেশগুলিতে যা হয় না ইহুদীদের ওইটুকু দেশে তা হয়। আরবদের যে কোনো দেশের চেয়ে ইসরায়েল আরো অগ্রসর, আরো উন্নত। এখন কি সামরিক বলেও বলবান। আন্তর্জাতিক সহানুভূতি তো ইসরায়েলের দিকে যাবেই।

কিন্তু দেখা গেল ইসরায়েলের মূলনীতি হলো দুনিয়ার সব ইহুদীর জন্যে দরজা খুলে রাখা। শুধু তাই নয়, তাদের ডেকে আনা। যাতে ম্যানপাওয়ার বাড়ে। এক কোটি ইহুদীকে যদি জায়গা দিতেই হয় তবে রাজ্যের সম্প্রসারণ ছাড়া গতি নেই। তাতে তাদের অনাগ্রহও নেই, কারণ ইসরায়েলের আশেপাশে প্রাচীনকালে ইহুদীদের বসত ছিল। যেখানে বসত ছিল না সেখানে দখল ছিল। পুরাতনের পুনরাধিকার যদি জাতীয় নীতি হয় তবে ইসরায়েল রাষ্ট্র তার প্রতিবেশীদের তিষ্ঠোতে দেবে না। আরবদের খেদিয়ে নিয়ে যাবে আরো উত্তরে, আরো দক্ষিণে, আরো পূর্বে। ইসরায়েলে যেসব আরব টিকে থাকবে তারা হবে নিম্নশ্রেণী। ইতিমধ্যেই তিনটি শ্রেণী হয়েছে। ইউরোপীয় ইহুদীরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। ওরিয়েন্টাল ইহুদীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আরব যারা মাটি কামড়ে পড়ে আছে তারা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সোশিয়ালিজমও দেখা যাচ্ছে শ্রেণীশূন্য নয়। গাত্রবর্ণেরও তারতম্য আছে। এ এক নতুন বর্ণবিভাগ।

ইসরায়েলের সৃষ্টি যেভাবে হয়েছে সে আরবদের মেনে নেওয়া সহজ নয়। তবু সেটাও তাদের সহ্য হতো, যদি না অনবরত ম্যান পাওয়ার বাড়ানো ও পররাজ্য গ্রাস হতো ইসরায়েলের মূলনীতি। এই কিছুদিন আগেও যারা নির্যাতিত ছিল তারাও বলদর্পী হিটলারের ভাষায় কথা বলছে। তাদের উক্তিভঙ্গিতে এখন আকাশস্পর্শী। তারা নাকি পারমাণবিক বোমা বানাবে ও সেই বোমা কায়রো বাগদাদ আম্মান বেইরুট দামাস্কাসের উপর ফেলবে। তারা কি সুয়েজ খালকেই তাদের সীমান্ত ক... দাঁড় টানবে? তারা কি ...দেরই প... দখল করে গোটা খালটাই নিজেদের ক... না? আরবরা ওদের বিশ্বাস করে না। সেইজন্যে সব বেদখল জায়গা ফেরৎ চা... ইসরায়েলের সম্মতি দেখলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাই তার বিতাড়িত আরব নাগরিকদের পুনর্বাসন। হয় ইসরায়েলের ভিতরে, ... তার বাইরে নতুন এক রাজ্যে। এর জ... যতবার দরকার ততবার তারা লড়বে।

ইসরায়েল বরাবর বলে এসেছে সে সরাসরি কথাবার্তা। কিন্তু সঙ্গে স... একথাও গোপন করেনি যে কতক... দখলী জায়গা হাতছাড়া সে করবে না। নিরাপত্তার জন্যে হাতে রেখে দেবে। ছাড়া প্যালেস্টাইনের বিতাড়িত আরব... সে ঘরে ফিরে নেবে না। আরব মাইনরি...

সে আর থাকতে দেবে না। তাই যদি হয় তবে তার সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালিয়ে এমন কী লাভ করবে? সুয়েজ খাল থেকে সে হয়তো দূরে সরে যাবে, কিন্তু তার বিনিময়ে যা যা চাইবে তা দিতে গেলে তার কাছে কূটনৈতিক পরাজয় হয়। সামরিক পরাজয়ের পিঠে কূটনৈতিক পরাজয় চাপলে আরবদের পক্ষে সেটা দুর্বহ হতো। তাই তারা সরাসরি কথাবার্তার প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি।

তা বলে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় কথাবার্তা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। যতবার হয়েছে অচল অবস্থায় ঠেকেছে। কারণ ইসরায়েল উত্তর জেরুজালেম ছাড়বে না। সবটাই রাজা ডেভিডের রাজধানী। গোলান হাইটস ছাড়বে না, সেটা হাতে থাকলে সিরিয়ার দিক থেকে বিপদ আসবে না। শারম-এল শেখ ছাড়বে না, সেটা হাতে থাকলে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকবে। সবচেয়ে বড়ো কথা প্যালেস্টাইনের বিতাড়িত আরবদের সে ঘরে ঢুকতে দেবে না। অপর পক্ষে আরব দেশগুলি এসব প্রশ্নে অটল অনড়। ছ'বছর এইভাবে কেটে গেছে। আরো ছ'বছরও কাটতে পারে। তাতে ইসরায়েলের ক্ষতি নেই। যতই দিন যাবে ততই পাকা হবে তার দখল। পরে আরবদের দাবী তামাদি হবে, যেমন তামাদি হয়েছে ১৯৪৮ সালের ইসরায়েলী দখলের উপর তাদের দাবী।

আরবরা কোনো কালে এর চেয়ে বেশী একজোট হয়নি, তবে তাদের এ জোট সর্বাঙ্গীণ ঐক্য নয়। এখনো তাদের মিলিটারি কমাণ্ড এক নয়। তাদের পররাষ্ট্রনীতি এক নয়। তাদের ফাইনান্স এক নয়। তাদের বাণিজ্যনীতি এক নয়। যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া সহজ, শেষ করা কঠিন। রুশ মার্কিন সহযোগিতায় যুদ্ধ-বিরতি না ঘটলে সাপের ছুঁচো গেলার মতো দশা হতো তাদের। আবার যুদ্ধ শুরু করার হুমকি তাদের মুখে সাজে না। সেটা বিপজ্জনকও। কারণ তারা হেরে যাচ্ছে দেখলে রাশিয়া তাদের অনুরোধ শুনে সৈন্য পাঠাবে। সঙ্গে সঙ্গে বেধে যাবে রুশ মার্কিন বিরোধ। সবাই মিলে থামিয়ে না দিলে বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়ে দিলেও শান্তি হবে না। আরবরা অশান্ত থেকে যাবে। তাদের তৈল সংগ্রামও আর কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। চাই এমন একটা ফরমুলা যেটা নিরাপত্তা পরিষদ একমত হয়ে গ্রহণ করতে পারবে। যেটা বর্জন করতে ইসরায়েল সাহস পাবে না। যেটা মেনে নিতে আরবরাও নারাজ হবে না। সেটার জন্যে সকলে রুশ মার্কিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হাতেই মরণ, তাদের হাতেই বাঁচন।

ক্যাম্ফর
মেন্থল
ইউক্যালিপটাস
টার্পেন্টাইন
থাইমল
নাটমেগ
Rubex
Rubex

বাসের দোতলায় ইন্দ্রনীল। তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি নির্বিকার বয়ে-যাওয়া রাস্তার ভিড়ের দিকে। সহসা তার মনে হল ফুটপাতে পর্ণা হেঁটে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য মাথা কাত করে উল্টোদিকে দেখবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বিশেষ মুহূর্তেই বাসগুলো বিরক্তিকরভাবে দ্রুত ছুটে যায়। ফলে যাকে পর্ণা বলে ভেবেছিল সে, তাকে আর দ্বিতীয়বার দেখা গেল না।

নেমে উজিয়ে গিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু পর্ণাই যে হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এটা তার চোখের ভুলও হতে পারে। হয়তো এখন পর্ণা বাড়িতেই বসে রয়েছে। পর্ণার কথা তার মনে ছিল বলেই হয়তো এমনটা ঘটল।

বস্তুত কদিন থেকেই ভাবনা ইন্দ্রনীলের মনে জলডুব মাছের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকদিন যাওয়া হয়নি ওদের বাড়ি। অনেকদিন পর্ণাকে দেখা হয়নি। অবশ্য তাতে যে পর্ণার খুব একটা এসে যায় এমন মনে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রনীলের যেতে ইচ্ছা করে। কিছুদিনের অদর্শনে সে অস্থিরতা অনুভব করে। নিজের মনের এই সংগোপন লোভের জন্য সে নিজেকে ভৎসনাও করে মাঝে-মধ্যে।

অবশ্য আজ যাবার পক্ষে তার হাতে একটা জোরালো অজুহাত আছে। দুতিন দিন হল সে চাকরি করছে—এ সংবাদটা গিয়ে দেওয়া যেতে পারে মাসিমাকে। পর্ণার কাছে এটা কোন খবরই নয়; হতেই পারে না। পর্ণা তো ছাড়—ইন্দ্রনীলের নিজের কাছেও এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। শ'দেড়েক টাকার মাসমাইনের ক্যাশিয়ার—তাও যাবার হাতযশের ফল। কাজেই এ বাবদে তার যে পরিমাণে উৎসাহ—সংকোচ তার চেয়ে অনেক বেশী।

তবু যদি রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে যায়, নেহাৎই কথায় কথায় খবরটা অন্য কোন প্রসঙ্গের সঙ্গে ভেজালের মত চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য পথেঘাটে হঠাৎ দেখা হবার আকস্মিকতা পর্ণাকে খুব একটা রোমাঞ্চিত করে না। বোধ হয় বিরক্তই করে। কিছুদিন আগে এই শ্যামবাজার পাঁচমাথার ভিড়ে তাকে দেখতে পেয়ে ইন্দ্রনীল খুশী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল—'কী ব্যাপার, তুমি এখানে?'

'কেন, আমার এখানে থাকতে নেই নাকি?'

কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ

সমীর রক্ষিত

'না না, আমি তা মিন্ করিনি; মানে, এখানে কোন কাজেটাজে নাকি?'

'হ্যাঁ, যার জন্য একটা শাড়ি কেনার কথা। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? পছন্দ করে দেবেন।'— পর্ণা হেসেছিল। তার হাসিতে ভ্রূভঙ্গিতে এমন একটা কৌতুক ছিল, ইন্দ্রনীলের সমস্ত উৎসাহ, ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ে রাস্তার ছিটকানো কাদাজল লেগে গেলে যেমন হয় তেমনি হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। তবুও সে হেসেই বলেছিল—'শাড়ি আমি কী পছন্দ করব? শাড়ির ব্যাপারে আমার '। 'আচ্ছা তাহলে চলি'—বলে পর্ণা ছুটেই শুরু করেছিল। অর্থাৎ এর পরে ইন্দ্রনীলের সৌজন্যমূলক 'আচ্ছা এসো' কিম্বা 'পরে দেখা হবে' অথবা 'একদিন তোমাদের বাড়ি যাব' এসব কথার কোন একটিও উচ্চারণ করবার অবকাশ ছিল না। বরং এসব কথা ভাবাও কেমন অবান্তর অর্থহীন মনে হয়েছিল।

আসলে পর্ণা বেশ অহঙ্কারী। অবশ্য তার অহঙ্কারটা ঠিক বাইরের অলঙ্কারের মত আরোপিত কিছু নয়। অনেকটা স্বভাবের অন্তর্গত সৌন্দর্যের মত। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ফুলে ব্যাপক বিপুল ভাবে ছেয়ে গেলে যেমন গাছটাকে আপাদমস্ত অহঙ্কারী দেখায়—অনেকটা তেমনি। সামান্য মহিমাদীপ্ত। খুব স্বাভাবিক—একটুও বানানো নয়—ভীষণভাবে ন্যাচরাল।

হয়তো বা এটা তার রূপের জন্য। কিন্তু পর্ণা যে খুব একটা রূপসী একথা কেউ বলবে না। কিন্তু তার বাক্‌ভঙ্গিতে কিম্বা আত্মসচেতন চলনে কিম্বা তার সুস্মিত ব্যবহারে এমন একটা মাননীয় দূরত্ব তৈরী হয়ে যায়, যার জন্য তাকে সবার থেকে আলাদা মনে হয়। হয়তো বা সামান্য উন্নাসিক। তবু আদ্যোপান্ত সহজ। তার খুব কাছে দাঁড়িয়েও ইন্দ্রনীলের নিজেকে অনেক দূরের লোক ভাবতে একটুও সময় লাগে না, দ্বিধা হয় না, সঙ্কোচও না। কারণ, এটা যেন যোগ্যতার প্রশ্ন, যে কেন লোকই যেন পর্ণার যোগ্য নয়, কেউ কেউ হয়তো বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে।

ইন্দ্রনীল এটা পছন্দ করে। 'পছন্দ করে' না বলে শ্রদ্ধা করে বললেও বেমানান হয় না। সব মানুষেরই কিছু কিছু অহঙ্কার থাকা ভাল, যা উটকো নয়—যা তাকে অর্জন করে নিতে হয় নিজের আচারে আচরণে রূপে কিম্বা গুণে।

ঠিক এ কারণেই পর্ণার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হল না। অবশ্য ঘনিষ্ঠ হবার লোভ তার ছিল। জয় করবার লোভ। নিজের ব্যক্তিত্বের নিষ্প্রভ জোরটাকে বাড়িয়ে দিয়ে, কিন্তু পর্ণার সামনে দাঁড়ালে জোরটোর উবে যায়। ওদের বাড়ি গেলে মাসিমার সঙ্গেই কথা হয় বেশী। অথচ ইন্দ্রনীলের চোখ আর মন পড়ে থাকে পর্ণার চলাচলের দিকে। শ্রবণেন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ে থাকে তার কোন কথা বা কণ্ঠ-স্বরের প্রতীক্ষায়। নিজের থেকে যেচে পর্ণা প্রায়ই কথা বলে না। কদাচিৎ তেমন দুর্লভ সুযোগ ঘটে, দু'-একদিন বলে—'কী, কেমন আছেন?'

উৎসাহিত ইন্দ্রনীল ঠোঁট ছড়িয়ে হেসে বলে—'ভাল।'

'আপনারা যে কী করে এত ভাল থাকেন বুঝতে পারি না'—পর্ণার কথায় হাসি উড়ে যায়।

তবু গলায় জোর এনে ইন্দ্রনীল বলে—'খারাপ থাকলে তুমি খুশী হও নাকি?'

'আমার খুশী হওয়া না হওয়াতে কী কিছু এসে যায়। ভাল নেই এটাই কী খুব সত্যি না? বানিয়ে বানিয়ে ভাল বললেই ভাল থাকা যায় নাকি?'

পর্ণার কথা শুনে মনে হয় 'ভাল থাকা' কথাটার বড় কোন মানে আছে, গভীর কোন তাৎপর্য। জীবনে ভাল থাকা খুব সহজ নয়, থাকতে পারলে তা খুবই গর্বের আর গৌরবের—এমন কথা মনে আসে। এসব কথা বলার সময় পর্ণার চোখেমুখে কেমন একটা অন্যমনস্কতা ফুটে ওঠে। শুধু দুবেলা খেয়ে দেয়ে চালিয়ে যাওয়া, একে কী ভাল থাকা বলে?—ঠিক এরকম কোন কথা যেন তার মুখভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়। তার দৃষ্টি তখন সুদূরে প্রসারিত। আর তখন তাকে ফুলে ফুলে ভরাট একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মত দেখায়।

আর এরকম কোন মুহূর্তেই ইন্দ্রনীলের ভেতরে গোপন লোভ হাতে ধরা বিপন্ন ফড়িং-এর মত কাঁপতে থাকে। তখন এগিয়ে গিয়ে পর্ণার হাত দুটো নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়, তার খুব কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে সাধ হয়, কিম্বা তখন কোন বিস্তৃত সবুজ মাঠে তার পাশা-পাশি নীরবে বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে যেতে ইচ্ছা করে অথবা শুধুই সান্নিধ্যের জন্য তার খুব কাছে বহুক্ষণ বসে থাকার বাসনা তাকে ব্যাকুল করে দেয়।

কোন একদিন এমনি কোন মুহূর্তে সে ভীরুগলায় বলেছে—'একটা কথা বলব পর্ণা?'

'কেন বলবেন না, বলুন।'

'চল না কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি-'

'কোথায়, স্বর্গে না নরকে?'

'এখন যেখানেই যাব সেটাই স্বর্গ বলে মনে হবে।'—খুব বানিয়ে বানিয়ে ভেবে-চিন্তে কথাটা বলেছিল ইন্দ্রনীল, বলে নিজেই হেসেছিল। তারপর ফের অনুনয় করেছিল— 'চল না একটু পার্কে কিম্বা গঙ্গার ধারেটারে'—

'যাব না।' —একটুও না-ভেবে পর্ণা বলেছিল।

'কেন?'

'কেন? আজ গেলেই তো আরেকদিন বায়না ধরবেন, তারপরে আরো একদিন। আর তারপরে কোন একদিন হাত চেপে ধরবেন কিম্বা জড়িয়ে ধরে বলবেন—পর্ণা আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপরে জোর করেই হেসে উঠেছিল ইন্দ্রনীল, যদিও জোরটা তার ভেতর থেকে সহজভাবে আসেনি।

হাসিটা শেষের দিক বিকৃত হয়ে গিয়ে-ছিল। ফ্যাসফ্যাসে। তার চোখেমুখে সামান্য রক্ত উঠে এসেছিল।

একটু দম নিয়ে সে গম্ভীর হয়ে বলে-ছিল—'যদি বলিই, তাহলে কী খুব অন্যায় হবে?'

'হবে।'

'কেন?'

'ভাল করে বাঁচতে না জানলে ভালবাসা যায় না।' —কথাগুলো পর্ণার মুখে এতটুকু কৃত্রিম শোনায়নি। বরং একমাত্র পর্ণার পক্ষেই যেন একথা বলা সম্ভব। তাকেই

়নায়। ছোটখাট চাওয়া পাওয়া নয়, কিম্বা
াত্তিদিনের ঝাঁপাক ঘাটা জীবনধারণ
য়—ভাল করে বাঁচতে জানা', শুনে সুন্দর
উজ্জ্বল কোন এক অজানা উৎসবের বর্ণ-
ময়ময় ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে।
াার তখন পর্ণার চোখের পল্লবে বিষাদ
ন হয় কাজলের মত, তার দৃষ্টি দূরে
ারিয়ে যায়।

এজন্যই তাকে এত ভাল লাগে।
এজনাই চুম্বকের মত পর্ণা তাকে টানে
মমোঘ আকর্ষণে। অথচ এজন্যই ভয়ও
াাগে। যখন তখন পর্ণার কাছে যাওয়া
য়ে ওঠে না। নিজের হাতে রাশ টেনে
াাটকাতে হয় নিজেকে।

একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে বাস মোড়
নতেই ইন্দ্রনীলের চোখ পড়ে টালা পার্ক।
ই স্টপেই পর্ণাদের বাড়ি—এর দুটো
ারেই তাদের। যাত্রী নামিয়ে বাস ছেড়ে
দয়। হঠাৎ ইন্দ্রনীল উঠে পড়ে। দ্রুতপায়ে
নমে আসে নীচে। বাস তখন বেশ জোরে
ুটেছে। কনডাকটর এবং কিছু যাত্রী
াাঁতকে হই হই করে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে
ন্দ্রনীল যেন শুধুমাত্র মাধ্যাকর্ষণের ওপর
নর্ভর করে হ্যান্ডেল থেকে হাত ছাড়িয়ে
নয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারিদিকে পৃথিবীটা
একবার চরকির মত পাক খেয়ে পর-
ুহূর্তেই স্বাভাবিক, স্থির হয়ে যায়।
পর্ণাদের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে সে
জোর কদমে।

'ইন্দ্র নাকি!' —তাকে দেখে মাসিমা
াাঁড়িয়ে পড়েন। ইন্দ্রনীলের চোখে পড়ে—
ঘরে আলোর মধ্যে বসে পর্ণা চুল বাঁধছে।
তাকে একপলক দেখেই চোখ সরিয়ে
নিয়েছে।

কী বলবে কী করবে সঠিক ভেবে
ওঠার আগেই ইন্দ্রনীলের হাতটা মাসিমার
পায়ের দিকে চলে যায়, একটা প্রণাম
করে সে।

মাসিমা অবাক—'কী ব্যাপার ইন্দ্র,
আজ এসেই একেবারে'—

'একটা চাকরি করছি মাসিমা কদিন
থেকে—

লটারীর টিকিটে প্রথম পুরস্কার
পাবার সংবাদ নিয়ে যেন একটা টেলিগ্রাম
এল এই মুহূর্তে, এমনি উদ্দীপ্ত চোখ-
মুখ মাসিমার। চাকরির খবরে তার নিজের
মায়ের মুখটাও বোধহয় এতটা উজ্জ্বল
দেখায়নি।

মাসিমা বলেন—'তাই, কদিন ভাবছি
ইন্দ্রটা আসছে না কেন, এমন খবর তা
এতোদিন আসনি কেন?'

ইন্দ্রনীল কুণ্ঠিত বোধ করে। সঙ্কুচিত-
ভাবে ঘরের দিকে তাকায় একবার। মৃদু
হেসে বলে—'এ আর এমন কী খবর
মাসিমা, খুব সামান্য চাকরি—মাত্র শ দেড়েক
টাকা'—

'আহা বাপু, তোমরা কিছুতেই খুশী
না। সবাই কী আর গোড়াতেই অফিসার
টফিসার হয়ে ঢোকে নাকি? ধীরে, ধীরে
হবে—'

ইন্দ্রনীল শব্দ করে হেসে ওঠে; হেসে
প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করে—'আপনার
শরীর কেমন বলুন মাসিমা?'

মাসিমা সে কথা কানে তোলেন না।
পর্ণাকে তাড়া দিয়ে বলেন—'কী রে, যা এক
কাপ চা করে নিয়ে আয়।'

ইন্দ্রনীল আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। দুম্
করে পর্ণা হয়তো এক্ষুনি বলে ফেলবে—
'অত উতলা হচ্ছ কেন?'
কিংবা 'যাও না তুমি নিজে করে আনো।'

—যেমন সে অন্যান্য দিন বলে। চা সাধারণত মাসিমাই করে দেন।

পর্ণা তার দিকে তাকিয়ে এ সময় মুচকে হাসে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। এ হাসির অনেক অর্থ হতে পারে। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে ইন্দ্রনীলের, সে বলে ওঠে—না না, চা থাক।'

পর্ণা বলে—'যাচ্ছি মা।' ইন্দ্রনীলের পাশ কাটিয়ে সে চলে যায়।

'কী যে ভাল লাগছে ইন্দ্র খবর শুনে, কী বলব তোমাকে।'—মাসিমার উচ্ছ্বাস যত বাড়ে ইন্দ্রনীলের সংকোচ আর আতঙ্কও তত বাড়ে। তার মনে হয় আজ না এলেই ভাল হত। পর্ণা তাকে আজ সহজে ছাড়বে না। সে মনে মনে তৈরী হতে থাকে।

তার হাতে চা দিতে দিতে পর্ণা, তার তির্যক হাসি হেসে বলে—'তাই আজ আপনাকে এত ঝকঝকে দেখাচ্ছে।' কথাটা নেহাতই ঠাট্টা, না গুরুতর আক্রমণের ভূমিকামাত্র, ইন্দ্রনীল বুঝে উঠতে পারে না।

সে তাড়াতাড়ি বলে—'শ্যামবাজারের মোড়ে একজনকে দেখে ভাবলাম তুমি বুঝি—'

পর্ণার ঠোঁটে হাসি লক্ষ্য—'আমার কী

সৌভাগ্য! নেমে পড়লেন না কেন?'

'নামলে কী হত। তেমনকে তো আর পাওয়া যেত না, ফর নাথিং ভুগতে হত।'

'না হয় আমার জন্যে ভুগতেনই একটু।'

ইন্দ্রনীলের খুব বলতে ইচ্ছে হল—'কী লাভ?' কিন্তু কিছুই না বলে সে সতর্ক হয়ে পর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকল চোখ বড় বড় করে।

'হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছেন?'—মুখ বাঁকিয়ে পর্ণা ঘুরে দাঁড়ায়—'আমি একটু ছাদে যাচ্ছি, যাবেন নাকি?' দুর্লভ আমন্ত্রণ। এই প্রথম। তবু শঙ্কায় মন ভরে ওঠে ইন্দ্রনীলের। হয়তো চতুর শিকারীর মত খেলিয়ে নিয়ে নির্জন ছাদের অসহায়-তার মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে পর্ণা হো হো করে হেসে উঠবে, বলবে—'দেড়শ টাকার একটা চাকরি পেয়ে আপনারা কী করে যে এত গদগদ হন না, মাকে প্রণাম—'

তবু সে মোহাবিষ্টের মতই পায়ে পায়ে ছাদে উঠে আসে। নরম ফিকে অন্ধকার রহস্যময় ঢেউ হয়ে খেলছে ছাদময়। মাথার ওপরে ত্রিশংকু মেঘ হাওয়ার তাড়নায় উদ্ব্যস্ত। ছাদের কোণে অলসেয় ভর দিয়ে পর্ণা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি বহু দূরে কোথাও উধাও।

ধীর পায়ে তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দ্রনীল। আর মনে মনে প্রতীক্ষা করে উচ্চারোক্ত অস্থির নৈঃশব্দ।

সহসা ইন্দ্রনীল চমকায়। পর্ণার কণ্ঠ-স্বর—'আপনি এত ভীতু কেন বলুন তো ইন্দ্রদা?' আকস্মিক এ-প্রশ্নের তাৎপর্য সে ধরতে পারে না। ফলে সে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

পর্ণা ঘুরে দাঁড়ায়—'ছেলেদের এত ভীতু হলে মানায় না।' তার শাড়ির আঁচল অগোছালো তবু সেটা গোছাতে পর্ণার মন নেই।

অবাক হয়ে ইন্দ্রনীল বলে—'আমি ভীতু?'

'না হলে আপনার খুব অহংকার হয়েছে বলতে হয়। চাকরি পেয়েছেন তো কথাই বলতে চান না?'

'ওটা একটা চাকরি নাকি পর্ণা। বল-বার মত কিছু?'

'বাহ্ সবাই কী অফিসার হয়ে শুরু করে নাকি? হবে ধীরে ধীরে'—পর্ণার মুখের কথাগুলো চেনা চেনা লাগে। একটু আগে মাসিমাও এই কথাগুলো বলছিলেন না? পর্ণার মুখে তির্যক হাসি নেই, তার মুখ মলিন।

অবাক বিস্ময়ে স্বিধায় ইন্দ্রনীলের ঠোঁট বেঁকে যায়। সে বলে—'দূর, নেহাৎই একটা চাকরি। এ দিয়ে কী বাঁচার মত বাঁচা যায়?'

'খুব বড় বড় কথা বলছেন, না ইন্দ্রদা? আসলে আমাকে এড়িয়ে যেতে চান তাই না?' —বলে এক পা যেন এগোয় পর্ণা, তার চোখে মুখে তরল ফিকে অন্ধকার। স্তিমিত গলায় সে বলে—'আজকাল আসেন না কেন ইন্দ্রদা, জানেন আপনি না এলে আমার একটুও ভাল লাগে না।' আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে ইন্দ্রনীল। তার সমস্ত বোধবুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যায়। সে অনড়। পর্ণা বলে—'চলুন না ইন্দ্রদা, একটু বেড়িয়ে আসি কোথাও—পার্কে কিংবা গঙ্গার ধারে। যাবেন?'

ইন্দ্রনীল যেন পায়ে পায়ে পেছুতে থাকে—অনেক পেছান। অথচ তার চোখ সামনে। সে যেন পর্ণাকে সঠিক চিনতে পারে না। পর্ণার চোখ আজ কোন্ বিষাদ কাজলের মত ঘন হচ্ছে? সে খুব নিবিড় করে খুঁটিয়ে দেখে পর্ণাকে—আজো তাকে কৃষ্ণচূড়ার গাছের মতই লাগে। কিন্তু সে গাছে আজ আর একটিও ফুল নেই—একটুও পাতা নেই—শীর্ষবিন্দু থেকে গোড়া পর্যন্ত সর্বাঙ্গ রিক্ত—একেবারে কংকালসার। ইন্দ্রনীল জলেডোবা মানুষের খড়কুটো ধরার মত অস্থির হয়ে কথা খুঁজতে থাকে কিন্তু সে কী বলবে কিছুই ভেবে উঠতে পারে না।

ঘরে-বাইরে

সম্মুখগতির সহযোগিতা

নভেম্বর মাসের গোড়ায় নতুন দিল্লির ঝকঝকে এলাকায় দুনিয়ার বহু দেশের সুবেশা সুন্দরী মহিলারা জমা হয়েছেন। অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের আমন্ত্রণে এসেছেন আন্তর্জাতিক মহিলা মৈত্রী সঙ্ঘ। তাঁদের এবারকার অধিবেশন ভারতে। আমার হঠাৎ দেখা হলো ডেনমার্কের Karin Lis Svarre-র সঙ্গে। বেশ খাকি রং-এর উর্দির মত দেখতে পোশাক। তার উপর ব্যাজ রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম তিনি গার্ল গাইড কি না। কেন? কেন এ প্রশ্ন? বললাম, তোমার খাকি উর্দি দেখে তাই মনে হয়েছিল। উত্তরে বললেন, "প্যারিসের নবতম মহিলা ফ্যাশন এই, রচনা ক্যাশারেলের। খাঁটি সুতীর কাপড়। খাঁটি সুতীর কাপড় পশ্চিমের বাজারে যেমন মহার্ঘ, তেমন আভিজাত্যের পরিচায়ক।" তিনিও এসেছেন আই এ ডবলুর প্রতিনিধি হিসাবে।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম হোটেলের দিকে। সেখানেই বৈঠকের ব্যবস্থা। আই এ ডবলু বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব উওমেন-এর পরিকল্পনা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯০২ সালে পরিকল্পনার পর বার্লিনে ১৯০৩ সালে এক সভায় সংসদটি প্রথানুযায়ী গঠিত হয়। প্রথম নামকরণ হয়েছিল "দ্য ইন্টারন্যাশনাল উওমেন সাফরেজ অ্যালায়েন্স"। উদ্দেশ্য হলো নারী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং সুযোগের জন্য চেষ্টা করা। মেয়েরা তাঁদের অধিকার ও প্রভাব দিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পথ দেখাবেন। সেখানে থাকবে না নারী পুরুষে প্রভেদ, থাকবে না জাতিধর্মের বিচার।

এবার আই এ ডবলু-র বিষয় পার্টনারশিপ ফর প্রোগ্রেস। দাসী নয়, দেবী নয়, নারী পুরুষের সহকর্মী, সহমর্মী ও দায়িত্বের সমান অংশীদার হবে। ১০ দিনের

উদ্বোধন উৎসবে শ্রীমতী গান্ধী, এ আই ডব্লু সি-র প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মী রঘু-রামাইয়া এবং আই এ ডবলুর প্রেসিডেন্ট

সেমিনারে সহযোগিতার সকল দিকের সমালোচনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, জগতের সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অন্তরে অভিযোগ পোষণ করেন। নারী হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান। তাঁর বেলায়ও এ মনোভাব সত্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে নারীর প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়। দেহবল বা অন্য কোন সহজাত অসুবিধা মেয়েদের আছে কি না, এ কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের জবাব প্রসঙ্গক্রমে বললেন। চিকিৎসক এমন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কোন নারী আর কোন পুরুষ? অর্থাৎ নির্ভর করে কে ও কার বিষয় এ জিজ্ঞাসা। এই প্রথম শ্রীমতী গান্ধী নিজেকে ফেমিনিস্ট বললেন. If being a feminist means that there should be no discrimination against a woman using her ability and talent. If it means equality of rights on the basis of merit then I am a feminist.—"নারীর যোগ্যতা বা প্রতিভার ব্যবহারের বিরুদ্ধে যদি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হয় তবে আমি নারীর অধিকার আন্দোলনের সমর্থক। যদি গুণবিচারে সাম্যের দাবি হয় তবে আমি নারীর প্রগতিবাদের পৃষ্ঠপোষক।"

ভিন্ন ভিন্ন ডেলিগেটের বক্তৃতায় নারীর সমান অধিকারেরই কথা ছিল। সুইডেনের কারিন আর্লেন্ডের সাথে সমান অধিকার সম্বন্ধে আলোচনাটি আমার ভাল লাগলো। আইনের চোখে সাম্য সব নয়। সে সাম্যের স্বীকৃতি বাজে কথা। নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার চেয়ে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অংশ গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু সাম্যের খাতিরে পুরুষ নারীর কাজকর্মের কতটুকু নিয়েছে বা নিতে চেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেয়েরা তাদের সামাজিক স্বাধীনতার যে মূল্য দিয়েছে তাতে তার কর্তব্য দ্বিগুণ হয়েছে, কারণ পুরুষ এখনও মনে করে যে অন্তঃপুরের কাজ নিতান্তই মেয়েলী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সন্তান পালন, রান্নাবান্না বা গৃহস্থালির কাজে পুরুষ হাত দেন না। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও তাঁরা প্রস্তুত নন।

[illegible] প্রকাশিত এক-[illegible] "[illegible]" (নারীর [illegible] ভূমিকা) এই সমস্যার সম্যক আলোচনা [illegible]। তথ্যকার দিয়ে বইখানা জাতি-[illegible] সবাইকে চমকে দেয়। অথচ পুরুষেরও যে ঘরে ও বাইরে ভূমিকা থাকতে পারে সে কথা এ বইতেও নেই। বহু বৎসর কেটে গেছে; এখন কোন কোন দেশে পুরুষের [illegible] ভূমিকার কথা উঠেছে। জাতি-সঙ্ঘকে রিপোর্ট দেবার সময় সুইডেন সরকার তাঁদের [illegible] পদমর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন— "If women are to attain a position in society outside the home.......it follows that men must assume a greater share of responsibility for the upbringing of children and the care of the home— ঘরের বাইরেও যদি মেয়েরা প্রতিষ্ঠা চান, তা হলে পুরুষকে গৃহস্থালি এবং শিশুপালনে অধিকতর দায়িত্ব নিতে হবে। আইন দিয়ে কতটাই বা হয়। সমাজের সমষ্টিগত পরিবর্তন প্রয়োজন।

শ্রীমতী কারিন তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা বললেন। বিয়ের পর তাঁর স্বামী বলেছিলেন, "I am a progressive women's lib husband. I am ready to help with everything at home."— আমি নারী স্বাধীনতায় প্রগতিশীল স্বামী। আমি ঘরের যখন যা প্রয়োজন সবকিছুই সাহায্য করতে প্রস্তুত। শ্রীমতী কিন্তু খুশী হননি। উত্তর দিয়েছিলেন— "আমিও তো সাহায্য করি।" উত্তরকালে তাঁদের মধ্যে এ আলোচনা আর হয়নি।

স্বামী-স্ত্রীর বেলায় সাম্য যেমন প্রয়োজন তেমন সন্তানের বেলায়ও। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে প্রভেদ তো আমাদের দেশে এত বেশী ছিল এবং এখনও আছে যে শ্রীমতী কারেনের সঙ্গে আমরা একমত। তিনি বলেছেন, ভাই ও বোন পারিবারিক জীবনে সমান সুযোগ না পেলে, পুত্র ও কন্যা সমান আদরে প্রতিপালিত না হলে সাম্যের সব কথাই অপূর্ণ থেকে যাবে। সমাজে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য যে আত্মপ্রত্যয় প্রয়োজন তার বীজ অঙ্কুরিত হয় অল্প বয়সে। পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণতা আসে যখন প্রত্যেকটি মানুষ তার মঙ্গলের জন্য আগ্রহ নিয়ে কাজ করে। ছেলেমেয়েকে যতটা বিশ্বাস করবেন, যতটা দায়িত্ব দেবেন ততটা তাদের পারিবারিক শুভাশুভের বা হিতাহিতের জ্ঞান জন্মাবে। তাতে তারা আত্মনির্ভরতা শিখবে। ছেলের বেলায় এক রকম কাজ, মেয়ের বেলায় অন্য রকম, সে যুগ এখন দূরে সরে গেছে।

চিন্তাধারার সহযোগিতা সব সহযোগিতার সেরা। সহযোগিতা সব সময় নারী ও পুরুষের প্রশ্ন নয়। ছেলেমেয়ে, বন্ধু, স্বামী এমন কি নারী প্রগতির পথে প্রত্যেক নারীর মনের সঙ্গে মনের মিল দরকার। এ মিল গভীর মিল। আমি লাল ভালবাসি বলে আপনাকে নীল ভালবাসতে দেব না, এমন কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সকলে এক উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে। আপনি যদি ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্র চান, আর আপনার স্বামী বিমুখ হন, তবেই আদর্শের সংঘর্ষ হবে। আমাদের দেশে এই আদর্শের সংঘর্ষ নিয়ে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়। পুরুষ উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে গেলে সংসার তার জন্য আটকে পেতে রাখে। সে পরিবারের ভরণপোষণ করে বলে তার জন্য কত দরদ সকলের। আর নারী যদি একই কাজ করে ঘরে ফেরে, তবে তার জন্য দশটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেন সে দুঃখ দৈন্য অভাবের বাইরে কোন উৎসাহে উপস্থিত হতে ছুটে গিয়েছিল। গৃহে তার আরাম নেবার অধিকার নেই। জীবিকার যুদ্ধ না করেও স্বামীর যা অধিকার আছে চিরাচরিত প্রথায় সে তা দাবী করে যাবে। আবার সেই যুগ-যুগান্তরের পারিবারিক নিয়মে মেয়েরা গৃহকর্মভার সবটুকু নেবে, কারণ সেটা তার কাজ। এ কিন্তু সহযোগিতা নয়।

শ্রীমতী

ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ ৫ ॥

'নান্ এখানে এসে...... ঐ সব করে। না, আমার বিশ্বাস হয় না।' বলে সে।

'আমি কি তোমায় বিশ্বাস করতে বলেছি?'

'তবে যে সে বলে যে বিয়ের আগে কখনো কাউকে ...... বিয়ের পরে সেই যা তার স্বামীকেই কেবল ......'

'সে কথা সে জানে আর তুমি জানো। আমাকে সে ও কথা বলেনি।'

'তুমি দিব্যি গেলে বলো যে কখনো আর ওর সঙ্গে মিশবে না। মিশতে যাবে না। বলো আগে আমায়......'

'বাঃ, তা কি করে হয়? কাছাকাছি ওই একটি মাত্রই স্টেশনারী দোকান—কিছু কিনতে হলে যেতেই হবে ওখানে। কোনো কিছুর দরকার পড়লে কোথায় যাব তখন? পয়সা তো কাছে থাকে না সব সময়, সে আবার ধারেও দেয় আমাকে দরকার হলে।'

'বেশ, তবে সেই দোকানেই যা মিশবে তার বাইরে আর কোথাও...... সিনেমায় কি কোনো খানে কখনো মিশবে না।'

'না যদি মিশি—নাই মিশলাম। কিন্তু না মিশলে হবেটা কী?'

'তাহলে তুমি যা চাইছো তাই হবে।'

এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন চৌকি-টার ধার ঘেঁষে বসল।

আমি চুপ করে ওর ভাবভঙ্গী দেখ-ছিলাম। সারা মুখ ওর রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখ নীচু করে কী ভাবছে যেন।

আমি কোনো জবাব দিলাম না ওর কথার।

চকিত কটাক্ষে একটু তাকিয়েই আস্তে আস্তে সে শুয়ে পড়ল আমার বিছানায়। —'দরজাটা ভেজিয়ে দাও।' বলল তারপর।

'না।'

'না কেন? তুমি তো চাইছিলে?'

'মোটেই আমি তা চাইনি। তোমাকে বাজাচ্ছিলাম কেবল। তুমি মেয়েটা কেমন দেখছিলাম তাই।'

'তার মানে?'

'তার মানে নান্ বলে মিথ্যে না। বলে তোমরা দুজনাই এক মোহরের—এপিঠ আর ওপিঠ। কেবল কালীর বেলায় কোনো বাছা-বাছি নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে যে কাউকে

"এই সব বলে নান্?" গর্জে ওঠে লালি

ডাকতে পারে, তুমি এখনো ততটা এগোওনি, এগুতে পারোনি। তোমার একটুখানি বাছ-বিচার পছন্দ অপছন্দ রয়েছে—তবে দুজনেই তোমরা এক পথের পথিক।'

'এই বলে নান্?'

'বলেই তো। আর বলে তোমাদের কোনো ভয় ডর নেই মোটেই। ভয়ের কোনো কারণ রাখেনি মা। তোমাদের মা ভারী ওস্তাদ। হাসপাতালের ধাই না? সেই যে কী হয় মেয়েদের—মাসে একবার করে হয় না? তিনচার দিন ধরে থাকে? প্রথমবার তা হবার সময় কী একটা ওষুধ তিনি খাইয়ে দিয়েছেন তোমাদের। জন্মে তোমাদের মা হবার আশংকা নেই......?

'এই সব বলে নান্? গর্জায় লালি।

......তোমরা আর তোমাদের মা সব এক ......। ......তোমাদের ...... দিয়েছে ......দের ......।'

তক্তপোশ থেকে উঠে দাঁড়ায় লালি। মুখ-খানা ওর কীরকম হয়ে যায় যেন। চোখে মুখে রাগ আর ঘৃণা বর্ষিত হতে থাকে।

হিংস্রা ফণিনী কোনোদিন প্রত্যক্ষ করিনি। বঙ্কিমী উপন্যাসের উপমায় পড়েছি মাত্র। বঙ্কিম কটাক্ষে তার কী আর ঠাওর পাব—এখন চোখের সামনে তাই দেখে চমকে গেলাম।

দজ্জাল বেগমের মতো সে গর্জে উঠেছে। ফুঁসে উঠে ছোবল মারার মতই বলল......

তিনটি কথাই বলল কেবল...... 'তোর—তোর—তোর মাকে......'

চলতাবা ছিরাপদটি আমার অজানা নয়। অনুস্বার ঐ অশোভন কথাটি প্রায়ই শুনতে হত অকুণ্ঠভাবে।

আমাদের পাড়ায় ছেলেরা ভারী মাতৃ-ভক্ত। কিন্তু সে ঐ পরের [illegible]। কারণে অকারণে তুচ্ছ অজুহাতে আশপাশ বস্তির আবালবৃদ্ধের মুখে কথাটা শোনা [illegible], কিন্তু কোনো বনিতার মুখে এই প্রথম।

অবশ্য লালি তখনো কারো বনিতা

বিছানায়। ঘুমের [illegible] [illegible] আসলাম না আর।

সে-আমি বিছানায় শুয়ে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি সেই-আমার চোখে ঘুম নেই। ভাবছি শুয়ে শুয়ে—আকাশ পাতাল—কত্তো কী! সামনে ডাঃ পি. ব্যানার্জির বাড়ির দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

জলবিয়োগের প্রয়োজনে উঠলাম। বাথরুম থেকে ফিরে খোলা বারান্দার দিকে দাঁড়ালাম। ঠান্ডা হাওয়ায়, মাথাটা যদি ঠান্ডা হয়।

শীতের রাত, কুয়াশায় ঢাকা—জ্যোৎস্না থাকতেও কেমন যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা—ছায়াময়।

সামনের মাঠে তাকাতে গিয়ে চোখে লাগলো হঠাৎ...... মর্কাস স্কোয়ারের রেলিং ঘেঁষে গ্যাসপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কে ও? লালি না?

লালিই তো।

সন্ধ্যেবেলার সেই পোশাকেই। গায়ে গরম কিছু নেই —এই ঠান্ডার ভেতর...... ঠায় দাঁড়িয়ে নাকি তখন থেকেই?

এরকমটা হবে আমি ভাবতে পারিনি।

আলোয়ানটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম। এটা ওর গায়ে জড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি গে।

কিন্তু কাছাকাছি হতেই আমাকে দেখে সে ছুটতে শুরু করেছে—আমিও পিছু নিয়েছি ওর।

মর্কাস স্কোয়ারের ধার দিয়ে সে ছুটছিল—আমিও ঠিক তার ছায়ার মতই।

ছুটছেই সে, থামবার নামটি নেই। আমিও তার পিছনে নাছোড়বান্দা।

চারচক্কর পরিক্রমা হয়ে গেল, কিন্তু এই চক্করবর্তি কিছুতেই তার নাগালের কাছাকাছি পৌঁছতে পারল না।

সে একটু আস্তে ছুটলে আমি হাঁফ ছাড়ি, সে একটু দম দিলে আমি বেদম হয়ে পড়ি। সে হনহন ছুটলে আমি হনো!

এমনি করে আট পাক ঘোরা হয়ে গেল আমাদের। আমি হাঁপাতে লাগলাম। সাত পাকে বিয়ে হয়ে যায় বলে। এতো তার ওপরেও আরো এক পাক! না, এত কড়া পাক আমার বরদাস্ত হবার নয়।

কদাচ ইস্কুলের কোনো স্পোর্টসে নামিনি কখনো; দৌড় ঝাঁপ আমার কুষ্ঠি বিরুদ্ধ—ব্যায়ামের মধ্যে বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ আর ওপাশ—এর বেশি আমার পোষায় না। সেই আমায় ধরে লেজে বেঁধে এত পাক ঘোড়দৌড় করাচ্ছে এই মেয়েটা।

ভাগ্যিস, এত রাত্তিরে পাড়ার কোনো ভদ্রসন্তান বাইরে নেই, নইলে আমাদের এই যুগলধাবন দেখে কী ভাবত কে জানে!

নাঃ, আর পারিনে। হাঁপিয়ে গিয়ে

আমিও তার পিছনে নাছোড়বান্দা

স্কোয়ারের পূর্বদিকের ডাঃ বর্মনের বাড়ির রোয়াকে বসে পড়লাম।

দুচক্কর আর মারলেই দশচক্করে পড়ে যা হয় বলে তাই হবে আমার। হার্টফেল করে মরে ভূত হয়ে যাব নিশ্চয়। সেই ভূতপূর্ব দশায় পৌঁছবার আগে সেখানে বসে......

বসে বসে দেখতে লাগলাম লালি কোন দিকে না তাকিয়ে তেমনি হন্ হন্ করে ঘুরপাক খাচ্ছে তখনো।

সূর্যগ্রহণের সময় ঘুরন্ত চাঁদ যেমন সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে এসে পড়ে তেমনি ঘুরতে ঘুরতে লালি আমার কাছাকাছি এসে পড়ল। মুখোমুখি আসতেই আমি রোয়াকের থেকে এক লাফে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেছি।

কোন পাকচক্রে জানিনে, অবশ্যম্ভাবী এই রাহুগ্রাস ঘটে গেল অকস্মাৎ।

দেখলাম চোখের জলে সারা মুখ তার ভেসে যাচ্ছে। তখনো সে অঝোর ধারায় কাঁদছে।

কী ভাষায় সান্ত্বনা দিতে হয় জানিনে। [illegible] একটা ভাবই জানা কেবল আমার—তাই দুঃখের ভারটা।

আর চাঁদের জলের ওপর আমার [illegible] [illegible] একলা করে ছাড়লাম তাকে।

তার আমারও যেন উঠলো উঠছিল আরো আরো।

তারপর কেঁদে কেঁদে একটুখানি ঠান্ডা হলে আমি বললাম—আমি তোমায় মিথ্যে বানিয়ে বলেছিলাম লালি। মান্তু ওসব কথা মোটেই বলেনি আমায়। ওর অজান্তে এ বছরের কথাই হয় না আমার। তার দোকানে বাড়ি—জিনিস কিনি চলে আসি—এটাই সে জানে না আমার বাবা। তোমার দুঃখে আমার মায়ের দিদি তোকে বলছি ওর ওপর আমার কোনো টান নেই। ওর নাম দিয়ে যা যা বলেছি না সব বানিয়ে......মিথ্যে কথা সব।"

"তুমি মিথ্যে কথা কও?" সে জলভরা চোখে তাকায়।

"কইনে? বলো কি তুমি? আকছার কই। মিথ্যে কথা বেচেই তো খাই। লেখক নই? বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হয় আমাদের—সেই সব গল্পটল্প কি সত্যি কথা নাকি? এত এত মিথ্যে কথা লিখতে পারি আর একটু মিথ্যে কইতে পারিনে? বলো কী তুমি?

(ক্রমশ)

নারলিকার-এর সঙ্গে

অনিবার্য (?) কারণে ইনডিয়ান এয়ার-লাইনস সেদিন তাদের কলকাতা-বোম্বাই-এর ভোরের ফ্লাইটটি বাতিল করেছিলেন। পরিবর্তে ঘোষণা করেছিলেন, বিকেল চারটে নাগাদ কলকাতা-বোম্বাই রুটে তাঁরা একটি বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করছেন।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী ওঁর সঙ্গে বিকেল তিনটে নাগাদ যখন বিমানবন্দরের রিসেপশনে এসে খোঁজ করলাম, জানা গেল চারটের ফ্লাইট ঠিক কখন ছাড়বে বলা শক্ত। যে প্লেনটি বোম্বাই-এ যাবে সেটি এখন দমদমের পথে উড়ে আসছে। কিন্তু কখন সেটি পৌঁছবে আপাতত সে খবর দেওয়া সম্ভব নয়। ঝড়ো আবহাওয়ার দরুন টেলি-কম্যুনিকেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

উনি অর্থাৎ ৩৭ বছরের তরুণ এবং বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে ভি নারলিকার রিসেপশনিস্ট-এর মন্তব্য শুনে মৃদু হাসলেন। 'স্টিল আনসারটেইন।' ওঁর মুখে সংক্ষিপ্ত স্বগতোক্তি।

বিরক্তি? জানি না তিনি এয়ার লাইনসের অব্যবস্থার উপর বিরক্ত হয়েছিলেন কী না। গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যিনি গবেষণা করছেন, মাধ্যাকর্ষণের উপর নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা নক্ষত্র এবং নাক্ষত্র-জগৎ সম্পর্কিত নতুন এবং নাটকীয় ব্যাখ্যার যিনি অন্যতম উদ্গাতা, এ সব ব্যাপারে কখনও তিনি বিরক্ত হতে পারেন কী না আমার জানা নেই। বরং তাঁর গভীর চোখের মধ্যে যেন লক্ষ করলাম কৌতুক, খানিকটা কৌতূহল। মুখের ওপর নির্বিকার হাসির আমেজ।

বললেন, আসুন। কোথাও বসা যাক।

আমি বললাম, বরং চলুন কফি অথবা ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে খানিকটা গলা ভেজান যাক।

সেই ভাল। কফি না, বেশ তেষ্টা পেয়েছে। ঠাণ্ডা পানীয় হলেই ভাল হয়। বললেন তিনি।

আমরা বিমান বন্দরের বার-এ এসে বসলাম। এবং তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী দু বোতল অরেঞ্জের অর্ডার দিলাম। এক মিনিটের মধ্যেই অরেঞ্জ এল।

আর তারপরই শুরু হলো আর এক প্রস্থ আলোচনা তাঁর সঙ্গে। তিনি অর্থাৎ অধ্যাপক জে ভি নারলিকারের সঙ্গে। বললেন, কিছুক্ষণ আগে আপনি হয়েল-নারলিকারের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের কথা বলছিলেন। এটা এখন কিন্তু পুরনো খবর।

আমি বললাম, কয়েক বছরের ঘটনা ঠিকই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটা অজানাই বলতে পারেন।

কোন রকম ভূমিকা না করে অধ্যাপক নারলিকার শুরু করলেন :

'দেখুন, কোন একটি বস্তুর ভর মাপতে গিয়ে আমরা বলি বস্তুটির ভর চার গ্রাম বা পাঁচ গ্রাম এবং ইত্যাদি। ভরের পরিমাপ বলতে আসলে যেটা ধরা হয়, সেটা তার 'ইনারসিয়া' বা জ্যাড্যের পরিমাপ। যার 'ইনারসিয়া' যত বেশি, তার ওপর কার্যকরী বলও তত বেশি। নিউটনের মতে 'ইনরসিয়' বস্তুর নিজস্ব ধর্ম। 'ইনট্রিনজিক প্রপারটি'। এবং এটা এমন একটি ধর্ম যার ওপর বাইরের কোন বস্তুর প্রভাব কাজ করে না।'

'গত শতাব্দীতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Mach নিউটনের এই মতবাদটিকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। তিনি বললেন, ইনার্সিয়া বস্তুর নিজস্ব ধর্ম হতে পারে না। ইনার্সিয়া পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর-শীল।'

প্র : পারিপার্শ্বিকতা বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : পারিপার্শ্বিকতা বলতে মহাবিশ্বে যত সব নক্ষত্র প্রভৃতি রয়েছে তাদেরকেই বোঝায়। Mach-এর বক্তব্য, যদি ধরে নেয়া যায়, মহাবিশ্বে একটিমাত্র বস্তু ছাড়া কোথাও আর কোন কিছু নেই

অধ্যাপক জে ভি নারলিকার

অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবটাই ফাঁকা, তাহলে একক ওই বস্তুটির ইনার্সিয়া বলে কোন ধর্ম থাকতে পারে না। Mach-এর এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে আইনস্টাইনকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর আপেক্ষিকবাদে Mach-এর এই তত্ত্বটি যাতে প্রতিফলিত হয় তার জন্যেও তিনি চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এরও পরে পৃথিবীর বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী Mach-এর ধারণার উপর নির্ভর করে নতুনভাবে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব সেই অভিমুখেই একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই তত্ত্ব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের পরি-প্রেক্ষিতে কোন বস্তুর 'ইনার্সিয়া' কী ধরনের অথবা কতটা হওয়া উচিৎ, আঙ্কিক পদ্ধতিতে তার ব্যাখ্যা যোগাতে সাহায্য করেছে।

এটুকু বলেই হঠাৎ থেমে পড়লেন অধ্যাপক নারলিকার। পরমুহূর্তেই জলের বোতলটি হাতে তুলে বললেন, এই বোতলটির ইনার্শিয়ার কথাই ভাবুন। নিউটনের মতে এটির ইনার্শিয়া এর নিজস্ব ব্যাপার। আশপাশের এই চেয়ার-টেবিল অথবা দূরের গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু হয়েল-নারলিকার তত্ত্ব ঠিক যে সূত্রটি এ বোতলের ইনার্শিয়ার পরিমাণটি দিতে পারে সেটা যোগাতে সাহায্য করেছে। আশপাশের চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে আমাদের দৃশ্যমান জগৎ বা মহাজগতের যত বস্তু আছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই বোতলটির ইনার্শিয়া কত এই সূত্র সেটা বের করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন : অধ্যাপক নারলিকার, দৃশ্যমান জগৎ বা মহাজগৎ বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর : মাফ করবেন, আমি একা নই। অধ্যাপক হয়েল এবং আমি যুগ্মভাবেই এ ব্যাপারে কাজ করেছি। আমরা ধরে নিয়েছি, খালি চোখ থেকে শুরু করে শক্তিশালী বেতার-দূরবীনে মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত যত রকমের বস্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তারা সবাই আমাদের দৃশ্যজগতের মধ্যে পড়ছে।

প্রশ্ন : এই দৃশ্যজগতে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি মিলিয়ে যত রকমের বস্তু দেখা গেছে তাদের মোট ভর কত?

উত্তর : দশের পেছনে পঞ্চান্নটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায়, প্রায় তত গ্রাম।

প্রশ্ন : আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গে আপনাদের তত্ত্বের মূল পার্থক্য কোথায়?

উত্তর : মূল পার্থক্য এই : নিউটন এবং আইনস্টাইন দুজনই ধরে নিয়েছেন দুটি বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব যত কমতে থাকে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণও বেড়ে যায়। সেটা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মৌলিক পার্থক্য যেটা সেটা হল, ওঁরা বলেছেন দূরত্ব যত বেশি কমে আকর্ষণ-বল তত বেশি বাড়ে। আমরা বলছি, ঠিক তা নয়। এই আকর্ষণ-বলেরও একটা সীমা আছে। খুব কাছাকাছি এসে যাওয়ার পর আকর্ষণের পরিবর্তে শুরু হয় বিকর্ষণ। বস্তুরা তখন পরস্পরকে ধাক্কা মেরে দূরে সরে যায়।

প্রশ্ন : আপনাদের এই শেষোক্ত মতবাদের সপক্ষে কোন প্রমাণ দাঁড় করান কি সম্ভব হয়েছে, অধ্যাপক নারলিকার?

উত্তর : ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করুন। কোয়েসারস, পালসারস অথবা গ্যালাক্সির কেন্দ্র জগৎ, যাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস অভ্ দ্য গ্যালাক্সি, এ সবের কথা অনেকেই আপনারা তো জানেন। নিরেট এই বস্তুগুলি ক্রমে আরও নিরেট হচ্ছে। কারণ যে সব বস্তুকণা দিয়ে এরা তৈরি, তারা পরস্পর যত কাছাকাছি হচ্ছে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ-বল, তত বেশি বাড়ছে। তারা সম্বদ্ধ হচ্ছে। এটাই প্রমাণ করে 'গ্র্যাভিটেশন ইজ অ্যাট্রাকটিভ'। কিন্তু যদি দেখা, উপর্যুপরি আকর্ষণের [illegible] হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল, এর অর্থ [illegible] দাঁড়াতে পারে? বলা বাহুল্য, [illegible] জগতে কখনও কখনও যে বিস্ফোরণ ঘটে সেটা তো এখন প্রমাণিত সত্য। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকবাদ এ ধরণের ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। বরং হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব—এই মাত্র যে কথা আপনাকে বললাম—বস্তুরা অত্যন্ত কাছাকাছি হওয়ার পর আকর্ষণের বদলে পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে—এটা ধরে নিলেই মহাজাগতিক, বিস্ফোরণজনিত ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করান সম্ভব।

*

হ্যাঁ, এটাই সেই বিখ্যাত এবং যুগান্তকরী হয়েল-নারলিকার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। সমাহিত ভাবে বলে যাচ্ছিলেন নারলিকার স্বয়ং। আমি নীরব শ্রোতা।

শুধু একটি নয়। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল এবং জে ভি নারলিকার গত এক দশকে একের পর এক নানা রকম তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে চমকপ্রদ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। সেই সমস্ত তত্ত্ব কখনও মুহূর্তে সাদরে গৃহীত হয়েছে, কোনটি বা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত বা বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

যেমন ধরুন, হয়েল এবং নারলিকার গত তিন বছর ধরে বস্তু এবং তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নতুন নতুন সূত্র প্রসঙ্গে নানাভাবে

আলোচনা করে আসছেন। তাঁরা বলছেন, কোন বস্তুর ভর অপর বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে পরিমাপের ওপর নির্ভর করে। নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, প্রাকৃতিক বস্তুর অভিকর্ষক—ধ্রুব বা গ্র্যাভিটেশনেল কনস্ট্যান্ট G সময়ের উপর নির্ভরশীল। জ্যোতিষপদার্থবিজ্ঞান এবং ভূ-পদার্থবিজ্ঞানে এ ধরনের মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ মতবাদটি সত্যি হলে বলতে হয়, সূর্য ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর বয়স যত বাড়বে তার আয়তনও সে তুলনায় বেড়ে যাবে।' হয়েল এবং নারলিকারের মতে, অতীতে নক্ষত্রগুলি আরও উজ্জ্বল ছিল। তখন তাদের অভিকর্ষক ধ্রুবকের মাত্রাও বেশি ছিল।

যদিও এসব তত্ত্বের উপর সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনো বারনোথি এবং টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিয়াট্রিস টিনসলে (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল, খণ্ড ১৮২, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)। ও'রা প্রশ্ন তুলেছেন, তাই যদি হয়, তা হলে 'কুণ্ডলী নক্ষত্র জগৎ' বা স্পাইরেল গ্যালাক্সিগুলি এখনকার চেয়ে অতীতে নিশ্চয় আরও বেশি উজ্জ্বল ছিল? কিন্তু এমন কিছু কিছু কুণ্ডলী নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের ঔজ্জ্বল্য কমেছে বলে তো মনে হয় না। এমনও তো হতে পারে G-এর মান কমে যাওয়ার ফলে নয়, বরং অন্য কোন বস্তু নক্ষত্র, নক্ষত্র জগৎ প্রভৃতিকে আড়াল করে রাখার দরুন ওই বস্তু খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে? গ্রহণের সময় সূর্য বা চাঁদকে যেমন নিষ্প্রভ বলে মনে হয়; কতকটা সেই রকম?

বলা বাহুল্য, এত সব বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে তত্ত্বিক বিজ্ঞানী হিসেবে নারলিকার এখন শিরোনাম। হয়েল এবং নারলিকার বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে দুই নির্ভীক পরিব্রাজক। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন প্রচলিত নিয়মে নারলিকার হয়ত বিদেশেই থেকে যাবেন। 'কারণ বিদেশ মানেই তো প্রচুর সুযোগ?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা করেন নি। পাকাপাকি-ভাবে তিনি ফিরে এসেছেন স্বদেশে। এখন তিনি বোম্বাই-এ টাটা ইনস্টিটিউট অভ্ ফান্ডামেণ্টাল রিসার্চ-এ অধ্যাপক পদে বৃত।

অধ্যাপক নারলিকার কলকাতায় এসে-ছিলেন সম্প্রতি। বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়ামের আমন্ত্রণে। পোলিশ পিপলস রিপাবলিক এবং ওই মিউজিয়াম মিলিতভাবে কোপার-নিকাসের ৫০০তম জন্মবার্ষিকী পালনের যে আয়োজন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে কোপারনিকাসের উপর বক্তৃতা দেবার জন্যই এই আমন্ত্রণ। ওই সময় মিউজিয়ামের অধিকর্তার শ্রীঅমলেন্দু বসু এবং কিউরেটার শ্রী এন ব্যানার্জী বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক নারলিকারের সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা।

হাতে সময় ছিল কম। বিড়লা মিউজিয়াম থেকে কলকাতা বিমানবন্দর যেতে যেটুকু এবং বিমানবন্দরে গিয়ে যতটা সময় তারই ফাঁকে চলেছিল অনর্গল প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন : বিদেশে অত বড় প্রতিষ্ঠা পেয়েও দেশে ফিরে এলেন কেন? বুঝতেই তো পারছেন, প্রায়োগিক গবেষণা ছাড়া এখানে ফান্ডামেন্টাল বা মৌল গবেষণার সুযোগ নেই বললেই চলে।

উত্তর : দুটি কথা ভেবে আমি দেশে ফিরে এসেছি। এক, যে ধরনের গবেষণা আমি করছি সে ধরনের গবেষণা এ দেশেও করা যায়। আমার তো তাত্ত্বিক গবেষণা। সব কাগজে-কলমে। দরকার শুধু একটি যন্ত্রগণক। দুই, আমি দুটি কন্যার জনক। আমার মনে হয়েছে, ওরা যখন বড় হবে বিদেশের সামাজিক পরিবেশে ওদের নিয়ে আমার সমস্যায় পড়তে হতে পারে। অন্তত যাঁরা বহু আগে তরুণ বয়েসে ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সামাজিক ব্যাপারে সমস্যা যে কী জটিল এখন সেটা তাঁরা বুঝতে পারছেন।

প্রশ্ন : বিদেশে গিয়ে যে সব বিজ্ঞানী স্থায়ী-ভাবে বাস করছেন, স্বদেশের প্রতি এখন তাঁদের মনোভাবটা কী রকম?

উত্তর : আমার মনে হয়েছে, বিজ্ঞানীরা প্রথমে বিদেশে যান প্রচণ্ড উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে। বছর দুই সেখানে বাস করার পর স্বদেশে ফিরে এসে যতটা সম্ভব চেষ্টা করেন থেকে যেতে। যখন সেটা পারেন না, তখন চিরকালের জন্যেই তাঁরা দেশত্যাগী হন। এবং ফিরে গিয়ে সেখানে যে ধরনের আচরণ করেন তাতে দেশের ওপর তাঁদের বিদ্বেষ, ঘৃণা এসবই প্রকাশ পায়। এতে বিদেশীদের কাছে দেশের ইমেজ নষ্ট হয়।

প্রশ্ন : সত্যি কথা বলতে কী, আজাদীর পর তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে গবেষণা করার মত কোন ট্রাডিশনই এ দেশে গড়ে তোলা হয় নি। তাই বলছিলাম, আপনার গবেষণাগারে হয়ত আপনি এমন মানুষই বেশি দেখতে পাবেন, যাঁরা নারলিকারকে দেখেন শুধু মাত্র একটি 'ইমেজ' হিসেবে। তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মত কোন মানসিকতাই তাঁদের নেই। এটা কি ঠিক নয়?

প্রশ্ন : আপনি যা বলছেন, মিথ্যে নয়। তবে এক জায়গা থেকে তো আমাদের শুরু করতেই হবে? পরের হাতে পাঠ্য-পুস্তক রেখে দিয়ে চিরদিন লেখাপড়া চালান যায় না। বলছিলাম, প্রায়োগিক গবেষণার উন্নতির জন্যে ভাল পরি-কল্পনা নিয়ে কিছু কিছু মৌল গবেষণা আমাদের চালাতেই হবে। তা ছাড়া আমি যে ধরনের কাজ করছি তার জন্যে দরকার ভাল অঙ্ক জানা ছেলেমেয়েদের। এ দেশে তেমন ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদেরকে এ ধরণের গবেষণার কাজে লাগাতে পারলে বিজ্ঞানীদের কর্মসংস্থান এবং গ্রাজুয়েশন দুই-এরই সুরাহা করা যায়। এ ধরনের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি টাটা ইনস্টিটিউটে একটি গবেষণা-বিভাগ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

অ্যাপ্রিসিয়েশন? কথাটা মনে করিয়ে দিতেই অধ্যাপক নারলিকার আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, বছর কয়েক আগে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এ বক্তৃতা দিতে এসে-ছিলাম। প্রচুর ভীড় হয়েছিল। আমার ভাল লাগে নি। কারণ বেশির ভাগ শ্রোতারাই মনে হয়েছিল নারলিকারকে দেখতে এসেছেন, বুঝতে নন। তবে হ্যাঁ, প্রফেসর সতোন বোস আমার কোডটি মুছে দিয়েছিলেন। বক্তৃতার পর তাঁর সঙ্গে আমার একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়ে-ছিল। নিজের বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

সমরজিৎ কর

॥ দুই ॥

আসে নি কেউ। এসেছিল, দুই দাদা। বাবা এসেছিলেন মজুমদারদের ভিড় একমালি বৈঠকখানা থেকে। যার অবস্থান ঠাকুরদালানের দেউড়ি পেরিয়ে ডান দিক মন্দিরের গায়ে। যেখানে সন্ধের পরে বাবা কাকা জ্যাঠারা ছাড়াও, আরো কিছু প্রতিবেশী আসেন। তারা পাশা খেলতো না। সেই যৌথ বৈঠকখানার শেষ নাটকের মহড়া হয়েছে 'প্রফুল্ল' বছরখানেক আগে, এবং গত বছর পুজোর সময় সেই নাটক হয়েছিল। তার আগে হয়েছিল, 'কালপরিণয়'। তারপরে যুদ্ধের দামামা। নিষ্প্রদীপ মহড়া শেষ করে, পুরোপুরি অন্ধকার। যৌথ বৈঠকখানায় এখন কেন যুদ্ধ এবং বাজার দরের আলোচনা। চাল ছ' টাকার ঊর্ধ্বে, নুনের দাম নাকি ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও চার পয়সা হয়েছে। যা কল্পনাতীত। কিন্তু বাজার দরের থেকে বৈঠকখানায় আজকাল যুদ্ধের কথাই বেশি। কথা না। বৈঠকখানা সন্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে—অবশ্য বাক্‌যুদ্ধ। দলে ভারি হিটলার মুসোলিনী তোজো এবং সুভাষ বসু। স্ট্যালিন চার্চিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। আর্য হিটলার পৃথিবীর ত্রাতা। জাপান ভারতবর্ষ দখল করবেই। সুভাষবাবু তাদের সঙ্গে আসছেন। সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সনদ।

'আরে রাখো তোমার হিটলার। ও ব্যাটা নাপিতের ছেলে আবার আর্য হলো কবে?'

'আর তোমার রাশিয়ার মুচির ছেলে বুঝি দুনিয়া জয় করবে? ওই কমিউনিস্টরা কী বলছে, আর তাই কপচাচ্ছ। হিটলারের মায়ের ঠ্যালায় তো ঘুঁগড়ো বাপ দেখছে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে এসে হিটলার কানে কানে বলে গেছে। ব্যাটা বলে আর্য! ইহুদিদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে পর্যন্ত ইঁদুরের মতো কলে পিষে মারছে, ওতো একটা পিশাচ।'

'হোক পিশাচ, তবু ইংরেজদের তো মারছে। আর নাপিত হলে আর্য হবে না, কে বলেছে? দেখবে, একদিন সারা পৃথিবীতে এই হিটলার-ই আর্য বর্ণ হয়েছে।'

'তা হলে জাপানীরাও আর্য বলো!'

রাগ যুদ্ধের পরিস্থিতি এইরকম, প্রধানত ইংরেজ বিদ্বেষ প্রবল, সুভাষ বসু সম্পর্কে একটি উত্তেজনাকর, অলীক আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আর্য হিটলারের প্রতি বীরত্বের মহিমাবোধ ও জার্মান যুদ্ধাস্ত্র ও কৌশলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও বিস্ময়, অন্য দিকে হিটলারের পিপচ. ঘরের পাঁজির বাজী পোড়ানো শেষ হলেই মিত্রশক্তির হাতে পতন, এবং স্ট্যালিন একলাই একশো। প্রতি সন্ধের পরে, সকলেই আবার ক্ষুধা বোধ করেন, নিদ্রার প্রয়োজনের কথা মনে রাখেন এবং আগামী দিনের কাজের চিন্তা পীড়া দিতে থাকে, তখন পরবর্তী সন্ধের জন্য যুদ্ধ মুলতুবী ও অসমাপ্ত রেখে কেউ কারোর ওপর প্রকৃত বিদ্বেষ পোষণ না করে বৈঠকখানা ত্যাগ করেন।

শিউলীর প্রয়োজনীয় জিনিস, অতএব আসে নি কেউ। দাদারা স্বদেশী, বাবা-হিটলারপন্থী, একান্নবর্তী বৈঠকখানা থেকে ফিরেছিলেন, সকলের পায়ের শব্দে একটি প্রত্যাশা সফল হয়নি, তিমিরেশ আসেনি, মোহনও না। শ্রীরার পড়া শেষে মেয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল, শিউলী আসলেও খাদ্যের দুশ্চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে থেকে অন্ধকারে ঘরে পড়তে গিয়েছিল, উৎকর্ণ ছিল, যে-কোনো শব্দের প্রতি। শব্দ—দূরের রেললাইন থেকে এঞ্জিনের হুইসেলের শব্দ, বড় রাস্তায় মোটরের শব্দ, দূর আকাশে এরোপ্লেনের ক্ষীণ শব্দ, সমীর ধাত্রের কাছে আবাহনী, প্রতিবেশী রক্ষিত বাড়ির ইঁটখোলা থেকে লোকদের ডেকে ওঠা এবং পাড়ায় কুকুরদের চিৎকার, তারপরে একে একে বাবা, দাদাদের ফেরা। কেউ আসেনি। তিমিরেশ কোথায়? স্বয়ং মায়ের হাতে একবার দেখা দিয়েছিল, ডাক শোনা গিয়েছিল, 'শিউলি'। শিউলি ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? খাবি না?

শিউলী জবাব দেয় নি। বকুলতলায় কি তিমিরেশ আজও আসে নি? মোহন চিঠি দিতে পারে নি? মোহন কী ভেবেছে?

দু'দিন আগেই ত্রিদিবেশ বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। তবু মনে একটা ক্ষীণ আশা, যদি সবিতা পণ্ডিতের সঙ্গে কোন ভাবে ত্রিদিবেশের যোগাযোগ হয়ে থাকে। সবিতা পণ্ডিত নাকি কী একটা চাকরির কথা বলেছিল, ত্রিদিবেশ শিউলীকে সেই-রকম জানিয়েছিল। ত্রিদিবেশ কি পণ্ডিত-দার সঙ্গে কলকাতায়? চাকরি পেয়েছে?

শিউলী ভাতের মধ্যে আঙুল ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাদের বন্দনা ম্যাগাজিনের কী হলো? বেরোবে না?'

বন্দনা ম্যাগাজিন, হাতে লেখা পত্রিকা। শিউলী ওর প্রত্যাশিত জবাবের গণ্ডীকে অনেকখানি সীমিত করে এনেছিল ম্যাগাজিনের প্রশ্নে, এবং দীনু জবাব দিয়েছিল, 'ওসবের মধ্যে আমি নেই। ওসব ত্রিদিবেশ-মোহনদের ব্যাপার। ত্রিদিবেশের আঁকা লেনিনের ছবি নিয়ে তো আজ খুব ঝগড়া হচ্ছিল।'

শিউলীর বুকের মধ্যে আশার নাকাড়া বেজে উঠেছিল, প্রকৃতপক্ষে বুকের দ্রুত-স্পন্দন ওকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

দীনু বলেছিল, 'মোহন সেই ছবি বকুলতলার ঘরের দেয়ালে টাঙাতে গেছলো। শেতল কিছুতেই দেবে না। শেতল বলে, তাহলে ও গান্ধীর ছবিও টাঙাবে। এই নিয়ে তুমুলকালাম কাণ্ড।' বলতে বলতে দীনু হেসেছিল, আবার বলেছিল, 'মোহন শেতলকে বললে, গান্ধীর ছবি এরকম এঁকে টাঙাবার হিম্মত থাকে তো টাঙা। শেতল বলে, আঁকার কি দরকার, গান্ধীর ছবি দোকানেই অনেক পাওয়া যায়, কিনে এনে টাঙাবো। আসলে শেতলদের মধ্যে তো কেউ ত্রিদিবেশের মতন আঁকতে পারে না। তারপর চন্দর বললে ক্লাবে লেনিন গান্ধী, কারোর ছবির টাঙাতে হবে না। ত্রিদিবেশ ছবিটা এঁকেছিল বন্দনা ম্যাগাজিনের জন্য, চন্দরের কাছে ছিল। মোহনটা সব কিছু নিয়েই লাফালাফি করে, আর শেতলটা ওর সঙ্গে কথায় পারে না, যা কাণ্ড করে ছোঁড়াগুলো।'

দীনু আবার হেসেছিল, এবং তারপরেও তার কথা থামবে কী না, সেই আশংকায় শিউলী ওর শেষ প্রশ্ন করেছিল, 'ত্রিদিবেশ কিছু বললে না?'

'সে তো আজ ক'দিন বেপাত্তা।' যদিচ দীনুর সেটা শেষ জবাব ছিল না, বলে-ছিল, 'শুনেছিলাম, বাড়িতে নাকি ওকে কী বলেছে ওর দাদারা, ওর মামা। ওকে নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে। ত্রিদিবেশের দাদাগুলো যেন কেমন, কারোর সঙ্গে তেমন মেশেও না। ত্রিদিবেশ তো আমাদের বাড়িতেও ক'দিন আসেনি।

আসে নি। দীনু কি শিউলীকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল? না কেবল বলবার জন্য বলেছিল? কিন্তু সে একবার শিউলী, তারপরে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বউদির দিকে তাকিয়েছিল। বউদি ওর স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাকে কি আর দুটো ভাত দেব?'

বউদি বলেছিল বলেই যেন দীনু ভাত নিতে চেয়েছিল। শিউলীর যা শোনবার ছিল তা শোনা হয়ে গিয়েছিল, অতএব খেতে বসবার প্রয়োজনও ফুরিয়েছিল, কিন্তু ছলনায় গরস ওকে মুখে তুলতে হয়েছিল, এবং তুলেই বুঝতে পেরেছিল, ভাত গলা দিয়ে নামবে না। গলায় যেন একটা প্রতিবন্ধক আর প্রতিবাদ আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। বউদি রান্নাঘর থেকে বেরোবার আগেই ও দ্রুত মুখের গরস নামিয়ে থালায় রেখেছিল, কোনো-রকমে জলের গেলাস তুলে এক ঢোক গিলে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

দীনু অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হলো, খেলি না?'

আবার ছলনা, শিউলী বলেছিল, 'খেতে পারছি না, খেতে পারছি না, পেটটা আবার কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে।'

বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে খিড়কির দিকে যেতে যেতে শুনেছিল, 'বাবাকে বললেই তো হয়, কী একটা পেট ব্যথার ওষুধ যেন আছে!'

শিউলী কলতলার পাশ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সত্যি সত্যি পায়খানায় গিয়ে ঢুকে-ছিল। দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ভিতর থেকে। তখন সত্যি সত্যি মনে হয়েছিল, ও যেন একটা প্রাকৃতিক বেগ বোধ করছে, কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে-ছিল, যে-প্রাকৃতিক বেগ ও বোধ করেছিল, তা প্রকৃত না। তীব্র বমির ভাব ছিল না, মুখ থেকে লালা গড়ানো থু থু ফেলে-ছিল। একটু পরে বেরিয়ে এসে দালানের বারান্দায় অন্ধকারে মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সম্ভবত বউদিই কিছু বলে-ছিল। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কীরে পুলি, খুব দাস্ত হচ্ছে নাকি?'

শিউলী বলেছিল, 'না, এখন একটু ভালো লাগছে। তবে খেতে পারবো না। মা, তুমি আমাকে একটু বিট-নুন দাও।'

কথাটা বলে পলকে আরো কথা মনে আসতেই, আবার বলেছিল, 'গরহজম হয়েছে বলে মনে হয়।'

শিউলী জানতো, মা ওকে দৃষ্টির গণ্ডীতে বেঁধে ফেলেছেন, অতএব প্রতিটি কথারই অনুসন্ধান করবেন। বিট-নুন আসলে একটি হজমী, যার স্বাদ অম্ল আর লবণাক্ত, এবং জোয়ান মেশানো থাকায় তার একটি বিশেষ স্বাদ, বিস্বাদ মুখে যা একটি সরসতা এনে দেয়। লঙ্কা বা আমের আচারের পরিবর্তে সেইজন্য বিট-নুনই চেয়েছিল, এবং মা কোনোরকম সন্দেহ করতে পারেন ভেবেই গরহজমের কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। হজমী বস্তুটি মায়ের নিজের হাতে তৈরি; সৈন্ধব লবণ, লেবুর রস আর জোয়ান দিয়ে।

মা যেন খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, 'তোর যা অবস্থা দেখছি, তাতে বিট-নুনে কি কমবে? তুই বরং কয়েক ডোজ নকস্‌ভমিকা খা। তোর বাবা তাই বলছিল।'

দালানের বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে জলভরা বালতি আর মগ থাকে, পা ধুয়ে ভিতরে ঢোকবার জন্য। শিউলী তাড়াতাড়ি মগে জল তুলে পায়ে ঢেলে বলেছিল, 'না, ওসবের দরকার নেই, না কমলে কাল সকালে দেখা যাবে। এখন একটু বিট-নুন মুখে দিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ি, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

শিউলী জানতো, অন্ধকারে মা ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, দেখতে না পেলেও কিছু অনুমান করার চেষ্টা করছিলেন। শিউলী বুঝতে পারছিল, মা আসলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, এবং সম্ভবত সঠিক কারণেই মা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কারণ, মাকে শিউলী যতোটা চেনে, মা ওকে তার থেকে কম চিনতেন না। মায়ের উদ্বিগ্ন হবার এবং সন্দেহ করবার অতি গুরুতর অব্যর্থ কারণ ছিল। সেই কারণ কেবল শিউলীর অসুস্থ অবস্থা দেখে না।

শিউলী দালানে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি দেবে, না আমি বিট-নুন তোমার ঘর থেকে নিয়ে নেব?'

রাত্রে মায়ের ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিল না, শিউলী বাবাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। ঘরে ঢুকলেই, বাবা নানা কথা জিজ্ঞেস করতেন। মা বলেছিলেন, 'তুই তোর ঘরে যা, আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

শিউলী ওর আর বেলির শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। হ্যারিকেন কমানো, খাটে মশারি ফেলা, অস্পষ্টভাবে বেলিকে দেখা যাচ্ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল কী না, বোঝা যাচ্ছিল না। মায়ের অপেক্ষায় ও জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিচ ওর মনে হচ্ছিল, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। বসতে বা শুতে পারলেই ভালো হয়। হ্যারিকেনের সলতে ও ইচ্ছা করেই ওসকায় নি। একটু পরেই, মা এসেছিলেন, হাতে বিট-নুনের ছোট বোয়েম, জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আলো জ্বালিস নি?'

'কমানো আছে।' শিউলী বলেছিল, 'এখুনি তো শুয়ে পড়বো, আলো নিবিয়ে দেবে।' বলে ও মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মা বোয়েমের মুখ খোলার আগেই, শিউলীর গালে হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন, এবং তারপরে গলায়, বলেছিলেন, 'গায়ে তাত-টাত নেই তো?'

মায়ের সেই স্পর্শ এতোই আকস্মিক, শিউলী ওর চমকানো গোপন করতে পারেনি, এবং অতি চতুরা ছলনা পটিয়সীর মতো, একটু হাসির শব্দ করে মায়ের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। মানুষের সমস্ত আচরণই তার প্রয়োজনে, এমন কি ছল-চাতুরিও, এবং তা লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বয়সের সীমারেখা মানে না। শিউলী বলেছিল, 'আঃ, এমন সুড়সুড়ি লাগলো!'

অথচ ওর বুকে তখন যেন বলিদানের নাকাড়া বাজছিল, মায়ের হাতে যেন খাঁড়া। মা বলেছিলেন, 'আমার মনে হলো, তুই যেন শিউরে উঠলি।' গাটা তোর একটু গরমই রয়েছে দেখছি। শীতটিত করছে নাকি?'

হ্যাঁ, শিউলীর শীত-ই করছিল, শরীরের উত্তাপে না, আতঙ্কে। ও অনুভব করেছিল, মায়ের স্পর্শেও যেন একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা আর সন্দেহ। শিউলী ওর স্বরে হাসির সরসতা বজায় রাখবার চেষ্টা করেই বলেছিল, 'না, শীত করবে কেন?'

মা বলেছিলেন, 'কিন্তু গা গরম রয়েছে। বুঝতে পারছি না কিছু। আমাশা হলেও গা গরম হয় অনেক সময়।'

মা যেন আপন মনে কথাগুলো বলছিলেন। আসলে মা চিন্তা করছিলেন, এবং যে-অব্যর্থ চিন্তা করছিলেন, সেই অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসাই তাঁর স্বরে বেজে উঠেছিল, 'তোর দিন গেল যেন কবে?'

শিউলীর মনে হয়েছিল, ওর পায়ের তলায় মাটি কেঁপে গেল, এবং সেই মুহূর্তেই ও একেবারে বিপরীত মূর্তি ধারণ করেছিল, 'রাত দুপুরে, তোমার মাথায় কি আর কোনো চিন্তা এলো না? দাও একটু বিট-নুন দেবে তো দাও, তা না হলে আমি শুয়ে পড়ছি।'

মা উত্তেজিত হননি, ঝাপসা অন্ধকারেও শিউলী মায়ের মুখ দেখে তা বুঝতে পেরেছিল। তিনি আস্তে আস্তে বিট-নুনের বোয়েমের মুখ খুলতে খুলতে বলেছিলেন, না বলছি এজন্য যে সময় মতন না হলে, ঠিক মতো পরিষ্কার না হলে অনেক সময় পেটে ব্যথা হয়, গা গরম হয়।'

বলে, বোয়েমের ভিতরেই রাখা কাঠের চামচ দিয়ে, বিট-নুন তুলেছিলেন, শিউলী হাত পেতে নিয়েছিল। মা আবার বলেছিলেন, 'আমারই ভুল, পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আগেই তো তোর দিন গেছে, আবার দিন ঘনিয়ে এলো। যা কগে, শুয়ে পড়। তোরা একটু ভালো থাকলেই ভালো।'

মা চলে গিয়েছিলেন। শিউলী তখনো হাতে বিট-নুন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন ওর পায়ের তলায় মাটি কাঁপছিল না, বলিদানের নাকাড়া বাজছিল না, বুকে। মায়ের কথাই শুধু কানে বাজছিল, এবং যে-হিসাবটা ওর মাথায় ছিল না, মা যেন সেই হিসাবটাই মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, প্রকৃতির ঋতুচক্রের একটি কাল পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আগেই অতিক্রম করে গিয়েছে, আর একটি কাল আসন্ন। কিন্তু প্রকৃতির ঋতুচক্রের সেই কালস্রোত ছাব্বিশ দিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভাবতে ভাবতে শিউলীর মনে হয়েছিল, ওর হাত দুটো মুষ্ঠি পাকিয়ে উঠছে, সমস্ত শরীর যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। অতি দ্রুত হাতের বিট-নুন মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে খাটের ওপর বসেছিল। চোখ বুজেছিল। আস্তে আস্তে বিট-নুনের স্বাদ ওর মুখের ভিতর এক নতুন স্বাদের লালায় ভরিয়ে তুলছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রের অন্ধকারে দূরে ক্ষীণ শব্দ শোনা গিয়েছিল, কারোর পায়ের শব্দ। ত্রিদিবেশ না, গোঙানো অস্ফুট স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিল, ওর জ্যাঠতুতো দাদা মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছেন। অমন বেশি রাত্রে ত্রিদিবেশ আসতো না।

শিউলী ঠাকুরদালানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, বাইরে যাবার দেউড়ির দিকে তাকায়। আজ দিনের বেলা, গত রাত্রের সেই কষ্ট তেমন নেই। বুঝতে পারে না, গোপনীয়তার জন্য ওর কষ্ট বাড়ে, না কি শরীরের এই কষ্ট একান্তই ওর প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য। মনে হয়, সর্বদা গোপন করার ভয়চকিত ত্রস্ততা না থাকলে, কষ্ট এতো তীব্র থাকে না। কিন্তু আজ সকালের প্রতীক্ষাও ব্যর্থ। কোনো শব্দই প্রত্যাশা পূর্ণ করেনি। ত্রিদিবেশ না, মোহনও না, কেউ আসেনি।

শিউলী বাইরে দেউড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ওর চোখের তারা দুটো যেন উদ্দীপ্ত আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পরমুহূর্তেই চোখের পাতায় একটা নিবিড়তা নেমে আসে। ও অনেকটা আচ্ছন্নের মতো, দেউড়ির বাইরে গিয়ে উত্তরের নির্জন রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করে।

ক্রমশ

ত্বক কত সুন্দর, কত মোলায়েম
কেবল সিন্থেল কোল্ড ক্রীম
ব্যবহারের ফলে

চিত্র প্রদর্শনী

বহির্বঙ্গের কোনও [illegible] শিল্পীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে কলকাতার শিল্পরসিকবৃন্দ খুশী হন, কারণ এ জাতীয় প্রদর্শনীতে ভিন্ন রসের স্বাদ মেলে। সেই দিক থেকে বিচার করলে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস গ্যালারীতে আয়োজিত শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্তের প্রদর্শনী অনেকেরই ভাল লাগে। শিল্পী শিক্ষালাভ করেন দিল্লী পলিটেকনিকে, পরে ইতালি সরকারের বৃত্তিলাভ করে তিনি ইতালি যান ও উচ্চতর শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এই শিল্পী দেশে ও বিদেশে অনেক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন, বহু পুরস্কারও লাভ করেছেন, তবে সম্ভবত বহির্বঙ্গে থাকার জন্য এখানে এখনও ঠিক বিশেষ পরিচিত নন। প্রদর্শনীতে বিমূর্ত রীতিতে আঁকা ১৫টি

ল্যাণ্ডস্কেপ-৩ —দিলীপ দাশগুপ্ত

শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীর রচনা আকার এবং কয়েক স্থলে ইমেজারি প্রধান। রঙ ব্যবহাররীতি প্রশংসনীয়, বিশেষ করে নীল ও সবুজ রঙের নানা স্তরভেদ ও তারতম্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তবে কয়েক স্থলে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খ্যাতনামা শিল্পী বিমল দাশগুপ্তের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। অবশ্য যাঁরা বিমল দাশগুপ্তের সমকালীন রচনার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের চোখেই এই প্রভাব ধরা পড়বে, অপরের চোখে নয়। সুমার্জিত রঙ ব্যবহার প্রণালীর জন্য কয়েকটি ছবি প্রথমেই নজরে পড়ে—যেমন ল্যাণ্ডস্কেপ-৩। নীল ও সবুজ রঙ নানা স্তরে বিভিন্নভাবে বিন্যাস করে শিল্পী একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে পেন্টিং ইন রেড-এরও নাম করা যায়। গভীর লাল, কমলা ও সবুজ রঙ সুকৌশলভাবে ব্যবহার করে শিল্পী স্থানে স্থানে স্ফটিকের স্বচ্ছতা সৃষ্টি করেছেন, ফলে একটি চমৎকার ইমেজারি ফুটে উঠেছে। ভারতীয় মোটিফ ও প্রতীক অবলম্বনেও শিল্পী দুএকটি ছবি এঁকেছেন, যেমন সিমবল-১, তবে এটিতে কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি। দু একটি সাধারণ মানের, যেমন ছাই রঙ প্রধান ডিটি-৩। কয়েকটি কমপোজিশন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন নীল, সবুজ ও পরিমিত লাল রঙ প্রধান ল্যাণ্ডস্কেপ-৪। সুন্দর কারুকার্যের দিক থেকে লাল, হলুদ ও বেগুনী রঙ ভিত্তিক ইয়োলো ব্রিজ-এর নাম করা যায়।

✻

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত শিল্পী অনমিত্রর প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই বালক শিল্পীর সাম্প্রতিকতম শিল্পকর্মে কিছু বৈচিত্র্য দেখে থাকবেন। অনমিত্র পরিচিত প্রতিভাধর শিল্পী, যদিও তার বয়স মাত্র ১৫। তার ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য রঙ নির্বাচন ও ব্যবহার প্রণালী। অনমিত্র যেন প্রকৃতির কোলেই মানুষ—তাই অধিকাংশ ছবিতেই প্রকৃতি যেন বিভিন্নরূপে তার কাছে ধরা দিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত অনমিত্রর কোনও ছবিতে মানুষ বা জীবজন্তুর সাক্ষাৎ মেলেনি—অবশ্য ইঙ্গিত প্রধান পাখী বা পায়রার কথা স্বতন্ত্র। আরও লক্ষ্য করার বিষয় সবুজ ও নীল রঙের ব্যবহাররীতি ও অঙ্কন পদ্ধতি। প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই নীল ও বিশেষ করে সবুজ রঙের নানা স্তরভেদ ও তারতম্য চোখে পড়ে—বস্তুত সবুজ রঙবৈচিত্র্যে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। বহু স্থলে অনমিত্র এবার ছবির পুরোভাগে ছোট ছোট আয়ত ক্ষেত্র এঁকে নানা রঙে ভরে ফেলে ছবিতে একটি আলঙ্কারিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া বিচিত্র রূপ ও রেখা প্রধান নানা গাছও দ্রষ্টব্য। এবারে অ্যাকশন পেন্টিংএর নিদর্শন কম চোখে পড়ল, তবে সেই তুলনায় বহির্জগতের নানা উপভোগ্য দৃশ্য দেখা যায়। প্রদর্শনীভুক্ত অধিকাংশ ছবিই সকলের চোখে পড়ে, সুতরাং বিশেষভাবে কোনটি চিহ্নিত না করলেও চলে। তা সত্ত্বেও মনসুন, উইনটার, সিরিজ, এ ম্যান অ্যাকোয়েন্ট ইন মনসুন, এ পলাশ ট্রী ইন স্প্রিং ও অটাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

✻

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী শেফালি সরকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা ৮৬টি নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী যে নিয়মিতভাবে ছবি আঁকেন তা অবশ্য নিদর্শনগুলি দেখে বোঝা যায় না। তার কারণ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মানের নিদর্শন দেখা যায়। বস্তুত, দু একটি দেখে যেমন ভাল লাগে, তেমনি অন্য কয়েকটি দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—এগুলিও কি এঁরই আঁকা? প্রকৃত কথা এই যে, প্রদর্শনীর জন্য ছবি নির্বাচন ব্যাপারে শিল্পীর সচেতন হওয়া উচিত ছিল—কারণ অধিকাংশ ছবিই দুর্বল ও প্রদর্শিত হবার অযোগ্য। পক্ষান্তরে শিল্পী যদি সুনির্বাচিত কয়েকটি ছবি প্রদর্শনীতে পেশ করতেন তাহলে সমীচীন

স্টেপস্ —শেফালি সরকার

হত। শিল্পী যে রঙ ব্যবহার রীতিতে অপটু নন তা দু একটি ছবি দেখেই বোঝা যায়, যেমন লেডিজ উইথ ল্যাম্পস্। ছবিটি ইমপ্রেসানিস্টিক, পরিকল্পনা ও রঙ ব্যবহারের দিক থেকে এটি উল্লেখ্য। আর একটি ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বোটস্—বিশেষ করে নৌকাকে কেন্দ্র করে হলুদ ও নীল রঙ ব্যবহারে শিল্পী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। টিবেটান উওম্যানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পরিকল্পনা ও অঙ্কনরীতির দিক থেকে ইরোসান-এর নাম করা চলে। প্রশংসনীয় ড্রয়িং নিদর্শন হিসাবে প্লি ডাকস্ উল্লেখ্য। রিফ রেসপাইটও অনেকের চোখে পড়ে, তবে এটিতে শৈলজ মুখার্জীর কিছু প্রভাব ধরা পড়ে। অন্যান্য ছবির মধ্যে স্টেপস, টয় ফ্যামিলি ও গার্ল উইথ পিচারস-এর নাম করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

॥ আটত্রিশ ॥

উদয়শংকরের কাকা কেদারশংকরের মেয়ে কলতার মামাবাড়িও কাশীতে। কালিয়া ক কিছুদিনের জন্যে সে এসেছিল মামা ড়তে। একদিন কেদারশংকর তাকে লেন যে তিনি কলকাতায় গিয়ে উদয়-রের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। সে লতার কথা জিজ্ঞেস করছিল—তাকে বার দেখতে চায়।

কাশী থেকে কনকলতা এল কলকাতায়। উঠল তালতলায়—তার দাদাদের ড়তে। অল্প পরে কালিয়া থেকে রশংকরও এলেন। একদিন সকালের ক তিনি কনকলতাকে নিয়ে গেলেন র্ স্ট্রীটে উদয়শংকরের সঙ্গে দেখা তে। অ্যালিস বোনারও তখন বাড়িতেই লন।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগের মুহূর্ত স্ত খুব অস্বস্তিতে কেটেছে কলতার। দাদা ফিরেছে বিলেত থেকে, ক দেখবে এই প্রথম। শিশুকাল ক শুনে আসছে কনকলতা তার এক আছে বিলেতে। তাকে দেখার আগ্রহ ও প্রবল।

কিন্তু মৃদু উত্তেজনায় কিশোরী লতার বুক কাঁপছে। কী বেশে সে বে তার দাদার সামনে! উদয়শংকর সাহেব। সে এসেছে বিলেত থেকে, কনকলতা গ্রামের মেয়ে। কী ভাববে উদয়শংকর, জিজ্ঞেসই বা কী। ভাবনায় ভাবনায় নাড়ি ছেড়ে কিশোরী-কনকলতার।

একবার সে ঠিক করল শাড়ি পরে। কিন্তু তা পরা তার অভ্যেস নেই, ফ্রকই পরে। বড়দিরা উপদেশ দিলেন, টুং-টাঁড়ি পোরো না, পায়ে বেঁধে চিৎপটাং হবে, ফ্রক পরেই যাও। কনকলতা তাদের কথাই শুনল।

উদয়শংকরকে কনকলতার ডাকনাম বলে কেদারশংকর বললেন, "এই যে, মীনাকে নিয়ে এসেছি।"

কনকলতা ছয়ে লজ্জায় একেবারে কাঠ। আবার এক মেমসাহেবও আছেন। কোনরকমে উদয়শংকরকে প্রণাম করে সে

যৌবনে তিমিরবরণ

ভাবছিল এখন এখান থেকে, পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। কিন্তু এই ছোট ভীরু গ্রাম্য বোনটিকে দেখে খুব খুশী উদয়শংকর।

কেদারশংকরকে সে বলল, "চাচা, মীনাকে তুমি রেখে যাও। এখানে আমাদের সঙ্গে ও খাওয়া-দাওয়া করবে। বিকেলবেলা নিয়ে যেও।"

খাওয়ার সময় কনকলতার বড় মুশকিল হল। স্বভাবতই সে বেশ লাজুক, তার ওপর এমন পরিবেশ। পাশে মেমসাহেব। তিনি না জানেন হিন্দি, না জানেন বাংলা। আর কনকলতাও ইংরেজী জানে না। তবুও মেমসাহেব তার খুব আদারক করছেন। আর যতই তিনি দেখাশোনা করছেন ততই ঘাবড়ে যাচ্ছে কনকলতা। কাঁটা-চামচে দিয়ে সে জীবনে কখনো খায়নি।

কনকলতার হাবভাব দেখে তার সঙীন অবস্থার কথা বুঝে নিয়েছিল উদয়শংকর। সে একটু পরে তাকে বলল, "মীনা, তুমি হাতেই খাও না।"

মীনা বাঁচল বটে সে কথা শুনে, কিন্তু হাতও যে মুখের কাছে তুলতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। এখানে না থেকে বাবার সঙ্গে চলে গেলেই হত। যা-তা করে কোনরকমে খাওয়া শেষ করল কনকলতা।

বিকেলে উদয়শংকর বলল, "মীনা, চল একটা শো দেখে আসি।"

কনকলতা যদিও মাথা নাড়ল, তবে বুঝল না কী দেখতে যাওয়া হবে। সে থিয়েটার সিনেমার কথা শুনেছে, শো-এর কথা শোনেনি কখনো। সেটা আবার কী রকম?

অ্যালিস বোনার আর উদয়শংকরের সংগে কাঠ-কাঠ কনকলতা বোবার মতন গেল মিনার্ভা থিয়েটারে 'মেবার পতন' দেখতে।

পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে ফিরতে-ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। কেদারশংকর ওদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। উদয়শংকর ভেতরে যেতেই বাবাকে একা পেয়ে কান্না-কান্না গলায় কনকলতা বলল, "আমাকে শিগগির বাড়ি নিয়ে চল। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

কেদারশংকর একটু অবাক হয়ে পরে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খাওনি?"

"আমি এখানে কিছু খেতে পারিনি। বাবা চল না—" কনকলতা একরকম জোর করে কেদারশংকরকে বাইরে টেনে এনে রাস্তায় নামল। উদয়শংকরকে কিছু বলে আসারও অবসর পেলেন না তিনি।

কিন্তু একটু পরে ছুটতে-ছুটতে উদয়শংকর এল রাস্তায়। এসে কেদারশংকরকে বলল, "মীনাকে কাল আবার দিয়ে যেও।"

শুনে মনে মনে কনকলতা ভাবল, আর এসেছি কাল! কিন্তু আবার আসতে হল তাকে। কেদারশংকর কথা দিয়ে এসেছিলেন। বিকেলে অ্যালিস বোনার, উদয়শংকর আর কনকলতা বেড়াতে গেল আউট্রাম ঘাটে। আকাশ পরিষ্কার। হু-হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আজ কনকলতার কাঠ-কাঠ ভাব একটু কেটে গেলেও সে কথা-টথা বলছে না একেবারেই। মাটির একটা পুতুলের মতন অন্য দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

আজ কেউ নিতে আসবে না কনকলতাকে। উদয়শংকর তাকে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেবে তালতলায়। সেই সন্ধ্যায় প্রথম ট্যাক্সিতে যেতে যেতে উদয়শংকর বিলেত যাওয়ার কথা বলল কনকলতাকে।

বলল, "আমাদের সংগে তোমাকেও নিয়ে যাব প্যারিসে। তোমাকেও নাচতে হবে। কী? যাবে?"

কনকলতা যেমন বসেছিল তেমন থাকল। মাথা নাড়ল না, কথাও বলল না। উদয়শংকর আবার বলল, "আমিই নাচ শেখাব তোমাকে।"

তবুও চুপ কনকলতা। উদয়শংকর একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে, তুমি বোবা নাকি মীনা?"

পাছে মিস বোনার তাকে সত্যিই বোবা ভাবেন, সেই ভয়ে কনকলতা খুব আস্তে বলল, "না। বাবা যা বলবে তাই করব।"

"বেশ। আমি চাচার সংগে কথা বলব।" —উদয়শংকর বলল, "তোমাকে আমি কিন্তু নিয়ে যাবই।"

শুধু কনকলতাকে নয়, কেদারশংকর রাজেন্দ্রশংকর দেবেন্দ্রশংকর রবীন্দ্রশংকর— এমন কি হেমাঙ্গিনী দেবীকেও সংগে নিয়ে যাবে উদয়শংকর। অন্নদাচরণ ভট্টাচার্যও যাবে। সে এই পরিবারের বন্ধু। অন্নদাচরণের ডাক নাম বেচু। আর যাবে উদয়শংকরের এক মামা ব্রজবিহারী।

কনকলতা কালিয়ায় ফিরে গেল। কিছু পরে অ্যালিস বোনার, হরেন ঘোষ আর মহেন্দ্র সিং নামে এক বন্ধুকে নিয়ে উদয়শংকরও গেল সেখানে। বিলেত যাবার কথাবার্তা একেবারে পাকা হয়ে গেল। এখন বেরিয়ে পড়লেই হয়।

কাশী থেকে উদয়শংকর আগে গেল বোম্বাই-এ। দিন কয়েক পরে জাহাজ ছাড়বে। জাহাজের নাম সেই এস-এস গংগেস। তার পরিবারের আর সকলে কাশী থেকে এক সংগে এসে পড়বে। এসে উঠবে হোটেলে। তিমিরবরণ যথাসময়ে এসে পৌঁছবেন কলকাতা থেকে।

বোম্বাই-এ পৌঁছবার পরই তিমিরবরণের গুণমুগ্ধ সাধক ও সুরশিল্পী দিলীপকুমার রায়কে উদয়শংকর লিখল— "I regard myself as lucky in having Timirbaran with me. I have been travelling throughout India for the last seven months, but was never so much impressed as by his music. He is really wonderful with his Sarode. When I came to India I never dreamt of a decent Indian orchestra, but Timirbaran's orchestra that lately accompanied my dances in Calcutta made me change my mind. I only hope there will be more parties than that."

তিমিরবরণ আর মাইহারে ফিরে গেলেন না। তিনি গুরুজীর অনুমতি ভিক্ষা করে তাঁকে চিঠি লিখলেন। সব শুনে খুব খুশী হলেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান। তিনি তাকে জানালেন তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা। তিমিরবরণ এলেন বোম্বাই-এ। তাকে জাহাজে তুলে বিদায় জানাতে সংগে এলেন তার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী মিহিরকিরণ।

কাশী থেকে উদয়শংকরের আত্মীয়-আত্মীয়া এবং বেচুও এসে পড়ল। এদের মধ্যে বয়স্ক শুধু দুজন- কেদারশংকর আর হেমাঙ্গিনী দেবী। কনকলতা কিশোরী। আর একেবারে ছোট মানুষ রবীন্দ্রশংকর। যাকে বাড়ির সকলে ডাকে রবু বলে।

রবিশংকর দশ বছর পূর্ণ হয়ে এগারোয় পড়েছে। কনকলতা তার চেয়ে মোটে কয়েক বছরের বড়। তাই ওদের দুজনের খুব ভাব। ওরা লুডো বোর্ড এনেছে সংগে—জাহাজে খেলবে বলে। মেজদা রাজেন্দ্রশংকরকে রবিশংকরের বড় ভয়। সে নিজে পড়াশুনোয় ভাল বলে রবুকেও চোখে-চোখে রাখে যেন সে ফাঁকি-টাঁকি না দেয়।

রাজেন্দ্রশংকর যখন বাড়িতে থাকে না, রবিশংকর মাঝে মাঝে তখন একটা সেতার নিয়ে বসে। এই রকম অনেক বাজনা বাড়িতেই আছে। সেতারটা যেন রবিশংকরের চেয়ে বড়। তার ধরতে প্রথম-প্রথম বেশ অসুবিধা হয়। তবুও সে বাজিয়ে যায় আপন মনে—টুংটাং টুংটাং!

রাজেন্দ্রশংকর এসে পড়লেই মুশকিল। রবিশংকরকে ধমক দিয়ে বলে, "এখন তোমার পড়াশুনো করবার সময় না?"

রবিশংকর অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি সেতার সরিয়ে রাখে।

তারপর একদিন জাহাজ দুলে উঠল মাঝসমুদ্রে। উদয়শংকর প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। বাকি সকলে চলেছে ট্যুরিস্ট ক্লাশে। উদয়শংকর সারাদিন কেবিনেই থাকে। এরা সকলে বসে থাকে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আকাশ দেখে, সমুদ্রের শোভা দেখে আর গল্প করে কিম্বা বই পড়ে কাটায়। কনকলতা আর রবিশংকর লুডো খেলে একদিকে।

একদিন এল উদয়শংকর। কনকলতাকে ডেকে বলল, "কাল ব্রেকফাস্টের পর আমার কেবিনে যেও। নাচ শেখাবো।"

পরদিন ব্রেকফাস্ট খাবার বেশ অনেক পরে উদয়শংকরের কেবিনে এল কনকলতা। সে তার কেবিন একা খুঁজে পাবে না বলে রবিশংকরকেও সংগে নিয়ে এসেছে। কনকলতাকে পৌঁছে দিয়েই রবিশংকর সরে পড়ল।

উদয়শংকর শুয়েছিল। কনকলতা আসতেই সে বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, "এত দেরী কেন? আমি তো ব্রেকফাস্টের পরেই আসতে বলেছিলাম?"

উদয়শংকরের রূঢ় স্বর শুনে বুক দুপ-দুপ করে উঠল কনকলতার। সে বেশ ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনি তো বলেছিলেন ব্রেকফাস্টের পর আসতে—মানে, খেয়েই যে আসতে হবে—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

উদয়শংকর বলল, "হ্যাঁ, ব্রেকফাস্টের পরেই আসতে হবে। কাল থেকে এক মিনিটও দেরী করবে না। ঠিক সময় আসবে। বুঝেছ?"

কনকলতা ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে।

প্রথম দিন কনকলতাকে হাতের তিন রকম মুদ্রা শেখাল উদয়শংকর। দ্বিতীয় দিন আরও তিন রকম। দেখিয়ে বলল, এগুলো ভাল করে করবার চেষ্টা করতে। কনকলতা ডেকে এসে রবিশংকরকে বলল, "এই রবু, দেখবি আয়—"

রবিশংকরের মোটেই দেখবার ইচ্ছে ছিল না কী শিখছে কনকলতা। সে দেখল তার মেজদা ডেকে বসে বসে একটা বই পড়ছে কিন্তু তিমিরবরণ এখন এখানে নেই। তিনি তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর কেবিনে বসে সরোদ বাজাচ্ছেন। রবিশংকর এদিক-ওদিক

তাকিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সেদিকে। তিমিরবরণ মাঝে মাঝে ডেকে বসেও বাজান। তাঁর বাজনা শুনতে ভীষণ ভাল লাগে রবিশংকরের।

প্রায় পনের দিন পরে এস এস গ্যাঞ্জেস নোঙর ফেলল মার্সেলস বন্দরে। দশ বছর আগে এই বন্দরেই এসেছিল উদয়শংকর প্রথম। সেদিন তার মনে জেগেছিল শিহরণ—অপরিচয়ের রহস্য তাকে দিশাহারা করে তুলেছিল। আজ তার মনে নিবিড় পরিচয়ের আনন্দ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কেননা একমাত্র সেই জানে এখানকার পথঘাট, নিয়মকানুন। আর সকলে নতুন, পরবাসীর মতন ভীরু, ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্থ।

মার্সেলস থেকে ট্রেনে সকলে যখন প্যারিসে এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়। কুয়াশায় ভেজা ভারী অন্ধকার নামছে। ভীষণ ঠান্ডা সেদিন। কুয়াশাও খুব ঘন। সিমকী এসেছে স্টেশনে, সঙ্গে তার মা ম্যাডাম বারবিয়েও আছেন। ওরা প্যারিসে একটা বাড়ি ঠিক করেছে এদের জন্যে।

কবে আবার দেশে ফিরে যাবে ঠিক নেই। এবার ইউরোপে দীর্ঘদিন বাস করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল উদয়শংকর। প্যারিস হবে তার নৃত্যদলের চিরস্থায়ী আস্তানা। এখান থেকে সে যাবে কণ্টিনেণ্টের নানা শহরে, নাচের পর আবার ফিরে আসবে এখানেই। তারপর এখান থেকে আবার যাবে সুযোগ মতন যেখানে হয়।

প্যারিসের বাড়িটা দোতলা। বেশ বড়। নিচের তলায় হলে চলবে নাচের মহড়া—

তিমিরবরণের ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা সংযোগে উদয়শংকরের প্রথম নৃত্য

বাজনার সঙ্গত। দু-আড়াই ঘণ্টার প্রদর্শনী হবে। প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে সেই মতন। উদয়শংকর এখন সেই ভাবনায় বিভোর। তিমিরবরণের সঙ্গে সে পরামর্শ করে সারাদিন। কেননা তার ওপরই অর্পণ করা হয়েছে সঙ্গীত পরিচালনার গুরু-দায়িত্ব।

তিমিরবরণ সুযোগ্য শিল্পী। তিনি এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছেন যে উদয়শংকরের রসবোধ অতি সূক্ষ্ম। কেননা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র, ভদ্র আসরে যেগুলির প্রবেশ নিষেধ, যেগুলি অবহেলিত এবং শুধু নিম্ন সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠানেই প্রচলিত, সেগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত উদয়শংকর। সে প্রকাশ্য মঞ্চে তার নাচের সঙ্গে ব্যবহার করবে ঢাক-ঢোল করতাল এবং পাখোয়াজ। তাছাড়া অভিজাত বাদ্যযন্ত্র সেতার এবং সরোদ তো থাকবেই।

উদয়শংকরের নৃত্যে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার প্রসঙ্গে রিনা সিংঘা ও রেজিনেল্ড ম্যাসি তাদের 'Indian Dances—Their history and Growth' বইতে লিখেছেন :

"His choreography was such that the existing classical ragas and tals would not have fitted it in their normal form. A certain amount of experiment was therefore necessary. He wanted music which was Indian, of a high quality without being too complex, and which would also allow for orchestration.

The challenge was accepted by Timirbaran, whom he commissioned to do this work. Timirbaran used on orchestra of fourteen, which included various kinds of stringed as well as percussion instruments . . . ."

"In terms of European music, fourteen instruments could hardly be said to comprise an orchestra, but for Indian classical music this is a very large number indeed, since this music is not based on harmony and so does not need a multiplicity of instruments which might easily endanger its particular unity. Since some of the ballets needed special sound effects as well, such as thunder, ploughing and harvesting, these too had to be devised."

প্রায় মাসখানেক পর বিষ্ণুদাস শিরালী লণ্ডনের পাট চুকিয়ে এসে উঠল উদয়শংকরের প্যারিসের বাড়িতে। তখন সেখানে রোজ নাচ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের জোর মহড়া চলছে সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা দুটো অবধি ক্রমান্বয়ে।

শংকরীপ্রসাদ (ক্রমশ)

শীতের রুক্ষতার মধ্যে... আপনার ত্বকে 'অকাল বসন্তের' ছোঁয়া লাগুক
নিভিয়া—সুস্থ, সুন্দর ত্বকের রহস্য !
অ্যাণ্ড নেফিউ-এর তৈরী

'খর স্রোতে নব আনন্দের'

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে দেবতারা মৃত্যুভয়ে ছন্দের মধ্যে আশ্রয় লইলেন এবং ইহা হইতেই ছন্দ শব্দের সৃষ্টি। ছন্দ বলিতে বিশেষ করিয়া বেদ না বুঝিয়া যদি একালে কথাটির এক সামান্য অর্থ ধরি তাহা হইলে উপনিষদের এই উক্তিটি কাব্যতত্ত্বের প্রথম সূত্র হিসাবে গ্রহণীয়। কাব্য-রস ব্রহ্ম-রসের সমতুল কথাটির তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে নাও বুঝিতে পার। 'বাক্য রসাত্মকং কাব্যং' কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে রস-তত্ত্বের কূট আলোচনা করিতে হয়। আর যদি বল কাব্য তোমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে যেন কাব্য সম্বন্ধে সার কথাটি বলা হইল। উপনিষদকার বলিলেন, দেবগণ মৃত্যুভয়ে তাড়িত হইয়া ছন্দের দুর্গে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ী হইলেন। একালে ইহার অর্থ এই যে কাব্য-সাধনা অমৃতের সন্ধান।

মধ্যযুগে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কাব্যে এই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য এই অমৃতের উৎস। কিন্তু আধুনিক যুগ বিচিত্র পথগামী হইয়া যেন বড় দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। মনে হয় যেন আমরা এক নতুন যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সে যুগে বৈষ্ণব কাব্যের রস ফুরাইয়া যায় নাই, সে যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। তবু যেন কোন নতুন কথা শুনিবার ইচ্ছা হয়, কোন নতুন সুরের জন্য উৎকর্ণ হই। সে নতুন কথা একজনের কথা নয়, সে নতুন সুরও একজনের সুর নয়। জীবনানন্দ দাশের কথায়—'এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়—কয়েকজন কবির যুগ।...এই নতুন কবিসাধারণসংঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান'। ('উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য' ১৩৫২, কবিতার কথা, ২য় সং ১৩৭০, পৃঃ ৩৮) এই কবিসাধারণ-সংঘের দুই অসাধারণ কবি জীবনানন্দ দাশ আর বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে যখন একটি সর্বভারতীয় পুরস্কার লাভ করিলেন, তখন গৌড়জন তাঁহাকে লইয়া কতখানি মাতিয়াছিলেন, তারে বেতারে পত্রে পত্রিকায় সভায় সমিতিতে তিনি কতখানি অভিনন্দিত হইয়াছেন জানি না। তবে অনুমান করিতে পারি খুব বেশী মাতামাতি হয় নাই। প্রথম কথা, বিষ্ণুবাবু বিনয়ী সদালাপী মানুষ হইয়াও যেন নির্জনতামুখী। বঙ্গ-দেশের সাহিত্য-শতদলের কোন কোন একটি দলেরও ধার ধারেন নাই। Thy soul was like a star, and dwelt apart কথাটির মধ্যে কবির আত্মস্থতার প্রশংসা থাকিলেও বলিতে হয় এমন apart থাকিয়া ইংরাজ কবি বড় লাভবান হন নাই। বিষ্ণুবাবু 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক' এই ভাবটি বোধ হয় আজও পরি-ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে লইয়া আমরা মাতিব কেন।

দ্বিতীয়ত, বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয় হইলেও একালের বাঙ্গালী-পাঠক প্রধানত উপন্যাস-রসিক। পৃথিবীর সব দেশেই কাব্যের চাইতে উপন্যাসের চাহিদা বেশী। তবে বঙ্গদেশে আজ উপন্যাসের বড় ছড়াছড়ি। আমাদের সকল মহৎ কথাই এখন বৃহৎ কথা। যদি সম্ভ্রান্ত কবিরূপে পরিচিত হইতে চাও আগে একটি গল্প বল। মহৎ কবি যদি নিছক কবি হইয়াও থাক অন্তত আজ একটি কাহিনী লেখ। ওই দেখ বাঙালী পাঠক আজ কথা-সরিৎ-সাগরে ভাসিতেছে। বিষ্ণুবাবু কেবলি কবি।

তৃতীয়ত আধুনিক বঙ্গীয় সমালোচক আধুনিক বঙ্গীয় কবিকে প্রায় এড়াইয়া চলেন। আর বিষ্ণু দে'র কোন কাব্য-গ্রন্থ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে এখনও স্থান না পাইয়া থাকে, তবে শীঘ্র তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে আশা করি না। আমাদের কাহারও হাতে টি এস এলিয়টের পাচনবাড়ি, কাহারও হাতে ডি লিটু-এর পাঞ্চজন্য, আবার কাহারও এক হাতে পাচনবাড়ি আর হাতে পাঞ্চজন্য, কিন্তু গোষ্ঠে বা রণক্ষেত্রে আমাদের কোন সমসাময়িক কবির নাম বড় উচ্চারণ করিতে হয় না।

তবে এই প্রসঙ্গে আসল কথা বোধ হয় এই যে বিষ্ণুবাবুর কথা কান পাতিয়া শুনিয়া মর্মে উপলব্ধি করিবার সময় আমাদের নাই। গত পাঁচিশ বছর ধরিয়া আমরা যে হট্টগোলের মধ্যে জীবন কাটাইয়া আসিতেছি তাহাতে বিষ্ণুবাবুর ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার রেশ আমাদের কানে পৌঁছাইতে পারে না। বঙ্কিমের যুগে

পশ্চিমের কণ্ঠস্বর বাঙালী শুনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বাঙালী শুনিয়াছে। একালে এক বিষম কলরবের মধ্যে যেন কোন একটি কণ্ঠস্বর আমরা স্পষ্ট শুনিতেছি না। অর্থাৎ আমাদের দেশে ডেমোক্রেসি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি কোথাও আমরা কোন একজনের কথা শুনিতে বা মানিতে চাই না। এদের কণ্ঠে যে অন্তরের কথা শোনা যাইতে পারে সে বিশ্বাস আমরা হারাইয়াছি। অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ হইতে আমাদের বড় আপত্তি। কেবল মুক্তকেরে ছন্দের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমাদের হয় মুক্তাক্তর নাই, অথবা আমরা নিজ নিজ ছন্দে নিজ নিজ মুক্তি খুঁজিতেছি। বিষ্ণুবাবু আমাদের সকলের জীবনের মৌল ছন্দটির স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন; তাঁহার কাব্য সেই অনুভূতির প্রকাশ। তাঁহার কথাঃ

সামগ্রিক এই ছন্দ অস্বীকারে বিপ্রকীর্ণ
রবিরশ্মি পুড়ে যাবে,
শুধু পাবে কোটিলোরা
ব্যর্থ অন্ধকারে ঘৃণা মৃত্যুর ধিক্কার।

তবে বিষ্ণুবাবুর অন্ধকারে ভয় নাই। তাঁহার আধুনিকতার শাশ্বত সত্যটিকে এই নিভীকতার মধ্যেই খুঁজিয়া লইতে হইবে।

গোধূলি বিবর্ণ হল।
অন্ধকার অদৃশ্য প্রতীক্ষা,
নিদ্রায় ও বিনিদ্র প্রয়াসে, প্রহরে প্রহরে
অনাগত সম্পূর্ণ দিনের।

যে নিরাশার ভাব লইয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি বিষ্ণুবাবুর কাব্যে তাহার প্রশ্রয় নাই। যে আশার কথা উপনিষদে, বৈষ্ণব কাব্যে, শাক্ত গানে, রবীন্দ্রনাথে সেই আশার কথা বিষ্ণুবাবুর কবিতায়। তবে উপনিষদ, বৈষ্ণব কাব্য শাক্ত গান রবীন্দ্রনাথের পরেও যে বিষ্ণুবাবুর কাব্য পড়ি তার কারণ এই যে, তিনি একালের বড় ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন। আধুনিক কবির বড় দায়িত্বও এইখানে। বিষ্ণুবাবু অন্ধকারে বিভূতি দেখিয়াছেনঃ

উত্তরে পশ্চিমে গ্রীষ্ম, পোড়া বালি,
বৈশাখে বা জ্যৈষ্ঠে
গ্রাম্য কাফি পুড়ে ছাই,
ঝরেছে সবুজ আম।
তবু আশা। আশা বাঁচে খাণ্ডবেরও পরে
মরুভারতীতে নামে শ্যাম, দেশী,
আঝোর আষাঢ়।

বিশিষ্ট কবির কোন কোন লাইন যেন মন্ত্রের মত কানে বাজিতে থাকে, আর উহার অর্থেরও যেন শেষ নাই। যতবার উচ্চারণ করি ততবার যেন নিবিড় হইতে নিবিড়তর ভাবের সঞ্চার করে। চরণটির একটি শব্দ যেন কত যুগের সাধনার অর্থ বহন করিয়া আনে। Empson সাহেবের Seven Types of ambigecity গ্রন্থের তত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে না মানিয়াও বলিতে পারি এই "ভারতী" শব্দটির এখানে বিচিত্র দ্যোতনা। ভারতী কি না বাক্যধ্বনি অর্থাৎ ভাষা। আবার ভারতী হইলেন ভাষাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী যিনি সরসিজাসনা। ঋগ্বেদে বহু স্থানে সরস্বতী সিন্ধুনদ অর্থে ব্যবহৃত। আবার কোন কোন স্থানে সরস্বতী দেবনদী। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে সরস্বতী বাক্ রূপে বর্ণিত এবং পরে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪১ সূক্তের ষোড়শ ঋকে সরস্বতী শ্রেষ্ঠ নদী। এমন সজল সরস্বতী বা ভারতীকে মরু-ভারতী বলা হইল। অন্যপক্ষে ভারতী শব্দের সঙ্গে মরু শব্দের সংযোগে একটি অভিনব ভাবের সৃষ্টি হইল। এই ভাবের উৎস বিষ্ণুবাবুর ইতিহাসবোধে। 'এ বড় অদ্ভুত রাজ্য, ছাব্বিশ বৈশাখে মরুভূমি'। প্রাচীন কবির ভগবতী ভারতীকে বা ভারত-চন্দ্রের ভরসা ভারতীকে আধুনিক কবি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিতে পারেন না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর ইতিহাসের খাণ্ডব-দাহে সব পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। কিন্তু তারপর আবার 'নামে শ্যাম' কথাটির মধ্যে কত ভাব ঘন নিবদ্ধ হইয়া আছে। শ্যাম অর্থে মেঘ, নবদূর্বাদল, আবার ইহার মধ্যে বৈষ্ণবের ইষ্ট দেবতা, চাই কি শাক্তের শ্যামা বা মাইকেলের 'শ্যামা জন্মদে'। দেশী দীপক রাগের ভার্যা এক রাগিণী। আর অঝোর আষাঢ় কথাটির অর্থ কোন বাঙ্গালী-পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। মুকুন্দরামের 'আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল' যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা বিষ্ণুবাবুর এই লাইনটির তাৎপর্য ধরিতে পারিবেন। এই আষাঢ়ের ধারায় নতুন আশার সঞ্চার, নতুন প্রাণের উদ্গম। সে প্রাণের আধার কোথায়? কবির উত্তরঃ

ছিন্ন জীর্ণ সব আয়ু। তবু আশা। আশাই ত মাতৃভাষা। কথাটি অবশ্য 'মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলাভাষা' কলিটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কবির বক্তব্য আরও গভীর। ভাষার মৃত্যু আত্মার বিনাশ। মানুষের অভ্যুদয় ভাষার অভ্যুদয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ-রাজ জনককে বলিলেনঃ 'বাগ্বৈ সম্রাট পরমং ব্রহ্ম'। কথাটির তাৎপর্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুঝাইতে পারেন। তবে সাধারণভাবে বুঝিতে পারি সমস্ত সত্তা, সমস্ত উপলব্ধির আধার হইল ভাষা। সার্থক ভাবের সাধনা সার্থক ভাষার সাধনা। যেখানে মনন সুন্দর, সেখানে উচ্চারণ সুন্দর। এই ভাষার সূত্রে আমাদের অন্তর্জগত বহির্জগতের সঙ্গে গ্রথিত। সেই গ্রন্থনাকে সার্থক করিতে হইলে—বিষ্ণুবাবুর কথায়—'মমতায় ব্যাপ্ত কর মন', 'প্রাত্যাহিকে মগ্ন কর মন', 'সততায় স্থির কর মন'।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলও সে কূজন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে টানে
ব... রণ
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেশাও সে নাচ,
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।

বিষ্ণুবাবুর কবিতার মর্মস্থলে পৌঁছাইতে হইলে তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য আগে বুঝিয়া লইতে হইবে। এ কথা অবশ্য যে কোন কবি সম্বন্ধেই বলিতে পারি। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর ক্ষেত্রে কথাটির বিশেষ মূল্য এই জন্য যে তাঁহার স্টাইল আমরা প্রায়ই আধুনিক বাংলা কাব্যের স্টাইলের সঙ্গে গুলাইয়া ফেলি। আবার কখনও বা তাঁহার স্টাইল এলিয়টের অনুসৃত এই স্থির বিশ্বাসে বিশ্লেষণের লেঠা চুকাইয়া দেই। অর্থাৎ বিষ্ণুবাবু এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত একথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হইবে। তিনি ইংরাজী

সাহিত্যে পণ্ডিত, কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট কলেজে তিনি উক্ত সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন দীর্ঘকাল, তিনি আধুনিক ইংরাজী কাব্যের বিশেষ করিয়া এলিয়টের কাব্যের অনুরাগী, তিনি এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৫৩), এলিয়ট সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধ ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্য-সমাজে অনুসৃত। কিন্তু তবু বলি ভাবে ও ভাষায় বিষ্ণুবাবুর কবিতা কোন অর্থে এলিয়টের কাব্যের প্রতিধ্বনি নয়। এলিয়ট নিজের একটি লাইনের সঙ্গে অপর কোন কবির একটি লাইন জুড়িয়া দেন এবং বিষ্ণুবাবুও ওইরূপ করিয়া থাকেন। অতএব বঙ্গীয় কবি ইংরাজ কবির মন্ত্রশিষ্য এমন যুক্তি সাহিত্য-সমালোচনায় মারাত্মক। এই যুক্তির বড় বিপদ এই যে, ইহাতে মনে হইবে বিষ্ণুবাবু শব্দের কারুকার্য লইয়া ব্যস্ত, নিজস্ব ভাবনার এক সার্থক স্বতন্ত্র প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। আচার্য সুকুমার সেন বলেন: 'জীবনানন্দের কবি প্রকৃতিতে হৃদয়াবেগের উত্তেজনা ও অনুভবের তীক্ষ্ণতা স্বভাবতই প্রবল। বিষ্ণুবাবুর কবি প্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুর পথ-কাহী বুদ্ধিরই অনুসরণ করিয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিয়টের কৌশল স্পষ্টভাবে অনুসৃত।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪খঃ, ৩য় সং ১৯৭১ পৃঃ ৩৭৬) একথার অর্থ বোধ হয় দাঁড়াইতেছে এই যে বিষ্ণুবাবু ভাবের ঘাটতি বিদ্যা দিয়া পূরণ করিয়াছেন এবং এই বিদ্যা নির্ভরতার ফল স্বরূপে এলিয়টের রচনা-ভঙ্গির অনুকরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইংরাজী কাব্য পাঠ করিয়া আমরা কতখানি আনন্দলাভ করিয়াছি জানি না, কিন্তু উক্ত কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা বহুলাংশে বিপর্যস্ত। গত শতাব্দীতে আমরা বলিতাম মুকুন্দরাম বাংলার চসার, বঙ্কিম বাংলার স্কট, মাইকেল বাংলার মিল্টন বা বায়রন। এই শতাব্দীতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে শেলীর সঙ্গে তুলনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বিষ্ণুবাবুকে এলিয়টের সঙ্গে জড়াইয়া লইবার পক্ষে 'প্রমাণ'ও বড় কম নাই।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে সমালোচনার একটি বিশিষ্ট কাঠামো নির্মিত হইয়া আছে। আমরা যখন আমাদের আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় অগ্রসর হই তখন ওই কাঠামোটি যেন বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করি। আমাদের আধুনিকতা যে বিশেষভাবে আমাদের নিজস্ব আধুনিকতা হইতে পারে এই বিশ্বাস যেন আমাদের এখনও হয় নাই। আমাদের প্রাচীন যুগ প্লেটো বা ইস্কিলাসের যুগ হইতে ভিন্ন; আমাদের মধ্য যুগ একোয়াইনাস্ বা দান্তের যুগের সঙ্গে সম্পর্কহীন; অতএব আমাদের আধুনিকতা দেশের আধুনিকতা অবশ্যই হইতে পারে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এই কথা যেমন আমরা ইউরোপীয় হিউম্যানিজম্ হইতে আমদানি করি নাই তেমন একালে আমাদের কোন আধুনিক বোধের জন্য ইউরোপীয় মডার্নিটির খোঁজ লইতে হয় না। বিষ্ণুবাবুর আধুনিকতা একান্তভাবে বাঙ্গালী কবির আধুনিকতা। তিনি ইংরাজী বই পড়িয়া আধুনিক হইতে শেখেন নাই।

তবে মুশকিল এই যে গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী কাব্যে এমন সব কাণ্ড হইয়াছে যে, তাহা লইয়া একটু আলোচনা না করিলে মনে হয় আমরা আধুনিকতা হইতে বড় দূরে সরিয়া আছি। আর ইংরাজী কাব্যে ও কাব্য-চিন্তায় আধুনিকতার দুই প্রবক্তা এলিয়ট এবং হিউম-এর প্রবচনগুলি যেন আমাদের কাছে এক নতুন কাব্যতত্ত্বের সন্ধান দিল। ১৯১৩ সালে হিউম আধুনিক কাব্যের প্রফেট্ হইয়া লিখিলেন

লা সহিতেই তম, পূর্ব-ইতিহাস। নুবাদ, একান্তভাবে বাঙালীজীবনের ধুনিকতার কবি। তিনি কবি বলিয়াই ধুনিক, আধুনিক বাঙালী কবি নন।

বিষ্ণুবাবুর আধুনিকতার মহত্ত্ব এই যে বিশ্বজীবনের শাশ্বত সত্যে দৃঢ়-মূল। আধুনিকতাকে কোন নূতন আধুনিকতা দিয়া উন্মূল করিতে পারিবে না। ক্রমে গতিতে এক সচ্ছল একতান'। এই একতান বাবুর কাব্যে বিচিত্রভাবে বাজিয়া উঠেছে। তাঁহার কাব্যের মূল-পদটি নি আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি হার আধুনিকতার মর্ম বুঝিয়াছেন। হারা সার্থক আধুনিক কাব্যকে সাম্প্রতিক বশ্য ও অন্ধকারের কাব্য হিসাবে গ্রহণ রিয়াছেন তাঁহারা বিষ্ণুবাবুর অন্ধকার-বোধের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা নি না। যাঁহারা তাঁহার জীবন-দৃষ্টি বা মাজ-দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এই অভিনবত্ব দেখিয়াও বোধ হয় স্বীকার করিবেন না। আর যাঁহারা তাঁহাকে এলিয়টীয় ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের কবি বলিয়া গণ্য করিতে ন তাঁহারাও এদিকে সহজে দৃষ্টি দিবেন না। অথচ তাঁহার জীবন-দৃষ্টির মূলে থেটি ধরিতে না পারিলে আমরা এই মার্ক্সবাদী এলিয়ট-ভক্ত কবিকে লইয়া বিষম গোলে পড়িব। 'পৃথিবীর বৃহত্তম নাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিয়ট' এই প্রশ্ন যিনি করিয়াছিলেন তিনি কার্ল-মার্ক্সকে দিয়া কি ভাবে বিংশ শতাব্দীর পোড়ো জমি চাষ করাইয়া লইবার কথা ভাবিয়াছিলেন তাহা কবে কোন 'বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য' তাঁহার 'থীসিসের কেতাবে' দেখাইয়া দিবেন জানি না। মার্ক্সীয় মতবাদ ও এলিয়টের কাব্য যে বিষ্ণুবাবুর মনোজীবনে প্রবেশ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অর্থে দান্তে একোয়াইনাসের দর্শন গ্রহণ করিয়াছেন সেই অর্থে বিষ্ণুবাবু মার্ক্সীয় দর্শনকে তত্ত্বপক্ষে কবি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। অন্যদিকে দান্তের ভার্জিল-প্রীতি সত্ত্বেও যেমন ডিভাইন কমেডি ঈনিডের প্রতিধ্বনির বিষ্ণুবাবুর এলিয়ট প্রীতি সত্ত্বেও তাঁহার কাব্য ওয়েস্টল্যাণ্ডের প্রতিধ্বনি নয়। বিষ্ণুবাবুর **সেই অন্ধকার চাই** (১৯৬৬) কাব্য-গ্রন্থে যে অন্ধকারের অনুভূতি তাহা মার্ক্স বা এলিয়টের জগতে খুঁজিয়া পাই না :

অন্য অন্ধকার আছে? তা-ও চেনা,
থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল
স্মৃতির হর্ষে ছায়
কন্দরায় আদিম গর্ভে যেখানে করেছে
মহা ভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।

থেকেছি সে অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই
শরীরে, হৃদয়ে,
সেই মনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, দৃষ্টিময়,
মধুর দয়াল ;
মৃত্যু নয় দীন হীন, আপাতিক, নয়
সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক
শোষণে ভয়াল।

এমন হিরণ্যগর্ভ অন্ধকারের কথা এলিয়টের কাব্যে কোথাও নাই, ওয়েস্টল্যাণ্ডে নাই, ফোর কোয়ার্টেট্‌সেও নাই। ওয়েস্টল্যাণ্ডের শেষ কথা শান্তির প্রসঙ্গমাত্র, শান্তির উপলব্ধি নয়। আর ফোর কোয়ার্টেট্‌সের শেষ কথা এংলিকান সালভেশনের কথা :

And all shall be well and
All manner of things shall be well.

কথাটি চতুর্দশ শতকের ইংরাজ মিস্টিক জুলিয়ানার এক উক্তির প্রতিধ্বনি :
'Sin is behovabil [inevitable], but all shall be well and all shall be well and all manner of things shall be well.'

এ তত্ত্ব sin and redemption-এর তত্ত্ব। ইহার মধ্যে 'হিংস্রতাও স্বাভাবিক, দৃষ্টিময়, মধুর দয়াল' এই ভাবের লেশ মাত্র নাই। আর ফিকেস্ট লাল মার্ক্সবাদীও এই স্বাভাবিক দৃষ্টিময় মধুর দয়াল হিংস্রতার তত্ত্বকে অমার্জনীয় মিস্টিক প্রলাপ বলিয়া তুচ্ছ করিবেন। আর যদি বলি বিষ্ণুবাবুর 'মার্ক্সীয় চিদম্বরে, মননের সম্পূর্ণ স্বভাবে, সশরীরতায়', 'প্রত্যক্ষের সত্যময়তার মধ্যেই এই স্বাভাবিক দৃষ্টিময় মধুর দয়াল হিংস্রতার অনুভূতি সম্ভব তাহা হইলে বুঝিব হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, সূফী মিস্টিসিজমের মত এক ধরনের মার্ক্সীয় মিস্টিসিজম্‌ বাংলা কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। অন্ততপক্ষে কোন মার্ক্সবাদী বোধ হয় একথা স্বীকার করিবেন না।

বিষ্ণুবাবুর এই হিরণ্য-গর্ভ অন্ধকার-বোধের মূলে তাঁহার প্রসন্ন স্থির নির্মল আস্তিক্যবোধ। ইহার মধ্যে মধ্যযুগীয় তুকা বা তুলসীর বা আমাদের কালের রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-প্রেম নাই। তবু বলিতে হয় ইহাই আধুনিক আধ্যাত্মিকতা। আর আমাদের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সেরা তত্ত্ব শংকর অদ্বৈতেও বা ঈশ্বর-প্রেম কোথায়? ঈশ্বর-প্রেমিক চিনি খাইতে ভালবাসে; ঘোর অদ্বৈতবাদীর পুরুষার্থ চিনি হওয়া। অতএব অদ্বৈতবাদীর আধ্যাত্মিকতা ঈশ্বর-পাগল বৈষ্ণব বা শাক্ত বা শৈবের আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরভক্ত মানুষ ঈশ্বরের অসীমতা মানিয়াও তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুজগতে অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে লইয়া আসিতে চায়। তাহার ঈশ্বর প্রতিমায় মূর্ত, মন্দিরে অধিষ্ঠিত, ইতিহাসে সক্রিয়। আধুনিকের আধ্যাত্মিকতা ব্রাত্যের আধ্যাত্মিকতা। ইহাতে

মিনার নাই, মন্দির নাই, মঠ নাই, পূজা নাই। ইহার রক্ত ইতিহাসের সত্তা হইতে জাত, ইহার ধর্ম মানব-প্রকৃতি-শিল্প-স্বপ্ন-প্রেম। ইহাতে রক্ত-মাংস অনুচ্চারিত, ঈশ্বর সশরীরে অনুপস্থিত। কিন্তু ইহা সত্য ও আনন্দের সন্ধানী বলিয়া আধ্যাত্মিক। বিষ্ণুবাবু এই সত্য ও আনন্দের সন্ধানী, আধ্যাত্মিক কবি। মাইকেল ব্রজাঙ্গনাকাব্য লিখিয়াও বৈষ্ণব কবি হন নাই। বিষ্ণুবাবু বুঝিয়াছেন 'পদাবলী ধূয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে'। তাই তিনি আর একখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লেখেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন 'রবিরশ্মি সম্প্রসারণ'। তাই তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের রেশ টানিবার কথা ভাবেন নাই। অথচ বৈষ্ণবকবি ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ের ধন।

দেখেছি গাড়ুখাই-পারে দীঘি, সেই
শ্যাওলাপড়া পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালাক্ষী
আঁকিয়ে অম্বর,
জয়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তনের
সিঁদুরে রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মন্দিরের
নক্ষত্র পাথর।

এই মন্দিরের নক্ষত্র পাথর নবীন কবির হৃদয়ে কোথাও বাজিতেছে, তাঁহার নতুন সঙ্গীতের আরোহণ-অবরোহণের মধ্যে কোথাও মিশিয়া আছে।

চোখের জীবন ফেরে, দেখি মগ্ন
যুগল বিগ্রহ
বেশভূষাহীন, শুধু কাঁচা পাথরের বেদী
রাধা আর ঘনশ্যাম,
নেই পূজার গৌরব, অথচ কোথায় গন্ধ
আরতির শঙ্খারের পাথরে স্তম্ভিত
কোথায় সৌরভ ?

সেকালের স্বাদ-গন্ধ একালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, একালের স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে একত্র হইয়াছে। 'একাল আর সেকাল মেলে কালের বিবর্তনে।'

রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসের এই ডায়ালেকটিক-বিধানে নবীন কাব্য উপস্থিত বিষ্ণুবাবু বিপরীত এক অভিমত। তত্ত্বটি বুঝাইয়াছেন তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় (রচনা ৯ মে ১৯৬১)।

স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষার রাঙে
যে তীক্ষ্ণতা
সে তীব্র বিষণ্ণ হর্ষে কেন তুমি হবে
ম্রিয়মান ?
জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্ফুট চেতনা
যে আবেগে মূর্ত, তাতে পূরবী ই
মনকল্যাণ।

এই 'পূরবীই ইমনকল্যাণ' কথাটির মধ্যে বিষ্ণুবাবুর রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে মনোভাব সূত্রাকারে উপস্থিত। পূরবী সন্ধ্যার পূর্বে বা দিনের চতুর্থ প্রহরে গেয়। ইমনকল্যাণ রাত্রির প্রথম প্রহরের গান। কিন্তু কান পাতিয়া শোন জীবনের মহাসঙ্গীতে যেন কত রাগ কত রাগিণী এক ঐকতানে মিলিত হইয়াছে।

একটি অখণ্ড সত্য অভিজ্ঞতা,
স্মায়ুতে বিকীর্ণ
হবে, তাই এক হয় ইছামতী অথবা
তিতাস—
এমনি হাজার নদী—গঙ্গা পদ্মা কোন বা
কিউল।
সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে কোথা, সংকল্পেরই
স্মৃতিতে অথবা
বাঁধা যায় নিজেকে—ও শুদ্ধ কাব্যে
নব্য পরম্পরা।

কাব্য-জগতের এই অখণ্ডতার কথা

লয়ট বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার adition and Individual Talent বন্ধে 'the historical sense npels a man to write not merely th his own generation in his bones, t with a feeling that the whole of e literature of Europe from Homer d within it the whole of the literare of his own country has a simulneous existence and composes a nultaneous order. এই তত্ত্বটি বিষ্ণুবাবু ঐতিহ্য ও শিল্পে আধুনিকতার সমস্যা ন্থে তাঁহার নিজস্ব ভাবে বুঝাইয়াছেন। বে আধুনিক কাব্যের কালজয়িতার থা বিষ্ণুবাবু যেমন বুঝাইয়াছেন মেন এলিয়ট বুঝাইতে পারেন ই। তাঁহার আধুনিকতার উত্তর-রির পূর্বসূরির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য তিহাসিক সূত্রে যুক্ত। আধুনিকের নৈতি-তনার মধ্যেও এক আনন্দ এবং সেই নন্দের উপলব্ধিতে আধুনিক কবি সর্ব-লের কবি।

অতএব চোখ মেলে ধূসর নৈতিতে
বিশ্ববীক্ষা
চর্চা করি, ধৈর্যভরে, যাতে উত্তীর্ণ বিবাদে
বর্ণ্য আনন্দ শুনি, অর্ধমৃত
বিধ্বস্ত শহরে
দায় শুধি গ্লানির আকাশে গ্রাম গ্রামান্তরে
মানবঋণের
আনন্দেই, কিংবা তারই নামান্তরে—
ঐতিহাসিক বিষাদে,
যুক্তিক উল্লাসে, তীব্র, আবিশ্ব উদাসী
ভারতীয় সঙ্গীতের মতো।

এ কালের সঙ্গে সে কালের এই অন্বয়বোধ বিষ্ণুবাবুর অন্বয়-মুখী চেতনার একটি দিক মাত্র। কাব্য দর্শন ইতিহাস, বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান মূলত অন্বয়ের অন্বেষণ। সংখ্যা হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্য বা ব্যাপকের অবিনাভাব বা সঙ্গত সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বিধৃত তাহার আশ্রয় এই অন্বয়ের তাৎপর্য শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ বুঝাইবেন। সাধারণভাবে বুঝিতে পারি যাহা অনন্বিত তাহা অর্থহীন। যাহা অন্বিত তাহা অর্থপূর্ণ। যেমন শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্বয়ে কথা, তেমন চিত্তের সঙ্গে বস্তুর অন্বয়ে ভাব। বেদান্তের শেষ কথা 'তৎ ত্বম্ অসি' কথাটিও এক অন্বয়ের কথা। 'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে। মুক্ত কর হে বন্ধ' ইহাও সার্থকভাবে অন্বিত হইবার জন্য প্রার্থনা। আধুনিক মানুষের পক্ষে এই অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। সে যেন এক বিচ্ছিন্ন বিভক্ত জগতের মানুষ। সেখানে কিছুই যেন কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এমন ছিন্ন ভিন্ন জগতের অর্থহীনতা সেই আধুনিকেরা alienation বলেন। এই alienation এ অন্বয়ের অভাব। বিষ্ণুবাবু alienation-এর কবি নন। তিনি অন্বয়ের কবি। একালে alienation-এর বড় ধুম। সেই ধুমে বিষ্ণুবাবু অনুপস্থিত। তাঁহার অন্বয়বোধের প্রকাশ তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে।

আমারও অভিষ্ট তাই
আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যাহের ইন্দ্রধনু ভেঙে থাক স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝরনা
সহাস জীবনে এনে দিক্
সহজ আনন্দ দিক্ মানবিক
দুঃখের করুণা
বাঁচার সকল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙিন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ
দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস
এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে-চিলে-শালিকে-টিয়ায়
ট্রামে-বাসে পায়ে পায়ে গ্রামান্ত-শহরে
কলে-মিলে।
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই অনিন্দ্য জঙ্গমে
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তানে
বাষ্পে-বাষ্পে ছাপে রঙে-রঙে
আমাদেরও চিদম্বরম।

এই অম্বরমুখিতা বিষ্ণুবাবুর কাব্যকে উপনিষদের কাছাকাছি লইয়া আসিয়াছে।

অনন্বয়ে ঘাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজো, হিরণ্ময়
সত্যের ঘাঁটিতে
উন্মত্ত নির্ঝরে মথে
অতল জীবন বোধে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের
বাস্তব বসুধে।

কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ধূসর
মাটিতে আঁকরে
নীলে নীলে সোনালী জলের স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে

—পিপড়ের মতন নয় খড়ি নিয়ে
কিংবা ফানুস—

বিস্মৃত অতীত নিয়ে।
অস্তিমের অমর পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রেখে।

বিষ্ণুবাবুর ভাষার বা স্টাইলের আধুনিকতা তাঁহার ভাবের আধুনিকতার অনুসারী। তাঁহার নতুন ভাব যেমন বাংলা কাব্যের শাশ্বতভাবের সঙ্গে যুক্ত তাঁহার ভাষাও তেমন বাংলা কাব্য-ভাষার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার স্টাইলের অনন্যতার মধ্যে স্বেচ্ছাচারের চিহ্ন মাত্র নাই। ভাষার শৌখীন নকামো তিনি সযত্নে এড়াইয়াছেন। 'নববধূ-ভাষা ছাড়ো মন'।

সাবেক নূতন ছন্দে মিলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, গানে কবিতার ভাষায়।

মাইকেল বলিতেন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য বুঝিতে হইলে তাঁহার কাব্য বারম্বার পড়িতে হইবে। My advice is Read, Read, Read, Teach your ears the new tune and then you will find out what it is. বিষ্ণুবাবুর স্টাইলের মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে এক একটি কবিতা বহুবার পড়া চাই। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চালটা ধরিতে যেমন সেকালের বাঙালীর কিছু সময় লাগিয়াছে বিষ্ণুবাবুর ভঙ্গীভনিতির চালটাও ধরিতে একটু মনোযোগের প্রয়োজন। তিনি বাংলাভাষার স্বধর্ম বুঝিয়া তাহাকে নিজের স্বধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। এই মিলনের ফলে যে স্টাইলের সৃষ্টি তাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই স্টাইলে পল ভালেরি-কথিত ভাষার অন্তর্নিহিত ভাষা দিয়া কবি তাঁহার কথা বলিতেছেন। শব্দের এই বাঙ্গার্থ যে কোন সার্থক কাব্যের প্রাণবস্তু। কিন্তু আধুনিক কবির পক্ষে ভাষার সাধনা এক কঠিন সাধনা। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা কত বিচিত্র কথা কত বিচিত্র ভাবে বলিয়াছে। এই ভাষাকে দিয়া নতুন কথা নতুন ভঙ্গীতে শুনাইতে হইলে শব্দের মধ্যে এক নতুন সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিতে হয়। শব্দের বাক্যে তখন এক নতুন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। চিত্রশিল্পী দেগা একদিন মালার্মেকে বলিয়াছিলেন: 'তোমাদের এই কবিতা-রচনা এক নারকীয় ব্যাপার। কত সব চিন্তা মনে আসে তবু কিছুতেই যেন তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।' মালার্মে উত্তর করিলেন, 'কাব্যের উপজীব্য চিন্তা নয়, শব্দ'। আধুনিক সাহিত্যে শব্দে শব্দে বিয়ের নিত্য নতুন ঘটকালি, শব্দের সঙ্গে শব্দের নিত্য নব-পরিণয়, ভাষার দেহে নব নব যৌবনের উদ্গম।

উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে
বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খেলা রাখি,
গানে গানে নেয়ে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই
রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে,
হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত
নব-আনন্দের।

এই খরস্রোত নব-আনন্দের হাজার ছন্দ, ইহার বিচিত্র বীচিভঙ্গ, ইহার হাস্য, লাস্য, ইহার দুকূলপ্লাবী প্রবাহ আবার ইহার মন্থর কুটিল গতি, ইহার অপ্রত্যাশিত আবর্ত আবার ইহার ধীর শান্ত ধারা, ইহার মুখরতা, নীরবতা, ইহার গাম্ভীর্য, ইহার চপলতা বাংলা কাব্যে এক বিশিষ্ট স্টাইলের সৃষ্টি করিয়াছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তগান, বাউলগান মাইকেলের কাব্য, রবীন্দ্র কাব্যের পরই এমন এক পরিশীলিত পরিমার্জিত স্টাইলের আবির্ভাব সম্ভবপর। আধুনিকতার বনিয়াদ এক সমৃদ্ধ অতীতে। বিষ্ণুবাবুর স্টাইলের অভিনবত্ব বাংলা কাব্যের এই সমৃদ্ধির ফল।

যে কোন যুগের যে কোন কবির প্রধান কর্ম তাঁহার ভাবকে ভাষার অতীতে লইয়া যাওয়া। প্রাচীন ভারতের অলংকার-তত্ত্ব, রস, ধ্বনি, বক্রোক্তি লইয়া সকল আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপের প্রাগ্ দ্যুলীয় মতবাদ ওই একই কথা বিভিন্ন ভাষায় বলিতেছেন। কাব্যের ভাষা আমাদের পরিচিত ভাষা হইয়াও ঠিক সেই ভাষা নয়। কাব্যে ভাষা সঙ্গীতে পরিণত। প্রত্যহের ভাষার প্রয়োজন তাহার তথ্যময়তার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। কাব্যের ভাষা অভিধার্থকে ছাড়াইয়া একটি নতুন অর্থের সন্ধান দেয়। কাজ-কর্মের ভাষা কাজকর্মের সঙ্গে ফুরাইয়া যায় কাব্যের ভাষা এক অবিনশ্বর শব্দলোকের সৃষ্টি করে। কবি কি পদ্ধতিতে একটি লৌকিক-ভাষার আশ্রয়ে একটি অলৌকিক ভাষার সৃষ্টি করেন সে বিষয়ে আলোচনা সম্ভব, সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবে এই ভাষা হইতে ভাষার ঊর্ধ্বে উঠিবার কাজটি আধুনিক কবির পক্ষে বড় কঠিন কাজ। প্রাচীনতম কবি একটি ভাষার ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহার স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলিলেন। তাঁহার পরের কবি দেখিলেন প্রাত্যহিক ভাষা ও কাব্যের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহু বিচিত্র বাক্য-রীতির সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বিতীয় কবি ভাষার এই নতুন ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করিলেন। ভাষার প্রাচুর্যে তাঁহার কাজ বাড়িল। এই ভাবে বিবর্তন-শীল প্রাত্যহিক ভাষা এবং বহুযুগের বহু কবির বিচিত্র ভাষা আধুনিক কবিকে যেন এক ভাষা-জালের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। সে জাল স্বর্ণজাল হইলেও কবি এই প্রাচুর্যের মধ্যে দিশাহারা বোধ করেন। ভাষার এই প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁহাকে এক নতুন নিজস্ব ভাষার সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর বর্তমান যুগে, বিশেষভাবে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া কাব্যের ভাষা লইয়া যে এত তর্ক বিতর্ক তাহার প্রধান কারণ ভাষা ও সাহিত্যের এই বিচিত্র সমৃদ্ধি। গত একশত বছর ধরিয়া আবার যে ভাষা লইয়া এক্সপেরিমেন্ট-এর কথা হইতেছে তাহাও ভাষার এই পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের পরিণাম। কবিকে এখন ভাবিতে হয় তিনি কোন পথে কিভাবে তাঁহার নিজস্ব ভাষাটি খুঁজিয়া পাইবেন।

বিষ্ণুবাবু এই স্টাইলের সাধনায় সিদ্ধ। এই সিদ্ধি আধুনিক বাংলা কাব্যের এক বিশিষ্ট কীর্তি। দেশী বিদেশী সাহিত্যের বহু বিচিত্র কাব্য-রীতির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, কলা ভাষার জিনিয়াস্ বুঝিয়া এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কাব্যের মিউজিককে অভ্যস্ত শিক্ষিত বাঙালী কাব্য-পাঠকের কানের রুচি মনে রাখিয়া বিষ্ণুবাবু তাঁহার নিজস্ব স্টাইল গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই স্টাইলের লক্ষণ [illegible] কথায় নির্দিষ্ট করা শক্ত। গণিতজ্ঞ [illegible] যেমন গণিতের মূল প্রকরণে [illegible]রের ফলে বিভিন্ন অংক বিভিন্ন প্রণালীতে কষিতে পারেন বিষ্ণুবাবু সেইরূপ ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার মূল রীতি রক্ষা করিয়া বিষয় অনুসারে তাঁহার স্টাইলকে চালিত করেন। স্টাইল সম্বন্ধে কোন মতবাদের অনুশাসন মানিয়া তিনি একটি লাইনও লেখেন নাই। বস্তুত তাঁর স্টাইলের একটি বিশেষ লক্ষণ ভাষার ও ঢংএর সারপ্রাইজ্ বা চমক। উনি যে কখন কি কথা কোন ভাবে বলিবেন তাহা কে বলিবে। এ চমক প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের চমক নয়, এমন কি মেটাফিজিকাল কবিকুলের উইটও নয়। এ যদি শুধু কথার চমক হইত তবে একে চটকও বলা যাইত। এই চমকে আমাদের যে বিস্ময় তাহা কবির অনুভূতির বিস্ময় হইতে অভিন্ন।

যাই বল তুমি, পরগাছা নই, বটে
পিপুলে না হোক শালে অন্তত উপমা।
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উংসে
তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে।
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।

প্রথম কথা, একটা অন্ত্যমিলের প্রত্যাশা জাগাইয়া ভিন্ন চালে স্তবকটি শেষ করিলেন। অথচ অন্ত্যমিলের অভাবে আমাদের আশাভঙ্গ হইল না। এক অদৃশ্য তন্তুতে অন্ত্যানুপ্রাস যেন এই পাঁচটি লাইনকে একত্র করিয়া রাখিয়াছে। শেষে মনে হয় মিত্রাক্ষরে এমন অখণ্ডতা সম্ভব

হইত না। দ্বিতীয়ত, 'যাই বল তুমি, পরগাছা নই' পদটি একটু হাল্কা ধরনের কথায় আরম্ভ বলিয়া মনে হয়। 'পিপলে না হোক, শালে অন্তত উপমা' কথাটিও যেন একটু চটুল। কিন্তু তারপর 'পাথরে মাটির লাল নীরসতা যেন বড় অতর্কিতে একটি গম্ভীর প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিল। আবার 'উৎস'এর মত তরল শব্দটি লাল নীরসতাকে এক নতুন অর্থ দিল। তৃতীয় স্তরে দেখি ওই 'উৎস' শব্দটির হাত ধরিয়া সহসা সরস পল্লব কোথা হইতে যেন উঠিয়া আসিল। সর্বশেষে ঋজু কঠিন জীবনের অপ্রত্যাশিত পূর্ণতা পাঁচটি লাইনের অর্থটিকে ফুটাইয়া তুলিল। ভাষার এই প্যারাডক্স ভাবের প্যারাডক্স-এর জন্য অপরিহার্য।

কিন্তু এই সারপ্রাইজ আবার কখনো কখনো বড় সহজে বুঝি না।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ

আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ।

এ-কূলে ও-কূলে আমাদেরই বর্তমানে কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে।

আমরা পৃথিবীর মানুষ বেশ একটি সরল কবিত্বময় কথা। আর এ কথার মধ্যে কোন চমকও নাই। অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ কথাটিতে কবিত্বের মাত্রা একটু চড়িল; কিন্তু এও প্রায় ক্লিশে। কিন্তু তবু লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম যে 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত' ইত্যাদির রেটোরিক ইহাতে নাই। কিন্তু যে কবি-সুলভ কথা দুইটি প্রথম দুই চরণে পাইলাম তাহা যেন এক নতুন অর্থ পাইল স্তবকটির তৃতীয় চরণে। স্রোতের এপারে ওপারে যে দুই কলি তা 'আমাদেরই বর্তমান'। টাইম ও স্পেসের এক তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জরিপ বা হিসেবের প্রশ্ন উঠিল। শেষ চরণের প্রথম কথাটি যেন এক হিসাবের খাতা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে—'কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও'। এই সারপ্রাইজ গোটা স্তবকটির মধ্যে যেন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করিল। আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কিছু একটা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরিশেষে আসিল 'বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে'। স্রোত বা এ-কূল ও-কূলের সঙ্গে বৃষ্টি কথাটির এক সম্পর্ক ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু আর্তেসীয় জল কি বস্তু? ফ্রান্সের আর্টোরিস নামক অঞ্চলে এক ধরনের কূপ খনন করা হয় যাহা হইতে জলের চাপ জল আপনা হইতেই ঊর্ধ্বমুখী হইয়া উৎসারিত হইতে থাকে। এই কূপ এখন আর্টেজিয়ান ওয়েল নামে পরিচিত। বাংলায় আর্তেসীয় জল কথাটি বেশ তরল, মধুর। তাছাড়া আর্তেসীয় কথাটির মধ্যে আর্ত শব্দটির দ্যোতনাও একটু আসিয়া পড়ে। 'বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে' কথাটি 'কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও' কথাটির আটপৌরে ভাবটি একেবারে মুছিয়া ফেলিল।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, এই রকম একটি অপরিচিত বিদেশী শব্দ কবিতায় ব্যবহার করার পক্ষে যুক্তি কি? একথার উত্তরে প্রথমে বলিতে হয় দেশী শব্দ অর্থাৎ আমাদের বাংলা শব্দও, বিশেষ করিয়া তদ্ভব শব্দও কখনো কখনো অনুরূপ দুর্বোধ্য হইতে পারে। মাইকেলের 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে মহামহোপাধ্যায় হইতে হয়। কিন্তু কথাটি কানে এমন সুন্দর বাজিয়া ওঠে যে অর্থটি জানিয়া লইবার ইচ্ছা হয়। অথচ সমুদ্র, তীরও ঢেউ শব্দের স্থলে যাদঃপতি, রোধঃ এবং চলোর্মি শব্দের ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলায়ও পাইব না। এই রকম শক্ত শক্ত, অন্ততপক্ষে অপ্রচলিত শব্দ বিষ্ণুবাবু বড় কম ব্যবহার করেন নাই। নেআণ্ডরতাল (বর্বর-ইংরাজী Neander thal), সেংপ্রাস (সর্পরিহাস), বুভুৎসা (জিজ্ঞাসা), এই রকম বহু শব্দের প্রয়োগ বিষ্ণুবাবুর কবিতায়। ইহা পেডান্ট্রিও নয়, এলিয়টের অনুকরণও নয়। ভাষার চমৎকারিত্বের জন্য কবি অচলিত, বিদেশী শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, প্রয়োজন হইলে এক-আধটি শব্দ সৃষ্টি করিয়াও লইতে পারেন। বিভিন্ন যুগের অলংকারিকেরা কবিকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিতেছেন। এরিস্টটল তাঁহার পোয়েটিক্স গ্রন্থে বলেন: 'Out-of-the-way usages give dignity and transform the common speech; by out-of-the-way I mean loan words, metaphors, extended words and all departures from the standard.' (অনুবাদ, L J Potls, ১৯৫৩, পৃ ৪৯) এরিস্টটল তাঁহার রেটোরিক নামক গ্রন্থে আরও বলিলেন:—

'A foreign air must be given to the language; for people are admirers of what is far-off, remote, and all that is wonderful is agreeable' (অনুবাদ: E M Cope, ১৮৭৭, ৩য় খঃ পৃঃ ১৪-১৫)। ডেমেট্রিয়াস তো বলিয়া বসিলেন 'the usual and familiar diction excites contempt. (on style, অনুবাদ: T A Maxon, ১৯৪৯, পৃ ২২০)। হোরেস বলেন:

'It has been, and ever will be allowable to coin a word with the stamp in present request. (Art of Poetry, অনুবাদ: C Smant, পৃঃ ৪৬)। জর্জ চ্যাপম্যান লক্ষ্য করিলেন:

chancer had more new words for his time than any man needs to devise now, ('A Defence of Homer,' G. G. Smith সম্পাদিত Elizabethan Critical Essays, ১৯০৪, ২য় খঃ পৃঃ ৩০৫)। ড্রাইডেন তাঁহার 'Discourse of Epic Poetry' প্রবন্ধে লিখেছেন:

'when I want at home I must seek abroad. বায়রনের দুটি লাইন এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে:

Then fear not, 'tis needful to produce

Some term unknown, or absolete in use.

বিষ্ণুবাবু 'বিদ্যাধ্ব ধন্ধের পথ' বাছিয়া লইয়া নেআণ্ডরতাল বা আর্তেসীয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। এই শব্দগুলি তাঁহার কণ্ঠে সুন্দর মানাইয়াছে, তাঁহার স্বাভাবিক ভাষার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। বাংলা কাব্যের সব পদ, যদি 'আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে/আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে' প্রভৃতির মত সরল হইত তাহা হইলে সে কাব্যে মাইকেলের স্থান হইত না। বিষ্ণুবাবুর স্টাইল বাংলা ভাষার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, হাজার বছরের বাংলা কাব্য-রীতির এক সার্থক পরিণতি।

আমি বাংলার লোক,

ছিন্ন-ভিন্ন আমার জীবনে,

রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে,

এই নদী এই মাঠ আম জাম বনে

ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার নূতন নূতন

হর্ষে বলিষ্ঠবিস্তার।

বিষ্ণুবাবুর কাব্যের বাংলা ভাষার এই বলিষ্ঠ বিস্তার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ কীর্তি।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯০ ॥

রাস্তায় প্রচুর মানুষ জন। দেখে মনে হয় সকলেই যেন শ্যামবাজার-বাগবাজারের দিকে যাচ্ছে। নির্বাচন নাকি ঐ দিকেই দারুণ জমেছে। বাগবাজারের দিকে আমাদের কোনো চিন্তা নেই, বরং যত বেশী ভোট পড়ে ততই ভালো। কিন্তু মন্টু আর অনিমেষের মুখ গম্ভীর।

বাগবাজারে এসে শুনলাম, এখানে দু' তিনটে সেন্টারে প্রচুর ফল্‌স ভোটিং হচ্ছে। কংগ্রেস থেকে লরি ভর্তি করে নিয়ে আসছে লোক বাইরে থেকে, তারা হুড়হুড় করে ঢুকে ভোট দিয়ে আসছে।

পরিতোষ আমাদের এদিককার ইনচার্জ, তার চুল উস্কোখুস্কো, পাঞ্জাবিটা অনেকখানি ছেঁড়া, দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে পরাজয়।

পরিতোষ আমাদের তিনজনকে দেখে বললো, আমার সঙ্গে আয় এদিকে, একটা জরুরি পরামর্শ আছে।

পরিতোষের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে আমরা চলে এলাম বৃন্দাবন পাল লেনে। সেখানে আগাছা ভর্তি একটা মাঠের ওপাশে একটা ভাঙা বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে থাকতে দেখেছি। শুনেছি বাড়িটার কোনো মালিক নেই। পরিতোষ আমাদের নিয়ে এলো সেই বাড়িটার মধ্যে, একেবারে ভেতরের দিকে একটা অন্ধকার ঘরে। যে-কোনো সময় মাথায় ইঁট খসে পড়তে পারে। ঘরটার মধ্যে আমাদের পার্টির অনেকগুলো ছেলে রয়েছে, কয়েকটা লোহার রড, ফ্ল্যাগ, পোস্টার।

জায়গাটাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা গুপ্ত আস্তানা। একটু রোমাঞ্চ বোধ হয়। এর আগে যখন শুনতাম পার্টির লীডাররা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছে, তখন আমার মনে হতো সত্যিই বোধহয় মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে কোনো লুকোবার জায়গা আছে। সে বিষয়ে অনেকদিন আমি নিঃসংশয় হতে পারিনি। এই পোড়ো বাড়ির ভাঙা ঘরটা দেখেও মনে হয় সেই রকম জিনিস। কিংবা গোপন যুদ্ধের হেড কোয়ার্টার।

যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব সম্পর্কে আমার কাছে কিছু কথা চিন্তা করে চিত্ত আন্দোলিত হতো। সেই রকম যুদ্ধের সম্ভাবনা এখন অনেক দূরে সরে গেছে। এখন আমরা ভোট-যুদ্ধে মেতেছি। প্রথমবারে তাতেও উত্তেজনা কম অনুভব করিনি।

দুটি লম্বা মতন রাগী চেহারার ছেলে পরিতোষকে জিজ্ঞেস করলো লেটেস্ট পজিশন কি?

পরিতোষ বললো, এইট্টি কিংবা নাইনটি পার্সেণ্ট পোলিং হচ্ছে এক একটা সেণ্টারে। তার মধ্যে একটাও জেনুইন কিনা সন্দেহ! শংকর বোস ক্যাম্পটার করে দিচ্ছে একেবারে।

শংকর বোসের নামটা আমার কাছে কেমন চেনা চেনা মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শংকর বোস কে রে?

মন্টু অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, তুই গ্রেট ডিগবাজি মাস্টার শংকর বোসকে চিনিস না? আগে টেররিস্ট পার্টিতে ছিল, তারপর ফরটি টু-তে জেলে গিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগ দিল, খুব বড় বড় কথা বলতো, এখন ইলেকশানের ঠিক আগে কংগ্রেসে গিয়ে ভিড়েছে। নিজে দাঁড়ায় নি, কিন্তু এ পাড়ার কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেটকে তো সে-ই জিতিয়ে দিচ্ছে। টাকাও পেয়েছে অঢেল!

আমার মনে হলো, এই শংকর বোসের নাম আমি সূর্যদার মুখে দু একবার শুনেছি, সূর্যদাদের দলেই ছিল এক সময়। সূর্যদা যদি এখন এখানে থাকতো, কোন পার্টিতে যোগ দিত? বোধহয় ভোটেই দিত না। সূর্যদা রাজনীতি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু টাকা ছড়ালেও এত লোক পাবে কোথা থেকে? এদের সকলেরই তো অন্য জায়গায় ভোট আছে।

পরিতোষ বললো, তুই ইলেকশানের কিছু বুঝিস না। অনেকেরই ভোটার লিস্টে নাম থাকে না। তা ছাড়া রেফিউজি-

দের তো প্রশ্ন কারুরই ভোট নেই—শংকর সেনের খুব হোল্ড আছে রিফিউজি কলোনিগুলোতে—ওখান থেকে গাড়ি ভর্তি করে করে নিয়ে আসছে।

রাগী চেহারার লম্বা ছেলে দুটি বললো, ওরা এ রকম ফল্‌স ভোটিং চালাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো? তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে গিয়ে এক সঙ্গে চার্জ করি, ইলেকশন ভণ্ডুল হয়ে যাক।

মণ্টু বললো, ওখানে অনেক পুলিশ আছে।

—থাক পুলিশ। আমরা আধলা ইঁটে ভূপতিনাশ করে দেবো।

পরিতোষ বললো, শুধু পুলিশ নয়, ওরা ওখানে অনেক গুণ্ডা লাগিয়ে রেখেছে। ইলেকশান ভাঙতে দেবে না—ওদের কাছে ড্যাগার আছে। আমরা প্রিপেয়ার্ড নই। কাশীপুরে ওরা দুজনকে স্ট্যাব করেছে।

অনিমেষ দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শালা! আমরা কি তা হলে কিছুই করবো না!

পরিতোষ বললো, আমরা কাউণ্টার অ্যাকশান নেবো। আদিনদা খবর পাঠিয়েছেন, আমরা যতজনকে পারি জোগাড় করে আমাদেরও ফল্‌স চালাতে হবে।

পরিতোষ ঘাড় ফিরিয়ে অন্য কয়েকটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, দাগ তুলতে পেরেছিস।

একজন বললো, ইজি! পাঁচ সাত মিনিট লাগে।

সে কাছে এগিয়ে এসে আঙুলটা দেখলো। তর্জনীর পাশের দিকে কালির ফোঁটা যেখানে থাকার কথা, সে জায়গাটা ফর্সা। দেশলাই কাঠির বারুদের দিকটা জলে ডুবিয়ে পাঁচ সাত মিনিট ঘষলেই উঠে যাচ্ছে দাগটা। শুধু দেশলাই কাঠির বারুদ ঘষলেই দাগটা ওঠে, সেটা এত তাড়াতাড়ি কি করে সকলে জেনে ফেললো, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

মণ্টু বললো, বাদল, তোর দাগটা তুলে ফেল।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমার এ বছর ভোটিং রাইট হয়নি। যদিও আমার এখন একুশ হয়ে গেছে, কিন্তু ভোটার লিস্ট তৈরি করার সময় কম ছিল।

সে কথা বলতেই ওরা সবাই একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো। আমি এখনো একটাও ভোট দিই নি, এ তো ম্যান পাওয়ার নষ্ট করা। তক্ষুনি ভোটার লিস্ট দেখে একটা নাম বার করলো, সাধন রায়, বয়েস চব্বিশ, বাবার নাম শশাঙ্ক রায়। পরিতোষ জানালো, এই সাধন রায় পাটনায় গেছে, ওরা খুব ভালো ভাবে জানে, সুতরাং কোনো রিস্ক নেই।

আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ওরা পাঠিয়ে দিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। যদিও একটু আগে আমি নিজে পোলিং এজেন্ট হিসেবে দেখে এসেছি যে ভয়ের কিছু নেই—নাম টাম ঠিক বলতে পারলে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না, তবু আমার বুক কাঁপছিল। এই প্রথম আমি সজ্ঞানে একটা অন্যায় করতে যাচ্ছি। অন্যরা অন্যায় করছে বলেই আমার অন্যায়টা ছোট হয়ে যায় না।

মণ্টু আমাকে এগিয়ে দিল বুথের কাছাকাছি। শেষকালে বলে ছিল, আমাদের পোলিং এজেন্ট যদি তোকে চিনতে না পেরে বেশী জেরা করে তা হলে ডান দিকে কানের পাশটা চুলকোতে থাকবি। তা হলেই বুঝতে পারবে।

আমি সুধন রায় ও শশাঙ্ক রায়ের নাম প করতে করতে লাইনে দাঁড়ালাম। যতবার নে হচ্ছে, এই সামান্য নাম দুটো শেষ হতে ভুলে যাবে। মুখখানা হাসি হাসি রে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়েও বুঝতে পারলাম, ঠিক মতন হাসি ফুটছে না। আমার বুকের মধ্যে যে এত জোরে ধড়াস ড়াস শব্দ তা কি অন্যরা শুনতে পাচ্ছে না? রেণু যদি জানতে পারে কখনো? রেণু একটা মিথ্যে কথা বলাও সহ্য করতে পারে । আর আমি অন্য লোকের নামে পরিচয় দিয়ে—। রেণু যদি আমাকে ভালো না বাসে, হ বলে কি আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবো? নাঃ, রেণুকে বোঝাতে হবে, এটা একটা স্ট্র্যাটেজি।

শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে হলো না। যন্ত্রের মতন আমি নাম ও ঠিকানা বলে গেলাম, পোলিং এজেন্টরা বললো, নেক্সট! এখানে দেখলাম, কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টরা দারুণ প্রতাপের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসারটি মিনমিনে। তাকে বোঝানো হয়েছে যে লাইন বিরাট হয়ে গেছে, সুতরাং এখন বেশী জেরা করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

আঙুলে ফোঁটা দিয়ে, ব্যালট পেপারটা বাক্সে ফেলার পরের মুহূর্তে আমার সমস্ত গ্লানি কেটে গেল। আমার মনে হলো, আমি একটা দারুণ ব্যাপার করে ফেলেছি। আমি অসৎ লোকদের ঠকাতে পেরেছি।

লাফাতে লাফাতে ফিরে এলাম সেই ভাঙা বাড়িতে। আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কেউ তেমন উৎসাহ দেখালো না। পরিতোষ বললো, দাগটা মুছে ফ্যাল। তোকে আবার যেতে হবে।

সকলেই তিনবার চারবার করে যাচ্ছে। কংগ্রেসের অর্থবল আছে, লোকবল আছে। আমাদের এ দুটোর একটাও নেই বলে এক একজনকেই যেতে হচ্ছে বারবার। এই গোপন ঘরটায় একটা কারখানা বসে গেছে। এক একজন ভোট দিয়ে আসছে আর তিনজন এক্সপার্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাদের দাগ তুলে ফেলার জন্য। আমাদের যেখানে যত ওয়ার্কার আর ভলান্টিয়ার ছিল সকলকেই ডেকে আনা হয়েছে এখন—আর মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে যতগুলো তুলতে পারা যায়। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে ভোটার লিস্ট বার করে এনেছে কায়দা করে, কেন কেন নামের পাশে এখনো টিক পড়েনি দেখবার জন্য।

এবার আমাকে দেওয়া হলো সুশান্ত তালুকদার, বাবা জয়দেব তালুকদার, বাড়ির নম্বর সাতাশের দুই, হলুদ রঙের বাড়ি। এবার অন্য বুথে, তেমন একটু ভয়ও করছে না। লাইনে দাঁড়িয়ে আরাম করে সিগারেট

ধরলাম। লাইনে আমার সামনে পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা কোনোক্রমেই বাগবাজারের লোক নয়—বাগবাজারের লোক দেখলেই চেনা যায়।

খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম, এই বুথের চেহারা অন্যরকম। আমাদের পার্টির কোনো পোলিং এজেন্ট এখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না। যারা বসে আছে তারা যাকে তাকে ধরে হঠাৎ জেরা করছে, ছেলে ছোকরা দেখলে আর রক্ষে নেই। ভেতরে পুলিশ রয়েছে, উঠোনের মধ্যে কয়েকজন ভোটারকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের মিথ্যা পরিচয় প্রমাণিত হয়ে গেছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওদের। এবং স্বয়ং শংকর বোস ঐ বুথ পরিদর্শন করতে এসেছেন। সেই প্রথম আমি দেখলাম শংকর বোসকে—তখন ঘুণাক্ষরেও অনুমান করা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।

লোকজনের কথাবার্তা শুনেই আমি চিনতে পারলাম শংকর বোসকে। খুব রোগা আর লম্বা মতন মানুষ, চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। আমার বন্ধুরা যেমন বলেছিল, সে রকম কোনো ফন্দীবাজ মানুষের মতো মুখ নয়, বরং যেন একটু বেশী অভিজ্ঞ আর ক্লান্ত মনে হয়। মোটামুটি চেহারা দেখলে খারাপ ধারণা কিছু হয় না।

আমার শরীরে ভয়টা আবার ফিরে এলো। স্পষ্ট টের পাচ্ছি পা কাঁপছে। সুশান্ত তালুকদারের বাবার নাম যেন কি? বাড়ির নম্বর সাতশোর দুই না সাইত্রিশের দুই! ইস, কাগজে লিখে আনি নি কেন? এই সামান্য ব্যাপারটাও মনে থাকে না? এখনো চলে যাবো? বড্ড কাছাকাছি এসে গেছি, এখন চলে যেতে গেলে যদি কিছু মনে করে! শংকর বোসের সামনেই ধরা পড়বো, যদি উনি কোনোক্রমে জানতে পারেন আমি সূর্যদার ভাই—।

শংকর বোস সেই মুহূর্তেই সেখান থেকে চলে গেলেন বলে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো কিছুটা। নাম ঠিকানা সব ঠিক ঠাক মনে পড়ে গেল।

—নাম?

—সুশান্ত তালুকদার।

—বাবার নাম?

—জয়দেব তালুকদার, সাতাশের দুই...

পোলিং এজেন্টটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে টিক দেওয়ার জন্য মাথা নিচু করেছিল, হঠাৎ আবার মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাবা তো মারা গেছেন?

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে আমি বললাম, না তো!

লোকটি এবার রাগী গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাবা মারা যান নি?

আমিও জোর দিয়ে বললাম, না!

প্রথমবার প্রশ্নের সময় অতর্কিতে আমি নিজের বাবার কথাই ভেবেছিলাম। পরের বার খেয়াল হয়েছে। তবু, সন্দানা বুসম্ভকার, মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, আমার বাবা মারা গেছেন। আমার সব ঘড় নিরীহ মানুষ, তাঁকে মুখের কথাতেও আমি মেরে ফেলতে পারি না।

লোকটি ধমক দিয়ে বললো, জয়দেব তালুকদার আমার মাস্টার মশাই ছিলেন, উনি মারা যাবার পর ওঁর ডেড বডি আমি নিজে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেছি, আর আপনি বলছেন, উনি মারা যান নি!

আমার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমি ধরা পড়ে গেছি। কাছেই পুলিশ। হয়তো এই লোকটা অত্যন্ত চালু, জয়দেব তালুকদারের মারা যাবার ব্যাপারটাও বানিয়ে বলছে, কিন্তু আমার আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই।

দু' এক মুহূর্ত আমি চুপ করে ছিলাম শুধু। সেই সময়টুকুতে পৃথিবীর আর কিছু নয়, শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠলো রেণুর মুখ। রেণুই যেন আমার বিচারক। রেণু কি আমার সব দোষ ক্ষমা করবে? রেণুর চোখের দিকে তাকালেই ও কি বলবে, আমি রাগ করি নি!

আমি খুব দুর্বল গলায় লোকটিকে বললাম, দাঁড়ান, আমি বাড়ি থেকে রেশন কার্ড নিয়ে আসছি।

—রেশান কার্ড এনে কি দেখাবেন? আমি জানি না?

আমি আর অপেক্ষা করলাম না, পেছন ফিরেই দৌড়ালাম।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, ধরুন, ধরুন, ঐ ছেলেটাকে ধরুন তো!

কিন্তু তখন আমি অন্ধ আমি কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু দৌড়োচ্ছি। অত জোরে জীবনে কখনো ছুটি নি আগে।

এক সময় বুঝতে পারলাম, আমি বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আমি ধরা পড়িনি, বেঁচে গেছি। তবু দাঁড়ি থামলাম না। তীব্র গতিতে ছুটছি। সেই ছোটা বাড়ির দিকে নয়, বন্ধুদের দিকে নয়। কোন-দিকে জানি না। ভয় চলে গিয়ে এখন [illegible] এসেছে লজ্জা। আমি হেরে গেলাম। [illegible]র কি রকম অনায়াসে তিন চার বার ফল্‌স দিয়ে এসেছে। আমি পারলাম না। আমি হেরে যাই বারবার। আমি ভয় পাই।

কিন্তু ফিরে গিয়ে আবার চেষ্টা করার ইচ্ছে হলো না। আমি বুঝতে পারলাম, এই সব পথ আমার জন্য নয়। আমি অযোগ্য। আমাকে একাই থাকতে হবে।

ছুটতে ছুটতেই আমি দেখলাম, সার সার লরি ভর্তি নকল ভোটার তখনও আসছে। গণতন্ত্রের বিচিত্র রূপ আমার সেইদিনই দেখা হয়ে গেল।

(ক্রমশ)

'একা এবং কয়েকজন' উপন্যাসে ভুলক্রমে পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৮৭-র পর ৮৯ হয়েছে। ৮৯ পরিচ্ছেদটি হবে ৮৮, ৯০টি ৮৯।

কথায় বলে, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। এমন উদার জায়গা কোলকাতায় কেন, ভারতবর্ষের অন্য কোনো শহরে নেই। শহরের মধ্যেকার গুঁতো-গুঁতি ধোঁয়া থেকে লোকে ইচ্ছে করলে পরিত্রাণ পেতে পারে এখানে, কিন্তু, তবু আশ্চর্য হতে হয় একথা ভেবে, খুব কম লোকই পরিত্রাণ পেতে চায়। কেননা, গড়ের মাঠের অধিকাংশ জায়গা এখনো ফাঁকা। যদিও নানা রকমভাবে গড়ের মাঠটির আয়তন কমে যাচ্ছে তবু মাঠটি এখনো আশ্চর্য রকমের ফাঁকা। ফাঁকা জায়গায় কোলকাতার মানুষ যেতে চায় না, মানুষ সেখানেই যায় যেখানে আরো মানুষ আছে। সিনেমা, থিয়েটার, যুজন্ত বাস, ট্রাম, শেয়ালদা স্টেশন, বড়বাজার, চিৎপুর ওসব জায়গার লোকেরা কেউ গড়ের মাঠে আসে না। তবে হতে পারে, কোলকাতার মানুষ-দের পরিত্রাণ পাবার প্রয়োজন নেই কিংবা হয়ত সময় নেই।

তাই বা কি করে বলি। যে কোন দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর উত্তর দিকে চলে আসুন বিকেল সন্ধের মাঝামাঝি, দেখবেন সেখানে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম। এ ওকে গুঁতোচ্ছে, সে তাকে। রাস্তায় বাজার বসে গেছে, ফুচকা, ঝাল আলু, টক আলু, চীনে বাদাম বিক্রী হচ্ছে। ছোট ছোট কেরোসিনের অসংখ্য আলোয় জায়গাটি দূর থেকে আশ্চর্য রকম ঝলমলে দেখাচ্ছে। লোকেরা চিৎকার করছে, আইস-ক্রিমওলা আইসক্রিম বিক্রী করছে, বলছে ঠান্ডা—ঠান্ডা—ঠান্ডা—বাবু ঠান্ডা!! চীনে বাদামওলা তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, বাদাম বাদাম, বাদাম!! ভেলপুরীওলা তার ভেল-পুরীর উচ্চ প্রশংসা করছে। প্রত্যেকেই নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটাচ্ছে। এরই মধ্যে দেখা যাবে সম্পূর্ণ নীরব বেলুনওলা, এবং তারই প্রতিবাদ স্বরূপ প্রচন্ড সরব ভিখিরী। কোলকাতায় ভীড়ের রাস্তায় যা যা পাওয়া যায়, এখানে তার সমস্তই আছে, তবু কোলকাতার লোকেরা এখানেই বেড়াতে আসে। কিন্তু ঐ রাত ন'টা পর্যন্তই তাদের দৌড়। তারপর ভীড় পাতলা। এখানে কেউই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর দিকে তাকায় না। যদি এখানে চাঁদও ওঠে তাও কারুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না বলেই আমার মনে হয়েছে, এমন কি কখনো চাঁদনী সন্ধ্যায় আমি নিজেও যখন ঐ দলে মিশে গিয়েছি, তখনো চাঁদ আমার চোখে পড়ে নি। মনে পড়ছে, ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়লটাও যেন সেখানে দেখতে পাইনি।

গড়ের মাঠে লোক আরো আসে কিন্তু একা নয়। হাজার হাজার লোক ফুটবল খেলা দেখতে যায়, বহু ক্লাব থেকে ক্রিকেট খেলা হয়। সে সব জায়গায় ভীড় হয়। ভীড় হয় বড় বড় রাজনৈতিক সভায়, ভীড় হয় মেলায়, শীতকালে। ভীড় হয়, ট্রাম ডিপোয়, শহীদ মিনারের পাশের বাস টার-মিনাসগুলিতে। আরো ভীড় হয় কুৎসিৎ দৃশ্য হকার্স কর্নারের বাইরে, যেখানে ফুচকাওলা বিক্রী করছে ফুচকা, সুটকেস-ওলা সুটকেস। অবশ্য এখানে এখন এসে পড়েছেন আরো কিছু লোক যাঁরা বিলিতি, বিদেশী জিনিসপত্র, ব্লেড, ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার সবই বিক্রী করছেন, একটু বেশি দামে। যে রেডিওর দাম জাপানে ত্রিশ টাকায় পাওয়া যায়, এখানে তাই একশো দশ টাকায় লোকেরা অম্লান বদনে কিনছে। দর-দামও হচ্ছে, দু-পাঁচ টাকা হয়ত কমানো যাচ্ছে, এই পর্যন্ত।

ট্রাম ডিপোর মধ্যেও বাজার বসে গেছে। আগে কার্জন পার্ক ছিল গড়ের মাঠেরই অংশ, এখন সেই কার্জন পার্কটিকে ছোট করে ট্রামের জন্য জায়গা করে দিতে হয়েছে, হয়তো জায়গা ছিল না, উপায়ও ছিল না। কিন্তু রেডিওর অফিসটা, প্ল্যানেটোরিয়াম, এবং এ জাতীয় আরো কিছু, এগুলি তো অন্যত্রও হতে পারত। তার উপর আরো আসছে। জাতীয় নাট্যশালা, আর হাওড়ার দ্বিতীয় সেতু। গড়ের মাঠ আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে। হয়ত কয়েক যুগ পরে এর অস্তিত্ব থাকবে কি-না সন্দেহ। অথচ আমরা তাই বোধ হয় হতে দিচ্ছি। কোলকাতার ফুসফুস, কেউ ব্যবহার করে-ছিলেন এই কথাটি গড়ের মাঠ সম্পর্কে। সেই ফুসফুসে আজ রোগ ধরেছে। এখনো ঐ রোগ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে আজ আমরা যদি একে অবহেলা করতে শুরু করি তাহলে আর দেখতে হবে না। গড়ের মাঠের মৃত্যু ঘটবে। এ আশঙ্কা আজকের নয়, গড়ের মাঠ যাঁরা সৃষ্টি করে-ছিলেন তাঁদেরই একজন ইংরেজ লেখক ১৯২২ সালে আতংক প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, বৃটিশরা কি ভারতীয়-দের বলবে, "এসব আমরা তৈরি করেছিলাম আমাদের জন্য, তোমাদের জন্যও, কিন্তু এখন আর একত্রে আমাদের থাকা সম্ভব হচ্ছে না!" যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর মূর্তি আজ রেড রোডে রয়েছে, সেগুলো কি তুলে নিয়ে বাবুরা তাঁদের বাগানবাড়ির বাগান সাজাবেন? আর ময়দানের সর্বত্র কি বস্তি গজিয়ে উঠবে?

তারপর অবশ্য সে লেখক লিখেছিলেন, আশা করি তা ঘটবে না। চারনকের শহর সম্পর্কে অত নিরাশার কারণ নেই।

পঞ্চাশ বছর পর ইংরেজ লেখকের আতংকের অর্ধেক অংশটা সত্যি বলে প্রমা-

গণিত হয়েছে। বাকি অর্ধেকটাও সত্যি হতে পারে যদি আমরা সচেতন না হই।

*

ইংরেজরা গড়ের মাঠটিকে কিন্তু কোলকাতাকে 'ফুসফুস' দেবার জন্য গড়েন নি। সাহেবরা এই মাঠে একটু আধটু হাওয়া খাবেন ঘোড়া চালাবেন, মেম-সায়েবের সঙ্গে সন্ধেবেলা একটু আধটু ঘুরে আসবেন—সে জন্যও নয়। নামেই এর পরিচয়—মাঠটি গড়ের। অর্থাৎ ওদিকে রয়েছে দুর্গ। দুর্গের কাছাকাছি কোনো বাড়ি-ঘর থাকলে দিশী লোকেরা সহজে, গোপনে আক্রমণ করবার সুযোগ পাবে হয়ত। যাতে কয়েক মাইল দূর থেকেই 'নেটিভ'দের গতিবিধি নজরে পড়ে তারই জন্য এই মাঠের সৃষ্টি। তাই এর নাম গড়ের মাঠ।

এখানে অবশ্য এখনো ঠিক বস্তি গড়ে ওঠে নি। এখানে দিনেরবেলায় গুচ্ছ গুচ্ছভাবে এখানে ওখানে ভীড় হয়। হয়ত কোলকাতার "সব চেয়ে গর্বের বস্তু" ময়দানে কয়েকজন লোক একা একা, এর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেও থাকতে পারেন। কিন্তু কাউকে এর মধ্যে, এই "সবুজের সমুদ্রের" মধ্যে রাত্রি বাস করতে বিশেষ দেখা যায়নি। তবে যা অবস্থা শহরের ভেতরে, গড়ের মাঠের সেই অবস্থা আসতে কি খুব দেরি হবে?

"সবুজের সমুদ্র" লিখেছিলেন আর জে মিনি, পঞ্চাশ বছর আগে। তিনি লিখে ছিলেন, অনেকে এই সবুজের সমুদ্র (যেখানে গাছগুলিকে মনে হয় ছোট ছোট দ্বীপ, আর মনুমেণ্টকে মনে হয় লাইট হাউস) পছন্দ করেন না। তাঁরা বলেন আসল সমুদ্র দেখতে বোম্বাই যাওয়াই তো ভাল। সেখানকার সূর্যাস্ত অতি মনোরম। মিনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলছেন কোলকাতার সৌন্দর্য এর গড়ের মাঠে—সে অতি আশ্চর্য ব্যাপার। ফোর্ট উইলিয়ামের উপরের আকাশের রঙের বাহার সূর্যাস্তের সময় আর কোথাও দেখা যায় বলে তাঁর জানা নেই। তবে যে সমস্ত পর্যটক এসে দু একদিন কোলকাতায় থেকে হুট করে চলে যান, গড়ের মাঠ তাঁদের জন্য নয়। কোলকাতাকে ভাল লাগাতে হলে এখানে থাকতে হবে, এর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এর রূপকে গ্রহণ করতে হবে হৃদয়ের মধ্যে।

গড়ের মাঠে রাত এল। মিনি লিখছেন—এসেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তুকে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। তবে চাঁদ থাকলে সে আলাদা ব্যাপার—চাঁদের আলো হল প্রকৃতির পুলিস, রাত্রির প্রবল আক্রমণ থেকে একে তাকে রক্ষা করাই এর কাজ। তবে চাঁদের আলোর নানা নিয়ম, নানারকম এর কাজকর্মের সময়। মাসের কয়েকটা সন্ধ্যা ছাড়া এর দেখা তো তেমন পাওয়া যায় না। অধিকাংশ রাতই গড়ের মাঠকে কাটাতে হয় অন্ধকারে। আর ভোরের প্রথম আলোয় ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়ালকে দেখে মনে হয়, সে যেন একটা লাজুক নববধূ, কাল রাতেই যার বিয়ে হয়েছে। আর যে পুকুরটাকে মনে হচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর ধারে—কিন্তু আসলে সেটা আমার চৌরঙ্গীর হোটেলেরই সামনে, এখনো সেটায় কুয়াশা রয়েছে, ঘুম তার এখনো ভাঙেনি।

"সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া ছিলাম।

"নিকটেই একটি বাদাম গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদাম গাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউ খেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্নের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।"

আরণ্যক শুরু করেছেন বিভূতিভূষণ এইভাবে। তিনি যখন লিখেছিলেন তখন *কোলকাতায় মোটর গাড়ির সংখ্যা কম, লরিও সমানারকমের। আর হর্ন আজকাল যা হয়েছে তার তুলনায় সেগুলি ছিল অনেক কম আওয়াজের। আজকাল ফোর্টের ধারে চুপচাপ বসে থাকার উপায় আছে কি? চারিদিক থেকেই আওয়াজ আসে। একটু বসে থাকলে অন্তত পাঁচরকম লোক এসে জিজ্ঞেস করে যায়—কানের খুসকি বার করবেন বাবু? —মালিশ? চীনে বাদাম, কুলপি বরফ? আইসক্রিম, চা?* লবটুলিয়ার কেন, এখানে বসলে নিজের নামটাও সহজে মনে পড়ে না। গড়ের মাঠে একা বসে কয়েক মিনিট সমাহিত-ভাবে চিন্তা করা আজকাল অসম্ভব হয়ে পড়েছে প্রায়।

পরিত্রাণ, অতএব গড়ের মাঠে এখন আর পাওয়া যায় না। শান্ত সমাহিত ভাব এখানে আনা অসম্ভবই বলা যায়। ফাঁকা মনে করে একটি গাছের তলায় বসুন, দেখবেন চতুর্দিক থেকে অন্তত বারো রকমের ফিরিওলা আপনাকে দেখতে পেয়ে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। আর দুজন বসে থাকলে এই সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। পুলিস আসে, আসে আরো কিছু দর্শক। গড়ের মাঠকে দূর থেকে যতখানি জনশূন্য বলে মনে হয় ভেতরে গেলে তা নয়। মানুষ মানুষকে পছন্দ করে, একত্রে থাকা তার অভ্যেস, একা থাকলে সে পাগল হয়—কিন্তু মাঝে মাঝে সে যে একা না থাকলেও পাগল হতে পারে সেটাই অনেকে ভুলে যায়।

আগে বোধ হয় গড়ের মাঠ অনেক ভাল ছিল। বিভূতিভূষণেরও আগে, তারও অনেক অনেক আগে। পঞ্চাশ বছর আগেও ময়দানের গাম্ভীর্য ছিল। বিকেলবেলা "ছেলেমেয়েদের অশান্ত চিৎকারেও তার গাম্ভীর্য ভেঙে পড়ত না।" এখন ছেলে-মেয়েদের ময়দানে তেমন তো দেখা যায় না। যখন ইংরেজ ছিল তখন বেশ কিছু আয়াকে পেরামবুলেটর নিয়ে সকালে দেখা যেত এই মাঠে আসতে, এখন তাদের সংখ্যা অনেক, অনেক কম।

"ময়দান ছিল শহর সৃষ্টির আগে থেকেই। যখন কলকাতা ছিল তরুণ [illegible] তখনি বৃদ্ধ, গাছের দাড়িতে ভর্তি। [illegible] ছিল বলা যায়।"

পঞ্চাশ বছর আগেকার বর্ণনা [illegible] বলছেন মিনি।

"কি সুন্দর এবং শান্ত, আর মহান রাজার মত। এর এই শান্ততার জন্যই লোকেরা এখানে আসে চিন্তায় সমাহিত হবার জন্য, যে কারণে লোকেরা পাহাড়ে যেয়ে নেয় ডেরা। একজন চশমা পরা ইউরোপিয়ানকে দেখা যায় বসে থাকে এখানে বিকেল থেকে গোধূলি পর্যন্ত *ডিনারের সময় পর্যন্ত তিনি বসেন, আর ডিনারের পর ফিরে আসেন। তিনি অনেক রকম ভাবেন, বিচিত্র সে সব চিন্তা। তাঁকে অনেকটা কিপলিংএর মত দেখতে। তিনি হয়ত কিছুই লেখেননি, কিংবা হয়ত লিখেছেন? কে জানে। তিনি গড়ের মাঠে যা দেখেছেন তার একটু অংশও যদি আমাকে বলতেন তাহলে কি ভালই না লাগত!"*

"এই ময়দানে চলে প্রণয়ের বন্যা, চাঁদের আলোও তা দেখতে পায় না। চাঁদ যা দেখেনি ময়দান তা দেখেছে, এ হিসেবে

ভদ্রতার দিক থেকে বৃড়ি চাঁদের চাইতেও দাম অনেক বড়!"

তিনি আরো লিখেছেন—"এখানে গরুরা ঘাসে মুখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘাস খাচ্ছে। ছাগলের দলও তাই করছে। ঘোড়া, গাধা আছে, আর আছে লুঙিপরা অলস লোকের দল, তারা মাঝে মাঝে গান গায়। রাস্তার ধারে সব গাছ তলাতেই বাজার বসে গেছে। এখানে খালি গায়ে ক্ষৌরকার, ওখানে আখের ঝুড়ি নিয়ে কে আখ বিক্রী করছে, মুড়কি তেলেভাজা—হরেক রকম কারবার। এর মধ্যে তরকারিওলাও আছে—লোকেরা দেখে যাচ্ছে মাছিরাও একটু আধটু চাখছে। কিন্তু এদের দৌড় যতক্ষণ আলো ততক্ষণ, সন্ধ্যে হলেই এরা কোথায় মিলিয়ে যাবে। এখানকার লোকদের অধিকাংশই গ্রাম্য—তারা বন্দুক দেখতে আসে, তার আশ্চর্য জিনিসগুলি দেখতে হাজারে হাজারে। সন্ধ্যেবেলা তারা নেই, কোথায় যেন অদৃশ্য, কিন্তু কাল তাদের আবার দেখা যাবে সকাল থেকেই। আবার শুরু হবে চাওয়ালার চা! চা! চা! চা! আওয়াজ।"

আরো কয়েক বছর পিছিয়ে যাওয়া যাক। এই শতাব্দীর শুরুতে এসেছিলেন একজন ইংরেজ। নিজের নাম দিয়েছিলেন কালাপাহাড়। তারপর তাঁর স্মৃতিমন্থন করে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার ঘুরে যাবার পর। তিনি লিখছেন, প্রাসাদের শহর কোলকাতার সব চাইতে বড় গৌরব হল এর ময়দানটি। সুন্দর, খোলা, গাছভর্তি এই অংশটির ভেতরে সুন্দর সুন্দর কত রাস্তা। এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটি হল রেড রোড, মান পাড়িয়ে দেয় লন্ডনের সেন্ট জেমস্ পার্কটিকে। ময়দানের একটা দিক নদী আর ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ দিয়ে ঘেরা। আমি এর আগে যখন এসেছিলাম, তার পর থেকে ময়দানের পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর। লর্ড কারজনের চেষ্টায়ই বেশির ভাগ ভাল ভাল জিনিস হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এসপ্ল্যানেডের শেষ প্রান্তের পুরনো পুকুরটি ইতিমধ্যে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর প্রায় অকটারলোনি মনুমেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে প্রশস্ত বাগান।

এরই কাছাকাছি সময়ে ময়দান সম্পর্কে ভ্রমণকারীদের জানাচ্ছেন টমাস কুকের পুস্তক: গবর্নরের বাড়িটি তৈরি হয় ১৮০৪ সালে, আর এখান থেকে চোখে পড়ে ময়দানের নিরবচ্ছিন্ন দু মাইল। ময়দানের সর্ব দক্ষিণে রয়েছে সুন্দর সেন্টপল গীর্জা। ময়দানটি চোখকে অসামান্য তৃপ্তি দেয়। খুব গরমকালেও রাত্রের শিশির ঘাসগুলোকে সজীব সবুজ রাখে।

সেই সময় গ্র্যান্ড হোটেল বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন: শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থান, ৬০০ ফুট প্রমোদ বারান্দা থেকে ময়দানের অতুলনীয় দৃশ্য চোখে পড়ে। কন্টিনেন্টাল হোটেল বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন: ময়দানের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়।

ময়দানটি তখন সত্যিই অন্যরকম ছিল। তার "দৃশ্য" বলবার মত ছিল। কেবল জনতার ভীড় আর চীনেবাদাম আর ফুচকাওলা ছিল না। সত্যিকারের সমঝদাররা গড়ের মাঠটিকে ভাল বাসতেন।

তারও আগের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ যে বছরে জন্মায়—সে সময়ের কথা। একজন ইংরেজ লিখছেন, বিদ্যুত চমকায়, বৃষ্টি নেমে আসে ঝমঝম করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ময়দানটা পুকুরের মত দেখতে হয়ে যায়। বিদ্যুৎ চমকাতেই থাকে, আধ সেকেন্ডের জন্যও থামবার নাম নেই...আর মেয়েদের পোশাক বিশ্রী ভাবে এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে...।...এই রকম এক ঝড়ের রাতে কোলকাতার এক বড় সাহেবের স্ত্রী জেলের কাছাকাছি একটা ঘোড়া থেকে ঝড়ের তোড়ে ছিটকে পড়লেন নালার মধ্যে। ময়দানের দক্ষিণ-পূব দিক সেটি, অন্ধকারে সঙ্গীরা কোথায় চলে গেছে আর কেউ বুঝতে পারেন নি তাঁর কি হল। যেমন হয়ে থাকে সচরাচর, ঝড় তো আধ ঘন্টার মধ্যেই চলে গেল, এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ি ("বাগি") করে দুজন লোক এসে দেখতে পেলেন, নালার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বসে আছেন মেমসাহেব! ভদ্রলোক দুজন তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলার তখন এমন মানসিক অবস্থা যে, তিনি তাঁর নাম ধাম সব ভুলে মেরে বসে আছেন। ভদ্রলোক দুজন ভেবেই পেলেন না তাঁকে নিয়ে কি করবেন, অবশেষে স্থির হল তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হক। জেনারেল হাসপাতালে অবশ্য ঘন্টা দুই বিশ্রাম করবার পর মেম সাহেবটির স্মৃতিশক্তি ফিরে এল।

মেমসাহেবের ঘোড়াটি কিন্তু মেমসাহেব ফিরবার আগেই, একা একাই বাড়ি ফিরে যেতে পেরেছিল। এই জন্যই বোধ হয় লোকে বলে হর্স সেন্স!

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই শহরটিকে অতি আধুনিককালে আধুনিক লেখক, নইপালের মনে হয়েছিল, এ হল প্রায় বার্মিংহামের মত, কিন্তু গড়ের মাঠে এসেই তাঁর মনে হল এটিকে নিশ্চয় হাইড পার্কের সঙ্গেই তুলনা করা চলে! পাশ

নিয়ে ক্রৌরঙ্গীর নিয়ন আলো তাঁকে মনে পড়িয়ে দিল হাইড পার্কের বেজওয়াটার রোডের বা পার্ক লেনেরই নিয়ন আলোর সারি।

তবে সাদৃশ্যগত মিল পর্যন্তই। নইপাল যদি এই শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেন, কিছুদিন থাকতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন গড়ের মাঠ এবং হাইড পার্কের মধ্যে ফারাক অনেকখানি। প্রথম কথা, হাইড পার্ক এবং কেনসিংটন গার্ডেন মিলে যতখানি—গড়ের মাঠ তার চাইতে অনেক বেশি বড়। হাইড পার্কে অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল রয়েছে তার মত কুৎসিৎ বস্তু নাকি দুনিয়াতে নেই—এটা অবশ্য যখন অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল তৈরি হয়েছিল তখনকার কোনো সমসাময়িকের রাগের কথা। কোলকাতায় রয়েছে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল—এটিকেও অনেকে বলতেন, এমন খারাপ স্থাপত্য আর হয় না। তবে চোখে সহ্য হয়ে যায় কুৎসিৎ অনেক কিছুই। তবে সম্ভবত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটিকে অকারণ তাজমহলের সঙ্গে তুলনা করা হত বলেই সম্ভবত এটিকে খারাপ মনে হত। এখন অবশ্য কোলকাতায় স্থাপত্য নিয়ে বিশেষ আর আলোচনা হয় না। আমরা সমস্ত স্থাপত্যের উপরেই 'ভোট দিন' আর 'বিপ্লব' লিখে লিখে সৌন্দর্য কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।

কাছেই সেন্ট পলস গীর্জা। এত সুন্দর গীর্জা পৃথিবীতেই কম। ১৮৪৭-এ এই গীর্জাটি তৈরি হয়, এখানেই এককালে নাকি ওয়ারেন হেস্টিংস হাতিতে চড়ে বাঘ শিকার করতেন! এখন এর কাছেই বাঘের আস্তানা, আধ মাইলের মধ্যেই, কিন্তু সে সব বাঘ বন্দী। চিড়িয়াখানায়। খোলা বাঘ কলকাতায় আর নেই। এই গড়ের মাঠে একশো বছর আগেও বা দু' দশ বছর এদিক-ওদিক হতে পারে, বাঘ ছিল না, তবে শেয়াল ছিল। প্রচুর শেয়াল সন্ধ্যেবেলায় 'সেরিনেড' গাইত। ১৮৮৯ সালে একজন ইংরেজ লিখছেন, কোলকাতায় প্রথম রাত্রি আমি জীবনে ভুলতে পারব না। বাগানে রাত্রিবেলা একদল শেয়াল সমবেত হয়ে 'সেরিনেড' গাইল—সমস্ত রাত ধরে চলল তাদের এই সঙ্গীত। তবে প্রথম রাতই আমার কেটেছিল বিনিদ্রভাবে, যদিও কোলকাতায় তার পরও শেয়াল প্রতি রাত্রেই ডেকেছে, যেমন তারা ডেকে থাকে সমস্ত ভারতেই।

বাঘ, শেয়াল স্নাইপ, বক ব্যাং আরো অন্যান্য পাখি, "নাম না জানা"র সংখ্যাই বেশি। (স্ট্রেঞ্জ বার্ডস আর সীন।) আমরা প্রকৃতি প্রেমিক নই, অধিকাংশ পাখির নামই আমাদের অজানা। গড়ের মাঠে জন্তু জানোয়ার অনেক। এখন কাঠ বিড়ালী, কাক, কিছু বক ছাড়া স্বাধীন জন্তু বা পাখি তেমন নেই। তবে এখন সকালে বিকেলে চোখে পড়ে মোষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, পোষা এবং না-পোষা কুকুরের দল। উপরে চিল ওড়ে, কখনো শকুনও।

কলকাতা তথা ভারত, একজন মেমসাহেবের চোখে ছিল, "তাজা-বি-তাজা, নউ বি নউ" চিরসজীব, চিরসবুজ। কথাটা হাফিজের। কোলকাতার গড়ের মাঠই প্রাণ, চিরকালই ছিল এখন বোধ হয় আরো বেশি। এই প্রাণপূর্ণ শহর সম্পর্কেই মির্জা গালীব লিখেছিলেন, এমন আশ্চর্য সুন্দর শহরে আমি ভিখিরী হয়ে থাকতেও রাজি অন্য শহরে রাজা হয়ে থাকার পরিবর্তে!

যদি বলা যায় এর সবটাই আমাদের গড়ের মাঠের জন্য, তাহলে হয়ত ভুল হবে, কিন্তু এটা ঠিক, গড়ের মাঠটি না থাকলে কোলকাতার আকর্ষণটাই কমে যেত অনেকখানি। গড়ের মাঠ না থাকলে এত অসংখ্য—প্রায় ৮০টির বেশি খেলাধুলোর ক্লাবই বা কোথায় করা হত, কোথায়ই বা হত খেলার গ্যালারি, কোথায় হত রাজনৈতিক দল উপদলের সভা মহাসভা? তবে এটা ঠিক, প্রথম দিকে যদি গড়ের মাঠটি খালি রাখা না হত তাহলে সাহেবরা এই শহরে থাকতে চাইতেন কিনা সন্দেহ! সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসই বদলে যেতে পারত। এখানেই পৃথিবীর সর্বোত্তম ঘোড়ার দেখা পাওয়া যেত। এখানেই তৈরি করা হল ভারতবিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এখানে সায়েবরা ঘোড়াদের দৌড় করিয়ে দেখতেন তাঁদের ভাগ্য ফেরে কিনা!

সেই সায়েবরা এখন নেই। "বাবুদের বাগানবাড়িতে" নয় অনাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পঞ্চম জর্জ, কানিংহ্যাম, ল্যানসডাউন, নেপিয়ার, সারজন লরেন্সের মূর্তি। সার উইলিয়াম পীল কারজন অকল্যান্ডের মূর্তি। এখন এই গড়ের মাঠ আর সায়েবদের নয়। সায়েবরা এর পাশ দিয়ে এখন টুরিস্ট বেশে ঘুরে যান মাত্র। তাঁরা পুরনো "গৌরব"এর কথা ভেবে বোধ হয় আক্ষেপ করেন। এই গড়ের মাঠ দেখতে দেখতে কয়েক বছর আগে একজন তরুণ ইংরেজ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বৃটিশ আমলটাই ভারতবর্ষের পক্ষে ভালো ছিল কি বল? তার কি উত্তর দেব? বৃটিশ আমলটা বৃটিশদের পক্ষে যে আরো ভাল ছিল, সে কথাটা তাঁকে আর বলিনি। বিদেশী লোক, তায় আবার সায়েব। মৃদু হেসে বললাম, চলো চিড়িয়াখানায় যাই, ভাল লাগবে।

কিন্তু মনে একটা দ্বিধা রয়েই গেল। গড়ের মাঠ কি ঠিকমত রাখা হচ্ছে? রাখতে পারছি? এখনো এখানে উড়ো মন্দির স্থাপিত হয়নি, কিন্তু এখন গড়ের মাঠ অনেক বেশি নোংরা সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মনুমেন্ট শহীদ মিনার হয়েছে, কিন্তু তার তলাতে এখন সমস্ত রকম অশান্তির দৃশ্য। রাজনৈতিক সভা এবং কোলকাতার হাজার রকম বাসের মহাসভা ঠিক এরই তলায়। হকারস করনারের পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না, মানুষের প্রস্রাবখানা সেখানে সর্ব সময় গন্ধ ছড়াচ্ছে। এখানে ওখানে ফেরিওয়ালা হাজারে হাজারে প্রতিদিন নোংরা করছে জায়গাটা, চিৎকারে, হট্টগোলে গড়ের মাঠের আগেকার শান্ততাকে নষ্ট করছে। এখন তৈরি হবে আবার কয়েক একর জুড়ে কোলকাতা আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরির মাল রাখবার গুদাম ঘর। শোনা যাচ্ছে, সস্তা জাতীয় ছোটখাট মাথা গুঁজবার বারগাও তৈরি হচ্ছে এরই আনাচে কানাচে। প্রতি বছরই গড়ের মাঠ কমছে। পরে এর কি কেবল ইতিহাসটাই থাকবে? ভবিষ্যতে তখন ঐতিহাসিকেরা সম্ভবত লিখবেন, "কোলকাতায় একটা প্রশস্ত জায়গা ছিল, প্রায় দু মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া—সেখানে বহুলোক বেড়াতেন, ঘোড়ার দৌড় হত, ফুটবল ক্রিকেট খেলা হত। এখন সেখানে মানুষের বসতি। মাঠের চিহ্ন নেই।"

বিজ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা

গত ৩রা নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় 'বিজ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য লেখক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ। কুসংস্কারের অন্ধকারে লালিত পালিত ভারতীয় জনজীবনে এ ধরনের কশাঘাতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

তবু কিছু কথা থেকে যায়। কারণ, প্রবন্ধটির মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ থেকে গেছে। রক্তের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা নিয়ে অবৈজ্ঞানিক ধারণা কি কেবল এদেশেরই সৃষ্টি বা অদ্যাপি কেবল এদেশেই চালু আছে? বিজ্ঞানে অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলোতেও এই ধারণা এখনও একেবারে অপ্রচলিত নয় বা এই রক্ত নিয়ে এই কুসংস্কার একেবারে কম প্রাচীনও নয়। কোথাও সেটা রক্তের পবিত্রতা অপবিত্রতার রূপ নিয়েছে, কোথাও বা আভিজাত্য অনাভিজাত্য ইত্যাদির বেশে এসেছে। এই প্রসঙ্গে 'Blue blood' কথাটি মনে পড়ে। অভিজাত ও অনভিজাত এইভাবে রক্তের মূল্যায়ন, কিছু উচ্চবংশীয়ের রক্তের রঙ নীল ও সেই কারণেই পবিত্র এবং বাদ বাকী সকল অভাজনদের রক্তের রঙ আলাদা কাজেই অপবিত্র—এ ধারণা বহু যুগের এবং এখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। অবশ্যই আমি রক্ত নিয়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে সমর্থন করতে চাইছি না। মূল সমস্যা এই যে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি ধারণাগুলো নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র বেশে দেখা গেছে বা এখনও দেখা যায়। সমগ্র মানবসমাজেরই মনের এক দুর্মর ব্যাধি হলো এই ভেদাভেদ সচেতনতা। প্রবন্ধকারের এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল নয় যে "পবিত্র অপবিত্র মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ পৃথিবীর মধ্যে এক বে-নজির বৈশিষ্ট্য" (পৃঃ ৭৪)। সমস্ত পৃথিবীতেই এই জাতিভেদ অন্য পোশাকে উপস্থিত ছিল যার চিহ্ন এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। এদেশের আর্যদের মতো খোদ চীনেও মোঙ্গলদের (Mongols) পরবর্তী যুগে বহিরাগত মানচু (Manchus) সম্প্রদায় তৎকালীন চীনের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে নিজেদের শাসন কায়েম করার পর একমাত্র তাদের রক্তই পবিত্র, বাদবাকী সমস্ত আদিবাসী ও অধিবাসী চৈনিকদের রক্ত অপবিত্র, অতএব পতিত—এ ধারণা সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে দিতে পেরেছিল। এ ছাড়া সাদা চামড়ার মানুষগুলো কালো মানুষগুলোকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে আজও পর্যন্ত, তার মূলেও রয়েছে রক্তের পবিত্রতা অপবিত্রতা সম্পর্কে সেই সনাতন ধারণা ও মানসিকতাই। একদিকে হরিজন বালককে জীবন্ত দগ্ধ করার উল্লাস এবং অন্যদিকে রক্ত দূষিত অতএব পদদলিত কালো চামড়ার মানুষগুলোর সমানাধিকারের দাবিতে উৎসর্গিত জীবনকে বুলেট দিয়ে স্তব্ধ করার চেষ্টা, একই বিকৃত ও অসহিষ্ণু মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত। বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সমগ্র মানব সমাজকেই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হতে হবে এবং আশার কথা, লেখকও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিলম্বে হলেও ভারতবর্ষেও সে যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

এ ছাড়াও প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে ভারতীয়দের খাদ্যাভ্যাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জমি চাষ করার সেকেলে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কতগুলো নেহাৎ আবেগপ্রসূত মন্তব্য করেছেন বলে মনে হয়। "গত কয়েকশত বৎসর আগে থেকেই মানুষ ও শুয়োরের মল ব্যবহার করার ফলে চীন ও জাপানে জমির উর্বরাশক্তি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী" এ যুক্তিও তথ্যনিষ্ঠ বলে মনে হয় না। বহু পূর্বের কথা ছেড়ে দিলেও, বিশেষ করে চীনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষির সর্বাঙ্গীণ অবনতিই তার প্রমাণ। একটি উদাহরণই যথেষ্ট—১৯৩৯ সালে চীনে খাদ্যশস্য উৎপন্নের পরিমাণ ১৪০ মিলিয়ান মেট্রিক টন যেটা ১৯৪৯ সালে ১০৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে এসে দাঁড়ায়। যেকালে ভারতবর্ষে আর যাহোক, বলদ দিয়ে হালচাষের রীতিটি চালু ছিল বা আছে, সেখানে চীনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু করে ১৯৪৯ পর্যন্ত মানুষ দিয়েই হালচাষ করা হতো। এটা অকল্পনীয় হলেও সত্যি। চীন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তির উক্তিতে ধরা পড়ে যে, ঐ সময়ে চীনে) "of 245 million acres of cultivated land only forty million were irrigated....no fertilizers were available at all." এই ফার্টিলাইজারের মধ্যে সহজেই অনুমান করা যায় প্রবন্ধকার-উল্লেখিত মানুষ ও শুয়োরের মলও পড়ে। ফলত Disease, hunger and disorder ravaged the country." খাদ্যসমস্যাকে তারা জয় করেছে উন্নত ধরণের চাষের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে যার মধ্যে আছে colletivization of farms, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ ও কেমিক্যাল সারের বহুল ব্যবহার ইত্যাদি যার কোনোটাই এদেশের কৃষকদের কাছে এখনও তেমনভাবে পৌঁছয়নি, যার সত্যতা সরকারী পরিসংখ্যানেই পাওয়া যায়। তাছাড়া বেশ কয়েক শত বৎসর যাবত গোবর এবং বিগত কয়েক দশক ধরে ঘোড়ার মলও সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এদেশেই। এমন কি প্রবন্ধকার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙে খাদ্য হিসাবে পরিত্যাজ্য গরুর হাড়চূর্ণও হিন্দু কৃষকরাই জমিতে ব্যবহার করছে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই। আসলে প্রয়োজন কুসংস্কার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন যা ছাড়া চীন ও জাপানের উচ্চ ফলনের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দেয়া যাবে না। প্রবন্ধকার এ বিষয়েও কিছুটা আলোচনা করলেই সুবিচার করতেন।

তারপর ধরা যাক খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা। "বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস অর্জনে আরম্ভ করতে হবে" এই সদুপদেশ মেনে নিলেও কৌতূহল থেকেই যায়, কি ভাবে সেটা করা যাবে। শুধু খাদ্যাভ্যাস বদলানোই যথেষ্ট নয়, পরিবর্ত খাদ্যবস্তুর সহজলভ্যতাও একটি প্রশ্ন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবার জন্য মাছ, মাংস (যার মধ্যে গরুও আছে) ডিম ইত্যাদি খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কথা হলো তা পাই কোথায়? প্রবন্ধকারের কথাতেই জানা যায় যে, ভারতবর্ষে অর্ধেকেরও বেশি লোক নিরামিষাশী এবং তাতেই এই সমস্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মূল্য হাওয়া ভরা বেলুনের মতো ক্রমশই ওপর দিকে উঠে গেছে সাধারণ মানুষের (একমাত্র উচ্চবিত্ত ছাড়া) আয়ত্তের বাইরে। জীবনটাকে টিঁকিয়ে রাখার মতো খাদ্যাখাদ্য সংগ্রহ করাটাই যেখানে অধিকাংশের মস্ত বড়

সমস্যা, সেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রোটিন সমন্বিত খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাটা নেহাতই নিষ্ঠুর রসিকতা বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশে মানুষের যে তুলনাহীন প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে তাতে কুসংস্কার ভেঙে রাতারাতি চীনাদের মতো কীটপতঙ্গ খাওয়া শুরু হলে তারও মূল্য পনের টাকা কিলো দাঁড়িয়ে যাবে না তো? আর খাদ্যাভ্যাস গত পঁচিশ বৎসরে যে কি প্রচণ্ডভাবে পাল্টে যাচ্ছে সেটা প্রবন্ধকার একটু চোখ খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন।

এতদ্ব্যতীত আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য যে মানুষকে বিশেষভাবে সকাম বা নিষ্কাম করে না তার আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধকারের "এদেশের মানুষের উৎপাদনী শক্তি যেন...শয়নকক্ষেই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছে" (পৃঃ ৭৫) ধরনের মন্তব্য নিছক অসহিষ্ণুতা থেকেই উদ্ভূত বলে মনে হয়। অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় ভরা ভারতবর্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিপুল হার রোধ করতে হলে সর্বস্তরে প্রয়োজন শিক্ষার আলো এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। বক্র মন্তব্য করে প্রবন্ধকার আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাতে সমস্যার হেরফের কিছু হয় না। উপযুক্ত প্রচার, সুযোগ সুবিধা, পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিয়েই জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাকে কবজা করা যায়—আমারা আপনার উন্মাজনিত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়।

অসীম দত্ত

ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

॥ ২ ॥

বিজ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা লেখাটি খুবই সময়োপযোগী বলতে হবে। এবং ভারতের বর্ণাশ্রমের তীব্র আক্রমণ খুবই মূল্যবান। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বর্ণাশ্রম কি শুধু ভারতেই আছে, আর কোথাও নেই বা ছিল না? তবে নাইট, ব্যারন, লর্ড, সেনেটর প্রভৃতি কারা? মোল্লা, মৌলভী, মৌলানা এসব পদবী কেন? আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশেও তো New class জন্ম নিচ্ছে এবং সেখানে উপরে নীচে প্রভেদ বর্তমান। যে নামেই ডাকি, এগুলি কি বর্ণাশ্রম নয়?

ভারতে এক বর্ণের সাথে, বিশেষ করে, উচ্চ বর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের বিবাহ-মিলনে বাধা আছে বা ছিল। এটা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং কুসংস্কারপ্রসূত চিন্তায় পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন—একজন লর্ড বা ব্যারনের মেয়েকে কি একজন ড্রাইভার বা নিম্ন-শ্রমিকের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়? একজন সেনেটারের মেয়েকে কি একজন পোর্ট শ্রমিক বা নিগ্রোর সাথে অবাধে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়? একজন মৌলনার মেয়েকে কি একজন দিনমজুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়? আমরা তো দেখেছি খোদ ইংল্যাণ্ডে নীচবংশোদ্ভবাকে বিয়ে করতে গিয়ে সিংহাসনের সমস্ত অধিকার ছাড়তে হয়। এগুলি কি বর্ণাশ্রমের বেড়াজাল নয়?

উচ্চবর্ণের পুরুষ দ্বারা নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোক ভোগ্যসামগ্রী হিসাবে শুধু ভারতে নয়, পাশ্চাত্য দেশেও ব্যবহৃত হয়। বিবাহ ঘটে কম। সংখ্যাতত্ত্বে আসে না।

প্রাচীন ভারতের দু-একটি উদাহরণ দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন, প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নীচু বংশের মানুষদের ভীষণ অত্যাচার করত। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে যদি সব বোঝান যায় তবে বলতে হয়, ভারতে বর্তমানে অনেক উচ্চবর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের বিবাহ-মিলন ঘটছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তত্ত্ব' অনুযায়ী তাহলে সারা ভারতেই উচ্চনীচে বিবাহ-মিলন হয়ে গেছে।

"আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি।" "বাঙালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালী ও ভাবুক, মায়াবাদ বিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্ত সংমিশ্রণের ফল। ("তরুণের স্বপ্ন—নেতাজী।") "ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে।"

মানুষ কেন আমিষ বা নিরামিষ খায়—তা সব সময় বিজ্ঞান বা ইতিহাস দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। তর্ক করা যায় মাত্র। জর্জ বার্নার্ড শ ভারতীয় নন, গান্ধীজীর শিষ্যও নন। তিনি নিরামিষ খেতেন এবং এই খাদ্যের প্রচার চাইতেন। তিনি কেন নিরামিষ খেতেন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে কি?

জন্মহার নিয়ে শুধু নিরামিষাশী ভারতকে কটূক্তি করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। আমিষভোজী চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সাথে তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন এবং এর ভিতরকার 'কারণ' উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন।

জন্মহার পবিত্র অপবিত্র আমিষ নিরামিষ আহারের উপর নির্ভর করে না। বিজ্ঞান বলে, অনুন্নত অশিক্ষিত দেশ ও সম্প্রদায়ের উপরই নির্ভর করে জন্মহার। বর্তমান ভারতের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার কম।

"গান্ধীজী যৌবনে কামাসক্ত ছিলেন," একথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন, সত্য! গান্ধীজীর কথার মর্মার্থ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছেন কিনা আমার সন্দেহ। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আসক্তির কথা আমরা শুনিনি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে এই কথা কয়টি উপস্থাপন করেছেন, তাতে কথাটির কদর্থ করা হয়েছে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— "নিরামিষাশী ভারতবাসীদের মত কামাসক্ত এবং যৌনজীবনে উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন জাতি পৃথিবীতে খুবই কম আছে।" এই-রকম হীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি আমি খুব কমই শুনেছি। ২০ বছর আগেও আমার কৈশোরে বর্তমানের মত অবাধ যৌনাচার দেখিনি। এইরকম উচ্ছৃঙ্খল কামাসক্ত জীবন দেখিনি। আমেরিকা ও ফরাসী দেশের কথা ধরা যাক—এই দুটি দেশের বিষয়ে যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়, তা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে দেখেছেন কি? দুইটি দেশই বিজ্ঞানে উন্নত, শিক্ষিত, আমিষভোজী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতান্দ্রিক। ভারতবর্ষের মত বর্ণাশ্রমের বেড়াজাল নেই। তবে কেন এতো উচ্ছৃংখল কামাসক্ত?

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"নিরামিষ আহার...সম্ভব নয়।" (পৃঃ ৭৬) এই-গুলি কি দারুণ বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণা সমৃদ্ধ। (ভারতের কোন উদাহরণ

দেখো না—[illegible] [illegible] [illegible], কিছু নেই এবং ছিল না।) এতোদিন পড়েছি বা শিখেছি—জাতি বা সভ্যতার পতন ঘটে—দৈবদুর্বিপাকে, আন্তর কলহে এবং উন্নত ও শক্তিশালী জাতির আক্রমণে। প্রাচীন গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য এইভাবেই ধ্বংস হয়েছে জেনে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে এটা ভুল শিখেছি। আসলে রোম ও গ্রীসের অধিবাসী নিরামিষ আহার গ্রহণ করেই পতন ঘটিয়েছে নিজেদের। কিন্তু রোম ও গ্রীসের অধিবাসী নিরামিষাশী হয়েছিল বা এখনও আছে একথা মানতে পারছি না। তবে এই সভ্যতাগুলির পতন ঘটল কি করে?

দীর্ঘদিন ফরাসীরা বৃটেনের কাছে মার খেয়েছে। ফরাসীরা তো নিরামিষাশী নয়। আফ্রিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা নিরামিষাশী একথা কেউ বলবেন না এবং এ'রা উন্নত বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। তবে কেন তাঁরা দীর্ঘদিন অন্ধকারে পড়ে আছেন? তাঁরা কেন উন্নত হতে পারছেন না?

'আরববাসিগণ নিরামিষাশী' একথা কেউই উচ্চারণ করবেন না আশা করি। তবে কেন ১৯৪৮—১৯৭৩ পর্যন্ত বারবার আরবরা ইজরাইলীদের কাছে মার খাচ্ছে? এর কোন বৈজ্ঞানিক পবিত্রতা অপবিত্রতা নিরামিষ আমিষ আহার ব্যাখ্যা আছে কি? রাজনৈতিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে।

নিরামিষাশী ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমিষভোজী ব্রিটিশ সিংহ শৃগালে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমি নিরামিষ ভোজী নই। নিরামিষের জয়গান গাইছি না।

দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
জগদ্দল, ২৪ পরগণা

॥ ৩ ॥

দেশ পত্রিকায় (শনিবার, ১৭ই কার্তিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বিজ্ঞান পবিত্রতা ও অপবিত্রতা" প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, "কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে চরিত্রের সঙ্গে রক্ত কিংবা জীবকোষের কোনও সম্পর্ক নেই। রক্ত কিংবা জীবকোষ মানুষের দৈহিক আকার প্রকার অনেকাংশে নির্ণয় করে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব কিংবা চরিত্রের সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নাই।" শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি ঠিক নয়। জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চারিত্রিক গুণাগুণ বংশগতির উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

"There is, however, no fundamental scientific distinction that can be drawn between moral, mental, and physical traits, since all alike have a structural anatomical basis and are undoubtedly equally subject to the laws of heridity. Examples of what is meant by psychological traits are thrift loyalty, stubborness, temperament, presence or lack of inhibition, inborn nomadism, and such special natural gifts as mechanical ingenuity, literary ability, a flair for mathematics, or an aptitude for music or the other fine arts."

উপরের এই অংশটুকু Herbert Eugene Walter-এর genetics নাম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম। এখানে anatomical basis অর্থে কোষ বা আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে কোষ মধ্যস্থ Genecke বুঝানো হয়েছে। অবশ্য পিতা মাতার চারিত্রিক গুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ সন্তান সন্ততির মধ্যে সব সময়ই যে ঘটবে, তা নয়। তার অনেক কারণ আছে। যেমন, অনেক সময় কোন একটি গুণ বংশগতির অনেকগুলি উপাদানের (Genes) উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে যদি একটি উপাদানেরও অভাব ঘটে তা হলে ওই গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। আবার পরিবেশ যদি উপযুক্ত না হয় তা হলে বংশগতির সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও ওই গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। যদিও চারিত্রিক গুণের বহিঃপ্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সম্ভব হয় না, তাই বলে চরিত্রের সঙ্গে রক্তের বা কোষের কোনই সম্পর্ক নাই, এ কথা ঠিক নয়।

প্রভাতকুমার ভাদুড়ী
সিউড়ী

॥ ৪ ॥

দেশ পত্রিকায় (১৭ই কার্তিক ১৩৮০ সাল) শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞান, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা' আলোচনাটা আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। জাতি-বর্ণ পবিত্রতা-অপবিত্রতা ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে লেখক যা বলেছেন তাতে তর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও প্রশংসনীয়।

আমার অভিযোগ, (১) একদিকে লেখক চিন্তা করছেন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রগতি, অন্যদিকে তিনি সমালোচনা করেছেন কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সম্পর্কে। হিন্দু ছাড়াও ভারতবর্ষে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বিপুল। তাঁরাও এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে তাঁদেরকেও ব্রতী হতে হবে। কিন্তু তাঁদের ধর্মের মধ্যেও যে সব সংস্কার আছে তারও দূরীকরণ প্রয়োজন।

(২) প্রত্যেক ধর্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আদর্শের দ্বারা চালিত এবং আচার ও সংস্কার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। অতিরিক্ত পরিমাণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়াতে আমরা অনেকে অনেকানেক ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে থাকি। প্রত্যেক ধর্মই যদি তাঁদের কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে পারেন, আদর্শকে বজায় রেখে কু-আচার বর্জন করতে পারেন তবেই ভারতবাসীর কল্যাণ সম্ভব। কিন্তু লেখকের কথায় পুরোপুরি ধর্মটাকেই বিসর্জন দেবার আভাষ লক্ষণীয়।

(৩) সবশেষে জানাই, লেখক একটি তথ্যগত ভুল পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন 'মানবচরিত্রের সঙ্গে রক্ত বা জীব-

... ...netics সম্পর্কিত যে কোন বই পাঠ করলেই তিনি জানতে পারবেন যে "Genes are responsible for the transmission of characters."

উজ্জ্বল দাশশর্মা
কলিকাতা-২৬

বাবুদের দুর্গোৎসব'

১৭ই কার্তিক ১৩৮০ সনের দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত একটি পত্রের একস্থানে ওই পত্রের লেখক শ্রী দুর্গাদাস পাত্র মহাশয় লিখেছেন, "........কুম্ভ রাশিতে যখন সূর্য আসে; ফাল্গুন মাসে সরস্বতী পূজা হয়—......।"

কিন্তু আমরা জানি সাধারণতঃ মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয় এবং রবি তখন মকর রাশিতে থাকেন। ফাল্গুন মাসেও সরস্বতী পূজা কখনও কখনও হয়। কিন্তু সেটি নিয়ম নয় ব্যতিক্রম।

শরৎ মণ্ডল
মহড়, ২৪ পরগণা

সাম্প্রদায়িকতার উৎস

১২ই আশ্বিনের 'দেশে' প্রকাশিত অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাম্প্রদায়িকতার উৎস' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে হতাশ হলাম। জয়ন্তানুজবাবু একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক কিন্তু এ রচনাটিতে সে পরিচয় রাখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ... ... ও ... সাম্প্রদায়িকতার রূপে বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হয় যে, প্রকৃত ধর্মের স্বরূপে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার বীজ নাই। ধর্মের মর্মবেত্তা সাধক ও ভক্তশ্রেণীর অন্তর আশ্রয় করে প্রসন্ন শান্ত করে কিন্তু দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সঙ্গে অসামাজিক ব্যক্তিগণ ও তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জড়িত থাকেন, সাধক ও ভক্ত শ্রেণী নয়। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার জনক ভ্রান্ত রাজনীতি ও অর্থনীতি আর কিছুটা অপসংস্কৃতি। রাজনীতিবিদরা অর্থনৈতিক অসন্তোষকে চাপা দেবার জন্য ধর্মের বহিরঙ্গ আচারকে আশ্রয় করেন, সম্প্রতিককালে অবশ্য ভাষা, বর্ণ ও রক্ত কৌলিন্যকেই সবচেয়ে বেশী এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যতদিন মানব সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বিরাজ করবে এবং সাধারণ মানুষ প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষায় বঞ্চিত থাকবে ততদিন ধর্ম, বর্ণ ভাষা বা সংস্কৃতি আশ্রয়ী সাম্প্রদায়িকতার অবসান অসম্ভব।

অতএব ধর্মকে বর্জন করে মানবতাবাদের আশ্রয় অবলম্বন করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যাটি অত সরল নয়। ধর্ম সম্প্রদায়ের মত মানবতাবাদীদের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায় জন্ম নিয়েছে ও নিচ্ছে। নয়া মানবতাবাদিগণ মার্কসীয় মানবতাবাদীদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বর্তমানে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতে বাংলাদেশে প্রতি মাসে শত শত মানুষ জীবন দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য যদি ধর্মকে বর্জন করতে হয় তাহলে তো ভাষা রাজনীতি এমনকি কোথাও কোথাও সংস্কৃতিকেও জীবন থেকে বাদ দিতে হয়।

মূল কথা, সংঘর্ষের বীজ মানুষের চরিত্রের স্বার্থপরতার মধ্যেই নিহিত আছে। এই স্বার্থপরতাকে দূর করতে হলে মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। অথচ এই মূল্যবোধ আধ্যাত্মিভিত্তিক না হলে মানুষের জীবনের মূলে নাড়া দিতে সক্ষম হবে না। এই সত্য যাঁরা উপেক্ষা করেন তাঁদেরকে জীববিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এটাই ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ধার্মিক হয়েও অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বমানবিকতাবাদের জয়গানে মুখর ছিলেন। এঁদের উদারতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদীদের কাছে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতিভাত হলেও এঁরা মানবতাবাদীদের মত দাম্ভিকও গোঁড়া ছিলেন না। এ কথা স্মরণীয় যে, গোঁড়ামি থেকেই উন্মত্ততা দেখা দেয় এবং উন্মত্ততা থেকেই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্ম।

ধনঞ্জয়কুমার নাথ
মেদিনীপুর

বিশ্ববিজ্ঞান

'দেশ' ১৭ কার্তিক ১৩৮০ সংখ্যায় বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ইনটিগ্রেটেড সার্কিট" নিবন্ধে (বিশ্ববিজ্ঞান) বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ একটি গুরুতর ভ্রম থেকে গেছে। ট্রানসিস্টরে ক্যাথোড গরম করার বিদ্যুৎ শক্তির আদে প্রয়োজন নাই। নিবন্ধে লেখা আছে: "ট্রানসিস্টারে কারেণ্ট কম, খরচও সেই সঙ্গে ক্যাথোড গরম করার বিদ্যুৎ শক্তিও।" যাঁরা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ নন তাঁ... ধারণা হইতে পারে ট্রানসিস্টারে ক্যা... গরম করার বিদ্যুৎ শক্তি লাগে, তবে ভাল্‌বের চেয়ে কম।

প্রসঙ্গত উক্ত নিবন্ধে লেখক পরিচিতিতে প্রফেসর বন্দ্যোপাধ্যায়কে "সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ ইলেকট্রনিক যন্ত্র নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন" বলে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে উনি এই ইনস্টিটিউটে ১৯৫২ সাল হইতে ইলেকট্রনিক যন্ত্র নির্মাণ বিভাগের প্রধান এবং একক ও তাঁর বহু ছাত্রদের সঙ্গে বহু সার্থক রূপায়িত প্রকল্পের জনক।

সন্তোষ নাথ
সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স

সাহিত্য সংবাদ

উপেন্দ্রকিশোর

লীলা মজুমদারের যে-কোনো রচনা পাঠ করাই এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি পড়লাম ওরিয়েন্ট লংম্যান্স প্রকাশিত লীলা মজুমদারের ছোটদের অমনিবাস। বইটি নতুন নয়, কিন্তু লীলা মজুমদারের কোনো লেখাই পুরোনো হয় না। ওঁদের পরিবারের সকলেরই এই গুণ আছে।

এই বইতে আছে লীলা মজুমদারের দুটি উপন্যাস, একটি নাটিকা, অনেকগুলো ছোট গল্প, আর আমাদের অনেক কালের বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জীবন কাহিনী। এমন অনবদ্য জীবনী-রচনা পড়ার অভিজ্ঞতা সচরাচর হয় না। তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্য এবং তাদেরই এক প্রিয় সঙ্গী বিষয়ে—অন্য অনেকের হাতে এই ধরনের লেখা হয় প্যানপেনে কিংবা জোলো মিষ্টি। লীলা মজুমদার যাদুকরী। তাঁর লেখা যথেষ্ট তথ্যবহুল অথচ সরস ও স্নিগ্ধ।

তিনি শুরু করেছেন সত্তর পঁচাত্তর বছর আগেকার কলকাতা শহরের বর্ণনা দিয়ে এবং সেই সময়ে আমাদের সমাজ সংস্কারে ব্রাহ্মদের ভূমিকা। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের (এখন বিধান সরণী) তের নম্বর বাড়িতে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, তারই ওপর তলায় ফর্সা চেহারা, কালো কোঁকড়া দাড়ি সমন্বিত এক পুরুষ, যিনি 'সন্দেশ' প্রকাশ করে সারা দেশের মানুষকে মাতিয়ে তুলেছেন।

উপেন্দ্রকিশোরদের পারিবারিক ইতিহাস ইনি শুরু করেছেন আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে। এঁরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ, আদি বাস বিহারে, তখন পদবী ছিল দেও। বিহার থেকে প্রথম ওঁরা এসে বসতি স্থাপন করেন নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। প্রায় চারশো বছর আগে এঁদেরই এক পূর্বপুরুষ ভাগ্য অন্বেষণে চলে আসেন ময়মনসিংহে, সেই সুবাদে ওঁদের এখন বাঙাল বলা হয়। বংশানুক্রমেই এই পরিবারে ভাষা চর্চা ও কাব্যানুরাগ-এর ধারা ছিল।

শুধু কাব্যপ্রীতি নয়, এঁদের শারীরিক শক্তি ও সাহসেরও খ্যাতি ছিল। এই বংশের এক ঠাকুর্দা ডাব ও নারকেল ছুঁড়ে একবার একটা বাঘকে কুপোকাত করেছিলেন। এই পরিবারের মেয়েই "পদী পিসীর বর্মী বাক্স" লিখতে পারেন বটে। লীলা মজুমদারের লেখার গুণ এই, তিনি উপেন্দ্রকিশোরের জীবনী তথা নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস লিখতে গিয়েও বহু মজার মজার চরিত্র ও কাহিনী খুঁজে বার করতে ছাড়েন নি। তাঁদের বংশে কে খুব কৃপণ ছিলেন এবং মরবার সময় যে তাঁর (এক শো কুড়ি বছর বয়েসে) তৃতীয়বার নতুন দাঁত গজিয়েছিল, এও আমরা জানতে পেরে যাই।

এই বংশের এক পুরুষের নাম লোকনাথ রায়চৌধুরী। ইনি সাধক প্রকৃতির ছিলেন এবং তন্ত্র চর্চা করতেন। এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হলো, তবু তাঁর সংসারে মন ফিরলো না। তাঁর বাবা একদিন রাগ করে তন্ত্রের উপচার, নর-কপাল, [illegible] মালা ইত্যাদি ভাসিয়ে দিলেন ব্রহ্মপুত্রের জলে। তাতে মনের দুঃখে লোকনাথ শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। এঁর নাম শ্যামসুন্দর। এই শ্যামসুন্দরের আট ছেলের মধ্যে তৃতীয় জনের নাম রাখা হয়েছিল কামদারঞ্জন। এই ছেলেকে পোষ্যপুত্র হিসেবে নিলেন এক দূর সম্পর্কের জমিদার কাকা, তিনি ছেলেটির নাম বদলে রাখলেন উপেন্দ্রকিশোর। ইনিই আমাদের উপেন্দ্রকিশোর। খুব ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোর নিজের বাবার বিশাল চেহারা নিয়ে আড়ালে একটু ঠাট্টা করেছিলেন, বাবা তাই শুনে এমন এক চড় মারলেন ছেলেকে যে ছেলে ঘর থেকে উড়ে গিয়ে দরজার বাইরে পড়লো।

দেখা যাচ্ছে, এই পরিবারের মধ্যেই অসংখ্য গল্পের উপাদান রয়েছে। এই রকম প্রামাণ্য অথচ মজাদার পারিবারিক ইতিহাস আগে কেউ কখনো পড়েছেন কি? আমি অন্তত পড়িনি। এবং যাঁরা ভালো লেখা খুঁজে খুঁজে পড়তে ভালোবাসেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করবো লীলা মজুমদারের এই রচনাটি আগে পড়ে না থাকলে অবিলম্বে পড়ে নিন।

এই পরিবারের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক। এঁদের অন্তরঙ্গ জীবনের টুকিটাকি কথা পড়তে দারুণ ভালো লাগে। যেমন "ছোটখাটো শ্যামলা রঙের ছেলেটি সারাক্ষণ বিরাট হাঁ করে যে চ্যাঁচাচ্ছে নয় খাই-খাই করছে"—এই শিশুটি মাত্র দু' বছর বয়সে তার বাবাকে হারায়। এই শিশু সমস্ত রায় পরিবারের মধ্যমণি, উপেন্দ্রকিশোরের বড় ছেলে অনন্য-সাধারণ সুকুমার রায়ের একমাত্র ছেলে। আজকের সত্যজিৎ রায়। এই সব রচনা ফুরিয়ে যাবার পরও মনে হয়, কেন আর একটু ছিল না।

বিয়ের পদ্য

ইংলণ্ডে রাজকবি বা পোয়েট লরিয়েট বলে একটা পদ এখনো আছে। এখন জন বেটজেম্যান এই পদে অধিষ্ঠিত। সদ্য ইংলণ্ডের রাজকুমারী অ্যানের সঙ্গে মার্ক ফিলিপসের বিয়ে উপলক্ষে তিনি প্রথম লিখলেন একটা [illegible] কবিতা। যে-হেতু রাজকবি নির্বাচনের আগে কাকে এই পদে বসানো হবে এই নিয়ে ও-দেশে এখনো অনেক আলোচনা হয়, তাই এই রাজকুমারীর বিয়ের কবিতার নমুনা কি রকম তা আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি:

Hundreds of birds in the air
And millions of leaves on the
pavement
Then the bells pealing on
Over palace and people outside
All for the words, I will
To love's most holy enslavement
What can we do but rejoice?
With a triumphant bridegroom
and bride

আমাদের দেশে যারা হাতে [illegible] পরী আঁকা লাল কাগজে বিয়ের পদ্য ছাপায়, তারাও এই ইংরেজী বিয়ের পদ্যের নমুনা পড়ে হাসবে না?

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

নাটক : গিরিশ রচনাবলী

গিরিশ রচনাবলী। তৃতীয় খণ্ড। সম্পাদক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ। ১৩এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা ৯। পঁচিশ টাকা।

অধ্যাপক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত গিরিশ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডটি পূর্ব-প্রকাশিত প্রথম দুটি খণ্ডের মতই একখানি উল্লেখযোগ্য ও সুসম্পাদিত সংকলন। আলোচ্য গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের বাইশটি নাটক, চোদ্দটি বিভিন্ন বিষয়ক গদ্যরচনা এবং 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য সাধনা' পর্যায়ে সম্পাদকের একটি দীর্ঘ তথ্যমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত। সংকলিত নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকটির পুনর্মুদ্রণ। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে 'সিরাজদ্দৌল্লা' এবং 'মীরকাশিম' নাটক দুখানির সংগে এ নাটকটিও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত—আশ্চর্য, এমনকি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও, 'ছত্রপতি শিবাজী'র পুনঃপ্রচার ঘটেনি। অথচ এ নাটকটি ছিল সে যুগের একখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় মঞ্চ-সফল নাটক। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে এর গভীর সম্পর্কটিও বিস্মৃত হবার নয়। সুতরাং নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থখানিকে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে পাঠকদের আবার উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদক এবং প্রকাশক অবশ্যই বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার অধিকারী।

'ছত্রপতি শিবাজী'র দ্বিতীয় অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন, "The Press and the public are the best judges of the merit of the performance."

সংবাদপত্র ও দর্শকদের ওপর গিরিশচন্দ্রের এই আস্থা হয়ত জনপ্রিয়তায় অভিভূত নাট্যকারের একটি আত্মতৃপ্ত স্বীকৃতি। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অনুসন্ধানী পাঠকের কাছে তাঁর এই ঘোষণার তাৎপর্য গভীরতর। বস্তুত সেকালের ইতিহাস, সংবাদপত্র, দর্শকদের স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্রের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে তাঁর নাট্যচর্চা সম্পর্কিত বহু বিচিত্র তথ্য। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দৃষ্টি এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। সংকলিত নাটকগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং প্রাপ্তব্য তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি প্রতিটি রচনা ও অভিনয়ের বিবরণকে সজীব করে তুলেছেন।

এ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের আবিষ্কার রীতিমত চমকপ্রদ। তার একটি, ভারতী (১২৮৮) পত্রিকায় 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকের সমালোচনা। লক্ষ্মণের বীরত্বের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে এ পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন, 'কিসে তাহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর।' অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন এটা রবীন্দ্রনাথের লেখা। এই অনুমান অত্যন্ত সংগত। রবীন্দ্রসাহিত্যের সূচনা-পর্বের কথা স্মরণে রাখলে এর মধ্যে যেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের আত্মপক্ষ সমর্থনেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন' সম্পর্কে সম্পাদকের সিদ্ধান্তটিও জরুরী। লেখাটি প্রকাশিত

গিরিশচন্দ্র (অয়েল পেইন্টিং)

হয়েছিল কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। অথচ অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশ গীতাবলী'তে নাটিকাটির উল্লেখ আছে। সম্পাদকের মতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র অনুকরণে রচিত এই নাটিকাটি গিরিশচন্দ্রেরই লেখা।

'প্রফুল্ল' নাটকটির জনপ্রিয়তা এবং এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের যোগেশের ভূমিকায় অভিনয়ের কাহিনী প্রায় প্রবাদের মতো। সম্পাদক গিরিশচন্দ্রের প্রথম অভিনয়ের সেই স্মরণীয় রাত্রিটির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সেদিন স্টারে যোগেশ—অমৃতলাল মিত্র; মিনার্ভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। গুরু শিষ্যে দ্বন্দ্ব। স্টার বিজ্ঞাপন দিয়েছে : তোমার শিক্ষিত বিদ্যা তোমার দেখাব। কলকাতার দর্শক মহলে দারুণ চাঞ্চল্য, সমস্ত শহর সরগরম। অথচ গিরিশচন্দ্র ভাবছেন তিনি নতুন কী দেবেন দর্শকদের। তাঁর ভাষায় : 'আমাকে আমার আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে। যোগেশের ভূমিকায় যাহা শিখাইবার তাহা অমৃতকে শিখাইয়াছি।' কিন্তু সেদিন অভিনয়ের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে 'প্রফুল্ল' নাটক জনপ্রিয় হয়ে গেল। ... যোগেশ চরিত্রের এক অনন্য রূপায়ণ দেখলেন কলকাতার মানুষ। পরবর্তী কালে আরও অনেক প্রতিভাবান নট এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। এ সম্পর্কে সম্পাদক এমন একজনের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন যিনি স্টার, মিনার্ভা, আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরে 'প্রফুল্ল'র অভিনয় দেখেছিলেন। তিনি লিখছেন, 'অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, দানিবাবু ও শিশিরকুমার এ চারজনের 'যোগেশ'-এর একটা তুলনার জন্যে পাঠকের আগ্রহ জাগে। মোটামুটি-ভাবে এই বলা যায় যে গিরিশচন্দ্রকে তাঁর উচ্চাসন থেকে আজও কেউ নামাতে পারে নি।'

এ রকম বহু বিচিত্র ঘটনা ও তথ্যে সমৃদ্ধ এই রচনাবলীর ভূমিকাটি গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ও কৌতূহলের নিরসন করবে। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্পর্কে একালের দর্শকেরা হয়ত ততটা আগ্রহী নন। নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের সার্থকতার প্রশ্ন নিয়েও বিতর্ক ওঠে। কিন্তু বাংলা থিয়েটারের সংগে বাঙালী দর্শকদের প্রীতির সম্পর্কটি গড়ে তুলবার গৌরবময় ভূমিকাটি যে গিরিশচন্দ্রেরই প্রাপ্য এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। শুধু নাটক রচনা নয়, বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে তাঁকে বাংলা মঞ্চের পাদপ্রদীপকে উজ্জ্বল রাখতে হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের এই ভূমিকাটিকেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বাংলা নাটকের একনিষ্ঠ 'প্লে-রাইট' হিসেবে গিরিশচন্দ্রের এই মূল্যায়ন এ সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবায়।

বাংলা ভাষার ইতিহাস। শ্রীআনন্দমোহন বসু। পারমিতা প্রকাশন। কলেজ রোড, বোলপুর বীরভূম : মূল্য সাড়ে চৌদ্দ টাকা।

গল্প-উপন্যাসের ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ অনেক। বাংলা ভাষার খাত্ব বৃদ্ধি হোক, এ আমরা সকলেই চাই। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল আমাদের একেবারেই অনুপস্থিত। তাই এ বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের খুবই কম। আর যা আছে, তাদের সব কটিই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর দিকে তাকিয়ে লেখা। গবেষণার জন্য লেখা, যা ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল নিয়ে স্বতন্ত্র রচনার চেষ্টা প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রীয়ার্সনের 'Linguistic Survey of India' প্রকাশিত হয়েছিল অনেককাল আগে; আর সুনীতিকুমারের 'The Origin and Development of the Bengali Language' প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের রচনা। সুনীতিকুমারের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা এককালে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই, গবেষণার এ ধারা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি। একমাত্র সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' কোনো রকমে ভাষাতত্ত্বের চর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওপার বাংলার মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের Phonetics-এর আলোচনা অবশ্য ইদানীং কালের ভালো গবেষণা, তবে ভাষাতত্ত্বের সুবিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তাও অসম্পূর্ণ। আনন্দমোহন বসুর লেখা ৩৪৩ পৃষ্ঠার বইখানি পেয়ে উৎসাহ আসে, কৌতূহল বাড়ে, নতুন কথা কিছু বলা হয়েছে কী না দেখবার জন্য।

যদিও গ্রন্থটির নাম 'বাংলা ভাষার ইতিহাস', গ্রন্থকার কিন্তু শতাধিক পাতা ব্যয় করেছেন অন্য ব্যাপারে। এখানে বিবৃত হয়েছে ভাষা ও লিপির কথা, ভাষার শ্রেণী বিভাগ—ভাষা বংশের কাহিনী, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর পরিচিতি এবং ভারতীয় আর্যভাষার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় পালি-প্রাকৃতের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনায় ঠিক এগুলি কী অপরিহার্য?—অবশ্য এগুলির আলোচনা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে এবং সুখপাঠ্যও হয়েছে। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে 'Bow-wow' 'Pooh-pooh' ও 'Ding-dong' থিয়োরি এবং অনুরূপভাবে মিশ্র বা অপভাষার কথায় 'পিজিন ইংরেজী', 'বীচ-লা-মার', 'মরিশাস ক্রেওল' ও 'চিনুক' উপভাষার প্রসঙ্গ বেশ রম্য ও সুখপাঠ্য। মিশরীয় চিত্রলিপি, ফিনিসীয় লিপি, প্রাচীন পারসিক বাণমুখ লিপি, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি এবং একেবারে শেষকালে বাংলা বর্ণমালার ক্রম বিবর্তনের চিত্র লেখক বিজ্ঞানসম্মতভাবেই উপস্থাপিত করেছেন।

তবে কোনো কোনো ব্যাপারে মতান্তরের অবকাশ আছে। ভুল বললাম, মতান্তর আমাদের নয় নানা ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিকদের যে মতান্তর আছে, সেগুলি উল্লিখিত থাকলে ভালো হত। এবং কেন তিনি একটি মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তার যুক্তিও দরকার। হিট্টিভাষাকে লেখক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে দেখিয়েছেন। কিন্তু এ উপস্থাপন সম্পর্কে এ দেশের একজন বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক অন্য কথা লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, 'প্রথমে হিট্টি ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের মধ্যে ধরা হইয়াছিল। এখন বিস্তৃততর আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, হিট্টি ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের ভাষার তুলনায় অনেক প্রাচীন।' 'এনসাইক্লোপিডিয়া'র ভাষা গোষ্ঠীর যে তালিকা আছে, তাতে অবশ্য হিট্টিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'আনাটোলিয়' শাখার উপভাষা হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার ওখানে আবার 'বল্টিক' ও 'স্লাভিক' দুটি ভাষাকে পৃথক পৃথক ভাবে তালিকাভুক্ত করে বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে মতান্তরের সুযোগ করে দিয়েছে।

গ্রন্থকার আনন্দমোহন বসু ভূমিকায় লিখেছেন, বর্তমান গ্রন্থে যে কয়েকটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা ধ্বনি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত 'উচ্চারণ-তত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য।—গোটা বইটা নিয়ে যেহেতু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা এই সামান্য পরিসরে সম্ভব নয়, তাই লেখক যে বিষয়ে নূতনত্বের দাবি করেছেন, সে বিষয়ে একটু দেখা যাক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধটি অবশ্যই মনে পড়তে পারে। বলা বাহুল্য, লেখকও সেকথা স্মরণে রেখেছেন। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই শ্রীবসুর এই আলোচনা খুবই ভালো হয়েছে। তবে কয়েকটি শব্দের উচ্চারণের ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল থেকে যায়। আমরা 'পদ্মে'র জায়গায় 'পোদ্দ' উচ্চারণ করলেও, 'পদ্মাধম'কে কী 'পোদ্দাধম' উচ্চারণ করি? আর 'অম্বর'কে নিশ্চয়ই 'ওম্বর' নয়। অনুরূপভাবে 'ওস্তাদের' অনুকরণে 'ওকর', 'ওমূল্য' ও 'ওনিরুদ্ধ' আমরা একালে উচ্চারণ করি কী। ঠিক এই রকমই 'পর' শব্দের উচ্চারণে 'পরো' বা 'ভীত' উচ্চারণে 'ভীতো' একটু বোধ হয় কষ্ট-কল্পনা। বাংলার বর্ণমালা বহির্ভূত নতুন একটি স্বরধ্বনিকে লেখক আমাদের কাছে পরিচিত

[illegible], এই [illegible] হল, 'ম্যা [illegible]'। এ জন্য লেখক অবশ্যই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন। কিন্তু জনগণের জিজ্ঞাসা, বাজনদারের প্রয়োগে 'স'-কে বদ দিলেন কেন? এর জন্য, আর কিছু না হোক, 'আনুকূল্য' পাবার স্বীকৃতিটা অন্তত পাওয়া উচিত।

'অনুকল্পতারের' ব্যাপারেও কিছু বলার আছে। এখানে লেখক যেভাবে 'দেশি' শব্দের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন, সম্ভবত তা ঠিক হয়নি। সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা যেসব শব্দ পেয়েছি, তার মূল গ্রীক-অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল যেখানেই থাকুক না কেন—লেখক তাকে সংস্কৃতের যোজক বাদ দিয়ে দেশী-বিদেশী বলব কেমন করে? আগন্তুক 'অতিথি' নয়, মৌলিক উদ্ভব শ্রেণীর ভেতর এদের স্থান নির্ণয় করাই শ্রেয়। এদিক থেকে সুকুমার সেনের পরিকল্পনা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

ভাষাতত্ত্ব ব্যাপারটাই তর্ক কণ্টকিত। শ্রীবন্দুর বইখানিকে অবলম্বন করে এত কথা বলা গেল—এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বইখানি খারাপ নয়। বইটি ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল বাড়িয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। তবে দুঃখ এই, আরো পাঁচটি বইয়ের মত এটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার দিকে তাকিয়ে লেখা। কৌতূহলী গবেষকের চেষ্টা নিয়ে লেখক যদি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নামতেন, তা হলে নিঃসন্দেহে আরো ভালো বই তাঁর হাত দিয়েই আমরা পেতাম।

●

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাত্রই বারো বছরের অভিনেত্রী-জীবন, সামান্য এক সখীর ভূমিকা দিয়ে সেই জীবনের সূত্রপাত, তবু বিনোদিনী যখন স্বেচ্ছায় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন, তখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে তিনি আসীন। ৫০টি নাটকে ৬০টিরও বেশী ভূমিকায় অবতীর্ণা এই কিংবদন্তীসমা নায়িকা শুধু যে অভিনয়ের জন্য স্মরণীয়া তাই নয়, বাংলার নাট্যজগৎ আরও নানা দিক থেকে তাঁর কাছে ঋণী। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগ নিয়ে যে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল তার জের কম দিন চলে নি। 'চৈতন্য লীলায়' বিনোদিনীর অতুলনীয় অভিনয়ের গুণে রঙ্গমঞ্চে রামকৃষ্ণ দেবের পদার্পণ এবং আশীর্বাদ জ্ঞাপনের পরই বলা চলে সেই প্রতিকূলতার অবসান ঘটেছে। ৬৮নং বিডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারের জন্য বিনোদিনীর দুর্লভ আত্মত্যাগের বিনিময়ে—একথা অস্বীকার করা যাবে না। অথচ এই থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই বহু বঞ্চনা লাঞ্ছনা ও আশাভঙ্গের মনোবেদনা পেতে হয়েছে তাঁকে। সমাজ তাঁকে স্বীকৃতি দেয় নি, থিয়েটারও হাতে হাতে প্রাপ্য মেটায় নি তাঁর। নাটকের ইতিহাস এক সময় তাঁর প্রতি প্রভূত উপেক্ষা দেখিয়েছে। এমন কি 'আমার কথা'র মতো বিরল স্বাদের জীবনকাহিনী ও দুটি স্বরণ্য প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রকৃত সমাদরও কোনো অজ্ঞাত কারণে হয় নি বহুদিন।

অবশ্য উত্তরকাল এই ভুল ক্রমশ সংশোধন করে নিয়েছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস তাঁকে আজ শ্রদ্ধার আসন দিতে ভোলে নি, 'আমার কথা'ও বিপুলভাবে সমাদৃত। বাংলা রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীর বছরে বিনোদিনীর জীবনী তো প্রায় হুজুগের মতো জনপ্রিয় বিষয়।

চিত্তরঞ্জন ঘোষের নাটক **নটী বিনোদিনী** (পরিবেশক : দে বুক স্টোর. চার টাকা।) অবশ্য এই হুজুগের ফসল বলা যাবে না। চিত্তরঞ্জনবাবু দীর্ঘকাল যাবৎ প্রকৃত গবেষকের মতো বিনোদিনীর জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে এসেছেন এবং ইতিপূর্বে একটি উপন্যাসও লিখেছেন এই আশ্চর্য জীবনকে কেন্দ্র করে। 'নটী বিনোদিনী' নাটকে তিনি মুখ্যত তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তা সত্ত্বেও বিনোদিনীর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কৌতূহলও মিটিয়েছেন সূত্রধারের সংলাপে। বস্তুত, সূত্রধারকে বেশ নতুন আঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। নাটক হিসেবে নটী বিনোদিনী নিঃসন্দেহে অভিনব এবং সার্থক। বিনোদিনীর জীবন নিয়ে মঞ্চসফল এই নাটকটির মুদ্রিত রূপ দেবার কাজে চিত্তরঞ্জন বরং একটি মারাত্মক ত্রুটির নিরসন ঘটিয়েছেন। বিনোদিনীর কন্যার জন্ম থিয়েটার ছাড়ার চার বছর পর। তাঁর থিয়েটার ত্যাগের কারণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক বস্তুত ছিল না। অথচ নাটকের ইতিহাসে অনেকে এই ভুল করেছেন। আর একটি কথা, চিত্তবাবুর নাটক পড়ে মনে হয়, 'বিল্বমঙ্গলে' চিন্তামণির ভূমিকাই বিনোদিনীর শেষ অভিনয়। কিন্তু তা কি ঠিক? 'বেল্লিক বাজার' নাটকে 'রঙ্গিনী'র ভূমিকাতেই বিনোদিনীর সর্বশেষ মঞ্চাবতরণ নয় কি?

*

'সুস্মিতাকে সুকান্ত' এবং 'সুকান্তকে সুস্মিতা' এই ভাবে পর পর অধ্যায় সাজিয়ে সুকুমার ভট্টাচার্যের পুরো উপন্যাসটি [illegible] লেখক (ভারতী বুক স্টল, [illegible] টাকা), লেখা যেন ই যায়, সুকান্ত সুস্মিতা নায়ক-নায়িকার নাম। স্কুলে শিক্ষয়িত্রী সুস্মিতা সহকর্মী সুকান্ত চৌধুরীর স্ত্রী হিসেবে বি-এ পাশ করে প্রাইভেটে এম-এ পরীক্ষাও দেয়। ইতিমধ্যে সুকান্ত সিভিল-সার্ভিসের (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ?) চাকরি নিয়ে স্কুল ছেড়ে দেয়। চোখের আড়াল হলেও মনের আড়াল হয়নি দুজনে। কিন্তু জেলার্টি সুকান্ত চৌধুরীকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সুস্মিতকে চরম মূল্য দিতে হল। সুকান্তর প্রাণের বিনিময়ে রাজনৈতিক নেতা হেমদাকে বিয়ে করল সুস্মিতা। সন্তানের বাৎসল্যে অবশ্য প্রেমের থেকে বড়ো তৃপ্তি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে সে।

গল্প হিসেবে বড়ো কিছু নয়, প্রচুর উচ্ছ্বাসও রয়েছে, তবু সুকুমার ভট্টাচার্যের একটি কৃতিত্ব স্বীকার্য। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কয়েকটি টুকরো অ্যানেকডোটসের মধ্য দিয়ে একটি উপভোগ্যও ছবি তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি।

পত্রিকা

প্রজ্ঞা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮০)। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি : ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যা—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। (ছাত্রদের জন্য এক টাকা)।

বঙ্গীয় দর্শন সংসদের মুখপত্র এই পত্রিকার এটি প্রথম সংখ্যা। দর্শন সংসদের উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে দর্শনচর্চা। বস্তুত সেই উদ্দেশ্যেই এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা তাঁরা প্রকাশ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরেও মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ববিদ্যার পঠন-পাঠনকে যখন আমরা লক্ষ্য বলে জেনেছি, তখন এ ধরনের উদ্যোগ নিশ্চয় সাধুবাদের যোগ্য।

'প্রজ্ঞা'র বর্তমান সংখ্যায় দর্শনের নানা জটিল তত্ত্ব নিয়েও মাতৃভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে সকলেই কৃতবিদ্য, আলোচ্য বিষয়ের উপরে তাঁদের অধিকার যে তর্কাতীত, প্রতিটি রচনাই তার প্রমাণ দেয়। দর্শনের চর্চা কেন যে মাতৃভাষাতেই করা দরকার, ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের রচনাটি পাঠ করলে সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। বর্তমান সংখ্যা থেকে ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদু বোরদে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। অবশ্য থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশোর্ধ্ব টেস্ট খেলোয়াড় বিশ্বস্ত সৈনিক বোরদেকে টেস্ট থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন ক্রিকেট বোর্ডের তক্তে বসা কর্তাব্যক্তিরা। এবার বোরদে নিজেই ক্রিকেট থেকে সরে গেলেন। এর অর্থ রণজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি বা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় ক্রিকেটের সাহসী সৈনিককে আর দেখা যাবে না। মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক ছিলেনও না। কালে-ভদ্রে কোনো প্রদর্শনী খেলায় বা বেনিফিট ম্যাচে দেখা গেলেও যেতে পারে।

বঞ্চনা, ব্যর্থতা, সাফল্য ও গৌরবমণ্ডিত চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড় চাঁদু বোরদে। মহারাষ্ট্র, বরোদা ও ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অনেক অবদান, অনেক গৌরবময় ভূমিকা। কিন্তু ক্রিকেটের গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটি অর্থাৎ মহা অনিশ্চয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের গতি। ভারতের টেস্ট দলে স্থান পাবার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। দলে স্থান বজায় রাখা সম্পর্কে বহুবার অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করেও একটি টেস্ট খেলাতেও অধিনায়ক হবার সম্মান পাননি। অথচ বহু খেলায় বোরদের বিপদত্রাতার ভূমিকা, ব্যাট বল ফিল্ডিংয়ে প্রায় সমদক্ষতার পরিচয়।

চাঁদু বোরদেকে অবশ্যই অমি নাইডু, মার্চেন্ট, মুস্তাক, মানকড় বা হাজারে, অমরনাথের সমপর্যায়ের ক্রিকেটার বলব না। কিন্তু ৩৫·৬০ রানের অ্যাভারেজে ৫৫টি টেস্টে ৫টি সেঞ্চুরি সমেত তার ৩০৬২ রান এবং ৫২টি উইকেট কিংবা ৫২·৯০ রানের অ্যাভারেজে রণজি ট্রফির ৭৬টি খেলায় ১৪টি সেঞ্চুরি সমেত ৪০৩৮ রান ও ১০১টি উইকেট লাভ সাধারণ ক্রিকেটারের পরিচয় নয়। প্রথম শ্রেণীর মোট ২৩৬টি খেলায় তার মোট রানের সংখ্যা ১২৩৩৫। সেঞ্চুরির সংখ্যা ২৭। রঞ্জির খেলায় সর্বোচ্চ রান ২০৭ নট-আউট, টেস্টে ১৭৭ নট-আউট।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বৈত সিরিজে ব্যাটিং অ্যাভারেজে (৬১·৮৩) দ্বিতীয় স্থান এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং অ্যাভারেজে (৪৮·৫০) শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন বোরদে। ১৯৬৬-৬৭তে গ্যারি সোবার্সের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে বোম্বাই (১২১ রান) ও মাদ্রাজ (১২৫ রান) টেস্টে সেঞ্চুরির সহ অ্যাভারেজ হয়েছিল ৫৭·৬৬।

এই সব পরিসংখ্যান থেকে বোরদের ব্যাটিং দক্ষতার আংশিক আভাস মিললেও

ক্রিকেট থেকে বোরদের বিদায় —

তার সত্যিকার শক্তির পরিচয় পেতে হলে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই সব ইনিংসের কথা, ইংরাজিতে যাকে বলে ক্লাসিক ইনিংস—বোলারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বোরদের সাহস ও সৌন্দর্যে গড়া কয়েকটি ইনিংস।

১৯৬০-৬১ সিরিজে মাদ্রাজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর ১৭৭ রানের সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংসটিকে আমি বলব না। ১৯৬৫-তে বোম্বাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে

চাঁদু বোরদে

সেঞ্চুরিটিকেও (১০৯ রান) ধরব না। ধরব না গ্যারি সোবার্সের দলের বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরিকেও। কিন্তু অবশ্যই ফ্রাঙ্ক আলেকজান্ডারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে বোরদের প্রথম সিরিজের শেষ টেস্টের দুটি ইনিংসকে ক্লাসিক হিসাবে চিহ্নিত করব। তা ছাড়া ব্রিসবেনে, ইডেনে এবং ব্রাবোর্নে কয়েকটি ইনিংসও স্মরণীয় হয়ে আছে।

ধরা যাক ১৯৫৯-৬০'এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার কথা। জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজ। ভারতীয় ক্রিকেটের ঘর তখন অগোছালো। পাঁচটি টেস্টে ৪ জন অধিনায়ক। তারপর হল ও গিলক্রিস্টের বলের গোলায় সবার থরহরি কম্প। বোরদের দুর্ভাগ্য, জীবনের প্রথম টেস্টে চমৎকার সূচনা করে ৭ রানের মাথায় রান আউট। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ মেলেনি। দ্বিতীয় টেস্টে ০ ও ১৩ রান। তৃতীয় টেস্টে দলে থেকে বাদ। দিল্লিতে চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবার শূন্য। বলা বাহুল্য, প্রতি টেস্টেই বোরদেকে ৯ নম্বর কিংবা ১০ নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছে। মাদ্রাজেই শুধু দ্বিতীয় ইনিংসে বলির পাঁঠার মত পাঁচ নম্বরে বোরদেকে পাঠানো হল হল-গিলক্রিস্টের গোলার সামনে। গিলক্রিস্টের বাম্পারের বিরুদ্ধে বোরদের ব্যাট ঝলসে উঠল। প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে আরম্ভ করলেন উইকেটের সঙ্গে। সোবার্সের এক ওভারে করলেন ১০ রান। শেষ পর্যন্ত ৫৬ রানের একটি সুন্দর ইনিংস। বলা প্রয়োজন, মাদ্রাজ টেস্টেও বোরদেকে স্পেশাল খেলোয়াড় হিসাবে রাখা হয়েছিল। গোপীনাথ এবং মঞ্জরেকার আহত থাকায় খেলার সুযোগ মেলে।

ওই খেলার পর সিলেক্টরদের পক্ষে শেষ টেস্টে বোরদেকে বাদ দেবার আর প্রশ্ন ওঠে না। ব্যাটের বিক্রমে বোরদেও দেখিয়ে দিলেন বাদ দিলে সেটা মহা ভুল হত। প্রথম ইনিংসে করলেন ১০৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬। সবাই ধরে নিয়েছিল হাজারের পর ভারতের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে বোরদেই দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করবেন। কিন্তু কিছুটা দুর্ভাগ্য এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের দুষ্টবুদ্ধির ফলে শেষ দিনের শেষ ওভারে জোড়া সেঞ্চুরীর ৪ রান বাকী থাকতে হিট উইকেট আউট হয়ে গেলেন। জন গডার্ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ভারত বিজয়ী হতে পারেনি মাত্র ৬ রানের জন্য। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে একটি ওভার বাকি থাকতেই আম্পায়ার বেল তুলে নিয়ে খেলার উপর যবনিকা টেনেছিলেন। এই সিরিজের শেষ টেস্টের শেষ দিনে একই ভাবের উত্তেজনার মধ্যে বোরদে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আলেকজান্ডার শেষ ওভারে বাউন্ডারির চারদিকে লোক রেখেছিলেন যাতে বোরদের ব্যাট থেকে বল বেরিয়ে না যায়। বোলার বল করছিল উইকেটের অনেক দূরে দিয়ে যাতে ব্যাটে-বলে সংযোগ না হয়। সময় নেই, হতাশায় বিচলিত বোরদে বাউন্ডারি মারতে গিয়ে হিট উইকেট আউট হলেন। বলবার কথা ওই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একমাত্র বোরদেই একটি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলেন।

ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথম জয়ের সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছিলেন অনবদ্যভাবে ৬৩ রান করে। বোম্বাইতে ববি সিম্পসনের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভারতকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন নির্ভীক আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিংয়ে। তবে ইডেনে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ের মূলে বোধহয় বোরদের অবদান সবচেয়ে বেশী। ১৯৬২ সিরিজে টেড ডেক্সটারের ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে ৬৮ (রান আউট) ও

[illegible] বাইরে চলে পড়ছে। [illegible] অধিকারী চৌকস [illegible] হয়তো ছিল না [illegible]। [illegible] করে স্কোয়ার কাট, কভার ড্রাইভ ও হুক-এ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর লেগ ব্রেক ও গুগলী বল বহু বড় ব্যাটসম্যানের বিভ্রান্তি ঘটাত। কাঁধে আঘাতের জন্য শেষদিকে অবশ্য বলের ধার কমে গিয়ে- [illegible]।

ক্রিকেট খেলা থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বোরদে বলেছেন—আমার ধমনীতে বইছে ক্রিকেটের রক্ত, কিন্তু দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়েই আমাকে ক্রিকেট থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হল সম্ভাবনাময় একজন তরুণকে স্থান করে দেবার জন্য। আমি অনেক খেলেছি, এখনো যদি জায়গা আগলে রাখি তবে [illegible] গেলেও ক্রিকেটকে আমি সরে থাকব না। সম্ভাবনাময় তরুণদের তালিম দেওয়া এবং তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করাই হবে আমার প্রধান কাজ। তাছাড়া উদয় ও রাজেশ সব সময়েই তো আমার ক্রিকেট খেলার সঙ্গী। চন্দ্রকান্ত গুলাবরাও বোরদের বয়স এখন ৩১। পুত্র উদয়ের বয়স সাড়ে পাঁচ, রাজেশের দুই।

—প্রফুল্ল

খেলার মাঠে

কলকাতা সফরে এসে আমেরিকার নিগ্রো দৌড়বীর জেমস হাইনেস স্টার্ট নেবার নিখুঁত পদ্ধতি দেখাচ্ছেন

ক্রীড়ানীতি এবং রাজনীতি

"খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই"—ক্রীড়াজগতের কর্ণধারদের মুখে প্রায়ই কথাটা শোনা যায়। অথচ খেলার ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আবারও উঠেছে বিশ্ব ফুটবল এবং এশিয়ান গেমসকে কেন্দ্র করে। দুই সংস্থায় ভাঙনেরও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তেহরানে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমসের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাইওয়ানকে বাদ দিয়ে চীনকে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সদস্য করায়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভাতেই চীনকে সদস্য করার প্রস্তাবটি পাস হয়েছিল। সম্প্রতি তেহরানে ফেডারেশনের কাউন্সিল সভায় সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় চীন এ জি এফ-এর স্থায়ী সদস্য হয়েছে, ফেডারেশন থেকে বিতাড়িত হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তাইওয়ান।

বলা বাহুল্য, 'দুই চীন' কি 'এক চীন'—এই রাজনৈতিক প্রশ্নেই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে। চীনের দাবী, তাইওয়ান চীনেরই অংশ, পৃথক দেশ নয়। সুতরাং তাদের শর্ত, তাইওয়ানকে বাদ দিয়ে তাদের সদস্য করতে হবে। চীন নিজে কিন্তু সদস্য হবার আবেদন করেনি। ইরান, জাপান প্রভৃতি দেশ উদ্যোগী হয়ে প্রস্তাবটি পাস করিয়েছে।

সত্যি কথা, ৮০ কোটি মানুষের দেশ চীনকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত নয়। এশিয়ান গেমস থেকে তো নয়ই। কিন্তু আর একটি দেশ এখন পর্যন্ত যখন পৃথক হয়ে আছে—যত ছোটই হোক—তাদের বাদ দেওয়া কতখানি যুক্তিসংগত সে সম্পর্কে তর্ক উঠতে পারে। বিশেষ করে তারা যখন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এখানেই ক্রীড়ানীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক।

এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলি এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির হুমকিতে। চীন অলিম্পিক কমিটির সদস্য নয়, অধিকাংশ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থারও নয়।

অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিলানিন বলেছেন, চীন যোগ দিলে তেহরানের এশিয়ান গেমস অলিম্পিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন হারাতে পারে। আন্তর্জাতিক সাঁতার সংস্থার সভাপতি হ্যারোল্ড হেনিং পরিষ্কার করে বলেছেন, এশিয়ান গেমসের সাঁতারে চীনকে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং যদি কোন দেশ চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সে দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন হারাবে, মন্ট্রিল অলিম্পিকে যোগ দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক ওয়েট লিফটিং ফেডারেশনের সভাপতি অস্কার স্টেটও এক সুরে কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ ফ্রেডেরিক হোল্ডার বলেছেন, তাঁর সংস্থার এশিয়ান গেমস বয়কট করার সম্ভাবনা আছে তাইওয়ানকে বাদ দিয়ে চীনকে সদস্য করায়। এই সব হুমকির উত্তরে তেহরান গেমসের সংগঠক সম্পাদক হাসান রসৌলির বক্তব্য: 'আগামী ১৯ মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে।' আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। সব ঠিক হয়ে যাবে কিনা বলা শক্ত। তবে ১৯৬২-র জাকার্তা এশিয়ান গেমসের মত একটি সমাধান সূত্র হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। ইন্দোনেশিয়া সরকার তাইওয়ান ও ইজরাইলের প্রতিযোগীদের ভিসা মঞ্জুর না করায় জাকার্তা এশিয়ান গেমসেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে সেটা খেলাধুলা চলা কালে। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলি জাকার্তা এশিয়ান গেমস থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এশিয়ান গেমস নামের বদলে নামকরণ হয়েছিল 'জাকার্তা গেমস'। তাই আইনত ওই গেমসের রেকর্ড এশিয়ান গেমসের রেকর্ড হিসাবে স্বীকৃত নয়। তাতে অবশ্য জাকার্তা গেমসের কোন অঙ্গহানি বা ক্ষতি হয়নি। কিন্তু খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সমর্থন প্রত্যাহার আর আগে থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।

তবে তেহরান এশিয়ান গেমসে তেমন সমস্যা দেখা দিতে নাও পারে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক রংগমঞ্চে পট পরিবর্তনের ফলে। তাইওয়ানকে যে আমেরিকা এতকাল মদৎ দিয়ে এসেছে সেই আমেরিকাই বিবৃতি দিয়ে 'এক চীন নীতি' স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং শুধু এশিয়ান গেমস ফেডারেশনেই নয়, চীনের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্যপদ লাভের দিনও আগত। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনেও আপাতত ভাঙ্গনের আশঙ্কা নেই।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনে ভাঙ্গনের আশঙ্কাও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক কারণেই রাশিয়া স্যান্টিয়াগোতে গিয়ে চিলির সঙ্গে বিশ্ব কাপ ফুটবলের প্লে-অফ ম্যাচ খেলেনি। এবং রাশিয়া বিশ্ব কাপ থেকে বাতিল হওয়ায় রাজনৈতিক কারণেই রাশিয়ার সমর্থক পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি (পোলাণ্ড, পূর্ব জার্মানী ও বুলগেরিয়া) যারা মূনিখে বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পেয়েছে, বিশ্ব কাপ বয়কট করার কথা চিন্তা করছে। সুতরাং খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতির যথেষ্ট যোগ রয়েছে, মুখে যতই বলা হোক দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামের অলিম্পিক কমিটির সভাপতিই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আমরা সবার সঙ্গে খেলাধুলো করতে চাই। এমন কি উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গেও। আমরা তাইওয়ানের বহিষ্কারের বিরোধিতা করব, কিন্তু চীনের অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দেব না।' বস্তুত দক্ষিণ ভিয়েতনাম এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের কাউন্সিল সভায় 'দুই চীন' প্রস্তাব সমর্থন করে তাইওয়ানকে রাখতেই চেয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধি কিন্তু পুরোপুরি চীনকেই সমর্থন করে 'এক চীন' প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

রাজনীতির সঙ্গে ক্রীড়ানীতি যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত প্রচুর উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করা যায়। অন্য পরে কা কথা, আমাদের কলকাতাতেই কি কম? রাজনীতির পালা বদলের সঙ্গে কলকাতার ক্রীড়া প্রশাসনে কর্মকর্তা বদলের ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীস্নেহাংশু আচার্যকে অতীতে আই এফ এ-র সভাপতি পদে বরণ তো রাজনৈতিক পালা বদলেরই ফল। পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া পরিষদ থেকে যোগ্য সম্পাদক শ্রীশম্ভু মল্লিকের অপসারণেরও একই কারণ। অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব হয়তো খেলাধুলোর অগ্রগতির তেমন অন্তরায় নয়। কিন্তু রাজ্য ক্রীড়াক্ষেত্রে অবশ্যই অন্তরায়। হাতে নাতেই আমরা তার ফল ভোগ করছি। রাজ্য ক্রীড়াসংস্থা অচল হয়ে আছে। কাজ কর্ম বন্ধ। বস্তুত শম্ভু মল্লিক সরে যাবার পর কাজ কিছুই হয়নি। অথচ কি চমৎকার পরিকল্পনা নিয়ে শম্ভুবাবু কাজ শুরু করেছিলেন, সারা রাজ্যের একটা সমীক্ষা করেছিলেন কোন জেলায় কতটি স্কুলের খেলাধুলো করার মাঠ আছে, জিমন্যাসিয়াম আছে। জেলায় জেলায় কোচিং ক্যাম্প খোলা এবং প্রয়োজন অনুরূপ ছোট ছোট আকারের স্টেডিয়াম তৈরীরও পরিকল্পনা ছিল। রাজনৈতিক পালা বদলের সঙ্গে সব পরিকল্পনাই পচে গেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব কোনভাবেই কাম্য নয়।

কলকাতায় মার্কিন অ্যাথলীট দল

আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় একটি মার্কিন অ্যাথলেটিক দল সম্প্রতি ভারত সফর করে গেল। দলটি কলকাতায়ও এসেছিল তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাথলেটিকসের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কোচ ও অ্যাথলীটদের কিছুটা ওয়াকিবহাল করার জন্য।

দলে অবশ্য অলিম্পিক স্বর্ণ-পদক বিজয়ী কোন অ্যাথলীট ছিল না। তবু জেমস বারনেট, আর্ল হ্যারিস, লরি কেনেডি, ব্যারী ম্যাকলিউর ও জন ওয়ারকেনটিন—পাঁচ জনই মার্কিন মুলুকের প্রথম সারির অ্যাথলীট। দৌড়, ডিসকাস নিক্ষেপ, হপ-স্টেপ জাম্প এবং ডেকাথলনে ওদেশের পুরস্কার বিজয়ী। ওদের অ্যাথলেটিকসের প্রথা প্রকরণও নিঃসন্দেহে নির্ভুল। ওদের সঙ্গে এসেছিলেন কোচ রিচার্ড গাজলাজ, যিনি ওরেগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিকস ডাইরেক্টরও।

একদিনের ডেমনস্ট্রেশনে খুব বেশী লাভবান হবার কথা নয়। কিন্তু বৃষ্টি-ভেজা মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে অনেক দিক ওদের ডেমনস্ট্রেশনের কতটুকু সুযোগ নিতে পেরেছে আমাদের অ্যাথলীট ও কোচরা। কংক্রিট পিট-এর বদলে ভিজে মাটিতে দাঁড়িয়ে ডিসকাসের ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়েছেন লরি কেনেডি। লরি হ্যারিস, ৯·২ সেকেণ্ডে যার ১০০ গজ দৌড়ের কৃতিত্ব ভিজা ঘাসের ট্র্যাকেই দেখালেন দৌড়ের স্টার্ট নেওয়া স্টেপিং এবং দৌড়ের সময় হাতের অবস্থানের নিখুঁত পদ্ধতি। ব্যারী ম্যাকলিউরও হপ-স্টেপ ও জাম্পের কিছু কিছু পদ্ধতি দেখিয়েছেন। কিন্তু অব্যবস্থার জন্য জন ওয়ারকেনটিন ডেকাথলনের ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারেননি। ডিসকাসে আমাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন পারভিন কুমারকে ও'রা দেখেছেন। ও'রা জানালেন তার ছোঁড়ার পদ্ধতি ভুল। সঠিক পদ্ধতিও দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু অব্যবস্থা, মাঠের মধ্যে দর্শকের ভিড় এবং প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ওঁরা যা দেখিয়েছেন তার কতটা আমাদের অ্যাথলীটরা নিতে পেরেছেন সন্দেহ। যদি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বা এডেনগার্ডেন্সে ওদের ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হত তা হলে হয়তো অ্যাথলীটরা আরও উপকৃত হতেন।

একলব্য

অরণ্যদেব ★ লী ফক

সী-প্লেনের মধ্যে.....

"ছুটির ঘণ্টা" (পরিচালনা : বরুণ কাবাসী) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী ও শান্তনু

মতামতের মন্তাজ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক নতুন চলচ্চিত্র নীতি গ্রহণ করেছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতিবিধানই এর প্রধান লক্ষ্য। চলচ্চিত্রশিল্পসেবীদের কাছে এটা নিশ্চয়ই সুসংবাদ। নতুন চলচ্চিত্র-নীতি খুবই ব্যাপক। তাতে ফিলম ইনডাসট্রির সমস্যার দিকে যেমন নজর দেওয়া হয়েছে তেমনি চলচ্চিত্রের চারুকলার দিকটিও উপেক্ষিত নয়। চলচ্চিত্র উৎসব আধিকারিকও গঠিত হয়েছে। ফলে ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সুফল কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পে একবার দেখা দিয়েছিল। উৎসবের প্রভাবে একাধিক নতুন পরিচালককে আমরা পেয়েছিলাম। এবং নতুন জাতের কিছু ছবি।

* * *

ভারতীয় সিনেমার সমস্যাটা এখন মূলত ইনডাসট্রিগত, না শিল্পকলাগত তার অনুসন্ধান আবশ্যক। বাংলা চলচ্চিত্রের কথাই ধরা যাক। বাংলা সিনেমার সমস্যা অনেক। সমস্যাগুলি বহুবার আলোচিত, সুতরাং নতুন করে উল্লেখ না করলেও চলে। কিন্তু একটি বড় সমস্যার দিকে অনেকেই নজর দিচ্ছেন না। বাংলা ছবি সাধারণভাবে মোটেই এগোয়নি। মাঝে-মাঝে কলকাতায় বিদেশী চিত্রের উৎসব হয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ছবি দেখা যায়। অন্যান্য দেশের ছবিও আসে। ওই সব ছবি দেখে বাংলা ছবির দৈন্য আরও প্রকট হয়ে পড়ে। বিদেশের সব ছবিই মহৎ নয়, খুব একটা উৎকৃষ্টও হয়ত নয়। কিন্তু তবু ওই সব ছবির মধ্যে এমন টেকনিক্যাল পারিপাট্য থাকে কিংবা সাধারণ বস্তুকেও এমন উপভোগ্য করে তোলা হয় যা বাংলা ছবিতে আশাই করা যায় না। বাংলা সিনেমার আগের চাইতে এখন কলাকৌশলগত উৎকর্ষ অনেক বেশী দেখা যায়। তাও সব ছবিতে নয়, কোন কোন বিশেষ ছবিতে। অথবা বিশেষ পরিচালকের ছবিতে। বাংলা ছবিতে অনেক সময় এমন টেকনিক্যাল কাজও দেখা যায় যা আজকের দিনে একেবারেই অচল, বিশ-পঁচিশ বছর আগে হলে না-হয় কথা ছিল।

* * *

টেকনিক্যাল কাজের মান উন্নয়নের ব্যাপারটার সঙ্গে ইনডাসট্রির দুর্দশা জড়িত বলে অনেকেই ভাবতে পারেন। একথা একেবারেই অমূলক হয়ত নয়। কিন্তু দুর্দশার দোহাই দিয়ে অক্ষমতা ঢাকা যায় না। একই পরিবেশে একই অবস্থায় এবং একই স্টুডিওতে উন্নত টেকনিক্যাল মানের ছবি এবং অতি নিম্ন টেকনিক্যাল কাজের ছবি একই সঙ্গে হয় কী করে? অর্থের ব্যবস্থা সমান অঙ্কের না থাকতে পারে। তবু একই যন্ত্রপাতিতে একই সঙ্গে ভাল ও নিম্ন মানের ছবিও হয়।

* * *

সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের গর্ব। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি এবং সাধারণ বাংলা ছবির মধ্যে বিস্তর ফারাক। এর কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি পাওয়া যায় কি? যে-কোন বিদেশী সমালোচক বা বোদ্ধা দর্শক সত্যজিৎ রায়ের ছবি এবং যে-কোন সাধারণ মানের ছবি পর পর দেখলে স্তম্ভিত হবেন। এরকম অঘটন কিন্তু আর কোন দেশের সিনেমায় দেখা যায় না। ওই সব সিনেমায় বেশ কয়েকজন বড় পরিচালক একই সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। সব ছবিরই মধ্যে প্রয়োগের বা কলাকৌশলের পরিচ্ছন্নতা ও কৃতিত্ব দেখা যায়। বাংলা সিনেমা সাধারণভাবে নাবালক, যেন বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে রয়েছে। তাই সকল

[illegible] আরো [illegible] হওয়া দরকার। [illegible] দেখা যাবে। [illegible] সিনেমা পরিবর্তনের সঙ্গে [illegible] না, [illegible] না। এখানেই [illegible] বাংলা ছবির [illegible]। বিদেশী চলচ্চিত্র দেখার প্রয়োজন একারণেই খুব বেশী। চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে আমাদের পরিচালক ও কলাকুশলী আন্তর্জাতিক [illegible] আরও [illegible] জানতে পারবেন। প্রচুর অভিজ্ঞতাও তাঁরা সঞ্চয় করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সিনেমা তৈরির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ-এর মতো। সরকার এ-বিষয়ে যে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা এ-কারণেই একটি বড় সংবাদ।

অভিনেতৃ সংঘের নাট্য-উৎসব

অভিনেতৃ সংঘ এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। বৃদ্ধ, অক্ষম ও দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য করাই এই উৎসবের লক্ষ্য। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, সংঘ অতীতেও দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও খরার সময় আর্তের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য সংঘের নানারকম পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে চিত্র-প্রযোজনা একটি।

শ্রী চট্টোপাধ্যায় আরও জানান যে, সংঘ ইতিমধ্যেই একটি সাহায্য-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। তাঁদের এখন প্রধান চেষ্টা হল দুঃস্থ শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা। অসহায় শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও তাঁদের আছে। তা ছাড়া নাট্যশিল্প সম্পর্কে চর্চা ও অভিনয়-অনুশীলনের জন্য লাইব্রেরী সমেত একটি অ্যাকাডেমি তৈরি করাও সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

"দুই বোন" (পরিচালনা : শচীন অধিকারী) ছবিতে বিদ্যা রাও ও গৌতম

এই সব পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সংঘ অনেক দিন যাবতই নানা সাহায্য-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন

সার্তাদিনব্যাপী নাট্য-উৎসবের (রবীন্দ্র সদনে) উদ্বোধন হয়।

সাংবাদিক বৈঠকে আমরা বিষয়ে আলোচনাকালে সৌমিত্রবাবু জানান, এই উৎসব-ব্যবস্থা যখন চলছে তখনই সংঘের অন্যতম সভ্য শ্রীশ্যাম লাহা হঠাৎ পরলোকগমন করেন। এই উৎসবের আয়োজনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার কথাও সংঘ ভাবছেন। শিল্পীদের কল্যাণে ছায়াছবি তৈরির কাজে সংঘ অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। অচিরেই পুরো খবর পাওয়া যাবে। প্রসংগত শ্রী চট্টোপাধ্যায় দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য শিল্পী সংসদের ছবি তৈরির কথা তোলেন। তিনি বলেন, এ-জাতীয় প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

ববি

(আর কে ফিলমস)

আইন যেহেতু, স্বেচ্ছাকৃত বিয়ের ব্যাপারে, নাবালক-নাবালিকার সপক্ষে নয় এবং অভিভাবকও যখন তার বিপক্ষে তখন সহজেই নাটক তৈরি হতে পারে। তবে ববি-তে নায়ক ঋষি কাপুরের পিতা প্রাণ ছেলের প্রেম ও বিয়ে বানচাল করার জন্য এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন যে, ছবিতে খল-চরিত্র রাখার প্রয়োজন কিছুটা সিদ্ধ। অন্য দিকে ষোড়শী নায়িকা ডিমপল কাপাডিয়ার পিতা প্রেমনাথও শেষ পর্যন্ত কন্যাকে স্বয়ম্বরা হতে দিতে রাজী নন। গোড়ায় তিনি গররাজী ছিলেন না, কিন্তু কোটিপতি প্রাণের কাছে অপমানিত হবার পর তাঁর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত।

লয়লা-মজনুর মতো রাজা ও ববি (ঋষি কাপুর ও ডিমপল) প্রেমের জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করেছে। পালিয়ে বেড়াবার সময় এক দুর্বৃত্তের হাতেও পড়েছে। তখন যথা-রীতি মারপিট। অর্থাৎ প্রযোজক-পরিচালক-চিত্র সম্পাদক রাজ কাপুর ববি-তেও মার-ধর জনিত উত্তেজনার ব্যবস্থা রেখেছেন এবং আরও কিছু গতানুগতিক উপাদান ঢুকিয়েছেন।

নায়িকা ডিমপলকে পরিচালক প্রায় সর্বক্ষণ মিনি স্কার্ট পরিয়ে রেখেছেন। অন্য পোশাকেও শরীর যথাসম্ভব অনাবৃত। ডিমপল এ-ছবিতে ধীবর-কন্যা, মাছের কারবারীর মেয়ে। সমুদ্রের জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সাঁতার কাটাও তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার পক্ষে সুইমিং কস্টুম পরে অভিজাত-মহলের সুইমিং পুলে নামা খুব স্বাভাবিক কি? পরিচালক যেন সারা ছবিতে এই কিশোরীর রূপ-যৌবন দেখাতেই ব্যস্ত। বক্স-অফিসে যে তার মার নেই সেটা রাজ কাপুর জানেন। ছবিটির উপর ভাগ্য আরও সুপ্রসন্ন, কারণ

"ববি"/ডিমপল, ঋষি কাপুর

রাজেশ খান্নার স্ত্রীকে দেখবার জন্য দর্শকরা ভিড় করতেই পারেন। ববি-র বড় আকর্ষণ হয়ত এটাই। ডিমপলের অভিনয় অবশ্যই খুব স্মার্ট, সিনেমায় এই প্রথম অভিনয় করছেন মনেই হয় না। নায়ক ঋষি কাপুর পিতার উপদেশ ও হাব-ভাব অনুযায়ী অভিনয় করে গেছেন। ওঁদের নিয়ে রাজ কাপুর অ্যাকশন ও রোমান্স সম্বলিত তৎক্ষণাৎ-উপভোগ্য প্রেমের নাটক ঠিকই গড়ে তুলেছেন। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সুরারোপিত অনাবশ্যক গানও রেখেছেন প্রচুর। অকারণে একাধিক নাচের দৃশ্যও রয়েছে। নানা বিষয়ের বহুলাই ববি-র বিশেষ লক্ষণ। টিন-এজারএর প্রেম নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছবিও হতে পারত, কিন্তু রাজ কাপুর হিন্দী চিত্রের মামুলি পথটিই বেছে নিয়েছেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

"চলচ্চিত্রের আটচালায় একই সঙ্গে বাস করে বিচিত্র ধরনের মানুষ। কেবল কে কী, সেইটেই সঠিকভাবে সনাক্ত করা বড় মুশকিল। আজ আপনার যাকে প্রগতিশীল চিত্র নির্মাতা বলে মনে হচ্ছে, কালকে দেখবেন অমুক চোরাকারবারির বা স্মাগলারের সংগে তারই সবচেয়ে খাতির, দেখবেন হয়ত সেই চোরাকারবারের অর্থেই দেশের সবচেয়ে সার্থক সমাজসচেতনমূলক ছবি তৈরী হচ্ছে! নামকরা সিনেমা হাউসের মালিককে কাল টাকার থলি উপহার দিয়ে সেই হাউসই নির্লজ্জ হচ্ছে অনাচারের প্রতিবাদে নির্মিত ছবি।

সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে, জুলুস নিয়ে, আন্দোলন করে যাঁরা খ্যাত তাঁদেরই ভিড় সরকারী সব কমিটিতে! একদল প্রশংসা করে প্রতিষ্ঠিতের পিঠ চুলকে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস পাচ্ছে, অন্যদল সব কিছুকে নাকচ করে, সব কিছুকে সাব স্ট্যান্ডার্ড বলে, সাফল্যকে ভাগ্যের বলে, অন্যকে ছোট করে নিজেদের বড় করতে চাইছে। কেউ বিদেশীর প্লট ডিঙিয়ে করে দারুণ অ্যাকশনওয়ালা দেশী ছবি বানিয়ে রেয়াব নিচ্ছে, আবার কেউ বিদেশী চিত্র-নাট্যের অনুকরণে চিত্রনাট্য লিখে তার ওপর ছবি বানিয়ে ওরিজিন্যাল চিত্রনাট্যকার হিসেবে পুরস্কৃত হচ্ছে।" এই বলে হাই তুললেন ভদ্রলোক। বললেন, "যবে থেকে লিখছি, তবে থেকেই ভাবছি, যারা পড়বে তারাও তো ভাববে, কিন্তু এখন দেখছি পত্র পত্রিকা পড়বার জন্য নয়। ভাববার জন্য নয়। সব কিছু ভীড়ে হারিয়ে যাবার জন্য। পাঠকের, দর্শকের রুচি যাদের জন্য এত জঘন্য, যারা প্রথম পৃষ্ঠায় অর্ধনগ্ন নায়িকার ছবি ছাপে, আর পাতায় পাতায় হিন্দী ফিলিমের নগ্নতম দৃশ্যের চেয়েও নগ্ন কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনের ছবি ছাপে, তারাই যখন আর্টফিলিমের প্রয়োজনীয়তার ওপর সম্পাদকীয় লেখে, তখন বিশ্বাস করুন আমার দুঃখে হাসি পায়। এই হচ্ছে আমাদের হতভাগ্য দেশ।"

পাগল হয়ে যাবার ভয়ে ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি লেখাও ছেড়ে দেব। আবার ভাবছি সবই যদি ছেড়ে দি তাহলে ধরবো কি? জীবনের জন্য জীবিকা আর জীবন এবং জীবিকা মিলে এক বিচিত্র গর্ভযন্ত্রণা।

সরল শর্মা

ওয়াহিদা রেহমান বাগদত্তা।

আমার মতে যে বছরটি চলে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে বিয়ের বছর, এবং যে বছরটি আসছে সেটি সন্তান সম্ভাবনার। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা গেছে, জয়া ভাদুড়ি, মৌসুমী চ্যাটার্জী, ডিমপল কাপাডিয়া এবং রাখী—এঁরা সকলেই সন্তানসম্ভবা। তবে দুঃখের ব্যাপার, তনুজা তাঁর প্রথম সন্তানটি হারিয়েছেন। কথায় আছে: জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। প্রজাপতিদেবের শুভ দৃষ্টি এখনও চিত্রজগতের প্রতি নিবদ্ধ আছে। সম্প্রতি যে শিল্পীটি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন তিনি হলেন ওয়াহিদা রেহমান। তাঁর বিয়ে পাকা হয়ে গেছে ফরিদ আহমেদ সিদ্দিকের সংগে। এ খবর সকলেরই জানা। ফরিদ আহমেদ উত্তর-প্রদেশের বিজনোরের একজন ধনী ব্যবসায়ী। ওঁদের এই রাজযোটক বিয়ের ব্যাপারটাকে মদনদেবের কর্মকাণ্ড বললে ভুল বলা হবে। বরং বলা যায় প্রজাপতির নির্বন্ধ। এ বিয়ে স্থির হচ্ছে পারিবারিক সূত্রে। পাকাদেখা এবং পাকা-কথা অর্থাৎ এনগেজমেনটের

ব্যাপারটি অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। বিয়ের আগে ওয়াহিদা রেহমানের ব্যাপার বলছি।

সেই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে —যখন ওয়াহিদা রেহমান গুরু দত্তর "সি আই ডি" ছবিতে প্রথম অভিনয় করলেন—সেই তখন থেকেই ওয়াহিদা অভিনেত্রী হিসেবী খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিতা। গুরু দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নানা মুখরোচক খবর তখন বাজার সরগরম করে রেখেছিল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুরু দত্তর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী গীতার বিচ্ছেদও ঘটে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। ওই সময় ওয়াহিদা প্রায় সকলেরই সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। গুরু দত্তর মৃত্যুর পর সকলেই আশা করেছিলেন ওয়াহিদার সঙ্গে দিলীপকুমারের বিয়ে হবে। ও'রা একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন "রাম ঔর শ্যাম", "আদমী" এবং "দিল দিয়া দর্দ লিয়া" ইত্যাদি ছবিতে। সকলেই যখন ও'দের বিয়ের তারিখটি ঘোষণার অপেক্ষায় আছেন তখন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে মাত্র ৫৬ ঘণ্টার চিন্ত-ভাবনায় দিলীপকুমার ঘোষণা করলেন তিনি সায়রা বানুকে বিয়ে করবেন। ওই সময় দিলীপকুমারের বরানুগমনের কালে নার্গিসের একটি উক্তি আমার স্পষ্টই মনে আছে। শ্রীমতী নার্গিস নিচু গলায় শাম্মিকে বলেছিলেন যে এখন তাঁর মনের মধ্যে কেবলই ভেসে ভেসে উঠছে ওয়াহিদার মুখখানা। সে বেচারা হয়তো এখন তার ঘরে নিরালায় বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। এই ঘটনা ওয়াহিদার বুকে শেলের মত বিঁধেছিল। বেশ কিছুদিন তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, এর পরে তেহরাণে "সুবা ঔর শাম" ছবির শুটিং-এর সময় শোনা গিয়েছিল ওয়াহিদার সঙ্গে সঞ্জীবকুমারের হয়তো বিয়ে হতে পারে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। ও খবরটা মনে হয় নেহাতই দুষ্টু জনের রটনা।

যাই হোক, সব রটনা আর গালগল্পের এখন ইতি। ওয়াহিদা এখন নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে। সকলে নিশ্চয় তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবেন। ফরিদ আহমেদের সঙ্গে ওয়াহিদাকে মানিয়েছে বড় সুন্দর। যদিও ফরিদ বয়সে একটু ছোটই হবেন। ও'দের বিয়ের উৎসব হবার কথা ছিল এই নভেম্বরেই। কিন্তু কী কারণে যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটা হবে আগামী বছরের গোড়ার দিকে।

বিনোদ মেহরা-রেখার বিয়ে

গত আগস্ট মাসে এখানে জোর গুজব রটে যে বিনোদ মেহরা ও রেখার বিয়ে হয়ে গেছে। সংবাদের সত্যতা স্বীকার অথবা অস্বীকার করা হয়নি কোন পক্ষ থেকেই। বরং হাবে ভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল যে এটা একটা বাজে গুজব।

কিন্তু এখন আমার যা খবর তাতে জানা যাচ্ছে ব্যাপারটা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। রেখা এবং বিনোদ মেহরা এখন আইনত স্বামী-স্ত্রী। বিয়ে হয়েছে গত আগস্টের মাঝামাঝি কলকাতায় জনৈক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে। বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন হেমন্ত মুখার্জী এবং কমেডিয়ান অজিত চ্যাটার্জী। বিয়েটা ঘটেছে খুব গোপনে। এ ব্যাপারে কেন এত গোপনীয়তা রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে সম্প্রতি আমার সঙ্গে রেখার দেখা হয়েছিল মোহন সাইগালের "উও—ম্যায় নহী" ছবির সেটে। উনি শুটিং করছিলেন নবীন নিশ্চলের সঙ্গে। রেখাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ সম্পর্কে, কিন্তু সে কোন পাত্তাই দিল না। অবশ্য এ সংবাদের স্পষ্ট প্রমাণ আমার হাতেই আছে। আমার বিশ্বাস এ খবর জানার পর নব-দম্পতীকে সকলেই প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাবেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

পরলোকে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৮ নভেম্বর কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র-জীবন শুরু হয় চিত্র-পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর অধীনে। প্রথম স্বাধীনভাবে চিত্র-পরিচালনা করেন ১৯৬২ সালে "কাজল" ছবিতে। এর পর তিনি যে ছবিগুলি করেন তার মধ্যে 'দেয়া নেয়া', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'মা ও মেয়ে' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর শেষ ছবি "কবি" বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এককালে ক্রীড়াবিদরূপেও বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কালীঘাট ও টাউন ক্লাবে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলতেন। সদালাপী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটি অনেকেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চিত্রজগতের অনেক ব্যক্তি তাঁর বাসভবনে এসেছিলেন শ্রদ্ধা জানাতে।
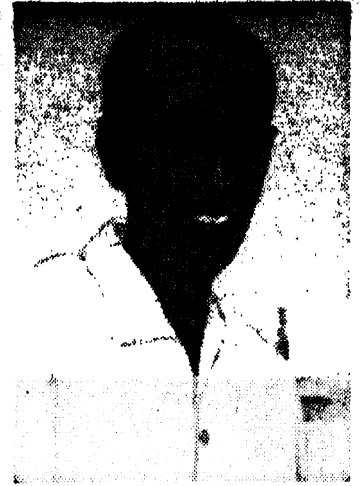
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় বিলায়েত খাঁ

'কলাসঙ্গম' গোষ্ঠী তাঁদের প্রথম নিবেদন রাখলেন তিন দিনের এক উচ্চাঙ্গ সংগীতের সম্মেলনের মাধ্যমে, রবীন্দ্রসদনে। পরিমিতি এবং বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় সে আয়োজনে। তিন দিনের তিনটি অনুষ্ঠানে আমরা পেলাম ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, বেগম আখতার, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, শ্রী এম এস গোপালকৃষ্ণণ এবং কুমারী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়াকে।

ওস্তাদ বিলায়েত খাঁয়ের কথা দিয়েই শুরু করা শ্রেয়। শিল্পীর এ শহরে জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। তার কারণও নিটোল করে ফুটে উঠতে দেখলাম সেদিনের বাজনায়। নিখাদ সেতারবাদনের এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত। বিনোদনী প্রকরণও সে রীতিতে যেন আনার ওপর আঠার আনা। বিলায়েত বাজালেন ইমন কল্যাণ।

বলা যেতে পারে আলাপে, কিংবা

ড়ের প্রথমাংশে বাজনা ঠিক দানা বাঁধল সে সময় একরকম মনেও হল বিলায়েতের পক্ষে ইমন কল্যাণের থেকে ইমন নক প্রাসঙ্গিক রাগ। কিন্তু ক্রমে জোড়ের অংশ থেকে সমস্ত আসরকে বন্দ করে রাখলেন শিল্পী। যেমন ছন্দের কাজ তেমনই মীড়, তান, বটের সমারোহ। সর্বোপরি অখণ্ড বন্দের ঝালা। বিলায়েত হাতের কাজের মধ্যে দেখালেন তিন সপ্তক জুড়ে বিদ্যুতের মত তান, সুরের বিস্তৃত অনুরণনের মাধ্যমে কম্বিনেশনের উত্তরণ, গোলাম আলি সাহেবের কায়দায় তকি'ব এবং পুকার, এবং সূক্ষ্ম ছন্দের সহযোগে জয়পুর স্টাইলের জমজম।

তিন তালে কেরামত খাঁর চমৎকার সহচার্য বিলায়েত বেশ গম্ভীর করে গত্ বাজান। বিলায়েতের গায়কী ঢঙের প্রশংসায় অনেক কিছুই শোনা যায়। সেতার যন্ত্রটির মানব বলা হয় ওঁকে। কিন্তু যে কথাটা তিনি বারংবার স্মরণ করালেন সেদিন তা হল ওঁর লয়কারীর চাতুরী। গানের অংগে বাজালেও নিছক ঠেকাতে ধরিয়ে রাখলেন না কেরামত খাঁকে। বরং লড়ন্ত কি সওয়াল-জবাবের মত মোটা আঁচড়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়ে সূক্ষ্ম লয়ের সম্প্রসারণের ভেতরই নিবিষ্ট রাখলেন বাজনার টেনশনকে। এটা চাট্টিখানি কথা নয়। উপরন্তু মনে রাখা দরকার, বিলায়েত সুরের স্রোতে কিন্তু কখনই ভাটা আসতে দেননি। প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে শিল্পী ঝালায় চড়ে বসেছিলেন। সে সময় কেরামত খাঁর না ধিন্ ধিন্ না, বড় মধুর ছন্দ মিশেছিল সে ঝালায়। না দেখলে বিশ্বাস হয় না, বিলায়েতের ঝালায় দানার খেপগুলো কী নিখুঁতভাবে আসে। আর তাও সেই পঁচিশ মিনিট ধরে।

ইমন কল্যাণেরই দুনীতে শিল্পী সময়াভাবের জন্য একটা রাগমালিকার অবতারণা করেন। প্রায় ১২টা রাগ আমরা শুনলাম সেই ভাব—তিলক কামোদ, দেশ, বেহাগ, শংকরা, যোগ, বাহার, মল্লার, খাম্বাজ ইত্যাদি। সেতারের ঘাট (ফ্রেট) বদল না করে যে কী ভাবে এটা হয় ভাবতেও অবাক হই। তাছাড়া একটু সুরের রেশ ছড়িয়ে বিলায়েত প্রায় বেশ কটা রাগ তানও শোনালেন।

শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে শিল্পী আসর শেষ করলেন আনন্দ ভৈরব দিয়ে।

ওস্তাদ আমীর খাঁ গাইলেন বিস্তারিত ভাবে চৌতালে হেমকল্যাণ, পরে কাফী কানাড়া, এবং শেষে তরানা। হেমকল্যাণের মধুর স্বভাব একটা সংবেদনশীল মূর্তি পেয়েছিল খাঁ সাহেবের পেশকারিতে। প্রভূত আলাপের মজা ছিল বিলম্বিত বিস্তারে। পরে ছন্দময় তানে শিল্পী যথেষ্ট আমোদ সঞ্চার করেছিলেন। কাফী কানাড়াতে কম্বিনেশনের উৎকর্ষ ছিল। তবে কানাড়া নিবেদনটি ঠিক প্রথমটির মত ভাবামোদের নয়, এবং এতে মননশীলতার আধিপত্যই লক্ষণীয় ছিল। উল্লেখ করা অবশ্যক, হেমকল্যাণের একাধিক মীড়ের সময় মিষ্ট সুরের কারুণ্যকে আমরা প্রচণ্ড অনুভব করেছি।

খাঁ সাহেবের সঙ্গে ভাল সংগত করেছিলেন শ্রীগোবিন্দ বসু।

তবে এ সম্মেলনের গানের আসরে সবচেয়ে দুরন্ত কাজ দেখালেন বেগম আখতার। জোর গলায় বলতে পারি গত বছর দশেকের মধ্যে এত সাফা গলায় ওঁকে আমরা পাইনি। দুরূহ গলার কাজ একটিও তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন না। ঠুংরীতে চমৎকার স্কেলের কাজ করলেন, হরেক রকম মোড় নিলেন বক্তব্য প্রকাশ করতে এবং এক সময় একটু বিলম্বিত খেয়ালের ঢঙে বোলবিস্তার করলেন। বেগমকে গাইতে খুবই অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন সারেঙ্গীতে সাগিরুদ্দিন খাঁ এবং তবলায় কেরামত খাঁ।

বেগম প্রথমে গাইলেন পিলুতে "সইয়া গয়ে পরদেশ"। পরে ধরলেন,—ওঁর বিখ্যাত গজল "মুঝে কোই গম ন থা"। কেবল গলার কাজের বিবরণ দিয়ে এ গানের ধারণা দেওয়া অসম্ভব কারণ রবীন্দ্রসংগীতের মতই এর একটা বিরাট অংশ লুকিয়ে আছে বাণীর মর্মস্পর্শিতায়। তাই পাঠকের জন্য এ গজলের কটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছিঃ

মুঝে কোই গম ন থা,
ন থী দুশমনি কিসিসে,
তেরী দোস্তিসে পাহলে॥
ইয়ে হায় মেরা বদনসীবী,
তেরা প্যার কসরে ইসমে,
তেরা গমসে মার ডালা
মুঝে জিন্দেগীসে॥

এই কথাতেই (তাও সবটা দিতে পারলাম না) সুর জুড়েছিলেন বেগম সাহেবা। এবং সে রেশ থাকতে থাকতেই ধরলেন পাহাড়ীতে দাদরা "ও বেদরদী, সপনমে আ যানা"। দেশোয়ালী রীতিতে গাওয়া এ গান এবং ভেজপুরী স্টাইলে গাওয়া 'সুন্দর সারি' এখনও কানে বাজছে। বেগম নতুন করে ওঁর পুরনো কথা শুনিয়েছিলেন 'কোয়েলিয়া' ঠুংরী ও 'ইয়ে মুহব্বৎ' গজলে।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশী গেয়েছিলেন পূরিয়া কল্যাণ। সুন্দর আলাপ্ করে খেয়ালে এসেছিলেন শিল্পী। তবে মাঝখানে মাইকের দুর্দশার জন্য এবং কিছু অসহিষ্ণু শ্রোতার চেঁচামেচির জন্য তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল গানের মজা ধরে রাখতে। নিম্নশ্রেণীর শিল্পী হয়ত সেই আন্দোলনে রাগের শকল্ ভুলে যেতেন। যাই হোক, ভীমসেন সমস্ত মনোযোগ রাখলেন রাগের তিল তিল ডিটেলে। ক্ষণে ক্ষণে গভীর মীড় ওঁর গানকে একটা ভাবসৌকর্য দিয়েছিল। ওঁর তানও ছিল একাধিক বাজনায়। পরে ওঁর হরি-ভজন—যো ভজে হরিকো সদা—শ্রোতার মন তোলপাড় করেছিল। যোশীজীর শেষ নিবেদন ছিল একটা মিশ্র গারা ঠুংরী। তাতে কিছু টপ্পাঙ্গীয় কাজ দেখেছি।

এম এস গোপালকৃষ্ণাণ সঠিক অর্থে একজন সার্থক শিল্পী। ওঁর বেহালার ছড়ে অনেক কিছুই আছে যা অনেক হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতের বেহালা শিল্পীর হাতে নেই। কর্ণাটকী এবং হিন্দুস্থানী উভয় স্টাইলেই পারঙ্গম গোপালকৃষ্ণণ। এই দুই স্টাইলেই উনি বাজালেন হংসধ্বনি। এই গতে স্ট্রোকের সৌন্দর্য ধরা পড়ল। ওঁর স্কেলের কাজও খুব চোখা। পূরিয়া ধানেশ্রীর আলাপ, জোড়, ঝালায় দেখলাম শিল্পীর ছড় ঘষার কায়দায় বেশ আদর এবং অনুভূতি আছে। হিন্দুস্থানী স্টাইলের কোমল মীড়, কিংবা কর্ণাটকীয় ছোট, বক্র ছন্দের কাজ প্রসঙ্গমতন ব্যবহৃত ছিল। মৃদঙ্গের মাপা ছকের সংগত গত-ঝালায় বেহালাকে বিশেষ সহচর্য দেয়।

শিল্পীর হাতে দক্ষিণী রাগ মোহন-এ ধুন শুনেও অবাক হয়েছি। হিন্দুস্থানী পাহাড়ীর মতন কিছুটা। তবে পাহাড়ীর থেকেও মোহনের চলন গম্ভীর। সেই গাম্ভীর্যকেই কিছুটা আলগা করলেন শিল্পী দেশোয়ালী গানের অঙ্গসূত্রে।

শেষের দিকে গোপালকৃষ্ণাণ বাজিয়েছিলেন ভীমপলশ্রী এবং ভৈরবী।

সম্মেলনের একমাত্র নাচের আসরে ছিলেন কুমারী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়া। ওঁর ভরতনাট্যমে তৈরির কাজই বেশী। অভিনয়টা কিছুটা দুর্বল। তা ছাড়া খানিকটা অস্থিরতাও বুঝি শিল্পীকে পেয়ে বসে মুদ্রা নিবেদনের নিগূঢ় মুহূর্তগুলিতে। আসলে নিখাদ নৃত্যের একটা বিশেষ পরাকাষ্ঠাই হল—ভাবনার মূর্তির মতন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা। সবচেয়ে সচল মুহূর্তে, মনে হয়, নিখাদ নৃত্য শরীরের তরফে অচল—কিছুটা সিনেমার স্টিলের মতন কিংবা স্টানিস্লাভস্কির পরম নাট্যমুহূর্তের মতন। এবং এই বোধেই উত্তরণ যে কোন ভরতনাট্যম শিল্পীর। কুমারী বড়ুয়ার প্রয়োজন হয়ত সংযম। কিছুটা অভিনয়-দক্ষতা। আর তা হলেই অপলকভাবে দেখবার মতন হয়ে উঠবে ওঁর নাচ।

সেদিনের নাচ নিয়ে আর কিছু বলার নেই আমার।

সংগীত-সমালোচক

নয় বাম দলের বাংলা বন্ধের ডাক বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শনিবার বন্ধের দিন কলকাতা শিল্পাঞ্চল সমেত রাজ্যের সর্বত্র মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে কেটেছে। দু' চারটি জায়গায় রেল লাইন অবরোধ করার চেষ্টা হলেও ট্রেন চলাচল করেছে, বিমান উড়েছে। কলকাতা ও শহরতলিতে বাস ও ট্রাম চলেছে। তবে অন্য দিনের তুলনায় যাত্রী কম। গত জুলাই মাসে বন্ধ-এর দিন প্রাইভেট বাস রাস্তায় বের হয়নি। এবার হয়েছে। এবার ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় কম দেখা গিয়েছে। মিনি বাস একরকম বের হয়নি বললেই চলে। সকালে বেশিরভাগ বাজার খোলা ছিল। কিন্তু বিকিকিনি খুব একটা হয়নি। শহর ও শহরতলির বড় বড় দোকান-গুলির বেশীরভাগ বন্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় রাজ্য সরকারী অফিস-গুলিতে হাজিরা বেশী ছিল। ব্যাংকগুলিতে এক তৃতীয়াংশ কর্মচারী হাজির হন বলে জানানো হয়। পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এদিন বন্ধ-এর ডাক দিয়েছিলেন। পরে তা সমর্থন করে এই বন্ধ পালনের জন্য নয় বাম দল আহ্বান জানান। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর তীব্র বিরোধিতা করা হয়। এই নয়টি দল হল—সি পি আই (এম) আর এস পি, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কারস পার্টি, আর সি পি আই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। সরকার এবং কংগ্রেস দলও যে বন্ধের ব্যাপারে সংযত আচরণ দেখিয়েছেন সে জন্য সি পি আই খুশি।

দেশী সংবাদ

১২ নবেম্বর—আজ লোকসভায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধী দল সরকারের নিন্দা করতে চেয়ে যে মুলতুবী প্রস্তাবটি আনেন ১৩২-৩৯ ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। আনীত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেলেও বিরোধী সদস্যদের উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হয়েছে। কতগুলি অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য সরকারই দায়ী এই অভিযোগ করে দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারী ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর সমালোচনা করেন।

আগামী সংসদে সংসদ সদস্য ৭৭ বছর বয়স্ক শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর সদস্য পদের ৫০ বছর পূর্ণ করবেন। এটা ঐতিহাসিক। শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে কোন ব্যক্তি একদিন একটানা সংসদ সদস্য ছিলেন না। স্যার উইনস-টন চার্চিল ৫০ বছরের বেশি থাকলেও মাঝ-খানে দুবার তিনি ছিলেন না।

১৩ নবেম্বর—লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী জি এস ঢীলন আজ এই মর্মে এক রুলিং দিয়ে-ছেন: যদি জরুরী কারণ বা পরিস্থিতি না থাকলে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সরকারের পক্ষে অর্ডিন্যান্স জারি না করাই উচিত।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের কাজকর্মে রাজ্য কংগ্রেস সন্তুষ্ট নয়। তাঁকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে এই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানান হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি বলেন, না ভেবেচিন্তে খাদ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যখন তখন আলোচনায় বসছেন। একের পর এক অদলবদল ঠিক করে যাচ্ছেন। অথচ দায় নিয়ে সব কিছু মুখ্যমন্ত্রীকেই করতে হচ্ছে।

১৪ নবেম্বর—১৯৭১-৭২ সালে এই দু বছরে ভারত সরকার পশ্চিম বাংলায় নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য মাত্র পাঁচটি লাইসেন্স ও মাত্র একটি মোটর ভ্যান ইনটেন্ট মঞ্জুর করেছেন। অথচ এই একই সময় মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে জুটেছে ৩১টি শিল্প লাইসেন্স ও ৬৫টি লেটার অব ইনটেন্ট।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ২১ নবেম্বরের পর ঘোষণা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বুধ-বার রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতি-নিধিদের আলাদা আলাদাভাবে ওই কথাই জানিয়ে দিয়েছেন।

১৫ নবেম্বর—নয় বাম দলের আইন অমান্যের শেষ দিন—আজ কলকাতা পুলিশ ৬১০ জনকে গ্রেফতার করে। এসপ্ল্যানেড ইস্ট অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে, বামপন্থী নেতারাও আইন অমান্য করেন। কিন্তু তাঁদের হেয়ার স্ট্রিট থানায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ কমিশনার বলেন, তাঁদের গ্রেফ-তার করা হয়নি।

আংশিক রেশনে যে পরিমাণ খাদ্যের বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছিল তা অবিলম্বে আবার দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। বিধিবদ্ধ এলাকাতেও কাটা রেশন পূরণ করার চেষ্টা হবে পয়লা জানুয়ারি থেকে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছে মুখ্য-মন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

১৬ নবেম্বর — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের সূচনা হিসাবে আরটস, সায়েন্স কমারস কলেজ কনট্রোলার বিভাগের পৃথক পৃথক সেল খোলা হবে। এখান থেকেই সেই বিভাগের পরীক্ষা পরিচালনা এবং ফল প্রকাশের ব্যবস্থা হবে।

বেলিফদের নিয়মমাফিক কাজের ফলে কল-কাতা করপোরেশনে নবেম্বর মাসে এ পর্যন্ত এক পয়সাও পৌরকর আদায় হয়নি। আশংকা করা যাচ্ছে সারা মাসে হয়ত অবস্থা এমনই চলবে। জানা গিয়েছে যে, পৌরসভার আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আট কোটি টাকার মত কর অনাদায়ী পড়ে আছে।

১৭ নবেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম-দিন পালনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯ নবেম্বর যে সভা ডেকেছিলেন তা প্রধান-মন্ত্রীরই অনুরোধে বাতিল করা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, তিনি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে কোন উৎসবের পক্ষপাতী নন।

ব্রেবোর্ন রোডের চোরাকারবারের অপরাধে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের একটি দোকানের মালিক মহম্মদ এম ভকিলের ২০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দু মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। প্রেসি-ডেন্সি ম্যাজিসট্রেট ভারতরক্ষা বিধি ও অত্যা-বশ্যক পণ্য আইন অনুযায়ী এই আদেশ দেন।

১৮ নবেম্বর—গতকাল সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমা (৯৬) দেহরক্ষা করেছেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত ক'মাস তিনি কারো সঙ্গে দেখা করছিলেন না। জনগণ তাঁকে শেষ দেখেছেন এই বছরের ১৫ আগস্ট। শ্রীমার নশ্বর দেহ শ্রীঅরবিন্দের সমাধির কাছে আশ্রমের আরাধনা কক্ষে শায়িত আছে। সোনালী রেশমী কাপড়ে তাঁর দেহ ঢাকা।

বিদেশী সংবাদ

১২ নবেম্বর—মারকিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগার আজ পিকিং-এ চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডঃ কিসিংগার তিন দিনে আজ তৃতীয়বার চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইএর সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

১৩ নবেম্বর—ব্রিটেনে বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবেলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এডওয়ারড হিথ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। যাতে উপযুক্ত পরিমাণে কয়লা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে সেজন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৪ নবেম্বর—আমেরিকা বলেছে যে, চীন একটাই এবং তাইওয়ান চীনের এই দাবি আমে-রিকা চ্যালেঞ্জ করে না। মারকিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগার চারদিনব্যাপী পিকিং সফর শেষে প্রচারিত এক যুক্ত ঘোষণায় এই কথা বলা হয়েছে।

১৫ নবেম্বর—ফিলিপিন এবং সিংগাপুরের তেল কোম্পানিগুলি নোটিশ দিয়েছে: মারকিন সপ্তম নৌবহর এবং মারকিন ফাইটার প্লেন তাঁরা পশ্চিম এশিয়ায় তেল সরবরাহ করতে পারবেন না। মারকিন পররাষ্ট্র দফতর আজ এই ব্যাপার সমর্থন করছে।

১৬ নবেম্বর — সারওয়াকের জঙ্গলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে গত বুধবার থেকে সংঘর্ষ-এর আধা সামরিক জাতীয় রক্ষীবাহিনী ও বাংলা-দেশ রাইফেলস-এর লোকজনের সাহায্য আজ .... এগিয়ে গিয়েছে। সারওয়াকের উপকূলবর্তী এলাকায় অনেক দিন ধরে উগ্র-পন্থীরা ঘাঁটি গেড়ে দিন কাটাচ্ছে।

১৭ নবেম্বর—চারদিন ধরে হাজার হাজার ছাত্রের মারমুখী বিক্ষোভের পর সরকার আজ সারা গ্রীসে সামরিক আইন জারি করেছে। ছাত্র-দের দাবি: প্রেসিডেন্ট জরজ পাপাদোপউলসের সামরিক সমর্থনপুষ্ট সরকারকে গদিচ্যুত করতে হবে।

১৮ নবেম্বর—জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকাকুই তানাকা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, চীন এবং তাঁর দেশ চায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় থাকুক। সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে, চীন এখন বুঝতে পেরেছে এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি দরকার।

রঙের মত রঙ

ICI ডুলাক্স

পাকা রঙের ছোঁয়ায় আপনার স্বপ্ন রূপায়িত হয়ে উঠবে

★ আপনি যেমনটি চান, আপনার রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী উজ্জ্বল বা হাল্‌কা, রকমারি রঙের বাহার এনে দেয় সুশ্রী ও সুন্দর—ডুলাক্স।

★ ডুলাক্স দিয়ে রং করা জিনিস সহজেই ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় কারণ ডুলাক্স পুরোপুরি জল-নিরোধক।

★ নিখুঁত ফিনিশ—ডুলাক্স রঙে হেরফের নেই।

★ ডুলাক্স সতিকারের পাকা রং, ফিকে হবে না। আপনার রঙের স্বপ্নকে সার্থক ও স্থায়ী করবে।

রং দেখতে ভালো লাগে,
তবে ভালো রং করতে হলে
রং সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা দরকার।

নামকরা একজন স্থপতিকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তিনি কি বলেন

একাধারে স্থপতি ও স্থাপত্যবিদ্যার অধ্যাপক প্রোফেসর এ. কে. ব্যানার্জিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন, "রঙ লাগাবার ছক তৈরী করাটা আসলে সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অঙ্গ। প্রথমে বাড়ীর ভেতরটা আগাগোড়া ভালভাবে দেখে নিতে হবে—প্রতিটি ঘর, কোন্ কাজে ঘরটার ব্যবহার, ঘরের আয়তন ও গড়ন এবং ঘরে আলোর ব্যবস্থা কি ধরনের এসব বুঝে নিয়ে ঘরের ভেতরকার সাজসজ্জার মোটামুটি পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এবার দেয়ালে কোন্ রঙ লাগালে ভাল হবে সেটা ঠিক করে নেবার পালা—এমন রঙ নির্বাচন করতে হবে যাতে আভ্যন্তরীণ প্রসাধন ও সাজসজ্জার মিলেমিশে একটা পরিপূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে, এমন কি কোথাও খুঁত থাকলে তা ঢেকে যায়। আমি নিজে এমন রঙ পছন্দ করি যে-রঙ প্রকৃতিতে দেখতে পাই—তাতে চোখ ক্লান্ত হয়না, তাছাড়া রঙের খেলা ফুটিয়ে তোলাও সোজা। তবে দেয়ালে খুব উজ্জ্বল রঙ ভেবেচিন্তে লাগাতে হয়। আরেকটা কথা—ঘরের প্রসাধন দেখবার মত করতে হলে ভালো রঙ বেছে নেওয়া চাই—হেরফের হলে চলবে না।"
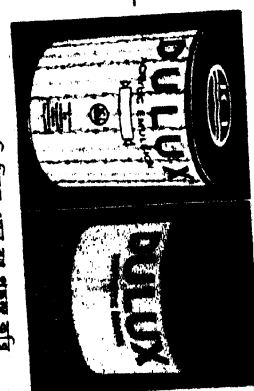
ডুলাক্স ইনফরমেশন সার্ভিস
পোঃ বক্স ১০২২২ কলিকাতা ৭০০০১৯

ডুলাক্স রং দিয়ে ঘর সাজানো পরিকল্পনার একটি কোভার অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠাবেন।

নাম ....

ঠিকানা ....

পেশা ....

ডুলাক্স প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা :
দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল্‌স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ডুলাক্স—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, লণ্ডন-এর ট্রেডমার্ক।
রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী : দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

গৃহসজ্জায়—ICI ডুলাক্স আপনার পরম বন্ধু

ACCI (P) 7745

৪১ বর্ষ] শনিবার, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 8th December, 1973 ... পয়সা [সংখ্যা

সূচীপত্র

প্যান্টীন সম্বন্ধে উপদেশ আর মতভেদ

“এটা হেয়ার ড্রেসিং, ডার্লিং!”
“এটা হেয়ার টনিক, ইয়ার!”

হ্যাঁ, সত্যিই তাই!
যাঁরাই প্যান্টীন ব্যবহার করেন, —প্যান্টীন ব্যবহার করতে বলেন। কিন্তু প্যান্টীন যে কি করে তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে জোর দিয়ে বলেন এটা সবচেয়ে সৌখিন হেয়ার ড্রেসিং। অন্যেরা দাবী করেন এটা সবচেয়ে কার্য্যকরী হেয়ার টনিক।

শ্রীমতী জ্যাকী ক্যাশানওয়ালা, ২৩,— “হেপিনেস” বুটিকের মালিক-ডিজাইনার বলেন, “ইট্‌স্ অল এ ফ্রেশ-সেন্স, ডার্লিং! তেল চটচট গ্রীসি চুল হামি সহ্য করতে পারি না—কান্ট স্ট্যাণ্ড ইট! আই ডিগ এ ন্যাচারাল লুক ইন হেয়ার! ওয়েল-গ্রুমড্, ন্যাচারাল লুকিং চুল—গর্জাস! এ্যাণ্ড জন্যই তো আই ইউজ প্যান্টীন!”

শ্রীমতী ক্যাশানওয়ালা ঠিকই বলেছেন—প্যান্টীনে চুল তেলতেলে হয় না অথচ সুবিন্যস্ত থাকে। কিভাবে দেখুন: ক) মাথবার সময় অ্যালকহল আধারিত প্যান্টীন চুলের গুচ্ছির ভেতর প্রবেশ করে, খ) এতে আপনার চুল ‘ভিজে’ গিয়ে আয়ত্তের মধ্যে আসে আর সেট করতে সুবিধে হয়, গ) একবার সেট হয়ে গেলে অ্যালকহল উবে যায়, (ফলে স্বাভাবিক দেখায়) চুলে থেকে যায় ‘ফিক্সার’, যার দরুণ আপনার চুল ঠিক জায়গায় থাকে, আর ঝলমলে সুন্দর দেখায়, ঘ) এর বৃদ্ধ ফরমুলা সারাদিন আপনার চুলকে সতেজ করে রাখে।

বাইরে, ঘরের যত্ন

নিউওয়েভ ফিল্ম প্রযোজক-পরিচালক শ্রীরাজু কিলাম্‌কার, ৩৯, চিন্তার মগ্ন—“প্যান্টীন? হুম্…হাঁ…ইয়াদ আছে—হামার ফিলাম্ ‘পেয়ার, জীবন, মৌথ’ যেখন খতম হয়া, তেখন পহ্‌ল্‌ধ্‌বার এটা বেব্‌হার করলম! রাতদিন শুটিং শুটিং শুটিং…খানাপিনা নিন্দ হারাম…তার উপরে ডিস্ট্রিবিউটর, সেন্সর, ×?!+—কোতো কোতো ঝামেলা—এক তো বহুত্ নষ্টি, তার উপরে সোচ সোচকর মাথার চুল খতম্ হোবার অভস্থা!”

শ্রীমতী জ্যাকী ক্যাশানওয়ালা—ফ্রেশ-সেন্স, ডিগ?

“হামার মেক-আপ ম্যান প্যান্টীন বেব্‌হার করতে বোলা। বোলা চুলের মূলের ভিতরে কুছ্ গণ্ডগোল হোবে তো বি-কমপ্লেক্স গ্রুপ থিকে এক ভিশেষ ভিটামিন, প্যানথেনল—চুলের মূলকে খুনের প্রবাহ দিবে এমন সব পোষক পদার্থ মিঁচ্ মেরেছি যা কোরে যো অন্য কোই পারে না। উপরন্তু, প্যান্টীন খুসকিকে লড়াই কোরে হামার মথা সাফ রেখেছিল।”

“প্যান্টীন বেব্‌হার করতে করতে মাত্র দো হফ্তাকে ভিতরে হামার চুল উঠা বন্ধ! হামার ফিলামভি হিট হয়া। ফিলাম খুব ভালো চলা…”

কোনো পক্ষ না নিয়ে আমরা এইটুকুই পরিষ্কার করে বলতে চাই যে প্যান্টীন হল চুল সুবিন্যস্ত রাখার তেল-হীন উপায়, যা চুল ওঠা বন্ধ করে!

শ্রীরাজু কিলাম্‌কার—হামার চুল উঠা বন্ধ!

প্যান্টীন! চুল সুবিন্যস্ত রাখার তেল-হীন উপায়, যা চুলওঠা বন্ধ করে!

Creative Unit-802 BN

সূচীপত্র

এই চমৎকার ‘লেমন সেট’ দেখতেই শুধু দামী,—আসলে দাম বেশী নয়।

এই ইয়েরা ‘লেমন সেটে’ ৬টি মনোরম গেলাস এবং তারসঙ্গে একটি সুন্দর ‘জাগ’ থাকে। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত, কারণ ‘জাগে’ বিশেষ প্লাস্টিক ঢাকনার ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ, যেমন সুন্দর, তেমনই ন্যায্য দাম।
আপনার বাড়ীতে কি আপনি রাখবেন না?

LEMON SET

ইয়েরা লেমন সেট—
আপনার বাড়ীতেই এ সেট শোভা পায়।

নির্মাতা: অ্যালেম্বিক গ্লাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা।

JAISONS-3189 BBn

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুধা গোগাতে

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬

শনিবার ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ।

turday 8 December 1973.

হ অভিযানের প্রাথমিক পর্ব

পশ্চিমবঙ্গে ধানচাল সংগ্রহ অভিযান হয়েছে প্রায় মাসখানেক হতে । এর মধ্যে সংগ্রহ-পরিমাণ য়েছে দেড় হাজার টনের কিছু ী। হিসেবটা অবশ্য পুরোনো. রোই নভেম্বরের পর আরও কিছু হ নিশ্চয় হয়েছে—কাজেই ধরে য়া যেতে পারে মোটামুটি দু হাজার চাল সংগ্রহ হয়েছে এ পর্যন্ত। নে দুটো কথা আছে : প্রথম কথা চযানের এটা গোড়ার পর্ব, কাজেই কর্ম ঢিলে তালে চলছে: দ্বিতীয় ।, ফসল কাটার মরশুম আরম্ভ হয়ে লও তা পুরোমাত্রায় শুরু হয় নি ভ শতকরা পাঁচ দশ ভাগ জমির ধান টা হয়েছে। এ-সব সত্ত্বেও সংগ্রহ ভাবে এগুচ্ছে তাতে মনে হয়, সর রের মোটা লক্ষ্য—সেই পাঁচ লক্ষ টন গ্রহ বহু দূরের ব্যাপার। এই যদি কাজেই হতাশাজনক হয়—তবে, পাঁচ কেন তার সিকিও শুরুকারের সংগ্রহে আসবে কিনা সন্দেহ। খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ অবশ্য বলেছেন চাল কলে এখনও ধান ভাঙা হয় নি, তার ওপর শস্য বন্যার জন্যে তাঁদের লোকজন সরিয়ে আনতে হয়েছিল বলেই অবস্থাটা আপাতত এই রকম। এ ছাড়াও তিনি কিছু কারণ দেখিয়েছেন, যেমন গ্রামে চালের দর এখনও এত বেশী যে ধান কেনায় সরকারী বাঁধা দরে ধান পাওয় মুশকিল। তা ছাড়া কলকাতা রেশন এলাকায় কিছুটা চাল গম বাড়ালে এবং বাইরে আংশিক রেশনে চাল গম দিতে পারলে চাহিদা কমবে, গ্রামে ধান-চালের দর পড়বে। খাদ্যমন্ত্রী তাই বার বার দিল্লির কাছে অতিরিক্ত চাল গমের প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

কারণ হিসেবে সরকারী পক্ষ থেকে া বলা হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ব্যর্থতার যুক্তি সব সময়েই কিছু না কিছু থাকে, এবং সে যুক্তি স্বীকার করে নিলেও অন্য তরফের আর কথা থাকতে পারে। সেটা এই যে ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান আরও অজস্র কারণে ব্যর্থ হতে বসেছে। ফুড কর্পোরেশনের কর্মচারীদের কাজ কি ঠিক মতন হচ্ছে? জেলা প্রশাসন—যার ওপর সরকারকে নির্ভর করতে হচ্ছে—তারাও নাকি তেমন গা দেখাচ্ছে না। এর চেয়েও মারাত্মক কথা—কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন হাল হয়েছে যে, কোথাও বড় সহযোগিতা নেই, কংগ্রেসের অনেক এম এল এ এ-ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ উদাসীন হয়ে আছেন, এমন কি দুষ্ট লোকে বলে—অমুক বিরোধী বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে কেউ কেউ একটা ভদ্রলোকের চুক্তি করে ফেলেছেন। অর্থাৎ যেখানে সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ করার চেষ্টা চলছে সেখানে এঁরা নীরব, নিষ্ক্রিয়। প্রফুল্লকান্তিবাবু বোধ করি বুঝতে পারছেন, সংগ্রহ কাজটি এমনই জটিল যে তাঁর নিজের দলের প্রতিটি এম এল এ এবং দায়িত্ববান কর্মীর সহযোগিতা ছাড়া তা সফল করা যাবে না। শুধু সরকার নয়, কংগ্রেসের নেতারাও যে এখন বেশ বিচলিত তা বোঝাই যায়। কিন্তু এই সহযোগিতা কেমন করে আসবে? রাজনৈতিক শত্রুতা বড় সাংঘাতিক জিনিস, সেটা এতই সংকীর্ণ পথে চলে যে জনসাধারণের মঙ্গল বা কল্যাণের কথাটা গ্রাহ্য করে না। তা ছাড়া আজ যেরকম হাল হয়েছে দেশের তাতে চাল কলের সব মালিক কিংবা বৃহৎ কারবারীদের সঙ্গে সহজে এঁটে ওঠার ক্ষমতা কি সরকারের আছে? নাকি সরকার সত্যি সত্যি সে চেষ্টা করবেন? বীরভূমের কোনো চাল কল মালিক নাকি খাদ্য কর্পোরেশানের জনৈক অফিসারকে প্রকারান্তরে শাসিয়েছেন। এটা হয়তো সত্য নাও হতে পারে, [illegible] সম্ভাব্য সংঘর্ষে সরকার কী করতে [illegible] তা আমরা দেখতে আগ্রহান্বিত [illegible]। পাঁচ লক্ষ টন ধান-চাল সংগ্রহের [illegible] চন্দ্রিকা দেখে অবশ্য সব কথা বলা উচিত নয়, তবু আমাদের উদ্বেগ থাকল।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
ত্রিপুরাবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
২ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৩৬.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	১৮.৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৯.৫০

আসাম ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৪৪.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	২২.৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	১১.৫০

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৮৪.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	৪৪.০০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	২২.০০

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৬০.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	৩১.০০

লণ্ডন গ্রাহক মারফত

বার্ষিক	— টাঃ	১৭৪.০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	৮৭.৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৪৪.০০

দুঃস্বপ্ন

বগমরাজ

করুণানিধি

...গ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা

...চেরি ও তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস ও ...কংগ্রেসের নির্বাচনী ঐক্যের সংবাদে ... চমকিত। দেশের অ-কংগ্রেসী ... দলের নেতারা তো বিস্মিতই, ...দুই কংগ্রেসের বহু নেতাও। ...রাজ ও শ্রীমতী গান্ধীতে আলোচনা দীর্ঘদিন ধরেই। এবং তা নিয়ে ...কল্পনারও অন্ত ছিল না। অনেকেই ...নয়েছিলেন, আলোচনা চলছে ...ক কংগ্রেসে নেওয়া নিয়ে এবং সেই তামিলনাড়ু কংগ্রেসকে শক্তিশালী ...ব্যাপারে। এমনও শোনা গিয়েছিল, শ্রীমতী গান্ধীর দলের পরবর্তী ... হবেন, আর শংকরদয়াল শর্মা ...শে ফিরে যাবেন।

... পর্যন্ত দেখা গেল, পণ্ডিচেরি ...তামিলনাড়ুর জন্য দুই কংগ্রেসের ... হচ্ছে। কামরাজের বিচিত্র রাজ- ...এটা আর একটা চমক।

...ই চমকপ্রদ রাজনৈতিক ঘটনায় যা ...যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। ...কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা অত্যন্ত ... বিশেষ করে মোরারজী দেশাই। ... ধারণা, মোরারজীর ভাষায়, ...রাজ আবার শ্রীমতী গান্ধীর ফাঁদে প... হন।" সংগঠন কংগ্রেসের এইসব ... হিসাব শ্রীমতী গান্ধীর দল ভেঙ্গে ...হল, তাঁর সরকার ও সংগঠনের অবস্থা ...ন হয়ে উঠছিল, সংগঠন কংগ্রেসের ... বিরাট সুযোগ আসছিল—ঠিক এই ... কামরাজ দুই কংগ্রেসে সমঝোতার ...ধা করলেন।

সংগঠন কংগ্রেসের এইসব নেতা ...কো প্রকাশ করেছেন, এর ফলে উত্তর ...শের নির্বাচনে সংগঠন কংগ্রেসের বিশেষ ... হবে। নির্বাচকদের বোঝাতে ...বিধা হবে, কেন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে ...া অঞ্চলে যখন তাঁরা নির্বাচনী ...ঝোতা করছেন, তখনই আর একটা ...লে তার বিরোধিতা করছেন? স্বয়ং ...রাজ অবশ্য মনে করেন না যে ঠিক এই ...নায় উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে সংগঠন ...গ্রেসের তেমন ক্ষতি হবে। তিনি ...তশ্রুতি দিয়েছেন, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে ...জে গিয়ে উত্তর প্রদেশে দলের নির্বাচনী ...ভিযানে অংশ নেবেন।

*

দাক্ষিণাত্যে দুই কংগ্রেসের নির্বাচনী ...মঝোতায় চমকিত ও বিক্ষুব্ধ কিছু ...কংগ্রেসীও। বিশেষ করে সেই অংশটা ...রা সি পি আই পন্থী। কিন্তু তাঁরা ...কাশ্যে এর সমালোচনা করতে পারছেন না। বিক্ষুব্ধ সি পি আইও। সি পি আই ...

বিরোধী একটা অভিযানই শুরু করে দিত যদি না এই ঘটনা রুশ-কমিউনিস্ট নেতা ব্রেজনেভের ভারত ভ্রমণের মুখোমুখি ঘটত।

ব্যাপারটা কিন্তু সি পি আইয়ের রাজনীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সি পি আইয়ের বক্তব্য ছিল, নতুন কংগ্রেসের মধ্যেও দুটো অংশ আছে। একটা প্রগতিশীল অংশ, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশটা গোপনে দেশের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এরা আসলে চায় আদি কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃতির সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, আদি কংগ্রেস বা সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে যিনি নির্বাচনী সমঝোতা করতে বিশেষভাবে অগ্রসর হলেন তিনি স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী। কামরাজ যদি কংগ্রেসে, অর্থাৎ নব কংগ্রেসে চলে আসতেন তাহলে সেটা হত একরকম ব্যাপার। বলা চলত, কামরাজ ও তাঁর কিছু প্রগতিশীল অনুগামী আদি কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নব কংগ্রেসে চলে এলেন। কিন্তু এখন যেটা হল তা হল, নব ও আদি কংগ্রেসের ডি এম কে-বিরোধী সমঝোতা।

সি পি আই নেতৃত্বও ডি এম কে-বিরোধী। তাঁরাও দাক্ষিণাত্যে ডি এম কে-কে উচ্ছেদ করতে চান। একদা তাঁরা এই ব্যাপারে কামরাজের সহযোগিতা পেতেও ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আন্না-ডি এম কে দলের অভ্যুত্থানের পর সি পি আইয়ের কৌশল পাল্টে যায়। তাঁরা তখন ডি এম কে-বিরোধী অভিযানটা চালাতে চান প্রধানত তিন দলের সহযোগিতায়। সেই তিনটা দল হল শাসক কংগ্রেস, আন্না ডি এম কে এবং সি পি আই। সি পি আই নেতারা জানতেন এই তিন দল যদি তামিলনাড়ুতে ও পণ্ডিচেরিতে একযোগে কোনও ডি এম কে-বিরোধী অভিযান চালায় তাহলে তার আসল নেতৃত্বটা করবে সি পি আই-ই। যদিও এই অভিযানের সামনে থাকবেন আন্না ডি এম কের জনপ্রিয় নেতারা এবং পেছনে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন। কারণ, আন্না ডি এম কের জনপ্রিয়তা আছে, তার নেতাদের জনপ্রিয়তাও প্রচুর, কিন্তু আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার মত সুশিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী তার নেই। আর তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের অবস্থা আরও শোচনীয়। তার না আছে কোনও জনপ্রিয় নেতা, না আছে দলের নীচুর তলায় সুশিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী। সি পি আই এই অবস্থাটার পূর্ণ সুযোগ নিতে চেয়েছিল।

তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরিতে দুই কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা সি পি আইয়ের অঙ্কটা একেবারে ভেস্তে দিল।

এই ঘটনা আরও প্রমাণ করল, শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে যাই বলা হোক, তিনি আসলে সি পি আইয়ের প্রভাব বাড়াবার তেমন বিশেষ কোনও সুযোগ করে দিতে মোটেই রাজি নন। বরং উল্টোটা করতে আগ্রহী। সি পি আইয়ের এতেও শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক।

*

এ তো গেল রাজনৈতিক দলগুলির হিসাব নিকাশ।

সাধারণ মানুষের যেটা দেখার তা হল এর ফলে, অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী ও কামরাজের সমঝোতার ফলে দেশের ভাল হবে কিনা।

কামরাজের নিজের অবশ্য বয়স হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যও মোরারজীর মত ভাল নয়। তবে সংগঠন কংগ্রেসের ভেতরে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা কামরাজ-পন্থী। তাঁরাও চান দুই কংগ্রেসের সমঝোতা।

এই সমঝোতাপন্থীদের মধ্যে আবার দুটি গোষ্ঠী আছে। একটা গোষ্ঠী আছে প্রধানত সরকারী সুযোগ সুবিধার লোভে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা বা ঐক্য চান। আর একটা গোষ্ঠী আছে যাঁরা মনে করেন, দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে দুই কংগ্রেসের সমঝোতা প্রয়োজন। দুই দলের ভেতরে যাঁরা সত্যিকারের জনদরদী, জাতীয়তাবাদী এবং সৎ ব্যক্তি আছেন তাঁদের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন।

দুই নেতা যদি এদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে সেটা হবে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমরা সবাই পছন্দ করি আর না করি, কংগ্রেসই আপাতত দেশের শাসক থাকবে। তাই কংগ্রেসের মধ্যে ও সঙ্গে যত বেশি সত্যিকারের জনদরদী, সৎ এবং কর্মক্ষম মানুষ থাকেন ততই ভাল। এঁরা যদি দলে ও রাষ্ট্রচালনায় প্রাধান্য পান তাহলে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও দেশের কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব।

কিন্তু তা না হয়ে এই ঐক্য যদি শুধু দুজনের কমন শত্রু ডি এম কে বধের জন্য হয়ে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ঐক্য দেশের ও দলের কোনও ভাল করতে পারবে না। এই ঐক্যও হবে আর একটা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক প্যাঁচ মাত্র।

২৫।১১।৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

রাজকন্যের বিয়ে

আশ্চর্য জাত হচ্ছে ইংরেজ। নতুন আর পুরোনোকে বেমালুম মেলাতে ওদের জুড়ি দুনিয়াতে কেউ নেই। পুরোনোকে তারা আঁকড়ে পড়ে থাকে না অথচ একেবারে বাতিল করেও দেয় না। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলে তারা নতুনকে আদর করে ঘরে ঠাঁই দেয় তারই সঙ্গে আবার পুরোনোর ছোঁয়াচও বেশ একটু রেখে দেয়। ব্রিটেনে গণতন্ত্রের ভিত বেশ পোক্ত। কিন্তু সামন্ত-তন্ত্রও বরবাদ হয়ে যায়নি, রাজতন্ত্রও নয়। হাউস অব লর্ডস্ দিব্যি রয়েছে হাউস অব কমন্সের পাশাপাশি। সবার ওপরে রয়েছেন মনার্ক বা সভারেন অর্থাৎ রাজা কিংবা রাণী। তাঁদের আগেকার প্রতিপত্তি অবিশ্যি অনেককাল আগেই গেছে—দেশ শাসন করেন মন্ত্রিসভা, তাঁদের চালচলনের ওপর নজর রাখেন কমন্স্ সভা। রাজা-রাণী-রাজবংশের খাতির কিন্তু আজও যায়নি। একা রাণীর জন্যে সালিয়ানা খরচ হয় প্রায় দু কোটি টাকা। রাজবংশের অন্যরাও বেশ মোটা ভাতা পান। বিলেতের লোকেরা কিন্তু মনে করে না টাকটা জলে যাচ্ছে।

তাদের রাজভক্তির উৎস যে শুকিয়ে যায়নি তার প্রমাণ মিলেছে ১৪ নভেম্বর। সেদিন বিয়ে হয়েছে রাজকন্যে অ্যানের। রাণী এলিজাবেথের তিনি একমাত্র মেয়ে যদিও একমাত্র সন্তান নন। রাণীর তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে চার্লসের বয়স পঁচিশ। তিনি এখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ অর্থাৎ যুবরাজ, বিলেতের ভাবী রাজা। রাজকন্যে অ্যানও সিংহাসনের একজন দাবিদার। তবে তাঁর দাবি তিন ভাইয়ের দাবির নিচে। কোনও ভাই যদি রাজা না হন কিংবা অষ্টম এডওয়ার্ডের মত রাজা হতে না চান তবেই তাঁকে সিংহাসনে বসানোর কথা উঠবে। বিলেতে নিয়ম হচ্ছে ছেলেদের দাবি সবার আগে—রাজা-রাণীর ছেলে কেউ না থাকলে রাজত্ব অর্শাবে মেয়ের ওপর। দ্বিতীয় সন্তান হলেও রাজকুমারী অ্যান সিংহাসনের দু নম্বর নন, তিন নম্বর দাবিদার। মেয়েদের সমান অধিকারের দিনে নিয়মটা যে বেখাপ্পা সে কথা উঠেছিল বিলিতি পার্লামেন্টে অ্যানের বিয়ের দিনেই। তবে কথাই সার—নিয়ম পালটাবার কোনও প্রস্তাব পাস হওয়া দূরে থাকুক, ওঠেওনি।

রাজপুত্তুর-রাজকন্যের সঙ্গে রাজবংশের কারও বিয়ে হওয়াই দস্তুর। নিদেন কোনও আমীর-ওমরার সঙ্গে। বিলেতের রাজবংশে সে দস্তুর ভেঙে গেছে বারো বছর আগে—ভেঙেছেন রাণীরই বোন রাজকুমারী মার্গারেট রোজ একজন সাধারণ মানুষকে বিয়ে করে। তাঁর নাম এখন অবিশ্যি লর্ড স্নোডন তবে তাঁকে জাতে তোলা হয়েছে বিয়ের পর। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল অ্যান্টনি আর্মস্ট্রং-জোন্স। পেশা তাঁর ফটো তোলা।

মার্গারেটের পথই বেছে নিয়েছেন রাজকন্যে অ্যান এলিজাবেথ অ্যালিস লুইস। তিনি বিয়ে করেছেন ভালবেসে একজন সেনা-বাহিনীর লোককে। তাঁর নাম ক্যাপটেন মার্ক ফিলিপস্। প্রথম কুইন্স্ ড্রাগুন গার্ডসের তিনি একজন অফিসার। ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে তিনি আদৌ নন। তাঁর বাবা পিটার ফিলিপস্ দু পয়সা কামিয়েছেন সসেজ অর্থাৎ শুয়োরের মাংসের পিঠের ব্যবসা করে। তাঁদের বাড়ি উইলটশায়ারের [illegible] গাঁয়ে। সেই সুবাদে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে রাজরাজড়া আর হোমরাচোমরা লোকেদের সঙ্গে সেখানকার ঘোড়ার সাজ তৈরিকরনেওয়ালা আর গাঁয়ের কামারেরও নেমন্তন্ন হয়েছিল রাজকন্যের বিয়ে দেখতে।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বিলেতের সবাইকার পছন্দ নয় তাদের রাণীর একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে হয় সেই মধ্যবিত্ত ঘরে। কেউ আনকোরা খুঁতখুঁত করছে। কেউ কুষ্ঠি-কুলুজি ঘেঁটে বের করেছে রাজকন্যের বর একেবারে কেউকেটা নন। তাঁর শিরাতেও রাজবংশের রক্ত বইছে। কেউ বলছেন তিনি [illegible] ওয়েলসের একজন [illegible] বংশধর। কারুর মতে এলিজাবেথের আমলের একজন সদস্যের, কারুর মতে বা ষোড়শ শতাব্দীর একজন লর্ড হাই ট্রেজারারের অর্থাৎ রাজকীয় খাজাঞ্চির। তাঁর ঠাকুরদার ঠাকুর্দা যে ল্যাঙ্কাশায়ারের একজন খনির মজুর ছিলেন, তাঁর গিন্নী যে তাঁত বুনতেন সে কথা কবুল করতে উঁচু নজরের লোকেদের বাধছে। অথচ সেই মজুরের পদবি ছিল ফিলিপস্ আর সেটাই এখন রাণীর জামাইয়ের পরিবারের পদবি। দেখা যাচ্ছে, রাজবংশের সঙ্গে কুটুম্বিতে করার মেজাজ ঝামেলা। সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্যে তাই বলা হচ্ছে মার্ক ফিলিপস্ রাজকন্যের এক ধরনের তুতো ভাই—তেরো পুরুষ আগে তাঁদের দু বংশ নাকি এক ছিল।

এ সব অবিশ্যি মুখ রক্ষের চেষ্টা তবে কিন্তু মুখ রক্ষে না হয়ে মুখে কালিই পড়ছে। রাজতন্ত্রই যে যুগে কালের স্রোতে ভেসে গেছে সে যুগে মনগড়া বংশতালিকা বানানো ন্যাকামি ছাড়া কিছু নয়। তবে ন্যাকামিতে গণতন্ত্রের পয়লা ঘাঁটি আমেরিকাও কিছু কম যায় না। ইংরেজদের রাজভক্তির তবু একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়—সেটা তাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু অ্যানের বিয়ে নিয়ে যে হইচই হয়েছে আমেরিকায় তার মানে খুঁজে পাওয়া ভার। ও দেশে অ্যানের বিয়ের খবর ঘটা করে প্রচার করা হয়েছে রঙীন টেলিভিশনে। ফলাও করে ছাপা হয়েছে রাজকন্যে আর বীর সৈনিকের প্রণয়বৃত্তান্ত। রূপকথার গল্পের সঙ্গে এ বিয়ের মিল খুঁজে পেয়ে মেতে উঠেছে হুজুগে মার্কিনীর দল। অথচ অ্যান রূপকথার রাজকন্যে নন, মার্ক ফিলিপসও গল্পের বীরপুরুষ নন যিনি দৈত্যের কাছ থেকে লড়াই করে উদ্ধার করেছেন বন্দিনী রাজনন্দিনীকে। তাঁদের বিয়ে আর কিছু নয় যুগ যে পালটাচ্ছে তারই ইঙ্গিত।

অ্যান-মার্কের বিয়েতে রোমান্সের আভাস অবশ্য আছে, কিন্তু প্রথম দেখাতেই ভালবাসা তাঁদের হয়নি। দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৬৮ সনে লণ্ডনে একটা পার্টিতে। রাজকুমারীকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন রাণীর মা এলিজাবেথ। সেটা ছিল অলিম্পিক খেলোয়াড়দের একটা সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান। এর পর মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে মার্কের সঙ্গে অ্যানের। তারই পরিণতি তাঁদের জাঁকজমক করে বিয়ে। রাজকন্যে অ্যান মেমের পুতুল আদৌ নন, তিনি পাকা ঘোড়সওয়ার, বিস্তর প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তিনি নাম কিনেছেন। আগস্ট মাসে রাশিয়ায় কিয়েভে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি পা ভেঙে অনেক দিন ছিলেন হাসপাতালে। মার্ক ফিলিপসের নেশাও ঘোড়ায় চড়া। তিনিও একজন ধুরন্ধর ঘোড়সওয়ার। তাঁদের দুজনের মন দেওয়া-নেওয়ার পালা চলেছে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। শিকারের জঙ্গলে। বিয়েতে তাঁরা নাকি আঠারোখানা ঘোড়ার বিশ্বকোষ উপহার পেয়েছেন। মার্ক অ্যানকে বিয়ে করেছেন রূপে ভুলে নয়, সম্পত্তির লোভেও নয়, মর্যাদার মোহেও নয়। মনের মতো সঙ্গিনী পেয়েছেন বলে তাঁদের চার হাত এক হয়েছে।

ছোট্ট

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট হয়েই আছে
আমার, না হয় তোমার, না হয় তাহার বুকের কাছে
দুঃখ নিবিড় একটি ফোটায়—দুঃখ, চোখের জলে
দুঃখ থাকে ভিখারিনীর এক মুঠি সম্বলে।

ছোট্ট হয়েই আছে
একের না হয় বহুর, না হয় ভিড়ের বুকের কাছে।

একটি ঝিনুক তাকে
জন্ম থেকেই, একটু-আধটু, বাইরে ফেলে রাখে॥

দাবীদার

সাধনা মুখোপাধ্যায়

আমি তোর গলা টিপে
আমি তোকে মেরে ফেলে
তোর গাত্রচর্ম দিয়ে
ডুগডুগি তৈরী করে দেখিস্ বাজাব
আমার বসার ঘরে
সবচেয়ে উঁচু তাকে
সে বাজনা সাজাব
আমারই নিতাম্ব তুই
অন্যদের দাবী দাওয়াহীন
তবু বুক সশঙ্কিত
যদি ওই দরোজা পাশের ঘুঁটে
গাছটা দুলন্ত হয়ে বলে ওঠে
আমারও একটু দাবী আছে
অনেক ক্ষুধার জল পেয়েছি যে
ও হাতের কাছে

তবু ভয় থেকে যায়
মাঠ পারে ওই নদী
ঢেউ ভেঙে বলে ওঠে যদি
দাবীদার দলে আছে
আমারও একটুখানি স্থান
আমার বুকের মধ্যে এখনও
সে ঘ্রাণ আছে
যখন সে করেছিল স্নান
তবুও কাঁপবে বুক
যদি ওই কাজলী পাপিয়া
বলে ওঠে, আমিও অংশীদার
যখন সে মৃত্যুকান্না কেঁদেছিল
তার সুরটুকু আমি রেখেছি গলায় ধরে
বাজাই তাকেই আমি
অন্য কারুর সঙ্গে
যবে হয় প্রেমিকের বিয়ে।

নারী

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এ কেমন প্রেম, যার অন্য নাম দয়া, উদারতা?

নাকি যা নারীর কাছে গণনীয়, নারীর অধীত
তার মুখ একাগ্র, ব্যাপ্ত অদ্বৈতবিসারী?
তাই হতভাগ্য শঠ ফেরিওলা পাষণ্ড তণ্ডক
কিংবা লুলো
মসৃণ পায়সে
বঞ্চিত এবং খুশী,—যেমন পাখিরা সরে বসে
জ্যোৎস্না থেকে।
পথে হাঁটতে ভ্রাতাদের অনঘ কফোণি ঠেকে যায়
দু-একটি প্রতীকে, যাহা
নৈবেদ্যের সঙ্গে তুলনীয় কিন্তু মর্মরনির্মিত!

দুধে ও ব্যথায় ভারী ছোট-ছোট স্তূপগুলি অর্পিত কোথায়
না জেনেই ওরা ভাবে—নারী, সব নারী
পরোক্ষপ্রেমিকা, এক, পরিধানে ভিন্ন ভিন্ন শাড়ি।

যে জানে, সে জানে
দিলে সে একজনকে দেবে, অন্যদের কিছুই দেবে না।

ফলের বাগানে

শিশিরকুমার দাশ

সেইদিন ফলের বাগানে রূপসী আপেল কানে কানে
বলে গেল, "সন্ধ্যা হয় হয়
এইবার হয়েছে সময় সুন্দরের

লালসারা মৃদু খেলা করে পাতা ঘাস তারার ভিতরে
অন্ধকার ফলের বাগানে,
প্রতিরোধী দেহের উজানে সুন্দরের

শরীর এখন বড় সুখী, এখন শরীর অভিমুখী
সুখ থেকে জন্ম নেয় ভয়
বৃন্তহীন, নগ্ন, নিরাশ্রয় সুন্দরের

অবসন্ন পল্লবিত স্তব এবার মাটির অনুভব
মর্মরিত সারাবনময়
অন্ধকার ভেঙে চন্দ্রোদয় সুন্দরের"॥

াামার এক বিজ্ঞ বন্ধু আছেন। র্শ দেবার ধার তিনি ধারেন না। তিনি উপদেশ। তিনি বলেন, কেবল নিসর্গ-' দেখে বেড়ালে দুনিয়ার বিন্দুবিসর্গ ই নাকি জানা হয় না। অনেক রমণীয় র্যই অবশ্য আছে পাহাড়ে-সমুদ্রে-শে-লতায়-পাতায়-পুষ্পে; কিন্তু তার ও যা বড় সৌন্দর্য তাকে বলতে হয় রমণীয়, তার বহরই নাকি আলাদা।

কৌতূহল হল খুব, জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা?"

চট করে তিনি উত্তর দিলেন না, আমাকে তে বললেন। আমি ভাবতে লাগলাম। ড়-সমুদ্র-আকাশ তছনছ করে লতায়-াায়-পুষ্পে মন দিলাম।

"কী হল? পেলে?" বিজ্ঞের মতন হেসে জ্ঞাসা করলেন তিনি।

মাথা নেড়ে জানালাম—পেলাম না।

"পাবে তো না-ই।" তিনি বললেন, ড়িঘোড়া চেপে ঘুরে বেড়ালে, আকাশ-ার করলে এসব চোখে পড়ে না। এর া চলতে হয় পদব্রজে—পায়ে হেঁটে। গের কালে তীর্থভ্রমণ হত যেভাবে।"

এততেও আমি পরিষ্কার বুঝতে না-ায় তিনি বিরক্ত হলেন। বললেন, খনো লোকে তীর্থক্ষেত্রে যায়, কিন্তু ়ে আসে কেবল ক্ষেত্রটি, তীর্থ দেখা আর না। কেন? এখন লোকে যে আয়েসী য় গিয়েছে, গাড়ি চেপে চট করে পৌঁছে চ্ছে দুর্গম জায়গায়; তাই সোজা হয়ে ছে সব। সহজেই যা অর্জন করা যায়, তার ম বোঝে না, মর্যাদা বোঝে না। তাই তীর্থ ার দেখে না, সে সব জায়গায় যায় বটে। আত্মীয়-বন্ধুদের বলতে পারবে অমুক য়েগায় গিয়েছিলাম, এই বলাটুকুর জন্যে াদের যাওয়া। এটা বিলাস। বিলাসিতা বলে চলবে না হে। একটু তকলিফ করতে বে।"

তাঁর উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিলাম। কিন্তু মনে হল, অপাত্রেই তাঁর এই উপদেশ। কমনা, বিলাসিতা করার বাসনা মাঝে মাঝে য়ে, কিন্তু সংগতিতে কুলোয় না। গাড়ি-ঘোড়া চেপে ঘুরে বেড়ানোও সাধ্যে কুলোয় না, তাই অবলম্বন মাত্র এই এগারো নম্বর।

"কত নম্বর বললে?"

"এগারো।"

"তার মানে?"

বললাম, "এই পা-দুখানা। এই দুটিই আমার বাহন।"

শব্দ করে হেসে উঠলেন আমার বিজ্ঞ বন্ধুটি। তাঁর এমন হাসি সচরাচর দেখা যায় না। হাসি থামিয়ে বললেন, "তা হলে তোমার হবে।"

"কী হবে? জীবনে উন্নতি, সাফল্য?"
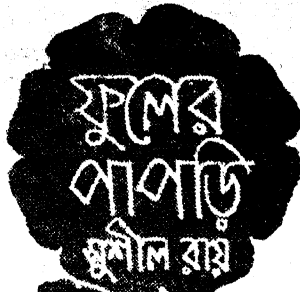
"ও-সবের মানে বুঝিনে। দু চোখ খুলে হাঁটলেই দেখতে পাবে সেই সৌন্দর্য পথে-ঘাটে ছড়ানো।"

"এবার শুনি, কী সেটা?"

বিজ্ঞ বন্ধুটি হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, "ওর নাম উলঙ্গ-বাহার।"

কথাটা শোনা মাত্র শরীরের শোণিতে হঠাৎ বুঝি সংগীত বেজে উঠল; স্বচ্ছবাস বা স্বল্পবাস পরিহিতা অজস্র তরুণীর চলচ্চিত্র ভেসে উঠল চোখের সামনে।

বিজ্ঞের মতন মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি, বললেন, "না। ও জিনিস না।"

তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, "ওর চেয়েও মর্মস্পর্শী।"

সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য বিস্তর দেখেছি বটে কিন্তু তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি বলে তা মনকে তেমন স্পর্শ করেনি।

এমন দৃশ্য কে না-দেখছে নিত্য-নিয়মিত। এমন দৃশ্য না-দেখে উপায়ই বা আছে কার? এখন পথেঘাটে এই সব উলঙ্গ শিশুর দল খেলা করে চলেছে, কখনো বা খেলা করে বসেছে, ফুটপাথে ফুটপাথে দৌড়োদৌড়ি করছে, হঠাৎ এক দৌড়ে চওড়া রাস্তা ক্রস করে চলে যাচ্ছে, অথচ গাড়ি চাপা পড়ছে না। আশ্চর্য জাদু জানে বটে এরা। অন্য ঘরের বা অন্য দরের ছেলেরা দরজার চৌকাঠ পার হলেই কিন্তু গাড়িচাপা পড়ে।

এরা কারা? তা কেউ জানে না। এদের পিতা কে, মাতা কে—তাই-বা কে বলবে। এদের দেখাশোনার ভার কার—তাও কেউ জানে না।

উলঙ্গবাহার বিস্তার করে এই নগ্ন-শিশুর দল ছড়িয়ে আছে নগরে-গঞ্জে, শহরের ফুটপাথে।

এদের জন্যে করুণা করা বৃথা। সেই জন্যেই কেউ করুণা করে না। এরা অনাহারে থাকে না কিছুতেই, কিছু-না-কিছু খায়ই। তা না হলে এতদিন বেঁচে থাকতে পারত না। কিন্তু কী খায়, তা অবশ্য জানা নেই।

বড়-বড় প্রাসাদে-অট্টালিকায় খাদ্য-সংকটের জন্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে নাকি, কিন্তু এদের কোনো সংকট নেই, হাহাকারও নেই। এরা দিব্য আছে।

এই জন্যেই এদের জন্যে করুণা করা বৃথা। কেউ তাই করুণা করেও না। ভিড়ের রাস্তায় এরা পায়ের কাছে এলে ধমক খায় মাত্র।

শীত সহ্য করার ক্ষমতা এদের অসাধারণ, রোদ-বৃষ্টি এরা পরোয়া করে না। একেবারে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানোই এদের জীবন।

অনেক মজার মজার দৃশ্যও এরা দেখায় বটে।

কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছি আমার এক আত্মীয়কে রিসিভ করতে, দিল্লী থেকে আসছেন তিনি। ট্রেন দেড় ঘণ্টা লেট। অপেক্ষা করে বসে আছি। কত বিচিত্র রকমের মানুষ দেখছি সেই ভিড়ের মধ্যে।

সেই সঙ্গে দেখছি এদেরও। সর্বত্রই দেখা যায় এদের। এরা সর্বত্রগামী, বাতাসের মত।

বেড়ালের বাচ্চার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা—এই মানুষের বাচ্চারা। লোকজনের পায়ের কাছে যাচ্ছে, তাড়া খেয়ে সরে যাচ্ছে।

সময় কাটাবার জন্যে আমি স্টেশনের বিশাল চত্বরে ধীরে-ধীরে পায়চারি করছি। এদের মজা দেখছি।

দশ নম্বর প্লাটফর্মের গেটের কাছে দেখি—একটা সাত-আট বছরের উলঙ্গ ছেলে তত্তোধিক উলঙ্গ একটা বছর পাঁচেকের মেয়েকে কী-যেন খাইয়ে দিচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি, এক টুকরো রুটি। ওরা ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। ছেলেটার গায়ে হাতকাটা একটা বেঁটে গেঞ্জি, মেয়েটার গায়ে কিছু ছিল না।

দৃশ্যটা দেখে বেশ মজা লাগল।

এমনি আরও মজার দৃশ্য হয়তো দেখা যেত, কিন্তু দিল্লীর ট্রেন এসে গেল।

আমার সেই বিজ্ঞ বন্ধুটির কথা এক পলক একটু চিন্তা করেই পকেট থেকে প্লাটফর্ম-টিকিট বার করতে করতে গেট ভেদ করে ছুটে দিলাম।

এর পরও অনেকবারই ওদের দেখেছি, দেখেছি ওদের অনেক কাণ্ডকারখানা। ঘুরে ঘুরে ওদের দেখে-দেখে বিস্তর তথ্য জোগাড় করে একটা মস্ত ব্যাপার খাড়া করে তোলা যায় কি না—তাও ভেবেছি।

"কিন্তু তাতে ওদের লাভ?" বিজ্ঞ বন্ধুটি আমার পরিকল্পনায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে বললেন, "তাতে হয়তো তোমার মহিমা বাড়বে, তোমার আত্মসুখ হবে, কিন্তু ওদের তাতে কী?"

বললাম, "মাটি দিয়েই তো মানুষ গড়ে তোলে মূর্তি; অন্যের দুঃখকষ্ট দিয়েই তো কাব্য—"

"ভাবব। ভাবব। ভাবব।" আমার পিঠে থাবা দিয়ে তিনি বললেন, "ভেবে দেখব তোমার প্রস্তাব। কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী বলবে তোমার মস্ত ব্যাপারটিতে?"

"ভাবিনি।"

"ভেবো না। ভেবে তল পাবে না।"

অনেক ভেবে-চিন্তে তাই ঠিক করলাম ওদের কথা আর ভেবে লাভ নেই।

ওদের কথা আর ভাবি নে, কিন্তু চোখে ওরা পড়ে যায়ই। সিনেমা হাউসের সামনে, রেস্তোরাঁর সামনে ওরা আছেই। একটু আনন্দ করে বের হচ্ছি, অমনি ওরা নগ্ন হাত পেতে পথ আগলে দাঁড়ায়। বিরক্তিতে জ্বলে যায় আপাদমস্তক।

পুজো প্যান্ডেলে মাইক বাজে। অমায়িক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওরা গান শোনে। ফিল্মি গান শুনে-শুনে ওরা বুঝি তা রপ্তও করে নেয়। দেখেছি, ওরই মধ্যে কেউ-কেউ হাত বাজিয়ে গুনগুনোচ্ছে। ওদের রকম-সকম দেখে মজাই লাগে।

পৃথিবীকে ওরা যেন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আমরা আদিম-মানবের বংশধর, আমরা আদিম বেশে থাকব, আদি আচার-আচরণ করব, তোমাকে আমাদের পরোয়া নেই! আদিম-মানুষের ডেরা ছিল না, আদিম মানুষ চাল-ডাল-তেল-নুন-লংকা খায়নি, এসব না-খেয়েও তারা যদি বংশরক্ষা করতে পেরে থাকে, তবে আমরাও—

এটা ওদের হামবড়া ভাব হতে পারে। হোক। ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ওরা ওদের জন্মদিনের পোশাক পরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াক নিজের মর্জি মতন। আমরাও চলি আমাদের মর্জি অনুসারে।

আমাদের তেতলার বিদ্যাসুন্দরবাবুর মেয়ের জন্মদিন পরশু। তিনি নিমন্ত্রণ করে গেলেন বাড়িসুদ্ধ সকলকে। বেশ ঘটা করেই তিনি কাজটা করবেন। তাঁর নিমন্ত্রণের ধরন দেখেই তা বোঝা গেল।

তিনতলা এই বাড়িটার আমি দোতলার একটা পোরশনের ভাড়াটে। তিনতলা পুরোটাই বিদ্যাসুন্দরবাবুর। তাঁর দুই ছেলে ও এইটি নিয়ে তিন মেয়ে, এটি হয়েছে গত বছর। এবার তার প্রথম জন্মদিন।

বিদ্যাসুন্দরবাবু বেশ বিত্তশালী লোক। মানুষটা বিদ্যানুরাগী তেমন নন। তা না

হয়ে ভালোই করেছেন। ও সব বাই যাদের থাকে তাদের বড় ল্যাঠা। একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে এমন ঘটা তারা করতে পারে না।

আমাদের বাড়িটা হাল-ফ্যাশানের নয়। এটা একটা সাবেকি বাড়ি। অনেক ইঁট লেগেছে বাড়িটা বানাতে। বেশ শক্তসমর্থ। ছিরি হয়তো তেমন নেই, কিন্তু ভিতরে বেশ স্পেস আছে, সহজেই চলা-ফেরা করা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে বাঁশ উঠে যাচ্ছে আজ থেকেই। ছাদে ম্যারাপ হবে। মস্ত ছাদ। শ-দুই লোক একটা ব্যাচেই বসতে পারে।

দোতলায় আমরা একটা ব্যালকনি পাই, কিন্তু তেতলার দুটি ব্যালকনিই বিদ্যা-সুন্দরবাবুর।

কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকার রাস-বিহারী অ্যাভিনিউ আর কর্নফিল্ড রোডের ক্রসিং-এ আমাদের এই বাড়িটা। দক্ষিণ একেবারে খোলা—ট্রাম-বাস চলে ওই চওড়া রাস্তা দিয়ে। অনেক দিনের ভাড়াটে আমি, তাই এমন জায়গায় বেশ কম ভাড়াতেই আছি। বিদ্যাসুন্দরবাবু অবশ্য এসেছেন বছর তিন হল। বেচারাকে বেশ মোটা ভাড়া দিতে হয়। তার জন্যে তাঁর অবশ্য আক্ষেপ নেই, বলেন, "বাড়ি যতদিন না তুলছি ততদিন এটুকু খেসারত দিতে হবেই।"

বিদ্যাসুন্দরবাবু কী করেন জানিনে। শুনেছি ওঁর বেশ বড় বিজনেস আছে। কিন্তু ব্যস্ততা তেমন দেখিনে। আমরা যেমন ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, উনি তেমন নন। খুব ধীরস্থির। খুব মিষ্টভাষী। যারা খেটে খায় তাদের উনি নাকি পছন্দ করেন। পরিশ্রম-না-করা যাদের জীবিকা তাদের উপর তিনি খুব খাপ্পা। এই জন্যে ভিখিরি-দের তিনি দেখতে পারেন না। তাঁর কাছে কেউ কখনো ভিক্ষে পায়নি—অহংকারের সঙ্গে তিনি এ কথা ঘোষণা করেন। সোসাইটির উপর ওরা নাকি একটা বোঝা।

তাঁর কথায় আপত্তি জানাবার কিছু নেই, এই জন্যে মাথা নেড়ে সায় দিতে হয়েছে।

এই বিদ্যাসুন্দরবাবুর মেয়ের জন্মদিন। বাড়িসুদ্ধ সকলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব, কিন্তু ওই মেয়ের জন্যে কী যে উপহার নিয়ে যাব—এ এক যন্ত্রণা। গরিব-মানুষের বাড়িতে গেলে যেমন-তেমন কিছু একটা দিলেই হত, কিন্তু এটা যে বিদ্যাসুন্দরবাবুর বাড়ি। বিত্ত-শালীদের চারদিক দিয়েই লাভ, কেউ তাদের কম দিয়ে সরতে পারে না।

মস্ত ম্যারাপ ছাদটাকে ছেয়ে ফেলেছে। এই উঁচু বাড়িটা যেন মজবুত ও বিশাল একটা ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়েছে, সকালে বাজার থেকে ফেরার সময় দূর থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। বেশি বাজার আজ করতে হয়নি—ওইটুকুই সাশ্রয়, ও-বেলা তো রান্না হবে না, বাড়িসুদ্ধ নেমন্তন্ন।

ছাদেরই একটি কোণে রান্নার আয়োজন হয়েছে। কাতারে কাতারে জিনিসপত্র উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছি ফুটপাথে ভাজি-করা হলদে চেয়ার নামছে ঠেলাগাড়ি থেকে। ওখান থেকে ছাদে নিয়ে যাওয়া হবে।

ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই বিদ্যাসুন্দর-বাবুর। খুব ছিমছাম মানুষ। সব জিনিস চান ছিমছাম রাখতে। এঁটোকাটা রাস্তায় ফেলতে দেবেন না। সব জমা করে রাখা হবে, পরদিন জমাদার এসে নিয়ে যাবে ওপর থেকে।

বিকেলের দিকে সিঁড়িতে তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, বললেন, "সিভিক সেন্স থাকা দরকার। আমার বাড়ির নোংরা ফেলে আমি পাঁচজনের অসুবিধে করব কেন।"

একটু থেমে বললেন, "তা ছাড়াও জানেন তো। ওই বেগার আর কুকুর। ওরা ওই এঁটো নিয়ে এমন কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করবে যে, হট্টগোলে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠবে। তার-চে—"

কথাটা শেষ করতে পারলেন না বিদ্যা-সুন্দরবাবু। উপর থেকে ডাক শুনেই আমার দিকে হাত নেড়ে ছুটে উঠে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার কিছু পর থেকেই উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। লোকজন আসতে আরম্ভ হল। সিঁড়ি দিয়ে দলে-দলে মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চা-কাচ্চা কলরব করতে করতে উঠে যাচ্ছে উপরে, ওরা যে সব সুগন্ধি ছিটিয়ে এসেছে জামায়-কাপড়ে, সেই গন্ধ আমাদের ঘরে ঢুকে সারা ঘর মাত করে দিয়েছে, ম-ম করছে ঘর।

আমাদের বাসার লোকেদের মধ্যে তখন সাজ-সাজ রব। কোন্ শাড়িটার সঙ্গে কোন্ জামা ম্যাচ করবে, কোন্ শাড়িটা ক্যাশড্, কোন্ জামার টিপকল নেই, কোন্ জুতোটার গোড়ালিতে কাদা শুকিয়ে, কোন্ স্লিপারের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছে—এ সব আগে থেকে দেখে রাখা হয়নি কেন, এ নিয়ে আমাকে মাঝে মাঝেই মাথা গরম করতে হচ্ছে।

যথাসম্ভব জলদিই সাজে সেজেগুজে আমরা প্রায় একটা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে যখন উপরে উঠলাম তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোনো ব্যাচ কারো ফসকে না-যায় এজন্যে দৌড়োদৌড়ি।

তেতলার বড় ঘরটায় এক-বছরের মেয়েটিকে একটা খাটের ওপর রাজেন্দ্রাণীর মতন বসানো। অজস্র ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া তো আছেই, সেই সঙ্গে হরেক-রকমের উপহারসামগ্রী। একটা মেয়ের বিয়েতেও বুঝি এমনটি হয় না।

বিদ্যাসুন্দরবাবুর মেজ মেয়ে এক কোণে খাতা-কলম নিয়ে বসে কে কি দিচ্ছেন লিখে-লিখে রাখছে। এই ব্যবস্থাটা বড় বিশ্রী মনে হল। একটা উপহার আমরা এনেছি বটে, অন্য পাঁচটা উপহারের সঙ্গে এটা মিশিয়ে ফেলতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু তা হবার উপায় নেই।

যা হবার হোক, আমরা ছাদে চললাম। এখানে এত লোক যে দম বন্ধ হবার দশা।

অনেক রকম খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। জিনিসগুলো খেতেও মন্দ না। যা খেলাম তা অনেকটা ফাঁসির খাওয়ার মত।

বিদ্যাসুন্দরবাবু ঠিকই বলেছিলেন।
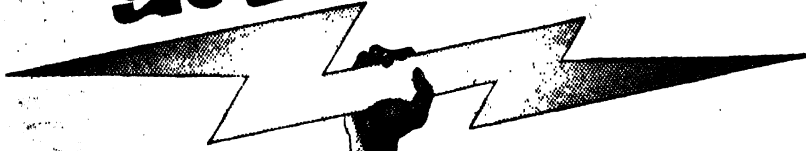
এস্ট্রেলা-শক্তি
এমন শক্তি যার আলো আপনি নিজেই দেখতে পাবেন
এমন শক্তি যার আওয়াজ আপনার কানে বাজতে থাকে
ESTRELA
132
আপনার ট্রানজিস্টার আর টর্চে এস্ট্রেলা-শক্তির বাহাদুরী দেখুন!
এস্ট্রেলা ব্যাটারির শক্তি: যেন 'বিন্দুতে সিন্ধু'
এস্ট্রেলা ব্যাটারিজ লিঃ, বম্বে ৪০০ ০১৯
CMEB-2-234 BEN

তিনি বলেছিলেন যে, ক্যাটারারের ব্যবস্থা করলে রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট কমত, "কিন্তু কী জানেন, ওতে যেন আন্তরিকতা থাকে না, খাওয়ানোই হয়, আপ্যায়ন হয় না।"

খুব আপ্যায়ন করে খাইয়েছেন বটে এখন হাঁশফাঁশ করছি।

নিজেদের ডেরায় নেমে এসে কোমর ঢিল দিয়ে একটু জিরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখনো অবারিত দখিণা-বাতাস আছে।

ফুটপাথে কলশব্দ শুনে ঝুঁকে নীচে তাকালাম। ঠিক। ওরা। ওদের কথা ভাবব না বলে নিস্তার নেই। ওরা ভাবিয়ে ছাড়বে।

দূর থেকে এই সুউচ্চ ম্যারাপ দেখে ওরা নিশ্চয় ছুটে এসেছে। আলোর আলো-ময়ও তো হয়ে আছে ছাদটা। এটা ভোজের বিজ্ঞাপন। এর আকর্ষণ আছেই।

কিন্তু, হায় রে, তাদের সে আশায় পড়ছে বালি।

বিদ্যাসুন্দরবাবু ছিমছাম মানুষ, তাঁর সিভিক সেন্সও খুব চোখা। একটা দানা খাদ্য নীচে পড়েনি। ফুটপাথ আগের মতই সাফ।

কিন্তু ওরা বিদ্যাসুন্দরবাবুকে চেনে না। ওরা এসেছে ওদের অভ্যাসমত। বেগার আর কুকুর—এ-সবের উপদ্রব তিনি যে সহ্য করতে পারেন না, তা ওরা জানে না।

দশ-বারোটা ছেলেমেয়ে এসে জমেছে ফুটপাথে। আট-দশ বছর বয়স হবে ওদের। দু-তিনটি মেয়েও আছে ওদের মধ্যে। আমার বিজ্ঞ বন্ধু যার আখ্যা দিয়েছে উঞ্ছপাহাহার, উপর থেকে দেখতে লাগলাম সেই শোভা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ওরা কাকুতি-মিনতি করছে, কিছু খেতে চাইছে। ওই কলশব্দই আমার কানে গিয়েছিল। কিন্তু সে শব্দ তিনতলা বা তার ছাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাচ্ছিল না নিশ্চয়।

কিন্তু ওরা হতাশ হয় না, হতাশ হতে শেখেনি ওরা। তাই আকাশের দিকে হাত তুলে দল বেঁধে কেবলই আবেদন জানাচ্ছে।

ওদের জন্যে করুণা করা বৃথা। বিশেষ করে এই ভরপেট ক্ষুধার্তের কথা ভাবা ঠিক না। আমি নির্বিকারভাবে সিগারেট টানতে লাগলাম। ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

এ বেলা তো আমাদের রান্না হয়নি। কিছু নেইও। যদি কিছু থাকত তা হলে, কী জানি, হয়তো গিয়ে দিয়ে আসতাম আদিম-মানবের ঐ বংশধরদের।

তেতলার আলো একে-একে নিবছে। উৎসব ওদের শেষ হয়ে এল। এখন ঘরদোর সাফ করা হচ্ছে।

তিনতলা থেকে ঝুপঝুপ করে কী যেন পড়ল নীচে। সে কী, তাঁর সিভিক সেন্সের কথা ভুলে গেলেন নাকি বিদ্যা-সুন্দরবাবু?

আশান্বিত হয়ে নীচে তাকালাম। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া। ঘরের জঞ্জাল সাফ করে ওসব ফুটপাথে ফেলে দেওয়া হল।

নীচের ওরাও আমার মত আশান্বিত হয়ে থাকবে। ওরা ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিল ঐ ফুলের মালা। একটু চুপ করে রইল, হয়তো আশাভঙ্গ হয়েছে। হয়তো ভুলবার চেষ্টা করল ওদের খিদে। তার পর সকলেই সকলে হঠাৎ হেসে উঠল। মালা কাড়াকাড়ি করে ওরা গলায় পরল। অসীম আনন্দে অধীর হয়ে উঠল তারা, গলায় মালা পরে হাতে তোড়া নিয়ে নাচতে লাগল। অস্পষ্ট উচ্চারণে গাইতে লাগল ফিল্মি গান—

ওরে চন্দা ওরে তারা
কেই জিতা কোই হারা।

উপর থেকে দেখতে লাগলাম এই মজা। অনেকক্ষণ ধরে চলল ওদের উৎসব। তারপর ক্লান্ত হয়ে ওরা একে একে ফুলের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোরবেলা লাফ দিয়ে উঠে ব্যালকনি থেকে উঁকি দিলাম। ওরা নেই। পড়ে আছে কেবল কয়েকটি ফুলের পাপড়ি।

॥ ছয় ॥

প্রতিভা থাকলেই হয় না, তাকে প্রতিভাত করার বাহন চাই। তাই লেখকের চেয়ে প্রকাশককে বড় বলে আমার মনে হয়েছে অনেক সময়। তাঁর ভূমিকা প্রায় আকাশের মতই! লেখক জ্যোতিষ্ক হতে পারেন কিন্তু তাঁর ভাস্বরতাকে প্রকাশ করার জন্য আকাশ ছাড়া কে আর? 'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা?' চন্দ্র সূর্য-তুল্য লেখককেও নিজের কক্ষে ধরাতেই কেবল নয়, সকলের কাছে ধরে দিতেও আকাশের মতই ওই প্রকাশক রয়েছেন।

আকাশ তার বিপুল অবকাশে কোথাও যেমন জ্যোতিষ্ককে ভাস্বর করছেন, তেমনি কোথাও আবার কোন জ্যোতিষ্ককে চুর চুর করে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা আকাশ। ফের কখনো আবার কোথাও হয়ত সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ অণুকণাগুলি কুড়িয়ে প্রকৃতির নির্দেশে নিজের অনুগ্রহের নতুন অন্বেষায় নব গ্রহ গড়ে তুলছেন আবার। লেখকের ভাগ্য ভাঙাগড়ার এই খেলা প্রকাশকের।

লেখক আর প্রকাশকে সম্বন্ধটা নাকি খাদ্য-খাদকের এমনটাই শুনে থাকি। আমার এক লেখক বন্ধু, পরে যিনি প্রকাশকও হয়েছেন, ফলে উভয়দশার অভিজ্ঞতায় বিচক্ষণ বলা যায়, তাঁর মতে লেখক আর প্রকাশক উভয়ে কখনো একসঙ্গে বাঁচতে পারে না, একজনকে মেরেই অপরের বাঁচা এবং ফলাও হওয়া। প্রকাশক যেকালে লেখকের খেলো আনই মারেন সেখানে। কৌশলী লেখক পাকেপ্রকারে প্রকাশকের মুণ্ডখানি খাবলে খুবলে নিতে পারেন।

বড় বড় প্রকাশকদের খবরাখবর রাখি না, তাঁদের সহিত যোগাযোগের সৌভাগ্য আমার কম হয়েছে, তাঁদের আচার-আচরণের কথা আমার অজানা, তবে তেমন প্রকাশক-ভাগ্য আমার না হয়ে থাকলেও, প্রকাশভাগ্য আমার বেশ ভালোই আমি বলতে চাই।

আমার যা কিছু বড়খাড়ির ছোট ছোট প্রকাশকরাই তার গোড়ায়। তাঁদের অকৃপণ বদান্যতাতেই আমি এতদিন ধরে দীপ্যমান। তাঁদের ঋণ আমি সসম্ভ্রমে স্বীকার করি।

বড় বড় মেজ মেজ প্রকাশকরা এসেছেন আমার জীবনের শেষভাগে। যেমন দেবসাহিত্য কুটীর, ওরিয়েন্ট পাবলিশিং, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, সিটি বুক এজেন্সি, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, অশোক প্রকাশনী, বিদ্যোদয়, অভ্যুদয় ইত্যাদি। এঁদের সর্ববৃহৎ পাবলিশার্স দেখা দিয়েছেন সর্বশেষে—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ—যাঁরা ছোটদের বড়দের মিলিয়ে আমার দশ-বারোটি বই ছেপেছেন—আবার আট-দশটা এডিশন করেছেন কোন কোনটার, যাঁদের দৌলতে আমি প্রথম টের পেলাম যে আমার বইয়ের একাধিক সংস্করণ হয়ে থাকে, হতে পারে। প্রচুর টাকা পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ফণিবাবু বাদলবাবুর তুলনা হয় না।

অবশেষে দেখা দিয়েছেন অতি সম্প্রতি আমার নাতিবৃহৎ প্রকাশক—আমার নাতি নাতনি ভাগনে ভাগনিরা—গোপাল প্রীতি পলি, প্রভৃতি। এদের কেউ কলেজে পড়ে, কেউ বা স্কুলের ছাত্রী, কেউ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা নিয়ে কাজ না পেয়ে এই অধ্যবসায়ে এসেছেন। আমার নামমাত্র অবদান নিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে দোকান খুলে বসেছেন এঁরা—শিব্রাম চকরবরতির বইয়ের দোকান নাম দিয়ে—এবং কর্পোরেশন মার্কেট কমিটির স্বর্গত চেয়ারম্যান গণপতি শূর মহাশয়ের সাহায্যে বিনা সেলামিতে মাসিক যৎকিঞ্চিত ভাড়ায় মার্কেটের পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় একটুকরো জায়গা পেয়ে ওরই মধ্যে আমার ভাগনে শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার কারিগরির কারিকুরি ফলিয়ে ছোট্ট একটু কাঠামো খাড়া করেছেন—তারই ভেতরে বইয়ের গুদাম শো-কেস সব কিছু নিয়ে বেশ সাজানো গোছানো চমৎকার দোকানটি।

এঁরা প্রকাশ করতে নেমেছেন আমার রচনাবলী। সেই শুরুর থেকে এতাবৎ আমার লেখা যত বই প্রকাশিত অপ্রকাশিত পত্রিকাগত

হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে (শতাধিক মত তো হবেই নিশ্চয়), বাংলা মুলুকের সর্বত্র খোঁজ খবর নিয়ে গুপ্ত এবং প্রায় অবলুপ্ত দশার থেকে উদ্ধার করে উত্তম ম্যাপলিথো কাগজে লাইনো টাইপে রেক্সিন বাঁধাই এ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবার প্রয়াস তাঁদের।

[ইতিমধ্যে কাগজের দাম ৫৫ থেকে বেড়ে একশো পাঁচ টাকা রীমে দাঁড়িয়ে গেছে। তবুও এই আক্রার বাজারেই শিল্পী শৈল চক্রবর্তী কর্তৃক বিচিত্রিত হয়ে প্রথম খণ্ডটি নাকি ছাপতে যাবার মুখেই। তাহলেও আমার প্রত্যয় যে পাঠক সাধারণের আনুকূল্যে বইগুলি তারা যথাসময়ে বের করতে পারবেই। আনুকূল্যের আভাসও মিলছে বেশ। পাড়ার মিস্ত্রির বাড়ির একটি ছেলে এসে একসঙ্গে পাঁচ খণ্ডের দাম (গ্রাহকমূল্য পঞ্চাশ) আগাম দিয়ে গেছে শুনলাম। এরকম নাকি আরও কেউ কেউ। আর সাধারণ গ্রাহকও মন্দ না।

বয়সের হেতু এই লেখালেখির থেকে অবসর নিতে চাই। প্রাণের দায়ে যেটুকু না লিখলেই নয় তাই বেশি আর লিখব না ঠিক করেছি। বহুৎ লেখা হল, আর কেন? এখন একটু যত্ন করে আরাম করা দরকার—সে

আরাম এখন আর অন্য কিছু নয়, আহার-বিহার না, আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া, নিজেকে তৈরি রাখা, স্বচ্ছন্দ শান্তিতে মৃত্যুবরণ।

লিখব কম, সেই হেতু নতুন বইও বেরুবে এক আধখানা মাত্র; তাই আমার ভাগনে ভাগনিরা চাইছেন আমার পুরনো বইগুলো সুসম্পাদিত সুমুদ্রিত হয়ে বার হোক এবার। লেখাগুলো যেন ভাবীকালের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে হারিয়ে না যায়।

অবশ্য তাদের আমি ভরসা দিয়েছিলাম, হারাবার কোনো হেতু নেই। বৃহৎ প্রকাশক রয়েছেন (এবং গজাবেন আরও) যাঁরা আমার বইগুলিকে টেনে হিঁচড়ে খুঁজে বের করবেনই এবং আবার ছেপে বার করবেন—তবে এখন নয়, আমার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর বাদ। যখন আমার বইয়ের কোনো কপিরাইট থাকবে না। কোন লেখকের কবে কপি রাইট যাচ্ছে সেজন্য তাঁরা ওত পেতে রয়েছেন, দিন গুণছেন এমন কি। জীবদ্দশায় লেখককে মূল্য দিতে বৃহৎ প্রকাশকের বৃহৎ অনীহা, কিন্তু কপিরাইট গেলে সে বাধা থাকে না আর, তখন সবাই মিলে হুড়মুড় করে একসঙ্গে বার করতে লাগেন। তা নইলে ত্রৈলোক্য মুখুজ্যে, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়ের মত অমন লেখকরা এতদিন ধরে অপ্রকাশিত পড়ে থাকেন?

আমার সেকালের প্রকাশ-কাহিনী কই একটু খানে।

মৌচাকে প্রকাশিত আমার ছোটদের গল্পগুলি নিয়ে প্রথম ছোটদের বই আমার পঞ্চাননের অশ্বমেধ বেরয় এম সি সরকার থেকে আর প্রথম বড়োদের গল্প বই (প্রেমেন্দ্র মিত্রর সহযোগিতায়) প্রজাপতির পক্ষপাত কমলা পাবলিশিংয়ের থেকে। কিন্তু তার আগেও আমার বই প্রকাশ পেয়েছে বইকি।

টাকা নিয়ে লেখা আর রয়্যালটি পেয়ে প্রকাশককে বই দেবার কাঞ্চন কৌলীন্যলাভে পেশাদার লিখিয়ের পর্যায়ে দাঁড়াবার আগে নিজের খরচায় বই ছাপতে হয়েছিল আমাকে। সেকালে প্রকাশিত লেখার সংগ্রহে গদ্য পদ্যর তিনখানা বই বার করতে হয়েছিল আমায়। কবিতার বই দুটোর নাম 'মানুষ' ও 'চুম্বন', আর গদ্যটির, প্রবন্ধ বই—আজ এবং আগামী কাল।

গল্পের পাতে পড়বার আগে আমাকে কবিতা আর প্রবন্ধের খাতে বয়ে যেতে হয়েছে—ইয়া ইয়া প্রবন্ধ আর তাঁহা তাঁহা কবিতা বেরিয়েছিল আমার বিনা দক্ষিণায় নবশক্তি উত্তরা ভারতবর্ষ কালিকলম আর কবি প্রণব রায় সম্পাদিত ধূপছায়ায় এবং আরো কী সব কাগজে মনে নেই। সেই সব লেখাপত্তর কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড়ো করে বাবা আর মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে বের করেছিলাম। ভালো কাগজে কুন্তলীন আর্ট প্রেস থেকে (এদিকে স্বর্গত হিতেন বসুর যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল) ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল তিনখানা বই। প্রকাশক হিসেবে এম সি সরকার মশায়রা তাঁদের নাম দিয়েছিলেন, ফলে, তাঁদের ওই নামমাত্র সাহায্যেই বইগুলি কেটে গেছল বেশ। যদিও প্রথম সংস্করণই ছিল শেষ সংস্করণ।

তবে সেগুলি হচ্ছে, কবিগুরুর ভাষায়, আরম্ভ-র আগে যে আরম্ভ থাকে তারই আড়ম্বর। প্রদীপ জ্বালানোর আগে তার সলতে পাকানো যার নাম। কাঁঠাল সুপক্ক হয়ে কোষে কোষে বিকশিত রসালো হবার আগেকার কাঁচা-পাকামো। এঁচোড়ের জ্যাঁচড়ামো।

আজ এবং আগামীকাল বইটির পরে অবশ্য দু'-তিনটি সংস্করণ হয়েছিল, নামান্তরে এবং আরো নানা বিতর্কিত প্রবন্ধ সঙ্গে নিয়ে মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি রূপে, কিন্তু এখন তা বাজারে মেলে কিনা আমি জানিনে। তবে কবিতার বই দুটির একেবারেই কোনো উদ্দেশ নেই।

ছোটদের প্রথমকার গল্পগুলি মৌচাকে প্রকাশিত হয়ে পঞ্চাননের অশ্বমেধ নামে বেরিয়েছিল এম সি সরকার আণ্ড সন্স থেকে—বার করেছিলেন সুধীর সরকার মশায়ের সুহৃদ (ও'র দোকানেই বসতেন) অপূর্ব বাগচী মশাই, তার কিছুদিন বাদ বেরয় বড়দের গল্প বইটি।

প্রেমেনের কাছে তালিম নিয়ে বড়দের গল্প আমার সবে তখন হাতেখড়ি। লিখেছি মোটে গুটি তিনেক, 'দেবতার জন্ম' আর লালির কাহিনী নিয়ে যোত প্রতিষোক্ত, আরেকটি আমার এক কাজিনের বিয়ের কাণ্ড নিয়ে 'প্রজাপতির পক্ষপাত'। প্রথম গল্প দুটি কবি শৈলেন লাহার গল্প পত্রিকায় বেরুলো। তৃতীয়টি কোথায় বেরিয়েছিল মনে পড়ে না। কিন্তু তিনটি মাত্র গল্পে বই হয় না।

কোনো রকমে তিনটে গল্প তৈরি হলেও তাইতে কখনো বই হতে পারে না। তাছাড়া ছাপাবার ব্যবস্থা করবে কে? এই সব নানান ফ্যাকড়া দেখা দিল তখন।

আর এসব ফ্যাকড়া, প্রেমেন কথিত, গল্পের মধ্যেকার নয়—তার বাইরের। গল্প না হয় হলো, কিন্তু তা ছাপছে কে মশাই? তার প্রকাশক কই? বড়দের বাজারে কি নাম আছে তখন আমার?

কিন্তু একেবের যে গাড় আমার অজ্ঞাতসারে আগের থেকেই যেন কেমন হয়ে রয়েছিল।

মা বলেছিলেন যে তোকে আর কিছু করতে হবে না, আর করবিটাই বা কী তুই? স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই, ফিটফিটে ওই দেহ, বিদ্যাসাধ্যি কিছু নেই তোর—খাবি কি করে রে? চলবে কি করে তোর? বলেই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন নিজের জিজ্ঞাসার—আর কিছুটি তোকে করতে হবে না। সকালে ঘুম ভাঙবার পর বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় একবার কেবল মাকে ডাকবি—মা দুর্গা। মা দুর্গা!! ব্যস্, তাহলেই তোর হয়ে যাবে—জপের মালা ঘুরোতে হবে না, ধ্যানে বসতে হবে না, আর কোনো সাধাসাধনা নয়।

িথিধস্মো কিছু না। তাতেই তোর হয়ে ব সব।

কী হবে মা?

যা তোর হবার...যা তুই হবি, হতে চাস তে চাস তুই। তার সব। সবটাই। দেখবি দিকে তোর আপনার থেকেই পথ রুষ্কার হয়ে আছে। কিছুরই জন্যে একটু-নিও লড়াই করতে হচ্ছে না তোকে। কারো গা কাড়াকাড়ি মারামারি নয়। কোনো পদ-আপদ অসুখ-বিসুখ কাছে ঘেঁষবে তোর, এমন কি, তোর বন্ধুদের প্রিয়জন-রও নয়।

বন্ধুদেরও? প্রিয়জনেরও? তারা না কলেও?

তাইত হয় রে। দেখেছি হতে। তাদের খ কষ্টে তুই দুঃখ পাবি যে, তাঁদের শোক য়োগে প্রাণে লাগবে তোর—মনে ব্যথা বি—প্রাণে লাগবে তোর সেই জন্যেই। র কষ্ট হয় এমন কিছু কখনো হতে বেন মা?

শুধু ঘুম থেকে উঠে কি দিনান্তে কবার কেবল মা দুর্গাকে ডাকলেই হয়ে বে? কোনো সাধনভজন করতে হবে না? রুটরু লাগবে না? মন্ত্র তন্ত্র নিতে হবে কারো কাছে?

কেনে দরকার কণে না। ছেলে ডাকলে মা খনো থাকতে পারে? একবার মনে করলেই লে। মা ছুটে আসবে তক্ষুনি। যা চাস টা পেতে চাস যা তোর পাওয়াটা দরকার া যেন আপনার থেকেই এগিয়ে আসবে তার হাতে। যেখানে যাবি দরজা খোলাই বি—ধাক্কা মেরে খুলতে হচ্ছে না তোকে. আপনার থেকেই খুলে যাচ্ছে একের পর এক —দেখিস।

ফুটবল খেলার মরসুমে, লীগ্ড লীগের খেলা দেখতে ময়দানে নিত্য যেতাম, একদিন একটি ছেলের সঙ্গে হঠাৎ ভাব হয়ে গেল আমার—তারপর সে রুমাল পেতে রিজার্ভ রে আমার জন্য রাখত তার পাশের জায়গাটি—সেই স্মার্ট ছেলেটির নাম শিবু। ইস্কুলে পড়ত তখন। পরে সে দাদার মের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে,.....এক্ পরিবারের ছন্নছাড়া হয়ে থাকটা কি ভালো? তাই পরে শম্ভু মুখার্জি হয়ে গেছে। এবং সেই শম্ভুটিও সেই আর এখন, তিনটি রূপসী কন্যেরীর বাবা।

সেই শিবুর খোঁজে একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে (শ্রীমানী বাজারে ষষ্ঠীর পথেই একটা বাড়িতে থাকত তারা তখন, আমাদের পাড়ার কাছাকাছি। তার দাদা সাহিত্যিক সাহিত্যরসিক এবং লেখকজনহিতকর অমায়িক পারে পকারপ্রবণ অতি সজ্জন বিশু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আমার।

তিনিই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁর এক বন্ধু ভালো প্রকাশক, তাকে বইটা দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। তিনটের সঙ্গে আর দুটো গল্পের দরকার কেবল।

আর দুটো গল্প এখন পাই কোথায়? লেখা তো বললেই হয় না। অন্তত আমার তা নয়। গেলাম প্রেমেনের কাছে।

ভাই, তোমার দুটো গল্প দেবে আমায়?

তাহলে একখানা বড়দের বই হয়ে যায় আমার। কিছু টাকা পাই। আমার তো তেমন নাম নেই বড়দের বাজারে—যেখানে তোমার দর আর কদর দুই দুর্দান্ত। তোমায় আমায় দুজনের নামই একসঙ্গে থাকবে বইটায়। আর তাহলেই প্রকাশক লুফে নেবে বলছে।

কে বলেছে? মা, বিশু।

বলতে না বলতেই সে রাজি। তক্ষুনি সে, তার কোনো বইয়ে প্রকাশ পায়নি তখনো, এমনি দুটো গল্প দিয়ে দিল আমাকে। আমার একটা গল্পের নামেই নাম হলো বইটার—প্রজাপতির পক্ষপাত। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শিবরাম চক্রবর্তী। প্রকাশক —কমলা পাবলিশিং হাউস।

প্রেমেনের মতন বন্ধুবৎসল সুহৃদ্ আর হয় না।

এই সময় পর পর কয়েকটি বই বেরিয়ে যায় আমার। প্রেমেনের সহযোগীপ্রণেতা হয়ে বাজারে হয়ত একটুখানি প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে—আমার চাহিদা বেড়েছিল খানিক।

বইয়ের ব্যাপারে সেকালে কপিরাইট দেওয়া-নেওয়ার রেওয়াজটাই ছিল চালু। এমন কি শরৎচন্দ্রকেও গোড়ার দিকে তাঁর বইয়ের সর্বসত্ত্ব বেচতে হয়েছে নামমাত্র দামে। এই সময়কার প্রায় বই-ই আমার কপিরাইট বেচে দেওয়া। আমার হেমেনদার, শৈলদার—প্রায় সবার।

কিন্তু তার মধ্যে একটুখানি কিন্তুও ছিল বইকি। হেমেনদা (আমাদের পূর্বসূরী হেমেন্দ্রকুমার রায়) আমাকে বলেছিলেন যে, কপিরাইট বেচো ক্ষতি নেই, কিন্তু কপি-রাইটের সঙ্গে আরো যেসব রাইট জড়িয়ে থাকে সেগুলি যেন হাতছাড়া হয়ে না যায় —কী জানি পরে কখন কী কাজে লাগে আবার—তার সূত্রে টাকা পেতে পারো ফের তো।

তাঁর নির্দেশমত কপিরাইটনামায় আরও একছত্র যোগ করতে হতো আমায়...একস-ক্লুডিং প্লেরাইট, ফিলম রাইট, চীপ এডিশন রাইট, রেডিয়ো রাইট, রেকর্ডিং রাইট, ট্রানস-লেশন রাইটস, টেলিভিশন রাইট (যদি কখনো এদেশে আসে, কেউ বলতে পারে?) ইত্যাদি। এমন কি দেবসাহিত্য কুটীরের প্রকাশিত আমার অতি শোভন সংস্করণের চমৎকার বইগুলিতেও এসব সত্ত্ব আমার কর্তৃক সংরক্ষিত যে, তা পরিষ্কার লিপিবদ্ধ করা রয়েছে।

দেবরাজ সুবোধ মজুমদার মশাই দেবতুল্য সজ্জন, তাঁকে যখন বললাম, আসলে আপনাকে এই বইগুলির ভল্যুম রাইট দেওয়া হল কেবল। মানে, এ-নামে, এইভাবে, এর গল্পগুলি নিয়ে এমন বই আর কাউকে আমি দিতে পারব না, অতঃপর লেখককে আর কোনো খেয়ালটি না দিয়ে যত খুশি ছাপতে পারবেন আপনারা—কিন্তু এর সঙ্গে বিজড়িত অন্যান্য যে সত্ত্ব রয়েছে যা আপনি ব্যবহার করবেন না বা করতে পারবেন না তা আমাকে ছেড়ে দিতে আপনার বাধা কী?

না, কোনো বাধা নেই। ওসব রাইট আমি চাই না। আপনি নিজের রাখতে পারেন। কাজের মানুষ তিনি অল্প কথার। এক কথায় কাজ হয়ে যায় তাঁর কাছে।

এই রকম 'মণ্টুর মাস্টার' ইত্যাদি আরো যেসব বই ওই সব সত্ত্ব বাদ দিয়ে কপিরাইটে দেওয়া ছিল কারও কারও কাছে, সেগুলি এখন আমার রচনাবলীতে প্রকাশ করার ন্যায়ত কোনো বাধা নেই, কেননা আদি চুক্তিতে গ্রন্থাবলী সত্ত্ব চীপ এডিশন রাইট পেপার ব্যাক রাইট এসবও পরিষ্কার বাদ দেওয়া রয়েছে।

ইস্টার্ন ল' হাউসের অনাথনাথ দে মশাই তাঁর আইনের বইয়ের বাইরে নিজের ব্যক্তিগত অর্থোদ্যোগে আরতি এজেন্সি নামে ছোটদের বই প্রকাশ করতেন, হেমেন্দ্রকুমার সুনির্মল প্রমুখ অনেকের বই নেওয়া ছিল তাঁর। আমারও একখানা নিলেন এই সময়। সেই বইটিই মণ্টুর মাস্টার। শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর তখন সবে আঁকার শুরু—নব্য যুবক। আমার বই নিয়েই তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ। শিল্পী শ্রীশৈল-র শিল্প-শৈলী সেই বইয়েই প্রকাশ পায় প্রথম—মণ্টুর মাস্টার বইটির কী চমৎকার বিচিত্রন না তিনি করেছিলেন। প্রথম আবির্ভাবেই তাঁর হাসির ছবি দিয়ে তিনি বাজার মাত করলেন। তাঁর রেখার জোরে আমার লেখার দিকেও নজর টানলেন সবার। শৈলর সহায়েই আমার কি থেকে কী হইল!

আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গৌরাঙ্গ-

প্রসাদ বসুর একটি হাসির গল্পের বই—সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—বেরিয়েছিল সেই সময়—অনাথ প্রকাশনায় আর শৈল-বিচিত্রমঞ্চ। গোর তখন ইস্কুলের ছাত্র, সেই অল্প বয়সেই কী চমৎকার গল্প সব লিখেছিল সে! তার স্বাদ এখনো আমার মনে লেগে। তার ও আমার কয়েকটি করে গল্প নিয়ে যৌথ লেখকতায়ও একখানি বই বের হয় আমাদের—জীবনের সাফল্য।

তার পর থেকে আমার সব বইয়ের, দেব সাহিত্য কুটীরের বইগুলির তো বটেই, ছবিটাব তাঁরই আঁকা। আবার আমার আগামী রচনাবলীর বিচিত্রনায় যা কিছু তিনিই করছেন, এবার তাঁর কার্টুন কলার কী নয়া কেরামতি প্রকাশ পায় সবাই তার অপেক্ষায়।

অনাথবাবু আমার আরো কয়েকটি বইও প্রকাশ করেন কপিরাইট নিয়ে ঐ শর্তে। অমন ভালো কাগজে চমৎকার ছবি ছাপা এমন বই এত সস্তায় কী করে যে তিনি দিতেন (কোনটার দামই ছ' আনার বেশি নয়, শ্রীশৈল বিচিত্রিত দশ বারোটা করে বিচিত্র গল্প) সেই এক বিস্ময় ছিল।

অনাথবাবু বলতেন, এই কপিরাইট নেওয়ার জন্যই। লেখককে সেই প্রথমবারই যা দিতে হয়, তার পরে আর দেবার কোনো নামগন্ধ নেই, ছবি ব্লকের খরচাও সেই প্রথমটায়, তার পরে নেই আর, কাজেই প্রথম সংস্করণে প্রায় কোনো লাভ না হলেও পরের প্রকাশগুলোয় তা পুষিয়ে যায়। বইগুলো আমি এক হাজারের জায়গায় পাঁচ হাজার ছাপতে পারি। একাধিক সহস্রের এক একটা সংস্করণ দেখতে দেখতে উপে যায় সস্তার কিস্তিতে। তাই সস্তায় বই দিয়েও পোষায় এবং সস্তার হেতু হাড়ভাঙ্গি কাটেও বই। সস্তায় বই দেওয়া যায় বলেই ঐ কপিরাইট নেওয়া।

সুবোধবাবুও বলতেন, ঐ কথাই।

তাতে আপনার লাভ?

লাভ? লাভের কথা কইছেন? বাড়ি বাড়ি কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ খুশি হাসিতে ঝলমল করে ওঠে, তার চেয়ে বড় লাভ কী আছে আবার?

মনে হয় দেব সাহিত্য কুটীরের সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমাদের অনাথবাবু।

শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতার মত দাতা আর হয় না। এই দুর্লভ মহার্ঘ বস্তু সব সুলভে শিশুদের যে যোগায় তার চেয়ে মহাপ্রাণ কে আছে আর? সাত্ত্বিকের কর্মযজ্ঞ আনন্দযজ্ঞ তাঁদেরই—তাঁরাই যথার্থ মহামানব। অনাথবাবুর দেহরক্ষার পর আরতি এজেন্সি উঠে গেছে কিন্তু দেবসাহিত্য কুটীরের রাজসূয় অব্যাহত রয়েছে এখনো।

তাঁদের দানযজ্ঞে অনেকের সদাব্রত খুলে গেছে রাজিজুড়—মিথ্যে নয়। দেশের ছেলের হেসে বেঁচেছে। স্কুল-টিফিনের পয়সা জমিয়ে কিনতে পেরেছে সস্তা বই। হাতে হাতে ঘুরেছে সে সব, ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও পৌঁছে গেছি।

লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে তাঁদের বই (আমারও বইকি!) কিন্তু তাতে আমার কোনো লোক ফেরেনি। তাঁদের রাজসূয়ে আমি কিন্তু দাঁড়াতে পারিনি একটুও, তেমনি দরাজ শুয়ে এখনো। এত বই বেচেও টাকার মুখ তেমন দেখতে পাইনি কখনো যেমনটা দেখতে পাচ্ছি এখন ইদানীং এই আনন্দ পাবলিশার্সের প্রকাশনায়—সৌজন্যে।

কিন্তু তাই বলে কি কখনোই কোনো লাভ হয়নি আমার? লাভটা কি খালি টাকার অঙ্কেই গোনবার? মনের অঙ্ক বলে নেই কিছু? এতদিন ধরে এত এত ছেলেমেয়ের মনের কোণে যে একটুখানি ঠাঁই পেয়েছি সেটা কি কিছুই নয়?

ছোটদের লেখায় দেখা দেবার ঢের আগে আমার কবিতার বই মানুষ-এর জেখোয় যেন আমি লিখেছিলাম, মনে পড়ছে, 'ঘরে ঘরে আমার যে প্রিয়/আমার আত্মীয়/যাহাদের তরে ধ্যানরত/আমি বাঁচি/আমি জেগে আছি/পূজেরত' আমার অজান্তেই লেখা, কিন্তু তার মানে জানতে পারলাম অ্যাদ্দিনে।

আমার প্রকাশকদের যজ্ঞটা রাজসূয়ই বটে, কিন্তু আমার যজ্ঞটাও নেহাত অশ্বমেধের মত নয়, আমার যজ্ঞ শুয়ে শুয়ে। আমার রচনারা মোটেই ঘোড়া নয়—ঘোড়ার মতই প্রায়। উদ্দাম ঘোড়ার মতই ছুটে বেরিয়েছে তথা দিগ্বিদিকে, নতুন নতুন হৃদয়ের রাজ্যজয়ে।

সেই সব ঘোড়া ছুটছে...ছুটছেই। ছুটছে আজও......এখনো। ছুটবে বুঝি চিরকালই। কে জানে।

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে শিল্পী দ্বারকানাথ চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরীর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে প্রথমজনের ৩১টি ও দ্বিতীয়জনের ৪০টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। দ্বারকানাথ চ্যাটার্জী ভারতীয় রীতিতে নিয়মিতভাবে ছবি এঁকে পরিচিতি লাভ করেছেন ও ইতিপূর্বে অনেক প্রদর্শনীতেও তাঁর শিল্পনিদর্শন দেখা গেছে। এবারের প্রদর্শনীতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা গেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নানা পুতুল অবলম্বনে তিনি ছবি এঁকেছেন ও ছবির সঙ্গে ছড়াও লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ ছবিই বিভিন্ন প্রদেশের পুতুল ও ছড়া বৈচিত্র্যের জন্য যেন একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে—বিশেষ করে লাল, নীল ও হলুদ রঙ ব্যবহার এবং পুতুল জাতীয় সরলতার জন্য এই ছবিগুলির মধ্যে একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। বিশেষ করে, ময়ূরপঙ্খী, আহ্লাদী পুতুল, ভিলেজ বেল, গৌর নিতাই ও লক্ষ্মী ও পেঁচার ছবি অনেকের চোখে পড়ে ও সেই সঙ্গে মা চিত্রমালাও কয়েকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রঙীন ছবির মধ্যে দু-একটি ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও নতুন কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে স্নেক চার্মার, মাই মাদার ও বিশেষ করে লিনোকাট প্রিন্ট অনেকের নজরে পড়ে। বর্তমান যুগে এ জাতীয় ছবি অনেকের ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু যে সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় রীতি অবলম্বনেই ছবি এঁকে চলেছেন তাতে তাঁর নিষ্ঠা ও নিজস্ব মতবাদের যে পরিচয় মেলে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিত্রনিভা চৌধুরী সুখ্যাত খ্যাতনামা কয়েকজন ব্যক্তির প্রতিকৃতি এঁকেছেন। এগুলি বহুকাল আগে আঁকা। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনের সময়ে যেখানে বহু মনীষীর সমাগম হয় ও শিল্পী পেনসিলে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকেন। এছাড়া দেশের খ্যাতনামা নেতা ও শিক্ষাবিদদের প্রতিকৃতিও প্রদর্শনীতে দেখা যায়। শিল্পীর যে প্রতিকৃতি অঙ্কনে দক্ষতা আছে তা কয়েকটি নিদর্শন দেখে জানা যায়। বিশেষ করে গোপেশ্বর ব্যানার্জী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হেমলতা ঠাকুর, জওহরলাল নেহরু, বিনোবা ভাবে, আচার্য কৃপালনী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও আবদুল গফ্‌ফর খাঁ-র প্রতিকৃতিগুলি প্রশংসার দাবী করে। অন্যান্য ছবির মধ্যে পলাশ, কদম ও শেলটার মন্দ লাগেনি।

*

শিল্পী সমীর মল্লিক অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে ১৬টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। এই শিল্পী প্রথাগতভাবে কোন আর্ট স্কুলে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন নি—অন্তরের তাগিদে আপনার মনে ছবি এঁকে থাকেন। শিল্পী উত্তরপাড়ার চৈতন্য কলাবিজ্ঞান কেন্দ্রের সভ্য ও ইতিপূর্বে কেন্দ্রের যৌথ প্রদর্শনীতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। শিল্পীর রস ও অংকনরীতি দুইই পরীক্ষামূলক। তা সত্ত্বেও তুলির বলিষ্ঠ টানের জন্য দু-একটি চোখে পড়ে, যেমন হার্টস্। সূক্ষ্ম খোজালের পরিপ্রেক্ষিতে বেগুনী রঙের বলিষ্ঠ ও সাবলীল রেখাপ্রধান কমপোজিশন উল্লেখ্য। রঙ ও ওয়াশ রীতির মধ্য দিয়ে দু-এক স্থলে শিল্পী রস সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে ব্যারেন বিউটির নাম করা চলে। নিসর্গদৃশ্যগুলি সাধারণ মানের, যদিও দু-একটি মন্দ লাগেনি, যেমন দি সী। এটিতে নীল ও সাদা রঙের কারুকার্য সৃষ্টি প্রশংসনীয়। প্রতীকপ্রধান রচনা হিসাবে শরণার্থীর নাম করা যায়। অন্যান্য নিদর্শনের অধিকাংশই দুর্বল।

*

রুক্ষ, পাতাবিহীন ছোটবড় গাছের ডালপালার মধ্যে নানা আকার ও ছন্দের অভাব মেলে, সাধারণ মানুষের চোখে সেগুলি হয়ত সব সময়ে ধরা পড়ে না, কিন্তু শিল্পীর অনুসন্ধানী চোখ এগুলির নিজস্ব একটি বিশিষ্ট রূপ অনায়াসেই ধরা দেয়। শ্রীমতী অর্জুন রায় বহুকাল যাবৎ নানাস্থান থেকে এজাতীয় ডালপালা সংগ্রহ

ধ্যানশীল —শ্রীমতী অর্জুন রায়

করেন ও বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে এজাতীয় বহু নিদর্শন দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিচিত্র এই নিদর্শনগুলির মধ্যে জগতের বহু পরিচিত দৃশ্য তথা আকারের সন্ধান মেলে। দর্শকের সামনে এগুলি উপস্থাপিত করে শ্রীমতী রায় তাঁর শিল্পপ্রীতি ও অনুসন্ধিৎসু শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই স্বহস্তে যে কত পরিচিত আকার কেবলমাত্র ডালপালার মধ্য

দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা এগুলি দেখেই বোঝা যায়। বাস্তবিকই কয়েকটি দেখে মনে হয় বুঝি বা এগুলি ভাস্করের রচনা। এই প্রসঙ্গে এলিফ্যান্টস ট্রাঙ্ক, সেন্ট্রাল ডাইভ, সেভারড হেড (মহিষ) লোন পেট্রল, স্কিপার ও বিশেষ করে সাইটিং-এর নাম করা যায়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি নিদর্শনই সুনির্বাচিত ও পরিচিত আকারের দিক থেকে অভিনব। ছোট বড় নানা আকারের এজাতীয় নিদর্শনগুলি যে গৃহশোভার শ্রেষ্ঠ উপকরণ তা বলাই বাহুল্য।

*

একই শিল্পী বিভিন্ন মাধ্যম ও রীতিতে যে কত বিচিত্র কাজ করতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত গৌতম রায়চৌধুরীর প্রদর্শনীতে। এটিই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী—এখানে নানা মাধ্যমে রচিত ৮৭টি নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী প্যাস্টেল, চারকোল, কালিকলম, কালি ব্রাশ ব্যবহার করে নানা শ্রেণীর ছবি এঁকেছেন এবং পোড়ামাটির কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তিও তৈরী করেছেন। প্রদর্শনীভুক্ত বিপুল নিদর্শনরাশি দেখে বোঝা যায় যে শিল্পীর নিষ্ঠা আছে। তবে অধিকাংশই স্কেচ জাতীয় এবং তাঁর সমস্ত নিদর্শনই পরীক্ষামূলক। দেখে মনে হয় এক-একটি মাধ্যম ও রীতিতে তিনি কয়েকটি স্কেচজাতীয় রচনা করেছেন ও এ জাতীয় নিদর্শনের অধিকাংশই তিনি প্রদর্শনীতে পেশ করেছেন। নির্বাচন বিষয়ে শিল্পীর সচেতন হওয়া উচিত ছিল, কারণ কয়েকটি নিছক পরীক্ষামূলক ও শিক্ষার্থীসুলভ। তা সত্ত্বেও নিজস্ব চিন্তাধারাকে রেখা মাধ্যমে রূপায়িত করার ক্ষমতা যে তাঁর আছে তা প্রদর্শনী দেখে জানা যায়। ফলে বিভিন্ন মাধ্যম ও রীতিতে আঁকা নানা জাতীয় নিদর্শনের মধ্যে দু-একটি চোখে পড়ে যায়, যেমন প্যাস্টেল রচিত ইঙ্গিত প্রধান মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, সবুজ রঙ প্রধান প্রতীকমূলক সিটিং উওম্যান, বিমূর্ত রীতির স্টাডি-১। কালিকলমের নিদর্শনগুলির মধ্যে আদিম সরলতা ও দু-এক ক্ষেত্রে হাস্যরসের আভাস মেলে (ফিগার, হারমোনিকা প্লেয়ার)। ব্রাশ ও লাল কালী মাধ্যমে আঁকা দু-একটি নিদর্শন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে প্রতীকপ্রধান বিমূর্ত রীতি ও সুকৌশলে লাল রঙ ব্যবহারের জন্য সিটিং ফিগারস-এর নাম করা যায়। সাধারণ লেখার কালী ও কলমে রচিত মাদার অ্যান্ড চাইল্ডও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পোড়ামাটির সব নিদর্শনই পরীক্ষামূলক, তবে হেড ড্রামার ও খেয়াল সিংগার মন্দ লাগেনি।

চিত্রপ্রিয়

যুগ যুগ জীয়ে

সমরেশ বসু

॥ একুশ ॥

মন দ্রুতগামী, আলো থেকে সেই
য়র মতো, মন চলে যায় চার বছর
নে।

গাড়ি চলে উইলশন রোড দিয়ে টগ্‌বগ্‌
বগ্‌। কিন্তু শিউলীর মনে হয় শব্দটা
র টাউ ঠাউ টাই ঠাউ কিংবা অন্যরকম
দ্‌। ঘোড়ার পায়ে লাগানো নাল,
ল রোডে এমন একটা শব্দ তোলে যা
া দিয়ে শিউলী ব্যাখ্যা করতে পারে না
ঃ ঘোড়ার পায়ের সেই শব্দ যেন প্রতিধ্বনি
লে দু পাশের পাকা একতলা দোতলা
ড়গুলোর দেওয়ালে দরজায়। সাধু
চোয়ানের এক্কা গাড়ি, শহরের একমাত্র
ড়াটে গাড়ি, এখনো ঝকঝকে চকচকে,
খে মনে হয় যেন যাদব ডাক্তারের বাড়ির
ড়ি, কিংবা নাম করা মোক্তার হবিবুল্লা
হেবের গাড়ি। শহরে পারিবারিক গাড়ি
ভুবন মুখুজ্জেরও আছে, রাস্তায় বেরোয়
া। বেড়াতে বেরনো ছাড়া মুখুজ্জেদের
ড়ির আর কোনো কাজ নেই। হবিবুল্লা
হেবের এক্কাগাড়ি, টগবগিয়ে ঝুনঝুনিয়ে
কুমা কোর্টে রোজ যায় আসে, তেমনি
য় আসে ডাক্তার যাদব দত্তর গাড়ি। সেই
ই গাড়িকে মনে করিয়ে দেয় সাধু
চোয়ানের গাড়ি। ভাড়াটে এক্কা গাড়ি,
কমাত্র সাধুরই আছে, আর সবই জোড়া
ড়ার পালকি গাড়ি, ঝরঝরে পুরনো।
খে মনে হয় রোগা ঘোড়াগুলো খেতে
তে পায় না, চোখের পিচুটিতে মাছি
টে থাকে।

যে-কোনো যাত্রী বহনের জন্য সাধুকে
রল ইস্টিশনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে
য় না, রেলগাড়ি এলে যাত্রীদের ডেকে
কিতে হয় না। সাধুর এক্কা ভাড়া খাটে
বশেষ বিশেষ ব্যক্তির, প্রায় প্রত্যহই তার
নয়মিত যাত্রী থাকে। কোনো কারণে
াদব ডাক্তারের বা হবিবুল্লা সাহেবের গাড়ির
রকার পড়লে সাধুর ডাক পড়ে, বা অন্য
কানো বিশিষ্ট ব্যক্তির গাড়ির দরকারেও
াধুর গাড়ি চাই। সাধুর নিয়মিত
ত্রীদের মধ্যে বিবেকানন্দ বসুকে
কালবেলা পৌঁছুতে হয় খেয়া ঘাটে।
বিবেকানন্দ বসু নদীর ওপারের কলেজে
যান পড়াতে, অধ্যাপক, বাবু হিসাবে
ফিটফাট। তারপরেই জেলা জাজেস কোর্টের
উকীল হরিহর সেনকে পৌঁছুতে হয়
ইস্টিশনে। তাঁকে পৌঁছে দিয়ে ইস্টিশনে
একটু অপেক্ষা করতে হয় আপ ট্রেনের জন্য,
সেই ট্রেনে আসেন মধুমতী রায়, কলকাতা
থেকে এই শহরে। এই শহরের তিনি
গার্লস হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। শিউলীরা
তাকে মধুদি বলে।

হেমন্তের সকাল, বেলা দশটা, মিষ্টি
রোদ ঝকঝক করে। শিউলীর মনে হয়
যেন ঝমঝম করে সাধুর এক্কা চলে উইলশন
রোড দিয়ে, যাত্রী মধুদি। শিউলীরা
ইস্কুলের পথে। শিউলী আর আরো কটি
বন্ধু, যারা সকলেই ছাত্রী এবং এক পাড়ার
কাছাকাছি। তাই সবাই সবাইকে ডাকা-
ডাকি করে এক সঙ্গে যাত্রা করে। এইসব
শহরের রাস্তা কম চওড়া, বিশেষত ভিতরের
রাস্তা। এক্কার মতো গাড়ি প্রায় গোটা
রাস্তা জুড়ে চলে, পথের লোককে সাবধানে
ধারে দাঁড়িয়ে গাড়ির রাস্তা করে দিতে হয়।
সাধুর এক্কার শব্দ পেয়ে শিউলীরা
রাস্তার ধারে সারি সারি সরে দাঁড়ায়। সরু
রাস্তায় সাধু কখনো জোরে গাড়ি হাঁকায়
না, ধীরে দুলকি চালে চালায়, গানের
তালের মতো ঘোড়ার পায়ে শব্দ বাজে,
ধাতব শব্দ, প্রতিধ্বনি তোলে দু পাশের
বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে। এক্কার মাথায়
ঢাকনা থাকলেও এই হেমন্তের কালে তা
গুটিয়ে রাখা হয়, মধুদিকে দেখায় যেন
সম্রাজ্ঞীর মতো।

সম্রাজ্ঞী মধুমতী রায়, শহরের উচ্চ
বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা
প্রতিদিন আসেন কলকাতা থেকে। বয়স
হয়তো তিরিশের কাছাকাছি, দেখায় তুলনায়
অনেক কম, বলতে হয় রূপসী তরুণী।
রূপসী? হ্যাঁ, শিউলীর চোখে মধুদি
সম্ভবত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এমন কি
কাননবালা বা ছায়ারাণীর থেকেও,
বায়স্কোপে যাদের দেখা যায়, সাজগোজ
করা নানান বেশে। মধুদির সিঁথেয়
সিঁদুর নেই, চুল বাঁধেন মেমসাহেবদের
মতো, মোটা তেলহীন বিনুনির প্রজাপতি
ছাঁচ বা পান পাতার মতো অথবা কেবল
এক বিনুনি, এলিয়ে দেওয়া থাকে না পিঠের
ওপর, গুটিয়ে রাখেন ছোট করে যা শহরের
এ অঞ্চলে দেখা যায় না, মাঝে মাঝে একমাত্র
মিলের মেমসাহেবদের ছাড়া। কিন্তু তাদের
চুলের রঙ কালো না, সোনালি, বাদামী বা
এক ধরনের ধূসর নীল নীল, যা দেখতে
শিউলীর ভালো লাগে না। মধুদির চুল
কুচকুচে কালো না, কেমন একটা গাঢ় খয়েরি
কিন্তু উজ্জ্বল, শিউলীর মনে হয় তেল
মাখলে তা কালো হয়ে উঠতে পারে, যেমন
ওর নিজের মাথার চুলে সাবান ঘসলে
মধুদির মতো গাঢ় খয়েরি রঙ ফুটে ওঠে।

মধুদির ময়খানে সিঁথে, ঘন পাশের চুল একটু ফুলে থাকে, কেন যেন ছবিতে দেখা মৃণালিনী ঠাকুরের কথা মনে পড়ে যায়, এবং মধুদির কপাল কখনো চুলে ঢাকা থাকে না, যা সাধারণত অন্যান্য মহিলারা পাতা পেড়ে করে থাকেন এবং মধুদির কপালে কেউ কখনো সিঁদুরের ফোঁটা দেখেনি, অথচ সবাই জানে তিনি বিবাহিতা। মধুদি রহস্যময়ী, শিউলীর মনে। মধুদির হাতে শাঁখা নেই, লোহা নেই, চিকচিক করে সোনার চুড়ি, যেন প্রায় মধুদির হাতের রঙের সংগে মিলিয়ে এবং বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি সোনার ঘড়ি। মধুদি সুন্দরী, যদি বা তাঁর নাকের ময়খানটা ঈষৎ মোটা দেখায় তথাপি টিকলো; যদি বা তাঁর চোখ তেমন ডাগর না, কিন্তু টানা ভাব, আর উজ্জ্বল কালো তারা; মুখের গঠন ভঙ্গি একটু চওড়া, যে কারণে মৃণালিনী ঠাকুরের সেই ছবিটা আরো বেশি করে মনে পড়ে যায়। মধুদির একটু মোটা কিন্তু সুন্দর ঠোঁট দুটি স্বাভাবিক লাল, ঝকঝকে সাদা দাঁতের হাসির কোনে তুলনা নেই।

মধুদির মুখ কখনো তেলতেলে দেখায় না, গাঢ় নানা রঙের শাড়ি তিনি পরেন না। তাঁত বা সিল্ক বা পরে ঝকঝকে উজ্জ্বল, অধিকাংশই সাদা। গোলাপ রঙ এবং পাড়ের রঙ থাকে একদিন, এক-এক রকমের কালো নীল বেগুনি, তার সংগে জামা বদলিয়ে যায়।

সমস্ত শিক্ষিকা—দিদিমণি, হাঁ, মণিদের মধ্যে মধুদি অনন্যা। সুন্দরী, কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য মেশানো বা অন্য কিছু, শিউলী ব্যাখ্যা করতে পারে না। সুন্দরী, অনন্যা, অতুলনীয়া এবং এক ভাগ রহস্যময়ী, কাছে পেয়ে দেখেও যেন ধরা ছোঁয়া যায় না। তাঁকে বিবাহি ভাবতে অসুবিধা হয়, কারণ সা শিক্ষিকাদের সাজপোশাকের এবং আচরণে সংগে কোথাও তাঁর মিল নেই। ছাত্রী জানে মধুদির নাকি একটি মেয়ে আছে তিনি স্বামীর সংগে বাস করেন, কিন্তু এ শহরের লোকেরা তাঁর নামে নানা কথা বলে, মন্দ কথা। যে কারণে তিনি ইতিমধ্যে আরো রহস্যময়ী এবং সবিতাপণ্ডিতের সংগে নাকি তাঁর ভাব আছে। ভাব একটি কথা, যা বললে বোঝায় ভাব ভালবাসা যা শিউলীর ভাবতে অবাক লাগে। কারণ সবিতাপণ্ডিত মধুদির থেকে বয়সে ছোট যদিচ মধুদিকে মোটেই বড় দেখায় না পাশাপাশি দাঁড়ালে দুজনকে মোটেই বেমানান দেখায় না। শিউলীর দেখা আছে তথাপি মেনে নিতে পারে না।

মধুদি এ শহরে বাস করেন না কলকাতা থেকে যাওয়া আসা করেন। কিন্তু তাঁর থাকার জন্য ইস্কুল কম্পাউন্ডের গায়ে একটি ছোট বাড়ি আছে। যে বাড়িতে তিনি কখনো-সখনো থেকে যান। তখন ইস্কুল কমিটির মেম্বাররা অনেকে তাঁর সংগে দেখা করতে যান, সবিতাপণ্ডিতও যায়। সবিতাপণ্ডিতের সংগে মধুদির ...য়ের সূত্র কী, শিউলী জানে না। মধুদি নানা গল্পের নায়িকা, ভালো আর মন্দ যেসব গল্প কেবল এ শহরকে কেন্দ্র করে না, কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত সেইসব গল্প কাহিনী প্রচলিত ভাষায় কেচ্ছা কাহিনী নাম দেওয় যায় এবং শিউলীর সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি। তথাপি বলতে হয় অবিশ্বাসের দিকে ঝোঁকই বেশি। মধুদির মতো স্মৃতিশক্তি হয় না। তিনি এ শহরে বারোমাস বাস করেন না, কিন্তু প্রায় সমস্ত ছাত্রীদের নাম মনে রাখেন। ইস্কুলের ছুটির পরে কলকাতা ফিরে যাবার আগে অনেক মেয়ের বাড়ি যান, যেসব মেয়েদের তিনি একটু বেশি ভালবাসেন, আর সেই ভালবাসা পাওয়া ছাত্রীদের মধ্যে শিউলী একজন, যার মুখে চোখের দিকে তাকিয়ে মধুদি দেবীর মতো স্নেহে

সেন। শিউলীর কাছে মধুদি আদর্শ। মধুদি রাগ করেন, কিন্তু চিৎকার করেন না, এবং তাঁর সেই রাগ করা মুখের দিকে তাকালে মনে হয় আকাশে মেঘ থমথম, ঝড়ের সূচনা। সমস্ত ইস্কুলটার চেহারাই যেন বদলিয়ে যায়। মধুদি যখন রাগ করেন, তখন বুঝতে হয় কোনো ছাত্রীর দুরূপনের কোনো অপরাধের কারণে এবং সেই ছাত্রী সকলের চোখে ধিক্কারের পাত্রী হয়ে যায়।

মধুদি সম্রাজ্ঞী, কারণ মধুদি যখন একা খেলা এক্কায় কোলের উপর রাগ রেখে যান তখন আশপাশের বাড়ি থেকে দরজায়, জানালায়, একতলা দোতলার বারান্দা থেকে পাড়ার বউ আর মেয়েরা তাঁকে দেখে এবং শহুরের পুরুষেরা, সমস্ত শ্রেণীর পুরুষেরাই তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। কে যান? মধুমতী রায়, গার্লস ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস। কোন মহিলা? ছোকরি ইস্কুলকা বিবি মাস্টার। এরকম বলে, অধিকাংশ অবাঙালী মেয়ে পুরুষ শ্রমিকরা।

শিউলী রমা শৈবাল মিনতি রাস্তার ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ে, সাধুর এক্কার দিকে তাকায়। সাধুর গায়ে বৌনয়ানের মতো জামা এবং এরকম জামা-ই সে পরে থাকে আর তার রঙ গেরুয়া। মাথায় টাক কিন্তু ঘাড় অবধি বেয়ে পড়া কালো রুক্ষ চুল, গলায় কয়েক ছড়া তুলসীর মালা। তার পরনেও গেরুয়া রঙের খাটো ধুতি। চেহারায় সে কোথাও কোচোয়ান গাড়োয়ান না। শহরে সবাই তাকে সাধু নামে ডাকে। হয় তো তার অন্য কোনো নাম আছে, তথাপি এই নামেই সবাই তাকে ডাকে, কারণ বোধহয় সে নদীর ধারের রক্ষাঘাটের কাছে বটতলার ঘরে থাকে। সেখানেই তার আস্তাবল। সে পুজো করে আর তার প্রকাণ্ড ঘোড়টার সেবা করে এবং বিশেষ যাত্রীদের নিয়ে ছোটাছুটি করে। ঘরে তার বউ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, আছে কী না কেউ জানে না।

সাধুর ঘোড়াকে সবাই আরবি ঘোড়া বলে। যাদব ডাক্তার বা হাবিবুল্লা মোক্তারের থেকে তার ঘোড়া ছোট না, রোগে বেতো টাট্টু না, রীতিমতো বড় ঘোড়া যার গায়ের রঙ অনেকটা কালো আর মেটেয় মেশানো, দু'তিন জায়গায় সাদা দাগ। এক্কার আসনে বসে মধুদি, হেমন্তের সকালের রোদ তাঁর সারা গায়ে। একটি লাল পাড় শাড়ি তাঁর পরনে, যেন লাল সিঁদুরের মতো। পুরো ঘোমটা তাঁর মাথায় কখনাই থাকে না, খোঁপার কাছে একটু আটকানো থাকে। শিউলী দেখতে পায়, মধুদির শাড়ি-পাড়ের লাল রঙের রোদ লেগে রঙ তাঁর গালের পাশে ঝলক দেয়। তিনি শিউলীদের দিকে তাকিয়ে হাসেন, শিউলীরা হাসে। মধুদি ঘাড় ঝাঁকিয়ে, বলেন, 'এসো তোমরা, আমি যাই।'

মধুদি এভাবেই বলেন, আর শিউলীরা সমস্বরে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি মধুদি।'

মধুদি এমনভাবে 'আমি যাই' বলেন, যেন ছাত্রীদের কাছে অনুমতি নিয়ে যান, সেই ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করেন, এবং সম্রাজ্ঞীর মতো চলে যান। রোজ এরকম দেখা হয় না, মাঝে মাঝে হয়ে যায়। কোনোদিন মধুদির ট্রেন দেরি করে, কোনোদিন শিউলীদেরও দেরি হয়ে যায়। মধুদির এক্কা চলে গেলেই মেয়েদেরও তাড়া লেগে যায়, ওদের চলার গতি দ্রুত হয়, যেন মধুদির এক্কারি পিছনে পিছনেই ছুটে যাবে।

উইলসন রোড থেকে রাস্তা বাঁক নেয় নবনারায়ণ দাসের গলিতে। উইলসন রো—মিউনিসিপ্যালিটিরই কোনো মিসে শহরের চেয়ারম্যানের নামে তৈরি আর নবনারায়ণ দাস এ শহরের কে শিউলী জানে না। দুটো রাস্তার মোড়ে একটা গোল করে বাঁধানো বটতলা। বটতলার বাঁক মোড় নিয়ে মধুদির গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়, কেবল দূরে থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে আসে এবং আস্তে আস্তে তা হারিয়ে যায়।

নবনারায়ণ দাসের বটতলার মোড় যতো এগিয়ে আসে, শিউলীরা ততোই আড়ষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ইস্কুলে যাবার পথে বটতলার মোড় একমাত্র জায়গা, যেখানে প্রায়ই কয়েকটি ছেলে আশেপাশে দাঁড়িয়ে

যদি শোনেন ইওরোপবাসীরা যে ইওরোপীয় ক্লজিট ব্যবহার করছেন তা' ভারতেই তৈরী- আপনি কি বিশ্বাস করবেন ?

হাঁ ক'রবেন, যদি আপনি

নাইসর

দেখে থাকেন।

নাইসরের উৎপাদন ২০ শতাংশেরও বেশী রপ্তানীর জন্যেই রেখে দেওয়া হয়। কারণ, নাইসর ভারতের এমন এক স্যানিটারী সামগ্রী যা আন্তর্জাতিক সমস্ত বিধিনির্দ্দেশ মেনেই তৈরী করা হয়। রঙ করতে, ঝলমলে ক'রে তুলতে আমরা বাছাই-করা কাঁচামাল ব্যবহার করি। এতেই এটি হয় মজবুত আর ফিনিস্‌ও হয় চমৎকার ! গঠনের দিক থেকেও বৈচিত্রময় বিপুল আয়োজন। দেখলেই বিশ্বাস হবে। হাঁ, আপনার কাছাকাছি ডিলারের কাছে গিয়ে দেখে আসুন। কী বিরাট পার্থক্য— এক পলকেই বুঝতে পারবেন।

প্রতিটি সেটই আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়—নিখুঁত ফ্লাশিং সম্পর্কে নিশ্চিত গ্যারেন্টী।

Lic. Keramag

নাইসর—আপনার বাথরুম সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে।

OBM: 2635 BEN

বাড়ির বারান্দায় বা রকে বসে থাকে। ...র মেয়েরই নাম বোধহয় জানে এবং ...না কোনো মেয়ের নাম ধরে প্রায়ই দেয়, হাসাহাসি করে। ছেলেগুলোকে বোকা মনে হয়, তেমনি নেওটা। ...ীর রাগ হয়। তা ছাড়া দুঃখ, একটু ...ও দেখতে ভালো না, অথচ ওরা ভদ্র-...দের বাড়িরই ছেলে, শিউলীদের থেকে ...বছরের বড়। রাস্তার আশেপাশে ...বাড়িরা কেউ না থাকলেই ওরা কিছু ...কিছু বলে, নাম ধরে ডাকে, হাসাহাসি ...দু একটা কথাও বলে। ওরা এমন ...মধুদির নাম করে বলে, 'সব মধুমতীর ...চলেছে।' শুনলে শিউলীর কেন মনে হয় এইসব ছেলেদের বাড়িতে ...বাবা মায়েরা নিশ্চয়ই মধুদির ...র্কে খারাপ কথা বলে এবং ওদের ...র ইস্কুলে পড়ে না, অথচ ওরা যে—...র বলে ছোটলোক, ঠিক তাও না।

শিউলীর যখন নরনারায়ণ দাসের বট-...র মোড়, মধুদির গাড়ি তখন হাচিনসন ...ের বাঁকে। হাচিনসন রোডেই শিউলী-...ইস্কুল। শিউলীর চোখে পড়ে সেদিক ...ই ত্রিদিবেশ একলা এদিকে অগ্রসরমান। ...দাদা রাখালের বন্ধু, মাঝে মধ্যে ওদের ...ে যায়, ভালো করে লেখাপড়া করে না। ...উলী আরো জানে, ত্রিদিবেশ নাকি ...সিগারেট খায়, ওর দাদা মা মামা কেউ ওকে ...ন্দ করে না। যাকে বলে, অকালপক্ক ...পে, ত্রিদিবেশ নাকি তাই। কেবল ওর ...বেটা ভালো। শিউলী ওর সঙ্গে কখনোই ...লো করে কথা বলে না। ত্রিদিবেশ যে ...পে ছেলে, বোঝা যায় ওর ধুতি-পরা ...থলে। তাও আবার বড়দের মতো কোঁচ ...য়ে। শিউলীর ওপরের দাদা রাখাল ত ...র না, এবং মেজদার (রাখালের) মতে ...ও ত্রিদিবেশের মতো না। ত্রিদিবেশের ...থার চুল বড় বড়, যা দেখলেই ওকে বখাটে ...ন হয়। ছেলেটার একটাই গুণ, ভালো ...ব আঁকতে পারে। মেজদার কাছে শুনেছে, ...টুকো পড়ার কেদার চক্রবর্তীর কাছে নাকি ...ত্রিদিবেশ এস্রাজ বাজানো শেখে, এবং ...ইতিমধ্যেই নাকি ভালো বাজাতে শিখেছে। ...কেদার চক্রবর্তীকে কেউ ভালো বলে না, ...তিনি নাকি মদ্যপান করেন, আরো নানা ...কিছু করেন যা খারাপ এবং থিয়েটার যাত্রা ...ন বাজনা এই সব নিয়ে থাকেন এবং তার ...চেয়ে বড় কথা, তিনি ত্রিদিবেশের থেকে ...বয়সে অনেক বড়। কিছু না হোক, ত্রিদিবেশের বাবার বয়সী নিশ্চয়ই। এতো ...বড় বুড়ো বয়সের একটা লোকের সঙ্গে ত্রিদিবেশ মেশেই বা কেমন করে? ওর চোখ ...দুটো বড়, মুখটা অবিশ্যি মিষ্টি, আর কথাবার্তা খুব ভালো। মাও ওকে অপছন্দ করেন না, আর বাবা বলেন, 'কী হে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লেখাপড়া সব টঙে তুলে দিয়ে, কেবল তুলি চালিয়ে যাচ্ছো? আখেরে পেট চালাবে কী করে বাবা? ছবি আঁকে কারা? বড়লোকেরা। যাদের খাওয়া পরার ভাবনা নেই।' ত্রিদিবেশ জবাব দেয় না, কেবল মিটিমিটি হাসে। সেই হাসি দেখে শিউলী বিরক্ত হয়। আরো বিরক্ত হয় যখন দেখে ছেলেটা চা খায়। ওর বড়দা পর্যন্ত চা খায় না, ত্রিদিবেশ দিব্যি চা খায়।

শিউলী দেখতে পায়, ত্রিদিবেশ বট-তলার দিকে অগ্রসরমান, ওর হাতে একটা খাতা। শিউলীর আরো চোখে পড়ে, সেই ছেলেগুলোও রাস্তার ওপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে যেন শিউলীদের রাস্তা আটকানোই উদ্দেশ্য। শিউলীর নাকের পাটা ফুলে ওঠে, কারণ এটা নতুন, এই রাস্তার মাঝ-খানে গুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তার মধ্যেই শৈব্যা বলে ওঠে, 'ত্রিদিবেশ কী রকম বাবু সেজে আসছে।'

ত্রিদিবেশকে ওরা সবাই চেনে, কিন্তু শিউলী শৈব্যার কথা শুনলেও, সেদিকে ফিরে তাকায় না, ওর রাগ-ঝলকানো দৃষ্টি রাস্তার ওপর ছেলেগুলোর দিকে এবং ছেলেগুলোর মুখে হাসি, দৃষ্টি ওদের দিকেই। শিউলীদের বাধ্য হয়েই রাস্তার ধারের নর্দমার পাশ ঘেঁষে এগোতে হয় এবং সেই মুহূর্তেই ওর কানে আসে, 'ওকে আমি একদিন ঠিক একটা চুমো খাবো, দেখিস।'

শিউলী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন নিজের ইচ্ছায় না, কেউ ওর পা দুটো টেনে ধরে। মিনতি ওর হাত ধরে টানে, ডাকে, 'চলে আয়।'

শিউলী বলে ওঠে, 'কুকুর কোথাকার, মুখে লাত্থি মারতে ইচ্ছা করে।'

ছেলে চারটি হেসে ওঠে। ত্রিদিবেশ তখন সামনে এসে পড়ে। আর একটি ছেলে তখন বলে ওঠে, 'কুকুর বললে কামড়ে দেব।'

শিউলী ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে ফুঁসে ওঠে, 'আয় তো কোন্ কুকুরটা কামড়াবি?' ত্রিদিবেশ দাঁড়িয়ে পড়ে। একজনের নাম ধরে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে নীলু?'

যার নাম নীলু, সে বিদ্রূপে ঝাঁজে, 'যাই হোক, তোর তাতে কী? তুই যেখানে যাচ্ছিস, যা।'

সেই মুহূর্তে ত্রিদিবেশের সঙ্গে শিউলীর দৃষ্টি বিনিময় হয়, এবং শিউলীর দৃষ্টিতে ত্রিদিবেশকেও যেন সমান ধিক্কার হানে। ত্রিদিবেশ চোখ ফিরিয়ে নীলুদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি অনেকদিন শুনেছি, তোর এখানে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের মেয়েদের যা তা বলিস। তোরা এরকম নোঙ-রামি করিস কেন, ছোটলোকের মতো?'

নীলুর দলের একটি ছেলে ঝাঁজিয়ে ওঠে, 'কোথাকার গার্জিয়ান এলো রে সুশাল, মারবো ঘাড়ে এক রদ্দা বাপের নাম ভুলে যাবি। ভাগ এখান থেকে।'

'ভাগাবো?' এই উচ্চারণ মাত্র। ত্রিদিবেশ ওর হাতের খাতাটা বটতলার বাঁধানো চত্বরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এবং অপমানকারীকে তৎক্ষণাৎ গালে একটা ঘুষি কষিয়ে দেয়।

শিউলীর মনে হয়, ত্রিদিবেশ যেন মুহূর্তে একটা আগুনের শিখ ওর গায়ে ছুঁইয়ে দেয়। কিন্তু পরিণতি মুহূর্তে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। চোখের পলকে নীলুরা চারজন ত্রিদিবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ত্রিদিবেশ একলাই লড়ে, থামে না, পিছু হটে না, এবং নিচুস্বরে গজায়, 'ছোটলোক, ইতর, মেয়েদের সঙ্গে—।'

কথা শেষ হবার আগেই, ত্রিদিবেশের চুল টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়। জামা ছিঁড়ে যায়। ঠোঁটের কষে রক্ত, এবং চারজনে মিলে ওকে, নর্দমার দিকে ঘুষি মারতে মারতে নিয়ে যায়। শিউলীর ঠোঁট কেঁপে ওঠে কান্নায় না, ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় ও উদ্বেগে 'ত্রিদিবেশ।'......... (ক্রমশ)

রবীন্দ্র-সাম

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে যেটা গোলমেলে মনে হয় সেটা হচ্ছে প্রাচীন যুগ, যাকে আমরা বৈদিক যুগ বলি। এই যুগের তথ্য কি ইংরিজী, কি বাংলা কি হিন্দী—এক-একটা বইতে এক-এক রকম পাওয়া যায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তথাকথিত স্কলারদের খুব কমই—অধিকাংশই এর ওর তার মত উদ্ধার করে কাজ সেরেছেন। লিখেছেন অনেকে অনেক কিছুই, কিন্তু সাক্ষাৎ আলোচনায় ব্যখ্যা করতে গেলেই মুশকিল! তখন দেখবেন অনেকেই বলবেন—এসব বহু শতবর্ষী পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে, ঠিক বুঝিয়ে দেবার উপায় নেই; অথচ লেখবার সময় বস্তা বস্তা কাগজ ভরাতে দ্বিধা হয়নি। আবার তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকের (শুধু তাদেরই নয় অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরও) ধারণা রবীন্দ্রনাথ যে সব বেদমন্ত্রে সুর দিয়েছেন সেইগুলিই আসলে বেদগান। কিন্তু এই ধারণা আদৌ সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ যেসব মন্ত্রে সুর দিয়েছেন, সেগুলি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন স্বরে আবৃত্তি করা হত, সেগুলি গাইবার নিয়ম ছিল না কারণ সেগুলি সাম বলে স্বীকৃত হয়নি। কেবলমাত্র যেসব ঋকমন্ত্র উদ্গাতৃ সম্প্রদায় গাইতেন সেগুলিই ছিল মূলত বেদগান। রবীন্দ্রপ্রদত্ত সুরে বেদগানের মধ্যে একমাত্র "উদু ত্যং জাতবেদসম্" (ঋ ১।৫০।১) গান বলে স্বীকৃত। এটি সামবেদের পূর্বার্চিকের ৩১নং সাম এবং এটি "সূর্য-সাম" বলে খ্যাত। এর গীতরূপ অবশ্য বৈদিক নিয়মে সম্পূর্ণ অন্য রকম। উপনিষদ গাইবার কোনও বিধি ছিল কিনা জানি না; কোনও ঐতিহ্য আছে কিনা তাও জানা নেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গাথাসমূহ সুরে আবৃত্তি করা হত: যেমন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "চরৈবেতি" কেবলমাত্র উদাত্ত এবং স্বরিত—এই দুই স্বরে আবৃত্তি করা হত। শাস্ত্রে প্রদত্ত চিহ্ন দেখে এই রকমই মনে হয়।

আর্যদের বিশ্বাস ছিল মন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ নয়, তারা মন্ত্রের দ্রষ্টা। মন্ত্র তাঁদের কাছে প্রতিভাত হত—যাকে বলে "রিভেলেশন"। এই কারণে ঋক মন্ত্রগুলির সঙ্গে ঋষিদের বা মহামানবদের উল্লেখ থাকলেও তাঁরা মন্ত্রগুলি রচনা করেছেন এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু মন্ত্রগুলি ছিল সমস্ত প্রেরণা অর্থাৎ ইনস্পিরেশনের সূত্র। যখনই যিনি যে কষ্টে পড়তেন তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কোনও একটি বিশেষ মন্ত্র গেয়ে প্রার্থনা করতেন; তাঁদের বিশ্বাস ছিল এই জন্যই তাঁদের দুঃখমোচন করবার কামনা

নির্বাচন করা হত তা বলা সম্ভব নয়; কিন্তু ব্রাহ্মণ বা সূত্রগ্রন্থে বলা হয়েছে সেই সব মন্ত্র নাকি তাঁদের কাছে প্রতিভাত হত এবং গাইবার প্রেরণা প্রদান করত। একজন হয়ত গৃহের ভূমি সম্পদ চাইলেন কিন্তু তিনি প্রার্থনা করলেন, সোমরসের গাথা দিয়ে। কেন যে এক্ষেত্রে সোমরসকে বেছে নেওয়া হল তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। এই মন্ত্রগুলিও যিনি সুর সহযোগে গেয়েছেন তাঁর নামেই পরিচিত হয়েছে এবং একই মন্ত্র একাধিক ঋষির নামেও খ্যাত হয়ে এসেছে। এই রকম বেশ কয়েক শত মন্ত্র বর্তমান। এইগুলিও সাম এবং এই সকল সামই যাগ-যজ্ঞে উদ্গাতারা সেই সুরে গাইতেন। এই সব সামের সঙ্গে বহু চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান বর্তমান। অনেক সময় এই সব উপাখ্যানের সঙ্গে অপরদেশীয় সুপ্রাচীন উপাখ্যানেরও মিল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এই রকম একটি কাহিনী উদ্ধৃত করা যাক যার সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের মোজেস-এর লোহিত সাগর-উত্তরণ কাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

বাইবেলের কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে মোজেস ইজরায়েলদের নিয়ে যখন সমুদ্র পার হবার উদ্যোগ করছিলেন তখন ইজিপ্টের সম্রাট বহু সৈন্য নিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হন। ঈশ্বরের নির্দেশে মোজেস দণ্ডসমেত তাঁর হাত উত্তোলন করে বিস্তৃত করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল দু' ভাগ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেয়ালের মত স্থির হয়ে রইল। মোজেস তখন সদলবলে সমুদ্রের শুষ্ক বালুপথে সমুদ্র অতিক্রম করতে লাগলেন। ইজিপ্টের সেনারাও তাদের অনুসরণ করে সমুদ্রের মধ্যভাগে এসে পৌঁছালো। তখন ঈশ্বরের নির্দেশে মোজেস আর একবার হাত তুলে ধরলেন আর তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের বিভক্ত জল প্রবল উচ্ছ্বাসে একাকার হয়ে যেতে লাগল এবং ইজিপ্টের সমস্ত সেনা সেই বিপুল জলধিতে সমাহিত হয়ে গেল তাদের প্রচুর রথ অশ্ব সব কিছু নিয়ে।

এই রকমই জল বিভক্ত হবার একটি কাহিনী আছে আমাদের বৈদিক সাহিত্যে। একদা ভরতগণ তাঁদের শত্রু ইক্ষ্বাকুগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে খুবই অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন সিন্ধু নদীর (বিখ্যাত সিন্ধু নদী অথবা কোনও একটি বড় নদী) এক পারে। অপর পারে ইক্ষ্বাকুগণ অবস্থান করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন ভরতগণের পক্ষে কেননা ইক্ষ্বাকু বংশীয় অসমাতির পুত্র ভয়দ দেবতাদের দুটি দিব্যকান্তি লোহিতবর্ণের অশ্ব অধিকার করে রেখেছিলেন। ইন্দ্র ভয়দকে সেই দুটি অশ্ব সমর্পণ করতে আদেশ করলেন; কিন্তু ভয়দ তাদের কোনমতেই ছাড়লেন না। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ভীষণভাবে গর্জন করে উঠলেন (অক্রোশৎ)। সেই স্থানটির নাম এই কারণেই হয়েছিল ইন্দ্রাক্রোশ। ভরতগণের সঙ্গে ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি। ইন্দ্র তখন এই

দুই ঋষিকে বললেন—"আপনারা ইক্ষ্বাকুদের যাবতীয় গো-সম্পত্তি অধিকার করে নিন।" কিন্তু সেটা সহজ ছিল না, কারণ ইক্ষ্বাকুরা সেই বিরাট নদীর অপর পারে অবস্থান করছিলেন। ঋষিদ্বয় কিন্তু অকুতোভয়ে ভরতদের বললেন—"ইন্দ্র আমাদের ইক্ষ্বাকুদের গোসমূহ অধিকার করতে আদেশ করেছেন; অতএব তোমরা এস আমরা তাদের অধিকার করি।" ভরতগণ উত্তর দিলেন—"তাহলে এই নদী আমরা যাতে উত্তীর্ণ হতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।" ঋষিরা বললেন "—তোমরা তোমাদের রথের সঙ্গে অশ্বসমূহ সংযুক্ত কর।" তারা তা করলেন এবং নদীতে অবতরণ করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি একান্তভাবে প্রার্থনা করলেন যে সেই দুস্তর নদী যেন অতিক্রম্য হয়। এই সময় যে সামটি বিশ্বামিত্রের নিকট উদ্ভাসিত হয় এবং যেটি গেয়ে তিনি প্রার্থনা করেন তার নাম ক্রোশ সাম। বিশেষভাবে সামটি গাইবার পর বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি নদীতে অবতরণ করে ইন্দ্রের উদ্দেশে ঋক সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে স্তুতি করলেন

িনি পুরন্দরীভেদ করেন, যিনি যুবা, ; অমিত পরাক্রমশালী, যিনি যাবতীয় র নিয়ামক, যিনি বজ্রধারী এবং বহু সত তিনিই ইন্দ্র। হে বজ্রধারী ইন্দ্র, গোহরণকারী বলনামক অসুরের গুহায় স্থাপন করেছিলে এবং অসুর কর্তৃক হৃত দেবগণ ভীত না হয়ে তোমার র সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। হে শূর, র দানে সমৃদ্ধ এই নদীর বর্ণনা করতে ত আমরা প্রত্যাগমন করছি। হে স্তুতি- ্য ইন্দ্র, স্তোতাগণ যাঁরা তোমার উপাসনা ন, তাঁরা সেই দানের কথা অবগত হন।"

ক্রমে তাঁরা নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ লেন। সেই সামের প্রভাবে নদীর জল- শ সরে গিয়ে তাঁদের জন্য পথ করে ত লাগল এবং রথ অশ্বসহ ভরতগণ নন্যে সেই সিন্ধু পার হয়ে এসে প্রবল ্রমে ইক্ষ্বাকুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ্ষ্বাকুদের গোসমূহে তাঁরা বেষ্টন করলেন ং ঋষিদ্বয় পশ্চাদভাগে অবস্থান করতে গলেন। অবশেষে তাঁরা ইক্ষ্বাকুদের রাজিত করে তাদের সমুদয় গোসম্পত্তি ধিকার করে এই দুই ঋষিকে প্রত্যর্পণ রলেন।

এই যে কৌৎস সাম যার প্রভাবে এত ্ড হল সেটি হচ্ছে—

ন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উকথ্যম্। বদে বৃধস্ব দক্ষস্য মহাংহিষঃ॥

হে ইন্দ্র, সোমরস নিষ্কাশনের পর মহান লপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞ ক্রতু এবং উকথ্যকে পবিত্রতা প্রদান কর। তিনি (ইন্দ্র) এইভাবে মহান পরিগণিত হন।

মেজেসের কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য থাকলেও সেটি ইঙ্গিত করাই আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য এটি গোচর করা যে বেদমন্ত্রকে অপৌরুষেয় জ্ঞান করা হলেও বহু ব্যক্তিই নানা কারণে নানা মন্ত্রে সুর দিয়ে গেয়ে প্রার্থনা করেছেন এবং যাগ- যজ্ঞে উদ্গাতারা সেই সব সুরই অনুসরণ করেছেন। সেই সব মন্ত্র সেই সব ব্যক্তির নামে পরিচিত হয়েছে; যেমন দেবাতিথি সাম, সজ্ঞান সাম, যৌক্তাশ্ব সাম, অরিষ্ট সাম প্রভৃতি; আবার বহু ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু সাম ঘটনামূলক ঐতিহ্য অনুসারে পরিচিত হয়েছে; যেমন, রথন্তর সাম, বৃহৎ সাম, সজ্ঞান সাম, যৌক্তাশ্ব সাম, অবিষ্ট সাম, বারবন্তীয় সাম প্রভৃতি। সে যুগে যদি ঋষিরা বেদমন্ত্রে স্বনির্বাচিত সুর প্রদান করবার অধিকার পেয়ে থাকেন তাহলে এ- যুগে কোনও মহামানব সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি নিজস্ব সুরে ঋকমন্ত্র গেয়ে থাকেন তাহলে সেগুলিকে আমরা "রবীন্দ্রসাম" আখ্যা দিতে পারি। এ যুগের বিশেষ বিশেষ ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে সেই সুরে বেদমন্ত্র গাইলে তাকে নেহাৎ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার বলতে পারব না। তবে, এটা অবশ্য স্বীকার্য যে রবীন্দ্র- প্রবর্তিত বেদগান ক্লাসিকাল মন্ত্রগান নয় তা একান্তভাবেই এ যুগের রবীন্দ্রসাম—যা এ যুগের বিধিতে অনুষ্ঠানাদিতে আচরণীয়। প্রসঙ্গত এটাও বলতে পারি যে বৈদিক যুগেই গন্ধর্বগণ সামগান গাইতেন নিজেদের রীতিতে। যেহেতু তাঁরা উদ্গাতা ছিলেন না সেহেতু তাঁদের সুরে গাওয়া সামেরও বৈদিক স্বীকৃতি নেই। কোনও গন্ধর্বপ্রদত্ত সুরে গাওয়া সামের উল্লেখ শাস্ত্র দিতে পাওয়া যায় না যদিচ গন্ধর্বদের উপদিষ্ট সামগানের উল্লেখ আছে—যথা উর্ণায়ুসাম। এই উর্ণায়ু ছিলেন গন্ধর্ব। কিন্তু মন্ত্রের সুর তিনি দেননি।

রেকর্ডে গুরুনানকের ভজন

গ্রামোফোন কোম্পানী অতি সম্প্রতি স্টিরিও রেকর্ডে স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর গাওয়া চারটি নানকের প্রসিদ্ধ ভজন প্রকাশ করেছেন। এই চারটি গানই সংগীত, মধুর এবং ভজনের যথার্থ রসও এগুলিতে বর্তমান। সর্বাপেক্ষা সুখের বিষয় খেয়ালের ঢঙে এই সব ভজনে বিস্তার যোগ করা হয়নি, যা আজকাল সচরাচর দেখা যায়। তবে, সমালোচকের নিজস্ব বক্তব্য এই যে, দক্ষিণ ভারতীয় কতকগুলি ভঙ্গী এই গানগুলিতে ওতঃপ্রোতভাবে রয়ে গেছে যাতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। পালুসকারের ভজনে যে রস উত্তর ভারতীয় রসিকেরা পেতেন তা এগুলিতে স্বভাবতই পাবেন না, তবে ভজনকে যে মূল উদ্দেশ্য তা এই গানগুলিতে বর্তমান। কয়েকজন বিশিষ্ট শিখ বোদ্ধার কাছ থেকে জানা গেল এই ভজনগুলির মূল সুর নাকি গায়িকা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এও জানা গেল যে শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী এই রেকর্ড বিক্রির সমস্ত অর্থই গুরুনানক ট্রাস্টের ফান্ডে দান করেছেন। আমরা এই সুন্দর ভজনসমন্বিত রেকর্ডের বহুল প্রচার কামনা করি।

শার্ঙ্গদেব

বিশ্ববিজ্ঞান

পৃথিবীর আকাশে নতুন অতিথি

৩০ নভেম্বর!

পূর্বদিগন্তে প্রভাতী আলো ফুটে গেলেও সূর্য তখনও দিগন্তের নিচে। তারা আকাশের বুকে দু একটি নক্ষত্র টিম টিম করে জ্বলছিল। আর রাতের অন্ধকার ধীরে পশ্চিম আকাশের দিকে সরে যাচ্ছিল।

ঠিক এই সময়। দিগন্তের যে ফাঁকটুকু দিয়ে সূর্যোদয়ের কথা তার কাছাকাছি। কফালি মেঘ। না। বরং বলি এক ফালি মেঘের ফোয়ারা। অথবা মেঘের পুচ্ছ। পূর্ব দিগন্তের আবছা আলোর পর্দায় পরিষ্কার দেখা গেল সেই পুচ্ছ যেন বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ক্রমে সেটি স্পষ্ট হল। তারপর অস্পষ্ট। সূর্যোদয়ের প্রাকমুহূর্তে আর তাকে দেখা যায়নি। সবশুদ্ধ ওই দিন। তারপর থেকে গত কয়েক-দিন ধরে ওই প্রভাতী মুহূর্তে সে-দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি চলছে। যদি এখনও পর্যন্ত কেউ না দেখে থাকেন, তাহলে বলব, দৃশ্যটা দেখে নিন। কারণ এখনও দেখা যাবে। বরং আরও স্পষ্ট। আজ না হয় কাল। তবে ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭৪৫-র মধ্যে। তারপর আর একে দেখা যাবে না। আগামী ৭৫০০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ আর একে দেখতে পাবে না।

কহৌতেক!

হ্যাঁ, প্রথম আবিষ্কারের দীর্ঘ আটমাস পর বহু প্রতীক্ষিত সেই ধূমকেতু কহৌতেক (Kohoutek) এখন পৃথিবীর আকাশে উদীয়মান। এ বছর মার্চ মাসে চেক্ বিজ্ঞানী লুবস কহৌতেক প্রথম এই ধূম-কেতুটির কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর নামেই ধূমকেতুটির নামকরণ। বলা হয়, একটি লম্ব উপবৃত্তীয় পথ ধরে ঘণ্টায় ৭০,০০০ মাইল বেগে সেটি সূর্যের দিকে এগিয়ে আসছে। বহুদূরে থাকার দরুন গোড়ায় খালি চোখে দেখা যায়নি। একমাত্র শক্তিশালী বেতার-দূরবীক্ষণেই তার সঞ্চরণপথটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, এটি যেন একটি চলমান আলোক-পিণ্ড। পরে সূর্যের কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই আলোকপিণ্ড থেকে এক

'হ্যালের ধূমকেতুর চেয়ে অনেক বড়, অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল'। কহৌতেক সম্পর্কে এই মন্তব্য অনেক বিজ্ঞানীর। ২৮ ডিসেম্বর যখন এই ধূমকেতু সূর্যের নিকটতম অঞ্চলে উপস্থিত হবে তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব দাঁড়াবে দুই কোটি কিলোমিটার। এ বছর এপ্রিল মাসে অ্যারিজোনার কিট পিক-এ অবস্থিত ন্যাশনাল অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কহৌতেক-এর এই ছবিটি তুলেছিলেন (তীর চিহ্নিত)

ফালি পুচ্ছের আবির্ভাব। সে পুচ্ছ ক্রমেই আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য : আগামী ২৫ ডিসেম্বর এই ধূমকেতুটির ঔজ্জ্বল্য ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। সূর্য এবং চাঁদের পর এটিই হবে তখন তৃতীয় উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তারপর জানুয়ারির মাঝামাঝি এক অভূতপূর্ব সজ্জায় এর পুচ্ছ পৃথিবীর আকাশের প্রায় ছয় ভাগের একভাগ অংশ ভরিয়ে তুলবে। তখন তাকে দেখা যাবে পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে। অতঃপর দ্রুত প্রস্থানের পালা। নিজস্ব সঞ্চরণপথ ধরে পৃথিবীর পরি-মণ্ডল ছেড়ে সে চলে যাবে দূর মহাকাশের উদ্দেশে। আগামী ৭৫,০০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানুষ আর তাকে দেখতে পাবে না। বলা বাহুল্য, মানুষের ইতিহাসে এত বড় ধূমকেতুর নজির এই প্রথম। এর পর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধূমকেতুটি হল হ্যালের-ধূমকেতু। প্রতি ৭৬ বছর অন্তর এই ধূম-কেতুটি পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালে। আবার দেখা যাবে ১৯৮৬ সালে।

*

বস্তুত, ধূমকেতুর আবির্ভাব মানুষের কাছে যেন এক প্রাচীনতম অভিজ্ঞতা।

কাহোতেক কখন কোথায় থাকবে

পৃথিবীর কোন কোন দেশে ধূমকেতুকে গণ্য করা হয় অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে। কারোর কারোর কাছে ধূমকেতু দেখাটাও যেন এক অশুভ ব্যাপার। এসবের যথাযথ কারণ অবশ্য অস্পষ্ট। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং বিশেষ করে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে ধূমকেতু চিরদিনই একের পর এক নতুন রহস্যের সন্ধান জুগিয়ে এসেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে গ্রহ-উপগ্রহের মত ধূমকেতুও সৌরমণ্ডলের অন্য এক ধরনের বস্তু। পার্থক্য এই, গ্রহ উপগ্রহরা বিচরণ করে প্রায়-বৃত্তাকার সঞ্চরণপথ ধরে। পরিবর্তে ধূমকেতুর পরিক্রমণ পথ উপবৃত্তীয়। গ্রহ-উপগ্রহের তুলনায় তাদের ভর কম। এছাড়া ধূমকেতুর মূল বস্তু-কেন্দ্র সব সময় নীহারিকা সদৃশ বাষ্প বা প্রায় বাষ্পীয় বস্তু দিয়ে ঢাকা থাকে। সূর্য থেকে ধূমকেতুর দূরত্ব যখন বেশি তখন তাকে মনে হয় যেন একটি আলোকবিন্দু। তার পাশ থেকে খানিকটা অংশ বেরিয়ে এসে লেগে রয়েছে। অর্থাৎ পুরো চেহারাটা তখন তার যেন একটি কমা'র মত। সূর্যের কাছাকাছি এলে কমা'র সেই বাঁকানো অংশের আয়তন বাড়তে শুরু করে। এবং শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় একটি বিরাট ঝাটা বা ল্যাজের মত।

তিনভাবে ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়ে থাকে। এক, যে বছরে ধূমকেতুটিকে প্রথম দেখা যায় সেই বছরের সঙ্গে ছোট হাতের ইটালিকস ইংরেজি বর্ণ জুড়ে। যেমন ১৯৪৬a, ১৯৪৬b, ১৯৪৬c প্রভৃতি। দুই, প্রথম আবিষ্কারের সালের সঙ্গে রোমান সংখ্যা জুড়ে। যেমন, ধূমকেতু ১৯৪৬I, ১৯৪৬II প্রভৃতি। তিন, কখনও বা প্রথম সন্ধানকারীর নামেও ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়। যেমন, হ্যালের ধূমকেতু, এনকের ধূমকেতু, ইত্যাদি।

নামকরণ যাই হোক না কেন, এক একটি ধূমকেতুর সঞ্চরণপথ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি পরিক্রমণ করার সময় কোন ধূমকেতু সূর্যের খুব কাছাকাছি আসে। কোনটি বা বহুদূরে থেকেই পরিক্রমণ সেরে চলে যায়। যেমন ধরুন ১৮৮০I এবং ১৮৮৭I ধূমকেতু দুটি সূর্যের প্রায় ১০,০০০ মাইলের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। খুব কাছাকাছি এলে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ টানে এবং সৌর-ঝটিকার ধাক্কায় ধূমকেতুর বেশ কিছু বাষ্পীয় অংশ বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া সূর্যের উত্তাপে তার মধ্যে বাষ্পীভবনও বেড়ে যায় বলে লেজের আয়তন আরও কিছুটা বাড়তে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায়, পরিক্রমণ শেষ করে ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, সূর্যের অতিরিক্ত আকর্ষণে তার লেজের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয় এবং মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ব্যাপারের দরুন ধূমকেতু যতবার সূর্যের কাছে আসে ততবার তার কিছু পরিমাণ বস্তু সে হারিয়ে ফেলে।

এ ছাড়াও এক-একটি ধূমকেতুর সঞ্চরণপথের কায়দা-কানুনও যেন এক এক রকমের। বেশির ভাগ উপবৃত্তীয় পথে চললেও, কারো কারোর সঞ্চরণপথ প্রায় অধিবৃত্তীয়। ফলে চলার পথে সূর্য থেকে কেউ হয়ত বেশি দূরে পর্যন্ত সরে যেতে পারে না। অবার কেউ কেউ সৌরমণ্ডলের বাইরেও চলে যায়। কেউ নিজের পরিক্রমণ

পথ একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ৩.৩ বছরের মত। যেমন এনকে'র ধূমকেতু (Encks Comet)। আবার কয়েকের সময় লাগে ১,০০০,০০০ বছরের মত। প্রথম শ্রেণীর ধূমকেতুদের বলা হয় নিকট-সঞ্চরণমান ধূমকেতু। দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে বলা হয় দূর-সঞ্চরণমান ধূমকেতু। কহৌতেক সূর্যের নিকটতম অঞ্চলে আসবে আগামী ২৮ ডিসেম্বর। সূর্য থেকে তখন তার দূরত্ব দাঁড়াবে দুই কোটি কিলোমিটার। কহৌতেক এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে।

✻

কিন্তু চিরায়ত যে দুটি প্রশ্ন গত দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর তাবৎ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে রেখেছে তারা হল : এক, ধূমকেতুর সঠিক পরিচয়টি কী? দুই, কী ধরনের বস্তু-সামগ্রী দিয়ে ধূমকেতু তৈরি?

প্রথম প্রশ্নের সমাধানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিউটনের। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন, ধূমকেতুর চলাফেরার কায়দাটা গ্রহেরই মত। গ্রহ যেমন সূর্যকে মধ্যখানে কোন এক জায়গায় রেখে নির্দিষ্ট পথ ধরে পরিক্রমণ করে, ধূমকেতুও তেমনি
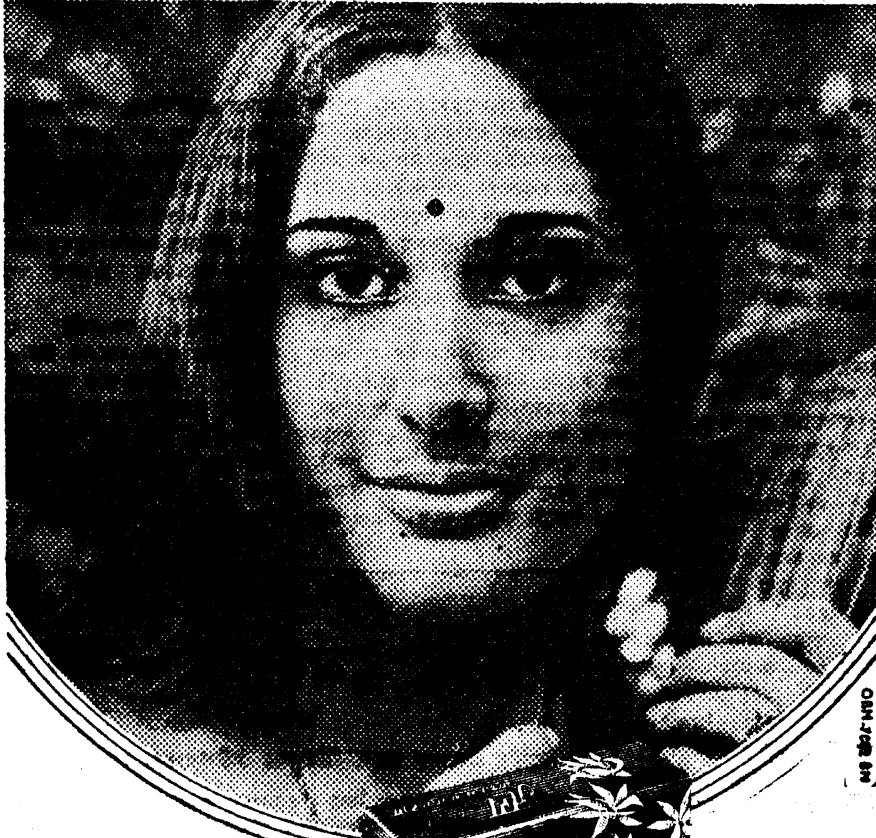
করে। প্রতিটি গ্রহের পরিক্রমণ-কাল বা টাইম পিরিয়ড যেমন নির্দিষ্ট, প্রত্যেকটি ধূমকেতুর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমনি। অর্থাৎ প্রত্যেক ধূমকেতু একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার পরিক্রমণ পদ্ধতি একবার করে ঘুরে আসবে। অতএব বলতে পারেন ধূমকেতুও একটি গ্রহ। ১৭০৪ সালে ২৪টি ধূমকেতুর গতির উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে নিউটন এই মতবাদটির সপক্ষে সমর্থন জানান। এবং সাম্প্রতিক বিশ্বাস, সূর্যের দূরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন অথবা প্লুটোর কাছাকাছি অঞ্চলে ঠিক যেভাবে একসময়ে গ্রহগুলি তৈরি হয়েছিল ঠিক সেই-ভাবেই ধূমকেতু জন্মলাভ করেছিল। পরে সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানে তারা এক একটি পরিক্রমণ পথ ধরে চলাফেরা শুরু করে দেয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : ধূমকেতু ছোট ছোট বরফের কুচি দিয়ে তৈরি। তবে কিসের বরফ—জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড না আর কিছুর, বলা শক্ত। এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন, এক এক ধূমকেতু এক এক ধরনের বস্তু দিয়ে তৈরি। এবং কোনটি কী দিয়ে তৈরি সেটা নির্ভর করছে সেটি কোন সময়ে এবং কী ভাবে তৈরি হয়েছিল তার ওপর।

তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধূমকেতু থেকে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ধূমকেতুর বস্তুসামগ্রীর মধ্যে আছে নানারকম রাসায়নিক অণু। এই সমস্ত অণুর কোনটি 'র‍্যাডিকাল' কোনটি বা অয়নিত 'র‍্যাডিক্যাল'। যাদের মধ্যে প্রধান : কার্বন, সাইনোজেন, CH, NH, OH, অ্যামাইন, কার্বন মনোকসাইড, নাইট্রোজেন, প্রভৃতি। ধূমকেতুর মাথা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'কমেটস হেড', কারোর কারোর মতে সেটির স্বরূপ কতকটা উল্কাপিণ্ডের মত। এ থেকে এমন সিদ্ধান্তও কেউ কেউ করছেন, ধূমকেতুর কেন্দ্রীভূত বস্তুকণার মধ্যে লোহা, গন্ধকের অকসাইড এমন সব পদার্থও থাকতে পারে।

*

প্রশ্ন অনেক। তার কিছুটা সমাধিত। কিন্তু অনেক কিছুই নতুন প্রশ্নের জাল রচনা করে চলেছে। কহৌতেকের আবির্ভাব তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় রকমের সুযোগ। কারণ, এই প্রথম একটি বড় আয়তনের ধূমকেতু পৃথিবীর কাছাকাছি এসে উপস্থিত এবং নানারকম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনার ফলে সেকেলে বিজ্ঞানীদের তুলনায় এখনকার বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ সুবিধেও অনেক বেশি। গত আট মাস ধরে সে-সব যন্ত্রপাতি সাজিয়ে সবাই এখন প্রস্তুত।

বলা হয়েছে, মার্কিন দেশের স্কাইল্যাব-৩ এর তিন অভিযাত্রী জেরাল্ড কার, এডোয়ার্ড গিবসন এবং উইলিয়াম পোগ বিভিন্ন ধরনের এগারটি যন্ত্র দিয়ে কহৌতেকের উপর সন্ধান চালাবেন। এর মধ্যে রয়েছে অতিবেগুনী রশ্মি বা 'আলট্রা-ভায়লেট লাইট' ক্যামেরা। উল্লেখ্য, পৃথিবীর আবহাওয়া ভেদ করে দূর পথের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীর বুকে পৌঁছতে বাধা পায়। ফলে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে অতিবেগুনী রশ্মিতে ছবি তোলা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব ঊর্ধ্বাকাশের কোন জায়গা থেকে। তাই একমাত্র স্কাইল্যাবের যাত্রীদের পক্ষেই সে ধরনের ছবি তোলা সম্ভব হবে এবং তার ফলে ধূমকেতু সম্পর্কিত অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এ ছাড়াও সম্প্রতি মেরিনার-১০ নামে মানব আরোহীহীন যে মহাকাশ যানটিকে মার্কিন দেশ বুধ এবং শুক্র গ্রহের দিকে পাঠিয়েছেন, তার সাহায্যে কহৌতেকের ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৃথিবী থেকে ছবি তোলার ব্যবস্থা তো আছেই। ওই সমস্ত ছবি একত্রিত করে ধূমকেতুটির ত্রিমাত্রিক (Three dimensional) চেহারাটি জানা সম্ভব হবে। এই সঙ্গে যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ এখন পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে,—পাঁচটি রকেট, দুটি বেলুন সেই সব এবং বিভিন্ন যন্ত্রবাহী একটি বিমান নিয়মিতভাবে কহৌতেকের ছবি তুলে চলেছে।

ইতিমধ্যে, ৯ ডিসেম্বর থেকে তিনদিন ধরে চলবে শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধূমকেতু দেখার পালা। তাঁরা ধূমকেতুটিকে দেখবেন 'কুইন এলিজাবেথ' জাহাজের ডেকে বসে। জাহাজটি নিউ-ইয়র্ক বন্দরে এখন দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে প্রত্যেক দর্শককে খরচ করতে হবে মাথাপিছু ১৩০ ডলার। পরিবর্তে বিশেষ ধরনের একটি দূরবীণের সাহায্যে তাঁদের ধূমকেতুটিকে দেখতে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা শোনার সুযোগ।

বলা বাহুল্য, উত্তেজনা এখন সর্বত্র। ভারতের কোদাইকানাল এবং উতকামণ্ডের শক্তিশালী বেতার-দূরবীক্ষণও এখন লোলুপ দৃষ্টিতে দূরাকাশের দিকে [illegible]। বাস্তবত সোভিয়েত দেশের [illegible] জডর‍্যাল ব্যাঙ্কের [illegible] লিয়ার [illegible] সন্ধানের [illegible] তিনেকের [illegible] করা হয়।

—সমরজিৎ কর

ডাক্তাররা বলেন,
৩ মাসের পর,
সর্বাঙ্গীণ
বিকাশের
জন্যে আপনার
বাচ্চার চাই
শক্ত আহার
ফ্যারেক্স আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাকে ফ্যারেক্স কত কি দেয় দেখুন!
সহজপাচ্য প্রোটিন। সেই সঙ্গে, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রণ
আর কার্বোহাইড্রেট।
আপনার বাচ্চার জন্যে কি অনুপাতে ফ্যারেক্স বাড়ানো প্রয়োজন:
বাচ্চার বয়েস
ফ্যারেক্সের পরিমাণ
৩-৬ মাস
১-২ চায়ের চামচ দিনে দুবার
৬-৯ মাস
৩-৪ চায়ের চামচ দিনে তিনবার
৯ মাসের পর
৪-৬ চায়ের চামচ দিনে চারবার
বিনামূল্যে ফ্যারেক্স পুস্তিকার জন্যে এখানে লিখুন:
ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্ট বক্স ১৬৫৫৮, বম্বে ১৮ ডবলিউ বি,
সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন।
(যে ভাষায় চাই জানাবেন)
FAREX
ফ্যারেক্স®
গ্ল্যাক্সোর তৈরী
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে আপনার
বাচ্চার প্রথম শক্ত আহার
CMGF-35-175 BN

ঘরে-বাইরে

ওঁ আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে

আমরা ফিরছিলাম একেবারে কন্যাকুমারী থেকে। গন্তব্যস্থল তখনকার মত মাদ্রাজ। পথে বহু তীর্থ দর্শন করে মহাতীর্থ পন্ডিচেরী পৌঁছলাম। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। সাধক বন্ধু থাকতেন আশ্রমে কিন্তু আশ্রমসংলগ্ন একখানা বাড়ি তাঁর রয়েছে। অতিথি আগন্তুক এলে তাদের থাকতে দেন। সেই গৃহে হঠাৎ দেখা হলো তদানীন্তন পন্ডিচেরীর আই জি শ্রীশান্তিনাথ দের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে শান্তিনাথ বললেন, দিন কয়েক আগে পন্ডিচেরীর সমুদ্রে সাংঘাতিক এক কান্ড হয়েছে। উত্তাল সাগরতরঙ্গে কিশোরের দল নাইতে নেমেছিল। একজন তার মধ্যে ফিরে আসেনি। তার হদিশ না করতে পেরে পুলিশে খবর গেল। পুলিশ যখন দুরন্ত সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া বালকের খোঁজে ব্যস্ত, মাদার খোঁজ করলেন বালকের পিতার। মাদারকে কিন্তু কেউ তখনও খবর দেয়নি। বালকের পিতা এলেন। মাদার বললেন যে, তাঁর পুত্র বহুদূরে চলে গেছে। তার জন্য দুঃখে উদ্বেগে পড়লে সে শান্তি পাবে না। মাদার তাকে দেখেছেন। তার দুঃখকষ্ট নেই। বালকের পিতা হতভম্ব। কিসের কথা, কি কথা কিছুই বুঝতে পারছেন না। ততক্ষণে বালকের সংবাদ রটে গেল চারিদিকে। অবনতমস্তকে এত বড় আঘাত শিরোধার্য করে পিতা নিঃশব্দে চলে গেলেন। মাদার তাঁকে আপন শক্তি দিয়ে দুঃখ বহন করবার শক্তি দিয়েছেন। সান্ত্বনার তাঁর আর প্রয়োজন কই?

অবাক বিস্ময়ে বসে আছি। ডাক পড়লো প্রার্থনা সভায় যাবার। সেদিন বৃহস্পতিবার। প্রার্থনার শেষে পাঁচ মিনিট আলো নিবে গেল। সবাই নিঃশব্দ চুপচাপ। অল্প আগে শোনা ঘটনার রেশ আর রাতের আকাশ বাতাস সব মিলে কি অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টি করেছিল ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। কত লোকের মুখে, কত ভক্তের কাছে কত কথা শুনেছি। কিন্তু আমার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সেদিন শ্রীমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করেছিলাম। স্পর্শ, গন্ধ, গীত, সুখ, দুঃখ কিছু নেই। আছে পরমশক্তির মহাপ্রসাদ।

গত ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীমা দেহরক্ষা করেছেন। ১৯১৪ সালে ২৯শে মার্চ মাদাম মীরা রিশার পান্ডিচেরীতে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৩৬। মীরাকে আবার দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর তিনি পন্ডিচেরী এলেন দ্বিতীয়বার। ইউরোপীয় পোশাক ছাড়লেন, নিরামিষ আহার ধরলেন ও গভীরভাবে দিব্য সাধনায় মন দিলেন। ১৯২৬ সালের শেষে শ্রীঅরবিন্দ নিজে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলে শ্রীমাই নিলেন আশ্রমের ভার ও সাধকদের দায়িত্ব। তখন থেকে তিনি আশ্রমের মা, সবার মা।

এই আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী মহিমময়ী সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "The Mother" বইখানিতে বলছেন, "Do not allow yourself to be troubled or discouraged by any difficulties, but quietly and simply open yourself to the mother's force and allow it to change you"—

"বিপদে বিচলিত হয়ো না, নিরাশ হয়ো না। শান্ত সরলভাবে মাদারের শক্তির কাছে নিজেকে মেলে দাও আর পরিবর্তন আসতে দাও।"

শ্রীমাকে নিত্য নূতনরূপে সাধকরা দেখেছেন। একটি প্রশ্ন দেখুন, "While looking at the mother when she came on the Terrace, I suddenly saw in her lap a baby who I

শ্রীমার কিশোরী মূর্তি

took to be Jesus Christ as it resembled his figure. The vision lasted for about a minute and I saw it with open eyes. Cant it be true?" উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, It may be so—as Jesus was the child of the Divine mother.

হতে পারে—যিশু ছিলেন দিব্য মায়ের শিশু। প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন ছিল, "মায়ের চত্বরে দর্শনদানকালে তাঁর কোলে একটি শিশু দেখলাম। শিশুটিকে আমি যিশু ভাবলাম কারণ তাঁরই অবয়ব বলে মনে হয়েছিল। দৃশ্যটি মিনিটখানেক রইল; আমি চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিলাম।" হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলে মাদারের শক্তির পরিচয় পেয়েছে। সাধক পেয়েছে। আশ্রমবাসী সামান্য মানুষও পেয়েছে। মাদারের দিব্য শক্তি হয়তো এখনও মিশে থাকবে পন্ডিচেরীর আকাশে বাতাসে।

শ্রীমতী

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

আজ যদি এই কলকাতা শহরের কোন একটি জায়গায় উঁচু দেয়াল দিয়ে বলা হয় এপার-ওপারের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, তোমরা কি তা মেনে নেবে? ঠিক আমাদের অবস্থাও তাই। কোন মানুষের মনকে ইঁটের দেয়াল দিয়ে দীর্ঘদিন পৃথক করে রাখা যায় না। আজ হোক আর কাল হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাস কেন, এটা সত্য, একদিন উভয় জার্মানীর পুনর্মিলন হবে। আর সেদিন দূরে নয়।

উপরের কথাগুলি বলতে গিয়ে একটু থেমে গেলেন। আবার কলকাতার চৌরঙ্গীর রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডক্টর (শ্রীমতী) সুটেজ শোভেন। এই জারমান মহিলা পেশায় সাংবাদিক। সম্প্রতি ভারত সরকারের অতিথি হিসাবে তিন সপ্তাহের জন্য ভারত দর্শনে এসেছিলেন। এরই মধ্যে কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যান। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এ নিয়ে তিনবার কলকাতায় এসেছেন। ভারতে এসেছেন চার বার। '৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময় কলকাতার আশপাশে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। সেই বছর শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ভারতের একাধিক রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার অভিযানের রিপোরটও করেন। কলকাতায় একটি অভিজাত হোটেলে বসে তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল।

কথা প্রসঙ্গে জানালেন, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাদের পারিবারিক বন্ধু। জওহরলাল নেহরুর জীবনী নিয়ে জারমান ভাষায় তার লেখা গ্রন্থ জারমানীতে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে। শ্রীমতী শোভেনের মতে জওহরলাল নেহরু এ যুগের মহামানব। তিনি ভারত-জারমানি বন্ধুত্বের যে সূচনা করেছেন তার ফলশ্রুতি আজকের ভারত-জারমান বন্ধুত্ব।

শ্রীমতী শোভেন বললেন, যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা শ্রীমতী গান্ধী শুধু তোমাদের নেত্রী নন। তিনি বিশ্বের নির্বাচিত ও নিপীড়িত নারী সমাজের প্রতিভূ। জারমান মহিলারা শ্রীমতী গান্ধীকে তাদের পরম আত্মীয়া বলে মনে করেন। তিনি জানালেন '৭১ সালে অক্টোবর মাসে শ্রীমতী গান্ধীকে 'বন'-এ যে সম্বর্ধনা জানানো হয় এর আগে কোন বিদেশী এত বেশি সমাদর পাননি।

ডক্টর সুটেজ শোভেন

অ্যাংলো-জারমান সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীমতী শোভেন আমার প্রশ্নের জবাবে জানালেন, একটানা ২৫ বছর সাংবাদিকতার কাজ করেছেন—১৯৩৫ সাল থেকে '৬০ সাল পর্যন্ত। এই সময় তিনি লনডনে একাধিক জারমান ও সুইস সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে লনডনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার রিপোরট করতে গিয়ে এক সময় তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে পড়েন। হোম অফিস থেকে তাকে একাধিকবার সতর্ক করে

দেওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যে তিনি একটুকু পিছিয়ে পড়েননি বা নিজেকে কোথাও আত্মসমর্পণ করতে দেননি।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী। বার্লিন এবং আমেরিকার দেলাওয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেন। বর্তমানে বিশ্বের যুব সমস্যা সম্পর্কে, বিভিন্ন দেশের যুব শক্তির আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

প্রথমেই তাঁর নিজের দেশের যুব শক্তি সম্পর্কে বললেন, বহু যুবক আজ হতাশায় ভুগছেন। তাঁরা কোন পথে যাবেন, এটাই তাঁদের কাছে আজ সমস্যা। পথ খুঁজে না পেয়ে তাই বিপথে চলে যাচ্ছেন। কেউ বা নেশায় মত্ত হয়ে দূরে গিয়ে আত্মতুষ্টির চেষ্টা করছেন। শ্রীমতী শোভেনের মতে এই সব বিপথগামী যুবশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে এদের ফিরিয়ে আনা যায়। উত্তরে তিনি বললেন, এদের কথা শুনতে হবে। ঘৃণা করে এদের দূরে সরিয়ে রাখা হবে অন্যায়।

তিনি আরও জানালেন, আজকের জারমানে অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'ফ্রি-সেক্স' প্রচলন তীব্রভাবে বেড়ে গিয়েছে। এমন দৃষ্টান্তও আছে এই মেলামেশার ফলে ১২।১৩ বছরের কিশোর-কিশোরী সন্তানের জনক-জননী হচ্ছে। শ্রীমতী শোভেনের মতে এটা শুধু জারমানে নয়। সারা দুনিয়ার বহু উন্নত দেশে আজ এটা একটা সমস্যা।

প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি অবাধ মেলামেশার পক্ষে নন?

উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমরা চাই অবাধ মেলামেশা। অবাধ মেলামেশা যাতে বিকৃত রূপ না নেয় এবং অতিরিক্ত ড্রাগ ব্যবহার না হয় সেটা দেখা উচিত। ধরুন, একটি ১২ বছরের ছেলে বা মেয়ে যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ড্রাগ ব্যবহার করে তাতে তার শরীরের বা দেহের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ১২ বছরের কোন মেয়ের পক্ষে ড্রাগ সহ্য হলেও কোন ছেলের সহ্য হয় না। কারণ দেহের গঠন তখনও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শ্রীমতী শোভেন এই প্রসঙ্গে আর বেশি কিছু মন্তব্য করতে চাইলেন না। আজকের জারমানীর রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং বহু রাজনৈতিক গ্রন্থের তিনি লেখিকা। যুবশক্তি সম্পর্কে তাঁর গবেষণার জন্য '৭২ সালের আগে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে দু'বার সম্মানিত করেছেন। সারা পৃথিবীতে এখন তিনি ঘুরছেন। দেখছেন, সমীক্ষা করছেন—কোথায় কোন দেশের যুবশক্তি কেন আজ কর সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছেন না।

শ্রীমতী শোভেন মনে করেন, যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে সেখানে কি ছেলে কি মেয়ে সকলের ভোটদানের অধিকার ১৮ বছর করা উচিত। অবশ্য তিনি এও জানালেন, ইতিমধ্যে জারমান সহ পৃথিবীর বহু দেশে ভোটারদের বয়স কমিয়ে ১৮-তে নামিয়ে আনা হয়েছে।

দু'সন্তানের জননী। শ্রীমতী শোভেনের এখন বয়স ৬১ বছর। স্বামী ডক্টর উইলমান ওলকহ্যাং থাকেন বার্লিনে। 'ইনডিভিসাবল' নামে এক সংস্থা গঠন করেছেন। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে উভয় জারমানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও কাছে টেনে নেওয়া। কারণ, তাঁর মতে উভয় জারমানীর সাধারণ মানুষ মনে করেন তাঁরা "জারমান"। তারপর তাদের রাজনীতি। শ্রীমতী শোভেন আরও জানালেন, '৭৩ সালে পূর্ব জারমান বার্লিনে যুব উৎসবে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র যোগ দেন। সেখানে তাঁরা যে সম্বর্ধনা পান তাতে তাঁদের মনে হয়নি যে, তাঁরা দু' দেশের নাগরিক।

প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে আমার সঙ্গে শ্রীমতী শোভেনের কথার ফাঁকে তিনি বারবার এই কলকাতা শহরের নানা সমস্যার কথাও তুললেন। এবং বললেন, আবার যখন কলকাতায় আসব তখন তোমাদের পাতাল রেলে যাতায়াত করব। আমি বললাম, নিশ্চয়ই। দেখো, আমাদের পাতাল রেল তোমাদের থেকে খারাপ হবে না। হো হো করে একগাল হেসে শ্রীমতী শোভেন বললেন, "আই হোপ সো"।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

॥ উনচাল্লিশ ॥

এতদিন উদয়শঙ্করের ছিল শুধু মনোবল, ছিল অদম্য উৎসাহ। তার অর্থ ছিল না। প্রয়োজন মতন সাজসজ্জাও ছিল না। বাজনার যে ব্যবস্থা ছিল তা যেন শুধু কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে, সুরের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে নৃত্যকে সমৃদ্ধমণ্ডিত করবার জন্যে নয়। এই দুটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল উদয়শঙ্কর।

নিঃসঙ্গ কবি কিম্বা শিল্পী নির্জনে নিঃশব্দে আপন খেয়াল খুশী মতন পরিভ্রমণ করতে পারেন তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলে। এমন কি, কোন গায়ক কিম্বা যন্ত্রশিল্পী একা-একা রচনা করতে পারেন তাঁর আপনার সুরলোক। তাদের রস সৃষ্টি হয়তো কোন সহকারীর সহযোগিতার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু অভিনেতা এবং নর্তক—এদের শিল্প ভিন্ন গোত্রের। পরমুখাপেক্ষী না হলে এদের চলে না। দর্শকদের কাছে নর্তক কিম্বা অভিনেতার নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হলে চাই অবহসঙ্গীত, চাই আলোকসম্পাত, চাই সঙ্গী সঙ্গিনী। এবং মঞ্চের পর্দার ওঠা পড়ার ওপরও এদের নির্ভর করতে হয় অনেকখানি। তাছাড়া মঞ্চসজ্জার পারিপাট্য দর্শকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ।

আনা পাভলোভার ব্যালে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংস্পর্শে যুক্ত থাকলেও এই সরল তথ্যগুলি বুঝে নিতে বেশী বিলম্ব হয়নি শিল্পী উদয়শঙ্করের। স্বভাবতই সে অতিমাত্রায় সময়-সচেতন। দর্শকদের মনে ক্লান্তি কিম্বা বিরক্তি জেগে ওঠার আগেই তার মঞ্চের ওপর যবনিকা নেমে আসে ধীরে ধীরে। তখনো দর্শকরা আগ্রহে উন্মুখ, অদম্য কৌতূহলে উৎসুক—কী আছে, দাও! আরও দাও!

দর্শকদের এমন গ্রহণের সাগ্রহ ইচ্ছাকে নর্তক জীবনের শুরু থেকে নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ দেয়নি উদয়শঙ্কর। এই বোধই সম্ভবত তার সাফল্যের, তার বিস্ময়কর জনপ্রিয়তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ।

ভারতবর্ষ থেকে নতুন করে আবার প্যারিসে ফিরে এসে উদয়শঙ্করের মনে

অ্যালিস বোনার

হল আপাতত তার যেন আর কোন অভাব নেই। তার আছে প্রায় সব রকম বাদ্যযন্ত্র। সঙ্গে এসেছেন তিমিরবরণ। যোগ দিয়েছেন বিষ্ণুদাস শিরালী। নৃত্যসঙ্গিনী হিসেবে মনেপ্রাণে ভারতীয় সিমকী তো আছেই। আর অ্যালিস বোনারের দৌলতে প্রায় তার গোটা পরিবারটাকেই তো নিয়ে এসেছে উদয়শঙ্কর। সুতরাং ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রুচিমতন খাওয়া-দাওয়া-এখন তার অভাব কিসের?

মুক্ত হস্তে অকাতরে অর্থ ব্যয় করবার জন্যে সবার ওপরে আছেন কুমারী অ্যালিস বোনার। শিল্পপতির কন্যা হলেও তিনি নিজে প্রতিষ্ঠাবান ভাস্কর, শিল্প-প্রাণা। ব্যবসায়িক দিকের চেয়ে শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যই সম্ভবত তার কাছে মুখ্য ছিল। তা না হলে একজন বিদেশী উদীয়মান নর্তক এবং গোষ্ঠীর এত লোককে কীসের মোহের বশবর্তী হয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে তিনি ইউরোপে নিয়ে যাবেন!

উদয়শঙ্কর অ্যালিস বোনারের আনুকূল্যেই ভারতবর্ষে নৃত্যের একটা ভারতীয় দল গঠন করবার জন্যে ফিরতে পেরেছিল। কিন্তু যারা তার সঙ্গী হল তারা... কেউই নর্তক কিম্বা নর্তকী নয়। নৃত্যের সামান্য অভিজ্ঞতাও তাদের কারুর ছিল না। আর তার অন্যান্য আত্মীয়রাও শুধু শখ করে বাঁশি খোল ঢাক ঢোল—এইসব বাজায়। তেমন উল্লেখযোগ্য কেউই নয়।

উদয়শঙ্করের পরিবারের অনেকে নর্তক হিসেবে তার কৃতিত্বের বিশেষ মূল্য দেয়নি। কেন না, নৃত্য তাদের মতে খুব উচ্চমানের শিল্প নয়। কিন্তু এমনি ভাগ্যের পরিহাস যে সেই নর্তকের সংগৃহীত অর্থেই তারা বিলাত ভ্রমণের অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে গেল। অ্যালিস বোনারের কৃপায় এই রকম মহৎ প্রতিশোধ নিতে পেরেছে বলে মনে মনে বেশ গর্বিত হওয়া উদয়শঙ্করের পক্ষে স্বাভাবিক বইকি।

অ্যালিস বোনার অর্থ ব্যয়ে কোন কার্পণ্য করেননি। উদয়শঙ্করের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে তিনি মহীয়সী নারীর মতনই তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার। এমন মানুষের দেখা কজন পায়!

একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে তাসের প্রাসাদ। আর এমন অগাধ প্রাপ্তির একটা অন্ধকার দিকও আছে। অর্থ যখন সহজলভ্য, মানুষ তখন সাধারণত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

এবং তাঁর পক্ষে যথেচ্ছাচারী হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। তবে সেই সময় অ্যালিস বোনারের মধ্যে প্রশ্রয়ে উদয়শঙ্করের আত্ম-বিশ্বাস যেন একটা জেদের বশেই প্রবল। যারা আনকোরা, অনভিজ্ঞ তাদেরই সে গড়ে নেবে মনের মতন করে।

প্যারিসের বাড়ির একতলার বড় হল ঘরে রিহার্স্যাল চলছে। উদয়শঙ্করের নৃত্য দলের মহড়া ভারতবর্ষে কখনো হয়নি। এখানেই শুরু হয় প্রথম। মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে নানারকম বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্র-শিল্পীরাও বসে গেছে।

তিমিরবরণ সঙ্গীত পরিচালক। যদিও তাঁর হাতে সরোদ তবু দৃষ্টি প্রত্যেকের দিকে। বিষ্ণুদাস শিরালী বাজাবেন প্রয়োজন মতন সেতার, জলতরঙ্গ। এক সঙ্গে অনেক তবলা বাদন অর্থাৎ তবলা তরঙ্গও তাঁরই কাজ। কেদারশঙ্কর বাজাবেন খোল মৃদঙ্গ ও গন্ধর্ব যন্ত্র (আনন্দ লহরী)। ব্রজবিহারী (মাতুল) বাজাবে ঢাক। অন্নদাচরণ (বেচু) আর উদয়শঙ্করের

গজাসুরবধ নৃত্যে উদয়শঙ্কর, সিমকী ও সম্প্রদায়

মেজভাই রাজেন্দ্রশঙ্কর বাঁশি আর ঢাক দুই-ই বাজাবে।

সব দেখে শুনে তিমিরবরণের মনে হল আর দু-একজন সেতার শিল্পী থাকলে যেন ভাল হত। একমাত্র বিষ্ণুদাস শিরালী ছাড়া আর কেউ নেই। এর মধ্যে তিমিরবরণ লক্ষ করেছিলেন বালক রবিশঙ্করের আশ্চর্য ঝোঁক সেতারের প্রতি। তিনি তাকে অবসর মতন একটু-আধটু দেখিয়ে দিলেন। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা তুলে নিল রবিশঙ্কর। তিমিরবরণ তাকেও টেনে বসিয়ে দিলেন যন্ত্র-শিল্পীদের আসরে।

অনুষ্ঠান হবে বেশ দীর্ঘ। প্রায় আড়াই ঘণ্টার মতন। নৃত্যের আগে-পরে ফাঁকে-ফাঁকে তিমিরবরণ বাজাবেন সরোদ। বিষ্ণুদাসের জলতরঙ্গ ও তবলা তরঙ্গ থাকবে। শিল্পীদের পোশাক পরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্যে কিছু সময়ের বিরাম থাকবে দু-বার। যদিও এখন প্যারিসে উদয়শঙ্করের নৃত্যের অনুষ্ঠান হতে আরও কয়েক মাস দেরী আছে।

গভীর শীত তুচ্ছ করে মহড়া চলেছে। সিমকী আর উদয়শঙ্করের নাচই প্রধান। তাছাড়া আছে দেবেন্দ্রশঙ্করের ব্যাধ নৃত্য (Hunter's Dance)। কনকলতারে একক কোন নাচ আপাতত নেই। শুধু গজাসুর বধ নৃত্যে যখন শিব ধ্যানমগ্ন আর পার্বতী পূজারতা তখন সে এসে শুধু তাদের আরতি করে যাবে।

উদয়শঙ্করের নতুন পরিকল্পনা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গজাসুর বধ নৃত্য। সিমকী আর উদয়শকর শিব ও পার্বতী। গজাসুর দেবেন্দ্রশঙ্কর। কাহিনী সংক্ষেপে হল এই—শিব ধ্যানস্থ। পার্বতী পূজারতা। এমন সময় গজাসুরের আবির্ভাব। সে হরণ করতে চায় পার্বতীকে। তার ওপর বলপ্রয়োগ করতে অগ্রসর হয়। পার্বতী ভয় পায়। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এই ভয়ংকর গজাসুরকে। এবং অবশেষে ভীতত্রস্ত পার্বতী আকুল আবেদন জানায় শিবের চরণে। ধ্যান ভঙ্গ হয় শিবের। ধীরে ধীরে হয় তার অমিত বিক্রমের প্রকাশ। তারপর যুদ্ধ গজাসুরের সঙ্গে। এবং গজাসুর বধ। পরে আবার শান্ত, স্থির শিব। আবার ধ্যানমগ্ন।

মহড়ার সময় উদয়শঙ্কর তিমিরবরণকে পরিবেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "তিমিরবাবু, আমি চাই আপনার মিউজিক যেন কথা বলে। গজাসুরের ভাষা হবে চড়া, কর্কশ। শিবের ভাষা গম্ভীর। অ... পার্বতীর ভাষা একটু মিহি। মানে, ভঙ্গি... যেমন ফুটে উঠবে তাকে তেমনি ভাষা ফু... উঠবে মিউজিক।"

তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের কথা শু... সবগুলি বাদ্যযন্ত্রের দিকে একবার পল... তাকিয়ে দেখলেন। দেখে বললে... "বুঝেছি।"

উদয়শঙ্কর বলল, "শিব ধ্যানম... পার্বতী তার উপাসনা করছে। এ সম... বাজনা হবে খুব মধুর, মন্থর—"

তিমিরবরণ হেসে আর একবার বললে... "বুঝেছি।"

উদয়শঙ্কর বললে, "গজাসুর এখ...

আসেনি, কিন্তু সে আসছে। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে—ঘটতে যাচ্ছে—এমন ইঙ্গিত দিতে হবে মিউজিককে—"

উদয়শঙ্করের কথা মতন তিমিরবরণ বাজালেন নানারকম বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু উদয়শঙ্করের ঠিক যেন মনের মতন হল না। সে পা দিয়ে মেঝের ওপর তাল দিতে-দিতে আবার বুঝিয়ে দিল তিমিরবরণকে সে কী চায়—কেমন চায়। তিমিরবরণ লক্ষ্য করলেন উদয়শঙ্করের ভঙ্গী। কতকটা যেন কথাকলি মুদ্রার মতন।

সিমকীর ভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে গেছেন তিমিরবরণ। সে এখনো যায়নি ভারতবর্ষে, কিন্তু তার হাত ও পায়ের মুদ্রা এবং চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখলে মনে হয় সে যেন দীর্ঘকাল কোন ভারতীয় নৃত্যগুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছে। উদয়শঙ্করের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছে সিমকী।

উদয়শঙ্করের প্রথম নৃত্য অনুষ্ঠান প্যারিসে হল ১৯৩১ সালে মার্চ মাসের তিন তারিখে সাঁজেলীজে রঙ্গালয়ে। কী সাংঘাতিক ভিড় জমেছে রঙ্গালয়ের বাইরে! বুকিং অফিসের সামনে ঠেলাঠেলি, মারামারি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আর একটিও আসন খালি নেই। সব টিকিট কখন শেষ হয়ে গেছে। তবু কেউ ফিরে যেতে চায় না। যেসব মহিলারা দামী-দামী জামা-কাপড় পরে খুব সেজেগুজে এসেছিল, কী করুণ অবস্থা তাদের। স্কার্ট গাউন ছিঁড়ে-টিঁড়ে একাকার!

এমন হইচই শুনে ফরাসী পুলিস এসে হাজির সাঁজেলীজে রঙ্গালয়ে। কী ব্যাপার? ভারতীয় নাচ হবে। টিকিট আর নেই। পুলিস রঙ্গালয়ের ভেতরে ঢুকে খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখল। সত্যি, আর এক তিলও জায়গা নেই। সে বাইরে এসে তখন সকলকে উদ্দেশ করে বলল, "যাও চলে যাও সব! আর একটি আসনও খালি নেই!"

উদয়শঙ্করের ইন্দ্র ও গন্ধর্ব। উদয়শঙ্কর ও সিমকীর অসি নৃত্য, রাধাকৃষ্ণ নৃত্য। ভীল নৃত্য। তিমিরবরণ দুবার সরোদ বাজালেন। প্রথমে শুধু সরোদ, পরে তবলার সঙ্গে। বিষ্ণুদাস শিরালীর তবলাতরঙ্গ হল। দেবেন্দ্রশঙ্করের ব্যাধ নৃত্য শেষ হল প্রবল করতালির মধ্যে। সব শেষে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের নাচ গজাসুর বধ।

কেষ্টু আর ব্রজবিহারী দুজন দুদিকে একটা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে। পর্দা সরে গেল। মঞ্চে শিব ও পার্বতী। পিছনে দেবকুলের মতন ঐকতান বাদকগণ বসে আছেন। মৃদু মধুর ঝঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে। কিশোরী কনকলতার অপ্সরাগণের আরতি নৃত্য হয়ে গেল।

কিছু পরেই গর্জন করে উঠল ঢাক ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের ইঙ্গিতের মতন। উত্তেজনা থমথম করছে রঙ্গালয়ে। গজাসুর প্রবেশ করছে। তার লক্ষ্য পার্বতী। থমক বাজছে। সঙ্গে তাসা ষোলো মাত্রার তালে। পার্বতী ক্ষুব্ধ, বিচলিত। সে প্রতিবাদ করছে গজাসুরের স্পর্ধায়। তখন খোল বাজছে—তাও ষোল মাত্রার তালে। এগিয়ে আসছে গজাসুর।

ভীত পার্বতী আর স্থির থাকতে পারছে না—শরণ নিচ্ছে শিবের। এই সময় সারেঙ্গীতে বাজছে ভৈরবী। ধ্যান ভাঙছে শিবের। অন্য ঢাকের ভিন্ন শব্দ। শিব জেগে উঠেছে। তার গুরুগম্ভীর স্বর যেন ধ্বনিত হচ্ছে চার রকম পাখোয়াজে ষোল মাত্রার তালে। শিব ও গজাসুরের যুদ্ধ চলছে। কখনো পাখোয়াজ, কখনো বিভিন্ন ধরনের ঢাক বাজছে।

যত দর্শক উপস্থিত ছিলেন সাঁজে লীজে রঙ্গালয়ে, উদয়শঙ্করের গজাসুর বধ নৃত্যই তাদের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হল। মোটামুটি প্রথম থেকে যে যে নৃত্য পরিবেশন করা হল—প্রত্যেকটি যেন এক একটি ছবি। সংগঠক হিসেবে উদয়শঙ্করের প্রধান গুণ তার উপস্থাপনার স্বকীয়তা। যন্ত্রশিল্পীরা মঞ্চেই উপবেশন করেছেন। তাদের বেশভূষার বিশেষত্ব দর্শক সাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। ভারতীয় নৃত্য সম্প্রদায়ে যন্ত্রশিল্পীদের লোকচক্ষুর সামনে সম্ভবত উদয়শঙ্করই প্রথম আনল।

কিন্তু প্যারিসে উদয়শঙ্করের এই নৃত্য পরিবেশনায় তিমিরবরণের কৃতিত্ব অশেষ। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে সুরারোপ জানাতে পারে গোটা নৃত্যমঞ্চের হৃৎস্পন্দন। উদয়শঙ্কর যা চেয়েছিল তিমিরবরণ দিলেন তার চেয়ে
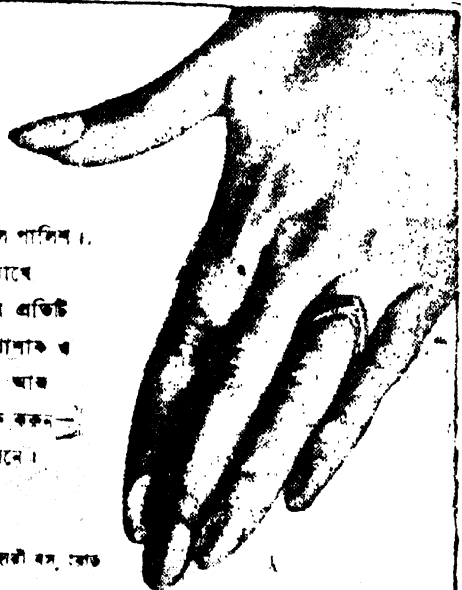
অনেক বেশী। নাচ থেমে গেছে। কিন্তু রঙ্গালয় তখনো ভরে আছে সুরের মূর্ছনায়। নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের এমন দুরূহ সমন্বয় সম্ভবত দর্শকবৃন্দ আগে কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি।

যে মাসে প্যারিসে উদয়শঙ্করের নৃত্যের অনুষ্ঠান হল এই একবারই। নৃত্যদল নিয়ে উদয়শঙ্কর এল জারমানীতে। নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করে ওরা যখন প্যারিসে ফিরে এল তখন সেখানে আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীর আয়োজন চলেছে ব্যাপকভাবে। এই সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীতে যোগ দেবে বহু উপনিবেশ। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা যেমন থাকবে, তেমনি এখানে খোলা হবে নানা বিপণি—বেচাকেনা চলতে থাকবে সমানে। ঠিক হল, যতদিন এই কলোনিয়াল একজিবিশন চলবে ততদিন উদয়শঙ্কর ও তার সম্প্রদায় প্রদর্শন করবে ভারতীয় নৃত্য। তবে প্রদর্শনী বলে নৃত্য-সূচী খুব দীর্ঘ করা হল না।

একদিন ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনীর দোকান-পাট দেখে বেড়াচ্ছিল উদয়শঙ্কর আর তার ভাইরা। সঙ্গে বোধহয় তিমিরবরণও ছিলেন। একটা স্টলের ওপরে বেশ বড় করে লেখা, ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস। আর একটু কাছে এসে ওরা সকলে দেখল সাজান রয়েছে সুন্দর সুন্দর ভারতীয় অলঙ্কার। তাছাড়া হাতির দাঁতের ছোট ছোট নানা রকম জিনিসও আছে। যে ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন, তার দিকে তাকিয়ে উদয়শঙ্করের মনে হল যে তিনি যেন বাঙালী। একটি ছোট মেয়েও ছিল সেই স্টলে।

মেয়েটি একটু আগে লক্ষ করেছিল এই সুন্দর সুন্দর মানুষগুলিকে। কতকটা যেন রামায়ণ মহাভারতের মানুষের মতন। বড় বড় চোখ, বড় বড় চুল। এখানে যারা সারাদিন আসা-যাওয়া করে এরা তাদের কারুর মতনই নয়। একজন বিদেশিনী রয়েছে এদের সঙ্গে—সে-ও ভারতীয়ের মতন।

এই দোকানের যিনি অধিকর্তা তিনি উদয়শঙ্করকে দেখে সম্ভবত বাঙালী বলে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর দেশের ছেলেদের যথাযোগ্য সমাদর করে অমায়িক হেসে তিনি বললেন, "আমার নাম অক্ষয়কুমার নন্দী। কলকাতা থেকে আসছি। ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস আমারই।"

উদয়শঙ্কর অলঙ্কার দেখল। দেখে নম্র হেসে বলল, "আমার নাম উদয়শঙ্কর—"

অক্ষয়কুমার খুশী হয়ে বললেন, "আপনার নাম জানি। যাক, আলাপ হয়ে গেল—"

ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন, "আমার মেয়ে অমলা। ওকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

অমলা কিন্তু উদয়শঙ্কর আর তার বাবার কথাবার্তা ভাল করে শুনেছিল না। একটা বড় কঠিন প্রশ্ন জাগছিল তার মনে—সে কিছুতেই উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। অমলা এখনো উদয়শঙ্করের নাচ দেখে নি, তবে তার বাবার কথা শুনে সে ধরে নিল যে উদয়শঙ্কর একজন বিখ্যাত লোক। অমলার মনে একটা কথা যেন কেমন করে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল যে বিখ্যাত লোক মাত্রেরই দাড়ি থাকে।

তাহলে উদয়শঙ্করের দাড়ি নেই কেন?

আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর উদয়শঙ্কর কাল দুপুরে অক্ষয়কুমারকে তাদের বাড়িতে খাওয়ার কথা বলল। তিনি যেন দয়া করে তাঁর ছোট মেয়ে-টিকেও সঙ্গে নিয়ে যান। অক্ষয়কুমার শুনলেন যে হেমাঙ্গিনী দেবীও এসেছেন এখানে। তিনি উদয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয়ের ইউরোপ আগমন এই প্রথম নয়। তিনি প্রথম ইংল্যাণ্ডে আসেন ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ এম্পায়ার এক্জিবিশনে তাঁর কারখানায় প্রস্তুত অলংকাররাজি সে দেশের মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে। সম্ভবত তাঁর কিছু ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল, তবে সেটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়।

স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারক হিসেবে অক্ষয়কুমার জনসাধারণের কাছে পরিচিত হলেও তাঁর এই পেশা গ্রহণ করার পিছনে একটা রাজনীতি জড়িত ইতিহাস আছে। ভারতের পরাধীন যুগে তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। শ্রীঅরবিন্দর আদর্শে অনুপ্রাণিত অক্ষয়কুমার।

তাঁর ভারতজননীর সেবা তিনি করেন অসহায় পল্লী রমণীদের স্বাধীন জীবিকা অর্জনের একটা সহজ পথের অনুসন্ধানে। তিনি একসময় বুঝেছেন যে, সোনা ও হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কাজেই মেয়েদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তখন অক্ষয়কুমার নিজেও এই পেশায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এবং বাংলার মেয়েদের সবরকম উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে 'মাতৃ মন্দির' নামে তিনি একটি পত্রিকাও প্রকাশিত করেন।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস-এর প্রচারকার্যের জন্যে নয়, ভারতীয় স্বর্ণ-শিল্পের একটা নিদর্শন অক্ষয়কুমার তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে এই ব্যবসার সামগ্রিক প্রসারের কথা ভেবেই।

অক্ষয়কুমার পরদিন যথাসময়ে অমলাকে সঙ্গে নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন উদয়শঙ্করের প্যারিসের সেই বাড়িতে। (ক্রমশ)

ViVA
The Double-Action Health Drink
FORTIFIES YOU FOR THE DAY
RELAXES YOU FOR THE NIGHT
ASP/JIL-V-IA/73 BEN
বাড়ির লোকেদের
ভিভা খাওয়ান.
সর্বাধুনিক খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যার ফল ভিভা। এর পেছনে আছে পুষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের গবেষণা। আর পাঁচটা খাদ্য পানীয়ের মত ভিভাতেও আছে পুরো ননীযুক্ত খাঁটি দুধ ও বার্লি মল্ট। কিন্তু ভিভাই শুধু একমাত্র যাতে আছে হুইট মল্ট।
হুইটমল্ট কেন?
কারণ হুইট মল্টে রয়েছে সহজপাচ্য আকারে প্রকৃতিদত্ত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন আর খনিজ।
হুইট মল্ট যোগ হওয়ায় আরও নানা দিক থেকে ভিভা হয়েছে বহুগুণে ভালো। এর স্বাদ ঢের ভালো রং গাঢ় সোনালী এবং জলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।
সেইজন্যেই আপনাদের দৈনিক আহার্যের বাঞ্ছনীয় ঘাটতি পূরণে ভিভার জুড়ি নেই।
আপনার হাতে এখন বেছে নেবার উপায় রয়েছে। আপনার পরিবারের পক্ষে যে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়টি আজকের সবচেয়ে ভালো সেইটি বেছে নিন।
ভিভা কিনুন।
ভারতে তৈরী করছেন:
জগতজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
ভিভা
অফুরন্ত জীবনী শক্তির উৎস

এবারে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন অস্ট্রেলিয়ান ঔপন্যাসিক প্যাট্রিক হোয়াইট। অনুমান করা কঠিন নয় অতঃপর নানা ভাষায় তাঁর বইয়ের অনুবাদ হবে, তাঁকে নিয়ে সমালোচকরা লিখবেন, এবং বিভিন্ন দেশের পাঠক-পাঠিকারা অন্তত সাময়িক-ভাবে অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। যাঁরা নোবেল প্রাইজ পান তাঁরা যে সকলেই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, অথবা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হলেই যে উক্ত পুরস্কার কারো কপালে নিশ্চিত এর কোনটাই সত্যি নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ফলে অনেক সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে অন্য দেশের পাঠক-পাঠিকাদের প্রথম পরিচয় ঘটে এবং সেই সূত্রে তাঁদের দেশ, ভাষা সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কেও কিছু খোঁজ খবর শুরু হয়। বিশেষ করে তাঁরা যদি এমন দেশের লেখক হন যে দেশ কখনো রাষ্ট্রিক বা আর্থিক প্রাধান্য অর্জন করেনি। যেমন আইসল্যাণ্ড, কিংবা নরওয়ে অথবা অস্ট্রেলিয়া।(১)

রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পান বাংলাদেশে তখন তা নিয়ে বিস্তর উৎসব সম্বর্ধনা হয়েছিল। যুগের ফারাকের জন্যই হোক, অথবা অস্ট্রেলিয়ানদের মেজাজ বাঙালীদের থেকে একেবারে অন্য রকম বলেই হোক, হোয়াইটের পুরস্কার পাওয়া নিয়ে এদেশে কোনো রকম হইচই দেখা গেল না।(২) হোয়াইট যে নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন একথা অবশ্য এদেশে আসার পর থেকে অনেকের কাছে শুনেছি। তিনি যে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এ সম্পর্কে এদেশের সাহিত্যরসিকদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। (৩) এই পুরস্কারকে তিনি নিজে কিন্তু কোনো মূল্য দেননি। পুরস্কারের পুরো টাকাটা তিনি একটি ট্রাস্ট দান করেছেন—এদেশের যে সব লেখক সাহিত্যকেই জীবনের একমাত্র সাধনা হিসেবে বেছে নিয়েছেন অথচ যাঁরা সাহিত্য থেকে বিত্ত অথবা জনপ্রিয়তা অর্জন করেননি, প্রতি বছর তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে এই ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি দেওয়া হবে। আমাদের দেশে যাঁরা 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পেয়েছেন বা ভবিষ্যতে পাবেন তাঁরা তাঁদের টাকা দিয়ে এই ধরনের কিছু করলে মন্দ হয় না।

হোয়াইট সম্পর্কে সংক্ষেপে দু চার কথা জানাই। তাঁর মা-বাবা অস্ট্রেলিয়ান হলেও তিনি নিজে জন্মেছেন লণ্ডনে (২৮শে মে ১৯১২) এবং তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ অস্ট্রেলিয়ার বাইরে কেটেছে। তাঁর যখন তের বছর বয়স তখন তাঁকে লেখাপড়ার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়; কেম্ব্রিজ থেকে ১৯৩৫ সালে মডার্ন ল্যাঙ্গোয়েজেস্ নিয়ে বি এ পাস করার পর তিনি সাহিত্য কর্মকে জীবনের সাধনা হিসেবে বেছে নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে লণ্ডনে বসবাস করা ঠিক করেন। তাঁর প্রথম বই কিন্তু সিডনী থেকে প্রকাশিত হয়: এটি একটি কাব্যগ্রন্থ, নাম The Ploughman and other Poems (১৯৩৫)। এটি তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ, এবং এটিকে বাদ দিলে তাঁর অন্য সমস্ত বইই প্রথমে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে তিনি পাঁচ বছর রয়্যাল এয়ার-ফোর্সের ইনটেলিজেন্স অফিসার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি শেষ পর্যন্ত অস্ট্রে-লিয়াতে ফিরে আসেন, এবং সিডনীর কাছে একটি ফার্ম নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

অস্ট্রেলিয়াতে ফিরলেও এখানকার সমাজজীবনকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেছেন। আমাদের দেশের মত এখানেও অধিকাংশ সাহিত্যিক জীবিকার জন্য হয় অধ্যাপনা করেন, নয় তাঁরা খবরের কাগজ, রেডিও, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। তাছাড়া তাঁরা নানা প্রতিষ্ঠানের সদস্য, তাঁদের মধ্যে নানা রকমের দলাদলি আছে, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁরা অংশ নিয়ে থাকেন। হোয়াইট এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন, কখনো কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায় না, এমনকি সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর খুব বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাঝে মাঝেই আলোচনা প্রবন্ধ বেরোয় বটে, কিন্তু তাঁর নিজের লেখা এদেশের কোনো পত্রিকায় ক্বচিত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রত্যেকটি বই প্রথম ছাপা হয় লণ্ডনে, তারপর সেখান থেকে এখানকার পাঠক-পাঠিকার হাতে আসে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর যখন অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্যের এই স্বীকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত চাওয়া হয় তিনি বলেন, তাঁর পরিচয় নয় যে তিনি অস্ট্রেলিয়ান, তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি

প্যাট্রিক হোয়াইট.

লেখক। কথাটা শুনতে হয়ত গর্বোক্তির মত, অন্তত দেশপ্রেমিকদের কাছে এই ধরনের ঘোষণা মোটেই প্রীতিকর নয়, কিন্তু এই উক্তির মধ্যে তাঁর নিঃসঙ্গ এবং একান্ত সাধনার ইঙ্গিত আছে।

নিঃসঙ্গতাবোধ হোয়াইটের সমস্ত সার্থক রচনার উৎস এবং কেন্দ্রীয়বস্তু। এবং যদিও নিঃসঙ্গতাবোধ কোনো বিশেষ দেশ, জাতি বা যুগের নিজস্ব যখন নয়, তবু এই বোধের সূত্রেই, সম্ভবত তিনি অস্ট্রেলিয়ার গভীরতম রূপটিকে যে ভাবে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন অন্য কোনো সাহিত্যিক তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেন নি। বিরাট মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ধূ-ধূ মরুভূমি বা আধা মরুভূমি; মুষ্টিমেয় মানুষ এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ইতস্তত কিছু উপনিবেশ গড়েছে; তাদের সীমাবদ্ধ সার্থকতাকে ঘিরে আছে উদাসীন প্রান্তরের ধূসর বিস্তার। একদিকে নির্জনতার আতঙ্ক তাদের চরিত্রে এনেছে প্রবল রক্ষণশীলতা এবং যূথানুগতা; অন্যদিকে একাকিত্ব যুগিয়েছে আত্মনির্ভর উদ্যমের প্রসিদ্ধ প্রেরণা। অস্ট্রেলিয়ান মানসের এই পরস্পরবিরোধী দুটি দিককেই হোয়াইট তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফুটিয়ে তুলছেন। হোয়াইটের একটি আত্মজীবনীমূলক রচনায় (The Prodigal Son, ১৯৫৮) তিনি তাঁর মহৎ উপন্যাস The Tree of Man (১৯৫৫) সম্পর্কে লিখেছেন :

> Because the void I had to fill was so immense, I wanted to try to suggest in this book every possible aspect of life, through the lives of an ordinary man and woman. But at the same time I wanted to discover the extraordinary behind the ordinary, the mystery and the poetry which alone could make bearable the lives of such people, and incidentally my own life since my return.

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছাড়া হোয়াইট এ পর্যন্ত চারটি নাটক (The Ham Funeral, Season of Sarsaparilla, A Cherry Soul, Night on Bald Mountain) একটি গল্পগ্রন্থ (The Burnt Ones) এবং নয়টি উপন্যাস প্রকাশিত করেছেন। তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস—Happy Valley (১৯৩৯) এবং The Living and the Dead (১৯৪১)—প্রস্তুতি পর্বে ফেলা যায়। কিন্তু তাঁর তৃতীয় উপন্যাস The Aunts Story (১৯৪৮)তে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর স্পষ্ট। থিওডোরা গুডম্যানের চরিত্রের ভিতর দিয়ে তিনি সংবেদী নিষ্ঠায় ফুটিয়ে তুলেছেন চরম পারকোর ছবি—চিত্তভ্রংশের এমন [illegible] দুর্লভ। এই উপন্যাসটি হোয়াইটের নিজের বিশেষ প্রিয়।

দি আণ্টস্ স্টোরির প্রায় সাত বছর পরে প্রকাশিত হয় দি ট্রি অব্ ম্যান। এই উপন্যাসটিকে অস্ট্রেলিয়ার এপিক বলা যায়। এখানকার ভূপ্রকৃতি এবং সমাজ, ধূসর এক-ঘেয়েমি এবং বোবা নির্জনতা; কঠিন একাগ্র উদ্যম এবং তার কেন্দ্রে অনতিক্রম্য পারকাবোধ—ধীরে ধীরে স্ট্যান পার্কার এবং তার স্ত্রীর জীবনকাহিনীর চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এর পরবর্তী উপন্যাস Voss (১৯৫৭)এ হোয়াইটের কল্পনা এবং রচনারীতির নতুন মোড় চোখে পড়ে পার্কাররা সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ, ভস্ ঘোষিত ভাবেই অসাধারণ। ওই উপন্যাসের নায়ক দুর্গম পথের যাত্রী ; অজ্ঞাত জগতের স্বপ্ন তার চোখে, দুর্মর তার আত্মপ্রত্যয়, নিশ্চিত ট্র্যাজেডির টীকা তার কপালে। এই উপন্যাসে হোয়াইটের কল্পনা বিশেষভাবে প্রতীক-নির্ভর।

পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে প্রতীকের প্রয়োগ আরো জটিল, এবং সবক্ষেত্রে সমান সার্থকতা অর্জন করেনি। এই উপন্যাসগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে এখানকার সমালোচকদের মধ্যে প্রবল মতভেদ বর্তমান। বিশেষ করে Rider in the chariot (১৯৬১) এবং The solid Mandale (১৯৬৬) সম্পর্কে। অন্য উপন্যাস দুটির নাম The Vivisector (১৯৭০) এবং The Eye of the storm (১৯৭৩)। বিস্তারিত আলোচনা মুলতবী রেখে এখানে বোধহয় এইটুকুই শুধু বলা চলে, হোয়াইটের কল্পনা ক্রমেই রূপকের দিকে ঘেঁষেছে। প্রচলিত অর্থে যাকে ধর্ম বলা হয়, তিনি তাতে সম্পূর্ণ আস্থাহীন, বিশেষ করে যেখানে তা মুখ্যত প্রতিষ্ঠান এবং অনুষ্ঠাননির্ভর সেখানে তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা স্পষ্ট। পড়ে-পাওয়া প্রত্যয় এবং সামাজিক আচার ব্যবহার ও নিয়ম নির্দেশকে অবলম্বন করে যাদের জীবন কাটে তাদের সঙ্গে উক্ত অর্থে ধার্মিকদের বিশেষ কোন পার্থক্য তিনি দেখেন না। কিন্তু মানব অস্তিত্বের যে গূঢ় প্রয়োজন থেকে ধর্মের উদ্ভব তাকে তিনি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে মনে হয় এই প্রয়োজন ব্যক্তির অনতিক্রম্য নিঃসঙ্গতা বোধের সঙ্গে জড়িত। এরই তাগিদে মানব কল্পনায় ঈশ্বর, দেবদেবী, পুরাণ, প্রতীক ইত্যাদি জন্ম নেয় ; মানুষের চেতনায় ছাড়া এদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু মানুষের জীবনে এদের প্রভাব দুর্মর। পারকাবোধ ব্যক্তিকে ঠেলে দেয় নিজেকে অতিক্রম করার বিভিন্ন উদ্যমের দিকে; তুরীয়ের স্বপ্ন তারই অন্যতম ফল; কিন্তু তুরীয়ের যেহেতু মানবোত্তর অস্তিত্ব নেই, এই স্বপ্ন [illegible] করতে পারে। রূপক ঘেঁষা উপন্যাসের ভিতর দিয়ে হোয়াইট এই শহীদদের কাহিনী নানাভাবে উপস্থিত করেছেন। সে কাহিনীর স্ত্রীপুরুষ এবং ল্যান্ডস্কেপ যদিও অস্ট্রেলিয়ান, যে ট্র্যাজিক কূটাভাস তার কেন্দ্রে তা সর্বমানবীয়। এদিক থেকে আবার অনেক সময় প্যাট্রিক হোয়াইটকে টমাস মান-এর সমগোত্রীয় মনে হয়েছে।

১। হোয়াইটের পুরস্কার প্রাপ্তির খবরে নারাজ হয়ে প্যারিস-ম্যাচ্ মন্তব্য করেছেন, কোথাকার কে এই প্যাট্রিক হোয়াইট? কে চেনে তাকে? তাঁর চাইতে আমাদের আঁদ্রে মালরো ঢের সুযোগ্য পাত্র।

২। লেখাটি শেষ করার পর খবর পেলাম যে আজ ফেডারাল পার্লামেন্টে স্থির হয়েছে হোয়াইটকে পার্লামেন্ট সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। লেবার গভর্নমেন্টের আমলে এদেশে যে স্বাজাত্যবোধের হাওয়া বইতে শুরু করেছে এই সম্বর্ধনার প্রস্তাব মনে হয় তারই অন্যতম ফল।

৩। হোয়াইটের অধিকাংশ উপন্যাস পেঙ্গুইন সংস্করণে পাওয়া যায়। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে পড়তে চান তাঁদের জন্য উৎকৃষ্ট বই : G. A. Wilkes (ed). Ten Essays on Patric White. তাছাড় পাঠ্য : অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্যের ওপরে পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংগ্রহে কবি ভিনসেণ্ট বাক্‌লি-র প্রবন্ধ; প্যাট্রিসিয়া মরিসের The Mystery of Unity; এবং কোয়াড্রাণ্ট পত্রিকায় (মে-জুন, ১৯৭৩) অধ্যাপিকা লিওনি ক্যামার-এর প্রবন্ধ।

ভারতীয় সখের ফোটোগ্রাফারদের কাছে সর্বপ্রথম আগফা আইসোলি১ উপস্থিত করা হচ্ছে।

১. সহজে পরিচালনীয় চিহ্নগুলোর সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন শাটার স্পীড সেটিং। ২. নিখুঁত চমৎকার ছবির জন্য অ্যাক্রোম্যাট এফ ৮ লেন্স। ৩. অনুপযুক্ত পরিবেশে ছবি তোলার জন্য ২টি লেন্স স্টপস যথাযথ এক্সপোজারের নিশ্চয়তা দেয়। ৪. ১২০ সাইজের রোলফিল্মের সাহায্যে ১৬টি (৪×৪ সেঃ মিঃ) ছবি তোলা যায় (৬×৬ সেঃ মিঃ সাইজের চেয়ে ৪টি ছবি বেশী) ফিল্ম গোটাবার "নবে" বা বোতামে বিশেষভাবে লকিং বন্দোবস্ত আছে যা "ডবল এক্সপোজার" প্রতিরোধ করে। ৫. লাল সংকেত সূচনা করে যে "ডবল এক্সপোজার লক" চালু আছে।

আগফা আইসোলি ১এর সাহায্যে উজ্জ্বল আগফা-কালার 'ট্রান্সপেরেন্সি'ও তোলা যায়, যা প্রজেক্ট করার উপযোগী। সুস্পষ্ট প্রিন্টের জন্য এবং এনলার্জ করার জন্য সর্বদা আগফা-গেভার্ট ফোটো-পেপারের নাম করে চেয়ে নিন।

প্রস্তুতকারক: নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড, বরোদা।

একমাত্র পরিবেশক:

আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
বোম্বাই • নিউদিল্লী • কলকাতা • মাদ্রাজ।
® আগফা-গেভার্টের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক অ্যান্টোয়ার্প/লিভারকুজেন, ফোটোগ্রাফিক প্রডাক্টস্-এর প্রস্তুতকারক।

আগফা আইসোলি ১
উচ্চাভিলাষী
অপেশাদারদের
যোগ্য ক্যামেরা।

Simoes/AG/14C_BEN

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯১ ॥

কিছুক্ষণ ছোটার পর আমি যত না বেশী হাঁপিয়ে পড়লাম, তার থেকেও বেশী মন খারাপ হয়ে গেল। বারবার মনে হতে লাগলো, আমি একটা অপদার্থ। পৃথিবীতে আমার কোন মূল্যই নেই। আমি অন্যায়কে ভয় করি, আবার ন্যায়ের পথে যাবারও দৃঢ়তা নেই। কিংবা সে পথ কোনটা আমি জানি না।

এই যে মানুষজন, রাস্তায় এত ভিড়, হৈ-চৈ, হাসি ও ঝগড়া—এই সবেরই কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? আমি কোথায় যাবো? শৈশবের এক একটা স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, আর চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে যেন সেই ভাঙার ঝনঝন শব্দে।

কোথায় যাবো, এই প্রশ্ন মনে এলে তৎক্ষণাৎ একটা সহজ ও অবধারিত উত্তর মনে আসে। রেণুর কাছে।

আমার মাথার মধ্যেই অনেকরকম প্রশ্ন এবং অনেকরকম সমস্যা এসে ভিড় করে। অনেক সময় দিশেহারা হয়ে যাই। কিন্তু দুটি ব্যাপরে আমার উত্তর সব সময়ই সরল। খিদে পেলে খেতে হবে, আর মন খারাপ হলেই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এখন মাথা থেকে আর সব কিছু জটিল ব্যাপার সরিয়ে ফেলে এই সরল দুটি পথ বেছে নিলাম।

প্রথম কথা, দারুণ খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে শুধু কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। এই কথা মনে পড়তেই আরও অসম্ভব বেশী খিদে পেয়ে গেল।

পকেটে কিছু খুচরো পয়সা আছে। দু' আনি এক আনি দু' পয়সা মিলিয়ে প্রায় বারো আনা। যথেষ্ট খাওয়া হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে এক কোয়ার্টার মাংস, দু'খানা রুটি আর পাঁচটা সিগারেট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে একা খাবো কি করে? কোনোদিন আমি একলা কোনো হোটেল রেস্তোরাঁয় ঢুকিনি। একলা বসে বসে কোনো দোকানে চুপচাপ খাবার খেয়ে যাওয়া আমার কাছে একটা অত্যন্ত ভাল্‌গার দৃশ্য মনে হয়। অনেককে দেখেছি এরকম ভাবে খেতে, তারা নিশ্চয়ই মফঃস্বলের লোক।

আমি শ্যামপার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। খালি পেটে সিগারেট টানলে পেটের ভেতরটা চিনচিন করে, তাতেও এক ধরনের নেশা নেশা হয়। অনেকদিন আগে বিষ্ণু আমাকে বলেছিল, জ্বর হলে ওর খুব ভালো লাগে। খুব বেশী জ্বর বাড়লে যখন একটা ঘোরের মতন হয়, তখন কতরকম দৃশ্য দেখা যায়, মনটা খুব চমৎকারভাবে হালকা হয়। এখন আমি বিষ্ণুর এ কথাটার মর্ম বুঝতে পারি। শরীরকে কষ্ট দেবার মধ্যেও একটা আরাম আছে। খালি পেটে সিগারেট খাওয়ার কোনো যুক্তি নেই, অথচ ইচ্ছে করে। বিশেষ করে যখন মন খারাপ থাকে, তখন শরীরকে কষ্ট দিলে অন্যরকম উপকার পাওয়া যায়।

খিদে পেলেই খেতে হবে, এই সিদ্ধান্ত খুব সরল হলেও গ্রহণ করা সহজ নয়। যেমন, আমার খিদে পেয়েছে, পকেটে পয়সা আছে. তবু আমি খেতে যেতে পারছি না। আমার কোনো বন্ধু যদি একা আমাকে কোনো দোকানে বসে খেতে দেখলে ঠাট্টা করে! আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে এখন দেখা হয়ে গেলে আমি তাকে অনায়াসেই দ্বারিকের দোকানে লুচি আর আলুরদম খাওয়াতে পারতাম। ওরা তিনে পয়সায় যে ডালটা দেয়, সেটার স্বাদই সবচেয়ে ভালো। মনে করলেই জিভে জল আসে।

পংকজ কিংবা ভাস্কর কলকাতায় থাকতে পারে এখন। অনেকদিন ওদের বাড়ি যাই না, এখন একবার গেলে হয়। ভাস্করের বাড়িতে গেলেই খিদের সমস্যা মিটে যায়—এরকম বিকেলবেলা ওদের

বাড়িতে যে-কেউ গেলেই তার জন্য ওপর থেকে খাবার আসে।

কিন্তু এখন ভাস্করের কাছে গেলে আর সহজে ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। তাহলে রেণুর সঙ্গে দেখা হবে কি করে?

চার পয়সার চিনে বাদাম কিনে নিয়ে তাই খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। একা একা চিনে বাদাম খাওয়া যায়। ঝাল-নুনটা কি অসম্ভব ঝাল। চোখের জল বার করে দেয়।

মন খারাপ হলেই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে হবে—এই ব্যাপারটাও খুব সরল মনে হলেও আসলে খুব সরল নয়। ইচ্ছেটা সরল, কিন্তু পৃথিবী বড় জটিল। তীব্র ইচ্ছে থাকলেও রেণুর সঙ্গে দেখা করবো কি করে?

রেণু অনেক সময় অভিযোগ করেছে যে বেশীর ভাগ সময় ওই আমার কাছে দেখা করতে আসে, আমি ওর কাছে যাই না। কথাটা অনেকটা সত্যি, আমার মন-প্রাণ রেণুর দিকে সব সময় ছুটে যেতে চায়, কিন্তু পথে অনেক বাধা। রেণুকে যখনই জিজ্ঞেস করেছি, আবার কবে দেখা হবে, রেণু বলেছে, তুমি আমার বাড়িতে আসবে। আমি বলেছি যাবো, তবু যাওয়া হয় না। কেন যে যাই না, তা রেণুকেও বুঝিয়ে বলতে পারি না।

বিষ্ণু চলে যাবার পর আর যখন তখন ওদের বাড়িতে যেতে পারি না। শেষের দিকে বিষ্ণুই ছিল ঐ বাড়িতে আমার একমাত্র বন্ধু। রেণুর দাদা অংশুর সঙ্গে কিছুতেই আমার বনলো না। এখন শুধু রেণুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি যায়? কেউ বারণ করেনি, শুধু রেণুর ছোটকাকা একদিন শুধু একটু বক্র ইঙ্গিত করেছিলেন। ওদের পুরোনো আমলের বনেদী বাড়ি—বাইরের কোনো ছেলে ও-বাড়ির কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় না। আমি এত ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে যাচ্ছি যে নিজেকে বাইরের ছেলে বলে কখনো ভাবিনি। কিন্তু রেণুর ছোটকাকার ইঙ্গিতটাতে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল। সেই থেকে আর ওদের বাড়িতে কখনো যাইনি। আর কিছু নেই, শুধু আমার বঙালের গোঁটুকু এখনো আছে।

খড়্গপুর থেকে ফেরার পর আর রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেকদিন রেণুর কোনো খবর জানি না, আজ তো কলেজ ছুটি, আজ রেণু কোথায় থাকতে পারে?

ঘুরতে ঘুরতে আমি রেণুদের বাড়ির রাস্তায় চলে এলাম। একবার হেঁটে গেলাম বাড়িটার সামনে দিয়ে। সদর দরজাটা খোলা, ভেতরের উঠোনটার একটা অংশ দেখা যায় ফাঁকা। অনেকদিন ও বাড়িতে নতুন শিশু জন্মায়নি। ঐ উঠোনে এখন কেউ আর খেলাধুলো করে না।

খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসতেই হলো। ঐ বাড়িটা আমাকে চুম্বকের মতন টানছে। অনায়াসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারি। রেণুর ছোটকাকার চোখ এড়িয়ে যদি দোতলায় উঠে যাই, রেণুর মা আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। উনি তো এক সময় আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। উনি কি কখনো রেণুর কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করেন না?

যেমন পকেটে পয়সা থাকা সত্ত্বেও আমি খাবারের দোকানে ঢুকতে পারিনি, সেইরকম, এখানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি রেণুদের বাড়িতে ঢুকলাম না। এরকম ভাবে যাওয়া যায় না।

ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেকে আমার আরও নিঃস্ব মনে হতে লাগলো। কি[illegible] ভিখারী। কিংবা চোর। রাস্তায় [illegible]ট মানুষ কি আমার দিকে অবজ্ঞার [illegible]তে তাকাচ্ছে না? যারা হেঁটে যাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই কোথাও না কোথাও যাচ্ছে, আমি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

সত্যিই তো, কেন দাঁড়িয়ে আছি? রেণু যে আজ বাড়ি থেকে বেরুবে, তার কি কোনো মানে আছে? কিংবা রেণু বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, ফিরবে বেশী রাত্রে। ভবানীপুরে ওর মাসীর বাড়িতেও যেতে পারে। একমাত্র আমার ইচ্ছেশক্তির জোরেই আমি রেণুকে এখানে টেনে আনতে পারি। এর জন্য কতখানি ইচ্ছা-শক্তি দরকার? পি সি সরকারের একটা বইতে পড়েছিলাম, রোজ সকালবেলা সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ব্যায়াম করলে দৃষ্টিশক্তি এত দূর বেড়ে যায়—। ইস, কেন যে সেই চোখের ব্যায়ামটা করিনি।

পেছন থেকে কে একজন আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললো, কি রে বাদল! এই ব্যাপারটা আমার আগেই ভাবা ছিল। এ পাড়ায় অনেকেই কে চেনে। এইরকম কোনো জায়গায় করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ কেউ এসে কথা বলবেই।

তাকিয়ে দেখলাম, সুবীর। আমার ণী হলেও বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। দের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে থাকে। পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে ওকে ভয় পায়, সুবীর নিজেকে প্রত্যেকটি কুমারী র অভিভাবক হিসেবে মনে করে।

আমি সুবীরের দিকে অসহায়ভাবে লাম। সবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মন জয় র জন্য হাসলাম ফ্যাকাসে ভাবে। সুবীর আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে যায়, তাহলে আমি আগামী এক গাহের জন্য ভগবানে বিশ্বাস করতে গ আছি।

সুবীর বললো, এখানে চুপ মেরে ড়য়ে আছিস কেন রে?

সুবীর জানে না, আমি এখন আর দের বাড়ির ভেতরে ঢুকি না। সুবীর ন, আমি যে-কোনো সময়েই রেণুর শ দেখা করতে পারি। সুতরাং ও দিকে কিছু সন্দেহ করবে না।

সম্ভবত ঈশ্বরই আমার মাথায় বুদ্ধি টিয়ে দিলেন। আমি বললাম, ট্রামের া দাঁড়িয়ে আছি। অনেকক্ষণ ট্রাম সছে না।

—মল্লিকাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

এই প্রশ্নে আমি আরও বেশী চমকে ঠ। এটা আবার সুবীরের কি কায়দা? ণুদের বাড়িব কথা জিজ্ঞেস না করে ল্লকাদের বাড়ির কথা বলার মানে কি? ল্লিকা নামটা চেনা চেনা, কিন্তু আমার ঙ্গে আলাপ নেই।

উত্তর না দিয়ে আমি এমন একটা দুখভঙ্গি করলাম, যার অনেক রকম মানে হতে পারে। এবং কথা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, সুবীর, তুমি ইলেকশানের সময় কিছু করো নি?

সুবীর অত সহজে ভুললো না। ইলেকশানের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, মল্লিকাদের বাড়িতে খুব রসের কারবার জমেছে, নারে?

আমাকে সাবধান হতে হবে। সুবীরের কাছে দুর্বলতা দেখালে চলবে না। কোনো রকম যুক্তি মানে না সুবীর। যে কোনো সময় গালাগালি দিতে বা হাত চালাতে পারে। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম। সিগারেটে টান দিয়ে সুবীর বললো, বাদল, তুই থিয়েটার করছিস না?

(ক্রমশ)

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

শ্রীসুখরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধে অবসরপ্রাপ্ত I. C. S. শ্রীবিজয়কুমার আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে, ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে শীতকালে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে চৌ এন লাই ও নেহরুর মধ্যে ম্যাকমেহন্ লাইন নিয়ে যে কথাবার্তা হয়েছিল—তার সারাংশ বর্ণনা করেছেন বিজয়বাবুর উদ্ধৃতি দিয়ে: চু' সেই রাত্রে ম্যাক্মেহন লাইন ভারত-চীন সীমান্তের রেখা হিসাবে প্রায় ৯০ ভাগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।" সেই রাত্রে 'চু' ও নেহরুর মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছিল, শ্রীআচার্য "সমস্ত আলোচনার নোট" নিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রবন্ধে দুটি বিতর্কমূলক মন্তব্য দেখা যাচ্ছে: (১) "গোটা আলোচনার 'নোট' আবার দুজনকে পড়ে শোনানো হলো।" (২) "বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসাবে তিনি গোড়া থেকে জানতে পেরেছিলেন, হিন্দী-চীনি ভাই-ভাই-এর যুগে চীনারা নাগাদের উসকানি দিতেন—পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম-প্রকাশের জন্য।"

(১) ১৯৫৬ সালের শেষভাগে দিল্লিতে ম্যাক্মেহন লাইন সম্পর্কে নেহরু-চৌ আলোচনার বর্ণনা রয়েছে নিম্নলিখিত সরকারী দলিলে: (ক) চৌ-এন-লাই'এর কাছে লেখা নেহরুর চিঠি, তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮ White Paper I ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা; (খ) নেহরুর কাছে লেখা চৌ এন লাই'এর চিঠি, তারিখ ২৩ জানুয়ারি ১৯৫৯ White Paper I ৫৩ পৃষ্ঠা; (গ) চৌ এন লাই'এর কাছে লেখা নেহেরুর চিঠি, তারিখ ২২শে মার্চ ১৯৫৯ White Paper I ৫৬ পৃষ্ঠা; (ঘ) নেহরুর কাছে লেখা চৌ এন লাই'এর চিঠি তারিখ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ White Paper II ২৯-৩১ পৃষ্ঠা।

এই চিঠিগুলি মন দিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে সেখানে এমন কোন উল্লেখ নেই যে, "গোটা আলোচনার 'নোট' আবার দুজনকে পড়ে শোনানো হলো" বা তারা সেই 'নোট' যথাযথ লিখিত বলে গ্রহণ করেছিলেন।

(২) ১৯৫৪ এপ্রিল থেকে ১৯৫৮ সেপ্টেম্বর—এই সময়টিকে সঠিকভাবে "হিন্দী-চীনি ভাই-ভাই" এর যুগ বলা যেতে পারে। ১৯৫৮ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে যখন চীনের মূল ভূখণ্ডের নিকট বর্তী দ্বীপপুঞ্জের (Off-Shore Islands) উপর দখলদারী নিয়ে চীন ও আমেরিকার মধ্যে এক বড় রকমের সংঘর্ষের উপক্রম হয়েছিল সে সময় পূর্বেকার মত [যথা কোরিয়া ও ইন্দোচীনের সংকট, চীন-তিব্বত বিরোধ] ভারতের মধ্যস্থের ভূমিকা

চীন মানতে রাজী হয়নি। ভারতের অন্যতম প্রবীণ কূটনীতিবিদ শ্রী ভি, সি, ত্রিবেদী I. C. S.-এর মতে, এই সময় থেকেই ভারত-চীন বন্ধুত্বের ফাটল ধরেছিল। [China And Peace In Asia Edited by A. Buchan 1950 পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় ওঁর প্রবন্ধ।] এই যুগে বিদ্রোহী নাগাদের স্বাধীনতা প্রয়াসে সাহায্য করেছিল বৃটেন/আমেরিকার কোন কোন গোষ্ঠী। তাছাড়া ১৯৫৬ সালের জুন মাস থেকে শিলং-এ স্থিত

তৎকালীন পাকিস্তানের কূটনৈতিক দপ্তরের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে নাগা-বিদ্রোহী-দের যোগাযোগ হয়েছিল। [Eclipse of East Pakistan: Jyoti Sen Gupta] পৃষ্ঠা ৩৯২-৩৯৪] ভারত সরকার ডিসেম্বর ১৯৬১ সালে গোয়া দখল করার পর ১৯৬২ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি কমিটিতে মার্কিন প্রতিনিধি ভারত সরকারের নাগা-বিদ্রোহ দমননীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। চীনের বিরুদ্ধে নাগা-বিদ্রোহী দের সাহায্য করার অভিযোগ প্রথম করেছিলেন ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রী শ্রীচাগলা ১১ এপ্রিল ১৯৬৭ সালে—অর্থাৎ 'হিন্দী-চীনি ভাই-ভাই যুগে'র প্রায় নয় বছর পরে। অন্যদিকে দেখা যায়, ১৯৫৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে চীনের পক্ষ থেকে তিনবার ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে—'কালিংপং-এ বসবাস-কারী তিব্বতীদের চীন-বিরোধী ষড়যন্ত্র-

শ্রীনিবাস রঙ
জমকালো, উজ্জ্বল-
উজ্জ্বল…নয়ত প্যাস্টেল
রঙের স্নিগ্ধ সুষমা। আমাদের
কাপড়ে আপনি সবই পাবেন।
বৈচিত্র্যে—বিশাল। পাবেন, হরেক
রকমের সুতীর আর 'টেরিন'/
কটনের কাপড়। এই কাপড়ই
চেয়ে নিন। দেখুন তুলনা ক'রে।
এ কাপড় যে আপনাকে মনোরম
সাজে সাজাবে—তা আপনি
নিজেই বুঝবেন।
দি শ্রীনিবাস
কটন মিলস্
লিমিটেড
শ্রীঃ
Interpub/SN/6/72 BN

কার্যকলাপ দমন করা হোক'।
ite Paper I পৃষ্ঠা ৬০, ৬৩, ৬৬)
সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫৪-১৯৫৮
চীনের কাছে এমন কোনও অভিযোগ
হয়নি যে, চীন সরকার প্রত্যক্ষ বা
ভাবে নাগাবিদ্রোহীর ষড়যন্ত্রমূলক
তারা আস্কারা বা উৎসাহ দিয়েছেন।
যারা ভারত-চীন সম্পর্কে নিয়ে বহুদিন
চনা করেছেন, তাদের কাছে
ার্যের উক্তি হেঁয়ালি বলে মনে হতে
।

করুণাকর গুপ্ত
কলিকাতা-১৯

প্রোটিন-ক্যালরি

১৩শে জুন তারিখের দেশ পত্রিকার
সংখ্যায় প্রকাশিত "আমার ভারতে
ন ক্যালরি অপুষ্টিজনিত সমস্যা"
ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীবিনয়কুমার দাশ-
মহাশয়ের পত্র (৩৭ সংখ্যা) দেখেছি।
খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ও বিশ্বস্বাস্থ্য-
ার দুই বিশেষজ্ঞ কমিটি যুক্তভাবে
বীতে বিভিন্ন খাদ্য সাধারণত যেভাবে
করা হয়ে থাকে তা পর্যালোচনা করে
protein utilisation% সংক্রান্ত
ছেন। তার তালিকা প্রকাশ করেছেন
দুই সংস্থার যুক্তভাবে প্রকাশিত
otein Requirement" এর ৪৮
ায়। এই পুস্তিকা বহুল প্রচারিত
যাঁরা জনগণের পুষ্টি বিষয়ে চিন্তা
ন বা গবেষণা করেন তাঁদের নিকট
য়া যাবে। এই পুস্তিকায় দেওয়া
ট মূল্য পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার হয়ে
। আমি নিজেও পৃথিবীর বিভিন্ন
খাদ্য ও পুষ্টিনীতির কাজে ব্যবহার
ছি এবং প্রবন্ধেও তাই প্রকাশ
ছি। এখানে একথা বলাও আবশ্যক
রন্ধনের প্রণালীর উপর নির্ভর করে
ন্ন মূল্যও পাওয়া যেতে পারে।
ার প্রবন্ধে একথাও বলেছি যে,
টিনের গুণাগুণ যাই হোক না কেন,
টিনের যে আনুপাতিক অংশ শরীরে
পরিপূর্ণরূপে গৃহীত হয় তকেই
প্রোটিনের net protien utilisation
(NPU%) বলা হয়। মাতৃ দুধের NPU
১০০% হলেও শিশু যেটুকু গ্রহণ করে
তার NPU যেটুকু খায় তার NPU
বলে ধরা হয়, কারণ কিয়দংশ বমি করে
ফেলে দেয়। ডিমের কথা বলতে গিয়ে
আমি শিশু ও প্রাক-বিদ্যালয়ের বালক
বালিকার কথা মনে রেখেই বলেছি। তাদের
জন্য অর্ধ বা তিন-চতুর্থাংশ সিদ্ধ, পোচ
করা বা নরম অমলেট যথেষ্ট উপকারী।
বয়স্কদের না খেলেও কোন ক্ষতি হয় না।
ডিমের সরবরাহের পরিমাণ এতই কম যে
শিশুদের প্রয়োজনই বেশী। ডিমকে অতি-
সিদ্ধ করে, ভেজে তারপর ডালনা করে
খেলে, মাছকে খুব কড়া করে ভেজে খেলে,
মাংসকে ভাজা করে কষে রোস্ট করে খেলে
বা দুধকে ঘন ক্ষীর করে খেলে বা দুধকে
milk powder করলে এসব খাদ্যের
প্রোটিনের মূল্য অনেক কমে যায়। একে
denaturisation of protein বলা হয়।
গৃহিণীদের উপকারের জন্য আকাশবাণীর
মহিলামহল প্রোগ্রামে খাদ্যের প্রস্তুত
প্রণালীর আলোচনা অনেকদিনই শুনেছি।

অতিরিক্ত খাদ্যের যে তালিকা আমার
প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে তা ঠিকই আছে,
ছাপার কোন ভুল নেই। ১০-১২.৫ টনের
পার্থক্য কোন স্থানে দেখান হয়নি, সব
সংখ্যাই হাজার মেট্রিক টনে দেখান হয়েছে।
বলা হয়েছে অতিরিক্ত ২০০ ক্যালরি পেতে
হলে ৫০ গ্রাম জনপ্রতি অতিরিক্ত খাদ্যের
যে প্রয়োজন হবে (চাল/আটা/ময়দা—৩৫
গ্রাম; ডাল-৫ গ্রাম; চিনি-৫ গ্রাম ও
চিনা বাদাম-৫ গ্রাম) এবং সপ্তাহে একটি
ডিমের সরবরাহের জন্য ১৯৭৩ সালের
জনসংখ্যার অনুপাতে বাঁ দিকের দুই
সারিতে সমগ্র ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে
অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন দেখান হয়েছে।
প্রত্যেক সংখ্যাই হাজার (০০০) মেট্রিক
টনে দেওয়া হয়েছে যেমন চাল/আটা/
ময়দা যথাক্রমে ৭,৩৩০,০০০ ও
৬০০,০০০ মেট্রিক টন, ডাল-১০৪৭০০০
ও ৮৫,৭০০ মেট্রিক টন ইত্যাদি। এই
সঙ্গে অবগতির জন্য ডানের সারিতে

শীতের রুক্ষতার মধ্যে... আপনার ত্বকে 'অকাল বসন্তের' ছোঁয়া লাগুক
বাহার ফুটিয়ে তুলুন। দেখুন, আপনার ত্বক কত সুন্দর, কত কোমল হয়ে উঠেছে।
ত্বকের সৌন্দর্য্য বাড়াতে নিভিয়ার জুড়ি নেই। তেলতেলে ভাবও কম। আঠার মত লেগে থাকে না, যা চকচক করে না। লাগাবার সাথে সাথেই আপনার ত্বকের সাথে মিশে যায় উপরন্তু আপনার ত্বকের পুষ্টি যোগায়, আর্দ্রতা বাড়ায় আর, ত্বক রক্ষাও করে চমৎকার! এবার, এই শীতে নিভিয়া ব্যবহার করে আপনার সৌন্দর্য্য অম্লান রাখুন।
পরের শীতে এবং ভবিষ্যতেও নিভিয়া ক্রীমের প্রতি আপনার অনুরাগ বেড়েই যাবে।
নিভিয়া—সুস্থ, সুন্দর ত্বকের রহস্য!
NIVEA
অ্যাণ্ড নেফিউ-এর তৈরী

১৯৭০ সনে কত খাদ্য দেশে উৎপন্ন হয়েছিল তাহাও দেখান হয়েছে। যেমন চাল/গম-৯০,৫৫৩,০০০ মেঃ টন; ডাল-১০,১৩৩,০০০ মেঃ টন। ১৯৭৩ সালে কত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে তা ১৯৭৫-এর পূর্বে জানা যাবে না।

প্রতুলনাথ সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৪০।

বাটেশ্বরের শিবমন্দির

আপনাদের পয়লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীমতী অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটেশ্বরের (বটেশ্বর?) শিবমন্দিরের প্রসঙ্গে লেখা রচনাটি কৌতূহলোদ্দীপক, শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে কয়টি কথা বলবার আছে।

Cunningham যে শিলালিপিটি মিউজিয়মে জমা দিয়েছিলেন তা বটেশ্বরের মন্দিরে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিলো আগ্রা থেকে ৪ মাইল দূরে 'মৌজা বাটেশ্বর' একটা ঢিবির মধ্যে খননকার্য চালাবার সময়, অবশ্য ওই ঢিবির মধ্যে যে কেমন করে শিলালিপিটি পৌঁছেছিলো তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। তবে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি এই লিপিটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন ভবিষ্যতের মানুষের কথা ভেবে, শিলালিপিতে দুটি মন্দির নির্মাণের কথা বলা আছে। একটা শিবমন্দির, অপরটা বিষ্ণু-মন্দির, ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রাত্রেয় (চান্দেল্ল) বংশীয় রাজা পরমার্দিদেব ৩৪টি স্তবকে বিভক্ত সংস্কৃতে লিখিত এই শিলালিপিটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে Epigraphia Indica-র প্রথম খণ্ডের ২৭০-২৭৪ পৃষ্ঠায়। এই শিলালিপি ভেদাবর বংশীয় মহেন্দ্র সিংহের মন্দির সংক্রান্ত নয়, তাছাড়া শিলালিপির বিষ্ণু-মন্দির সম্পর্কে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই লেখেন নি।

মুসলিম আমলের বহু পূর্বেও যে হিন্দুরা শ্বেতপাথরের প্রাসাদ নির্মাণ জানতেন এবং প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও অলংকরণ যে অতি উন্নত ধরনের ছিলো লেখিকার সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা একমত।

লেখিকা বটেশ্বরে প্রচলিত লোক-কাহিনী শুনিয়েছেন যে, ওই মন্দির দুটি শ্বেতপাথর নির্মিত সহসা দেবতার কোপে ধ্বংস হয়ে গেলো, কিন্তু শিলালিপিতে উল্লিখিত মন্দির দুটি এখনও আছে তবে ভিন্ন নামে। কেউ কেউ এমনও অনুমান করেন, আগ্রার তাজমহল হচ্ছে সেই শিব-মন্দিরটি আর নদীর ওপারে ইতমদউদ্দৌলার তথাকথিত কবরটি হচ্ছে সেই বিষ্ণুমন্দির, লেখিকা বলছেন যে, মন্দিরের আশেপাশে মাটির স্তূপের তলায় স্নানাগার, কয়েদখানা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, তাজমহলের তলাতেও এই ধরনের অনেক কক্ষ রয়েছে, দরকার হলে এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ হাজির করা যেতে পারে।

দীপককুমার ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৯।

আমার যৌবন

শারদীয় সংখ্যায় "দেশ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর লিখিত "আমার যৌবন" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি কথা আছে, "পরিচয়" প্রকাশিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে, বেশ অনেকদিন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ বেদান্তবাগীশ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হয়ত অনেক পরে সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সুধীন্দ্র-নাথ দত্তের পিতা। বুদ্ধদেব বসুর বিবরণ ভ্রান্তি-জনক। ইতি

আনিসুর রহমান
ঢাকা

উদয়শংকর

গত ২৪শে কার্তিকের সংখ্যায় উদয়-শংকরের জীবনীতে শ্রীসুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"সে বছর সুভাষচন্দ্রের যোদ্ধা বেশ প্রথম দেখেছিল দেশবাসী। আগে আগে চলেছেন অশ্বারোহী সুভাষচন্দ্র। সৈনিকের বেশ তাঁর পরনে। মাথায় টুপি, দু'হাতে অশ্ব বল্গা।'

১৯২৮ সনে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ঐ কলেজের দেয়ালের উপরে বসে কংগ্রেস সভাপতি মতিলালের শোভা-যাত্রা দেখেছিলাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সুভাষচন্দ্র ছিলেন—GOC—General Officer in Command। শনিবারের চিঠি কার্টুন ছাপিয়ে নীচে লিখেছিল গক।

সুভাষচন্দ্র সেই শোভাযাত্রায় মতিলাল নেহেরুর অনেক ঘোড়ায় টানা গাড়ির পিছনে ধীর গতিতে চলমান একখানি খোলা মোটর গাড়ির উপর GOC সুলভ খাকির পোশাক পরে বীরের মত অতি গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই ঐতিহাসিক শোভা-যাত্রায় তিনি মোটেই ঘোড়ার পিঠে ছিলেন না। যোদ্ধার বেশ সুভাষচন্দ্রের ছিল এ-কথাও বলা যায় না।

শান্তিদাশংকর দাশগুপ্ত
কলিকাতা-৬০

বাংলাদেশের গদ্য—২

লোক মুখে শুনেছি হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আহমদ শরীফ ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'নন্দিত নরকে' পড়বার আগে তিনি এই লেখককে চিনতেন না। তা হলে স্বীকার করতেই হবে, বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ নামে একজন শক্তিমান লেখকের আবির্ভাব হয়েছে।

'নন্দিত নরকে' একটি ছোট উপন্যাস বা বড় গল্প। বইখানার প্রধান প্রশংসা বিষয় এই যে, এর যেন কোনো দাবি নেই, বিরাট কোনো প্রত্যাশা নেই, খুব নিচু গলার লেখা। এই উপন্যাসের যে বর্ণনাকারী, অর্থাৎ 'আমি' সে একজন আধুনিক যুবক। কিন্তু আধুনিক যুবকের যে সমস্ত চারিত্রিক মূল্যবোধ আমরা দেখতে অভ্যস্ত, তার বিশদ বর্ণনা এই লেখাতে নেই। যুবা বয়েস, ঘরের চেয়ে বাইরের জগৎটা বেশী টানে, মা-বাবার চেয়ে বন্ধু-বান্ধব কিংবা দূরবর্তিনী কোনো নারীকেই বেশী আপন মনে হয়। কিন্তু এই তরুণ লেখক সেই বাইরের জগতের দিকে বেশী জোর দেন নি, তিনি লিখেছেন ওই যুবকটির পারিবারিক কাহিনী।

কে না জানে, পারিবারিক কাহিনী লেখাই সবচেয়ে শক্ত। বাবা ও মায়ের ভালোবাসা, পরে স্নেহ, ভাইবোনের সম্পর্ক —এই যে সব পৃথিবীর বহুকালের ব্যাপার —নানা ভ্যারাইটির ওলট পালোটে বা বিশেষ কল্পনায় নিতান্ত শিল্পে বিধৃত করা সত্যিই সহজ কাজ নয়। কারণ, এরকম বহু লেখা হয়ে গেছে, তা ছাড়া এর মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার সুযোগ কম, একমাত্র তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই এর সংকেত এনে দিতে পারে। হুমায়ূন আহমেদ-এর সেই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তো আছেই, আর একটা তাঁর বড় গুণ তিনি আবেগের বাড়াবাড়ি করেন নি, আগাগোড়া তিনি, যে-কোনো আধুনিক যুবকের মতনই, একই সঙ্গে সংসারের সঙ্গে জড়িত অথচ নির্লিপ্ত। একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। বাবা, মা, তিন ভাই, এক বোন। এর মধ্যে সব কটি ভাইবোন সহোদর নয়, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাবা আবার শাদী করেছেন। কিন্তু বিমাতাও ধর্মশীলা ও স্নেহময়ী, ভাইবোনদের মধ্যে কোনো ফাটল নেই। সংসারে অতিরিক্ত দুটি প্রাণী আছে। একটি পোষা কুকুর, আর একজন মাস্টার মশাই। বাবার বাল্যবন্ধু, নিরাশ্রয় নিঃসম্বল এই কুদর্শন প্রৌঢ়কে এ বাড়িতেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। মাস্টারমশাইটি অবশ্য খুবই স্নেহপ্রবণ।

এই এদের বাড়ি। এদের পাশের বাড়ির লোকেরা অবস্থাপন্ন। তারা শৌখিন, সে বাড়ির মেয়েরা কথা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত

গায়। ও-বাড়ির লোকেরা অবশ্য এ-বাড়ির লোকদের নিচু চোখে দেখে না, আদর যত্ন করে। এ-বাড়ির ছেলে ও-বাড়ির মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

এই পর্যন্ত পড়ার পর মনে হয়, রচনাটির নামের মধ্যে নন্দিত শব্দটি ঠিক হলেও নরক কেন? সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবির মধ্যে নরক কোথায়? একটু আধটু অভাব বা দারিদ্র্য থাকলেই তো নরক বলা যায় না।

এ-বাড়ির বড় মেয়ে রাবেয়ার মাথার দোষ আছে। ক্ষ্যাপা, বড়ই সরল আর ভালো মেয়ে সে। কিন্তু তার মানসিক দুর্বলতার কাছে সে অসহায়। তার শরীরে যৌবন এসেছে কিন্তু হুঁশ আসে নি, সে লেখাপড়া শিখলো না কিন্তু পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে অসভ্য কথা শিখলো। সে যখন তখন বাইরে বেরিয়ে যায়, তাকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা। বাবা-মা ও ছেলে মেয়েরা পাশাপাশি ঘরে শোয়। মাঝখানে বাঁশের বেড়া। মাঝ রাতে যুবক শুয়ে শুনতে পায় পাশের ঘরে বাবা মাকে আদর করছেন। চুম্বনের শব্দ। এ সবই স্বাভাবিক, তবু যুবকের চোখ মুখ জ্বালা করবেই।

হঠাৎ জানা গেল, রাবেয়া গর্ভবতী। পাগলা মেয়ে, সে বলতেই পারে না, কে তার এই সর্বনাশ করলো। 'সে দুঃখের সময় হাসে।' আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে সতীত্বের দাম প্রাণের মূল্যের চেয়েও অনেক বেশী। অভাব অনটন দারিদ্র্যে তেমন লজ্জা নেই, কিন্তু কুমারী মেয়ের গর্ভের মতন কলঙ্ক আর কিছু হয় না। এই অবস্থার মেয়েকে কোনোক্রমে বিয়ে দিয়ে পার করে দেওয়ার একটা চেষ্টা হয়। কিন্তু পাগল মেয়েকে কে বিয়ে করবে? পাগল মেয়ে গর্ভবতী হলেও প্রকাশ্যে তার চিকিৎসা করানো হয় না। অবৈধ গর্ভপাতের চেষ্টায় বাবা মা মেরে ফেললেন মেয়েকে। গর্ভপাতের পর, 'আমার বুকটা বড় খালি খালি লাগে' —এই কথা বলতে বলতে মরে গেল রাবেয়া। নায়কের ছোট ভাই মন্টু—সে খেলতে গিয়েছিল অন্য জায়গায়, ফিরে এসে এই ব্যাপার দেখে মাছ-কাটা বঁটি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো মাস্টারমশাইকে।

এই হলো ঘটনা, কিন্তু এর একটা অন্য দিকও আছে। খুব সহজে এই চরিত্রগুলির কারুকে ভালো বা মন্দ বলা যাবে না। মন্টু খুব ভালবাসতো ওই মাস্টারমশাইকে। মাস্টারমশাই রাবেয়ার মাকে দিদির মতন ভক্তি করতেন। কেউ কোনো কু-মতলবের নেই, তবু এই সব ব্যাপার ঘটে যায়। গল্পের 'আমি' এখানে দ্রষ্টা, সে নির্লিপ্তভাবে সব কিছু বর্ণনা করেছে। গল্পটি শেষ করার পর বড় মায়া লেগে থাকে।

রশীদ খান-এর 'অনিশ্চিত লোকালয়'— পাঁচ-ছটি গল্পের সংকলন। বাংলাদেশেও অধিকাংশ বইয়েরই নাম বেশ সুন্দর হয়। এই নামটিও কাব্যগ্রন্থেরই উপযোগী যেন।

রশীদ খানের গল্পগুলিকে এক কথায় ভালো বা মন্দ বলা যাবে না। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই আরম্ভ হয়েছে বেশ সরলভাবে, ঠিক যেন মুখে বলা কাহিনীর মতন। যেমন, 'জুবেদা শুনেছিল তার নিঃসন্তান ধনী মামা একটা মেয়েলোকের জন্য পাগল হয়েছে।' মনে হয় যেন, লেখক একটি নিছক গল্পই শোনাতে বসেছেন। কিন্তু লেখক বহুদর্শী, তিনি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মানুষের মনের জটিল ক্রিয়ার পটভূমিকা এঁকে একটা ধোঁয়াটে জগৎ তৈরি করে ফেলেন। ফলে, নিঃসন্তান ধনী মামা কিংবা তাঁর রক্ষিতা কিংবা তাঁর অলস ভাগ্নেকে আমরা যে রকম আশা করি, এরা কেউই সে রকম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনে, এই লেখক হঠাৎ এক জায়গায় গল্প থামিয়ে দিয়ে পাঠককে ধাক্কা দিতে চান, জীবনটা এত সোজা ব্যাপার নয় যে!

তবে, এঁর প্রায় সব কটি গল্পই প্রায় ব্যর্থ মানুষদের নিয়ে। যারা অন্য সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না, হেরে যাচ্ছে, কিন্তু হার স্বীকার করছে না। এই হার স্বীকার না করার মধ্যে কোনো অহংকার নেই, আছে যেন খানিকটা কৌতুক। সাংকেতিক ব্যাপারটাকেই যেন বিদ্রূপ করতে চাইছেন।

এঁর গল্পগুলি নিশ্চিত নতুন স্বাদের। তবে, একটি মাত্র কথা বলা যায়। এঁর কথা কখনো কখনো অপরিষ্কার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শওকত ওসমানের প্রভাব কখনো কখনো যেন চোখে পড়ে, কিংবা আমারই ভুল হতে পারে।

সনাতন পাঠক

পলিকান ল্যাটিন আমেরিকান রীর কল্যাণে একদার প্রায়-অপরিচিত শ দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারছি। একটি কারণে ল্যাটিন আমেরিকাকে ঘিরে দরও আগ্রহের সীমা নেই—প্রায়শই হয়, এবং সঙ্গত কারণেই যে, এশিয়া, কা ও দক্ষিণ আমেরিকার একদা স্বাধীন ্রি ক্রমান্বয়ে 'তৃতীয় বিশ্বে' রিত হচ্ছে বা হয়েছে। এই একত্রী-র পিছনে প্রধান যুক্তি হলো যে, তিনটি শেরই স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির র পথ রুদ্ধ করে রয়েছে মোটামুটি ধরনের বিপত্তি। যথা গতায়ু উপ-বাদের কিছু নাছোড় চিহ্ন, গ্রামাঞ্চলে ীকৃত সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির বাঁকা পথে অর্থ-ক শোষণ। সৌভাগ্যের বিষয়, পেঙ্গুইন এই প্রতিবন্ধগুলিকেই বিস্তারিত-বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের প্রকাশিত ন বইয়ের মাধ্যমে। ল্যাটিন আমেরিক কে এ ধরনের আলোচনাগুলি করেছেন গুন্ডার ফ্রাঙ্ক, রেগিস দেব্রে, চে ভেরা প্রভৃতি স্বনামধন্য সমাজবিজ্ঞানী বিপ্লবীরা। বলা বাহুল্য, অনেক সময়েই র সিদ্ধান্ত মেনে নিতে মন সায় দেয় দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক গুন্ডার র metropolitan — sattelite ের ভিত্তিতে তাঁর তত্ত্বকে খাড়া নের ভ্রান্ত প্রচেষ্টা—যাই হোক, লোকিত এক মহাদেশের উত্থান, সংগ্রাম জনজীবনের উপর যে এঁরা মূল্যবান লোকপাত করেছেন এ সম্বন্ধে অধিকাংশই মত হবেন।

গেরিট হুইজারের বইটি, যার প্রতিপাদ্য ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ক অভ্যুত্থান, উপরোক্ত পর্যায়ের মধ্যে ড়। অবশ্য মূল পার্থক্য এইখানে যে, ইজার গুন্ডার ফ্র্যাঙ্কের মতো কোন স্থির ত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অনভিপ্রায়ী। পরন্তু মারিগেলা বা গুয়েভারার মতে ইজার বিপ্লবীও নন। তাঁর উদ্দেশ্য অনেক মিত এবং বলা যেতে পারে নৈর্ব্যক্তিক। ৯৬২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লেখক উনাইটেড নেশনস-এর অধীন আন্ত-র্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I L O) পরিচালিত কর্তৃক 'field project' এবং 'action research' কর্মাবলীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, ও কাজের খাতিরেই ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপদান করবার তাগিদে বাস বেঁধেছিলেন। সেই সময়েই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদের দৈনন্দিন অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করে তিনি এই বইটির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি রেখেছেন অতীতের ইতিহাসের প্রতি, রাষ্ট্র কাঠামোর উপর এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্বের দিকে। ফলস্বরূপ গ্রন্থটি নিছক তথ্য ও তত্ত্বের কচকচিতে পর্যবসিত না হয়ে একটি

Peasant Rebellion in Latin America: by Gerrit Huizzer. Penguin Books. 40 p.

প্রাণবন্ত আলোচনা হয়ে উঠেছে। কৃষক-জীবনের সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস অবিশ্বাস মিশে গেছে বৃহত্তর পটভূমির অর্থনৈতিক রাজ-নৈতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে।

এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে 'হাসিয়েন্ডা' (ব্রেজিলে 'ফাজেন্ডা') মালিক বা ভূমিবর্জিতদের আধিপত্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীর জমিদারীর কৃষকদের জোরজবরদস্তি করে হটিয়ে বা আদালতের একপেশে বিচারের সাহায্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কুক্ষিগত করে রেখেছে। তার কিছু অংশ অনেক সময়েই উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় না। শুধু যে জাতীয় অর্থনীতিকে এই নিষ্কর্মা পদ্ধতি দুর্বল করে তা নয়, ভূস্বামীরা আবার

গ্রন্থ প্রচ্ছদ

আমাদের দেশের এককালীন জমিদারদের মতোই গ্রামে অর্জিত অর্থের সাহায্যে শহরে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে। এই অবাধ 'conspicuous consumption'-এর দরুণ কৃষি উন্নয়নের পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এক কথায় একটি যুগভ্রষ্ট নীতির রক্ষক এই সম্প্রদায় এবং এদেরই অধীনে কাজ করে অসংখ্য কৃষক যারা উৎপাদনের ফল থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত। এই সঞ্চিত বঞ্চনার জন্মশ্রুতি "culture of repression" বা "নিপীড়ন সংস্কৃতি" যার ভুক্তভোগী হওয়ার

দরুণ চাষীরা বিপ্লবে অবিশ্বাস, জমিটুকুকে আঁকড়ে থাকার মনোবৃত্তিই এদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলত যখন কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সরকার জমি বণ্টনের নীতিকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয় বা কোন নিরপেক্ষ সংস্থা সীমিত গ্রামীণ উন্নয়নে ব্রতী হয় তখন কৃষকদের কাছ থেকে সম্যক সহযোগিতা মেলে না।

অবশ্য হবসবম যাকে বলেছেন 'নিপীড়ন সংস্কৃতি', তাকেই ন্যায্য প্রতিরোধের ভিত্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে যদি কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার থেকেই ছেঁকে তুলতে পারেন অবদমিত চেতনা এবং সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করবার দারুণ অভীপ্সা। মেক্সিকোতে এমিলিয়ানো জপাটা ও উরসুলো গালভান, বলিভিয়াতে জুয়ান গুয়ের, পেরুতে হিউগো ব্লাংক, ব্রাজিলে ফ্রান্সিসকো জুলিয়াও প্রমুখ সে চেষ্টাই আন্তরিকভাবে করেছিলেন। উপরন্তু কৃষকদের পাশে অনেক সময়ে এসে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় শিক্ষক, আইনজীবি, ভূমিমালিকদের সচেতন সন্তান ও ধর্মযাজক। ফ্রান্সিসকো জুলিয়াও নিজেই জমিদার শ্রেণীভুক্ত ও যাজকদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় ক্যামিলো টরেস।

লেখক সুনিপুণভাবে কৃষক আন্দোলনগুলিকে পর্যায়ভুক্ত করেছেন। সম্ভবত বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই পৃথকীকরণ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। মেক্সিকোতে কৃষকদের সংগ্রাম প্রগতিশীল রাষ্ট্রনায়ক কারডেনাস-এর নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। বস্তুত, কারডেনাসের শক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিল সরকার প্রতিষ্ঠিত কৃষকবাহিনী। আবার বলিভিয়াতে রক্তক্ষয়ী 'চ্যাকো ওয়ার' এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে কৃষকেরা অনিশ্চয় সুযোগ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন অনেক সংগঠন। পার্শ্ববর্তী শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে আত্মিক তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এই যুগ্ম অভিযান এত প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে দাবিদাওয়া আদায় করে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। পরিণাম হাইজারের ভাষায়, "The great majority of the Bolivian peasants were transformed into small proprietors".

অন্য দিকে ভেনিজুয়েলাতে কৃষক সংগঠন শিকড় থেকে গড়ে না উঠে আরোপিত হয়েছিল বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতাদের উদ্যোগে। রোমুলো বেতানকোর্ট সমর্থন পেয়ে অংশতেই জাতীয় কৃষক সংস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। তার উপর দুশো পেশাদারী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রামে পাঠিয়েছিলেন কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে। অবশ্য এই সব ভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মধ্য দিয়ে একটি সর্বস্তরী সত্য প্রতিভাত হয়—প্রত্যেক পর্যায়েই আন্দোলন রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে যুক্ত। যেখানে রাষ্ট্র প্রগতিশীল সেখানে গঠনমূলক সমঝোতা, যেখানে নীতির পিছনে রয়েছে ভূস্বামীদের স্বার্থ সেখানে অশান্তি, প্রতিরোধ এমনকি রক্তক্ষয়।

শেষ দুইটি পরিচ্ছেদে লেখক পুরেন কাসুন্দি ঘেঁটেছেন : সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ ও বিপত্তি কি কি এবং এখনও অব্যাহত প্রতিরোধের রাজনৈতিক ফলাফল কি হতে পারে এই তাঁর সেকেলে শিরঃপীড়া। স্বভাবতই এ অংশে ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির ছড়াছড়ি ও বহুপঠিত ফর্দের তালিকা। যথা নেতার প্রয়োজনীয়তা, শহর ও গ্রামের মিতালি এবং কৃষকের মনে চেতনার বীজ রোপণ সম্বন্ধে বারংবার মন্তব্য। এতগুলি সফল-অসফল সম্মেলনের বর্ণনা ও মূল্যায়নের পর এই সরলীকৃত উপসংহারগুলো অনাবশ্যক বোধ হয়। অবশ্য পুনরাবৃত্তি যেন ইদানীংকার রাজনৈতিক লেখার একটা বিশেষ ধর্ম। গুন্ডার ফ্র্যাংকও এক কথা বিশ বার বলেছেন। এতে যে শুধু সমালোচক বা পাঠকই বিরক্ত হয় তা না, রাজনৈতিক কর্মীরও আদৌ চেতনার প্রসার ঘটে না।

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

মাজতত্ত্ব : আদিবাসী সমাজ

Bauris of West Bengal: C. Shasmal, M.Sc., D.Phil. ndian Publications, 3, British ndian Street., Cal-1. Price Rs. 28.00.

কিছু আদিবাসী কালক্রমে আমাদের ভাবধারা ও সংস্কৃতির পরিপুষ্ট পেয়ে আমাদের বিভিন্ন জাতি বিন্যা- একটিতে পরিণত হতে পেরেছে। এই মিশ্রণের ফলে তাদের আদিবাসী পরিবর্তন ঘটেছে। লোকাচার আর তির মূল ধারা থেকে একটু পৃথক ও মোটামুটি একটি সমধর্মী চরিত্র জীবন যাত্রায় খুঁজে পাওয়া যায়। পশ্চিমবাঙলার বাউড়ি সম্প্রদায় একটি উদাহরণ। আমাদের জাতি দের একেবারে নিচের ধাপে এই ড়িরা তপশিলী সম্প্রদায় হিসেবে আশ্রয় রছে।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে কোন এক ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহের পর ড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা আমাদেরই র রাজ্য বিহারের মানভূম, মল্লভূম ও ভূম থেকে জীবিকার সন্ধানে পশ্চিম লার কোলে নতুন জীবন শুরু করে ছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনী, পুরুলিয়া এবং হুগলীতে এরা এসে নতুন বসতি গড়ে তুলল। '৬১ সালের নারীতে দেখা গেছে পশ্চিম বাঙলায় মোট ড়ির সংখ্যা ৫০১২৬৯ জন। পরে বিকার সন্ধানে এই বাউড়িরা বিভিন্ন দিক ক ক্রমান্বয়ে হুগলী জেলাতেই এসে সমবেত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বাউড়ি হুগলী জেলার যে সমস্ত অঞ্চলে সংসার পেতেছে তা হল বলাগড়, মগরা, পোলবা, পাণ্ডুয়া এবং ধনিয়াখালি থানা। কিছু পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল এবং তার কাছের থানার বিভিন্ন গ্রামে।

বাউড়ি সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হ্যাণ্ড বুক অফ কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস গ্রন্থে উল্লেখ আছে—বাউড়ির মানভূমে নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত ওড়িয়া জাতি দের বংশানুক্রমিক জীবিকা ছিল ঝাড়ু দানা। এদের আদি বসবাস গঞ্জাম প্রদেশে সেখানে স্থানীয়ভাবে এরা খদেলো নামে পরিচিত ছিল। বাউড়িরা একসময় সমাজে অস্পৃশ্য ছিল এবং এরা দাবি করে থাকে এদের বংশানুক্রমিক জীবিকা ছিল পালকি বহন করা। অন্য মতে চুয়াড় বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকদের অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। অত্যন্ত কড়া হাতে সেই বিদ্রোহ দমন করার সময় চুয়াড়রা তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। অথচ এই চুয়াড়রা একসময় তাদের মারমুখি যোদ্ধা-সুলভগুণের জন্যে সুপরিচিত ছিল। স্থানীয় রাজা এবং জমিদাররা সেই কারণে এদের পাইক, বরকন্দাজ, লেঠেল ইত্যাদি হিসেবে চাকরি দিতেন। ইংরেজদের তাড়া খেয়ে পলাতক চুয়াড়রা দেশীয় জমিদার ও রাজন্যবর্গের আনুকূল্য হারিয়ে চরম অর্থ-নৈতিক দুর্দিনের মুখোমুখি হল। জীবিকার জন্যে খোলা রইল একটি মাত্র রাস্তা—চুরি ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি। শ্রী জে এন ভট্টাচার্য বাউড়িদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাগদি, ডোম, হাড়ি, বেদিয়া প্রভৃতি জাতিকে অপরাধপ্রবণ মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

স্যার এইচ এইচ রিসলে, ডাঃ নীহার-রঞ্জন রায়, ডাঃ আর কে মুখোপাধ্যায়

সকলেই একমত যে কিছু কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়—যেমন হাড়ি, ডোম, বাউড়ি, বাগদি একটু একটু করে হিন্দু সমাজ এবং সংস্কৃতির মূল ধারার অন্তর্ভূত হয়ে তাদের আদিবাসী চরিত্র হারিয়েছে। হিন্দু সমাজের বিরাটত্ব তাদের পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীশ্যামল পশ্চিমবাংলার বাউড়ি সম্প্রদায়ের একটি অন্তরঙ্গ ভুরুচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের সমীক্ষা খুব সহজসাধ্যও নয় এবং যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। লেখক হুগলী জেলার ধনিয়াখালি ও পোলাবা থানা থেকে মোট এগার আটটি গ্রাম সমীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এই আটটি গ্রামে বাউড়ি পরিবারের মোট সংখ্যা ছিল ২৪৭। কিছু কিছু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থারও যথেষ্ট অসুবিধে ছিল। অসুবিধে ছিল বসবাসের। দিনের পর দিন এইসব পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে এই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ ছবি লেখকের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

শুধু নৃতত্ত্বের পাঠক নয়, সাধারণ পাঠকও এই বই থেকে প্রচুর আগ্রহের খোরাক পাবেন। একদল মানুষের বেঁচে থাকার ইতিকথা যে কোন কাহিনীর থেকেও আকর্ষণীয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'নিগ্রো/ঠোঁটে তার শিঙা/গায়ের জ্যাকেটে সুন্দর সাজানো একসারি বোতাম/সে নিজেও জানে না কোন খাদে সংগীত আশ্চর্য নেমে যায়/আর তার অলস সুন্দর মায়া তীরের মতো বেঁধে বক্ষের গভীরে/অথচ মৃদু লয়ে যখন তার কণ্ঠ থেকে সুরে উঠে আসে মনে হয় সমস্ত দুঃখ যেন মিশে যায় স্বর্ণালি এক মধুর সংগীতে'—শিঙাবাদকের এই আশ্চর্য ছবিটি একদিক থেকে ল্যাংস্টন হিউজের আত্মপ্রতিকৃতিও মনে হতে পারে। কেননা, তাঁর ঠোঁটেই ছিল সেই শিঙা যাতে নিগ্রো-জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণাকে স্বর্ণালি সংগীতে উত্তীর্ণ করেছিলেন তিনি।

শুধু নিগ্রো কবিরূপে নয়, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের একজন প্রধান কবি হিসাবেই ল্যাংস্টন হিউজের প্রতিষ্ঠা। জীবনের বিচিত্র জীবিকাসমূহের দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় অন্যতর মাত্রা যোগ করেছে। সরল, তীক্ষ্ণ, প্রতিবাদমুখর তেজী কবিতার পাশাপাশি অজস্র আশ্লেষে প্রেমের কবিতা লিখেছেন ল্যাংস্টন হিউজ। সম্প্রতি অসিত সরকার অনূদিত **ল্যাংস্টন হিউজের কবিতা** (পরিবেশক: কথা ও কাহিনী, তিন টাকা) নামে একটি চমৎকার কাব্যসংকলন বেরিয়েছে। সহজ সরল অনুবাদ। ল্যাংস্টন হিউজের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের একটি সুন্দর অবলম্বন হবে অসিতবাবুর এই অনুবাদ-সংকলনটি সন্দেহ নেই।

✻

অধ্যাপক রাজেন দাশগুপ্তের **পঞ্চপ্রদীপ** (পরিবেশক: স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, তিন টাকা) সম্ভবত তাঁর সাহিত্য নেশার খেয়ালী ফসল। 'পঞ্চপ্রদীপ' নামে তিনি বুঝিয়েছেন পাঁচটি প্রেমের সার্থকতা। অসীমা-অনিমেষ,

সুলেখা-অজিত, শেফালি-মণীশ, বিনতা-সুনীল এবং প্রতিমা-মনোজিতের ইচ্ছাপূরক মিলনের মধ্যে তাঁর উপন্যাস শেষ হয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রেমে প্রতীক্ষা, কোনো প্রেমে আত্মত্যাগ, কোথাও ভুল বোঝাবুঝি কোথাও-বা জীবনমরণ সমস্যার ছবি ফুটেছে। কিন্তু 'সব ভালো যার শেষ ভালো' নীতিতে বিশ্বাস রেখে তিনি প্রত্যেকের প্রেমের মিলনান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন উপন্যাসকে। মসৃণ ভঙ্গি, সরস সংলাপ এবং ভাবালু আড়ষ্টতা সত্ত্বেও পড়ে ফেলা যায়।

*

খুব বিখ্যাত হয়তো নন, তবে সমীরণ দত্তর সাহিত্যসাধনা দীর্ঘদিনের। বয়সে প্রবীণ এই নিভৃত সাহিত্যসেবী দীর্ঘদিন ধরে রোগাক্রান্ত এবং গৃহবন্দী। তবু দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু সাহিত্যিক এবং মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছেন তার একটি আন্তরিক ছবি ফুটে উঠেছে সদ্য প্রকাশিত নিবন্ধ সংকলন **মহামানবের সাগরতীরে** (সলিল সাহিত্য প্রকাশনী, চার টাকা) গ্রন্থে। স্বল্পায়তন এই টুকরো প্রবন্ধগুলিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও চর্চার নির্ভুল চিহ্ন ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ দাশ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, সরোজকুমার রায়-চৌধুরী প্রমুখ স্বদেশী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেমন গভীর, বিদেশের নেরুদা, হেইনরিখ বোল, এজরা পাউন্ড কিংবা পার্ল বাক-মোপাসাঁ সম্পর্কেও তিনি সমান কৌতূহলী। এ-ছাড়া মাদার টেরেসা, লর্ড রিপন, রামমোহন রায়, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, নিবেদিতা সম্পর্কেও টুকরো আলোচনায় তিনি বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস দিতে পেরেছেন। এ-কৃতিত্ব নিশ্চিত প্রশংসনীয়।

*

শঙ্কর দাসের **আজ বসন্ত** (প্রাপ্তিস্থান বিদ্যাভবন, আড়াই টাকা) তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ সোনালী ঢেউয়ের অল্পকালের ব্যবধানে প্রকাশিত। সোনালী ঢেউতে তাঁর বিদঘুটে শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেও তা খুব কমে নি। 'হামাল্লা' মানে সর্বময় কর্তা, 'খোংরা' অসমতল, 'ছুকাঁস' ছোট, 'উঁচল' নগণ্য, জোয়াপ্পা ইচ্ছে—এই রকম যা 'জোয়াপ্পা' তাই ব্যবহার তাঁর এবারের উপহার। কবিতার বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে বোঝা গেল না।

*

দীপককুমার সরকারের **রূপতীর্থ** (... প্রেস, ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) ভ্রমণ কাহিনী। প্রায় পাঁচ ছ শ বছর আগে হোমকুণ্ড যাবার পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে একদল তীর্থযাত্রীর বিনাশ ঘটে রূপকুণ্ড হ্রদের তীরে। সেই অস্থি-অবশেষ ও অন্যান্য নিদর্শন দেখার জন্যে অনেকে ছুটে যান রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ডের তীর্থপথে।

দীপকবাবু অবশ্য ঠিক ভ্রমণকাহিনীর মতো লেখেন নি বইটি, তাঁর লেখা দিনপঞ্জী-ভিত্তিক। এতে তফাত খুব হয় না। সবই জানা হয়ে যায়। অন্তত তিনি যাবতীয় পথঘাটের খবর-টবর ও গল্পকথা ঠিকই শুনিয়েছেন কেবল প্রতিদিন ভোরবেলা চা-কফি-জলখাবার ও রাতের খিচুড়ি

পত্রটীর নিমানন্দৈনিক খন্টিনাটি বর্ণনা একটু শুনতে হয়েছে।

তবে তাঁর পরিশিষ্ট অংশটি খুবই প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ ভ্রমণকারীরা একটি নিখুঁত ছবি পাবেন এর মধ্যে।

পত্রিকা

সত্তর দশক ॥ সম্পাদক : জিতেন গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজন সেন। ৭৮।২ বীরেন রায় রোড ওয়েস্ট, কলকাতা-৬১। মূল্য : দু' টাকা।

বর্তমান সংখ্যাটিতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন দীপেন্দু চক্রবর্তী, জিতেন গংগোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্রভৃতি। 'কবিতাই বিরুদ্ধাচরণ এবং ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ' নামে সুব্রত চক্রবর্তীর আলোচনাটি তরুণ কবিদের কাছে অশেষ মূল্যবান লেখা হিসেবে গ্রাহ্য হবে। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'অশনি সংকেতে'র ওপর সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি যুক্তিপূর্ণ। প্রজ্ঞর শূর এবং তুলসী সেনগুপ্তের গল্প দুটি সুন্দর। অনেক কবিতা আছে 'সত্তর দশকে'র এই সংখ্যায়, যার অধিকাংশই জানায় কবিতা নির্বাচনে সম্পাদকদ্বয় আরো একটু মনযোগী হলে ভালো করতেন। আগাগোড়া খুব সুন্দর ছাপা এবং অত্যন্ত রুচিপূর্ণ এই পত্রিকাটি তার পাঠকদের 'সত্তর দশকে'র চরিত্র সম্পর্কে আরো আগ্রহী করে তুলবে।

নবতম্ভা। সম্পাদিকা : সুতপা চক্রবর্তী। দাম ৩·৫০ টাকা।

নরতমার প্রথম সংকলনটি রূপে বেশ বিপুল কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদিকার কৃতিত্ব এই যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন থেকে রচনা ও লেখক নির্বাচন করেছেন তিনি। তাছাড়া, বিষয়-অনুসারে মোটামুটিভাবে যোগ্য লোকই বেছে নিয়ে লেখাতে পেরেছেন। আলোচ্য সংখ্যায় কবিতা সিংহ লিখেছেন সুদীর্ঘ একটি উপন্যাস। বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গিতে উপন্যাসটি বিশেষ আকর্ষণীয়। গল্প লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দিব্যেন্দু পালিত, মতি নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাসের প্রথম দিক ও নারায়ণ চৌধুরীর 'পূর্বাগার আত্মা' নিবন্ধ দুটি মূল্যবান। এ-ছাড়া প্রচুর প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, চলচ্চিত্রপ্রসঙ্গ, নাট্যালোচনা, ব্যঙ্গরচনা ও খেলাধুলো সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। অমিতাভ চৌধুরীর তিনটি ছড়া, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, আলোক সরকার প্রমুখের কবিতা উল্লেখযোগ্য।

সমাজ। সম্পাদক : সৌমেন ভট্টাচার্য। ৩।২৮, অশোক অ্যাভিনু, দুর্গাপুর-৪।

একটি পরিচ্ছন্ন 'লিটল ম্যাগাজিন' বলে আলোচ্য পত্রিকাখানিকে সুপারিশ করা যায়। 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ' বিষয়ক এই ত্রৈমাসিক বিবিধ রচনাবলীর মধ্যে রচয়িতাদের বক্তব্যের বেশ একটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকদের মধ্যে কিছু পরিচিত কিন্তু অধিকাংশই স্বল্প বা অপরিচিত হলেও তাঁদের রচনায় মান পত্রিকাখানিকে মর্যাদা দিয়েছে।

তমসীর। সম্পাদক : অজয় মুখোপাধ্যায় ও রতনকুমার দাস। ৬৪/৩ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বেশ কয়েকটি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও আলোচনা এবং একটি কাব্যনাটক নিয়ে প্রকাশিত এই সাহিত্য সংকলনের প্রথম সংখ্যাটিতে বেশ পরিচ্ছন্ন সম্পাদনার নিদর্শন ছড়ানো। এ-সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলার বিস্মৃত ক্রিকেট অধিনায়ক

(১)

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে যেসব বাঙালী খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলে খ্যাতি অর্জন করেছেন, আধুনিক কালের অনেকেই তাদের নামডাকে চেনে। কার্তিক বসুকে চেনে ক্রিকেটের কোচিং নিয়ে মেতে আছেন বলে। গণেশ বসুকে চেনে জোড়নামে। কমল ভট্টাচার্যকে চেনে সেতার তরংগ কণ্ঠ শুনে। তাছাড়া কমলবাবু ক্রিকেট প্রশাসনেও স্থান করে নিয়েছেন, খেলাধুলো সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় লেখারও রেওয়াজ রেখেছেন। সুটে ব্যানার্জী, মণ্টু ব্যানার্জীকে চেনে যেহেতু তারা টেস্ট খেলোয়াড়। কিন্তু আধুনিক কালের অনেক ক্রিকেট ভক্তও সুশীল বসুকে চেনে না। বোধ করি তাঁর নামও শোনে নি। অথচ একসময় সুশীল বসুর হাতের ব্যাট মারের চাবুক হয়ে উঠেছে। সহজাত ব্যাটিং ক্ষমতার শৌর্য-মিশ্রিত সাবলীল ছন্দে রসজ্ঞ দর্শক মনে সুশীল বসু সৌন্দর্যের শিহরণ জাগিয়েছেন। বাংলা দলের অধিনায়কত্বও করেছেন রণজি ক্রিকেটে। কিন্তু ছোটখাটো মানুষটি বহুদিন আগে ময়দান থেকে চুপিসারে সরে গেছেন। নাম প্রচারে আগ্রহ দেখাননি, প্রশাসনে মাথা গলাননি। তাই সুশীল বসু ক্রিকেট মহলে বিস্মৃতপ্রায় নাম।

ক্রীড়া সাংবাদিকতার সুবাদে সুশীলদার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। ট্রামে চড়ে সান্ধ্যভ্রমণ ওঁর অভ্যাস। আগেও ছিল। বামার লরীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অভ্যাসটা নিত্যদিনে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলেই ক্রিকেট নিয়ে কথা ওঠে। কলমের মাধ্যমে বর্তমানের ক্রিকেট রসিকদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি কয়েকবার। বার বারই এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। সেদিন আবার দেখা হতেই বললাম, আগামী সপ্তাহে আপনার বাড়ি যাচ্ছি। নম্বরটা তো কত?

ক্রিকেটের পরিভাষায় নম্বর বললেন সুশীলবাবু। 'রাস্তার নামটা তো মনে আছে?' বললাম, হ্যাঁ। 'সেঞ্চুরিটা মনে রেখো। তার থেকে একটি বাউন্ডারি বাদ দাও। কত হল?' বললাম, ৯৬। 'এবার একটা শর্টরান যোগ কর। আর টানা পনেরো বারের রনজিৎ চ্যাম্পিয়ন বোম্বাইয়ের কথা মনে রেখো অর্থাৎ ৯৭এর বি হচ্ছে আমার বাড়ির নম্বর।

এভাবে নম্বর বললে কেউ কোনদিন ভোলে না। ক্রিকেটের ভাষায় বাড়ির নম্বর শুনে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক-এর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি তাঁর টেলিফোন নম্বর মনে রাখার ব্যাপারে বলেছিলেন, 'এক্সচেঞ্জটা মনে রাখবেন, আর মনে রাখবেন, আমি 'চারশো-বিশ' অর্থাৎ ফোরটোয়েণ্টি। কিন্তু তিন ডিজিটে তো নম্বর হয় না, ওটাকে ফোর টোয়েণ্টির বদলে ফোর থাউজ্যাণ্ড টোয়েণ্টি করে নেবেন।' বলা বাহুল্য, রসিকতাটি কোনদিন ভুলবার নয়, ৪০২০ টেলিফোন নম্বরও নয়। সাংবাদিকের এক্সচেঞ্জ নম্বর উহ্য রেখে এখন ক্রিকেটারের ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়িতে যাওয়া যাক।

৯৭-বি নম্বরে ঢুকে দেখি, ওঃ হরি! এত বড় ক্রিকেটারের বাড়ি, যে বাড়ির বড় ছেলে প্রদীপ এখন রাজস্থান ক্লাবে নিয়মিত ক্রিকেট খেলছে, সে-বাড়িতে ক্রিকেটের কোন চিহ্ন নেই। দেওয়ালে খেলার একখানি ছবিও না। তার বদলে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনি নিবেদিতা, কাজি নজরুল প্রভৃতির ছবি দেওয়ালে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। সবই হাতে আঁকা ছবি। ছোট ছেলে প্রবাল দরজা খুলে দিয়ে আমাকে বসতে বলেছিল। সুশীলদা ঘরে ঢুকে বললেন, মুকুল, এই আমার ছোট ছেলে প্রবাল। এ বছর গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ করেছে। মহীশূর স্টেট স্কলারশিপও পেয়েছে।

সুশীল বসুর লেটকাট করা ভঙ্গী

বুঝতে কষ্ট হল না কার তুলির টানে দেওয়ালের ছবিগুলি অমন জীবন্ত। সুশীলদা জানালেন, প্রবাল আসলে ভাস্কর। ওগুলি ওর খুব ছোট বয়সের আঁকা। জিজ্ঞাসা করলাম প্রবালের মধ্যে এ 'আর্ট' কোথা থেকে এল? সুশীলদা যাঁকে দেখিয়ে দিলেন, অল্প ঘোমটার আড়ালে তখন তাঁর মুখ লজ্জায় লাল। অর্থাৎ পর্দানশিনী মায়ের কাছেই প্রবালের আঁকার হাতে খড়ি। একবার আমার মনে হল ক্রিকেট মজলিস থেকে সুশীলদার সরে যাবার এটাই বোধ হয় বড় কারণ। অতঃপর আমার মত অ-রসিকের সঙ্গে আর্ট নিয়ে কিছু আলোচনা এবং আর্ট থেকেই ক্রিকেট আর্টের কথা।

সুশীল বসুর ছোট বেলার কথা আমার জানা ছিল না। ধারণা ছিল, যে এরিয়ান ক্লাবে উনিশ-কুড়ি বছর উনি ক্রিকেট খেলেছেন অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে, সেই ক্লাবেই ওঁর ক্রিকেটের হাতে খড়ি হয়েছে এবং দুঃখীরাম মজুমদারই ওঁর শিক্ষাগুরু।

সুশীলদা জানালেন, 'না এরিয়ান ক্লাবে নয়, কাকার (মোহিত বসু) কাছে আমাদের ৪ নম্বর উল্টাডাঙ্গা রোডের পৈত্রিক বাড়িতেই আমার ক্রিকেটের প্রথম পাঠ। বাড়িতেই ছিল ইস্ট ক্লাব নামে একটি ক্লাব। কোচবিহারের কোচ ফ্রাঙ্ক টেরাণ্ট আমার খেলার পরোক্ষ প্রেরণা। কাকা ভাল ক্রিকেটার ছিলেন। ছিলেন টেরাণ্টের মহাভক্ত। ছোট বেলায় ক্রিকেটের নানা গল্প শোনাতেন। আমাদের নিয়ে যেতেন সাহেবদের খেলা দেখাতে। রাজকুমারদের ও কোচবিহার দলের খেলোয়াড়দের খেলা শেখাবার জন্য মহারাজা প্রোফেশনাল কোচ ফ্রাঙ্ক টেরাণ্টকে বিলেত থেকে আনিয়েছিলেন। কোচবিহার দলেও খেলত টেরাণ্ট। অসাধারণ খেলোয়াড় ছিল। যেমন ব্যাটে, তেমন বলে। অসম্ভব ধরনের ধীর বোলার। কিন্তু চাতুরী ছিল ফ্লাইটে। যাকে বলে— 'আকাশে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ'—সেইভাবে ফ্লাইটের ফাঁদে বড় বড় ব্যাটসম্যানকে বেঁধে ফেলত। লক্ষ্য ও নিশানা ছিল অব্যর্থ। আবার ব্যাট করত নিখুঁতভাবে।'

সুশীলদা বললেন, 'কাকার কাছে টেরাণ্টের খেলার অনেক গল্প শুনেছি যাকে ক্রিকেটের অলৌকিক কীর্তি বলা যায়। একবার নাকি মহারাজার সঙ্গে বাজি ধরে নির্ঘাৎ পরাজয়ের মুখ থেকে মহারাজার দলকে জিতিয়ে দিয়েছিল নয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে এবং সেঞ্চুরি করে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—মুকুল

(শট পাট)।

ব্রোঞ্জ—দামোদর সিং (১৫০০ মিটার দৌড়); সতীশ পিল্লাই (লং জাম্প), গোপাল কিন্দুর জ্যাভলিন থ্রো), বাহাদুর সিং (শট পাট), টি সি ইয়োহানান (হপ স্টেপ ও জাম্প), আব্দুল আজিজ, আদ্রিয়ান কেনেডি, কে নটরাজন ও এ পি রামস্বামীকে নিয়ে গড়া রিলে দল (৪×১০০ মিটার রিলে)।

পদক খতিয়ান

	সোনা	রূপো	ব্রোঞ্জ	মোট
জাপান	১৯	৮	৮	৩৫
ভারত	৪	৬	৬	১৬
ফিলিপিনস	৪	৩	৩	১০
তাইওয়ান	২	৬	৭	১৫
দঃ কোরিয়া	২	৩	২	৭
তাইল্যান্ড	২	২	—	৪
ইরান	২	—	২	৪
পাকিস্তান	২	১	—	৩
ইজরায়েল	১	—	১	২
সিঙ্গাপুর	—	৪	৪	৮
মালয়েশিয়া	—	৩	১	৪
ইরাক	—	২	—	২
কম্বোডিয়া	—	—	২	২
নেপাল	—	—	১	১

দুষ্টের ছলের অভাব হয় না

দুষ্টের যে ছলের অভাব হয় না তার প্রমাণ আমাদের ফুটবলের মুরুব্বিরা। আমরা যতই লেখালেখি করি, প্রথম ডিভিশনে দলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং রিটার্ন লীগ বরবাদের ফলে ফুটবলের মান নেমে যাচ্ছে, আর ক্রীড়ামোদীরা যতই চেঁচামেচি করুন প্রথম ডিভিশনে দলের সংখ্যা কমানো হোক, আই এফ এর কর্মকর্তারা ততই বেপরোয়া হয়ে দল বাড়িয়ে চলেছেন।

না হলে, বালি প্রতিভা ও পুলিসের 'মরা' খেলাটিকে আবার বাঁচিয়ে তোলার কেন এই চেষ্টা? আমরা সবাই জানি বালি প্রতিভা দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাবার বিধানে পড়েছে প্রথম ডিভিশন লীগে সর্বশেষ স্থান পেয়ে। কিন্তু পুলিস ও বালির খেলায় রেফারির তথাকথিত ভুল পরিচালনাকে কেন্দ্র করে এখন শালিশীর ব্যবস্থা হচ্ছে কেন? অস্বীকার করছি না, পুলিসের কাছে পরাজয়ের ফলেই বালি দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাবার বিধানে পড়েছে। স্বীকার করছি, রেফারি রিপোর্টও লিখেছিলেন ওই খেলায় ভুল করেছিলেন, কিন্তু কত পরে ওই রিপোর্ট এসেছিল? রিপোর্ট দেবার সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার অনেক পরে। এবং ময়দানের প্রতিটি ঘাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় তাদের মতে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রবল চাপে। আই এফ এর সত্ত্বেও বালিকে বাঁচানো যায়নি আইন ঘটিত কারণে। তাই এখন শালিশীর ব্যবস্থা। প্রকারান্তরে বালিকে প্রথম ডিভিশনে রেখে দল বাড়াবারই প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, আমাদের খবর—বালির সঙ্গে নল, অঙ্গদ প্রভৃতি দলনেতা মিতাদের কোল দিয়ে ফুটবলে রামরাজ্য কায়েমের চেষ্টা চলছে। প্রথম ডিভিশনে আরও দল বাড়াবার পবিত্র ব্রতে আই এফ এ-র মুরুব্বিরা মেতে উঠেছেন।

৮০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্য পদকের অধিকারী শ্রীরাম সিং

ফাঁকা মাঠে গোল

বিশ্ব কাপ ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার খেলায় যোগ্যতা অর্জনের জন্য চিলি ও রাশিয়ার প্লে অব ম্যাচকে কেন্দ্র করে জল অনেক ঘোলা হয়েছে। বোধ হয় আরও কিছু ঘোলা হতে বাকি আছে। ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছি, স্যান্টিয়াগোতে খেলতে অস্বীকার করায় রাশিয়া বিশ্ব কাপ থেকে বাতিল হয়ে গেছে, চিলি মিউনিখের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পেয়েছে।

কিন্তু ওই খেলার খবরগুলি যেমন বিভ্রান্তিকর, তেমনি ফাঁকা মাঠে গোল করে চিলির বিজয়ী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনাও ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত।

নানা রকমের খবর এসেছে। প্রথম খবর এল রাশিয়া স্যান্টিয়াগোতে খেলতে গররাজি, চিলির অন্য শহরে খেলতে পারে। পরের খবর, চিলিতেই রাশিয়ার খেলতে আপত্তি। তার পরের খবর, রাশিয়া খেলা স্থগিতের আবেদন করেছে। ফিফা অন্য কোন শহরে খেলার জন্য দুই দেশের কাছে গোপন সার্কুলার পাঠিয়েছে। আবার খবর এল, চিলি অন্য শহরে খেলতে বা খেলা স্থগিত রাখতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে, গত ২১ নভেম্বর খেলার নির্দিষ্ট তারিখে রাশিয়া খেলার নির্দিষ্ট স্থান স্যান্টিয়াগোতে হাজির না হওয়ায় চিলি ফাঁকা মাঠে একটি গোল করেছে।

কিন্তু ফাঁকা মাঠে গোল করা কেন? ওটা তো গণ্ডগ্রামের ফুটবলের রেওয়াজ। তাও বহু আগের ব্যাপার। আজকাল পল্লী-গ্রামের ফুটবলে অনুপস্থিত দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী সাব্যস্ত হবার জন্য উপস্থিত দলকে ফাঁকা মাঠে গোল করতে হয় না। রেফারির রিপোর্টেই উপস্থিত দল বিজয়ী ঘোষিত হয়। চিলি-রাশিয়া প্লে অব ম্যাচের জন্য নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক প্যানেলের একজন রেফারি ছিলেন। তিনিই কি ফাঁকা মাঠে গোল করিয়েছেন? নাকি রেফারির অনুপস্থিতিতেই চিলি নিজেরা মাঠে নেমে গোল করেছে। যাই হোক, ব্যাপারটি কিন্তু লোক হাসানোর মত। বিশ্ব কাপের খেলায় এমন ঘটনা আশা করা যায় না।

—একলব্য

অরণ্যদেব ★ লী ফক

কেন পিছু ছাড়ব না?
যেহেতু আমি তোমাকে বলছি!
বেশ ছাড়ব না।

কিন্তু আর কতক্ষণ এইভাবে··· এ আবার কেমন পোশাক রে বাবা!
পোশাকের দিকে নজর না-দিয়ে সামনে নজর রাখো!

ওই আমাদের মাল নিয়ে সী-প্লেনটা আসছে!
ডায়ানার প্রথম প্যারা-স্যুটটা না খুললে মুশকিল হবে!
আরে, পিছন-পিছন আর একটা প্লেন আসছে কেন?
4/15

ঠিক জায়গায় এসে গেছি! রেডি!
আমি ঝাঁপ দেব না!
দিতেই হবে!

ব্যাপার কী? ঝাঁপ দেবার জন্যে তুমি এমন জবরদস্তি করছ কেন?
ঝাঁপ তোমাকে দিতেই হবে! এখুনি!

প্লেনটা আর একটু নামাও
অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে!
আমাদের উপরকার ওই প্লেনটা অমন করছে কেন?
এখুনি তোমাকে ঝাঁপ দিতে হবে, ডায়ানা!
দেব না!

মতের
জ

াধ হল প্রথম রাজ্য সরকারের নসংযোগ বিভাগের তরফ থেকে ফিল্ম জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রা হল। ববি চিত্রের মুক্তি জ কাপুর, তাঁর ছেলে ঋষির কাপুর এবং ইউনিটের একাধিক াতায় এসেছিলেন। তথ্য ও বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত র এক চা-চক্রে রাজ কাপুর ও আপ্যায়িত করেন। চলচ্চিত্রশিল্প াগের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সবাই চলচ্চিত্রজগতের নেতৃস্থানীয় কাপুরকে চায়ের পার্টিতে আমন্ত্রণ ু অস্বাভাবিক নয়। বিদেশ থেকে । সংস্কৃতিজগতের বিশেষ কোন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর তরফেও হয়ত নে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সরকারের তথ্যমন্ত্রী এর আগেও ক এসেছেন এমন মান্যগণ্য ব্যক্তিকে করেছেন। সমালোচকরা নামকরা - পরিচালক - অভিনেতা রাজ সম্মান জানানোর ব্যাপারে বিরূদ্ধ প্রকাশ করতে পারেন, কারণ এই প্রথম ঘটল। প্রথম যা ঘটে ক্ষে বিপক্ষে অনেক কিছুই শোনা জ্য সরকারের তথ্য বিভাগ ফিল্মের ও যে যথেষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছেন, এই । প্রতীয়মান, তার মূল্যও কি কম?

• •

ন্দ্রের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী কলকাতায় ত্র তৈরির সম্ভাবনাটি অস্বও খতিয়ে চান এবং এই কারণেই রাজ কাপুরকে । জানিয়েছেন—এমন ধারণাও হতে তথ্যমন্ত্রী রাজ কাপুরের সংগে এ কেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন শান যায়নি। তা ছাড়া, রাজ কাপুর সংবাদিককে স্পষ্টই বলেছেন, আমি াতায় ছবি তৈরির পক্ষপাতী নই। কার স্টুডিওর হাল ভাল নয়, যন্ত্রপাতি সরঞ্জামও তেমন নেই এবং কালার রটরি তো নেই-ই। এই মন্তব্য রাজ র করেছেন তথ্যমন্ত্রীর সামনেই। ার এই জল্পনার এখানেই ইতি।

• • •

কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরি হলে াকার চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণ হতে পারে থিয়োরিটা নির্ভুল কিনা তা নিয়ে াচনার সুযোগ আছে। বাংলা ছবির ভাল পরিচালকরা সকলেই কিন্তু ভাল হিন্দী ছবি বানাতে পারেননি। বাঙালী পরিচালকরা বোমবাইয়ে থেকেই ভাল হিন্দী ছবি তৈরি করছেন। ওই পরিবেশে যেটা সম্ভব এখানকার পরিবেশে হয়ত সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া, বোমবাইয়ে যে বাঙালী পরিচালকরা হিন্দী ছবি বানিয়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিকোণ হিন্দী চিত্রের সংগেই যুক্ত। বোমবাইয়ের সংগে প্রতিযোগিতা করবার মতো কিংবা সারা ভারতে কদর পাবার মতো হিন্দী ছবি তৈরি করতে হলে সম্ভবত একটি বিশেষ মানসিকতার দরকার। অথবা কোন রকম আপসের পথে না গিয়ে বাংলা ছবির মতো করেই হিন্দী ছবি তৈরি করলে সুফল দেখা যেতে পারে। বোমবাইয়ের নামকরা প্রযোজক-পরিচালকরা কলকাতায় এসে ছবি বানালেই যে সমস্যা মিটবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এখানকার কলাকুশলী ও কর্মীরা তাতে কিছুটা লাভবান হতে পারেন, স্টুডিওরও হয়ত লাভ হবে কিন্তু এই প্রচেষ্টা নিয়মিত চলবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। কোন একজন স্টারের তারিখ পাওয়ার সুবিধার জন্য বোমবাইয়ের কোন প্রযোজক কলকাতায় ছবি বানাবার পরিকল্পনা করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি মনে করেন অন্য কলাকুশলী বা শিল্পীরা বোমবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত প্রযোজকের ছবিতে

রাজ কাপুর ও ঋষি কাপুর—কলকাতায় ফটো—সেন

কাজ করতে পারলেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করবেন কিংবা যে-কোন পরিস্থিতিতেই কাজ করতে রাজী হবেন তবে বিরাট ভুল হবে। আত্মসম্মান খুইয়ে তাঁরা কাজ করবেন না। তা ছাড়া বোম্বাইয়ে এমন পরিচালক কে আছেন যাঁর ছবিতে কাজ করতে পেরে তাঁরা আহ্লাদে আটখানা হবেন? সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কখনও-সখনও যাঁরা কাজ করে অভ্যস্ত কিংবা অন্য গুণী পরিচালকের ছবিতে যাঁরা হামেশাই কাজ করেন তাঁদের তো এই মোহ থাকবার কথা নয়। তাই শক্তির দম্ভের কাছে তাঁরা নত হবেন কেন?

প্রেম পর্বত

(আর্ট সেকারস)

রেহানা সুলতানের স্বামী নানা পালসিকর—হিন্দীচিত্রে এই অঘটন হামেশা ঘটে না। প্রেম পর্বত-এর পরিচালক বেদ রাহী গতানুগতিক বিষয়ের ছবি করতে চাননি ঠিকই, কিন্তু নায়িকা রেহানার পরকীয়া প্রেমের ঘটনার মধ্যে বৈশিষ্ট্যও তেমন কিছু নেই। আর দশ জন নায়িকা যে-ভাবে সুদর্শন যুবকের প্রেমে পড়ে কিংবা তাদের প্রণয়কাণ্ড যেরূপ দেখানো হয় এ-ছবিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে রেহানা রোমান্টিক যুবক সতীশ কাউলের কাছে ধরা দেবেন কী দেবেন না তা-নিয়ে কিছুটা দ্বন্দ্ব আছে, কারণ তিনি পরস্ত্রী। শেষ অবধি বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর পর ও'রা অতি সহজেই মিলিত। বৃদ্ধ মরবার আগে স্ত্রীর ব্যভিচারিত্বের কথা জেনে গেছেন এবং ওই মানসিক আঘাতেই তাঁর মৃত্যু। মরবার

"প্রেম পর্বত"/নানা পলসিকর ও রেহানা

আগে তিনি অবশ্য স্ত্রীকে বলেছেন, ... মুক্ত।

ঘটনা সরলীকরণের চেষ্টা ছবি...

গাড়াই রয়েছে, তাছাড়া শারীরচর্চাও হতে পারে। বিবাহিতা হওয়া নিয়ে নানা জটিলতার অবতারণা করতে পারি। যে কারণে বৃদ্ধবয়স্য তরুণী ভার্যা। অবাঞ্ছিত পরিণয় দেখাবার জন্য খলনায়কের (নায়িকার কাকা) শয়তানির দরকার হয়েছে। বিয়ের পর পাহাড়ী অঞ্চলে স্বামীর ঘরে যাওয়ার পরই রেহানার সঙ্গে পর্বতের জঙ্গলে (যে-কারণে ছবির নাম প্রেম পর্বত) সতীশ কাউলের দেখা। ছবিটি সম্পর্কে প্রশংসার কথা এই যে পরিচালক ঘটনা-বিন্যাসে কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাননি। তাঁর পরিমিতিবোধ সর্বত্র লক্ষণীয়। সে-কারণে ছবিটিও দেখতে ভালই লাগে। গান যদিও বেশি তবু সংগীত-পরিচালক জয়দেবের দেওয়া সুরে সুখশ্রাব্য।

"অচেনা অতিথি" (পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস) ছবিতে সুখেন দাস ও স্বরূপ দত্ত

বোম্বাই বিচিত্রা

'ববি' রিলিজ হবার পর হঠাৎ নাকি সব প্রাক্তন নায়িকারা প্রাচীন হয়ে গেছেন', 'ডিম্পলের উদ্দাম উচ্ছলতার ছটায়' নাকি 'সব নায়িকাদের গ্ল্যামার ম্লান', সবাই এখন নতুন নায়িকা খুঁজছেন। অনেক নতুন ছবি শুরু হতে পারছে না নতুন নায়িকার অভাবে। নানা ম্যাগাজিনের কভার পেজ থেকে শুরু করে নানান ধরনের ইনস্টিটিউট, ডানসিং স্কুল, নামকরা রেস্তোরাঁ, নামকরা মেয়েদের কেশ বিন্যাসের দোকান, খ্যাত লেডিজ টেলার্স, সর্বত্র প্রযোজকেরা এবং তাঁদের এজেন্টরা হন্যে হয়ে ঘুরছে 'নতুন ডিম্পলের' খোঁজে; নতুন ডিম্পল পেলেই তাদের ছবি আরম্ভ হয়ে যায়; কিন্তু হচ্ছে না, নতুন ডিম্পলও পাওয়া যাচ্ছে না ছবিও আরম্ভ হচ্ছে না। নামকরা নায়িকারা বিপদ আসন্ন দেখে ছোটোখাটো নায়কদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে, নামকরা নায়করা নতুন মুখের প্রতীক্ষায়, অনেক ছবির নায়ক নির্ধারিত, কিন্তু নায়িকা এখনো নির্বাচিত নয়। এই ধরনের একটি ছবির প্রযোজকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, "এই নিয়ে সাতাসটা নতুন মেয়ে দেখালাম কিন্তু ব্যাটার একটাও পছন্দ হচ্ছে না।" জিগ্যেস করলাম "ব্যাটা টা কে?" ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আবার কে! আমাদের নায়ক!" বললাম, "ও, তা কিরকম মেয়ে খুঁজছেন?" ভদ্রলোক তাঁর নায়ককে কোট করলেন নায়কোচিত ভঙ্গীতেই, "এক্‌জ্যাক্টলি ডিম্পলের মত। ওরকম নায়িকা নাকি এক সেঞ্চুরিতে একটাই হয়।" বললাম, "তাহলে তো আপনার মহা বিপদ, ঘটনাটা যে এত অসম্ভব তা কিন্তু আপনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।" আমি কি বলতে চাইছি সেটা ঠিক বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "খুলে বলুন; খুলে বলুন কী বলতে চাইছেন?" আমি বললাম, "কিছু বলতে চাইছি না, আপনার নায়ক ডিম্পলের মত নায়িকা চাইছে, আর তারই সঙ্গে বলছে ডিম্পলের মত নায়িকা এক সেঞ্চুরিতে একটাই হয়, তার অর্থ কী?" ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন "কী?" বললাম, "ডিম্পলের মত নায়িকা যদি এক সেঞ্চুরিতে একটাই হয় তাহলে আপনাকে আরো এক সেঞ্চুরি অপেক্ষা করতে হবে কেননা এ সেঞ্চুরিতে তো ওরিজিন্যাল ডিম্পলের আবির্ভাব হয়েই গেছে!" ভদ্রলোক দেখলাম আমার বক্তব্য বুঝতে পারলেন, এবং বুঝলাম তিনি আরো গভীর কিছু বুঝেছেন আমার বক্তব্য থেকে কারণ আপাত অঘাত খেয়ে তাঁর মুখাবয়ব ম্লান হলেও ক্ষণিকের মধ্যেই তার চোখ চক্ চক্ করে উঠলো, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ঠিক ধরেছেন তো মশাই, সেজ সুজি অ্যাভয়েড করতে পারছু না বলেই নিশ্চয় এই প্যাঁচটা কষেছে! ভাগ্যিস সকাল সকাল বোঝা গেল নইলে পুরো সেঞ্চুরি অপেক্ষা করতে হোতো।" কি যেন একটা নতুন খুঁজে পেয়ে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, আমার পিঠে সস্নেহ চপেটাঘাত করে বললেন, "তাছাড়া যদি ডিম্পলের মত 'ওয়ান ইন এ সেঞ্চুরি' নায়িকই খুঁজে আনতে পারি তাহলে 'ওয়ান ইন এন ইয়ার' নায়কের পায়ে তেল মাখাতে যাবো কেন? আসলে শালা নতুন নায়িকার ফ্রেশনেসের কাঁধে চড়ে নিজের পজিশন পাকা করতে চাইছে—" হঠাৎ স্বগতোক্তির খাদ থেকে উঠে এসে অসীম কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, "মশাই আপনি একেবারে গড সেণ্ট, সময়, টাকা, খোশামোদ, পরিশ্রম দুশ্চিন্তা সব বেঁচে গেল এই দুর্দিনে যখন সব কিছুর দাম লক লক করে বেড়ে চলেছে তখন যা বাঁচাতে পারেন তাই লাভ। চলুন একটু চা খেয়ে আসি"—উঠলেন ভদ্রলোক।

সরল শর্মা

অথচ সংযুক্তা

(থিয়েটার সেন্টার)

থিয়েটার সেনটারের কিংবা অনন্য তরুণ রায়ের পরিচালনায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক (ও'রা যে একই ব্যক্তি কে না জানেন) যাঁরা দেখেছেন অথচ সংযুক্তা দেখে তাঁরা একটু বিভ্রমে পড়বেন। তরুণ রায়ের তথা ধনঞ্জয় বৈরাগীর শেষের দিকের রাজনীতিক প্রসঙ্গ-সম্বলিত নাটকগুলির বক্তব্য দর্শকের অজানা নয়। অথচ সংযুক্তা তরুণ রায়ের পক্ষে কি পালাবদল? নাটকের শিল্পী তিনজন—তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায় ও দেবরাজ রায়। পরিবারের কনিষ্ঠ শিল্পী দেবরাজ রায় ইতিমধ্যে একাধিক বাংলা ফিল্মে উগ্রপন্থী তরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই জাতীয় ভূমিকায় দেবরাজের এক ধরনের ইমেজ তৈরি হয়েছে। অথচ সংযুক্তা-র দেবরাজ যে ওই ধরনেরই 'এক যুবক সেটা তাঁর ইমেজ-এর সদ্ব্যবহারের জন্য হয়ত নয়। তরুণ রায়ের এই নাটক দেখলে বোঝা যায়, নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট-এর আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে প্রবল ছিল। সেটা প্রথম দর্শনেই

বোঝা যায়, যখন পর্দা ওঠে। বারবনিতার ঘরের সেটটি চমৎকার। ছবি এঁকে মঞ্চ সাজিয়েছেন রঘুনাথ গোস্বামী। ওই সেটেই নাটক অভিনীত, মাত্র একবার বারবনিতা ছাড়া ওই সেটে তরুণ নায়ক রাজার (দেবরাজ) মাকে দেখা গেছে। দীপান্বিতা রায়কে এ-কারণে দুই ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে। রাজার মা ছেলের মুখ থেকে কিছু নির্মম কথা শুনেছেন। রাজা ওই একটি মুহূর্তে তার সদ্য-অর্জিত চিন্তা-ধারা ও প্রত্যয়ের কিছু অংশ মাকে শুনিয়ে দিয়েছে। পিতা-মাতাকে যে সে 'জানোয়ার' বলেছে তাতে জননী স্বভাবতই স্তম্ভিত। রাজার মত ও পথের কথা দর্শক সারাক্ষণই শুনেছেন—কখনও সংলাপে, কখনও কবিতায় (সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ছাড়া কেদার ভাদুড়ির কবিতায়)। কবিতা-সংলাপ এ-নাটকের একটি বিশেষ পরীক্ষা, যার মধ্যে চমক আছে, সমাজ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে নালিশও কম নয়।

বারবনিতা কুসুমের ঘরেই দুদিনের জন্য রাজা আত্মগোপন করতে এসেছে। এখানে থাকাকালীন তার আত্মসমালোচনায় কোন কাজ ছিল না। সে দরজায় টোকা পড়বার অপেক্ষায় ছিল—যখন সহকর্মীরা এসে তাকে অ্যাকশন-এ বেরিয়ে পড়বার জন্য ডাকবে। ওই বারবনিতার ঘরেরই বাসিন্দা টৌরি (তরুণ রায়), একদা যে বিপ্লবী দলে ছিল। টৌরির দরজায়ও টোকা পড়েছিল, সে সাড়া দিতে পারেনি। এই অক্ষমতার স্মৃতি তাকে বরাবর দংশন করে চলেছে।

নাটকটি সংলাপপ্রধান, ঘটনা এতে সামান্য। টৌরি ও কুসুমের কথা তাদের কথাতেই জানা যায়। কুসুম অভিনেত্রী হতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। প্রতিবন্ধক ছিল তার মা। বিপ্লবের দল ছেড়ে টৌরিকে পুলিশের চাকরি নিতে হয়েছিল। সেও তার মায়ের জন্য। এদের অতীত কাহিনী বিন্যাসে নাটকের রস আছে। নিজেদের জীবনের বঞ্চনার কথা দুই শিল্পী তাঁদের অভিনয়-দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। দর্শক তখন স্তব্ধ। তরুণ রায়ের অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের আর এক নজির এই 'অথচ সংযুক্তা'। নাট্যপরিচালক এবং ছদ্মনামে নাট্যকার হিসাবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন কেন রাজার মতো ছেলেরা এই বিপজ্জনক পথে চলে এসেছে। রাজার যন্ত্রণার কিছু কারণও তার মুখ দিয়ে জানানো হয়েছে। নাট্যকার যদি এই কারণগুলিই যথেষ্ট ও সঠিক মনে করে থাকেন তবে দর্শকের কিছুই বলবার নেই। তবে নাট্যকার নিরপেক্ষভাবে এই তরুণের সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন বলা চলে না, বক্তব্যেও তিনি নিরপেক্ষ বা কেবলমাত্র দ্রষ্টা নন। টৌরি শেষ সময়ে রাজাকে প্রেরণা দিয়ে বলেছে সে যেন তার মতো দরজায় টোকা পড়লে থেমে না থাকে। দেবরাজ থামেনি। সে যে থামবার ছেলে নয়, অথচ তার মধ্যে যে কোমলতা আছে (সে, দলের নির্দেশ সত্ত্বেও নিজের

তে খুন করতে পারেনি) এই স্বভাবটি বরাজ রায় সুন্দর অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে কাশ করেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ভাল।

তবে প্রয়োজনা হিসাবে অথচ যন্ত্রা-কে খাটো করবার উপায় নেই। রূপ রায়ের বক্তব্য কেউ গ্রহণ করুন চাই করুন, এই নাটক তাঁর অনেক আগেকার টকের মতো শুধুই বিনোদনের জন্য নয়। -নাটক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও তর্ক-তর্কের অবকাশ বেশী, বেশ ধারালো টক। নাটক রচনায়, বা আঙ্গিকেও াধুনিক বা পরিণত চিন্তার ছাপ আগের য়ে অনেক বেশী। মঞ্চে মাত্র তিনজন শল্পীকে দেখা যায়, কিন্তু অনেকের পস্থিতিই অনুভব করার সুযোগ রেবানিতার বাড়িতে। সেটা পরিচালক নির সদর্থক ব্যবহারে সম্পন্ন করেছেন। ারবানিতার বাড়িতে একটি কুকুর ও টেরি-র অস্তিত্বের ব্যঙ্গাত্মক তুলনার াইডিয়াটিও চমৎকার। নাটকে হাস্যরস এবং নাট্যসৃষ্টির মুহূর্তও অনেক। নাটকের প্রয়োগ ও প্রযোজনায় যে ভাবনা য়েছে তা সুষ্ঠু ও গভীর, অন্য ভাবনা যমনই হোক। তবুও নাটকের কথাই বড়। সেই কারণে একটি প্রশ্নও জাগে—নাটকটি সমকালীন, নাকি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার প্রচেষ্টা?

দক্ষিণীর নষ্টনীড়

দক্ষিণী সংস্থার কর্মধররা প্রধানত সংগীত ও নৃত্যকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেলেও নাটক নিয়েও যে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী এ পরিচয় আগেও পাওয়া গেছে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে তাঁরাই প্রথম রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" গল্পটিকে নাটকাকারে উপস্থিত করেন। এবারে রজত-জয়ন্তী বর্ষে তাঁরা সেই নাটকটিই আবার পরিবেশন করলেন উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে। তবে এবারের কুশীলবগোষ্ঠী নতুন। গত ১১ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে নাটকটি অভিনীত হল।

ভূপতি, চারুলতা এবং অমল এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে যন্ত্রণা ও জটিলতার চিত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে দিয়েছেন তা নাটক দেখে অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। এই জটিল মানসিকতার রূপ নাটকে প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। নাট্যরূপকার আশিস মুখোপাধ্যায় (নির্দেশনাও তাঁরই) সে কাজে যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমন প্রয়োগকর্মেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চারু এবং ভূপতির চিন্তা এবং অনুভূতি তিনি স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন যেখানে আশুতোষ বড়ুয়ার আলোক পরিকল্পনাও খুবই কার্যকরী হয়েছে। তবে পাত্র-পাত্রীদের মুখে সংলাপের অংশ আরও কম করা যেতে পারে কিনা সেটা শ্রীমুখোপাধ্যায় ভেবে দেখবেন। চিন্তার গভীরের সকল অনুভূতি সম্ভবত সংলাপে প্রকাশ করা যায় না। চারুর নিঃসঙ্গতাও সংলাপের মধ্য দিয়ে জানতে হয় দর্শককে।

নাটক মূলত ভূপতির ট্রাজেডি রূপেই উপস্থিত। ওই চরিত্রের অন্তরের হাহাকার এবং যন্ত্রণাময় মানসিকতা আশিস মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ওই চরিত্রের সরলতা, গভীরতা এবং ব্যক্তিত্ব অতি-দক্ষ রূপকারের মতন প্রকাশ করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। চারুর ট্রাজেডি কিন্তু তেমন গভীর ভাবে মনকে স্পর্শ করে না। ওই চরিত্রের শিল্পী এণাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় খারাপ করেননি, দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর অভিনয় তো খুবই ভাল, তবে আরও সূক্ষ্মতার আশা ছিল ওই চরিত্রের কাছে। অমলের চরিত্রে ভীষ্ম গুহঠাকুরতা আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অভিনয় এক মুহূর্তের জন্যও অভিনয় বলে মনে হয়নি। শিল্পী চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। নাটকের অন্য তিনটি চরিত্রের যথাযথ রূপ দিয়েছেন দীপা সুর (মন্দাকিনী), অসিত চট্টোপাধ্যায় (উমাপতি), বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (মতিলাল)।

ভজনের রেকর্ড

গুরু নানকের জন্মতিথি উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানি "গুরু নানক শবদ" বা নানকের ভজনের একটি ই-পি রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। ভজনগুলি গেয়েছেন প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী এম এস শুভলক্ষ্মী। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন তাঁরই কন্যা শ্রীমতী রাধা। সম্প্রতি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে গানগুলি বাজিয়ে শোনানো হয়। চারখানি ভজন (কহে রে বন/প্রভু ম ভজ/ঠাকুর তুম সরনায়/রাম সিমরো) মূলে সুরে ভক্তিভাবের সঙ্গে গেয়েছেন শিল্পী। শ্রোতারা খুবই আনন্দ পাবেন গানগুলি শুনে।

গ্রামোফোন কোম্পানি আরও একটি ভজনের ই-পি রেকর্ড সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। এগুলি গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী শ্যামল মিত্র। তাঁর মুখে ভজন প্রাণ পেয়েছে। রেকর্ডের এক পিঠে আছে কবীরের দুখানি (পানি মেঁ মীন পিয়াসী/কবীর গর্ব ন কীজিয়ে), অপর পিঠে আছে মলুক দাসের একটি (হে যশোদা কী লাল) এবং সুরদাসের একটি (তু গরিব কো নিওয়াজ) ভজন। ভি. বালসারা সুরারোপিত এই চারখানি গান শিল্পী খুব দরদ দিয়ে গেয়েছেন। এ রেকর্ডটিও শ্রোতাদের খুশি করবে।

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসে লক-আউট আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নতুন কাজের শিফট প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কর্মীদের আন্দোলন চলতে থাকায় ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইনসে লক-আউট ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর চেয়ারম্যান এয়ার চীফ মারশাল পি সি লাল লক-আউটের কারণ সম্পর্কে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন: এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বজায় রেখে বিমান চালানো আর সম্ভব ছিল না। তিনি কর্মীদের দলবদ্ধভাবে কাজকর্মে বাধাদানের কথাও বলেন। তিনি বলতে পারেন না কবে এই লক-আউট তুলে নেওয়া হতে পারে। একমাত্র ইউনিয়ন যদি এগিয়ে আসেন এবং বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেন তবেই তা হতে পারে—এখন নির্ভর করছে তাঁদের উপর। তবে নতুন শিফট চালু করতে কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। লক-আউট ঘোষণার কেল ঘণ্টা পরে এক বেতার সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শ্রীর জবাহাদুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরু করার জন্য কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আলোচনার দরজা এখনও খোলা আছে। শ্রীলাল বলেন, কিছু এক্জিকিউটিভ পাইলটের সহায্যে সীমিত সংখ্যক বিমান চালানো যেতে পারে কিন্তু তাও তড়তাড়ি সম্ভব হবে না। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, তাঁরা যা করছেন তার পেছনে সুস্পষ্ট নীতি আছে। কলকাতা থেকে আগরতলা পর্যন্ত যত বেশী সম্ভব ফ্লাইট চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন সিটি অফিস থেকে টিকিট ফেরত দেওয়া হচ্ছে।

দেশী সংবাদ

১৯ **নভেম্বর**—রাজ্য সরকারের খাদ্য দফতর এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য করপোরেশনের অবহেলা ও অব্যবস্থায় কাশীপুরে এফ সি আই গুদামে লক্ষ লক্ষ টাকার চিনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোক গত তিন সপ্তাহ ধরে রেশন দোকানে চিনি না পেয়ে খোলা বাজারে চড়া দরে তা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

নিমতলা শ্মশানে দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির কাজ শেষ। এখন থেকে শুধু লোক নিয়োগের অপেক্ষা। খরচ পড়েছে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা। পৌরসভার সচিব শ্রীশৈলজানন্দ ভট্টাচার্য জানান, কেওড়াতলা শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিটি মেরামত করে আবার চালু হয়েছে।

২০ **নভেম্বর**—সাড়ে দুলাখ টাকা দামের চিনি ফুড করপোরেশনের কাশীপুরের গুদামে গলে জল হয়ে যাচ্ছে। চিনির রসে গুদামের মেঝেতে পা রাখা দায় অথচ রেশনে চিনি নেই। রেশনে চাল গমের বরাদ্দ কমানো হয়েছে। ওদিকে কাশীপুরের গুদামে শত শত বস্তা চাল গম পচছে। বেওয়ারিশ মালে ছাতলা পড়ে গিয়েছে, তবু রেশন দোকানে চালান দেওয়া হয়নি। দেড় লাখ টাকা মূল্যের ডাল একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গুদামের কর্মচারীরা জানেন না, এই ডালের আদৌ কোন গতি হবে কিনা।

২১ **নভেম্বর**—গত দুমাসে কলকাতার বাজারে সরষের তেল ও বীজের চালান বেড়েছে তিনগুণ, অথচ দাম কমেনি এক পয়সাও। বরং কিলো পিছু গড়ে দু টাকা দাম বেড়ে গিয়েছে। এক শ্রেণীর মিল মালিক যাঁরা একই সঙ্গে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বীজের বাজার ও কলকাতার তেলকলগুলি কব্জা করে রেখেছেন, তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেল নিয়ে ফাটকা খেলছেন।

লোকসভায় আজ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। একমাত্র সি পি আই ছাড়া আর সব বিরোধী দল প্রস্তাব সমর্থন করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তাব করেন যে আলোচনা এখনই হোক।

১২ **নভেম্বর**—দশ পয়সা পর্যন্ত বাস ভাড়া প্রত্যেক স্টেজে পাঁচ পয়সা করে। এই বর্ধিত হার স্টেট ও প্রাইভেট উভয় বাসের

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কলকাতা ও চব্বিশ পরগনার বাস ভাড়া বৃদ্ধি অনুমোদনের জন্য আর টি এর বৈঠক আজ বসছে। তাঁরাই ঠিক করে দেবেন কবে থেকে বর্ধিত ভাড়া বলবৎ হবে।

হাওড়ায় সাঁকরাইল থানা এলাকায় বালি রোডের উপর বুধবার এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতেরা দুজনকে আহত করে সব আরোহীদের মোটর থেকে নামিয়ে দেয়। পরে আরোহীদের একটি বন্দুক, কিছু কারতুজ ও মোটর গাড়িটি নিয়ে উধাও হয়। পুলিশ মাল-পত্র এবং ডাকাতদের কোন সন্ধান পান নি।

২৩ **নভেম্বর**—সিনেমার টিকিটের লাইনে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে ১৮ বছরের এক তরুণের জীবনান্ত ঘটে। লেক টাউনের সিনেমা হলে এদিন থেকেই একটি হিন্দী চিত্র শুরু হয়েছে। এই তরুণটি টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছিল। অত্যধিক ভিড়ের চাপে লাইন থেকে ছিটকে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পয়লা ডিসেম্বর থেকে কলকাতা ও চব্বিশ পরগনায় স্টেট বাস ও বেসরকারী বাসের ভাড়া প্রতি স্টেজে পাঁচ পয়সা করে বাড়ছে। কলকাতা আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের বৈঠকে ভাড়া বাড়ানোর এই দিন ধার্য করা হয়। বাণিজ্যিক কমিশনার হাওড়া অঞ্চলের ভাড়া বাড়ানোর সুপারিশও করেছেন।

২৫ **নভেম্বর**—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যপালদের সামরিক সেক্রেটারি ও এডিকং না রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এ প্রথা একটা জাকজমকের প্রতীক। শ্রীমতী গান্ধী বলেন রাজ্যপালরা রাজভবন ছেড়ে ছোট বাড়িতে যান তিনি তা চান না।

রাঁচির সেন্ট এলয়সিস স্কুলের একটি ছাত্র অঙ্ক কষার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যন্ত্রটি সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। দেখে সবাই তার বুদ্ধির তারিফ করেছেন। বিহারের দুটি স্কুলের তিনজন ছাত্র ও একজন শিক্ষক সম্প্রতি তিনটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। পূর্বোক্ত ছাত্রের অঙ্ক কষার যন্ত্রটি তার অন্যতম।

২৫ **নভেম্বর**—হাওড়ায় বিভিন্ন সরকারী দুধ বিক্রয় কেন্দ্রের বরাদ্দ দুধ নিয়ে কালো-বাজারে বিক্রির অভিযোগে হাওড়া পুলিশ আজ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে চারজন দুগ্ধ বিভাগের কর্মী। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, হাওড়া আদালতের মধ্যে একটি সরকারী দুধ বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ দুধ কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে, এই খবর পেয়ে দুগ্ধ দফতরের ভিজিলেন্স বিভাগ নজর রাখেন।

বিদেশী সংবাদ

১৯ **নভেম্বর**—এথেন্স-এ রক্তাক্ত সংঘর্ষে দুশ নিহত ও দুশ আহত হয়েছে বলে প্যান হেলেনিক মুক্তি আন্দোলনের ইটালিয়ান সেল জানিয়েছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্যাপাডো পোলস জুন্টার বিরোধে গ্রীক ছাত্রদের ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের আবেদন জানানো হয়।

২০ **নভেম্বর**—বাংলাদেশ সরকার এ টি দেবের অভিধানের বিক্রয় ও প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। গতকাল ওই আদেশ দেওয়া হয়েছে। সরকার মনে করেন, দেশের নিরাপত্তা ও সার্ব-ভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর বিষয় ওই অভিধানে রয়েছে।

২১ **নভেম্বর**— পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো সম্প্রতি ক্রিশ্চয়ান সায়েন্স মনিটার পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সর-বরাহ করতে অস্বীকার করে তাহলে পাকিস্তান 'আরব বন্ধুদের' কাছ থেকে টাকা নিয়ে অন্য জায়গা থেকে অস্ত্র কিনবে।

২২ **নভেম্বর**—ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া বাণিজ্যের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক ও কারি-গরী সহযোগিতার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দুদেশের মধ্যে ১৯৬৪ সালে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল, নতুন চুক্তি এল সেই স্থানে। এর ফলে প্রতিটি দেশ তাঁদের ৫৯টি উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দেশে পাঠাতে পারবে।

২৩ **নভেম্বর**—পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির শর্ত অনুযায়ী মিশর ও ইজরায়েলের সৈন্য সরানো বিষয়ে দুই পক্ষের প্রতিনিধি-দের মধ্যে আজ নিকটবর্তী সুয়েজ এলাকায় এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী জানান।

২৪ **নভেম্বর**—গতকাল লনডনে অনুষ্ঠিত এবারকার বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্যা মারজোরি ওয়ালেস (১৯) বিশ্ব সুন্দরী হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছেন ফিলিপিনস-এর ১৮ বছর বয়স্কা কুমারী ইভানজেলিন পাসকুয়াল। তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন জামাইকার ২১ বৎসর বয়স্কা প্যাট্রিসিয়া ইয়েমেন।

২৫ **নভেম্বর**—রেডিও কাবুল পেশোয়ার থেকে একটি খবরে বলেন, সম্প্রতি পাকি-স্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সফরে যান, তখন ইসলামাবাদে বিরোধীরা তাঁর বিমান লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

দেশ
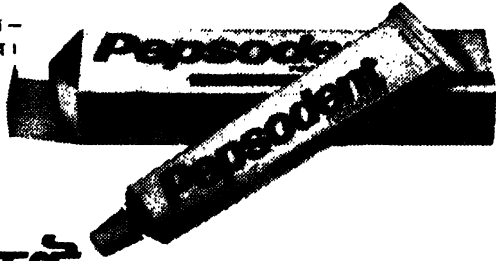
৩৪ বর্ষ] শনিবার, ১ পৌষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 17th December, 1966 মূল্য—৫০ পয়সা [সংখ্যা ৭

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা ১৪৲
অনেক আগে অনেক দূরে ৪৷৷
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷
গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲
নিকৃষ্ট গল্প ৫৲
মাইকেল মধুসূদন ৪৲
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ১০৲
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৷৷
চিত্র ও চরিত্র ৬৲

হংসমিথুন	২৲
প্রাচীন আসামী হইতে	৪৲

রবীন্দ্রসরণী ১০৲
বঙ্কিমসরণী যন্ত্রস্থ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ
১ম ৭৲ ২য় ৭৲

প্রশান্ত চৌধুরীর

আলোকের বন্দরে	৪৷৷৹
কান পেতে শুনি	৫৲
নদী থেকে সাগরে	৮৲
ঘণ্টাফটক	৪৲
ডাকো নতুন নামে	৪৲

বিমল করের

সীমারেখা	৪৷৷৹
পান্থশালা	৩৷৷৹
জীবনায়ন	৫৲
পরবাস	৪৷৷৹
খোয়াই	৩৲

বিমল মিত্রের

একক দশক শতক ১৪৲
কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম—১৬৲ ; ২য় ১৬৲
শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲
বেনারসী ৫৷৷

মনোজ বসুর

সাজবদল ৫৷৷
বন কেটে বসত ১০৲
গল্পপঞ্চাশৎ ১০৲

মহাশ্বেতা দেবীর

বায়স্কোপের বাক্স	৬৷৷৹
আঁধারমানিক	১২৷৷৹
অজানা	৪৷৷৹

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

পরমাত্মীয়া	৫৷৷৹
কাঞ্চনময়ী	৬৲
দূরের মিছিল	৫৲

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজীনীলা	৭৲
বাঁকা স্রোত	৬৷৷৹
সোহাগরাত	৪৲
অহল্যার স্বর্গ	৩৲
ছায়াসঙ্গিনী	২৸৹
জটিলতা	২৸৹
জায়া ও জননী	৫৲
নীলাঞ্জনা	৭৷৷৹
পরপূর্বা	৪৷৷৹
সর্বংসহা	৫৲
শ্রেষ্ঠ গল্প	৫৲
রোশনাই	৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ক্লান্তবিহঙ্গী ১১৲
আরাকান ৫৲
ইরাবতী ৪৷৷
উপকূল ৩৲
চন্দনবাঈ ৫৲
তরঙ্গের পর ৫৲
মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲
সপ্তকন্যার কাহিনী ৩৷৷
শহরেবন্দরে ৪৷৷

৷৷ রচনা সম্ভার ৷৷
প্রমথনাথ বিশী
সম্পাদিত

কান্তকবি রচনাসম্ভার	১০৲
গিরিশ রচনাসম্ভার	১০৲
দ্বিজেন্দ্র রচনাসম্ভার	১২৷৷৹
বঙ্কিম রচনাসম্ভার	১২৷৷৹
বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার	১০৲
ত্রৈলোক্য রচনাসম্ভার	১০৲
বিহারীলাল রচনাসম্ভার	১০৲
ভূদেব রচনাসম্ভার	১০৲
মাইকেল রচনাসম্ভার	১০৲
রমেশ রচনাসম্ভার	১০৲

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন

কাব্যমালঞ্চ ৬৲
৷৷ নূতন মুদ্রণ ৷৷

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

যতীন্দ্র কাব্যসম্ভার	১২৷৷৹

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদঃ শ্রীসুধাজিৎ সেনগুপ্ত

জেনসলিন প্লাস্টিক ওয়াল ফিনিশ'এ

যা খরচ পড়ে, তা তেলরঙে দেওয়াল রঙ করার মতই সামান্য, অথচ এর রঙের জলুস অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেকবার ধুলেও নষ্ট হয় না।

শোভাবর্দ্ধক খাঁটি প্লাস্টিক এর আগে এতটা এত কম দামে কখনও পাননি।

এরচেয়েও বড় কথা, জেনসলিন ওয়াল ফিনিশ'এ এমন একটি প্লাস্টিক উপাদান আছে যার ফলে এর রঙের জলুস বাড়ে ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, বারে বারে ঘষামাজা বা ধোয়ামোছা করলেও তা নষ্ট হয় না।

এখন থেকে ১৫ রকম সুন্দর রঙে জেনসলিন প্লাস্টিক ওয়াল ফিনিশ নিকটতম রঙের দোকানে চাইলেই পাবেন—দাম এমনতর যা সাধারণের সাধ্যে কুলোয়।

আপনার ঘরের দেওয়ালের শোভাবর্দ্ধন করুন এই যুগান্তরকারী প্লাস্টিক ফিনিশ দিয়ে, যা গুণের দিক থেকে যেমন বিস্ময়কর, দামের দিক থেকেও তেমনি।

প্রস্তুত করেছেন : **জেনসন এণ্ড নিকল্‌সন**, বাজারের সেরা রবিয়্যালাক'এর প্রস্তুতকারক।

জেনসন এণ্ড নিকলসন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, ২২৫, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা

জি, এন, বোদোলোই রোড, আমবাড়ী, গৌহাটি।

প্রকাশিত হল

বিমল করের

নতুন উপন্যাস

পরিচয়

দাম ৪·০০

পূজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে হাজারিবাগ বেড়াতে যাচ্ছে প্রায় অভিভাবকহীন একটি ছোট দল, যে দলে আছে তিনটি যুবক, দুটি যুবতী আর একটি কিশোরী। বাঁধনছাড়া, স্বচ্ছন্দ, উচ্ছল। ট্রেনে পরিচয় হল এক স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে—ভদ্রলোক প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত, সুখী ও পরিতৃপ্ত। ভদ্রমহিলা স্নেহপরায়ণা [illegible]। হাজারিবাগে পৌঁছল তারা, উঠল কাছাকাছি বাড়িতে। ক'দিনের আনন্দকলহাস্য—কিন্তু এরই মধ্যে স্মৃতিসুখ দুঃখতাড়িত আশ্চর্য এক নাটক যেন অভিনীত হয়ে যায় পাঠকের চোখের সামনে। "পরিচয়" নিছক প্রেমের উপন্যাস নয়, বিচিত্র জীবনের নেপথ্যলোকের উপাখ্যান। বিমল করের মধুর ও বিস্ময়কারী রচনাশক্তি এতে নতুন তাৎপর্য যুক্ত করেছে। এরকম প্রাণবান রচনা ইদানীং প্রায় দুর্লভ বলা চলে।

● সদ্য প্রকাশিত আরও গ্রন্থ ●

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর

বাংলার লৌকিক দেবতা ৬·০০

এ গ্রন্থটিতে দক্ষিণরায়, মানিকপীর, ওলাবিবি, পাঁচুঠাকুর, বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দ, জাদু, মাকাল, টুসু, ষেটু, উত্তরবাহিনী, রক্ষাকালী প্রমুখ কয়েকটি লৌকিক দেবতার মূর্তি বা প্রতীক, পূজাপদ্ধতি, পূজক সম্প্রদায়, মাহাত্ম্য বা এঁদের সম্বন্ধে লোকপ্রচলিত কাহিনী, কোন্ কোন্ অঞ্চলে এঁরা পূজিত এবং ভারতবর্ষের আর কোন্ অঞ্চলের লৌকিক দেবতার সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য বর্তমান প্রভৃতির বিবরণ এঁদের মূর্তি বা প্রতীকের চিত্র সহ বিবৃত হয়েছে।

বিমল মিত্রের

উপন্যাস

চলো কলকাতা

একদিন আগে কালীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি ছিল পাথুরিয়াঘাটায়। সেখানে কাপালিকরা কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিত। পরে দেবীকে তারা কালীঘাটে স্থানান্তরিত করে। এখন আর সেই পাথুরিয়াঘাটা সেই কালীঘাট সেরকম নেই।

কিন্তু না, আছে। সেই কলকাতাও আছে, আর আছে সেই কাপালিকরাও। এখন আর কাপালিকদের গেরুয়া বসন নেই—এখন তাদের অন্য পোশাক, অন্য আকৃতি। এখনও তারা নরবলি দেয়। "চলো কলকাতা" সেই নরবলির রক্তাক্ত কাহিনী।

দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

উপন্যাস

আত্মপ্রকাশ

তরুণ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রথম মৌল উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ"-এ অদ্ভুত নৈপুণ্য এবং অনুপম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমকালের অস্থির, বিভ্রান্ত, বিপথগামী যুবমানসের অসহায়তা, বেদনা, সুস্থ আত্মপ্রকাশের আকুল আর্তি প্রতিফলিত করেছেন। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, দুঃসাহসিকতায় অগ্রণী যৌবন কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করার কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে মহৎ আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে করতে ছুটে চলেছে আত্মঘাতের পথে, দেখে পাঠক শিউরে উঠবেন।

দাম ৬·৮০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ
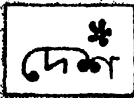
৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭
শনিবার ১ পৌষ ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

টেলিফোন
২৩-২২৪০ ২৩-৮৫৪১

Saturday 17 Dec 1966

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পর

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাস্থানে অশান্ত প্রেতের দৃষ্টি অনেকদিনই পড়েছে, আপাতত মনে হচ্ছে তার পদ-প্রভাব কলকাতায়। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে, যে কলেজটি নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত সেই সরকারী প্রেসিডেন্সি কলেজও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন, অন্যান্য কলেজগুলি তো খোলা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সেখানে অন্তত চলছে। আসলে সব কলেজেই উত্তেজনার মাত্রা তীব্র এবং ছাত্র মিছিলের দাপটে ঠিক মতন কলেজ চালানো যাচ্ছে না; যদি এই সব কলেজও অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে আশ্চর্য হবার কারণ থাকবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার ব্যাপারটিকে ঐতিহাসিক বলা হয়েছে। সেদিক থেকে এই ঐতিহাসিক কীর্তির সম্মান যাদের প্রাপ্য তারা হয়ত ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ফলে সাধারণ হিসেবে দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] দুশ্চিন্তার বিষয় হল। তবু বেতন পাওয়ার সমস্যাটি হয়ত কোনোরকমে মেটানো যেতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের ক্ষতির মাসুল কে দেবে? উদাহরণস্বরূপ এম বি বি এস পরীক্ষার কথা ধরা যেতে পারে, ধরা যেতে পারে এম-এ, এম এস-সি প্রভৃতি পরীক্ষার্থীদের কথা। এভাবে আরও বহু পরীক্ষার এবং পরীক্ষার্থীদের কথা তুললে দেখা যাবে ছাত্রসমাজের একাংশের অশেষ ক্ষতিসাধন হল। তার ভোগ একমাত্র পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদেরই ভুগতে হবে। আর তার ফলে যে সমস্যা ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে তার গুরুত্বও কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার ব্যাপারটিকে অনেকেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দাবি যেরকম সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তাতে সিন্ডিকেট আর কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? দীর্ঘদিন তাঁরা ছাত্রদের শুভবুদ্ধির জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের আচরণও ক্রমশ দুঃখজনক হয়ে উঠছে। যেভাবে ওই কলেজের অধ্যক্ষকে অন্যত্র থেকে কলেজে টেনে এনে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়; যেভাবে উন্মত্ত ছাত্রদল ওই কলেজের বিজ্ঞান-গবেষণাগার ভেঙে তছনছ করেছে তাতে মনে হয় না, কোনো কলেজের ছাত্র নিজের কলেজের এমন ক্ষতিসাধন করতে পারে। কার স্বার্থে এই উন্মত্ত আচরণ? অথবা ধরে নিতে হবে, ছাত্রদল মনে করেন, কলেজ-ল্যাবরেটরি ভেঙে ফেলার মধ্যে 'সংগ্রামী কৃতিত্ব' আছে?

কয়েকজন ছাত্রের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে এই অশান্তি সৃষ্টি করে রাখার মধ্যে ছাত্র সম্প্রদায়ের কি স্বার্থ আছে জানি না। অল্প কয়েকজনের জন্য যারা এত অস্থির তারা কেন শত শত ছাত্রের কথা ভাবে না? প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকটি ছাত্রের সমস্যাকে যদি সমস্ত ছাত্রজগতের সমস্যা বলে ধরে নিতে হয় তবে বলার কিছু নেই; এবং ধরে নিতে হবে একালে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে স্বৈরাচারের ওপর। আমরা মনে করি, যতদিন ছাত্রেরা মনে করবে তাদের প্রতি শিক্ষকদের আচরণ [illegible] ভিত্তিহীন, ততদিন তাদের প্রতি মুহূর্তে অভিযোগ থাকবে। কিন্তু আমরা মনে করি না, সাধারণত কোনো শিক্ষকই তাঁদের ছাত্রের প্রতি এ-ধরনের মনোভাব পোষণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতি তাঁর ছাত্রদের আচরণ যদি এই হয়, তবে সন্দেহ হয় যে-জল এতো গড়িয়ে এসেছে সেই জলে যথেষ্ট বেগ ছিল।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলকাতার পথে পথে যে ধ্বনি দিয়েছে তার মধ্যে শিক্ষার জন্য ব্যাকুলতা কতটুকু ছিল তা আমরা জানি না, তবে "লাল সেলাম"-এর দাপট ছিল। "লাল সেলাম"-এর সঙ্গে কলেজের যে কি সম্পর্ক তা আমরা বুঝি না। প্রসঙ্গত বলি, যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতি অশিষ্ট আচরণ প্রকাশ করা হয়, এবং যেদিন ওই কলেজের ল্যাবরেটরিতে হানা দেওয়া হয়—এই দু দিনই পথচারীরা ছাত্রদের মুখে যেসব সম্ভাষণ ও উক্তি শুনেছেন, তা কখনই ছাত্রদের মর্যাদা প্রকাশ করে না। সন্দেহ হয়, যারা যথার্থ ছাত্র, তারা ওই বিক্ষোভের মধ্যে কতটুকু অংশ নিয়েছিল। বিক্ষোভ জানানোর রীতি, অন্তত ছাত্রদের ক্ষেত্রে শিষ্ট হলেই আমরা খুশী হই।

যাই হোক, সাম্প্রতিক ছাত্র-বিক্ষোভ যে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই উদ্বেগের প্রধান কারণ, বিক্ষোভের নামে গোটা আন্দোলনটিই বিপথে চলেছে। তাতে শিক্ষা বা ছাত্র কোনো দিকেরই মঙ্গল হবে না।

রোডেশিয়ার ব্যাপারে বৃটিশ ভণ্ডাম

রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন প্রয়োগ করার জন্যে ইউ এন-এর নিকট বৃটিশ আবেদনের মুখ্য তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ইংরেজ ইংরেজের গায়ে হাত দেবে না এবং আর কেউ যাতে হাত দিতে না পারে, তার জন্যে এমন কোনো ফাঁকিবাজি নেই, যা বৃটিশ গবর্নমেণ্ট করতে প্রস্তুত নন। নরম স্যাংশন দিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোডেশিয়ার "বিদ্রোহী" স্মিথ গবর্নমেণ্টকে কাবু করে ফেলা যাবে এই স্তোকবাক্য দিয়ে উইলসন সাহেব কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের এক বছর বোকা বানিয়ে রেখেছিলেন। সত্যি সত্যি বোকা কেউ বনেন নি। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে দু-একজন খোলাখুলি বৃটিশ গবর্নমেণ্টের ফাঁকিবাজির বিরুদ্ধে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিছু সময়ের জন্যে এমন অবস্থাও হয়েছিল যে, কমনওয়েলথ বুঝি ভেঙে গেল। কিন্তু বেশীর ভাগ দেশের প্রতিনিধিরা তত দূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে আরো সময় দেওয়া হল। কনফারেন্স উইলসন সাহেবের দ্বারা কতকগুলি প্রতিশ্রুতি স্বীকার করিয়ে নিয়ে এরূপ বিশ্বাস করার ভান করলেন যে তাতে কাজ হবে। রূঢ় সত্যকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধিরা স্টেট্সম্যানশিপ দেখালেন। ভারত গবর্নমেণ্টও সেই দলে ছিলেন।

আসল কথা হচ্ছে যে, মাথা ধরতে অনেকেই প্রস্তুত নয়। রোডেশিয়ার স্মিথ কোম্পানিকে না সরালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো আদমিদের ন্যায্য অধিকার লাভ অসম্ভব। কেবল স্যাংশনের দ্বারা স্মিথ কোম্পানিকে সরানো যাবে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না, সেইজন্যে নিছক ভণ্ডামির অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্যে মুখে বলা হচ্ছে, দরকার হলে স্মিথ কোম্পানিকে সরাবার জন্যে বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে বলপ্রয়োগ করতে হবে, যদিও কারো মনেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সাদা জাতভাইদের গায়ে কখনো হাত তুলবেন না। জেনে-শুনে ধোঁকা খাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ কমনওয়েলথ দেশগুলির এগোবার মত সাহস নেই, শক্তিও নেই। বলপ্রয়োগ ছাড়া স্মিথ কোম্পানিকে সরানো সম্ভব নয় বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং যাঁরা এও জানেন যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট বলপ্রয়োগ করবেন না, তাঁরা যদি কিছু করতে চান, তা হলে বিকল্প বলপ্রয়োগের ব্যবস্থার দিকে তাঁদের এগোতে হয়। সেটি কারো হিসেবে কুলোচ্ছে না। অন্যদের কথা ছেড়ে দিই, দু-একটি ছাড়া আফ্রিকান দেশগুলিরও সেদিকে এগোবার উৎসাহ নেই। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এর পুরো মাত্রায় সুযোগ নিচ্ছেন।

কমনওয়েলথ কনফারেন্স বৃটিশ গবর্নমেণ্টকে দিয়ে যে প্রতিশ্রুতিগুলি স্বীকার করিয়ে নিয়েছিল, সেগুলির তাৎপর্যটুকুও স্মিথ কোম্পানি মানতে রাজী নয়। স্মিথের মুখদর্শন করব না বলে উইলসন সাহেব গোঁ ধরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে বৃটিশ রণতরীতে স্মিথ-উইলসনের নাটকীয় সাক্ষাৎকার হল। একটা মিটমাটের ভিত্তির খসড়াও তৈরী হল, ঠিক হল দুজনে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গিয়ে স্ব স্ব ক্যাবিনেটের মত গ্রহণ করবেন। উইলসন সাহেবের ক্যাবিনেটের অনুমোদন পাওয়া গেল, কিন্তু সল্সবেরি থেকে সাফ জবাব এল—রাজী নই। সুতরাং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিকে সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে উপস্থিত হতে হল রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যানডেটরী স্যাংশনের আবেদন নিয়ে। ম্যানডেটরী স্যাংশনের দ্বারা স্মিথ কোম্পানিকে ভূপাতিত করার আশার চেয়ে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের বড় লক্ষ্য হচ্ছে, রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে আর কেউ যেন বলপ্রয়োগ করতে না পারে। কোর্টে মামলা দায়ের করে ইনজাংশন নিয়ে বিচারাধীন সম্পত্তিতে অন্যের হস্তক্ষেপ ঠেকানো যেমন, এটাও অনেকটা তেমনি ব্যাপার।

বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন প্রয়োগের আবেদন নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে যাওয়ার মতো বিচিত্র হাস্যকর কিছু ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। রোডেশিয়া আইনত বৃটিশ রাজ্য। বৃটিশ আইনের চক্ষে স্মিথ সরকার সরকারই নয়, বিদ্রোহী সংস্থা। স্মিথ কোম্পানির স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে, বৃটিশ রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বৃটেন মনে করে। এ বিষয়ে বৃটেনের দ্বিমত নেই। বৃটিশ গবর্নমেণ্টের বিদ্রোহী সুতরাং বিদ্রোহের দমন করার দায়িত্ব বৃটিশ গবর্নমেণ্টেরই। কোনো রাজ্যের অংশবিশেষের অধিবাসীদের একদল যদি বিদ্রোহী হয়, তবে তাদের দমন করার জন্যে সিকিউরিটি কাউন্সিলকে স্যাংশন জারি করার জন্যে আবেদন কোন বিধির মধ্যে পড়ে? রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্যাংশন জারির দ্বারা স্মিথ "সরকারের" স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে নাকি? স্মিথ সাহেব এই প্রশ্নটি তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে স্যাংশন জারি করার অর্থ হবে রোডেশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তাকে স্বীকার করে নেওয়া। কোনো অরাজক ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে স্যাংশন হয় না, স্যাংশন হয় অন্যায়কারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে। স্মিথ কোম্পানি নরম স্যাংশন ব্যর্থ করে দিয়েছে, যদি ম্যানডেটরী স্যাংশনও ব্যর্থ হয়, যার সম্ভাবনা খুবই বেশী, তা হলে এই স্যাংশনের আনুষঙ্গিক নীট ফল হবে এই যে, "স্বাধীন রোডেশিয়া"র কার্যত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ হবে।

বৃটিশ গবর্নমেণ্ট সহজেই বলপ্রয়োগের দ্বারা স্মিথ কোম্পানির বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন, যেটা তাঁদের কর্তব্য ছিল। তা না করে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট স্যাংশনের হুজুগ তুলে এক দিকে স্মিথ কোম্পানির অন্যের দ্বারা আহত হবার সম্ভাবনাকে নিবারিত করলেন এবং অন্য দিকে রোডেশিয়ার বে-আইনী স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথ সহজ করে দিলেন।

রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট কেন বলপ্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন, তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরা যে ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার তুলনা বিরল। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট অহিংসা-পন্থী নন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ হাতছাড়া হয়ে গেলেও তখনও যেখানে যেখানে বৃটিশ কলোনিয়াল স্বার্থের আস্তানা আছে, সেখানেই বৃটিশ গবর্নমেণ্ট নিজের অর্থনৈতিক শক্তির সীমানা ছাড়িয়েও ছোটোবড়ো সামরিক ঘাঁটি রেখেছেন। রোডেশিয়ার বিদ্রোহী জাতভাইদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করার সাফাই গাইবার সময়ে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের বোমাবন্দুক সরবে চলছে।

ম্যানডেটরী স্যাংশন কতখানি সফল হবে, তার পূর্বাভাষ বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কথা থেকেই পাওয়া যায়। স্যাংশনের প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ গবর্নমেণ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন যে, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট কিন্তু দক্ষিণ

কবীর এক
সর্ব ভারতীয় দল
গড়েছেন।
আমিও এক নেতা
ডাঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে বাম ও দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা বাঙলা দেশে সমঝোতায় আসতে পারেনি।
ঝামেলা আসন নিয়ে
পরাজিত কৃষ্ণন।

সুনন্দর জার্নাল

'একটি মৃদু প্রতিবাদ'
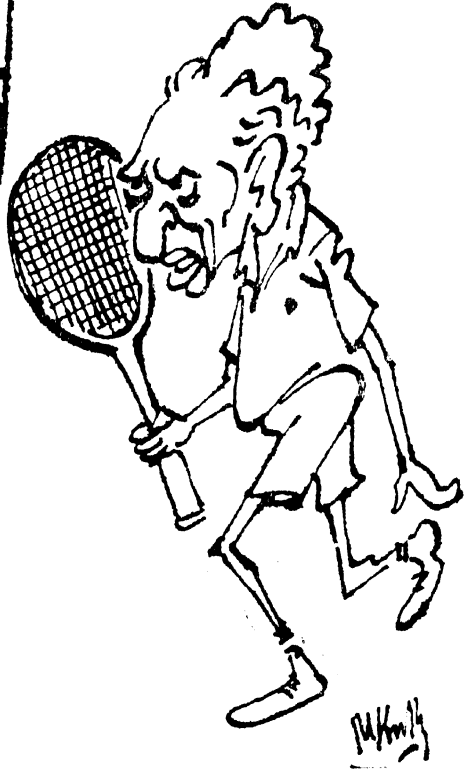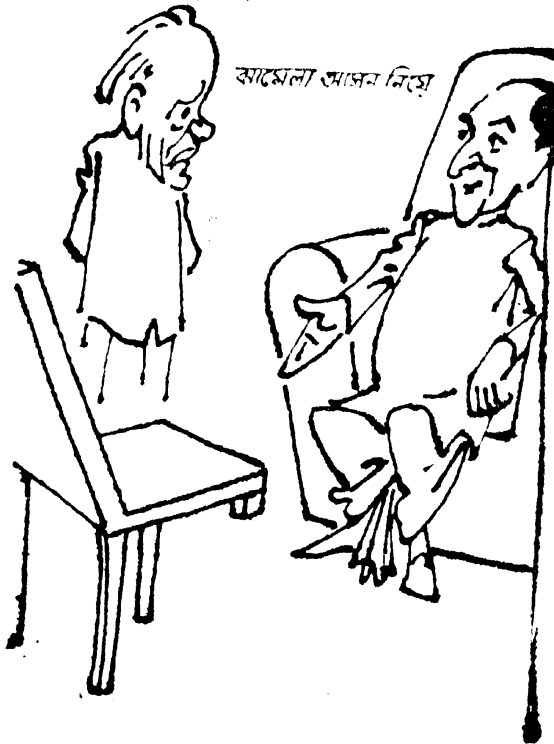
প্রথমেই মহিলাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে [illegible] দুঃসাহস রাখি না, শুধু পুরুষ-দের পক্ষ থেকে কিছু মৃদু প্রতিবাদ জানাতে চাই।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, বাংলা দেশের জনপ্রিয় সাহিত্য-সাপ্তাহিকটির পাঠকবৃন্দ-

শাড়ির বিজ্ঞাপনে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গুলো অনুধাবন করবার পরে আমি ও [illegible] বিজ্ঞাপনকলায় মনোনিবেশ করেছিলুম। অচিরাৎ একটি নিদারুণ পক্ষপাত আমাকে কাতর করল। এই বক্তব্য সেই প্রসঙ্গেই।

মহিলাদের বিচিত্রিত করে বিজ্ঞাপন-দাতারা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাবেন, তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। একটি সুদর্শনা সন্ন্যাসিনী (উর্দু 'হাসিনা' শব্দের উৎপত্তি এ থেকেই কিনা কে জানে!) কোনো বিশেষ টুথপেস্ট ব্যবহার করে বিকচ কুন্দদন্তে তাকিয়ে রয়েছেন—এই মনোহরণ দৃশ্যে কে না খুশি হবেন! যে তরুণীটি নিঃসঙ্গতার দুঃখে প্রায় বৈরাগ্য নিচ্ছিলেন —হঠাৎ একটি ক্রীম ব্যবহার করবার সাত দিনের মধ্যেই তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, যে-কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা (কন্যার [illegible] [illegible] চৌরঙ্গীর [illegible] সাজানো এই বিজ্ঞাপনটি দেখে নিশ্চয় আশায় আনন্দে শিহরিত হবেন। বিভিন্ন শাড়ি এবং পোশাকের ছবিতে যে রূপসীরা বিজ্ঞাপনের রেখায় রেখায় নেচে উঠছেন তাঁদের দেখে মনে হবে—শুধু শ্রীযুক্তা বা কেন, এঁদের যে-কেউ অবলীলায় বিশ্ব-সুন্দরীর মুকুট কেড়ে আনতে পারেন। চিত্রলোকের অপ্সরার যে সাবান মেখে দিব্য কান্তি লাভ করেন, অনন্ত কেউ এবং কেউ পুরুষও নিজেদেরে সেই সাবানটির জন্যে একটা গভীর এবং গোপন ব্যাকুলতা অনুভব করবেন। এইসব মনোলোভা বিজ্ঞাপনের বিরোধিতা করব—এমন ঘোরতর গণ্ডার মার্কা খিলিপ্টাইন আমি নই।

আমার আপত্তি অন্য কারণে। ইয়ো-রোপের প্যাগান যুগ শুধু পরম রমণীয়া ভেনাস আর বনকন্যা ডায়ানার [illegible] বর-মাল্য সাজাতো না, অ্যাপোলো এবং জুপিটাররাও সেদিন বাদ পড়তেন না। মিলো দ্বীপের আফ্রোদিতে যেমন অনামা শিল্পীর অতুল কীর্তি, মিকায়েল এঞ্জেলোর ছেনি-হাতুড়িতে আকাশের অধিরাজ জুপিটার তেমনি আজো অমর হয়ে আছেন।

কিন্তু ও-সব বিশ্বগত ব্যাপারে মাথা দিয়ে কাজ নেই। আমাদের ছেলেবেলাতেও এই বাংলা দেশেই বিজ্ঞাপনের ভেতরে বেশ নিরপেক্ষ ঔদার্য দেখতে পেতুম। অর্থাৎ [illegible] 'তেল' মেখে সুন্দরী যখন [illegible] বিচরণ করতেন, তখন বিশেষ [illegible] পুরুষ অবলীলাক্রমে এক [illegible] দুই পেশল হাতে মাথার ওপরে তুলে ফেলতেন। তখন নারীরাও

সওদাগরের মুখে হাঁটুতে 'দাত-নখ' মালিশ করতেন এবং স্বনামধন্য কেশতেল মেখে রসিক এবং গোঁফো পুরুষেরা পুজোর আনন্দে নৃত্য করতেন। বেশ একটা সমতা ছিল তখন—ইংরিজীতে যাকে বলে 'সকয়ার ডীল।'

আজকাল সমস্ত জিনিসটাই কেমন এক-পেশে হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। এবং ক্রমাগত বিজ্ঞাপনে এই 'বিউটি প্যারেড'-এর

৮।

কেশ তৈলের বিজ্ঞাপনে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ফলে, বিকিনি-[illegible] স্কার্ট রোমাঞ্চিত [illegible] অবধি চলেছে এমন সবের এক একটি পরিষ্কার কার্টুন দেখে: [illegible] পবিত্র বাইবেল থেকে [illegible] ফিজিক্সের বইয়ের প্রচ্ছদপট পর্যন্ত কিভাবে ললনাশোভিত করা হয়, তার কতগুলো নমুনা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের অবশ্য এখনো অতটা বাড়াবাড়ি হয়নি, গুরুপাক অবস্থাটাও আসেনি। আমরা এখনো রোমান্টিক, আজো নারীকে সর্বসৌন্দর্যের সারভূতা বলে কল্পনা করে থাকি, ক্যালেন্ডারে কোনো চিত্তহারিণীর ছবি থাকলে বছরের শেষেও তার মায়া কাটাতে পারি না—মুগ্ধ চোখের সামনে সেটিকে ঝুলিয়ে রাখি। আমার মনোবেদনা অন্য কারণে।

এখনকার বিজ্ঞাপনে পুরুষেরা প্রায়ই সেকেণ্ড ফিডল। তাঁরা [illegible] ফেব্রিকের স্যুট পরেন—কারণ মহিলারা তাঁদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাবেন; বিশেষ ব্লেড দিয়ে তাঁরা দাড়ি কামাবেন, কেননা মহিলা-সমাজে তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। যৌথ রোমান্টিক ছবিতে অবশ্য পুরুষদেরও মধ্যে মধ্যে মন্দ দেখায় না, কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে—আসলে তিনি [illegible] ব্যাক-গ্রাউণ্ড ছাড়া আর কিছুই নন। পুরুষের কিংবা ছেলেদের [illegible] বিজ্ঞাপনজাতীয় ব্যাপারে কখনো কখনো অবশ্য [illegible] চিত্র দেখা যায়, কিন্তু তার একটুও ঠিক [illegible] নয়, তা একধারে কমিক এবং [illegible]; তার উপরেও ফোকাস মহিলাটির ওপরে—সেই নাটকেও তিনিই নায়িকা!

পুরুষমুখো বিজ্ঞাপন কি রকম? দেখা যাচ্ছে তিনি বিকৃত মুখে নানাভাবে খক-খক করে কাশছেন—অপেক্ষা করে রয়েছেন, কখন একটি বিশেষ মালিশ সহযোগে সেই দুঃসহ কাশি নিবৃত্ত হবে। কেউ বা একমাথা টাক নিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছেন—একটি কেশপ্রসাধনীতে তাঁর অকাল-বার্ধক্য দূর হবে বলে বিজ্ঞাপন-দাতা আশ্বাস দিচ্ছেন। কখনো তাঁকে দাঁতের ব্যথার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে দেখা যাচ্ছে—আশা আছে মোক্ষম বড়িটি পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তিনি ঘুমোতে পারবেন।

অর্থাৎ পুরুষেরা বিকৃত, বিকট, ব্যাধি-গ্রস্ত, [illegible] যাঁরা সদ্য [illegible] গোলাপের মতো বিকশিত হচ্ছেন—তাঁরা সকলেই চিত্তহারিণী মহিলা। সৌন্দর্য-তত্ত্বের দিক থেকে এর একটা ভাল ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে কিন্তু বাস্তবের [illegible] পুরুষদের পক্ষ থেকে এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সাবান-তেল-সুগন্ধির প্রতি পুরুষের কোনো আকর্ষণ নেই—অতি বড়ো নিন্দুকেও নিশ্চয় এ-কথা বুক ঠুকে বলতে পারেন না; আর ইভ-নন্দিনীরাও যে কখনো খকর-খকর করে কাশেন না এবং তাঁদের কারো কারো মাথায় এক একটি সুমসৃণ টাকের আবির্ভাব হয় না—কোনো "দুর্মর" রোমান্টিকও কি সে-কথা জোর করে বলতে পারেন?
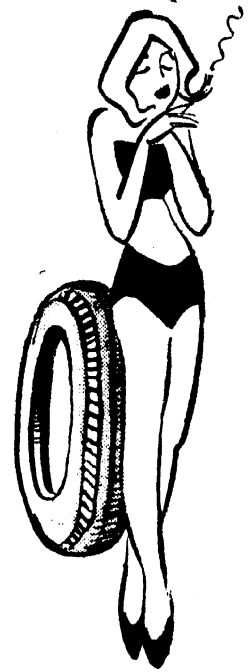
টায়ারের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত নারীমূর্তি—কারণ দুর্বোধ্য

অন্তঃপুরকে উত্তেজিত না করেই আমার দীন নিবেদন: একটা সামঞ্জস্য করা হোক। শুধু কলকব্জা আর কাশি-টাকের বিজ্ঞাপনেই পুরুষকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁর একটা [illegible] সুযোগ দেওয়া হোক—নতুন স্যুটে এবং শ্যাম্পুতে যেন তাঁর [illegible] সম্ভাবনাই তিনি না করেন। একালের জাগ্রত মহিলাদেরও এই [illegible] কবল থেকে মুক্তি দেওয়া যাক—যাঁরা এরোপ্লেন চালান এবং পার্লামেন্টে সদস্যা হন—তাঁরাই বা কেন নিছক পটের বিবি হয়ে থাকবেন?

আশা করব—এরপর মহিলাদের পক্ষ থেকেও অনুরূপভাবে দাবি উঠবে। যেদিন ভৈরবীমূর্তিতে খাঁড়া হাতে নিয়ে তাঁরা "বঙ্গনারীর পাঠা"র সাইন বোর্ডে পাঁঠা কাটতে থাকবেন—সেই শুভদিনটিতে তাঁরা আরো গরীয়সী হবেন, আমরাও চরিতার্থ হবে।

নীরার অসুখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে,
সূর্য নিভে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি নিজস্ব জ্বলার আগে
জেনে নেয়,
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে।
অফিস-সিনেমা-পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুল শাখায় তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশী।
হঠাৎ উদ্দাম হাওয়া এলোমেলো পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে
আকাশ জুড়ে খেলা শুরু করলে
কলকাতায় সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ
বেড়াতে গিয়েছে!

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখবোধ
হঠাৎ কখনো ট্রামের পেটে লরি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌমাথায়
[illegible], পথে পথে মানুষের মুখ কালো,
মিছিলের বিরক্ত মুখোশ—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই,
গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মনখারাপ করে আছো?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, শিল্পীর সম্মুখে নয়
আয়না দেখার মতো, দেখাও ও মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি আমার [illegible]।
অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও
খেলা দেখে
চলে যায় স্বাস্থ্যময় সুখে
ট্রাফিকের গিঁট খোলে, ট্রামের সঙ্গে টেমপো, মোটরের সঙ্গে
রিক্‌শা মিলে মিশে বাড়ি ফেরে, বেকার [illegible]
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে,
বেঁচে থাকা [illegible]!

নীরার খবর নেই, আজ বুঝি নীরার অসুখ
সমস্ত কলকাতা তাই ক্রুদ্ধ হবে ঈশ্বরের কাছে তার
সব কাজ বন্ধ, ক্রমে ট্রামে-বাসে ধর্মঘট শুরু হবে
অফিসে-ইস্কুলে আর কেউ যাবে না, এত অভিমান!
আরও লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, টেলিফোন-পোস্টঅফিসে
আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
নীরার গভীর কণ্ঠে আর কেউ সুস্থ নয়।
কোটি কোটি কণ্ঠস্বরে তীব্র প্রশ্ন, কোথায় এখন নীরা?
নীরাকে সারিয়ে দাও,
দাও!

নীরার অসুখ সারলে কলকাতায় ফের সুবাতাস
আমি জানি তৎক্ষণাৎ
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদেরও দাবি মিটে যাবে।

দু'হাত তুলে বলেছিলাম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দু'হাত তুলে বলেছিলাম—ফিরিয়ে নাও
আমায় তোমার চাকর করো,
আমার চোখের নোন্‌তা জলে আলতা পরো
চুল ভিজিয়ে বেণী বানাও—
দু'হাত তুলে বলেছিলাম, ছুঁয়েই দেখ
সবটা হয়ত পাথর হয় নি,
একটুখানি সেঁক পেলে তো গলতে পারে
বুকের খাঁচা, খাঁচার পাখি, পাখিটার বুক।
তুমি এমন কৃপণ হয়েছ, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হলে আমায় দোষ দিও না।

বলেছিলাম, বসে থাকবো,
চিরটাকাল ধুলো হয়ে পাপোশে থাকবো—
যতদিন না চটির থেকে একটু গোবর
দিয়ে আমায় শুদ্ধ করছো।
চিরকাল যে অনন্তকাল...শূন্যতা যে বড়ো অসুখ!...
দেখা হয় না, দেখা হয় না,
কোন্‌ বিদেশে বুড়ো হচ্ছ
দিয়ে যাও সেই একটা খবর।
তুমি এমন কৃপণ রইলে, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হবো, আমায় দোষ দিও না।

ঠাণ্ডা

লেগে থাকলে
এখুনি সারিয়ে ফেলুন

অম্রুতাঞ্জন

লাগালে অবিলম্বে যন্ত্রণার উপশম হবে

দশ রকম ভেষজ মিশিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী **অম্রুতাঞ্জন পেন বাম** ব্যবহার করলে বুকে সর্দি বসা এবং সাধারণ সর্দি দুইই নিরাপদে আরাম হয়। পেশীর ব্যথা, মাথাধরা এবং মচকানোর ব্যথাতেও **অম্রুতাঞ্জনে** বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একেকবারে সামান্য একটু লাগে ব'লে বাড়িতে একটি শিশি থাকলে কয়েক মাস চলে যায়। সবসময় হাতের কাছে **অম্রুতাঞ্জন** রাখবেন।

অম্রুতাঞ্জন ৭০ বছরের ওপর ঘরে ঘরে গৃহস্থের বিশ্বস্ত সহায়।

অম্রুতাঞ্জন ব্যথা ও সর্দিতে উপকারী—একাধারে দশটি ভেষজ।

অম্রুতাঞ্জন লিমিটেড, মাদ্রাজ · বোম্বাই · কলিকাতা · দিল্লী

JWT/AM 2817A

অবস্থান

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

তনিমা এখন সোজা গিয়ে উঠবে পূর্ব কলকাতার কীক রো-য় তার মাসিমার বাড়ি। ওখানে খাওয়া-দাওয়া করলে ভালই। বড়লোক বলে তনিমা বিশেষ আমল দেয় না ওখানে। আজকে ওখানে না খেলে কলেজ স্ট্রিটে বন্ধু সুমিত্রার মেস-এ ঠিক হয়ে যেতে পারে। সেখানে সুবিধা না হলে অগত্যা হোটেল খোলা আছে।

যাই হোক, খাওয়া যেখানেই হোক—সুবীরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বেলা একটা নাগাদ। ঠিক রাজভবনের সামনে—যেখানে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট হয়েছিল। সুবীর সেখানে তনিমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তনিমা এলে ওখান থেকে তারা মার্টিন ট্রেনে চেপে আমতা পর্যন্ত যাবে। আমতা থেকে মাইল তিন-চার দূরে নির্জন নিরিবিলি গ্রামে তনিমাদের বাড়ি। সেই তনিমাদের বাড়িতেই যাবে সুবীর। তনিমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কলকাতা থেকে মাইল তিরিশের মত দূরত্ব। অথচ কতখানি অজ পাড়াগাঁ। মাটির আঁকাবাঁকা পথ, বনগাছপালা আশশ্যাওড়া জঙ্গল কাশফুল আর আকন্দগাছের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথ। যানবাহন বলতে গরুর গাড়ি আর পাল্কি আর পাল্কি। এই দুটো জিনিস ছাড়া যাতায়াতের আর কিছু নেই। তনিমা বলেছে, গরুর গাড়িই ভাল। সুবীর বলেছে—পাল্কি। তনিমা গরুর গাড়ির কথায় বলেছে কেমন ছই টাঙিয়ে ঠুকুস ঠুকুস করে যাব। হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে বসে গল্প করতে করতে। সুবীর বলেছে, না, পাল্কি-ই ভাল। গরুর গাড়ি হ'ল বড় বেদনাদায়ক। শরৎদার উপন্যাসের শেষ দৃশ্যের মত। কথাটা দু পক্ষ থেকে ঠিক হয়েছিল—আচ্ছা, মার্টিন লাইট রেলগাড়িতে চেপে বাজি ধরা হবে—কোন্‌টায় যাব। বাজিতে যা উঠবে তাই স্বীকার করে নিতে হবে। পাল্কি কিংবা গরুর গাড়ি—দুটোর একটা।

তনিমা এসেছে মার্টিন লাইট রেলপথে আমতার দিক থেকে। সুবীর এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ব্রড গেজ লাইন মাড়িয়ে কোলাঘাটের আশপাশে কোন গ্রাম থেকে। দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এখানেই।

কথাটা শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটের সময় প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে বসে ঠিক হয়েছিল দুজনার
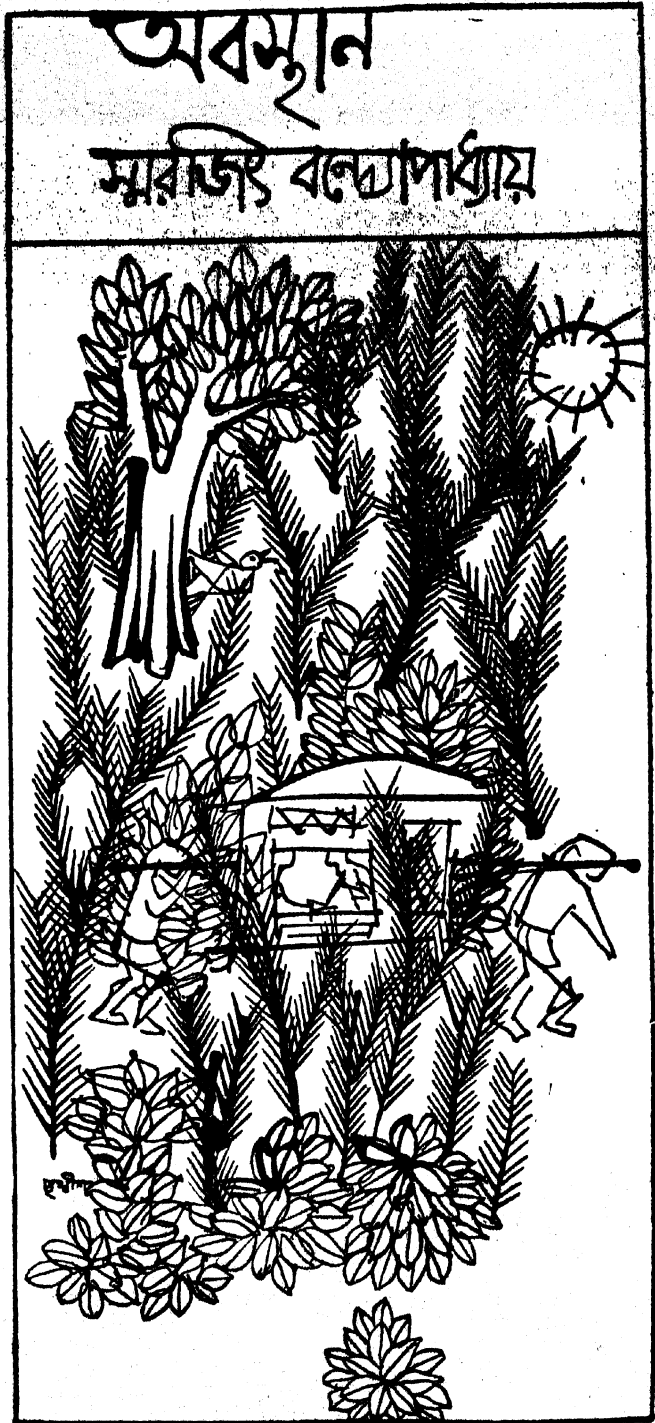
ময়ো। তারপর নানারকম অর্থচিন্তা, দুর্ভাবনা, চাকরির দুর্দশা, কলকাতার বর্তমানের লোকসংখ্যা, যানবাহন সঙ্কট, সংবাদপত্র সভাসমিতি মিছিল, লাল আবিরে রং স্লোগান শিক্ষকদের বক্তৃতা সব কিছুর ভিতর তনিমাদের বাড়ি যাবার কথাটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে সময় সুযোগ ক'রে ক'রে কথাটা জানিয়ে নিচ্ছিল দুজনেই।

তারপর আইনভঙ্গের দিন ঠিক করতে পারেনি ওরা পুলিসের ভ্যান-এ চড়ে জেলে যাবে কিনা। দুপুর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা অমান্যের কথাটা বিচার করতে পারেনি। নানারকম ভেবেছে। তারপর একসময় ঠিক হয়েছে, দুজনেই জেলে যাবে। এবং সব ঠিক ক'রে নেবার পর তনিমার দূরসম্পর্কের এক দাদার বন্ধু মালা এনেছিল। ওরা সে মালা না পরে লোকজন ছিঁড়েখুঁড়ে বিচ্ছিন্নভাবে চলে গিয়েছিল।

তারপর জেল থেকে মুক্তি পেয়েই একবার টাকাকড়ির কথা চিন্তা করে ও বাড়ির কথাটা মনে ভেবে নেবার পর ঠিক হয়েছিল —না, যাওয়া হবে। তনিমার বাড়ি যাওয়া হবেই। সুবীর জেল থেকে বেরিয়ে বলেছিল, তুমি তাহলে একটা নাগাদ রাজভবনের কাছে আসছ ত!

তনিমা বেশ হাসিখুশির মধ্যে বলেছিল —হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে। খেয়ে রেডি হ'য়ে আসবে নিশ্চয়।

(২)

জেল থেকে বেরিয়ে মনে কেমন অগাধ আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল। কেমন তীর্থ করে আসা পুণ্যবান লোক মনে হয় নিজেদের। মনে সাহস সঞ্চিত হয়ে সব কিছুকে তাই দিয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। দাড়ি বড় হয়ে খচ-খচ করে লাগলেও জেল-মুক্তির পর আলো বাতাসের দিকে চেয়ে কোথা থেকে যেন অজস্র আনন্দ ফিরে আসে। স্বদেশী স্বদেশী মনে হয় নিজেদের। কলকাতাকে যেন বেশ খানিকটা চেনা হ'য়ে গেল—এই ভাবটা ছড়িয়ে আছে সবার চোখে মুখে।

তনিমা জেল-মুক্তির পর বাইরে বেরিয়ে ছটফট করতে করতে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। কথার তুবড়ি নিয়ে অবশেষে সবটুকু প্রকাশ করতে না পেরে খুব তাড়াতাড়িতে ট্রাম স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াল এবং সংগে সংগে একটা ট্রাম এসে গেলে কথা বলতে বলতে অভ্যস্ত লোকের মত ট্রামে উঠে পড়েছিল তনিমা। ভিড়-ট্রামেই উঠে পড়েছিল। সুবীর নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে বিদায় দিয়ে নিজে অন্য দিকে যাবে। ট্রাম গুটিগুটি চলতে শুরু করে দিয়েছে। তনিমাকে দুজন পুরুষ [illegible] কাছে টেনে নিয়ে ট্রামের অন্ধকারে অদৃশ্য ক'রে দিল। এটা দেখার পর সুবীর বিষণ্ণ মনে কলকাতার পথ হাঁটতে লাগল।

কাঁধের ঝোলা ব্যাগে ময়লা একরাশ জামা কাপড়। সেই সংগে একটা ছোট গীতাও রয়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় মা ওটা ব্যাগে পুরে দিয়েছিল। সেই সংগে ওটা পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছিল মা। ওটা নিয়মিত পাঠ করলে সব গন্ডগোল মিটে যাবে। সরকার সব দাবি স্বীকার করে নেবে। সুবীর ফুটপাথ ধরে চলছিল। বিজ্ঞাপন, শো-কেসে হিন্দী ছবির মারাত্মক অশ্লীল পোস্টার দেখে পথ চলছিল। ছোট বোনের একটা প্লাস্টিকের পয়সা রাখা ব্যাগ এনেছিল। তাতে ধার করার অবশিষ্ট পাঁচ টাকা পড়ে আছে। কিছু আধময়লা জামা-কাপড় আর নগদ পাঁচ টাকা নিয়ে কি তনিমাদের বাড়ি যাওয়া যায়। দাড়িটা ত' কত দিন কামানই হয়নি। পেটে অস্বাভাবিক খিদে। এই টাকা নিয়ে আজ সুবীর হোটেলে খেতে যাবে। গাড়িভাড়া টিকেট যদি তনিমা করে ত' ভালই। তনিমা অন্তত আমার অবস্থাটা ভাল করেই বুঝবে। কথাটা এভাবে ভেবে সুবীরের হাসি পেল। তনিমা আমার অবস্থা বুঝবে, আমি তনিমার অবস্থা বুঝব। আমরা পরস্পর উভয়ে উভয়ের অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে সজ্ঞান হয়ে আছি। আর তার মাঝখান থেকে কেবল অর্থ নামক বস্তুটি দুর্বল ক্ষীণ হয়ে আমাদের কোনরকম স্থিরতা দিচ্ছে না।

(৩)

ক'দিন কলকাতায় বেশ কাটল। কেবল বসে বসে মিছিল দেখেছে। মিছিল। বক্তৃতা আর মানুষের বন্যা। দুঃখ আর দুর্দশার চিত্র দেখেছে। চিৎকার করে গলা ধরে গেছে। প্যান্ডেলে বসে পাওনা সিগারেট খেয়ে খেয়ে ঠোঁট দুটো কালো হয়ে গেছে। আর, আর মায়ের কথাটিকেও একেবারে

... একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। আবার একটা সুবীরকে দেবার পর নিজে একটা ধরালো।

সুবীরের কাছে অসহ্য লাগছিল শুভ্রাংশুর উপস্থিতি।

ঠিক এমন সময়েই সুবীর দেখল তনিমাকে। পার্কের ও কোণ দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শুভ্রাংশু থাকায় সুবীর তেমন আনন্দ প্রকাশ করতে পারছিল না। আর ঠিক তনিমাকে কাছে দেখতে পাওয়ার সংগে সংগে সুবীরের পেটের খিদেটাও প্রচণ্ড মুক্তি পেয়েছিল। খালি পেটে কয়েকটা নিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই।

"কি হল, এত সকাল সকাল এসে পড়লে।" সুবীর হালকা গলায় তনিমাকে বলে উঠল।

"মনে কর সকাল সকাল ফেরাই যাব।" তনিমা কাঁধ-ব্যাগ নিয়ে ঘাসের ওপর বসতে চাইছে।

শুভ্রাংশু লাফিয়ে উঠে পড়ল—"আসুন আসুন তনিমা দেবী। কি ব্যাপার আরে, জেল-টেল খেটে কি হয়ে গেছেন একেবারে।"

শুভ্রাংশুর আচরণ কথাবার্তা সুবীরের সহ্য হচ্ছিল না। নিজের পেটটা অসম্ভব খালি বোধ হচ্ছে। তনিমা খেয়ে এসেছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করা উচিত কিন্তু শুভ্রাংশু থাকায় জিজ্ঞেস করতে পারল না।

শুভ্রাংশু তনিমার দিকে ঘুরে বসে কথা জুড়েছে। "আপনাকে কিন্তু আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ... শাড়ি। ... কলকাতা যাকে বলে।"

তনিমা ... বলল, "আমার কাপড়-জামা ... দিয়ে এলাম। ... সর্বস্ব আজ আমার পরিয়ে দিল।"

"খুব ভাল লাগছে আজ দেখতে।" শুভ্রাংশু সিগারেট ঠুকছিল।

আর সুবীর তার অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে হঠাৎ ট্রাম স্টপেজে নন্তুদাকে আবিষ্কার করতে পেরে একটু ইতস্তত করল। তারপর কাকেও কিছু না বলে ছুটল নন্তুদার উদ্দেশে।

(৬)

তনিমা অপেক্ষা করে আছে সুবীরের জন্য। কথায় কথায় শুভ্রাংশু খাওয়া-দাওয়ার কথা তুলেছে। খাওয়া সত্যি হয়েছে কি হয়নি ইত্যাদি কথায় দ্বিধার মাঝখানে পড়ে হঠাৎ তনিমাকে খাওয়াবার চেষ্টায় শুভ্রাংশু তাকে চৌরঙ্গীপাড়া কোন হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছে। শুভ্রাংশু উঠে পড়েছিল। তনিমা এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল সুবীরকে।

পার্ক পেরোতেই সুবীর এসে জুটলো। "তোমরা কোথায় চললে?"

"তুমি কোথায় বেরিয়ে গেলে হঠাৎ?" তনিমা ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলল।

"নন্তুদার সংগে দেখা হল। কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে এলাম।"

শুভ্রাংশুকে বাধ্য হয়েই বলতে হল—"তনিমার যে আজ খাওয়া হয়নি—সুবীর-বাবু, আপনার বোঝা উচিত ছিল। কিছু করতে পারতেন একটা।"

"অনেক কিছু উচিত তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু কি করা যাবে বলুন। খাওয়া ত আমারও হয়নি। বুঝতে নিশ্চয় পেরেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করেন নি কেন?"

শুভ্রাংশু আঘাত পেল। আঘাত পেয়ে শুধু চলতে লাগল পাশাপাশি। কোন কথাই সে বলছিল না।

কিন্তু টাকা ধার করে নিয়ে আসার জন্যে সুধীর শুভ্রাংশুর ওপর আক্রোশ ছুঁড়ে মারতে পারল। রাগ আক্রোশ কিম্বা লজ্জা ও ক্ষুধায় ভাঙতে ভাঙতে তারা চৌরঙ্গী-পাড়ায় চলতে লাগল।

একটা হোটেলে এসে তিনজনে বসল। শুভ্রাংশু খাবে না। বেশ বসে থেকে তদারকি করে খাওয়াবে দুজনকে।

(৭)

খাওয়ার বিল মেটাবার সময় সুধীর কাউন্টারে আসে টাকা গুনতে। শুভ্রাংশু কোনরকম আমল না দিয়ে কড়কড়ে নোট গুনে বার করল। সুধীর পকেট তার। প্রায়ই তাড়া তাড়া নোট বার করে। নোটের গন্ধ শোঁকে। টাকা দিয়েই হাতে আসল। পড়ে শুভ্রাংশু আবার এসে দাঁড়াল।

সুধীর আড়ষ্ট, বলল—"শুভ্র, এবার তোমার অফিসের সময় হ'য়ে এল।"

"হ্যাঁ, চলি তা হলে।" তনিমা শুভ্রাংশুকে বিদায় জানাল। খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে দুজনে বাস ধরল। শুভ্রাংশু একা দাঁড়িয়ে থাকল। ডিজেলের একরাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

দুজনে বাসে উঠে এলোমেলো কথা, মিছিল, জেলের কথা, নানারকম টুকরো-টাকরা কথাবার্তা গল্প বলতে বলতে কলকাতার ইতিহাস তৈরি করছিল। তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে গোটা কলকাতাটা বর্তমানে একটা কার্টুন ছবি হ'য়ে উঠছিল তাদের সামনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মার্টিন লাইট রেলওয়ে স্টেশন হাওড়া ময়দানে এসে দাঁড়াল। সুধীরই দুখানা টিকিট কেটে আনল।

তারপর ছোট ডিবডিবে একটা কামরায় দুজনে বসে পড়ল নিশ্চিন্তে।

(৮)

ট্রেনটা ফাঁকা হ'য়ে আসছিল। ফাঁকা হ'তে তনিমা একটা লম্বা সীটে আধশোয়া হ'ল। সুধীর অন্য একটা সীটে বসে সামনের বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। সিগারেট শেষ করার পর তনিমার দিকে তাকাল সুধীর। এতদিনে যেন ওর চেহারা থেকে শিক্ষিকা সাজটা মুছে গেছে। ছাপা শাড়ি পরেছে। সরু হাতা ব্লাউজ। দেহটা যেন স্যান্ডুইচের মত দেখাচ্ছে। মুখটা তেল-তেলে। যেন মুখে দুধের সর মেখেছে। মসৃণ। সুন্দর। তনিমা তার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মনোরম কৃশতা পেয়েছে। এতদিনে তার আগেকার অনেক স্বভাব পাল্টে গেছে।

সুধীর বলল, "তনিমা, তুমি অঙ্ক জানো।"

"ততটা ভাল নয়।"

"ম্যাট্রিকের অঙ্ক জানলেই হবে।"

"বল।"

"অঙ্কটা হ'ল—", সুধীর ঠোঁট কামড়ে বলল, "মনে কর, শহরে খাদ্য আন্দোলন হচ্ছে এবং হরতাল। এই উপলক্ষে সরকার আন্দোলনের নেতা ও ধর্মঘট-ব্যাপারে জড়িত কিছু লোককে বন্দী করলেন। যারা আন্দোলনের নেতা ও ধর্মঘটে জড়িত ধৃত লোকজনের সংখ্যা সাকুল্যে দুশো।"

"আচ্ছা।"

"এবার কাগজ ও পার্টির তরফ থেকে বন্দী মুক্তির জন্যে চাপ দিলে সরকার প্রথম মুক্তি দিলেন সকলকে।"

"হ্যাঁ।"

"তারপর আবার কিছুদিন পর ৩০ জনের মুক্তি।"

"হ্যাঁ। ৪০ জন হ'ল।"

"তারপর আরো ৬০ জন।"

"১০০ জন হ'ল।"

"তারপর ১০ জন।"

"১১০ হ'ল।"

"বাকি কজনের মুক্তি হয় না। তারপর

[illegible] ও পার্টির তরফ থেকে চিৎকারের [illegible] খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপারে বাকি [illegible] মূক্তি হ'য়ে গেল।"

"হ্যাঁ, ২০০ জনই ছাড়া পেল।"

"তা হলে—" বলে এবার সুবীর অঙ্কটা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে খাদ্যবস্তুর দাম উঠল কি নামল। যদি খাদ্যের দাম ওঠে তবে তা কত। এবং যদি দাম কমে তবে সেটাই বা কত।"

তানিমা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "বারে, এটা কি একটা অঙ্ক হ'ল নাকি।"

সুবীর উঠে বসল। সিগারেট ধরালো। তারপর বলল, "হ্যাঁ, এটার একটা উত্তর আছে। অর্থাৎ খাদ্যবস্তু উধাও হ'য়ে দূরে—অনেক দূরে চলে গেল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল মার্টিন লাইট রেলের ইঞ্জিনটা, ছাগলের মত, মুখ নেড়ে শিস টেনে টেনে চলছিল। ওরা মুখে অন্যরকমের হাওয়া আলো লাগাচ্ছিল। বিভিন্ন গাছপালা দৃশ্যের ভিতর দিয়ে ওদের রেলগাড়ি ছুটছিল।

সুবীর এম সময় বলল, "[illegible] কে থাকার কে এক [illegible] ঘুষ খায়, কোন চৌদ্দ পুরুষের [illegible]—তার পকেট থেকে [illegible] চৌরঙ্গীপাড়ার হোটেলগুলো ঘুরে ঘুরে শেষে আজ এক জায়গায় [illegible]।"

(৯)

অবশেষে পাল্কিই ঠিক হয়েছিল। কয়েকটা কাগজের টুকরোয় নাম লিখে টুকরোগুলো পাকিয়ে তারপর হাতের মধ্যে নেড়ে নিয়ে সুবীর তানিমাকে যে-কোন একটা টুকরো তুলে নিতে বলার পর বাকি টুকরোগুলো সুবীর ফেলে দিয়ে তানিমাকে তার নিজেরটা দেখতে বলেছিল—টুকরোতে কি লেখা আছে। তানিমা কাগজ দেখে বলেছিল, "ইস্, পাল্কি।"

পাল্কিতে বসার পর সুবীর কথাটা ফাঁস করল। সুবীর বলল, "সব কাগজের টুকরোয় কিন্তু ওই 'পাল্কি'ই লেখা ছিল।

কথাটা শুনে দুজনেই হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে ওরা মুখোমুখি বসে গ্রাম দেখছিল। নিচু নিচু গাছপালা, মাঠ, বিষণ্ন আলো। কাঁটা ফুলগাছ আকন্দ শিরীষ কণ্টিকারি। হিজলগাছ। তিরি পাখি, মাছ-মোরলার ডাক শুনছিল। পিঠুলিগাছ আর করমচার ফুল-দেখছিল। পাল্কি বাহকের গান শুনছিল। দুজনে চুপ করে বসেছিল পাল্কির মধ্যে।

গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন তারা বর্তমানের ভারতবর্ষের কাছ থেকে অনেক দূরের নগণ্যতায় অবহেলিত হ'য়ে চলে যাচ্ছে। অনেক অতীতের নির্জন নিস্তব্ধ পাড়াগাঁয়ে তারা ফিরে যাচ্ছিল। থাকছিল। শান্তি পাচ্ছিল।

> থসমস তলা রয় হিম্পো—
> হিম্পোলো হুকুম্না
> সদর গলি হিম্পো—
> হিম্পোলো হুকুম্না
> ডাঁয়ে ঝটকি বাঁয়ে ঝটকি হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> তালাফুটো তলা রয় হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> ঠিকরি তলা রয় হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> ভিতরে গোঁজা হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> বাঁয়ে কালাহাতি হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> পাছাড়ারে হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> যে যায় বলে চলো হিম্পো—
> ....হুকুম্না
> দিগম্বরী তলা রয় হিম্পো—
> ....হুকুম্না

'যাও ডুবে যাও, যাও ডুবে যাও' বলতে বলতে কাঁধ পালটাপালটি করে পাল্কি-বাহকরা আরো দূরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

কলকাতার ডায়েরী

এসেছিলেন অনেকেই, কিন্তু সবার নজর ছিল একজনের দিকে। তাঁর নাম রানী গ্যইদালো — নাগা-ইতিহাসের দুর্ধর্ষ নায়িকা। তাঁর কৈশোর আর যৌবন কেটেছে ইংরেজদের কারাগারে। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি তাঁর উপজাতিদের 'রানী'; একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

গ্যইদালোর এখন বয়স হয়েছে। তেহারা বেঁটেখাট চেহারা, পরনে দেশজ বেশ, চোখে কালো চশমা, দুহাতে দুটো ঘড়ি। কী দমদম বিমানবন্দর, কী রবীন্দ্রসদন, কী শতবার্ষিকী ভবন—সর্বত্রই তিনি ছিলেন মধ্যমণি, তাঁর কাছেই লোকের ভিড়।

একই আগ্রহ ছিল রবীন্দ্র সরোবরে ইউনিভারসিটি রোয়িং ক্লাবের বাড়িতে। জাতীয় আলোচনাচক্রে যোগ দিতে যে-সব পাহাড়ী নেতা এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁদের সেদিন ওখানে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। আমরা যাঁরা গিয়েছিলাম, নিরাশ হলাম—গ্যইদালো এলেন না। তিনি ক্লান্ত।

তবে অন্যদের নিয়ে সেদিনকার আসর জমজমাট ছিল। গারো, খাসী, মিরি, মিকির, নাগা, মণিপুরী, টিপরাই নানা জাতির নেতারা। তাছাড়া ওই বিষয়ে উৎসাহী কিছু সজ্জন ব্যক্তি। প্রধান উদ্যোক্তা পান্নালাল দাশগুপ্তও আছেন সকলের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে। কৃশকায়, শীর্ণদেহ এই মানুষটি যখন সলজ্জ ভঙ্গীতে কথা বলছিলেন, তখন একবারও মনে হয়নি, ইনিই সেই দুর্ধর্ষ পান্নালাল দাশগুপ্ত যিনি মাত্র কয়েক বছর আগে সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

সেখানে আলাপ হল মিসেস ইংটির সঙ্গে, বাপের বাড়ি গারো পাহাড়, শ্বশুরবাড়ি মিকির পাহাড়। বাংলা বলেন চমৎকার। সেখানেই এক বাঙালী মহিলার সঙ্গে পরিচয়। নাম আশা হোরাম। না, বাঙালী কোন পদবী নয়, বিয়ে করেছেন জনৈক নাগা অধ্যাপককে। আলাপ হল মিজো নেতা বাওছুয়াকা, গারো-নেতা উইলিয়ামসন সাংমা, খাসী নেতা নিকোলাস রায়, নাগানেতা ইমলং এবং ফিজোর ভাইঝি রানো সায়জা-র সঙ্গে। 'লোক ভারতী' গান গেয়ে শোনাচ্ছিলেন, বাংলাদেশের লোকসংগীত। গানের তালে তালে সবাই তালি বাজাতে শুরু করে দেন। আর নির্মলেন্দু চৌধুরী যখন গাইতে ওঠেন, ফিজোর ভাইঝি বলেন, 'ওর রেকর্ড কিনব, পাওয়া যায়?' বাওছুয়াকা আমার পূর্ব পরিচিত, তিনি পাশে বসে ছিলেন। বললেন, গান শুনে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে।

ছেলেবেলা? আপনার তো বাড়ি লুসাই পাহাড়ে!—আমি অবাক হয়ে বলি।

বাওছুয়াকা একটু হেসে জানান, ছেলেবেলা থেকে তাঁর পড়াশোনা ঢাকায়।

গানের সুর ইতিমধ্যে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। বাংলা গান শেষ হতেই উইলিয়ামসন সাংমা সদলবলে ছুটে এসে গারো গান শুরু করে দিলেন। এবার আমাদের তালি দেবার পালা।

অদ্ভুত পরিবেশ, মনেই হচ্ছিল না কলকাতা শহরে আছি, যেন আসামের কোন গাঁয়ে চলে গিয়েছি। সমতলে পর্বতে দূরত্ব দূর হয়ে গিয়েছে।

দু দিনের আলোচনাচক্রে লাভ কতটুকু হয়েছে, আমি ঠিক জানি না, তবে এইটুকু বলতে পারি, সেদিনের মত মেলামেশা আমরা যদি আরও আগে থেকে শুরু করতাম, তাহলে হয়ত অনেক সমস্যাই মাথা চাড়া দিয়ে আজ এত ভয়ানক হয়ে উঠত না, ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারত না।

ঠিক ওই কথাই বললেন শ্রীসোনারাম থাওসেন। থাওসেন থাকেন হাফলঙে। নর্থ কাছাড় ও মিকির পাহাড় জেলা পরিষদের তিনি চিফ এক্জিকিউটিভ মেমবার। তিনিও ওই আলোচনাচক্রে যোগ দিতে কলকাতায় আসেন।

থাওসেন বাংলা বলেন যে কোন বাঙালীর মত। বললেন, "আমরা রয়েছি মাঝখানে। এদিকে অসমীয়া সংস্কৃতির ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ওদিকে বাংলা সংস্কৃতির সুরমা উপত্যকা, দুটোরই কিছু কিছু আমাদের নিতে হয়েছে। তবে জোর বাংলার দিকেই বেশী। আমাদের প্রাচীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতি এবং হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

(থাওসেনরা কাছাড়ী। কাছাড়ীরা নিজেদের বলেন 'ডিমাছা', দাবি করেন ঘটোৎকচের বংশধর বলে। কাছাড়ই সর্বশেষ স্বাধীন রাজ্য ব্রিটিশ দখলে আসে।)

থাওসেন হিন্দু, তাঁর জেলার অধিকাংশ লোকই তাই। আলাদা পাহাড়ী রাজ্য গঠন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য একটু অন্য রকমের। বললেন, "দেখুন দাবিটা প্রধানত আসছে আমাদের মত ইংরেজী শিক্ষিত নেতাদের কাছ থেকে, সাধারণ লোকেরা ওসব নিয়ে এত মাথা ঘামায় না। নাগাদের ব্যাপার অবশ্যি একটু আলাদা। তবে যত দিন যাচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি ততই বাড়ছে। আমরা যাঁরা পাহাড়ী এলাকায় থাকি,

...দের সম্পর্কে আপনাদের কৌতূহল আছে, কিন্তু আগ্রহ নেই। আমাদের কিছু নাচ-গান আর জামা কাপড় সম্পর্কে আপনারা উচ্ছ্বসিত, অথচ মজার ব্যাপার দেখুন, এত ঘটা করে প্রচার করা সত্ত্বেও আমরা কে কোন্ এলাকার লোক, তা'ও কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা জানেন না। উইলিয়ামসন সাংমা গারো পাহাড়ের নাম-করা নেতা, আসাম বিধানসভার বিরোধীদল নেতা; কিন্তু কলকাতার একটি কাগজে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে 'খাসী নেতা' বলে। আমাদের মনে ক্ষোভ জাগাটাও স্বাভাবিক। এই আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে আমরা সরাসরি অনেক কথা বলতে পারলাম, পরিচয় হলও অনেকের সংগে, দুই তরফের দৃষ্টিকোণও আঁচ করা গেল। আমার তো মনে হয়, এটাই এই সম্মেলনের বড় লাভ।"

শ্রীথাওসেন তারপর একটি বিনীত অনুরোধ জানালেন, আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস ও ছাপাখানা তিনি দেখতে চান।

উত্তম প্রস্তাব; আমি খুশী, তবে এত দ্রষ্টব্য থাকতে খবরের কাগজের অফিস কেন?

আমার প্রশ্নের জবাবে শ্রীথাওসেন বললেন, "আমি রোজ ১৮টি দৈনিক কাগজ পড়ি। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড। আপনাদের কাগজে আমি লিখেছিও যে।"

*

কালীঘাটের মা কালী যে সত্য সত্যই জাগ্রত, তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল সাউথ ক্লাবের টেনিস মাঠে। খবর পেলাম, ডেভিস কাপ খেলার শেষদিনে রামনাথন কৃষ্ণণ মা কালীর পুজো তো দিয়ে এসে-ছিলেনই, সাউথ ক্লাবের সদস্য অনেক কট্টর বাঙালী সাহেবও নাকি কালীর কাছে মানত করেন। মা তাঁদের কথা রেখেছেন।

—চাণক্য

মুদ্রা মূল্য হ্রাস ও রপ্তানি

বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৫ সালে যেখানে রপ্তানি ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৩½ ভাগ, সেখানে আমদানি শতকরা ৬ ভাগ হওয়ায় ৬০০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট আমদানির শতকরা ২১ ভাগে ছিল কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচা মাল; শতকরা ৩০ ভাগ ছিল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। স্পষ্টত, পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি সংকোচনের আর সম্ভাবনা নেই বলে রপ্তানি থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সবচেয়ে বেশী করে তোলা জরুরী হয়ে উঠেছে।

চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্য

কার্পাস শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রে, ১৯৪৮-৫০ সালে বিশ্বের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের যে অংশ ভারত রপ্তানি করতো, আভ্যন্তরিক ব্যয় ও মূল্য দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় তা-ও টিকিয়ে রাখা সমস্যা হয়ে উঠেছে। বিগত দশকে জাপানের অংশ সমানে বেড়ে গেছে। ব্যয় বৃদ্ধির দরুন কার্পাস দ্রব্য রপ্তানির অসুবিধা টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে মনে হয় কাটিয়ে উঠা যাবে এবং আমাদের প্রতিযোগিতা-ক্ষমতার বৃদ্ধি হবে।

১৯৫০ ও ১৯৬৫ সালের ভেতর বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ পাট দ্রব্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬ থেকে ৭১ ভাগে এবং চা-এর বেলা শতকরা ৪৭ থেকে ৩৫ ভাগে নেমে এসেছে। পাটশিল্পদ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাস আমাদের রপ্তানির সহায়ক হওয়ায় পাকিস্তান তার উৎপাদন-ক্ষমতার-সম্প্রসারণে নিরুৎসাহ হবে বলে মনে হয়; ফলে পাকিস্তানের প্রতিযোগিতা থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ কমে যাওয়ার আশংকা হ্রাস পাবে। পাট শিল্পকে যখন নিস্তেজ বলা যায় না তখন ঐ শিল্প যে পাটের নতুন ব্যবহার উদ্ভাবন করবে সেটা আশা করা হয়তো অন্যায় হবে না। পাট ও কার্পাসদ্রব্য শিল্প সম্প্রতি কাঁচামালের অনটন থেকে যে অসুবিধা ভোগ করছে আরো আমদানি দ্বারা তা দূর করার জন্য চেষ্টা করলে ভালো হয়। এক কথায়, চিরাচরিত শিল্পগুলি যাতে নতুন নতুন পরিবর্তের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে সেজন্য সেগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

চা-এর রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব আফ্রিকা এবং নিকৃষ্ট জাতের চা-রপ্তানিকারী অন্যান্য দেশগুলির ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার দরুন ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের রপ্তানির অংশ যে কমে যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হবে, আশা করা যায়। খনিজ ধাতু ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির বেলা অবশ্য ব্রেজিলের খনি-সংক্রান্ত কোম্পানিগুলির সঙ্গে আমেরিকার ইস্পাত কোম্পানিগুলির একটা বন্ধন-ব্যবস্থা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্রেজিলের ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির সুবিধা বজায় থাকবে এবং টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে তা সম্ভবত দূর হবে না। কিন্তু সেখানেও রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা

জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়ের ভেতর আমাদের রপ্তানি গত বছরের ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার থেকে এ বছর ৪৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারে নেমে এসেছে। রপ্তানির নিস্তেজ অবস্থার একটা কারণ হচ্ছে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই মূল্য স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তন এবং অর্থসাহায্যের জন্য যখন দাবি উঠেছে সে সময় এটা স্বাভাবিক ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্য যেখানে কমে গেছে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বাড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি। কিন্তু কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত কাঁচা মালের সাম্প্রতিক অনটনের দরুণ বেশীর ভাগ রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো এখনই সম্ভব হচ্ছে না। আশার কথা এই যে, ঐ বছর অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্পগুলির উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় বেশ কিছু বেড়েছে। তার মধ্যে, পতঙ্গনাশক দ্রব্য, ট্রাক্টর ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনের শিল্পগুলি আছে। আমদানিলব্ধ কাঁচামাল আসতে আরম্ভ করলে ঐসব শিল্পের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-হার বাস্তবাভিত্তিক হয়েছে। স্বভাবত, রপ্তানির জন্য বিবিধ সরকারী সাহায্যের এখন আর প্রয়োজন থাকার কথা নয়। অবশ্য রপ্তানির ব্যাপারে এখনো কয়েকটি শিশু শিল্পের অন্তত কিছু সময়ের জন্য বিশেষ সাহায্য লাগতে পারে। বস্তুত, অর্থসাহায্য ছাড়া কোনো কোনো দ্রব্যের রপ্তানিই সম্ভবপর হবে না। কিন্তু মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের পর যে আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিদেশে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে পাওয়া আগের চাইতে সহজ হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অর্থ সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া

টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরিক দ্রব্য মূল্য এবং বিদেশের দ্রব্য মূল্যের মধ্যকার বৈষম্য সংশোধন। বস্তুত, মুদ্রা মূল্য হ্রাসের সময় সংকল্প হয়েছিল যে, খরচ বাঁচাবার সব রকমের চেষ্টা করা হবে এবং কোনো মতেই অর্থ সম্প্রসারণ করা হবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে দেশে ৪০০ কোটি টাকার মতো মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে এবং তার পরিপূরক হিসাবে কৃষি বা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। বাজেটের আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার ফাঁক পূরণ করার জন্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে কর্জ নেওয়ায় দেশে টাকার যোগান বেড়ে গেছে।

১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন বেশ কমে গিয়েছিল বলে এ বছর ফাঁকা মরসুমে খাদ্যশস্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় যদি অনবরত খাদ্য আমদানি (প্রধান খাদ্যশস্য এখন মোট আমদানির একের পাঁচ ভাগের বেশী) করতে হয় তাহলে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে। খাদ্যশস্যের সংকট অথবা খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বিনিময়-হারের পরিবর্তনকে সরাসরিভাবে দায়ী করা যায় না। কিন্তু খাদ্যের অনটনের সময় বাজেটের ঘাটতি থেকে অর্থের সম্প্রসারণ নিশ্চয়ই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। স্পষ্টত, আভ্যন্তরিক মূল্য স্থিতি সংরক্ষণে সরকার ব্যর্থ হলে মুদ্রামূল্য হ্রাসের আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।

শান্তিকুমার ঘোষ
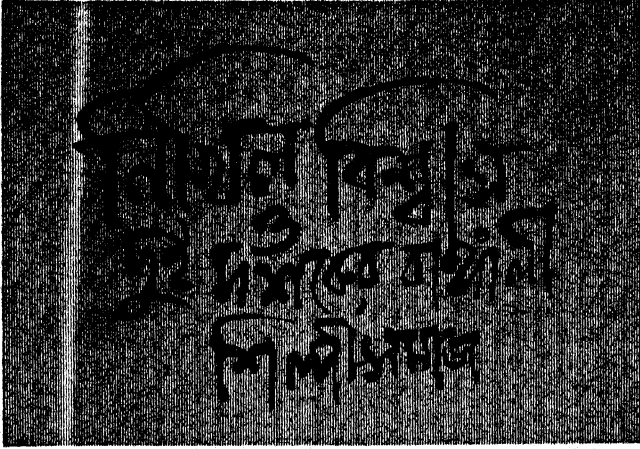
প্রণবরঞ্জন রায়

আমরা যারা ১৯৩০ সালের পরে জন্মেছি, এই ভারতবর্ষেই অনেক মারক অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি, মহাযুদ্ধে গণ-হত্যার কথা শুনেছি, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরের আত্মত্যাগের মহত্বের কাহিনী শুনেছি, মারীতে দুর্ভিক্ষে লোক-ক্ষয়ের কথা শুনেছি, আণবিক বিস্ফোরণে মৃত্যুর কথা শুনেছি। অনেকে আত্মীয় বিয়োগে শোকাভিভূত হয়েছি। এসব মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই অনেকাংশে আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে একটি পরোক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে থেকেছে। কখনও হয়তো কোন বিশেষ উপায়ে মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত বিচলিত করেছে; যখন তা হয়েছে তখন হয়তো সেই পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই অত্যন্ত গভীর হয়েছে। কিন্তু বেশীভাগ সময়েই এই সব মৃত্যুর শিকার অন্য লোক। যতক্ষণ না আমরা নিজেদের অত্যন্ত প্রেমাস্পদ সহমর্মীর মৃত্যুশোকে অভিভূত হয়ে নিজেকে মৃত্যুর শিকার হিসাবে কল্পনা করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি ততদিন মৃত্যু-অভিজ্ঞতা সত্যিকারের অভিজ্ঞতা নয়, জ্ঞান মাত্র।

এগারোই নভেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্যামলের প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনীর শেষ দিন ছিল। সন্ধ্যা থেকেই বন্ধুবান্ধবরা সবাই একে একে এসে জড়ো হচ্ছিলেন। অরুণ ছিলেন, প্রকাশ ছিলেন। ছিলেন সুনীল, সনৎ, অনিল আর আমাদের গুজরাতী শিল্পীবন্ধু পারেখ। শিল্পী বন্ধুদের মধ্যে কে কে প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন আর কে কে আসেন নি তার হিসাব-নিকাশ হচ্ছিল। আমি বলছিলাম, 'দেখলি, নিখিলটা এল না।' কথাটা পড়তে পারল না। রঞ্জন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'সে আর কোন এক্সিবিশনে আসবে না।' রঞ্জনের চেহারা ছবি-ভঙ্গি কৌতুকলেশহীন। আমাদের অজান্তেই তার সামগ্রিক উপস্থিতিতেই কোন অঘটনের স্পর্শ যেন অনুভব করলাম চৈতন্যে। হয়তো বা নিজের অজান্তেই তখন কারো মুখ দিয়ে আশঙ্কিত প্রশ্ন উচ্চারিত হয়ে থাকবে, 'মানে?' রঞ্জন হয়তো বা তার উত্তরে বলে থাকবেন, 'আজ বিকেলে পি জি হাসপাতালে নিখিল মারা গেছে।' আর সে মুহূর্তেই হয়তো মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়ে থাকবে। কারণ আমরা তো কেউই আমাদের এই তিরিশ থেকে ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। নিখিল তো তিল তিল করে মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়াবার জন্য আমাদের তৈরি করেন নি। বৃষস্কন্ধ দীর্ঘদেহী সবল পুরুষ নিখিলকে তার সবচেয়ে পুরোন ক্ষীণ খর্বকায় শিল্পী-বন্ধু শ্যামল ডাকতো মহিষাসুর বলে। এই গত পুজোর পরে যেদিন সুতৃপ্তিতে নিখিল এসেছিলেন, শ্যামল তাকে বলেছিল 'এ-পুজোয় কোথায় কোথায় মহিষাসুরের অভিনয় করে টাকা রোজগার করলি?' কে জানতো শরীরযন্ত্রের ভিতর থেকেই মহিষাসুর বধ পালার আয়োজন হচ্ছে। আর জানতাম না বলেই মৃত্যু ছিল পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। তাই রঞ্জন যখন তাঁর সর্ব-অস্তিত্ব দিয়ে নিখিলের মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনলেন তখন, সেই সতীর্থ সহমর্মীর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সকলের সামনে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অনিবার্য বিধিরূপ মেলে ধরলো।

নিখিল অবশ্য বলতে পারতেন—"না, আমি তোমাদের ঠকাই নি। আমি তোমাদের তো বহুকাল থেকেই মৃত্যু-চেতন করতে চেয়েছিলাম। আমি শিল্পী, আমার শিল্পের মধ্য দিয়েই আমি তোমাদের অনিবার্য মৃত্যু সম্পর্কে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। তোমরা আমার ছবিতে মৃত্যু দেখেছো।—দেখেছো সে মৃত্যু প্রশান্ত মৃত্যু নয়, দেখেছো সে মৃত্যু স্বেচ্ছা-মৃত্যু নয়, দেখেছো সে মৃত্যুর কারণ হত্যা, ঘাতকতা, নাশকতা। দেখেছো সে মৃত্যু সংঘটিত মৃত্যু, যাতে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে

শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস

মানুষ মরে। তোমরা আমার ছবিতে আরো দেখেছো যে যারা মরছে, তারা মহৎ তারা বীর। তারা অন্ধকারে আত্মগোপনকারী কুটিল কুচক্রী গুপ্ত আততায়ীকে ভয় পায় ঠিকই, কিন্তু মরবার সময়ে সেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মরে। তোমরা কি বোঝনি, জীবনস্পৃহ শিল্পী হিসাবে আমি বরাবরই সেই অসুন্দর জীবনবিরোধী মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গেলাম। আমি জানতাম মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু শিল্প মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক একটি জয়ের ফল। তোমরা শিল্পকে জীবন থেকে আলাদা করে বলে মৃত্যুকে দেখনি। জীবনকেও না। কিন্তু আমার কাছে শিল্প ছিল জীবন এবং অভিজ্ঞতারই প্রকাশ। আমার শিল্প থেকেই আমার জীবনটাকে বইয়ের মতন পড়ে নিতে পারবে। মৃত্যুকেও। মৃত্যু চেতনা আমার কাছে শুধু মাত্র শৌখিন শিল্প-উপকরণ ছিল না; বরং আমার শিল্পই ছিল সেই জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ মাধ্যম। সুতরাং তোমরা বলতে পারবে না যে আমি তোমাদের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রস্তুত করি নি। আমি বেঁচেছি পরিপূর্ণভাবে, কারণ আমার কাছে বাঁচাটা ছিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের লড়াইয়ের মহৎ প্রকাশ; আমি মরেছি ঘোষণা করে, কারণ মৃত্যুটা ভীষণ অনিবার্য। এ সবই আছে আমার ছবিতে।"

কথাগুলো নিখিল বলেন নি। কিন্তু বলতে পারতেন। আমরা যারা নিখিলকে কিছুটা জানতাম, চিনতাম, তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে খানিকটা পরিচয় লাভ করেছি, তারা সবাই বিশ্বাস করি নিখিল বিশ্বাস একথা বলেছেন।

নিখিলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯৫৪ কিংবা ৫৫ সালে; ঠিক মনে নেই। 'চিত্রাংশু' গোষ্ঠীর একটি এক্জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ হয় আরও চার পাঁচ বছর আগে। ওর নিমন্ত্রণেই ওদের চিত্রাংশুর এক্জিবিশন দেখতে গিয়েছিলাম। শ্যামলের মুখেই 'চিত্রাংশু'র অন্যান্যদের পরিচয় পেয়েছিলাম। নিখিল সম্বন্ধে বলেছিল, নিখিল আর্ট কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ছিল একজন দক্ষ শিল্পী। জলরঙে তখন থেকেই ওর হাত ছিল পাকা। প্রথাগত উপায়ে আস্তে আস্তে ধুয়ে ধুয়ে নিখিল রঙ লাগাতো না। ফলে ওর রঙ হত খুব উজ্জ্বল, আর তা অসম্ভব জোর পেত। তখন থেকেই ওর ড্রইং ছিল খুব সাবলীল। ছবিতেও তার পরিচয় পেলাম। 'ইনিই নিখিল বিশ্বাস'—ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দেখি শ্যামলের পাশে দাঁড়িয়ে এক খদ্দরের পায়জামা-পঞ্জাবি পরা এক সবল দীর্ঘদেহী যুবক। স্বাস্থ্য প্রাচুর্য, পরিধেয়র মলিনতায়, রুক্ষ দাড়িতে আর অযত্ন লালিত চুলে এক কঠোর রুক্ষতার ছবি। নমস্কার করে বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমাদের কাজ কেমন লাগছে?' কণ্ঠস্বরের সঙ্গে চেহারা-ছবির কোন মিল নেই। কণ্ঠস্বর সুসংস্কৃত, কমনীয়, একটু বুঝিবা লালিত্যের ছোঁয়া লাগা। রথীনবাবু সেদিন বলছিলেন, নিখিলের বাইরেটা ছিল লড়িয়ের আর ভিতরটা ছিল আশ্চর্য নরম, সংবেদনশীল। যারা নিখিলকে চিনেছিলেন জেনেছিলেন তাঁরা সবাই এই এক কথাই বলবেন। নিখিলের ছবিতেও তো ঠিক সেই জিনিস। নিখিলের ছবির সেই অসম শক্তিধর মানুষরা বীরের মতন লড়ছে, ত্রস্ত ঘোড়ারা বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী নিয়ে পিছপায়ে উদ্যত, বিশাল দেহী ষণ্ড অথবা বন্য বরাহ আক্রমণোদ্যত, কিন্তু তারা শংকার পরিবর্তে করুণা উদ্রেককর। কারণ তাদের চোখে আর্তি, ভঙ্গীতে যন্ত্রণার প্রকাশ। কারণ, তাদের আক্রমণোদ্যত ভঙ্গী আত্মরক্ষার ভঙ্গীরই নামান্তর। তারা ভয়ঙ্কর অন্ধকার আততায়ীর হাতে গুপ্ত হত্যার শঙ্কায় পলায়মান। কুটিল ক্রূর মারক শক্তির হাতে সবলশক্তিমান জীবনীশক্তির পরাজয়-চেতনা নিখিলকে দিয়েছিল একটি sense of tragedy। তার চরিত্রে আর সৃষ্টিতে সেই sense of tragedy মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে একটি অপ্রতুল sense of irony তার চরিত্র এসে মিশেছিল। সে irony চেতনা থেকে প্রায় মধুসূদনের মতন। সে দুর্গার দেবীত্বকে ব্যঙ্গ করে মহিষাসুরের tragic fateকে মানুষের পক্ষে মহত্তর দৃষ্টান্ত বলে মনে করতে পারত। শিরস্ত্রাণে মুখ ঢাকা বর্শা হাতে মৃত্যুদূতের চেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় শায়িত শক্তিধর অশ্ব তার কাছে অনেক মহৎ মানুষ ছিল। সেই অশ্বের মৃত্যু যন্ত্রণার কারুণ্য তাঁকে ছবি আঁকিয়েছে, বেদনার্ত করেছে সংঘাত আর দ্বন্দ্ব মানবিকতার মৃত্যু, মানবিক মানুষের মৃত্যু সব সময়েই তাঁর চেতনাকে মথিত করেছে। এই কারণেই তিনি রাজনীতি থেকে মনে মনে খুব দূরে থাকতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর ছবি কখনও রাজনৈতিক ঘটনায় এবং বিশ্বাসের নিরস বিবৃতিতে পরিণত হয় নি। ১৯৬০ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, অহী-ভূষণ মালিক আর বম্বের সলিল ঘোষের উদ্যোগে বম্বেতে কলকাতার তরুণ শিল্পী-দের এক প্রদর্শনী হয়, কন্টেম্পোরারি ইয়ং আর্টিস্ট অফ বেঙ্গল নাম দিয়ে। নিখিল ছিলেন তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। সে প্রদর্শনীতে নিখিলের একটি ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সে ছবিটির নাম ছিল 'কঙ্গো, ১৯৬০'। প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যার প্রতিক্রিয়াতে ছবিটি আঁকা হয়। ছবিটিতে ছিল একটি কষাইয়ের ছুরি আর ছাল ছাড়ানো উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা দগদগে লাল-সাদা একটি কষাইয়ের দোকানের ছাগল। ছবির ভাষায় ওটি ছিল একটি 'স্টিল লাইফ'। কিন্তু কি জান্তব স্টিল লাইফ, কি ভীষণ প্রতিবাদ!

নিখিল-শ্যামলদের 'চিত্রাংশু' এই বম্বাই এক্জিবিশনের অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল। অরুণ, সনৎ, সোমনাথদাদের আর্টিস্টস সার্কল তখন টিঁকে ছিল। বম্বের সাফল্যময় এক্জিবিশনের পরে সকলে মিলে ঠিক করলাম নতুন সংস্থা করা হবে। জন্ম হলো সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিসটস-এর। নিখিল, শ্যামল, শৈলেন, অরুণ, সনৎ, অহীভূষণ হলেন উদ্যোক্তা। এলেন অনিল, বিজন, প্রকাশ, সোমনাথ, রেবা, কমলা, সুকান্ত। একটু পরে সুধীর-রঞ্জন, সুকুমার, সুনীল, রঘুনাথ, শর্বরী। অর্থাৎ বাংলাদেশের চিত্র ও ভাস্কর্য জগতে নাম করতে পারা যায় এমন সবাই এলেন। আর্টিস্ট্রি হাউসে দারুণ প্রদর্শনী হলো। তার পরেই ধরলো ভাঙ্গন। সবাই তারুণ্যের তেজে, ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচিতে ছিলেন অবিচল এবং গরিমাদৃপ্ত। কিছুটা অসহিষ্ণু। মতপার্থক্য হতে লাগলো। নিখিল, বিজন, কমলা, প্রকাশ, অহীভূষণ গ্রুপ ছেড়ে চলে গেলেন। বন্ধুত্ব কিন্তু নষ্ট হলো না। কারণ শিল্প সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণায় আমরা সকলেই যে ছিলাম যুগ-শরীক সতীর্থ। বছর দুয়েক পরে রঞ্জন এলেন আমাদের নতুন বন্ধু হয়ে। রঞ্জন, বিজন, নিখিল আর গোপাল, রবীন, বিমল মিলে গড়লেন 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স' গ্রুপ। নীরোদ মজুমদার মশাই তাঁদের প্রাথমিক প্রেরণা যোগালেন। তারপর নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বার পর তাঁর জায়গা নিলেন পরিতোষ সেন। বিমল, গোপাল, রবীন একটু দূরে সরে গেলেন। কাছে এলেন প্রভাস সেন, শর্বরী আর মিলু। প্রকাশ কিন্তু সেই কন্টেম্পোরারি সোসাইটি

ছাড়ার পর থেকে একক। অথচ সবাইয়ের অত্যন্ত নিকট বন্ধু। 'ক্যালকাটা পেইণ্টার্স' গ্রুপ এর মধ্যে একটা সযত্ন রক্ষিত দূরত্ব বজায় রেখে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। অনেকেই একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। কেউ কেউ একদা রেবেল নিখিল আর বিজনকে একটু ভুলও বুঝলেন। এর মধ্যে নিখিল অনেকগুলি একক প্রদর্শনী করে ফেলেছেন, অনেক গ্রুপ শো-তে অংশ গ্রহণ করেছেন। বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ছবি বেশ বিক্রি হচ্ছে। বাড়িতে বিদেশী, বিদেশিনী ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। চেতলার সরু গলিতে গাড়ি থেকে বিদেশী মুখ দেখা গেলেই পাড়ার লোকেরা আঙ্গুল তুলে 'ছারাদা'র অর্থাৎ নিখিলের বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছে। এমন সময়ে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে এলেন শিল্প ঐতিহাসিক ডিয়েটর স্মিডট ও তাঁর স্ত্রী, বললেন, পূর্ব জার্মানীতে তাঁরা নিখিলের প্রদর্শনী করবেন। যেমন বলা তেমন কাজ। নিখিলের বিশাল বিশাল ড্রইংগুলি বেঁধে নিয়ে তাঁরা উঠলেন। কলকাতার পশ্চিম জার্মানীর কন্সালের আপিসের কর্তা ব্যক্তিরা বললেন, শুধু পূর্ব জার্মানীতে দেখালেই চলবে না, তুমি মত দাও আমরা ওগুলো পশ্চিম জর্মানীতে দেখাই। নিখিল মত দিলেন। এগারোই নভেম্বর ডিয়েটর স্মিডট ড্রেসডেন থেকে নিখিলকে যখন লিখলেন, লাইপৎসিগ, আর হাল্লেতে তোমার প্রদর্শনী অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কাগজপত্রে যে সব প্রশংসাসূচক সমালোচনা বেরিয়েছে তার কাটিং এর সঙ্গে পাঠালাম। ড্রেসডেনেও এ পর্যন্ত তোমার ছবি অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে। এর পর প্রদর্শনী যাবে বার্লিনে। তোমার ছবি বিক্রির টাকা কিভাবে পেতে চাও জানাও। আর তোমার পক্ষে কি এদেশে আসা সম্ভব?' তখন, কি তিনি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে সেদিন বিকেলেই কলকাতায় নিখিল সব প্রশ্ন আর উত্তরের বাইরে চলে গিয়েছে।

নিখিলের মৃত্যুতে আমরা আবার অনেক দিন পরে সবাই মিললাম। ২০শে নভেম্বর, রবিবার সকালে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের ছবির নীচে সুধীর খাস্তগীর আর নীরোদ মজুমদারের ছবির মুখোমুখি, গোপাল ঘোষ আর আমিনা করের ছবির দিকে মুখ ফিরে, সোমনাথ, অরুণ, সনৎ আর শ্যামলের ছবির সামনে আমরা আবার সকলে বসলাম। আমরা সোসাইটি অফ কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্‌ট্‌স-এর সবাই। আমরা 'ক্যালকাটা পেইণ্টার্স'-এর সবাই। এসেছিলেন তরুণতর 'ষড়ঙ্গ' গোষ্ঠীর সবাই। আরও সব চিত্রকর, ভাস্কর আর কলকাতার শিল্পরসিক বন্ধুরা।

ঠিক করা হলো নিখিলের স্ত্রী বীণা আর আবাল্য সুহৃদ-সহচর কর্মী নির্মলের কাছে আর অন্যান্য বন্ধুদের হেফাজতে নিখিলের যে সব ছবি আছে তার একটা বিশদ তালিকা করা হবে। ঠিক করা হলো, নিখিলের ছবির দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের কাছে অনুরোধ জানানো হবে তাঁদের কাছে যে সব ছবি আছে তার বিশদ বিবরণ যেন তাঁরা দয়া করে জানান। ঠিক করা হলো, নিখিলের কিছু নির্বাচিত ছবির রঙিন আর দু' রঙা ফটোগ্রাফ তুলে রাখা হবে।

নিখিল পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, ভীষণ বেশী করে বেঁচে ছিলেন। ভালবেসেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন। দায়িত্বশীল স্বামী হয়েছিলেন। দুই সন্তানের স্নেহময় পিতা হয়েছিলেন। অসংখ্য লোকের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিলেন। প্যাসান নিয়ে বন্ধুত্ব করেছেন, প্যাসান নিয়ে ঝগড়া করেছেন। প্রচণ্ড কাজ করতে পারতেন, খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন। ছবি যখন এঁকেছেন ভূতগ্রস্তের মতন মগ্ন হয়ে ঝড়ের মতন এঁকে গেছেন। হাজার হাজার ছবি এঁকেছেন। তাঁর বিভিন্ন পর্বের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন অন্তত হাজার খানেক ভালো ছবি তো বীণা দেবী, নির্মলবাবু আর সেন মশাইয়ের জিম্মাতেই আছে। বন্ধুরা সেদিন একমত হয়ে বললেন, নিখিলের ছবির একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী করা বাংলাদেশের শিল্পী সমাজের আশু কর্তব্য। উপস্থিত শিল্পীরা এবং শিল্পী-সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা অর্থ এবং পরিশ্রম দিয়ে সেই প্রদর্শনীকে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ হলেন। কিন্তু অতবড় প্রদর্শনীর জন্য জায়গা কোথায় পাওয়া যায়! অন্তত পনেরো দিনের জন্য অত বড় জায়গা নেবার মতন পয়সা কোথায়? একমাত্র অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এরই অতবড় জায়গা আছে। কিন্তু অ্যাকাডেমি কি পনেরো দিনের জন্য বিনা খরচে অতবড় জায়গা ছেড়ে দেবেন? কে যেন বললেন, 'দেবেন নাই বা কেন? ও'রা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সব-চেয়ে পুরনো শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশের শিল্পীদের প্রতি ও'দের কর্তব্য তো সবচেয়ে বেশী।' অন্য আরেকজন বললেন, বাংলা দেশের নামী তরুণ শিল্পীরা এবং তাঁদের সংস্থাগুলি যদি লেডি মুখার্জি এবং রথীনবাবুর কাছে অনুরোধ জানান তবে ও'রা তো অমত করবেনই না, বরং সানন্দে রাজী হবেন।' ঠিক হলো নিখিলের ছবির Retrospective Exhibition-এর জন্য অ্যাকাডেমির সাহায্য চাওয়া হবে। দিল্লীতে প্রদর্শনীর জন্য চাওয়া হবে ললিতকলা অ্যাকাডেমি এবং অল-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফট্‌স সোসাইটির সাহায্য, আর বম্বের জন্য আর্টিসট্‌স এইড সেণ্টারের সাহায্য।

কিন্তু মিত্র ইনস্‌টিট্যুশনের কলাশিক্ষক নিখিল বিশ্বাসের স্ত্রীর কথা কি আমরা একবারও ভাবব না? অবশ্যই ভাবব। ঐ বড় একজিবিশন থেকে ছবি বিক্রির চেষ্টা করা হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের সবই যাবে তাঁর কাছে। ললিত-কলা আকাদেমিকে বলব, আপনারা আপনাদের স্থায়ী শিল্প সংগ্রহশালার জন্য নিখিলের ছবি কিনুন। সে আবেদন জানাব ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টস-এর কিউরেটর প্রদোষ দাশগুপ্তের কাছে। লেডি মুখার্জিকেও বলব ও'দের নবনির্মিত স্থায়ী গ্যালারীর জন্য নিখিলের বেশ কিছু ছবি কিনতে।

ঠিক হলো ললিতকলা আকাদেমির সাধারণ সম্পাদক ভবেশচন্দ্র সান্যাল মশাই আর পত্রিকা সম্পাদিকা জয়া আপ্পাস্বামীকে অনুরোধ করা হবে ললিতকলা আকাদেমির আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের পরিচয়সূচক পুস্তকমালায় নিখিলের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করার জন্য।

অনেক কিছু করতে হবে। শিল্পীদের নিজেদেরই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংহত হয়ে করতে হবে। এ-করা শুধু নিখিলের জন্য নয়। এ-করা আমাদের জেনারেশনের শিল্পের জন্য। এ-করা আসলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

শিশুর যত্ন নিতে সেরা

এত নরম—মনে হবে যেন মায়ের কোল পেয়েছে

এত স্বাস্থ্যসম্মত—সহজেই পরিষ্কার করা চলে—অনেক মিনিটের মধ্যেই ধুয়ে, শুকিয়ে আগের মত ব্যবহার করা চলে—এমন কি বীজাণুমুক্ত করা চলে।

নানা রকম সুবিধে—উভয় দিকেই ব্যবহার করা চলে আর আচ্ছাদনী দিতে হয় না—জল, তেল, পেট্রল, চর্বি বা কীট-বিনাশক দ্রব্য এর কোন ক্ষতি করে না

এত হাল্কা-ছোট ছেলেও এটি অনায়াসে তুলতে পারে

কিনতে খরচ খুবই কম—অন্য যে কোন রবার ফোম গদির চেয়ে দামে কম

আরও পাওয়া যায়

বেবী বোলস্টারস্
বেবী বালিশ
বেবী প্র্যামসেট
কোল বালিশ খেলনা

অনেক ধরনের বাহারে রঙে

U-FOAM
ইউ-ফোম

একটি বিস্ময়কর বহুকাজের উপযোগী ইউরিথেন ফোম

প্রস্তুতকারক
ইউ-ফোম প্রাইভেট লিমিটেড
সনতনগর, হায়দ্রাবাদ-১৮

PDS-UP-464 BEN

ডিস্ট্রিবিউটর ঃ

পি সাঙ্ঘভী অ্যাণ্ড কোং

৭এ, এলগিন রোড, কলিকাতা—২০ (ফোন ঃ ৪৭—৩৮৯৩)

কার্জন রোডের ম্যাক্সমুলার ভবন

দিল্লির ডায়েরি

"ম্যাকস্‌মুলার ভবন" অনেক প্রকারের অনেক ভবনদের মধ্যে একটি হলেও, ভারতবর্ষে এই স্বদেশী-বিদেশী সংস্থাটি এক অনন্য স্থান করে নিয়েছে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের কাছে, বিশেষত যারা বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় এগিয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য ম্যাকসমুলার ভবন অত্যন্ত সহায়ক।

এখানকার ভবনটিই সবচাইতে প্রাচীন, ১৯৫৭ থেকে। তারপর হয়েছে আরো ছ'টি: কলকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, পুনা, রুরকেলা আর হায়দরাবাদ। বোম্বেতে একটি খোলা হবে অদূর ভবিষ্যতে। বছর ষাট-সত্তর আগে জার্মান পণ্ডিত ম্যাকসমুলার সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে যেমন আবিষ্কার করেছিলেন ভারতকে পাশ্চাত্য জগতের কল্যাণে, আজ ম্যাকসমুলার ভবনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশ আবিষ্কার করছে জার্মানীকে—জার্মান ভাষা, চারুশিল্প, সংগীত বিজ্ঞান, টেকনোলজি, ইতিহাস—এক কথায় কৃষ্টিকে।

ডক্টর রুস্‌, ডাইরেক্টর-জেনারেল, গ্যেটে ইনস্‌টিটিউট, মুনিখ্‌

শুরুতে এই সংস্থা পরিচালিত হচ্ছিল পশ্চিম জার্মেনীর দূতাবাসের কৃষ্টি-শাখা দ্বারা। ১৯৬২-৬৩ থেকে পরিচালনার ভার নিয়েছে মুনিখের বিখ্যাত সংস্থা, গ্যেটে ইনস্টিটিউট এবং ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন ডক্টর ভেরনের রুস। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল সেদিন ছোট্ট একটি সাংবাদিক সম্মেলনে, জার্মান প্রেস আতাশে কেম্পলিনের বাড়িতে। উনি ভারতীয় সংগীতের খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, জার্মেনীতে প্রচুর সুযোগ আছে ভারতীয় নৃত্য-গীত-সংগীত দেখানো-শুনানোর। তাঁর মতে, দুই দেশের ভিতর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান (যেমন হচ্ছে ম্যাকসমুলার ভবনের সহায়তায়) ছিল দুই সভ্যতার ভিতর যোগসূত্র স্থাপন করা, দুই সভ্যতার পারস্পরিক জানাশোনা, পরিচয়, বন্ধুত্ব।

ভারত আজ উঠতি দেশ, শিল্প, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দিকে। দেশের বহু ছেলেমেয়ে পারদর্শী হতে চায় কল-কারখানার নানা কাজে, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে। আজ তাদের সামনে সুযোগও অনেক। জার্মান ভাষা শিখে জার্মান দেশে বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা নেওয়া হল একটা মস্ত সুযোগ, যেমন সুযোগ আছে ইংরিজীর মাধ্যমে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে। (অধুনা তৃতীয় স্থান বোধ হয় রুশ ভাষার।) ম্যাকসমুলার ভবনের কাজ-কর্মের একটা বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তাই—জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া।

দিল্লীর ম্যাকসমুলার ভবনের দুটি অংশ: একটি তিন নম্বর কার্জন রোডে, অন্যটি কনট্‌প্লেসে "ই" ব্লকে, মার্কেনটাইল

ম্যাকস্‌মুলার

একটি সংগীত বৈঠকে কয়েল-রয়টের বাঁশী বাজাচ্ছেন। গান করছেন তাঁর স্ত্রী এবং পিয়ানোতে আকাশবাণীর শ্রীমতী নানাবতী

ব্যাংকের উপরে। কার্জন রোডে ভাষা শিক্ষার ক্লাস, আর আছে একটি মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ। এখানেই তৈরী হচ্ছে এদের নতুন বাড়ি। ভারতে এই প্রথম হচ্ছে ম্যাকসমুলোর ভবনের নিজস্ব ভবন। আরো বছর খানেক লাগবে সম্পূর্ণ হতে। ভাষা শিক্ষার দুটো সেমেস্টার প্রতি বৎসর জানুয়ারি থেকে মে, এবং অগস্ট থেকে ডিসেম্বর। পুরো কোর্স শিখতে বছর চারেক লাগে। এটা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের উপর। ভাষা শিক্ষার জোর হল ব্যাকরণ আর কথা বলার দিকে। গোড়া থেকে শেখানো হয় আধুনিক ডাইরেকট্ মেথডে: অর্থাৎ জার্মান ভাষায় সোজাসুজি শেখানো। এখানে আছেন তিনজন জার্মান অধ্যাপক, আর চারজন ভারতীয়।

গেটে ইনস্টিটিউটের অধীনে এঁরা যে ম্যাকসমুলোর কেন্দ্র খুলেছেন পুনাতে সেখানে আছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব জার্মান স্টাডিজ। ওটা হল শিক্ষক তৈরি করার আবাসী-কলেজ। ডক্টর রস বললেন: "আমরা প্রয়োজন অনুভব করছি, আরো বেশী করে ভারতীয় শিক্ষকদের, যাঁরা নিজেরাই শেখাতে পারবেন জার্মান ভাষা। আমাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান তাতে আরো বাড়বে, আরো উন্নত হবে।"

কনট্ প্লেসের শাখায় আছে লাইব্রেরি ও লেকচার রুম। প্রত্যেক সপ্তাহে বসে একটি করে আলোচনা বৈঠক। প্রতি দুই সপ্তাহে একদিন (শনিবার) রেকর্ড-করা সংগীত। আরেকটি আছে নাট্যচক্র। কিছু দিন আগে এরা অভিনয় করেছিল কয়েকটা দৃশ্য, বেরথর্ট্-এর "সেজুনের ভালো মানুষ" থেকে। অন্যান্য সংস্থার মতো এদেরও রয়েছে সিনেমা বিভাগ। প্রায়ই দেখান হয়।

রাজধানীর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, এখানকার ম্যাকসমুলোর ভবন একজন পরিচালক পেয়েছে, যিনি শুধু জার্মান ভাষায় পণ্ডিত নন, একজন নাম-করা সংগীতজ্ঞও বটেন। উনি হলেন প্রফেসর কয়েল-রয়টের। নিজে ভাল বাঁশী বাজান, আর ওঁর স্ত্রী মার্গারিটা অপেরা-গায়িকা, সোপ্রানো। প্রফেসর কয়েল-রয়টেরের অবদান প্রচুর। গত কয়েক বছরে ইনি পাশ্চাত্ত্য সংগীত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন সংগঠনমূলকভাবে। ইনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এখানে দিল্লী চেম্বর অর্কেস্ট্রা। একটি যৌথ সংগীতের "কয়ের" গঠন করেছেন, এবং হনুমান রোডে জুনিয়র মডার্ন স্কুলে নতুন [illegible] ক্লাস খুলেছেন পাশ্চাত্ত্য [illegible] শেখানোর। পিয়ানো, বেহালা, বাঁশি [illegible] কণ্ঠসংগীত। স্বামী স্ত্রী দুজনেই [illegible]। প্রফেসর নিজে হলেন ভারতের সমস্ত ম্যাকসমুলোর ভবনগুলোর সুপারভাইজার, এবং দিল্লীর ভবনটির ডাইরেক্টর।

ম্যাকসমুলোর ভবন নামক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন বস্তুত ডক্টর রাউ। উনি গত বছর ডিসেম্বর অবধি ছিলেন। তাঁর আগে ছিলেন ডক্টর কেরকফ্ ও ডক্টর রুয়েসগেন্। সমস্ত কেন্দ্রের পরিচালকরা প্রত্যেকেই জার্মান ভাষা ও সাহিত্যে স্কলার। আরো আছেন দুজন জার্মান শিক্ষক, যাঁরা ডক্টর রাউ-এর সহায়তা করেছেন প্রচুর। একজন হলেন মিস্টার ডবিস্, যিনি এখানকার ভাষা-শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অন্যজন হলেন বর্তমান ভাষা-শাখার কর্তা, মিস্টার পোলে। গত যুদ্ধের আগে ইনি কলকাতায় অধ্যাপক ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে এখানে ইংরেজদের হাতে বন্দী হন।

কার্জন রোডের বাড়িতে আরো একটি সংস্থা আছে। এটি ম্যাকসমুলোর ভবনের অন্তর্গত নয়। নাম হল জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় খবর দেওয়া; শিক্ষক ও স্কলারদের আদান-প্রদান; স্কলারশিপ দেওয়া ইত্যাদি কাজ। অধিকাংশই স্থির হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। পরিচালক হলেন ডক্টর হেসেচারগার। আগে ছিলেন মিস ডুর্কভিটস। যিনি এখন হলেন সাংস্কৃতিক বিভাগের সহকারী, আর যাঁর কাছে সংগ্রহ করা এই লেখার মাল-মসলা।

কনট্ প্লেসের লাইব্রেরীতে আছে প্রায় দশ হাজার বই, জার্মান ও ইংরিজী ভাষায়। ভারতীয় প্রাচ্যবাদ, জার্মান সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি অর্থনীতি নানা বিষয়ে।

লাইব্রেরির একাংশ

খগেন দে সরকার
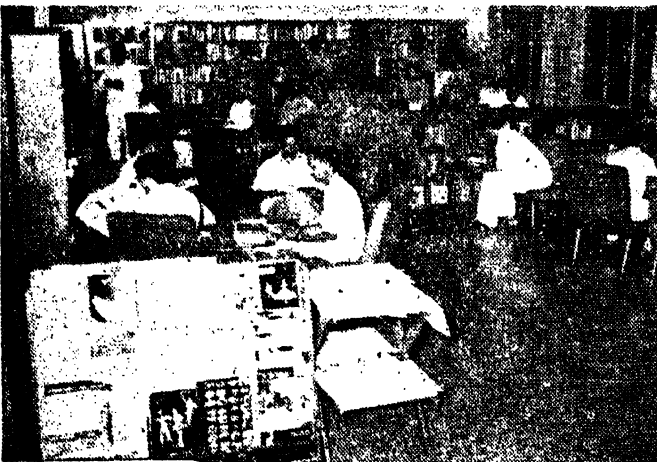
গান্ধীজীর দূত

সুধীর ঘোষ

দু'টি ঐতিহাসিক চিঠি

ভারতবর্ষের নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২০শে মার্চ তারিখে লণ্ডন থেকে যাত্রা করেন, এবং ২২শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লীতে পৌঁছন। ১৯শে মার্চ তারিখে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ভারত-সচিবের দপ্তর থেকে তিনি তখন তাঁর কার্যভার বুঝে নিচ্ছিলেন। সেই সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন লাসেলস্ আমাকে ফোন করে বললেন যে, নবনিযুক্ত ভাইসরয় ভারতে রওনা হবার আগে আমি যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি ও কথাবার্তা বলি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি এমনভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন যেন আমি তাঁর অনেক কালের বন্ধু। তিনি বললেন যে, ভারত-সচিব ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের কাছে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথাও তিনি জানেন। অতঃপর ভারত সম্পর্কে তাঁর কর্মপন্থার একটা আভাস আমাকে দিলেন তিনি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যা-কিছু তিনি শুনেছেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক তা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। জানালেন, ভারতবর্ষে পৌঁছে পর পর কাদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। এত খোলাখুলিভাবে তিনি আমাকে সব কথা জানাচ্ছেন কেন, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না। একটু বাদেই সেটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। আলোচনা শেষ করে তিনি বললেন, ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা তো অনিবার্য। যাই হোক, আপনি যদি একটা উপকার করেন তো বড় ভাল হয়। **নয়াদিল্লি পৌঁছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমি মিঃ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সর্বাগ্রে আমি তাঁরই সঙ্গে দেখা করব।** তবে ভারত-সচিবের কাছে শুনতে পেলাম যে, তিনি এখন দিল্লি থেকে অনেক দূরে। বিহারে যেখানে খুব সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল, তিনি নাকি এখন সেইখানে রয়েছেন। তিনি দিল্লি আসতে রাজী নন। এমন কী, মিঃ নেহরুও তাঁকে নাকি দিল্লি আসতে রাজী করাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আপনি কি তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেবেন? চিঠিখানা আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আজ রাত্তিরেই চিঠিখানা আপনাকে লিখে ফেলতে হবে, এবং কাল সকাল আটটার মধ্যে ১৬নং বেলগ্রেভ স্কোয়ারে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িটা হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদের ঠিক পেছনে। সকাল আটটার কিছু পরেই আমি বিমানযোগে ভারত-যাত্রা করব। আমি আপনাকে যা-যা বললাম, মিঃ গান্ধীকে তার বিবরণ আপনি চিঠির মধ্যে জানিয়ে দিন, এবং দিল্লি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে তাঁকে রাজী করাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

বস্তুত এটি পরিচয়পত্র ছাড়া আর কী; আর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভাইসরয় কিনা আমার মতন মানুষের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিচ্ছেন! লর্ড ওয়াভেল এমন কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু নতুন ভাইসরয় সেই তুলনায় অনেক বেশী বিচক্ষণ মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গান্ধীজীকে দিল্লি আনাবার জন্য কাকে দিয়ে চেষ্টা করাতে হবে।

আর্থার বটমলি, উড্রো ওয়াট এবং পার্লামেন্টের আরও অন্য কয়েক তরুণ শ্রমিক সদস্য সে রাত্রে কমন্স সভার রেস্তোরাঁয় আমাকে সস্ত্রীক ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেন। হোয়াইট হল থেকে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ পর্যন্ত হেঁটে

গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তাঁদের বললাম যে, নতুন ভাইসরয় আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে একটি চিঠি লিখতে বলেছেন; চিঠিটা আজই লেখা দরকার, কাগজ পেলে সেখানে বসেই চিঠিটা আমি লিখে ফেলতে পারি। 'কমন্স সভা'র ছাপ-মারা কাগজ ছাড়া অন্য রকমের কাগজ তাঁরা দিতে পারলেন না। এ কাগজ সাধারণত পারলামেন্টের সদস্যরাই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কী আর করা, অন্য কাগজ না থাকায় তারই উপরে চিঠিটা আমি লিখে ফেললাম, এবং পরদিন সকালে সেটি ১৬নং বেলগ্রেভ স্কোয়ারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলাম। যথাসময়ে মহাত্মার কাছ থেকে উত্তর এল। উত্তরে তিনি লিখলেন:

পাটনা,
২১-৪-৪৭

"চিরঞ্জীব সুধীর ও শান্তি,

তোমাদের সমস্ত চিঠিই আমি পেয়েছি। কাজের চাপ এখন এত বেশী যে, নিতান্ত জরুরী চিঠি ছাড়া অন্য চিঠির উত্তর দেবার মত সময় পাই না। তোমাদের আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তোমাদের যদি আমাকে কিছু জানাবার থাকে, শুনব। ভাইসরয় সম্পর্কে যা-কিছু আমার করতে হয়েছে, তার খবর তোমরা নিশ্চয় পেয়ে থাকবে। পরস্পরকে আমাদের ভাল লেগেছে। ঘটনাই প্রমাণ করবে, তিনি কী ধাতু দিয়ে গড়া মানুষ। তবে, নৌ-বাহিনীর মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তিনি খুব পরিশ্রম করছেন।

তোমাদের দু'জনেরই ওখানে পরীক্ষা চলেছে। তোমরা যে এতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। শান্তি কেমন আছে? তার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে তো? ওখানে সে কী শিখছে?

আমার কাজ খুবই কঠিন। কিন্তু তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। কাজটা যখন হাতে নিই, তখনই তো এর দুরূহতার কথা আমি জানতুম। আশা করি, কিছু কিছু ভারতীয় কাগজপত্র তোমরা পাচ্ছ। আগাথা ও অন্যান্য বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানিও। আশা করি কার্লের স্বাস্থ্য এখন আগের চাইতে ভাল।

তোমাদের দু'জনকেই আমার ভালবাসা জানাই।

বাপু"

হাতের লেখা কাঁচা; দেখে মনে হল, বাচ্চা কোনও মেয়েকে দিয়ে চিঠিখানি লেখানো হয়েছে। চিঠির একেবারে শেষে গান্ধীজী তাঁর আপন হাতে দু' লাইন লিখে দিয়েছেন। "কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছি, তাতে বোকামি করে ভুল ঠিকানা লেখা হয়েছিল; এটি তারই নকল। মূল চিঠি আমি আপন হাতে লিখেছিলাম।" এত তাঁর দুঃখ, এত তাঁর নিঃসঙ্গতা, কিন্তু তার মধ্যেও—পাছে আমি বেদনা পাই, তাই—তিনি জানাতে ভোলেন নি যে, নিজের হাতেই তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পিতা তাঁর সন্তানের কাছে আপন হাতে চিঠি লেখেন নি, অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, এমন ধারণা করে আমি হয়ত কষ্ট পেতে পারি। কী গভীর ছিল তাঁর ভালবাসা, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

মূল চিঠিতে ভুল করে আমার ঠিকানা লেখা হয়েছিল: "সুধীর ঘোষ, হাউস অব কমন্স, লনডন"। পরে অবশ্য সেটিও পেলাম। ব্রিটিশ ডাক বিভাগ কর্মদক্ষ। আমার প্রকৃত ঠিকানা খুঁজে বার করে কেনসিংটনে আমার ফ্ল্যাটে তাঁরা চিঠিখানি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত বেশ ভালয়-ভালয় কাটল। তার দিন কয়েক বাদেই শুরু হল আমার বিপদের পালা। বাপু যা আশঙ্কা করেছিলেন, তা-ই সত্য হল। শ্রীনেহরুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম আমি। ৬ই এপ্রিল তারিখে লেখা চিঠি; উপরে লেখা 'ব্যক্তিগত'। তাতে তিনি জানালেন:

১৭ ইয়র্ক রোড,
নয়াদিল্লি, ভারতবর্ষ
৬ই এপ্রিল, ১৯৪৭

"প্রিয় সুধীর,

লনডনে ভারত-বন্ধু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাগজে এই খবর পড়ে আমি কিছুটা বিস্ময় বোধ করেছি। এ-রকম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যে ভাল কাজ সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের কোনও সমিতি গঠনের উদ্যোগ করলে তাতে সুবিধে হয় কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। এমন কী, কংগ্রেসও এই ধরনের কাজ করেনি; তার কারণ কংগ্রেসের মনে হয়েছিল যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় ব্যবস্থা থাকলে এই ধরনের সমিতির মূল্য কমে যায়। ভারত সরকারের পক্ষে এ কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। উদ্যোগটার অপব্যাখ্যা হতে পারে, এবং বলা হতে পারে যে, এটা একটা দলীয় উদ্যোগ।

২। এ বিষয়ে আমি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছি; ভেলোডির কাছেও লিখছি। যা করা হয়েছে, তা ভেঙে দেওয়া হোক, এমন কথা আমি বলি না। সেটা করা শক্ত হবে; তার ফলাফলও অনাকাঙ্ক্ষনীয় হতে পারে। তবে তুমি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে খুবই সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হবে, এইটেই আমি চাই।

৩। সমিতির লোকজনদের যে তালিকা দেখছি সেটাকে অবশ্যই ভালই মনে হচ্ছে। তাদের মেলামেশার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাও ভাল। তবে সরকারীভাবে এর উদ্যোগ হওয়াটা আমার মনঃপূত নয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে কাজ তুমি করবে, সেটাকে দলীয় কাজ বলে মনে করা হবে, অথবা লনডনে কিংবা অন্যত্র ভারতীয়দের মধ্যে তা নিয়ে সমালোচনা হবে, এটা আমি চাই না। আমরা এখন একটা অস্বস্তিকর ও দুরূহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি, এবং কী আমরা করব এবং কীভাবে তা করতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।

আন্তরিকভাবে তোমার
জওহরলাল নেহরু"

শ্রীসুধীর ঘোষ,
ইনডিয়া হাউস,
লনডন

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, লনডনে কিছু মানুষকে আমি এক জায়গায় এনে মিলিয়েছিলাম। এই গোষ্ঠীটিকে বলা হত 'ভারত-বন্ধু'। শ্রীনেহরুর পুরনো বন্ধু এইচ এন ব্রেলসফোর্ড ছিলেন এর নেতা। ভারতবর্ষের সমস্যা আর অসুবিধার কথা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলাই ছিল এঁদের কাজ। ভারত সরকারের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর কোনও সম্পর্কই ছিল না। উদ্যোগটা আমারই বটে, কিন্তু সরকারী সম্পর্কের কোনও নামগন্ধ এতে ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বিশিষ্ট ব্রিটনদের এই গোষ্ঠী যদি ভারতবর্ষের বক্তব্য ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেন, তবে তাতে আশু কাজ হবে; এবং ভারত সরকারের বেতনভোগী কর্মচারীরা যা করবার চেষ্টা করছেন, এতে করে তার জোর আরও বাড়বে। গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য কী, এইচ এন ব্রেলসফোর্ডের লেখা এই চিঠিখানি পড়লেই তা বুঝতে পারা যাবে।

৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেন্‌স্‌,
লনডন, এন ডব্‌লু, ৩
২৬শে মে, ১৯৪৭

"প্রিয় জওহরলাল,

এই চিঠি আপনার কাছে আমার ও আমার স্ত্রীর গভীর ও সস্নেহ শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কাজে-ঠাসা এই জটিল দিনগুলিতে সারাক্ষণই আপনার কথা চিন্তা করি আমরা, এবং আপনার শক্তি ও মানসিক শান্তি কামনা করি। জানি না, এর মধ্যে দিন-কয়েকের জন্য আপনি পাহাড়ে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পেরেছেন কিনা।

এবারে জানাই আমাদের নতুন গোষ্ঠী ভারতবন্ধু-সমিতির কাজ কেমন চলেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁদের কিছুটা বন্ধুসুলভ আগ্রহ আছে ও স্বাধীনতার নবযুগে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, সব দল থেকেই এখন ইংরেজকে আমরা এই সমিতির মধ্যে টানতে চাই। আপনি তা নিশ্চয়ই বুঝবেন। শুধুমাত্র ব্রিটিশরাই এর সদস্য হতে পারবেন। এই ব্যাপারটার উপরে আমি এইজন্যে গুরুত্ব দিচ্ছি যে, লনডনের কিছু ভারতীয় এর উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝেছেন, এবং ভেবেছেন যে, এটা বুঝি ইনডিয়া লীগেরই একটা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য ও সংগঠন কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। এর সদস্যদের মধ্যে সর্বদলেরই লোক আছেন। তবে বলাই বাহুল্য, যে ক'জন টোরি আমাদের সঙ্গে আছেন, স্বাধীনতায় তাঁদের সম্মতি আন্তরিক। এ পর্যন্ত যে ক'জন সক্রিয় সদস্য পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন সার স্ট্যানলি রীড, সার জর্জ শুস্টার, লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট, উডরো ওয়াট ও আমি। তবে অবশ্য অনেকেও আমাদের কোনও-না-কোনও আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন লর্ড বীভারিজ, সার হ্যারল্ড নিকলসন ও গ্রাহাম হোয়াইট। আর এন বাটলার আমাদের প্রথম সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুধীর ঘোষের মাধ্যমেই এ যাবৎ আমরা যোগরক্ষা করেছি; তাঁর সম্পর্কে আমাদের সকলেরই খুব উঁচু ধারণা। ঠিক লোককেই আপনি নির্বাচন করেছেন। তাঁর চাইতে পছন্দসই ও জনপ্রিয় জন-সংযোগ অফিসারের কথা ভাবাই চলে না। তিনি খুবই উদ্যোগী ও কল্পনাশীল মানুষ; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁর কাজের সুফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, জনসাধারণ আরও বন্ধুভাবাপন্ন ও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের এই গোষ্ঠী কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। ভাবছি, স্টারলিং ব্যালান্‌স নিয়ে খুব শিগগিরই একটা প্রকাশ্য আলোচনার ব্যবস্থা করব। একজন ভারতীয় সেখানে আপনাদের বক্তব্য বিবৃত করতে পারেন। জনসাধারণের মধ্যে যারা ভারতের অনুরাগী এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য তাদের কাছেও এখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি। তবে সময়-নির্বাচনটা যাতে ঠিক হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কী সিদ্ধান্ত যে নেব, তা

আমরা এখনও জানি না। তবে একটা কথা ঠিক, সেটা এই যে এই গোষ্ঠীকে ঘিরে বেশ বড় ও প্রভাবশালী একটা 'বন্ধু' মহল আমরা গড়ে তুলতে পারব।

আমার আশংকা, ভারতবর্ষে একটি ফেডারেল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়ত আপাতত পরিহার করতে হবে। তাই যদি হয়, তবে তার বিকল্প হিসেবে এখন থেকেই কি কনফেডারেশনের কথা চিন্তা করা চলে না? একমাত্র এই পথেই জাতীয় সৈন্যবাহিনীকে অখন্ড রাখার আশা করা যেতে পারে। দ্বৈত রাজতন্ত্রের পুরানো প্রথাটিকে এ ক্ষেত্রে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অস্ট্রিয়া ও হাংগারি, এরা উভয়েই ছিল সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল এক। সরবরাহের ব্যাপারে ভোট দেবার জন্য তাদের প্রতিনিধিরা (প্যারিটির ভিত্তিতে) বছরে একবার মিলিত হতেন। যৌথ-মন্ত্রী ছিলেন তিনজন; তাঁরা পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

ব্যবস্থাটা কার্যকর হতে পেরেছিল (কিছু-কিছু বিরোধ অবশ্য বাধত), তার কারণ হ্যাপ্সবার্গ রাজতন্ত্র এ ক্ষেত্রে যোগরক্ষার

কাজ করেছে। তা ছাড়া এ দু'টি দেশের শুল্ক-ব্যবস্থাও ছিল যৌথ।

হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি এইভাবে যোগসূত্র রচনা করা যায়, তবে সেই কনফেডারেশনের একজন প্রেসিডেন্ট ঠিক করতে হবে।

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলও শেষ পর্যন্ত সেই কনফেডারেশনে যোগ দিতে পারে।

তবে আমি কল্পনা করতে পারি যে, কতখানি ব্যগ্রভাবে আপনি ও আপনার সহকর্মীরা এখন সম্ভাব্য নানা ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখছেন, এবং এর চাইতে আরও ভাল ব্যবস্থার সন্ধান হয়ত আপনারা পাবেন।

আমি ও আমার স্ত্রী আপনাকে, ইন্দিরাকে ও আপনার নাতিটিকে আমাদের ভালবাসা জানাচ্ছি।

চিরকালের জন্য আপনার
নোয়েল বেল্‌সকোর্ড"

এই চিঠিতে অবশ্য কোনও ফল হল না। ঝঞ্ঝাট ক্রমে বাড়তেই লাগল। শ্রীনেহরু ও সর্দার বল্লভভাইয়ের লেখা দু'খানি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

নয়াদিল্লি,
২০শে জুন, ১৯৪৭

"প্রিয় সুধীর,

তোমার চিঠির উত্তরে দিন কয়েক আগে আমি একটি ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছি। তার ঠিক পরেই সর্দার প্যাটেল তাঁর কাছে লেখা তোমার ২৮শে মে তারিখের চিঠির একটি নকল আমাকে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিশ্চয় আলাদাভাবে তোমাকে চিঠি লিখবেন। তবে আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার যা ধারণা হয়েছে, সেটা খোলাখুলিভাবে তোমাকে আমার জানানো উচিত।

প্রথমেই একটা কথা সকলের স্পষ্ট বোঝা দরকার, সেটা এই যে, লনডনে তুমি সর্দার প্যাটেলের প্রতিনিধিত্ব করছ এবং আমার প্রতিনিধিত্ব করছেন আর কেউ— এ কথা নেহাতই উদ্ভট এবং অর্থহীন। এমন কথা বলাও নেহাত বোকামি যে, সর্দার প্যাটেল ও আমি সরকারে দুই পৃথক নীতি অনুসরণ করে চলেছি। বুদ্ধিমান মানুষদের মধ্যে মতের পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক; কিছু কিছু ব্যাপারে আমাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার ভিত্তিতে আমরা কাজ করে থাকি। তার কারণ শুধুই এই নয় যে, আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল; বর্তমান অবস্থায় সেই সহযোগিতা অত্যাবশ্যকও বটে। লনডনে তুমি বিশেষ কোনও একজন মন্ত্রীর কিংবা অন্য কারও প্রতিনিধি নও; সেখানে তুমি ভারত সরকারেরই প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছ। এ ব্যাপারে সরকার যে-সব নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, স্বভাবতই সেই নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে।

সরকারের রুটিনে-বাঁধা কাজ মাঝে মাঝে লাল্‌ফিতের ফাঁসে জড়িয়ে যায়। সংগত-ভাবেই এর নিন্দাও করা হয়ে থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে রুটিন আর শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাশীল থাকারও কিছুটা মূল্য আছে। এই কারণেই যথাবিহিত পন্থায় কাজ করা দরকার। তা

নইলে বিশৃঙ্খলা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। লনডনে হাই কমিশনারই তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তা। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার উপদেশ চাওয়া উচিত, এবং যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তিনি যে শুধুই তোমার উপরওয়ালা, তা নয়; জীবন সম্পর্কে তিনি অনেক বেশী অভিজ্ঞ, লনডনে তিনি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, এবং তাঁর পরামর্শ নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ভারত সরকারের যে দপ্তরের সঙ্গে তুমি বিশেষভাবে যুক্ত, সেই তথ্য ও বেতার দপ্তরের সঙ্গে তুমি সরাসরি যোগ রাখতে পারবে না।

সরকারী কাজের প্রসঙ্গে এইখানেই ছেদ টানছি। যেমন অন্যান্য ব্যাপারের, তেমনি এরও একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। তোমার চিঠি থেকে এবং অন্যান্য কিছু কিছু বিবরণ থেকে মনে হয়, লনডনে তুমি কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিলে এবং তোমাকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ কথা জেনে আমি বিস্মিত হইনি। নতুন জায়গায় গিয়ে মানুষকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে হয় এবং সহকর্মীদের শুভেচ্ছা লাভের চেষ্টা করতে হয়। তা নইলে সন্দেহ দেখা দেয়। ভারতবর্ষের রাজনীতি এখন জটিল, অন্তত বাইরে থেকে দেখে সেইরকমই মনে হয় এবং প্রত্যহ এখানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক কী যে ঘটছে এবং কোন্ নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে, সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সর্বদা সেটা বুঝে ওঠা শক্ত। নতুন সরকার আসায় নীতির কোনও পরিবর্তন সূচিত হল কিনা তাও স্বভাবতই তাঁরা জানবেন না।

তার উপরে আবার লনডন হচ্ছে ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি। ভারতীয় সংগঠনের সংখ্যা সেখানে কম নয়। তাদের অধিকাংশের অস্তিত্বই অবশ্য নেহাতই খাতায়-পত্রে। ইংলনড-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে স্বভাবতই সর্বরকমের মানুষ রয়েছে। কেউ কেউ অতি চমৎকার মানুষ; আবার কেউ কেউ সর্বতোভাবে অবাঞ্ছনীয়। বাদবাকীরা উপর উপর ভেসে বেড়ায়; অন্যের সমালোচনা করাই তাদের কাজ। নবাগতকে এই সমস্ত-কিছুরই সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর কর্মপদ্ধতি যদি আদৌ আক্রমণাত্মক কিংবা বিস্তারশীল হয়, তবে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন।

তোমার চিঠিতে তুমি কৃষ্ণ মেনন ও লনডনে তাঁর সহকর্মীদের উল্লেখ করেছ। ইনডিয়া লীগেরও উল্লেখ করেছ তুমি। কৃষ্ণ মেননকে আমি ভালভাবেই চিনি। লনডনে তাঁর কাজের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইনডিয়া লীগের কথাও জানি আমি। কৃষ্ণ মেনন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা খুবই উঁচু। তাঁকে আমি আমাদের একজন দক্ষতম মানুষ বলে গণ্য করি। চমৎকারভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, এবং আমরা আশা করি যে, ভবিষ্যতে তিনি এর চাইতেও বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবেন।

ইনডিয়া লীগের মধ্যে নানান রকমের মানুষ রয়েছেন। ভারতীয় দৃষ্টিকোণের বিচারে বলা যায় যে, এটিই হচ্ছে ইংলনডে সবচাইতে কার্যক্ষম সংগঠন। এর যে ত্রুটি নেই তা নয়; অতীতে এই প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু ভুল করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কিংবা অন্যত্র যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই সে কথা বলা যায়। যতটা সম্ভব, ইনডিয়া লীগের কাজের পূর্ণ সুবিধা আমরা নিতে চাই।

তুমি যখন ওখানে যাও, তারপর থেকে কৃষ্ণ মেনন প্রায় একটানা ইংলনডের বাইরে রয়েছেন। আমাদের হয়ে অন্য কিছু কাজ তাঁকে করতে হবে; সেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে শিগগিরই তিনি ইংলনডে ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রাখা উচিত, তোমার যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাঁকে সে কথা জানানো উচিত। সাধারণ অবস্থায় তোমাকে অবশ্য তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

আশা করি, শিগগিরই তোমার অসুবিধা তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে। কত তাড়াতাড়ি পারবে, প্রধানত সেটা তোমারই উপরে নির্ভর করছে। অন্যদের তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না; তবে নিজেদের আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি যাতে অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা যায়। আমার মনে হয়, ইংলনডে তোমার পক্ষে খুবই ভাল কাজ করা সম্ভব; তার কারণ, তুমি কার্যোৎসুক, বুদ্ধিমান, উদ্যোগী। লোকের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করতে পারো, অন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে চলতে পারো। তবে তোমার আর-একটু অভিজ্ঞ হওয়া দরকার; এখনও তুমি একটু কাঁচা। এটা অবশ্য শিগগিরই কেটে যাবে। এমনিতে এটা এমন কিছু
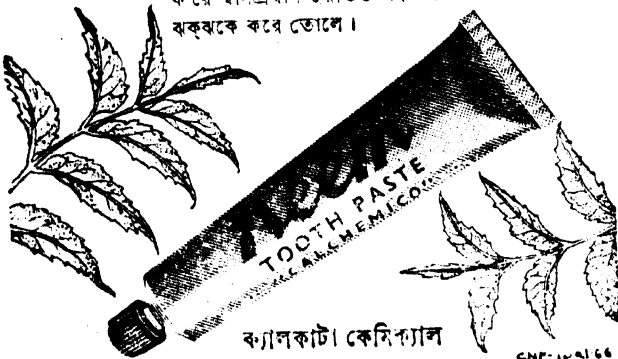
রুতের ব্যাপার নয়। তবে এর ফলে সুবিধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আমার ধারণা, রাজনীতির সঙ্গে মার প্রাথমিক যোগ-সম্পর্কটা ঘটেছে স্টভাবে। সচেনাতেই তুমি রাষ্ট্রীয় তির বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে উঁচু একটা রে মন্ত্রী ও অন্যান্যদের সংস্পর্শে সছ। এ ক্ষেত্রে তুমি নেহাতই অমাদের তিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলে বটে, ন্তু এরই ফলে এমন একটা কার্যধারায় ম অভ্যস্ত হয়ে যাও, যা ঠিক স্বাভাবিক র্যধারা নয়। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, স কয়েক আগে যখন তুমি আমার সঙ্গে খা করেছিলে, তখন আমি তোমাকে লছিলাম যে, এই যে সরাসরি তুমি লনডে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, ঝে-মাঝে এতে কাজের সুবিধে হয় বটে, ন্তু এর অনেক ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে রা হয়ত মনে করবেন যে, তুমি অমাদের তিনিধিত্ব করছ, অথচ বস্তুত তুমি হয়ত না-ও করতে পারো। এর ফলে আমাদের পরে হয়ত দায়িত্ব এসে পড়তে পারে; থচ অন্য পক্ষ সেই দায়িত্বের জালে নজেকে জড়াবেন না।

অতীতে এবং ইদানীং তোমার যে-সব চিঠি পেয়েছি, তার থেকে মনে হয়, ংযমের শাসনে নিজেকে তুমি বাঁধতে শেখোনি; অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ায়িত্ব যাঁর হাতে, আত্মসংযম তাঁর পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক গুণ।

আমি তোমাকে খোলাখুলি সব বলছি। তার কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি; আমি চাই, তোমার উন্নতি হোক। তোমার কাজে যাতে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু ঘটুক, এটা আমি চাই না। তা যাতে না ঘটতে পারে, বলা বাহুল্য, তারই জন্য আমি চেষ্টা করব। কিন্তু আমি আশা করি যে, তুমি নিজেকে আর একটু শৃঙ্খলার শাসনে বাঁধবে, আর একটু সংযত হবে। আমাদের সকলকেই এখন ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের ভার নিতে হবে; তা যাঁরা নিতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য।

এ চিঠি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত: আর কাউকে এটা দেখাবার দরকার নেই। তবে আমার মনে হয়, সর্দার প্যাটেল ও মিঃ মেনোনেরও এটা দেখা উচিত। তাঁদের কাছে, অতএব, এর নকল আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আন্তরিকভাবে তোমার

জওহরলাল নেহরু"

শ্রীসুধীর ঘোষ,

কেয়ার অব দি হাই কমিশনার ফর

ইণ্ডিয়া ইন লনডন,

ইণ্ডিয়া হাউস,

লনডন।

চমৎকার এই চিঠিখানির সুরটা ছিল কূটনৈতিক। সেইটে আমার ভাল লাগেনি। শ্রীনেহরু এই চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, আমাকে তিনি পছন্দ করেন, আমার উন্নতি তাঁর কাম্য, আমাদের সকলকেই ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের ভার নিতে হবে, এবং তা যাঁরা নিতে পারেন তাঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য। এর দ্বারা তিনি কি সত্যি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা যাঁদের আছে, আমাকে তিনি তাঁদেরই একজন বলে মনে করেন?—এবং ভালভাবে কাজ করে আমি যদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে আমাকে তিনি দায়িত্বের পদ দেবেন, এই কথাই কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? না, তা তিনি আদৌ বোঝাতে চাননি। সমস্ত মহত্ত্ব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ জেদী। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, নয়াদিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছিল, আমাকে তিনি তখন অপছন্দ করতে শুরু করেন। আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর চিঠিখানিকে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু বস্তুত তাঁর অযৌক্তিক ধারণাই এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। চিঠিতে তিনি বলছেন যে, ক্যাবিনেট মিশন লনডনে ফিরে যাবার পরে ক্রিপ্স আর পেথিক লরেন্সের কাছে আমি যে চিঠিপত্র লিখতাম, তাতে বিপদের ঝুঁকি ছিল; কেননা, আমার মতন মানুষ এইভাবে চিঠি লেখার ফলে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের কোনও প্রতিশ্রুতির দায়ে আবদ্ধ না করা সত্ত্বেও কংগ্রেস দলের উপরে হয়ত দায়িত্ব এসে পড়তে পারত। কথাটা অর্থহীন। ক্রিপসের অনুরোধে আমি চিঠি লিখতাম। তিনি বলেছিলেন, আমার চিঠি পড়ে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতে তাঁর সুবিধে হয়; আমার চিঠিকে তাই তিনি মূল্যবান মনে করেন। প্রতিটি চিঠি পাঠাবার আগে গান্ধীজী তার খসড়া একবার পড়ে দিতেন। তিনিও মনে করতেন যে, ক্রিপসের কাছে এই যে আমি চিঠি লিখছি, এতে কাজের খুবই সুবিধে হচ্ছে। শ্রীনেহরু যখন লর্ড ওয়াভেলের অধীনে মন্ত্রী, তখন ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার অবাধ উপায় তাঁর ছিল না। আমার বিশ্বাস, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে তাঁর মতামত জ্ঞাপনের ব্যাপারে আমার এই চিঠিগুলি তখন তাঁর পক্ষেও একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

সবচাইতে দুঃখ পেলাম এই কথা বুঝতে পেরে যে, চিঠিখানি আমাকে সম্বোধন করেই লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি এর উদ্দিষ্ট নই, আসলে এর উদ্দিষ্ট হচ্ছেন বল্লভভাই প্যাটেল, এবং মেনোন। (মেনোন তখন অস্থায়ীভাবে হাই কমিশনারের কাজ চালাচ্ছেন।) তাঁদের দুজনের কাছেই শ্রীনেহরু এই পত্রের অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতই যদি এটি একটি ব্যক্তিগত চিঠি হত, এবং একটি তরুণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াই যদি শ্রীনেহরুর লক্ষ্য হত, তা হলে তিনি কিছুতেই হাই কমিশনারের কাছে এ চিঠির অনুলিপি পাঠাতেন না। চিঠির মধ্যে ভাল ভাল যে-সব কথা রয়েছে, সেগুলি আমাকে উদ্দেশ করে ততটা লেখা হয়নি, যতটা বল্লভভাই প্যাটেলকে উদ্দেশ করে। শ্রীনেহরু জানতেন যে, তিনি আমাকে পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু আমার উপরে গান্ধীজী আর বল্লভভাই প্যাটেলের প্রভূত আস্থা রয়েছে। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে সুধীর ঘোষের বিরোধে শ্রীনেহরু একা ছিলেন এক দিকে; অন্য দিকে ছিলেন গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল।

এর কিছুকাল বাদে, ভারতবর্ষে ফিরে এসে, গান্ধীজীকে আমি চিঠিখানি দেখাই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানি পড়লেন। তারপর মন্তব্য করলেন, "বিচিত্র

চিঠি। যিনি লিখেছেন, তিনি একজন মহৎ মানুষ। স্বভাবতই তিনি দয়ালু এবং উদার। একজন তরুণের প্রতি সুবিচার করবার জন্যে তিনি এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু আর এক দিক থেকে তাঁর উপরে আরও প্রবল চাপ পড়ায় তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।" বলা বাহুল্য, গান্ধীজী এখানে কৃষ্ণ মেননের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। মেনন তখন নেহরুর ছায়াস্বরূপ।

এই একই বিষয়ে ডেপুটি 'সিংহ' বল্লভ-ভাইয়ের বক্তব্যও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর এই চিঠি থেকেই তা বোঝা যাবেঃ

তথ্য ও বেতার দপ্তর,
ভারত সরকার,
নয়াদিল্লি, ২৯-৬-৪৭

প্রিয় সুধীর,

তোমার ২৮শে মে, ১৯৪৭ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। চিঠিখানি পেয়ে তোমার সম্পর্কে আমার উদ্বেগ কিছুটা কাটল। যেসব অসুবিধের মধ্যে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। এ ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া কী, স্বভাবতই তা আমি জানতে চাইছিলাম। এখন জেনে খুশী হলাম যে, অসুবিধের তুমি মোকাবিলা করছ। নৈরাশ্য আর ভগ্নোদ্যম ভাবটাও আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু তোমার মতন গুণী ও যোগ্য মানুষ অসুবিধের মোকাবিলা করতে গিয়ে এইভাবে মুষড়ে পড়বে, এটা ঠিক নয়। জনসংযোগ-অফিসারের জীবন তো সুসময়েও এবং অনুকূল অবস্থাতেও পুষ্পশয্যার জীবন নয়। সে ক্ষেত্রে তোমাকে কেন্দ্র করে যে পক্ষপাতদুষ্ট বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে, তাতে ধৈর্য, সাহস আর কৌশল আরও বেশী মাত্রায় থাকা চাই। এইসব অসুবিধের সঙ্গে তোমার পরিচয় যতই বাড়বে, ততই তুমি বুঝতে পারবে, কীভাবে এর মোকাবিলা করতে হয়। এ আমি নিশ্চিত জানি।

জওহরলাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তা আমি দেখেছি। চিঠিখানিতে এমন কিছু আছে, যা হয়ত তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু তার জন্য ভগ্নোদ্যম কিংবা হতাশ না হতেই আমি তোমাকে অনুরোধ করব। তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, শান্তভাবে, বিনম্র মর্যাদায় তা তুমি গ্রহণ ক'রো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে, এ ব্যাপারে তোমার দিকের বক্তব্যও আমি সম্পূর্ণ জানি, এবং আমার উপরে সর্বদাই তুমি এই আস্থা রাখতে পারো যে, তোমার অবস্থাটা আমি সহানুভূতি সহকারেই বিবেচনা করব। যাঁরা তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তাঁদের সন্তোষ-বিধানের জন্য তোমাকে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু তাই বলে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের পরামর্শ তোমাকে আমি দেব না। সরকারী কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে এমন কোনও কথা নেই, যার জন্য তোমাকে তা করতে হতে পারে; যদি তোমাকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে এইসব সম্পর্ক ছেদ করতে বলেন, তা হলে তিনি নিজের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করবেন মাত্র। বস্তুত, এখানেই তুমি যে কাজ নিয়ে রয়েছ, শুধু যে তারই সুবিধের জন্য এইসব যোগ-সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার তা নয়, এতে করে আমাদেরও এখানে কাজের কিছুটা সুবিধে অবশ্যই হতে পারে। তবে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, হাই কমিশনারের মনে যেন এমন ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, তুমি তাঁর অজ্ঞাতসারে কিছু করছ। তুমি যদি বিচক্ষণ হও, এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে হাই কমিশনারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, তা হলে নিশ্চয় তেমন ধারণা তাঁর হবে না।

ওখানকার সংবাদপত্র এবং ব্রিটিশ সরকারের অফিসারদের সঙ্গে তুমি যে মূল্যবান যোগসূত্র গড়ে তুলতে পেরেছ, এ কথা জেনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। যে কঠিন কাজ তোমার হাতে, তা সম্পাদনের ব্যাপারে এতে নিশ্চয়ই তোমার অনেক সুবিধে হবে। কাজে-কর্মে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য যোগ্য একজন লোক পাঠাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্য-বশত, লোক-নির্বাচনের ব্যাপারে ফেডারেল পাবলিক সারভিস কমিশন বড়ই সময় নিচ্ছেন। লোক-নির্বাচন হয়ে গেলে, এবং নিয়োগটা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে তারপর আর তাঁর কাজে যোগ দিতে বিলম্ব হবে না।

জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিকদের যে গোষ্ঠী গড়া হয়েছে, আমার মনে হয় না যে, তার থেকে নিজেকে তোমার ভিন্ন করা উচিত। ভারতবর্ষের মর্যাদার যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, তোমার দায়িত্ব-ভারের গুরুত্বও তার ফলে বৃদ্ধি পাবে; এবং বেসরকারীভাবে যেসব যোগসম্পর্ক তুমি গড়ে তুলেছ, এতে আমাদের কাজের তখন অনেক সুবিধে হবে। আর কিছু না হোক, যারা আমাদের ঘোর বিরোধী, ব্রিটিশ জনসাধারণের সেই অংশের পুরনো বিদ্বেষ তখন দূর হবে, এবং ভারতবর্ষকে নিয়ে দলাদলির প্রশ্ন উঠবে না। এই কারণেই আমাদের প্রচারব্যবস্থায় এমন একটি নির্দলীয় গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ ঘোষণাটিকে এখানে খুবই ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কাগজে তার খবর তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এবারে অভিযোগ উঠেছে মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধেই। বলা হচ্ছে যে, ঘোষণাটিকে তিনি সরাসরি মেনে নেননি, পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। দেশ-বিভাগ হলে প্রশাসনিক যে-সমস্ত প্রশ্ন দেখা দেবে, তারই বিবেচনায় আমরা সবাই এখন ব্যস্ত রয়েছি, এবং যথাসম্ভব শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করবার চেষ্টা করছি।

দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্যাটি এখন আমাদের সামনে এক বিরাট বাধা। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ মনোভাব অবশ্যই কাজের অনুকূল; তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পলিটিক্যাল দপ্তরের আমলারা ইতিপূর্বে যেসব দায়দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রেখেছেন, এবং যে পন্থায় কাজ করেছেন, তার ফলে আমাদের পথে এক গুরুতর বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। এইসব অফিসারের অসহযোগী, এমন কী বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী মনোভাব জনচিত্তে যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে, ব্রিটিশ সরকার সে বিষয়ে অবহিত হলে আমি খুশী হতুম। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য বিশ্বাস করে যে, প্যারামাউন্ট ক্ষমতার অবসানের পর তারা স্বাধীনতা লাভ করতে অধিকারী। এইসব রাজ্য সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়, যথাসময়ে তা আমরা বুঝতে পারব। তবে ভেবে দুঃখ হয় যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও আমলারা যদি না আমাদের পথের উপরে এইভাবে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, বহু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে তা হলে আমরা রক্ষা পেতাম।

টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সম্পর্কে তোমার টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি। নিবন্ধটির শুধু সংক্ষিপ্তসারই দেখেছি আমি। জওহরলাল নিজেই অনেকবার যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, মনে হচ্ছে সেইটেই এতে প্রতিফলিত। এ নিয়ে তোমার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

শান্তিকে ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকভাবে তোমার
বল্লভভাই"

সুধীর ঘোষ, এস্কোয়ার,
জন-সংযোগ অফিসার,
ভারতীয় হাই কমিশনারের দপ্তর,
ইন্ডিয়া হাউস, অলডুইচ, লনডন, ডব্লিউ সি ২

(ক্রমশ)

'Do you think I am an Indian?'
'Of course!'
'Do you think my ability and intelligence are less than any of your average people?'
'I don't think so.'
'Then?'
'Then what?'

মুখের কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে তখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও বিদেশী হিসাবে প্রধানত আজকের পৃথিবীর কাছে যে জায়গার কথা বলছি সেখানে আমার বড় বেশী কৌলীন্য নেই। স্থান Sophia Universityর আন্তর্জাতিক শাখার সান্ধ্য-বিভাগ। জাপানে বাইরের লোকের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ভাষা। এখানে শিক্ষ বিভাগের সব কিছুই এঁদের নিজেদের ভাষায়। বিজ্ঞানের যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব বা ব্যাখ্যাকে এঁরা নিজেদের ভাষায় সুন্দর তর্জমা করেছেন। প্রথম প্রথম আশ্চর্য লাগত। এখনও যা আমাদের কল্পনার বাইরের বলা চলতে পারে। শুধু তাই নয়, আজকের জাপান নিজের আভ্যন্তরীণ জীবন-জিজ্ঞাসারও ইংরেজী ভাষার বিশাল প্রগতিকে এমন সুন্দরভাবে এড়িয়ে যে পৃথিবীর সামনের সারিতে আসতে পেরেছে সেটা আমার কাছে এক বিরাট বিস্ময়। যে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে আরম্ভ করে ইতিহাস রচনায় কোথাও এতটুকু অসুবিধা নেই। আর এক দিকে ভাবাবেগ-কাব্যিক প্রকাশনের ছুটি-বিচ্যুতি কেমন সুন্দরভাবে একে অপরকে নিজেদের ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছে—কী কথায়, কী লেখায়।

কিন্তু আজকের জাপানের নূতন যুব সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছে—'ইংরেজী শিখব'। কি ছেলে কি মেয়ে। দেখেছি কি ভীষণ উৎসাহ আর উদ্যম। ইংরাজী ভাষা আজ আন্তর্জাতিক ভাষা। তাই এরাও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিচার করলে দেখব, আমরা দু শ' বছরে যা শিখেছি তার তুলনায় এরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শুরু করে তুলনামূলক মান নির্ণয়ে আমাদের অনেক উর্দ্ধে। কারণ, জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রধানত মেয়েদের শিক্ষায় আইন করে ইংরেজী ভাষা শেখা বন্ধ ছিল।

কয়েকদিন আগে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক লিখেছেন। তিনি বিভিন্ন জায়গার রাস্তায় ব্যক্তিগতভাবে চার শ স্কুল এবং কলেজের ছেলেকে ধরে জিজ্ঞাসা করেছেন, কার কতটা ইংরাজী ভাষায় দখল। তাতে দেখেছেন প্রায় তিন শ-র উপরে শুধু পড়তে পারে, এক শ-র উপর পড়তে এবং বুঝতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ জন পড়তে-বুঝতে এবং বলতে পারে আর প্রত্যেকের সঙ্গে ইংরেজী শেখার একটা ছোট্ট বই আছে। আমাদের দেশের মতনই এদের কোন সুযোগ নেই ইংরেজীতে কথা বলার। দ্বিতীয়ত, এদের লাজুক প্রকৃতি আরও প্রতিবন্ধক। আমি বিশ্বাস করি, আগামী যুব-সম্প্রদায় সব কিছুর মতনই খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজী ভাষাটাও দখল করে নেবে। কারণ এরা ওই একটা ব্যাপারে অতুলনীয়।

Sophia Universityতে International Division নাম দিয়ে আমাদের মতন জাপানী না-জানাদের জন্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বহুরকম বিষয়ের উপর কিছু পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। অনেক দেশের ছেলে অনেক রকম চেহারা আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেখানে বিদ্যমান। বেশীর ভাগই আমেরিকাবাসী। আমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখি গোঁফ শুধু আমারই আছে—আর তা নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে, অনেক উত্তরও দিতে হয়েছে। ভারতীয় হিসাবে আমিই সেখানে একক। পাশে এসে বসে আফ্রিকা থেকে আগত একটি নিগ্রো ছেলে। বেশ দেখতে পাই জাপানী ছেলেরা আর কয়েকজন এশিয়াবাসী ওর মধ্যেই কেমন এক দিকে যুক্ত হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আলোচনাও আমাদের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ।

যে ধরনের ভারতীয় খবরাখবর এরা পেয়ে থাকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার সত্যতা হয়ত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর বিকৃতিতে তার যে রূপ পরিগ্রহ করে তাতে সংবাদের মূলধারাই শুধু ব্যাহত হয় তা নয়, মাঝে মাঝে তা ব্যক্তিগত চিন্তাক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তখন তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝে কার সাধ্য? দেখতে পাই, সাধারণ একটা ঘটনার উপর চোখ বুলিয়ে হাটে-বাজারের কয়েকটা মুখরোচক আলোচনার উপর ভিত্তি করে একজন একটা লেখা লিখে ফেলেছে। অবশ্য আমাদের দেশেও যে এর অভাব তা নয়। তা না হলে ভারত থেকে সংবাদ আসে "......কোথায় বানর মারতে গেলে মানুষ বুক পেতে দিচ্ছে......কোথায় হাতী পাগল হয়েছে......কোথায় দিনের বেলায় বাঘে মানুষ খেয়েছে......আর 'গরু'? সে তো রোজকার খবর।" হয়ত খুঁজলে দেখতে পাব এর পেছনেও লুকিয়ে আছে দুনিয়ার দাবার চাল।

তাই সেদিন যখন একটা ছেলে ভারতের কথা প্রসঙ্গে সযত্নে পকেট থেকে একটা জাপানী দৈনিক সংবাদপত্রের অংশ, যা সে আমার জন্য কেটে এনেছে, বার করল, তখন স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম :

'এটা কি?'

ভাবলাম নিশ্চয়ই আমরা 'গরু মারা বন্ধ' করছি বা গরু খেতে 'কেন' শুরু করছি না তার উপর অসংখ্য লেখার উপর একটা।

সত্যই যে দেশে হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, বাড়িতে, খাবারের দোকানে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং তোলপাড় করা সংবাদ একটা মামুলী হাসির খোরাক মাত্র, সে সম্বন্ধে বলা বা লেখাটা তো আশ্চর্যের কিছু নয়। এরাও আমাদের মতন ভীষণ একটা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিন কাটাত। কোন এক সময় 'মেইজী' শাসনে ভীষণ খাদ্যাভাবে 'মেইজী' স্বয়ং খাদ্যের প্রতিবন্ধকতা ভঙ্গ করলেন। তারপর কয়েকটা যুগ পার হয়ে এসে এরা কেমন সব কিছু মানিয়ে নিয়েছে। কোন রোষ-বহ্নি এদের

ধ্বংস করে নি। সেই কারণে অহেতুক যুক্তি-তর্কে এরা আজ বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এদের কাছে আজ আর বিরাট কোন অস্তিত্ব নিয়ে জড় করে নেই। এদের ভিতর ধর্মের নামে সততার ভণ্ডামি নেই, সাধারণভাবে সত্যকারের সততাই এদের জীবনে শিকড় গেড়ে বসেছে। তার ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু সাধারণ ঝড় বিরাট মহীরূহকে কি করতে পারে? সততার বিশালত্বকে ক্ষুণ্ণ করে সমগ্র জাতির উপর একটা পাপ-বোধ আসবার কোন সম্ভাবনাই এদের আজ নেই।

জাপানী কাগজে জাপানী ভাষায় লেখা। ছেলেটি ইংরেজীতে তর্জমা করছে, আমরা শুনছি। তাতে অনেক সত্য আছে, অনেক অসত্যও আছে। অনেক বাজার-গুজবকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়াও হয়েছে। হয়ত এমন লেখা অনেকই বার হয়। লেখক ভারত ঘুরে এসে খানিকটা অভিজ্ঞতা দিয়েছেন।

তাঁর মতে ভারতবাসী কাজের চাইতে আলোচনা বেশী করে। কয়েকজন এক-জায়গায় হলেই যে-কোন বিষয়ে তারা আলোচনা শুরু করে, যে-আলোচনাকে কেন্দ্র করে কোন ফলপ্রসূ উপসংহারে পৌঁছয় না।

বললাম—'তোমাদের মতে স্বার্থগত মূল্য-বোধ নেই এই তো? কিন্তু, একক চিন্তাধারা অপরের কাছে ব্যক্ত করেই তো সৃষ্টি হয় দর্শন-সাহিত্য, গড়ে ওঠে জীবন-জিজ্ঞাসার নূতন উপলব্ধি আর উপাদান।'

কিন্তু কে বুঝবে? বোঝবার, ভাববার সময়ই বা আজকের পৃথিবীর কোথায়?

তারপর—পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার নাকি বিদেশী দেখলেই ন্যায্য ভাড়ার চাইতে বেশী দাবি করে আর নাকি তাকে 'গুরু নানকে'র নাম স্মরণ করিয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সঠিক ভাড়াটা নিয়ে দুবার সেলাম ঠুকে রেহাই দেয়।

আর 'গরু দেবতা'র কথা তো আছেই। যেন গো-ভক্ষণ শুরু করলেই আমাদের খাদ্যসমস্যার সব সুরাহা হয়ে যাবে। সব-শেষে খাদ্যাভাব নিয়ে এক বিশাল পর্ব। আমাদের কি করা উচিত, কিভাবে এধরনের জীবনযাত্রা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার উপর বৃহৎ আলোচনা।

পড়া শেষ করে ছেলেটি আমার দিকে তাকাল। আরও কয়েকজন ছেলের করুণা-ভরা দৃষ্টিও তখন আমার উপর। যা আমার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ববোধকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয়। ভাবটা যেন—"হায় রে ভারত-বাসী......"।

কি বলব! খবর একেবারে টাটকা। গো-হত্যার জন্য দেশে উত্তেজনা। তাকে কেন্দ্র করে দেশের মন্ত্রীর পদত্যাগ, গুলি-চালনা, মৃত্যু। ধরুন, আজ যদি বিলেত থেকে ফিরে 'গোবর খাচ্ছে না কেন?' বলে অন্য কোন দেশে এমন উত্তেজনা হত তখন আমরা কেমনভাবে জিনিসটাকে গ্রহণ করতাম? এদেরও তো তাই! যার পেছনে সত্যই কোন ঐতিহ্য আছে কিনা সেটা ভাববার সময় আজকের পৃথিবীর কারুর নেই, আমাদেরও আছে কিনা সন্দেহ? যাই হোক তখনও খানিকটা বাকি। তাদেরই একজন বলে উঠলো—"সত্যই তোমাদের মতন কয়েকটা দেশের জন্য দুঃখ হয়। যখন এশিয়ার অনেক দেশ আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে সেখানে তোমরা যেন দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছ......।"

তাই আস্তে আস্তে ওই কথাগুলো বলে ফেললাম তার "Then what?"-এর শেষ হওয়া পর্যন্ত।

তারপর বিদেশে বসে যেটুকু ব্যাখ্যা করা সম্ভব, করতে চেষ্টা করেছি। কারণ, আমাদের দেশের so-called বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কতটুকু দেশ সম্বন্ধে জানি, কতটুকু আমার দেশ সম্বন্ধে জানা সম্ভব? এখানে এমন কোন publicityর বন্দোবস্ত নেই যেখানে এদের মতন দু-একজনকে নিয়ে গিয়ে, আমার অজ্ঞতার বাইরে আমার দেশকে, দেশের সত্যকারের দুঃখ দুর্দশা এবং তার প্রতিকারের পরিকল্পনাকে তার সামনে তুলে ধরা যায়।

আমাদের অসংখ্য সমস্যার কোনটা কতটা বলা—কওয়া সম্ভব! আর অত সময়ই বা কোথায় তাদের যে, আমার কথা শুনবে, ভাববে? সাধারণভাবে চোখের সামনে যেটা দেখছে, শুনছে বা শোনানো হচ্ছে, সেইটা দিয়েই বিচার করছে। দোষ দেওয়া যদি হয় সেটা আমাদেরই ভুল হবে।

তবুও না বলে পারলাম না তার "then what?"-এর সঙ্গে সঙ্গে।

"দেখ, তোমার সহানুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এটা তো বিশ্বাস কর যে স্বদেশবাসী তার দেশকে বিদেশের চাইতে বেশী ভালবাসে। ভারতবাসীও তার নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম নয়। আমার মত অগণিত মানুষ আমাদের দেশে আছে যারা চায় এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হোক, যা দিন দিন আমাদের

দম্ভ বাড়াচ্ছে, যা একটু একটু করে পৃথিবীর চোখে আমাদের ছোট করে দিচ্ছে। তোমাদের দেশে যেমন আমার চাইতে বেশী এবং কম দুই সম্প্রদায়ের কর্মক্ষম এবং বুদ্ধিজীবী আছেন, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। যাঁরা সত্যই বোঝেন—একটা সুষ্ঠু-পরিবেশকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন বা সমস্ত জাতিকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে চান। পৃথিবীর চোখে আমাদের দেশেও জন্মগ্রহণ করেছেন একের বেশী মহাপুরুষ খুঁজলে আজও পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশী বোঝেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা সমস্যা একে অপরের সঙ্গে এমন-ভাবে জড়িয়ে আছে তাকে ছাড়ান কি এক দিনে বা একটা মুখের কথায় সম্ভব? প্রথমত, আমরা দলীয়ভাবে কোন গোষ্ঠীভুক্ত হতে চাইনি। আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখ, এশিয়া বাসীরা কেমন দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবিকার মান নির্ণয়ে তারাই জিতেছে যারা ধনী সম্প্রদায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। তোমাকে অনুরোধ করছি "then what?"-এর পর তুমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা কর একজন ভারত-বাসীর মন দিয়ে, শুধু একজন দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নয়।"

যা বলতে পারলাম তার চাইতে ভাবলাম অনেক বেশী।

কই এরা তো আলোচনা বড় একটা করে না। আজকের যুব-সম্প্রদায়কে দেখেছি গাড়িতে, অফিসে, খেলার মাঠে, রাস্তায় কোথাও সে ধরনের আলোচনা নেই। এই তো আজকে এদের সাটো-গভর্নমেণ্ট টলটলায়-মান। মাত্র বাহাত্তর দিন মন্ত্রিত্ব করবার পর নিজের জেলার কোন এক ছোট স্টেশনে মেল-ট্রেন থামবার অনুমতি দেওয়াতে, অন্তত অফিসের কাগজপত্রে সেইভাবেই আছে, Transportation Minister পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন বিরোধী দলের চাপে। ছুটে আসতে হল Defence Ministerকে সুদূর আমেরিকা থেকে তাঁর সফর অর্ধ-সমাপ্ত রেখে। কোন এক-সময় তিনি সামরিক যানবাহনে নিজের ব্যক্তিগত কাজে নিজের দেশে গিয়েছিলেন, সেখানে সামরিক বাজনাদাররা তাঁকে অহেতুক সংবর্ধনা জানায়, যেটা সরকারী ভাবে নীতিবিরুদ্ধ। সেই নিয়ে কিন্তু ভীষণ নাজেহাল। কতটা সত্য-মিথ্যা তা আলোচনা হচ্ছে তাদের Diet-এ, আমাদের দরকার কি? এদের পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী আমাদের দেশের তুলনায় কোনরকম আলোচনা নেই এইটাই বড় কথা। সেখানে ভাল-খারাপের প্রশ্ন নেই। আর যেটুকু আলোচনা আছে, তা নেহাত মামুলী, যা রেল-ট্রাম-বাস সরগরম করছে না, কেউ অফিসের কাজ রেখে বলছে না—"আরে, রাখুন মশায় কাজ, ওদিকে গেল যে......"

এদের অধুনা প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের চিন্তা নিয়ে নিজে ব্যস্ত: কারণ, তাঁর নিজের দলেই ভাঙন ধরেছে। খুব কম লোকই ভাবছে, আর এক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে কি হবে?

তবে কি এরা রাজনীতিতে উদাসীন? নিজেদের সম্বন্ধে তত ওয়াকিবহাল নয়? তাই বা কি করে বলি?

হয়ত মধ্যবয়সী যা বৃদ্ধের দল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ করে সাময়িকভাবে সব কিছুতে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বেশী পছন্দ করছেন। তাই বলে এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে তাঁদের চিন্তাধারায় কোনরকম মালিন্য এসেছে। আজকে তাঁরা ছোটোখাটো রাজ-নীতিক বা স্বার্থগত, ব্যক্তিগত বা দলীয় যাই হোক না কেন, গোলযোগ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেই বেশী মনোযোগী। যে বিরাট ঝড় তাদের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তাকে প্রত্যক্ষ করে আজ যারা বেঁচে আছে, তার চেয়ে একটা সুস্থ জীবন-প্রবাহ বা সমগ্র জাতির উপর একটা পরিপূর্ণ দায়িত্ব-ব্যক্তিত্ব-মমতাবোধ এনে দেবে। দু বেলা পেট ভরে খাওয়া ও আপন-জনের অশ্রুভরা চোখে হাসি ফুটিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বিনিময়ে এরাই বা সুস্থ অনুভূতির কিছুটা আত্মিক জড়তা। তারা বাঁচতে চায় বর্তমান নিয়ে। ইতিহাস কবে কি বলবে তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই।

কিন্তু উঠতি যুব-সম্প্রদায়? এই তো সেদিন Yokohama বন্দরে আমেরিকার আণবিক শক্তিসম্পন্ন জাহাজকে "কেন ঢুকতে দেওয়া হল?" তাই নিয়ে ছাত্ররা কি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এখানেও কাঁদুনে গ্যাস-লাঠিতে শেষ পর্যন্ত শেষ হল। কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছি—সাময়িক শান্ত হল, কিন্তু ক্লান্ত হল না।

আজকের শিল্পোন্নত জাপানের চিন্তা-ধারাকে কেন্দ্র করে হয়ত অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। হয়ত আমার ব্যক্তিগত চিন্তাধারাটা ভুল হতে পারে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করে আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই হয়ত কিছুটা ধরা পড়বে।

তবুও আমি চোখকানকে সজাগ রাখি। কোন রসিক বন্ধু যখন হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে, "না—তোমাদের ভারতে আর যাওয়া হল না—"। কেন "ধর, গাড়ি চালাতে চালাতে যদি কোন গরু চাপা দিয়ে ফেলি—সে-ও তো গো-হত্যা, নিশ্চয়ই আমায় শাস্তি পেতে হবে..."। তার মধ্যেই খুরে বেড়ায় এদের হালকা মনের পরিচয়। সে মনে গম্ভীরতার ছোঁয়া নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় চার মিলিয়ন যুবক প্রাণ হারিয়েছে। আজ জাপানের

চারদিকে ছোট-বড় যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা চায় কাজের লোক। আমি একটা ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপাতত যুক্ত আছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন এদের Employment Exchange--এ নাম লেখাতে গেলাম। চাকরির জন্য নয় চাকুরিজীবীর জন্য। সেখানে চারদিকে বড় বড় অফিস, কল-কারখানা থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—"কাজের লোক চাই।" সব থেকে নিম্নতম বেতন সেখানে আমাদের দেশের আজকের সাড়ে চার শ' টাকা। আমার চোখে আশ্চর্য লাগাই তো স্বাভাবিক।

মনে পড়ল বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সবে কলেজের গণ্ডি পার হয়েছি। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেক পরিচয়-পত্র পেশ করেছি। স্বভাবতই সাড়া পাইনি। ছাত্র-জীবন আর বাস্তব-জীবন তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত। ছাত্র-জীবন বিধ্বস্তপ্রায়। সমগোত্রীয় কয়েকজন বসে আছি মফস্বল শহরের কোন-এক বন্ধুর পড়বার বাইরের ঘরে। শীতের দুপুর। কলেজের ইউনিয়ন, খেলাধুলোও যেন ওই বেকারত্বের যূপকাষ্ঠে কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। সকলের চুপ করে থাকাটা ক্ষুণ্ণ করল এক বন্ধু। হঠাৎ জানালার লোহার গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল, "দেখ কেউ যদি ওই রাস্তাটা থেকে ডাকে, 'এস চাকরি দেব', তা হলে তখনই দরজা দিয়ে বের হয়ে ছুটব না—এই গারদ ভেঙেই লাফ দেব।" বড় করুণ শোনাল ওর গলার স্বর। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমরা সকলে এক অদ্ভুত হাসি হাসলাম। সান্ত্বনা দেবার মতন কোন আশ্বাস আমাদের ছিল না। ওই দোদুল্যমান লোভগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই দশ বছর আগের দিনটাতে ফিরে গেলাম। কানে বাজল সেই করুণ স্বরটা। সেদিন সে জানত, ওই লোহার গারদ ভাঙা সম্ভব নয়। তার অলীক কল্পনা একটা অবাস্তব আশা করেছিল যে, তার পরিপূর্ণ আনন্দটা নিশ্চয়ই তাকে কোন আসুরিক বলে বলীয়ান করবে। সে যাক গে। ছেলেটি আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাইবেলের কথাটা মনে পড়ে —"কোন জিনিস অন্তর থেকে চাইলে তুমি পাবেই।"

জাপানে ছেলেরা বা মেয়েরা তাই হাই স্কুলের গণ্ডিটা পার হয়েই একটা কোন কাজে ঢুকে পড়ে। কারণ, উচ্চশিক্ষা এখানে ভীষণ খরচ-সাপেক্ষ। উপরন্তু যে-সব সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাকেন্দ্র আছে সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষায় পার হয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করা সাধারণ ছেলের পক্ষে খুবই মুশকিল।

একটা ছেলে হাই স্কুল প[illegible]ে। ভাবতে হল না কি করে চাকরি[illegible]বে। ভাবল আর ঢুকে পড়ল। সারা দিন কাজ করল। সেখানে ফাঁকি নেই। সন্ধ্যায় বেশীর ভাগই একজন "Girl friend,—যার প্রকৃত অর্থ এখনও আমার বোধগম্য হয়নি—নিয়ে গল্প-গুজব করল, নয়ত বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করে কোন পানশালায় বসে গেল। আর তা-ও না করলে চলে গেল "মাজানি" খেলতে। এও এক ধরনের জুয়া, অনেকটা দাবার মতন। আমি খেলা জানি না—তবে পয়সা বিনিময় হয় তা জানি। তারপর বাড়ি ফেরা। আর কি চাই? জনৈক ভদ্রলোক আমায় ঠাট্টা করেছিলেন : **Never return home early at night, your neighbours will think you have no money to spend . . . .**" নয়ত এদের ভাষায় বলবে, 'চিচিম্বো'—কৃপণ। ওতেই নাকি পাড়াতে কৌলীন্য বাড়বে, কে কত রাত্রে ফিরছে। দেখেছি, রাত্রের ফিরতি ট্রেনে অর্ধেকের উপর মানুষ মদ্যপানের আমেজ নিয়ে ঘরে ফিরছে, কিন্তু কোন অভদ্রতা নেই। তবে কি একেবারেই নেই? অবশ্যই চোখে পড়ে, তবে খুবই কম।

সকালে উঠেই ছুটছে। হাজিরা-খাতায় সইটি ঠিক সময় হওয়া চাই। সব মিলিয়ে জীবন-সমস্যা নিয়ে ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। পাস কর আর না কর চাকরি করব মনে করলেই চাকরি; চাকরি করলেই পয়সা; পয়সা নিয়ে দোকানে গেলেই জিনিস পাওয়া যায়, আর বাড়তি পয়সা যদি থাকে—চিন্তার কোন কারণ নেই। খরচ করবার সহস্র উপায় হাত বাড়িয়েই আছে। অতএব আপাতদৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই, অত ভাববার দরকার নেই। আমি নিজেকে দিয়েই ভেবেছি। স্কুল ছাড়ালে তো কোন কলেজে কি করে ভর্তি হব, সে এক দুর্ভাবনা। ঢুকলাম কলেজে. পাসও করলাম। কোথায় চাকরি? জুতোর তলা ক্ষইয়ে যদিও বা কোন একটা জুটল
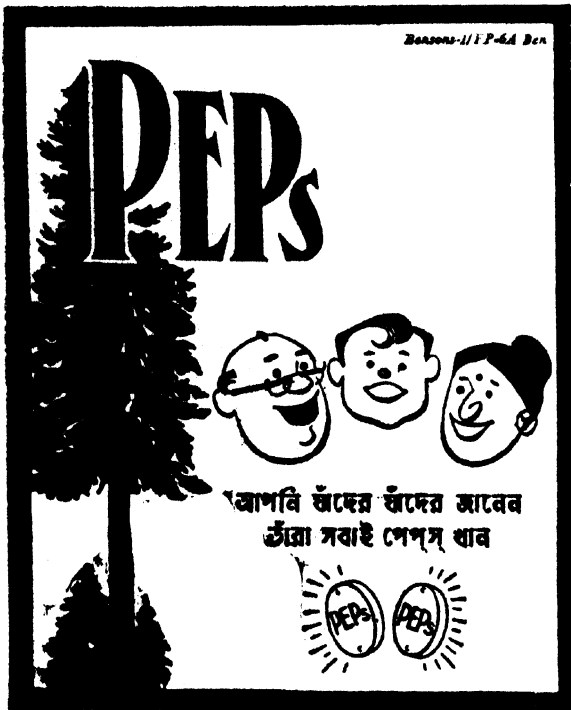
তাতে এদিকে কুলোয় তো ওদিকে কুলোয় না। তারপর সাধারণ জীবনে যা হয়, নতুন করে মনে করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। এই বাধাগুলোই আস্তে আস্তে আমাদের মানসিক বিকারে পরিণত হয়। যত দিন যায় যত বাধা পেতে থাকে, ততই ভয়াবহ রূপ নেয়। তারপর একটু বেশী জ্ঞান হলে—যখন কোন উপায় থাকে না, তখন "গভর্নমেণ্ট" নামক কোন এক অসার শব্দের প্রতি নির্ভুল দোষারোপ করি।

কিন্তু এরা? আমাদের দেশের যে-কোন এ ধরনের সমস্যার একটাও কি আমাদের মত অত গভীরভাবে ভাবতে হয়? না, ভাবতে হয় না—ভাববার দরকার নেই। চিন্তা করতে হয় না। রেশন—অসুখ—কিউ......। কিন্তু কেন? শুধু কি চাকরি আর চাকরির আয়োজন আছে তাই? এটা তো তাদেরই সৃষ্টি, তাদের সৃষ্টির সুখই তারা নিজেরা ভোগ করছে।

আজকের পৃথিবী পাঁচ শ' বা দু' শ' বছর আগের পৃথিবী থেকে অনেক তফাত। দু' শ' বছর আগে আমাদের দেশে ইংরাজ এসে যে কায়েমী বসবাস শুরু করেছিল তাও তাকে একদিন ছাড়তে হল। দু' শ' বছর বা তার আগে "স্বাধীনতা" আর "পরাধীনতা"-র যে সংজ্ঞা ছিল, আজ আর তা নেই। কারণ, পৃথিবীর রূপ পালটে গেছে, মানবমনে চেতনতা অনেক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে যে ক্ষমতার লোভ আর পদদলিত মনোভাব মানুষের মনে দানা বেঁধে আছে তাকে উপড়ে ফেলবে,' কার সাধ্য। সে আজ যেমন আছে, কালও থাকবে। কিন্তু সেই দলের তারাও সচেতন হয়ে গেছে, তারা জেনেছে যে, ওই দুটো শব্দের সংজ্ঞা পালটে গেছে। আজ তারা অন্য পথ ধরেছে। মানব-সভ্যতার নামে দিয়ে যে যার নিজের মনোবৃত্তিকে এবং চিন্তাধারাকে অপরের উপর চাপাতে পারলেই সন্তুষ্ট। সেখানে বিভিন্ন এশিয়া-বাসী ওইটুকু নিয়েই কেমন একে অপরের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে ও নিজেদের শক্তিক্ষয় করছে। কই ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা আমেরিকা তো তা করছে না, যদিও বোঝাপড়া করবার অনেক কিছুই তো তাদের বাকি আছে। তারা জানে, ওটুকু "বাকি" থাকবেই। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে ওটুকু পূরণ হবে না—এক লোকসান ছাড়া। তাদেরকে তা হলে বুদ্ধিমানই বলতে হয়। জাপানকে এশীয় দেশ হিসাবে বুদ্ধিমানই বলব। জাপান আজ ব্যবসায় নেমেছে। সত্যই তো, আমাকে যখন ব্যবসা করে খেতে হবে তখন ব্যবসাদারের মতই চলতে হবে বইকি।

জাপানকে সবচেয়ে বেশী খাদ্য বাইরে থেকে কিনতে হয়, তার বদলে বাইরে যায় ভারী মালের উৎপাদন—যেমন ইস্পাত। সেদিন এদের শিল্প-উন্নয়নের মান দেখছিলাম। গত কোরিয়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উন্নয়নের হার হঠাৎ বেড়ে গেছে।

যারা ব্যবসা করে, তাদের দেখা উচিত, কি করে, কোন্ পরিস্থিতিতে কতটা বেশী মালের কাটতি হওয়া প্রয়োজন। সেখানে অযথা কোন ন্যায়-অন্যায় বোধকে বা পুরোন মান-অভিমান আর বাক-বিতণ্ডাকে টেনে এনে পরিস্থিতিকে বেশী ঘোরাল করবার যুক্তি নেই। আজকের পৃথিবীর চাহিদা অনুযায়ী তারা সকলকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করছে। নিজের প্রয়োজন মত যে-কোন দেশ থেকে কাঁচা মাল কিনতে প্রস্তুত। লাল চীন থেকে চাল আমদানি করছে। তার বদলে যাচ্ছে ইস্পাত, জমিতে দেবার সার। দেশের জিনিস সমানভাবে বিক্রি হচ্ছে—আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে। যে-কোনো দেশ যে-কোনো প্রয়োজনে তার কাছে চাইলেই জিনিস

পারে। সে ব্যবসাদার। সে জিনিস কি কাজে লাগাচ্ছে বা তাতে কতটা মানবতাবোধ লুকিয়ে আছে সে খোঁজে প্রয়োজন কি? সব দেশই পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার সুযোগ বেশ ভালভাবেই নিচ্ছে। যে ব্যাখ্যাই তার হোক না কেন, আমি বলব, সে বুদ্ধিমান। আজকের পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে ওটুকু অবশ্যই প্রয়োজন।

আজকের জাপান ছাত্র-অধ্যাপক-ব্যবসায়ী নানাবিধ মুখপাত্র লালচীনে পাঠিয়ে ব্যবসার সম্পর্ক আরও বাড়াবার চেষ্টা করছে। নূতন করে আবার এদের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চীন বলেছে, তোমরা বেশী চাল কেন, আমরাও বেশী Fertiliser কিনছি। সেদিনের ম্যানিলা-সম্মেলনে দর্শক হিসাবেও কাউকে পাঠায়নি। লাল চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে বসতে দেবার পূর্ণ সমর্থন এদের আছে। কোন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসুক বা লোকক্ষয় বন্ধ হোক এরা অবশ্যই চায়। কিন্তু তার পেছনে ভীষণভাবে লেগে থেকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে একটা ফাঁকা বাহবা নেবার মতন বাতুলতা এদের নেই।

কয়েক দিন আগে বৃহৎ ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর (Steel Mills) একটা সম্মেলন হয়ে গেল। গত কয়েক মাস আগে Daily Commodities এবং Heavy Industry-র মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল যে, কিছু সময়ের জন্য কোন Steel Mills তাদের Ultra-Modern mechanism ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, ভারী-মালের উৎপাদন চাহিদার চাইতে বেশী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিনের আলোচনায় তারা সে চুক্তি ভংগ করল। কারণ, আজকের পৃথিবীর কাছে আরও ইস্পাত প্রয়োজন। জাপান বুক ফুলিয়ে বলছে, "আমি তোমায় অবশ্য দেব।" কারণ সুস্পষ্ট।

আজকের এই অগ্রগতির পেছনে কিছু সাদামাঠা যুক্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু সেইটাই সব নয়। সামরিক খাতে এদের ব্যয় নেই বললেই চলে। প্রায় সমস্ত National income-টা এরা নিজেদের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারছে। সেখানে ভারতকে তার অর্ধেকের বেশী ব্যয় করতে হচ্ছে সামরিক খাতে। সে খরচটা দেশের কোন মানব-কল্যাণে লাগে না। বাস্তবতার দিক থেকে উঠতি দেশের উন্নতি সাধনে সে অংশটা একটা বিরাট প্রতিবন্ধক।

গত বিশ্বযুদ্ধের চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা তার সামরিক শক্তি দিয়ে জাপান পাহারায় ব্যস্ত। খারাপ লাগে না এদের সম্পর্কটা দেখতে। মনে হয়, এক বৃহৎ শক্তি যেন বলছে, "তুমি কাজ করে যাও, আমি তোমাকে পাহারা দিচ্ছি।" আর সেই সংগে যোগ দিয়েছে জাপানের সহস্র সহস্র কর্মক্ষম যুবকযুবতী, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, যার সবটুকু সাধ্য। কর্মক্ষমতা, সহনশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, আর যে-যে গুণ থাকলে একটা জাতি সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে, এদের মধ্যে তার সব কিছুই বিদ্যমান। কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই।

সেদিন আমার এক বন্ধু জাহাজে এসে বেশ কয়েক দিন থেকে গেল। কারণ জাহাজ মেরামত করার প্রয়োজন হয়েছিল।

বিলিতী কোম্পানীর জাহাজ। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোরা যাচ্ছিস ইংল্যাণ্ডে, ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ, জাপানে সারাচ্ছিস কেন?"

বলল, "আরে জানিস না, এখানে যে কাজটা এক মাসে হচ্ছে, ইংলণ্ডে কম করে সেটা তিন মাস লাগবে।"

কিছু দিন আগে আমেরিকা এবং জারমানি থেকে দুটো Ship Building Experts-এর দল এসেছিল জাপানে। জাপান আজ Ship Building-এর মান-নির্ণয়ে সর্বপ্রথম। তাই তারা দেখতে এসেছিল কি এমন Extra technical know how আছে, যা এদেরকে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত রিপোরট দিয়ে গেছে: Hard work and sincerity of the labours and technicians"

এরকম বহু কিছু আছে যে সুখ আর ঐশ্বর্যের ডালি নিয়ে আজকের জাপান সকলকে ডাকছে। এই চোখ-ঝলসান রূপের সামনে অসংখ্য দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কি করে চিনি—কি করে বোঝাই—দু'শ' বছর পরাধীনতার পর আজকের স্বাধীন ভারতের সংগে তো ওইখানেই সবচেয়ে তফাত, সে তার নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে বড় হতে চায়, বাঁচতে চায়।

বিকাশ বিশ্বাস
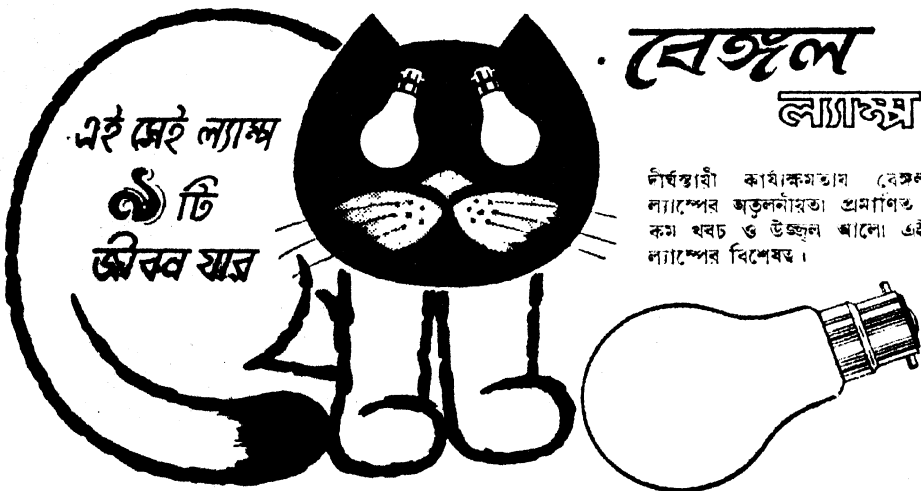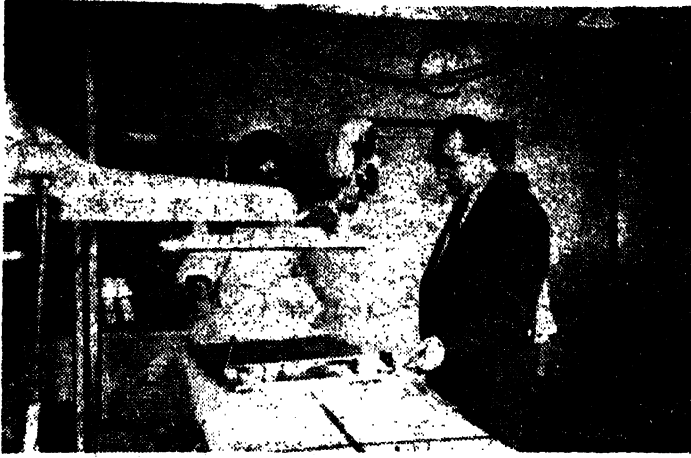
সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের এক লেবরেটরীতে আচার্য ব্লখিন

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই (২)

আগেই বলেছি ক্যান্সার হচ্ছে দেহ-কোষের ভিতরের ব্যাপার। শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে যেমন শ্রমবিভাগ রয়েছে, তেমনি কোষের মধ্যেও শ্রমবিভাগের জন্য রয়েছে কতকগুলি ক্ষুদ্রতর পদার্থ যেগুলিকে বলা হয় অর্গ্যানেল। সাইটো-প্লাজমের মধ্যে এই রকম দুটি পদার্থের নাম রিবোসোম ও মিটোকণ্ড্রিয়ন। প্রথমটির কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ করা, দ্বিতীয়টির কাজ শক্তি উৎপাদন করা। এ ছাড়া আরো তৃতীয় একটি অর্গ্যানেলের সন্ধান পেয়েছেন লুভে'র আচার্য ক্রিশ্চিয়ান দা দুভে। সেটির নাম লাইসোসোম। সেগুলির নিজস্ব এনজাইম আছে, যেগুলি ডি এন এ, আর-এন-এ সমেত প্রোটিন পদার্থে বিভাজন ঘটাতে পারে। ঐ ধরনের একটি এনজাইমের নাম অ্যাসিড ফস্ফেটেজ। অসুস্থ অবস্থায় ঐ অ্যাসিড কোষ গলিয়ে দিতে পারে। হালে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, কোষের মধ্যে লাইসোসোমগুলি ক্যান্সার উৎপাদক বস্তুগুলির আক্রমণ কেন্দ্র হতে পারে। এই নিয়ে বর্তমানে ব্রিটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল গবেষণা করছেন। লাইসোসোমের এনজাইম যদি বেশি মাত্রায় সাইটোপ্লাজমে গিয়ে মেশে তাতে কোষের যে ক্ষতি হয় তাতে কোষের মৃত্যু ঘটতে পারে এবং তার মধ্যে ক্যান্সার জাতীয় পরিবর্তন ঘটাও বিচিত্র নয়, এই হচ্ছে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডঃ অ্যান্থনী অ্যালিসনের মত। ক্যান্সারের কারণ সম্পর্কে আরো সব মতামত আছে।

ক্যান্সারের প্রধান কারণ যদি ভাইরাস হয় তবে বসন্ত, কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের মত ক্যান্সারেরও টিকা আবিষ্কৃত হওয়া স্বাভাবিক। টিকার সাহায্যে শরীরে রোগের প্রতিবিষ (অ্যান্টিবডি) তৈরি হয়। দেশে দেশে ভাইরাস বিজ্ঞানী ও ইমিউনো-লজিস্টরা সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অবশ্য মানুষের ক্যান্সার ভাইরাস থেকেই হয়, এ-কথা এখনো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নি। যাই হোক নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল সেণ্টারে একজন রোগীর ক্যান্সার টিস্যু আর একজন রোগীর গায়ে জুড়ে দিয়ে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় রোগীর দেহে রক্তের কিছু নতুন শ্বেতকণিকা তৈরি হয়েছে যেগুলি বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাতে পারে। তার কিছু শ্বেতকণিকা প্রথম রোগীর দেহে সঞ্চারিত করা হয়। এইভাবে ৪০জন রোগীর মধ্যে কিছু সংখ্যক রোগীর অবস্থার উন্নতি দেখা যায় এবং ১ জনের নাকি ক্যান্সার সেরে গিয়েছে। এই ধরনের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেশেই চলেছে।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

ক্যান্সার নিরাময়ের প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে অস্ত্রোপচার ও রশ্মি চিকিৎসা। তাছাড়া রেডিয়াম ইরিডিয়াম ইত্যাদির আইসোটোপ সরাসরি টিউমারের মধ্যে চালিয়ে এবং হোর্মোন ইঞ্জেকশন দিয়ে থেরাপি করা হয়। আজকাল নানা রকমের ফলপ্রদ ওষুধও বার হয়েছে (যা দিয়ে করা হয় রাসায়নিক থেরাপি) যেমন থিওফস্ফামাইড, সাইক্লোফস-মাইড ইত্যাদি। এক একটি এক এক জায়গার ক্যান্সারে ব্যবহার হয়। প্রসংগত একটা কথা বলা দরকার। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও হাতুড়ে চিকিৎসকের অভাব নেই। অমুক লোকের অমুকের টোটকা ওষুধ খেয়ে ক্যান্সার সেরে গিয়েছে এই ধরনের গুজব বাজারে ছেড়ে এই হাতুড়েরা পয়সা রোজগারের জমি তৈরি করে। ব্র্যাণ্ডির সংগে চিংড়ি মাছ বা দুধের সংগে ঘোড়ার পায়খানা মিশিয়ে খেলে ক্যান্সার সেরে যায় এই ধরনের গুজবও প্রচারিত হয়েছে। এই রকম চিকিৎসায় আরোগ্যদের পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে হয় তাদের ক্যান্সার হয় নি, না হয় হাতুড়ের ওষুধের সঙ্গে সংগে তারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও করেছে।

আসল কথা, ঠিক সময়ে অসুখ ধরা পড়লে বিশেষ করে অসুখের পূর্বলক্ষণ-গুলি প্রকাশ পেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্সার

রোগ আজকাল ঠেকানো যায়। অবশ্য সব-রকম ক্যান্সারের চিকিৎসা সোজা নয়। বৃহদন্ত্র, স্তন, ফুসফুস, প্রস্টেট গ্রন্থি, জরায়ু, মুখ ও চামড়ার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাফল্যের সংখ্যা বেশি। বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, জীবিকা, লোক স্বাস্থ্য ইত্যাদির বিভিন্নতার দরুন ক্যান্সারের আক্রমণস্থলের কিছু কিছু পার্থক্য হয়। যেমন এশিয়া ও আফ্রিকার চেয়ে ইউরোপে পাকস্থলীর ক্যান্সারের সংখ্যা বেশি, মুখের ক্যান্সার বেশি দেখ যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চুন ও দোক্তা খাবার অভ্যাসের দরুন। মুখের চামড়ার ক্যান্সারের সংখ্যা দক্ষিণ গোলার্ধে বেশি।

ক্যান্সার অবশ্য শরীরের যে কোন অংশে হতে পারে। উপরে যে অংগগুলির নাম করা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও গলনালী, স্বরযন্ত্র চোয়ালের হাড়, পায়ু, প্রস্টেট গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, বৃক্ক, যকৃৎ প্রভৃতি অংগ-প্রত্যংগেও রোগ হতে পারে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রোগের স্বতন্ত্র কারণ আছে। যেমন বলা যায় যে পাকস্থলীর ক্যান্সার দেখা যায় প্রধানত খাওয়ার বদভ্যাসের ক্ষেত্রে। মেয়েদের স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থির ক্যান্সার বেশি দেখা যায় তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিশুকে স্তন্যপান করান না। দেখা গিয়েছে যে সন্তানহীনাদের ক্ষেত্রে ঐ রকম ক্যান্সার সন্তানবতীদের তুলনায় তিন গুণ বেশি। অত্যধিক গরম চা, দুধ, অর্ধচর্বিত খাদ্য, দোক্তার রস ইত্যাদি থেকে গলনালীতে যে স্থায়ী ক্ষত হয় তাই থেকে ক্যান্সার হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে যাদের ফুসফুসের ক্যান্সার আছে, তাদের শতকরা প্রায় ৮৫জন অত্যধিক সিগারেট খায়। এ ছাড়া শহরের ধোঁয়াশাও ক্যান্সারের অনুকূলে।

শ্বেতকণাদের চোখে লাইসোসোমের কার্যকলাপ

প্রতিটি জায়গায় ক্যান্সার হবার বিশিষ্ট কতকগুলি খুঁটিনাটি লক্ষণ আছে যেগুলি অনুশীলন করে চিকিৎসকরা রোগ সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ করতে পারেন। তাই নিজের ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ হলে কর্তব্য হচ্ছে সংগে সংগে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সব কিছু খুলে বলা এবং পরীক্ষা করানো। এটা যদি সবাই করেন তবে রোগ মারাত্মক হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

কোন দেশকে ক্যান্সারের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু প্রতিবিধান আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে জনসাধারণ যাতে স্বাভাবিক পরিবেশে সুস্থ শরীরে ও নির্মল আবহাওয়ায় কাজকর্ম ও বসবাস করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা। সেটা শুধু ক্যান্সার কেন, যে কোন রোগের প্রতিষেধক। দৈন্যদশা, অভাব অনটন, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, স্বাস্থ্যহানিকর পরিবেশ, এ সবই অন্য রোগের মত ক্যান্সারেরও সহায়ক। এই সব সমস্যার সুরাহা করা যে কোন দেশের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, যেমন তাঁদের দায়িত্ব জনসাধারণকে ক্যান্সার রোগের লক্ষণ ও কারণগুলি এবং প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের দ্বারা অবহিত করা, দেশময় ক্যান্সার ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে সেগুলিকে ক্যান্সার রোগ সংক্রান্ত যাবতীয় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা সুসজ্জিত করা, ক্যান্সার গবেষকদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। আমেরিকা থেকে হালে লেসার রশ্মির সাহায্যে বিনারক্তপাতে অর্বুদ অপসারণ করার (ওহিওর ডঃ টমাস ব্রাউন) এবং মস্তিষ্ক ও চোখের ক্যান্সার ধরবার জন্য শ্রবণাতীত শব্দ তরংগ ব্যবহারের সংবাদ এসেছে (ফিলাডেলফিয়ার ডঃ মারে স্মিথ।) এই সমস্ত ব্যবস্থার সুযোগ যদি বাদও দিই তবু অন্যান্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভারতের মানুষ পাবে না কেন?

আমাদের দেশ থেকে কিছু কিছু ক্যান্সার-গবেষক বিদেশে গবেষণা করে এসেছেন (যেমন ডঃ রমেশ চক্রবর্তী) বা করতে যাচ্ছেন (যেমন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রাম প্রসাদ) সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু এদেশে ফিরে আসার পর তাঁদের কাজ করবার কতটুকু সুযোগ-সুবিধা ও সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হবে সেটাই ভাববার কথা।

রোগটি একজনের থেকে আর একজনের দেহে বা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয় এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। ফ্রান্সে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সব অনারোগ্য ক্যান্সারের রোগীদের রাখা হয়েছে আজ বহু বছর। সেখানেও সংক্রমণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ক্যান্সার রাতারাতি হয় না কারণ বিভিন্ন কারণের গোটা শরীরের স্বাভাবিক জৈবক্রিয়া ব্যাহত হতে হতে তবে জমি তৈরি হয় ক্যান্সারের। সুতরাং ক্যান্সার স্থানীয় ব্যাধি নয়। গোটা শরীরের অসুস্থতা বা অস্বাভাবিক অবস্থার একটি চরম পরিপ্রকাশের কেন্দ্র হচ্ছে ক্যান্সার। ধরুন প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সারের কথা। শরীরের রক্তে পুরুষ ও স্ত্রী হোর্মোনের সমতা যেখানে নষ্ট হয় সেখানেই এই ক্যান্সার বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাংসপেশীতে দীর্ঘকাল নিয়মিতভাবে হোর্মোন ইঞ্জেকশন দিলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের স্তনের দুগ্ধ-গ্রন্থির ক্যান্সারেও ঐভাবে হোর্মোন ইঞ্জেকশন দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এই ব্যাপার থেকে মনে হয় যে সারা দেহের অবস্থাকে ওষুধের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য ফিরিয়ে আনতে পারলে ক্যান্সার সারবার অনুকূল অবস্থা শরীরের মধ্যে তৈরি হয়। প্রস্টেটের ক্ষেত্রে যে সাফল্যলাভ করা গিয়েছে ভবিষ্যতে অন্যান্য অংগের ক্ষেত্রেও হয়ত তা লাভ করা যাবে।

প্রাক্-ক্যান্সার পরিচালক ও উপসর্গগুলি বহুদিন ধরে প্রকাশ পাবার পর ক্যান্সার রোগের উদ্ভব হয়। ক্যান্সার রাতারাতি হয় না বলে রোগ ধরে চিকিৎসা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। ক্যান্সার চিকিৎসার সাফল্য তাই প্রধানত নির্ভর করে ঠিক সময়ে রোগ ধরার উপর।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

পুষ্পগুচ্ছ — মিত্রা দত্ত

চিত্রপ্রদর্শনী

জ্ঞানব্রত ঘোষাল-এর চিত্র প্রদর্শনী : আর্টইস্‌ট্রি হাউস

যদিও জ্ঞানব্রত ঘোষাল আরোপ করার মাধ্যমে, টেকনিকে, পেরেক চুড়ি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিস কাজে লাগিয়েছেন—তবু খুব আশ্চর্য এই যে, বলার বিষয় তাঁর নিছক প্রকৃতি—যেখানে ঘাস বৃদ্ধ হয়। এরূপ গঠনের সম্মুখে দর্শককে থামতেই হয়। অবশ্য অপ্রাকৃতিক কল্পনা যে তিনি নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন নি এমন নয়।

উক্ত কাজের স্বপক্ষে তত্ত্ববিদরা বলেন, কোন নির্দিষ্ট এটা-সেটাকে তখনই কাজে লাগানো যেতে পারে যখন তার কার্যকারিতাকে, ফাংকশনকে ভুলিয়ে দেওয়া যায়—একেবারেই মনে হবে না সেটার মধ্যে পেরেকত্ব আছে, অর্থাৎ আর একভাবে তা দেখা দিয়েছে। চিত্রগত আলোচনায়তে সেটা আর পেরেক নয়।

এখানে তেমনি জিনিসগুলিকে কখনও রেখা বা রঙ হিসাবে ধরা হয়েছে। তার মনে লাইট নাইট লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কিশোরী কাউল-এর চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

কুমারী কিশোরী কাউল কাশ্মীরের নামকরা শিল্পী নারায়ণ মূর্তসগরের পৌত্রী; ইনি বরোদা কলেজ অব ফাইন আর্টসের একজন কৃতি ছাত্রী। ইতিপূর্বে দিল্লি বোম্বাই ও আলিগড়ে তাঁর প্রদর্শনী হয়েছে।

কুমারী কাউলের ছবি দু ভাগে ভাগ করা যায়, একদিকে তিনি ওতপ্রোত বর্তমানতাকে নিয়ে কাজ করেছেন, অন্যদিকে, রঙ রেখা ছন্দ এবং বুনট নিয়ে (টেকস্‌চর) ছবি এঁকেছেন; যেমন টেকসচুরাল স্টাডি, কম্পোজিশন ইন স্ফিয়ার্স, আবার অন্যদিকে শ্রীনগর হ্যাবিটেশন, রিদমিক বোউটস।

ফলে দেখা যাবে তিনি বিশ্লেষণবাদী; এবং বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে তিনি বিষয়ের দিকে চেয়েছেন; আঁকার বিভিন্ন রীতি বর্ণিকা ভঙ্গ কেমন করে দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে মিলবে তা, অর্থাৎ সেই ভাবনা, প্রতিটি ছবিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অপ্রাকৃতিক কাজ যেহেতু সাধারণত কোন চিরাচরিত পরিপ্রেক্ষিত থাকে না, সেখানে ক্রমাগত ছবি একটি নকশা; কখনও রঙের টেনসনে রঙ, অথবা রেখার টেনসনে রঙ দাঁড়িয়ে থাকে—এবং যেহেতু এই ধরনের কাজ তাঁর বেশী তাই দেখা যাবে প্রাকৃতিক অর্থাৎ অবয়ব-ধর্মেও সেটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

তাঁর প্রকৃতির ছবি তাই কোথাও যে একটা বস্তু হয়ে গড়ে উঠেছে এমন নয়, শুধু আলগা তুলিতে করা কতক আন্দোলিত ছন্দ; অবশ্য এ কথাও হয়ত ঠিক যে রেনেসাঁস-কৃত পরিপ্রেক্ষিত আধুনিক ধারায় আর কাজে লাগে না। ফলে অবয়ব আর নিরবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে; তাঁর রিদমিক বোউটস ও ...ডি ইন প্লেন উল্লেখযোগ্য কাজ।

সংগীত শ্যামলা-র চিত্র-প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

সংগীত শ্যামলা একটি শিল্প শিক্ষা সংস্থা। এই প্রদর্শনীতে অজস্র রকমের কাজ ছিল যথা, তেল রঙ, মিউরাল, সিল্ক পেন্টিং, জলরঙ—তাছাড়া বাটিক ও শিশুদের আঁকা অনেক ছবি।

সব থেকে ভাল লাগল যে, এই সংস্থা এখনও ভারতের নিজস্ব ধারার উপর জোর দেন, এখানে কাঙড়া তথা পাহাড়ী চিত্রের অনেক নকল ছিল, হয়ত মুখগুলি তেমন নয়ন-সুখকর হয়নি, তবু এ কথা ঠিক যে, শিক্ষার্থী সেই ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিল, সেই ছবিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছিল।

সিল্ক পেন্টিংগুলি ভারী সুন্দর হয়েছে, যথা, শকুন্তলা মহেশ্বরী ও আশা জৈনের কাজ।

মিস চিত্রা দত্ত-র চিত্র-প্রদর্শনী : ইনডো-আমেরিকান সোসাইটি

চিত্রা দত্ত অনেকদিন পর প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। এখানে তাঁর সর্বসমেত ২২খানি ছবি ছিল। তেলরঙ ও প্যাস্টেলে করা। এইগুলিকে সমগ্রভাবে ইম্প্রেশানইস্টিক কাজ বলা যায় কি না তা বিশেষজ্ঞরা ভাববেন।

তার ফ্লাউয়ার স্টাডির বাঁ পাশের যে ছায়াটা আমাদের সঙ্গত বলে মনে হয়নি কিন্তু অন্য দিকে রিভারবিয়াস কুলু-র ছবিতে স্রোতের ডান ধারের লাল ছোঁয় খুব সুন্দর বলে মনে হয়েছে, কিন্তু উপরে গাছের ডেপথটার সম্পর্কে নিশ্চয় উনি ভেবে দেখবেন আশা করি। তাঁর কোত দারের ছবিটি ছোট, কিন্তু বিরাট হয়ে দেখা দেয়।

ত্রিলোচন কলমচি

দো আঁশে

প্রাপ্তবয়স্কদেরও একটি রূপকথার জগৎ আছে। সেই অপরূপে কথার জগতে প্রতিদিন এমন অনেক ঘটনা ঘটছে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। সেই অতি-নাটকীয় জগতে সবই সম্ভব, সব কিছু। ইকনমিক-অ্যানিমিয়া, পলিটিক্যাল জন্ডিস কিংবা ডিপ্লোম্যাটিক পাইলস কিছুই সেই সবপেয়েছির দেশবাসীকে কব্জা করতে পারেনি। সেখানে নানা রঙের দিনগুলি এখনো সোনার খাঁচায় মনোহারী পাখির মত হরবোলা।

নাচে গানে নিশ্চিন্তিতে ভরপুর সেই রাজ্যে কোটিপতি রাজার কন্যার সঙ্গে কনিষ্ঠ কেরানীর বেকার পুত্রের রোমাঞ্চকর উপাখ্যান শেষ পর্যন্ত শাঁখা-সিঁদুর-হুলুধ্বনিতে পাকা হয়। আবার অন্য দিকে নায়েক রাজপুত্তুর ছদ্মবেশে বস্তির ঘরে এসে ওঠে নিছক আদর্শের তাড়নায়; অনেক প্রকার মুশকিল আসান করে অনৌকা অরক্ষণীয়াকে অভাবনীয়ভাবে পার করে চলে যায়। এমনিভাবে প্রতি মুহূর্তে ট্রামে-বাসে ট্রেনে-স্টীমারে, ঘাটে-অঘাটে পলকের দেখা অপলক হয়ে থাকে। চতুর্দিকের অগণিত সমস্যা অনায়াসে টেন-ওয়ার্ড পাজল-এর মত অক্ষরে অক্ষরে সলভ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভিলেনকে বেদম মাউট করে নায়ক সেই ছাঁদনা তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত ক্ল্যাপ পড়ে ঘর ফেটে যায়।

অথচ আমাদেরই চেনা সংসারের সাউন্ডারীর মধ্যে এইসব উপাস্য দেবদেবীর ফিল্ড ওয়ার্ক চলেছে। সেই লেক, সেই ময়দান, সেই স্টেশন, সেই অফিসপাড়া, প্রতিদিনের চেনা ফুটপাথ, লোকাল ট্রেন, পুভৌগ্য হোটেল কিংবা দূরান্তের জনপদ। উড়ন্ত ককপিট থেকে ছুটন্ত টাইপরাইটার পর্যন্ত সেই চিত্রনাট্য ছড়ানো। যে-কোনো ঘটনাই সেখানে গল্প, যে-কোনো গল্পই লোভনীয় নাটক। শ-দেড়েক ফুট লম্বা এক-একটি মিনিট যেন এক-একটি সাসপেন্স-ড্রামা।

ঠিক দিনের পর দিন যখন আমরা জীবনের ডিভ্যালুয়েশান, রং অ্যাসেসমেন্ট আর মিসক্যারেজে ভুগছি, ওভারটাইম আর টিউশানীতে রুদ্ধশ্বাস; ধার দেনা তাপ্পি দিয়ে কোনোরকমে কার্নিক-খাওয়া ঘুড়ি উড়ছে আমাদের। ত্রিশঙ্কুর মত অদৃশ্য ফুটবোর্ডে প্রমাণ সাইজে ঝুলছি, যে-কোনো মুহূর্তেই পৃথিবী থেকে নক-আউট হবার সম্ভাবনা। মিথ্যা এবং যাদিতে ভর্তি এই আমাদের লাইফ; ঘরে প্রতি-বছরের জমানো ক্যালেন্ডারের মত অনিবার্য শিশুপাল, দাম্পত্য কলহরূপী home-যজ্ঞ, বেডরুমে পিকেটিং। সব মিলিয়ে বেশ ছিলাম হয়ত, সেকুলেয়েড ইনফেকশন ঘটেই বিপদ বাধলো। অসম্ভবের নেশা ধরল চোখে। গায়ে বিস্তর ব্যথা জমিয়ে ছায়াধরার ব্যবসায় নামলুম। প্রতিদিন প্রায় ৪২০০টি শো-হাউস থেকে নিদেনপক্ষে আধ কোটি লোক আফিংখোরের মত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসছি আর মনে মনে নিজের ভবিষ্যতের একসট্রেম-প্যারী নাটক ভাবছি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, অমনি দাদার জরুরী টেলিফোন। দৌড়ালাম হিন্দুস্থান পার্কে। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে শুধোলাম, কি ব্যাপার?

ধূমায়মান সিগারেটটাকে খড়ির মতন তিন আঙুলে ধরে দাদা আমার তখন শূন্যে কিছু কাল্পনিক কথা লিখছিলেন। চমকে উঠে বললেন, কে? ওঃ তিলু! যা ভেতরে যা। দেখগে, আবার সেই আরম্ভ হয়েছে।

মনের মধ্যে এই রকমই একটা আশঙ্কা ছিল, যদিও টেলিফোনে দাদা কিছুই বলেননি এবং বলবার সুযোগও দেননি।

জিগেস করলাম, আজ কি বই ধরেছেন? দীপ জেলে যাই না, সাত পাকে বাঁধা?

হুঙ্কার ছেড়ে দাদা বললেন, দয়া করে ইয়ার্কি মেরো না! যাও ভেতরে গিয়ে নিজের চোখে দ্যাখো।

শোবার ঘরের সামনেই ইন্টারভিউ ঘটলো। দেখি বউদি এই সাত সকালেই (তখন সকাল ঠিক সাতটা) চুল বেঁধেছেন আধুনিক কায়দায়, জবরদস্ত পোশাক

He... in

[illegible] [illegible] দেখতে পেয়ে বিচিত্র বেশে অদ্ভুত কায়দায় দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ছলছলে চোখে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, কী ব্যাপার? আবার জ্বালাতে এসেছ!

জবাবী ডায়লগ আমার জানা ছিল না, তাই হিতে বিপরীত হবে ভয়ে জবাব দিলাম না। পকেটে অটোগ্রাফের খাতাটা এনেছিলাম বুদ্ধি করে। বিনীত ভঙ্গিতে সেটা খুলে বাড়িয়ে ধরলাম বউদির দিকে। কয়েকটি কি-হয় কি-হয় মুহূর্ত পার হয়ে গেল। তারপর অকস্মাৎ ফল ফলল, মুখ-চোখের ভঙ্গি বদলালো। আমার কাছ থেকেই কলম চেয়ে নিয়ে খসখস করে কি লিখলেন। কি লিখলেন ভাবতে পারেন? লিখলেন—শুভেচ্ছা সহ সুচিত্রা সেন।

শুধু লেখায় নয়, আমি জানি, আমার এম-এ পাশ বিশ্বেশ্বরী বউদি এই মুহূর্তে মনে মনে সুচিত্রা সেন হয়ে গেছেন, হয়ত সারা দিন কিংবা কয়েক ঘণ্টা এই স্বপ্ন মায়া-মতিভ্রমের মধ্যে কাটবে। এবং এই অবস্থায় স্বামী-সমাজ-সংসার সব তাঁর কাছে মিথ্যে, দারুণ মিথ্যে। কোনো একটি ছবি কিংবা একাধিক ছবির টুকরো টুকরো দৃশ্য এলোমেলোভাবে অভিনয় করে যাবেন, স্মৃতি থেকে একতরফা মনোলগ্ ঝাড়বেন, সলিলকিও চলবে! মাসে দু' মাসে এরকম হয়।

এ প্রবলেম শুধু দাদার একলার, এ কথা বিশ্বাস করি না। অনেক বাবা মা দাদা বউদি হয়ত এইরকম সমস্যায় ভুগছেন, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও হয়ত কেউ কেউ দৌড়চ্ছেন। ওয়ার্ল্ড হিস্টোরিয়ার কেস-হিস্ট্রি জানা গেলে দেখা [illegible] [illegible] তিন ভাগের দু' ভাগই ফিল্মের অবদান।

এরকম মোক্ষম রকম [illegible], তবে অল্পস্বল্প ছিটগ্রস্ত হয়েছে, এমন ফিল্ম-রি-অ্যাক্টর তো দেশে কোটি কোটি। আমাদের দেশে অশনে বসনে এই [illegible]

ওল্ড মার্কেট সর্বত্র স্বর্ণকার থেকে চর্মকার পর্যন্ত সিনেমার নাম ভাঁড়িয়ে খাচ্ছেন। সিনেমার আদি যুগ থেকেই এই হুজুগ চলে আসছে। কাননবালা ব্লাউজের যুগ থেকে সঙ্গম শাড়ি, স্যারি ম্যাডাম, রিবন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখলাম। এবং বছরে বছরে আরো দেখবো। বসনে ভূষণে আপটুডেট হতে হলে সিনেমাকে চোখে চোখে রাখতেই হবে। মেয়েরা ছবি দেখতে গেলে কানে গল্প শোনেন, চোখে নায়ক-নায়িকার নখ থেকে চুল পর্যন্ত স্ক্রুটিনি করেন। ব্যাকরণে ভুল হলেও তাঁরা সব্যসাচী।

পথে দু' বেলা যত মেয়ে দেখেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ব-কলমে সেজেছে। সিনেমা কালচারিস্ট হলে আপনার চোখে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ত। কারো জুলপি কচুরি-পানার শিকড়ের মত নীচে নেমেছে, কেউ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের মত সিঁথি উড়িয়ে চুল সমান করে ফেলেছে, কারো চুলে বিশেষ ধরনের [illegible], কারো খোঁপা

"মনে হয় ক্রাচে ভর দিয়ে চলেছে"

সেকালের মোটরের পিছনে বাঁধা একস্ট্রা টায়ারের মত অটল, কারো বা খোলা চুল র‍্যাংক ভাসে'র মত অশ্বপুচ্ছ। শুধু কি তাই, কপালের টিপ, ভুরুর ছাঁটকাট, রুজের ঊর্ধ্ব-নিম্ন লম্বরূপ, শাড়ির মার-প্যাঁচ, চলন-চাউনি, কুট কটাক্ষ, কোনোটাই কি তার নিজের? সবই অনুবাদ রচনা, শুধু স্বীকৃতি নেই, এই যা।

তবে এই কপীজম্ (Copyism) শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমিত নেই, ছেলেরাও অতি দক্ষ হাতেই টুকলি করে চলেছে। উত্তমরূপে তারা চুল ছাঁটছে, কপালের উপরে জ্ঞানবাবুর দোকানের বৃহৎ আকারের সিঙাড়ার মত যে ছিলক নির্মাণ করছে, তার পিছনে হিরো ওয়ার্শিপ রয়েছে। হাত গুটোনোর কায়দা থেকে শুরু করে মোষের সিং-এর মত ছুঁচোলো জুতো সবই চলচ্চিত্রকল্প ব্যাপার। পাড়ায় পাড়ায় রক-ফেলোরা অস্তর্টিপুনি প্যান্ট পরে কোমরে দু হাত সেট করে যখন ঘুরে বেড়ায় তখন আপনার নিশ্চয়ই মনে হয় ক্রাচে ভর দিয়ে চলেছে। অপারেশন স্টিচের মত ঐসব প্যান্টের সেলাই দেখলেই মনে হয় পায়ের পরে সূচীকর্ম করা হয়েছে।

কিন্তু আমি নিতান্তই সেকেলে, নইলে এত বাঁকা চোখে সিনেমার দিকে তাকাচ্ছি কেন। আসলে সিনেমাই আমাদের শেষ আশ্রয়, আমাদের মুক্তি, আমাদের নব-জাগৃতি এর মধ্য দিয়েই আসবে। কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়, কোনো ধর্মসভার উপদেশ নয়, প্রকৃত সাম্যবাদ এই ছায়াচিত্রই এনে দেবে।

উত্তর কলকাতার [illegible] থেকে নিউ আলীপুরের প্রাসাদ পর্যন্ত এক কৃষ্টি বিস্তার করার সাধ্য একমাত্র এরই আছে। এক সুরে উচ্চাঙ্গ নিচুতলা বাঁধা পড়েছে এরই দৌলতে। ঘুচে গেছে বয়স, ঘুচে গেছে পদমর্যাদা, প্রাদেশিকতার প্রাচীর পড়েছে ভেঙে।

দুধওয়ালী সোফায় বসে অলস দুপুরে উল বুনতে বুনতে বালীগঞ্জের লিপস্টিক-রাঙা অধর মদন গায়, মেরা নাম Rita Christina আই আই আ, তখন নাথের-বাগানের বস্তীর ঘরেও রণকণ্ঠকিতমুখে আর একটি বালিকা হয়ত ঠিক ওর পরের লাইনটিই গাইছে। সত্যি ভাবলেও দেহ পুলকিত হয়। বুটপালিশ আর বুক-বাইণ্ডার থেকে শুরু করে ছোকরা ডেপুটি কিংবা মাধবনন্দী ঘোষেজ এম এল এ গানের সুরে বায়না করছেন বি ই টি টি ই আর বেটার, এম এ টি টি ই আর ম্যাটার, কিংবা তিন বছরের শিশু আধো আধো উচ্চারণে কসরত করছে, পাগল মুঝে কর দিয়া জাপান লাভ ইন টোকিও তখন মনে হয়

শুধু সাম্য নয় আন্তর্জাতিক সহবাস ঘনিয়ে এল বলে।

সিনেমা হলে বসে বসে আমি থিয়েটার দেখি। কতরকমের মানুষ, কতরকমের মুদ্রাদোষ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এক একটি শোয়ের ছাঁকনিতে এক এক টাইপের মানুষ ধরা পড়েছে। বিশেষ করে ম্যাটিনী আর নাইট শোর একটি বিশেষ চরিত্র আছে। ম্যাটিনীর ভরা জোয়ারে অন্তঃপুর থেকে ইস্কুল কলেজ পর্যন্ত ভেসে এসেছে দেখতে পাই। ট্রামে-বাসে ট্যাক্সিতে রিকশায়, পায়দলে। একবার একটি গলির ভেতর একটি লোমহর্ষক দৃশ্য দেখেছিলাম। প্রথমে একরকম ভেবেছিলাম, পরে বুঝলাম ট্রাপিজের খেলা নয়, রিকশঅলা প্যারালাল বার করছে। তিনজন জগদ্দল মহিলার চাপে পড়ে রিকশা প্রায় উল্টে গেছে রিকশর ডাণ্ডি ধরে অনেক উঁচুতে লাইফ রিস্ক নিয়েই রিকশঅলা ঝুলে রয়েছে। সে এক দৃশ্য। তবু এ সামান্য, সিনেমার জন্য যে-কোনো ঝুঁকি নিতে মহিলারা প্রস্তুত, মহোদয়গণও পিছিয়ে নেই।

সিনেমা হলে চোখ কান খোলা রাখলে অনেক তামাশা দেখতে পাবেন। interpreter স্বামীকে দেখবেন ইংরেজী ছবিতে, বদলে forecaster স্ত্রীকে দেখবেন বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে। কি অজ্ঞাত উপায়ে কাহিনীর খানাখন্দ অলি-গলি সব তাঁর জানা। সুতরাং একটু আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করতে কার না ভালো লাগে, শ্যালিকা হলে জামাইবাবুকে কাহিনীর কাটকাটে আরো অনেক কিছু হয়ত বলে যায়। নায়ক-নায়িকার বংশ পরিচয় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম বিবাহ সবই তাদের মুখস্থ। অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানো প্রেমিক যুগল থেকে নিরাসক্ত দর্শক কেউ না কেউ আপনার পাশে এসে বসবে। কতরকমের দর্শক, কেউ ছবি পাগল, কেউ কোনো দুঃখে দুঃখ হয়ে গিয়েছে। কেউ সপ্তাহে পর পর এক বই দেখছে, কেউ একদিনে তিনটি শো দেখে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি যায়। আমি একজনকে জানতাম যিনি সাটিং-এর মতই একদিনে কোনো ছবির সম্পূর্ণ করতেন না। কনটিনিউটি বজায় রেখে খুঁড়ি ধরে আসতেন পরের পর দিন, কারো চাই প্রথম দিনের ছবি দেখে নেওয়া। কেউ বা কোনো বিদেশী নায়িকার নাম দেখামাত্র ফাইটার বাড়ের মত ছুটে আসে। কারো বা অ্যাডাল্টস ওনলি লেবেলটিই যথেষ্ট। কেউ আসেন প্রাইভেট-টক করতে, কারো কোলে দুধের পোষা পোর্টেবল্ ট্রানজিসটার কানে ভলামে খোলা।

পয়লা সারির আসনগুলিতে যেসব দর্শক আসেন তাদের একটি আলাদা জগৎ। আগে
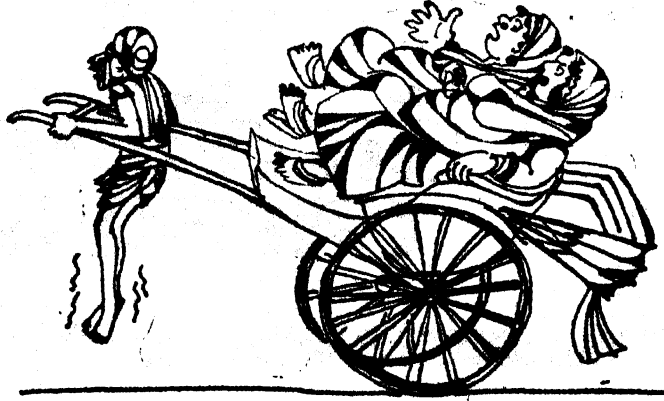
"ট্রাপিজের খেলা নয়, রিকশাওয়ালা প্যারালাল বার করছে"

ছিল সাড়ে ছ-আনা, এখন কুচো পয়সায় দশনী কিছু বেড়েছে। গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে লাইনের রণ জয় করে ভেতরে ঢুকে তাঁরা অবলীলায় ঘামে জবজবে জামাকাপড় নিংড়ে চেয়ারের পিঠে শুকুতে দেন। প্রয়োজন মাফিক জায়গায় ক্ল্যাপ এবং সিটি বাজিয়ে অভিনেতাদের উৎসাহিত করেন। কখনো কখনো নাচের বেলায় কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ বলে নর্তকীর উদ্দেশে পর্দা লক্ষ করে পয়সা ছুঁড়তেও দেখা যায়।

নাচের কথাই যখন উঠল তখন আর একটু বলি। হিন্দী এবং ইংরেজী ছবি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের যতখানি নাচাচ্ছে এমনটি বাংলা ছবিও পারেনি নাচ এখন ঘরে ঘরে সংক্রমিত হয়ে গেছে ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেক নবদম্পতি নৃত্যসাধনা করে থাকেন, নিচেরতলার বাসিন্দেরা তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। সের ইনডোর গেম হিসেবেও অনেক স্থূলকায় ভদ্রলোক ইদানীং এই বিদেশী নৃত্যকে কায়স্থ করছেন। হয়ত ডাক্তারী প্রেসক্রিপশনে গোটে বাতের সেরা দাওয়াই হিসেবে বক্ এন্ড রোল, টুইস্ট কিংবা চাচাচা স্থান করে নিয়েছে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা হয়ত আমার থেকে নিশ্চিত করে বলতে পারবেন।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

পাঁচ

কিন্তু মন গড়লেই না ধন! সেই মনটা গেল মুষড়ে। ভাবা গিয়েছিল, ফার্স্টো কেলাসের রাজ্যখানি একলা ভোগে লাগবে। বেয়ে আসা দুই দিগন্ত দুই জানালায়। তার সঙ্গে মুখোমুখি করে যদি হাসি আসতো, তাকে ঠোঁটে তুলে নেওয়া যেতো। যদি ভিতরে গুনগুনিয়ে উঠতো গান, তাকে ছেড়ে দেওয়া যেতো গলার অাগল খুলে। সেই যে ভরা প্রাণের ভূপিত-খানি, অকারণে চোখের জলে গলে আসে, তা যদি আসতো, তাকে দেওয়া যেত ভাসিয়ে। আর ঘরের বাইরে, জানালার পারে মাঠদে গাজী! এখন দেখি, সে তো যেন এই দিগন্তে একাকার। চমকে গেলে, মাথার ওপর আকাশ থাকে কিনা। এই যে রোদ ওই যে ছায়া, পাখিপাখালি গাছগাছালি, ভেদে ভেদে অভেদ, অখণ্ড। গাজী দেখি সেই অখণ্ডের শরিক। সে ফার্স্ট কেলাসের যাত্রী নয়। তার সভ্যভব্য ভদ্রতার দাবি নেই। সহবত শালীনতা সে চায় না। তার অখণ্ড একাকারে যেমন খুশি ছড়িয়ে দেওয়া যেত।

তা হল না। এখন শুধু ভাগীদারের ভাগাভাগির কথা নয়, এখন এ ঘরে জনপদ আর সমাজের আবির্ভাব হয়েছে। মূর্তি-মান সভ্যভব্য ভদ্রতা নিয়মকানুন ঢুকেছে। এখন দিগন্তে ডুব নয়। ভিন্ন যাত্রীর সুখ সুবিধা, অস্তিত্বের সতর্কতা। এখন এ ঘর দিগন্তের হাতায় নয়। এবার পায়রার খোপ। নড়ে বস, চড়াতে যেও না। তা হলেই মুখোমুখি, গায়ে গায়ে লাগা-লাগ।

বলবে, এ যাত্রী ভারী একালষেঁড়ে। এমন সুজন নয় যে, ন'জনে যাবে তেঁতুল পাতায়। ভাগের ভোগ জানে না। গণে জনে নেই, একা ভোগী স্বার্থপর।

তা বলতে পারো, যদি ধর্মে কয়। তবে, এলাম যে তেঁতুল পাতা থেকেই। সুজন কিনা জানি না, সমাজে সংসারে যেখানে সে ন'জনের ভাগাভাগিতেই বাস। সেখানে সকলেরই অন্নে জলে ভাগাভাগি, গাদাগাদি মুখোমুখি। কিন্তু যখন নিরালায় মন টানে মন, তখন! তখন মাঠ মাঝে তার ধারে যাওয়া কেন। দীঘির কূলে গিয়ে বসা কেন। ছাদের নিরালা কোণটিতে কেন আশ্রয় নেওয়া।

এটা স্বার্থপরের কথা নয়। অনেক পড়শী তো আছে, সময় বুঝে একবার নিজের ভিতরে যে পড়শীর বসত, তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ইচ্ছা। তারা তোমাকে অনেক পেয়েছে, তুমি তাদের অনেক বলেছ। এবার নিজেকে নিজে একটু বলা কওয়া হোক। কোথায় যাও, কেন যাও, কি চাও, কিসের খোঁজে। এবার হবে মন বন্ধই হোক। মন চলা যাই খোপ ছেড়ে। দেহ থাকুক পড়ে। তুমি যাও দিগন্তে। ঘ্রাণে গন্ধ আসে সুবাসিত প্রসাধনের। চুল চাপানো সাবানের, গায়ে মুখে মাখা ক্রমুর, জামাকাপড়ের সুগন্ধির। আসুক। আরো আসে ফুলেল তেলের। আসুক। কী যেন নাম। ঝিনি। বাতাসে যার চুলের ঝটকা লাগে। ডান হাতের চুড়িতে তার রিনিঠিনি। যাক গে শোনা। শ্রবণ বন্ধন কর। আবার দেখ, টুকুস্ শব্দ, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে যায়। ভিনপুরুষে শরম, চোখ ফিরিয়ে নাও। দেখছ না, গালের পাশে চুলের আড়ালে, সোমত্থ মেয়ের হাতে ছোট আরশি। আপন মুখখানিই যে পলকে পলকে হারায়। ঠোঁটের রঙ এর মধ্যেই হালকা। তাই মুখ আড়াল করে একটু রাঙিয়ে নেওয়া। এই জল-ভড়ভড়িয়াতে দেখবে কে? আর কেউ না দেখুক, নিজের মন দেখবে। নইলে বড় অস্বস্তি। তোমার যদি বেমানান লাগে, মানিয়ে নেবার দিব্যি নেই। দৃষ্টি বন্ধন কর। তবে কিনা, বাতাসের মর্জি বোঝা দায়। ঠিক এ সময়েই সে রঙ-বালকের আঁচল দিল উড়িয়ে। কাঁধের কাছ থেকে গোটা পুষ্ট ডানা-

থালিতে ঢাকনা নেই। তার সঙ্গে নগর-বাসিনীর কোমর ঝম্বির ওপরে এক ফালি রোদের মত গোরা বুকের ঝিলিক দেয়। কী বেকাজ বাতাস দেখ, অযথার্থ চমকে দিয়েছে। ঝটিতি ঠোঁট রাঙানো সামনে নিয়ে আঁচলে টান দিল। সেই ফাঁকে টুক্ করে দেখে নেওয়া, আপন জন নয়, ভিন্ মানুষে। চোখ ফেরাবার সময় পেলাম না। যুবতীর মুখে রঙ ধরে গেল।

নিজের ভিতরে দেখি, কে যেন চুপি চুপি হাসি সামলায়। মনের পড়শীর মজা লাগে। যোগী সে নয় বটে, কিন্তু মনে হয়, এ সবই যেন এ দিগন্তে একাকার। গঙ্গীর মত এও যেন ভেদে ভেদে অভেদ অখণ্ড। দেশ তো, বাতাস আসুক বেগে। যুবতী সাজুক। এ দিগন্তে সবই সাজে।

সহসা প্রচণ্ড হাঁক, 'হুঁশিয়ার!'

লঞ্চ উলটো পাড়ের সীমায়। জোয়ারের জল থইথই। উঁচু বাঁধের কাছ ঘেঁষেই লঞ্চ দাঁড়ায়। তার যন্ত্র বন্ধ হয় না। খালাসী হুঁশিয়ার বলে মোটা তক্তা এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দেয় বাঁধের ওপরে। তারপরে বাঁধের মাটিতে বাঁশ ঠেকিয়ে উঁচু করে ধরে। যাত্রী দুজন। জোয়ানের হাতে টিনের স্যুটকেস্। জামার ওপরে, কোমর বেড় দিয়ে চাদর বাঁধা। কাপড় ঠেকেছে গিয়ে হাঁটুর কাছে। আর এক হাতে ধরা বছর কয়েকের ছেলে। তার গায়ে জামা আছে, কিন্তু তলায় কেন কিছু নেই, কে জানে। ওদিকে নাকের ফুটো দিয়ে দরানি ভেসে যায়।

যাত্রীদের ওঠার পরেই আবার তক্তা টেনে নেয় খালাসী। লঞ্চ মাঝ দরিয়া নিশানা করে দক্ষিণে ভেসে যায়। যত দূরে চোখ যায়, নদী আর উঁচু বাঁধ। পশ্চিমে তীরে তবু কিছু গ্রাম চোখে পড়ে। আম জামের মাথা ছাপিয়ে সুপারি, তাকে ছাপিয়ে নারকেলের মাথা দোলানো। তাও যেন মনে হয়, গ্রাম অনেক দূরে। নদীর ধারে তাকে বেঁধে রেখেছে উঁচু পাড়। পাড়ের আড়ালে আড়ালে, গ্রামের বাইরে বাইরে, পাকা কিংবা আধপাকা, সবুজ-পাংশু ধানের খেত। পুব দিকেতে, উঁচু পাড়ের আড়ালে, নির্নিবা চোখে যত দূরে দেখ, কেবলই ধান। জনপদে ঘরে ঘরে এত যে নাই নাই, এখানে সে খবর নেই। এখানে সে যেন দিক-জোড়া দাতা কর্ণ। আর দেখ, তার সবুজে পাংশু ঝোপ অথই-এর বুক থেকে, মাঝে মাঝে একটা লম্বা তীর যেন সোজা আকাশে উঠছে। উঠতে উঠতে হঠাৎ ধনুকের বাঁক বেঁকে গিয়ে, আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পাখিগুলোর নাম কী কে জানে। দূর থেকে দেখি যেন ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ছে। উড়তে উড়তে আবার ঝাঁপ খেয়ে ধান খেতে ডুব দিচ্ছে। হয়তো ধান-চড়াইয়ের দল। ধরাতে ওদের মন নেই, ধানভোজনে মত্ত।

তবু এ নদীর পাড় যেন কেমন খাঁ খাঁ করে। চাংড়া চাংড়া মাটির ঢিবি, নদী বরাবর করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও তার তেমন সবুজের সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে, দু চারটে ঝাড়ালো গেনো গাছ। কোথাও নাম না-জানা জলজ জঙ্গল। যেখানে পাড়ের নীচে কিছু কিপ্টিং জমি জলে ডোবোঁম, সেখানে গাঙ শালিকদের নিঃশব্দ ঠোঁট খোঁচানো। এত বড় একটা জলযান যে দু পাড়ে শব্দ ছড়িয়ে যায়, একবার তাকিয়ে দেখে না। বোধ হয়, এই পাঁকের পোকামাকড় বসে রোজ দেখা শোনার ব্যাপার। যত ভয় তো অচেনাকে। ওই জল-ভডভডিয়াকে দেখা আছে, প্রথম ডিম ফেটে বেরিয়েই।

'বাবু!'

কানের কাছেই ডাক শুনে ফিরে দেখি, গাঙ্গীর সাদার বাঁধা পাগড়ি আমার মুখে লাগে প্রায়। বলে, 'কেমন বোঝেন বাবু?'

তার চোখের ঝিলিকে যেন রহস্য। ভুরু নেচে নেচে ওঠে। কী বোঝার কথা বলে গাজী? কথা আসে কোন বায় থেকে? জিজ্ঞেস করি, 'কিসের?'

গাজী ঘাড় দুলিয়ে, দূরের দিকে দেখিয়ে বলে, 'এই ভেসে পড়া?'

ভুলে গিয়েছি, এই ভেসে পড়া গাজীর মতলবে। ভাল লাগা, মন্দ লাগার দায় এখন তার কাঁধে। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। মনে হয়, এই যে কোথাও কিছুর শেষ নেই, তার মধ্যে আমার ভাল-মন্দ সব কিছুর হদিস যেন হারিয়ে গিয়েছে। বরং জিজ্ঞেস করি, 'এই রকম উঁচু পাড় কতখান?'

গাজী বলে, 'যত দূরে যাবেন। এ তো বাবু ভেড়ির বাঁধ, নদী সামাল দিয়ে রেখেছে। এক ফোঁটা জল যেন জমিনে না যেতি পারে।'

'কেন?'

'লোনা। এ গাঙের জল যে তিতা লোনা। ফসল হতি দেয় না।'

বাঁধ দিয়ে তাই নদী বন্ধন। এ জল যে নোনা, তা জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করি, 'ইছামতীর যে জল দেখে এলাম, সেও কি নোনা নাকি?'

'আজ্ঞা। উনিশ বিশ হতি পারে, তয় বাবু, লোনা। সাগর যে এখেনে আসা-যাওয়া করেন। এখানে বার মাস লোনা। এই টানের দিন এল, এবার একটু কম পড়বে।' বলে সে দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে। গাজীর সবই রহস্যময়, হাসবার কী আছে বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দেয় গাজী নিজেই, 'বাবুর যে কথা। বলে, যে জল দেখে এলাম, তাও লোনা নাকি। বাবু, মানুষ দেখে কি সুমন কুমন বোঝা যায়। জল দেখে কি কেউ বলাতি পারে, লোনা, না মিঠা।'

যথার্থ কথা। নিজের বাস মিঠা জলের কূলে। গঙ্গার ধারে বসত। টানের দিনে সে জলের যেমন রঙ, এ জলেরও সেই রকম। তার জোয়ার ভাঁটায় যেমন তরঙ্গ, সেই তরঙ্গে রোদ যেমন চলকায়, এখানেও সেই রকমই দেখি। লোনা মিঠার স্বাদ নদীর গায়ে লেখা নেই।

'হ্যাঁ, কথাটা ভেবে দেখতে গেলে ঠিক বলেছ তুমি।'

বলে একটু লম্বা টানের হাসি। কথা ধরেছেন গলাবন্ধ কোট, কেশ বিবাগী মাথা। তিনি যে আমার মুখোমুখি, সেই খেয়াল নেই। অবাক হয়ে লাভ নেই, বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, কেশ বিবাগী মাথা দুলছে। যেন গাজীর সঙ্গে তাঁরও রহস্য চলেছে। তারপরেই ডাক দিয়ে বলেন, 'শুনছো, এই যে! এই যে, ওরে ঝিনি, জানিস তো, এ জল কিন্তু লবণাক্ত। মানে, সী ওয়াটার যাকে বলে।'

ওপাশের বেঞ্চ থেকে দু জোড়া চোখ ফিরল বটে। পর মুহূর্তেই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি। যুবতীর হাসির মধ্যেও, লতা যেমন বাতাসে কাঁপে, তেমনি ভুরু কেঁপে যায়। সেই কাঁপনে হাসির ছটা নেই। ক্ষোভের বক্রতা যেন। প্রৌঢ়াও যেন একটু নাকছাবিতে ঝিলিক হানেন। গলাবন্ধ কোটকে যেন বিদ্ধ করতে চান। তাতে এই ধারণা হয়, সী ওয়াটার লবণাক্ত কি না, সে ভাবনার থেকে অন্য কোন লবণাক্ত ভাবনা সেখানে। কিন্তু কেশ বিবাগী মাথাখানিতে দরিয়ার ঝলক হেনে তখন তিনি আমাকে লক্ষ করেছেন, 'ইয়েস, রাইট, সল্ট ওয়াটারে ক্রপ্ নষ্ট হয়ে যায়, হানড্রেড পার্সেন্ট করেক্ট।'

বলার ধরনটা যেন গাজীর কথায় আমার প্রত্যয় হয় নি। তাই প্রত্যয়সিদ্ধ করার দায় ও'র কাঁধে। ঘাড় নেড়ে জানাতে হয়, কথাটা উনি যথার্থ বলেছেন। এ জল সল্ট ওয়াটার, এতে ক্রপ্ নষ্ট হয়। তার চেয়ে দেখি, গাজী গলাবন্ধ বাবুকে হাঁ করে দেখছে। মুরশেদ হাপিস্, গোসাবা-যাত্রী বাবুর কথা বীজমন্ত্রের থেকে কঠিন।

তা হোক, প্রৌঢ় আবার উলটো আসনের দিকে মুখ করেছেন। মনে হয়, ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছাড়বেন। কে জানতো, এই মানুষে কোন মানুষ আছে। সু কু ছাড়ো, দরিয়ার জল দেখলেই তার স্বাদ বোঝা যায় না। বললেন, 'টাকিতে, হাঁদুও ঠিক এই কথাই বলেছিল, বুঝলে। এই যে দেখছ বাঁধ, উঁচু উঁচু ঘোঁড়ির বাঁধ—।'

গাজী বাইরের থেকে জানালা দিয়ে মুখখানি আর একটু তুলে তাড়াতাড়ি বলে, 'ঘোঁড়ি নয় বাবু, ভেড়ি—ভেড়ির বাঁধ।'

কিন্তু সেটা কোন কথা নয়। এখন বিষয়ে আসা গিয়েছে। গাজীর দিকে হাত তুলে, উলটো আসনের দিকে ফিরে বলেন, 'ওই হল। ঘোঁড়ি আর ভেড়ি, তোমাদের কোনটারই কোন মানে হয় না। বাঁধের আবার ঘোঁড়ি

আর ভোঁড়।......তা বুঝলি ঝিনি, এতেই প্রমাণ হয়, লবণের একটা ক্ষয় করবার ক্ষমতা আছে......।'

এই পর্যন্তই। সহসা প্রৌঢ়ার সিন্দুর-বিন্দুতেই যেন ধমক বেজে ওঠে, 'কী তখন থেকে ঝিনি ঝিনি করছ। অলকা বলতে পার না?'

বলেই একবার খোপের ভিন্ যাত্রীটিকে দেখে নেওয়া। আহ্, এবার শোন গড়ে কথা। লবণাক্ত জলের বিচার এক দিকে, আর এক দিকে লবণাক্ত ভাবনা কোন চলে বহে, তাই দেখ। প্রৌঢ়ার অবস্থা যেন ভাসন্ত নৌকা আচমকা ডাঙায় ঠেক খায়। প্রথম শব্দ হয়, 'অ্যাঁ?'

শব্দের পরেই অধীনের প্রতি একবার কটাক্ষ। এখন কে লজ্জায় পড়ে, ভেবে দেখ। চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। সত্যিই তো, তখন থেকে ঘর করতে অষ্টপ্রহরের নাম ধরে ডাকা কেন। বাইরে লোকজনের সামনে কি পোশাকী নামটা বলা যায় না। ভিন যাত্রী তুমি না হয় 'ঝিনি' নাম ধুয়ে জল খাবে না। ঘরের লোক হয়ে তুমি ঘর বারটা বজায় রাখবে তো। একটা সাবাস্ত বলে কথা আছে। গাজীর চোখ
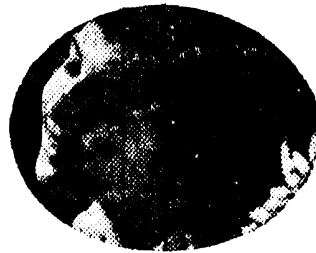
মুরশেদ অকুল। তার গোঁফদাড়ির ফাঁকে, হাঁ মুখে জিভখানি দেখা যায়। যেন সে আমাকে চোখে জিভে দুয়েতেই দেখে। দেহতত্ত্বের রহস্য থেকেও বড় রহস্য কী যেন ঘটে গেল, ধরতে পারলা না।

প্রৌঢ় ততক্ষণে আবার ধরতাই ধরার তাল করেন, 'ও, সেই কথা বলছ। মনে থাকে নাকি সব সময়। আচ্ছা, অলকাই বলা যাবে। তোদের আবার......।'

আবার ঠেক্। বোঝা যায়, ইশারা হয়েছে। তিন্ যাত্রীকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে সীমন্তিনী চুপ ধমকে চুপ করান। বোধ হয় সেই জন্যেই প্রৌঢ়ের গলায় পুরনো কথার জের; যেন সহজ গলাতেই বলছেন, 'হ্যাঁ, ওই আর কী, নুনের কথা হচ্ছিল। নুন দেখলে, লোহা পর্যন্ত ক্ষইয়ে দেয়। এই যে বাঁধ দেখছ, ওই নোনা জলের জন্যেই। তা নইলে তো ধান কিছুই হত না।'...

মনের দোষ, চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, উলটো দিকের সাড়া কেমন। কিন্তু পারা গেল না। ভিতরে যেন কোথায় তিন যাত্রীর আত্মসম্মান টনটনে হয়ে ওঠে। অথচ, তার মধ্যেই কোথায় একটা কুলু কুলু শব্দ বাজে। তবে সাবধান, হাসি নিষেধ। গাজীকে জিজ্ঞেস করি, 'এ নদীতে ঘাট নেই? কেউ চানও করে না?'

এখন এক চোখের পীড়া। মনেও সেই পীড়া লাগে। লোনা বলে কি সেই দরিয়ার কূলে মানুষের ছায়াও পড়তে নেই?

গাজী ভুরু তুলে চোখের ফাঁদ বড় করতে চায়। বলে, 'দোহাই মুরশেদের, অমন কথা কবেন না বাবু। এ জলে যে শমন আছে।'

'শমন? সে আবার কী? কুমীর নাকি?'

'না বাবু, কুমীর নয়, কামট।'

'সেটা কী রকম?'

'সে বাবু বেজায় রকম। কুমীরের মতন উনি ডাঙায় ওঠেন না। জলে ডুবে ডুবে ধারে কাছে ঘোরাফেরা করেন। একবার কেউ নামলি হয়। যেটুকুন পাবেন, এক গরাসেই সাবড়ে নিয়া যাবেন।' খোপের ঘরে ভয়ের ডুকরানি, 'মা গো!'

তাকিয়ে দেখি, ঝিনি বন্দ, অলকা বন্দ, ভয়ে শরীর হিলহিলানো। গাজীর দিকে কাজল কালো চোখে যেন আস্ত কামট ভাসে। প্রৌঢ়ারও সেই অবস্থা। গলাবন্ধ কোটের হাল দেখবার আগেই গলা বেজে ওঠে, 'ডেঞ্জারাস্! হাঁদু বলেছিল বটে—।'

ততক্ষণে গাজী আবার ধরে দিয়েছে, 'তা বাবু, যার যেথেনে বাস, না কী বলেন। ইদিককার গোটা গাঙ জুড়ে ও'য়াদের রাজত্ব। কুমীর মশায়ের থেকে ও'য়ারাও বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু কম ধরেন না। এই যে মোটর লঞ্চখানি চলেছে, জলে গিয়া দেখেন, ও'য়ারাও সঙ্গ নিয়ে চলেছেন।'

'কেন?'

'যদি আস্তা মানুষটা জানোয়ারটা পড়ে, ওর একটু ভোজ হয়।'

উলটো আসন থেকে আকার মেয়ের আর্তরব, 'ও মা, শুনেছ?'

প্রৌঢ়া সীমন্তিনী গলাবন্ধ কোটের দিকে ফেরেন। তাঁরও যেন বুক ধড়াসে যায়। বলেন, 'হাঁদু তোমাকে কিছু বলেনি?'

প্রৌঢ়ের সামনে যেন কামটের হাঁ। ঘাড় নেড়ে বলেন, 'নো। মানে, হাঁদু আমাকে কামটের কথা যেন কী বলেছিল, কিন্তু এরকম কিছু বলেনি। বাট দিস্ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, তার বলা উচিত ছিল।'

কেন, জলে পড়ে নাকি সবাই। কামটেরা ঘিরেছে নাকি। জলযানে এত মানুষ, মেয়ে মন্দ ছা, যারা ঘর করে এই নদীর কূলে, তাদের প্রাণ কি সব হাতে নাকি। খবর কি তাদের অজানা? তাই যদি তো, যাত্রা কেন। গন্তব্যে পাড়ি কেন। তবে হ্যাঁ, বলতে পার, সংবাদ নতুন। অচিনকে বড় ভয়। তা বলে তোমাকে কেউ কামটের মুখে নিয়ে চলেনি। যদি ধরে নেওয়া যায়, সম্পর্কে এই তিনে বাপ মা মেয়ে দেখ গিয়ে, আরো অমন বাপ মা মেয়ে যায় এই জলযানে। অন্য মানুষে কি খেয়াল নেই। কিন্তু আমি দেখি মুরশেদ নামের মজদুরকে। তার কালো চোখের ঝিলিকে, দাড়ির ভাঁজে হাসিতে এখন যেন সে আর গাজী নয়। শমনের দোসর নাকি সে। যেন অকূলে ভাসিয়ে এখন প্রাণ নিয়ে খেলা করে। 'ইষ্ট নাম জপ কর হে, কালের দেশে এবার কাল ঘনিয়েছে।'

না, শমনের দোসর নয়, খবর দিয়ে মজা দেখে। নিজেই তাড়াতাড়ি জানালায় হাত তুলে বলে, 'ডরাবেন না মা-ঠাকরুন! অ দিদি, কিছু ডর নাই। ও'য়ারা তক্কে তক্কে থাকেন বটে, তয় জানাবেন, মানুষকে ভয় পায় না, এমন জীব খোদায় বানায় নাই। তয়, হ্যাঁ, এইসব গাঙে চলাফিরা করতি গেলে একটু হুঁশিয়ার। পড়লেন আর ধরলে, তা নয়, তয় বলা তো যায় না এই আর কি। এ'য়ারা আবার মানুষজনের কাছাকাছি থাকেন কিনা।'

গাজীর এক হাতে বরাভয়, আর এক হাতে ভরাডুবি। এক নাকাতে নেই সে। ভয়ের কিছু নেই, তবে হ্যাঁ অসাবধান হলে সেটা কপালের লিখন। এখন যেমন বোঝ। কাজের কথা জিজ্ঞেস করি, 'সেরকম দুর্ঘটনা ঘটে নাকি?'

গাজী বলে, 'তা বাবু, যা নিয়া আপনার ঘর করা, তা একেবারে রেয়াত না দিলি কি চলে। এই তো সিদিনের কথা বলছি। ডাঙার কাজ সেরে জলের জন্যি গেলে তুমি গাঙে। তোমার জম্মো কম্মো এখেনে, সব তোমার জানা। অই, হলে কে, এজলাসের

ফারমান এসেছিলেন। যেই গিয়া হাটুভর জলে নেমে বসা, অমনি জরিমানা। হাটুর কাছ থিকে কুটুস্ করে একখানি পা।'

কুটুস্ করে একখানি পা। বাহ্ গাজী, এজলাস ফারমান জরিমানা বলে টুকুস টুকুস্ দিচ্ছে বেশ।

ওদিকে গলাবন্ধ কোটের রুদ্ধ উত্তেজিত গলা, 'নেকস্ট? তারপর?'

'তারপর আর কী। হাঁকে ডাকে লোকজন গিয়া ডুলি নিয়ে এল। পাঠিয়ে দিয়া হল

বসিরহাটের হাসপাতালে। ততক্ষণে পচন ধরেছে। ওই এক ব্যাজ, বিষ বড় খারাপ। দেখতি দেখতি পচে, আর—।'

গলাবন্ধ কোট ধমকে ওঠেন, 'আরে, দুত্তোরি পচাপচি, লোকটা বাঁচল কিনা বলবে তো।'

গাজীকে চেনা ভার। তখনো দাড়ির ভাঁজে, ফাটা মুখে মিটিমিটি হেসে বলে, 'সে জব তো আগেই দিলাম বাবু। বললাম না জরিমানা। নইলে তো ইস্তেমাল হত। ফাঁসির হুকুম হয় নাই। তয়, উরুতের কাছ-খান অবধি বাদ দিতে হয়েছিল।'

প্রৌঢ়ার গলা, 'কী সর্বনাশ!'

প্রৌঢ় চোখ ঘুরিয়ে তাল দেন, 'অবকোর্স!'

ঝিনি না অলকা যার নাম, সে বুঝি সাজ-পোশাক ভুলে যায়। ভয়ে আর বিরক্তিতে ঠোঁট উল্টে বলে, 'কী বিচ্ছিরি জায়গা। আগে জানলে কে আসত।'

গাজী আবার অভয় দেয়, 'ডরাবেন না দিদি, ও সবই নসীব। এই যে এত লোক আছে, কেউ যায় না, তুমি কেন গেলে? তোমার অজানা তো কিছু না। এই ধরেন না, আপনাদের কলকাতায় দেখেছি, এই পেকাণ্ড গাড়ি, মানুষ গুঁড়িয়ে দিয়ে দৌড়। সে রাস্তাও তো কামটের গাঙ দেখি।'

গলাবন্ধ ধমক দিলেন, 'আরে তুমি থাম। কোথায় কামটের নদী, আর কোথায় কলকাতা। সেখানে লোকে গাড়ি চাপা পড়ে অসাবধানে।'

গাজী হেসে সাক্ষী মানে স্বয়ং প্রৌঢ়াকে, 'অই শোনেন বাবুর কথা, আমি তো সেই কথাখানিই বলছি। বেহুঁশিয়ার হয়েছ কি গেছ। না, কী বলেন মা, অ্যাঁ? আবার দ্যাখেন গিয়া, যে গাড়ির তলে মানুষ, সেই গাড়ি চালার মানুষে। এখেনে দ্যাখেন গিয়া, কোনো একটা-দুটো কামট জেলের জালে ধরা পড়তিছে, আর মুগুরের মার খেয়ে মরতিছে।

প্রৌঢ়: 'ধরা পড়ে?'

অলকা: 'দেখতে কেমন?'

গাজী দিদির কথারই 'জব' দেয়, 'সে আর বলতি হচ্ছে না দিদি, একেবারে শোরের মতন। দাঁত যদি দ্যাখেন তো ভিরমি। ছুতোরের করাতকে বলে ওদিক থাক। অইরকম দু' পাটি।'

অলকা নাম্নী গালের চুল সরাতে ভুলে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কত বড় হয়?'

'কুমীরের মতন অত বড়টা হয় না, একটু ছোট। ওর গায়ে চাকা নাই।'

দিদির মুখের অবস্থা দেখে গাজীর বুঝি আবার হাসি ফোটে। কামটের দুঃস্বপ্নে দিদির ঠোঁটের রঙে আর তেমন

ঝলক লাগে না। গাজী বলে, 'কোন ভয় নাই দিদি, মনের সুখে যান।'

গলাবন্ধ কোট প্রায় কাঁচকলা দেখাল। বলেন না, বলা ভাল, খেঁকোন; 'মনের সুখ আর রাখলে কোথায় বাবা।'

অধীনে ভাবে, তা বটে, সব যে কামটেই খেল। আর সে দায় যেন সব গাজীর। এবার বোধ হয় গাজী তাই দায়-ভঞ্জনের বাণী বলবে। কিন্তু না, তাকিয়ে দেখি, গাজীর দাড়ি ওড়ে বাতাসে। সে আমার দিকে চেয়ে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে দেখে গলাবন্ধ বাবুকে। এমন কেউ নেই, ওর দাড়ি নেড়ে দিয়ে বলে, 'পাজী।' মুরুশেদের নামে বেশ মজায় আছে। কিন্তু এই চোখের মজার সাক্ষী একমাত্র আমি কিনা তা বোঝবার জন্য চোখ ফেরাতে হয়। না, অন্য সাক্ষীরা তখন নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত। এই অঞ্চল যে একদা সুন্দরবনের মধ্যেই ছিল, প্রৌঢ় মা-মেয়েকে তাই বোঝাচ্ছেন। যদিও মেয়ের চোখের নজরটা কোন্ দিকেতে খেলছে, তা বোঝা আমার কর্ম নয়। শুনেছি কিনা, চোখে অনেক সময় মন বসত করে। তখন আর নজর মেপে নজর বোঝা যায় না।

এদিকে গাজী গলা যতই মিছু করুক, তার মুখটা আমার শ্রবণ থেকে দূরে নয়। শুনি সে গুনগুনোয়, 'অসুখ যেখেনে, সুখ সেখেনে. জ্যাপা খুঁজে দ্যাখ না মনে মনে ।'

বাইরে ফিরে তাকাই। যে গাঙ নিয়ে এত কথা, সেই গাঙের জল দেখি। তাকানের নীচের ঝলক রোদ্রে চলকায়। যেন গলানো রুপোয় লীলায় খেলে যায়। এত চলুকে বলুকে কিসের। ছলুকে বলুকে ভাটির। উজানী গাঙ কখনো সাগরের ডাক শুনেছে। যেন মায়ের কাছ থেকে মেয়ে ছুটে দিয়েছিল। ডাক শুনে চলে দৌড় দিয়েছে। ছলুকে বলুকে তাই, 'যা-ই, যা-ই।' ......জোয়ারে পারে নীরবতা। পারে আশমান ছায়া আরশি। এই নদী দেখে কে বলবে তার জল নোনা, তলায় অন্তর পেটের ক্ষুধা, হাঁ করে আছে। মানুষ দেখে যখন সুকু মনের হদিস পাও না জল দেখে পাবে কেমন করে। ঘর কর, কুলে থাক, জানবে।

এখন গ্রামের খোঁজ নেই। গ্রামগুলো সব কোথায় গিয়েছে, দিগন্তে তার কোন ঠিকানা দেখা যায় না। জেটির বাঁধের শেষ নেই, দুপাড় ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। হুঁশিয়ার নোনা গাঙ, এখানে আমাদের সোনা মোহরের সিন্দুক। যা কর বাঁধের সীমায়, এদিকে নজর দিও না। বাঁধের গায়ে মাঝে মধ্যে গাছ চোখে পড়ে। অধিকাংশই গেমো, ঝাঁকড়া খাটো খাটো। আর এক ধরনের গাছ, তার নাম জানা নেই। ইচ্ছে করে বলি, কৃষ্ণচূড়া। সায় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণচূড়া যেমন ছড়ায়, তেমনি উঁচুতে ওঠে। আর, এ যেন কেবলই ছড়ায়, আর ছড়ায়। ক্রমে ক্রমে পাখির ঝাঁকের মেলা লাগে। লাগবেই। নদী যায় ভাটায়, চর জাগে জগতে। নোনা পলিতে অনেক খাবার ছড়ানো। ঠোঁট ঠুকে তুলে নেওয়া। দিনান্তে তো দুই দফে খাওয়া, দুই ভাঁটিতে যা পাওয়া যায়। গাঙ শালিকেরা দূরে চারে চলে না, ঝাঁকের ভিড়ে তারা অগণ্য। তার ওপরে, পাঁকের রোদে ছায়া পড়ে দেখায় যেন অজস্র। ফাঁকায় ফাঁকায় আছেন ধার্মিক, কালো আর সাদা। বকধার্মিক। নজর একটু দূর দিকে।

বাঁধের ওপারে মানুষের আহার। চরায় পাখির ভোজ। জলে যে ফেরে, হয়তো সে হিংস্র, জীব নিয়মের বাইরে নয়। গাজীর বলা কলকাতার পথের কথাটাও ভুলতে পারি না। তবু সব মিলিয়ে এই দিক্‌হারা দিগন্তে কে উদাসী বিরাজে। মন বলে চল যাই এক অচিন স্বপ্নের খোঁজে।

তখন শুনি, মোটর-বাসের ভেঁপুর মত প্রায় কানের কাছেই প্যাঁক প্যাঁক বাজে। তারপরেই টিঙ্ টিঙ্ ঘণ্টা। অমনি ছাদের চোঙায় ভড্ ভড্ শব্দ মন্থর হয়ে যায়। ভুলে যাই, আমার কাঠের দেয়ালের আর এক পাশেই সারেঙ বসে আছে। তাকিয়ে দেখি, সামনেই বাঁধ। নদী কখন মোড় ফিরেছে, খেয়াল ছিল না। দেখছি মাঝদরিয়া ছাড়িয়ে কখন বাঁধ আমার হাতের কাছে। কী যেন কয়েক নাম-না-জানা গাছ বাঁধের বুকে। দূরে একটি কাশবনে ঘেরা গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের শিরি মাথা, সেই স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃক্ষ নারকেল মাথা তুলে আছেন। গোটা দশ-পনের বাড়ি ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে। এদিকে দেখ, এখনো লঞ্চ থামেনি। খালাসীর কাঠের সিঁড়ি নামেনি। টিকেট কাটার ব্যবস্থা নেই। সে-সব লঞ্চে উঠেই হবে। বাঁধের ওপর তো কয়েকটি গাছ ছাড়া, একখানি পাতার ঘরও দেখি না। এ কেমন ঘাট, কে জানে।

যাত্রীদের মধ্যে কর্তা গিন্নি সাহেব বিবি ছাওয়াল পাওয়াল সব রকমই আছে। বোঁচকা-বুচকির মধ্যে একজনের হাতে যেটি চোখে পড়ে, সেটি একটি নধর ছাগলছানা। বেচারীর চোখে কী তরাস! গলায় কাতর ডাক। মাকে ছেড়ে হয়তো যেতে হচ্ছে। জন্মভূমিও বটে। কোথায় নিয়ে যায়, কে জানে।

সিঁড়ি পড়তে না পড়তেই যাত্রী পা দেয়। তবে এবার বাঁধের গায়ে নয়। জল নেমে গিয়েছে ভাটায়। সিঁড়ি গিয়ে লাগে চরায়। সবাই নেমে এসে ওঠে।

উঠুক, কিন্তু যেভাবে সব হাঁটুভর পাঁক ঠেলে উঠছে, পিছলে না পড়ে। অনেকেরই টলমল ভাব। তার থেকে বেশী ভয় লাগে কলা বউটিকে দেখে। তবে উনি বউ কি বিবি, কে জানে। লম্বায় হাত তিনেক, বছরে বড় দেখি। লাল পাড় বাসন্তী রঙের জমিনে বেজায় লাল ফুলের ঝলক। তা বলে মুখ দেখতে পাবে, সে আশায় নিমাই। শাড়ির মধ্যে কোথায় যে আছেন, তা আর খুঁজি পেতি হসসে না।

তা বেশ তো, হায়া বজায় থাক, কেউ কি একটু হাতটা ধরতে পারে না। পারতো, যদি মা শাশুড়ী থাকতো। স্বামীতে হাত ধরলে আর হায়া কোথায় থাকে। তিনি তো বোধ হয় ইতিমধ্যে লঞ্চে উঠে পড়েছেন।

আহা, কী অশুভ ভাবনা দেখ। বউটি কাঠের সিঁড়ি থেকে হাঁটা দিল একেবারে ডাইনে বেঁকে। গেল গেল শব্দ ওঠার আগেই বউ নিচে। এ কে বলে দক্ষিণের পলি পাঁক। একেবারে কোমর অবধি নিচে। অমনি ঘোমটা ফাঁক। এবার দেখ ঠোঁট-সড়ানো আট-দশ বছরের মেয়েটি। শ্যামা গায়ে তেলতেলে মুখখানিতে দুলে নোলকে সাজ। কপালে সিঁথেয় ডগডগে সিঁদুর। চিলের মত এক চিৎকার, 'আঁ আঁ বাবা গো।'......

বউয়ের কান্না, লোকের গেল গেল, তার মধ্যেই একজনকে দেখা গেল, এক লাফ। মন্দর এদিক নেই, ওদিক আছে। হাতের বোঁচকাটি তিনি ছাড়েননি। কাদোর ওপরে গতরখানিও বেশ দশাসই। গোঁফের বাহার পড়েছে। দুপ কিংবা তাঁর মতার খবর কে জানে, মুখখানি বাঁধের মতই গড়াভেঙেলড়া। বোঝা গেল, স্বামীটি ওই পিসী। টান দিয়ে তুলে একেবারে পরের বুকে সতী। কে যেন আমার হেঁকে বলে, 'বউ তো?'

ভেবেছিলাম, রাগের জবাব আসবে। তাই কখনো হয়। ওই সংসার খাওয়া পাক ঠেলে উঠতে উঠতে মন্দ হাসি চাপতে পারে না। সলজ্জ হেসে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।' তারপরে শোনা হাসি। ছাদের খুপরিতেও হাসি খিলখিলিয়ে উঠছে। মাঝে মেঝেতে গড়াগড়ি। কেবল কর্তার মুখ বিরস। ঘটনা দেখতে দেখতে বলেন, ...

সেন্স!' গাজী ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাসতে হাসতে হাঁক দেয়, 'ভাগ্যি চোরাবালি নয়, তাহলে আর বউ পেতে হত না হে।'

বেচারী ছাড়া কী বলবে। তখন হাত ধরে নি। এখন কাঁধে কোলে ঝুলছে। নিজের গায়ে অমন পাট-ভাঙা নীল রঙের জামাটা কাদায় মাখামাখি। বধূটির মাথায় আবার ...। মুখখানি স্বামীর ঘাড়ে গোঁজা। লজ্জা করে না বুঝি। হতে পারে আট দশ বছর বয়স। বউ তো।

কর্তা গিন্নী উঠতে না উঠতেই সারেঙের ঘরে টিঙ টিঙ। অমনি যন্ত্রের গর্জন জোরে বেজে ওঠে। লঞ্চ মোড় ঘুরে সরে যায়। খালাসী সেই অবস্থায় সিঁড়ি টেনে তোলে। দিগন্ত আবার খুলে যায়।

(ক্রমশ)

সঙ্গীতের থিওরী

এ বছর উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত সম্মেলনগুলিতে থিওরীর আলোচনা নিয়ে কিঞ্চিত সাড়া পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গীতের থিওরী বলতে আমাদের প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে সেটা সত্য হলেও সম্পূর্ণ নয়—এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। বহু শত বৎসরে সঙ্গীতের সঙ্গে আরও নানা বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সঙ্গীতের থিওরী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সেগুলিও মুখ্য হয়ে ওঠে। আমরা এখনও সঙ্গীতকে তেমন সর্বাঙ্গীণভাবে দেখতে অভ্যস্ত হইনি।

প্রচলিত ধারণায় থিওরীর আলোচনা মানে রাগরাগিণীর লক্ষণসমূহ নিয়ে আলোচনা। কোন রাগে কোন কোন পর্দা লাগে, কীভাবে তার বিন্যাস হয়, তার বিশেষ অলঙ্কারগুলি কী কী, তার বাদী, সম্বাদী নির্ণয়, তার গায়ন পদ্ধতি—এইগুলিই হল বর্তমান ধারণায় থিওরীর অন্তর্ভুক্ত। এর যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কারণ, সঙ্গীত একটি প্রযুক্ত বিদ্যা—প্রয়োগেই এর সম্পূর্ণ সার্থকতা। অতএব যাঁরা বিবিধ রাগ-রাগিণীর সার্থক রূপায়ণে সক্ষম তাঁরা নিশ্চিতভাবেই পণ্ডিত কিন্তু সঙ্গীত এমন একটি বিদ্যা যার পূর্বাপর সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে এই জ্ঞানটিই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে আরও বিবিধ বিষয় জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটি মিলিয়ে সঙ্গীত। এই কারণে সঙ্গীতকে তৌর্যত্রিক বলা হয়। থিওরীর দিক দিয়ে বিচার করে বলব—সাহিত্য, ছন্দ এবং ইতিহাস—এই তিনটি বস্তু নিয়েই থিওরীর আলোচনা সম্পূর্ণ হবে। এই তিনটি বিষয় নিয়েই সঙ্গীতচিন্তা গড়ে উঠেছে এবং আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে এই সঙ্গীতচিন্তাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও দু-একটি বিষয় সঙ্গীত-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—এগুলি দর্শনের পর্যায়ে পড়ে। ধ্বনি এবং নাদের তত্ত্ব বা রাগ-রাগিণীর দেবময় মূর্তির পরিকল্পনাকে দার্শনিক বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে?

খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ভরত প্রযুক্ত বিদ্যার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের যে কী সম্বন্ধ সেটিও তিনি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন। নাটকে কোথায় কীভাবে সঙ্গীত যোজনা করা হত এবং সেই সব সঙ্গীতের স্বরূপ কী ছিল তা বোঝাবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন ছন্দকে অবলম্বন করে কীভাবে বিভিন্ন সঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছিল—সে বিষয়েও তিনি কম আলোচনা করেননি। অথচ, দুঃখের বিষয় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ওপর মোটামোটা গ্রন্থ রচিত হলেও এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত আমরা সব বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের আলোচনাকেই স্বীকার করি, তাঁদের পক্ষে সঙ্গীতের এই সব জটিল বিষয় বোঝা শক্ত বলে তাঁরা এদিকে অগ্রসর হননি—আমাদের দেশের মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী স্কলাররাও তাঁদের চোখ দিয়েই সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত। অতএব যেটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে সেটা এঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। মাপ করবেন, রূঢ় হলেও যা সত্য তা না বলে পারি না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ভারি ভারি গ্রন্থ যখনই রেফারেন্সের জন্য পড়তে হয়েছে তখনই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইনি। মনে হয়েছে তাঁরা পরিশ্রম করেছেন বিস্তর কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর মর্মগ্রহণ করতে সমর্থ হননি। তাঁদের গ্রন্থগুলি অধিকাংশই বিবলিওগ্রাফির দিক থেকে উত্তম, কিন্তু ব্যাখ্যার দিক দিয়ে দরিদ্র। অথচ, যাঁদের টুলো পণ্ডিত বলা হয় তাঁদের কাছ থেকে সব প্রশ্নের সদুত্তর মিলেছে। অতএব আমাদের বস্তু নিয়ে আমাদেরই আলোচনা করতে হবে, নতুবা সম্পূর্ণ আলোকপাত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এছাড়া সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সঙ্গীত-সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সংস্কৃত-সাহিত্যের এত ভারি ভারি গ্রন্থাদির মধ্যে সঙ্গীতসাহিত্যের উল্লেখ নগণ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই যখন চর্যাপদ সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করলেন, তখন তাঁর একবারও মনে হল না যে, চর্যা যখন সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত তখন সঙ্গীতসাহিত্যে এর উল্লেখ মেলে কি না। চেষ্টা করলে তিনি বিফল হতেন না, কিন্তু এটা তাঁর মনে হয়নি। বড়ু চণ্ডীদাসের তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। সঙ্গীতের দিক থেকে এই গ্রন্থের মূল্যায়নে খুব কম ব্যক্তিই তৎপর হয়েছেন। নানা বিষয়ে আমাদের অন্ধভক্তি প্রচুর আছে, তেমনি আছে অন্ধ বিশ্বেষ। আচার্য অভিনবগুপ্তের নাট্যশাস্ত্রের টীকা নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের সঙ্গীতাংশের টীকায় অভিনবগুপ্ত আদৌ আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছেন কি না সন্দেহ। এই টীকা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে গিয়ে এমন প্রতীতি হওয়া আশ্চর্য নয় যে, তিনি সঙ্গীতে আদৌ

অভিজ্ঞ ছিলেন না, অথচ স্কলারদের কলমে এই টীকারই জয়জয়কার হবে এবং তাও এই দুর্বোধ্য টীকায় আদৌ প্রবেশ না করে। তাঁরা কি এটা স্বীকার করবেন যে সঙ্গীত-রত্নাকরের সাহায্য না পেলে নাট্যশাস্ত্রে প্রবেশ করা দুরূহ। আমার তো মনে হয় কল্লিনাথ যদি নাট্যশাস্ত্রের টীকা রচনা করতেন, তাহলে আমরা অনেক বেশী লাভবান হতাম। সঙ্গীতের থিওরীর আলোচনায় এই সব বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আমাদের নাট্যসঙ্গীত কেমন ছিল, কিভাবে রাগ-সঙ্গীতের উৎপত্তি হল, এই যে বিরাট প্রবন্ধসঙ্গীতের বর্ণনা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে বর্তমান বিভিন্ন দেশী সঙ্গীতের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় কি না এবং তাদের বিবর্তন কেমনভাবে হয়েছে—এ সবই ব্যাপকভাবে আলোচনা করা দরকার। তাল সম্বন্ধে আলোচনাও প্রায় [illegible]ই হয়নি। মার্গতাল সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। বর্তমান তিন তাল এক ফাঁক পদ্ধতির আগে দেশী তালের প্রয়োগ কিভাবে হত সে সম্বন্ধেও কোন আলোচনা হয়নি। সঙ্গীতশাস্ত্রের বহু অংশ দুর্বোধ্য। তাকে সুবোধ্য করতে হলে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঙ্গীতের ইতিহাস সংগঠন করা সম্ভব, নইলে নয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডকে অনেকে দোষ দেন যে, তাঁর রাগসম্বন্ধীয় থিওরী ঠিক নয়। কিন্তু ভদ্রলোক করবেন কি? বর্তমানে ঠাট হিসাবে রাগসঙ্গীতকে ভাগ করা ছাড়া বোধ হয় আর কোনও উপায় নেই। তিনি নানা থিওরী ঘেঁটেই এই মতবাদে পৌঁছেছিলেন। এই ব্যাপার আজকাল আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে। যেরকম মিশ্ররাগ এবং ধুনের বহর দেখা যাচ্ছে তাতে এই থিওরীকেও বজায় রাখা কঠিন হবে। আমার তো মনে হয় নানারকম চটকদার নাম দিয়ে রাগ বলে যে সব "ইনকমপ্যাটিবল্ মিক্সচার" তৈরী হচ্ছে তার কঠিন সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রগতিরও একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা দরকার। এসব ক্ষেত্রে তা আছে কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন। কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষেরা এদিকে এগুবেন কি? সন্দেহ আছে—কারণ যাঁদের নিয়ে এত ঘটা তাঁদের কোন প্রকার উত্তেজনা ঘটাতে বোধ করি তাঁরা রাজী হবেন না।

মুসলমান শাসনের কয়েক শত বৎসরের সাংগীতিক বিবর্তন আমরা অল্পই জানি। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানেও আমাদের ঔৎসুক্য দেখা যায় না। তানসেন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী গালগল্প নিয়ে আমরা তথাকথিত ইতিহাস রচনা করি। কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস কী বলে সে সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করি না। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহে এখনো প্রচুর পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে যা ছাপা হলে আমাদের অনেক কৌতূহল মিটতে পারে। সে সম্বন্ধে আমরা এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিনি। মোগল যুগের যে সমস্ত ইতিহাস-গ্রন্থ বহু বৎসর পূর্বে ছাপা হয়ে গেছে [illegible]লি আর নতুন করে ছাপা হয়নি। [illegible] লাইব্রেরীতে সে সব বই এমন অবস্থায় আছে, যে নাড়াচাড়া করতে গেলেই [illegible] করে গুঁড়ো হয়ে পড়ে। এসব গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হওয়া যে অত্যাবশ্যক তাও ঘোষণা করে জানাতে হয়।

থিওরীর আলোচনায় আমার মনে হয় এই সব বিবিধ বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গীতের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করা দরকার। প্রযুক্ত বিদ্যার আলোচনা তো আছেই কিন্তু সঙ্গীত যে একদা সাহিত্যের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিল এবং ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিবর্তন হয়েছিল—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারলে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছু আলোকপাত ঘটতে পারে এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রেও নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতকে আমরা যেভাবে দেখি তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখতে হবে—তবেই এটা সম্ভব হবে।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একাজ হবে না। আজ চোদ্দ পোনেরো বছর ধরে যে সমস্ত কনফারেন্সের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাতে মনে হয় এঁদের পক্ষে এই ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বীকার করুন না না করুন, ব্যাপারটা ব্যবসা [illegible] কিছুই নয়। থিওরীর আলোচনায় লাভের অবকাশ নেই এবং শূন্য প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা দিয়েও কেউ সুখ পাবেন না। কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষিত সাংস্কৃতিকসংস্থা ভিন্ন একাজের দায়িত্ব অপর কারুর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান, দর্শন বা ইতিহাসের কনফারেন্স যেভাবে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনাও সেইভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই তার গুরুত্ব থাকবে এবং তাঁরা যে সব রেজোলিউশন গ্রহণ করবেন তা উচ্চতর মহলে গ্রাহ্য হবে। আ[illegible] এই আশায় রইলাম যে অদূর ভবিষ্য[illegible] [illegible]পযুক্ত পটভূমিকায় উপযুক্ত পণ্ডিত [illegible]বর্গের সহায়তায় উপযুক্ত পরিবেশে সঙ্গীতবিদ্যার দুরূহ আলোচনার সূত্রপাত হবে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সঙ্গীত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

একটি পত্র

মহাশয়,

আমার অগ্রজ স্বর্গত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগরের সুরারোপিত ১২ খানা গানের যে লং প্লেইং রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানি সম্প্রতি প্রকাশিত করেছেন সে সম্পর্কে আপনার (লেখকের নাম দেওয়া হয় নাই) সুচিন্তিত সমালোচনা পড়েছি। এই সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আছে।

আপনি লিখেছেন, "গ্রামোফোন কোম্পানি এঁদের (অর্থাৎ যাঁরা প্রথম যুগে সুরসাগরের গান রেকর্ড করেছিলেন) রেকর্ডগুলিকে পুনর্জীবিত করেন নি, কিন্তু

করা যেতে পারত এবং তা হলেই বোধ হয় এই ক্লাসিকাল সৃষ্টিগুলি সুরক্ষিত হত।" আপনি আলোচ্য লং প্লেইং রেকর্ডখানা ভাল করেই শুনেছেন। কারণ আপনি যে দুখানা গানের কথা উল্লেখ করেছেন শুধু-মাত্র সেই দুখানা গানই আগেকার গায়কীর তুলনায় কিছুটা ম্লান হয়েছে, কিন্তু বাকি দশখানা গানই আগেকার গাওয়া রেকর্ড থেকে উৎকর্ষমানের হয়েছে। আগেকার রেকর্ডগুলিকে পুনর্জীবিত করার থেকে গানগুলিকে পুনর্জীবিত করাই আমার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে। আপনি লিখেছেন, "এ যুগের শিল্পীরা যদি গত যুগের শিল্পের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারেন, তবে দুর্ভাগ্যকেই দায়ী করব, তাঁদের নয়।" হয়ত আপনার বলার উদ্দেশ্য ছিল "গত যুগের শিল্পীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্পর্কে"। সব যুগেরই অভিজাত শিল্পীদের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা স্টাইল আছে যা অননুকরণীয়। পরবর্তী যুগের শিল্পীরা সেই সব শিল্পীদের ব্যর্থ ও অন্ধ অনুকরণ না করে যদি তাঁদের নিজস্ব স্টাইলে মূল-শিল্পের ব্যতিক্রম না করে ঐসব গান করেন তাহলে তাতে দুর্ভাগ্যের কিছু নেই, বরং এইটাই তো একমাত্র পথ। যাঁরা সাহানা দেবী বা রেণুকা সেনগুপ্তের গাওয়া অতুল-প্রসাদ সেনের গান অথবা ইন্দুবালার গাওয়া নজরুল ইসলামের গান শুনেছেন তাঁদের একটা "নস্টালজিয়া" থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁরা ৩০।৩৫ বৎসর আগেকার ঐ সব রেকর্ড শোনেন নি, কিম্বা যারা বর্তমান যুগের মানুষ তারা কি তাই বলে অতুল-প্রসাদ বা নজরুল ইসলামের গান থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আপনি লিখেছেন, "কয়েকটি গানে সুপরিচিত অপর কণ্ঠের ছায়াপাত ঘটেছে, এমন কি ট্রেনার মহাশয়ের কণ্ঠের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বিড়ম্বনা পরিহার করা যেতে পারত।"

আলোচ্য রেকর্ডের শিল্পীদের ট্রেনিং দিয়েছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। সুরসাগরের গানের একমাত্র ভাণ্ডারী কি না জানি না, তবে ইনি অন্যতম প্রধান ভাণ্ডারী একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

সুরসাগরের জীবদ্দশায় সঙ্গীতের ব্যাপারে যে দুজন তাঁর সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা হলেন স্বর্গত কবি শৈলেন রায় ও সন্তোষ সেনগুপ্ত। সুরসাগরের যে সব গান এইচ এম ভি-তে রেকর্ড করা হত তার বেশীর ভাগ ট্রেনিং সন্তোষবাবু দিতেন। সুরসাগরের গানের প্রামাণ্য স্বর-লিপির বই সন্তোষবাবুরই লেখা। কাজেই "কয়েকটি গানে সুপরিচিত অপর কণ্ঠের ছায়াপাত" যদি ঘটেই থাকে তবে নিশ্চয়ই কিন্তু সেই বস্তু ততটাই প্রামাণ্য হয়েছে।

সুধাংশুকুমার দত্ত
কলকাতা-২৬

লেখকের বক্তব্য

আগেকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড পুনর্জীবিত করার সম্ভাবনা থাকলে সেটাই ভাল হত—একথা জোর দিয়েই বলব। গ্রামোফোন কোম্পানিও যে [illegible] এটা করেননি এমন নয়। কেন্দ্র [illegible] পত্র-লেখক দুঃখেও না [illegible] অন্যায়েই বলেছেন। তার প্রধান [illegible] সমালোচনার বিরুদ্ধে এই একটিমাত্র চিঠি ছাড়া আর একখানিও প্রতিবাদপত্র আসেনি। বর্তমান শিল্পীরা অতীত রচনার [illegible] থেকে বঞ্চিত থাকবেন বা থাকবেন না—এমন অন্যায় ইঙ্গিত আমার সমালোচনা থেকে পত্রলেখক কি করে খুঁজে পেলেন তাই ভাবছি। একান্ত বিবেক প্রসূত, পরোক্ষ প্ররোচনা ভিন্ন এটা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ আমাদের রেকর্ড দেন সমালোচনার জন্য—নিছক স্তুতিবাদের জন্য নয়, এটা পত্র-লেখকের বোঝা উচিত ছিল।

আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ওই যে "নিজস্ব স্টাইল" —ওইখানেই সবচেয়ে গোলমাল। এই নিজস্ব স্টাইল প্রায় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট শিক্ষা, অভিনিবেশ, অভিজ্ঞতা এবং পরিমার্জনা থেকে উদ্ভূত হয় না। ফলে যেখানে স্রষ্টার একটি ছোট্ট মীড় বা গমকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না বা কণ্ঠে রূপায়িত হয় না সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে এই নিজস্ব স্টাইল। এই কারণেই গত যুগের "শিল্পকে" বোঝবার কথা বলেছি, যার মানে কম্পোজিশন। এছাড়া ভঙ্গী বা ম্যানারিজম সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। সেটা দোষের পর্যায়ে পড়ে। তাকে স্টাইল বলে চালানো অন্যায় এবং অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে বলি,—পত্রলেখকের অগ্রজ সুরসাগর মহাশয় অতুলপ্রসাদ সেনের "ডাকে কোয়েলা বারে বারে" গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করবার সময় বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, তিনি কবির কাছে এই গানটি বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে তারপরে স্বরলিপি করে-ছিলেন যাতে তাঁর নিজের গায়নভঙ্গীর বা স্বকীয় ধরণের কোনরকম ছায়াপাত না ঘটে। খুব সম্ভব "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে ফুটনোটসহ এই স্বরলিপিটি বেরিয়েছিল। এই থেকেই বোঝা যাবে স্রষ্টার সুরের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন। পত্রলেখকের উক্তি পরস্পর-বিরোধী। তিনি পরবর্তী শিল্পীদের মূল শিল্পের ব্যতিক্রম না করে গান করবার কথা বলছেন, আবার সেই সঙ্গেই বলছেন অপর কণ্ঠের ছায়াপাত ঘটলে সেটা প্রামাণ্য হবে। এইরকম [illegible] আশা কবি [illegible] সঙ্গীতরসিকই কামনা করবেন।

পত্রলেখকের শেষের মন্তব্য যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাদের শচীনকে বাদ দিয়ে হারানেরই আশ্রয় করতে হয়। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে যেমন কোনও গায়ক অন্তরঙ্গ-ভাবে যুক্ত ছিলেন যাঁরা ওস্তাদ মানুষ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁদের ওস্তাদির ছায়াপাত ঘটলে সেটাকে যত প্রামাণিক বলে যদি ধরে নিই তাহলে ফল কি দাঁড়াবে বলাই বাহুল্য।

শাক্যদেব

চব্বিশ

পথ মাইল পঞ্চাশের কিছু বেশি। অবনী দুপুর নাগাদ এসেছিল, বেরুতে বেরুতে তিনটে বাজল।

হৈমন্তীও যাচ্ছে। তার যাবার কিছু ঠিক ছিল না; বরং বরাবরই সে বেশি দূরে পথ যেতে, বাইরের ঠাণ্ডায় রাতে ঘোরাঘুরি করতে অনুৎসাহ দেখিয়েছে। গুরুডিয়া থেকে অতটা পথ জিপে করে গিয়ে মাদাউআলের বনজঙ্গল পাহাড়ের মাঝখানে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস দেখার উৎসাহ তার ছিল না। তাছাড়া সারা রাত সেখানে কাটাতে হবে। অসুবিধেও ছিল। তবু সে শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে।

গতকাল, অবনীর বাড়িতে গগনের সংগে বড়দিন করতে এসে সারাটা দিন ভালই কেটেছিল। গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, বিজলীবাবুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, অনেক দিন পরে হঠাৎ গগনের পাললায় পড়ে তাস খেলা—এসব যেন মনের কোনো গুরুভার সাময়িকভাবে অনেকটা হালকা করে দিয়েছিল। ফেরার সময় অবনী বলল, 'আপনিও চলুন কাল, সাইট্টা খুব সুন্দর, বাঁধের গায়ে পাহাড়ের ওপর ইনস্পেকসান বাংলো, চমৎকার লাগবে। একটা তো রাত। অসুবিধে খুব হবে না। পরশু দিন বেলা ন'টার মধ্যে যথাস্থানে পৌঁছে দেব আপনাকে।'

গগন বলল, 'চল্ দিদি, এই চান্স। পরে আর তোর যাওয়া হবে না।'

হৈমন্তী তখনও স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। সে গগন নয়, যাব বললেই যেতে পারে না। কিছু যেন ভাবার ছিল।

আজ সকালে হাসপাতালে রুগী ছিল না; অনেকটা বেলায় দুজন এল: একটার চোখ উঠেছে, অন্যটার ঠাণ্ডায় চোখমুখ ফুলে টসটসে। তারপর এল সুরেশ্বর, সঙ্গে শিবনন্দনজী। দুজনেই যেন ব্যস্ত; কথা বলতে বলতে এসেছিল, কথা বলতে বলতেই চলে গেল, কেন এসেছিল বোঝা গেল না। কিন্তু মনে হল, যেন এই আসা-যাওয়ার মধ্যে হৈমন্তীকে দেখে গেল।

হাসপাতালে বসে থাকতে থাকতে হৈমন্তী স্থির করে ফেলল : সে যাবে। আসার সময় যুগলবাবুকে বলে এল, কাল আসতে তার বেলা হবে, রুগী এলে যেন বসিয়ে রাখা হয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে গগনকে বলল, আমরা আজ থাকছি না তোর সুরেশদাকে বলে আয়।

পথটা নতুন; এর আগে হৈমন্তী আর এদিকে আসে নি। ছড়ানো কালো ফিতের মতন পথ, যত যাও ততই যেন ফিতেটা খুলে যাচ্ছে, আঁকবাঁক তেমন একটা নেই, পরিষ্কার ছিমছাম, ডাইনে বাঁয়ে ঢেউ-ভাঙা প্রান্তর, দূরে গায়ে গায়ে কোথাও পাহাড়ের টিলা, কোথাও বা তরুলতায় আচ্ছাদিত ছোট ছোট পাহাড়। শীতের মরা রোদ পার্বত্য পাদদেশকে ক্রমশই নিষ্প্রভ করে আনছিল। ছায়া নেমেছে তরুমূলে, ছোট-খাটো দেহাতী গ্রাম, অল্প স্বল্প ক্ষেত খামার, সবজি খেতে মটরশুঁটি, কাঁচা কুয়ো থেকে জল তুলছে বউ ঝি, কুল ঝোপ, দু একটা কুকুর। কদাচিৎ এক আধটা বাস চলে যাচ্ছিল।

সামনে অবনী, পাশে বিজলীবাবু। পেছনে হৈমন্তী আর গগন। নেব না নেব না করেও কয়েকটা জিনিস হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিছানার ব্যবস্থাই প্রধান, ছোটখাটো সুটকেশও। হৈমন্তীর জন্যে গগন কম্বল নিয়ে নিয়েছিল, আর দুই ভাইবোনের কিছু গরম বস্ত্র। গগনরাও সুটকেশ নিয়েছে একটা। জল আর চায়ের ফ্লাস্ক, টিফিন কেরিআর—এ-সব বিজলীবাবুর ব্যবস্থা। উপরন্তু বিজলীবাবুর আরও একটি ব্যবস্থা ছিল, হৈমন্তী আসছে শুনে তিনি সংকুচিত ও বিব্রত হয়ে আগেভাগেই সেটা লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

দেখতে দেখতে অনেকটা পথ চলে আসা গেল।

বিজলীবাবু বললেন, "মিস্তিরসাহেব এবার একটু রেস্ট দিন। বিকেলের চা-টা খেয়ে ফেলা যাক।"

"ক'মাইল এলাম?" গগন শুধলো।

"প্রায় আধাআধি, মাইল পঁচিশ হবে—" বিজলীবাবু জবাব দিলেন।

"বিজলীদার দেখছি মাইলেজ পর্যন্ত মুখস্থ," গগন হেসে বলল।

"এখানকার দেহাতী লোক ভাই, কোথায় কি তার একটা মোটামুটি জ্ঞান না থাকলে চলে।" বলে বিজলীবাবু ডান হাত তুলে দূরে একটা পাহাড় দেখালেন, বললেন, "ওই পাহাড়টা হল চন্দ্রগিরি, এখানকার লোকে বলে চাঁদওআরি, ওর নীচে দিয়ে আমাদের যেতে হবে।"

"পাহাড়টা তো কাছেই," গগন বলল।

"মাইল ছয়েক—" বিজলীবাবু বললেন।

গগনের বিশ্বাস হল না, বলল, "ছ মাইল? কি বলছেন!...এখানের মাইলের হিসেবটাও কি দেহাতী?"

বিজলীবাবু হেসে জবাব দিলেন, "পাহাড় জিনিসটা ওই রকমই; মনে হয় পাই পাই তবু তারে পাই না।"

বিজলীবাবুর বলার ভঙ্গিতে গগন জোরে হেসে উঠল। হৈমন্তীও হেসে ফেলল।

অবনী হাসতে হাসতে বলল, "বিজলীবাবু, এটা ওমর খৈয়াম নয়।" বলে চা খাবার জন্যে গাড়ি দাঁড় করাল।

বিজলীবাবু সহাস্য মুখে জবাব দিলেন, "না, ওমর খৈয়াম নয়। এ হল পুরনো দিনের বাংলা গান: সে যে দেখা দিয়ে দিয়ে দেখা দেয় না, ধরা দিয়ে হায় ধরা দেয় না।" জংলা-কারফা।"

অবনী গলা ছেড়ে হেসে উঠল। গগনও হাসতে লাগল।

অবনী বলল, "বিজলীবাবুর তা হলে পুরোনো বাংলা গানও জানা আছে।"

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন বিজলী-বাবু, পথে দাঁড়িয়ে গায়ের জামাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "একটু আধটু আছে। আমার বাবার মুখে শুনেছি। হার-মোনিয়াম বাজিয়ে ডুগি তবলার সংগে সংগত করে গাইতেন।" বলে বিজলীবাবু গাড়ির মধ্যে হাত বাড়ালেন, হৈমন্তীকে বললেন, "দিন তো দিদি, চায়ের ফ্লাস্কটা।

ওই যে হলুদ মতন কাপড়ের থলে ওর মধ্যে কাপটাপ আছে।"

গগনও নীচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। অবনী রাস্তার দাঁড়িয়ে জিপ গাড়িটার সামনের চাকায় বার কয়েক জুতোর ঠোক্কর মেরে কি যেন দেখে নিল।

হৈমন্তী চায়ের কাপ বের করল। বিজলীবাবুর সব কাজ ব্যবস্থা মতন, কোথাও এতটুকু ভুল হবার যো নেই। চায়ের কাপ, জলের গ্লাস, কলাপাতায় মোড়া পান। হৈমন্তী গাড়ির পিছন দিক থেকে জলের ফ্লাস্ক নিয়ে কাপ ধুতে ধুতে বলল, "বাড়ি থেকে সব গুছিয়ে দিয়েছে না?"

বিজলীবাবু হাসলেন। "ওই টুকুই সুখ, কোথাও যাব বললে আর রক্ষে নেই, মরণকালে মুখে দেবার গঙ্গাজলটুকু পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।"

হৈমন্তী হাসিমুখে ভর্ৎসনা করল, "ছি, ও কথা বলবেন না।"

গগন বলল, "আপনি এমন তোফা আছেন বিজলীদা যে আপনাকে দেখে ম্যারেজ্ সম্পর্কে আমার প্যানিক্‌টা কেটে যাচ্ছে।"

"ফক্কড়...!" হৈমন্তী ধমক দিল যেন।

হাসাহাসির মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খাওয়া হল। হৈমন্তী নামল না।

মাঠ ঘাট থেকে রোদ এবার উঠতে শুরু করেছে, যেন এতক্ষণ সারাটা সকাল দুপুর ধরে আকাশ এসে মাটিতে রোদ মেলে দিয়েছিল, এবার বেলা পড়ে যাওয়ায় দ্রুত হাতে তা তুলে নিয়ে কোলে জড় করছে।

অবনী এসে গাড়িতে বসল, ঠোঁটের ডগায় সিগারেট। বিজলীবাবু পান মুখে পুরেছেন, জিবের ডগায় একটু চুন ছুঁইয়ে ধীরে ধীরে গাড়ির মধ্যে উঠে এলেন। গগনও সিগারেট টানতে টানতে উঠে পড়ল।

প্রায় সাড়ে চার বাজছে। রোদ পালাচ্ছে বলে বুঝি শীতের দমকা উত্তরের বাতাস তাকে তাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। গাছের ছায়াগুলি এখন বেশ দীর্ঘ এবং মাটির রঙের সঙ্গে ছায়ার রঙ মিশে আছে।

অবনী গাড়িতে স্টার্ট দিল।

"কতক্ষণ লাগবে পৌঁছতে?" গগন জিজ্ঞেস করল।

"ঘণ্টা খানেক," অবনী বলল; বলে বিজলীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মাওলা না কি বলে যেন, ওখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা ধরলে নাকি শর্টকাট হয়।"

বিজলীবাবু মাথা নাড়লেন, "রাস্তা খুব খারাপ, আমার চেনা নেই; পুরনো রাস্তাই ভাল।"

গাড়ি চলতে শুরু করল। অল্প এগিয়েই অতি শীর্ণ এক নদী, নদীতে জল নেই, বালির ওপর ছায়া নেমেছে, ধীরে ধীরে যেন বনাঞ্চলের মধ্যে রাস্তাটা হারিয়ে যাচ্ছে, বড় বড় শালগাছ, অজস্র হরিতকী আর নিম। শীতের বাতাস এসে গাছপাতায় ক্ষণে ক্ষণে কাঁপুনি তুলেছে, আমলকি বন যেন হঠাৎ ছুটে এসে পালাল, আর কোথাও গাঁ-গ্রাম চোখে পড়ছে না, শুধু জঙ্গল, বিচিত্র গাছপালা, পথে মানুষ জন নেই, গাড়ি নেই, নির্জন নিস্তব্ধ এক জগতে যেন ক্রমশই গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে।

বিজলীবাবু তাঁর হাতে-পাকানো সিগারেট ধরিয়েছেন। হৈমন্তীর শীত ধরতে শুরু করেছিল, গায়ের কোটটা জড়িয়ে নিল। গগন ঝুঁকে পথঘাট দেখছে, অন্যমনস্ক।

অবনী বলল, "বিজলীবাবু, আপনার কপিলকে দিয়ে ক্লাচটা একবার দেখাবেন তো, মাঝে মাঝে বড় ডিস্টার্ব করে...।"

বিজলীবাবু অবনীর পায়ের দিকে তাকালেন।

গগন হঠাৎ বলল, "আমরা কি পাহাড়ের তলায় এসে পড়লাম?"

"হ্যাঁ," বিজলীবাবু জবাব দিলেন, "আর একটু এগিয়েই দু দিকে পাহাড় পড়ে যাবে, মাঝ দিয়ে রাস্তা।...চন্দ্রাগিরির এক গল্প আছে "

"কি গল্প?"

"এখন তো বলা যাবে না...চেঁচাতে হবে; পরে বলব।"

গগন চুপ করে গেল।

সামান্য পরেই চার পাশ থেকে পাহাড়ের আড়াল উঠে এল, যেন বনবৃক্ষ ও লতাগুল্ম-পূর্ণ পাথরের এক মস্ত ঝাঁপি তাদের দু পাশে। দীর্ঘশীর্ষ গাছ, কুণ্ডলী পাকানো জটাজুটধারী অশ্বত্থ, স্তূপীকৃত ছায়া, কদাচিৎ কোনো সূর্যরশ্মির রেখা, গভীর খাদ, আর পরিপূর্ণ স্তব্ধতা; শুধু গাড়ির শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন কানের পরদায় মিশে আছে।

তারপর কখন যেন এই ঝাঁপি খুলে যেতে লাগল, মাথা তুলে দাঁড়ানো আড়াল সরে যাচ্ছে, বনজঙ্গল বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী হয়ে আসতে লাগল, সামনে উতরাই, শেষ বিকেলের ম্রিয়মাণ আলোয় ঝাঁক বেঁধে পাখি উড়ে যাচ্ছে, নিমফুলের গন্ধের মতন কেমন এক গন্ধ এল, কয়েকটি বনজ কুসুম।

গগন এতই মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিল যে সে হঠাৎ গাইতে শুরু করল : 'বাঁকি বেলা বয়ে যায়, কাননে আয় তোরা আয়...'।

গগন গানে পারদর্শী নয়; তবু তার মোটা সাদামাটা গলা, তার উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ হৃদয়, গানটিকে কেমন সুন্দর ও জীবন্ত করে তুলল।

বিজলীবাবু ঘাড় পিছু দিকে হেলিয়ে দিয়ে গান শুনতে লাগলেন। অবনী একবার ঘাড় ফেরাল। হৈমন্তী হাঁটুর ওপর

কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

গান শেষ হলে বিজলীবাবু বললেন, "বাঃ!"

গগন যেন এবার লজ্জা পেল। হৈমন্তীর দিকে চকিতে চেয়ে বলল, "হঠাৎ কেমন ফিলিং চলে এল বিজলীদা, আমি গাইয়ে নয়।"

"না হলে গাইয়ে, কিন্তু বেশ গেয়েছ।

দেখ ভাই, গান হল আধা-গাইয়েদের জন্যে; আর সুর হল পাকা-গাইয়েদের জন্যে।"

গগন কেমন অবাক হয়ে বলল, "সেকি! মানেটা তো বুঝলাম না।"

বিজলীবাবু হেসে বললেন, "মানেটা সহজ। একটা হল অন্তরের জিনিস, অন্যটা যন্তরের।"

ঠিক যেন গোধূলি বেলায় মাদাউআলের কাছে ওরা পৌঁছে গেল। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সরকারী জঙ্গল দু পাশে, মনে হল এক সময়ে এই জঙ্গল কেটে মাঠ হয়েছিল, আবার নতুন করে সামনের দিকটা গাছের চারা পোঁতা হয়েছে। ছোট ছোট গাছ, সাজানো গোছানো, একটা সজারু ছুটে গেল, কিছু পাখি, শীতের ধূসরতা নেমে গেছে, আকাশ গড়িয়ে গোধূলির আলো মেঘের আড়ালে ডুবে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা কনকনে মুঠো ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছে শীতের।

দেখতে দেখতে এই বনের মধ্যে মানুষের পদচিহ্ন ফুটে উঠল। হলুদ রঙের কোয়ার্টারস, মস্ত মস্ত লোহার থাম, ওভারহেড লাইন, নদীর রেখা, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। যেতে যেতে সরকারী জঙ্গলে গগন একটা হরিণ দেখতে পেল। আঙুল দিয়ে হরিণটা দেখাবার আগেই সে অদৃশ্য।

অবনী ডাইনে বেঁকল, তারপর আবার বাঁয়ে। সামান্য পথ এগিয়েই চোখের সামনে বাঁধটা দেখা গেল। এপাশ ওপাশ যেন আর দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে, অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাতি জ্বলছে, দুরন্ত তীক্ষ্ণ এক বাতাসের দমকা এসে সর্বাঙ্গ শিহরিত করল।

বিজলীবাবু বললেন, "বছর পাঁচেক আগে একবার এসেছিলাম মিত্তিরসাহেব, তখন কাজ চলছে। এখন দেখছি ভোল পালটে ফেলেছে।"

অবনী বলল, "আসতে তো চাইছিলেন না, জোর করে নিয়ে এলুম।"

গগন বলল, "ইস্, এখানে এসে সাতটা দিন থাকলেই হত। মার্ভেলাস সাইট্।... কি রে দিদি, ভাল লাগছে না?"

হৈমন্তী ঘাড় কাত করল। তার ভাল লাগছিল।

যতক্ষণ ভেতরে ছিল মনে হচ্ছিল এ এক রহস্যপুরী, যা দেখা যায় তার চেয়েও যা দেখা যায় না তার চিন্তাই যেন বিহ্বল করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উদাসীন বিরাটাকার কতক যন্ত্র ধ্যানীর মতন বসে আছে, কোথাও তার ভ্রূক্ষেপ নেই, অথচ তার আভ্যন্তরিক রহস্যের পরিচয় শুনলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। দুর্বোধ্যের সামনে দাঁড়ালে চমৎকৃত হবার যে স্বাভাবিক আবেগ, গগনরা সেই আবেগে চমৎকৃত ও বিহ্বল হচ্ছিল। অবনীর পক্ষে বিমূঢ় অথবা বিস্মিত হবার কোনো কারণ ছিল না। বরং পাওয়ার-হাউসের ছোকরা মতন শিফট্ এঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস্তব যা দেখাচ্ছিল এবং বোঝাচ্ছিল অবনী তার বিস্তৃত ও সরল ব্যাখ্যা করে গগনদের কৌতূহলকে মোটামুটি পরিতৃপ্ত করছিল। যন্ত্রের সেই জটিল জগৎ, যেখানে কেমন একটি নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জন ছিল, যেখানে প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষে এবং অন্তরালে কত বিচিত্র কিছু হয়ে যাচ্ছিল, যেখানে আলোকিত মঞ্চে কয়েকটি মাত্র কুশীলব দৈত্যসদৃশ লৌহ-পিণ্ডকে করতলগত করে রেখেছিল—সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে গগন বলল, 'এসব দেখলে মানুষের ওপর ভক্তি বেড়ে যায়। জলস্থল তাও তার হাতে বাঁধা পড়ল।'

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারপাশে কেমন একটা ময়লা আলোর ভাব, টিলা আর পাহাড় গাছপালার অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষের শুরু, চাঁদ উঠে আসছে, দূরে দূরে বাতি জ্বলছে, যেন একটি আলোর মালা সমস্ত উপত্যকার গলায় ঝোলানো, বাতাসের ধারালো চোট গায়ে লাগছে, কুয়াশা-ঝাপসায় ডান দিকের বাঁধটি মাঝরাতের তেপান্তরের মাঠের মতন দেখাচ্ছিল।

হৈমন্তীর শীত করছিল, গগন কুঁকড়ে গিয়েছে। বিজলীবাবু কান মাথা ঢেকে নিয়েছেন চাদরে। খানিকটা পথ চড়াই উঠে ইনস্পেকসান বাংলো।

গগন শীতের চোটে সিগারেট ধরালো। বলল, "ভেতরে যতক্ষণ ছিলাম মনেই হয়নি বাইরে এরকম ঠাণ্ডা।"

বিজলীবাবু বললেন, "একে উঁচু জায়গা, পাহাড়ী: তার ওপর ওই বেঁধে রাখা জল—কূল কিনারা দেখছি না; শীতের দাপট রাত্রে বোঝাবে।"
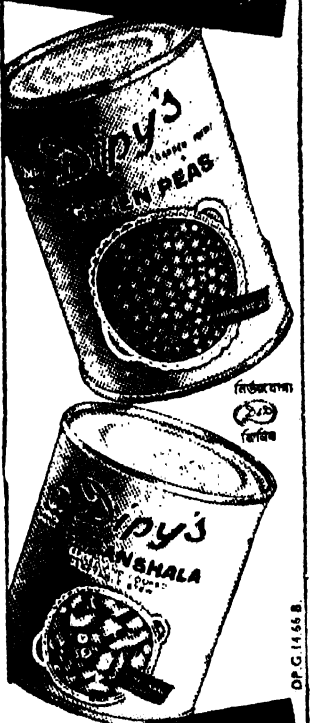
হৈমন্তীর মনে হচ্ছিল একটা স্কার্ফ কিংবা মাথায় গলায় জড়ানো কিছু [illegible] না নিয়ে এসে সে ভুল করেছে। নিয়ে [illegible]লেই হত। গাড়ি থেকে নেমেই তারা স্টান চলে এসেছিল। জিনিসপত্র যা, বেহারা-খানসামাগুলো ঘরে নিয়ে চলে গেল। বাংলোর ভেতরে তারা ঢোকে নি পর্যন্ত।...একটা জিনিস হৈমন্তী লক্ষ করল, অবনীর চাকরির মর্যাদা এখানে বেশ। তার পরিচয়—অন্তত সরকারী পরিচয় এরা জানে হয়ত, খাতির কিছু কম করল না। সাধারণের জন্যে যা নিষিদ্ধ, নানা বিষয়ে যে কড়াকড়ি তার কিছুই তাদের পোয়াতে হল না। দিব্যি সব ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে দেখে এল।

রাস্তাটা সুন্দর, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে, তফাতে তফাতে বাতি, পাশে গাছপালা, নীচে তাকালে স্টাফ কোয়ার্টারসের আলো চোখে পড়ে। ওপাশে দৈত্যের মতন ড্যাম।

অবনী বলল, "আপনার বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে?"

হৈমন্তী হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল, "তেমন কিছু নয়; একটু ঠান্ডা লাগছে।"

"আর বেশি হাঁটতে হবে না, কাছেই..."

"আপনি এখানে মাঝে মাঝে আসেন?"

"না; বার দুয়েক কাজে আসতে হয়েছে।"

"আপনাকে চেনে..."

"ঠিক সেভাবে নয়। তবে এখানের যিনি কর্তা ছিলেন মিস্টার মজুমদার তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কাজের ব্যাপারেই হয়েছিল। চমৎকার মানুষ। তিনি এখন নেই। বদলি হয়ে গেছেন।"

বিজলীবাবু ও গগন অন্যপাশে কথা বলছিল।

কথা বলতে বলতে পথটুকু পেরিয়ে এসে ওরা বাংলোয় উঠল।

দুটো ঘর, প্রায় মুখোমুখি। মাঝখানে ঢাকা বারান্দা। ঘরে আসবাব পত্রের বাহুল্য না থাকলেও মোটামুটি খাট, টেবিল, চেয়ার ছিল; দেওয়ালে গাঁথা র‍্যাক। ঘরের লাগোয়া বাথরুম। ঘরের জানলায় কাঁচ আর খড়খড়ি।

বেয়ারা-খানসামাগুলো জিনিসপত্র ঘরে তুলে রেখেছিল।

চায়ের পাট বসল পুবের ঘরটায়। জানলা বন্ধ, দরজা ভেজানো, বাতি জ্বলছে। ঘরের আবহাওয়ায় অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছিল হৈমন্তী।

গরম জল, রাতের খাওয়া দাওয়া, ঘরে আগুন তুলে দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদির তদারকি শেষ করে এসে অবনী বলল, "আপনাদের বিছানাপত্র পেতে দিক; গরম জল দিচ্ছে বাথরুমে—মুখহাত ধুয়ে বিশ্রাম করে নিন খানিক। আমরা ওঘরে আছি।"

অবনী আর বিজলীবাবু তাদের ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে বিজলীবাবু বললেন, "মিত্তিরসাহেব, সবই তো ভাল হল, কিন্তু শেষরক্ষা হবে তো?"

অবনী বুঝতে পারল না, সিগারেট ধরাতে ধরাতে তাকাল।

বিজলীবাবু হেসে বললেন, "অমন হুইস্কিটার একটা গতি করা দরকার।"

অবনী হেসে ফেলল।

বিজলীবাবু চাদর বালিশ বের করতে করতে বললেন, "আমি ভেবেছিলাম উনি আসবেন না।...যখন শুনলাম আসছেন তখন থেকেই ঝিমিয়ে পড়েছি। মানে, আর কিছু নয়, আমাদের হল চোরের মন, সিঁদ দেবার আগে ধরা পড়ার ভয় থাকে।"

অবনী হাসতে হাসতে জানলা-ঘেঁষা খাটের ওপর গিয়ে বসল, বসে পায়ের ওপর পা তুলে নিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল, "আপনি তো গুণী লোক, বুঝেসুঝে ব্যবস্থা করুন।"

বিজলীবাবু ঘরের চারপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, বললেন, "তা তো করতেই হবে, কোলের ছেলে বয়ে এনেছি বাঁধের জল ভাসিয়ে দিয়ে যেতে তো পারব না।"

অবনী জুতো জোড়া খুলে ফেলে গায়ের কোট খুলল। খোলা হোল্ডঅল থেকে র‍্যাগ, স্লিপার এটা ওটা বের করতে লাগল।

"খানসামাটাকে সোডার কথা বলে-ছিলেন?" বিজলীবাবু শুধোলেন।

"আনিয়ে রাখবে।"

"তা হলে আমার বিবেচনায়, দুটো মুখে দিয়ে—ও ঘরের দরজা বন্ধ হলেই শুরু করা যাবে।"

অবনী মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

বাথরুমে জল দিয়ে দিয়েছে বেয়ারা, অবনী চোখে মুখে জল দিতে গেল। বেয়ারা এসেছিল। ঘরদোর বিছানা গুছিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বিজলীবাবু তাঁর বিছানাটা হাতে করে ঝাড়লেন, অকারণে, তাঁদের আনা চাদর বালিশই বিছানায় পাতা হয়েছে। বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে আপন মনে গুন গুন করে গাইছিলেন: 'সে দেখা দেয় দেয়, দেয় না, ধরা দিয়ে হায় ধরা দেয় না।' বিজলীবাবুর চোখেমুখে কিছু অন্যমনস্কতা; কি ভেবে ভেবে যেন কোনো হাসিও ঠোঁটে লেগে ছিল। সুটকেশ টেনে দু'একটা কি যেন বের করলেন, মাথার গরম টুপিটাও।

অবনী বাথরুম থেকে সামান্য পরে বেরিয়ে এল, ট্রাউজারস বদলে পায়জামা পরেছে, গায়ে পাঞ্জাবির ওপর পুরু পুল-ওভার। বিজলীবাবু তখনও চেয়ারে বসে গুন গুন করে গাইছেন: 'সে যে ধরা দিয়ে ধরা দেয় না, শুধু আশার ভাষায় ফিরে চায় না।'

অবনী হেসে বলল, "আপনার সেই গা—ন?"

"সুরটা একবার আনবার চেষ্টা করছিলাম", বিজলীবাবু হেসে হেসে জবাব দিলেন, "ঠিক আসে না। বুঝলেন মিত্তির-সাহেব, এও ওইরকম—ধরা দিয়ে ধরা দেয় না।" বলে তাঁর সকৌতুক চাপা চোখ নিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, পরে বললেন, "জগতে এ বড় মজার খেলা, না মিত্তিরসাহেব, ধরা দিয়েও ধরা দেয় না।"

অবনী বিজলীবাবুর চোখের দিকে দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "সব খেলাই মজার!...যান, গরম জল ঠান্ডা হয়ে যাবে, ঘুরে এসে বসুন।"

বিজলীবাবু আর কিছু বললেন না, বাথরুমে চলে গেলেন।

অবনী অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল।

হৈমন্তীর ঘরে বসে গল্পগুজব হচ্ছিল। ঘরে আগুন রেখে গেছে বেয়ারা, জানলা বন্ধ, দরজাও ভেজানো; বাইরে শীতের প্রচণ্ডতা এখন আর অনুভব করা যাচ্ছিল না। গগন খানিকটা গল্পগুজব করার পর বিজলীবাবুর গান শুনতে উঠে গেল। আসলে গগন বিজলীবাবুর সঙ্গে খানিকটা রঙ্গরসিকতা করতে চায়। তাছাড়া, সে আপাদমস্তক আবৃত হয়েছে, উদ্দেশ্য: বিজলীবাবুকে টেনে নিয়ে পশ্চিমের ঢাকা বারান্দায় গিয়ে জ্যোৎস্নালোকে বাঁধের জল দেখবে।

অবনী আর হৈমন্তী মুখোমুখি বসে, হৈমন্তী বিছানায়, অবনী কাছাকাছি চেয়ারে।

অবনী বলল, "আপনিও একবার বাইরে গিয়ে দেখলে পারতেন। এতটা উঁচু থেকে সামনের লেকটা দেখতে এখন ভালই লাগত। চাঁদের আলোয় অতটা জল, আশেপাশে পাহাড় জঙ্গল, অদ্ভুত দেখায়।"

"দেখব—" হৈমন্তী বলল, "এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না, কুঁড়েমি ধরে গেছে ঠান্ডায়।"

"আপনারা দুই ভাইবোনেই ঠান্ডায় বেশ কাবু হয়ে পড়েন", অবনী হাসিমুখে বলল।

"অভ্যেস নেই। গগনের তো একেবারেই নেই, আমি তবু খানিকটা সইয়ে নেবার সময় পেয়েছি।" হৈমন্তীও হাসি মুখে জবাব দিল।

"তবু সইছে না—" অবনী ঠাট্টা করে বলল।

"না।" হৈমন্তী মাথা নেড়ে হেসে উঠল।

অবনী চোখ সরাল না, হৈমন্তীর হাসি দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি—"

হৈমন্তী তাকিয়ে থাকল, মুখের হাসি তখনও মুছে যায় নি।

অবনী বলল, "আমার আজকাল মনে হয়, এই জায়গাটা আপনার কোনো দিক থেকেই সইছে না।"

হৈমন্তীর মুখের হাসি মুছে গেল; ভীরুর মতন, হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়ার মতন তার চোখের কোলে এবং পাতায় কেমন অস্থিরতার ভাব ফুটল। দৃষ্টি নত করে নিল।

অবনী অপেক্ষা করল, কেন করল সে জানে না ঃ হৈমন্তী কিছু বলবে এই আশায় হয়ত; বা এই দ্বিধায়, হৈমন্তী অসন্তুষ্ট হল কি হল না?

"কিছু মনে করলেন?"

হৈমন্তী মাথা নাড়ল, না মনে করেনি।

অবনী সামান্য নীরব থেকে বলল, "আপনাকে আমি বন্ধুর মতন একটা কথা বলতে পারি।...প্রথম যখন এসেছিলেন—কি রকম, মানে আপনাকে অন্যরকম দেখাত ঃ আমার মনে হয়েছিল, আপনিও ডেডিকেটেড, সুরেশ্বরবাবুর মতন, ওই ধরনের কিছু...। আমি বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারছি না, মানে—" অবনী দ্বিধার হাসি হাসল। "সে যাই হোক, আপনাকে এখন তা মনে হয় না।...আপনার এখানে ভাল লাগছে না; অ্যানহ্যাপি। অন্ধ আশ্রমে আপনার কোনো টান নেই। আপনি ডেডিকেটেড নন।"

হৈমন্তী নিস্পন্দ বসেছিল; অবনীর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না। তার কোথাও ক্রোধ নেই, বিরক্তি নেই, অসন্তোষ নেই।

অবনী মুহূর্ত কয় অপেক্ষা করল। "আমি ভেবে পাই না, ঘরবাড়ি মা ভাই ছেড়ে কেন আপনি এখানে এলেন?... নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আপনি খুব জীবন্ত।...সুরেশ্বরবাবুর কাজকর্ম আপনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর সেবাটেবা দয়া-ধর্ম এসবেও আপনার মতি নেই।...কৃশ্চান নান্ আমি দেখেছি, আপনি নান্ নন।"

হৈমন্তী পায়ের ওপর থেকে শাল সামান্য তুলে নিল। তার ঈষৎ কুঁজো হয়ে মস্ত মুখে বসে থাকা, তার নীরবতা, অসহায় আড়ষ্ট ভঙ্গি এখন কেমন ছেলে-মানুষের মতন দেখাচ্ছিল। যেন এই হৈমন্তীর মধ্যে বয়সের দৃঢ়তা নেই; তার সেই গাম্ভীর্য, পেশার পৃথক মর্যাদা, ব্যক্তিগত সংযম ও গোপনতাও আর নেই।

"যেখানে আপনার মন নেই, যা ভাল লাগে না, যাতে বিশ্বাস নেই—সেখানে আপনি কেন এলেন আমি জানি না।" অবনী যেন ধৈর্য হারাচ্ছিল।

হৈমন্তী হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। "বেশিদিন আর থাকব না।"

অবনীর মনে হল হৈমন্তীর গলার স্বরে শীতের বাতাসের মতন ঠাণ্ডা কনকনে একটা ভাব ফুটল।

"আমার কথায় রাগ করলেন?"

"না।"

"আমার পক্ষে হয়ত এ-সব কথা বলা উচিত হল না। তবু বললাম।...আপনাকে আমার অদ্ভুত মনে হয়।...কেন এসেছেন, কেন আছেন..."

"কিছু না। হয়ত শখ..."

"শখ নয়।"

"তাহলে কিছু ভেবে এসেছিলাম।... আপনি কি শুধু চাকরির জন্যে এখানে এসেছেন?"

অবনীর চোখ মুখের ওপর প্রবল জোরে যেন কেউ ফুঁ দিল, চমকে ওঠার মতন হল অবনীর। হৈমন্তীকে দেখল, বলল, "সত্যি কথা শুনবেন?"

হৈমন্তী তাকিয়ে থাকল।

"আমি পালিয়ে এসেছি।"

হৈমন্তী কথা বলল না, কিন্তু তার চোখে গভীর কৌতূহল ও প্রশ্ন ছিল, যেন তার দৃষ্টি বলছিল ঃ পালিয়ে এসেছেন? কিন্তু কেন?

অবনী হৈমন্তীর চোখের বিস্ময় ও প্রশ্ন লক্ষ করতে করতে বলল, "আমার আর কিছুই ভাল লাগত না, চাকরিবাকরি, বন্ধু-বান্ধব, বাড়ি—কিছু না। সব কেমন একঘেয়েমির মতন হয়ে উঠেছিল। খুব ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম।" অবনীর মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির ভাব ফুটেছিল, গলার স্বরে হতাশা। "বোঝানো মুশকিল, ঠিক যে কি বোঝাতে চাইছি তাও জানি না—" অবনী ম্লান একটু হাসল, "আমার মনে হত, আমার মধ্যে আর কিছু নেই, শুকিয়ে গেছে, যা যা ছিল পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জীবনের এই অবস্থাটা এত খারাপ... অসহ্য..."

হৈমন্তী অপলকে তাকিয়ে থাকল। মনে মনে যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল।

কিছু সময় দু পক্ষই নীরব। শেষ পর্যন্ত অবনী এই বিষণ্ণ স্তব্ধতা কাটাবার জন্যে নড়েচড়ে বসল, সিগারেট ধরাল, তার পর বলল, "আমার আসার সঙ্গে আপনার আসার কোনো মিল নেই। আমি যেন অনেকটা পালিয়ে কোথাও মাথা লুকোতে এসেছি; আপনি তো তা নন—আমার ধারণা, আপনি কোনো আশা নিয়ে এসেছিলেন।"

হৈমন্তী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল না, কিন্তু বুকপিঠের ওঠাপড়া লক্ষ করা গেল।

সামান্য পরে হৈমন্তী হঠাৎ বলল, "চলুন, বাইরেটা দেখে আসি।"

স্বপ্নের মধ্যে দেখা বুঝি ঃ অস্পষ্ট কোমল কেমন এক আচ্ছন্নতার জগৎ যেন স্থির হয়ে আছে। হিম-জ্যোৎস্নায় জড়ানো চরাচর, ব্যাপ্ত শূন্যতার মধ্যে কোনো স্তব্ধ শান্ত বিশাল এক হ্রদ যেন পড়ে আছে নীচে, দূরে রেখার মতন পার্বত্য অঞ্চল, স্লুইস্ গেটের পদতলে বিষণ্ণ এক নদী। হৈমন্তী শূন্য দৃষ্টিতে দেখছিল, তার চেতনার কোথাও বুঝি কিছু ছিল যার অদ্ভুত এক অনুভূতি তাকে নির্বাক, পরম দুঃখী, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। বাঁধের জলের দিকে চোখ রেখে হৈমন্তী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, শীত আবার তাকে শিহরিত করল।

অবনী বলল, "ঘরে যাবেন?"

হৈমন্তী নীরব। তার মাথায় ঘোমটার মতন শাল জড়ানো, শালের পাড়ের একটা পাতা কপালের কাছে শুকনো পাতার মতন কালচে দেখাচ্ছিল।

অবনী আবার কি বলতে যাচ্ছিল, হৈমন্তী মুখ ফেরাল।

"চলুন, যাই—" হৈমন্তী বলল, "কেমন যেন লাগে দেখতে—"

"থাকবেন আর খানিকটা?"

"না। আমার বেশি ঠাণ্ডা লাগানো উচিত না—" হৈমন্তী ফেরার জন্যে পা বাড়াল। ফিরতে ফিরতে বলল, "আজ এসে ভালই করেছি। না এলে কত কিছু দেখতে পেতাম না।"

অবনীর মনে হল, হৈমন্তী 'কত কিছু' কথাটা যেন কেমন করে বলল।

মাঝ এবং শেষ রাতের কোনো সময়ে অবনীর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, কে যেন তাকে ডাকছে। নেশার সে কিছু শুনছে কি শুনছে না, অথবা ঘুমের ঘোরে শুনছে, বুঝল না। ঘর অন্ধকার। বিজলীবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

অবনী বালিশ থেকে সামান্য মাথা তুলে শোনবার চেষ্টা করল, কে তাকে ডাকছে।

(ক্রমশ)

ঘরে-বাইরে

কাঞ্চীপুরম শাড়ির কথা

ভারতের অর্থনীতির বাঁধনহারা অধোগতি কার্পাস শিল্পে সঙ্কটের সম্ভাবনায়ও হাত বাড়িয়েছে। রেশম শিল্পের সঙ্কট তারও আগে সূচিত হয়েছে, তবে সাধারণের দৈনন্দিন কেনাকাটার সামগ্রী নয় বলে হয়তো আমরা খবরের কাগজের তোলপাড় করা খবরে জানিনি। রেশম, বিশেষত বাংলার রেশম সংকটাপন্ন। অল্প দামে যা বাজারে রেশমী শাড়ি বা কাপড় চালানো হয়, তার কোনটাই খাঁটি রেশম নয়। আবার মূল্য বেশী দিতে খদ্দের নারাজ। কারণ, তথাকথিত মুর্শিদাবাদ শাড়ির চেয়ে চমৎকার, ঘন বুনুনি টেঁকসই রেশম দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গা থেকে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় শহরে আমদানি করা হয়। যে-সব প্রতিযোগী রেশমশিল্প সুন্দরী সমাজকে বাংলার গরদ তসর রেশম থেকে আকর্ষণ করে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর এবং কাঞ্চিপুরী প্রধান।

রেশম শিল্পের জন্ম কোথায়, আমরা জানি না। তবে সাধারণ বিশ্বাস, চীনেই প্রথম তুঁতগাছের রেশম কীট কাজে লাগানো হয়। সেখান থেকে এক দিকে কোরিয়ার পথে জাপান, অন্য পথে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দিয়ে ভারতবর্ষে রেশম-গুটি প্রথম যাত্রাপথ খুঁজে পেয়েছিল। কথিত আছে, চীন সম্রাজ্ঞী সিলিং ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট হুয়োন্‌তির পত্নী। তিনিই রেশম শিল্পের পথপ্রদর্শয়িত্রী কিন্তু সে শিল্প অন্যত্র প্রসার লাভ করবে, সহ্য করতে পারতেন না। দারুণ কড়া নিয়ম এড়িয়ে কোন এক চীন রাজকন্যা মাথার চুলে রেশম কীটের ডিম লুকিয়ে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পদার্পণ করতে এসেছিলেন। জাপানীরা তো আজও তাদের শ্রেষ্ঠ রেশম গুটির বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। আবার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নজিরে কখনও-বা ধরা হয়েছে রেশম ভারতবর্ষেই প্রথম উৎপন্ন হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে খোটান, পারস্য, মধ্য এশিয়া ইত্যাদিতে রেশম শিল্প ছড়িয়ে যায়। অ্যারিস্টটলের লেখাতে ভারতের রেশমের উল্লেখ আছে। আলেকজান্ডারের বাহিনীর মুখে মুখে হয়তো ভারতের আর পাঁচটা ঐশ্বর্য ঐতিহ্যের মত রেশম কাহিনীও পাশ্চাত্ত্য জগতের বিস্ময় হয়েছিল।

এতো সব পুরোনো ইতিহাস। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসের পাতায় দক্ষিণী শাড়ি ও রেশমী কাপড়ের মহিমায় যে-সব এলাকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার মধ্যে বারানসী এবং কাঞ্চীপুর প্রধান বললে অত্যুক্তি হয় না।

মাদ্রাজ শহরের ৪৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঞ্চীপুরম শহর। ব্রিটিশ আমলে শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাঞ্চীপুরমকে বলতাম কাঞ্জীভরম। তাই শাড়ির নামও হয়েছিল কাঞ্জীভরম শাড়ি। ছোট-বড় মন্দিরময় এই নগরী এক সময় পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল এবং ইতিহাসে তার গরিমার অন্য রূপও ছিল। তারপর চোলা ও বিজয়নগর রাজ্যের অধীনেও গরিমার মর্যাদা বজায় ছিল। সেকালে এ অংশের নাম ছিল থোণ্ডাই-মণ্ডলম। চোলা রাজ করি কাল নাকি বনজঙ্গল কেটে কূপ আর দীঘি কাটিয়ে নানাভাবে থোণ্ডাইমণ্ডলমের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন। খৃষ্টোত্তর দুই শতাব্দীতে পল্লব রাজত্বের শুরু থেকে কাঞ্চীপুরম এই থোণ্ডাইমণ্ডলমের বর্ধিষ্ণু শহর। কিন্তু রেশম শিল্প কবে থেকে কিভাবে কাঞ্চীপুরমের বৈশিষ্ট্য হয়েছে, তার কোন খবর কোথাও স্পষ্টভাবে রাখা নেই। আমাদের রেশম শিল্প যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদির তুঁতগাছের চাষ, রেশম কীট পালন থেকে নিয়ে তাঁত বোনা পর্যন্ত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, কাঞ্চীপুরমের শিল্প মোটেই তা নয়। কাঁচামাল হিসাবে রেশম আসে বাইরে থেকে, সোনা-রূপোর জরি আসে সুরত থেকে। রেশমের অধিকাংশ ব্যাঙ্গালোর এলাকার। মহীশূর মালভূমি রেশম কীট উৎপাদনের জন্য আদর্শ। বাতাসের আর্দ্রতা তাপমাত্রা যেন ঠিক মাপ করা। ব্যাঙ্গালোর রেশমই নাকি আবার বাংলার কাঁচা রেশমের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

পাড়ে, আঁচলে, জ্যাকার্ডমকে সুন্দর নকশায় এনেছে কোমল সৌন্দর্য

সেখান থেকেই কাঁচামাল আসুক, শিল্পের ইতিহাসও কিন্তু কাঞ্জের জিটেফোটার সেই অতীত গৌরবের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চায়। তামিল সাহিত্যের মহাকাব্য, শিলাপ্পাধিকারম। অনুমান খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীতেই লেখা। সে সময় কাবেরী-পুম্পেট্টিনম ছিল জমজমাট বন্দর। শিলাপ্পাধিকরমে সেখানকার রেশম, পশম ও কার্পাস শিল্পের কথা আছে। কাবেরী-পুম্পেট্টিনম একদিন সাগরজলে তলিয়ে যায়। হয়তো বা যারা বেঁচেছিল তাদের মধ্যে কিছু তন্তুবায় বা সালিয়ার কাঞ্চী-পুরমে আশ্রয় নেন। সেই সালিয়ারবাই প্রবর্তক কাঞ্চীপুরমের সুন্দরী মনোহরণ শিল্পের শিল্পী। সালিয়ার জাতি বলেন, তাঁরা ঋষি মৃকণ্ডের উত্তর পুরুষ। মৃকণ্ড ঋষি দেবতাদের তন্তুশিল্পী। আবার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্টে আছে যে, সালিয়ার তন্তুবায় জাতি বেশীর ভাগই তাঞ্জোর জেলায়। তাদের আদিবাস অন্ধ্র দেশে। চোলা রাজা প্রথম রাজা রাজা (Raja Raja) পূর্ব চালুক্য এবং চোলা মিলনের পর অন্ধ্র দেশ থেকে সালিয়ারদের আমন্ত্রণ করে আনেন।

কাঞ্চীপুরমের শিল্পী নাকি এককালে কার্পাস বস্ত্র বয়ন করতেন। কিন্তু পাড় ও আঁচলে রেশম রাখতেন। অন্ধ্র দেশের গাধোয়াল বা নারায়ণ পেট শাড়িতে এখনও সেরকম হয়। ক্রমশ সুতীর অংশ কমিয়ে দিয়ে অবশেষে পুরো রেশমের আভিজাত্য-পূর্ণ রেশমী ও জরির কাজ চলন হয়েছে। আজও কাঞ্চীপুরের প্রত্যেক তাঁতী যে রেশম শিল্পী তা নয়। যাঁরা রেশমী শাড়ি বোনেন, সমাজেও তাঁদের মর্যাদা বেশী। তাঁরা সুতীর কাপড় বোনাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিল্প মনে করেন ও নিজেরা কথনও বুনতে রাজী হন না।

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, সোনালী জরির কাজ এখন কত কম পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিছু রাসায়নিক প্রণালীতে কৃত্রিম জরি তৈরি হবার খবর শুনেছি, কিন্তু ব্যাপকভাবে ভাল জরির ব্যবহার যা হয়, তার মান কিছু নেমে থাকলেও সোনা-রুপোর সামান্য ব্যবহার এখনও হয়। সোনা-রুপোর দামের উপর তাই জরি এবং জরিযুক্ত কাপড় নির্ভর করে। সোনালী জরিতে রেশমী সুতোর উপর রুপোলী জরিই জড়ানো হয়, তবে সেই রুপোলী জরিকে সোনার জল করে ধুয়ে নেওয়া হয় বা গিল্টি করা হয়। যদি শতকরা ৭৮ ভাগ রুপো হয় তো ২১ ভাগ রেশম এবং মাত্র এক-শতাংশ সোনা। এক সময় সোনা বা রুপোর অংশ এত বেশী হত যে, বেশী কাজ-করা শাড়ির ওজন হ'ত ভারী আর শাড়ির জরি গলিয়ে সোনা-রুপো পুনরুদ্ধার পর্যন্ত করা যেত। কাঞ্চীপুরম শাড়ির জরিও সব সময় উচ্চ-মানের হয় না, তবে সরকারী তথ্য সংগ্রহে ঐ শতকরা হিসাবই রাখা হয়েছে। কাঞ্চীপুরমের টিসুর শাড়িও আজকাল বেনারস টিসুর মত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। পাড় এবং পড়েন বা আড়াআড়ি সুতো সোনালী রুপোলী রেখে টিসুর বোনা সতর্কভাবে শিল্পী চালিয়ে যান। জরির বুনুনি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ নিপুণতার নিদর্শন।

আমাদের বাংলার তন্তুবায় সংসারের মত কাঞ্চীপুরমের শিল্প প্রায় পারিবারিক আয়োজন। সুতো জড়ানো থেকে আরম্ভ করে শাড়ি পাট করা পর্যন্ত তন্তুবায় সংসারে সবাই অল্পবিস্তর সাহায্য করে যান। সমাজেও অন্ন-সংস্থান বা উপ-জীবিকা হিসাবে শিল্পের নানা অংশ নানা লোকের মধ্যে ভাগ করা থাকে বলে বহু লোকের উপায় হয়। ১৯৬৪ সালের হিসাবে কাঞ্চীপুরমের লোক-সংখ্যা ছিল এক লাখের কিছু কম। তার মধ্যে ২০,০০০ তাঁত চলে। ৬৫০০ তাঁত রেশমের। প্রায় আড়াই হাজার পরিবার তাঁতের কাজে উপজীবিকা সংগ্রহ করেন, কিন্তু অন্যান্যভাবে তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে উপজীবিকা অর্জন করেন প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার লোক। এ ভিন্ন অল্প সময় সামান্য কিছু কাজ প্রায় বহু সংসারের মেয়েরা, এমনকি, ছোট ছেলেরাও করে।

কাঞ্চীপুরম শাড়ির আধুনিক নমুনা

নকল করতে গিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে কিছু পরিমাণ। ব্যবসায়ীরা বলেন, রুচির সংগে তাল দিয়ে চলতে হ'লে সিনেমার নামে শাড়ি অথবা বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মনোরঞ্জক নকশা, বাহার, সবই প্রয়োজন। আমাদের যেমন 'মানে-না-মানা' অথবা কোন বোম্বাই ছবির নামের শাড়ি হয়, কাঞ্জীপুরম শাড়িতেও হয় "কল্যাণ পরিসু" বা "নেন নীলভু"। সারা ভারতের বা লোক-প্রিয় "motive" বা অলঙ্করণ তারই দু-একটা রকমফের কাঞ্জীপুরম শিল্পেরও অবলম্বন। "পাতা, ফুল, আম, দীপক" ইত্যাদি পরম আদরণীয় অলঙ্করণ। আবার নতুনত্বের আমেজ এনে শিল্পী কোথাও-বা নকশা দিলেন "নয়া পয়সা"।

কাঞ্জীপুরম শাড়ির কদর বাইরেও যথেষ্ট, কিন্তু দক্ষিণী মহিলা সমাজ কাঞ্জীপুরম শাড়ির সবচেয়ে বড় খদ্দের। শতকরা ৭৫টি শাড়িই মাদ্রাজ প্রদেশে বিক্রি হয়। তবে মাদ্রাজের বাইরে মহিলা সমাজের রুচি সম্বন্ধে কাঞ্জীপুর সচেতন হ'য়ে উঠছেন। শুনে অবাক হলাম যে, বিক্রির হিসাবের উপর নির্ভর করে কাঞ্জীপুর তাঁতী সম্প্রদায় মন্তব্য করেছেন যে, কলকাতার মেয়েরা কোমল ও মোলায়েম রং ও কারুকার্য পছন্দ করেন। হালকা নীল গোলাপী, ধূসর ইত্যাদি বাংলার রুচির জন্য তাঁরা বেশী তৈরি করেন। ওদিকে মাদ্রাজে নাকি গাঢ় রং, যেমন কমলা, ঘোর নীল, সবুজ ইত্যাদির কাটতি বেশী। আবার অলংকরণের বেলায়ও মাদ্রাজের মেয়ে যেখানে ঢালা জরির "আম্রাম" বা হংস কিনারা খুঁজবেন, বাঙালী মেয়ে খুঁজবে ছোট্ট আম বা দীপকের বাহার।

"আম" অলংকরণটি সম্বন্ধে" আমার নিজস্ব একটু কথা অবান্তর হ'লেও, বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কাশ্মীরী শালের কল্কা থেকে নিয়ে দক্ষিণী নকশা "আম" মনে হয় একই ধারার ভিন্ন নাম। হিল্লোলিত পাইন শাখা থেকে শালের কল্কা এসেছে, না, ঝেলাম নদীর মন্থর-গতির বাঁক থেকে কল্পিত হয়েছে কল্কা, জানি না, কিন্তু আমও ঐ কল্কারই মত। ভারতবর্ষের যত রকম অলংকরণ নজরে ঠেকেছে, তার একটা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায়, এই কল্কা বা আম জাতীয় মোটিফ দেশজোড়া শিল্পের সংহতির চমৎকার নিদর্শন। মনে হয় আমাদের দেশে যে জরি বা সুতী কি সিল্কের দাত হ'ত, তা-ও এই একই ভাবের প্রভাব অথবা তার অপভ্রংশ। ওয়াটসন সাহেব তাঁর বই "Textile Manufacturers and Costumes of People of India" বইখানাতে আমাদের রুচির দ্রুত পরিবর্তন বিরোধিতা সম্বন্ধে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন:

"Among the people of India, there is not that constant desire for change in the costume which is noticeable in Europe. Some patterns have been there for centuries......Indian taste in decoration is in the highest degree refined. Such combination of form and colour as many of these specimens exhibit, everyone will call beautiful, and this beauty has one constant feature—a quietness and harmony which never fail to fascinate."—

নীল শাড়িতে, কমলালেবু রং-এর উপর জরির চাটাই পাড়। দুখানা শাড়িতেই "আম" অলঙ্করণ লক্ষ করবেন পাড়ের তলায়

পাশ্চাত্য সুন্দরীদের এ-মাসে ও-মাসে রং বদলায়, নমুনা বদলায়। আমাদের সজ্জায় আমরা শিল্প-সৌন্দর্যকে ঐতিহ্যময় করে তুলতে চাই। তাই কাশ্মীরের দোলায়মান পাইন শাখাই হ'ক বা হাওয়ায় লুটিয়ে-পড়া দেবদারু শীর্ষই হক, ঝেলামের বাঁকই হ'ক বা পল্লব ঘন আম্রকাননের একটি রসাল ফলই হ'ক—রূপসৃষ্টির বেলায় আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রত্যেক শিল্পীর মন একই রসে হিল্লোলিত হয়, আর রসিক সুন্দরী তার মর্যাদা দেয় সমাদরে; গ্রহণ করে চিরকালের সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে অথবা কল্পনা থেকে নিজকার বেশভূষায়।

শ্রীমতী।

শ্রী রাজাগোপালাচারী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত গো-হত্যা আন্দোলন বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন

—"বুড়ো হলে কী হবে, রাজাজীর চোখে এখনো ছানি পড়েনি। কালো চশমার আড়ালেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন, নির্বাচন ক্ষেত্রে গো-হত্যা অনিবার্য, সুতরাং আগে-ভাগে এই নিয়ে ঝামেলা করার মানে হয় না।"

একটি বিদেশী সংবাদে শুনিলাম, কোন এক বিবাহিত ভদ্রলোক স্ত্রী বর্তমান সত্ত্বেও প্রেম করিয়া বেড়াইতেন। ইলেকট্রিক শক-এর সাহায্যে তাঁহার প্রেমের ভূত তাড়াইবার ব্যবস্থা করা

হইয়াছিল। পর্দায় প্রেমিকাদের একটি একটি ছবি ভাসিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ে লাগে ইলেকট্রিক শক। —"পুরনো দিন হলে এত ঝামেলার ব্যবস্থার প্রয়োজন হত না। ইলেকট্রিক শক-এর বদলে একটি মুড়ো ঝাঁটাই ছিল যথেষ্ট"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির বহু সদস্য সরকারকে চতুর্থ যোজনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগের অনুরোধ জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তাঁদের সঙ্গে এই অনুরোধ আমরাও সরকারকে করি। তবে মনে হয়, খাদ্য উৎপাদন জোরদার করতে হলে ছাত্রদের অনুরোধ জানানো উচিত। বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ; 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে'র সুবিধেও নেই, সুতরাং আমরা চাষ করি আনন্দে।"

ডেভিস কাপ খেলার শেষের দিনে শ্রীকৃষ্ণন নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি কালীঘাটের প্রসাদ খাইয়া খেলায় জিতিয়াছেন। কোন কোন উগ্র সমর্থক নাকি কালীঘাটে পুজো দিয়া মায়ের সিন্দুর কৃষ্ণনের কপালে পরাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রসাদ খাইতে দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"ব্রেজিলের বিজিত কক যেন না মনে করেন, মা কালীর প্রসাদই তাঁর হারের কারণ; কৃষ্ণন যা র‍্যাকেট চালিয়ে গেলেন তার ধার মা কালীর খড়্গেও নেই!!"

একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, ভেজালে স্থান নাকি রাজস্থানের প্রথম সারিতে। সহযাত্রী সখেদে বলিলেন—"হায় বাংলা, তুমি এই সামান্য ব্যাপারেও কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলে না!"

পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে মৃগদাব রচনার কথা চিন্তা করা হইতেছে। —"হলে খুবই ভালো, না হলে—'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে'—গান তো আছেই"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বহু শলা-পরামর্শেও নির্বাচন-যুদ্ধে বাম-ঐক্য সাধন সম্ভব হইল না, দুটি বিরোধী নির্বাচনী ফ্রন্ট অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে এবং বাম-কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটি ফ্রন্ট ইতি-মধ্যেই জন্ম নিয়াছে। —"আর মাত্র দু' মাস পরে নব-জাতক কি নির্বাচনী ফ্রন্টে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করতে পারবে"—প্রশ্ন করে আমাদের শ্যামলাল।

সুকর্ণ আবার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়—একটি সংবাদ-শিরোনাম। শুনিয়া আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেল শল্য হলো রথী!"

এক সংবাদে প্রকাশ, নীতিমন্ত্রীর দোকানে নাকি দুর্নীতি চলিতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী সখেদে মন্তব্য করিলেন—"শিরে হৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধিব কোথা!"

সরকার প্রেক্ষাগৃহগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত শো-এর শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজাইতে হইবে। "কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত সমাপ্তি পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে দণ্ডায়মান থাকতে দর্শকদের কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা সে সংবাদ এখনো পাইনি"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে পড়িলাম, রোডেশিয়ার বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ সরকারের নেতা আয়ান স্মিথ এমন কোন শাসনব্যবস্থায় রাজী হইবেন না যাহাতে শ্বেতাঙ্গরা ক্ষমতার স্বর্গ হইতে নির্বাসিত হয়। "সম্পাদক মশাই অতি সত্য কথা বলেছেন; অনেকে বলছেন উইলসনের এ সম্পর্কিত প্রচেষ্টা ভাঁওতা মাত্র। আয়ান সমর্থক শ্বেতাঙ্গরাও গান ধরে সতর্ক ক'রে
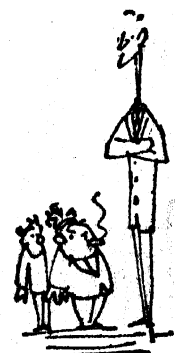
দিচ্ছেন—আয়ান দাদা গো বউ-ধরা এক কুম্ভীর এল যমুনায়"—সহযাত্রী কবিয়ালের গানটি সুর করিয়া শুনাইলেন।

ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া গেলে 'ট্রামে-বাসে'র কী হইবে এ প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"খুড়ো শ্যামলালরা রাজী হলে আমরা ট্রেনে-টেম্পোতে চড়ব; কী আর বলা যাবে, পড়শীর মেয়েদের হাতে, খানা খেতে হবে যাবে"—বললেন সহযাত্রী।

অ্যারেন্‌জ্‌মেণ্ট ইন গ্রে অ্যাণ্ড ব্ল্যাক

সাদা-কালোর বিষণ্ণতা : জেমস হুইসলার
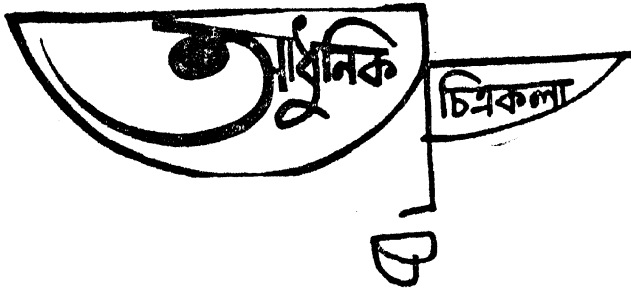
শিল্পকলায় যখন নতুন কিছু হয়, সমকালীন পঞ্চাশ উর্ধ্বের লোকেরা বলে, গোল্লায় গেল জাতি, নীতিবাদ, বিশ্বাস—চল্লিশের নিচে যারা তারা গোপনে গোপনে স্বীকার করে, বেশ ভালোই লাগছে—তিরিশও যাদের হয়নি তারা লাফালাফি মাতামাতি নকলে পাগল ক'রে দেয়। হুইসলারের অভ্যর্থনা মার্কিন দেশে পরিষ্কার উক্ত ফর্মুলায় পড়ে যায়। বুড়োরা ক্ষেপে অস্থির, সদ্যবিগতযৌবনরা কিছুটা মুগ্ধ ছেলে-ছোকরাদের উল্লাসে টেঁকা যায় না।

১৮৩৪ সালে জন্ম হয় ম্যাসচুসেট্‌সের লওয়েল শহরে। বাবা ছিলেন বিখ্যাত ওয়েস্ট পয়েণ্টে পাশ করা জেনারেল এবং সেই সময়ে মার্কিন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেলের ইঞ্জিনিয়ার। সব ছেলেই ছোট বয়সে বাবার পায়ের রেখায় চলে, হুইস্‌লারও তাই অন্ধের মতো ভর্তি হয়েছিলেন মিলিটারি ইস্কুলে—কিন্তু দুদিনেই অসহ্য হয়ে উঠলেন। এর পরের দৃশ্য প্যারিসের কাফে গুরবোয়ায় হুইস্‌লার, ব্রাক্‌মদ, বোদলেয়ার, ফাঁতি লাতুর প্রভৃতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পুরোপুরি পারিসিয়ান।

১৮৬০ সালে হুইস্‌লারের প্রথম প্রদর্শনী হয় সালঁতে এবং কুর্বে তাঁর ছবির ভক্ত হ'য়ে ওঠেন। এর পর তিনি আর একটি ছবি পাঠান সালঁ প্রদর্শনীর জন্য কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ভয়ঙ্কর রেগে যোগাযোগ করেন তখনকার বিখ্যাত বিদ্রোহী ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে এবং বাস্তববাদী ঢঙ ছেড়ে এদের ধারায় ছবি আঁকা শুরু করেন। হুইস্‌লার শুধু যে পূর্বসূরিদের ধ্রুপদী বাঁধনই নাকচ করলেন তা নয়, রোমাণ্টিকদের বায়বীয় উচ্ছ্বাসও তাঁর ভালো লাগল না। এই সময়ে তিনি একবার কিছুদিনের জন্য চিলিতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর ছবিতে, এতদিন যা দেখা যায়নি, এক অদ্ভুত স্বতন্ত্র মেজাজ দেখা গেল, যা থেকেই তাঁর সত্যিকারের তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকরের জীবন আরম্ভ। ১৮৯০ পর্যন্ত হুইস্‌লার অনবরত ভ্রমণ করেছেন ইউরোপের নানা দেশে, কখনো ভেবেছেন ইটালিতেই থেকে যাব, কখনো বেলজিয়ামে, কিংবা মনে হয়েছে এর কোনো জায়গাই অনুকূল নয়, মার্কিন দেশেই ফিরে যাব, কিন্তু মার্কিন দেশে তাঁর ফিরে যাওয়া হয়নি; প্যারিসেই আস্তানা গেড়েছেন ১৮৯০-এর পর থেকে। তবে তাঁর মাঝের অনেক বছর কেটেছে লণ্ডনে। রাস্‌কিনের সঙ্গে এই লণ্ডনে সেই ঐতিহাসিক মামলা হয় তাঁর।

আসলে ভিক্টোরিয়ানরা হুইস্‌লারকে দেখতে পারত না, কারণ অন্ধকারধর্মী তাঁর ছবির মধ্যে না ছিল নীতিকথা, না ছিল কোন আশাবাদ, এবং তিনি যেহেতু সত্য কথা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ক্যানভাসে, তাই রাস্‌কিন প্রভৃতি ভিক্টোরিয়ান কপটরা সুযোগ পেলেই কলমের আক্রমণ চালাতেন হুইস্‌লারের ওপর। রাস্‌কিনের এই আক্রমণ একবার একটু বেশী হয়ে গেল। সেই ছবি "নক্টার্ন ইন সিলভার অ্যাণ্ড ব্ল্যাক", তার জন্য হুইস্‌লার দাম ধরেছিলেন

দ্যু শো গিনি—এটা ঠিকই, তিনি ঈষৎ গর্বিত আর চালিয়াত গোছের ছিলেন, কারণ, কোনক্রমেই তাঁর এই ছবিটির দাম এত হতে পারে না, ওটা শুধু একটু লোক দেখানো ব্যাপার ছিল, কিন্তু তাতে রাস্কিনের এত ফোসকা পড়ার কী আছে —তিনি লিখলেন, "আমি এই ধরনের ছোটলোকী গর্ব অনেক দেখেছি, কিন্তু কখনো এমন নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখিনি যে, একটা ফালতু চালিয়াত দ্যু শো গিনি দাম হাঁকছে এক ভাঁড় রঙ লোকের মুখে ছুঁড়ে দেবার জন্য"। অনেক দিন ধরেই রাস্কিন যাহা-তাহা গালাগাল দিচ্ছিলেন তাঁকে নানা পত্রিকায়, কিন্তু এবার আর সহ্য হল না, হুইস্লার মানহানির মামলা ঠুকে দিলেন। এই মামলার ব্যাপারটা লোকের খুব মজার ঠেকছিল এবং মামলা-গৃহ নাকি সেদিন লোকের হাসিতে ফেটে পড়েছিল যখন দেখা গেল হুইস্লার মামলার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে, এক ফার্দিং ক্ষতিপূরণস্বরূপ পেয়ে দর্পিত ভঙ্গিতে বিজয়ের হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই মামলার জন্য হুইসলার এত খরচ করেছিলেন যে, তাঁর অর্থনৈতিক ধাক্কার জের ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

জীবনের ব্যাপারগুলো অনেকক্ষণ জানলুম, তাঁর ছবির বিষয় কিন্তু এখনো কিছুই জানা হ'ল না। যদিও হুইসলারের ছবিতে সেই ঝাঁজ বা নেশা নেই, যা একটি যুগকে জয় করে নিতে পারে, তবু তাঁর

নকটার্ন ইন ব্লু অ্যান্ড সিলভার

ছবিতে বর্ণবিন্যাস এবং বিষয়-বিন্যাসের আশ্চর্য মিলনে যে দৃশ্য-কবিতার জন্ম নেয়, তাকে অপূর্ব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিনি ইম্প্রেশনিস্টদের মতো এক-একটি রঙের সুর অন্বেষণে ব্রতী ছিলেন, যা তাঁর ছবির কয়েকটি নাম বললেই বুঝতে পারবেন—যেমন "হারমনি ইন গ্রে অ্যান্ড গ্রীন", কিংবা "অ্যারেনজমেণ্ট ইন গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক" বা "সিম্ফনি ইন হোয়াইট" প্রভৃতি। তাঁর ছবির মধ্যে এক ধরনের আগন্তুকের দৃষ্টি ছিল, তিনি কখনোই একাত্ম হতেন না তাঁর "বিষয়ে"র সঙ্গে, তারা শুধুমাত্র কম্পোজিশন বা ছবি বা রঙ হ'য়েই ছবিতে উপস্থিত। এখানে ইম্প্রেশনিস্টদের সঙ্গে তাঁর একটি বিরাট তফাত। তাঁর চিত্ররীতি বা শৈলী খুব নিঃসন্দেহ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাঝে মাঝে সামান্য অস্বস্তিকরও হয়ে ওঠে, কারণ, চিত্রে ভাস্কর্যের যে স্থান রয়েছে, যার ফলে ক্যানভাসে "বিষয়" আঁটো ভাবে গেঁথে আছে মনে হয়, তা তিনি সম্পূর্ণ নাকচ করেছেন তাঁর ছবি থেকে। কিছুটা বায়বীয় তাই তাঁর অনেক চিত্রই। যে-কোনো শিল্পই যদি অধিক মনোরম হ'য়ে পড়ে তা হলে মহৎ হ'তে পারে না, তা হুইস্লারের এটাই ছিল অসুবিধে।

আসলে তাঁর ছবিতে কবিতার দিকটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়, তাঁকে বলাই হ'ত "টেমস নদীর কবি"। টার্নার যেমন টেমসে দেখেছিলেন রঙের এক প্রোজ্জ্বল সংমিশ্রণ, হুইস্লার ঠিক সেই চোখ নিয়েই দেখতে পেয়েছিলেন অন্ধকারে নদী শরীর হারিয়ে হালকা হাওয়া, আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। হুইস্লারের ছবি অতীতের কথা বলে, স্মৃতি থেকে উঠে-আসা গুঞ্জন, কণ্ঠস্বর, মুখে, শরীর ভেসে বেড়ায়। উদাহরণস্বরূপ আলোচনা করা যাক, "অ্যারেন্জমেণ্ট ইন গ্রে অ্যান্ড ব্ল্যাক" এবং "নকটার্ন ইন ব্লু অ্যান্ড সিলভার" দুটি চিত্র রচনা।

দুটো ছবির, যদিও একটি পোরট্রেট এবং অপরটি দৃশ্য, কোনোটাই যেন এইমাত্র দেখা নয়, অতীতের দৃশ্য হঠাৎ চোখে ভেসে এল। পোরট্রেটটি চিত্রকরের মায়ের, কিন্তু লক্ষ করুন, কোথাও কোনো আবেগ নেই, বিষণ্ণতা হাওয়ায় যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, ঘুমের নেশার মতো লাগে। চিত্রবিন্যাস সরল, অনাড়ম্বর, কিন্তু নির্মিত—ছবিটির "চরিত্র"কে তুলে ধরে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে না, সাদা-কালো এবং 'বিষয়ে'র বিন্যাসের মধ্য থেকে বিষণ্ণতার সুর উঠে আসছে। এই ছবিটি থেকে এক ধরনের নরম বাজনা বাজে, চারিদিকের আবহাওয়া শীতল হ'য়ে যায়।

অন্য ছবিটিও তাই, প্রায়ান্ধকারে যে ব্রিজ দেখা যাচ্ছে, তা শুধু একটি ফর্ম মাত্র, সমস্ত জিনিসটা নির্ভর করছে সাদা-কালোর এক বিশেষ জায়গায় উপস্থাপনের মধ্যে—আমাদের হারিয়ে-যাওয়া সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যেন নেশার ঘোরে। আসলে এ ছবিতে কিছুই নেই আব-হাওয়াটা ছাড়া; এক ভয়ংকর মন-খারাপ-করা সন্ধ্যা যেন মনে পড়ে যায়, যার বিষয়ে শুধু দু-একটি রঙ আর রেখা ছাড়া আর সবই ভুলে গেছি।

শুদ্ধশীল বসু

ছাত্র আন্দোলন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গত দু'মাস ধরে কলকাতায় যে ব্যাপক ও বিরাট ছাত্র আন্দোলন চলছে তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি নিজে একজন ছাত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজে বার বার ছাত্রসভায় অংশ গ্রহণ করেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সামান্য বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যে ধরনের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা কল্পনার বাইরে। গত ২২শে নভেম্বর ল কলেজে একজন ছাত্র বললেন, ল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হলে নাকি তাঁর চাকরি-স্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের স্থান থেকে বিচ্যুত হবেন। তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কোথায়? বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষিত ছেলেদের চাকরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়। যাদের ভিতরে জোর আছে তাদের কথা পৃথক কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রদের পরীক্ষার ফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়। তাদের কথা, সর্বোপরি দেশের শিক্ষা-জগতের অপূরণীয় ক্ষতির কথা চিন্তা করে কর্তৃপক্ষ একটা মীমাংসার পথে আসতে পারতেন।

এবার ছাত্র আন্দোলনের কথা বলি। ছাত্র আন্দোলন কলকাতার কলেজে নতুন নয়। তবে এবার নির্বাচনী বৎসর। ছাত্র-আন্দোলনের প্রসঙ্গকে জিইয়ে রাখতে পারলে বিরোধী দলগুলির সুবিধা কিঞ্চিৎ বেশীই হবে। কারণ তারা দেশের স্বার্থ দেখে না—ছাত্রদের ভবিষ্যৎ দেখে না। দেখে নির্বাচনে জিততে পারলে নিজেদের কি করে সুবিধা হতে পারে।

এই যদি পরিণাম হয় তাহলে আমি মনে করি আইন করে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ান বন্ধ করে দেওয়া হোক। বিশ্বাস করি ছাত্র নেতাদের শক্তির কথা। কিন্তু সাধারণ ব্যাপার নিয়ে যদি প্রায়ই বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে যারা সত্যিকারের পড়াশোনা চায় তাদের উপায় কি হবে?

পরিশেষে আমার অনুরোধ, ছাত্র-সংঘগুলি একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন—যাতে ছাত্র-সমাজের মঙ্গল হয়। অন্যায় আর অবিচারের প্রতিকার নিশ্চয় আমরা চাই কিন্তু সেই প্রতিকার কেবলমাত্র ছাত্র কল্যাণের পর প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজ-নৈতিক চক্রান্তের পরিণতি ভয়াবহ—তার দৃষ্টান্ত ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র আন্দোলন।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিমল পাচাল
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল কলেজ

ডাকটিকিটে রবীন্দ্রনাথ

৩৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যার 'দেশ'-এ সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্রের প্রবন্ধটির 'খুঁজে দেব না খুঁজে নেব' পর্যায়ের ৫ নম্বর পাদটীকায় জানতে চেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আর্জেন্টিনা ব্যতীত অন্য কোন দেশের সরকার বিশেষ ডাকটিকিট প্রচার করেছিলেন কিনা। জানাচ্ছি—বরেণ্য বিশ্বকবির শতবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর মোট ৫টি দেশে ডাকটিকিট প্রচার করা হয়। দেশগুলি (১) ভারতবর্ষ (২) আর্জেন্টিনা, (৩) সোভিয়েট রাশিয়া, (৪) ব্রাজিল, (৫) রুমানিয়া। অবশ্য আর্জেন্টিনা ব্যতীত অন্য কোন দেশ ভারতে প্রচারিত ডাকটিকিটের কবির প্রতিকৃতির অনুকরণ করেনি। তবে একজন ডাকটিকিট সংগ্রাহক হিসেবে একথা বলতে পারি যে ঐ পাঁচটি দেশের ডাকটিকিটে মুদ্রিত কবির প্রতিকৃতিগুলিও অনন্যসাধারণ ও সুন্দর।

নির্মলকুমার দাশগুপ্ত
কলিকাতা—২০

'খুঁজে দেব না খুঁজে নেব'

রসিক ও পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের 'খুঁজে দেব না খুঁজে নেব' নামক 'পঞ্চতন্ত্রে'র অন্তর্গত রচনাটি আগ্রহ সহকারে পড়ছিলুম, কিছু নতুন কথা শোনার আশায়। মূল কাহিনীতে নয়, পাদটীকায় তিনি কিছু নতুন কথা বলেছেন। সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

রচনাটির প্রথম অংশের ২নং টীকায় তিনি বলেছেন "সাঁ ইসিদো (ইংরেজি Saint Isidore) বুয়েনস আইরেসের কুড়ি মাইল উত্তরে, সমুদ্রপারে" (২৩৫ পৃঃ দেশ, সংখ্যা ৩)। কিন্তু প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীতে দেখলাম কথাটা 'San Isidore' (২০১ পৃঃ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং)। ভূগোল গ্রন্থ, মানচিত্র ও ভ্রমণ বিষয়ক বইয়ে 'San' পেলাম, আলী সাহেবের মত অনুযায়ী 'Saint' পেলাম না। যেমন এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্লড ট্রাভেল, ভলাম টু গ্রন্থের ৩২৩ পৃষ্ঠার ঐ San Isidore-ই আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।

তা ছাড়া সান ইসিদ্রো 'সমুদ্রপারে' নয়, প্লেট নদী বা রিও-দ্য-লা-প্লাতা নদীতীরে অবস্থিত।

উক্ত রচনার দ্বিতীয় অংশের ২নং পাদটীকায় (৩৪ পৃঃ দেশ, সংখ্যা ৪) তিনি পূরবীর 'চিঠি' কবিতার ষষ্ঠ চরণটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন '...এই দেশী ইস্পানি'। কিন্তু মূলগ্রন্থে বানান আছে 'এই দেশী'।

অবশ্য এগুলি গৌণ ব্যাপার। 'ইস্পানি' সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা বক্তব্যের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রধান আলোচনা। 'ইস্পানি' বাক্যিতার্থে কোন দেশের নাম নয়, সরাসরি একটি বিদেশী ফুলের নাম। রবীন্দ্রনাথ নিতয়াদের 'মিরালরিয়ো' (নদীশোভনা) নামক যে বাড়িটিতে ছিলেন সেই বাড়িটির ঐশ্বর্য ছিল এক বিস্তৃত পুষ্পবাগিচা। কবির অবস্থানকাল নভেম্বর-ডিসেম্বর

অর্থাৎ তখন আর্জেন্টিনায় গ্রীষ্মকাল। আর্জেন্টিনায় এই ঋতু ফুলের ঋতু। ('নিউ হরাইজনস্ ওয়রল্ড গাইড : প্যান আমেরিকান ওয়রল্ড এয়ারওয়েজ' গ্রন্থের ৩৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। রবীন্দ্রনাথের নিবাসসংলগ্ন 'নদীশোভনা'র বাগানেও ফুটেছিল অজস্র ফুল। এই পুষ্পসৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন 'বিজয়া' স্বয়ং—তাঁর স্বরচিত একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "It was the season of the sweetest-smelling flowers: espinillos', honey-suckle, roses." (টেগোর অন দি ব্যাঙ্কস্ অব দি রিভার প্লেট, পৃঃ ৩৩, এ সেনটিনারী ভল্যুম, ১৮৬১—১৯৬১)। লক্ষণীয়, 'espinillos' কথাটি উর্ধ্বকমাচিহ্নিত। বিজয়া কবির কাছে 'চিঠি' কবিতাটির তর্জমা শুনেছিলেন। কারণ, কবির সদ্য রচিত কবিতার নাট্যোচ্চারণে শ্রোতা ছিলেন বিজয়া। তাই পরে প্রবন্ধটি লেখার সময় উর্ধ্বকমাচিহ্নিত করেছেন পুষ্প নামটিকে। যা বিজয়াই হয়তো কবিকে ফুলটির নাম ও পরিচয় বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিজয়া-বর্ণিত এই 'Espinillo'কেই 'ইস্পানি' বলেছেন ছন্দের খাতিরে। ছন্দের খাতির রাখতে গিয়ে তিনি অভিধান-বহির্ভূত অনাচার করেন নি। 'Espinillo' শব্দটি অপ্রচলিত আমেরিকান শব্দ। এই শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ ESPINO থেকে। 'Espino' সম্বন্ধে উদ্ভিদবিদ্যার বই বলছে, এটি একটি কাঁটা আগাছার ফুল। রঙ সাদা, কখনো ক্রীম। স্পেনে একে Hawthorn বা Buckthorn বলে। (Eng.-Span. and Span.-Eng. Dictionary; Martinez Amador) তা ছাড়া Webster's New International Dictionary, 2nd edition. এর ৮৭৩ পৃষ্ঠায় ঐ 'ইস্পিনো'র বর্ণনা আছে।

এই 'ইস্পিনো' থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'ইস্পানি' করেছেন। ইস্পানি ফুলকে বলেছেন জুঁই। ফুলের সঙ্গে মিল, গাছের সঙ্গে নয়। (অমরনাথ রায়ের 'পুষ্পোদ্যান' অনুযায়ী এই ফুলটিকেই কি 'ওনোকোনা পিনোনোমা' বলে?)।

'ইস্পানি' স্প্যানিশ সম্পর্কিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'ইস্পানী' লিখতেন। এবং পূর্বচরণের 'বাংলা দেশের বাণীর সঙ্গে মিল হত।

তা ছাড়া চিঠি কবিতাটি পুষ্পবিষয়ক। পুষ্পপ্রেমিক, পুষ্পসচেতন ও পুষ্পনামকরণবিদ রবীন্দ্রনাথ 'চিঠি' কবিতাটির চার দিন আগে, ভুবনডাঙার মাঠের আকন্দকে স্মরণ করে 'আকন্দ' কবিতাটি লেখেন। এবং বারোই নভেম্বর লিখেছেন রূপকথমী 'বিদেশী ফুল'। রবীন্দ্রকাব্যধারায় পূরবী কাব্যেই এসেছে সর্বাধিক সংখ্যক ফুলের নাম।

তাই আমাদের বিনীত নিবেদন যে, ইস্পানিকে হিসপানি বা হিসপানীয়াই বলা ঠিক নয়। যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলী সাহেবকে অনুরোধ করি এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বিশদ করার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সামন্ত
বাংলা গবেষণা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার নাট্যসাহিত্য

গত ৩ ডিসেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে 'বাংলা দেশের সাম্প্রতিক নাটক' আলোচনাটি সত্যিই একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত রচনা হয়েছে। বর্তমান বাংলা নাট্যসাহিত্যের দৈন্যদশা দেখে আমরা যারা পীড়িত হই তাদের কাছে সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের এই সমীক্ষাটি কিছু ভাবনার উদ্রেক নিশ্চয় ঘটাবে। অন্তত, একটি আমার মনে কিছু ভাবনা জাগিয়েছে আর তাই এ চিঠি না লিখে পারছি না।

তিরিশের যুগ থেকে বাংলা দেশে সাহিত্যের প্রতিটি বিভাগে আন্দোলনের নামে কিছু একটা হয়ে গেছে। উত্তরচল্লিশে "নব নাট্য আন্দোলন"-এর নামে আধুনিক নাট্যপ্রেমীদের রক্ত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। শুরু হয়েছে। কিন্তু তাতে নাট্যসাহিত্যের কি প্রাপ্তি ঘটেছে? লাভ যেটুকু হয়েছে সে অভিনয়ে, মঞ্চস্থাপত্যে, আঙ্গিক কারুকর্মে। আধুনিকতম নাট্যপ্রচেষ্টাগুলিতে পরিচালকরা জয়লাভ করেছেন, নাট্যকাররা হয়েছেন পরাজিত। অভিনয়যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই নাটকের সার্থকতার নিরূপক কিন্তু তা বলে সেগুলোই নাটকের শ্রেষ্ঠতা বা শিল্পগুণের পরিমাপক নয়।

এ কথা বোঝবার আজ সময় এসেছে।

জনতার বোবাকান্নাকে বাণীরূপ দিতে বিভিন্ন পার্টিতে যে কল্লোল উঠেছে, দলীয় রাজনীতির বেড়া ডিঙিয়ে, সাময়িক উত্তেজনার স্পর্শ বাঁচিয়ে, চিরন্তন নাট্যসাহিত্যে সে কি অবদান রেখে যাবে? রাজনীতি নাটকে অবশ্যই থাকবে, কারণ মানুষের সমাজকে নিয়ে নাটক এবং সেই মানুষের সমাজে রাজনীতি একটা বড় অংশ। কিন্তু যে অবজেক্টিভিটি নাট্যসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ তাকে উপেক্ষা করে পরিমিতি বোধ হারিয়ে মঞ্চের ওপর জোরাল স্লোগান তুললে, দলীয় পতাকাকে বাতাসে ওড়ালে আর যাই করা হোক নাট্যশিল্প সৃষ্টি করা হয় না। অথচ তেমন নাট্যকার থাকলে আমাদের এই বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ে ভাল নাটক লেখা হতে পারত। দুর্নীতির বিষবাষ্পে ভরা, নীতিভ্রষ্ট, চাঞ্চল্যগ্রস্ত এই বর্তমান বাংলাকে নিয়ে আমার তো মনে হয় কিছু সার্থক কমেডী নাটকের আবির্ভাব হওয়া উচিত ছিল কারণ কমেডীর উদ্দেশ্যই তো রঙ্গরসের উপকরণে নতুন মূল্যবোধকে জাগরূক করে তোলা, সামাজিক নিয়মশৃংখলার শৈথিল্য পূরণে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা। নাট্যকারের অভাবে তেমন কমেডী আমরা ইদানীং একটিও পাইনি। আজকের নাটকগুলিতে দেখি কেবলই একই সমস্যার পৌনঃপুনিকতা, আর নয় সস্তা জনমনোরঞ্জনের অকৃপণ আয়োজন।

আধুনিক কাব্যনাটক প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহ ও প্রত্যাশা অসীম। তবু এখানে বলার কথা, ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর মেলবন্ধন যেন কাব্য নাটকগুলিতেও ঠিক হচ্ছে না। সামগ্রিক বিচারে বাংলার নাট্যকাররা আমাদের শুধু হতাশই করছেন। একটা কথা আমি বুঝতে পারি না যে, কেন হালের বাংলা নাটকের উপর রবীন্দ্র-নাটকের উত্তরাধিকার বর্তাল না? রবীন্দ্র-নাটকের সাহিত্য মূল্যের কথা যেমন কোন সংশয়ের অপেক্ষা রাখে না তেমনি তার নাটকীয়

উপাদান-সৌন্দর্য ও এখন রসিকজন-স্বীকৃত। বিশেষ করে শ্রীশম্ভু মিত্রের পরিচালনাধীনে বহুরূপীর একাধিক রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনায় কবিগুরুর নাটকের মঞ্চসাফল্য প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তাই আমার আবেদন-বাংলা নাটকের মরা গাঙে আবার বান আনবার জন্য আজকের তরুণ নাট্যকারেরা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সত্যিকারের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হোন আর যেহেতু সব আন্দোলনই (তা সে আদর্শ ও উদ্দেশ্য যত শুভ ও মহৎই হোক্) এক সৃজনীশক্তিসম্পন্ন নেতার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সে কারণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা সেই আন্দোলনের নেতা হিসাবে গ্রহণ করুন। আসল কথা, রবীন্দ্র-নাটকের প্রকৃত উত্তরাধিকার লাভেই আমাদের নাট্যসাহিত্যের মুক্তির মন্ত্র লুকিয়ে আছে।

সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হুগলী।

গো-হত্যা নিবারণ

২৬শে নভেম্বরের দেশে 'দৈবেশিকী' পড়লাম। গোহত্যা নিবারণের ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলো। "পৃথিবীর এই একটি মাত্র দেশে **মানুষ** মনুষ্যেতর **একটি** জীবের প্রাণবধ অকরণীয় বলে ভাবতে শিখেছে।" একটি জীব নয়, আরও আছে—বাঁদর, হনুমান, লাটুর বাড়ির ইঁদুর যা ধরা পড়লে রাস্তার ওপারে খাটুয়োর বাড়ির দোরগোড়ায় চালান হয়—কিন্তু মান যায় না। ইত্যাদি

আবার, আমাদের দেশের মানুষ মারের বেলাতেই এভাবে বলা যায় না। অনেকেই Beef খাওয়ায় বিশ্বাসী। যদিও গরু খাওয়ার নাও হতে পারেন। আবার অনেকে সন্ধ্যার পর কিছুই খান না জীব হত্যারই ভয়ে।

এক শ্রেণীর মতবাদ অন্যান্য শ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দেওয়াই কি হিউম্যানিস্ট সেকুলারিজম?

আমি নিজে মাছ মাংসই খেতে পারি না। সেন্টিমেন্টে লাগে। পাঁঠা খাবো, গরু খাবো না আমি হিন্দু হয়েও মেনে নিতে পারি না। অবশ্য যাঁরা গরু খেতে চান না, গোসমস্যা মেটাবার জন্য তাঁদের খাওয়াতেই হবে একথাও আমি বলি না। খাওয়াবার প্রয়োজনও হবে না।

গান্ধীজীর কথা তোলা হ'য়েছে। গান্ধীজী গো-হত্যা নিবারণ করতে বলেছিলেন, আবার প্রয়োজন হলে গো-হত্যা করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

অধীরলাল ব্যানার্জী
দেওঘর।

জল ও 'পানি'

গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমীর দাশগুপ্তের কানাডার চিঠি পড়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। বিশেষত ঐ চিঠিতে আমাদের দেশী বাবুদের ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে স্বদেশ সম্বন্ধে তাদের যে অজ্ঞতার চিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন তা বাস্তবিকই ভয়াবহ। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, এদেরই ভেতর অনেকেই পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেদের কাছে আমাদের দেশের নীতি, আদর্শ ও অন্যান্য বাস্তব সমস্যার এমন বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করেন যার ফলে আমাদের দেশ সম্বন্ধে বিদেশীয়দের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে তারই সংগত কারণেই। তাই বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতার পেছনে এদের অবদানও নেহাত তুচ্ছ নয়। গেল বছরের পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের বক্তব্য পশ্চিমীদের বোঝাতে নেতারা নাজে-হাল হয়েছিলেন কি পরিমাণ তা এ প্রসংগে স্মর্তব্য। পরিশেষে শ্রীদাশগুপ্তের চিঠিতে একটি ত্রুটি নজরে এল। তিনি লিখেছেন, "পূর্ববংগীয়রা জলকে পানি বলেন—যেমন আমাদের দেশে বাঙালী, ওড়িষাবাসী এবং দাক্ষিণাত্যবাসীরা বাদে আর সবাই পানি বলেন।" মন্তব্যটি ঠিক নয়। পূর্ববঙ্গের সবাই জলকে পানি বলেন না। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলার লোকেরাই কেবল জলকে পানি বলেন। ওড়িষাবাসীরাও জলকে পানি বলেন।

শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য
ওড়িষ্যা

লিখেছেন নদীতে এত মাছ যে, সেখানে অসংখ্য মাছরাঙা, পানকৌড়ি আর কুর্‌বকের ছড়াছড়ি! লেখকের বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সব ক'টা পাখির নামই চার অক্ষরের ব্যবহার করা। এইসব লেখকের অনেকেরই সাহিত্যের প্রতি মমতা বা আকর্ষণ কম নয়, কিন্তু সামান্য অনুশীলনের অভাব ও দায়িত্বহীনতার ফলে এরকম বিভ্রাট ঘটে। ব্যাপারটা সোদরপ্রতিম ভাগিনেয় হয়ে যায় আর কি! এসব ক্ষেত্রে প্রকাশকদেরও দায়িত্ব আছে। লেখকদের হাতের লেখা যেমন খারাপ হতে পারে, তেমনি দু-একটা বানান ভুল বা শব্দ ভুলও বিচিত্র নয়। উপযুক্ত লোক রেখে প্রকাশকদের উচিত নির্দিষ্ট মান রক্ষা করা। বাংলা বানানের এখন একটা মোটামুটি সমতা স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তাও সর্বত্র এক রকম নয়. লেখকদের খেয়াল অনুযায়ী চলছে। মূলে উর্দ্ধ শব্দের বানান ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ, ঊর্ধ্ব —সবই চলছে। পূর্বাভাস শব্দটিকে অনেক প্রখ্যাত লেখকও লেখেন পূর্বাভাষ। আর যাই ছাড়ি না কেন, ভাষণ দেবার লোভ আমরা কেউই সহজে ছাড়তে পারি না।

সনাতন পাঠক

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

FOLKLORE LIBRARY by Dr. Piyushkanti Mahapatra. Indian Publications. 3, British Indian St., Cal-1. Price Rs. 6.50.

লোকসাহিত্য, লোকগাথার ক্ষেত্রে কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি' নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের পাঠাগার-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রচিত। মনোগ্রাফ তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী। ভারতীয় লোকগাথা বিশালতা ও বৈচিত্র্যে তুলনাহীন। তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও সে সম্পর্কে মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করবার যে গুরুদায়িত্ব 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি' গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য গ্রন্থটি লোক-সাহিত্যের পাঠাগার-সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে রচিত। বর্তমানকালে লাইব্রেরিয়ানশিপ এক উন্নত ও জটিল প্রকরণ। আর লোকগাথা সংক্রান্ত লাইব্রেরি যে সাধারণ লাইব্রেরি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের তা তো বলবার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ লাইব্রেরি যেখানে কেবলমাত্র পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিয়ে বেশি ব্যস্ত, লোকসাহিত্য পাঠাগার সেখানে অধিকতর ব্যাপৃত পুস্তকেতর বস্তু নিয়ে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন যে কত বিচিত্র বস্তুর মধ্যে সংরক্ষিত! এবং তা সংগ্রহ করা যেমন দুরূহ, সংরক্ষণ ততোধিক আয়াসসাধ্য। আমাদের দেশে লোকগাথা সংক্রান্ত নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করলেও লোক সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা অতি সম্প্রতি ভাবতে শুরু করেছি এবং আলোচ্য পুস্তক সে পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ, ভূমিকায় বলেছেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। কাজেই ডঃ মহাপাত্র এক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মানের অধিকারী।

দক্ষ লাইব্রেরী-বিজ্ঞানী লেখক স্বল্প পরিসরে যে আলোচনা করেছেন আশা করবো তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রেরা এবং লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ সংরক্ষণে উৎসাহী ব্যক্তিরা অনুধাবন করবেন এবং এ-বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শিখবেন।

৩৫৩।৬৬

শিকার কাহিনী

জঙ্গল মহল। বুদ্ধদেব গুহ। বাক্‌ সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলকাতা-৯। তিন টাকা।

বিগত পাঁচ দশটা বছর বাংলা সাহিত্যের পাড়াটা প্রায় ঠা ঠা করছে। আচমকা কোনো একজন নতুন লেখকের জবরদস্ত আবির্ভাবে পাড়াটা হঠাৎ গমগমিয়ে ওঠেনি—মাত্রই কয়েকজন বাদে পুরনো লেখকরা প্রায় সবাই কেউ টিমটিম, কেউ মিটমিট করছেন। কবিতার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা—ওখানে কিছু ভাঙা-গড়া তাদের পাঞ্জা-কষাকষি হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এমতাবস্থায়ও একেবারে অপ্রত্যাশিত দরজার থেকে কেউ কেউ পুরোপুরি নতুন সাবজেক্ট ধরে এমন টাটকা সওদা হাজির করেছেন যে, পাঠকমশাইদের মধ্যে কাড়াকাড়ি বেধে গেছে। এই অতি সাম্প্রতিক কালে যে দুচারজন লেখকের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের লেখক একজন। এঁর আবির্ভাব দুম করে, একেবারে রাতারাতি পাড়া-মাৎ। হাতে বন্দুক, মাথে শিকারের গল্পের উড়ো খই, মুড়কিতে হা হা হাসির ফেনা, কথা-বার্তায় নির্ভীকতায়, আত্মপ্রসাদের ঝলক—হঠাৎ কলমের খোঁচায় চেঁচিয়ে উঠে যে লেখা বেরয় তা তাজা, ঝাঁঝালো, শুনতে ইচ্ছে-করা শিকারের গল্প। মন একেবারে টাটকা হয়ে ওঠে। শিকার মানে, সাদা-মাটা, বাঘের চওড়া থাবা বনজঙ্গলে সাতশো-সত্তর বার শোনা ব্যাপার নয়; হরেক বন্দুকটোটার হিসেব, মনুষ্যের ধড়ফড়-ধড় চিবোনো জমাবদ্ধ বৃত্তান্তও নয়—বুদ্ধদেব-এর হান্টিং স্টোরিতে এই সব ভিজে বারুদের মত মামুলি মশলা নেই।

শিকারকে নিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতো আগাগোড়া রঙ্গরসিকতা করে তার বাঘের ভয়কে গোঁফের কম্পিকে পরিণত করেছেন, মাঝে-মাঝে তোফা সিচুয়েশন বানিয়ে গা-ছম-ছমও যে না করিয়েছেন এমন নয়।

তাঁর গল্প পড়ে মাত্র একটি কথা, মানে একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পারি—'সাবাস্'। সমস্ত ভাষায়, ভঙ্গিতে, টিপ্পনীর মোচড়ে—বক্তব্যের কেরিকেচারে তিনি পাঠককে কেবলই স্মরণ করান, 'এসব চল গিয়ে ওস্তাদের মার' এবং পাঠকও বলতে পারেন কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ। জঙ্গল মহল-এর সব গল্পই সাচ্চা চীজ, এক সময় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ছাপা হয়ে গিয়েছে—এখন সেইসব ছাপা এক বান্ডিল গল্প কুড়িয়ে এই মন-মেজাজ শরিফ করা বই। ভাষায় তাঁর একটা নিজস্ব জেল্লা আছে, উর্দু, বয়েৎ-এর উড়ন তুবড়ি যখন ছাড়েন তখন মন আলোয় ঝলসে ওঠে। প্রত্যেকটি গল্প ধরে তার সোয়াদ কতটা—নুন ঠিক হয়েছে কিনা—সমালোচনা করার এই মামুলি পদ্ধতিতে বর্তমান (সমালোচক নয়) পরিচায়ক নারাজ। আমি পাঠককে ব্যঞ্জনটি পরখ করে দেখতে বলছি। খুঁতখুঁতে বাই-ওঠা লোক মেজাজ ভালো করে উঠে যাবে—নিন্দুক আর মুখ-বেজার ভদ্রলোক সহাস্য না হন তো কি বলেছি। বুদ্ধদেব ক্রমাগত লিখবেন। শিকারের আড়ষ্ট শার্দুল-শিহরিত 'মিয়ার স্টেটমেন্ট'-এর প্যাটার্নকে তিনি একেবারে খোল-নলচে বদলে অনন্যসাধারণ, অভিজাত এক রসিকতায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের অনেক কিছুই গিলতে হয় সময় খুন করবার জন্য, সময়কে ভোগ করার জন্যে বুদ্ধদেব গুহ-র সঙ্গে মোলাকাৎ অত্যাবশ্যক।

জীবনী

ভারতরত্নমালা—শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দি বুক এক্সচেঞ্জ'—২১৭ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। শোভন সংস্করণ মূল্য ৪·০০ টাকা, সাধারণ সংস্করণ মূল্য ২·০০ টাকা।

ভারত-জননীর বহু কৃতি-সন্তানের জীবনচরিত ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে এ পর্যন্ত ভারতের যে ১৪ জন কৃতি-সন্তান 'ভারতরত্ন' পদক ও উপাধি পেয়েছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সমাজসেবী কারভে, কর্মযোগী বিশ্বেশ্বরৈয়া, সমন্বয়বাদী ভগবান দাস, আধুনিক চাণক্য রাজাজী, ঋষি কানে, বঙ্গগৌরব বিধানচন্দ্র, হিন্দী প্রাণ পুরুষোত্তম, ত্যাগমূর্তি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজনৈতিক পন্থজী, মহা-মনীষী রাধাকৃষ্ণন, বিজ্ঞানসাধক রমণ, ভারতজ্যোতি জওহরলাল, শিক্ষাবিদ ডঃ জাকির হোসেন, প্রিয় নেতা শাস্ত্রীজী। এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকার যাঁদের উপদেশ এবং নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা মহারাষ্ট্র নিবাসের কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা আকাশবাণী কেন্দ্রের শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশা করি এই জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সবিশেষ উপকৃত হবেন।

৪২৫।৬৬

কাব্যগ্রন্থ

কর্ণ-কুন্তী। বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার। পরিবেশক : দে বুক স্টোর। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। ২·৭৫ পঃ।

আধুনিক কাব্য-রীতিতে নয়, সাবেক কাব্য-রীতিতেই এই বইটির প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করেছেন রচয়িতা। মহাভারতের দুটি বিশিষ্ট চরিত্র কর্ণ ও কুন্তী; এই দুই চরিত্রের তাৎপর্য, মাহাত্ম্য, ও অনন্যতা এখানে পরিস্ফুট। যাঁরা রামায়ণ মহাভারতের রস অন্যত্র, অন্য আধারে, অন্য ভঙ্গিতে পেলেও কৌতূহলী হবেন, উপভোগ করবেন, বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহারের 'কর্ণ-কুন্তী' নামক গ্রন্থটি তাঁদের তৃপ্তি দেবে। মহাভারতে কর্ণ একটি প্রধান চরিত্র, নারীচরিত্রে কুন্তীও এক বেদনাবিক্ষত কারুণ্য-প্রতীক—কাব্যাকারে, নাটকাকারে, যে-কোন মাধ্যমে তাঁদের নিয়ে শস্য ফলানো যায়। লেখকের প্রয়াস সেদিক থেকে সফল।

প্রাপ্তি স্বীকার

কনে দেখা আলো। বীরেশ্বর বসু। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন : ২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

মিথুন মহল। অরুণকান্তি সাহা। উমেশ প্রকাশ : ১৭৩ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য ৪·০০।

বিপ্রলব্ধ। বিনয় চৌধুরী। শ্রীমতী কনক দেবী : ৭।৪ বনমালী ঘোষাল লেন, কলিকাতা-৩৪। মূল্য ১০·০০।

বাঙলার লৌকিক দেবতা। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৬·০০।

বিবাহ। জীবনকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। উমেশ প্রকাশ : ১৭৩ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। মূল্য ৬·০০।

রঙ্গজগৎ

রূপছায়া চিত্রর "খেয়া" (পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) ছবির একটি দৃশ্যে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। বিদেশী মুদ্রাও আসছে। কিন্তু বিদেশে ভারতের ছায়াছবির ব্যবসা-ক্ষেত্র যতটা বিস্তৃত হতে পারত, ততটা হয়নি। অনেকেই বলেন, এর মূলে রয়েছে ঔদাসীন্য ও উদ্যোগের অভাব। কোন তরফের বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকার উভয়েই সমান দায়ী। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, যে দেশ থেকে আমরা খুব বেশী ছবি আমদানি করি সে দেশেই সব-চাইতে কম সংখ্যক ছবি পাঠানো হয়।

কেউ কেউ বলেন, বাইরে ভারতীয় ছবির ব্যবসার পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এ দেশের চলচ্চিত্রের ভিন্ন ঐতিহ্য ও প্রমোদ-উপকরণ। ভারতীয় ছবিতে বহুজনের মনোরঞ্জনের বহুবিধ ব্যবস্থা থাকে, যার আকর্ষণ এ দেশেই সীমাবদ্ধ। তাই বিদেশী-দের কাছে ভারতের চলচ্চিত্রের আবেদনও সামান্য।

অপর দিকে, বিদেশী দর্শকের রুচির প্রতি নজর রেখে ছবি তৈরিরও বিপদ আছে। তা হলে স্বদেশে ছবি চলা কঠিন হবে। দুই দিক কীভাবে রক্ষা করা যায় সেটাই এখন বিবেচ্য। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী সাহায্য করতে পারেন সরকার। কোন্ ফেস্টিভ্যালে কী ধরনের ছবি পাঠানো দরকার সে বিষয়ে সরকারকে অবহিত হতে হবে। বিদেশে ওইসব ছবির প্রচার যাতে সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা মঞ্জুর করা উচিত। এবং ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও সরকার প্রযোজকদের সাহায্য করতে পারেন। এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের প্রযোজকরা বিদেশে ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে নাকি প্রায়শই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতাবাসের সহ-যোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। ভারত সরকারের বিদেশস্থ প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে প্রযোজক-দের সাহায্য করলে সমস্যা সমাধানের পথ অনেকটা উন্মুক্ত হতে পারে।

জাঁ কক্তোর "অরফী"

জাঁ কক্তোর "অরফী" শেষ পর্যন্ত কলকাতায় দেখানো হল। ছবিটির প্রতীক্ষায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের হয়ত আনন্দের অবধি ছিল না। ছবিটা দেখে কিছুটা উদ্দীপ্ত, কিছুটা আশাহত হয়েছি। "অরফী"-তে গ্রীক পৌরাণিক

রঙমহল ফোনঃ ৫৫—১৬১৯

প্রতি বৃহ ও শনি ঃ ৬॥
রবি ও ছুটির দিন ঃ ৩—৬॥
রোমাঞ্চকর হাসির নাটক।
বিধায়ক ভট্টাচার্যের

অতএব

ঃ পরিচালনাঃ
॥ হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায় ॥
শ্রেঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ জহর রায় ॥
হরিধন ॥ অজিত চট্টোঃ ॥ অজয় গাংগুলী ॥
মৃণাল মুখোঃ ॥ মিণ্টু চক্রবর্তী ॥
দীপিকা দাস ও সরযূবালা ॥
— অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন —

বিশ্বরূপা

বৃহস্পতিবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়

"বনফুল"-এর "ত্রিবর্ণ" উপন্যাস অবলম্বনে
নাটক ও পরিচালনা — রাসবিহারী সরকার
(ভূমিকালিপি পূর্ববৎ)
বিঃ দ্রঃ বর্তমানে নাটকটি বহুবিধ দৃশ্যপটসহ
বর্ণবৈচিত্র্যসম্পন্ন এক চমকপ্রদ নূতন
নাট্যপ্রথায় অভিনীত হচ্ছে॥

[শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

ষ্টারে নূতন নাটক

তাপসী

ঃ রচনা ও পরিচালনা ঃ
দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক ঃ অনিল বসু
সুরকার ঃ কালীপদ সেন
গীতিকার ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
* * * *
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ঃ ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ঃ ৩টা ও ৬॥টায়
* * * *
—ঃ রূপায়ণে ঃ—
কানু বন্দ্যো ॥ অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী
নীলিমা দাস ॥ সুব্রতা চট্টো ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস
সতীন্দ্র ভট্টা ॥ গীতা দে ॥ প্রেমাংশু বোস
শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর ॥ অশোকা দাশগুপ্তা
শৈলেন মুখো ॥ শিবেন বন্দ্যো ॥ আশা দেবী
অনুপকুমার ও ভানু বন্দ্যো

মুক্ত অঙ্গনে (৪৬-৫২৭৭)
চতুর্মুখ

অনেকের মৃত্যু
অনেকের মৃত্যু
অনেকের মৃত্যু

বৃহস্পতিবার/বাইশে ডিসে/ সন্ধ্যা সাতটা।
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে

(সি-২১২৯)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

মানিকতলা পুলের পাশে ফোন ৩৫-৩০১৮
বৃহ ও শনি ৬॥ রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥

এন্টনী কবিয়াল

শ্রেঃ জহর গাঙ্গুলী । মিহির ভট্টাচার্য । জীবেন
বোস । কালীপদ চক্রঃ । তরুণ মিত্র । কল্যাণী
ঘোষ । গীতা মুখার্জী । সাধনা রায়চৌধুরী ।
জয়নারায়ণ । পরিমল সেন । সমরকুমার ।
কেতকী দত্ত । রবিতারত (রূপকার) ।

(সি-২০৬৫)

শুভারম্ভ শুক্রবার ১৫ই ডিসেম্বর!
আপনার কল্পনাতীত একটি মিষ্টিমধুর প্রণয় চিত্র

Filmyug

আশা পারেখ · ধর্মেন্দ্র

আয়ে দিন বাহার কে

ইস্টম্যানকলার

প্রযোজনা জে ওমপ্রকাশ
পরিচালনা রঘুনাথ ঝালানী
সঙ্গীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

হিন্দ ঃ কৃষ্ণা ঃ মেনকা ঃ খান্না ঃ কালি...

ইন্টালী অজন্তা (বেহালা) খাতুনমহল (মেটিয়াবুরুজ) রিজেন্ট (কাশীপুর) অলকা (শিবপুর) নিশাত (সালকিয়া)
শান্তি (কদমতলা) সন্ধ্যা (খড়দহ) বিভা (বেলঘরিয়া) রামকৃষ্ণ (নৈহাটি) জয়ন্তী (রিষড়া) স্বপ্না (চন্দননগর)
কৈরী (চুঁচুড়া) ও অন্যত্র

"আয়ে দিন বাহারকে" (পরিচালনা : রঘুনাথ ঝালানী) ছবিতে ধর্মেন্দ্র ও আশা পারেখ—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

কাহিনী এ কালের পটভূমিতে বিন্যস্ত। ভূমিকায় বলা হয়েছে, এ ধরনের রূপকথার কোন বিশেষ স্থান-কাল নেই; কাহিনী কোন বিশেষ যুগের নয়, "এগনেস"।

"অরফী"তে ককতো দার্শনিকের ভূমিকা নিয়েছেন। এবং তাঁর এই ছবি দেখে মনে হয়েছে, চলচ্চিত্রকে তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তার একটি প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবেই ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ "অরফী" চলচ্চিত্রের শিল্পরীতি অর্থাৎ, এক কথায়, আর্ট-ফর্মের দিক থেকে কোন বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেনি। বক্তব্য ও ভাবনার এই চিত্র আমাদের বুদ্ধিকে সতেজ করে তুলেছে। জীবন-মৃত্যু কাহিনীতে একাকার। এই দুই বিপরীত সত্যের সীমারেখায় মানুষের চেতন-অবচেতন বাসনা ও উচ্চাশা বিশ্লেষিত। কবির মৃত্যুপ্রেমের (অরফীর নায়ক অরফিয়স কবি) কথা আমরা কবিতায় পড়ি। ছবিতেও দেখলাম। এখানেই "অরফী"-র প্রকৃত পরিচয়।

পরিবেশ, কবিদের কাফে ও সেখানে হাঙ্গামা, কবির বিবাহিত জীবনের প্রেম ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে ককতোর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় মেলে। কিন্তু "অরফী"-তে ককতোর চিন্তা ও মনন এত বেশী থাকা সত্ত্বেও ছবিটি দেখে এমন শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হয় কেন? কবি, কবিপত্নী কিংবা মৃত্যুর প্রতিনিধি সেই কাল্পনিক রমণীর মনের নিঃসঙ্গতা কি ককতোর বিশ্লেষণের বস্তু ছিল? কিন্তু এই একাকিত্বেও তো আমাদের মন ভরল না।

ফ্রাঁসোয়া রাইখেনবাখের "বক্সারস হার্ট"-এ ক্যামেরার ভাষা লক্ষণীয়। সেদিক থেকে "বক্সারস হার্ট" একটি আধুনিক চলচ্চিত্র। বক্সার যখন জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করতে পেরেছে তখনই ছবি শেষ। এই জ্ঞানগর্ভ বাণীর জন্য এত বড় ছবির কী দরকার ছিল! তবে একজন বক্সারের মনোবিশ্লেষণ, কেমন করে জয়লাভের জন্য সে তৈরী হয়, কী তার সাধনা ইত্যাদির একটি প্রামাণ্য রূপ ছবিতে দেখা যায়।

জাঁ লিগোর লাতালান্তি-এ পরিচালকের আপসহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অকালমৃত্যু না ঘটলে তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।

গত সপ্তাহে তিনটি নতুন ছবির কাজ শুরু হল। একটি অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের "আরোগ্য নিকেতন"। ইতিপূর্বে মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনী। ছবিটি পরিচালনা করবেন বিজয় বসু। রবীন্দ্রনাথের "জীবন যখন শুকায়ে যায়" গানটি গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আর একটি গান রেকর্ড করা হল। গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়েই ছবির শুভ-সূচনা। ছবির সংগীত পরিচালক রথীন চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক বিজয় বসু জানালেন, ছবির সব শিল্পী নির্বাচন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। তবে বিকাশ রায় ও ছায়া দেবী ছবিতে অভিনয় করবেন।

আপনার বাড়িতে কে-কে আছেন?
আমি বিয়ে করিনি।

বাঃ, আমি কি তাই বলেছি
না, ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখলাম।

সামান্য এই কয়টি কথার মধ্য দিয়েই "কখনো মেঘ"-এর মহরত দৃশ্য নেওয়া হল। নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক দুজনই ছিলেন মহরতের শিল্পী। প্রশান্ত দেবের কাহিনী নিয়ে ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত। বিভূতি লাহা ছবির প্রযোজক। সুরররচনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। বঙ্কিম ঘোষ, কানু মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্যান্য প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে।

অলকানন্দা এণ্টারপ্রাইজ-এর "ফিরে চল" (পরিচালনা : অতনুকুমার) ছবিতে সবিতা বসু ও অতনুকুমার—এ-সপ্তাহে ছবির শুভমুক্তি

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে "নল-দময়ন্তী" ছবির কাজ আরম্ভ হল গান রেকর্ডিং-এর ভিতর দিয়ে। গান গাইলেন মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেনের সুরে।

ডালটনগঞ্জে "পঞ্চশর"-এর কিছু রোমান্টিক দৃশ্য গ্রহণ করে পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা তাঁর ইউনিট নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। দৃশ্যগুলি তোলা হল রুমা গুহঠাকুরতা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। সম্প্রতি কোন ছবিরই আউটডোরের কাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন সম্পূর্ণ হতে পারে নি। "খেয়া" এবং "প্রস্তর-স্বাক্ষর"-এর আউটডোর শুটিং অসমাপ্ত রেখেই যথাক্রমে পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও সলিল দত্ত কলকাতায় ফিরে এসেছেন। "খেয়া"-র যে কয়টি দৃশ্য তোলা হয়েছে তাতে ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার প্রভৃতি। খেয়া নৌকোর মাঝি সেজেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

গীতবিতান-এর রজতজয়ন্তী উৎসব

রবীন্দ্রসংগীত চর্চার বিশিষ্ট শিক্ষায়তন গীতবিতান-এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল গত সপ্তাহে, রবীন্দ্র সদনে। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি রবীন্দ্রসংগীতের প্রসারের ক্ষেত্রে গীতবিতান-এর বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

গীতবিতান-এর সভাপতি এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন, রবীন্দ্রনাথের গানের অনুশীলন সর্বত্র। এবং রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার মূলে গীতবিতান-এর দান অস্বীকার করা যায় না। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রসংগীত চর্চার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের গানের উৎকর্ষ বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হবেন। তিনি অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান।

৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আট ঘটিকায় রজতজয়ন্তী উৎসব শুরু হয়। গীতবিতানের ছাত্র-ছাত্রীরা বেদগান (সংগচ্ছধ্বং) ও পরে সম্মেলক রবীন্দ্রসংগীত (আনন্দধ্বনি জাগাও) গেয়ে শোনান। তারপর সভার অন্যান্য কর্মসূচী পালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত এক শুভেচ্ছাবাণীতে বলেন, শুধু সুর ও ভাবের মাধুর্য নয়, গুরুদেবের রচনার মানবতাবোধ এবং গভীরতাই এই গানকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির তরফ থেকেও এক শুভেচ্ছাবাণী আসে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর বাণীতে বলেন, 'গীতবিতান' রবীন্দ্র ভাবধারা প্রচারে সাহায্য করেছে। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও শুভেচ্ছা পাঠান। গীতবিতানের অধিকর্তা শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি সভাপতির নিকট গীতবিতানের দীর্ঘায়ু কামনা করে এক বাণী প্রেরণ করেন।

গীতবিতানের উদ্দেশ্য, কৃতিত্ব ও লক্ষ্যের কথা বলেন শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার। শ্রীনীহারবিন্দু সেন গীতবিতানের পুরনো দিনের কথা বর্ণনা করেন। মাঙ্গলিকী পাঠ করেন ডঃ সরোজকুমার দাস। পঁচিশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের যাঁরা সূচনা করেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক বসু ছাড়া ছিলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীনীহারেন্দু সেন, শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী কনক বিশ্বাস (অরাক্ষ), শ্রীসৌমেন্দু গোস্বামী প্রভৃতি।

গত ১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী গীতবিতানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন। অল্পজন শিক্ষার্থী নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, বর্তমানে বিভিন্ন শাখায় তার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২২০০ জন। সভায় গীতবিতানের প্রথম যুগের কর্মী পরলোকগত সুজিতরঞ্জন রায়, প্রথম সভাপতি কালিদাস নাগ ও অন্যান্যদের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা হয়।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সদন মঞ্চেই 'কাল-মৃগয়া' অভিনীত হয়। গীতবিতান এই উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বিভিন্ন দিনে মঞ্চস্থ

"মায়ার খেলা"। নৃত্যনাট্যের পূর্বে সম্মেলক সংগীত ও আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফাদার দি ফাঁলো, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, এবং শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বিভিন্ন দিনে মূল্যবান ভাষণ দেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীরাজ-বাহাদুর "শাপমোচন" অভিনয়ের দিন উপস্থিত ছিলেন। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর শাস্ত্রীয় সংগীতের আসরের শিল্পী শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ আমীর খান, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও পণ্ডিত রবিশংকর। ৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসংগীতের আসরে শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমতী নীলিমা সেন, শ্রীমতী ঋতু গুহ, শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গান করেন।

শৌভনিক-এর নতুন নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'

'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর অসামান্য সাফল্যের পর শৌভনিক সম্প্রদায় এবার যে নাটক মঞ্চস্থ করছেন, তার নাম "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। (রতনকুমার ঘোষ)।

নববাধর্মী এই নাটকটি শীঘ্রই মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর নির্দেশনায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোক সম্পাতে, বিমল চক্রবর্তীর মঞ্চ-পরিকল্পনায় এবং দেবাশিস দাশগুপ্তের সুরারোপে অভিনীত হচ্ছে। অভিনয়ে আছেন অশোক মিত্র, নিমু ভৌমিক, কৃষ্ণ কুণ্ডু, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোপেন মুখোপাধ্যায়, শিবু মজুমদার, বিমল চক্রবর্তী, মনী দাস, সুকুমার ঘোষ, অমল মুখোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল সান্যাল, পাহাড়ীলাল মৈত্র, শচীনন্দন মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় আঢ্য, মানব মুখোপাধ্যায়, অসিত ঘোষ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপাল মুখোপাধ্যায়, অলকা পাল, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপা দত্ত, ছবি তালুকদার প্রভৃতি শিল্পীরা।

মহিলা শিল্পী মহল অভিনীত "কবি" দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে—নাটকের একটি দৃশ্যে মহিমা দেবী ও শিপ্রা মিত্র

প্রিয়া ফিল্মস-এর "হাটে বাজারে" (পরিচালনা : তপন সিংহ) ছবির ইনডোর শুটিং চলছে কলকাতায়—বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নায়িকা বৈজয়ন্তীমালাকে দেখা যাচ্ছে ফটো—দেশ

সুন্দরম-এর নাট্যোৎসব

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা সুন্দরম ডিসেম্বরের ১৮, ১৯, ২০, ২১ এই চার দিনব্যাপী এক মনোজ্ঞ নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা করেছেন। ১৮ই রবিবার সকাল দশটায় মুক্ত অঙ্গনে এই উৎসবের উদ্বোধন হচ্ছে বিমল করের বিখ্যাত গল্প 'জননী' এবং মনোজ মিত্রের 'মৃত্যুর চোখে জল' একাঙ্কটি নিয়ে। ১৯শে সোমবার সন্ধ্যায় মুক্ত অঙ্গনে 'কৃষ্ণচূড়ার মৃত্যু' নতুন নাটক। এই নাটকে অংশ গ্রহণ করবেন সুখ্যাত অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী কণিকা মজুমদার। ২০শে দুটি একাঙ্ক অভিনীত হবে—'পুরস্কার' এবং 'রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড', ২১শে উৎসবের শেষ দিনে জনপ্রিয় নাটক 'চার দেওয়ালের গল্প' অভিনীত হবে। সমগ্র নাট্যোৎসবটির নির্দেশকের দায়িত্ব পার্থপ্রতিম চৌধুরীর।

ছবির পর ছবি

মধুপ্রাণ ফিল্মস-এর হাসির ছবি "৮০তে আসিও না" কয়েক দিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে। শ্রী জ য় দ্র থ ৮০তে আসিও না পরিচালিত এ ছবির কাহিনীকার গৌ-র শী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, জহর রায়, কমল মিত্র, অসিতবরন, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায় প্রভৃতি। গোপেন মল্লিক সংগীত পরিচালক।

বি এম ডি মুভীজ-এর "জীবনমৃত্যু"র শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হীরেন নাগের পরিচালনায় ছবির জীবনমৃত্যু বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন প্রভৃতি। গোপেন মল্লিক ছবির সুরকার। কাহিনী ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের।

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ৮ ডিসেম্বর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেটের বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ' দশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হলো। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সকল বিভাগ বন্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অন্য কয়েকটি কলেজের ছাত্র বহিষ্কারের ব্যাপার নিয়ে পুরো তিন সপ্তাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাত্রদের পিকেটিং-এর ফলে সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পিকেটিং চলেছিল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হাত নেই। রেজিস্ট্রার বলেছেন যে, প্রশাসনিক, ছাত্র ভর্তি এবং ছাত্র বহিষ্কারের ব্যাপারে স্ট্যাটুট এবং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলির ওপর কোন কিছু করণীয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ খোলা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন তাঁরা তা প্রত্যাহার করেছেন।

দেশী সংবাদ—

৫ **ডিসেম্বর**—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন আজ লোকসভায় বলেন যে, উত্তরপ্রদেশের গো-হত্যা নিষেধ আইনটি শীঘ্রই দিল্লীতে প্রসারিত হবে। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে, গো-হত্যা নিষেধ সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশনামা রূপায়ণের জন্য সরকার 'জোর চেষ্টা' করবেন।

শ্রী এস কে পাতিল ও শ্রীস্বর্ণ সিং-সহ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনের জন্য শ্রীমধু লিমায়ের নেতৃত্বে বিরোধী সদস্যরা আজ লোকসভায় আবার নতুন করে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। অধ্যক্ষ শ্রীহুকুম সিং তাঁদের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

৬ **ডিসেম্বর**—শেষ পর্যন্ত বাম কমিউনিস্টরা নির্বাচনী ফ্রন্ট দাঁড় করাতে পেরেছেন। ছোট ও মাঝারি ছ'টি বিরোধী দল তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ফ্রন্টের নাম হচ্ছে সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট; লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠন।

আজ রাজ্যসভায় ১৯৬৬ সালের নিবারক নিরোধ বিলটি গৃহীত হলে সমগ্র বিরোধী দল প্রতিবাদস্বরূপ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। তাঁরা এটিকে কালা কানুন বলে অভিহিত করেন। এই বিল গৃহীত হওয়ায় নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আরও তিন বৎসর বেড়ে গেল।

৭ **ডিসেম্বর**—অতঃপর সরকারের বিনা অনুমতিতে রাজ্য সরকারের কর্মীরা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অফিস-ভবন, খোলা জায়গা, হল-ঘর প্রভৃতি স্থানে সভা-সমাবেশ করতে পারবেন না। "আপত্তিজনক লেখাযুক্ত" ব্যাজ পরিধানও নিষিদ্ধ।

জরুরী কাজকর্ম চালু রাখার আদেশ জারী করা সত্ত্বেও আজ উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারের শতকরা ৯০ জন কর্মচারী "অনির্দিষ্টকালের জন্য" ধর্মঘট করায় রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে।

৮ **ডিসেম্বর**—আজ অপরাহ্নে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্ অধ্যক্ষ দেবজ্যোতি বর্মন তাঁর মধ্যমগ্রামের বাসভবনে করোনারি থ্রম্বসিসে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬২ বছর বর্তমান। তিনি মৃত্যুদিন পর্যন্ত আনন্দমোহন কলেজের (সান্ধ্য বিভাগ) অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও সদস্য ছিলেন।

আজ মহাকরণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে পুলিস ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলে সেখানে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। ধৃত সহকর্মীদের মুক্তির দাবিতে কয়েক হাজার সরকারী কর্মচারী পুলিস বাহিনীকে ঘিরে দু' ঘণ্টাকাল অবস্থান করার পর ৪ জন কর্মীকে ব্যক্তিগত মুচলেখায় জামিনে মুক্তি দিলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

৯ **ডিসেম্বর**—রাইটার্স বিল্ডিং-এর আটজন সরকারী কর্মচারীকে আজ সাসপেনড করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে চারজনকে গতকাল পুলিস গ্রেফতার করে পরে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেয়। এই চারজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির চারটি ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীঅমৃতেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অন্য তিনজনকে ৪ লক্ষের বেশী সরকারী টাকা সম্পর্কে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গত শুক্রবার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী কে কে সেনগুপ্তের এজলাসে হাজির করা হয়। গত বুধবার কলকাতা গোয়েন্দা পুলিস আসামীদের গ্রেফতার করে।

আগের দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ছাত্রদের উপর পুলিসের লাঠি চারজ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ এবং সরকার কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণার ফলে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী একদল ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের তালা ভেঙে কেমিস্ট্রি লেবরেটরিতে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে দেয়।

১০ **ডিসেম্বর**—মজঃফরপুরে রামদয়ালু সিং কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আজ প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্য পুলিস ৪ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ওই কলেজের অধ্যাপক নিগমানন্দ কুমার ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং একজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হন।

সরকারের আদেশে আজ বিহারের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১১ **ডিসেম্বর**—ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরী আরমস, এইমস অ্যান্ড অ্যাসপেকটস নামে যে বই লেখেন, তা নিয়ে বাইরে সমালোচনা হলেও তার জের মিটে গিয়েছে। কিন্তু এ দেশের (বৃটিশ মালিকানাধীন) একটি সংবাদপত্রে সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে যে সাংবাদিকতা তিনি করেন, তার জের হিসাবে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দফতরকেও বেশ [illegible] নাড়া দিয়েছে।

বিশৃঙ্খল দেশকে উদ্ধারের জন্য [illegible] নির্বাচনের পর সব রাজনৈতিক দলের [illegible] নিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত। আজ নির্দলীয় ডেমোক্রেটিক কনভেনশন অব ইন্ডিয়ার সভায় সভাপতিত্ব করার সময় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রস্তাব করেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার বিদ্রোহী প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথ আজ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব-সম্বলিত খসড়া নথিটি অগ্রাহ্য করেছেন। রোডেশিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের জন্য জিবরালটারে সাম্প্রতিক আলোচনার পর এই নথিটি তৈরি হয়েছিল। ব্রিটেন রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

৬ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার স্মিথ সরকার আজ সরকারীভাবে এক বিবৃতিতে বলেছেন : ব্রিটেন চায় যে, আমরা তার কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করি। সেটা সম্ভব নয়। লন্ডন থেকে ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন।

৭ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা আরোপ করতে চাইলে, তা প্রয়োগ না করার জন্য রোডেশিয়া সরকার আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন। সাউথ আফ্রিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এ খবর দিয়েছেন।

৮ **ডিসেম্বর**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আরও কয়েকটি দেশ মহাকাশে পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধ করার বিষয়ে একটি চুক্তির খসড়া সম্পর্কে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন আজ টেক্সাসে এ কথা প্রকাশ করেন।

৯ **ডিসেম্বর**—রোডেশিয়ার অর্থনীতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন প্রায় ১২টি মূল পণ্যদ্রব্য রোডেশিয়া কর্তৃক আমদানির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য ব্রিটেন গতকাল স্বস্তি পরিষদকে অনুরোধ করেছে।

১০ **ডিসেম্বর**—শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্য রোডেশিয়ায় রফতানি নিষিদ্ধ করার যে প্রস্তাব ব্রিটেন তুলেছে, নিরাপত্তা পরিষদে জাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসাইমন এম কাপওয়েপওয়ে তা একেবারেই অকেজো বলে খারিজ করে দেন। পরিবর্তে তিনি রোডেশিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য-আমদানি ও রফতানি দুই-ই পুরোপুরি বন্ধ করার দাবি জানান।

১১ **ডিসেম্বর**—নেপোলিয়নের চুল নিয়ে অন্যত্র যে গবেষণা চলছে, তারই সহায়তায় কুওমিনটাং চীনের একজন বিজ্ঞানী আণবিক বিকিরণের মুখে আত্মরক্ষার উপযোগী একটি ঔষধ উৎপাদনের সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কার

টোকেন-এর
দরকার হয় না....

হয়রান হয়ে অপেক্ষা
করতে হয় না...

আপনার চেক সঙ্গে-সঙ্গেই
ক্যাশ হয়ে যায়
আমাদের চমৎকার
টেলার সিস্টেমে
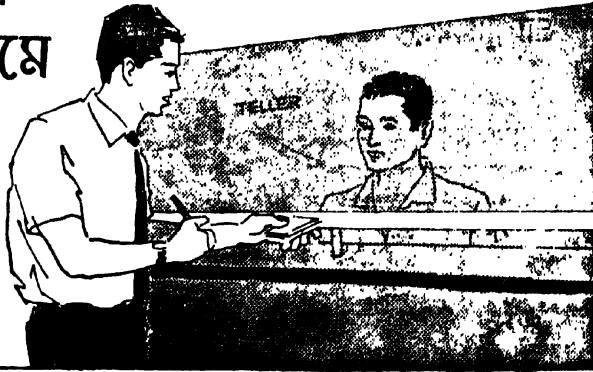
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

উৎপাদন বৃদ্ধি—আত্মনির্ভরতার একমাত্র উপায়।

REGD. NO. C2109

কেন আমাকে দিয়ে
রান্না করবেন,
জানেন তো ?

১ আমি প্রথম শ্রেণীর
ঝাড়াই ও বাছাই
মশলায় প্রস্তুত

২ আমি সময়, পরিশ্রম
ও অপচয় বাঁচাই

৩ আমি বৈজ্ঞানিক প্রথায়
সর্ব্বাধুনিক মেশিনে
প্রস্তুত এবং নির্ভেজাল

৪ আমাকে শিশু ও রুগীর
পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহার
করতে পারবেন

৫ আমি রান্নার
স্বাদ বৃদ্ধি করি

২৩১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭, ফোন ৩৩-১১৩২, গ্রাম-"স্পাইস মার্ট"

মিল-কাশীপুর
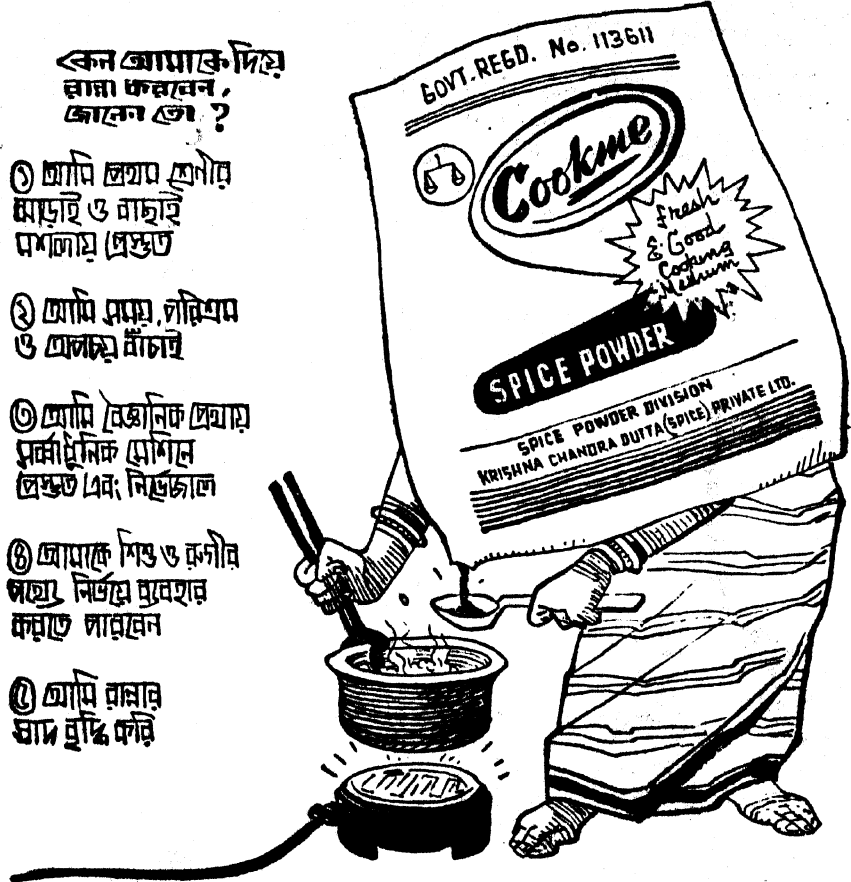
নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত
'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২০ বছরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।
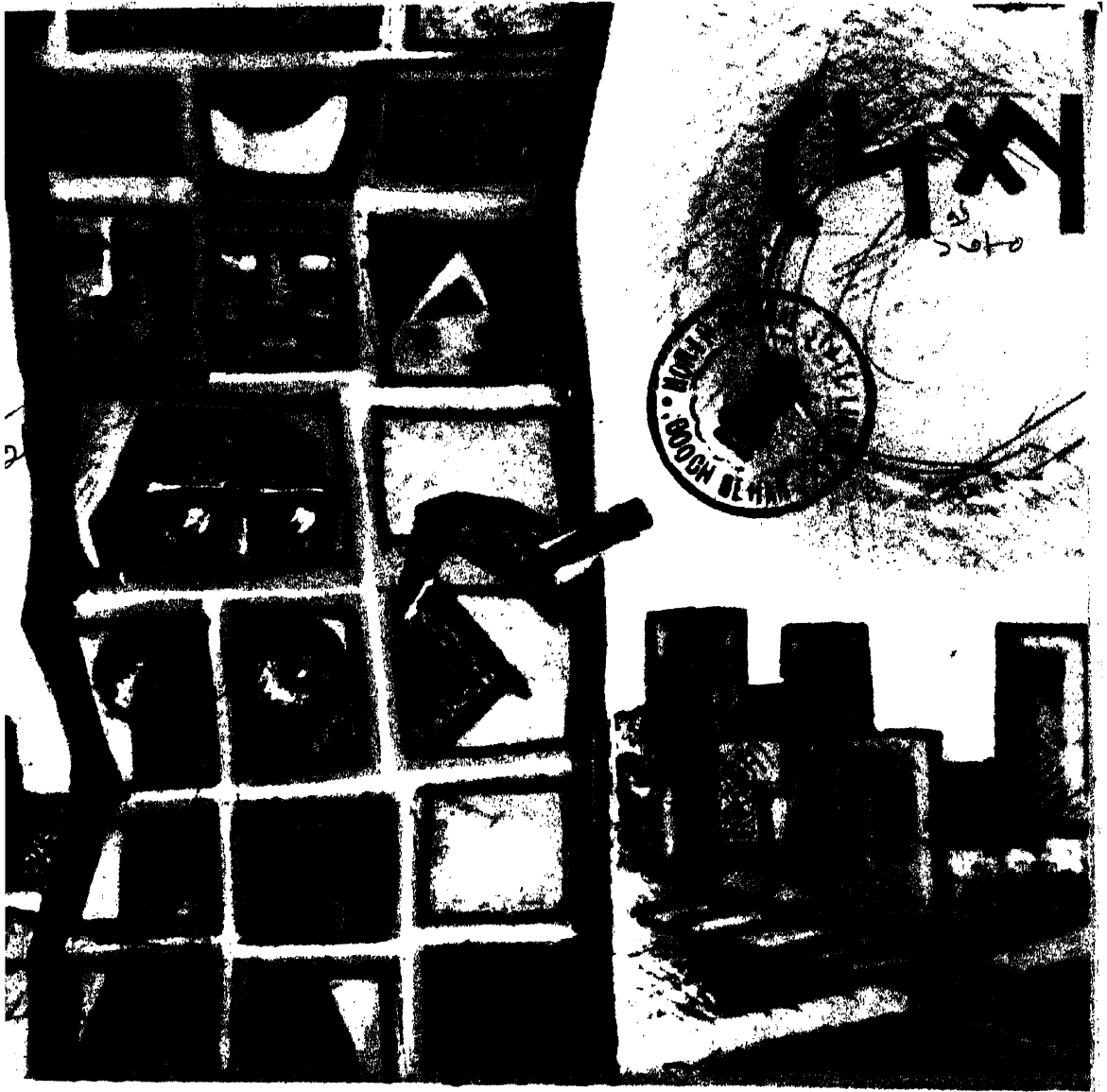
] শনিবার, ১৪ পৌষ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 29th December, 1973 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ৯

শ্রেষ্ঠ লেখক ও শ্রেষ্ঠ রচনা

প্রমথনাথ বিশীর
পূর্ণাবতার ১১৲
লালকেল্লা ১৮৲

জরাসন্ধের
নিঃসঙ্গ পথিক ১০৲
লৌহকপাট ২০৲

শংকরের
সীমাবদ্ধ ৬৲
স্থানীয় সংবাদ ৬৲

বিমল মিত্রের
আসামী হাজির তৃতীয় মুদ্রণ প্রথম—১৫৲ দ্বিতীয়—১৫৲
বেনারসী ৬৲
সন্ত্রী ৬৲

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ১৮৲

তারাশঙ্কর রচনাবলী ৫ম খণ্ড — ১৭৲ ৬ষ্ঠ খণ্ড — ১৭৲

বিভূতি রচনাবলী ২য়—৬ষ্ঠ খণ্ড প্রতিটি ১৮৲ ৭ম—১২শ খণ্ড প্রতিটি ১৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অশান্ত ঘূর্ণী ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
শতরূপে দেখা ১৭৲
নগরপারে রূপনগর ১৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর
প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৮৲
সুবর্ণলতা ১৩৲

অবধূতের
নীলকন্ঠ হিমালয় ৯৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম—১০৲ ২য়—১০৲
অবধূত ও যোগীসঙ্গ ৯৲

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের
পুণ্যতীর্থ ভারত

স্বামী জগন্নাথানন্দের
শ্রী'ম' কথা ১০৲

গজেন্দ্র মিত্রের
উপকণ্ঠে ১০৲

পেপার ব্যাক ক্লাসিকস্

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৪৲

বিভূতিভূষণের
পথের পাঁচালী (যন্ত্রস্থ)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ৪৲

বনফুলের
স্থবির ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
কেরীসাহেবের মুন্সী ৬৲

প্রবোধ সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৩৷৷

অন্নদাশংকর রায়ের
পথে প্রবাসে ৩৲

মিত্র-ঘোষ বাংলা পকেট বই ৩৫খানি বই প্রকাশিত হয়েছে

ভাল ছাপা : বহুবর্ণের মলাট : নূতন বই : নামকরা লেখক : প্রত্যেকটি—২৲ টাকা
ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাড়ির সকলের
স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে
উপকারী খাবারই
দেওয়া উচিত

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

গ্রাহকদের জন্যে এমন অবিশ্বাস্য উপহার এক হেলেন্‌ কার্টিসই
দিয়ে থাকে। অল্প বাড়তি দিয়ে
পুরো শতকরা ১০০% ভাগ! অভাবনীয়!
উদার হস্তে মুখে মাখুন মোনার্কের পুরুষোচিত
'সতেজতা! প্রতিবার কামানোর পর··· দিনের পর দিন!

মোনার্ক

যথার্থই রাজকীয় আফটার শেভ লোশন
ভারতে তৈরী করেন—
জে.কে. হেলেন কার্টিস লিমিটেড, বোম্বে-১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুরেন দে

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯

শনিবার ১৪ পৌষ ১৩৮০

Saturday 29 December 1973

কয়লার সমস্যা

কয়লাখনি জাতীয়করণের পর থেকে যে অ-ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, আর পাঁচটা স্থায়ী সমস্যার মতন কয়লাও একটা সমস্যা হয়ে থাকল। দেশের নানা জায়গায় এই সমস্যা ক্রমশই স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সে সংকট আরও ভয়াবহ। কয়লার অভাবে শিল্প এলাকায় হাহাকার উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলকাতা এবং আশপাশের শিল্পাঞ্চলের কথা ধরা যেতে পারে। আমাদের বিদ্যুতে উৎপাদন কয়লা-নির্ভর, কল-কারখানাতেও কয়লার চাহিদা কম নয়। অথচ কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শোচনীয়ভাবে কমে যাচ্ছে, কল-কারখানার কাজকর্ম বন্ধ থাকছে। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন নাকি ইদানীং তাঁদের চাহিদা মতন প্রাত্যহিক কয়লার যোগানও পাচ্ছেন না, ফলে পাওয়ার হাউসের উৎপাদন কমছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তাঁদের ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও কয়লার অভাবে উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্গাপুর প্রজেক্টেরও নানা সমস্যা। বিদ্যুতের অভাব শহরবাসীকে যতই কষ্ট দিক না কেন তবু শীতের দিনে তা হয়ত অসহ্য নয়। শিল্পাঞ্চলে এই অভাব ক্রমাগত উৎপাদন যেভাবে হ্রাস করে চলেছে তার উপায় কি হবে! আমাদের মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শিল্পই কয়লা-ভিত্তিক। কাজেই কয়লার চাহিদা মেটাতে না পারলে নানা ধরনের শিল্প ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে। সে সমস্যা এখন যা আছে তার চেয়েও তীব্র হবে।

পশ্চিমবঙ্গে কয়লাখনি কিছু কম নাই। আসানসোল রাণীগঞ্জ কয়লাখনিকে বেড় দিয়ে যে শিল্পাঞ্চল কলকাতা তার থেকে বেশী দূরে পড়ে না। তবে কেন এই অভাব? অভিজ্ঞ-মহল বলেন, জাতীয়করণের পর থেকে খনি থেকে কয়লা ওঠানো কমে গেছে, সরবরাহ ব্যবস্থায় শৈথিল্য ও হয়রানি বেড়েছে, সরকারী নিয়মের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারগুলি মানতে গিয়ে সরবরাহে বিলম্ব ঘটছে। এর সঙ্গে ওয়াগন-এর অভাব। অবশ্য হালে ওয়াগনের অভাব ঘটবার কারণ থাকলেও সেটা তো বরাবর ছিল না। যখন অঢেল মালগাড়ি পাওয়া গেছে তখনও কি সরবরাহ নিয়মিত ছিল?

সরকার কয়লাখনি হাতে নিয়েছেন, শ্রমিকের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে বই কমে নি (ভুয়ো শ্রমিকদের হিসেবের মধ্যে ধরে); তাহলে উৎপাদন কমছে কেন? তার কারণ কি এই যে, পরিচালনা ব্যবস্থায় যাদের হাত আছে তারা অকর্মণ্য? কিংবা যে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সত্য?

রাজ্য সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন যাতে বন্ধ না হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোল মাইনস অথরিটি এবং রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে, কয়লার প্রয়োজনীয় যোগান পাওয়া যাবে। সরকারী এবং বেসরকারী সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আপাতত কয়লা পাবেন।

আমরা সরকারী আশ্বাসে নির্ভর করে থাকতে পারি কি না জানি না—তবে মাসখানেক পরে যদি আবার এই সমস্যার কথা ওঠে তা হলেও বিস্মিত হব না। কেন না, কয়লার সমস্যা এই প্রথম নয়, এবং আশা করছি শেষও নয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, গার্হস্থ্য প্রয়োজনেও কয়লার সরবরাহ এখনও স্বাভাবিক হল না। চাহিদা যত সরবরাহ তত নয়। মাঝে মাঝেই দোকানে কয়লা থাকে না, এবং দামেরও কোনো সমতা নেই। সরকার এ-বিষয়ে কি করছেন তাও বুঝি না।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায়
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮২৫১

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৩৬.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ১৮.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৯.৫০

আসাম ও ত্রিপুরায়
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৪৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ২২.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ১১.৫০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৮৭.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৪৪.০০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ২২.০০
বিদেশে
(সাধারণ ডাকে)
বার্ষিক — টাঃ ৬০.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৩১.০০

লণ্ডন গ্রাহক বাবদ
বার্ষিক — টাঃ ১৭৪.০০
ষাণ্মাসিক — টাঃ ৮৭.৫০
ত্রৈমাসিক — টাঃ ৪৪.০০

নব বর্ষের উপহার

উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার নির্বাচন

উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে সারা ভারতে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। সম্ভবত, এই দুই রাজ্যে নির্বাচন হবে আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে।

এই দুটি রাজ্যের মধ্যে আবার উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল সমগ্র দেশের রাজনীতির পক্ষে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে, যাঁরা যে-কোনও-ভাবে তাঁর কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে চান, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাঁরা সবাই প্রস্তুত। তাঁদের হিসাবটা হল, যদি উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসকে হারানো যায় তা হলে তার ধাক্কা গিয়ে পড়বে দিল্লিতেও। এবং, সে ধাক্কাটা হবে প্রবল ধাক্কা। তখন শ্রীমতী গান্ধীর আসনকে দুর্বল করে দেওয়া, তাঁর কর্তৃত্বকে খর্ব করা হবে খুব সহজ ব্যাপার। এই হিসাবের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা যে-কোনও-ভাবে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে, কংগ্রেসকে হারাবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগেছেন।

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিও বেশ জটিল। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের নির্বাচনেই জাতপাতের প্রশ্ন ওঠে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনেও প্রশ্ন ওঠে, প্রার্থী প্রোটেস্টাণ্ট, না রোমান ক্যাথলিক। ভারতেরও বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে জাতপাতের প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে ভাষারও।

কিন্তু আমাদের দেশে এ সব জিনিস সবচেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে বোধ হয় হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে এবং দাক্ষিণাত্যে।

...জ্যোতিষী, ভাগ্যগণনাকারী, গণৎকার, মন্ত্রতন্ত্রকারী ও তন্ত্রমন্ত্রবাদী সব দলই এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন পুরোমাত্রায়।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে এবার এই ভয়ঙ্কর জিনিস যেন আরও বেশি করে আমদানি করার চেষ্টা চলছে। যাঁরা উত্তর-প্রদেশে কংগ্রেসকে পরাজিত করে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর কর্তৃত্ব খর্ব করতে চান তাঁরা সর্বপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিচ্ছেন। এই যে উত্তরপ্রদেশের কয়েকটা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল তারও মূলে আগামী নির্বাচন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সনের নির্বাচনের মুখে পশ্চিমবঙ্গেও ছোট আকারে এইরকম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আমদানি করা হয়েছিল। আর, শুধু যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তাই নয়, অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতাও আনা হয়। যেমন, জাঠ গোষ্ঠীর প্রশ্ন। জাঠদের মধ্যেও একেবারে আলাদা গোষ্ঠী-ভিত্তিক প্রচার চালানো হয়। বলা হয়, অন্যান্য গোষ্ঠীর সবাই জাঠদের শত্রু। সুতরাং, জাঠদের একত্র হয়ে ভোট দিতে হবে।

আগেই বলেছি, এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী প্রচার যে কোনও একটি দল চালান, তা নয়। চালান প্রায় প্রত্যেকটি দলই। একের সঙ্গে আরেকের প্রতিযোগিতা চলে এ ব্যাপারে।

এরা কিন্তু কেউই কোনও সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য এই কাজ করেন না। এই কাজ করেন শুধু ভোট পাওয়ার জন্য। এবং বস্তুত, এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে তাঁরা দেশের, সমাজের এবং আলাদা আলাদাভাবে সম্প্রদায়গুলিরও ক্ষতি করেন। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ভীষণভাবে তিক্ত করে তোলেন।

দুঃখের বিষয়, নির্বাচনে জয়ের অদম্য বাসনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। দলীয় লাভ-লোকসানের জন্য তাঁরা সমাজের ও দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি করেন।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে এবার চূড়ান্ত-ভাবে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করা হচ্ছে।

*

উড়িষ্যার নির্বাচনে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ঠিক ওভাবে আনা হচ্ছে না। কোনও দিনই তা হয় না। উড়িষ্যার নির্বাচনটা দাঁড়িয়েছে, নন্দিনী সতপথি বনাম উড়িষ্যার অন্য সব রাজনৈতিক নেতা। মোটামুটি সেইভাবেই এই নির্বাচন পরিচালিত হবে।

যদিও উড়িষ্যার নির্বাচনী ফলাফলকে ভিত্তি করে কিছু লোক সমগ্র পূর্বভারতের রাজনীতিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। তাঁদের হিসাবটা হল এইরকম : উড়িষ্যায় একটা কেন্দ্র-বিরোধী সরকার হবে। সেই সরকার রাজ্যের স্বাধিকারের দাবি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবে। তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পূর্ব ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যে এবং প্রত্যেক ভাবাভাবী লোকের মধ্যে... সংকীর্ণভাবাপন্ন... স্বাধিকারের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সব রাজ্যেই ভাঙাচোরা দেখা দেবে।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল এবং উড়িষ্যার নির্বাচনী ফলাফলকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। উত্তরপ্রদেশে যদি কংগ্রেসকে পরাজিত করে শ্রীমতী গান্ধীর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দেওয়া যায় তা হলে উড়িষ্যায় কেন্দ্র-বিরোধী সরকার গঠন করে সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যাবে। কারণ, তা হলে সেই কেন্দ্র-বিরোধী সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।

সেইজন্যই কিছু লোকের চেষ্টা, উত্তর-প্রদেশ এবং উড়িষ্যায় একই সঙ্গে কংগ্রেসকে পরাজিত করা। এবং, সেইভাবে গোটা ভারতে আবার একটা বড় রকমের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আসা।

দুঃখের বিষয়, দেশের বহু রাজনৈতিক নেতা এই দিকটার কথা জানেন না এবং তা ভেবে দেখার অবসরও তাঁদের নেই। যে-কোনওভাবে নির্বাচনে জয়লাভই তাঁদের উদ্দেশ্য।

*

শ্রীমতী গান্ধীও এই জিনিসটা বুঝেছেন। তাই প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, আগে উত্তর-প্রদেশের ব্যাপারটা সামলাতে। কারণ, তিনি জানেন, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস দলকে পরাজিত করতে না পারলে আপাতত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব কেউ খর্ব করতে পারবেন না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য, যে-কোনওভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে অটুট রাখা এবং দেশে বড় রকমের কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতা না আসতে দেওয়া।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল, বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর সঙ্গে যোগ্য লোকের একান্ত অভাব। যাঁরা তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁরা কেউ ছেলেখেলা করে, কেউ অস্বাভাবিক দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়ে, কেউ বা রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়ে, কেউ আবার স্রেফ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে বা ঝগড়াঝাটি করে কংগ্রেসকে অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধীকে বিপদে ফেলেছেন। এই সব কারণেই ১৯৭২ সনে দেশে যে রাজনৈতিক স্থিরতা এসেছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে নতুন উৎসাহের বন্যা এসেছে তার সুযোগও বহু রাজ্য কংগ্রেস সরকার নিতে পারেন নি।

এত বড় একটা দেশ, এত বৈচিত্র্য জটিল দেশ কখনও একজনের উপর ভরসা করে চলতে পারে না—যদি না রাজ্যে রাজ্যে, জেলায় জেলায় তাঁর সঙ্গে যোগ্য লোক থাকে।

১৭-১২-৭৩।

নবারুণ গুপ্ত

দেবব্রত

শেষ পর্ব

দুনিয়ার ইতিহাসে যে সব তারিখ ভোলা যায় না সেগুলো সবই আনন্দ কিংবা গৌরবের দিন নয়। ওদের মধ্যে এমন দিন বিস্তর আছে যেগুলো কান্নার আর বেদনার। এমনই একটা কালো দিন হচ্ছে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। সেদিন অ্যাডলফ হিটলারের হুমকিতে ঘাবড়ে গিয়ে ছাতা হাতে দৌড়ে এসেছিলেন জার্মানির মিউনিখ শহরে বিলেতের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সে ছাতা দিয়ে নাৎসিদের কবল থেকে ইউরোপের মাথা বাঁচাতে। ফ্রান্সের এদুয়ার দালাদিয়ে, ইটালির বেনিতো মুসোলিনি আর জার্মানির অ্যাডলফ হিটলারকে নিয়ে ঘটা করে একটা চার শক্তির বৈঠক বসিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন মহানন্দে মিউনিখ চুক্তি সই করে। সে চুক্তিতে যা চেয়েছিলেন হিটলার সে সবই চেম্বারলেন-দালাদিয়ে এক কথায় মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপকে তাঁরা বাঁচাতে পারেন নি, রুখতে পারেন নি নাৎসিবাদ-ফ্যাসিবাদকে। সুদেতেন এলাকার বাসিন্দারা জাতে জার্মান এই অজুহাতে হিটলারের হাতে এলাকাটা তুলে দিলেও হিটলার শান্ত হন নি।

জার্মানি একা নয়, চেকোস্লোভাকিয়ার নানা এলাকার ওপর দাবিদার ছিল আরও দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরি। অর্ধেক ত্যাগ করে সর্বনাশ এড়াবার চেষ্টায় তাদের দাবিও মেনে নিয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়া। সর্বনাশ কিন্তু এত করেও এড়ানো গেল না। ১৫ মার্চ ১৯৩৯ হিটলারি ফৌজ চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নিলে, মুছে দিল দুনিয়ার মানচিত্র থেকে সে দেশের নাম। কেমন করে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া চেকোস্লোভাকিয়া আবার জোড়া লাগলো সে অন্য ইতিহাস। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্বে মুক্তি পেল চেকোস্লোভাকিয়া—তার হারানো এলাকা জার্মানি, পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরির কাছ থেকে তাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো। যে দেশের জন্যে চেকোস্লোভাকিয়ার এই দুর্দশা যুদ্ধের পর সে-ও দুভাগ হয়ে গেল। পূব জার্মানিতে চেকোস্লোভাকিয়ার মতো চালু হলো কম্যুনিস্ট শাসন। কাজেই দু দেশের মধ্যে মিটমাট হতে দেরি হয়নি। কিন্তু মন-কষাকষি রয়ে গেলো পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে। আনুষ্ঠানিকভাবে মিউনিখ চুক্তি খারিজ করলো না পশ্চিম জার্মানি।

যতদিন খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা পশ্চিম জার্মানি শাসন করেছে ততদিন তাদের সঙ্গে প্রতিবেশী কম্যুনিস্টপন্থী দেশগুলোর মোটেই বনিবনা ছিল না।। দুনিয়াও তার ওপর বিরূপ ছিল, সেও ছিল দুনিয়ার ওপর। চেকোস্লোভাকিয়া-পোল্যান্ডের সঙ্গে তো তার সীমান্ত নিয়ে ঝগড়াই ছিল হাঙ্গেরি-বুলগেরিয়া-রুমানিয়া-যুগোস্লাভিয়া-আলবেনিয়া কারুর সঙ্গেই তার বনিবনা ছিল না; হৃদ্যতা দূরের কথা কূটনৈতিক সম্বন্ধ বলতেও কিছু ছিল না। আর পূব জার্মানি তো তার সৎভাই, তার সঙ্গে সমঝোতার কথাই ওঠে না। অবস্থাটা পালটেছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা গদি দখল করার পর তাদের নেতা ব্রান্ডটের চেষ্টায়। একটার পর একটা বেড়া ভেঙে তিনি কূটনীতির সম্পর্ক পাতিয়েছেন আলবেনিয়া ছাড়া সব কটা কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে মায় পূব জার্মানি পর্যন্ত। দু জার্মানি এখন পাকাপাকিভাবে আলাদা হয়ে গেছে। তাদের হাঁড়ি শুধু ভিন্ন নয় তাদের রূপান্তর ঘটেছে। একে অপরকে স্বীকৃতি তো দিয়েইছে দু জার্মানি এখন দুটো আলাদা রাষ্ট্র, তারা জাতিপুঞ্জের সদস্যও।

এর মূলে আছে পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর ব্রান্ডটের উদ্যোগ, উদ্যম আর অধ্যবসায়। তাঁর পূবালী নীতির শুরু উনসত্তরের অক্টোবরে যখন তিনি প্রথম গদিতে বসেন। সে নীতি গোড়ায় তাঁর দলের সবাই খোলা মনে মেনে নিতে চায়নি। ব্রান্ডট কিন্তু হাল ছাড়েননি। সবাইকে বোঝাবার জন্যে সমানে চেষ্টা করে গেছেন, ফলও পেয়েছেন। সত্তরের শেষাশেষি সই হলো রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি। তাতে পশ্চিম জার্মানি অঙ্গীকার করলে কোনও ব্যাপারের ফয়সালার জন্যে লড়াইয়ে নামবে না, সব ব্যাপারের ফয়সালা হবে আলাপ আলোচনা করে বৈঠকে বসে, ধীরসুস্থে, ইউরোপের সব দেশের মহাযুদ্ধের পর নতুন সীমান্তও সে মেনে নিলে, মায় পোল্যান্ডের সঙ্গে ওডের-নাইসে সীমান্ত পর্যন্ত। এর পর পোল্যান্ডের সঙ্গেও চুক্তি সই করার কোনও বাধাই আর রইলো না। যুগোস্লাভিয়া আর রুমানিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধা আগেই হয়ে গিয়েছে। আলবেনিয়া কম্যুনিস্ট দেশ ছাড়া আর কাউকে আমল দেয় না বলেই। বাকী চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরি।

বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরি পণ করেছিল চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে চুক্তি হলেই তারাও দলে ভিড়ে পড়বে। কিন্তু যতদিন সে চুক্তি সই না হচ্ছে ততদিন তারাও পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে হাত মেলাবে না। চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে মিটমাটের পালা সাঙ্গ হয়েছে ১১ ডিসেম্বর। সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরিরও আপত্তি ঘুচেছে। পর্দাও পড়েছে পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো মিউনিখ চুক্তির আর পঞ্চাশ মাসের ব্রান্ডটের পূবালী নীতির ওপর। তবে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন পশ্চিম জার্মানির নবনায়ক চ্যান্সেলর ব্রান্ডট। দেশে-বিদেশে কম ঝক্কি তাঁকে পোয়াতে হয়নি। তাঁর নিজের দেশে তো বটেই তাঁর নিজের দলেও সবাই তাঁর নীতিকে স্বাগত জানায় নি। অনেক অসুবিধের মধ্যে দিয়ে তাঁকে এগুতে হয়েছে খুব সন্তর্পণে, শেষ মুহূর্তে অনেক বাধা তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছে যা দূর করতে তিনি হিমসিম খেয়ে গেছেন। এমনও কখনও কখনও মনে হয়েছে তাঁর গদিটিই বুঝি যায়, বুঝি পূব-পশ্চিমের মেলবন্ধ নয় তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ভেস্তে যাবে শেষ পর্যন্ত।

ঝামেলা বেধেছিল চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে চুক্তি নিয়েও। সে চুক্তি সই হবার কথা ৬ সেপ্টেম্বর। কিন্তু মতান্তর দেখা দিল চুক্তির বয়ান নিয়ে। চেকোস্লোভাকিয়া চেয়েছিল নতুন চুক্তিতে মিউনিখ চুক্তি শুধু বাতিল করে দেওয়াই হবে না সে চুক্তি যে গোড়া থেকেই অসিদ্ধ এটাও কবুল করতে হবে। পশ্চিম জার্মানির তাতে নীতিগত আপত্তি। কেননা, ও কথা কবুল করলে অনেক আইনগত ফাঁসাদ দেখা দেবার সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হলো পারস্পরিক [illegible] এটুকুই যথেষ্ট। গোল কিন্তু এতেও মিটলো না। ফ্যাকড়া উঠলো পশ্চিম বার্লিনকে নিয়ে। সেটা যে পশ্চিম জার্মানির এলাকা নথিপত্রে তা মেনে নিতে চেকোস্লোভাকিয়া নারাজ। শেষ পর্যন্ত চুক্তিতে ও কথাটা পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয়েছে। পশ্চিম জার্মানির অনেকেই এ সব আপসকে গোঁজামিল মনে করে অখুশী যদিও হাজার হাজার জার্মান ওই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিরে আসবে সে দেশে। যাই হোক, মিটমাট যে হয়েছে সেটাই বড় কথা। তার জন্য বাহবা দিতে হয় চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডটকে। এ যুগের একটা চরম কেলেঙ্কারি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, কলঙ্কের পসরা নামিয়ে দিয়েছেন নিজের জাতের মাথার ওপর থেকে।

সুখের খোঁজে

তুলসী সেনগুপ্ত

মেটে রং-এর আকাশটা ক্রমশ ফিকে
য় যেতে লাগল। তখনও গঙ্গার দুপাশের
কিছু কেমন যেন রহস্যময়ীর মত
মটা টেনে রয়েছে। পাড়ে জলের ছলাৎ
াৎ শব্দ। এই বুঝি পাখ-পাখালির ঘুম
ঙলো। জ্বালা করছিল চোখ দুটো
তুর। নিবু নিবু চিতার ধোঁয়া নৃত্যের
ঙ্গীতে পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে।
শানের লোকজনের দিকে চোখ গেল
তুর: দেখলো সবাই কেমন ক্লান্ত,
দ্রাচ্ছন্ন। বড় করে হাই তুলল সে। দেখল,
মনে ঘণ্টু বড় একখানা বাঁশ হাতে
য়ে ছোট্ট হয়ে আসা মা-র শরীরটাকে
য়ে কী ভীষণ এক খেলায় মেতে উঠেছে।
বালেশহীন মুখচোখে ঘণ্টুকে প্রেত-
াকের অধিবাসী বলে মনে হতে লাগল
সময় ওর। পোড়া কাঠের টুকরোগুলো
ছিয়ে গুছিয়ে মা-র দেহের অবশিষ্টাংশটা
জায়গায় জড়ো করে পকেট থেকে
ড়ি বের করল ঘণ্টু। জ্বলন্ত কাঠের
করো হাতে নিয়ে বিড়িটাকে দু ঠোঁটের
ঝে রেখে কেমন চোখে তাকাল নিতুর
কে। ঠিক সেই সময় জ্বলন্ত কাঠের
করোটাকে মুখের কাছে এনে বিড়ি
াল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ধীর মন্থর
য়ে নিতুর কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস
ল, 'ওরা সব কোথায় রে নিতু?'

নিক হাতের ইশারায় চায়ের দোকান
খিয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। ঘণ্টু
র দিকে চোখ রেখে বললে, 'চা খাবি?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল নিতু।

ঘণ্টু ওর মুখের দিকে চেয়ে ফ্যাকাশে
হাসবার চেষ্টা করল। 'ধুত্, তুই কী রে!
এটা শেষ হতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি।
এই নিয়ে আমার আটান্নটা হলো।'

ঘণ্টুর কথাগুলো কানে যেতেই শরীরটা
কেমন যেন ছমছম করে উঠলো নিতুর।
ওর দিকে তাকাতে কেমন যেন বাধো বাধো
ঠেকছিল সে সময়। কেমন ভয় ভয়ও। কিন্তু
কিছু বলার আগেই টের পেলো, ঘণ্টু ওর
একটা হাত ধরে টেনে তুলছে। ঘণ্টুর শিরা
বের করা ঝিরঝিরে চেহারা দেখে কখনও
মনেই হয় না, এত শক্তি ওর ওই হাত
দুখানাতে রয়েছে। হাতটা ব্যথায় টনটন
করে উঠল, নিতু না উঠে পারল না। ওকে
দাঁড়াতে দেখেই ঘণ্টু বলল, 'দ্যাখ নিতু,
তুই এমন ভাব করছিস যে মনে হয়......'

কথা শেষ করতে দিল না নিতু। প্রশ্ন
করে, 'কী মনে হয় রে?'

'কী আবার। মা-বাপ চিরকাল কি
কারো থাকে রে? চ', চা খাই।' শেষের
কথাগুলো পরম মমতায় বলে গেল ঘণ্টু।

ঠিক সেই সময় ওরা শুনতে পেলো,
শ্মশানের উত্তর দিক থেকে চিৎকার, চেঁচা-
মেচি, দুদ্দাড় দৌড়ের শব্দ। হাতটা ছেড়ে
দিয়ে এক লাফে সিঁড়ি ভিঙে নিচে নেমে
গেল ঘণ্টু। মুহূর্তকাল স্থির থেকে চিতার
গলগলে ধোঁয়ার দিকে চোখ মেলে তাকাল
নিতু। মা-র মুখটা ঠিক সেই সময় সে
স্পষ্ট দেখতে পেলো। মা—তার মা! বুকের
মাঝে একটা চাপ ব্যথা অনুভব করলে ও,
ডান হাত দিয়ে বুকের ওপর হাত বোলাতে
লাগল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় বুঝতে

পারল, মাথাটা ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। মনে পড়ল না, সারারাত এক বিন্দু জলও সে চোখে ফেলেনি। এই প্রথম ওর খেয়াল হল, আত্মীয়-বন্ধু যারা এসেছে, তাদের প্রতি যে তার একটা কর্তব্য আছে, তা ভুলেই গেছিল। এক জাতীয় গ্লানি সে সময় ওকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে লাগল। মা-র মুখটা অমন করে বারবার তার চোখের সামনে উঁকি মেরে যাচ্ছে কেন? সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরা, কপালে টকটকে গোলা সিঁদুর, হাতে পদ্ম-কাটা থালা, তার ওপর প্রসাদীফুল আর যৎসামান্য সাদা বাতাসা, গুঁজিয়া, কলা-আর পেয়ারার কুচি। ঘরে ঢুকে প্রসাদী ফুল কপালে ছুঁইয়ে মা বলতেন, 'নে পেসাদ নে নিতু।' এই সব কিছু এমন করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কেন তার কাছে? চোখ দুটো ভীষণ জ্বলতে থাকল। দু'চোখের সাদা জমিতে জল বর্ষাকালীন নদীর মত থই থই করতে লাগল। গলার কাছে, বুকের মাঝে কেমন যেন জোট তোলপাড় করছে। ঠিক সেই সময় ঘন্টু ফিরে এলো। ওর চোখে জল দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। মুখে হাসি নিয়ে বলে, 'জানিস নিতু, ওখানে না, মড়াটা টুইস্ট নাচ নাচছিল।'

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলো নিতু।

কেমন এক সুখের নেশায়, আত্মতৃপ্তির আনন্দে মশগুল হয়ে গিয়ে ঘন্টু বলে, 'শালার মানুষের কলকব্জাগুলো বড় তাজ্জব রে!'

ঘন্টুর কথা বলায় কান্না যেন সব কিছু ভুলিয়ে দিতে লাগল নিতুকে। ও অপলকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে।

ঘন্টু হাসতে হাসতে বলল, 'জানিস নিতু, এখানে যারা আসে, সব এক-একটি চিড়িয়া, বাঁচার পরে বাপকেও চেনে না।'

নিতু আস্তে গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিল রে ঘন্টু, ওখানে?'

ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ফেলল ঘন্টু ও কথায়। হাসতে হাসতে বলে 'হুঁ', চা খেতে খেতে শুনবি 'খন।'

শ্মশানের বাইরে পাতা ছোট্ট বেঞ্চিতে বসে ঘন্টু চায়ের অর্ডার দিল। পকেট থেকে বিড়ি বার করে নিতুর হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নে খা।'

হাত বাড়িয়ে বিড়ি নিল নিতু। তারপর এক সময় অপরাধীর মত গলা করে বলে, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে রে ঘন্টু?'

'কী হলো আবার?'

'সারা রাত্তির হীরু, ঘোতন আর মদনারা শুকনো মুখে রইল—ওদের কথা আমি একদম ভুলে গিছলাম।'

'সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। হীরু ঘোতন আর মদনা—শালারা এক নাম্বার...'

'হোক গে। তবু আমার তো একটা কর্তব্য আছে?'

'দুস শালা। তোর মা মরেছে, তোর আবার কর্তব্য কী রে। আর তা ছাড়া তুই তো আমাদের মত সেয়ানা খচ্চর হতে পারলি না, ভদ্দরলোক হয়ে রইলি......বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ঘন্টু।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আত্মতৃপ্তির শব্দ বের করল ঘন্টু মুখ দিয়ে। ভাঁড়টাকে বেঞ্চের একপাশে রেখে বিড়ি ধরিয়ে বলতে থাকে, 'জানিস নিতু, শ্মশানে আসতে আমার খুব ভাল্লাগে। তোর মা-কে নিয়ে এই আটান্ন মড়া পোড়ালাম। লোকে বলে শ'খানেক মড়া যে পোড়াতে পারে, তার কপালে অনেক সুখ। জানিস, এই যে তোর মা মরল না, এতে আমার দুঃখ নেই; যেই শুনলুম তোর মা মরেছে, অমনি কী বলবো তোকে, মনটা ভীষণ খুশী হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝেই মনে হয়, আমি শালা আগের জন্মে ডোম ছিলাম। বড় ভাল কাজ রে ডোমদের। সাধু-সন্ত চোর-জোচ্চর সব শালা ওদের হাতে। বল ঠিক বলেছি কী না বল?'

নিতু মাথা নাড়ায় সে কথায়। বলে 'হ্যাঁরে ঘন্টু, তুই কী বাকি জীবনটা এমনি করেই কাটিয়ে দিবি।' নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকল কথাগুলো। সে কথায় রাগ করল না ঘন্টু। উপরন্তু হো হো করে হেসে উঠল। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে দূরে রেল লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ভাঁড়টা।

মাথা গোঁজ করে বসে রইল নিতু। ধরা গলায় আস্তে আস্তে বলে, 'তুই ঠিক বলেছিস ঘন্টু; শ্মশান একটা তাজ্জব জায়গা।'

সে কথার [illegible] ঘণ্টু। [illegible] [illegible] ইচ্ছে করেই [illegible] ... ল, 'ওই [illegible] দেখেছিস, ওরা কোন [illegible] এসেছে এখানে। তাই [illegible] পেরে গিয়ে [illegible] করে রেছিল'।

'কই, আমার তো কোন ভয় করেনি?'

'করতো, যদি দেখতিস, তোর মা চিতার পর উঠে বসেছে কিংবা হাত-পা ওপরের কে তুলে দিচ্ছে......'। ভীষণ মজার একটা থা বলল যেন ঘণ্টু; এইভাবে খিলখিল রে হাসতে লাগল। হাসলে পর ওর চোখ টো, মুখটা ভূতের বইয়ের মলাটের মত য়ে ওঠে।

নিতু ওর কাঁধ ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি ল। ফলে, কেমন যেন ঘাবড়ে গেল ঘণ্টু, ্যাবলা চোখে সরাসরি ওর মুখের দিকে য়ে রইল।

নিতু শান্ত গলায় বলে, 'তুই মরামানুষ য়ে অমন করে কথা বলিস কেন ঘণ্টু?' কটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলতে থাকে তু, 'জানিস ঘণ্টু, মা বারবার আমার াথের সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী যেন ল্তে চায়, আমি ঠিক তা ধরতে পারি না'।

ঘণ্টু সে-কথার ভেতরে না গিয়ে বলে, লছিলাম না, মানুষের কলকব্জাগুলো ীষণ নড়বড়ে। কোন কোন সময় মরা-নুষের শিরেও টান লাগে আর তখন মরা-নুষও উঠে বসে, হাত-পা ছোড়ে। আর নাড়িরা তা দেখে ভাবে ভূত, ভয় পায়। ই নিয়ে আটামটা মড়া পোড়ালাম। আঃ— র বাকী বিয়াল্লিশটা। শালার শ'খানেক া পোড়াতে পারলে......আর মাত্তর য়াল্লিশটা'।

মনে মনে ভাবল নিতু, ঘণ্টু তোর মধ্যের ন যটা মরে গেছে......নইলে তুই অমন ষ্ঠুর উপায়ে সুখের সন্ধান করিস কেন? ন্তু সে ৫ সব কিছুই প্রকাশ করতে পারল । ভেতরে ভেতরে চূড়ান্ত এক অস্বস্তির ়ত বয়ে যেতে থাকল।

ঘণ্টু এবার দর্বাণ্ড থেকে উঠে দাঁড়াল। ল, 'চ ভেতরে যাই?'

'কিন্তু ওদের তো আর দেখছি না। াথায় গেল বল দেখি?'

'কোথায় আবার! ল্যাংটো সন্নেসীকে রে গাঁজায় দম দিচ্ছে দেখগে যা। শালার াতন আর মদনাকে তো চিনলি না'।

ঠিক সেই সময় খান কয়েক রিকশার শব্দে ছন ফিরে তাকাল ঘণ্টু। দেখাদেখি নিতুও রল। দেখল, রিকশাগুলোয় জোড়া জোড়া য়েছেলে। তা দেখে ঘণ্টু কেমন অদ্ভুত য়নায় চোখের মণি ঘোরাল। মুখ দিয়ে চুক শব্দ বের করে রহস্যময় চোখে কয়ে রইল নিতুর দিকে। ঘণ্টুর ও ধরনের চরণে নিতুর কেমন যেন ঘেন্না করত ল। সেই সময় ঘণ্টুর মুখটা কেমন [illegible] [illegible] হয়ে উঠল। [illegible] নিল নিতু। [illegible] [illegible] কানে [illegible] ঘণ্টু, আপন মনেই যেন বলল, 'জানিস, ওরা পাপ ধুতে এল, [illegible] গঙ্গায় পাপ বিসর্জন দিয়ে সতীলক্ষ্মী হয়ে ঘরে ফিরবে।' সে কথায় নিতু কোনই উত্তর করল না। নির্বাক বসে রইল। সময়ের পা দ্রুত সরে সরে যাচ্ছিল।

অস্ফুট স্বরে নিতুকে ডাকল ঘণ্টু, 'ওই দ্যাখ ঘোতন আর মদনার কাণ্ড দ্যাখ'।

প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও না দেখে পারলো-না নিতু। দেখল, ঘোতন হীরু আর মদন ওই রিকশাগুলোর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওই মেয়েগুলোর [illegible] কি যেন সব বলছে। মেয়েগুলো ওদের কথায় হাসতে হাসতে ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলে পর, ওরা [illegible] [illegible] [illegible] দিতে [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠলো, 'মেয়ে-মানুষের [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে যায় —[illegible] যেখানেই [illegible] মেয়েমানুষের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়'। ওদের উল্লাসেই কী না কে জানে, থক্ করে একদলা থুকলো থুতু মুখ থেকে উগরে ফেলল ঘণ্টু। ওরা আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকল না। ধীর পায়ে ওরা শ্মশানের ভেতরে ঢুকল।

নিতু আর ঘণ্টু ভেতরে এসে দেখল, ওদের চিতাটা প্রায় নিবু নিবু। তীক্ষ্ণ চোখে চিতা লক্ষ করতে থাকে ঘণ্টু। অদূরে গোল হয়ে বসে থাকা আত্মীয়স্বজনদের দিকে এগিয়ে গেল নিতু। ওকে চোখ তুলে দেখে, ফের কথায় ডুবে গেল ওরা। নিতু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে লাগল, একজন বলছেন

'তা শঙ্কর, তোমার ছেলেটা তো এবার হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করলো। কলেজে পড়াচ্ছ, না চাকরি-বাকরিতে লাগিয়ে দিয়েছ?

'চাকরি কোথায় যে ঢুকিয়ে দেবো'?

'তা ঠিক। আচ্ছা, ভুলু কবরেজের ছেলে কাশী তো এখন বিড়লানগরে, না হিন্দ মোটরে কাজ করছে; শুনেছি, ও নাকি বড় সাহেবের পি এ। সম্পর্কে ও তো তোমার এক রকমের দাদা হয়—ছেলেকে নিয়ে যাও না একদিন?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, ইণ্টারভিউ একটা দিয়েছে, খবর আসেনি এখনও'।

'আঃ। খবরটা জোগাড় করার জন্য না হয় আর একবার গেলে......'।

'হ্যাঁ, এখন থেকে ফিরে বিশ্রাম-টিশ্রাম করে বিকেল নাগাদ যাবো ভাবছি......'

নিতু সরে এল ওখান থেকে। ঘণ্টুর পাশে এসে বসল। ঘণ্টু একবার ওকে দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ছেলে-বউ, চাকরি-বাকরি এই সব কথাই হচ্ছে না রে? শালার এখানে যেন কারো কিছুই করার নেই। নেহাতই দায়, তাই আসা। সব শালা সুখ খুঁজছে। আর দ্যাখ, এদিকে যে চিতাটা নিবতে বসেছে, তা বাবুদের কারুরই খেয়াল নেই। কার বাড়ির বউ কি করলো, কার মেয়ে কোথায় বিয়ে করছে, সব ব্যাটাই কেমন ধান্দা বাজিতে মেতে রয়েছে......কী বলবো তোকে, ঘেন্না ধরে গেছে সব দেখে। ছ্যা ছ্যা।' কথা শেষ করেই ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা প্যাকাটি কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘণ্টু।
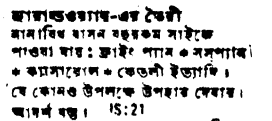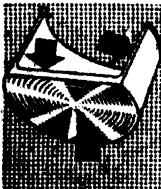
তাই দেখে নিতু শুধোয়, 'হ্যাঁ রে, আর কচু প্যাকাটি নিয়ে আসবো?'

'কেন? ওই শালাদের পুড়িয়ে মারবি নাকি? আঃ ওদের এখনও টাইম হয় নি।' বলেই হো হো শব্দে হেসে ফেলল ঘণ্টু। মুহূর্তকাল, তারপর সব চুপ।

এক মনে পোড়া কয়লাগুলো সরিয়ে রয়ে ছোট্ট একটা কালো তলতলে মাংসের দলা না কি যেন জ্বলন্ত কাঠের ওপর বাঁশ দিয়ে ঘুরিয়ে বসাল। তার ওপর আরও খান কয়েক জ্বলন্ত কাঠ চাপিয়ে দিয়ে চিতার কোণ ঘেঁষে বসল ঘণ্টু। ইশারা করে পাশে বসিয়ে নিতুকে বলে ঘণ্টু, 'জানিস নিতু, আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই তো মা মরেছিল, নইলে এমনি করে আমার মা-কও...

'আঃ চুপ কর ঘণ্টু। ও সব কথা এখন বলতে নেই'।

সে কথায় কেমন ম্লান হাসল ঘণ্টু। ধীর গলায় বলতে থাকে, 'ওই যে বলছিলি না, এখন তুই বারবার মা-কে ঘরে ফিরে আসতে দেখছিস, কারণ কী জানিস... সে তোর জন্য নয়। ওই যে ঘরে তোর পঙ্গু বাপটা রয়েছে, ওর জন্য......দেখিস তোর বাপকে না একদিন তোর মা কাছে টেনে নেবে'। একটু থেমে হাসতে হাসতে বলল, 'আর সে সময় আমাকে খবর দিতে ভুলিস না'।

কী হলো, নিতু আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। ভীষণ জোরে ঘণ্টুর মুখে লক্ষ করে ঘুষি চালল। কিন্তু সতর্ক, হুসেবী ঘণ্টু, সব কিছু আঁচ করতে পেরে মাথা সরিয়ে নিল। নিতু স্থির শান্ত হলে পর, ঘণ্টু এগিয়ে এসে নিতুকে বললে, 'খাঁটি কথা বলি তাই কেউ বোঝে না। সবাই রাগ করে। তোর চেয়েও তোর মা-র চিন্তা এখন ওই পঙ্গু লোকটার জন্যে। আটাশটা মড়া পুড়িয়েছি। কম লোক তো আর চোখে পড়ে নি।' কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল ঘণ্টু। বড় লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতার ছাইগুলো চতুর্দিকে ছড়াতে ছড়াতে একমুখ হেসে বললো, 'এই দ্যাখ, কপ্পুর হয়ে গেছে তোর মা। লোকে বলে, সব্বাই বলে, এটা পোড়ে না, মায়ের স্মৃতি নাকি পোড়ানো যায় না'।

নিতু শুধোয়, 'তুই কি বিশ্বাস করিস এ সব?'

'কেন, করবো না!' কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে সময় ঘণ্টু। ধীর গলায় যেন আপন মনেই বলে, 'জ্ঞান না হলেও মা-র কথা...।'

নিতু দেখলো, ঘণ্টু একমনে সে সময় নিজের নাভিমূলে হাত বোলাচ্ছে।

ঘণ্টু কিছুই বলছিল না। নিতু দেখলো, ঘণ্টু এক সময় বাঁশ দিয়ে ছোট্ট হয়ে আসা মা-র নাভির টুকরো চিতার একপাশে টেনে তুলল। মাটির টুকরোটা সে সময়ে কেমন যেন দপদপ্ দপদপ্ করছিল।

হঠাৎ ঘণ্টু জোর গলায় সকলকে লক্ষ করে বললো, 'ব্যস, এবার চলে আসুন সকলে। সব শেষ'।

নিতুর আত্মীয়স্বজন এক এক করে এসে ভিড় করলো সেই চিতার পাশে। ঘোতন হরি আর মদনও ফিরে এল ঠিক সেই সময়।

ঘণ্টু একটা সরায় সেই ছোট্ট নাভির টুকরোটা কাদামাটির মধ্যে ঠেসে দিয়ে আর একটা সরা দিয়ে ঢেকে দিল। নিতুর হাতে দিয়ে বলে, 'দে, জলে ভাসিয়ে দে'।

জোড়া সরা হাতে নিয়ে ধীর পায়ে নিতু এগিয়ে গেল ঘাটের দিকে। মনে হলো নিতুর, মা-কে সে চিরকালের জন্য সুদূর দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

সরষেতে সর্বনাশ

তলপ্রদ শস্যের অন্ত নেই। পৃথিবীর দেশে বহুরকম শস্যজ তেল ব্যবহার ভারতবর্ষেও কোথাও নারকেল তেল, ও তিলের তেল ইত্যাদি করে ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন তেলের ব্যবহার যে সব রাজ্যে ঘি প্রচুর খাওয়ার প্রচলিত ছিল, তাঁরাও এখন জমানো ঘি-এর বিকল্প হিসাবে চালাচ্ছেন। oil বা না-জমা তেল যাঁরা খান মধ্যে বাঙ্গালীর সরষের তেলের বিশিষ্ট বলা যায়। এই বৈলক্ষণ্য অন্যান্য প্রদেশের মানুষ এককালে সিটকে কথাও বলেছেন। আজ ত হয়েছে, সরষের তেল খাদ্য মধ্যে অতি নির্দোষ। গোল বেধেছে নিয়ে নয়, সরষের ভেজাল নিয়ে। ভেজাল এক লম্বা ইতিহাস। বছরের উপর হয়ে গেছে শেয়াল- অর্থাৎ Argemone Mexicanaর সরষের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবসায়ীরা ণ মানুষের সর্বনাশ করে আসছেন। আর্জিমোন যে মাত্র কেবল সরষেতে না হয়েছে তাও নয়। তৈলবীজ ভেজালের সহজসাধ্যতা অসাধু দিকে আকর্ষণ করেছে। কিছুদিন একটি গুজরাতি পরিবার তিল আর্জিমোন বিষের ক্রিয়ার বলি ন। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। করে তাঁদের লালা এবং রক্তে জিনিসের হদিশ হলো। কি এ অনেক গবেষণায় দেখা গেল আর্জি- বিষ।

আর্জিমোন বিষের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট- দেখা গেলে বিষের ক্রিয়ার খবর। কিন্তু তিলে তিলে ভেজাল তেলে অজানা প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে কে গ্রাস করছে তার খবর রাখা সম্ভব অন্যান্য অনেক ভেজালের মত মোন ভেজালে আগ্রহী দুষ্ট য়ীদল অতিশয় পরাক্রান্ত গোষ্ঠী। তিও এদের খেলার পুতুল। সর- আগমার্কা তো তুচ্ছ ব্যাপার তাদের। তাছাড়া সরকারের আত্মপক্ষ নের উপায়ও তৈরি। আগমার্কের বা টেস্ট হয় bulk-এর বা মালের। তারপর টিনে বোঝাই পালায় কি হয় সরকার বেচারার র কথা নয়। তাঁরা বলতে চান, আপনার আমার মতই সরকারও র। কি সাংঘাতিক কথা! ভেজাল করার আশায় যে-পাত্রে বা আধারে মার্কা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে কিনে ন, সেখানে নিশ্চিন্ত হবার ভরসা। খদ্দেরকে আইনের প্যাঁচ দেখিয়ে করিয়ে দেওয়াই যেন সব। তার চেয়ে

বেশী দায়িত্বের দায় নিতে সরকারও প্রস্তুত নয়।

বোম্বাইতে ডাঃ সোরাব হাকিম আর্জিমোন নিয়ে গত বিশ বছর ধরে গবেষণা চালাচ্ছেন। তিনি নাকি একবার তদানীন্তন রাজ্যপাল ডাঃ চেরিয়ানকে আর্জিমোন ভেজালের পথ বন্ধ করতে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেছিলেন। তার আগে বোম্বাইতে আর্জিমোন থেকে বিষক্রিয়ার ব্যাপক ও ভয়াবহ ফল দেখা যাওয়াতে ডাঃ চেরিয়ান নিজেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি। ডাঃ হাকিমকে নাকি তাই হতাশ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "কি করে কি করি বলুন, কারও ছেলে, কারও জামাই কেউ না কেউ তেলের কারবার করেন যে!"

কতবার কতভাবে শেয়ালকাঁটা-যুক্ত তেল খেয়ে ভীষণ রোগের লক্ষণ হয়েছে তার হিসাব নেই। গোদ বা dropssy তো বারোমেসে ব্যাপারে পেঁছেছে। বছর-খানেক আগে কলকাতার কাছেই দারুণ-ভাবে পক্ষাঘাত হলো। শত শত লোকের এক সঙ্গে পক্ষাঘাত দেখে খোঁজ করায় পাওয়া গেল তেলে white oil মেশানোতে এই কাণ্ড হয়েছে। শাক-সবজীতে পোকা মারার বিষ মেশানো তেল কখনও কখনও পল্লী অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত সংসারে মেয়েরা রান্নায় ব্যবহার করে ফেলেন। তা থেকে মৃত্যু হয় বা নানা উপসর্গ দেখা দেয়। আর্জিমোনও রীতিমত ব্যবসায়। শেয়াল-কাঁটা পথে ঘাটে, বনে বাদাড়ে গাদা গাদা জন্মায়। এই আর্জিমোন মেক্সিকানা পপি-জাতীয় গাছ, ফুলগুলি তার হলদে। বীজ ঠিক সরষের মত। গুজরাতিরা নাম দিয়েছেন সত্যানাশী। সত্যানাশীর সামান্য এতটুকু দীর্ঘদিন ব্যবহারে কঠিন চক্ষুরোগ, শোথ এমন কি ক্যানসার হতে পারে। আর্জিমোন বীজ সংগ্রহ করে দরিদ্ররা তেল ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে। চালের কাঁকড়, সুপুরির খেজুর বীচি ইত্যাদি যেমন বেশ লাভজনক ব্যাপার, শেয়াল-কাঁটাও সেইরকম বেশ জাঁকালো আয়োজন। আট আনা বা পঞ্চাশ পয়সা সের প্রতি পাওয়া যায়। তেলের পরিমাণ বেশ বেশী থাকে। কাজেই সস্তা এই নির্যাস বহুমূল্য খাদ্য তেলে মিশিয়ে দিলে লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঠেকায় কে?

আগে শেয়ালকাঁটার ভেজাল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার গুজরাত প্রভৃতি অঞ্চলে বেশী হতো। কারণ, তেল খাওয়া এসব রাজ্যে বেশী। ভাজাভুজি সরষের তেলে বা তিল তেলে চলন। বর্তমান তৈল সংকটে ও বনস্পতি বিভ্রাটে সরষের তেল-এর পাল্লা ভারী। সময় সময় একছত্র অধিপতি, কারণ সরষের তেল উধাও হওয়া বনস্পতির শূন্য স্থান যে পূর্ণ করে। তাই দেখে থাকবেন পাঞ্জাব, দিল্লি

সর্বত্রই এখন শের.লকটি) বিষ-এর নানা লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

আইনের আওতায় আছে Indian prevention of food adulteration act। অথচ এমন অবাধ ভেজাল পৃথিবীতে আর কোথাও মেলে কিনা জানি না। শুনেছি আমরা সচরাচর যা খাই তার এক তৃতীয়াংশ নিকৃষ্ট দ্রব্যের বেমালুম মিশ্রণ। বেবি ফুড থেকে নিয়ে মসলাপাতি, তেল ঘি থেকে ডাল পর্যন্ত সব ভেজাল। কি করে ঘরণী খাঁটি জিনিস নির্ণয়ই বা করবেন? মাঝারের ল্যাবরেটরীর ল্যাগিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষার পর পাক করলেও ভেজালের ভয় যাবে না। অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গও তো তেমন হয় না। বিজয়া দশমীর দিন উত্তর ভারতে রাবণ জ্বালানো হয়। এ বছর জয়পুরে পনেরো মিটার উঁচু রাবণের প্রতিমূর্তি নাকি জ্বালানো যায়নি। ভিতরে বাজির বারুদ ছিল ভেজাল! আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সব আয়োজনই যখন ভেজাল তখন খাদ্যই বা বাদ যায় কি করে? সব সময় সব খবর প্রকাশিত হয় না। কত শত ভেজালদুষ্ট খাদ্য আমাদের সর্বনাশ করে চলেছে কেই বা জানে। ভেজাল সম্বন্ধে সতর্ক সচেতনতা ছাড়া সাধারণের করণীয় কি বা থাকতে পারে?

টুকিটাকি

বিগত দশকে মূল্যস্ফীতির সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান দশকে যেন দ্রুততম বেগে ধেয়ে চলেছে। যা উঁকিঝুঁকি মাত্র মারছিল, তার করালরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাইকারি মূল্য বা খরচের পরিমাণকে ১৯৬১-৬২ সালে যদি ১০০ ধরে নেওয়া হয় তবে ১৯৬৯-৭০ সালে ১৭৬ হয়েছিল। আর এখন অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হয়েছে ২৫২!

গত তিন বছরে যা বেড়েছে তা তার আগের আট বছরের সমান।

এক কথায় বললে, টাকার মূল্য যদি কেনাকাটার ক্ষমতায় বিচার করা যায়, তবে তার দাম ৩৩ পয়সায় দাঁড়িয়েছে।

এ জন্যই ঘরোয়া বাজেট দেশের বাজেটের মতই দূরবস্থায় পৌঁছেছে। দুঃখের বিষয়, এই মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যে। চিনি, শস্য, খাদ্যতেল, শাক-সবজী ফল বা মাছ মাংস বহন করছে মূল্যস্ফীতির মস্ত এক অংশ।

সান্ত্বনা হিসাবে বলতে পারা যায়, মূল্যস্ফীতি দুনিয়ার সব দেশেই হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ নিদান খুলে কার্য কারণ বোঝবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভরসা পাবার অবকাশ কই? সকল সন্ধ্যার আয়োজনেই ক্লান্ত গৃহিণী হাঁপিয়ে ওঠেন। তাঁর কাছে তত্ত্বমূলক কেতাবী কথা অকার্যকর মনে হয়।

তার উপর আবার অভাব আর ঘাটতি। দুধ নেই, জ্বালানী নেই, তেল নেই, বনস্পতি উধাও। র‍্যাশন দোকানে লম্বা কিউ পার হলে হয়তো চাল শেষ হয়ে যাবে, অথবা চিনি মিলবে না। ঘরে ফিরে ক্লান্তি কাটাতে সময় লাগবে, কারণ বিজলী নেই, পাখা নেই, আলো নেই। তবে রাজনীতিবিদের দেওয়া নিত্য নূতন ভবিষ্যৎ ভরসার কথা পাবেন। আর্থিক বিপর্যয়ের মোড় ঘুরে গেল বলে। ধৈর্য ধরার উপদেশ সর্বত্র মিলবে। কিন্তু ঘরণীর সহন বা অপেক্ষা করার ক্ষমতাই একমাত্র দেশটাকে টিকিয়ে রেখেছে। নয় কি? ভেজালই বলুন আর পণের অভাবই বলুন, সহিষ্ণুতাই একমাত্র সম্বল।

শ্রীমতী

(চব্বিশ)
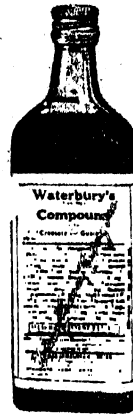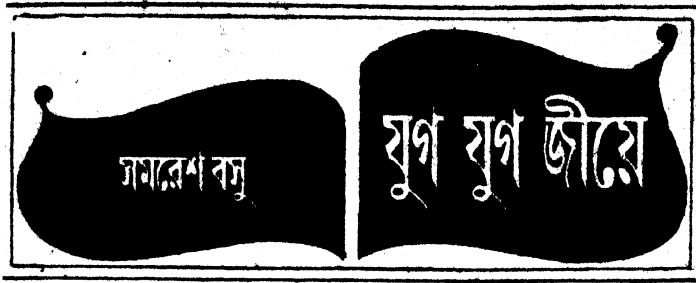
চার বছর আগে নবনারায়ণের গলির মোড়ে ঘটনা ঘটেছিল সকালের দিকে। রাত্রি আটটায় মেজদা রাখালের সঙ্গে ত্রিদিবেশ এসেছিল। বাবা বাড়িতে থাকলে মেজদা নিশ্চয়ই বকুনি খেতো। বাবার মেজাজ বেশি খারাপ থাকলে দুই চারটা চাঁটি এবং কান-মলাও খেতে হতে পারতো। বড়দাদা দীনেশ, কখনো কারোকে রূঢ় স্বরে কিছু বলা বা শাসন করতে পারে না। একমাত্র মা বলেছিলেন, 'এত রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় হলো? লেখাপড়া ছেড়ে এ সব করলেই হবে?' এবং এই কথার সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছিল, কারণ মা রান্নাঘর থেকেই মেজদাকে বকুনি দিচ্ছিলেন। রাখাল যখন ত্রিদিবেশকে নিয়ে বসবার ঘর দিয়ে দালানে ঢুকেছিল এবং বেলির নাম ধরে ডেকেছিল, তখন শিউলী দালান থেকে ওর ঘরে ঢোকবার দরজার মুখে মেজদা হাফপ্যাণ্ট পরে ছিল, ত্রিদিবেশ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো উকীল-মোক্তারদের মতো একটা প্যাণ্ট পরেছিল, গায়ে বুক খোলা শার্ট। দেখামাত্র বেমানান লেগেছিল এবং রাখালের গলার স্বর শোনা মাত্র মা রান্না ঘর থেকে হেঁকে উঠেছিলেন আর সেই সঙ্গেই তপ্ত কড়াতে কিছু ঢেলেছিলেন। শিউলী দালান আর ঘরের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর চোখে ভেসে উঠেছিল সকালবেলার সেই দৃশ্য। শিউলী নিজেও জানতো না। চার বছর আগে দালান আর ঘরের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেশকে সেখা এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা—নতুন দৃষ্টি, যা মন থেকে দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। বালিকা শিউলীর চোখে অবাক জিজ্ঞাসাও জেগেছিল। কোমল নরম লাজুক ত্রিদিবেশ কেমন করে উগ্র রাগে ও ঘৃণায় জ্বলে উঠেছিল, চারজনের বিরুদ্ধে একলা রুখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মার খেয়েছিল ত্রিদিবেশ, কিন্তু হার মানেনি। অবাক জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়েছিল, মধুদির সঙ্গে সেই কোন্ বিদেশী গল্প লেখকের গল্প পড়ার কথা মনে পড়ায়। ত্রিদিবেশের কথা শুনে মধুদির সেই বিস্ময়, মুগ্ধতা, প্রীতি এবং স্নেহ মনে পড়তে রাত্রি আটটার ত্রিদিবেশ যেন ওর চোখে এক নতুন চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং ত্রিদিবেশকে দেখে ওর সেই প্রথম নিজের কাছে অজানিত ভালো লাগা ও লজ্জা এক সঙ্গে ওর মুখের ও চোখের রূপ বদলে দিয়েছিল। কেমন একটা খুশি আর গৌরব বোধ ওর মনে জেগেছিল। কথা বলতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু এগিয়ে পর্যন্ত আসতে পারেনি। ত্রিদিবেশ আর মেজদাকে দেখে মনে হয়েছিল, ওরা যেন কোথাও থেকে ছুটোছুটি খেলাধুলা করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে। ওদের দেখাচ্ছিল উস্কোখুস্কো, অগোছালো, কিছুটা উত্তেজিত অথচ চোখে মুখে হাসির ঝলক এবং সেই মুহূর্তেই আবার মনে পড়ে গিয়েছিল ত্রিদিবেশের হাত ধরে মধুদির গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া। মনে হতেই শিউলীর ঠোঁটের কোণ দৃঢ় আর শক্ত হয়ে উঠেছিল এবং মধুদির প্রতি হঠাৎ মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে ত্রিদিবেশের প্রতিও। শিউলী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার-টেবলের কাছে যেতে পারেনি, দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মধুদির যে আচরণ ত্রিদিবেশকে ওর চোখে মহান করে তুলেছিল, সেই আচরণই ওর বালিকা-প্রাণে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছিল।

শিউলী যখন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, দালান থেকে রাখালের স্বর শোনা গিয়েছিল, 'বেলি, একটু খাবার জল দে তো, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।' এবং তারপরেই 'কুমারী শিউলী মজুমদার কোথায় গেল?'

মেজদা সেই সময় থেকেই বেশ পাজী হয়ে উঠছিল, আর একটু একটু পাকাও। ত্রিদিবেশের সঙ্গে মেশার ফলে বোধহয়।
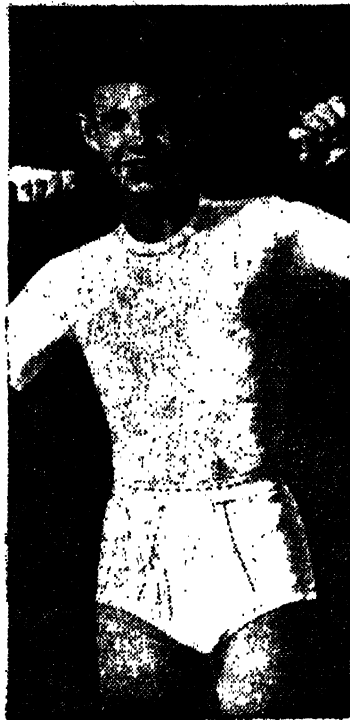
শিউলী ত্রিদিবেশের গলা শুনেছিল, 'শিউলী বোধহয় ও-ঘরে গেল।' যেন ছেলেটা শিউলীকে দেখতে পায়নি। শিউলীর ঠোঁটে হাসি, চোখে ভ্রূকুটি। রাখাল ঘরে এসে ঢুকেছিল, উত্তেজনার সঙ্গে উচ্ছ্বাস মেশানো স্বরে বলেছিল, 'ওহ্, তুই এখানে, আজ দারুণ কাণ্ড হয়ে গেছে। দাঁড়া, ত্রিদিবেশকে ডাকি।'

ডাকবার দরকার হয়নি, ত্রিদিবেশ নিজেই সেই ঘরে এসেছিল। ত্রিদিবেশের মুখে হাসি, চোখের দৃষ্টি ঝকঝকে। ওকে আসলে যতোটা কোমল মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দুরন্ত অশান্ত মনে হয়েছিল তখন। ওর চোখের তারা জ্বলকানো, পাতা অপলক অথচ দৃষ্টি নিবিড়। শিউলীর দৃষ্টিতে দীপ্ত ছিল, ভিতরে একটা খুশির ঝংকার, বাইরে শান্ত ভাব ধারণ করে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী দারুণ কাণ্ড হয়েছে?'

শিউলী একেবারেই দারুণ কাণ্ড বিষয়টি অনুমান করতে পারেনি। রাখাল যা ব্যক্ত করেছিল, সেই দারুণ কাণ্ড এইরকম— সন্ধের একটু পরেই ত্রিদিবেশ আর রাখাল প্রথম গিয়েছিল নীলুর বাড়ি। নীলু সকালবেলার সেই চারজনের একজন। তাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তারপরে গিয়েছিল চারজনের অন্যতম শিব,—শিবকুমারের বাড়ি। তাকে পাওয়া গিয়েছিল। শিবু বাড়ির বাইরে এসে ত্রিদিবেশ আর রাখালকে দেখে প্রথমে থমকে গিয়েছিল তারপরে সাহস দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এবং ত্রিদিবেশ বলেছিল, সকাল বেলা ওকে চারজনে মিলে মেরেছিল এখন ও প্রত্যেকের সঙ্গে একলা লড়তে এসেছে। শুনে শিবু দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং রেগে গালাগালি দিয়েছিল। তখন ত্রিদিবেশ তাকে জামার কলার টেনে ধরে মুখে ঘুষি মারে। শিবু চিৎকার করে উঠেছিল। ওর দাদা এবং পাড়ার কয়েকজন বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু আশ্চর্য, শিবুকে টেনে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ওর দাদা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরে ওরা গিয়েছিল মনতোষের বাড়ি, সেই চারজনের আর একজন। মনতোষ বাড়িতে ছিল, বেরিয়ে এসেছিল, এবং সে ত্রিদিবেশের কথা সবটুকু শোনবার আগেই ত্রিদিবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ত্রিদিবেশ সেই আক্রমণ প্রতিহত করে মনতোষকে দু হাতে জাপটে ধরে। রাস্তার ধারে জড়ো করা পাথরের খোয়ার ওপর ওরা দুজনেই আছড়ে পড়েছিল। সে সময়েই মনতোষের মাথায় চোট লাগায় সে চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু ত্রিদিবেশ ছাড়েনি। রাখালের মনে হয়েছিল ত্রিদিবেশ যেন মনতোষকে পাথরের খোয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। মনতোষ খারাপ গালাগাল করছিল, ত্রিদিবেশ মেরেই চলেছিল। তখনই দুটি ছেলে কোথা থেকে ছুটে এসেছিল, যারা মনতোষেরই বন্ধু এবং চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। একজন ত্রিদিবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রাখাল তখন ত্রিদিবেশকে বাঁচাতে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তখন আবার রাখালের ওপরও একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় মনতোষ আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'আমি মরে যাবো, আমাকে মেরে ফেলবে।' সেই আর্তনাদ শুনে মনতোষের বন্ধুরাই হকচকিয়ে উঠে সরে দাঁড়িয়েছিল এবং ত্রিদিবেশও উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'মনে রাখিস। ইস্কুলের মেয়েদের পেছনে আর কোনোদিন লাগতে যাস না।' মনতোষ তখনো পাথরের গাদায় পড়েছিল, ত্রিদিবেশ রাখালের হাত ধরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেছিল, (এই সময়ে শিউলী শংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মনতোষের যদি কিছু হয়?' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'কিছুই হবে না, ভীতুটা আসলে ভান করছিল') এবং তারপরে ওরা দুজনে গিয়েছিল, চতুর্থ ছেলে টাকুর বাড়ি—হরিদাস দাসের বাড়ি। টাকুদের বাড়ি রাস্তার ধারে। দোতলার বারান্দায় এসে সে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেশ আর রাখালকে দেখে জানতে চেয়েছিল কী দরকার। ওরা ওকে নিচে আসতে বলেছিল। টাকু স্পষ্ট জানিয়েছিল, ও

আসবে না এবং ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ দিয়েছিল। এই সময়ে শিউলী খিল করে হেসে উঠেছিল। ত্রিদিবেশকে জেস করেছিল, 'নিচে নেমে এলে ওকেও তে?'

ত্রিদিবেশ যেন অবাক হয়ে বলেছিল, মারবার জন্যই তো গেছলাম।'

শিউলী আবার হেসে উঠেছিল, ছিল, 'তুমি তো ভারি মারকুটে ছেলে ছ।'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'আমি মারকুটে? সকালবেলা আমাকে মেরে ছুটে দাছিল, আমি শোধ নেবো না?'

শিউলী ত্রিদিবেশের ঝকঝকে চোখের ক তাকিয়ে কয়েক পলক কথা বলতে রনি, তারপরে হঠাৎ কোথা থেকে ওর উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছিল, জিজ্ঞেস রছিল, 'তোমার কোনো চোট গনি তো?'

ত্রিদিবেশ মথায় হাত দিয়ে অবহেলার র বলেছিল, 'মাথায় একটু সামান্য গছিল, ও কিছু না।'

'আর সকালে? মধুদির সংগে চারখানায় গেছলে?' শিউলী জিজ্ঞেস রছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'না। আমার তো রকম কিছু সত্যি লাগেনি। মধুদি মাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। মাদের বাড়ির সবাই খুব অবাক ছিল, কিন্তু সবাই যেন রেগেও গেছে। জ আর বাড়ির কেউ আমার সংগে া বলেনি।'

শিউলী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস রছিল, 'ও মা! কেন?'

ত্রিদিবেশ নিঃশব্দে ঠোঁট উলটেছিল, মধ্যে ওর নির্বিকারত্ব ফুটে উঠেছিল। উলী আবার একটু তাকিয়ে থেকে জ্ঞেস করেছিল, 'ইস্কুলের মেয়েদের ছুনে লাগলে সত্যি তোমার রাগ হয়?'

'আমার ঘেন্না হয়।' ত্রিদিবেশ বলেছিল।

শিউলী আবার চুপ করে তাকিয়েছিল, ং হঠাৎ খেয়াল করেছিল, ওরা দুজন ড়া রাখাল বা কেউ ঘরে নেই। খেয়াল তেই ওর কেমন লজ্জা করে উঠেছিল, সো না। চা খাবে?'

যেচে চা দেওয়ার কথা শিউলী সেই থম বলেছিল। ত্রিদিবেশের চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল, নিঃশব্দে ঘাড় কাত রে সম্মতি জানিয়েছিল এবং শিউলীর াথে ত্রিদিবেশকে তখন কেমন বোকা াকা লেগেছিল। ও ঘর থেকে বেরিয়ে য়েছিল। চা তৈরি করে নিয়ে ফিরে এসে খেছিল, ত্রিদিবেশ সিগারেট খাচ্ছে। খেই বালিকা শিউলী দুরন্ত রাগে আর মন একটা অপমান বোধে রেগে উঠেছিল বং টেবলে চায়ের কাপ রেখে বলেছিল,

'তুমি সত্যি বখাটে। কেন তুমি আমাদের বাড়িতে বসে সিগারেট খাচ্ছ? অসভ্য কোথাকার। এতোটুকু বয়সে সিগারেট খতে লজ্জা করে না?'

শিউলী এতো রেগে গিয়েছিল অনেকটা অন্ধের মতো, ওর মাথায় রাগ ছাড়া কিছুই ছিল না। ত্রিদিবেশের সিগারেট খাওয়াটা ওর চোখে দুরপনেয় অন্যায়, ভয়ংকর স্পর্ধিত মনে হয়েছিল। ঝাঁজের সংগে কথাগুলো বলেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এইটুকু চেতনা ওর ছিল, রাগের কথা কারোকে জানতে দেওয়া যাবে না। ত্রিদিবেশের সিগারেট খাবার কথা ও বাড়ির কারোকে বলতে হয়নি। তাই দালানের শেষ প্রান্তের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়িতে ওঠবার দরজা খুলে ছাদে চলে গিয়েছিল। একতলার উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছাদের নানা জায়গায় ফাটল, যেখানে ত্রিপল চাপা আলকাতরা লেপে দেওয়া আছে। কোথাও কোথাও ফাটল দিয়ে কড়িবরগা অস্পষ্ট দেখা যায়।

প্রাচীন মজুমদার বাড়ি, ভগ্নোন্মুখ, বংশধরেরা তথাপি নিজেদের বসতভিটার গৌরবের সংগেই এখনো বাস করে, কিন্তু কানো দৈব বিপদ ঘটার আশংকায় রাত্রের অন্ধকারে ছাদে ওঠা বারণ, অতএব তা-ই শিউলী ছাদে উঠে গিয়েছিল, যেন কারোর মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতে না হয়। তথাপি মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা ছিল। উত্তরের একতলার শেষে মজুমদার বাড়ির দোতলায় অংশে যে জ্ঞাতি শরিকেরা বাস করে, একতলায় ছাদের দিকে তাদের খোলা দরজা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছিল। সম্পর্কে ওরই এক ভাই, খাটের ওপর বসে দুলে দুলে ইতিহাস পড়ছিল -ইতিহাসই, কারণ খৃষ্টাব্দ দিল্লি, যুদ্ধ ইত্যাদি টুকরো টুকরো কথা শিউলীর কানে ঢুকেছিল। ও ছাদের ওপর সিঁড়ি-ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। দূরে বাড়ি আর গাছগাছালির ফাঁকে রাস্তার বা কোনো বাড়ির দু একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। ছায়াপথ এবং অনেক নক্ষত্রদের

নাম পরিচয় শিউলীর জানা ছিল, কিন্তু ওর চোখের সামনে ভাসছিল শুধু ত্রিদিবেশের থতিয়ে যাওয়া মুখের অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি, তথাপি একটা বিব্রত হাসি নিয়ে কিছু বলতে যাওয়ার চেষ্টা এবং তখনো হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। যে-ছবিটা ওর চোখে তখনো অসহ্য বোধ হচ্ছিল, নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠেছিল এবং উত্তরের জানালা, দূরের আলো, আকাশ নক্ষত্র কিছুই দেখছিল না, কিছুই শুনছিল না, কেবল সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটি স্ফুরিত ঝংকার বাজছিল, কেন কেন কেন? আর সেই বারংবার প্রশ্ন যেন ওর বুকের মধ্যেও আঘাত করছিল।

শিউলীর সেই উত্তেজিত আচ্ছন্নতা, চেতনায় ত্রস্ত হয়েছিল মেজদা রাখালের কয়েকবার ডাকে। ও ত্রিদিবেশের নাম ধরে ডাকছিল। হয়তো অন্য কেনো নাম ধরে। কেউ কারোকে ডাকলে শিউলীর আচ্ছন্নতাকে স্পর্শ করতো না। তারপরেই মেজদার গলায় ওর নাম শোনা গিয়েছিল, 'পুলি কোথায় গেল?' শোনা মাত্রই শিউলী ত্রস্ত নিঃশব্দে ছাদের দরজা বন্ধ করেছিল এবং নিচে নেমে আসতে আসতেই দালানে মায়ের গলা শোনা গিয়েছিল, 'পুলি ঘরে নেই?'

শিউলী নিচে নেমে সিঁড়িতে ওঠবার ঘরেও আস্তে দরজা বন্ধ করে দালানে ঢুকেছিল, এবং বালিকা হলেও প্রকৃতি তার নিজের মুখের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বদলিয়ে নিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলছো?'

মা ওর দিকে তাকিয়েছিলেন এবং রাখালও ফিরে তাকিয়ে সহজভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'ত্রিদিবেশ কোথায় গেল রে?'

শিউলী কপট অবাক স্বরে বলেছিল, 'জানি না তো। আমি তো ওকে চা দিয়ে গেছলাম।

'কোথায় গেছলি?' মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

শিউলী অকপটে মিথ্যা বলেছিল, 'বাইরের বাড়ির দিকে। মনে হচ্ছিল, বাবা আমাকে ডাকছে। কিন্তু সামনে গিয়ে দেখলাম, বাবা খুব চেঁচিয়ে কথা বলছে। আমি একটু দাঁড়িয়ে চলে এলাম।'

মা সাধারণত সন্দেহপরায়ণা নন, কিন্তু তাঁর ভ্রূকুটি-চোখে কেমন একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা ছিল যা দেখে শিউলী অস্বস্তিবোধ করেছিল। চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে সেই অস্বস্তিও ফুটতে দিতে চায়নি। বাইরের বাড়ি থেকে বাবার গলা চড়িয়ে ডাক দেওয়াটা কিছু বিচিত্র ছিল না, দরকার পড়লে ডাকেন। হয়তো তাঁর বিড়ি ফুরিয়ে যায় কিংবা সকলের জন্য চা তৈরি করে নিয়ে যেতে বলেন এবং সেক্ষেত্রে ভুল শুনে শিউলীর বাইরের বাড়ির এজমালি বৈঠকখানায় যাওয়াটা অবাস্তব কিছু ছিল না, তৈরি ছলনায় ও যথেষ্ট পটুত্ব দেখিয়েছিল এবং তা যেন ওর অজান্তেই ভিতর থেকে বেরিয়েছিল। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আর ত্রিদিবেশ? সে ছেলেটা কোথায় গেল?'

শিউলী নির্বিকারভাবে বলেছিল, 'কে জানে, আমি তো জানি না। আমি তো ওকে চা দিয়ে গেলাম।'

মায়ের সঙ্গে রাখালও তাকিয়েছিল, কিন্তু দুজনের জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসার মধ্যে তফাত ছিল। রাখালের চোখে বিস্ময়, মায়ের চোখে যেন একটা সন্দিগ্ধতা ছিল। রাখাল বলেছিল, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো। ত্রিদিবেশ চাও খায়নি, আমাকে না বলেই চলে গেল?'

জিজ্ঞাসার সুরে ও কথা বলে শিউলীর দিকেই তাকিয়েছিল। শিউলী দুজনের দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে মায়ের স্বর শুনতে পেয়েছিল, 'সব ভূতুড়ে কাণ্ড এদের।' শিউলী ঘরে ঢুকে দেখেছিল, চায়ের কাপ যেমন রাখা ছিল, তেমনি পড়ে আছে। ত্রিদিবেশ তা স্পর্শ করেনি। বাইরের ঘরে মায়ের গলা আবার শোনা গিয়েছিল, 'হ্যাঁ, এই রাত্তির করে তুমি এখন আবার ত্রিদিবেশের বাড়ি যাও খোঁজ করতে। ওসব রাখ, পড়া-শোনা করতে বোস। গেছে গেছে, কেন গেছে, কাল জেনে নিলেই হবে।'

কেন গিয়েছে, শিউলীই একমাত্র তা জানতো। ঠাণ্ডা চায়ের কাপের দিকে

অ্যাকিয়ে ত্রিদিবেশের সেই মুখ ওর মনে পড়েছিল। ত্রিদিবেশ কি রেগে গিয়েছে, শিউলী ভেবেছিল। শিউলী শুনেছিল, ত্রিদিবেশ নাকি সিগারেট খেতে শিখেছে, মেজদা রাখালও কবুল করেছিল, যদিচ মেজদা রাখাল সিগারেট খেতো না, এখনো খায় না। শিউলীর অবাক জিজ্ঞাসায় রাখাল জবাব দিয়েছিল, 'ত্রিদিবেশটা এইরকম, বায়স্কোপের লোকদের মতন সিগারেট খায়।' তার মানেই বয়ে যাওয়া বখাটে ছেলে। অতএব সেইরকম ছেলে মেয়েদের পিছনে লাগা নোওরা ছেলেদের গুণ্ডা করলে, তাদের সংগে লড়াই করলে, অবাক লাগে। শিউলী অবাক হয়েছিল, বীরের ভূমিকায় মুগ্ধ হয়েছিল, তা বলে সেই বীর ওদের ঘরে বসে সিগারেট খাবে? যা শিউলী কখনো নিজের চোখে দেখে নি, এবং বালিকা মন যখন মুগ্ধতায়, অথচ এক ঈর্ষাকাতর দাবীতে, লীলা চঞ্চলতায় দুলছিল, এবং নিজের হাতে সেই বিশিষ্ট বীর বালককে আত্মগৌরবে চা এনে দিয়েছিল, যা ও কোনোদিনই দিতে চায় নি, তখন অপ্রস্তুত চিত্তে স্বভাবতই বিকার ঘটেছিল। একটা

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটায়
উপহার!

চিত্র প্রদর্শনী

বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা সত্যিই ভাগ্যবান। তারা স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে, যাদের বিকাশের জন্য নানা ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিশুদের [illegible] উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত সাময়িক-বার্ষিক আঁকা প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দ ও উৎসাহ দেখে কথাগুলি মনে এল। রাত্রে বিচিত্র আলোকমালা ও সেই সঙ্গে সপ্তাহব্যাপী ফিল্ম, পুতুল নাচ ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষ তথ্যকেন্দ্রটিকে সত্যিই যেন ছেলে-মেয়েদের স্বপ্নলোকে পরিণত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ছেলেমেয়ে তথা অভিভাবকদের ভিড় দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল যে কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অঙ্কন প্রতিযোগিতার দিনে প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চে পা রাখার জায়গা ছিল না—ছোট ছোট সপ্রতিভ প্রায় পাঁচশো ছেলেমেয়ে নিবিষ্ট মনে ছবি এঁকে চলেছে। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দৃশ্যই চোখে পড়ে। কেউবা অল্প আয়াসেই সুনির্বাচিত রঙের পর রঙ বুলিয়ে চলেছে, কেউবা হয়ত চমৎকার বহিঃদৃশ্য আঁকছে, আবার কেউ হয়ত কিছু অংশ এঁকে হতাশ হয়ে বসে আছে। কয়েকজন যে নিয়মিতভাবে শিল্পচর্চা করে তা অবশ্য ছবি দেখেই জানা যায়। বলতে বাধা নেই, কর্তৃপক্ষের অনুরোধে একজন সুপরিচিত কলাসমালোচকসহ তিনজন সুপরিচিত শিল্পী বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে প্রায় হিমসিম খান। প্রকৃতপক্ষে পাঁচ বছর বয়স্ক কুমারজ্যোতি রায়চৌধুরীর আঁকা ডাবলডেকার বাস ও শিবাজী মিত্র (বঃ ১১) ইমপ্রেসানিস্টিক 'বিসর্জন' দেখে সত্যিই তাঁরা বিস্মিত হন। শিশু বিভাগে যেসব ছেলেমেয়ে প্রশংসা দাবি করে তাদের মধ্যে পার্থ বসু (বঃ ৬), নীলাঞ্জন চৌধুরী (বঃ ৫) ও চান্দ্রেয়ী গোস্বামীর (বঃ ৫) নাম উল্লেখ্য। আট থেকে ১২ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাবলু কুণ্ডু (বঃ ১১), সুলেখা সেনগুপ্ত (বঃ ১১) ও সুদীপ্ত বিশ্বাস (বঃ ১০) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য দুটি বিভাগেরই প্রথম ১৫ জন ছেলেমেয়েকে পুরস্কার দান করে কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।
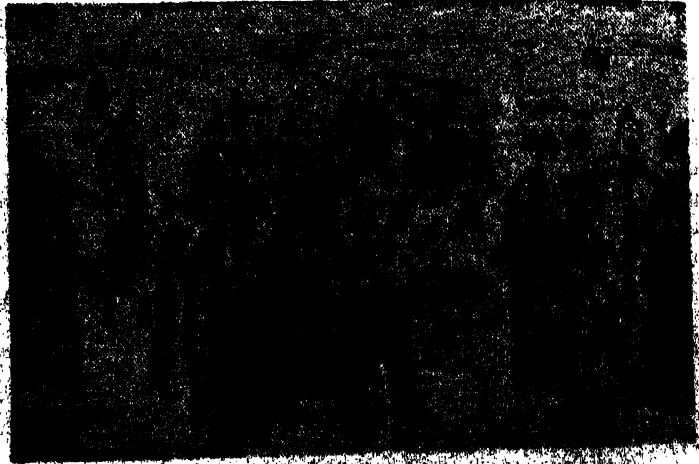
বিসর্জন (১ম পুরস্কার প্রাপ্ত) —শিবাজী মিত্র (বয়স ১১)

ডাবলডেকার বাস (১ম পুরস্কার প্রাপ্ত)
—কুমারজ্যোতি রায়চৌধুরী (বয়স ৫)

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী ডি ডি আগাশে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২০টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। শিল্পী ইন্দোরের বাসিন্দা, ১৯৬২ সালে তিনি বোম্বাই জে জে আর্ট স্কুল থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। পরে কয়েকটি প্রদর্শনীতে তিনি পুরস্কারও লাভ করেন ও ইন্দোরে স্পেকট্রাম প্রোগ্রেসিভ পেন্টারস সংস্থা স্থাপন করেন। এই শিল্পী বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেন। রচনাক্ষেত্রে রৈখিককে শূন্য রেখে যথাযথভাবে ছোট-বড় নানা আকার সংস্থাপন ও সংযোজনা করে তিনি একটি সুসমঞ্জস আকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। শিল্পী চাপারঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী। সুনির্বাচিত নানা রঙ ব্যবহার করলেও নীল ও সবুজ রঙ ভিত্তিক রচনাগুলিই যেন প্রথমে চোখে পড়ে যায়। যেমন ব্লু হারমনি। উপরের দিকে হালকা নীলরঙের সুকৌশল ব্যবহার ও পুরোভাগে স্বচ্ছ কোমল সবুজ রঙের আবরণ সৃষ্টি করে শিল্পী এটিতে একটি চমৎকার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। কয়েকটিতে শিল্পী গাঁথুনি (Structure) জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ বিভিন্ন আকার পাশাপাশি, অথবা একের ওপরে

একভাবে সাজিয়ে, ও সেই সঙ্গে রঙ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্তরপ্রধান নিদর্শন রচনা করেছেন। এক হিসাবে এটিই এই শিল্পীর অঙ্কনবৈশিষ্ট্য। সবগুলি না হলেও, দু-একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী রঙ ব্যবহার রীতিতে পারদর্শী, বিশেষ করে কয়েকটি রঙ সংমিশ্রণ করে দু-এক ক্ষেত্রে তিনি কাব্যলোক সৃষ্টি করেছেন, যেমন কমার্স ইন অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্রাউন-এ। এই প্রসঙ্গে কমার্স ইন রেড-এরও নাম করা যায়। সবুজ রঙের কারুকার্য ও গেরুয়া রঙের স্তরভেদ, বিশেষ করে সুপারইমপোজিশনের জন্য স্টাগ্‌জ অনেকের চোখে পড়ে। অন্যান্য রচনা নিদর্শন একটু আড়ষ্ট।

*

শিল্পী অজিত মণ্ডলও অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে টেম্পারায় আঁকা ২৫টি শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়। অজিত মণ্ডল তরুণ শিল্পী, ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখা গেছে, সুতরাং তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অপরিচিত নন। শিল্পীর নিদর্শনগুলি মুখ্যত লোকচিত্রধর্মী—নানা রঙের বিভিন্ন শ্রেণীর স্তরভেদ ও কারু-কার্যের মধ্য দিয়ে শিল্পী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি স্বচ্ছ কোমল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। দেশের পুতুল বা প্রাচীন লোকচিত্র অবলম্বনে প্রচিত্র ছবিগুলি নানা রঙ ও কারুকার্য বৈচিত্র্য দু-এক স্থলে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। তবে উল্লেখ্য, অধিকাংশ রচনাতেই খ্যাতনামা শিল্পী গণেশ পাইনের প্রভাব ধরা পড়ে। তরুণ শিল্পীর কাজে অবশ্য প্রবীণ শিল্পীর প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও ক্রমশ নিজস্ব অবদান তথা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। এই তরুণ শিল্পীর প্রতিভা আছে—আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি যদি অগ্রসর হন তাহলে তিনি যে অবশ্যই লাভবান হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লাল ও হলুদ রঙ প্রধান মাদার অ্যান্ড চাইল্ড-২ প্রথমেই চোখে পড়ে, এটির রঙের স্তরভেদ লক্ষণীয়। নীলরঙের স্তর-ভেদ সৃষ্টি ও কারুকার্যের জন্য গার্ডেন ড্রিম অব এ কিং অনেকের ভাল লাগে। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছবির নাম করা চলে—স্নেক চার্মার। কারুকার্য ও পুতুল-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহুরূপীও এক গোত্রের। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্ট্রেঞ্জারস ইন দ্য নাইট, দ্য লোনলি ডঙ্কে ও বিশেষ করে ২২নং ড্রয়িং উল্লেখ্য।

চিত্রপ্রিয়

ইমেজ —ভি ভি অগাশে

॥ ১ ॥

অনাথবাবু জলের দামে মণ্টুর মাস্টার-এর গ্রন্থসত্ব কিনে প্রায় জলের দামেই ছাড়তে লাগলেন, ছড়াতে লাগলেন বাংলা মুলুকের বালখিল্যদের বাজারে। কিন্তু ঐ সামান্য লাভে লেখকের প্রাণ বাঁচে কি করে? এই প্রশ্ন সেকালে আমার মনে জেগেছিল বইকি!

আমার বই ছোটদের হাতে হাতে ঘুরলে, ঘরে ঘরে আমার নাম ছড়ালে আমার লাভটা কিসের! এসব ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা কী আমার? এই সব সম্পর্কশূন্যের অনর্থযোগে কি উৎসাহ জাগে?

কিন্তু এইসব সম্পর্কের শূন্য কোনো এক একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অনেক হতে পারে, সংখ্যাহীন হয়ে দাঁড়ায়, তখন কি তা আর খেয়াল করেছি। বেড়াল যেমন বনে গিয়ে বনবেড়াল হয়, এই সব নেহাত বালকরাই একদা যৌবনে গিয়ে কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনীয়ার কেউ বা উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের ছোট-বেলাকার সঙ্গী আনন্দবর্ধন এই লেখককে মনে করে রাখবে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচরে।

মণ্টুর মাস্টার আমি মন দিয়ে লিখে-ছিলাম কিনা মনে নেই, কিন্তু তারই দৌলতে সেদিন আমার প্রাণ ফিরে পেয়েছি!

প্রাণ তো পড়ে পাওয়া, কোনোরকমে মায়ের পেট থেকে পড়লেই পাওয়া যায়—তার দাম ধরুন চোদ্দ আনাই। আর সেই প্রাণ যায়-যায় দশায় কখনো কারো সাহায্যে ফিরে পেলে তার দরুন আরো চার আনা ধরা যায় বোধ হয়। মোটের ওপর ঐ বইয়ের লাভটা এখন ষোলো আনার উপরে আঠারো আনাই দাঁড়িয়ে গেল বলতে পারি।

সম্পর্কশূন্যরাই একদিন পরমার্থের সম্পর্ক হয়, পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে।

সম্পর্কশূন্যরাই চারি ভিতে ঘিরে থাকে, সারা জীবন জুড়ে রয়, দিনের দিন জড়ো হয়ে দুদিনের পরমায়ুকে অনন্ত-গুণ বাড়িয়ে দেয়। সেই অনন্তদেবের রূপ-গুণের মহিমা কীর্তন করার সাধ্য কী আমার!

সংখ্যার অঙ্কই ভালো জানিনে, শূন্যের আঁকের তত্ত্ব কী বুঝব আমি!

শূন্যাকাশে মায়ের গর্ভে যা জমা হয়ে থাকে তাঁর সেই গর্ভাঙ্কের হিসেব আমাদের জন্মজন্মান্তরের। অনন্ত কাল ধরে। শূন্য আঁকের শেষ ফল শূন্যই। কিন্তু সেই শূন্যটি পাবার হেতুই জন্মজন্মান্তর প্রতীক্ষা আমাদের। একদিনে কী তার হদিশ মেলে! যদিও মুহূর্তের চকিতে তার আভাস লক্ষিত হয় কদাচ, বিদ্যুতের চমকে আকাশ জোড়া থমথমে মেঘের জমাট মুখ চোখে পড়ে হয়ত বা, ঠিক মায়ের মুখের মতই, কিন্তু তাঁর অপত্য স্নেহের অগাধ প্লাবনের কতটুকু আমরা থই পাই।

যা কিনা জন্মজন্মান্তর ধরে আমাদের জীবন দেবে, প্রাণ বাঁচাবে, স্বাদ মেটাবে, সব সাধ পূর্ণ করবে আমাদের। সেই থই থই কাণ্ড থ হয়ে যাবার মতই।

হরণ পূরণের আঁক তাঁরই ভালো জানা। একমাত্র তিনিই জানেন। কখন কার হরণ করে কোথায় কাকে পূরণ করতে হবে তার খবর তিনিই রাখেন। আমরা কখন যে হঠাৎ হৃত হই, কখন আবার উদ্ধৃত কোথাও হয়ে উঠি, তার হদিশ কি পাই আমরা?

আমার ছোটদের প্রথম বই পঞ্চাননের অশ্বমেধ-এর প্রকাশক অপূর্ব বাগচি মশাইকে আসতে দেখলাম আমার বাসায়— 'আসুন আসুন, অপূর্ববাবু! আমার কী সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন। এমনটা আমি ভাবতেই পারি না।'

সাদর অভ্যর্থনা করে আমার ঘরের একমাত্র ডেকচেয়ারে সমাদরে ওঁকে বসাই।

'দিদি, এক কাপ ওভালটীন বানা তো—আমাদের অপূর্ববাবুর জন্যে।'

কী আপদ, সেই সাত সকালে মামাতো বোন বিনিও সেদিন হাজির ছিল আমার বাসায়।

'না না, কেন অনর্থক কষ্ট করছেন আমার জন্য।' অপূর্ববাবু ভদ্রজনসুলভ আপত্তি জানান।

'কষ্ট কিসের! আমি এক কাপ বানাবো নাকি আমি? তাই ভেবেছেন? তিন কাপ তৈরি করব—আমাদের তিনজনের জন্যেই। আপনার সুবাদে আমাদেরও আরেক কাপ হয়ে যাবে আবার।'

'এই তৃতীয়বার।' আমি জানাই: 'ওভালটিন আমরা হরদম খাই—যদি কেউ

খরচ করে ঐটা বানিয়ে দেবার হাঙ্গাম পোহায়। আর, রয়েছেন বাগচিমশাই, বোনদের কাজই হচ্ছে ভাই। বোনার কাজ সই শীতকালে, আর চা-কফি ওভালটিন ইত্যাদি বানানো—সর্বকালে। দেখছেন না, কজন সোয়েটারটা বুনে দিয়েছে আমাকে এই পৌষমাসে, দেখুন! কতো কতো উলের সর্বনাশ করে। দেখছেন?'

'আঃ, থামো বুনেছে তো, ঘর মিলিয়েছ দিব্যি! হাতগুলোও ছোট-বড়ো হয়নি। বাঃ!' উনি বিনির বুননকর্মের তারিফ করেন। ওভালটিনের স্বাদের সাথে আহ্লাদে।

আমায় ছিলাম উনি আর একখানা বই নেবার জনাই এই সকালে আমার বাসায় এসেছেন। কিন্তু কি করে কথাটা পাড়া যায়, বা ওঁকে দিয়ে পাড়ানো যায়? বিনির পক্ষের বিনিময়ে গোড়াকার সেই পয়সা উপায়ের যুগে আমার, (পরে যেমন ইতুর দৌলতে আমার এই ইত্যাদি হয়েছে...) বিনিকে আমি ইশারা করি, সে আমার মনের কথার আঁচ পায় কিনা জানি না। নিজের ওভাল-টিন নিয়েই মেতে থাকে। আর অপূর্ব-বাবুর তারিফের সঙ্গে মিশিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খায়।

অগত্যা আমাকেই পাড়তে হয় কথাটা—একটুখানি ঘুরিয়েই: 'পঞ্চাননের বইটা তো বেশ কাটছে বলছিলেন না?' অতঃপর যদি আরেকখানা গল্পের বই ঐরকম.....'

আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি কন: —'হ্যাঁ. কাটছিল বেশ বটে গোড়ার দিকটায়, কিন্তু...কিন্তু...' প্রকাশ করতে তিনি যেন একটু কিন্তু কিন্তুই হন: 'কিন্তু হঠাৎ যে কী হল কে জানে, শ দুয়েক কপির পর তেমনটা আর টানছে না...কী হোলো যে'।

'তার মানে?'

'তার মানেটাই তো বুঝতে পারছি না।' তিনি ঠাওর পান: 'মনে হচ্ছে, ওর পরই পরের পর কতকগুলো বই আপনার বেরিয়ে গেল না বাজারে? এ বইটা আর তেমন চানস্ পেল না কাটবার। আপনার বইয়ের হাতেই আপনার বইটা মার খেল। এত চটপট এতগুলো বই বার করতে দেওয়া আপনার ঠিক হয়নি।'

তার মানে কী, তা আর আমি শুধাতে যাই না। মানে না বুঝলেও মর্মটা টের পাই। মর্মে মর্মে বুঝতে পারি যে আমার বই-ই আমার বইয়ের এই সর্বনাশ করেছে। বাঙালীদের যেমন বাঙালীরা করে থাকে তেমনি বইয়ের সর্বনাশ বই না করিলে আর কে করবে?

একই প্রিয় লেখকের একাধিক বই হাতের নাগালে পেয়ে কিনতে এসে পাঠকদের মনে দ্বন্দ্ব সমাস বাধে—কোনটা কিনব? এসে দোনামোনায় কোনোটাই কেনা হয় না, সবগুলোই কাটা পড়ে।

বইয়ে বইয়ে খেয়োখেয়ি বেধে গিয়ে সেই আহবে আমার বইগুলিই নিজেদের হাতে হতাহত হয় আর কি!

তবুও আমি নিজের সাফাই গাইতে ছাড়ি না—'তার মানে, তা নয়. আপনারা তেমন বিজ্ঞাপন দেননি তো বইটার। লোকে জানেই না যে বইটা বাজারে বেরিয়েছে......'

'মৌচাকে তো দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন। আমাদের সব বইয়ের বিজ্ঞাপন ঐ মৌচাকেই বেরয়—আর কোথাও দেওয়া হয় না। অন্নদাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের বইয়েরও—এমন কি! তাতেই বেশ বই কাটে আমাদের।'

এর উপর আর কী বলা যায়, আমি চুপ করে থাকি। তিনি একটা কথা কয় হঠাৎ—'কিচ্ছু ভাববেন না আপনি, আমরাই আপনার বই কাটিয়ে দেব—দেখবেন।'

'কী করে কাটাবি শুনি? লোককে দিয়ে জোর করে কিনিয়ে...আমি শুধোই?'

'লোককে জোর করতে যাব কেন? কাউকে কি জবরদস্তি কিছু কেনানো যায়?'

'আচ্ছা, লোক না হলো, কেউ

লেকই হোলো না হয়, কিন্তু নগদ বারো আনা বায় করে কাউকে দিয়ে কি জোর জার করে কিছু কেনানো যায় নাকি?'

'কাউকে দিয়ে কেন, আমরাই তো রয়েছি।'

'আছি ঠিকই, কিন্তু অতো টাকা কই আমাদের! টাকা থাকলে না হয় পুরো সংস্করণটাই কিনে ফেলা যেত। আর্তে বই কেটে যেত ঠিকই কিন্তু আমরাও সেই সাথে কাটা পড়তাম। কোনো লাভ হোতো কিনা কে জানে।'

'লাভ হোতো বই কি!' অপূর্ববাবু কন: 'পুরো সংস্করণটা কেটে গেলে খরচ খরচা বাদেও বেশ কিছু আমার লাভ হত বইকি!'

'আজ্ঞে, আপনার লাভের দিকটা ধরিনি। আমি ভাবছিলাম আমার লাভের কথাটা।' আমি জানাই: 'এক হাজারের সংস্করণ বেচে 'শ দেড়েক পেয়েছি আপনার কাছে; এখন যদি বাকী আট শো বই ২৫% কমিশন বাদে কিনতে হয় আমায়—বারো আনা করে দাম তো বইটার? তাহলে আটশো বার আনার শতকরা পঁচিশ বাদে প্রায় ছ'শো টাকা না কতোই গুণতে হবে আমাকে...অত টাকা পাব কোথায় আমরা?'

'আহা, তা কেন? আমরা কিনতে যাবো কেন গো? বইগুলো কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব আমরা...যাতে কিনা চটপট সাবাড় হয়ে যায় সব।' বাতলায় বিনি।

'কী করে করবি শুনি?'

'সে আমি ঠিকই করব। তুমি কিছু ভেব না। আপনিও ভাববেন না অপূর্ব-বাবু।' বিনি আমাদের আশ্বাস দেয়—'বই কি করে কাটে তার রহস্য আমার জানা আছে? আমি—আমরাই সেটা পারব মশাই?'

'ও বুঝেচি?' আমি ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি—'তুই সেই কথা কইচিস? আমরা মানে, উই? তা, বাগচিমশাই, আমার বাকী বই-গুলি কোথায় রেখেছেন বলুন তো তাহলে? আপনার দোকানে না কোনো গুদামে?'

'আমার বই আছে আমার বাড়ির বুক-শেলফে আলমারিতে—আবার কোথায়? দোকানে থান কুড়িক রাখা কেবল বিক্রির জন্য।'

'বেশ, আপনার ওই শেলফের অবস্থানটা কোথায় জানার দরকার। আপনার বাড়ি গিয়ে দেখে আসতে হবে।'

'বাড়িতে কেন? বই তো আমাদের দোকান থেকেই বিক্রি হবার।'

'তা জানি। কিন্তু আমরা কাটাতে যাচ্ছি না? এই কারণেই আপনার বুক-শেলফ-গুলির অবস্থানটা জানা। শেলফ হেলপের সাহায্যে কাটাতে হবে। তা লাগবে না?'

'তাতো লাগবেই। তা যে করেই হোক, বইগুলি কাটিয়ে দিন আমার। আমি বেঁচে যাই। কাটাতে পারবেন তো?'

'পারব না আমরা? কী বলেন আপনি? পড়েননি সেই পদ্যপাঠ? উই আর ইঁদুরের দ্যাখো ব্যবহার।/যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার॥/কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়।/সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়।/ধরাতলে নরাধম খল আছে যত/ঠিক তারা উই অথ ইঁদুরের মত॥' আমি কই—'এর মধ্যেই উই নাকি ধরা পড়ছে—সেই উই-য়ের কথা হচ্ছে।'

'ধরতে পারেন। আমি সে কথা কইতে পারি না। আমি কি আপনাদের নরাধম ভাবতে পারি কখনো?'

'না, না। আমাদের কথা নয়, আপনার বুকশেলফের কথাই। সেগুলো দেখে আসা দরকার। সেলফ-হেলপের সাহায্য চাই যে।'

'স্মাইলস্ সেলফ হেলপ—বইটার কথা কইছেন বুঝি?'

'স্মাইল থেকেও সেলফ-হেলপ, আবার সেলফ-হেলপের থেকেও সেই স্মাইলস্। তেমন কিছু হেরফের না, ইতরবিশেষ নয়। ...কথাটা কী, আমি কলকাতার পুরনো বনেদী পোড়োবাড়ির থেকে খুঁজে পেতে উইদের ধরে শিশিতে ভরে নিয়ে আসব, তারপর এক ফাঁকে আপনার বাসায় গিয়ে, আপনার অবর্তমানেই যদিও, সেই পোকা-দের আপনার শেলফে আমার বইয়ের গাদায় ছেড়ে দিয়ে আসব একসময়, তারপর আর দেখতে হবে না, ঘুণব্যক্তিরাই ঘুণাক্ষরে তামাম বই আমার কেটে-কুটে কাটিয়ে দেবে দেখতে না দেখতে—আপনি টেরটিও পাবেন

না। বুঝেছেন এবার?'

আশঙ্কিত অপূর্ববাবুকে বিনি সান্ত্বনা দেয়—'আমার কথায় কান দেবেন না। ইয়ার্কি করছে দাদা—যদিও এটা ঠিক ইয়ার্কি করার ব্যাপার নয়। যাক, আপনি ভাববেন না, দিন সাতেক সবুর করে দেখুন, এর ভেতরে কী করতে পারি আমি।'

অপূর্ববাবু বিদায় নিলে আমি বলি—'খুকু মা, ইনজুর নয়, জিনের সাহায্যে বই কাটাবি নাকি? বলে তো দিলি বড় গলা করে...ঢ্যাঁড়া যোক এইরূপ!'

'দ্যাখো না তুমি। কী করে কাটাই? সাড়ে নটা বাজে। বাড়ি যাব, চান করব ইস্কুলে যেতে হবে, ইস্কুলের পরে বিকেলে এসে জানাবো সব তোমাকে।'

বিনি চলে গেলে বিছানায় শুয়ে আমি কড়িকাঠ গুণি, ছাদের কড়ি বর্গাদের হাড়-হদ্দ জানতে পাই কিন্তু বিনির কথার কোনো বর্গমূল আমার মাথায় আসে না।

সন্ধেবেলায় সে এলে শুধালাম—'এতক্ষণে তোর ইস্কুলের ছুটি হোলো নাকি

কালকে তোমরা এসো। কাল নিশ্চয় পাবে

রে? কী ছিলো ইস্কুলে আজ? কোনো ফাংশন টাংশন?'

'ছুটির পরেই আমার ক্লাসের এক বন্ধুকে নিয়ে তোমার পঞ্চাননের অশ্বমেধ করতে বেরিয়েছি। এই ফিরছি। আজ শ্যামবাজারের মোড় অব্দি চষে এলাম, আরেকদিন ভবানীপুর-বালিগঞ্জ চষতে বেরুবো, তাহলেই দেখতে পাবে।'

'কী দেখতে পাবো বলছিস না তো? দেখাচ্ছিস না তো কিছু? কী করে টের পাব না দেখলে? আমি কি হাত গুণতে জানি? সারা বিকেলটা করলি কী, তাই শুনি আগে।'

'মহাকালীর থেকে বেরুতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগুরুর বইয়ের দোকান চোখে পড়ল। সেখান থেকেই শুরু করা গেল। শিবরাম চক্রবর্তীর এই বইটা আছে মশাই, পঞ্চাননের অশ্বমেধ? তারা বললেন, নাম শুনেছি বটে বইটার তবে আনা হয়নি এখনো।' 'সে কী মশাই! শিবরাম চক্রবর্তীর বই রাখেন না আপনারা? সেকী দারুণ লেখক শিবরাম। আমাদের ইস্কুলের মেয়েরা তো শিবরাম বলতে অজ্ঞান।' 'তাই নাকি? তাহলে তো এনে রাখতে হবে বইটা। পাঁচ-দশ কপি আনতে হবে কালকেই। নতুন লেখক কি..., তাই এমনি এনে রাখা হয় না, কেউ এ... চাইলে তারপর নিয়ে আসি। বেশ, কালকে তোমরা এসো। কাল নিশ্চয় পাবে।'

'বলিস কিরে! এই করছিস! সর্বনেশে মেয়ে তোরা।'

'তারপর, পাশের দোকানটাতেও সেই তাই। আবার তার পাশেরটায় পুনরাবৃত্তি—এইভাবে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত যেতে আসতে যতো দোকান পড়ল। এধার ধরে এগুলাম, ওধার দিয়ে ফিরে এলাম—এই করতে করতেই।' বিনি সোৎসাহে ব্যক্ত করে—'এর পরে একদিন গিয়ে ভবানীপুর-বালিগঞ্জের দোকানগুলো চষে আসব তাহলেই আর দেখতে হবে না। পঞ্চাননের অশ্বমেধ দেখতে না দেখতে উড়ে যাবে। অপূর্ববাবু নিজেই এসে জানিয়ে যাবেন দেখো না!'

এলেনও অপূর্ববাবু। এসেই খোঁজ নিলেন ওর।—'কই, খুকীকে তো দেখছিনে আজ?'

'কী বললেন? খুকী? আর বলবেন না কখনো। কানে পড়লে ওর রক্ষে থাকবে না।' বিনির হয়ে ওর জবাবটা আমাকেই দিতে হয়: 'খুকী বললে এমন খেপে যাবে সে। ইস্কুলেই পড়ে না হয়, কিন্তু ফ্রক ছেড়ে কবে সে শাড়ি ধরেছে জানেন? এখন আর খুকী নয় মহাশয়।'

'বেশ তাই হোলো।' হাসলেন অপূর্ববাবু: 'কিন্তু গেল কোথায়?'

'এখানে তো থাকে না। মামার বাড়ি থাকে—আমার মামার বাড়ি। মামাত বোন না? আসে মাঝে মাঝে আমার এখানে। বেহালার দিকটায় চষতে যাবে আজ বলছিল আমাকে...সেদিকেই গেছে হয়ত বা।'

'কী বললেন? বেহালার দিকে কী করতে গেছে বললেন?'

'বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক টিকনিক করতে বোধ হয়। ঠিক ঠিক জানিনে।' সামলে নিতে হয় আমায়।

'তাই বলুন। কিন্তু মেয়েটির ভূত-ভবিষ্যতে আশ্চর্য জ্ঞান মশাই।—ঠিকই বলেছিল আমাকে। এই হপ্তাখানেকের ভেতর বিস্তর বই কেটে গেছে আমার......আমি আজ এলাম কেন জানেন? এই খবরটা দিতেই শুধু নয়, আপনাকে একথাও বলতে, আমাকে না জানিয়ে এর দ্বিতীয় সংস্করণ এর মধ্যে যেন আর কাউকে দিয়ে বসবেন না।'

'কেন বলুন তো?' এই নতুন ধরনের কথায় অবাক লাগে আমার। '—দিতে যাব কেন?'

'মানে, এর দ্বিতীয় সংস্করণটা আমিই নিতে চাই। আমিই প্রকাশ করব। ভেতরের ছবি কভার ব্লক সব তো করা রয়েছে, কাগজও কেনা আছে আমার......এই ধরুন, দ্বিতীয় সংস্করণের দরুন এই কিছু টাকা এখন আগাম দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, পরে বাকীটা দেব। এই কথাই রইলো, কেমন?'

'বেশ বেশ। তাই হবে। এতো ভালো কথাই। আপনার কথার ওপরে আবার আমার কথা! আপনি আমার প্রথম প্রকাশক। আপনার দৃষ্টান্ত থেকেই, আপনি আমায় বই নিয়েছেন দেখেই না, আরো আরো প্রকাশক আসেন আমার কাছে? নতুন পাচ্ছি আরো। আপনার

দৌলতেই করে খাচ্ছ তো। আপনি কী বলছেন একথা।'

'আর এই পঁচিশ কপি আপনার বই— কমপ্লিমেন্টারি। লেখকের প্রাপ্য—আপনিও চাননি, আমারও দেওয়া হয়নি। আর এই দশ টাকা আলাদা দিলুম, আজ বিকেলে দেলখোস কেবিনে খুকীকে সঙ্গে নিয়ে... না, না, খুকী নয়, মিস্... মিস্... মিস্ কী যেন?'

আমি ওঁকে মিস করতে দিই না;— ধরিয়ে দিই—মিস বিনি।

'হ্যাঁ, মিস বিনি। আপনার বোন বিনিকে নিয়ে দেলখোস কেবিনে গিয়ে কিছু খাবেন আজ বিকালে।'

অপূর্ববাবুর অন্তর্ধানের পর, এক হাতে একশ টাকার একখানা অন্য হাতে দশ টাকার অপর এক নোট নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি আবার। কড়িকাঠের মুখোমুখি।

এবার বুঝি বিনির বর্গমূলের একটু হিসেব পাই। ওর মূল্য বুঝি। সত্যি, আর কোন বোন আমার এমন বন্ধুর মত? কোনো বন্ধুর সঙ্গে কি ওর তুলনা হয়? না, বিনির কোনো বিনিময় নেই।

অমূল্য বিনির থই না পেয়ে থ হয়ে পড়ে থাকি বিছানায়—কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে......বিলকুল বিনিময় হয়ে!

বর্গমূলের আঁক থেকে ভাবতে ভাবতে কড়ির মূল্যে চলে যাই। কমপ্লিমেন্টারির এই কপিগুলি বেচে আরও কিছু পয়সা-কড়ির আমদানি করা যায় নাকি? ভাবি তাই।

নইলে এই বাসা বাড়িতে বইগুলি রাখলে কখন যে হরিলুট হয়ে যাবে। এ ও সে এসে চেয়ে নিয়ে যাবে, ফেরত দেবে না আর। তার চেয়ে, বিনি তো বইয়ের মার্কেট বানিয়েই রেখেছে, তার চষা-ফসলের ক্ষেতে গিয়ে আমি উপরি কিছু ফলাও করি না কেন!

শুয়ে শুয়ে সেই ফন্দীটা আঁটছিলাম, এমন সময় সাক্ষাৎ বিনির সশরীর আবির্ভাব।

'কীরে! এখুনি এলি যে! হয়ে গেল তোর বেহালার কাজ?'

'জায়গাটা চাষবাসের বাইরে দাদা। চষব কি, হালই বসানো গেল না কোনোখানে। মতমতো জায়গাই পেলাম না তার। বেহাল হয়ে ফিরতে হয়েছে।'

'নাজেহাল হয়ে ফিরছিস তাহলে?'

'ট্রাম থেকে নামতেই হোলো না। নামবার কোনো যো-ই পেলাম না বেহালায়। যে ট্রাম ধরে গেলাম, বেহালার টার্মিনাস ঘুরে ফিরে এলাম সেই ট্রামেই। দেখতে দেখতে গেলাম এলাম—রাস্তার দুধারেও

'হাতে হাতেই দেখতে পাচ্ছি, এই যে দ্যাখনা!'

কোনোখানেই বইয়ের কোনো দোকান চোখে পড়ল না। নেমে আর কী করবো বলো? ট্রাম ভ্রমণ সাঙ্গ করে ফিরলাম এখন।'

'বেশ করেছিস। এই দ্যাখ, অপূর্ব-বাবু এসে আজ কী দিয়ে গেছেন। আর এই টাকাটা দিয়েছেন—দেলখোস কেবিনে আমাদের ভালোমন্দ কিছু খাবার জন্যেই।'

'খাচ্ছে বটে? তাহলে তো বেশ ভালোই কেটেছে তোমার বই।'

'আমি কী বলব? আমার বই অকাট্য, বললে আমি বলেছি কি!'

'বলো, আমার একটা কথা রাখবে? বলবো? এই একশ দশ টাকা আজে বাজে খরচ করে উড়িও না। আর কিছু নেই। [illegible] কী [illegible] আপনারা? এই টাকাটার বরং তুমি [illegible] করো। [illegible] কাগজ কিনে [illegible]। [illegible] খাবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বই [illegible] [illegible] তোমার বই [illegible] [illegible] [illegible]! শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট [illegible] পর্যন্ত শখানেক বইয়ের দোকান আছে। প্রত্যেক যদি দশখানা করেও রাখে, তোমার পুরো সংস্করণ একদিনেই কাবার। দেখতে পাচ্ছ?'

'হাতে হাতেই দেখতে পাচ্ছি—এই যে! দ্যাখ না!' বর্গমূল থেকে আমার দৃষ্টি হাতের কড়িতে নামিয়ে আমি আমাকে।

দু হাতে দুটি বাণিজ্যপ্রদর্শনীর 'দেখেছিস?' দু হাতে দুটি বাণিজ্য-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন আমার।

ক্রমশ

পৃথিবী এবং চাঁদ যমজ ?

একথা কি ঠিক, পৃথিবী এবং চাঁদের ন কোন ভূতাত্ত্বিক ঘটনা সমসূত্রে থত ? বিশিষ্ট সোভিয়েত জ্যোতি-দার্থবিজ্ঞানী ডঃ নিকোলাই কোজিরেভ প্রতি দাবি করেছেন, প্রশ্নটি হয়ত উড়িয়ে ওয়া যায় না। বরং পৃথিবী এবং চাঁদের তাত্ত্বিক আগ্নেয়কাণ্ড পরীক্ষা করে মনে য়েছে, এরা যেন 'অবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা'। ? যেন পৃথিবীরই এক অতীত মহাদেশ। ান পৃথক মহাজাগতিক অস্তিত্ব নিয়ে থনই তার আবির্ভাব ঘটে নি।

গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ডঃ াজিরেভ এবং তাঁর সতীর্থরা পৃথিবী চাঁদের পারস্পরিক ভূ-তাত্ত্বিক আগ্নেয়-ণ্ডের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আসছেন। ঃ কোজিরেভের বক্তব্য, 'এই পর্যবেক্ষণ লাতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমরা ক্ষ্য করেছি। দেখেছি, পৃথিবীতে যখনই কান আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটল, মনি—অর্থাৎ সেই মুহূর্তে অথবা এক াধ দিন পর চাঁদের বুকেও অনুরূপ টনার চিহ্ন ফুটে উঠল। একবার নয়। এ রনের ঘটনা আমরা একাধিকবার লক্ষ করেছি। এই যে সমকালীনতা, এর সাত্য-ারের তাৎপর্য কী ?'

ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ কোজিরেভ বলেছেন, 'ধরুন, জাপান অথবা মিশরের কোন জায়গায় হঠাৎ প্রচণ্ড ভূকম্পন ঘটে গেল। এই ঘটনার দু একদিন পর আমরা দেখলাম, চাঁদের কোন জ্বালামুখের ডগায় উজ্জ্বল একটি শিখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিখার চারপাশে গ্যাসের সমাবেশ। পৃথিবীতে কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ডগায় যেমনটি দেখা যায়, দেখতে ঠিক সেই রকমই।'

কী বলবেন ? কাকতালীয় ঘটনা ?

ডঃ কোজিরেভের উত্তর : আমার মনে হয়, এ ধরনের ঘটনা মোটেই কাকতালীয় নয়। কারণ, একাধবার হলে হতো। গত দশ বছরে এমন ঘটনা বার বার ঘটেছে। যখনই পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূকম্পন ঘটল, অমনি চাঁদের কোন না কোন জ্বালামুখের ডগা জ্বলে উঠল। এমন একটি সমকালী-নতার মধ্যে পারস্পরিক কোন যোগসূত্র নেই, এটা কী করে আপনারা অস্বীকার করবেন ?

দেখা গেছে, নিজস্ব পরিক্রমণ পথে চলতে গিয়ে পৃথিবী এবং চাঁদ যখন দ্রুত বেগে পরস্পর কাছাকাছি সরে আসে, অথবা দ্রুত পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, উভয়ের [illegible] তখন অস্বাভাবিক

এক নজরে

যাদের আমরা পার্থিব জগৎ বলে চিহ্নিত করি, তার মধ্যে আরও বিচিত্র জগতের দৃষ্টান্ত হয়ত বিরল নয়। যে সমস্ত বস্তুকণার সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের কোন কোনটির অনুরূপ অথচ বিপরীতধর্মী কণাও বিশ্বজগতে বাস করে। দ্বিতীয় এই শ্রেণীর কণাদেরই বলা হয় প্রতিবস্তুকণা বা অ্যান্টিপার্টিকল। আর যে বস্তু এই কণার সাহায্যে গঠিত, তার নাম অ্যান্টিম্যাটার। ওরা যেন বস্তুরই প্রতিবিম্ব।

প্রতিবস্তুকণার প্রথম উদাহরণ পজিট্রোন। এটি ইলেকট্রোনের প্রতিরূপ। ইলেকট্রোনের যা ওজন, পজিট্রোনের ওজনও তাই। একটি ইলেকট্রোন কণার মধ্যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আধান থাকে, একটি পজিট্রোনের মধ্যেও ঠিক ততটা বিদ্যুৎ আধান থাকে। পার্থক্য এই, ইলেকট্রোনের আধান ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী, কিন্তু পজিট্রোনের আধান ধনাত্মক তড়িৎধর্মী। পরে একের পর এক তৈরি হয়েছে অ্যান্টিডিউটেরন, অ্যান্টিহিলিয়াম প্রভৃতি।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের পরিচিত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের মত প্রতি-হাইড্রোজেন, প্রতি-অক্সিজেন, প্রভৃতি প্রতিবস্তু দিয়ে গঠিত হয়ত অনেক গ্রহ এবং নক্ষত্র বিরাজ করছে যাদের বলা চলে প্রতি-জগৎ বা অ্যান্টি-ওয়ার্ল্ড। বস্তু এবং প্রতিবস্তুর মিলন ঘটলে উভয়েরই বস্তু হিসেবে আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। পরিবর্তে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড শক্তি। মহাবিশ্বে মাঝে মাঝে প্রতি-জগৎ এবং জগতের মধ্যেও হয়ত মিলন ঘটে। আর যখনই তা ঘটে তখন হঠাৎ মহা-জাগতিক বিকিরণের মাত্রা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ঝলকে ঝলকে সেই বিকিরণ ঠিকরে এসে পড়ে পৃথিবীরও পরিমণ্ডলে। মার্কিন দেশের অ্যাপলো নভোচররা চাঁদের পথে পাড়ি দেবার সময় ওই ধরনের বিকিরণের সন্ধান পেয়েছেন।

কীভাবে জগৎ এবং প্রতি-জগৎ পরস্পর মিলে প্রচণ্ড বিকিরণ শক্তি সৃষ্টি করে ছবিতে দেখান হয়েছে। সূক্ষ্ম বক্ররেখা প্রতি-জগতের সঞ্চার পথ। তীর চিহ্নিত পথ ধরে মাঝে মাঝে ওরা ছুটে যায় ডান অথবা বাঁ পাশে ঘূর্ণায়মান ব্রহ্মাণ্ডের দিকে। সেখানে সাধারণ বস্তু দিয়ে তৈরি কোন নক্ষত্র বা গ্রহের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরো-পুরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় (বড় বড় সাদা অংশগুলি লক্ষ্য করুন)। ছবিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তৈরি।

উদ্গম ঘটেছে পৃথিবীতেই। চাঁদের ভূস্তরের ভূপৃষ্ঠের কোথাও জমে থাকা পাথর বা মাটির স্তর হয়ে উঠল। অথবা তার কোন এক অঞ্চলের ভূগর্ভ থেকে সবেগে বেরিয়ে এল গ্যাসের ফোয়ারা। আর ঠিক ওই একই সময়ে আমাদের এই গ্রহটির কোন না কোন অঞ্চলে অনুভূত হল মৃদু অথবা প্রবল ভূকম্পন। এ থেকে এটাই মনে হয়, পৃথিবীর ভূস্তরে যখন কোন পরিবর্তন ঘটে, তখন চাঁদের ভূস্তরেও অনুরূপ কোন পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেন পৃথিবী এবং চাঁদ দুই যমজ। তাই তাদের পারস্পরিক অনুভূতি অথবা ঘাত-প্রতিঘাত অমন সমসূত্রে গ্রথিত।

*

প্রশ্ন এই, পৃথিবী এবং চাঁদের পারস্পরিক এই প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা যোগান কতটা সহজসাধ্য হবে? বলা শক্ত।

প্রথমত, চাঁদ এবং পৃথিবী যখন কাছাকাছি সরে আসে তখন তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বল বেড়ে যায়। এর ফলে উভয়ের সংবদ্ধ ভূস্তরের কোন জায়গা আলগা হয়ে পড়ে, কোন জায়গা আবার বেশি সংবদ্ধ হতে শুরু করে। ভূস্তরের এই পরিবর্তনে কোন কোন জায়গায় ফাটলও দেখা দিতে পারে। যার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে ভূস্তরের গভীরে জমে থাকা জ্বলন্ত গ্যাস বা আগ্নেয় বস্তুসামগ্রী।

দ্বিতীয়তঃ, হয়ত ধরুন, পৃথিবীর গভীরে কোন একটি জায়গায় হঠাৎ সঙ্কোচন ঘটল। সঙ্কোচনের ফলে জায়গাটি হয়ত বসে গেল। তখন চাঁদের কোন অঞ্চল থেকে সেখানকার দূরত্ব আগে যতটা ছিল, তার তুলনায় এবার নিশ্চয় খানিকটা বেড়ে যাবে। আর দূরত্ব বাড়া মানেই উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক আকর্ষণের পরিবর্তন। আর তেমনটি যদি ঘটে, চাঁদের ভূস্তরও হয় কিছুটা আলগা হবে, অথবা আঁটোসাঁটো হয়ে থিতিয়ে পড়বে। ভূস্তরের এই সাময়িক বিচ্যুতির ফলে চাঁদের কোন অংশে ফাটল দেখা দিতে পারে, যার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে সেখানকার ভূ-স্তরের গভীরে জমে থাকা জলীয় বাষ্প এবং নানাপ্রকার ভূতাত্ত্বিক গ্যাস।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের পর ডঃ কোজিরেভ এই দ্বিতীয় মতবাদটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন সবচাইতে বেশি। তাঁর ধারণা, চাঁদের ওপরকার ভূস্তরের কাঠামো এবং সেখানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও বিশদ খবরাখবর জানা গেলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোথায় এবং কখন কী ধরনের ভূকম্পন ঘটতে পারে তার পূর্বাভাস যোগান সহজতর হবে।

তা না হয় হল। কিন্তু পৃথিবী এবং চাঁদ যে দুটি যমজ গ্রহ, এটা প্রমাণ করার কী হবে? বলা বাহুল্য, এমন একটি প্রমাণের সপক্ষে গ্রহণযোগ্য নজির যোগাড় করার কাজটা নিশ্চয় খুবই সহজ হবে না। এক, পৃথিবী এবং চাঁদের জন্মলগ্ন একই কী না, সেটা জানা দরকার। দুই, উভয়ের ভূতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে কতটা সমতা আছে সে সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যের প্রয়োজন। তিন, মিল বা গড়মিল পরস্পরকে কতটা প্রভাবিত করে সেটাও জানতে হবে।

ডঃ কোজিরেভ-এর বক্তব্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর পর্বতমালা, সাগরের গঠন (চাঁদের সাগর অবশ্য শুকনো) এবং তাদের বিন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। দেখা গেছে, পৃথিবীর উত্তরগোলার্ধে যেমন পাহাড়-পর্বত এবং স্থলভাগের পরিমাণ বেশি, চাঁদেরও উত্তর গোলার্ধে তেমনি প্রচুর পাহাড়-পর্বত এবং উঁচু জমির সমাবেশ। পৃথিবীর যে ধরনের ভৌগোলিক অঞ্চলে আল্পস পর্বতমালা বিরাজ করছে, চাঁদেরও অনুরূপ অঞ্চলে বিরাজ করছে কোপারনিকাস পর্বতমালা। এখন দেখা দরকার, আলপস এবং কোপারনিকাস কি একই সময়ে তৈরি হয়েছিল? আলপস এবং কোপারনিকাসের শিলাস্তরের বিন্যাস কি একই ধরনের? সোভিয়েত দেশের যন্ত্রচালিত চন্দ্রযান লুনা-১৬ এবং লুনা-২০ চাঁদের দেশ থেকে যে সব পাথরকুচি কুড়িয়ে এনেছে তাদের পরীক্ষা করার পরই হয়ত বলা সম্ভব, চাঁদ এবং পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে কতটা মিল অথবা গরমিল। এবং তারা সমকালীন কী-না। উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'ও ইতিপূর্বে চাঁদের ভূস্তর ফুঁড়ে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসার সংবাদ দিয়েছে। মাঝে মাঝে চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে ভূগর্ভস্থ গ্যাস বেরিয়ে আসে সে কথা 'নাসা'র বিজ্ঞানীরাও সমর্থন করেছেন। প্রায় একই সময়ে পৃথিবী এবং চাঁদের যে ভূকম্পন ঘটতে দেখা যায় সে কথা তাঁরাও স্বীকার করেন। তবে চাঁদের পিঠে জ্বলন্ত কোন আগ্নেয়গিরির সন্ধানের সংবাদ এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

উল্লেখ্য, চাঁদের বুকে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির কথা ফলাও করে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ডঃ কোজিরেভ এবং ডঃ ইয়েজেরসকি। ৩ নভেম্বর, ১৯৫৮, ক্রিমিয়ার মানমন্দির থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে

চাঁদের ছবি তুলতে গিয়ে সেখানকার অ্যালফোনসাস পর্বতমালার মাঝে বরাবর একটি [illegible] মত উজ্জ্বল একটি [illegible] দেখতে পান। তখন [illegible]। [illegible] এই ধ‍ুঁয়োর মধ্যে তাঁরা কার্বন [illegible] (C-২) সন্ধান পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। অবশ্য এরও আগে, ১৯৫৮র অক্টোবরে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী ডিনসমোর অলটার মীল এবং অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে ছবি তুলে আল-ফোনসাসের চূড়ায় নাকি একটি ফিকে ধরনের আভা দেখতে পান। যেন ধ‍ুঁয়োর স্তূপ ছড়িয়ে পড়ছে। তবে তার কাছাকাছি জ্বালামুখ আরজাচেলে তেমন কোন ঘটনা চোখে পড়ে নি।

বলা বাহুল্য, শুধু ভূস্তরই নয়, চাঁদ এবং পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। চাঁদের প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীর বাতাস এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে যায়। এবং বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে আলোড়িত হয়। কীভাবে হয়, চাঁদ এবং পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থানে কখন এবং কোন জায়গায় বায়ুমণ্ডল কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে সে সব তথ্য জানা গেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগানর ব্যাপারটাও অনেকটা সহজতর হবে।

সিগারেট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়

একটি সিগারেট বা অনুরূপ কোন ধূমপানের পর আরও একটি সিগারেট বা অনুরূপ কোন ধূমপানের জন্যে আপনি প্রতীক্ষা করেন কেন? খাবারের ব্যাপারে আমাদের যুক্তি, খিদে পায়, তাই আমাদের খেতে হয়। খিদের সময় খাবারের জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে উঠি। বিজ্ঞানী-দের ভাষায়, খাবার কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু নয়। স্থূল জৈবিক দেহটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই খাবার দরকার।

কিন্তু প্রশ্ন এই, সিগারেটের ধ‍ুঁয়ো সেবনও কি ওই একই কারণে প্রয়োজন হয়? না কি, ইচ্ছে করে বলেই লোকে সিগারেটের ধ‍ুঁয়ো পান করে থাকেন? কারণ যাই হোক না কেন, সম্প্রতি ইয়র্কশায়ারের টোবাকো রিসার্চ কাউন্সিল ল্যাবোরেটরির দুইজন গবেষক জি এইচ হল এবং ক্যাথলিন মরিসন জানিয়েছেন, সিগারেটের ধ‍ুঁয়োর সঙ্গে যে নিকোটিনটুকু আমরা শরীরে গ্রহণ করি, তার কজ্র অ্যাড্রিনেল গ্রন্থি থেকে 'করটি-কোস্টেরয়েড' নামে এক শ্রেণীর হরমোন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এর ফলে দৈহিক [illegible] ব্যাহত হয়। [illegible] ইঁদুর-এর [illegible] নিকোটিন প্রয়োগ করে এঁরা দেখেছেন, ইঁদুরগুলিকে যখনই নিকোটিন দেওয়া হয়, তারা চাঙ্গা হয়ে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু নিকোটিন প্রয়োগ বন্ধ করলেই কাজের বেলায় কেমন যেন ঢিমেতাল হয়ে পড়ে।

কিন্তু মারাত্মক দিকটা এই, নিকোটিন সেবনের ফলে তাদের শরীরে উপযুক্ত পরি-মাণ রোগপ্রতিরোধকারী কণা বা 'অ্যান্টি-বডি' তৈরি হতে বাধা পায়। হল এবং মরিসন প্রত্যেকটি ইঁদুরকে, দৈনিক তিরিশটি সিগেরেট থেকে যতটা নিকোটিন আমরা দেহস্থ করি, ততটা নিকোটিন খেতে দিয়ে দেখেছেন, তাদের প্লীহা, রক্তবহা নলের সংযোগস্থল এবং ফুসফুসের রোগ-প্রতিরোধের দক্ষতা দারুণভাবে কমে গেছে।

হল এবং মরিসন জানিয়েছেন, [illegible]

এর জন্যেই সিগারেটখোরীরা ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হন বেশি। এঁদের বক্তব্য, নিকোটিন, তা তামাক বা সিগারেটের ধ‍ুঁয়ো, যার মাধ্যমেই শরীরে প্রবেশ করুক না কেন, আপনার শরীরের স্বাভাবিক রোগ-প্রতি-রোধকারী কণা তৈরি করতে বাধা সৃষ্টি করে।

সমরজিৎ কর

শীতের রুক্ষতার
মধ্যে... আপনার
ত্বকে 'অকাল বসন্তের'
ছোঁয়া লাগুক
বাহার ফুটিয়ে তুলুন। দেখুন,
আপনার ত্বক কত সুন্দর, কত কোমল
হয়ে উঠেছে।
ত্বকের সৌন্দর্য্য বাড়াতে নিভিয়ার
জুড়ি নেই...তেলতেলে ভাবও কম।
আঠার মত লেগে থাকে না, বা
চকচক করে না। লাগাবার সাথে সাথেই
আপনার ত্বকের সাথে মিশে যায়
উপরন্তু আপনার ত্বকের পুষ্টি যোগায়,
আর্দ্রতা বাড়ায় আর, ত্বক রকাও
হয়ে চমৎকার! এবার, এই শীতে
নিভিয়া ব্যবহার করে আপনার সৌন্দর্য্য
অম্লান রাখুন।
পরের শীতে এবং ভবিষ্যতেও
নিভিয়া ক্রীমের প্রতি আপনার অনুরাগ,
থেকেই যাবে।
নিভিয়া—সুস্থ, সুন্দর
ত্বকের রহস্য!

বিয়াট্রিস স্ট্রেইট

॥ বিয়াল্লিশ ॥

অবশেষে ইংল্যাণ্ডে প্রবেশের অনুমতি পেল উদয়শঙ্কর। এবং ছোট একটি রঙ্গালয়ে তার নৃত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল মাত্র সাত দিনের জন্যে। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ই যথেষ্ট। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছে উদয়শঙ্কর, লণ্ডনেও পেল তেমন। রঙ্গালয় ছোট বলে বহু দর্শককে আসন না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হল।

তবে এখানেই উদয়শঙ্করের সদাপ্রসন্ন নিয়তি তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আর এক ধনকুবেরের। স্ত্রীভাগ্যে যার ধন, এমন একজন মানুষ সপরিবারে এলেন উদয়-শঙ্করের নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখতে লণ্ডনে। দেখে মুগ্ধ হলেন, বিস্মিত হলেন। এবং নাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাশি রাশি ফুল নিয়ে অভিনন্দন জানাতে এলেন উদয়-শঙ্করকে।

যথারীতি তার সঙ্গে করমর্দন করে সেই ধনবান ইংরেজ বললেন, "আমার নাম এল এলমহার্স্ট। এই যে আমার স্ত্রী ডরোথি। আর এ হল বিয়াট্রিস স্ট্রেইট, ডরোথির মেয়ে।"

বিয়াট্রিস অসামান্য রূপসী। তার চোখ সুন্দর, নাক সুন্দর, সুন্দর তার প্রতি অঙ্গ। বিয়াট্রিস সামনে এসে দাঁড়ালে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। উদয়শঙ্কর ও তার দলের আর সব মানুষকে দেখতে দেখতে বিয়াট্রিসও যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে।

এলমহার্স্ট উদয়শঙ্করকে বললেন, "আপনার নাম শুনেছি বেশ কিছু দিন ধরে। আজ আপনার নাচ দেখে খুশী হলাম—আমাদের সকলের খুবই ভাল লেগেছে।"

অল্প হেসে সবিনয়ে উদয়শঙ্কর বলল, "ধন্যবাদ।"

এলমহার্স্ট প্রথম দিনই বড় অন্তরঙ্গ স্বরে উদয়শঙ্করকে বললেন, "আমার মনে হয় আপনারা এখন বেশ ক্লান্ত। অনেক জায়গায় নাচতে হয়েছে তো! এখন একটু বিশ্রামের দরকার—তা-ই না?"

এলমহার্স্ট কি বলতে চান তা স্পষ্ট করে বুঝতে না পেরে উদয়শংকর তাঁর কথা মেনে নিয়ে আস্তে বলল, "হ্যাঁ।"

"আমার ওখানে একটু বিশ্রাম করবেন আপনারা সকলে। দয়া করে কাল আসুন চা খেতে—" এলমহার্স্ট বললেন, "আমাদের এস্টেট টটনেস-এ, দক্ষিণ ডেভনশ্যায়ারে।"

উদয়শঙ্কর তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বলল, "ধন্যবাদ।"

এলমহার্স্ট তাঁর পুরো ঠিকানা দিলেন। দিয়ে উদয়শঙ্কর ও তার দলের সকলকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। প্রথম দিন ডরোথি ও তার মেয়ে বিয়াট্রিস বেশী কথা বলল না। তবে তারাও জানাল উদয়শঙ্করকে সাদর আমন্ত্রণ।

ভূস্বামী এলমহার্স্ট অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। পরিষ্কার ও পরিপাটী তাঁর প্রাসাদোপম বাসস্থানের চারপাশ। বাগান বেশ বড়। সেখানে বড় বড় সুগন্ধি গোলাপের গাছ। কোথাও কোথাও ঝাউ-এর সারি। খোলা জায়গায় একটা নাটমঞ্চও আছে। এলমহার্স্ট আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এবং ভারতবর্ষের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু।

এলমহার্স্ট-এর আবাসস্থল ডার্টিংটন হলে একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্রও আছে। শিল্পের নানা শাখায় অভিজ্ঞ অধ্যাপকরাও আছেন এখানে। তার মধ্যে অভিনেতা মাইকেল

রাসলীলা নৃত্যে উদয়শঙ্কর, সিমকী, কনকলতা, রবিশঙ্কর ও সম্প্রদায়

লেখক আছেন—তিনি সুপ্রসিদ্ধ রুশ ঔপন্যাসিক আন্তন শেখভের আত্মীয়।

শীত ঋতু এখন গভীর। লণ্ডনের চেয়ে উন্মুক্ত ডেভনে শীতের দংশন অনেক বেশী ধারালো। তবুও এলমহার্স্ট দম্পতির আন্তরিকতা, লাবণ্যময়ী বিয়াট্রিসের মধুর হাসি ডার্টিংটন হলের চায়ের আসর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তাপে মুখর করে রাখল। কথায় কথায় উদয়শঙ্কর শুনল এলমহার্স্ট দম্পতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয়ের কাহিনী এবং শ্রীনিকেতন উদ্বোধনের ইতিহাস।

এলমহার্স্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় আমেরিকায় ১৯২০-২১ সালে। তিনি সেখানে তখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র। সে-সময় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহের প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমেরিকাবাসীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ভিতরে-ভিতরে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন।

তিনি এণ্ডরুজকে লিখলেন, "This visit of mine to America, has produced in me intense contempt for money."

কিছু পরে আবার লিখলেন, "যখন আমরা ভারতবর্ষে থাকি, তখন অর্থ আমাদের কি সুখ দিতে পারে তাহার কথাই কল্পনা করি। কিন্তু যখন এই দেশে আসি, তখন ধনের বিপদ কোথায় বুঝিতে পারি। এখন আমার কাছে স্পষ্ট হইয়াছে যে, ধন সৃষ্টির চেয়ে নষ্ট বেশী করিতে পারে। ধনকে সচল ও জীবন্ত রাখিতে হইলে ত্যাগের প্রয়োজন।"

গ্রামসংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা শুনে আদর্শবাদী ইংরেজ যুবক এলমহার্স্ট তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর আমেরিকান বান্ধবী ডরোথির সঙ্গে কবির আলাপ করিয়ে দেন।

ডরোথি বিধবা। কিন্তু সে ক্রোড়পতির স্ত্রী। তার পিতাও ক্রোড়পতি। সুতরাং এলমহার্স্ট-এর বান্ধবী ডরোথি স্ট্রেইট বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকটের কথা শুনে ডরোথি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে, ধনী তরুণীদের একটা ক্লাব আছে। তার নাম জুনিয়র লীগ। সেই ক্লাবের সদস্যাদের সঙ্গে সে রবীন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দেবে। এবং তা হলে বিশ্বভারতীর জন্যে সহজেই অর্থ সংগৃহীত হবে।

তার কথা শুনে আশার আলো জ্বলে উঠল রবীন্দ্রনাথের মনে এবং তিনি খুব আগ্রহ সহকারে ধনী তরুণীদের ক্লাব জুনিয়র লীগে এলেন। কিন্তু বৃথাই তাঁর আগমন। ডরোথি সব সদস্যাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়ে নিজে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বসে রইলেন এক দিকে। বিশ্বভারতীর কথা তোলবার কোন অবকাশ তিনি পেলেন না। ক্লাবে অন্য বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু এক সময় অধ্যাপক উডস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কোন মত আছে কিনা।

অধ্যাপকের এই প্রশ্ন শুনে এতদিন পর রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বভারতী সম্পর্কে এ-দেশের মানুষের উদাসীনতার কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর 'স্যার' উপাধি ত্যাগের কথা ভেবেই এরা যেন তাঁকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। এ কথা বোঝবার পর রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন আমেরিকায় আর অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবেন না।

কিছু পরে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলমহার্স্ট রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন যে, তিনি বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার কর্মে যোগ দিতে চান। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানালেন, বিশ্বভারতীর অবস্থা এমন সচ্ছল নয় এবং দেশেরও অবস্থা এমন অনুকূল নয় যাতে শিগগির তিনি তাঁর কল্পনাকে রূপদান করতে পারবেন।

এলমহার্স্ট লিখলেন, টাকার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কবিকে ভাবতে হবে না। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এলমহার্স্ট স্বয়ং এলেন শান্তিনিকেতনে। স্থির হল বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার সাহায্য আসবে আমেরিকা থেকে। যে ধনী বিধবা জুনিয়র লীগের সদস্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গিয়ে-

ছিল, শ্রীনিকেতনের কাজে সে-ই অর্থ-সাহায্য করবে। সে শ্রীমতী ডারোথি স্ট্রেইট।

ঠিক হল সুরুল হবে গ্রামোদ্যোগের কেন্দ্র। কয়েক মাস আগে সেখানে কয়েকজন অসহযোগী ছাত্র এসেছিল কলকাতা থেকে—নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এর মধ্যেই তারা কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ঠিক হল, তাদের নিয়ে এলমহার্স্ট কাজ শুরু করবেন। কিন্তু তার আগে দেশের কোথায় কৃষি-আদি কাজ কিভাবে চলছে, গ্রাম্য সমস্যা কেমন—সেসব তথ্য অবগত হওয়ার জন্যে তিনি সফরে বেরিয়ে পড়লেন।

ডরোথি উদয়শঙ্করকে বলল যে, সে-ও গেছে ভারতবর্ষে। যথাসময়ে এলমহার্স্ট-এর সঙ্গে তার শুভপরিণয় হয়ে গেছে। শ্রীমতী স্ট্রেইট হয়েছে শ্রীমতী এলমহার্স্ট। লাবণ্যময়ী বিয়াট্রিসও তার সঙ্গে এসে উঠেছে এলমহার্স্ট-এর গৃহে।

১৯৩০ সালে ডরোথি ভারতবর্ষে প্রথম এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বরোদা থেকে শান্তিনিকেতনে সবে ফিরেছেন। শ্রীনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব। ১০ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে হল সমবায় প্রতিনিধিদের সম্মেলন। বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন দপ্তরগতভাবে।

তিনি সভার উদ্বোধন করলেন। সভাপতিত্ব করলেন এলমহার্স্ট।

সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে এলমহার্স্ট-এর পরিচয় দীর্ঘকালের এবং সেই হেতু ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রচুর। এলমহার্স্ট উদয়শঙ্করকে বললেন তার সুবিধামতন যখন-তখন ডার্টিংটন হলে চলে আসতে। বললেন, খোলা আকাশের নিচে তাঁর কাননের মঞ্চে নৃত্যের অনুষ্ঠান করতে।

উদয়শঙ্কর আনন্দের সঙ্গে রাজী হল। এলমহার্স্টকে বলল, সে যাবে মাস কয়েকের জন্যে ভারতবর্ষে, সেখান থেকে আমেরিকায়। পরে আবার ইংল্যান্ডেই আসবে। তখন সে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে এলমহার্স্ট-এর সঙ্গে।

বিয়াট্রিসের সঙ্গেও কথা হল উদয়শঙ্করের। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি তারও শ্রদ্ধা অপরিসীম। সে-ও ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষ ভাল করে দেখতে চায়, সেখানকার রীতি-নীতি পূজা-পার্বণের কথা জানতে চায়।

সে রাতে এলমহার্স্ট-এর অতিথি হয়ে থাকতে হয়েছিল উদয়শঙ্কর ও তার সম্প্রদায়কে।

"মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।।"

সারা দিনরাতের অবসাদ তিমিরবরণের। ইউরোপ ও আমেরিকার কোলাহলময় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি পরিভ্রমণ করে ফিরলেও তিনি বড় বিষণ্ণ, তিনি নিঃসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যত্ন করে পড়েছেন তিমিরবরণ। এখন তিনিই তাঁর একমাত্র সঙ্গী।

"নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ—
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুট বর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে।"

তিমিরবরণ এক সময় গভীর পরি-তৃপ্তির সঙ্গে অনুভব করেন যে, তিনি আর এক নতুনতর শক্তি তাঁর অন্তরে [illegible] প্রধান হয়ে উঠেছে। এতদিন ইউরোপে থাকার পর তিনি বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছেন যে, পাশ্চাত্যের অর্কেস্ট্রা দেশের সংস্কৃতি উন্নয়নেরই শিল্পের একটি অঙ্গ। প্রত্যেক দেশেই রয়েছে স্টেট অর্কেস্ট্রা। এবং আপামর জনসাধারণ ঐকতানে উৎসাহী। সঙ্গীত-শিল্পের সব শাখার ঊর্ধ্বে ইউরোপের অর্কেস্ট্রা।

তিমিরবরণ দেশে-দেশে উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন বহু ঐকতান। শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি দেখেছেন দেড় শো থেকে দু শো মতন যন্ত্রশিল্পী অংশ গ্রহণ করে এক-একটি অর্কেস্ট্রা সম্প্রদায়ে। ইউরোপে থেকেই তিমিরবরণ বুঝতে পেরেছেন যে, ঐকতান বাদনের ভিতর দিয়ে বলা যায় কত বিচিত্র কাহিনী, প্রকাশ করা যায় মানুষের সুখ দুঃখ উচ্ছ্বাস ক্রন্দন, ঘোষণা করা যায় দম্ভ ও অমিতবিক্রম।

প্রথম যৌবনে গুরুজী আলাউদ্দীন খান-এর মাইহার ব্যান্ড শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিমিরবরণ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা, এবার তিনি ভাবতে শুরু করলেন আর এক ব্যাপক এবং মহান সৃষ্টির কথা। ভাবলেন, অসংখ্য ভারতীয় বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যেও তো গড়ে তোলা যায় ইউরোপের মতন অর্কেস্ট্রা—সুরে-সুরে বলা যায় নানা গল্প গান কবিতা—প্রকাশ করা যায় মানুষের এক-এক বৃত্তি, হৃদয়ের গভীর অনুভূতি।

অপচয়ের কথা আর তেমন পীড়া দেয় না তিমিরবরণকে। নতুন সৃষ্টির প্রেরণা তাঁকে বিভোর করে রাখে।

> "ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর
> বীজে পরিণত গর্ভে। আমি নিদ্রাতুর
> আলস্যশয্যার 'পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
> ভেবেছিনু, সব কর্ম রহিল পড়িয়া॥
> প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন;
> দেখিনু, ভরিয়া আছে আমার কানন॥"

দেখতে দেখতে ১৯৩৩ সালের কয়েকটা মাস কেটে গেল। উদয়শঙ্কর আবার ফিরবে ভারতবর্ষে। পৌঁছতে পৌঁছতে জুন মাস এসে যাবে। তখন গ্রীষ্মের দাবদাহে উগ্র তার জন্মভূমি। কখনো কখনো আকাশে মেঘের সমারোহ, আর এক-এক পশলা বৃষ্টির ঝাপটা—আর সজল হাওয়ার মাতামাতি। দেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুল উদয়শঙ্কর।

চঞ্চল ঘুঙুরবোলের মতন তার নাম যেমন ধ্বনিময়, তেমনি তাড়িৎশিখার মতন তার খ্যাতিও ছড়িয়ে গেল বিশ্বময়। ভারত-বর্ষের আর কোন নৃত্যশিল্পী নর্তক-জীবনের একেবারে শুরুতে সম্ভবত তারো পরে এত সমাদর, এত সম্মান পাননি।

কিন্তু কি এর কারণ?

আরও কত নৃত্যশিল্পী আছে ভারত-বর্ষে, আছেন কত গুরু, নৃত্যের বিশেষ বিশেষ শাখায় পারদর্শী দুরূহ মুদ্রা প্রদর্শনে অভিজ্ঞ কত নামী নর্তক। উদয়-শঙ্করের মতন তাঁরা কেন পেলেন না বিশ্ব-সভায় এমন অভিনন্দন?

উদয়শঙ্কর কোন ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্য জানে না। কারুর কাছে এখনো কিছু শেখেনি সে। তা ছাড়া তার পায়ের কাজও দুর্বল। তবু দেশে এবং বিদেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে কেন তার পক্ষে অসংখ্য মানুষের চিত্ত জয় করা সম্ভব হল?

যত দূরেই আমরা যাই, যা-কিছু দেখি যৌবনের দাহে ও দম্ভে, বার্ধক্যের প্রশান্তি ও ধ্যানদৃষ্টিতে সব ছাড়িয়ে ওঠে শৈশব-কৈশোরের টুকরো টুকরো দৃশ্য, কত রঙীন মধুর ছবি। অকম্পিত, অম্লান। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে যখন যেখানে আমাদের অবস্থান সেখানেই স্মৃতির পথ বেয়ে হঠাৎ কখন শৈশবের আনাগোনা—কৈশোরের নিঃশব্দ পদচারণ।

উদয়শঙ্করের বাল্য ও অস্ফুট যৌবন অতিবাহিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশে—গাজীপুর ও নসরৎপুরে এবং রাজস্থানের ঝালোয়ারে। একটি বাধাবন্ধনহীন বেপরোয়া কিশোর অবাক নয়নে দেখেছে চামার মাতাদীনের নাচ, দেখেছে নাওটাংকী। ঝালোয়ারে সে গেছে রাজপুত বিবাহবাসরে, দেখেছে ফাটা-বাজি, দেখেছে অস্ত্রপূজা।

অতীত স্বপ্নের মতন তার সেই সব দেখা পরে—অনেক পরে রূপ পেল ছন্দে সুষমায় ভঙ্গিতে অভিব্যক্তিতে। উদয়-শঙ্করের নর্তক-জীবনের প্রথম পর্যায়ের নৃত্যাবলীর দুটো ভাগ আছে। এক দিকে যেমন ইন্দ্র গন্ধর্ব রাধাকৃষ্ণ শিবপার্বতী রাসলীলা গজাসুর বধ ইত্যাদি, তেমনি অন্য দিকে, মারোয়াড়ী স্নানম গঙ্গাপূজো অসি অস্ত্রপূজা ব্যাধনৃত্য ভীলনৃত্য ইত্যাদি।

উদয়শঙ্করের নৃত্যমঞ্চ শুধু যেন ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির জন্য নয়। দৈবের আনুকূল্যেই তার শৈশব ও কৈশোর ভরে উঠেছে নানাবিধ ধ্রুপদী উপকরণ, উপাদানে। তার নৃত্যমঞ্চে পৌরাণিক ও লৌকিক ভারত ছন্দে এবং সুষমার গতিময় হয়ে উঠেছে।

কোন দেশের সংস্কৃতির কথা, আচার ও অনুষ্ঠানের কথা বলা যায় কাব্যে মহাকাব্যে সাহিত্যে কিংবা চিত্রকরের তুলিতে। কিন্তু তা-ও যে বর্ণনা করা যায় নৃত্যে সে-কথা সর্বপ্রথম প্রমাণ করতে পারলেন উদয়শঙ্কর।

নৃত্যের পরিধি এতদিন ছিল সীমাবদ্ধ। হয় ব্যাকরণের কঠিন শৃঙ্খলে গুরুগম্ভীর, নয় বাঈজীর চটুল অঙ্গ-সঞ্চালনে [illegible]। একটা ছক-কাটা গণ্ডির মধ্যে ছিল নৃত্যকলা-লক্ষ্মীর সতর্ক বিচরণ।

এই ছক-কাটা গণ্ডি মুক্ত হল উদয়-শঙ্করের আবির্ভাবে। কবির মতন, শিল্পীর মতন সে তার স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যছন্দে যেমন রূপ দিল ভারতীয় পুরাণের দেব-দেবীকে, তেমনি একে একে ফোটাল ভারতের আচার আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান, ধর্ম-সংস্কার। জন্মগত প্রতিভা না হলে এত দুঃসাহস আর কার হয়! শাশ্বত ভারত প্রথম জীবনেই গতিময় হয়ে ফুটে উঠল উদয়শঙ্করের নৃত্যমঞ্চে।

এই রূপদানের আরও কিছু বিশেষত্ব আছে। উদয়শঙ্করের রূপ, অঙ্গসজ্জা, মঞ্চ-সজ্জা—তার উপস্থাপনার রীতি এমনই নয়ন-ভোলানো যে, কোন ত্রুটির কথা দর্শক-দের মাথায় আসে না। তা ছাড়া আছে অপূর্ব সুরের ব্যঞ্জনা। উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখতে দেখতে সব মিলিয়ে দর্শক কখনো উত্তীর্ণ হয় দেবলোকে, কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনো কালিন্দী নই কূলে, কখনো রাজপুত উৎসব-প্রাঙ্গণে।

শ্যামল বাংলার সামান্য স্পর্শ নেই উদয়শঙ্করের প্রথম জীবনের নৃত্য সৃষ্টিতে। কেননা, বাংলার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। না থাক। তার নিয়তিই তাকে টেনে নিয়ে গেছে রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে—দিয়েছে অফুরন্ত উপকরণ, বিপুল বৈভব। সোনার বাংলায় বাস করলে এই সঞ্চয় দুরূহ হত উদয়শঙ্করের পক্ষে। কেননা, তার পটুতো অশিক্ষিত। অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে এত সংগ্রহ তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

শিক্ষা সব সময় সৃষ্টির ক্ষেত্রে হয়তো অনুকূল নয়। শিক্ষা ছিল না বলেই খুশি-মতন অগ্রগমনের কোন বাধা ছিল না উদয়-শঙ্করের। শিক্ষার শাসন ছিল না বলেই উদয়শঙ্করের নৃত্য শুধু স্বতঃস্ফূর্ত গতির আবেগে বাঙ্ময়।

উদয়শঙ্কর ভারতবর্ষে আবার ফিরে এল প্রায় তিন বছর পরে। তাকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল দেশবাসী, আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছিলেন প্রমোদ-পরিবেশক হরেন ঘোষ। সিমকীও এসেছে এবার।

আবার কলকাতার নিউ এম্পায়ারে উদয়-শঙ্করের নৃত্যের অনুষ্ঠান।

(ক্রমশ)
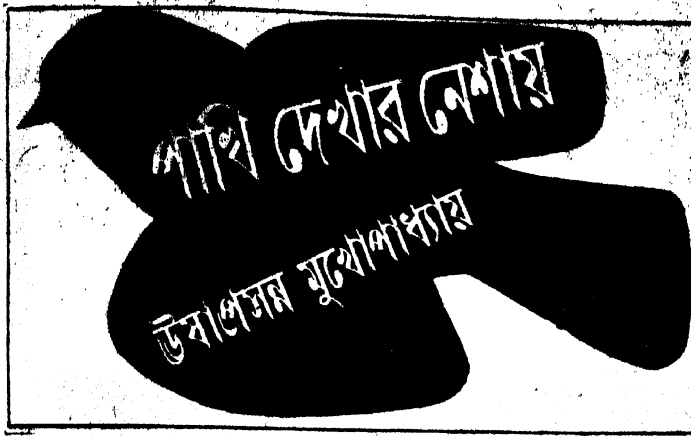
পার্কে-ময়দানে, বনে পাহাড়ে বেড়াবার সময় হঠাৎ যদি একটা অচেনা পাখির ডাক শুনতে পান, অথবা বিচিত্র কোন পাখির দেখা মেলে তবে হয়তো আপনারা অনেকেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বলা চলে, সেই কৌতূহল থেকেই একালের জনপ্রিয় 'হবি' পক্ষী পর্যবেক্ষণের (Bird Watching) উদ্ভব। অবশ্য এই হবিটি যে অতীতের অনেক মানুষেরও ছিল সম্প্রতি তার কিছু কিছু প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন মিশরে, চীনে, জাপানে, ভারতেও পক্ষী-প্রেমিক মানুষের অভাব ছিল না। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মিশরের অধিবাসীদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। কায়রোর যাদুঘরে ইতেতের (Itet) সমাধি ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করা একটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো 'মুরাল-চিত্র' রাখা আছে। নীলনদের অববাহিকায় বছরের একটি বিশেষ সময়ে যে সব বুনো হাঁস (লাতিন নাম-(Alopochen aegyptiacus)১ দুই তীরের প্যাপিরাস ও সর বনে এসে বাসা বাঁধে, তাদেরই ছবি এ'কেছেন ওই শিল্পী। ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় সাধারণ 'পারস্-পেকটিভ' সম্পর্কে শিল্পীর তেমন কোন জ্ঞান না থাকলেও তিনি একজন সাগ্রহী পক্ষী পর্যবেক্ষক। কারণ, বিশেষ প্রজাতির হাঁসের অবয়ব সংস্থান, পালকের বর্ণ ইত্যাদি বেশ খুঁটিয়ে না দেখলে ওই ধরনের প্রায় বাস্তবধর্মী ছবি আঁকা যায় না। এই সূত্রে, থিব্‌স (Thebes) অবস্থিত নাখতের সমাধি মন্দিরের দেওয়ালে নানা প্রজাতির পাখির যে মুরালটি আছে সেটিও লক্ষ্যনীয়।২ এই চিত্রের এক অংশে দেখা যায় ব্যাধের জালে ধরা পড়েছে মিশরীয় হাঁস, সারস (গোত্র-Gruidae) দিগ্ হাঁস (Anas Acuta) প্রভৃতি কয়েকটি জলচর পাখি। এই ছবিতেও পাখিগুলি বেশ জীবন্ত, কিন্তু সেই তুলনায় ব্যাধের দাঁড়াবার ভঙ্গি আড়ষ্ট শুধু নয়, রীতিমত অসম্ভব। ভাবতে অবাক লাগে যে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও মিশরের মানুষের পাখি সম্পর্কে কৌতূহলের অভাব ছিল না ৩। এই ধরনের আরও একটি প্রায়-অবিকৃত চিত্র-কর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে 'খুনসুতে' (Khunsu)৪, এই ছবিটিও প্রায় দু হাজার বছরের পুরোনো। আসলে প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ মানুষই ছিলেন পক্ষী প্রেমিক। তাঁদের কল্পনায় তাই দেখি অনেক দেবদেবীই পক্ষী মূর্তিধারী। যেমন, মৃত্যুর দেব সোকের-এর (Sokar) মুখ শিকরে বাজের (Astur badius) মত, সূর্যদেব হোরাসের (Horas) ও পশ্চিম দিকের দেবতা আমেন্‌ত-এর (Ament) মুখ বহরি বাজের (Falco peregrinus) অনুরূপ; এছাড়া জ্ঞান ও চিত্রলিপির দেবী থোত-এর (Thoth) মুখও আইবিস পাখির (Ibisinae) আদলে পরিকল্পিত। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে দীর্ঘজীবী শকুন (Aegypius monachus) ছিল পবিত্র পক্ষী; তাই তাঁদের পুরাণে শকুনমুখী দেবদেবীরও অভাব নেই। যেমন, দেবী 'মুট' (Mut) ও 'নেখেবেত'-এর (Nekhebet) যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার কোন কোনটি মনুষ্য মূর্তির অনুরূপ হলেও, কয়েকটি শকুনের মত। এছাড়া উৎখননের ফলে প্রাচীন সুমের-সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ কিছুকাল হল উদ্ধার আবিষ্কৃত হয়েছে তার নানা স্থানেও পক্ষী দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে।

তবে পক্ষী পর্যবেক্ষণের নিষ্ঠায় মিশরীয়দের পরেই নাম করা উচিত প্রাচীন চীনাদের। কারণ, চীনদেশেও পাখি দেখার আগ্রহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বহুকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। একাদশ শতকের সম্রাট হুই-ইৎসোঙ্ (Hui-Tsung) স্বয়ং ছিলেন

মিশরীয় মুরাল চিত্র
প্যাপিরাস বনে পাখি শিকার (থিব্‌সে প্রাপ্ত, খৃঃ পূঃ ১৫৪০—১৩৫০) বৃটিশ মিউজিয়ম

জ্ঞানদেবতা থোত্‌ ও সূর্যদেব হোরাসের মাঝখানে মিশর-রাজ র‍্যামেসেস (১২৯২—১৩২৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) [লাক্‌সর অবস্থিত আমন-মন্দিরের 'লো রিলিফ' অনুসরণে]

বিখ্যাত হচ্ছে একটি সোনালী ফেজান্টের ছবি। এছাড়া, ষোড়শ শতকের শিল্পী কানো ইতোকু (Kano Eitoku) ও কানো সানসেত্‌সু-এর (Kano Sansetsu) নামও স্মরণীয়। ইতোকুর আঁকা 'সোনালী ঈগল' (Aquila chrysaetus) এবং সানসেত্‌সুর আঁকা 'বকের পাঁতি' (গোত্র-Ardeidae) দু'টি অসাধারণ ছবি। এই ধারাতেই অষ্টাদশ শতকে মারুয়ামা ওকিও (Maruyama Okyo), হকুসাই (Hokusai), কোরিউসাই (Koriusai) প্রভৃতি শিল্পী এঁকেছেন নানা প্রজাতির আশ্চর্য জীবন্ত সব পাখির ছবি। বিশেষ করে হকুসাই-এর ছবিগুলি ইউরোপের পক্ষী প্রেমিকদের একেবারে মন কেড়ে নিয়েছিল। এই চিত্রাবলীর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, পাখির সঙ্গে পাখির বস্তু-সংস্থানকেও শিল্পীরা অবহেলা করেন নি।৬ তাদের ওড়া, বসা, সাঁতার
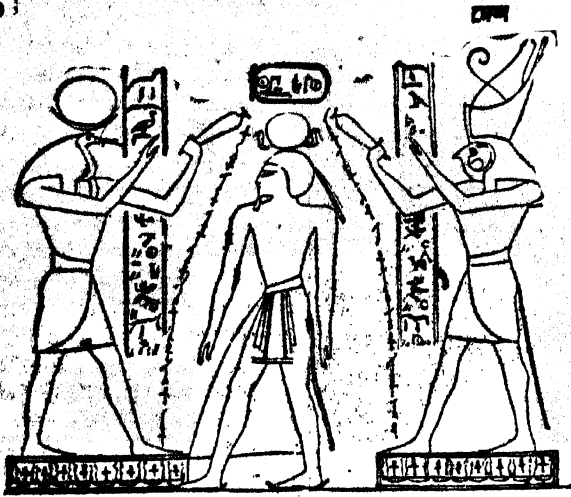
পক্ষী পর্যবেক্ষক ও শিল্পী। তাঁর আঁকা মার্সিসাস ফুল ও বটের পাখি (Coturnix) ছবিটি আজও জাপানের কানাগাওয়া চিত্রশালায় রাখা আছে; সেটি দেখলেই বোঝা যায় শিল্পী কত আগ্রহের সঙ্গে পাখিটাকে লক্ষ্য করেছেন এবং কত যত্নে তার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন চিত্রপটে। এই সূত্রে দ্বাদশ শতকের এক নাম-না জানা শিল্পীর আঁকা মান্দারিন হাঁসের (Aix galerieulata) ছবিটিও লক্ষণীয়; ওই চিত্র নয়া-চীনের সাংহাই যাদুঘরে সংরক্ষিত। সেকালের মানুষের পক্ষী পর্যবেক্ষণের বিশ্বস্ত-দলিল রূপে এই ছবি দু'টির মূল্য অপরিসীম। এখানেই শেষ নয়, একাদশ শতকের শিল্পী লি-আন-চুঙের (Li-An-ching) আঁকা 'বটের', দ্বাদশ শতকের শিল্পী সুঙ্‌-জু-ছি-এর (Sung-Ju-Chih) আঁকা ঝুড়ির মধ্যে চড়াই' (Passer domesticus), পঞ্চদশ শতকের চিত্রকর লু-ছি (Lu-Chi) এর আঁকা 'সোনালী ফেজান্ট' (Chrysolophus pictus), সপ্তদশ শতকের ইংসোউ-ই-কুয়াই (Tseu-I-Kuei) কর্তৃক অঙ্কিত 'সারস' (গোত্র- Gruidae) নিখুঁত পক্ষী-পর্যবেক্ষণের ফসল।৫ তবে এই সব চিত্র চীনা-শিল্পীরা পাখির বর্ণ, অবয়ব সংস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রমাণ দিলেও তাদের প্রকৃতি, বিচরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে কতটা অবহিত ছিলেন তা জানা যায় না। এ-বিষয়ে সমকালীন জাপানী শিল্পীরা বরং যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, চীনাদের মত তাঁরাও ছিলেন পক্ষী প্রেমিক; আর তাঁদের পাখি দেখার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা তাঁরা অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন রঙ তুলির আঁচড়ে। জাপানী চিত্রকলার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে মানুষের পরেই সেখানে পাখির স্থান। এই সূত্রে পক্ষী প্রেমিক কয়েকজন শিল্পীর নাম করা চলে। পঞ্চদশ শতকের শিল্পী সেশু (Sesshu) অনেকগুলি পাখির ছবি এঁকেছেন; তার মধ্যে সবচেয়ে

জাপানী চিত্রকর হকুসাই-এর (১৭৬০—১৮৪৯ খৃঃ) আঁকা সারস (Cranes)

১। সবসুদ্ধ ছ'টি হাঁসের ছবি অবিকৃত অবস্থায় আছে; এই হাঁসেরা প্রব্রজনশীল অর্থাৎ Migratory, শীতে বাসা বাঁধে। এই প্রসঙ্গে হিন্দী, বাঙলা এমনকি ইংরাজিতেও অনেক সময় একই পাখিকে নানা নামে ডাকা হয়ে থাকে; অঞ্চল ভেদে পাখির ডাক-নামও বদলায়; তাই প্রায় সবক্ষেত্রেই নিশ্চয়তার জন্য বাঙলা নামের পাশে লাতিন নামটি ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। এই নাম প্রধানত A Hand Book of Birds of India and Pakistan—Salim Ali and S Dillion Riply এবং Birds of the World Austin বই দু'টি থেকে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাম না বলে শুধু বর্গ গোত্রও দিয়ে দিয়েছি।

২। এই চিত্র পর্যায়ের আর একটি ছবি (প্যাপিরাস বনে পাখি শিকার) বৃটিশ মিউজিয়মে রাখা আছে।

৩। নাখতের সমাধি নির্মিত হয়েছিল (১৫৮০—১৩৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে) মিশরের অষ্টাদশ রাজ বংশের রাজত্ব কালে।

৪। এই ছবিটি আঁকা হয়েছে সমাধি মন্দিরের সিলিং বা ছাদে; ছবির বিষয়বস্তু—কয়েকটি হাঁস উড়ন্ত পতঙ্গপাল ধরে খাচ্ছে; হাঁসের ওড়বার ভঙ্গিটি শিল্পী মোটামুটি নিখুঁতভাবে এঁকেছেন।

৫। এই ছবিগুলি জাপানের বিভিন্ন চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

৬। উদাহরণ স্বরূপ, কোরিউসাই-এর 'সর বনে সারস', ওকিও-এর 'বুনো হাঁস' (Cygnopsis Cygnoides) অথবা ইতোকুর 'পাইন শাখায় ঈগল' ছবিটি স্মরণ করা যেতে পারে।

কাটার বিশেষ ভঙ্গিটিও চিত্রকর নিখুঁত ফটোগ্রাফের মত ধরে রেখেছেন।

অবশ্য পক্ষী পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে অতীতে চীনা ও জাপানীরা বহুই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন, এশিয়া ভূখণ্ডে তারা যে প্রথম ঐ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন তা' কিন্তু বলা যায় না। এ ব্যাপারে বরং ভারতের দাবিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা ভালো—আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'পক্ষী পর্যবেক্ষণ' বলে ঠিক সেই ধরনের মনোভাব প্রাচীন কালের কোন মানুষের মধ্যেই ছিল না। বিখ্যাত পক্ষী বিশেষজ্ঞ (Ornithologist) লায়েক ফতেহ্ আলির মতে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরই (সপ্তদশ শতক) ভারতের মধ্যে প্রথম কিছুটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে পাখিদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, এই আরম্ভেরও একটা আরম্ভ আছে। জাহাঙ্গীরের পূর্বেও পক্ষীপ্রেমিক ভারতীয়ের অভাব ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও চিত্রকলায় এই ধারণার সপক্ষে বহু প্রমাণও পাওয়া যাবে।

আমরা সবাই জানি, কবি বাল্মীকির মুখ থেকে যে আদি শ্লোকটি নিঃসৃত হয়েছিল তার মুখ্য প্রেরণা ছিল একটি চকাচকি হাঁসের (Casarca ferruginea) বিরহ বেদনা। অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্যের জন্মলগ্নেই কবিরা পাখিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। পরবর্তীকালে রচিত কালিদাস, ভারবি, ভট্টি, বাণ প্রভৃতির কাব্য ও নাটকেও পক্ষীপ্রীতির পরিচয় মেলে। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলী পক্ষীপ্রেমিক ছিলেন কালিদাস আর বাণভট্ট। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি কাব্যের নাম করা যেতে পারে। 'মেঘদূত'-এর বহু শ্লোকে কালিদাস নিখুঁতভাবে বহু পাখির আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, পূর্বমেঘের ৯ম শ্লোকে প্রব্রজনশীল চাতকের (একে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন pied crested cuckoo, ল্যাতিন নাম Cuculus canorus) ও বলাকার (টীকাকারের মতে স্ত্রী-বক, Ardea cineria গোত্রভুক্ত), ১১শ শ্লোকে মরালদলের (বুদ্ধদেব বসুর ধারণায় Greylag Goose, ল্যাতিন নাম—Anser anser), ২১শ শ্লোকে সারঙ্গের (অর্থাৎ চাতক, Hirundinidae গোত্রীয়), ২৩শ শ্লোকে শুক্লা-

জাপানী চিত্রকর সেশ্যুর (১৪২০—১৫০৭ খৃঃ) আঁকা সোনালী ফেজান্ট (Golden pheasant)

পাঙ্গ৭, মৈথুন-উন্মুখ ময়ূরের (pavo cristatus গোত্রীয়), ২৪শ শ্লোকে গৃহ-বলিভুক কাকের (মতান্তরে শালিক বা গোলা পায়রার), ৩২শ শ্লোকে সারসের (Gruidae গোত্রের), ৩৯শ শ্লোকে পারাবতের (গোলাপায়রা, columbinae) এবং উত্তরমেঘের ৮২শ শ্লোকে নীলকণ্ঠের (Coraciadae), ৮৬শ শ্লোকে চক্রবাকীর (চকাচকি), ৮৮শ শ্লোকে সারিকার (পাহাড়ী ময়না, Gracula religiosa) উল্লেখ দেখা যায়। এছাড়া ঋতুসংহার কাব্যের 'বর্ষা-বর্ণনা' অধ্যায়ে ময়ূরের (শ্লোক সংখ্যা—৬), শরৎ-বর্ণনা অধ্যায়ে কলহংস (শ্লোকসংখ্যা—২) ও সারসের (শ্লোক সংখ্যা—৮) এবং বসন্ত বর্ণনা অধ্যায়ে কোকিলের (শ্লোক সংখ্যা—১৪) সুন্দর বিবরণ আছে; বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির পক্ষী সমাজে কেমন উন্মাদনা জাগে তা কালিদাস সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন। এই পক্ষী পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে কালিদাসেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছেন বাণভট্ট। তাঁর 'কাদম্বরী'র উপক্রমণিকার পম্পা সরোবরের তীরবর্তী যে অরণ্যের বর্ণনা আছে প্রসঙ্গত সেটি স্মরণ করা যেতে পারে। ওই অরণ্য ছিল নানা পাখির একান্ত আশ্রয়। একদিন সেই বনে এসে হাজির হল নিষ্ঠুর ব্যাধ। সেই ব্যাধের অত্যাচারের ফলেই গৃহহারা হল নানা প্রজাতির পক্ষীশাবক। পলাশ গাছের কোটরে বাস করতো যে শুকপাখি (palaeornidae গোত্রের) তার চোখ দিয়ে [illegible] বাণ এর পর দেখেছেন সেই [illegible]। অতি সূক্ষ্ম তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি, চিত্রনৈপুণ্য তাঁর [illegible]। [illegible] পক্ষী [illegible] বৈশিষ্ট্য ও তার নীড়ের বিশেষত্ব অতিশয় [illegible] তিনি। শুধু সংস্কৃত কাব্য [illegible] গল্পে এবং পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশে ভারতের পক্ষীকুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সেখানে তিতির (Coturnix) রাজ শকুন (Sarcogyps calvus), টিয়া (Palaeornidae গোত্রের), কাক (Corvus গোত্র) পেঁচা (Tyto alba) মাছরাঙা (Halcyonidae গোত্রের), চাতক, সারস, রাজহংস (Cygninae গোত্রীয়) রাম বা বাস্তু ঘুঘু (Chalcophaps indicus) চিল (Mivus govinda) প্রভৃতি অসংখ্য পাখির উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের পাখি সম্পর্কে পশ্চিম দেশের মানুষদেরও যে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল তার প্রমাণ আছে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির (Pliny, the elder) রচনায়; তিনি লিখেছেন, সেকালে রোমের অভিজাত গৃহে ভারতের টিয়া ও ময়ূরের বিশেষ চাহিদা ছিল; এমন কি সম্রাট ক্লডিয়াস একবার বহু অর্থ ব্যয় করে নাকি ভারত থেকে একটি অদ্ভুত কিংবদন্তি পাখি আনিয়েছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন আসলে ওই বিচিত্র পাখিটি ছিল

[illegible]-চঞ্চু মাছরাঙা

৭. ময়ূরের চোখের রঙ বাদামি, কিন্তু চোখের চারপাশে থাকে একটি শ্বেত বৃত্ত তাই কালিদাস বলেছেন, শুক্লাপাঙ্গ; এটি নেহাত বাগ্‌বিস্তার নয়, তাঁর সযত্ন পক্ষী পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি।

মরাল (Anser anser)। কালিদাসের মেঘদূতে এই পরিব্রজনশীল হাঁসের উল্লেখ আছে

রাজত্বকালেই মোগল চিত্রকলার স্বর্ণযুগ। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর ১৬১০ থেকে ১৬২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট চিত্রকর ওস্তাদ মনসুর অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য অথচ বিচিত্র পাখির ছবি অঙ্কন করেছিলেন। এই মনসুর ছিলেন গুণী শিল্পী ও নিপুণ পক্ষী পর্যবেক্ষক। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত একটি 'বাহেরি বাজের' ছবি এবং বিলাতের ভিকটোরিয়া ও আলবার্ট মাদুঘরে রাখা একটি 'পালক মেলা টার্কি-মোরগের' (Meleagridae গোত্রীয়) ছবি বিশেষ বিখ্যাত। এছাড়া বারাণসীর ভারত কলা-ভবনে রাখা 'সারস ও ব্যাধ'র অনবদ্য ছবিটিও সম্ভবত মনসুরের আর একটি স্মরণীয় চিত্রকর্ম! প্রকৃত প্রস্তাবে, নানা প্রজাতির পাখির বর্ণ ও কলাপ-বৈচিত্র্য যুগে যুগে আরও নানা চিকরকে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করেছে। এই সূত্রে বিশেষ করে রাজস্থানী শৈলীতে আঁকা বিভিন্ন রাগরাগিণীর চিত্রগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে; এই চিত্রপর্যায়কে বলা হয় রাগমালা; দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত সপ্তদশ শতকে অঙ্কিত রাগিণী গৌড় মল্লার এবং অষ্টাদশ শতকে অঙ্কিত রাগিণী মধুমাধবী ও ককুভ ছবি তিনটিতেই ময়ূর, টিটিভ (Tetraonidae

একটি সোনালী ফেজান্ট (Phasianinae গোত্রের)।৮

ভারতীয় চিত্রকলাতেও পাখি গৌরব-জনক স্থান লাভ করেছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরাতন চিত্রিত মৃৎপাত্রে ময়ূর, হাঁস প্রভৃতির ছবি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। কারণ ঐ চিত্র যেমন বাস্তবধর্মী তেমনই শিল্পীর পক্ষীপ্রেমের পরিচায়ক। পঞ্চম শতাব্দীতে আঁকা অজন্তার ভিত্তি চিত্রেও নানা প্রজাতির পাখির দর্শন মিলবে; যেমন (ষোড়শ) সংখ্যক গুহার বেলে হাঁসের যে ছবিটি আছে সেটির সঙ্গে মিশরীয় মরাল চিত্রের অনায়াসেই তুলনা করা চলে।

আমরা পূর্বেই বলেছি লায়েক ফতেহ আলির মতে জাহাঙ্গীরই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পাখির প্রজাতি, বর্গ, গোত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন। তবু এই সম্পর্কেও কিছুটা মতানৈক্যের অবকাশ আছে; কারণ জাহাঙ্গীরের প্রপিতামহ বাবরের আত্মজীবনী পাঠে জানা যায় যে পাখি সম্পর্কে তাঁরও বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের অভাব ছিল না; কিন্তু নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাম্রাজ্য রক্ষা বা বিস্তারের কাজে আমৃত্যু ব্যস্ত থাকায় তিনি সে-কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ পাননি। তাঁরই সেই পাখি দেখার নেশা বংশগত সূত্রে জাহাঙ্গীরের চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই মোগল চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে জর্জ লারেন্স যথার্থই মন্তব্য করেছেন— Jahangir shared with his great grandfather Babur a particular interestin birds (Indian Art, The little library of Art, Mathuen).

কিন্তু জাহাঙ্গীর বাবরের মত শুধু যে পাখি ভালবাসতেন তাই নয়, তিনি চিত্রকলারও ছিলেন একজন গুণী সমঝদার! শোনা যায়, তিনি ছবিতে তুলির টান দেখেই সেটি কোন্ শিল্পীর আঁকা তা বলে দিতে পারতেন। আসলে জাহাঙ্গীরের

ওস্তাদ মনসুরের আঁকা বাজপাখি (১৬১০—১৬২০ খৃষ্টাব্দ) (জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত)

৮। এই তথ্য পরিবেশন করেছেন A. L. Basham তাঁর The Wonder that was India গ্রন্থে (পৃষ্ঠা—২৩১ [Fontana সং]

৯। দ্রষ্টব্য—১৩ই মে, ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের রবিবাসরীয় অংশে প্রকাশিত Laeeq Futehally-র রচনা Bird watching in India দ্রষ্টব্য।

মেয়েটি), বক, সারস প্রভৃতি নানা প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এছাড়া পরবর্তীকালের পাহাড়ী চিত্রাদিতে আছে হিমালয়ের কাঠ-ঠোকরা ও আর কোনো ধরনের রঙিন প্রিয়া কি করে ... হিমালয়েও লক্ষণীয়। আসলে হিমালয়ের কোলে নানা বর্ণাঢ্য পাখির বাস; তাই তারা অনেক আজও পক্ষী পর্যবেক্ষকের স্বর্গ। বিশিষ্ট পক্ষী-প্রেমিক সেলিম আলি হিমালয়ের পাখি নিয়ে আজও গবেষণা চালাচ্ছেন। তাই কাঙড়া, কুলু, বসৌলি প্রভৃতি রীতির শিল্পীরা অশিক্ষিত পটুয়ে নায়ক নায়িকার যে বিরহ-মিলনের ছবি এঁকেছেন, সঙ্গত কারণেই তাতে উদ্দীপনা বিভাগ হয়ে উঠেছে ওই হিমালয়ের পাখি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে কাঙড়া কলমে আঁকা 'কৃষ্ণ-লীলা' অথবা বসৌলি ঢঙে আঁকা 'বজবাহাদুর আর রূপমতী'র ছবি দ্রষ্টব্য। ছবিগুলিতে তাঁরা পাখি, মানুষ ও প্রকৃতিকে কত কাছাকাছি এনে ফেলেছেন তা না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়।

তবু এই চিত্রকরগোষ্ঠীকে কেউ পক্ষী-পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেবেন না। কারণ তাঁদের সৌন্দর্যপিপাসু চোখের পিছনে একটি বৈজ্ঞানিক মন সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। আধুনিক পক্ষীপর্যবেক্ষণ একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা; মধ্যযুগের কোন মানুষের মধ্যেই সেই জাতীয় উদ্যোগ আশা করা অন্যায়। এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রথম জাগ্রত হয়ে ওঠে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে। এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন ইংরেজ ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ানরা। আজও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পক্ষীপর্যবেক্ষকের সন্ধান পাওয়া যাবে ওই দুই দেশে। এমনকি ভারতেও পাখি দেখার উদ্যোগ করেন ইংরেজরাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন এই দেশে। অবশ্য কর্মসূত্রে ভারতের বনেজঙ্গলে, অলিতে গলিতে ঘুরতে ঘুরতে নানা পাখির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ওইসব অপরিচিত পাখিদের আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরা অনেকেই ডায়েরিতে খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে রাখতেন। শুধু তাই নয়, পেশাদার শিল্পীদের দিয়ে ওইসব দুষ্প্রাপ্য পাখিদের ছবিও আঁকিয়ে নেওয়া হত। ওই জাতীয় বিস্তৃত স্কেচ ও ছবি উনিশ শতকের কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ওই শিল্পীদের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় ছিল না। এই শিল্পীদের মধ্যে আবার মহিলা, অপেশাদার চিত্রকরও ছিলেন। আসলে পাখি দেখার সঙ্গে ছবি আঁকার নিবিড় যোগাযোগ আমরা বরাবরই লক্ষ্য করেছি।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পক্ষী-পর্যবেক্ষকেরা চিত্রকরের সাহায্য ছাড়াই তাঁদের গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাতে পারেন। কারণ তাঁদের হাতে এসে গেছে টেলিফটো লেন্স সমন্বিত ক্যামেরা ও ফটো তোলার অারও নানা উন্নত সরঞ্জাম। এছাড়া টেলিসকোপের সাহায্যে পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত না করে তাঁরা বহু দূরে থেকেই গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ংক্রিয় চলচ্চিত্র-ক্যামেরা ও টেপ-রেকর্ডারের সাহায্যে পাখির অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা নিখুঁতভাবে তুলে রাখতে পারা যায়। অধুনা কোন কোন পক্ষীবিশারদ দেশান্তরী পাখিদের গতিপথ নির্ধারণের জন্যে 'রেডার'ও (Radar) ব্যবহার করছেন।

এই সূত্রে পক্ষীপর্যবেক্ষণের দুটি স্তর সম্পর্কেও আলোচনা করা উচিত। সাধারণভাবে পৃথিবীর সমস্ত পক্ষী-পর্যবেক্ষককেই দুটি দলে ভাগ করা যায়; যেমন, কেউ কেউ অপেশাদার ও শিক্ষানবিস; আবার কেউ পক্ষীবিদ্যাবিশারদ ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করবার মানসে এই কাজে নেমেছেন। বর্তমানে শুধু আমেরিকাতেই অপেশাদার বা সৌখিন পক্ষীপর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। উদাহরণস্বরূপ ম্যাসাচুসেট্-সের Audubon Society এবং আমেরিকার Audubon Junior Club-এর সদস্য-সংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে। Audubon Society-এর সদস্যেরা অনেকেই পক্ষীবিশেষজ্ঞ; তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ হাজার। আর Audubon Junior Club-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১০

এই জাতীয় একটি 'টার্কি' আগের ছবি এঁকেছিলেন ওস্তাদ মনসুর (জাহাঙ্গীরের রাজসভার চিত্রকর)

পারেন। এখন তাদের সদস্য-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় নয় লক্ষ।

বনে পাহাড়ে ঘুরে পাখি দেখার মধ্যে যে অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া আছে, সম্ভবত তার টানেই দুনিয়ার নানা প্রান্তের [illegible] ব্যাপারটিকে [illegible] নিয়েছেন। আপনি [illegible] অনাবশ্যক প্রয়োজন নেই। একটি ভালো দূরবীন সংগ্রহ করতে পারলেই হলো। তারপর সেটি নিয়ে একদিন ভোরে বেরিয়ে পড়ুন মাঠে জঙ্গলে; তবে পাখি চিনতে হলে আগে পাখির চিত্র ও বর্ণনা সম্বলিত একটি 'গাইড বুক' কেনে নেওয়া ভালো। বর্তমানে বাঙলায় ভারতের পাখি সম্পর্কে সেলিম আলি, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, মারঋণ চন্দ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের বই-ই পাওয়া যায়। এছাড়া ইংরাজিতে বেশ অনেকগুলি ভালো বই আছে। এস ডিলান রিপ্লে ও সেলিম আলির বইটি অবশ্য সবচেয়ে সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য।

পাখি দেখার পক্ষে শরৎ, শীত ও বসন্তকালই সবচেয়ে ভালো সময়। বনে, পাহাড়ে, খালবিলের ধারে, ক্ষেত খামারের কাছে এমনকি শহরের মধ্যেও নানা প্রজাতির পাখি বাস করে। একটু সন্ধান করলেই তাদের দর্শন মিলবে। অনেকে হয়তো শুনে অবাক হবেন যে, কয়েক বছর আগে এক বসন্তে নিউ ইয়র্ক শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেনট্রাল পার্কেই পক্ষী-পর্যবেক্ষকেরা প্রায় ১০০ প্রজাতির পাখির সন্ধান পেয়েছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, গঙ্গার ধারে, ময়দানে, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অথবা শহরতলির ছোট-বড়ো বাগানগুলিতে ঘুরলে আপনারাও অনেক প্রজাতির পাখির দর্শন পাবেন। আসলে একালের অনেক শিক্ষা-বিদরাই বনে পাহাড়ে না ঘুরে নিজের গ্রাম বা শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই পাখির অবাধ বিচরণক্ষেত্র গড়ে তোলার পক্ষপাতী। সে কাজটি এমন কিছু কঠিনও নয়। পার্কে পাখিদের বাসা বাঁধার উপযোগী গাছ লাগিয়ে, জলাশয় খনন করে, উপযুক্ত আহার ও নিরুপদ্রব আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে অনায়াসেই তাদের আকর্ষণ করা যায়। আপনি আপনার ঘরের কাছেই অভয়ারণ্য গড়ে নিতে পারেন।

অবশ্য যাঁরা পাখির স্বাভাবিক বসতি-সংস্থানটি দেখতে চান তাঁদের বনে পাহাড়ে বা খালেবিলে না ঘুরে উপায় নেই। বিশেষত পাখির জীবনেতিহাস, পরিবেশের সঙ্গে তার অভিযোজন কৌশল, প্রজননরীতি, প্রব্রজনের পদ্ধতি (Migra- [illegible]

ওপরে ফটিক জল

নীচে সুইচোরা

করতে হলে আপনাকে দেশ ভ্রমণ করতেই হবে। কিছুকাল যাবৎ দেশান্তরী পাখিদের জাল পেতে ধরে তাদের পায়ে সন-তারিখ ইত্যাদি লেখা বিশেষ ধরনের হালকা প্লাস্টিকের বা অ্যালুমিনিয়ামের বেড়ি (Band) পরিয়ে দিয়ে সেগুলিকে আবার উড়িয়ে দিচ্ছেন পক্ষী পর্যবেক্ষকেরা। ওই পাখি অন্য দেশে গিয়ে আবার যখন ধরা পড়বে তখন তাদের প্রব্রজনের পথ, ঋতু, উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানা যাবে অনেক কিছুই। লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা মিলে বছর সাতেক আগে চন্দ্রালোকে পক্ষীপর্যবেক্ষণ ও তাদের প্রব্রজন সম্পর্কে যে গবেষণার উদ্যোগ করেছিলেন আজ সেই পদ্ধতিটিও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে নিশাচর পাখিদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে, যাঁরা পক্ষীপর্যবেক্ষণে [illegible] আরও একটি কথা জেনে রাখা ভালো। বিভিন্ন প্রজাতির (জীব বিজ্ঞানীর মতে যার সংখ্যা ৮,৬০০) পাখির মধ্যে শারীর সংস্থানগত তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও, পাখির বাস্তু নির্বাচনে কিন্তু যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়। এ বিষয়ে ইকোলজিস্টরা তাদের অভিযোজন ক্ষমতা দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যান। একমাত্র পৃথিবীর উচ্চতম স্থান আন্টার্কটিকা এবং শীতলতম স্থান [illegible] ছাড়া প্রায় সর্বত্রই পাখিদের দেখা মিলবে। মেরু প্রদেশে, মরুভূমিতে, পর্বতকন্দরে, গহন অরণ্যে, জলভূমিতে, সমুদ্রবক্ষে কোথায় না তারা হাজির নেই। এছাড়া এরা যে শুধু উড়তেই পটু, তাই নয়, তীব্রবেগে দৌড়াতে (যেমন উটপাখি) ১০, মাইলের পর মাইল সাঁতার দিতে (যেমন, পেঙ্গুইন) ১১, দক্ষ ডুবুরীর মত ডুব দিতেও (যেমন, পানকৌড়ি) পটু। আবার কোন কোন প্রজাতির পাখি হয় সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে (যেমন, কন্ডর শকুন)১২, নয় সমুদ্রবক্ষে (যেমন, এলবাট্রস) ১৩। প্রায় সারা জীবনই কাটিয়ে দেয়। কেউ কেউ পছন্দ করে উন্মুক্ত চারণ ভূমি (যেমন, এমু, Dromiceidae), আবার কেউ গহন অরণ্যের অন্তরাল (যেমন, অস্ট্রেলিয়ার বীণা পাখি, Menura)। তবে সাধারণভাবে অধিকাংশ পাখিই নির্জনতা ও গোপনতা প্রিয়। তাই তাদের পর্যবেক্ষণকালে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

পাখির ডাকের মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে; কয়েক প্রজাতির পাখি একেবারে মূক হলেও অধিকাংশ পাখিই নানা বিচিত্র শব্দ করতে সক্ষম। তবে তাদের কারও স্বর কর্কশ (যেমন, কাক) কারও অনুনাদী (যেমন, হামিং বার্ড, Trochilidae) আবার কারও সুমধুর (যেমন, কোকিল)। আবার পাহাড়ী ময়না, ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরাজ (Dissemurus paradise-

---

১০। উটপাখি (Struthio camelus) ও এমু প্রায় ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে দৌড়তে পারে। এরা উড়তে পারে না।

১১। মেরু অঞ্চলের অধিবাসী এই এডেলি পেঙ্গুইন (Spheniscidae গোত্র) সাঁতার দিতে পারে ঘণ্টায় প্রায় ৮ মাইল বেগে। হাঁটেও বেশ জোরকদমে; তবে একেবারেই উড়তে পারে না।

১২। আন্দিজ পাহাড়ের চূড়ায় এদের বাস।

১৩ অ্যালবাট্রসের (Diomedinae) পায়ের পাতার গঠনই এমন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের ঢেউ-এর উপর ভেসে বেড়াতে পারে; এছাড়া সাঁতার দেওয়াতেও এরা পটু।

[illegible] (Nycticorax nycticorax) শিকারের অপেক্ষায়

দেখা যাবে, সাধারণভাবে প্রতি বছর তারা একই আকাশপথ ব্যবহার করে; এমনকি একই দ্বীপ বা অরণ্যে সাময়িকভাবে বিশ্রাম নেয়। শুনতে অবাক লাগে, প্রতি বছর শীতে আলাসকা থেকে বেশ কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ছোট্ট হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হাওয়া খেতে আসে যে সোনালী প্লোভার (Pluvialis apricaria), তার আসা-যাওয়ার পথে কোথাও এক তিলতেও তফাত নেই। তবু তাকে ওই দুঃসাহসী ও দুরন্ত যাত্রা অভিযান থেকে ঠেকানো যায় না। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন, প্রতি বসন্তে আফরিকা থেকে যে সোয়ালো পাখিরা (Hirundinidae গোত্রের) ডিম পাড়ার তাগিদে উড়ে আসে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে, তাদের কোন বছরই নির্দিষ্ট গ্রামের নির্দিষ্ট খামার বাড়িটি খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। একবার মিডওয়ে দ্বীপ থেকে কয়েকটি অ্যালবাট্রস ধরে তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকায়, জাপানে, হাওয়াই ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে। শুধু তাই নয়, তাদের একটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুদূর ফিলিপাইনসে! তারপর একই দিনে ছেড়ে দেওয়া হল সেই পাখিগুলিকে। মাস খানেক বাদে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তারা সকলেই ফিরে এসেছে স্বস্থানে! মিডওয়ে থেকে ফিলিপাইনসের দূরত্ব ৪,১২০ মাইল, আর ঐ দূরত্ব পাড়ি দিতে অ্যালবাট্রসটির সময় লেগেছিল মাত্র ৩২ দিন! এই অভাবনীয় পক্ষী প্রব্রজনের তদারকি করবার আগ্রহেই আজকাল অনেকে পক্ষী পর্যবেক্ষক হচ্ছেন। [illegible]

অভাব নেই; প্রতি বছর শীতকালে এদেশে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চল থেকে রেলেহাঁস, দিকহাঁসের মত কত না পাখি হাওয়া খেতে আসে। এমন কি কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও তারা দলে দলে এসে ভিড় করে। এই সব পাখিদের সম্পর্কে গবেষণা করবার মত মানুষের সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভালো। তাহলে ভারতের ক্রমহ্রাসমান পক্ষীকুলকে অশুভ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

আমরা পূর্বেই পক্ষী পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক শর্ত ও অভ্যাসগুলির কথা উল্লেখ করেছি। এবার সেগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক। বনে পাহাড় মাঠে ময়দানে ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে পাখির [illegible] শুনুন; তারপর সেই ডাকটি চেনা কি অচেনা তা বিচার করে দেখুন। অচেনা [illegible] তার বৈশিষ্ট্য একটি খাতায় লিখে নেওয়া ভালো। এইবার ডাক অনুসরণ করে খুঁজে বার করুন পাখিটিকে। খুব কাছে না গিয়ে একটু দূর থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখুন। প্রথমে তার ঠোঁট, পা, লেজ ও ডানা থেকে প্রজাতি, গোত্র ও বর্গ নির্ণয়ের চেষ্টা করা ভালো। যদি পুচ্ছটি আগে দেখা যায় তবে তার বর্ণ, দৈর্ঘ্য বিস্তার, বিশেষত নোট বই-এ লিখে নিন। এই পুচ্ছ ওড়বার সময় পথ নির্দেশ ও গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পাখিকে সাহায্য করে। সাধারণভাবে চেনাজানা পাখিদের মধ্যে দোয়েল, হলদে বউ, [illegible] (Muscicapidae), শ্যামা (Kittacincla malabarica) প্রভৃতি পাখির পুচ্ছ বেশ বিচিত্র ও দীর্ঘ। পুচ্ছের পালক বিন্যাসটি ভালোভাবে দেখা চাই। সেই সঙ্গে দেখতে হবে ডানার রঙ, বিস্তার, গঠন। তবে পাখি যতক্ষণ না উড়ছে ততক্ষণ তার ডানার বিস্তার দেখা যায় না। ওড়ার পর দেখুন তার ডানা লম্বা না চওড়া; যদি চওড়া হয় তবে বুঝতে হবে অনেকক্ষণ বাতাসে ভর করে ভেসে থাকার ক্ষমতা আছে তার (যেমন শকুন); আর অপ্রশস্ত অথচ লম্বা হলে বুঝতে হবে দূরে পাড়ি দেবার অভ্যাস আছে তার (যেমন, অ্যালবাট্রস, গাংচিল)। পাখির ঠোঁটের গঠন, দৈর্ঘ্য দেখে তার জাতি ও খাদ্যাভ্যাস নির্ণয় করা যায়। যেমন চিল, শিকরে প্রভৃতি যারা মাংস ছিঁড়ে খায় তাদের ওপরের ঠোঁট বাঁকা ও তীক্ষ্ণ, নীচের ঠোঁট ধারালো। ছোট, শক্ত [illegible] গড়বার জন্যে বাবুই-এর (Ploceus philippinus) ছোট ঠোঁটটি বেশ [illegible] ত্রিভুজাকার। গাছে ঠোকর মেরে [illegible] বাসা বার করবার জন্যে কাঠঠোকরার (Picidae) ঠোঁট সরু অথচ ভোঁতা; অনেকটা বাটালির মতন। আবার কাদার মধ্যে থেকে গুগলি বা পোকা খুঁটে খাবার জন্য কাদাখোঁচা, জলপিপি (Metopidius [illegible]

মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাখি হামিং বার্ডের ঠোঁট লম্বা ও সামান্য বাঁকা; কারণ সে ফুলের থেকে মধু চুষে খায়। এছাড়া বিশেষ লক্ষ্যনীয় ঠোঁট হচ্ছে ধনেশ (Bucerotidae) পেলিকান১৬ (Pelecanidae), টিয়া ও ফ্লেমিংগোর১৭ (Phoenicopterus Ruber)। ঠোঁটের পর দেখা চাই ঝুঁটির বর্ণ ও দৈর্ঘ্য। কাঠঠোকরা, সিপাহি বুলবুলি (Otocompsa jocosa), হুপো (Upupidae গোত্রের) প্রভৃতি পাখির চমৎকার ঝুঁটি আছে। সবশেষে দেখা চাই পাখির পায়ের গঠন, বর্ণ, আঙুলের সংস্থান। এই প্রসংগে খাল বিল নদীর ধারে যে সব পাখির দেখা মেলে তাদের সংগে বনচর পাখির মূল তফাত কোথায় সেটাও জেনে রাখা চাই। সাধারণভাবে জলচর পাখির ঠোঁট ও পায়ের দিকে নজর দিতে হয় বেশি করে। যে সব জলচর পাখি কাদার মধ্যে পোকা ইত্যাদি সন্ধান করে ফেরে তাদের অধিকাংশেরই পা বেশ লম্বা; যেমন গো-বক জলফেপি কাদাখোঁচা কুচ বক, সারস, হাড়গিলা (অবশ্য পুরোপুরি জলচর নয়), ফ্লেমিংগো ইত্যাদি। আবার যারা সন্তরক শ্রেণীর পাখি তাদের পা খাটো এবং পাতা হাঁসের মত জোড়া। যেমন আলবাট্রস, পেলিকান, পানকৌড়ি, দিগহাঁস ইত্যাদি। এছাড়া লম্বা পায়ের সংগে লম্বা গলারও বুঝি একটা যোগ আছে; যেমন বক, জলফেপি, ফ্লেমিংগো, সারস প্রভৃতির গলাও বেশ লম্বা। শুধু পা বা গলা নয়, পায়ের পাতার আঙুলগুলি কিভাবে সাজানো সেটাও ভালোভাবে লক্ষ্য করা চাই। কারণ ওই আঙুল দেখেই তার স্বভাব চরিত্র, বাস্তু সম্পর্কে অনেক কিছু আন্দাজ করা যায়। সোনালী ঈগল, কণ্ডর শকুন, কাদাখোঁচা কাঠঠোকরা কি আলবাট্রসের পায়ের পাতা, আঙুল ও নখ এক-এক রকম। পারিপার্শ্বিকের সংগে তা অভিযোজনের একান্ত উপযোগীই শুধু নয়, তাদের খাদ্য সংগ্রহেরও প্রয়োজনীয় সহায়।

যাঁরা পক্ষী পর্যবেক্ষণের ব্যাপার আরও অগ্রসর হতে চান তাঁদের উচিত পাখিদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, খাদ্যাভাস ও বাসার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। অধিকাংশ পাখিই উপযুক্ত বস্তু ও আহারের সন্ধানে তার জীবনের একটা বড়ো অংশ কাটিয়ে দেয় ১৮। এছাড়া আছে সঙ্গিনী খোঁজা, ডিম পাড়া, ডিমে তা দেওয়া ও শাবক প্রতিপালনের ব্যাপার। এই সমস্ত পর্বের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করার একটা নেশা ও আনন্দ আছে; এরপর ভালো করে দেখা চাই বাসা বাঁধার কৌশলটি। গাছের ডালে বা কোটরে, ঘরের কার্নিসে, পাহাড়ের গায়ে ঝোপ ঝাড়ে, মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে, খড়কুটো লালা নিয়ে কত বিচিত্র রকম বাসাই না তৈরী করে তারা! প্রধানত ডিম পাড়া ও শাবক প্রতিপালনই এই বাসা বাঁধার উদ্দেশ্য; তবে কেউ কেউ প্রণয়-কুঞ্জ হিসাবেও বাসা বাঁধে (যেমন, নীড় বাঁধিয়ে পাখি, Ptilonorhynchidae)। সাধারণভাবে কে (অর্থাৎ স্ত্রী না পুরুষ পাখিটি) শাবক প্রতিপালনের দায়িত্ব নিচ্ছে এটাও জানো

---

১৬. কেউ কেউ বলেন 'গগনভেড়'।

১৭. কেউ কেউ বলেন 'কানঠুঁটি'।

১৮। পক্ষী সমাজে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী হচ্ছে মিশরের শকুন (Neophron percnopterus); তার আয়ু প্রায় ১১৮ বছর। এছাড়া শতবর্ষজীবী অন্যান্য পাখি হচ্ছে কাকাতুয়া, সোনালী ঈগল।

ভরের লক্ষণীয়। পাপিয়া (Hierococcyx Varius), বৌ-কথা-কও (Cuculus Micropterus) প্রভৃতি পাখিরা নিজেরা বাসা না বেঁধে অন্য পাখির (যেমন, কাক) বাসায় ডিম পেড়ে আসে। পাখির বাসা সংগ্রহ করাও পক্ষী পর্যবেক্ষকদের অনেকের হবি। বাবুই, দর্জি পাখি প্রভৃতির বাসা নিখুঁত আর শিল্পের কতই সুন্দর। এছাড়া, ডিম দেখে পাখি চিনতে শেখাও দরকার। এই প্রসঙ্গে দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন—ছাতারে পাখির ডিমের রঙ নীলচে সবুজ; ফিঙের ফিকে লাল, তার ওপর বেগুনির ছিটে; বেনে বউএর ডিমে বেগুনির উপর লালের ছিটে; ভীমরাজের সাদার ওপর কালো ছিটে; ডাক পাখির হলদের ওপর পাটকিলে ছিটে। সাধারণ ভাবে অধিকাংশ পাখিই একাধিক ডিম পাড়ে। তাই ডিম দেখলে সংখ্যাটাও লিখে রাখা চাই। অন্য পাখির খাদ্যাভ্যাস নিয়েও অনেক গবেষণা চলছে; পাখির খাদ্য তালিকায় আছে—পশু মাংস, মানুষের উচ্ছিষ্ট সবরকম খাবার, মাছ, কীট পতঙ্গ,

ছোট মাছরাঙা

ঝিনুক, গুগলি, ছোট পাখি, অন্য পাখির বা সরীসৃপের ডিম, সাপ বা অন্য সরীসৃপ, মধু, বীজ, শস্য, ফল, বাদাম, জলজ-উদ্ভিদ ইত্যাদি। ঋতু ভেদে পাখির খাদ্যাভ্যাস কেমনভাবে বদলে যায় সেটাও লক্ষ্য রাখতে হয়।

উপসংহারে পক্ষী পর্যবেক্ষণের কয়েকটি বাস্তব অসুবিধার কথা শিক্ষানবিসদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পাখি দেখা শুরু করে অনেকেই একটা ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করেন; সেটি হচ্ছে কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে চেহারার অমিল; তাই স্ত্রী পুরুষকে ভিন্ন প্রজাতির বলে ভ্রম হয়। সাধারণভাবে পুরুষ পাখির আকার বড়ো ও পালকের বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে থাকে; এছাড়া পুচ্ছটিও হয় চটকদার (যেমন, ময়ূর, ফেজান্ট, বীনা পাখি)। শুধু তাই নয়, মিলন ঋতুতে (Mating Season) সঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে পুরুষ পাখি অনেক সময় পেখম মেলে অন্য রূপ ধরে। তবে সব থেকে কঠিন পক্ষীশাবক দেখে তার প্রজাতি নির্ণয় করা; কারণ প্রায় এক বছর পর্যন্ত শাবকের ঠিক মত পালক গজায় না; এছাড়া মা-বাবার সঙ্গে তার চেহারার মিল থাকে সামান্যই। অবশ্য কোন ভালো 'গাইড বুকের' সাহায্য নিলে এ সব ভুল হবার সম্ভাবনা কম। পক্ষী পর্যবেক্ষক হিসবে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর শুধু দিনে নয়, চন্দ্রালোকেও নিশাচর পাখিদের (যেমন, ঠুকঠকিয়া, caprimulgidae) গতি বিধি লক্ষ্য করতে পারেন। তাতেও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

।। ৯৩ ।।

বুলবুল চেয়েছিল সূর্যকে নিয়ে সে আলাদা কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকবে। এমনকি, সে এ শহর ছেড়ে চলে যেতেও চেয়েছিল। সূর্য রাজি হয়নি। এ বাড়িতেই সে বেশ আছে।

দিনের বেলা বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে। সকালে দশটা-এগারোটার আগে কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। ঘুম থেকে ওঠার পরও সব কিছুর মধ্যেই একটা আলস্যভাব। যখন তখন হাই ওঠে। এ বাড়ির বাসিন্দাদের কারুর যেন খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই। নারীদের চুল বিস্রস্ত, ঠোঁটে গত রাত্রির পান খাওয়ার দাগ, চোখের সুর্মা খানিকটা মুছে গেছে, পোশাকের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুকনো ফুলের মালাগুলো ছড়িয়ে থাকে বারান্দায়।

অনেকের ঘরেই প্রত্যেকদিন রান্না হয় না। নোকররা দোকান থেকে খাবার এনে দেয়। সেই দোকানের শালপাতার ঠোঙা থেকেই খাওয়া হয়ে যায়, থালা বাসন বার করার ঝামেলাও নেয় না। আবার কেউ যদি শখ করে রান্না করতে বসে, অন্য ঘরের মেয়েরা ভিড় করে এসে দাঁড়ায় তার রান্না ঘরের দরজায়।

অধিকাংশ ঘরের মেয়েরাই একলা থাকে। এদের মধ্যে যাদের বাঁধা প্রেমিক আছে, তাদের সেই সব প্রেমিকরাও দিনের বেলা থাকতে চায় না কখনো। তবলচি বা দালালরা কখনো কখনো টাকা চাইতে আসে, বারান্দায় উবু হয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যায়—দিনের বেলা সময়ের কোনো দাম নেই এখানে। কারুর কারুর ঘরে বুড়ি মা এবং দু'একটি বাচ্চাও থাকে। সব মিলিয়ে সাত আটটি বাচ্চা আছে এ বাড়িতে। তাদের হুটোপুটির শব্দ ক্বচিৎ শোনা যায় বটে, কিন্তু ঠিক সন্ধের পর বাচ্চাগুলো যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় কে জানে।

সূর্য সারাদিন প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটায়। বুলবুল হাজার চেষ্টা করেও তাকে বাইরে পাঠাতে পারে না। বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকাই সূর্যর সব চেয়ে প্রিয় ভঙ্গি। বুলবুল খাবার নিয়ে এসে ডাকাডাকি করলে সূর্য উঠে বসে, মুখটুখ না ধুয়েই খাবার খায়। এ বাড়িতে চায়ের রেওয়াজ নেই। পাথরের মস্ত বড় গেলাস ভর্তি গরম দুধ খেতে হয় তাকে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে গোসলখানায় যায়। ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে।

দুপুরে আর একবার স্নান করার জন্য উঠতে হয়। প্রত্যেকদিন স্নান করার ইচ্ছে হয় না তার, কিন্তু বুলবুল এ ব্যাপারে খুব কড়া। ঠেলেঠুলে তাকে পাঠাবেই। বুলবুলের স্নানের বাতিক আছে। সারা দিনে সে নিজে অন্তত তিনবার স্নান করে, জ্বরজারি হলেও বাদ দেয় না।

স্নান করতে যাবার আগে সূর্য তার শরীরের জড়তা ভাঙবার জন্য হঠাৎ লাফা-লাফি শুরু করে। প্রথমে শ'খানেক ডন বৈঠক দেয়, তারপর এদিক-সেদিক শরীর মোচড়ায় আর লাফায়। লাফিয়ে লাফিয়ে সে ঘরের ছাদ পর্যন্ত ছোঁবার চেষ্টা করে, কখনো এলোমেলো তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দেয়। সেই সময় বুলবুল হেসে একেবারে কুটিকুটি হয়।

এই ব্যায়ামের সময় সূর্যর নৃত্যস্পৃহা দেখে বুলবুল প্রথম প্রথম কয়েকদিন চেষ্টা করেছিল সূর্যকে নাচ শেখাবার। কয়েকদিন পরেই সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। সূর্যর ব্যায়াম করা শক্ত শরীরে এখন আর ছন্দময় নৃত্য আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

সূর্যর আসল নামটি আর কেউ মনে রাখে নি, তাকে সকলে ডাকে বাঙ্গালীয়া বলে। প্রথম প্রথম বাঙ্গালীয়া বাবু বলতো এখন বাবু শব্দটাও অতিরিক্ত হয়ে গেছে। এখানকার সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব। অন্য ঘরের মেয়েরা তার সঙ্গে খুব সহজ ব্যবহার করে, কখনো কখনো প্রয়োজন হলে

তারা নিঃসঙ্কোচে এসে বলে, বাঙ্গালীরা, পাঁচ ঠো রুপিয়া দেও তো।

দিনের বেলা মেয়েরা এখানে শুধু একটা ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে থাকে। কারুর কারুর আবার কাঁচুলিরও বালাই থাকে না, শুধু ঘাগরাটাই বুকে পর্যন্ত টেনে গিঁট বেঁধে রাখে—সেই অবস্থায় সূর্যর সামনে পড়ে গেলে তারা একটুও লজ্জা পায় না। এত বড় বাড়িতে গোসলখানা মাত্র দুটি এবং স্নানের জায়গাটি একতলায় ইঁদারার ধারে এবং উন্মুক্ত। সব সময়েই ভিড় লেগে থাকে। স্নান করতে এসে সূর্যকে প্রায়ই আধঘন্টা একঘন্টা দাঁড়াতে হয়, অন্য মেয়েরা স্নান করতে করতেই সূর্যর সঙ্গে গল্প এবং রঙ্গরস করে।

গোড়ার দিকে সূর্যকে দেখে সকলেই নিশ্চয় দারুণ বিমূঢ় হয়ে ছিল। একটা লোক অন্য এক বাবুর সঙ্গে ফূর্তি করতে এসে তারপর একেবারে থেকেই গেল। তাও কিনা বুলবুলের সঙ্গে? এ-বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বুলবুলেরই আকর্ষণ সব চাইতে কম, তাকে কেউ সুন্দরী মনে করে না, তার গালে বসন্তের দাগ এবং সে ভালো গানও জানে না। নাচতে জানে বটে, কিন্তু সুরং না থাকলে মেয়েমানুষের নাচের আবার দাম কি ? সেই বুলবুলের কাছেই কিনা চলে এলো কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমন ফর্সা গায়ের রং। টাকা পয়সাও খরচ করে এন্তার সবচেয়ে বড় কথা, মানুষটার শরীরে এক বিন্দু রাগ নেই, যে যা বলে তাই শোনে।

কারুর কারুর মনে এক সময় সন্দেহ হয়েছিল যে সূর্য বোধহয় কোনো ফেরারী আসামী, এখানে এসে লুকিয়ে আছে। এ রকম ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু কয়েক মাস কেটে গেল, সে রকম কিছুই বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে এখানে পুলিসের লোকও আসে, কিন্তু তারা সূর্যকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। অন্য ঘরের মেয়েরা এখন বুলবুলের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে। তবে এখানে একরকমের কঠোর নীতিবোধ আছে। অন্য ঘরের কোনো পুরুষকে কক্ষণো কেউ ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের ঘরে ডেকে আনবে না। সেই পুরুষ নিজে থেকে আসতে চাইলেও রাজি হবে না।

সারাদিন সূর্য পড়ে পড়ে ঘুমোয়। সন্ধে বেলায় এ বাড়িতে যখন একটা সাজসাজ রব পড়ে যায়, তখন সেও জেগে ওঠে। মেয়েরা যেমন সাজ-সজ্জা বদলে প্রসাধন সেরে নেয়, সূর্যও তেমনি একটু সাজগোজ করে। বুলবুল তার জন্য কয়েকটা শেরওয়ানি আর কলিদার সিল্কের পাঞ্জাবি বানিয়ে দিয়েছে। সূর্যর এখন মস্তবড় গোঁফ এবং মুখভর্তি দাড়ি। ঐ সব পোশাকে তাকে আর বাঙালী বলে চেনাই যায় না। রাজপুত কিংবা শিখ বলেই মনে হয়। জামা কাপড় বদলানো হয়ে গেলে বুলবুল নিজের হাতে সূর্যর চুল আঁচড়ে দেয়, আতর মাখিয়ে দেয় গোঁফে। বুলবুল নিজেও খুব পরিপাটি করে সাজে। হাতে আঁকে মেহেদি, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে করে, লম্বা বেণী ঝোলায়। একটা মোতির মালা গলায় পরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আয়নার সামনে। তারপর মুচকি হেসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় সূর্যকে জিজ্ঞেস করে, কেমন দেখাচ্ছে ?

বুলবুলের সব সাজগোজই এখন সূর্যর জন্য। তার ঘরে এখন আর অন্য কেউ আসে না। অন্য ঘরে নিত্য নতুন বাবু আসে, নাচ গান যখন জমে ওঠে, তখন বুলবুল আর সূর্য পরস্পরকে নিয়ে মত্ত থাকে।

এক-একটা দিন অবশ্য [illegible] কোনো কোনো মেয়ে তাদের [illegible]দের নিয়ে চলে আসে এ ঘরে। সকলে [illegible] এক সঙ্গে হই চই হয়। গান বাজনা সাধারণত বেশী লোক না হলে জমে না। অন্য কোনো ঘরে মাইফেল বসলেও তারা সূর্য আর বুলবুলকে ডেকে নিয়ে যায়। সকলের কাছেই ওরা দু' জন প্রিয়। সূর্য সারাদিন প্রায় চুপচাপ কাটালেও এই সময়ে বেশ ফূর্তিবাজ হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড মদ খেয়ে আর প্রচুর সিগারেট ফোঁকে। যে-কোনো রসিকতায় হেসে ওঠে হো-হো শব্দে। মাত্র কয়েক মাস আগেও সে যে মদ বা সিগারেট স্পর্শ করতো না—এখন তাকে দেখে তা কল্পনাও করা যায় না। শেষ রাত্রির দিকে অন্যরা ক্লান্ত হলেও সে ক্লান্ত হয় না একটুও। তার দিন বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় টানা বারান্দায় গোল হয়ে তাস খেলছিল। আট দশটি নারী, এদের রূপ ও যৌবন ছাড়া আর

কোনো পরিচয় নেই। এরা আনন্দের পণ্য। সাধারণ সংসারী নারীদের তুলনায় এদের দুঃখ বোধ কম। তাস খেলাটা একটা নিমিত্ত মাত্র, আসলে ওরা রসের গল্পে বসেছে। সকলেরই চুল এখন খোলা। পিঠের ওপর ছড়ানো, এ ওর গায়ের ওপর ভর দিয়ে পা মেলে বসেছে, অনেকেরই বুক ও পেটের অনেকখানি অংশ অনাবৃত, কারণ কাছাকাছি কোনো পুরুষ নেই। হঠাৎ হঠাৎ টলে দেবার মতন ওরা কলস্বরে হেসে ওঠে, গড়িয়ে পড়ে একজন আর একজনের গায়ে—কেউ কেউ নিজের উরুতে চাপড় মারে। ওদের এই সময়কার হাসিতে অসভ্যতার ঝংকার আছে, তার মানেই গত রাত্রের কোনো গূঢ় গল্প।

ক্রমে আলো মিলিয়ে আসে, লোকরা ঘরে ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে যায়, ফুলওয়ালা মালা নিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। ওদের তবু ওঠার নাম নেই। একজন বুড়ি এসে ওদের বকাবকি করতে শুরু করে, গা ধুয়ে সেজেগুজে নেবার জন্য তাড়া দেয়। আঁধার হয়ে এলো, এক্ষুণি যে বাবুরা আসতে শুরু করবে। ঐ বুড়ি পরীবানুর মা—এ বাড়িতে পরীবানুই সবচেয়ে রূপসী, তার কাছে বেশী লোক আসে। সকলের ধারণা ঐ বুড়ি এত টাকা জমিয়েছে যে ভালো মহল্লায় তিনখানা বাড়ি কিনতে পারে।

অগত্যা খেলা ভাঙবার পর যে-যার ঘরে ফিরে যায়। হাসির রেশ তখনও লেগে থাকে। বুলবুল নিজে ঘরে এসে সেদিন আর সাজগোজের দিকে গেল না, ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সূর্য তৎক্ষণে জেগে উঠে সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে কি চিন্তা করছিল। বুলবুলকে শুয়ে পড়তে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, একি, শুয়ে পড়লে যে?

বুলবুল মুখ দিয়ে একটা শুধু আদরের উঁ উঁ শব্দ করলো।

সূর্য নিজে উঠে বসে বললো, এই, সন্ধেবেলা শুয়ে থাকে নাকি? ওঠো। আজ ঠাকুরসাহেবের আসবার কথা না?

বুলবুল-বুকের কাছে হাত দুটি এনে গুটি শুটি হয়ে বললো, আমার শীত লাগছে।

সূর্য বুলবুলকে ছুঁয়ে দেখলো, তার তার গা ছ্যাকছেঁকে, প্রায়ই বুলবুলের একটু আধটু জ্বর হয়। কিন্তু এমন পাগল মেয়ে, কিছুতেই ওষুধ খাবে না। কাছাকাছি এক বৃদ্ধ হেকিম সাহেব থাকেন, তিনি এদের চোখে একেবারে ধন্বন্তরি—তাঁর দেওয়া পুরিয়া খায় মাঝে মাঝে। জ্বর কমুক বা না কমুক সেই অবস্থাতেই খুব করে আবার চান করে, তারপর ছলছলে চোখে সুর্মা মাখে।

সেদিন ঠাকুর সাহেবের আসবার কথা। ঠাকুরসাহেব যেদিন আসেন সেদিন সারা বাড়িতে এক বিরাট উৎসব পড়ে যায়। ঠাকুরসাহেব নিজেও সঙ্গে আনেন সাত আট জনের একটি দল—সারা বাড়ির সবাইকে এক ঘরে জড়ো করে নাচগানের এক জলসা বসিয়ে দেন। খাবার দাবার মদ ইত্যাদি সব কিছুরই খরচ ঠাকুরসাহেবের। তাঁর চেহারাটা পুরোনো আমলের জমিদারদের মতই—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, গলার আওয়াজটা বাজখাঁই। ঠাকুরসাহেবের রোজগারের সূত্র কি কেউ জানে না, তবে এখানে অনেকের ধারণা, চম্বলের ডাকাতদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে। তবে লোকটি গান বাজনায় প্রকৃত সমঝদার।

সেদিন রাত আটটার পর ঠাকুরসাহেব দলবল নিয়ে পরীবানুর ঘরে জমিয়ে বসেছেন, তখনও বুলবুলের ঘর অন্ধকার। একটি মেয়ে বাইরে থেকে এসে ডাকাডাকি করতে

আসরলো। বুলবুলে, বুলবুলে, এ বাঙালীরা—

ঠাকুরসাহেব এর আগে কয়েকবার এসেছিলেন, সূর্যর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। তিনি নিজেই খোঁজ করছেন সূর্য আর বুলবুলের।

সূর্য বেয়ারাটিকে জবাব দিল, আজ আমরা যাবো না। বুলবুলের তবিয়ৎ ভালো নেই।

বুলবুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বললো, আমি যাবো না, তুমি যাও।

সূর্য বললো, না, আমারও ইচ্ছে করছে না।

বুলবুল অনুযোগ করে বললো, আমার জন্য তুমি শুধু শুধু ঘরে বসে থাকবে কেন! এ কি রকম মরদ।

সূর্য একদৃষ্টে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই দৃষ্টিতে কি রকম যেন অস্বস্তি লাগে। চেনা মানুষকে কি কেউ এতক্ষণ ধরে দেখে? বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছো, অমন করে?

সূর্য বললো, তুমি বুঝতে পারো না?

—না। তুমি প্রায়ই এরকম সোজাসুজি তাকিয়ে থাকো, আমি মানে বুঝতে পারি না।

—তোমার মধ্যে যে আর একটা বুলবুল আছে, আমি তাকে দেখি।

—আর একটা বুলবুল? আর কেউ নেই, আমার ভেতরে আর কিছু নেই!

—আমি ঠিক দেখতে পাই।

—তোমার ভেতরে যে আর একজন সূর্য আছে, তা কিন্তু আমি ঠিক জানি। তুমি যদিও আমাকে বলো নি।

—বলার দরকার কি! আমার ভেতরের মানুষটাই তো তোমার ভেতরের মানুষটাকে ভালোবাসে।

বুলবুল বললো, ঠিক আছে, ওঠো, ওঠো। তুমি যাও, ঠাকুর সাহেব তোমাকে ডাকাডাকি করছেন।

সূর্য তব যেতে রাজি নয়। ওদিকে পরীবানুর ঘর থেকে প্রবল হুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। আলাহিয়া বিলাবলে গান ধরেছে কেউ। অনেকে মিলে এক সঙ্গে হাততালি বাজিয়ে তাল দিচ্ছে। বুলবুল জানে, সূর্য এসব ভালোবাসে।

সে তখন উঠে পড়ে বললো, ঠিক আছে, চলো, আমিও যাচ্ছি।

সূর্য বললো, তুমি এই জ্বর গায়ে নিয়ে কোথায় যাবে? না, আজ যেতে হবে না।

—আমার কিছু হবে না।

বাতি জ্বালিয়ে বুলবুল প্রসাধন করতে বসলো। সূর্য অনেক করে নিষেধ করলো তাকে, কিছুতেই শুনেয়ে না। শেষ পর্যন্ত সূর্য বললো, তুমি সাজলে কি হবে। আমি যাবো না। আমার আজ আর ইচ্ছে নেই।

বুলবুল বললে, তুমি থাকো তা হলে। আমি একলাই যাই?

বুলবুল জানে, সূর্যকে তা হলে যেতেই হবে। সে কক্ষণো বুলবুলকে ছেড়ে একা ঘরে বসে থাকবে না।

একটু বাদে ওরা দুজন পরীবানুর ঘরে ঢুকতেই সকলে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করলো ওদের। ঠাকুরসাহেব সূর্যকে রসিকতা করে বললেন, বাঙালীবাবু, আপনাকে এতক্ষণ দেখিনি! ফুল আর বুলবুল, একি কেউ একা একা ভোগ করে!'

ঠাকুরসাহেব নিজের পাশে বসালেন সূর্যকে। ঠাকুরসাহেবের স্বভাব আছে, পুরুষদেরও কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলা। উৎসাহের আতিশয্যে এক একবার তিনি সূর্যর কাঁধ আঁকড়ে ধরে ধরে কাছে টেনে আনছেন আর সূর্যর কনুইতে একটা কঠিন কিছুর খোঁচা লাগছে। সূর্য সহজেই বুঝতে পারে, ঠাকুর সাহেবের কোমরে পিস্তল গোঁজা আছে। কোমরে পিস্তল গুঁজে নাচ গানের আসর জমানোটা মন্দ ব্যাপার নয়। ঠাকুরসাহেবের মুখে জর্দার ভুরভুরে গন্ধ—সেই গন্ধটা তাড়াবার জন্য সূর্য ঘনঘন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়।

বুলবুলকে দেখে এখন আর বোঝাই যাবে না যে তার শরীর খারাপ। ছুন্নির গানের সঙ্গে তবলচি একটা চমৎকার বোল দিতেই বুলবুল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো। সকলে একটা উল্লাসের শব্দ করলো। বুলবুলের পাতলা ছিপছিপে দেহটা বিদ্যুতের মতন খেলতে থাকে। ছুন্নি আর তবলচি ক্রমে লয় বাড়িয়ে দেয়। বুলবুল যেন চ্যালেঞ্জের সুরে তাদের কাছে ভাও বাৎলায়।

বুলবুলের এক-একটা নাচ শেষ হতেই সকলে বলে ওঠে, আরো, আরো! বুলবুলের কোনো আপত্তি নেই, সে যেন বেশী উৎসাহ পেয়ে গেছে। এক একবার বিরতির সময় বুলবুল সূর্যর কাছে আসে তার গেলাস থেকে মদে চুমুক দিতে। সূর্য তাকে চোখের ইশারায় জানাতে চায়, আর না। আজ আর থাক। বুলবুল ভ্রূক্ষেপ করে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আজ এখানকার সবাইকে সে একাই মাতিয়ে রেখেছে।

রাত আড়াইটের সময় বুলবুল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে সূর্য তাকে কোলে করে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

(ক্রমশ)

ঠিক সেই হকচকিয়ে যাওয়া জংলীর মতই কী, যে খুঁজে পেয়েছে সমুদ্রে ফেলে যাওয়া কোনও অদ্ভুত বস্তু?—এমন একটা কিছু যা সে বালি খুঁড়ে পেয়েছে, না কী হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছে কোনও অবাক-করা কিছু?—যার বলয়িত রেখাঙ্কন বড় জটিল, যেটা প্রথমে মিট্ মিট্ করেছে, আর তারপর জ্বল জ্বল করে উঠেছে? ঠিক যেমন সে এটাকে নাড়ে চাড়ে, উলটে দেখে, খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে এটা নিয়ে সে কী করবে, জানতে চায় এর কোনও সাংসারিক মূল্য আছে কী না যা তার বোধগম্য, যদিও তার মহত্তর কোনও ব্যবহার আছে কী না তা সে স্বপ্নেও ভাবে না, ঠিক তেমনি কী?

ঠিক এমনি আর্টকে আমাদের হাতের মুঠোয় ধরে আমরা ভাবি আমরা তার ভাগ্যবিধাতা। অসীম সাহসে আমরা তাকে চালাই, নতুন করে গড়ি, ভাঙিচুরি এবং প্রকাশ করি। আমরা টাকার জন্যে তাকে বেচি, ক্ষমতাসীন প্রভুদের তুষ্ট করবার জন্যে তাকে ব্যবহার করি। মজা লোটবার জন্যে কখনো বা তার দিকে ফিরি—চলতি আধুনিক গান থেকে নাইট-ক্লাব পর্যন্ত, কখনো বা ফিরি চলতি রাজনীতির হাওয়ায় ভেসে বা সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হাতের কাছে যে অস্ত্র পাই তাই নিয়ে, তা সে মদের বোতলের ছিপিই হোক আর মাথায় মারবার মুগুরই হোক। আর্ট কিন্তু আমাদের এই অপব্যবহারে কলঙ্কিত হয় না; প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ব্যবহারে সে কেবল তার অন্তর্লোকে আছে যে গোপন আলো তারই কিছুটা আমাদের দেয় মাত্র।

কিন্তু আমরা কখনো কী এই আলোর সবটুকে পাব? কে সাহস করে বলবে যে আর্টের সংজ্ঞার্থ সে চিরদিনের মত নির্ণয় করে দিয়েছে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তার সর্বাঙ্গের সঙ্গে? হয়তো কোন একদিন কেউ একজন ঠিক ঠিক বুঝেছিল এবং আমাদের বলেও ছিল; কিন্তু আমরা বেশি দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারি নি। আমরা কী শুনেছিলুম, এবং অবহেলা করেছিলুম, এবং তারপর তক্ষুনি সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলুম, যেমন সব সময়েই আমরা দ্রুত ফেলে দিয়ে থাকি আমাদের শাশ্বত সম্পদকেও কোন কিছু নতুনের জন্যে? তারপর যখন সেই পুরানো সত্য আমাদের নতুন করে বলা হল, তখন আমার স্মরণেও আনতে পারলুম না যে, এ সত্য একদিন আমাদেরই ঘরের সম্পদ ছিল।

কোনও কোনও শিল্পী নিজেকে এক স্বতন্ত্র আত্মিক জগতের স্রষ্টারূপে দেখেন। তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এই জগৎ-সৃষ্টির দায়িত্ব, তার লোক-সৃষ্টির দায়িত্ব, আর বহন করতে চান তাদের সর্ববিধ গুরুভার। কিন্তু এই গুরুভারের জগদ্দল তাঁকে চূর্ণ করে। কারণ কোনও নশ্বর প্রতিভাই এ-ভার বহনে সমর্থ হয় না। ঠিক যেমন কোনও মানুষই নিজেকে অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুরূপে ঘোষণা করে একটি সুসমঞ্জস, একতান অধ্যাত্ম-জগৎ গড়ে তুলতে সমর্থ হয় না, তেমনি। যখন সে দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন সে দোষ দেয় পৃথিবীর অন্তর্নিবিষ্ট, পরম্পরাগত অসংগতিকে, একালের পিষ্ট, দীর্ণ আত্মার জটিলতাকে অথবা জনগণেশের মূঢ়তাকে।

অপর কোনও কোনও শিল্পী, সেই উচ্চতর মহাশক্তিকে মেনে, ঈশ্বরের স্বর্গের নিচে নিজেকে দীন শিক্ষানবীশ বলে মনে করে সানন্দে কাজ করে চলেন। এতে তাঁর দায়িত্ব বাড়ে। যে সব মানুষ তাঁর সৃষ্টির রসাস্বাদন করছেন, তাঁদের জন্যে লিখছেন কী কথা, আঁকছেন কী ছবি, তার দায়িত্ব আরো কঠোর, আরো কঠিন হয়ে দেখা দেয় তাঁর কাছে। কিন্তু এর বদলে অন্তত এই আশ্বাসটুকু তিনি পান যে, এই জগতের স্রষ্টা তিনি নন। এর নির্দেশক তিনি নন। এ জগতের বুনিয়াদ সম্বন্ধেও কোনও সংশয় নেই। শুধু এ জগতের অন্তর্লীন ঐকতান সম্বন্ধে, এর মধ্যে সৌন্দর্য ও কদর্যতার যে অংশটুকু মানুষ মিশিয়ে দিয়েছে, তার সম্পর্কে অন্যান্য মানুষের চেয়ে অধিকতর সচেতন, অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে হয় শিল্পীকে। আর তাঁকে পৌঁছে দিতে হয় এই কথা—সমন্বয়ের, বিশ্বের সুষমার, তাঁর সহকারী মানুষের কাছে। তার সকল চরমতম ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনে—নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায়, জেলে অথবা রোগাক্রান্ত অবস্থায়—এই বিশ্বব্যাপী ঐকতানের বোধ তাঁকে ত্যাগ করে না।

কিন্তু আর্ট তার সকল অযৌক্তিকতা নিয়ে, তার পলে পলে ঠিকরে ওঠা চোখ ঝলসানো আলো নিয়ে, তার অভাবিতপূর্ব সৃষ্টির চমক নিয়ে, মানবজীবনের ওপরে সব চূর্ণ-করা প্রচণ্ড প্রভাব নিয়ে, এমনি রহস্যময়ী যাদুকরী যে, আর্টিস্টের দেখা জগতের মধ্যে, তার আর্টের ধারণার মধ্যে, তার অযোগ্য হাতের সৃষ্টির মধ্যে সে ফুরিয়ে যায় না।

প্রত্নবিদেরা আজও মনুষ্যজীবনের এমন স্তর আবিষ্কার করতে পারেন নি যেখানে আর্ট ছিল না। মানব-অস্তিত্বের প্রায়ান্ধকার প্রত্যুষে আর্টকে আমরা লাভ করেছি সেই অদৃশ্য উদ্যত হস্তের কাছ থেকে, যাকে আমরা তখনও চিনি নি। চিনেছি পরে, ধীরে ধীরে। কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দেওয়া হল এই বর? এ নিয়ে আমরা কী করব? —এ প্রশ্ন জিগ্যেস করতেও আমাদের দেরি হল ঢের।

যাঁরা বলেন আর্ট টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে, তার সকল রূপ জীর্ণ হয়ে যাবে, তাঁরা ভুল করেন চিরদিনই। মরি আমরাই, আর্ট চিরমৃত্যুঞ্জয়। আর আমরা যখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাব, মুছে যাব পৃথিবী থেকে, তখনো কী আমরা তার সর্বাবয়বের, তার সর্ব সম্ভাবনার পরিচয় পাব?

সব কিছুই নাম পরিগ্রহ করে না। কোনও কোনও বস্তু আমাদের নিয়ে যায় ভাষার অতীত তীরে সেই লোকে 'যতো বাচো নিবর্তন্তে'। যে হৃদয় তুষারিত, তমসাবৃত, সেখানেও আর্ট জ্বালিয়ে দেয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অগ্নিশিখা। আর্টের মধ্যে দিয়েই কখনো কখনো আমরা পাই সেই লোকাতীতের ছায়াবৎ ক্ষণদর্শন, যা যুক্তিবদ্ধ চিন্তায় অলভ্য।

আর্ট সেই পরীর দেশের মায়ামুকুরের মতো। এর দিকে তাকান—নিজেকে দেখতে পাবেন না; দেখবেন এক লহমার জন্যে সেই অনধিগম্য লোক যেখানে অশ্বারোহণে যাওয়া যায় না, পৌঁছনো যায় না পাখা মেলেও—কেবল অন্তরাত্মা গুমরে গুমরে ওঠে।

একদা ডস্টয়েভ্স্কি একটা রহস্যময় উক্তি করেছিলেন: 'সৌন্দর্যই পৃথিবীকে

বাঁচাবে'। এটা কী ধরনের উক্তি? বহুকাল আমি এটাকে কতকগুলো শব্দমাত্র বলে মনে করতুম। এ কেমন করে সম্ভব? এই জিজ্ঞাসু, রক্তপিপাসু ইতিহাসে কবে কাকে বাঁচাতে পেরেছে সৌন্দর্য? মহিমময় করেছে, উন্নীত করেছে—এ কথা ঠিক। কিন্তু বাঁচিয়েছে কাকে?

সৌন্দর্যের সত্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে কিন্তু একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টির মর্মমূলে গুহায়িত থাকে এমন এক সত্য, যার আবেদন অমোঘ। যথার্থ আর্টের অন্তর্লোকে স্বতই উদ্ভাসিত হয় এমন এক ভাস্বর সত্য, যাকে কূট তর্কের ধূলিজালে আচ্ছন্ন করবার উপায় নেই। আর এই সত্য বৈরী হৃদয়কেও অধিগত করে। এ অরিন্দম। একটা ভ্রান্তি বা অসত্যকে অবলম্বন করে একটা মসৃণ, পরিপাটি রাজনীতিক বক্তৃতা লিখে ফেলা যায়, লিখে ফেলা যায় একটা বদমেজাজী প্রবন্ধ বা সমাজসংস্কারের কর্মসূচী, গড়ে তোলা যায় কোনও দার্শনিক তত্ত্ব। যা গোপন করা হল বা বিকৃত করা হল তা তক্ষুনি ধরা পড়বে না।

কিন্তু তারপর এর বিরুদ্ধে লিখে ফেলা সম্ভবপর ঠিক অমনি মসৃণ এবং পরিপাটি একটা বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং সমাজসংস্কারের কর্মসূচী। গড়ে তোলা সম্ভবপর ভিন্নভাবে গঠিত একটা দার্শনিক তত্ত্ব। এই কারণেই এ সব জিনিসকে মানুষ বিশ্বাসও করে আবার সন্দেহও করে।

যা হৃদয়কে স্পর্শ করে না তা বারংবার আউড়ে গেলেও কোনও লাভ হয় না।

কিন্তু যথার্থ শিল্পকর্মের অন্তর্লোকে অনুস্যূত হয়ে আছে এমন এক সত্য যা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশ। যে-সব প্রতারক কৃত্রিম বা নিছক হাতের কৌশল দেখানোর জন্যে গড়ে তোলা, তাদের শিল্পরূপ দেওয়া যায় না; দেওয়া যায় না ধূপেকল্পের অভিব্যঞ্জনা। তারা ধসে পড়ে, দেখা দেয় নেহাতই রোগজীর্ণ এবং পাণ্ডুর হয়ে। কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না তারা। কিন্তু সেই শিল্পকর্ম যা বিধৃত করেছে সেই মহিমময় সত্যকে এবং তাকে উপস্থাপিত করেছে আমাদের কাছে প্রাণস্পর্শী শক্তিরূপে, তা আমাদের আত্মাকে আলোড়িত করে, মথিত করে। অনন্তকালেও কেউ একে অস্বীকার করতে পারবে না।

তা হলে হয়তো 'সত্য, শিব, সুন্দর' এই প্রাচীন ত্রয়ী নেহাতই অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা ফরমুলা নয়—যেমন আমরা মনে করতুম আমাদের জড়বাদী যৌবনে, সহজ আত্মবিশ্বাসে।

প্রাচীন মনীষীরা বলতেন এ তিন বনস্পতি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ত্রিশীর্ষ পরস্পরে আশ্লিষ্ট। [illegible] এ তিনের

অতি স্পষ্ট, অতি সরল স্কন্ধগুলোকে যদি বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়, কেটে ফেলে দেওয়া হয়, বাড়তে দেওয়া হয় না,—তবুও সুন্দরের অভাবিতপূর্ব, অপ্রত্যাশিত, অবাক-করা স্কন্ধ অকালে মাথা তুলবে এবং পৌঁছবে সেই একই উত্তুঙ্গ উচ্চতায়। ত্রয়ীর অভিপ্রায় সে একাই পূর্ণ করবে, সম্পন্ন করবে তাদের আরব্ধকর্ম। তাই যদি হয়, তা হলে 'সৌন্দর্যই পৃথিবীকে বাঁচাবে' ডস্টয়েভ্স্কির এই উক্তি নেহাতই দায়িত্বজ্ঞানহীনের উচ্ছ্বাস নয়, পরন্তু এ অপৌরুষের নিরুক্তি। যাই বলি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, অদৃষ্ট তাঁকে ভূয়োদর্শনের সুযোগ দিয়েছিল। আশ্চর্য বিভায় আলোকিত ছিল তাঁর অন্তর।

সাহিত্য তা হলে আজকের পৃথিবীকে সত্যিই সাহায্য করতে পারে? বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে এ বিষয়ে যেটুকু অন্তর্দৃষ্টি আমি লাভ করেছি তাই আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

যে মঞ্চ থেকে নোবেল বক্তৃতা পাঠ করা যায়, প্রতিটি সাহিত্যিকের কাছ থেকেই তা থাকে বহু বহু দূরে, আর তাতে আরোহণ করা যায় মাত্র একবারই। এ মঞ্চে আরোহণ করবার জন্যে তিন চারটে দুদিনের-জন্যে-তৈরি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমি আসি নি। আমি পার হয়ে এসেছি তুহিন অন্ধকারের কবর থেকে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার তুষারাচ্ছাদিত, দুরারোহ, মৃত্যুপিচ্ছিল সিঁড়ি। সেই তুহিন অন্ধকারের কবরের মধ্যেও বেঁচে থাকাই ছিল আমার ভবিতব্য। কিন্তু আরো অনেকে যাঁরা ছিলেন আমার চেয়েও অধিকতর সৃষ্টিশক্তির অধিকারী, আমার চেয়ে বলবত্তর, তাঁরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন।

এঁদের মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল 'গুলাগের' (দাসশ্রম-শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের) দ্বীপপুঞ্জে, যে দ্বীপগুলো ছড়িয়েছিল হাজারো টুকরোয়। আমাদের মাথার ওপরে ঝুলছে তখন পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের খড়্গ। আমাদের তাড়া করে ফিরছে তখন গুপ্তচর সংস্থার কিঙ্করেরা। আমি এঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলি নি। কারো কারো সম্বন্ধে আমি শুনেছি শুধু। আবার অনেকের সম্বন্ধে আমি অনুমান করেছি কেবল। যাঁরা এই অতল মৃত্যুগহ্বরে তলিয়ে যাবার আগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা অন্তত সাধারণ্যে পরিচিত। কিন্তু যাঁরা কখনো স্বীকৃতি পেলেন না, সাধারণ্যে কখনো উচ্চারিত হল না যাঁদের নাম, তাঁদের সংখ্যা কত? প্রকৃতপক্ষে এঁদের কেউই ফিরে আসতে পারেন নি। একটা গোটা জাতির সাহিত্য চাপা পড়ে রইল দাসশ্রমশিবিরের [illegible] অন্ধকারে। এঁদের জন্যে রইল

শুধু বিস্মৃতি। এঁদের জন্যে জুটল না একটা কফিন, একটা কবর, এমন কী লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুও। এঁরা শুয়ে রইলেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে মাটির কোলে—পায়ের আঙুলে বাঁধা রইল শুধু একটা নম্বর।

এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকেনি রুশ সাহিত্য, যদিও বাইরে থেকে তাকে দেখাতো অনুর্বর পোড়ো জমির মতো। যেখানে শান্তিতে, স্বচ্ছন্দে গড়ে উঠতে পারত এক বর্ণবিহ্বল অরণ্যানী, সেখানে দাঁড়িয়ে রইল কেবল দু-একটি বনস্পতি, যা দৈবাৎ এড়িয়ে গেল মৃত্যুর কুঠার।

আজ যখন আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার পায়ে পায়ে এসে তখন দাঁড়িয়েছেন সেই সব মৃত সাহিত্যিকদের ছায়ামূর্তিরা। নতমস্তকে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমি পথ করে দিচ্ছি তাঁদের, যাঁদের ছিল এই মঞ্চে ওঠার অগ্রাধিকার। এখানে দাঁড়িয়ে আমি কেমন করে অনুভব করব এবং প্রকাশ করব কী তাঁরা বলতে চাইতেন?

আমাদের এই কণ্ঠস্বরকে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপরে বর্তেছিল বহুকাল থেকেই, এবং আমরা এটা বুঝেও-ছিলুম। ভ্লাদিমির সোলোভিয়েভের ভাষায়:

যে বৃত্ত আঁকাই ছিল আমাদের বিধিলিপি
আমাদেরই তা পূর্ণ করতে হবে,
অন্তত আমাদের দাবির মধ্যে দিয়েও।

প্রায়ই যখন আমাদের বেদনাদিগ্ধ বন্দী শিবিরে বন্দীর দল চঞ্চল হয়ে উঠত, সান্ধ্য তুষারের নিবিড় তমসা ভেদ করে জ্বলে উঠত লণ্ঠনের সারি, তখন আমাদের অন্তর মথিত করে উঠে আসত সেই সব কথা যা আমরা চিৎকার করে শোনাতে চাইতুম সমগ্র পৃথিবীকে, যাতে অন্তত আমাদের একজনের কণ্ঠস্বরও পৌঁছয় বাইরের পৃথিবীতে। তখন কী স্পষ্ট মনে হত এই কথাগুলো যা আমাদের সফল দূত পৌঁছে দেবে বাইরের জগতের কাছে এবং যাতে বহির্বিশ্ব তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে সাড়া দেবে। এ কথাগুলো আমরা বই পড়ে শিখি নি, বাইরে থেকে আমদানীও করিনি অর্থসঙ্গতি রক্ষার খাতিরে। এ সব কথাগুলো গড়ে উঠেছিল কখনো কারা-কক্ষের নির্জনতায়, কখনো বা অরণ্যাগ্নির উষ্ণ শ্বাসে, সেই সব মানুষের সঙ্গে কথোপ-কথনে, যারা আজ মৃত। এ কথাগুলো পরীক্ষিত হয়েছিল সেই জীবনের কষ্টি-পাথরে, উঠে এসেছিল সেই জীবনের অন্তস্তল মথিত করে। যখন অবশেষে বাইরের চাপ একটু কমল, তখন আমার এবং আমাদের সকলের দিগন্ত প্রসারিত হল। এবং একটা আণুবীক্ষণিক ফাটলের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখলুম এবং চিনলুম 'সমগ্র জগৎকে। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলুম, আমরা যা ভেবেছিলুম সমগ্র জগৎ আদৌ তা নয়। অর্থাৎ এই জগৎ 'ওইভাবে

বেঁচে নেই', এ জগৎ পৌঁছে দেয় না 'ওই-খানে'। এ জগৎ কর্দমাক্ত জলাভূমি দেখে বলে ওঠে না 'কী সুন্দর ডোবা', গলায় কংক্রিটের বকলস দেখলে বলে ওঠে না 'কী চমৎকার হার'—এ সব ঠিকই। কিন্তু এ-জগৎও এমনি যেখানে কেউ ভেঙে পড়ে অশান্ত কান্নায়, আর কেউ মাতোয়ারা হয় লঘুচিত্ত নৃত্যে।

এটা কেমন করে ঘটল? কেন এই অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান? আমরা কী সংবেদন-শীল ছিলুম না? না কি সমগ্র জগৎ সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল? অথবা এমনটা ঘটেছিল ভাষার বিভিন্নতার জন্যে? কেন এমন হয় যে মানুষেরা পরস্পরের প্রতিটি স্পষ্ট উচ্চারণ শুনতে পায় না? তবে কি আর শব্দ শব্দিত হয় না? গড়িয়ে যায় বর্ণগন্ধস্বাদহীন জলের মতো? চিহ্নটুকুও বুঝি তার থাকে না?

যখন আমি এটা ক্রমশ উপলব্ধি করতে লাগলুম তখন বছরের পর বছর ধরে আমি পরিবর্তিত করতে লাগলুম আমার সম্ভাব্য বক্তৃতার গঠন, তার বিষয়বস্তু, তার সুর। সেই বক্তৃতাই আমি আজ দিচ্ছি। দাসশ্রম-শিবিরে তুষারস্পৃষ্ট সন্ধ্যায় আমি যে পরিকল্পনা করেছিলুম তার সঙ্গে এর কোনও সাদৃশ্য নেই।

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ এমনি-ভাবে গড়ে উঠেছে যে তার বিশ্ববীক্ষা—যদি না তা সংবেশনের সাহায্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে—তার অভিপ্রায়, তার মূল্যমান, তার ক্রিয়া-কলাপ—সবই নির্ধারিত হয়ে থাকে তার ব্যক্তিজীবনের এবং গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞ-তার দ্বারা। একটি রুশ প্রবাদ আছে: তুমি তোমার ভাইকেও বিশ্বাস কোরো না; বিশ্বাস কোরো শুধু তুমি তোমার বাঁকা চোখদুটিকে। আর এটাই আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে এবং মানুষের আচার আচরণকে বোঝবার সব থেকে নির্ভর-যোগ্য অবলম্বন। ইতিহাসের উষাকালের সেই সব দীর্ঘ যুগে যখন আমাদের পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেছিল অরাল অরণ্যানী, যখন সে ছিল রহস্যময়ী, যখন বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের রেখা সর্বত্র সঞ্চারী হয়ে ওঠে নি, যখন সে পরিণত হয় নি একটিমাত্র বিস্পন্দিত পিণ্ডে, তখন সেদিনকার জনপদবাসীরা তাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে রাজত্ব করেছে তাদের এলাকার মধ্যে, গোষ্ঠীর মধ্যে, সমাজের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের জাতীয় পরিসীমার মধ্যে। সেকালে ব্যক্তি মানুষের পক্ষে একটি মূল্যমান সহজে বুঝতে পারা এবং তা গ্রহণ করতে পারা সম্ভবপর ছিল; সম্ভবপর ছিল বোঝা কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অবিশ্বাস্য, কোনটা নিষ্ঠুর, কোনটা নীতিবিগর্হিত, কোনটা সততা, কোনটা ছলনা। এবং যদিও এই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাদের সামাজিক রীতিনীতিগুলো ছিল আশ্চর্যরকম আলাদা, যেমন আলাদা ছিল তাদের দাঁড়িপাল্লার বাটখারাগুলোও—তবুও এই পার্থক্যগুলো কেবল বিস্মিত করত বিরল-দৃষ্ট পথিককে, আর লিপিবদ্ধ হত তাদের দিনলিপিতে অবাক-করা সব ব্যাপার বলে। তারা কিন্তু কোনও বিপদ ডেকে নিয়ে আসত না সমগ্র মানবজাতির জীবনে, যে মানবজাতি তখনো এক হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু গত কয়েক দশকে অদৃশ্যভাবে হঠাৎ মানবসমাজ সমসূত্র হয়ে গেল, একীভূত হয়ে গেল। এটা আশার কথাও, আবার বিপদের কথাও। এর ফলে যদি পৃথিবীর একাংশে হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত লাগে বা প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাহলে তা তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ে অপরাংশে। অনেক সময়েই এ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার কোন উপায় থাকে না। মানবজাতি আজ এক হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তা বিধৃত হয় নি তেমন নিটোল ঐক্যে, যেমন নিটোল ঐক্যে বিধৃত ছিল গোষ্ঠী বা জাতি। এ ঐক্য গড়ে ওঠে নি বহুকালের পারস্পরিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, গড়ে ওঠে নি সেই এক জোড়া চোখ থাকার ফলে, যাকে আমরা আদর করে বলেছি 'বাঁকা চোখ'। এটা গড়ে ওঠে নি একই মাতৃভাষার চর্চার মধ্য দিয়েও। এ ঐক্য গড়ে উঠেছে সকল বাধাকে অতিক্রম করে মুদ্রযন্ত্র আর আন্তর্জাতিক বেতারের মাধ্যমে। যখন আমাদের ওপরে হঠাৎ নেমে আসে ঘটনা দুর্ঘটনার হিমানী-সম্প্রপাত, তখন মুহূর্তের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী তা শুনতে পায়। কিন্তু কোন মাপকাঠি দিয়ে এই ঘটনাগুলোকে মাপব, কেমন করে পৃথিবীর সেই অপরিচিত অংশের লোকাচার এবং অনুশাসনের সাহায্যে এগুলোর যথার্থ মূল্য নির্ণয় করব—এ সমস্যার কোন সমাধান তো পৌঁছে দেওয়া যায় না কোনও বেতার তরঙ্গ বা সংবাদপত্রের স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে। কারণ, এই মাপকাঠি-গুলো বিশেষ বিশেষ দেশে ও সমাজে, বিশেষ বিশেষ পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, বয়স্ক হয়ে ওঠে। এগুলোকে আদান-প্রদান করা যায় না নীল আকাশের শূন্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা তাদের বহু কষ্টে অর্জিত স্বীয় প্রমূল্যগুলোকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ঘটনার মূল্যায়নে। জিদের সঙ্গে, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তারা ঘটনাগুলোর বিচার করে তাদের স্বকীয় প্রমূল্যের তুলাদণ্ডে। অন্য কোনও মূল্য-মানের সাহায্য কখনোই গ্রহণ করে না তারা।

পৃথিবীতে এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমানের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও নেহাত নগণ্য নয়। কাছের ঘটনার মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের মূল্যমান, দূরের ঘটনায় আর এক ধরনের। স্থবির সমাজের মূল্যমান এক রকমের, যৌবনোচ্ছল সমাজের আর এক রকমের। ভাগ্যবান পুরুষদের এক প্রকারের, ব্যর্থকাম ব্যক্তিদের আর এক প্রকারের। এই বহুবিচিত্র মূল্যমানগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে মুখর। এরা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, হতচেতন করে। তাই আমরা পালিয়ে যেতে চাই স্বকীয় মূল্যমান ছাড়া অপর সকল মূল্যমানের কাছ থেকে, যেন এগুলো প্রহেলিকা অথবা পাগলের প্রলাপ। আর নিজেদের ঘরোয়া আটপৌরে মূল্যমানের সাহায্যে সহজ আত্মবিশ্বাসে আমরা বিচার করতে বসি সমগ্র বিশ্বের। আর এই কারণেই যেটা যথার্থই অধিক বেদনাদায়ক, অধিক অসহনীয়, অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাকে আমরা অধিক বেদনা-দায়ক, অধিক অসহনীয়, অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। অধিক বেদনাদায়ক, অধিক অসহনীয়, অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তাকেই যা অধিকতর কাছের। সম্পূর্ণ সহনীয় বলে মনে করি আমরা সেই সব কিছুকে যা দূরের, যা এখুনি এসে ভাঙছে না আমাদের ঘর—তা সেগুলো যতই মর্মন্তুদ হোক, যতই বুক-ভাঙা বোবা কান্নায় গুমরে গুমরে উঠুক, যতই ভেসে ভরে উঠুক লক্ষ লক্ষ বিধ্বস্ত জীবনের কঙ্কালে।

পৃথিবীর এক অংশে মাত্র কিছু কাল আগে শত সহস্র নির্বাক খৃস্টান যে মর্মন্তুদ নিষ্পেষণের তলায় গুঁড়িয়ে গেল, প্রাণোৎসর্গ করলে তাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের জন্যে, তা প্রাচীন রোমান নির্যাতনের চেয়ে কিছুমাত্র কম বীভৎস নয়। অপর গোলার্ধে একজন উন্মাদ (এবং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সে কেবল একাই নয়) সাগর পাড়ি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে যাজকোত্তমের পেটে ইস্পাতের ফলা সেঁধিয়ে দিয়ে ধর্মের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে। সে তার নিজের মূল্যমানের নিকষে আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই হিসেব কষে ব্যবস্থা করে রেখেছে।

এক মূল্যমানের মাপকাঠিতে দূর থেকে যাকে ঈর্ষাজনক, পূর্ণশ্রী স্বাধীনতা বলে মনে হয়, আর এক মূল্যমানের মাপকাঠিতে কাছ থেকে তাকে মনে হয় খেপিয়ে দেওয়ার মতো অসহ্য বন্ধন, যা ছিন্ন করবার জন্যে নির্দ্বিধায় আমরা এখুনি 'বাস' (bus) পর্যন্ত উলটে দিতে পারি। পৃথিবীর একাংশে যাকে মনে হতে পারে অবিশ্বাস্য, স্বপ্নসম্ভব সম্পদের সৌভাগ্য, পৃথিবীর অপরাংশে তাকে হয়তো মনে হবে শ্বাস-রুদ্ধ করা বীভৎস শোষণ, যার অবসানে এখুনি ধর্মঘটের ডাক দিতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর দুর্ঘটনাকে পরিমাপ করবার

অন্যেও আছে বিভিন্ন মূল্যমান : যে বন্যায় শত সহস্র প্রাণহানি হল তাকেও আমরা স্থানীয় দুর্ঘটনার চেয়ে লঘু করে দেখি। ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমান আমরা ব্যবহার করি ব্যক্তিগত অপমানের ক্ষেত্রেও : কখনো বা একটা বিদ্রূপের হাসি বা অবজ্ঞার ইঙ্গিত আমাদের কাছে তীব্র অপমানরূপে দেখা দেয়, আবার কখনো বা নির্মম প্রহারকেও আমরা মজাদার পরিহাস বলে মনে করি। ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমান আছে অপরাধ এবং শাস্তির বেলাতে : কোথাও বা এক মাসের কয়েদ, গ্রামাঞ্চলে নির্বাসন অথবা নির্জন কারাকক্ষে বাস, যেখানে খেতে দেওয়া হয় সাদা রুটি আর দুধ,—মানুষের কল্পনাকেও আতঙ্কিত করে তোলে। খবরের কাগজের পাতা ভরে ওঠে ক্রুদ্ধ চিৎকারে। আবার কোথাও বা পঁচিশ বছরের কয়েদ, সেই সব নির্জন কারাকক্ষে কয়েদীদের অন্তরিত করে রাখা যেখানে শীতে দেওয়ালের গায়ে জমে ওঠে কয়েক ইঞ্চি পুরু বরফ আর কয়েদীদের পরে থাকতে বাধ্য করা হয় শুধু অন্তর্বাস; সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের লোককে পাগলা-গারদে পাঠানো, অথবা সীমান্তের কাছে গুলি করে হত্যা করা সেই সব অসংখ্য অবুঝ লোকেদের যারা কেবলই না-হক পালিয়ে যেতে চায় তাদের সোনার দেশ ছেড়ে,—এ সব তো অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ ঘটনা! আর আমাদের মনও কেমন প্রশান্ত, উদাসীন থাকে পৃথিবীর সেই সব অঞ্চলের ব্যাপারে যাদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, যেখানের প্রায় কোন ঘটনার সংবাদই আমাদের কাছে পৌঁছয় না, কেবল কয়েক-জন সাংবাদিকের অতি তুচ্ছ, পুরানো হয়ে যাওয়া কিছু অনুমান ছাড়া।

তবুও মানুষের দৃষ্টির এই দ্বৈতের জন্যে, দূরের মানুষের দুঃখকে এই অবাক-করা না-বোঝার জন্যে, মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মানুষ যে এমনিভাবেই গড়া! কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কাছে—আজ যা সঙ্কুচিত হয়ে পরিণত হয়েছে একটি নিষ্ফল পিণ্ডে—এই পারস্পরিক না-বোঝা আসন্ন এবং ভয়ঙ্কর ধ্বংসের ইঙ্গিতরূপে দেখা দিচ্ছে। যেখানে ছটা, চারটে, এমন কী দুটোও মূল্যমান পাশাপাশি প্রচলিত, সেখানে টিঁকে থাকতে পারে না এক অখণ্ড পৃথিবী, বেঁচে থাকতে পারে না এক অবিভাজ্য মানবজাতি। এই স্পন্দন-বৈপরীত্য, এই ছন্দ-পতনের ফলে আমরা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ব।

যে মানুষের হৃদয় দুটো, এ জগৎ তার জন্যে নয়; আর এই পৃথিবীতে আমরা পাশাপাশি বেঁচে থাকতেও পারব না।

কিন্তু কে এই মূল্যমানগুলোকে মেলাবে? আর কেমনভাবেই বা মেলাবে? কে দিতে পারবে সেই প্রব্যাখ্যার সূত্র যা সমভাবে পৃথিবীর সর্বত্র নির্ণয় করে দিতে পারবে কী শুভ, কী অশুভ, কী সৎ, কী অসৎ, কী সহনীয় আর কী অসহ্য? কে গোটা মানবজাতির কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারবে কোনটা গুরুভার এবং অসহনীয়, আর কোনটা কেবল আঁচড়ে দিয়ে যায় গায়ের একটুখানি চামড়া? কে আমাদের ক্রোধকে প্রধাবিত করতে পারবে সেই বস্তুর দিকে যা কেবল কাছের নয়, যা যথার্থই রোমহর্ষক? কে পারবে পৌঁছে দিতে এই ধরনের বোধ, তার প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করে? কে জাগিয়ে তুলতে পারবে গোঁড়া, সংকীর্ণমনা, জেদী এই মানুষ নামক প্রাণীটির হৃদয়ে সেই সব মর্মন্তুদ বেদনা এবং প্রবঞ্চনার অনুভূতি যা কখনো ধরা পড়ে নি তার নিজের অভিজ্ঞতার বৃত্তে? প্রচার, বিধি-নিষেধের আরোপ, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ—এসব দিয়ে কোনও কাজ হবে না। কিন্তু সৌভাগ্য-বশত আজও আমাদের পৃথিবীতে আছে অন্তত একটা উপায়। সে উপায় হল আর্ট। সে উপায় হল সাহিত্য।

এরা অঘটন ঘটাতে পারে। এরা অতিক্রম করতে পারে কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সেই বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্যকে, যা অপরের অভি-জ্ঞতা সম্বন্ধে মানুষের মনকে করে তোলে অসাড়। এক মানুষ থেকে অপর মানুষে, যখন তারা এই পৃথিবীতে পূর্ণ করে তাদের অস্তিত্বের ক্ষণবৃত্ত, আর্ট পৌঁছে দিতে পারে এক অপরিচিত, জীবনব্যাপী অভি-জ্ঞতার দুর্বহ ভার—তার সকল বেদনা, সকল বর্ণবৈচিত্র্য, সকল জীবনরস নিয়ে। আর্ট পুনঃসৃষ্টি করে রক্তমাংসের দেহধারী এক অপরিজ্ঞাত অভিজ্ঞতা, আর তা এনে দেয় আমাদের অনুভবের আয়ত্তে।

না, এর চেয়েও অনেক, অনেক বেশি অঘটন ঘটাতে পারে আর্ট। বহু সময়ের ব্যবধানে, কখনো বা বহু শতাব্দীর ব্যবধানে, একটির পর একটি দেশ, এমন কী গোটা মহাদেশও, পরস্পরের ভুলের পুনরা-বৃত্তি করে চলেছে। এতে মনে হয় এ ভুল-গুলো বোধ হয় এক নজরে খুব সহজে ধরা পড়ার মতো নয়।

কিন্তু না; কয়েকটি জাতি স্বীয় অভিজ্ঞতার নিকষে যা যাচাই করেছে, এবং তারপর পরিত্যাগ করেছে, তাকেই হঠাৎ প্রজ্ঞার পরাকাষ্ঠা বলে আবিষ্কার করেছে অন্যেরা। আর এখানেও, যে-সব অভিজ্ঞতা আমরা স্বীয় জীবনে অর্জন করতে পারি নি তার প্রতিকল্প খুঁজে পাই কেবল আর্টে, সাহিত্যে। তাদের আছে এই এক অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি। ভাষা, দেশাচার, সামাজিক কাঠামো, সব কিছুকে অতিক্রম করে একটা গোটা জাতির জীবনের অভি-জ্ঞতাকে তারা পৌঁছে দিতে পারে অপর এক জাতির কাছে। অনভিজ্ঞ জাতির কাছে এনে দিতে পারে অপর এক জাতির কয়েক-দশক-দীর্ঘ তিক্ত, কর্কশ অগ্নিপরীক্ষার ইতিবৃত্ত। তাকে নিবৃত্ত করতে পারে সেই পথ অবলম্বন করা থেকে যা নিরর্থক, ভ্রান্ত, [illegible]; এবং তারা মানুষের ইতিহাসের দীর্ঘ [illegible] পথকে করে দিতে পারে সংক্ষিপ্ত।

আজ আর্টের এই মহৎ গুণ, এই মহৎ ভূমিকার কথাই আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি এই নোবেল বক্তৃতামঞ্চ থেকে।

আর্ট আমার পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে, বংশ পরম্পরায়, সঞ্চারিত করে দিতে পারে অকাট্য, ঘনসম্বদ্ধ অভিজ্ঞতা। এইভাবে এটা হয়ে ওঠে একটা জাতির প্রাণস্পন্দিত স্মৃতি। এইভাবে সে তার অন্তর্লোকে সংগোপনে প্রজ্বলিত রাখতে পারে অতিক্রান্ত ইতিহাসের অগ্নিশিখা এমনিরূপে, যা বিকৃত করা যাবে না, করা যাবে না কুৎসার কালিমালিপ্ত। এইভাবে একটা সাহিত্য এবং তার ভাষা একটা জাতির আত্মাকে রক্ষা করতে পারে সমূহ বিনাশের হাত থেকে।

[এ-কথা বলা ইদানীং ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সব জাতি প্রায় একই রকম হয়ে উঠছে, বিভিন্ন নরগোষ্ঠী আধুনিক সভ্যতার চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে গলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু এ মতে বিশ্বাসী নই। এ মতের আলোচনা করা অবিশ্যি এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। এখানে শুধু এটুকু বলাই সমীচীন হবে যে যদি সমস্ত মানুষ একই রকম হয়ে উঠত, যদি তাদের সকলকে গ্রাস করে গড়ে উঠত একটিমাত্র ব্যক্তিত্ব, একটিমাত্র মুখাবয়ব, তাহলে পৃথিবী যেমন হতশ্রী হয়ে উঠত, তেমনি হতশ্রী হয়ে উঠত পৃথিবী যদি বিভিন্ন জাতির [illegible] অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। বিভিন্ন জাতি-গুলো হল মানবসমাজের অমূল্য সম্পদ, তার বহু বিচিত্র সামূহিক ব্যক্তিত্ববিসর। এদের মধ্যে সব থেকে নগণ্য যে তারও আছে স্বকীয় স্থানিক রঙ, তারও অন্তরে নিহিত ঐশী উদ্দেশ্যের কোন বিশেষ দিক।]

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য সেই জাতির, রাষ্ট্রীক শক্তির খবরদারিতে যার সাহিত্য বিপর্যস্ত। কারণ, এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কেবল গ্রন্থ মুদ্রণের স্বাধীনতাকেই খর্ব করে না। এটা তার হৃদ্‌স্পন্দনকে থামিয়ে দেয়। তার স্মৃতিকে টুকরো টুকরো করে কাটে। সে-জাতি ভুলতে বসে তার আপন সত্তাকে, বঞ্চিত হয় তার আত্মিক ঐক্য থেকে। একই দেশের অধিবাসী সহৃদয় মানুষেরাও পরস্পরের কথা বুঝতে পারে না, যদিও তাদের ভাষা নাকি একই। নির্বাক বংশধরেরা বড় হয়ে ওঠে, বৃদ্ধ হয় এবং তারপর মৃত্যু তাদের গ্রাস করে। কিন্তু

তাদের কেউই কখনো বলে না নিজেদের কথা। পরস্পরের কাছেও না, সন্তান-সন্ততিদের কাছেও না। যখন মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশব্দে সাহিত্যসৃষ্টি করতে বাধা করা হয় আক্‌মাতোভা বা জামিয়াতিন্‌কে—যাঁরা সারা জীবনই রইলেন অন্তরিত এবং কখনোই শুনতে পেলেন না তাঁদের আপন রচনার, আপন কন্ঠের প্রতিধ্বনি—তখন এটা একটা গোটা জাতির কাছে শুধু দুঃখ-দায়ক ঘটনা হয়েই থেমে থাকে না, এ ডেকে আনে তার সমূহ সর্বনাশ।

আবার কখনো কখনো যখন এই নীরবতার ফলে মানবসমাজের সামগ্রিক ইতিহাসকে ঠিক মতো বোঝা যায় না, তখন তা হয়ে ওঠে সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও বিপজ্জনক।

শিল্পীকে তার প্রাণের আনন্দে, স্বচ্ছন্দে শিল্পসৃষ্টির স্বাধিকার দেওয়া হবে কী না, শিল্পকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে কী না তার আপন প্রাণস্পন্দনের তালে তালে স্বচ্ছন্দগতিতে অথবা শিল্প ও শিল্পীকে সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে সমাজের প্রতি তার কর্তব্যের কথা এবং তা পালনও করতে হবে, যদিও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে,—এসব নিয়ে দেশে দেশে, কালে কালে অনেক উত্তপ্ত, ক্রুদ্ধ এবং সুন্দর বিতর্ক হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমার কিন্তু কোন সংশয় নেই। তবুও পুরনো তর্কের ঝড় আমি আবার তুলব না। এ বিষয়ে অতি চমৎকার আলোচনাগুলোর অন্যতম হল আলবের কামুর নোবেল বক্তৃতা এবং আমি তাঁর সকল সিদ্ধান্তে সানন্দে সায় দেব। প্রকৃতপক্ষে কয়েক দশক ধরে রুশ সাহিত্যে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে একটা প্রবণতা। রুশ সাহিত্য তার আপন সত্তার সৌন্দর্যের ধ্যানে একেবারে মগ্ন হয়ে যেতে চায় না। সে চায় না তার পাখা মেলে পত্‌পত্‌ করে উড়তে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে। আমার সর্বশক্তি দিয়ে এই ঐতিহ্য বহন করতে আমি লজ্জিত বোধ করি না। লেখক যে তাঁর সমাজের মধ্যে থেকে অনেক কিছুই করতে পারেন এবং সেটা করাই যে তাঁর কর্তব্য এ ধারণার সঙ্গে রুশ সাহিত্য বহুদিনই পরিচিত।

কিন্তু বহির্বিশ্বে যাই ঘটুক না কেন তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে কেবল নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দর্শনকে প্রকাশ করার শিল্পীর যে স্বাধিকার আমরা যেন তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত না করি। আমরা যেন শিল্পীর কাছে কেবলই দাবি না করি। আসুন আমরা তাঁর কাছে অনুযোগ করি, প্রার্থনা করি, তাঁকে অনুরোধ করি, প্রলুব্ধ করি। এ সবই আমরা করতে পারি। কিন্তু আমরা যেন কখনোই বিস্মৃত না হই যে আসলে শিল্পী স্বয়ং তাঁর প্রতিভার অংশ মাত্রই বিকশিত করে থাকেন। তাঁর প্রতিভার অধিকাংশটাই পূর্ণ বিকশিতরূপে বিভাত হয় তাঁর মধ্যে তাঁর জন্মের কাল থেকেই। আর এই প্রতিভার বর তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার লাগাম টেনে ধরে, চাপিয়ে দেয় তাঁর ওপরে দায়িত্বের গুরুভার। ধরে নেওয়া যাক কারো কাছেই কোন ঋণ নেই শিল্পীর। তবুও যখন দেখি শিল্পী তাঁর স্বয়ংসৃষ্ট জগতের মধ্যে অথবা তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির এলাকায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েও কেমন করে তাঁর সত্যধৃত জগৎকে সমর্পণ করতে পারেন তাদের হাতে যারা অর্থগৃধ্নু, যুদ্ধব্যবসায়ী—একান্তই যদি তারা অপদার্থ বা উন্মাদ না হয়ে থাকে—তখন বেদনার্ত না হয়ে পারি না।

পূর্ববর্তী সকল শতাব্দীর চেয়ে অনেক বেশি নির্মম প্রতিপন্ন হয়েছে বিংশ শতাব্দী এবং তার প্রথম পঞ্চাশ বছর সেই ত্রাস সেই মহন্তরের পদপাত-শিহরিত। যে লোভ, ঈর্ষা, অসংযম, দ্রোহ এবং রিরংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব আজও আমাদের পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেইসব আদিম প্রক্ষোভে,—যদিও এগুলো এখন শ্রেণী সংগ্রাম, জাতিবৈর, জনগণের সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়নগত সংঘর্ষ ইত্যাদি রীতিমতো শোভন এবং ভদ্র ছদ্মনাম ধারণ করেছে। পরস্পরের সঙ্গে আপস না করার সেই যে আদিম প্রাগৈতিহাসিক প্রবৃত্তি তাই এখন পরিণত হয়েছে তত্ত্বে এবং এটাই এখন নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বলে পরিগণিত। এই প্রবৃত্তি দাবি করে অন্তহীন গৃহযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নরবলি, নিরন্তর আমাদের শোনায় যে শাশ্বত, চিরন্তন কল্যাণ বা ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই,—এ সবই আপেক্ষিক, পরিবর্তন-শীল। সেইহেতু এটাই হল নিয়ম যে যা করলে তোমার পার্টির সবচেয়ে বেশী লাভ হবে তাই করো। যে-কোনও পেশাদার গোষ্ঠীই যখনই কোনও বস্তুকে ভেঙে ফেলার সুযোগ পায় তখনই তারা তা ভাঙে, এ বস্তু তাদের অর্জিত না হলেও অথবা নেহাত বাড়তি হলেও। এর ফলে যদি সমস্ত সমাজটাও ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে যায়, তাতেও তারা দৃক্‌পাত করে না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় পাশ্চমী সমাজের সংক্ষোভ এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছচ্ছে যেখানে এ-সমাজ তার ভারসাম্য হারাবে, ভেঙে পড়বে। শতশতাব্দীর ন্যায়ানুগ শাসনে গড়ে ওঠা সীমারেখাগুলো ক্রমশই নির্দ্বিধায় ভেঙে ফেলছে হিংসা। তার নির্লজ্জ গর্বোদ্ধত পদপাতে পৃথিবী টলমল। একবারও কেউ ভেবে দেখছে না যে হিংসার ঊষর অনুর্বরতা ইতিহাসে বারংবার প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার কেবল উলঙ্গ ক্ষমতাই বিজয়গর্বে পৃথিবীময় আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে না, আস্ফালন করে ফিরছে তার উচ্ছ্বসিত সমর্থনও। ন্যায়বিচার কিছু নয়, উলঙ্গ ক্ষমতাই সব, এই নির্লজ্জ বিশ্বাস এখন পৃথিবী প্লাবিত করছে। ডস্টয়েভ-স্কির 'শয়তানেরা'—যারা ছিল গত শতাব্দীর নেহাতই প্রাদেশিক দুঃস্বপ্ন—এখন পৃথিবী-ময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে, ছড়িয়ে পড়ছে সেই সব দেশে, যে দেশে তাদের কথা স্বপ্নেও ভাবা যেত না। বিমান-ছিনতাই, মনুষ্যহরণ, সাম্প্রতিক কালের অগ্নিকাণ্ড এবং বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তারা এ-সভ্যতাকে ধ্বংস করবার তাদের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করছে। এবং হয়তো তারা সফলও হবে। যেসব অল্পবয়েসী ছেলেদের যৌন অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি, যারা এখনো দুঃখদুর্দশার আগুনে পোড়েনি, অধিকারী হয়নি বৃহত্তর বোধের, তারা সানন্দে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিভ্রষ্ট রুশ ভ্রান্তিগুলোর অনুসরণ করছে। তারা ভাবছে তারা বুঝি নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করছে। চৈনিক রেডগার্ডদের শোচনীয়তম শোচনীয় অধঃপতনকে উজ্জ্বল আদর্শ বলে তুলে ধরছে তারা। বিশ্বমানবের অন্তরশায়ী মহাসত্তা সম্বন্ধে তাদের অগভীর জ্ঞানের ফলে, তাদের অনভিজ্ঞ হৃদয়ের বালসুলভ বিশ্বাসে তারা চিৎকার করে উঠছে : 'এস আমরা ওই নির্মম, লোভী উৎপীড়ক-গুলোকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিই। তারপর রাইফেল আর গ্রেনেড্‌ রেখে দিয়ে আমরা, নতুনেরা, বনে যাব একেবারে ন্যায়পরায়ণ, সৎ এবং সহৃদয়।' আদৌ তা হবে না। যারা এদের চেয়ে অনেক বেশি দিন বেঁচেছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ঢের বেশি, বোঝেও অনেক বেশি, যারা এই অল্প-বয়েসীদের বাধা দিতে পারত, তাদের অনেকেই এদের বাধা দিতে সাহস করছে না। গলাধঃকরণ করছে সব কিছুই, পাছে তাদের রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করা হয় এই ভয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি রুশ প্রপঞ্চ সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে, তা হল ডস্টয়েভস্কি যাকে বলতেন 'প্রগতিবাদী বুকুনির দাসত্ব।'

মিউনিক-মনোভাব যে অতীতের বস্তু হয়ে উঠেছে এ-কথা আমরা আজও বলতে পারি না। এটা যে ইতিহাসে একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র, তা নয়। আমি বরং এ-কথা বলব যে, বিংশশতাব্দীতে মিউনিক-মনোভাবেরই প্রাধান্য। হঠাৎ পুনরুত্থিত নগ্ন বর্বরতার আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্যে মৃদু হাসি আর নতিস্বীকার ছাড়া আর কোনও কিছুই খুঁজে পায়নি ভীরু সভ্যজগৎ। এই মিউনিক-মনোভাব হল সফল, সম্পদশালী ব্যক্তিদের দুর্বল ইচ্ছাশক্তির এক দুরারোগ্য ব্যাধি। য যে-কোনও উপায়ে, যে-কোনও মূল্যে

বিজ্ঞবৈভব সংগ্রহ করতে চায়, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এ জগতে তারা তাদের নিত্যসঙ্গী। এই ধরনের লোকেরা—অন্তত আজকের জগতে এদের সংখ্যা অনেক—(লেখকরা) আর পক্ষপাতদুষ্টেরা পথ বেছে নেয়, যাতে তাদের অভ্যাস্ত জীবনযাত্রা কোনক্রমে আরও দুদিন বেশি টিঁকে যায়, যাতে আজই দারিদ্র্য আর দুর্দশাকে বরণ করে নিতে না হয়। তারা আমাদের আশ্বাস দেয়ঃ দেখো, কাল সবই ঠিক হয়ে যাবে। [কিন্তু কথামাত্রই সব ঠিক হয়ে যাবে না। স্থায়িত্বের মূল্য হবে শুধু অমঙ্গল। আমরা যখন সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকব, তখনই হব নির্ভয়ী এবং নিশ্চিন্ত।]

এ সবের ওপরে আবার আর এক দিক থেকে দেখা দিয়েছে সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা। ভৌগোলিক দিক থেকে সংকুচিত এবং সংকীর্ণ হয়ে এসেছে যে-পৃথিবী সেখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র রচনা করতে দেওয়া হচ্ছে না, দেওয়া হচ্ছে না আত্মার সঙ্গে আত্মার মেলবন্ধন করতে। জ্ঞান এবং সহানুভূতির অণুগুলোকে পৃথিবীর একার্ধ থেকে অপরার্ধে সঞ্চরণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে দেখা দিচ্ছে এক ভীষণ বিপদ। এই গ্রহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংবাদ ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ হয়ে আসছে। আধুনিক বিজ্ঞান জানে যে জ্ঞান আহরণের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে ঘনিয়ে আসবে সার্বিক বিনাশ এবং মহাপ্রলয়। সংবাদ ও জ্ঞানের আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, সইসাবুদ, সবই হয়ে পড়ে অর্থহীন। যে-এলাকায় মানুষের মুখ বন্ধ, কণ্ঠ রুদ্ধ, সেখানে স্বচ্ছন্দে যে-কোনও চুক্তির মনগড়া ব্যাখ্যা করা যায় কিংবা—তার চেয়েও যেটা সহজ—একেবারেই ভুলে যাওয়া যায় যে এরকম কোনও চুক্তি আদৌ কোনও কালে হয়েছিল। (অরওয়েল এটা খুব ভাল বুঝতেন।) যে-এলাকায় মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ, সেই এলাকায় যেন এই গ্রহের বাসিন্দারা বাস করে না। সেই এলাকা যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা কোন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা অধ্যুষিত। এই গ্রহের যে-কোনও অংশকেই তারা পদদলিত করতে প্রস্তুত এই পবিত্র বিশ্বাসে যে তারা সেখানে যাচ্ছে মুক্তিদাতা-রূপে, ত্রাণকর্তারূপে।

পঁচিশ বছর আগে মানবজাতির অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল সম্মিলিত জাতিসংঘ। কিন্তু, হায়, দুর্নীতিগ্রস্ত পৃথিবীতে এটাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এটা সম্মিলিত জাতিসংঘ নয়, এটা সম্মিলিত সরকার-সংঘ। এখানে সব সরকারই সমান মর্যাদা পায়—তা সে সরকার স্বাধীনভাবে নির্বাচিতই হোক বা গায়ের বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করেই গদিতে চেপে বসুক। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অর্থালিপ্সু পক্ষপাতিত্বের ওপর নির্ভর করে সম্মিলিত জাতিসংঘ কয়েকটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষার অতি তৎপর, কিন্তু অপর জাতিগুলোর স্বাধীনতা রক্ষায় একেবারেই উদাসীন। ব্যক্তিবিশেষের আবেদন, অতি-সাধারণ মানুষের আর্তনাদ, বিপন্ন চিৎকার বা সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে অস্বীকার করলো এই সংঘ, শুধু পোষ-মানা ভোটের জোরে। এই ক্ষুদ্র মানুষগুলো এই অতিবৃহৎ সংস্থার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় বোধ হয়। বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে সব থেকে ভাল যে দলিল তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে য়ুনো, (UNO), তার সেই মানব অধিকারের ঘোষণা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলাকে সকল সরকারের পক্ষে সদস্যপদপ্রাপ্তির বাধ্যতামূলক পূর্বশর্তে পরিণত করার কোনও চেষ্টাই করলো না এ। এইভাবে সেই অসহায় লোক-গুলোকে মুনো তুলে দিলো সেই সব সরকারের হাতে, যাদের তারা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়নি।

আজ এ কথা মনে হতে পারে যে সাম্প্রতিক কালের পৃথিবীর ভাগ্য বুঝি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আছে বৈজ্ঞানিকদের ওপরে। সমগ্র মানবজাতির প্রযুক্তিবিদ্যাগত পদক্ষেপ তাঁরাই নির্ধারিত করে থাকেন। তাই মনে হতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক-দের সদিচ্ছার ওপরেই বুঝি নির্ভর করে আছে পৃথিবীর গতি; রাজনীতিকদের ওপরে নয়। অল্প কয়েকজন বৈজ্ঞানিক যে উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরেছেন তা থেকে দেখি যে তাঁরা একমত হলে কত কী-ই না করতে পারেন। আর তাই এ-কথা আরো বেশি করে মনে হয় আমাদের। কিন্তু না, বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র, গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হবার জন্যে কোন সুস্পষ্ট চেষ্টাই এ পর্যন্ত করেননি। তাঁরা তাঁদের মহাসভার অধি-বেশনগুলোতে অপরের দুঃখ, দুর্দশার কথা নিয়ে আলোচনাটুকু পর্যন্ত করেন না। ভাবেন, বিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে থাকাই নিরাপদ। সেই একই মিউনিক-মনোভাব, সেই বেতসবৃত্তি, তাঁদের ওপরেও পক্ষ বিস্তার করে তাঁদের করে তুলছে ক্লীব।

তাহলে লেখকের স্থান কোথায় এবং তার ভূমিকাই বা কী এই নিষ্ঠুর, দ্বিধাদীর্ণ, গতিশীল জগতে—যে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে বহুবিধ ধ্বংসের কিনারে? আমরা তো রকেট ছোঁড়ার ধারে কাছেও যাই না, ঠেলি না তুচ্ছতম ঠেলাগাড়িও। যারা স্থূল, জড়শক্তির ভক্ত আমরা তো তাদের দ্বারা ঘৃণিত। তাহলে কি আমাদের পক্ষে পৌঁছিয়ে আসা, কল্যাণের অবিচল স্থিরতায় এবং সত্যের নয়? স্বাভাবিক নয় কি শুধু আমাদের এই তিক্ত, নিরপেক্ষ মন্তব্যগুলো লিখে যাওয়া যে মানবজাতি কতো নৈরাশ্য-জনকরূপে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, মানুষ হয়ে গেছে কী শোকাবহরূপে অধঃপতিত, আর মুষ্টিমেয় রুচি-সুন্দর আত্মার পক্ষে কি রকম অসম্ভব হয়ে গেছে তাদের মধ্যে বাস করা?

কিন্তু না, এ পথ অবলম্বনেরও আমাদের কোন উপায় নেই। যে একবার উত্তাম হস্তে গ্রহণ করেছে সেই বাক্-কে তার আর অব্যাহতি নেই। সে তার স্বদেশবাসীর, তার সমসাময়িকদের, নিরপেক্ষ বিচারক নয়। তাদের কৃত সকল পাপের, তার দেশে অনুষ্ঠিত সকল অপরাধের সে অংশীদার। যদি তার মাতৃভূমির ট্যাংকবাহিনী বিদেশী কোনও রাজ্যের রাজধানীর অ্যাসফল্টে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে থাকে, তবে সে রক্তের দাগ, সেই বাদামী চিহ্নগুলো, চিরতরে চিহ্নিত হয়ে গেছে লেখকের মুখমণ্ডলে। মন-খুলে বিশ্বাস করেছে যে বন্ধু, তাকে গলায়, ঘুমন্ত অবস্থায়, যদি তারা কোনও ভয়ংকর রাত্রিতে ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়ে থাকে, তবে সে-দড়ির কালশিটে দাগ পড়ে গেছে লেখকেরও হাতে। এবং যদি তার অল্প-বয়স্ক প্রতিবেশীরা লঘুচিত্তে সৎ এবং আন্তরিক কাজের চেয়ে ভ্রষ্টতাকে অধিক শ্রেয় মনে করে, অসক্ত হয়ে পড়ে নেশাভাঙে, ব্যাপৃত হয়ে পড়ে জামিন-রূপে ধরে রাখবার মতো মানুষ চুরি করে আনার কাজে,—তাহলে তার দুর্গন্ধও লেগে থাকে লেখকের নাসাগ্রে।

আমরা কি এ-কথা বলার মতো ধৃষ্টতা দেখাব যে সমকালীন পৃথিবীর পচনগুলোর জন্যে আমরা আদৌ দায়ী নই?

যাই হোক, আমাকে কিন্তু আনন্দিত করেছে বিশ্বসাহিত্যের ঐক্যের অনুভব। এ যেন একটা বিরাট হৃদয় যেখানে বিশ্বের সব সমস্যা, সব উদ্বেগ স্পন্দিত হচ্ছে, যদিও তার অনুভব এবং প্রকাশ বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম।

সুপ্রাচীন জাতীয় সাহিত্যগুলো ছাড়াও, এমন কী অতীত যুগেও, বিশ্বসাহিত্যের একটা বোধ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন জাতিক সাহিত্যের চূড়াস্পর্শী সৃষ্টিগুলোর একত্র সঞ্চয়ন এবং তাদের পারস্পরিক প্রভাবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এতে একটা সময়ের ব্যবধান থেকে যেত। পাঠক এবং লেখকেরা অপর ভাষার লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হতেন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, কখনো বা বহু শতাব্দীর ব্যবধানে। ফলে পারস্পরিক প্রভাবও বিলম্বে পড়ত এবং বিভিন্ন জাতিক সাহিত্যের সমুন্নত চূড়াগুলো ধরা পড়ত না সমসাময়িকদের চোখে। ধরা পড়ত কেবল

কিন্তু আজ এক দেশের লেখকের সঙ্গে অপর দেশের লেখক এবং পাঠকের পারস্পরিক যোগসূত্র প্রায় মুহূর্তের মধ্যে গড়ে ওঠে। এ-অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই আছে। আমার যে-সব বই দুর্ভাগ্যবশত আমার নিজের দেশে মুদ্রিত হল না, সেগুলো কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী সহৃদয় পাঠক খুঁজে পেল, যদিও এগুলো খুব দ্রুত অনূদিত হয়েছে এবং প্রায়শই অনুবাদগুলোও খারাপই হয়েছে। হাইনরিখ্ বোলের মতো প্রখ্যাত পশ্চিমী লেখকেরা সেগুলোর সমালোচনাতেও অগ্রণী হয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে যখন আমার স্বাধীনতা এবং শিল্পসৃষ্টি একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়নি, যখন অভিকর্ষের সূত্রকে উপেক্ষা করেই যেন আমার লেখাগুলো বাতাসে, শূন্যে ঝুলছিল, ঝুলছিল জনতার সংবেদনশীল ঝিল্লীর অদৃশ্য বোবা টানের ওপরে,—তখন আমি সবিস্ময়ে জানতে পারলুম আমার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন সারা বিশ্বের ভ্রাতৃপ্রতিম লেখকেরা। আতপ্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল আমার অন্তর। আমার সেই সব বিপজ্জনক সপ্তাহগুলোতে, যখন আমাকে বহিষ্কৃত করা হচ্ছিল সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে, তখন আমার চারপাশে সমর্থনের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বের প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা এবং আমাকে বাঁচিয়েছিলেন নির্মমতর নিপীড়নের হাত থেকে। আমাকে যে নির্বাসনের ভয় দেখানো হচ্ছিল, সত্যিই যদি আমাকে সেই নির্বাসনে যেতে হয়, সেইজন্যে নরওয়ের শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা আমার জন্যে গড়ে তুলেছিলেন একটি ঘর। শেষত, যে দেশে আমি বাস করি এবং লিখি যে দেশে থেকে, সে-দেশ থেকে নোবেল পুরস্কারের জন্যে আমার নাম উত্থাপিত হয়নি। আমার নাম উত্থাপন করেছিলেন ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক এবং তাঁর সতীর্থরা। এরপর বিভিন্ন দেশের জাতীয় লেখক ইউনিয়নগুলো সমগ্রভাবে আমার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন।

এইরূপে আমি বুঝেছি এবং অনুভব করেছি যে বিশ্বসাহিত্য শুধু ব্যক্তি নিরপেক্ষ কয়েকটি সংকলনগ্রন্থ নয়, নয় সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের দ্বারা গড়ে তোলা কোনও সামানীকৃত ধারণা। পরন্তু, এটি একটি সাধারণ সমবায়ী শরীর, একটি সাধারণ সর্বতোগ্রাহ্য মনোভাব, একটি জীবন্ত প্রাণস্পর্শী ঐক্য, যা মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। আজও জাতীয় সীমান্তরেখাগুলো তড়িৎবাহী তারের উত্তাপে এবং মেশিনগানের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণে লাল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকগুলো মনে করে যে সাহিত্য তাদের 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার', তারাই এর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সংবাদপত্রের স্তম্ভশীর্ষে এখনো লেখা থাকে : "আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কারও কোনও অধিকার নেই!" প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই সংকীর্ণ পৃথিবীতে 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে আর কিছু নেই। সব ব্যাপারকে সকলের মাথা ঘামাবার বিষয় করে তোলার মধ্যেই একমাত্র নিহিত রয়েছে মানবজাতির মুক্তি। পূবের মানুষদের গম্ভীরভাবে আগ্রহী হতে হবে পশ্চিমের মানুষ কী ভাবছে তা জানবার জন্যে, পশ্চিমের মানুষদের বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে পূবের দেশে কী ঘটছে তা জানবার জন্যে। মানুষের হাতে যে কটি সর্বাধিক সুবেদী, অনুরণনশীল করণ আছে সাহিত্য তাদের অন্যতম। আর এইজন্যেই সে

সমগ্র গ্রহণ করতে পেরেছে, আত্তীকৃত করতে পেরেছে এবং বিধৃত করতে পেরেছে মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের বোধকে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জাতীয় বিশ্বসাহিত্যের দিকে, অকালীন লেখকদের অগ্রজদের দিকে, যেসব অগ্রজদের জন্মবর্ষগুলির সঙ্গে আমার কখনো দেখা হল না, হয়তো ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।

সহৃদয় বন্ধুগণ! আমাদের যদি কোনও মূল্য থেকে থাকে তবে আসুন আমরা সাহায্য করতে চেষ্টা করি। আপনাদের বিবদমান দল, গোষ্ঠী, বর্ণ এবং বিরুদ্ধবাদী আন্দোলনে উপদ্রুত দেশগুলোতে স্মরণাতীত কাল থেকে কারা রচনা করেছে ঐক্যের সূত্র, অনৈক্যের নয়? এইখানেই রয়েছে লেখকদের ভূমিকার সার কথাটুকু। তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষার বিকাশক। তাঁদের জাতির, এমন কী পৃথিবীর যে-অংশটুকুতে তাঁরা বাস করেন সে-অংশটুকুরও, প্রধান ঐক্য-বিধায়ক তাঁরা। তাঁরাও তাঁদের জাতিক সত্তারও প্রবক্তা।

আমি বিশ্বাস করি যে, পূর্বসংস্কারের বশে যাঁরা চলেন, সেইসব দল ও মানুষের মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে এমন এক শক্তি, যার সাহায্যে সে মানবজাতিকে তার এই চরম সংকটের কালে সাহায্য করতে পারে। সাহায্য করতে পারে তার যথার্থ আত্মোপলব্ধিতে। সে পারে দেশ থেকে দেশান্তরে সঞ্চারিত করে দিতে সংক্ষিপ্ত অথচ গাঢ়-সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা, যার ফলে আমরা অন্তত আর দ্বিধাদীর্ণ হয়ে পড়ব না, ঝলসে যাবে না আর আমাদের চোখ। আর এই অভিজ্ঞতার ফলে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমানগুলো মিলবে, একজাতি সঠিকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে অন্য জাতির ইতিহাস থেকে এমনিভাবে, যেন এ তার নিজেরই ইতিহাস; আর নিস্তার পেতে পারবে একই নির্মম ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করার মর্মান্তিক বিড়ম্বনা থেকে। আর সম্ভবত এই ধরনের বাতাবরণের মধ্যেই আমরা গড়ে তুলতে পারব আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে গ্রহণ করবে সমগ্র পৃথিবী। কেন্দ্রের কাছে, অপরাপর মানুষের মতোই, আমরা দেখব সেই সব বস্তুকে যা অন্তিকের; আর পরিধির কাছে আমরা টেনে নেব সেই সব ঘটনাগুলোকে যা দূরের পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। তারপর আমরা এগুলোকে মেলাব এবং স্থাপন করব সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে।

আর লেখকরা ছাড়া কারা বিচার করবে তাদের অপরাধ সরকারের (কোন কোন রাষ্ট্রে অবিকল দুর্নীতিপরায়ণদের এটাই সহজতম পন্থা, আর নেহাৎ আলস্যে ছাড়া আর সকলেই এ পন্থা অবলম্বন করে থাকে)? কারা বিচার করবে তাদের জনসাধারণের যারা ভীরুর মতো অপমান সয় এবং দুর্বলতার মধ্যেই আত্মতৃপ্ত থাকে? কারা করবে যৌবনের লঘুচিত্ত উদ্দামতার বিচার, ছোরা-উঁচোনো ছোকরা মস্তানদের বিচার?

আমাদের হয়তো বলা হবে: উলঙ্গ হিংসার নির্দয় আক্রমণের সামনে কী করতে পারে সাহিত্য? কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে, হিংসা একলা বাঁচে না, বাঁচতে পারেও না। মিথ্যার সঙ্গে সর্বদা মিশ্রিত থাকে সে। হিংসা মিথ্যাশ্রয়ী। হিংসার সঙ্গে মিথ্যার স্বভাবগত বন্ধন বড়ই গভীর, বড়ই হৃদ্য। হিংসার যেমন একমাত্র অবলম্বন মিথ্যা, মিথ্যারও তেমনি একমাত্র আশ্রয়স্থল হিংসা। যে মানুষ একবার হিংসাকে তার কার্যসিদ্ধির উপায় বলে গ্রহণ করেছে, মিথ্যাকেই একমাত্র নীতি হিসেবে অবলম্বন করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই। হিংসা তার উদ্ভবের কালে প্রকাশ্যে দর্পিতভাবে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যখনই সে বলবান হয়ে ওঠে, ক্ষমতায় পাকাপাকিভাবে জেঁকে বসে, তখনি সে অনুভব করে যে তার নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাস কী রকম পাতলা হয়ে গেছে। সে অনুভব করে মিথ্যার কুয়াশার মধ্যে নেমে না এসে সে আর শ্বাস নিতে পারছে না। তার ক্রূর দুষ্ক্রিয়াগুলোকে মধুস্রাবী কথার মোড়কে ঢাকা ছাড়া তখন আর তার উপায় নেই। হিংসা যে সব সময়েই প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে আমাদের টুঁটি চেপে ধরে তা নয়। সে চায় যে তার শাসনাধীন প্রজাবর্গ মিথ্যার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিক। জড়িয়ে পড়ুক মিথ্যায়, কলঙ্কিত হোক তার কলুষে।

কিন্তু নির্ভীক সরলচিত্ত মানুষের অতি সরল কর্তব্য হল মিথ্যার অংশভাক্ হতে অস্বীকার করা। অতি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া যে সে তাকে সমর্থন করে না। সে কোনও মিথ্যাকর্মের দোসর নয়। মিথ্যা যদি একান্তই পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার পায়, তো পাক। যদি তা একান্তই আর একবার অধীশ্বর হয়ে ওঠে, তো উঠুক। কিন্তু সে তাকে সমর্থন করবে না; করবে না কোনও সাহায্য।

লেখক এবং শিল্পীরা কিন্তু এর চেয়েও অনেক মহৎ, অনেক মূল্যবান কাজ করতে পারেন। তাঁরা জয় করতে পারেন মিথ্যাকে। মিথ্যার সঙ্গে সংগ্রামে চিরদিনই জয়ী হয়েছে আর্ট, এবং জয়ী হয়-ও। আর তা হয় প্রকাশ্যে, চূড়ান্তভাবে, সকল মানুষের চোখের সামনে। হয়তো এ পৃথিবীর অনেক কিছুর প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে, উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মিথ্যা; কিন্তু আর্টের প্রতিকূলতায় ভেঙে খান খান হয়ে যাবেই সে।

আর যে মুহূর্তে অপসৃত হবে মিথ্যার কুয়াশা, সেই মুহূর্তেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে হিংসার উদগ্র, উলঙ্গ, কদর্যতা; আর তখনি ভেঙে পড়বে, গুঁড়িয়ে যাবে, বার্ধক্যে ন্যুব্জপৃষ্ঠ, জরদ্গব হিংসা।

হে আমার বন্ধুরা, সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর এই ঘোর দুর্দিনে, চরম সংকটের মুহূর্তে, আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি—আমাদের হাতে কোনও অস্ত্র নেই এই অজুহাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে নয়, চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে নয়—পরন্তু, নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধে যোগ দিয়ে।

রাশিয়ায় আমরা সত্য সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদগুলোকে বড় ভালবাসি। আমাদের চোখের জলে লোনা, তিক্ত, কর্কশজাতীয় অভিজ্ঞতাকে তারা মাঝে মাঝে বড় চমৎকারভাবে প্রকাশ করে। এমনি একটা প্রবাদ হল: সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও ভারী হয়ে উঠবে একটিমাত্র শব্দ, যার মধ্যে নিহিত আছে সত্য।

আর এই বিশ্বাসেই, এই কল্পনোর প্রচ্ছায়ে, ভব ও শক্তির নিত্যতার নিয়মের বাত্যয় ঘটে যাওয়ার আশায় আমি করে যাচ্ছি আমার কাজ, আর সমগ্র বিশ্বের লেখকদের কাছে রেখে যাচ্ছি আমার আবেদন।

অনুবাদক—দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭০-এ আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসিন প্রদত্ত নোবেল বক্তৃতা।

সাহিত্য সংবাদ

ফ্রানৎস কাফকার প্রেমিকা

ফ্রানৎস কাফকার বয়েস যখন আটত্রিশ, লেখক হিসেবে খ্যাতি খুব সামান্যই, ফুসফুসের অসুখ, অফিসে সাধারণ চাকরি করছেন, অবিবাহিত—সেই সময় মিলেনা নামের এক যুবতীর সংগে তাঁর যোগাযোগ হয়। মিলেনার বয়েস তখন চব্বিশ, স্বাস্থ্যবতী, দুঃসাহসিনী এবং বিবাহিতা। মিলেনা সেই সময়েই কাফকার সাহিত্য প্রতিভা সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিল। এই দুজনের প্রণয় ছিল যেমন তীব্র, তেমনই অভিশপ্ত, বিচ্ছেদই ছিল এদের নিয়তি।

মিলেনা একটি খাঁটি বোহেমিয়ান মেয়ে। আক্ষরিক অর্থে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে-অংশের নাম ছিল বোহেমিয়া, তার অন্তর্গত প্রাগ শহরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে মিলেনার জন্ম। অল্প বয়েসে তার মা মারা যায়। বাবার একমাত্র মেয়ে—বাবা ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী এবং মিলেনা প্রায় কৈশোর থেকেই বাবার অনুশাসন এবং সামাজিক রীতিকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। সেই রক্ষণশীল আমলেই তরুণী মিলেনা রাস্তা দিয়ে অদ্ভুত পোশাক পরে হেঁটে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেকের ভুরু উত্তোলিত করেছে। ক্রমে, অবধারিত ভাবেই মিলেনা এসে পড়ে লেখক-শিল্পী-কবিদের আড্ডায়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থাটা তখন বেশ গোলমেলে। অস্ট্রিয়ান তথা জার্মান আধিপত্যের জন্য এখানকার জাতীয়বাদীদের ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। চেকোশ্লোভাক ভাষী এবং জার্মান ভাষীদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি—প্রায়ই দাংগা-হাংগামা হয়। এবং হিটলার তখনো আসরে অবতীর্ণ না হলেও ইহুদী-বিদ্বেষ চতুর্দিকে লকলক করছে। ইহুদীরা তখন 'ইওরোপের নিগ্রো'।

লেখক-কবিদের মধ্যে মিলেনার প্রণয় হলো এমন একজনের সংগে, যে নিজে ঠিক লেখক না হলেও সাহিত্যের সমঝদার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী, দর্শনশাস্ত্রের গবেষক এবং রূপবান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সে জার্মান এবং ইহুদী। চেক পরিবারের কোনো মেয়ের পক্ষে সেই সময় কোনো জার্মান-ইহুদীর সংগে মেলামেশা করা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। মিলেনা এসব কিছুই গ্রাহ্য করলো না—এমন কি, তার প্রেমিক অর্নস্ট পোলাক-এর সংগে সে কবে কোন্ হোটেলে রাত কাটিয়েছে তাও বলে বেড়াতে লাগলো প্রকাশ্যে—যেন এটা একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। খবর পেয়ে মিলেনার বাবা যে অত্যন্ত জ্বলে উঠবেন তা বলাই-বাহুল্য। ধমক ও ভয় দেখানোর পর তিনি মেয়েকে জোর করে তালাচাবি বন্ধ করে রাখলেন একটা বাগানবাড়িতে।

কয়েকদিন বাদেই মিলেনা সেখান থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করলো পোলাককে এবং চলে গেল ভিয়েনায়।

প্রথম কিছুদিন খুব হইচই, আনন্দ উন্মাদনায় কাটলো। কাফে রেস্তোরাঁয় সাহিত্যিকদের সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, কখনো কখনো বাড়িতে সারারাত আড্ডা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ালো। প্রেমিক আর স্বামী এক নয়। পোলাককে কোনোক্রমেই আদর্শ স্বামী বলা যায় না, কিন্তু প্রেমিক হিসেবে সে এখনো আদর্শ, কারণ, সে মুক্ত ভালোবাসায় বিশ্বাসী বলে প্রায়ই অপর নারীদের সংগে সহবাসে তার দ্বিধা নেই। নারীরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তাছাড়া, পোলাক খুব বড় বুদ্ধিজীবী এবং দার্শনিক হলেও সংসার সম্পর্কে উদাসীন—খাওয়া-দাওয়া কি করে জুটবে, সে বিষয়ে চিন্তা করে না। অপমানিত এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লো মিলেনা। তার বাবাও তার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। উপায়ান্তর না দেখে মিলেনা সংসার চালাবার জন্য চেক ভাষা শিক্ষার একটা স্কুল খুললো, এবং টুকিটাকি লিখতে লাগলো সংবাদপত্রে। অনুবাদের চিন্তাও তার মাথায় আসে। ফ্রানৎস কাফকা নামের একজন স্বল্পপরিচিত লেখকের গল্প অনুবাদ করে পাঠায় এক প্রকাশকের কাছে। কয়েকদিন বাদেই চিঠির উত্তর আসে, প্রকাশকের কাছ থেকে নয়, স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে। এর পরের কয়েকটি চিঠি বিনিময়েই দুই দুঃখী আত্মা পরস্পরের খুব কাছে চলে আসে।

কাফকার সংগে মিলেনার পূর্ব পরিচয় না থাকলেও একেবারে অজানা ছিলেন না। কফির দোকানের সাহিত্যিক আড্ডায় কাফকার সংগে একসময় আলাপ হয়েছে অর্নস্ট পোলাকের—সেই সময় টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে মিলেনার হেঁটে যাওয়া চেহারা অস্পষ্ট মনে আছে। সেই সময়, ১৯২০ সালে, কাফকা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ছুটি নিয়ে এসে রয়েছিলেন মেরানো নামে একটা ছোট শহরে। অনুবাদ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মিলেনা এলেন ওখানে, তারপরই পাশার দান পড়ে গেল।

নারী সম্পর্কে কাফকা ছিলেন স্বভাবভীরু। সেই আটত্রিশ বছর বয়সেও কাফকা তিনবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও (এর মধ্যে দুবার একই নারীকে) ভেঙে দিয়েছেন। মিলেনার মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের পরমা নারীকে। দুজনে থাকে দুই শহরে, যোগাযোগের একমাত্র উপায় চিঠি। অসম্ভব, অজস্র চিঠি। প্রতিদিন চিঠি, একদিনে দু'তিন খানা চিঠি, তার ওপরে আবার টেলিগ্রাম। মিলেনার লেখা চিঠিগুলোর একটাও

পাওয়া যায় না, মিলেনারই অনুরোধে সেগুলি কাফকা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। আর কাফকার লেখা চিঠিগুলি মিলেনা তার এক বন্ধুর কাছে রাখতে দিয়েছিল—হিটলারী তান্ডবের পরও সেগুলো কোনো-ক্রমে রক্ষা পায়—এবং সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে। কাফকার অকৃত্রিম বন্ধু কবি ম্যাক্স ব্রড কাফকার সমস্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা সম্পাদনা করে নতুন ভাবে প্রচার করে বিশ্ব সাহিত্যকে কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন—তেমনি এই চিঠিগুলিও কাফকাকে চিনতে অনেকখানি সাহায্য করে।

কাফকা মিলেনার স্বামীর ভয়ে চিঠিগুলো পাঠাতেন পোস্ট অফিসের ঠিকানায়—মিলেনার কাজ ছিল, প্রায় দু' বছর ধরে, প্রতিদিন পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠির প্রতীক্ষা করা। আর কাফকা তখন এমনিতেই অনিদ্রা-রোগী, চিঠির প্রত্যাশায় তাঁর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছে। দুজনের মধ্যে মিলেনাই বয়েসে অনেক ছোট হলেও কাফকার ব্যবহারই বেশী ছেলেমানুষীতে ভরা।

প্রথম দিকের চিঠিগুলোতে ভালোবাসার আবেগ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু সেই ভালোবাসা প্লেটোনিক। দূরের এক শহরে বসেও কাফকা অনুভব করছেন মিলেনার নিশ্বাস, হাসি, কথা। মিলেনা কাছে নেই, তবু তার উপস্থিতি সর্বত্র।

মিলেনা এক জায়গায় বলেছে, 'ভালো না বাসলে একজন মানুষকে পুরোপুরি চেনা যায় না'। কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে শরীর আছে। শরীরও শরীরকে জানতে চায়। কাফকা একবার গোপনে ভিয়েনায় এসে দেখা করলেন মিলেনার সঙ্গে। চার-দিন কাটিয়ে গেলেন, কিন্তু এই মিলনে পরিপূর্ণতা ছিল না।

এর পরের চিঠিগুলোতে প্রায়ই ভয়ের কথা, আর মেজিনা যেন কাফকাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শারীরিক সম্পর্কের সময় কাফকা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

কিছুদিন পর আবার প্রকাশিত হয় পরস্পরকে দেখার বাসনা। চিঠির পর চিঠিতে চলছে গোপন পরিকল্পনা, কোথায় দেখা হবে। কখনো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরও মিলেনা আসতে পারছে না। আর, মিলেনার সনির্বন্ধ অনুরোধেও কাফকা যে ভিয়েনাতে কেন যেতে পারছেন না, তার কারণটা খুব মজার। কাফকা অফিস থেকে ছুটি নেবেন কি করে, বসের কাছে যে তাহলে মিথ্যে কথা বলতে হবে। তা কি সম্ভব? না, কাফকার পক্ষে সম্ভব নয়।

যাই হোক, কিছুদিন বাদে দুজনের দুই শহরের মাঝামাঝি, চেক-অস্ট্রিয়া সীমান্তে গমুন্ডে নামে একটি ছোট শহরে আবার দুজনে দেখা করলো। এ মিলনও সার্থক হয়নি, এক্ষেত্রে কাফকার 'ভয়' আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ, পরবর্তী চিঠিতে কাফকা লিখছেন, গমুন্ডের সময়গুলোর কথা আমি এখন চিন্তা করতেও চাইছি না।

এই ভয়জনিত বিস্বাদ জীবন কাফকার রচনার যেমন অঙ্গ, তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও। কাফকা লিখতেন জার্মান ভাষায় এবং ইহুদী, চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্মান-ইহুদীদের বিরুদ্ধে মিছিল তার ঘরের জানলার নিচ দিয়ে চলে যায়। এই বোধ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। ম্যাক্স ব্রড লিখিত তাঁর জীবনী পড়ে আমরা জানি, বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কি রকম অস্বাভাবিক। একটা অফিসে চাকরি করতেন, যে-চাকরি তাঁর কোনোদিন পছন্দ হয়নি। বহু বছর তাঁর স্বাভাবিক ঘুম হয়নি। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, একাচোরা, বিলাসিতা-হীন অনেকটা সন্ন্যাসীর মতন, কিন্তু ভীতু সন্ন্যাসী। কোনোরকম নেশা কিংবা মিথ্যে কথা—এতেও তিনি আশ্রয় নিতে পারেননি।

ডায়েরিতে কাফকা একজায়গায় লিখেছেন, তোমার শরীরের যৌন শক্তি দিয়ে তুমি কি পেলে? শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা, সবাই বলবে। অথচ খুব সহজেই সার্থক হতে পারতো......এম (মিলেনা) ঠিকই বলেছিল......ভয় মানেই সুখহীনতা......।

কাফকা মিলেনাকে দারুণভাবে নিজের করে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন এই মেয়েটিকে পেলেই তিনি উদ্ধার পেয়ে যাবেন—কিন্তু মিলেনার কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপারে ভয়। উত্তরেরই পরিচিত তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে কাফকা তার কাছ থেকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিলেনার কথা শুনতে চেয়েছেন। কিন্তু মিলেনার সঙ্গে তাঁর যে-কবার দেখা হয়েছে, তার কোনোটাই কিন্তু বেশী সুখের হয়নি।

শেষের দিকে মিলেনা বরং দু'-একবার সামান্য ভর্ৎসনা করেছে কাফকাকে, কিন্তু কাফকা চিঠিতে কখনো সামান্য আঘাত দিয়েও কথা বলেননি। বরং এই সময়কার চিঠিতে তিনি সূক্ষ্ম কাব্যরসের সঙ্গে তীব্র আর্তি যেমনভাবে মিলিয়েছেন, তার তুলনা খুব কম আছে। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে যারা সার্থক হতে পারে না, তারা এমন বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টি করে যায় কি করে?

মিলেনা ও কাফকার এই পত্র-প্রণয় চলেছিল প্রায় আড়াই-তিন বছর। শেষ-পর্যন্ত কাফকা নিজেই নিষেধ করেছিলেন মিলেনাকে চিঠি লিখতে। তাঁর অসুখ যত বাড়ছিল, ততই মিলেনার চিঠি ও চিন্তা তাঁর পক্ষে বড় বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিল। স্যানাটোরিয়ামেও তিনি মিলেনাকে আসতে দিতে চাননি। এই সময় তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, মিলেনাকে পেলে কাফকা এখনো বোধহয় বেঁচে উঠতে পারেন। একদিকে মিলেনা আর অপরদিকে মৃত্যু, কাফকাকে বেছে নিতে হবে। কাফকা বলেছিলেন, বেছে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আগে থেকেই ঠিক করা আছে। মৃত্যুর ঠিক আগে কাফকার সঙ্গে মিলেনার আর একবার দেখা হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে সংশয় রয়ে গেছে। মিলেনা তার সঙ্গে কাফকার প্রণয়ের কথা প্রকাশ্যে কখনো জানাতে পারেনি, কিন্তু তার যে-সমস্ত লেখায় কাফকার উল্লেখ আছে, তাতে বোঝা যায় সে কাফকাকে ঠিক মতন চিনতে পেরেছিল এবং তার ভালোবাসা ছিল আন্তরিক।

এর পর মিলেনা স্বামী ত্যাগ করে। পরবর্তী জীবনে সে আরও একবার বিবাহ এবং বারকতক প্রণয় করলেও কখনো ঠিক সুখ পায়নি। প্রাগে ফিরে আসার পর সাংবাদিক হিসেবে তার প্রচুর নাম হয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে সে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয় এবং চেকোস্লোভাকিয়ার পতনের পর নাৎসী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে চালান হয়ে যায় কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। সেখানেই মারা যায়।

কাফকা মিলেনা পর্ব সম্পর্কে জানা যায় ম্যাক্স ব্রড-এর লেখা কাফকার জীবনী এবং সম্পাদিত ডায়েরি ছাড়াও, উইলি হাস সম্পাদিত 'লেটারস টু মিলেনা' এবং মার্গারেট বুবের নিউমান লিখিত জীবনী। 'মিসট্রেস টু কাফকা' থেকে।

সনাতন পাঠক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক বাংলা ভাষার অভিধান রচনার একটি দীর্ঘ ময়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করেছেন এই সংবাদ জানিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় (৭৯৪ পৃ) শ্রীসনাতন পাঠক যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই সমীচিন। তা ছাড়া শ্রীপাঠক যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা আভাসে উল্লেখ মাত্র করেছেন, তা আজ ভয়াবহ সত্য। 'ভারতকোষ' পঞ্চম খণ্ড সম্পর্কে কিছু কথা আমরা নিবেদন করছি, তা বিচার করে দেখলে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকবে না।

শুরু থেকে ভারতকোষের কাজ কিভাবে চলছিল, প্রথমেই তা সংক্ষেপে বলে নিয়ে আমাদের বক্তব্য পেশ করব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একটি উপ-সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে তাঁরই বাসভবনে উপ-সমিতির সভা সাধারণত অনুষ্ঠিত হত। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ডঃ মজুমদার যে অকুণ্ঠ সাহায্য করে এসেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। উপ-সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ ও সম্পাদক-মণ্ডলীর সভ্যগণ এবং কাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে যুক্ত নন বহু সুধীজন সতত যে সাহায্য করেছেন তার স্বীকৃতি ১—৪ খণ্ড ভারত-কোষে রয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি স্বর্গত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রেরণায় এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ বিরাট পরি-কল্পনা কার্যকর হয়েছে। এমন কি অর্থ সংকট হলে তিনি নিজের কয়েক সহস্র টাকা ভারতকোষ মুদ্রণের জন্য দান করেছেন। আমরা দেখেছি পরিষদ কর্তৃপক্ষ সর্বদাই ভারত-কোষের কাজে তাঁর উপর নির্ভর করেছেন এবং কার্যপরিচালনার দৈনন্দিন দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল।

দলাদলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে উল্লেখ করা দরকার, কয়েক বছর আগে যে-দল ক্ষমতা অধিকার করেন সেই গোষ্ঠীও আজ বিভক্ত। দলীয় সংকীর্ণতা আজ কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা একটি বিষয় উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমরা দেখছি নির্মলকুমার বসুর অবদানের কথা স্বীকার করতে বর্তমান পরিষদ সম্পাদক সর্বদা কার্পণ্য করছেন। পঞ্চম খণ্ডের দরুণ সরকারী অর্থ সাহায্য প্রাপ্তি সম্পর্কে পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় বলা হয়েছে: 'পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার স্বর্গীয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের

মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআণ্টনি ল্যান্সলট ডিয়াসের দ্বারস্থ হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতকোষের পরিকল্পিত কার্য পঞ্চম খণ্ডে সম্পূর্ণ করার জন্য অনুগ্রহপূর্বক ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে (১৯৭১ খৃ) তিন কিস্তিতে মোট ১,১৬,০০০ টাকা মঞ্জুর করায় ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ডে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইল।" কিন্তু প্রকৃত তথ্য তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোড়ায় ভারতকোষের-দরুণ পরি-ষদকে ২,২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশ করার পর দেখা গেল এ টাকা তিন খণ্ড প্রকাশ করার পর প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয় হয়ে যায়। পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব ও অপ্রত্যাশিত মূল্যবৃদ্ধি প্রধানত এরূপ বিপর্যয়ের কারণ। চতুর্থ খণ্ড ছাপার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ইতিমধ্যে পরিষদ কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন ৪ খণ্ডের পরিবর্তে ভারতকোষ ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। অবস্থা বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও ৩০,০০০ টাকা অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করেন। তাতে ৪র্থ খণ্ড প্রকাশ করা গেলেও ৫ম খণ্ড প্রকাশ করবার সংগতি পরিষদের ছিল না। ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হবার পূর্বেই নির্মলবাবু আরও অর্থ সাহায্যের চেষ্টা শুরু করেন। তিনি তখন দিল্লীতে কমিশনার ফর শিডিউল্ড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস পদে অধিষ্ঠিত। তিনি ৫ম খণ্ডের সম্পূর্ণ ব্যয় বহনের জন্য পরিষদের পক্ষে কেন্দ্রীয় সর-কারের দ্বারস্থ হন। তাঁর অক্লান্ত ও প্রায় সম্পূর্ণ একক চেষ্টার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে তৎপর হন এবং অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য একজন পদস্থ কর্মচারীকে (শ্রী ডি এন সকসেনা) কলকাতায় প্রেরণ করেন। শ্রীসকসেনা পরিষদভবনে ২ দিন (মে ১৯৭০) আলো-

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এম এন ভাণ্ডারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের আবেদনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন এবং নিয়মানুযায়ী পরিষদকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎএর কাছে আবেদন পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আবেদন বিবেচনাধীন থাকা কালে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খৃঃ তারিখে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গত নির্মলকুমার বসু ও পরিষদ সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী রাজ্যপাল এ এল ডায়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিষদের আর্থিক দুরবস্থা জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদের সাধারণ বিভাগ ও ভারতকোষের দরুণ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ যথারীতি ভারতকোষ সম্পর্কে আবেদন বিবেচনা করে পঞ্চম খণ্ডের দরুণ সম্পূর্ণ ব্যয় বাবদ ১,১৬,০০০, অনুদান মঞ্জুর করেন। এ টাকা সম্পূর্ণই বাংলাভাষার প্রসারকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে এসেছে। অর্থসাহায্য সম্পর্কে শ্রীকরুণা-কেতন সেন (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা) ও শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব) বিভিন্ন সময়ে যে সাহায্য করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অর্থ সাহায্যের প্রথম কিস্তি পাওয়ার পর ভারতকোষ ছাপার কাজ শুরু হয়। কিন্তু কয়েকমাস দ্রুত কাজ চলবার পর দলগত বিরোধের ফলে কাজ নানারূপে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হল। বিগত ৫।৮।৭২ তারিখের পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় সভাপতির অনুপস্থিতিতে এবং ভারতকোষ উপসমিতির ২৯।৭।৭২ তারিখের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিয়মবহির্ভূত মনোনীত ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের অপসারণ করা হয়। প্রস্তাবটি সভার বিষয়-সূচীতে যথাযথ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে গরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সকলে এ প্রস্তাব সম্পর্কে একমত ছিলেন না। এর ফলে ভারতকোষ ৫ম খণ্ড প্রকাশের কাজ ব্যাহত হবে বলে কয়েকজন মত প্রকাশ করেন। তাঁদের ধারণা যে অমূলক ছিল না, এ ঘটনার পর বই যেভাবে ছাপা হয়েছে এবং ৫ম খণ্ড ছাপাতে যে বিলম্ব হয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে।

প্রথমাবধি একটি সম্পাদকমণ্ডলী প্রাপ্ত রচনাগুলি সম্পাদনা করে এসেছেন। তাঁদের নাম প্রথম ৪ খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। জুলাই ১৯৭২ পর্যন্ত পূর্বের সম্পাদক-মণ্ডলীই কাজ করেছেন। হঠাৎ কি করে এই সুযোগ্য ও সুপরিচিত সম্পাদকমণ্ডলী অপসারিত হলেন তা আমাদের জানা নেই। আনুমানিক ৩০০ পৃষ্ঠা ছাপা হবে যাবার পরই নূতন ব্যবস্থা কার্যকর হয়। এখন বইটিকে ১—৩০০ পৃষ্ঠা এবং ৩০১—৬৮০ এই দুটি ভাগে ভাগ করে তুলনামূলক বিচার করলেই নূতন ব্যবস্থা ও দলাদলির পরিণাম উপলব্ধি করতে পারা যাবে। আমরা মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব :

৫ম খণ্ডে সংযোজিত শুদ্ধিপত্র আমরা দেখতে পাই যে প্রথম ভাগের ভুলের সংখ্যা ২৫ এবং দ্বিতীয় ভাগের ভুল সংখ্যা ৯৭। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে দ্বিতীয় ভাগের ভুলের সংখ্যা আরও কয়েক শত বেশী হবে।

দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদনা যে অত্যন্ত শিথিলভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার প্রমাণ সর্বত্র পাওয়া যাবে। চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন এবং গণিতজ্ঞ রামানুজম্-এর জীবনী ছাপা হয়নি। রামন এফেক্ট নিবন্ধ ছাপা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পাদকগণ এ ত্রুটি ধরতে পারেন নি। "ভারহুত" সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে কিন্তু "সাঁচী" স্থান পায়নি, যদিও "ভারহুত" নিবন্ধে "সাঁচী দ্রষ্টব্য" বলা হয়েছে। "বীমা" সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে কিন্তু "হিসাবরক্ষা, হিসাবপরীক্ষা" (Accounts and Audit) সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ ছাপা হয় নি। একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হওয়া সত্ত্বেও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, প্রশান্ত মহলানবীশ, সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতির জীবনী ছাপা সম্ভব হয়নি। অথচ আনুমানিক ৩৫০ পৃষ্ঠা ছাপতে নূতন কর্মকর্তাগণ এক বছরের বেশী সময় নিয়েছেন। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মহারাজ (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী), যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, রমেশ আচার্য, শচীন সান্যাল, শহীদ শচীন মিত্র, ও পুরুলিয়ার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। অথচ একই বিষয়ে ২টি বিভিন্ন নিবন্ধ ছাপা হয়েছে; যথা 'গাথা সপ্তশতী' ও 'সপ্তশতী' এবং 'হরিদ্রা' ('মশলার' অন্তর্ভুক্ত) ও 'হরিদ্রা' (স্বতন্ত্র নিবন্ধ)।

তথ্যগত ভুলত্রুটি অনেক ক্ষেত্রে বস্তুত হাস্যকর ; যথা

"মুর্শিদাবাদ" নিবন্ধে বলা হয়েছে স্থানটি উত্তর রেলওয়ের একটি স্টেশন হতে ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

"শান্তিপুর" নিবন্ধে বলা হয়েছে রাজা গণেশ দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার অধিপতি ছিলেন।

"হাওড়া" নিবন্ধে বলা হয়েছে "১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা পৃথক জেলা রূপে গণ্য হয়"।

"অম্বরী" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে শহরটি গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আমরা দেখেছি নদীর উত্তর দিকে ডালিগঞ্জ, বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ সিভিল লাইনস, মহানগর প্রভৃতি শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল রয়েছে।

"লৌহ ও ইস্পাত শিল্প" নিবন্ধটি বিশ্বকোষে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। একটি উদাহরণই যথেষ্ট : "ইস্পাত তৈয়ারির (অর্থাৎ লৌহ হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়া লইয়া কার্বন সংযোজন) প্রচলিত চার রকম প্রণালী আছে—প্রাচীন, বেসমার, ওপেন হার্থ ও ব্লাস্ট ফার্নেস"! অথচ "লৌহ" নিবন্ধে বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ রয়েছে। "স্তূপ" নিবন্ধটি সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। স্তূপের ইতিবৃত্ত, বিভিন্ন অংশ, স্থাপত্য কৌশল, জৈনদের স্তূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। এমনকি সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপগুলি যা প্রাক-খৃষ্টকাল থেকে বিদ্যমান, যার তোরণ ও স্তম্ভের ক্ষোদিত চিত্রগুলি দেশবিদেশ থেকে লোকসমাগম হয়, সেগুলির উল্লেখ মাত্র নেই। নিবন্ধের অধিকাংশই "চৈত্যগৃহ" সম্বন্ধে একটি অপরিণত আলোচনা। অথচ "গুহামন্দির" ও "অজন্টা" "কার্লা", "নাসিক", "বেদসা" "ভাজা" ইত্যাদি নিবন্ধে সে সব তথ্য নিপুণভাবে বিবৃত হয়েছে। "সালিয়াম" নিবন্ধের গুরুতর ত্রুটি শুদ্ধিপত্রের সংশোধন দ্বারা কি দূর হয়েছে?

"হুগলি" জেলার শিল্পসংস্থার মধ্যে হিন্দ মোটরস, অ্যালকালি অ্যান্ড কেমিকালস, ডানলপ রাবার, ত্রিবেণী টিস্যুস প্রভৃতি স্থান পায় নি। উত্তরপাড়ায় একটি টিস্যু কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়েছে কি?

"যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত" নিবন্ধে বলা হয়েছে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী ওই বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।

অনেক নিবন্ধ ত্রুটিপূর্ণ। তার বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই, তবে রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনীতে অর্থবিজ্ঞানীরূপে তাঁর কৃতিত্বের পরোক্ষ পরিচয় মাত্র পাওয়া, তাঁর রচিত "Economic History of India" গ্রন্থের নামোল্লেখ না থাকা দুঃখ-দায়ক।

অমরেন্দ্রনাথ রায়
কলিকাতা

॥ ২ ॥

বিগত ১২ আশ্বিন, '৮০ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় সনাতন পাঠক 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বাঙ্গালা বানানের

স্বেচ্ছাচারিতার [illegible] করেছেন। বিষয়টি [illegible] কিন্তু বঙ্গীয় [illegible] তিনি যে মতামত প্রকাশ [illegible] তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত [illegible] বলে মনে [illegible] হল বাঙ্গালা ভাষার একখানি [illegible] ও সর্বাত্মক অভিধান প্রণয়নের সম্ভাবনাকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। শ্রীপাঠক পরিষদের অভিধান বিষয়ক প্রতিবেদনটির প্রাপ্তিসংবাদ দিয়েছেন অথচ সেটি পড়ে না দেখেই পরিষদের বিদ্রূপ সমালোচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। কেবল তাই নয়, পরিষদের পক্ষে অভিধান প্রণয়নের মত এত বড় একটা কাজ হাতে নেওয়াকে তিনি অবিমৃষ্যকারিতা বলেছেন। সনাতন পাঠকের এই অভিমতের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদান নগণ্য নয়। কিছু দিন আগেও পরিষদের তত্ত্বাবধানে পাঁচ খণ্ডে 'ভারতকোষ' প্রকাশিত হয়েছে। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পরিষদের এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। সাহিত্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হলে এ কাজ সম্পূর্ণ হত না। সনাতন পাঠক লিখেছেন, পরিষদের এই অভিধান রচনার প্রয়াস সম্ভবত প্রস্তাবেই থেকে যাবে—কাজ সম্পূর্ণ হবে না। এই অভিমতও নিতান্তই নৈরাশ্যপ্রসূত। এই সূত্রে তিনি অভিধান রচনাকে কলকাতার ভূগর্ভ রেলের সঙ্গে তুলনা করে নিজের কল্পনার দৈন্যকে প্রকটিত করেছেন। আমাদের ধারণা, ভূগর্ভ রেল ও অভিধান দুটিই সম্পূর্ণ হবে। আমরা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য গর্ব বোধ করি—বাঙ্গালা ভাষা ও বানানের বিশুদ্ধতার জন্য বিতর্ক করি, কিন্তু সেই মাতৃভাষায় একখানি সর্বব্যাপী ও নির্ভরযোগ্য অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আজও আমরা নিরুৎসাহী ও নৈরাশ্যবাদী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণের মহৎ কীর্তির কথা স্মরণ করেও বলতে পারি, বাঙ্গালা ভাষার একখানি সর্বব্যাপী অভিধান রচনার কাজ আজও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। এই অভিধান প্রণয়নে অধৈর্য ও নৈরাশ্যের প্রশ্রয় থাকা উচিত নয়, বরং বাঙ্গালা ভাষানুরাগী সাহিত্যসেবী সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এইরূপ দুরূহ সাহিত্যকর্ম সম্পন্ন হতে পারে।

রীতা বিশু
সিউড়ি, বীরভূম

পৃথিবীর আকাশে নতুন অতিথি

আটই ডিসেম্বর সংখ্যা "দেশ" পত্রিকার "বিশ্ববিজ্ঞান" শীর্ষক আলোচনায় কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।

৪৯৯ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের নিচের দিকে দেখছি "একটি লম্ব উপবৃত্তীয় পথ ধরে" ইত্যাদি। এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল। পদার্থবিদ্যাতে আমার জ্ঞানের স্বল্প পরিধির মধ্যে "লম্ব উপবৃত্তীয় পথ" বলে কিছু পাইনি।

ওই পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের শেষের দিকে রয়েছে হ্যালির ধূমকেতু "আবার দেখা যাবে ১৯৮৬ সালে"। এ ব্যাপারে সংশয়ের কারণ আছে।

৫০১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের মাঝামাঝি গ্রহ-উপগ্রহ ও ধূমকেতুর সঞ্চরণপথের আলোচনা রয়েছে। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে পরিক্রমণশীল বস্তুর পথ সব সময়েই উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তের এক চরম অবস্থা বৃত্ত। পৃথিবীর পরিক্রমণ পথের অনুভূ-দূরত্ব আর অপভূ-দূরত্ব প্রায় সমান বলে একে প্রায় বৃত্তাকার বলা চলে। কিন্তু প্লুটো গ্রহের বা বৃহস্পতির সবকটা উপগ্রহের সম্পর্কে একথা বলা চলে না। বিশেষ করে প্লুটোর অনুভূ-দূরত্ব আর অপভূ-দূরত্বের অনেক তফাত। উপবৃত্তের আর চরম অবস্থা অধিবৃত্ত, যখন অনুভূ-দূরত্বের তুলনায় অপভূ-দূরত্ব অসীম। ধূমকেতুর ক্ষেত্রে এই অনুপাতটা খুব বেশী, কোন কোন ক্ষেত্রে অসীমের সঙ্গে তুলনীয়। গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে ধূমকেতুর পরিক্রমণ পথের এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যই ধূমকেতুর, বিশেষত দূর-সঞ্চরমান (-সঞ্চরণমান' নয়) ধূমকেতুর যাওয়া-আসা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত। সূর্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা যেমন তাদের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর, তেমনি দূরত্ব তাদের পথ-বিচ্যুতির কারণ ঘটাতে পারে।

ওই পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের "ধূমকেতু দুটি সূর্যের প্রায় ৯০,০০০ মাইলের কাছাকাছি এসে পড়েছিল" সংবাদটি লেখক কোথায় পেয়েছেন জানাতে পারলে ভালো হত। সৌরশরীরের প্রায় ভেতরে ঢুকে পড়েও ধূমকেতুলীলা বজায় রেখে বেরিয়ে যাওয়াটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

৫০৩ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের মাঝামাঝি দেখছি "এই সমস্ত অণুর কোনটি 'র‍্যাডিক্যাল' কোনটি বা অয়নিত 'র‍্যাডিক্যাল'।" কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন, এগুলো 'র‍্যাডিক্যাল' না অয়নিত 'র‍্যাডিক্যাল', সেটা আলোচনার মধ্যে থাকলে ভালো হত।

একই কলমের নিচের দিকে—"প্রশ্ন অনেক। তার কিছুটা সমাধিত" (সমাহিত?)। কোন প্রশ্নটার সমাধান হয়েছে? দেখছি "ধূমকেতু ছোট বরফের কুচি দিয়ে তৈরি। তবে কিসের বরফ—জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড না অন্য কিছুর, বলা শক্ত।" আবার দেখছি "এক এক ধূমকেতু এক এক ধরনের বস্তু দিয়ে তৈরি।" আবার দেখছি "ধূমকেতুর বস্তুসামগ্রীর মধ্যে আছে নানারকম রাসায়নিক অণু।" তারপরেই দেখছি "ধূমকেতুর কেন্দ্রীভূত বস্তুকণার মধ্য [illegible]

[illegible]

[illegible]জ্যোতি সেন
[illegible]

বনস্পতির বৈঠক

'দেশ' পত্রিকার ৩০শে জুলাই এবং এই প্রাবন্ধ সংখ্যায় 'বনস্পতির বৈঠক' দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

আমার পিতা শরৎচন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকা তৎকালে কতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল তা প্রবীণ ও নবীন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরাই বিচার করবেন। পত্রিকা সম্পাদন করতে কি কি গুণের আবশ্যক কি ধরনের মনীষার প্রয়োজন প্রবোধবাবু যদিও তা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন কিন্তু "যেখানে তিন প্রকার যোগ্যতার কথা বলে" বলতে কি অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন তা অস্পষ্টই রয়ে গেল। যাই হোক, এ বিষয়ের বিচারে যাঁরা যোগ্য হবেন তাঁরাই বিচার করবেন। আমি শুধু 'বনস্পতির বৈঠক'-এ যে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে চাই। প্রবোধবাবু একাধিক সংখ্যায় 'দেশ'এর অনেকখানি জায়গা নিয়ে লিখেছেন, কি করে "হিন্দুস্থান মিউচুয়াল" বীমা কোম্পানীর পরিচালক আমার পূজনীয় "পূর্ণচন্দ্র রায়-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। আরও লিখেছেন পূর্ণবাবুই তাঁকে আগ্রহ সহকারে "উপাসনা পত্রিকায় যোগদান" করতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন বা "তিনি আমাকে উপাসনা মাসিক পত্রিকাটিও দেখাশোনা করার জন্য" অনুরোধ করেন। প্রবোধবাবু নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতিকারক উদ্দেশ্য নিয়ে একথা লেখেন নি, বরং মনে হয়, এটা তিনি সম্পূর্ণ অসাবধানতাবশত বা ভুলবশতই লিখেছেন। কারণ কোনও কালে বা কোনও সময়েই 'উপাসনা' পত্রিকাটির সঙ্গে "পূর্ণচন্দ্র রায়ের কোনও সংযোগ ছিল না। তাই তাঁর প্রবোধবাবুকে 'উপাসনা' পত্রিকা সম্পাদনায় অনুরোধ করার কোনও প্রশ্নই আসে না। কোন্ সালে তিনি 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জানতে পারলে আদৌ তিনি কোনওদিন 'উপাসনা' সম্পাদনার কাজ করেছেন কিনা—সঠিক তথ্য জানাতে পারি। এমনও তো হতে পারে—তিনি অন্য কোনও পত্রিকার নামের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

দীপ্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৬

সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়ছে প্রতি দিন। সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদির সাহিত্যের সেবক হওয়ার কথা ছিল। তার বদলে তারা প্রতিপক্ষ-শিবির গড়ে তুলছে। হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে সব দেশেই এখন সাহিত্য পাঠকের সংখ্যা কমছে। পাঠকদের অন্তত কিছুটা সুস্থিরতা না থাকলে সাহিত্যের চলে না। অথচ এমন দ্রুত দিন বদলে যাচ্ছে যে, সেটুকু স্থিতিও মিলছে না। সবাই জোর গলায় বলবেন, সাহিত্যের সঙ্গে সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না, তার সমস্যা তারই; তবু লেখকরা তাঁদের ভিতে ফাটল ধরার আতঙ্কে কেঁপে গিয়ে নিজেদের কালের পুতুল নতুন করে গড়ার নামে ভেঙে ফেলছেন, হন্যে হয়ে গিয়ে জোড়াতালি দিয়ে যা খাড়া করছেন তাকে আর চেনা যায় না। অনেকটা এ-দেশের যাত্রার বেঁচে থাকবার আশায় থিয়েটারের চরণে আত্মসমর্পণ করে আত্মহত্যা করার মতন।

প্রচুর লেখক তাঁদের পুতুল নতুন করে সাজবার তাগিদে শুধু যৌনতা ও হিংস্রতার দগদগে রঙ লাগাচ্ছিলেন। যাকে পোশাকী কেতায় মূল্যবোধ বলা হয় সে সব ধুয়ে-মুছে যাওয়ার ভিড়ও বাড়ছিল। এখনো অনেকে যৌনতা ও হিংস্রতায় মুখ ডুবিয়ে মাটি কামড়ে রয়েছেন। কিন্তু তেমন জোক্কম কিছু আর হচ্ছে না, হওয়ার কথাও নয়। কাঁচা মাংস বড় তাড়াতাড়ি পচে যায়।

ফলে নানা দেশের লেখকরা নতুন একটা প্রবণতা দেখাচ্ছেন, বিশেষত সেই সব লেখকরা যাঁদের একটি-দুটি গম্ভীর কথা বলার অভিমান আছে। এই লেখকরা রহস্য-কাহিনীর আদলে সাহিত্য রচনা করছেন, রহস্যের আলো-আঁধারিতে অস্থির পাঠকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে মন ভোলাতে চাইছেন। এই প্রবণতা অবশ্য মোটেই নতুন নয়। টি এস এলিঅটই তো সেই কবে গৃহস্থের কুকুরের সামনে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে চুরি করার তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন। এই প্রবণতায় নতুন শুধু এইটুকু যে, ইদানীং আর লেখকরা সততার ভান আঁকড়ে থাকা জরুরী মনে করেন না, পরিপাটি মিথ্যের প্রশ্রয় নেন অবলীলায়। অল্প দিন আগেও একটু অন্য রকম ছিল। যেমন সেদিনও প্রবীণ ইংরেজ ঔপন্যাসিক গ্রেহাম গ্রীন পরিষ্কার ভাগ দিতেন তাঁর কোনটি 'সিরিয়াস নভেল' আর কোনটি শুধু 'এন্টারটেনমেন্ট'। এখন আর এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না, ইচ্ছে করেই বাক্যগুলো [illegible] দেওয়া হয়।

কোনও উদ্দেশ্য না থাকলেও উইলিয়ম বাটলারের উপন্যাসে রহস্যকাহিনীর আদর্শ প্রকট, যদিও কখনো কখনো মোটা গলায় একটি-দুটি গম্ভীর কথা বলার অভি-মান তাঁর রয়ে গেছে। বাটলারের বয়েস চল্লিশ পার হয়েছে, 'দ্য বোন হাউস' তাঁর একাদশ উপন্যাস। তাঁর শৈশব কেটেছে সানফ্রান্সিসকোর কাছে, প্রথমে তিনি সুরকার হতে চেয়ে-ছিলেন, রেডিওর কাজ করেছেন, টোকিয়োর একটি খবরকাগজের জন্য কার্টুন এঁকেছেন,

The Bone House. By William Butler. Peter Owen.

জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন এবং সম্প্রতি আমেরিকার একটি কলেজে পড়ান। মূলত ইংল্যান্ডের লেখক হলেও আমেরিকায় তাঁর কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, 'দ্য বাটারফ্লাই রেভোলিউশন' নামে একটি উপন্যাস হলিউডে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর এত অভিজ্ঞতা এবং তিনি শুধু রহস্যকাহিনী লিখে নগদ বিদায় চান নি, সাহিত্যস্রষ্টার স্বীকৃতি চেয়েছেন। তথাপি, সম্ভবত সাহিত্যপাঠকের ওপর আস্থা হারিয়ে, অনিচ্ছুক অথবা অন্তত অস্থির পাঠককে টেনে রাখবার জন্য রহস্য-কাহিনীর নিশ্চল দেবার কূটকৌশল আয়ত্ত না করে পারেন নি।

ইদানীং এ-দেশে যে সব বিদেশী উপন্যাস আসছে তার অধিকাংশের লেখক উইলিয়ম বাটলারের মতন। মনে হয়, তাঁরা সবাই কোন-না-কোন লেখা-শেখার স্কুল থেকে সসম্মানে পাশ করে এসে কয়েকটি বাঁধা ছকে অথবা নকশায় উপন্যাস রচনা করছেন। এক-একজন লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত মৌল চরিত্রের স্পর্শ প্রায় কোথাও নেই। চেনা সড়ক থেকে সরে আসার সামান্যতম চেষ্টাও খানিক পরেই আবার পরিচিত ফর্মুলায় হারিয়ে যায়। এই লেখকরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করবার আশায় প্রায়শই যার আশ্রয় নিচ্ছেন তা হল শুধুই চমক, যাকে ওঁরা গিমিক বলেন, যার অবকাশ বিদেশের জীবনে প্রচুর এবং যা এ-দেশে দুর্লক্ষ্য।

এক শহরতলির নিম্নবিত্তদের এলাকা 'দ্য বোন হাউস' উপন্যাসটির পটভূমি। সেই এলাকার প্রান্তে রয়েছে কণ্টকাকীর্ণ লতা-গুল্মের এক বিরাট অপ্রবেশ্য জঙ্গল, যার নাম 'বোন হাউস'। মারাত্মক কাঁটালতায় আকীর্ণ সেই ঝোপঝাড় ভয়ঙ্কর রহস্যময়। সেখানে কিছুকাল আগে এবং সম্প্রতি তিনটি মানুষ খুন হয়েছে। মানুষের শত্রুতানির সঙ্গে মিশে গিয়ে অতিপ্রাকৃতের কুসংস্কারা-শ্রয়ী উপস্থিতি জায়গাটার রহস্যময়তা দারুণ

উইলিয়ম বাটলার

বাড়িয়ে দিয়েছে। বারো বছরের একটি মরম কিশোরকে সেই রহস্যের মরাত্ম অন্ধকারে সামান্য কারণে উধাও করে দিয়ে লেখক পাঠকের চুলের মুঠি ধরে গম্ভীর কথা শোনাতে চেয়েছেন। বারো বছরের ছেলেটির অন্তর্ধান নিয়ে বইটির শুরু, বইটির বিস্তার তাকে উদ্ধারের ব্যর্থ আয়োজন। এর মধ্যে লেখক বারংবার ভালো ও মন্দের, আলো ও অন্ধকারের চিরকালীন দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং, কাহিনীটিতে পাঠক সেই দ্বন্দ্বের রূপক আবিষ্কার করতে না পারলে নিজেকে সঙ্গত কারণেই বোকা মনে করবেন।

উইলিয়ম বাটলারের এই উপন্যাসটি সাধারণ, খুবই সাধারণ, তবু দু-একটি কারণে আলোচনার যোগ্য। যেমন লেখকের নিভৃত বিস্তৃতা। তাঁর সমকালীন অন্য অনেক লেখকের হাতে এই বইটি ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘ হয়ে যেতে পারত।

বাটলারের নিজের ছোটবেলা কেটেছে আমেরিকায়। ও-দেশের বারো থেকে পনের বছরের স্কুলের ছেলেমেয়েরা কৈশোরেই প্রাপ্তবয়স্ক। ওই বয়সের চারটি ছেলেমেয়ের চরিত্র উপস্থাপনে লেখক সব থেকে বেশী নৈপুণ্যের প্রমাণ রেখেছেন। ওই চরিত্রগুলি মার্ক টোয়েনের হাকলবেরি ফিন এবং জেরোম ডেভিড স্যালিঞ্জারের হলডেন কলফিল্ডকে অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয়। বাটলারের উপন্যাসে একটি পনের বছরের ছেলে ও একটি বারো বছরের মেয়ে যখন ওই কাঁটালতার জঙ্গলে প্রবেশ করে তখন তারা আর ছেলেমানুষ নয়—একটি পুরুষ ও একটি রমণী। এবং খুন হওয়ার পর যখন তারা আবিষ্কৃত হয় তখন দুটো মৃতশরীরই সম্পূর্ণ নগ্ন।

সুধাংশু ঘোষ

...নাটকের [illegible]

...লা নাটকের বিবর্তন। সুরেশচন্দ্র [illegible] ...
...[illegible] ১৯ বঙ্কিম
... স্ট্রীট, কলিকাতা-[illegible]। ২৫·০০

...লা নাটকের সূচনা হয়েছিল কী
প্রচলিত যাত্রাপালা থেকে? নাকি,
। নাটকের আদর্শে ও অনুকরণে
...র নাটকের জন্ম? সমালোচক মহলে
নিয়ে আজও বিতর্ক। আবার নাট্য-
রচনামাত্রই নাটক হিসেবে পূর্ণ-
...চ পায় না। অভিনয়যোগ্যতা এবং
...সাফল্য এই শিল্পের বিশেষ ছাড়-
...লে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস আসলে
নাটকেরই ইতিহাস। বাংলা নাটকের
তাই, তার প্রথম মঞ্চসফল আত্ম-
...র বিবরণ ও মূল্যায়ন-ও এ প্রসঙ্গে
জরুরী। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে,
...দনের কোন অভিনয়টিকে আমরা
...র গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবো!
নাটকের সার্থক সূচনায় এবং
...ণ কোন অভিনয়রজনীর দান সবচাইতে
... শ্যামবাজারের নবীন বসুর 'বিদ্যা-
...' নাট্যপ্রযোজনা, নাকি 'আশুতোষ-
বাড়ির 'শকুন্তলা' অভিনয়? অথবা
...ছিয়ায় মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়,
১৮৭২-এ মধুসূদন সান্যালের
...ত ন্যাশানাল থিয়েটারে দীনবন্ধুর
...দর্পণ' অভিনয়? সমালোচকেরা এর
...কটির বিবরণদানের সূত্রে কেউ একটা
অন্যটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

'বাংলা নাটকের বিবর্তন' গ্রন্থের লেখক
সুরেশচন্দ্র মৈত্র কিন্তু এ বিষয়ে এক
...র্ণ ভিন্ন পথের পথিক। আমাদের
...কের আদি সূচনার সন্ধানে তিনি
...ছয় যান প্রায় হাজার বছরের পুরোনো
...লাদেশে। চর্যাপদে উল্লিখিত 'বুদ্ধ-
নাটক' অভিনয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ
করে তিনি দেখিয়ে দেন বাংলা নাটক,
বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাঙালী জাতিরই
সমান বয়সী। নাট্যকলা মানুষের মৌল
প্রবৃত্তিজাত। লিখিত সাহিত্যেরও পূর্বে,
মুখোশ নৃত্যে, মূকাভিনয়ে বা স্থাপত্য-
শিল্পে এর আদি নিদর্শন। বাংলা নাটকের
ইতিহাসেই বা এই সূত্রগুলির মূল্য স্বীকৃত
হবে না কেন? দেশে দেশে নাটক সৃষ্টির
উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম ও তার
অনুষ্ঠান। গ্রীক নাটকের ক্ষেত্রে এই তথ্য
সর্বজ্ঞাত। বাংলা দেশেও ত চর্যার নাটক,
জয়দেবের নাটগীত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অভিনয়
ধর্মচর্চার অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত। চৈতন্য-
দেবের ঐতিহাসিক অভিনয়ের কথাবস্তুও
ধর্মগ্রন্থ। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই
অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্যই বা কী করে
বিস্মৃত হওয়া চলে? বস্তুত চর্যাপদের
কাল থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময়সীমা
পর্যন্ত বাংলা নাটক ছিল তার আদিযুগে,
তারপর শুরু মধ্যযুগের ভক্তিনাটক এবং
নাটগীতির অধ্যায়। মধ্যযুগের এই ভক্তি
আন্দোলন আমাদের জীবন ও সাহিত্যকে
বহুদিন ধরে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।
আমাদের উনিশ শতকের নাটকেই কি তার
প্রভাব খুব দুর্লক্ষ?

হাজার বছর ধরে বাংলা নাটক কী
ভাবে নানা প্রভাব ও সংস্কার আত্মসাৎ
করে বিবর্তিত হয়েছে তার ইতিহাস
আলোচনা সূত্রে লেখক সর্বত্র তাঁর অভিনব
দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যের
সঙ্গে সবাই যে একমত হবেন এমন নয়।
বিতর্কের বাসনা জাগবে অনেক ক্ষেত্রেই।
কিন্তু সে সম্পর্কে শ্রীমৈত্র সব সময় সজাগ।
বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিতর্ক আহ্বানের জন্যেই
যেন তিনি বিশেষভাবে উন্মুখ। বিচলিত
হবার মত সিদ্ধান্তগুলিকে তাই তিনি
আলোচনার শুরুতেই নিক্ষেপ করেন।
তারপর আরম্ভ, তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের
জন্যে যুক্তি ও তথ্যের নিপুণ উপস্থাপনা।
এভাবে বাংলা নাটক সম্পর্কে যে ধারণাগুলো
বহুদিন ধরে প্রচলিত তাদের ভিত্তি
সম্পর্কেই লেখক সন্দেহ প্রকাশ করে
বসেন। তাঁর ভাষায়: 'সমালোচকদের ধারণা
বাংলা নাটক যতখানি ইওরোপীয় আদর্শ
অনুসরণ করেছে, ততখানি সত্যিকার নাটক
হয়েছে। ধারণাগুলি যতই দৃঢ়বদ্ধ হোক,
যুগগুলির মূল ধরে নাড়া না দিয়ে উপায়
নেই। আমাদের উদ্যোগ হবে সেই পথে।'
সেই 'নাড়া দেবার' প্রয়োজনে যে ইংরেজি
সেবা মঞ্চাভিনয়কে [illegible] [illegible] সার্থক
নাটক বলে স্বীকার করি তাকে [illegible]
বলেন কুসংস্কার। এর [illegible] [illegible] [illegible]
তা হল উনিশ শতকেরই বিশেষ রুচি ও
চাহিদার তাগিদ। তেমনি প্রাচীন বা মধ্য-
যুগের অভিনয়ও হল সে যুগের বিশেষ
মানসিকতা ও চাহিদাপ্রসূত। হয়তো তখন
অনেক নাটকেরই লিখিত রূপ ছিল না,
হয়তো সেই নাটগীতিতে কেবল নাচগানেরই
প্রাধান্য, সংলাপ ছিল নামমাত্র। তাতেই বা
কী এসে যায়। আমাদের কবিতাও ত এক-
দিন সুর-তাল-লয় সহযোগে গেয় ছিল।
সেগুলিকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্ত্য
প্রভাবিত কাব্যকেই ত আমরা একমাত্র
সার্থক বাংলা কবিতা হিসেবে দাবী করি
না। নাটকের ক্ষেত্রে তবে কেন আমাদের
অতীত ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে এক-
মাত্র উনিশ শতকের মধ্যেই তার সূচনা ও
সাফল্যের সন্ধান করবো?

সূচনামুহূর্ত থেকে ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত
দীর্ঘ হাজার বছরের নাটকের ইতিহাস
বর্তমান গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়। তবে
প্রচলিত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস থেকে
আকারে এবং প্রকারে এই বই সম্পূর্ণ
স্বতন্ত্র। একে হয়ত বলা উচিত বাংলা
নাটকের সমালোচনামূলক ইতিহাস। বাংলা
নাটকের প্রচলিত ইতিহাসগুলিও সঙ্গত
কারণে লেখকের সমালোচ্য বিষয়। প্রয়ো-
জনীয় নতুন তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে এসব
ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তটির
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং
সর্বত্র তাঁর এক সতেজ ও সংস্কারমুক্ত

ভঙ্গির জন্যেই বোধ হয় এই বিশাল রচনাটির মধ্যে আদ্যোপান্ত আমাদের কৌতূহল বজায় থাকে। বাংলা নাটক প্রসঙ্গে প্রতিবেশী প্রাদেশিক ভাষায় নাট্যইতিহাস আলোচনা এ সম্পর্কে লেখকের বিশেষ অধিকার ও বিচক্ষণতার পরিচয়। মধ্যযুগের ধর্মাশ্রয়ী নাটগীত প্রাদেশিক গণ্ডী অতিক্রম করে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ; এবং বাংলা নাটকের বিবর্তনের সঙ্গেও তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলা নাটকের এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আবিষ্কার ও তার নতুন মূল্যায়নের জন্যে 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা নাটকের সমালোচক, ছাত্র বা সাধারণ পাঠক প্রত্যেকেই এখানে কিছু না কিছু নতুন ভাবনার উপকরণ পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লেখিকা হিসেবে বনশ্রী রায় একেবারেই নবাগত। ধান শুধু ধান (রূপা, চার টাকা) তাঁর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গি ও চিন্তাধারা রীতিমত পরিণত। 'ধান শুধু ধান'-এর কাহিনীর স্থানকাল ইতরভদ্র সকলেই। একটি গ্রামের কাহিনী শোনাতে বসে লেখিকা পুরো বাংলাদেশের গ্রামের একটি সাধারণ রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, শুনিয়েছেন তার মর্মকথা। মাটি আর ফসলের জন্য চাষীর প্রাণাধিক মমতার গল্পের পাশাপাশি রাশভারী জমিদারবাড়ির চক্রান্ত, শাসন আর অত্যাচারের এক জীবন্ত গল্প বর্ণনা করেছেন তিনি। বৃদ্ধ চাষী বলরামের স্মৃতিচারণে উত্থানপতনময় গ্রামের প্রতিটি স্পন্দন ও দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট অনুভব করা যায়। স্মৃতিভারাক্রান্ত এই বৃদ্ধের চোখে এখানো ধানভরা মাঠের স্বপ্ন, মাঠের ফসল যেন তাকে কথা বলছে তার সঙ্গে, কান পাতলে সে শুনতে পায় মাঠ জুড়ে মা লক্ষ্মীর চলাফেরার স্পষ্ট

হবে। অনেক খানির সাক্ষী বৃদ্ধ বলরামের চরিত্রটি লেখিকা অনেক সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। পুরো উপন্যাসেও তাঁর কলমের নিপুণ পরিচয় ছড়ানো।

*

১৯৭১ সালের মে মাসে আমেরিকা-ইউরোপ ঘুরতে বেরিয়েছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। কলকাতা থেকে মস্কো, মস্কো থেকে হেলসিঙ্কি, নরওয়েতে দু-দিন, সেখান থেকে কোপেনহেগেন, অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন তাঁরা। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, হোয়াইট হাউস, গ্রান্ডক্যানিয়ন ও ক্যালিফোর্নিয়ার 'হলিউড ও ডিজনীল্যান্ড' প্রভৃতি মুলুক ঘুরে বেড়াবার সময় যে-বিশাল অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁদের তার গল্প শুনিয়েছেন তাঁরা ভারতের বাইরে ভ্রমণ (প্রথম খণ্ড, পরিবেশক : প্রভাত কার্যালয়, ৬ টাকা) নামক ভ্রমণ কাহিনীতে। টুকরো টুকরো অধ্যায়ে স্বামী- স্ত্রী আলাদাভাবে তাঁদের ভ্রমণের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়তে মন্দ লাগে না। ডাঃ গৌরমোহন দাস দে ও শ্রীমতী নীহারকণা দাস দে-র অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, যুগ্মভাবে দম্পতি-রচিত ভ্রমণের গল্প সম্ভবত তাঁরাই প্রথম [illegible]লেন।

অগ্রযুতী [illegible]-গল্প অন্য-গল্প (পরিবেশক : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, দু টাকা) বেশ নতুন স্বাদের বই সন্দেহ নেই। চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই বইয়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে গল্পের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন লেখিকা : যেমন প্রথম পরিচ্ছেদের ছোট-গল্পগুলো কবিতার আকারে রচিত, কিন্তু চরাচরিত ছন্দ-টন্দের বালাই নেই। লেখিকা নিজে এর জন্যে বেশ গর্বিত। প্রতিটি কাব্যধর্মী গল্পের নিচে গল্পের গন্ধ' শিরোনামায় বিস্তৃত মহিমায় পরিচয় সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে গল্পগুলি প্রায় গল্পের মতো দেখতে। স্বাদ ? অনাস্বাদিতপূর্ব ! উদ্ভটতত্ত্বের চমৎকার নমুনা গ্রন্থটি।

পিতৃ পদাঙ্কে
প্রণব রায়
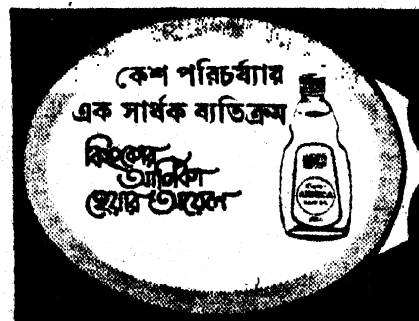
্রনিশগো হেচাঁরণা সালে স্বর্গজি ট্রফির
য় উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে পঙ্কজ
যখন জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি
ছল ইডেনে, তখন পঙ্কজের বয়স
রো বছর। ওই ইডেনেই পঙ্কজ পুত্র
রায় জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি করল
র স্কুল দলের বিরুদ্ধে কোচবিহার
র পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় মাত্র
না বছর বয়সে। সবে শুরু।
য়াড় জীবন বলতে যা বোঝায় সেই
নটাই পুরো পড়ে আছে সামনে।

পঙ্কজ রায় ভারতীয় ক্রিকেটের এক
বল নাম। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম উইকেটে
তুর রানে বিশ্ব রেকর্ডের ভাগীদার, বহু
স্ট যুদ্ধের স্মরণীয় নায়ক, যার পেছনে
ছে তেতাল্লিশটি টেস্ট খেলার
জ্ঞতা। প্রণব তার খেলোয়াড় জীবনে
ার মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবে
। সে সম্পর্কে অবশ্যই একটি বড়
্নসূচক চিহ্ন আছে। ক্রিকেট খেলার
ারও প্রশ্ন আছে। কিন্তু ক্রিকেট
র্কে অনুরাগ, সুযোগ, সুবিধা,
বেশ, মানসিকতা—প্রণবের সব কিছুই
ুল সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

খেলার প্রথা-প্রকরণ অবিকল পঙ্কজের
ইডেনে বিহার স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ে
বাবার স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে।
্দিকরা লিখেছেন, মনে হয়েছে পুত্রের
ধরে পঙ্কজ রায় ব্যাট করছে। পঙ্কজের
প্রণব ইনিংসের সূচনাকারী ব্যাটস-
। পঙ্কজের মতই ওর হুক, ড্রাইভ ও
য়ার কাট। নট আউট ১০০ রানের মধ্যে
১৬টি বাউণ্ডারি করেছিল তার অনেক-
ন মারের মধ্যেই ছিল পরিণত
ায়ড়ম্বর ছাপ। তবু পরিমার্জনের
প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। পিতৃ পদাঙ্কে
ফেলেই ক্রিকেটে এগিয়ে যেতে চায়
।

শুধু পিতার পদাঙ্কেই নয়, পারিবারিক
হ্যও ক্রিকেটে প্রণবের সহজাত
ধিকার। ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের
শাখায় ওর জন্ম—বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে
শাখার অবদান অনস্বীকার্য। কিংবা
যায়, প্রণব কুমারটুলির সেই
কট বাড়ির ছেলে, যে বাড়ি থেকে একটি
শালী ক্রিকেট দল বার করা যায়। যে
ের চারটি ছেলে রণজি ক্রিকেটে বাংলার
তিনিধিত্ব করেছে, দুজন হয়েছে বাংলার
ধনায়ক। তার আগেরও ইতিহাস
ছে।

সবাই জানে, গোবিন্দ (সম্প্রতি
লোকগত), রতন, তপন, রবীন
পাল, অজিত, পঙ্কজ, নিমাই অম্বর—
কট মহলে পরিচিত এরা একই
রিবারের সন্তান। ওদের পিতা এবং

পিতৃব্যদেরও ক্রিকেট-ফুটবলে অবদান কম নয়। পঙ্কজের পিতা এবং পিতৃব্যরা ছিলেন চার ভাই। ননীগোপাল রায়, রঙ্গলাল রায়, ক্ষীরোদলাল রায় এবং জলধিলাল রায়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রথম সম্পাদক ননীগোপাল রায়ের পুত্র জাস্টিস কিরণলাল রায়ও ছিলেন বাংলার নামী ক্রিকেট খেলোয়াড়। রঙ্গলাল রায়ের পুত্রদের মধ্যে রতন ও তপন ক্রিকেট খেলেছে

প্রণব রায়

টাউন ক্লাবে, গোবিন্দ স্পোর্টিং ইউনিয়নে, গোপাল ও রবীন কুমারটুলি ক্লাবে। ক্ষীরোদলাল রায়ের তিন পুত্র অজিত (কালু), পঙ্কজ এবং নিমাই। জলধিলাল রায় ছিলেন অবিবাহিত। বিলেতে ব্যারিস্টারি করতেন, বিলেতেই মারা যান। বাংলার বর্তমান ক্রিকেট অধিনায়ক অম্বর রায় হচ্ছে পঙ্কজের জ্যেষ্ঠ সহোদর অজিত রায়ের পুত্র। পঙ্কজের দ্বিতীয় পুত্র হচ্ছে প্রণব।

ক্রিকেট বাড়ির ক্রিকেটারদের কথা সবাই জানলেও পারিবারিক সম্পর্কটা সবার জানা নেই বলেই প্রণবের কথা আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কথাটা সেরে নিতে হল।

সেই ঘরে বসেই প্রণবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কয়েক বছর আগে যে ঘরে বসে কথা বলেছিলাম জাস্টিস কিরণলাল রায়ের সঙ্গে 'দেশ'-এর পাতায় তৃতীয় ক্রীড়া-ভূমিকা নিবন্ধ লেখার প্রয়োজনে। কুমারটুলি পার্কের উত্তর দিকে ৮বি অভয় মিত্র স্ট্রীটে রায়বাড়ির ওই ঘরটা এখন প্রণবের পড়ার ঘর। কথার মাঝেই পঙ্কজ এসে পড়ল। প্রণবকে জিজ্ঞাসা করল, 'কুটা, তোদের খেলার আজ কি হল রে।' প্রণব মুখ নীচু করে রইল। খবরটা আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম। বললাম, ও রান আউট হয়ে গেছে ৪২ রান করে। 'রান আউট হলি কেন?'—পঙ্কজের প্রশ্ন। প্রণব বলল, 'পা স্লিপ করে পড়ে গিয়েছিলাম।' 'কোন বুট পরে খেলেছিস? নতুনটা?' প্রণব বলল, হ্যাঁ। রান আউট হওয়া কিন্তু উচিত নয় বলে পঙ্কজ অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করল।

স্কটিশ চার্চ স্কুলের কমার্সের ছাত্র প্রণব ক্লাস টেন থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। ক্লাস ইলেভেনে উঠবে। দু বছর অ্যালবার্ট স্পোর্টিংয়ে খেলবার পর এ বছর খেলছে টাউন ক্লাবে। ইডেনে সেঞ্চুরি করার পর ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধেও লীগের খেলায় সেঞ্চুরি করবে আশা ছিল। হাত সেট হয়ে গিয়েছিল। খেলছিলও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু ৪২ রানের মাথায় রান আউট হওয়ায় মনে হল ও বেশ লজ্জিত। বাবার দিকে মুখ তুলে কথা বলতে পারছে না।

প্রণবের ব্যাটেখড়ি কুমারটুলি পার্কে, যে পার্কে বাবা-কাকা জ্যেঠা ঠাকুরদাদের ব্যাটেখড়ি হয়েছিল। স্কটিশ চার্চ স্কুলে খেলছে ক্লাস ফাইভ থেকে। গত বছরই প্রণব সেঞ্চুরির অধিকারী হতে পারত স্কুল ক্রিকেটে। স্কোরারের রান গণনায় ভুলে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওদের মানিকতলার স্কুলের মাঠে নর্থ ক্যালকাটা ইণ্টার স্কুল ক্রিকেটে রানী ভবানী স্কুলের বিরুদ্ধে ও ব্যাট করছিল। ওর নামের পাশে যখন ১০২ রান তখন ও রিটায়ার করল। কিন্তু ক্রিজ ছেড়ে এসে দেখে স্কোরার ওর একটি বাউণ্ডারি বাদ দিয়ে বাই-রানে ৪ যোগ করেছে। সুতরাং ৯৮ নট আউট লেখা হল ওর নামের পাশে। ব্যাট করা ছাড়া প্রণবের বলেও হাত আছে। লেগ ব্রেক বল করে। গত বছর রেঞ্জার্সের সঙ্গে অ্যালবার্ট স্পোর্টিংয়ের রেলিগেশন ম্যাচে পেয়েছিল ৩৬ রানে ৩টি উইকেট। তাতেও অবশ্য অ্যালবার্ট বাঁচতে পারেনি। এবং অ্যালবার্ট দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গেছে বলেই ও টাউন ক্লাবে এসেছে। এখন থেকেই অবশ্য বড় ক্লাবের ডাক শুরু হয়েছে।

প্রণব তার বাবার খেলা দেখার বিশেষ

[illegible] ... ১৯৭৬-এর পর পনের বছর এবং

[illegible] ... আমি যেন নিজের [illegible] আমাকে [illegible] দুই [illegible] পেলাম। তোমাদের কোন চিন্তা নেই, আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তোমরা শুধু ওর স্বাস্থ্যর প্রতি

[illegible] ... খেলার [illegible] জন্য।

অনুকূল

ভলিবলে গণ্ডগোল

ফুটবল খেলায় উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত নেই। হকি এবং ক্রিকেট খেলাতেও মাঝে মাঝে গণ্ডগোলের সৃষ্টি না হয়, এমন নয়। কিন্তু যে ভলিবল খেলা এতকাল ছিল নিছক আনন্দ উপভোগের খেলা, সুস্থ পরিবেশেই এতকাল খেলা হয়ে এসেছে—জনপ্রিয়তা বাড়ার সংগে সংগে সেই ভলিবলেও এখন দর্শক সমর্থক হামলা। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে চুলচেরা বিচার এবং চুলোচুলি।

আমি মহিলাদের ভলিবলের কথাই বলছি। ময়দানে ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে নৈহাটি এ সি এবং বিজয়ী সংঘের মধ্যে মহিলাদের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় যে ঘটনা ঘটে গেছে, এ রাজ্যের ভলিবল খেলার ইতিহাসে তা নতুন ঘটনা। চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙাচুর হয়েছে, দর্শকরা কোর্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ভীড়ের চাপে কুড়িজনের মত দর্শক আহত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত পুলিসের ঘোড়সোয়ার বাহিনীকে কোর্টের মধ্যে ঢুকতে হয়েছে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য। খেলাটিও সুষ্ঠুভাবে শেষ হয় নি। চতুর্থ গেমের শেষ দিকে আম্পায়ারের এক বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের পর এই সব ঘটনায় খেলা ১৪ মিনিট বন্ধ থাকে। পরে আবার খেলা আরম্ভ হলেও আবার মীমাংসাসূচক পঞ্চম গেমের অন্তিম পর্বে নৈহাটি যখন ১৪—১৩ পয়েন্টে এগিয়ে এবং খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তুমুল উত্তেজনা তখন আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে বিজয়ী সংঘের মেয়েরা কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আবার গোলমাল আরম্ভ হয়। ওই গোলমালের মধ্যেই ফাঁকা কোর্টে নৈহাটিকে দিয়ে সার্ভিস করিয়ে ফাইনাল খেলার উপর যবনিকা টানা হয়। পরের দিন ঘোষণা করা হয়, নৈহাটি এ সি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নৈহাটির অনুকূলে শেষ গেমের ফল ১৫—১৩ পয়েন্ট।

নৈহাটি ও বিজয়ী সংঘের মেয়েদের মধ্যে এই ফাইনাল খেলাটি নিঃসন্দেহে ভলিবলের এক স্মরণীয় খেলা, যে খেলায় ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা এবং চরম উৎকর্ষতা। অত্যধিক দর্শকের ভীড়ে আবহাওয়া ছিল সরগরম। প্রতি পয়েন্টের জন্য প্রতিটি মেয়েকে মরণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে, ব্লক, স্ম্যাশ ও প্লেসিংয়ে বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। দুই পক্ষ পর্যায়ক্রমে গেম জিততে থাকায় খেলার আকর্ষণও তুঙ্গে ওঠে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিজয়ী সংঘ গ্রুপের খেলায় ৩—১ গেমে নৈহাটিকে পরাজিত করায় খেলার মধ্যে বাড়তি আকর্ষণ যোগ হয়। বিজয়ী সংঘ প্রথম গেম জেতে ১৫—১২ পয়েন্টে। ১৪—১৩ পয়েন্টে দ্বিতীয় গেম জিতে নৈহাটি সমান অবস্থায় থামে। আবার বিজয়ী এগিয়ে যায় ১৫—৭ পয়েন্টে তৃতীয় গেম জিতে। আবার নৈহাটি সমান হয় চতুর্থ গেমে বিজয়ীকে ১৫—১০ পয়েন্টে হারিয়ে। মীমাংসাসূচক পঞ্চম গেমের কথা আগেই বলা হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার পক্ষে গ্যালারিবিহীন মাঠ মোটেই অনুকূল নয়।

গ্যালারি থাকলেও হয়তো গোলমাল হতে পারত। কিন্তু গ্যালারি ও কোর্টের মাঝে বেষ্টনী থাকলে দর্শকরা সহজে কোর্টে ঢুকতে পারত না, খেলাও হয়তো সুষ্ঠুভাবে শেষ করা যেত। ভলিবল খেলার জনপ্রিয়তা যখন দিন দিন বাড়ছে তখন দর্শকদের জন্য গ্যালারির ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

এশীয় বাস্কেটবলে ভারত

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত সপ্তম এশিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী ১২টি দেশের মধ্যে ভারত ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফিলিপিনস। গত বছর টোকিওতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ এশীয় বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জাপান, ফিলিপিনস হয়েছিল রানার্স। এবার খেলার আগেই জাপানের খেলোয়াড়রা জোর-গলায় বলেছিল, চোখ বেঁধে খেলে ফিলিপিনসকে হারাব। জাপানও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে এবার চতুর্থ-স্থান দখল করতে হয়েছে। ফিলিপিনস জাপানকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হলেও এবার ভাল খেলেছে কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপ ও ফাইনাল পর্যায়ের মোট ১০টি খেলার মধ্যে ৯টি খেলায় অপরাজিত দক্ষিণ কোরিয়া ফাইনালে ফিলিপিনসের কাছে ৯০—৭৮ পয়েন্টে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে তাইওয়ান।

১২টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রতি গ্রুপের উপরের তিনটি দেশকে নিয়ে ৬টি দেশের লীগ প্রথায় হয় ফাইনাল রাউন্ডের খেলা।

ভারত বি গ্রুপ লীগের তৃতীয় দল হিসাবে ফাইনাল পর্যায় খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু ফাইনাল গ্রুপের পাঁচটি খেলার মধ্যে একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। গ্রুপ লীগে ভারত পরাজিত করে ইন্দোনেশিয়াকে ৮২—৭০ পয়েন্টে, পাকিস্তানকে ৭৯—৫৯ পয়েন্টে এবং সিঙ্গাপুরকে ৮২—৭১ পয়েন্টে। আর পরাজিত হয় তাইওয়ানের কাছে ৯৯—৬৩ পয়েন্টে এবং ফিলিপিনসের কাছে ১০৯—৭৩ পয়েন্টে। ফাইনাল রাউন্ডে ভারতের পাঁচটি পরাজয় জাপান (৯০—৭৮), তাইওয়ান (৮৯—৬৩), দক্ষিণ কোরিয়া (১১৩—৬৭), ইরান (৮৭—৮২) ও ফিলিপিনসের (১১০—৮৪) কাছে। একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলা ছাড়া প্রায় প্রতি খেলায় ভারত বিরতির সময় পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও বেশী পয়েন্টে এগিয়ে যেতে দেয়নি। কিন্তু বিরতির পর পয়েন্টের ব্যবধান বেড়েছে। যেমন চ্যাম্পিয়ন ফিলিপিনস বিরতির সময়ে মাত্র ১০ পয়েন্ট এগিয়েছিল। খেলা শেষে তারা এগিয়ে গেল ২৬ পয়েন্ট। ইরানের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে তো ভারতই এগিয়েছিল ৩ পয়েন্টে। শেষ পর্যন্ত ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে ভারত হেরে গেল। এর অর্থ ভারতীয় খেলোয়াড়দের শারীরিক পটুতার ঘাটতি। ক্রমেই খেলার মধ্যে শ্রম-কাতরতার ছাপ ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে

রতের অধিনায়ক অনাথায়ন সিং, সুরেন্দ্র চৌরিয়া, বিজয় রাঘবন এবং ওমপ্রকাশ প্রায় ও খেলায় ভাল শিকার করেছে। কিন্তু রাও প্রথমার্ধে যত ভাল খেলেছে দ্বিতীয় র্ধে তত ভাল খেলতে পারেনি।

যে কোন খেলাই হোক, সে খেলার থা-প্রকরণ এবং কলাকৌশলের উপর নেকখানি নির্ভর করে দলগত সফলতা। ন্তু দৈহিক পটুতা এবং দমের অভাবে ব খেলার কলাকৌশলেই ঘাটতি পড়ে, প্রথা-করণের রূপায়ণও কষ্টকর হয়ে ওঠে। কলা-শল এবং প্রথাপ্রকরণে পারঙ্গম হয়েও রতের হকি খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার খাচ্ছে প্রধানত দৈহিক পটুতার ভাবে। ওই দুর্বলতা অন্যান্য খেলাধূলোর ক্ষেত্রও আমাদের আশানুরূপ এগিয়ে না বার অন্যতম কারণ। এশিয়ান বাস্কেট-লের কষ্টিপাথরে আর একবার আমাদের লোয়াড়দের দৈহিক অসামর্থ্যের কথা প্রমাণ য়ে গেল। আমি বলছি না, দৈহিক পটুতা থাকলে আমাদের খেলোয়াড়রা ম্যানিলা থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসত। বলছি, ক্রীড়া দক্ষতার সঙ্গে দৈহিক পটুতার যথাযথ সামঞ্জস্য থাকলে আমাদের ফল আরও ভাল হত। উল্লেখ্য, ফিলিপিনস, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়রা স্বভাবত ভারতীয় খেলোয়াড়-দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত খর্বকায়। বাস্কেট-বলে দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়রাই বাড়তি সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের খেলোয়াড়রা দীর্ঘদেহের সে সুযোগ সম্ভবত কাজে লাগাতে পারেনি দৈহিক পটুতার অভাবে।

বাংলার ক্ষেত্রেও দমের প্রশ্ন

অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের তুলনায় ভারতের খেলোয়াড়রা, যেমন শারীরিক সামর্থ্যে পিছিয়ে আছে, তেমন বাংলার খেলোয়াড়রাও বোধ হয় ভারতের কোন কোন রাজ্যের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাদের এঁটে উঠতে পারছে না। না হলে কলা-কৌশলের দিক দিয়ে বাংলার ফুটবল দলের সঙ্গে পাঞ্জাবের দলের কোন তুলনা হয় না। অথচ জাতীয় ফুটবলের পালের খেলায় পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলাকে ড্র করতে হয়েছে। আবার সুব্রত কাপের খেলায় গত বছরের বিজয়ী পাইকপাড়া স্কুলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে পাঞ্জাবের একটি স্কুল দলের কাছে। যদিও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পাইকপাড়া স্কুলের পরাজয় আম্বলার সনাতন ধরম স্কুলের কাছে টাই ব্রেকারে, তবু পাইকপাড়া অম্বালার স্কুলকে হারাতে পারেনি এটাই দেখবার বিষয়।

সুব্রত কাপ খেলার অধিকারপ্রাপ্ত বাংলার অপর স্কুল ইছাপুরের নর্থ-ল্যাণ্ডকেও বিদায় নিতে হয়েছে ইম্ফলের
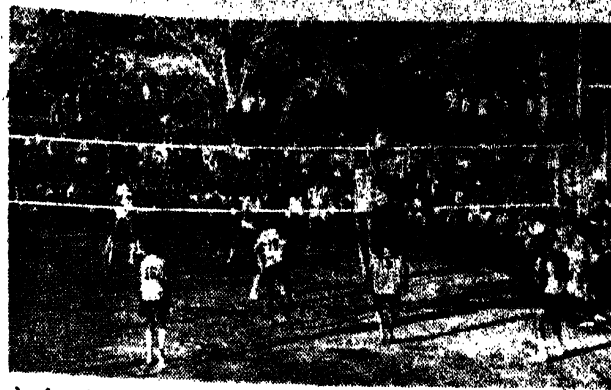
নৈহাটি এ সি ও বিজয়ী সঙ্ঘের মধ্যে মহিলাদের রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় দর্শকদের ভীড় —ফটো দেশ

তাম্বিসনা হাই স্কুলের কাছে হেরে গিয়ে। অবশ্য সেমিফাইনাল খেলায়। সারা বাংলার স্কুল ফুটবলে বিজয়ী ইছাপুরে নর্থল্যাণ্ড স্কুলের কয়েকটি ছেলের মধ্যে ফুটবলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা অনস্বীকার্য। অথচ ইম্ফলের স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে তারা পেরে উঠল না। বেশ কিছু সম্ভাবনাময় ছাত্র খেলোয়াড়ে গড়া পাইকপাড়াও হেরে গেল পাঞ্জাবের একটি স্কুল দলের কাছে।

চার যুগের ক্রীড়া সংগঠক

প্রায় চার যুগ ধরে ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত অধ্যক্ষ মৈনুল হক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১১ ডিসেম্বর পাটনায় মারা গেছেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

সর্বভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ মৈনুল হক ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ক্রীড়া সংগঠক। বিহার অলিম্পিক অ্যাসো-সিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীহক ১৯৩০ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। ১৯৩৮এর পশ্চিম এশীয় গেমসে, ১৯৫১র প্রথম এশিয়ান গেমসে এবং লণ্ডন (১৯৪৮) ও হেলসিঙ্কি (১৯৫২) অলিম্পিকে তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের শেফ দ্য মিশন। এছাড়া ১৯৬২ থেকে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের রুলস কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শ্রীহক চার বছর নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবেও মৈনুল হকের যথেষ্ট অবদান আছে, তিনি খেলা-ধূলোকে শিক্ষারই অঙ্গ হিসাবে মনে করতেন। ১৯৩৫ সালে ইংরাজীর অধ্য-াপক হিসাবে তিনি বিহার ন্যাশনাল কলেজে যোগ দেন। পরে হন ওই কলেজের অধ্যক্ষ।

ক্রীড়াক্ষেত্রের কুটিল চক্রের মধ্যেও অধ্যক্ষ হক ছিলেন অজাতশত্রু। ছোট-খাটো ফরসা চেহারার সদা হাস্যময় মানুষটির সান্নিধ্যে একাধিকবার এসে দেখেছি খেলাধূলোর নানা সমস্যাকে তিনি খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের দ্বারাই সমা-ধান করতে চেয়েছেন এবং সামগ্রিকভাবে খেলাধূলোর মধ্যে করতে চেয়েছেন জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ। সত্যি কথা, বয়সের ভারে শেষ দিকে তিনি তাঁর সংগঠন শক্তির অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপদেশেরও যথেষ্ট মূল্য ছিল। সম্ভবত তাই শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও বলেছেন, ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্র তার প্রবীণতম সংগঠক ও উপ-দেষ্টাকে হারাল।

বিলিয়ার্ডে লাফিরের বিশ্ব খেতাব

বিলিয়ার্ড যদিও বিলাসবহুল বড় হোটেল কক্ষের খেলা, কিংবা খেলা সঙ্গতি-পন্ন উচ্চ মহলের মানুষদের ক্লাবের—তবু বিলিয়ার্ডে পারদর্শী হবার জন্য গভীর মনঃসংযোগ, হাতের নৈপুণ্য এবং সাধনার প্রয়োজন। সুখের কথা এই খেলায় ভারত উপমহাদেশের দুজন মানুষ বিশ্ব খেতাব অর্জন করলেন। আগে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতের উইলসন জোন্স, এবার বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যামেচার বিলিয়ার্ডে চ্যাম্পিয়ন হলেন শ্রীলঙ্কার ছেলে জামাইদ মহম্মদ লাফির। পৃথিবীর নামী খেলোয়াড়দের হারিয়ে লাফিরের এই খেতাব লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। শুধু খেতাব জয়ই নয়, ৮৫৯ পয়েন্টের একটি ব্রেকে লাফির বিশ্ব রেকর্ডও করেছে। ভারত চ্যাম্পিয়ন সতীশ মোহনের দ্বিতীয় স্থান এবং মাইকেল ফেরেরার তৃতীয় স্থান দখলের সংবাদে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে ক্রিকেটের মত এ কমনওয়েলথ গেমসেও ভারত অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

—একলব্য

হতেই হবে। কেন না, বাচ্চাদের মুখে মুখে এই নামটিই হরদম ঘুরছে ফিরছে কিনা। এতে আছে খাঁটি দুধ, মধু, যবের গুঁড়ো আর চিনি। এছাড়া, নানান ধরনের চকোলেট, নারকেল, কমলালেবু আর কফি। সেরা সেরা জিনিস দিয়ে তৈরি বলেই ঘুরে ফিরে এর কথাই মনে পড়ে। খেয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, খাসা কাকে বলে। তাছাড়া, মিষ্টিটিষ্টির ব্যাপারে পাকা জহরী তো বাচ্চারাই!

নিউট্রিন

টফিলজেন্স

NCM-47/73 BEN

নিউট্রিন কনফেকশনারি কোং প্রাঃ লিমিটেড প্যালামানের রোড, চিত্তুর (এপি)

'রক্ততিলক' (পরিচালনা : বিশ্বজিৎ) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও অলকা

পশ্চিমবাংলা সরকারের অকৃপণ কারের দাক্ষিণ্যে এখন যে-কোন সময় যে-কোন ছবি প্রমোদ-কর থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। একদালে কোন ছবির প্রমোদ-কর মুক্তি খুবই সম্মানের বিষয় ছিল। প্রমোদ-কর রহিত করে কোন ছবিকে সম্মানিত করা হত, ওই ছবির বিশেষ গুণ সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করা যেত। এখন প্রমোদ-কর মুক্তির আর সেই তাৎপর্য নেই। কারণ প্রমোদ-কর থেকে রেহাই পাওয়াটা এখন আর কঠিন বিষয় নয়। রাজ্য সরকারের পরম ঔদার্যের ফলে ইদানীং একাধিক হিন্দী ছবিও প্রমোদ-কর থেকে রেহাই পেয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাংলা ছবি করমুক্ত হয়েছে।

*   *   *   *

বাংলা ছবিকে সরকার যদি সাহায্য করতে চান এবং সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দিতে চান তো খুবে ভাল কথা। কিন্তু কর লাঘবই তার একমাত্র পথ কিনা ভেবে দেখা দরকার। নাটকের ক্ষেত্রে যেমন প্রমোদ-কর তুলে নেওয়া হয়েছে বাংলা সিনেমার বেলায়ও যদি সরকার এই নীতি গ্রহণ করেন তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সেটা যখন

মতামতের মন্তাজ

হচ্ছে না তখন অনর্থক বছরে বেশ কয়েকটি ছবিকে প্রমোদ-কর থেকে মুক্তি দেওয়া কেন? কোন কোন ক্ষেত্রে এই বরদানের কোন বিশেষ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন ছবিকেও করমুক্ত করা হয়েছে যা দেখে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই ধরনের অন্যান্য ছবি কী দোষ করল। আসলে করমুক্তির বেলায় বিশেষ কোন নীতি দেখা যাচ্ছে না।

*   *   *   *

এদিকে ফিলম ডেভেলপমেনট বোরড একটি প্রস্তাব এখনও গ্রহণ করতে পারছেন না। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, কোন ছবির প্রমোদ-কর বাবদ গৃহীত অর্থের পঞ্চাশ ভাগ পরবর্তী ছবির জন্য প্রযোজককে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অবশ্য এই প্রস্তাব পরীক্ষা-মূলক ছবির ক্ষেত্রেই করা হয়েছিল—যে ছবি বক্স-অফিসের আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত। এই প্রস্তাব কোন রকমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাঁরা সস্তা প্রমোদের কথা না ভেবে সত্যিকারের তাৎপর্যপূর্ণ ছবি বানাতে চান অথবা ফিলম আর্ট নিয়ে কোন পরীক্ষা করতে চান তাঁদেরই সাহায্য পাওয়া দরকার। এ কাজে যদি সরকার উৎসাহ না দেন তবে সৎ চলচ্চিত্র তৈরির পথ যে একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। ফরমুলাসর্বস্ব প্রমোদ-চিত্র বক্স-অফিসে ভাল চলতে পারে। আরও ভাল চলার জন্য ছবিতে অসুস্থ উপকরণ রাখার প্রবণতাও বেড়ে যেতে পারে। এই অন্যায় আপসের পথে যদি সাফল্য আসে তবে পরিবেশকরা এবং প্রযোজকরা সুস্থ, সৎ ও শিল্পমণ্ডিত চলচ্চিত্র তৈরির কোন উৎসাহই হয়তো পাবেন না। চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নের পথও এভাবে ক্রমে রুদ্ধ হয়ে আসবে। অতএব সরকার পরীক্ষামূলক ছবির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রস্তাব মেনে নিতে পারতেন।

*   *   *   *

যদি বছরে কয়েকটি ছবির ক্ষেত্রে প্রমোদ-

কর প্রত্যাহারের ব্যাপার না ঘটত তবে এ নিয়ে কিছু না বললেও চলত। সরকার তো যখন-তখন প্রমোদ-কর ছেড়েই দিচ্ছেন। তবে এক্সপেরিমেন্টাল ছবির বেলায় এই কার্পণ্য কেন? কোন উল্লেখযোগ্য ছবি বেশির ভাগ দর্শক দেখুন—এটাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় এবং সেই ছবির প্রমোদ-কর মকুব হয়, তবে ওই ছবির প্রচুর ব্যবসায়িক লাভ হলে সরকার লাভের একটি অংশ স্বচ্ছন্দেই চেয়ে নিতে পারেন। প্রমোদ-কর অব্যাহতির একটি উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই যে, ছবি ভাল চলুক। দর্শকদের বাংলা ছবি দেখার জন্য উৎসাহিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল হলে সরকার লভ্যাংশ অনায়াসেই চেয়ে নিতে পারেন এবং তা সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে দান করতে পারেন। প্রমোদকর বণ্টন ও প্রত্যাহারের ব্যাপারে সরকারের অনেক কিছুই ভেবে দেখবার দরকার আছে। এখন সরকার চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণে বছরে অনেক টাকা দিতে প্রতিশ্রুত। তার উপর প্রমোদ-কর অব্যাহতির সাহায্যও চলছে। সাহায্য করা সব সময়েই ভাল, কিন্তু তার মূলেও একটা পক্ষপাতশূন্য ও সুস্থ নীতি থাকা দরকার। নতুবা সমালোচনা, কারণ ঘটে।

ননীগোপালের বিয়ে

প্রোডাকশন সিন্ডিকেট

এখন বাংলা কমেডি ছবির আকাল। সে কারণে ননীগোপালের বিয়ের কিছুটা কদর হতে পারে, কিন্তু মুশকিলও আছে। কমেডি এখানে মূলত সংলাপ-নির্ভর, টকেটিভ কমেডি আর কী। মজার কথা কতক্ষণই বা ভাল লাগে। কমিক সিচুয়েশন বেশি থাকলে অসুবিধা হত না। তা ছাড়া, ছবিটি অকারণে দীর্ঘ। দীর্ঘমেয়াদী ঘটনা দিয়ে দর্শকদের তৃপ্ত দেওয়া কঠিন। কাহিনীতে (দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল রচিত) আবার যমজ ভাইয়ের ঘটনাও আছে। তাতেও কমেডি অব এররস বা ভ্রান্তিবিলাস তেমন জমল না।

কমেডি ছবিতে সাধারণত পাত্র-পাত্রীর বিয়ে ভণ্ডুল হবার উপক্রম হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয় না। এ ছবিতে নায়ক ননীগোপালের বিপদ-উত্তরণের পথে তাকে যত্নের ছদ্মবেশও নিতে হয়েছে—হিন্দীচিত্রে যেমন। পরিচালক সুধীর মুখারজি ননীগোপালের বাচালতাকে বা চ্যাংড়ামিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। দর্শকরাও হেসেছেন খুব। পরিচালক কমেডির উপভোগ্যতা বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন খুব। নচিকেতা ঘোষ সুরারোপিত হালকা মেজাজের গান (মান্না দে'র কণ্ঠে খুবই উপভোগ্য) ননীগোপালের মুখে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিচালকের পরিকল্পনা সফল। জায়গা বিশেষে নায়িকাও
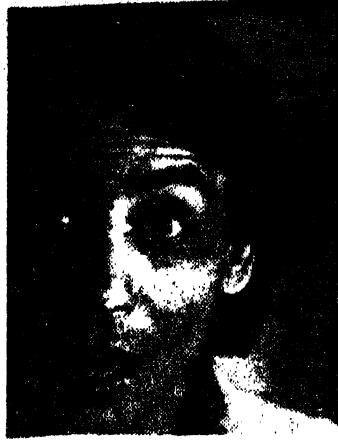
'ননীগোপালের বিয়ে'/চিন্ময় রায়

সুন্দর গান গেয়েছে (স্বপ্না দাশগুপ্তর কণ্ঠে)। নায়িকা যে গায়িকা এটা পরিচালক গোড়াতেই জানিয়ে দিয়েছেন—বাংলা ছবিতে এই প্রস্তুতি প্রায়ই বাদ পড়ে।

ননীগোপালের চরিত্রে চিন্ময় রায় ছাড়া অন্য কাউকে যেন ভাবাই যায় না। ছবির কমেডির গোটা দায়িত্ব (দুই ভূমিকায়) শ্রীরায়ের স্কন্ধে। তিনি তা অনায়াসে বহন করেছেন এবং কেবল অভিনয়ের জোরে অনেক জায়গা উপভোগ্য করে তুলেছেন। নায়িকা সেজেছেন জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়। কমেডি সর্বদা যুক্তির হাত ধরে চলে না। এম এ ক্লাসের ছাত্রী মানসী কেন ননীগোপালকে ভালবাসবে এই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ভালো যখন সে বেসেই ফেলেছে তখন জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়ও রোমান্টিক নায়িকার চরিত্র তৈরিতে কোন খুঁত রাখেন নি। রোমান্টিক হিরোইন হিসাবে তাঁকে ভালই লেগেছে। ননীগোপালের বিয়ের কমেডিতে রসের নতুন মাত্রা যোগ করেছেন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়—বন্ধু দিলীপের ভূমিকায়। তাঁর চরিত্রচিত্রণ সুন্দর। নায়কের অন্যতম বন্ধু হিসাবে আনন্দ মুখোপাধ্যায়ও স্বচ্ছন্দ।

প্রজাপতির নির্বন্ধের আগে নায়ককে অভিভাবকের নির্বন্ধ বানচাল করতে হয়েছে। এখানে অভিভাবক হিসাবে যিনি বিয়েতে বাদ সেধেছেন তিনি নায়িকার পঙ্গু জ্যাঠামশাই হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। কমেডির উপযোগীই তাঁর অভিনয়, কখনও তিনি রাশভারী। নায়কের বাবার ভূমিকা এ ছবিতে গৌণ। এই চরিত্রে অমর মুখোপাধ্যায় স্বর্গত জহর গাঙ্গুলির মতো অভিনয় করেছেন। চরিত্র ছবিতে অনেক, তবে চিত্রনাট্যে প্রায় সব ঘটনা ননীগোপালকে ঘিরেই রচিত। ননীগোপালের প্রেম এবং পরে বিয়ে সুসম্পন্ন করার জন্য এত ঘটনার প্রয়োজন ছিল না।

বরখা বাহার

অশোকা প্রোডাকশনস

শেষ পর্যন্ত যদি নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন ঘটানোই অভিপ্রায় ছিল, তবে মিছিমিছি টলস্টয়ের 'রেসারেকশন'-এর মত একটি বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীকে অবলম্বন করে ছবি করার দরকার কি? বরখা বাহার-এ রেসারেকশন-এর কাহিনীর আদলটাই আছে, নেই জীবন-উত্তরণের মহত্ত্ব। পরিচালক অমরকুমার দর্শকের তথা বক্স-অফিসের কথা একটু বেশি করেই ভেবেছেন। সেটা ভেবেই ছবিতে অনেকগুলি গানও রেখেছেন। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সুরারোপিত ওইসব গানের কয়েকটিতে সুরের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ঘটনা যখন গভীরে যেতে পারত তখন ওইসব গানের যথেচ্ছ প্রয়োগ ছবির ভালর চেয়ে মন্দই করেছে বেশি। সাধারণভাবে পরিচালকের কাজ পরিচ্ছন্ন। কিছু কিছু জায়গায় তাঁর সংযমও প্রশংসনীয়। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে নবীন নিশ্চল এবং রেখা দুজনেই মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছেন। আন্দামানের সেলুলার জেলে কয়েদীদের নিয়ে কিছু কমেডির দৃশ্যও আছে যা দেখে দর্শকরা মজা পান। তবে মন খারাপ হয়ে যায় তখনই যখন মনে পড়ে যায় টলস্টয় বর্ণিত বন্দীশিবিরের নানা মর্মান্তিক বর্ণনা। কী জিনিসের কী চিত্ররূপ।

পরলোকে বি এল খেমকা

বাংলা চলচ্চিত্রজগতের আর একজন প্রবীণ ব্যক্তি লোকান্তরিত হলেন। তিনি শ্রী বি এল খেমকা। গত ১১ ডিসেম্বর তিনি তাঁর কলকাতার কলেজ রো-স্থিত বাসভবনে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

শ্রীবজরংলাল খেমকার জন্ম রাজস্থানের রতনগড়ে (বিকানীর)। ১৮ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র হিসাবে কলকাতাকেই বেছে নেন। ১৯৩০ সালে তিনি ইস্ট ইনডিয়া স্টুডিও এবং ইস্ট ইনডিয়া ফিল্ম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলগু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় ছবি প্রযোজনা করেন। তাঁর প্রযোজনায় তোলা যমুনা পুলিনে, বিদ্রোহী, সোনার সংসার, হাল বাংলা, মানময়ী গার্লস স্কুল, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ইত্যাদি বাংলা ছবির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালে শ্রীখেমকা বেঙ্গল

...লম লেবরেটরিজ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী এস আর হেমাদ, শ্রী বি এন সরকার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে। কেবল চিত্র প্রযোজনাতেই নয়, শ্রীখেমকা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তাঁর কর্মধারা বিস্তৃত করেন। কলকাতার প্যারাডাইস চিত্রগৃহের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

এই কর্মী মানুষটির তিরোধানে চলচ্চিত্র জগতের বড় ক্ষতি হল সন্দেহ নেই। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা এবং তাঁদের সন্তানদের রেখে গেছেন।

নৃত্যনাট্য শ্যামা : দুটি প্রযোজনা

রবীন্দ্রনাথের চিরনূতন নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' যে বারবার দেখেও ক্লান্তি আসে না, তার কারণ এর প্রত্যেকটি গান এমন গভীর ভাব-ব্যঞ্জক এবং সমগ্রভাবে এর নাট্যরস এমন সংহত ও মর্মস্পর্শী যে প্রতিবারই তা নব নব রূপে যেন প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করে। সম্প্রতি পর পর দু সপ্তাহ 'শ্যামা'র অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। হিন্দী হাই স্কুল প্রেক্ষাগৃহে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক মানব অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'শ্যামা'য় সংগীতাংশে ছিলেন শ্যামা ও বজ্রসেনের ভূমিকায় যথাক্রমে কল্যাণী ঘোষ এবং অর্ঘ্য সেন। কল্যাণী ঘোষ শ্যামার অন্তর্বেদনার আকূতিক গানের মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। বজ্রসেনের গান চমৎকার গেয়েছেন অর্ঘ্য সেন। সেদিনকার সংগীতাংশ সখীর কণ্ঠে 'হায় একি সমাপন' গানটিও মর্মস্পর্শী করে পরিবেষণ করেছেন প্রভাতী ভট্টাচার্য।

'শ্যামা'র নৃত্যাংশের প্রধান দুটি ভূমিকায় সুমিত্রা মিত্র ও নরেশকুমার নিঃসন্দেহে দর্শকদের খুশী করেছেন। তবে নরেশ-কুমারের অভিনয়ে কোথাও কোথাও একটু আতিশয্য ছিল। সুমিত্রা মিত্রের স্বচ্ছন্দ নৃত্যকলা এবং সুন্দর অভিব্যক্তি 'শ্যামা'র চরিত্রটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। কোটালের ভূমিকায় শক্তি নাগের অভিনয়েও কিছু আতিশয্য ছিল কিন্তু সেখানে তার নৈপুণ্যেরও বিলক্ষণ পরিচয় থাকায় সমগ্র-ভাবে ভূমিকাটি বেশ উপভোগ্য বলেই মনে হয়েছে। উত্তীয়ের বেশে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহজেই দর্শকদের মন কেড়ে নেয়।

নৃত্যাংশের ভূমিকালিপি প্রায় একই ছিল রবীন্দ্রসদনে 'সাংগীতিকী' আয়োজিত 'শ্যামা' অভিনয়ে। তবে এই অনুষ্ঠানে উত্তীয়বধের পূর্ব মুহূর্তে শ্যামার অন্তর্দ্বন্দ্বটি পৃথক-ভাবে দেখানোর জন্য যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল সেটি নাটকের মধ্যে খুব সার্থকভাবে খাপ খেয়েছে বলে মনে হল না। সখীদের ভূমিকা এখানে অপেক্ষাকৃত সুঅভিনীত।

'সাংগীতিকী'র প্রযোজনায় সংগীতাংশ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। বজ্রসেনের সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সমাপ্তির মুহূর্তে অনুশোচনাদগ্ধ অন্তর্দাহ অতুলনীয় ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তেমনই ভাল গেয়েছেন সুমিত্রা সেন শ্যামার গানগুলি। শ্যামার প্রেমের গভীরতাটুকু তাঁর ব্যঞ্জনাময় সুরেলা কণ্ঠে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছিল। উত্তীয়ের গানে শৈলেন মুখোপাধ্যায় আর একটু আবেগের স্পর্শ রাখলে ভাল হত। কোটালের গানে রাখাল রক্ষিতের উচ্চারণ মাঝে মাঝে শ্রুতিকটু লেগেছে। সম্মেলক গানগুলি সুগীত।

আনন্দবর্ধন

"শর্মিলা" (পরিচালনা : সুনীল ঘোষ) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রাজশ্রী বসু

"সবুজ নক্ষত্র" (পরিচালনা : সুব্রত সেন) ছবিতে স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী

তুঘলক

সম্প্রতি কলামন্দিরে দক্ষিণ কলকাতার ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্য-বৃন্দ গিরিশ কারনাড় রচিত তুঘলক নাটকটি অরিজিৎ গুহ ও সুনীতি ভোসের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করলেন। মধ্যযুগের খামখেয়ালি নবাব রূপে পরিচিত মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস নিয়ে নাটকটি রচিত। এই নাটকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ শাসনকর্তারূপে চিত্রিত তুঘলক একটি বেদনাময় ট্র্যাজেডির নায়কের ভূমিকা

মিয়েছে। সুনীতি ভোসের সুন্দর কণ্ঠস্বর এবং সংবেদনশীল অভিনয়ে চরিত্রটি কোথাও কোথাও সজীব হয়ে উঠলেও সমগ্রভাবে, বিশেষত নাটকের শেষ দৃশ্যে, দর্শকদের মনে খুব গভীর দাগ কাটতে পেরেছে বলে মনে হল না। এর জন্য কেবল তাঁর নিজস্ব অভিনয়ই নয়, সম্ভবত দলগত অভিনয়ের ব্যর্থতা এবং উপস্থাপনার শৈথিল্যও কিছুটা দায়ী। দ্বিস্তর-বিশিষ্ট সুপরিকল্পিত মঞ্চ এবং পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য সত্ত্বেও এই কারণেই নাটকটি পরিপূর্ণভাবে যেন উতরোতে পারল না। এরই মধ্যে একমাত্র স্ত্রী-চরিত্রে মহম্মদের সংমার ভূমিকায় প্রণতা দেবী সুন্দর অভিনয় করেছেন। আলোর ব্যবহার ভাল, আবহ-সংগীতও যথাযথ।

'লাল নীল হলদে' (পরিচালনা : অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে অনামিকা সাহা

রবীন্দ্রসংগীতের একক অনুষ্ঠান

গত কয়েক বছর একক সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশনের যে একটি রেওয়াজ চলেছে তাতে ছোট-বড় নামী-অনামী বেশ কিছু শিল্পীকে যোগ দিতে দেখা যায়। এই সব আসরের সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। সুবিধা এই যে এতে শিল্পী বেশ কিছুটা সময় নিয়ে একটা বিশেষ 'মুড্' তৈরী করবার অবকাশ পান। অসুবিধার দিক এই যে এতে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি সহজ নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠানটি শ্রোতৃবর্গের কাছে ক্লান্তিকর মনে হতে পারে।

সম্প্রতি আকাদেমি অব ফাইন আরটসে 'সারস্বতে'র উদ্যোগে এই রকমেরই একটি আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্পী ছিলেন সনাতন সিংহ। অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে ছিল 'চারগুচ্ছে নানা ভাবনার গান'—শিরোনামায় বারোটি গানের সমাহার এবং দ্বিতীয়ার্ধে 'একক ভাবনাট্য—তারেই খুঁজে বেড়াই'—এই নামে আরো দ্বাদশটি গানের গুচ্ছ। সনাতন সিংহের গানের ভঙ্গিটি বেশ সাবলীল। কিন্তু গভীরতা কম, সুরের সূক্ষ্ম কাজেও তেমন স্বচ্ছন্দ নয় তাঁর কণ্ঠ। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের, শুধু রবীন্দ্রসংগীতই কেন—সব রকম গানে সঠিক লয়-নির্বাচন গানের অন্তর্নিহিত ভাবরসের অভিব্যক্তির পক্ষে এক অপরিহার্য শর্ত। এ-ব্যাপারেও শিল্পী সবগুলি গানের প্রতি ঠিক সুবিচার করতে পারেন নি। 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক', 'তুমি যে সুরের আগুন'—প্রভৃতি গান তিনি ভালই গেয়েছেন। কিন্তু 'আমি তোমার সংগে', কিংবা 'বিরহ মধুর হল'—এই জাতীয় গানের মর্মরস তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে বলে মনে হল না।

দুটি দিলরুবা এবং সরোদের সাহায্যে যন্ত্রানুষংগ নির্দেশনায় তিমিরবরণ যে রসবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিনকার অনুষ্ঠানে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতন।

আনন্দবর্ধন

ভারতের সনাতন সঙ্গীত

রবীন্দ্রসদনে 'অরূপ' আয়োজিত 'ভারতের সনাতন সংগীত' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের একক-শিল্পী হিসাবে হিমাংশু রায়চৌধুরী এ-দেশের গানের একটা ধারাবাহিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে যে গান প্রবহমান, তার রূপটি কেমন ছিল এবং বাংলা গানে তা ক্রমশ কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছে, সম্ভবত তারই কিছু উদাহরণ দেওয়া শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল।

ত্রয়োদশ শতকের গায়ক বলে উল্লেখিত নায়ক গোপালের শুদ্ধ বসন্তে গ্রথিত একটি ধ্রুপদ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। পরের গানটিও ধ্রুপদ এবং একই রাগে, রচয়িতা যদুভট্ট। এক্ষেত্রে কালানুক্রমিক ধারা বজায় রাখার কোনো চেষ্টা ছিল না, রাগের সাধর্ম্যের দিক থেকেই সম্ভবত গান দুটি পরপর শোনানো হল। এর পর দরবারী কানাড়া, জয়জয়ন্তী এবং বাগেশ্রী রাগে আরও কয়েকটি ধ্রুপদ শিল্পী গেয়ে শোনান যেসব গানের রচয়িতা ছিলেন হরিদাস স্বামী, বৈজুবাওরা, তানসেন প্রমুখ স্মরণীয় সংগীতকারগণ। গানগুলি ভারতের 'সনাতন সংগীতের' দৃষ্টান্তস্বরূপ তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুপদের মেজাজটি ফুটিয়ে তোলবার দিকে শিল্পী যত্নের ত্রুটি রাখেন নি। তবে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি একই তালে নিবন্ধ গান, যেগুলি গেয়েছেনও প্রায় একই ভঙ্গিতে, অনিবার্যভাবেই একটু বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়েছে। এই জন্যই 'শংকর মহাদেব' এবং 'হে অম্বা জগদম্বা' ভিন্ন তালে ও ছন্দে পরিবেশিত হওয়ায় বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবেশিত বাংলা গানগুলির মধ্যে টপ্পা অপেক্ষা গানগুলি শিল্পী সুন্দর মেজাজে গেয়েছেন। কল্যাণ রায়ের ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। শুকদেব সাহার এস্রাজ সংগত গানগুলির রসসৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। তবে একটা কথা। ঠুংরী, কীর্তন কিংবা দ্বিজেন্দ্রগীতি কি ভারতের সনাতন সংগীতের মধ্যে পড়ে না?

আনন্দবর্ধন

অতুল-দ্বিজেন্দ্র গীতি

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত একটি সংগীতানুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান শোনালেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষ থেকে নেতাজীভবনের অন্তর্গত নবগঠিত প্রেক্ষাগৃহ শরৎ বসু হলে প্রতি মাসে যে সংগীতানুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, আলোচ্য অনুষ্ঠান তারই প্রথম অধিবেশন।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় সেদিন প্রথমে অতুলপ্রসাদের যে গানগুলি শোনালেন, তার মধ্যে 'কে তুমি বসে নদীকূলে' শ্রোতৃবর্গ বিশেষ ভাবে মনে রাখবেন। 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'-ও নিঃসন্দেহে তিনি ভাল গেয়েছেন, কিন্তু পরের গানগুলিতেই যেন শিল্পী নিজের সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করে এক সুন্দর রসঘন পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

তবে সেদিন, যদিও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বিশেষত অতুলপ্রসাদের গান গেয়েই প্রধানত সকলকে মাতিয়ে এসেছেন, তাহলেও দ্বিজেন্দ্রলালের গানে যেন তিনি আরও স্বচ্ছন্দ, আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠলেন। চমৎকার গেয়েছেন 'প্রাণসখা এসো প্রাণে', আবেগে, অনুভবে উজ্জ্বল করে পরিবেশন করেছেন 'সে কেন দেখা দিল রে'। সব মিলিয়ে আগাগোড়া একটি সুন্দর ভাবময় পরিবেশ-রচনায় এই নবগঠিত স্বল্পপরিসর অথচ আধুনিক পদ্ধতিতে সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহের ভূমিকাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

আনন্দবর্ধন

অরণ্যদেব লী ফক
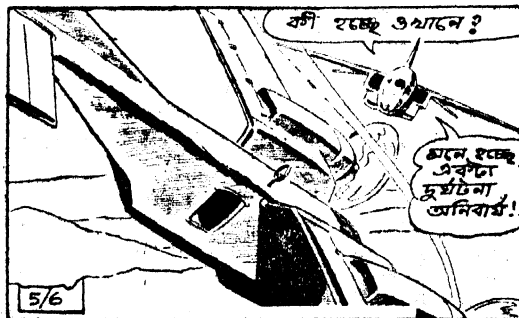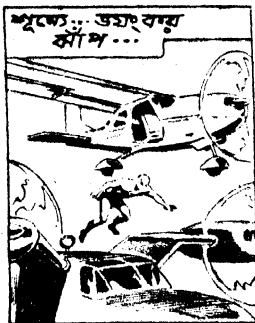
দেখেছ?
অবিশ্বাস্য! ওই প্লেনের থেকে একটা লোক নীচের সী-প্লেনটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!
কী চায় লোকটা?
??!!

ব্যাপারটা কী, বলো তো?
ডেনি আর সেই মেয়েটা কোথায়? তারা ঝাঁপ দিচ্ছে না কেন!

শূন্যে... ভয়ংকর ঝাঁপ...

!
!

কে তুমি? আ...
পরিচয় এক্ষুনি পাবে!

এই হচ্ছে কাউন্ট পেপি... এই লোকটাই তোমাকে এই অকাজের মধ্যে জড়িয়েছে!
হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কী করে...?
আ...
!

আর মেরো না-- আর মেরো না আমাকে...
বটে!

কী হচ্ছে ওখানে?
মনে হচ্ছে, একটা দুর্ঘটনা অনিবার্য!
5/6

ওই আসছে প্লেনটা।
ঝাঁপ দিচ্ছে না কেন?
অ্যাকসিডেন্ট ঘটতে যাচ্ছে... পালাও...
১২

হাসপাতালে কর্মবিরতি বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। এক সপ্তাহেরও বেশী এই কর্মবিরতি চলছে। বৃত্তিভোগী ডাক্তারদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক ডঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন ঃ তাদের এই আন্দোলন সরকার বিরোধী কোন ব্যাপার নয়। তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন নিছক তাঁদের কতগুলি ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য এবং পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানাতে। বৃত্তিভোগী ডাক্তার ও হাউস স্টাফদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধর্মঘটকারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মবিরতির মীমাংসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি ফরমুলা দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃবসু কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন আগামী ২৬ জানুয়ারির মধ্যে রিপোরট পেশ করা হয়। বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ঃ—বসু কমিটি এ সম্পর্কে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একদল এম-এল এ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান ঃ—অবস্থার মোকাবিলায় জন্য মিলিটারি ডাকুন; এই কর্মবিরতি বেআইনী ঘোষণা করুন। হাউস স্টাফ ও ইনটার্নিদের কর্মবিরতি বিষয়টি নিয়ে সোমবার (১৭ জানুয়ারি) স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তারপর যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবেন।

দেশী সংবাদ

১০ ডিসেম্বর—চার লক্ষ টাকায় কেনা টুইন এনজিন চেকোশ্লাভ বিমান 'মোরাভা' মোট ৩২ ঘণ্টা সরকারী কাজে ব্যবহার করেই রাজ্য পরিবহণ দফতর ৭৫ হাজার টাকায় বেচে দিলেন। কিনেছেন বোমবাইয়ের এক ব্যবসায়ী। আবার ৭৮ লক্ষ টাকা দিয়ে দুটি নতুন হেলিকপটার কেনা হচ্ছে।

কলকাতা সহ রাজ্যের সকল বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় আগামী রেশন সপ্তাহ (মঙ্গলবার) থেকে ২৫০ গ্রাম হিসাবে চালের বরাদ্দ বাড়ানো হবে। অর্থাৎ রেশন গ্রাহকরা সপ্তাহে মাথাপিছু এক কিলো করে চাল পাবেন।

১১ ডিসেম্বর—খাদ্য দফতরের কি সব দিকেই ভাঁড়ে মা ভবানী? করপোরেশন ট্যাকস বাবদ দেওয়া তাঁদের মাত্র আট হাজার টাকার একখানি চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে। চেকটি খাদ্য দফতর দিয়েছিলেন কলকাতা করপোরেশনের টালিগঞ্জ অফিসকে।

১২ ডিসেম্বর—গোষ্ঠী নিরপেক্ষ কিছু কংগ্রেস এম এল এ স্থির করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা ফিরলেই তাঁর কাছে দুটি দাবি জানাবেন। প্রথম দাবি যেসব মন্ত্রী ও এম এল এ-র বিরুদ্ধে মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে অবিলম্বে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এবং দ্বিতীয় দাবি। কলকাতায় যে মুষ্টিমেয় তথাকথিত কংগ্রেস নেতা পার্টির শৃঙ্খলা ভাঙছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৬০ মানিকতলা মেইন রোডে সরকার কিস্তি ক্রয়ের ভিত্তিতে ৭২০টি ফ্ল্যাট সমন্বিত বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে। চলতি মাসেই নির্মাণ কাজ শুরু এবং ২ বছরের মধ্যে তা শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

১৩ ডিসেম্বর— কলকাতায় অবস্থিত পশ্চিম বাংলার শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনকে ৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটগুলি পশ্চিম বাংলার অনগ্রসর অঞ্চলে স্থাপন করা হবে। আজ রাজ্যসভায় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী এই কথা জানান।

কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ পি সিনধে আজ রাজ্যসভায় বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার ১৭ শতাংশ বেশি খাদ্যশস্য বাজারে এসেছে। শ্রীসিনধে বলেন, বাজারে যে হারে খাদ্যশস্য আসছে, তাতে মনে হয় এ বছর খাদ্য পরিস্থিতি সহজ হবে।

১৪ ডিসেম্বর—সিগারেট টানার জন্য রাতে যাঁদের ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আছে। তাঁদের ফুসফুসে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গিয়েছে।

রাজ্য সরকার কলকাতা পুরসভার কাছে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পান। রাজ্য অর্থ দফতরের জনৈক মুখপাত্র এই কথা জানান। রাজ্য সরকারের কাছে পুরসভার অনেক টাকা পাওনা আছে বলে সম্প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১৫ ডিসেম্বর—বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে রাজ্য কৃষি দফতরের অধিকর্তা ডঃ এ কে দত্তকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তদারকি কমিশনের রিপোরটের ভিত্তিতে সাসপেনড করেছেন। শ্রীদত্তের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছিল আদালতেই তার কয়েকটির ক্ষেত্রে কেস আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতা করপোরেশনের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে। বছরে বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে বাজেটে প্রারম্ভিক তহবিলে ঘাটতি। এই ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রারম্ভিক তহবিলে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের গোড়ায় তা ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর—পশ্চিম ও উত্তর রেলপথের লোকো কর্মীদের দীর্ঘ দিনের ছয় দফা দাবি যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মেনে নেওয়া না হয়, তবে সারা দেশের ৭৫ হাজার লোকো রানিং কর্মী ওঁদের সহানুভূতিতে ধর্মঘট করবেন। এই চরমপত্র রেলমন্ত্রীকে দেওয় হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা শ্রীজগজীবন রাম আজ কলকাতায় বলেন, কংগ্রেসের খোলা দরজা দিয়ে অনেক আজে-বাজে লোক সংগঠনে ঢুকে পড়েছেন। কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের মমতা নেই। তারা তো দলের ক্ষতি করবেনই।

বিদেশী সংবাদ

১০ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের যে খবর আজ সরকারী সূত্রে পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় অন্তত ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং দুশো জেলে ডিঙ্গি নিখোঁজ হয়েছে। ওই দুশো জেলে ডিঙিগতে এক হাজার ধীবর ছিলেন, তাঁদেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

১১ ডিসেম্বর—পররাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরি কিসিংগারকে তাঁর ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময় গোপনে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে এই মর্মে ওয়াশিংটনে খবর পাওয়া গিয়েছে। ফলে ডঃ কিসিংগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে।

১২ ডিসেম্বর—বালুচ এবং পাখতুনদের মধ্যে সংহতির জন্য গতকাল প্যারিসে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বালুচদের দমনের জন্য পাকিস্তান এবং ইরানের নিন্দা করেছে। এই কমিটি অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ সহায়ক কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর—রাশিয়া তার সামরিক ব্যয় কমানোর কথা ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের জাতীয় বাজেটের ৯·১ শতাংশ এই ব্যয় কমিয়ে আনা হবে। ১৯৭৩ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সরকারী ব্যয়ের ৯·৯ শতাংশ।

১৪ ডিসেম্বর—কায়রোর আল-আহরম পত্রিকা আজ এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, ক্রেমলিনে শীঘ্রই নেতৃত্বের রদবদল এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের জায়গায় শ্রীকিরিল মজুরোভ প্রধানমন্ত্রী হবেন।

১৫ ডিসেম্বর—উগ্রপন্থীরা আজ রাত্রে ঢাকার মতিঝিলএলাকায় ইনডিয়ান এয়ারলাইনস অফিসে হানা দেয়। তারা আসে একটি জিপে করে। এয়ারলাইনস অফিসে ছোড়া তাঁদের তিনটি মোলোটভ ককটেলের দুটি ফাটলেও কেউ আহত হয়নি। কেননা অফিসে সেই সময় কেউ ছিলেন না।

১৬ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের ২২ বছরের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল গতকাল মাঝ রাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রয়েছেন। ভুলক্রমে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরিচয় বা নাম জানা ছিল না বলেই এ ভুল হয়েছে।

বিরল শোভায় সুষমা শোভনা
শর্মিলা ঠাকুর
বোম্বে
ডাইং
শাড়ীতে
বোম্বে
ডাইং-এর নতুন
সমারোহে দীপ্তিময়ী
শর্মিলা ঠাকুর।
চিত্তজয়ী
১০০% পলিয়েস্টার,
রেলিকা ১০০%
পিওর কটন, সুইস
ভয়েল ও ভয়েল।
BD 6738

Cover Printed by Ananda Offset Private Ltd.—Calcutta - 54.

বর্ষ] শনিবার, ২১ পৌষ, ... DESH Saturday, 5th January, 1974 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা ১০

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী
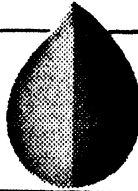
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম আঠারো টাকা।

সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গ্রাহকগণ টাকা পিছু কুড়ি পয়সা ক[illegible]ন।

যাযাবরের

হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবীর

এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত

সোনা রূপা নয় ১৫৲

বিমল মিত্রের

আসামী হাজির (১ম ... ১৫৲, ২য় ... ১৫৲)

কলকাতা থেকে বলছি ৬॥

একক দশক শতক ১৮৲

কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩৮৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৮৲

ভাগবতী তনু ১০৲

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ ১ম ১০৲

গৌরাঙ্গ পরিজন ১০৲

শংকরের

স্থানীয় সংবাদ ৬৲

সীমাবদ্ধ ৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

হাসপাতাল ৮॥ তালপাতার পুঁথি ২২৲ কলঙ্ককথা ৬॥

ময়ূরমহল ৬৲ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৮৲

রাতের রজনীগন্ধা ৫॥ **অশান্ত ঘূর্ণী ৮৲**

আশাপূর্ণা দেবীর

যার যা দাম ৫৲

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

শিলাপটে লেখা ৮৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

মণিমহেশ ৬॥

হিমালয়ের পথে পথে ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কান পেতে রই ১৪৲

একদা কী করিয়া ১৩৲

উপকণ্ঠে ১০৲ বহ্নিবন্যা ১১৲

জরাসন্ধের

নিঃসঙ্গ পথিক ১০৲

লোহকপাট ২০৲

ছায়াতীর ৫॥ ছবি ৪৲

তারাশংকরের

উত্তরায়ণ ৫॥

গন্নাবেগম ৯৲

১৯৭১ ৬॥ কবি ৬॥

পেপারব্যাক ক্লাসিকস্‌

বিভূতিভূষণের

পথের পাঁচালী (১ম মুদ্রণ নিঃশেষিত) ৪৲

গজেন্দ্র মিত্রের

কলকাতার কাছেই ৪৲

প্রমথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৬৲

বনফুলের

স্থাবর ৬৲

অন্নদাশংকরের

পথে প্রবাসে ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৩।।০

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ ৪৲

বিখ্যাত বইগুলি সম্পূর্ণই এই সুলভ সংস্করণে ছাপা হয়েছে। শুধু কাগজের মলাট—এই তফাৎ। তেমনি দুইদিক জোড়া সুন্দর মলাট, ভাল কাগজ।

বিমল করের

সেতু ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কৈলাসের পাটরানী ৩৲

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

গগনেন্দ্রনাথ ৬॥

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ৮৩।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, ক[illegible]

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়: ২০০ মি. লি. ও ৪০০ মি. লি.।

নতুন! ফসফোমিন আয়রন—মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB® SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন কারটার প্রেমটার প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
® ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/78 Beng

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০

শনিবার ২১ পৌষ ১৩৮০

Saturday 5 January 1974

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা

শিক্ষা নিয়ে আমাদের এখানে কী ধরনের অরাজকতা চলেছে তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে নতুন বছরে স্কুল সেসান শুরু হবার পর। নতুন বছরে যে পাঠক্রম চালু হবে সেটা দশ বছরের স্কুল-শিক্ষা। অর্থাৎ এগারো বছরের চলতি ব্যবস্থাটা উনিশশো পঁচাত্তর সালের পর আর থাকছে না, কাজেই এখন যেসব ছাত্রছাত্রী দশম বা একাদশ শ্রেণীতে রয়েছে তারা মোটামুটি বেঁচে গেলেও নতুন পাঠক্রম অনুসারে নবম শ্রেণীতে যাদের পড়তে হবে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট মানের পাঠ্যবই পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কেন এমন অবস্থা হল সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৭৪ থেকে নতুন পাঠক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বিষয় অনুসারে নতুন পাঠ্য-সূচী বা সিলেবাস স্থির করতে বছরের আটটা মাস কাটিয়ে দিলেন। তিয়াত্তর সালের আগস্ট মাস নাগাদ তাঁরা সিলেবাস দিলেন প্রকাশকদের, তাও আবার অসম্পূর্ণ। ওই সিলেবাস নভেম্বর মাসে আবার একদফা সংশোধন করা হল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কি ভেবেছিলেন জানি না, তাঁদের হয়ত ধারণা ছিল— পাঠ্য-পুস্তক রচনা এবং প্রকাশ করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, দু একটা মাস হাতে পেলেই প্রকাশকরা রাতারাতি বই লিখিয়ে তা ছেপে ফেলতে পারবেন এবং জানুয়ারি মাসের গোড়ায় তা বাজারে যথারীতি দেখা যাবে। পর্ষদ-কুলের বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

ব্যাপারটা যে অত সহজ নয় এবং তা বাস্তবে সম্ভবও নয়—এই কথাটা যখন প্রকাশকদের তরফ থেকে জানানো হল তখন পর্ষদ নীরব। কিছুটা সদয়ও হয়ে পড়লেন। পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হল—নতুন পাঠক্রমে যাদের পড়তে হবে তাদের মধ্যে নবম শ্রেণীর ভাষা সম্পর্কিত সিলেবাস ও নির্দেশ ছাড়া অন্য কোনো পাঠ্য-পুস্তকের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই. স্কুলগুলি যে যার নিজের মতন পাঠ্যবই অনুমোদন করে নিতে পারেন। দেখা যাচ্ছে, এই নির্দেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার স্কুল নিজেদের খেয়াল খুশি-মতন যে কোনো বই অনুমোদন করতে পারবেন, এবং স্বভাবতই কোনো সাধারণ মান থাকবে না, ভাল মন্দ মাঝারি সবই বাজারে চলে যাবে। ভুল ভ্রান্তিতে ভরা নিম্নমানের বইও পাঠ্য হয়ে থাকবে।

প্রকাশকরা বলেছেন: তাঁরা বরাবর জানিয়েছেন, এত দ্রুত তাঁদের পক্ষে পাঠ্যবই রচনার ব্যবস্থা ও প্রকাশ সম্ভব নয়। বাজারে কাগজ পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া যায় তার দাম অবিশ্বাস্য রকম বেশী। বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্যে ছাপাখানার কাজ অনিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ে বই প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এর ওপর রয়েছেন পাঠ্য পুস্তকের লেখকরা। যাঁরা বাজারে চলতি লেখক, নামকরা লেখক, তাঁদের পক্ষে এত অল্প সময়ে বই লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। এমন কি অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে তা এঁদের দিয়ে সংশোধন করানোর সময় পর্যন্ত নেই। কাজেই কোনো রকমে বই ছেপে ফেলে ছাড়া প্রকাশকদের আর কি করার থাকতে পারে! যে-কাজ যত্ন করে করতে হলে সাত-আট মাস সময় লাগে, মাত্র দু-তিন মাসে তা এঁরা করে ফেলছেন এই না যথেষ্ট!

অবস্থাটা তা হলে কেমন দাঁড়াচ্ছে আশা করি কারুরই বুঝতে অসুবিধে হবে না। পর্ষদের গাফিলতি, অকর্মণ্যতা, প্রকাশকদের পেটের দায়, লেখকদের কোনো রকমে দায়সারা কাজ আর স্কুলে মাস্টারমশাইদের নেক নজরের ওপর নতুন পাঠক্রমের গোড়া পত্তন হচ্ছে। যাঁদের হাতে শিক্ষার দায়দায়িত্ব নির্ভর করছে তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং ঔদাসীন্য লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর যে ক্ষতিসাধন করল তার দিকে কারও নজর পড়ল না, পড়বেও না।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম ৎ ৫০ পয়সা
[illegible]

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শ্রীঅভিজিৎকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০

চাঁদার হার
ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৩৬·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	১৮·৫০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	৯·৫০

[illegible] ও [illegible]
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৪৪·০০
ষান্মাসিক	— টাঃ	২২·৫০

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	[illegible]
ষান্মাসিক	— টাঃ	৪৪·০০
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	২২·০০

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	— টাঃ	৫০·০০

[illegible]

বার্ষিক	— টাঃ	[illegible]
ষান্মাসিক	— টাঃ	[illegible]
ত্রৈমাসিক	— টাঃ	[illegible]

ধূমকেতু

পোড়ার লড়াই

শ্মশান... জ্বালানির অভাবে...কলকাতার শ্মশানঘাটে মড়া পোড়ানোর যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাসী-মড়ার সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। এ জনকল্যাণ ও মড়াজাতির লাঘব করার মানসে অতীতে যাঁরা নতুন মনে ভেবেছিলেন, যাক এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, মড়ার পরও যে তাঁরা এইরকম একটা ফ্যাসাদে পড়বেন, এ কেউ ভাবতেই পারেন নি। কেওড়াতলা, নিমতলা, কাশী মিত্রের ঘাট, কাশীপুর রতনশ্মশান ইত্যাদি স্থানে কাঠের অভাবে দাহ-কার্যে এত বিলম্ব ঘটছে যে, স্বভাবত শান্ত এবং শিষ্ট মড়াগণও ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। পূজো মরশুমের প্রাক্কালে রেলের বুকিং অফিসে কিংবা টেস্ট ক্রিকেটের টিকিট কাউন্টারে, অথবা রাশিন দোকানের সামনে কিংবা বক্স-অফিস-হিট হিন্দী সিনেমার জন্য যে-রকম লম্বা লম্বা লাইন পড়ে, শ্মশানে শ্মশানে মড়াদেরও আজকাল সেই রকম লাইন দিয়ে ভবপারে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

নিমতলা শ্মশানঘাটেই কাঠের ক্রাইসিস চরমে উঠেছে। তাই বিক্ষুব্ধ মড়াগণ তাঁদের দাবি পূরণের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ঘাটবাবুকে ঘেরাও করেছেন। সংগ্রামী মড়াগণ তাঁদের আন্দোলন সফল করার উদ্দেশ্যে নিমতলা-ঘাটে এক সর্বদলীয় বাসী-মড়া সংগ্রাম পরিষদও গঠন করেছেন।

বাসী-মড়াদের এক মুখপাত্র সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, মড়া হয়ে আজ যে কি ঝঞ্ঝাটে আমরা পড়েছি, আপনারা যাঁরা বেঁচে আছেন, ঠিকমত তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। কাঠের অভাবে আমাদের দাহ হচ্ছে না। অনির্দিষ্টকাল আমাদের ঘাটের মড়া হয়ে এই শ্মশানের চত্বরে পড়ে থাকতে হচ্ছে। ফলে আমরা নির্বাণ সাযুজ্য হবার চান্সও পাচ্ছি না। সেই কারণেই মৃত্যুর পর পিণ্ড ইত্যাদি অর্থাৎ আমাদের যা ন্যায্য পাওনা, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

বাসী-মড়াদের ঐ মুখপাত্র তাঁদের এই দুর্গতির জন্য সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন। এবং এই কথাও ঘোষণা করেন, অবিলম্বে তাঁদের দাবি মানা না হলে, অর্থাৎ কিনা পোড়াবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে, তাঁরা তাঁদের সংগ্রামী আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না। অন্যান্য শ্মশানে অপেক্ষমাণ বাসী-মড়াদের উদ্দেশে সর্বদলীয়-বাসী-মড়া সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে যে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এ লড়াই পোড়ার লড়াই, কাজেই এই লড়াই-এর সঙ্গে সকল মড়ার ভাগ্যই জড়িত। সেই কারণেই আজ মড়াদের শুধু মরে গেলেই ... ফুরিয়ে যাচ্ছে না। ... দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই হবে যাবার ... অধিকারটুকু আদায়

করার পবিত্র দায়িত্বও আজ নিজেদের হাতে তুলে নিতে হচ্ছে। আমাদের সংগ্রাম এই দায়িত্ব পালনেরই সংগ্রাম। তাই এই সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য গ্রাম ও নগরের দাহযোগ্য সকল মড়াকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এবং লাগাতার সংগ্রাম করে যেতে হবে।

ঘেরাও-এ অবরুদ্ধ ঘাটবাবু মড়া পোড়াবার কাঠের অভাবের কথা স্বীকার করলেন। তিনি জানালেন, গত ৩৫ বছরের মধ্যে কাঠের এইরকম ক্রাইসিস দেখা যায় নি। তিনি এও বললেন যে, মড়াদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। চল্লিশ বছর ধরে তিনি ঘাটবাবুর চাকরি করছেন। কাজেই, ঘাটবাবু হিসাবে মড়াদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকদিনের। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান তাঁর হাতে নেই। এ কথা নেতৃস্থানীয় মড়ারাও জানেন। তবু তাঁরা তাঁকে ঘেরাও করে রেখে কেন যে হয়রান করছেন, তা তিনি বুঝতে অক্ষম। আজীবন মড়াদের সেবা করে এসে শেষকালে সেই মড়াদের হাতেই যে তাঁকে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। সবই কপাল!

ঘাটবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখলাম দু দল শ্মশানবন্ধু সেখানে এসে গেলেন। এক দল বললেন, নিমতলার মড়ার লাইন চিৎপুর ক্রস করে মিনার্ভা থিয়েটার পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তাঁরা ঐখানেই তাঁদের মড়া রেখে খবর নিতে এসেছেন। ঘাটবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, নিমতলায় আর আনছেন কেন দাদা, কাশী মিত্তিরে ট্রাই নিন না। শ্মশানবন্ধুরা বললেন, আরে মশাই, নিমতলাও চিনি, কাশী মিত্তিরও চিনি। ট্রাই কি আর নিইনি! সেখানকার লাইন বাগবাজার দিয়ে শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে। কেওড়াতলার লাইন শুনেছি বায়স্কোপ ছাড়িয়ে বড়বাজার ধর-ধর। কদিনের মধ্যেই ডায়মন্ড হারবার ছুঁলো বলে। মড়া কাঁধে কত আর ঘুরব?

অপরেক দল বললেন, তিন দিন আগে যাঁকে সৎকারের জন্য এনেছিলাম, তিনি দশ মশাই এখনও চিতায় চড়েন নি, অথচ তাঁর মেয়েরা তাঁর শ্রাদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

আরেকজন বললেন, না পুড়িয়ে শ্রাদ্ধটা কি শাস্ত্রসিদ্ধ হচ্ছে! নিয়মটা মানতে হবে তো, না কি?

অরিজেনজল ... এখনো ... দিয়ে যাঁদের ... করার জন্য ... ফ্যামিলিও তাঁদের কাঠ-কয়লার ... দিয়ে, এখন খোঁজ খোঁজ নিয়ে রাখুন, কবে কাঠ আসবে।

এই সংকটের কথা ক্রাইটেরিয়ন রিলিজ-এ খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রীর গোচরে আনা হলে তিনি অবশ্য বললেন, জনগণ ভাইটি, এ বিষয়ে আমি জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছি। ডিক আমাকে বারবার বলেছেন, ব্যাপারটা তদন্ত কর। করে আমাকে রিপোর্ট দাও। আমি ডিককে বলেছি, ডিক, তোমার ঘাড়ে এখন এত ঝঞ্ঝাট, তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওটা আমার উপরই নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দাও। তাই হল। আমিও তদন্ত করলাম। শ্মশানে কাঠের অভাব হয়েছে বটে, তবে অবিলম্বে কাঠ সরবরাহের জন্য আমরা ডিপার্টমেন্টালি খুব প্রম্পট অ্যাকশন নিয়েছি। বন্ধুরাষ্ট্রের কাছে আমরা কাঠ চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। তাঁরাও দিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু সে কাঠ আসতে পারবে না, কেননা খিদিরপুরে ডক এখন ডকে উঠেছে। জাহাজ ভিড়তে পারছে না। তাই আমরা ঠিক করেছি স্বনির্ভরতার উপরই জোর দেব। এই পঞ্চবার্ষিক যোজনায় আমরা রাজ্য যোজনা দফতরকে দিয়ে, মড়া পোড়ানোর কাঠ সরবরাহ বৃদ্ধির একটা খসড়া-প্রকল্প তৈরি করব। এবং সেই খসড়াটা যাতে কেন্দ্র যোজনায় অগ্রাধিকার পায়, তার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করব। যদি কেন্দ্র যোজনায় অগ্রাধিকার তালিকায় মড়া পোড়ানোর কাঠ সরবরাহ বৃদ্ধির প্রকল্পটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তবে সরবরাহ মন্ত্রী হিসাবে আমি এ গ্যারান্টি দিতে পারি যে, সপ্তম যোজনায় আমরা জরুরী ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণের কয়েকটা পাইলট প্রজেক্ট শুরু করে দিতে পারব। আমার আশা আছে, অষ্টম যোজনার শেষ বছর থেকেই শ্মশানে শ্মশানে কিছু কিছু কাঠ আসতে শুরু করবে।

প্রশ্ন : ততদিন এই মড়াগুলোর গতি কি হবে?

উত্তর : এরা ততদিন অপেক্ষা করবেন। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মড়াদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলব, জনগণ ভাইটি, আপনারা দেশের এই সংকটে বিরোধ ভুলে যান। আন্দোলন তুলে নিন। যাঁরা মরেছেন তাঁরা দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিন যতদিন না আমাদের স্বনির্ভর অর্থনীতির কাঠ শ্মশানে আসছে, ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। আর যে-সব জনগণ ভাই না মরে এখনও রয়েছেন, তাঁদের কাছেও অনুরোধ ... ধরে ... কাঠের সংকট দূরীকরণ ...।

দেবরাজ

পয়লা বৈঠক

মার্কিন সচিব ডঃ কিসিংগারের কেরামতির তারিফ করতে হয়। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইয়েছেন তিনি জেনিভায়। শান্ত শিষ্ট হয়ে তারা এক সঙ্গে শুধু জলই খায়নি জলপান শেষ হবার পরও দিব্যি খোশ মেজাজে আছে। ইস্রায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর যা সম্পর্ক তাতে তাদের এক সঙ্গে একই বৈঠকে বসে শান্ত হয়ে আলাপ-আলোচনা করা তো এক আশ্চর্য ঘটনা। বৈঠক শেষ হবার পর তারই জের টেনে আর এক দফা আলাপ-আলোচনা চালাতে রাজী হওয়াও কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। চারটে লড়াই হবার পর পশ্চিম এশিয়ার জট খোলবার কৌশল কি খুঁজে পেয়েছে আরবরা আর ইহুদিরা? সে কৌশলের হদিশ তাদের কি দিয়েছেন চতুর কূটনীতিক ডঃ কিসিংগার? রুশ বিদেশ মন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকও কি সায় দিয়েছেন কিসিংগারের সে শান্তি প্রস্তাবে?

এ সব জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে খ্রীস্টীয় নতুন বছরের শুরুতে যখন আবার আলোচনা আরম্ভ হবে পশ্চিম এশিয়ার শান্তি বৈঠকে। পয়লা বৈঠক বসেছিল দুদিনের জন্যে জেনিভার ডিসেম্বরের একুশে আর বাইশে। আগে অবশ্য ঠিক হয়েছিল সে বৈঠক বসবে তারও আগেই ডিসেম্বরে। তোড়জোড় সেই ভাবেই চলছিল। গোড়ায় কিন্তু গণ্ডিক সন্ধির কাজ শুরু হয়নি। মিশর নরম হলেও সিরিয়া ইস্রায়েল হয়নি। ইস্রায়েলী বন্দীদের ফর্দ সিরিয়া এখনও কাউকে দেয়নি। ইস্রায়েল হুমকি দিয়েছিল সে ফর্দ না পেলে জেনিভায় সে লোক পাঠাবে না। ডর হচ্ছিল বৈঠক হয়তো বসবেই না যদিও জেনিভাতে শান্তি বৈঠক বসানো যুদ্ধবিরতি চুক্তিরই একটা শর্ত আর সে শর্তে যারা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করেছে তারা সবাই মানতে বাধ্য। সোজাসুজি কথার খেলাপ করতে কেউই হয়তো চাইবে না। অনেকে তাই বলেছিলেন বৈঠক একটা বসবে ঠিকই কিন্তু বসতে না বসতেই তা বানচাল হয়ে যাবে, কেন না কী আরবরা, কী ইহুদীরা কেউই নিজেদের গোঁ ছাড়তে রাজী হবে না এমনই তাদের ধনুক ভাঙা পণ।

কিন্তু শত্রু-মিত্র সকলকে তাক লাগিয়ে বৈঠক ডঃ কিসিংগারের মুখ রেখে বসেছে জেনিভাতেই, চলেছেও রুটিন-মাফিক নির্বিবাদে, নির্ঝঞ্ঝাটে। মুখরক্ষে হয়েছে কেবল ডঃ কিসিংগারেরই নয় মিশরের রাষ্ট্রপতি সাদাতের আর ইস্রায়েলের প্রধান-মন্ত্রী গোলডা মেয়ারেরও। বৈঠক আপাতত তাঁদের দুজনের কারুরই ছিল না—তবে সাদাত চেয়েছিলেন বৈঠকটা হোক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে— লড়াই থামিয়েছেন তাঁরাই, যুদ্ধবিরতির শর্তও তাঁরাই মঞ্জুর করেছেন অতএব ফয়শালার ভার তাঁদেরই নেওয়া উচিত এই ছিল তাঁর কথা। শ্রীমতী মেয়ারের কিন্তু জাতিপুঞ্জের নামে হৃৎকম্প হয়। সেখানে তাঁর দরদী বন্ধু বলতে তো চারটে দেশ—আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগাল আর স্পেন। এদের মধ্যে এক আমেরিকা ছাড়া কেউ তো আর নিরাপত্তা পরিষদে নেই। কাজেই তাঁর মতে জেনিভা বৈঠকের দায়-দায়িত্ব জাতিপুঞ্জের হাতে তুলে দেওয়া আর হাড়িকাঠে মাথা গুঁজে দেওয়া একই ব্যাপার। প্রাণ গেলেও ও প্রস্তাবে তিনি রাজী হবেন না এই ছিল তাঁর সাফ জবাব।

জেনিভা বৈঠকের যে আগের ঘোষণা মত ১৮ ডিসেম্বর বসেনি তার কারণ সে বৈঠকে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে আরব আর ইহুদীদের মধ্যে মতভেদ প্রবল। কিন্তু উপায় একটা বের করে ফেললেন ঝানু কূটনীতিক ডঃ কিসিংগার। তাতে আরবদের মানও রইলো, ইহুদিদের কুলও। তিনদিকে দুটো আরব রাষ্ট্র আর ইস্রায়েল ঘুরে তিনি মিশর, জর্ডান আর ইস্রায়েলকে দিব্যি পটিয়ে ফেললেন। তারা সবাই রাজী হলো জেনিভা বৈঠকে যোগ দিতে। বাগ মানলো না খালি সিরিয়া। তার মতে ও বৈঠকটা ভুয়ো—ওতে লাভ হবে না আরবদের একটুও, ইস্রায়েলের সুবিধে করে দেওয়ার জন্যেই আমেরিকা ওটি ডেকেছে, তার পিছু পিছু রুশিয়াও হাজির হচ্ছে নিজের মান বাঁচাতে. না বুঝে ফাঁকে পা দিয়েছেন মিশরের সাদাত। সিরিয়াকে দলে টানতে চেষ্টার কসুর করেন নি ডঃ কিসিংগার, কিন্তু টলাতে পারেন নি রাষ্ট্রপতি আসাদকে। সিরিয়াকে বাদ দিয়েই তাই বৈঠক হয়েছে যদিও অক্টোবরের লড়াইয়ে তাদেরই খোয়া গেছে সবচেয়ে বেশী এলাকা—তার একটা হেস্তনেস্ত না হলে পশ্চিম এশিয়াতে শান্তির বনিয়াদ কখনই পাকা হতে পারে না।

জেনিভা বৈঠকে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি ছিলেনও বটে আবার ছিলেনও না। বৈঠক বসার দেব নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় নিরাপত্তা পরিষদের যে দরোজা বৈঠকে তাতে ছয় স্থায়ী সদস্য—আমেরিকা, রুশিয়া, ব্রিটেন আর ফ্রান্স কোনও ভোট দেয়নি। চীন তো ব্যাপারটাকে রুশ মার্কিন শয়তানি বলে বৈঠকে অংশ গ্রহণই করেনি। বোঝা যাচ্ছে বৃহৎ শক্তিদের ব্যাপারটা পুরোপুরি রাষ্ট্র-পুঞ্জের আওতায় আনতে আপত্তি আছে। আবার সব দায়িত্বই ঘাড় পেতে নিতে দুই প্রধানের ইচ্ছে নেই। তাই একটা আপসের পথ বাতলে দিয়েছেন ডঃ কিসিংগার যা অনেকেরই মনে ধরেছে। বৈঠক ডাকা হয়েছিল জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে। তার মহাসচিব কুর্ট ভালডহাইম সভাপতি ছিলেন পয়লা বৈঠকে। এরপর কিন্তু পালা করে সভাপতি হবেন রুশিয়া আর আমেরিকার দুই প্রতিনিধি—রুশ বিদেশ মন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো আর মার্কিন সচিব ডঃ কিসিংগার। এ ব্যবস্থায় মিশরের মুখও রইলো, আবার ইস্রায়েলেরও। সোজাসুজি বৈঠকে নাক গলাবার সুযোগ জাতিপুঞ্জকে দেওয়া হলো না। ওদিকে আর সবাইকে বাদ দিয়ে দু প্রধানের ওপরও সব দায়িত্ব বর্তালো না। অক্টোবরের লড়াইয়ের মতো কূটনীতিক লড়াইয়েও ফল সমান সমান হয়েছে।

জেনিভা বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতি-পুঞ্জের মহাসচিব ছাড়া পাঁচ দেশের পাঁচ বিদেশ মন্ত্রী—রুশিয়ার আঁদ্রে গ্রোমিকো, আমেরিকার ডঃ কিসিংগার, মিশরের ইসমাইল ফাহমি, জর্ডানের আবদেল মোনেম এল রিফাই (তিনি অবশ্য প্রধানমন্ত্রীও), আর ইস্রায়েলের আব্বা এবান। সিরিয়ার জন্য একটা চেয়ার রাখা ছিল বৈঠকে, কিন্তু সেটা শূন্যই ছিল বরাবর। প্যালেস্টাইন মুক্তি ফ্রন্টের কাউকে ডাকা হয়নি সে বৈঠকে অথচ পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের উৎপত্তি প্যালেস্টাইনের বাসিন্দাদের নিয়ে। সে সংকট না মিটলে ও অঞ্চলে শান্তি আসবে না। জর্ডানের রাজা হুসেন অবশ্য বলেছেন, প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি হচ্ছেন তিনি। তাঁর দাবি কিন্তু মুক্তি যোদ্ধারা মানতে রাজী নয়। ইস্রায়েলের যত ভয় এই মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে। তারা ইস্রায়েলের অস্তিত্ব নিয়েই টান দিয়েছে। বিমান ছিনতাই করে, মানুষ খুন করে তারা প্রমাণ করেছে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাদের বাদ দিয়ে ফয়সালা হলে তা টিঁকবে না। পয়লা জেনিভা বৈঠকে কাজ তেমন কিছু এগোয় নি—শুধু, ঠিক হয়েছে সুয়েজ খাল এলাকা বরাবর দু দেশের যে ফৌজ রয়েছে তা সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সে ভার নিয়েছে মিশর ইস্রায়েল আর জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি বৈঠকের এক কমিটি।

মা

[illegible]

মা—১

[illegible]
[illegible]
[illegible] শব্দ,
কখনও [illegible] পাখি, কভু বা [illegible] ভুল,
একত্রে তুমি আর অদ্বিতীয়া তোমার বাসনা।

বাসরটি সহসা কেন ফিরে আসে,
জানো কি? না। অহো সে, বেচারা!
পুনর্জন্মকে তুমি [illegible] কী নামে ডাকলে—পুনর্বাসনা
না কি তুমি অনন্তশয়ান শিব, আর তখন সে
নৃমুণ্ডমালিনী, শবাসনা?

চিন্তা যদি সারাক্ষণ জ্বলন্তলে চিতার চোখে চেয়ে থাকে
মেনে নাও। কিন্তু তাকে চিতাশয্যা কখনও কোরোনা
এই হেতু যে, ওই চিতা সহমরণের কোনো
বরাভয় মুদ্রা দেখাচ্ছে না।

মা—২

কৃষ্ণাচতুর্দশীতে কারও আসতে নেই।
কৃষ্ণচতুর্দশীতে কাউকে ডাকতে নেই।
ওই আলোতে কেউ কাউকে মুখ দেখায় না।
ওই আলোয় কারও মুখ দেখাও যায় না।
অমাবস্যায় এতই ভয়? তাহলে বরং
ভোরের জন্যে বসে থাকো।
মোমের মত মরা আলো?—সেও ভালো।
তখনই কিন্তু — কক্ষনোই —
সূর্যমুখীকে চন্দ্রমল্লিকা ভাবতে নেই।

মা—৩

চন্দ্র অস্তংগত হলে, সেই শেষ যামে
স্বকীয় ধমনী-ধ্বনি অনুভব ছাড়া সব কিছু
অবিধেয়, সে জানত। তবু, মূঢ়, তাকে
বাতাসের অসঙ্গত বাচালতা কেন যে ফের পেয়ে বসে!
কোথায় নিজের বুকে যে-পিদিমটা
এখনও টিমটিম,
সেটাও নিভিয়ে দেবে প্রতিজ্ঞায় আমূল ফুঁ দিয়ে,
তাতো নয়!
অন্ধকারে, অর্ধচক্ষু মেলে, সেই লুব্ধ তার
সময়ের সমীচীন অথর্বকালীন বেদ ভুলে,
জলন্তলে কোনো এক সিঁথিমূলে চেয়ে
প্রগাঢ় কারুণ্যে বলে ওঠে:
"আমি অপ্রাপ্যের প্রার্থী।
তোমার সমস্ত পুণ্য একবার — একবারই শুধু —
মাকে নিতে দাও। দিলে,
বিনিময়ে তোমাকে সমস্ত পাপ দেব।
সেই দান সুনিশ্চয় হবে মৃত্যুমেব।"

ভারতের অর্থনীতি

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের রায় অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে বরাদ্দের পরিমাণ কিছু বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশে ৩৭৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। এবারের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পাবে ৫৮৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। এটা হল কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কের অংশ বাবদ পাওনা। তাছাড়া সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান বাবদ পশ্চিমবঙ্গকে ২৩৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই খাতে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল ৭২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ঋণ রেহাই যা পাবে তার পরিমাণ ১৫৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কের অংশ বাবদ সব রাজ্যেরই পাওনার পরিমাণ এবার বেড়েছে; কারণ মোট রাজস্বের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর ও শুল্কের বণ্টনযোগ্য অর্থের পরিমাণ বণ্টন করার ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তির উপর আগে যা গুরুত্ব দেওয়া হত, তা-ই বজায় রাখা হয়েছে। তবে আয়কর থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ আগে রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হত, বর্তমান কমিশন তা বাড়িয়ে করেছেন শতকরা ৮০ ভাগ। অবশ্য যে অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হবে তার ৯০ শতাংশ বণ্টিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ১০ শতাংশ বণ্টিত হবে কর আদায়ের পরিমাণের ভিত্তিতে। তাছাড়া সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে তার পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৫০৯·৬১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় কর ও শুল্ক বাবদ রাজস্বের অংশ সবচেয়ে বেশি পাবে উত্তর প্রদেশ, কারণ উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। উত্তর প্রদেশের প্রাপ্য বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৫০·২২ কোটি টাকা; তাছাড়া উত্তর প্রদেশকে ১৯৬·৮৩ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান বাবদ দেওয়া হবে। তার ফলে উত্তর প্রদেশের মোট প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৪৭·০৫ কোটি টাকা। অনুরূপভাবে বিহারের মোট প্রাপ্য অর্থের

পরিমাণ হল ৮২৪·৭২ কোটি টাকা। এই দুটি রাজ্য যতটা কেন্দ্রীয় কর বা শুল্ক আদায় করে, পশ্চিমবঙ্গ তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ আদায় করে থাকে। কর ও শুল্কের অংশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ যেখানে পাচ্ছে ৫৮৮·০৭ কোটি টাকা, বিহার যেখানে পাচ্ছে ৭৩৮·৪৪ কোটি টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশ পাচ্ছে ৫৭০·০৮ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ পাচ্ছে ৫৪৩·৫৭ কোটি টাকা এবং মহারাষ্ট্র পাচ্ছে ৭১১·৫৩ কোটি টাকা। অথচ এই সবগুলি রাজ্যই কর আদায়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পিছিয়ে আছে; মধ্যপ্রদেশ তো অনেক পিছনে আছে। আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে ওড়িশা পাচ্ছে ৩০৪·৭৩ কোটি টাকা, আসাম পাচ্ছে ২৫৪·৫৩ কোটি টাকা এবং রাজস্থান পাচ্ছে ২০০·৫৩ কোটি টাকা। আর্থিক অনুদান যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে একটু বেশি পরিমাণে জুটেছে সেজন্য এই রাজ্যের সরকারী মহলে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরবর্তী অর্থ কমিশন যে আবার আর্থিক অনুদান প্রদান করার ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি অবলম্বন করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃত পক্ষে আয়করের ক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব বণ্টন করার নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ৯০ শতাংশ বণ্টন করা ও কর সংগ্রহের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট ১০ শতাংশ বণ্টন করার নীতিটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে রাজ্যে কর আদায়ের পরিমাণকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তাহলে কর ফাঁকি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। ন্যায়ের ভিত্তিতেও বলা চলে, যে রাজ্যে বেশি রাজস্ব অর্জিত হবে, সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণও বেশি হওয়া উচিত। খুবই পরিতাপের বিষয়, ষষ্ঠ অর্থ কমিশন আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে এ-দিকটির প্রতি সুবিচার করেননি। তবে মোট রাজস্বে রাজ্যগুলির অংশ যে ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, তা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশেরই অনুরূপ। কমিশনের সুপারিশে অন্তঃশুল্ক বা আবগারী শুল্ক থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তার নীট ২০ শতাংশ রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হবে। তবে রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তঃশুল্ক বাবদ বণ্টনযোগ্য রাজস্ব বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে নীতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার কমিশন এই রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ও অবশিষ্ট শতাংশ রাজ্যগুলির অনগ্রসরতার মাপকাঠির ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য অংশ পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন। ষষ্ঠ অর্থ কমিশন অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্য রাজস্ব রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ও ২০ শতাংশ রাজ্যগুলির অনগ্রসরতার মাপকাঠির ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করেছেন। অবশিষ্ট ৫ শতাংশ যাবে সেই রাজ্যগুলিতে যেগুলির মাথা পিছু আয় সর্বোচ্চ মাথা পিছু আয়ের অনেক পেছনে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশন মনে করেন কোম্পানি কর (Corporate tax) থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের কিছু অংশ যদি রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় তবে দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হবে না। বর্তমানে এই কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বণ্টনযোগ্য রাজস্বের আওতার বাইরে আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সুপারিশ গ্রহণও করেননি, বর্জনও করেননি। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে সুপারিশটি পেশ করা হবে। এই সর্বপ্রথম অর্থ কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে ঋণ আছে তার রেহাই কতটা দেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে বিবেচনা করেছেন। ঋণ থেকে রেহাই রাজ্যগুলি কিছু পরিমাণে পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও তা অনুমোদন করেছেন। দেশ বিভাগের আগেকার ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার ঋণ পশ্চিমবঙ্গকে আর শোধ করতে হবে না। [illegible] আড়াই কোটি টাকার ঋণও পশ্চিমবঙ্গকে আর শোধ করতে হবে না। গত ১৫ বছর এই ঋণ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সুদ দিয়েছে। দুর্ভিক্ষ ঋণ বাবদ পশ্চিমবঙ্গের জন্য বার্ষিক ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

একথা স্বীকার করতে হবে যে আগেকার অর্থ কমিশনগুলির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ঠ কমিশনের সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গের অনেক [illegible]। চতুর্থ অর্থ কমিশনের তুলনায় পঞ্চম অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য [illegible] ৫০ শতাংশ, ষষ্ঠ অর্থ কমিশন তাকে প্রায় শতকরা ১০০ [illegible]। তবুও পশ্চিমবঙ্গের [illegible] এখনও করা [illegible]। পশ্চিমবঙ্গের [illegible] রাজ্যগুলির [illegible]—এই সত্যটি অর্থ কমিশন কিছুটা [illegible] করলেও বণ্টনযোগ্য রাজস্ব বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে কর [illegible] আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল।

সুব্রত গুপ্ত

বিনতার মুখোমুখি ... বসেছিল রণেন। বাকী ছ'জন বসেছিল বড় গোল টেবিলটা ঘিরে—একে অন্যের মুখোমুখি। ঝাড় লাগানো নরম আলোয় হোটেলের এই জায়গা বেশ শান্ত, স্থির লাগছিল। আলোটা যদি আরো একটু অনুজ্জ্বল—হলদেটে না হয়ে নীলাভ হতো, তা হলে কেমন হতো। একটা স্বপ্নময় তন্দ্রা তার আসত কি না, রণেন ভাবল। একবার ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরখানা দেখল; এবং টেবিল ঘিরে বসে থাকা সবাইকে। ওরা সবাই খাচ্ছে। নীচু গলায় কথা বলছে, ঠাট্টা করছে, হাসছে। সে-ও সর্বক্ষণ একটা হাসির প্রলেপ সুন্দর করে বুলিয়ে রেখেছে।

মুখোমুখি বসেও রণেন ইচ্ছা করে বিনতার দিকে বেশী তাকাচ্ছিল না। অন্তত আজ ওদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকা ভাল। কত কথাই তো তাদের জন্য তোলা আছে। সে সব পরে হবে—নিশীথে নিভৃতে। ওদের কথায় বিনতা মিষ্টি করে হাসছে। কাটা-কাটা বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলছে; জবাব দিচ্ছে। হাল্কা রক্তবর্ণের ওষ্ঠরঞ্জনী মাখানো পাতলা দু' ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ উঁকি দেওয়া দাঁত-গুলো অসম্ভব সাদা ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এরকম দাঁতকেই বুঝি মুক্তোর সঙ্গে তুলনা করে। রণেন ভাবল। ও কানে পলতোলা ঝোলানো পাথর পরেছিল। মুখ নাড়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও দুটো দুলছিল। আর ওর থেকে যেন আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। রণেনের মনে হচ্ছিল, ওই পাথরের মধ্য দিয়ে যেন কোন অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিরন্তর বেরিয়ে এসে নিজেকে অক্ষত রাখার জন্য, কোন অজ্ঞাত ভয়কে বিদ্ধ করার জন্য তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। এটা শুধু তার কল্পনা। ভাবতে ভাল লাগছে তার।

"তুমি তো হাসছ শুধু, খাচ্ছো না তো।" পাশ থেকে পিনাকী বলল।

রণেন বেছে বেছে দু' টুকরো 'প্রন' মুখে তুলে দিয়ে বলল, "তুমি খাও, আমি ঠিক খাচ্ছি।"

"তুমি তো শুধু প্রন-ই খাচ্ছ বেছে বেছে।"

"অথচ প্রন-এ মিসেস রায়চৌধুরীর অ্যালার্জি। যার জন্য তিনি চিকেন ফ্রাইড রাইস নিলেন।" সুখেন্দু হাসতে হাসতে বলল।

"প্রথম দিনেই রুচির পার্থক্য ধরা পড়ল, মুশকিল।" পিনাকী বলল।

বিনতার পাশ থেকে মিস্টার বাসু স্মিত হাস্যে বললেন, "দ্যাটস নট অ্যাট অল এ প্রবলেম।"

বিনতা সুন্দর করে মুখ বুজে হাসল। রণেনের দিকে তাকাল।

রণেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মনে হলো তার, এই সেই চোখ। আশ্চর্য! কিন্তু

অন্যপূর্বা

কল্যাণশ্রী চক্রবর্তী

কোথায় তবু যেন একটা পার্থক্য আছে। কোথায়—কোথায়?.........

সেদিন—আজ থেকে বছর ছয়েক আগে, এই চোখ যেন অনেক প্রাণচঞ্চল কিছুটা ভীরু লাজুক ছিল। আর আজ কেমন বিষণ্ণ: চাঞ্চল্য অতলে সমাহিত। কিন্তু তাকাবার ভঙ্গী অনেকটা সেই।

সেদিন ছিল একটা ছোট রেস্তোরাঁর কেবিন। বর্ষাকাল। ভ্যাপসা গরম। ম্যারেজ অফিসারের কাছে সব পালা মিটিয়ে টিপ-টিপে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে তারা এখানে এসে উঠেছিল। তারা চার বন্ধু আর বিনতা। ঠাসাঠাসি করে সবাই বসেছিল কেবিনে। অজয়তোষের পাশে বিনতা। মাথায় ঘোমটা দেওয়া। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য দিয়েছিল এক সময়ে। আর খোলেনি ঘোমটা। অজয়তোষ পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখখানা মুছলো। তারপর ব্যাগ খুলে সে ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা বার করে বলল, "এতখানা কাগজে সব হয়ে গেল। আর কোন ঝামেলা নেই। তোমার কাছেই রাখ বিনতা।"

"তোমার কাছেই থাক।" সলজ্জে বিনতা বলল।

"...... আর ...... দেওয়া উচিত।" রণেন বলেছিল।

"কেন?" ...... বন্ধু ...... করেছিল।

"তা হলে দুজনের কাছেই থাকত।"

"এর কিছুই প্রয়োজন নেই।" হাসতে হাসতে বলেছিল অজয়তোষ। "ছিঁড়ে ফেললেও বা ক্ষতি কি। কিছু এসে যায় না। কি বল বিনতা?"

বিনতা হাসল।

রণেনের মনে হলো বিনতার মুখের হাসির চেয়ে চোখ দুটো যেন বেশী হাসে। ভারী সুন্দর ওই কালো বড় চোখ দুটো।...
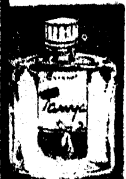
"এগ্‌জ্যাকট্‌লি, তোমাকে কোনদিন কালারড্‌ পোশাকে দেখলাম না রণেন। মিসেস রায়চৌধুরী ঠিক লক্ষ্য করেছেন। অথচ এ নিয়ে আমরা কোনদিন ভাবিনি।" পিনাকী বলল।

'ওন্‌লি দা হিন্দু উইডো ওয়্যারস দা সেম।" মিস্টার বাসু বললেন।

অজানা কথা নয়। ব্যাপারটা সত্যি, অথচ এই মুহূর্তে বসুর কথাটা ভাল লাগল না রণেনের। সব কথা সব জায়গায় চলে না।

বিনতা মাথা নীচু করে আছে। সিঁথি কুমারী মেয়ের মতো সাদা। না ওই বসুর কথা মতো বিধবার! অথচ বিনতা একদিন মোটা করে সিঁথিতে সিঁদুর আর কপালে বড় টিপ দিত। তাই সে একবার বলেছিল, "ওভাবে আজকাল কেউ সিঁদুর দেয় না বউঠান।'

বিনতাও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'বন্ধুপত্নীকেও আজকাল কেউ আর বউঠান ডাকে না।"

"এ ডাকটা আমার বড্ড ভাল লাগে।"

"আমার বেলায়ও ঠিক তাই।"

রণেন আবার তাকাল বিনতার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে রইল। সেই আগের এবং এখনকার মুখের কোন্‌টা সুন্দর, তাই ভাবতে লাগল। এবং ভেবে সে অবাক হলো, এখনো যেন সেই মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন একখানা মুখ। অনভিজ্ঞতায় আভায় সরল। অজানা ভয়ে ও লজ্জায় বিবর্ণ লাল। অথচ জয়ীর মুখ। আর আজ, অভিজ্ঞতার জটিল ধারালো—ঋজু ওই মুখ। অনেক পোড় খেয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যায়। নরম ইস্পাত অনেক শক্ত হয়েছে। অথচ সে এখনো ভাবতে পারে না, কেন এমন হলো। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে কি দারুণ বিপর্যয়—কি ভীষণ পরিবর্তন! খাবারের প্লেটগুলো, মাস্টার্ড ...... আলোয় ...... দিয়ে রণেন অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ...... দিকে। ...... পাঁচটি

ঢুকতে পারছিল না। শুধু আয়না। কিন্তু সমস্ত পথটা নি-কথায় কেটেছে।

বিনতার সঙ্গে দোতলায় উঠে এলো রূপেন। বাঁ দিকের ব্লকে এসে দাঁড়াল। বিনতা ব্যাগ থেকে চাবি বার করে দরজা খুলতে লাগল।

"আপনাদের ছেলে কোথায়?"

দরজা খুলে বিনতা বলল, "আসুন, ভেতরে আসুন।"

"ডক্তোর কখন আসবে?" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রূপেন জিজ্ঞেস করল।

'এই চেয়ারটায় বসুন।' বলে বিনতা সুইচ্ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। পাখা চালিয়ে দিল।

"সি আই টি'র এ-রকম ব্লক পেলেন কি করে?"

"বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। বসুন, আসছি।" বলে বিনতা বেরিয়ে গেল।

রূপেন ঘরের [illegible] দেখতে লাগল: আসবাবপত্র [illegible] একটা চার-কোণা নীচু টেবিল—অনেকটা সেন্টার টেবিলের মতো; আর চারখানা চেয়ার। দেওয়ালে তাকের ওপর একটা ছোট ট্রান-জিস্টার। একটা ফুলদানিও আছে। তাতে

অনেকদিন আগের অফিস ক্যালেন্ডার ঝুলে আছে। পূবপাশে একটা সিংগল বেড খাট। সব দেওয়ালগুলো একেবারে ফাঁকা —একটা ফোটোগ্রাফ নেই সেখানে। শুধু একখানা বি ও এ সি-র ক্যালেন্ডার ঝুলছে। রণেনের বারবার মনে হতে লাগল, এটা যেন কি রকম—স্বাভাবিক নয়। সব কিছু কেমন খাপছাড়া। ওদের দুজনের ছবি দেখেছিল আগের বাড়িতে। এখানে ওদের না থাক অন্তত ছেলের তো একখানা ছবি থাকবে। সহসা রণেনের খেয়াল হলো, এ বাড়িতে এসে সে যত সব প্রশ্ন করেছে, বিনতা এড়িয়ে গেছে সযত্নে—একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি। কোথাও কি কোন গন্ডগোল হয়েছে। না কি এমনি। কই, ভবতোষ তো কিছুই জানায়নি তাকে। এই তো কিছুদিন আগেও তার চিঠি পেয়েছে। তাকে শুধু জানিয়েছে, কলকাতা অস্বাভাবিক। সহজভাবে কোথাও ঘোরা-ফেরা যায় না, কথা বলা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। রণেন বসে বসে নানান কথা ভাবতে লাগল।

এক সময় বিনতা একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কাপড়-চোপড় ইতিমধ্যে পাল্টে নিয়েছে। চোখে মুখে জল দিয়েছে হয়তো। ফলে এখন ওকে বেশ সজীব লাগছিল। ও এসে টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, খান।' এক প্লেট নোনতা বিস্কুট সামনে রাখল। তারপর মুখোমুখি চেয়ারে বসল। নিজেও এককাপ চা টেনে নিল।

"বলুন, পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এলেন।" বিনতা বলল।

"পাকাপাকিভাবে কিনা জানি না; তবে বছর কয়েকের জন্য আছি।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কতদিন হলো এসেছেন?"

"এই মানে—এসেছি মাস ছয়েক।"

"ভাল হয়েছে। আপনার ছেলে কোথায়? বছর দুই আগে দেখেছি। তখন সবে দাঁড়াতে শিখছে। এখন দেখতে কেমন হয়েছে।"

বিনতা কোন কথা না বলে পেয়ালা পিরিচের দিকে তাকিয়ে রইল অদ্ভুতভাবে। শেষে আস্তে আস্তে বলল, "ওর বাবার দেশে।"

"ভবতোষ আসবে কখন?"

বিনতা সোজাসুজি রণেনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত। পরে স্পষ্ট করে বলল, "ও এখানে আসবে না।"

রণেন ভীষণ অবাক হলো। ঢোক গিলে বলল, "কেন?"

"আসা উচিত হবে না বলে।"

"আর কেন?"

"আইন আসতে দেবে না।"

বিনতার চোখ সহসা খুব জ্বলো, না অন্য কোন এক অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে উঠল, রণেন বুঝতে পারল না। এই মুহূর্তে ঠিক কারো সে বুঝে উঠতে না পেরে বাক্‌রহিত হয়ে বসে রইল।

জানলা দিয়ে বাইরে একবার শূন্য চোখে তাকাল রণেন। আলো অনেকটা ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সূর্য অনেক আগেই হয়তো অস্ত গেছে। পড়ে রয়েছে শুধু কিছুটা শেষ বিবর্ণ রক্তিমাভ ছোঁয়া ছোঁয়া মেঘের গায়ে। অতএব আজকের দিন শেষ। রণেন চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে মুখ ফেরাল। বিনতা মুখোমুখি তার দিকে বসে।

ঘরের আলো আরো কম। ক্রমশ সব-কিছু অস্পষ্ট হয়ে আসছে। রণেন ভাবল, আর কিছু তো জিজ্ঞাসায় নেই। অতএব ওঠা যাক এবার। কিন্তু কোন কিছু না করেই সে চুপচাপ বসে রইল।

বিনতা চেয়ার সরিয়ে উঠল। সুইচ-বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। আলো জেলে দিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আরেক কাপ চা দি। আপনার চা ঠান্ডা হয়ে গেছে।"

চায়ের কাপ তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে রণেন বলল, "না না এখনো গরম আছে।"

"বেশ, খেয়ে নিন।"

"ভবতোষ আমাকে কিছু জানায়নি।" অনেকটা আত্মগতভাবে বলল।

বিনতা কোন কথা বলল না।

"কতদিন ধরে—"

"ব্যাপারটা অনেকদিন নয়।" একটু থেমে, তারপর বলল, "এখন সেপারেশনে আছি। আর কিছুদিন বাদে সব চুকে যাবে।"

"তারপর কি করবেন?" বলেই রণেন বুঝতে পারল প্রশ্নটা বোকার মতো হলো।

কোন কথা না বলে বিনতা ক্ষীণভাবে হাসল।

"এখন কি কোন উপায় নেই। আমি কি ভবতোষকে কিছু বলব?"

"না, কোন প্রয়োজন নেই।"

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে রণেন এক সময় বলল, "উঠি বউঠান। পরে দেখা হবে।"

রণেন দরজার দিকে এগোল। পেছনে পেছনে বিনতা এলো। দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"আপাতত এক হোটেলে। দুদিন বাদে ফ্ল্যাট পাব।"

বিনতা কোন কথা না বলে ভাবলেশহীন-ভাবে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। "আচ্ছা, আপনার অফিসের ফোন নাম্বার কত?"

বিনতা বলল। রণেন তাড়াতাড়ি ডায়েরীতে লিখল।

"[illegible] ডিপার্টমেন্ট?"

"[illegible]?"

[illegible] এসে রণেন হঠাৎ নিজেকে বড় একলা মনে করল। এই ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে কতকগুলো বিচিত্র ভাবনা তাকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে মনটাকে অবশ করে তুলল। সব কেমন যেন হয়ে যায়। বিনতা আর ভবতোষ। যখন তারা বিয়ে করে, দুজনেই শিক্ষক। আজ বিনতা অফিসে চাকরি করে। হয়তো ভালই মাইনে পায়। অথচ বিবাহ বিচ্ছেদাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কেন? কি করে ওদের জীবনে এত বড় বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো। তাদের সাধের সন্তানও এই সমস্যা রোধ করতে পারল না। এক সময়ের ভালবাসা—সেই প্রচণ্ড ভালবাসা এখন একটা সিস্যার আধুলিতে পরিণত হয়ে গেল! তা হলে—

......"তুমি কিন্তু একেবারে খাচ্ছ না।" পিনাকী আস্তে করে বলল।

বিনতা রণেনের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভ্রূ বাঁকালো। তারপর বলল, "শরীর খারাপ লাগছে?"

"আরে না না।" বলে এক টুকরো মাংস মুখে পুরে দিল। "আমি তোমাদের কথা শুনছিলাম।"

"কি আর কথা বলব।" পিনাকী বলতে লাগল, আজকাল মন খুলে একটা কথাও বলতে পারবে না। যদি বল তা হলে চার দেওয়ালের মধ্যে বসে। তাও যাকে বলবে, তার মন ভালভাবে জানা চাই।"

"অর্থাৎ তার পলিটিক্যাল ভিয়ুস আগে থেকে জানা চাই।" হাসতে হাসতে রণেন বলল।

"তার মানে?" পিনাকীও হাসতে হাসতে ভ্রূ কোঁচকালো।

"তার মানে, আমরা বাঙালী। ইন এভরি ডিসকাশন পলিটিকস মাস্ট কাম। কান ছাড়া গীত নাই।"

মিস্টার বাসু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ইউ আর রাইট মিঃ রায়চৌধুরী। আই কান্ট স্ট্যান্ড অল দোজ বোগাস পলিটিক্যাল ডিসকাশন্‌স। দেয়ার আর সো মেনি থিংগস্ ইন দা ইউনিভার্স—"

"তোমার প্রবাসে থাকা সার্থক হয়েছে রণেন।" মিস্টার বাসুর কথা শেষ করতে না দিয়ে পিনাকী বলে উঠল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রণেনের দিকে।

"কেন বলছো?" রণেন তেমনি হাসতে হাসতে বলল।

"সব প্রভিন্সের লোক যেমন বলে, বাঙালীরা প্রভিন্সিয়াল। বাঙালীরা কেবল রাজনীতি করে।"

"অন্যায় বলে?"

"ন্যায় কি অন্যায়, তা তুমি ভালই বোঝ। এই কূট তর্কে আমি যাব না। তবে শুনে রাখ, রাজনীতি করে বাঁচার দায়ে। মানুষের গলা টিপে ধরলে গোঙায়। এই গোঙানিটা যদি রাজনীতি হয়, তবে তাই। ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, প্ল্যানড্ ওয়েতে গোটা কয়েক প্রভিন্সকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে—আরো পড়বে। তাই এই টারময়েল। বাঁচার গোঙানি। আর এই শব্দ বন্ধ করার সজোর প্রচেষ্টা। এই অসুস্থতার মধ্যে আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়েছি।"

"বাট ইটস্ নট অ্যাট অল এ গুড সাইন।" মিস্টার বাসু ভীষণ গম্ভীর হয়ে বলল।

"আমি কি তাই বলেছি। আমি কজ্ অ্যান্ড এফেক্টের কথা বলছি। সব কিছুই পালটে যাচ্ছে। কলকাতাকে দিয়ে বাংলাকে বোঝা যাবে। কলকাতা ধুঁকছে—ভীষণভাবে ধুঁকছে। কি রকম দ্রুত বিশ্রীভাবে পালটে যাচ্ছে!"

একটানা এত কথা বলে পিনাকী বিনতার দিকে তাকাল। বিনতা ওদের আলোচনা শুনছে। রণেন ভাবল, সব পালটে যাচ্ছে।... বিনতাও পালটে গেছে—অনেক পালটে গেছে। শুধু চেহারায় নয়, মনে—মনে। আজ অনেক [illegible] [illegible] কবিতা [illegible]—ঠিক কি রকম [illegible] না [illegible]? সহজ [illegible] আর [illegible]? হ্যাঁ, ও-ও অনেক [illegible] গেছে। [illegible] নয়, মনেও। [illegible] হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। "এসেছিস তো বেশ কয়েক দিন হলো, [illegible] এখানে এলি?"

"কলকাতায় এসে গেছি, [illegible] কি করে?"

"তোর আমার বন্ধু-বান্ধব কি কম?"

রণেন নিষ্প্রাণ হাসল।

"লিফ্‌ট পেয়েছিস নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ।"

"এখন তো এখানেই থাকবি?"

"হ্যাঁ।"

"তোর মা—মাসিমা কেমন আছেন?"

"আছেন এক রকম। বাবলুর সঙ্গে দুর্গাপুরে আছেন।"

"জানি।"

"এত দিন বাদে এলি, কলকাতা কেমন লাগছে?"

"আরো নোংরা হয়েছে, নানান সমস্যা বেড়েছে—"

"এলাকায় এলাকায় হানাহানি [illegible] বোমবাজি—"

"ও সব তো তোর চিঠি আর কাগজের মাধ্যমে জেনেছি। কিন্তু তুই আছিস কেমন?"

"দেখে কি মনে হয়?"

"শুধু দেখে কি সব বোঝা যায়।"

"তা বটে। ভালই আছি।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল দুজন। তারপর সংকোচ কাটিয়ে রণেন জিজ্ঞেস করল, "বউঠান কোথায়?"

ভবতোষ কোন কথা না বলে একদৃষ্টিতে রণেনের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে একটা অদ্ভুত কৌতুকে-হাসি ধীরে ধীরে প্রথমে চোখে, পরে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তার। রণেন ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ভবতোষের দিকে যেন তাকাতে পারছে না। শেষে চোখ দুটো একটু তির্যক করে নিয়ে বলল, "আমাকে আগে তো জানাতে পারতিস।"

"কি লাভ হতো?"

"লাভ যে কোথায় থাকে, কেউ তা বলতে পারে না।"

ভবতোষ তেমনি হাসতে লাগল।

"আমি যদি বলি, তোর কি লাভ হলো?"

ভবতোষ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে ধীরে ধীরে বলল, "উপায় ছিল না।"

"উপায় খুঁজেছিলি?" রণেন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল।

ভবতোষ কোন উত্তর না করে শুধু রণেনের দিকে তাকিয়ে রইল। রণেন হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে [illegible] [illegible] করে বলল,

ভারতের নারী

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের সুষমা, পারিজাতের কোমলতা, ধরণীর তিতিক্ষা, মন্দাকিনীর ছন্দ আর অমরাবতীর প্রেমে রচিত ভারতীয় নারী। ইতিহাসের কোন এক কালজয়ী মুহূর্তে এদেশের কোন জ্ঞানতপস্বী এই সত্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন যে নারীই শক্তির উৎস। সর্বদেশে সর্বকালে নারী প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে দেশে বা সমাজে নারী অবহেলিতা, নিপীড়িতা এবং লাঞ্ছিতা, ইতিহাসের খর-স্রোতে অনিবার্য গতিতে অভীষ্টের দিকে ধাবমান না হয়ে সে পংকিল আবর্তে আবদ্ধ গতিহীন জলাশয়ে পরিণত হয়। আমাদের এই ভারতবর্ষ আজ যে জগতের এক পেছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে গণ্য হচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ এই যে, কল্প-লোকের মহীয়সী শক্তিস্বরূপিনী নারীর সঙ্গে বাস্তব পরিবেশে এদেশের নারী-সমাজের প্রকৃত অবস্থার বিন্দুমাত্র মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে এদেশের শীর্ণকায় খর্বদেহ বীরপুরুষদের রচিত ধর্মীয় অনু-শাসনে নারী সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শোষিত, নির্যাতীত এবং শৃংখলিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় নারীর শৃংখল-মোচন ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাই ভারতের মুক্তি ও প্রগতি সম্ভব নয়।

যে বৈদিক সভ্যতায় নারীর শক্তিময়ী মূর্তি কল্পিত হয়েছিল, সে সভ্যতায় নারীর এ-রূপ বাস্তব ক্ষেত্রেও বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেখানে অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ অবাঞ্ছিত বিবাহ, পর্দাপ্রথা বিবাহিত জীবনে অসম মর্যাদা, সতীদাহ, বৈধব্যের অনুশাসন প্রভৃতি অবিচার ও পরাধীনতায় নারী জাতি শৃংখলিত ছিল না। শিক্ষা, স্বাধীন প্রেম ও বিবাহ, আব্রুহীন মুক্ত জীবন, সম মর্যাদা, বিধবা বিবাহ এমনকি পাণ্ডিত্য এবং শৌর্যবীর্যে নারীর অবদানের অনেক নজির বৈদিক যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানে, অনুসন্ধিৎসায় শিল্পকলায়, সাহিত্য-দর্শনে এবং মুক্ত চিন্তায় ও জীবনে বৈদিক যুগে ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ তাই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে এই সভ্যতার বহুমুখী বিকাশ ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতের এই মত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় যে মধ্যযুগে আরব আক্রমণের সময় থেকেই বিধর্মীদের ভয়ে এদেশে প্রথম স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নানাবিধ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার শুরু হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগের পর থেকেই, বিশেষত মৌর্য-যুগের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্থায়ী কুসংস্কারের গোড়াপত্তন হয় এবং এদেশের সমাজে নারীর হীনস্থানও তখন থেকেই রচিত হয়। একমাত্র পর্দাপ্রথাই মধ্যযুগে প্রবর্তিত হয়। আর তাও সম্ভবত বিধর্মীদের ভয়ে ততটা নয়, যতটা তাদের, বিশেষত অভিজাত শাসক শ্রেণীর অনুকরণে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুশাসনের মধ্যেই প্রকৃত-পক্ষে নারীর জন্মগত হীনস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। হিন্দু সমাজের ভিত্তি মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে নারী শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রমতে নারীর কোন স্বাধীন সত্তা নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে এক গৃহপালিত পরাধীন প্রাণী বিশেষ।

বৈদিকোত্তর যুগে হিন্দু কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুশাসনে নারীর জন্মগত হীন-স্থানের অন্যতম কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সন্তান উৎপাদনে জীববিজ্ঞান সম্মত নারীর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং নারীকে শুধুমাত্র পুরুষ কর্তৃক সন্তান সৃষ্টির একটি জীবন্ত আধার মনে করতেন। ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ ঘাঁটি করলে কখনো এমন ধারণা হয় না যে প্রজননে বিজ্ঞানসিদ্ধ নারীর প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে এদেশের যুরবক শাস্ত্রকারদের কোন সচেতনতা ছিল। মনু বলেছেন যে সন্তানের জনক হবার জন্যই ভগবান পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে গর্ভে ধারণ করবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন নারীকে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই ছিল নারীর যথার্থ স্থান সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারদের বদ্ধমূল ধারণা।

নারীকে একটি যৌনযন্ত্র মাত্র মনে করবার এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই তার আজীবন পরাধীনতার তত্ত্বের অন্যতম উৎস। যেহেতু সন্তান উৎপাদন করাই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, অতএব ঋতুমতী হওয়া মাত্রই কিংবা তারও আগে কিশোরী মেয়ের বিবাহ ধর্মশাস্ত্রীয় যুগ থেকে হিন্দু সমাজে সাধারণত সমর্থিত হয়েছে। বাল্যবিবাহের এখানেই উৎপত্তি। ঋষি বৌধায়নের বিধান অনুযায়ী কন্যা ঋতুমতী হবার আগে যে পিতা তাহাকে পাত্রস্থ করেন না, অবিবাহিতা অবস্থায় সে যতবার ঋতুমতী হয় পিতা ততবার গর্ভ-পাতের মহাপাতকে নিমগ্ন হন, সে যুগে যা নাকি নরহত্যার চেয়েও গুরুতর বলে গণ্য হত। মনু অনুশাসন দিয়েছেন যে, বিবাহের সময় পাত্রের বয়স যেখানে চব্বিশ, সেখানে পাত্রীর বয়স হবে আট, আর পাত্রের বয়স যদি হয় ত্রিশ, তবে পাত্রীর বয়স বারো। একই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে নারীর যে কোন স্বাধীন মানসিক সত্তা ও হৃদয় আছে, ধর্মশাস্ত্রগুলিতে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথমত, মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে পিতা অথবা ভ্রাতারা কন্যাকে যে পাত্রের কাছে সম্প্রদান করবেন তাকেই পতিদেবতা রূপে গ্রহণ করতে হবে এবং আজীবন বিনা দ্বিধায় তার সেবা করতে হবে। মনুর বিধানে স্বামী যদি সম্পূর্ণ গুণহীন, দুশ্চরিত্র এবং লম্পট হন, তথাপি তাকে

সর্বদা দেবজ্ঞানে পুজো করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ কামাসক্ত স্বামীর প্রস্তাবে কখনো সম্মত না হলে স্ত্রীকে ঘুঁষি চড় কিংবা লাঠি দিয়ে প্রহার করবার অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা পুরুষের বহুবিবাহ সমর্থন করলেও নারীর জন্য এক বিবাহ এবং স্বামীর মৃত্যুর পর চিরবৈধব্য ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বিধান দিয়েছেন। মনুর মতে বহু বিবাহিত স্বামীর কোন স্ত্রী তার সংসারে থাকতে না চাইলে তাকে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে, কিংবা পরিবারের সমস্ত লোকজনের সামনে চিরতরে বাড়ী থেকে বার করে দেয়া হবে। চতুর্থত, শাস্ত্রকারেরা নিঃসন্তান স্ত্রীর জন্য বর্বরোচিত নিয়োগ প্রথার বিধান দিয়েছেন। পঞ্চমত, তাঁরা বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের অধিকার থেকে নারী জাতিকে বঞ্চিত করেছেন। পরিশেষে বলা যায় যে, শাস্ত্রকারেরা সাধারণত নারীর স্থান শূদ্রদের অর্থাৎ সমাজের তথাকথিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর সমতুল বলে ঘোষণা করেছেন।

মনু এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ অবশ্য অনেক সময় সাধারণভাবে নারী-জাতিকে সম্মান জানাবারও বিধান দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ মনু বলেছেন, যে সংসারে নারী সম্মান লাভ করেন না, কিংবা দুঃখে থাকেন, সে সংসার উচ্ছন্ন যায়। কিন্তু একই সংগে আবার নারীদের সর্বদা দাবিয়ে রাখবার, অবিশ্বাস করবার, কড়া পাহারায় রাখবার এবং হাঁড়ি-কড়া মাজা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় ভারী কায়িক শ্রমের দায়িত্ব দেবার বিধান এবং উল্লিখিত অপরাপর অমানুষিক বিধানও দিয়েছেন। ভারতবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ এল বেশম যথার্থই লিখেছেন, "The ancient Indian attitude to women was in fact ambivalent. She was at once a goddess and a slave, a saint and a strumpet."

অধ্যাপক বেশম যে কথা যোগ করেননি তা হল এই যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে নারীকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করলেও বাস্তব জীবনে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনুশাসন তার জন্য দাসীর স্থানই নির্দিষ্ট করেছিল।

নারী জাতিকে শুধুমাত্র এক হৃদয়হীন যৌনযন্ত্র রূপে গণ্য করবার পেছনে অবশ্য যৌনজ্ঞানের অভাব ছাড়াও আরেকটি গভীরতর কারণ আছে, এবং তা অর্থ-নৈতিক। এদেশে প্রাচীন কাল থেকেই কন্যা-সন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তানের সমাদর বেশী, কারণ শ্রমিক হিসেবে এবং আজীবন নির্ভরতার দিক থেকে পুত্র-সন্তানের মূল্য অনেক বেশী, যদিও এই আর্থিক কারণকে ধামাচাপা দেবার জন্য ধর্মব্যবসায়ী শাস্ত্র-কারেরা এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে, পুন্নামক নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই পুত্রের একান্ত প্রয়োজন। বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই যেহেতু নারী-জীবনের উদ্দেশ্য, পিত্রালয়ে অনূঢ়া তরুণী হিসেবে তাই তার কোন আর্থিক মূল্য নেই। বরঞ্চ পরিবারের উপর সে এক বিরাট আর্থিক বোঝা স্বরূপ। বিবাহিতা নারী হিসেবে সে একাধারে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী এবং সমস্ত পরিবারের অবৈতনিক দাসী। অতএব পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় উভয় দিক থেকেই যত শীঘ্র কিশোরী কন্যার বিবাহ হয়, আর্থিক দিক থেকে ততই লাভজনক। ধর্মের আবরণে ঢাকা এই নগ্ন আর্থিক স্বার্থের আরেকটি উদাহরণ তথাকথিত দেবদাসী প্রথা, যা ছিল এদেশে প্রাচীন কাল থেকে মন্দিরে গণিকাবৃত্তির আরেক নাম। এই প্রথার মাধ্যমে লম্পট পুরোহিতকুল শুধু যে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতেন তাই নয়, মোটা আর্থিক লাভও করতেন। মধ্যযুগীয় বিদেশী পর্যটক মহাপণ্ডিত আলবেরুনীর মতে মন্দিরগুলো থেকে মোটা রাজস্ব আদায়ের লোভে অন্য কোন কোন দেশের মত ভারতবর্ষেও রাজারা এই দেবদাসী প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এবং প্রধানত তার ফলেই এই প্রথা বর্ধিষ্ণু রূপ ধারণ করেছিল।

এদেশের ইতিহাসে ধর্মের নামে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্থিক কারণে নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ সতীদাহ প্রথা। কোন সুস্থচিত্ত মানুষই একথা বিশ্বাস করবেন না যে বিশেষ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র ছাড়া স্বেচ্ছায় কোন নারী মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হতে চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আত্মীয়-স্বজনেরা আর্থিক কারণে সদ্য বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করতেন। এই আর্থিক কারণ ছিল প্রধানত দু রকম। প্রথম কারণ মৃত স্বামীর এবং সদ্য বিধবার যাবতীয় সম্পত্তি ও অলংকারাদি আত্মসাতের বাসনা। দ্বিতীয় কারণ, সদ্য বিধবার আজীবন ভরণ-পোষণের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা। একই কারণে পরবর্তী কালেও বিধবাদের একাধারে থানবস্ত্র প্রভৃতিতে অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনে আর অহর্নিশি বিরাট যৌথ পরিবারের দাসীবৃত্তিতে বাধ্য করে আমরণ নিদারুণ শোষণের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হত। যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে সদ্য বিধবা সতীদাহে সম্মত হতেন, বৈধব্যের চিরস্থায়ী এবং দুর্নিবার ভয়াবহতাই সম্ভবত ছিল তাদের সম্মতির মূল কারণ। অথচ সতী-দাহ প্রথার বিরুদ্ধে যখন আইন পাশ হয়, তখন একশ' কুড়ি জন হিন্দু পণ্ডিত এক যৌথ চিঠিতে লর্ড বেন্টিংকের নিকট এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে বলেন যে, সতীদাহ হিন্দুধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এহেন গুরুতর ধর্মীয় বিষয়ে ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত অসমী-চীন। বিধবাদের নিষ্ঠুর শোষণের নগ্ন আর্থিক কারণগুলোকেও শাস্ত্রকারেরা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্যতা, পতি-ভক্তি, পরলোক প্রভৃতি ধর্মীয় তত্ত্বের অন্তরালে ঢেকে রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ইসলাম ধর্মেও নারীর আজীবন পরা-ধীনতা অনস্বীকার্য, এবং তার পেছনেও আর্থিক স্বার্থের প্রাধান্য বিদ্যমান। কোরাণে বলা হয়েছে যে, মেয়েদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্বের অধিকার আছে, কারণ আল্লাহ নারীর চেয়ে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, এবং পুরুষেরা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করেন। ভালো মেয়েরা স্বভাবতই পুরুষের বাধ্য হয়ে থাকেন। কোন নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হন, তবে তাকে তিরস্কার করবার, পৃথক শয্যায় শুতে বাধ্য করবার এবং প্রহার করবার অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। শিশুবিবাহও আরবদেশে বহুল প্রচলিত ছিল এবং কোরাণে এর সমর্থন রয়েছে। তবে কোন কোন ব্যাপারে নারী জাতি সম্বন্ধে কোরাণের বিধান হিন্দুশাস্ত্রগুলির চেয়ে অনেক বেশী উদার। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যদিও কোরাণে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অধিকার পুরুষদের দেয়া হয়েছে, সংগে সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে অক্ষম হলে পুরুষ মাত্র একটি বিবাহই করবে। কোন হিন্দু শাস্ত্রে এরকম বিধান নেই। দ্বিতীয়ত, নারীদের সম্পত্তির অধিকার কোরাণে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে নারীর সম্পত্তির অধিকার নেই। তৃতীয়ত, কোরাণে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কোন দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিলে স্বামীর পক্ষের একজন এবং স্ত্রীর পক্ষের একজনকে মধ্যস্থ রেখে আলোচনায় বসতে হবে। চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদের আগে প্রতীক্ষার সময় নির্দেশ করা হয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে ভাতা দেবার বিধান রয়েছে। উপরন্তু স্বামীই স্ত্রীকে যৌতুক দেবেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও

তা ফেরৎ দেয়া চলবে না। কোরানে বিধবা বিবাহেরও সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে। তথাপি সাধারণ ভাবে বলা হয়, এদেশের দুই প্রধান ধর্মগোষ্ঠীতেই নারী নির্যাতনের শাস্ত্রীয় বিধান রয়েছে, এবং এ নির্যাতনের আর্থিক ও সামাজিক কারণগুলোকে ধর্মীয় তত্ত্বের আবরণে ঢেকে রাখতে ধর্মব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

॥ ২ ॥

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে যে ধর্ম সংস্কারের প্রয়াস আরম্ভ হয়, তার মধ্যে নারী জাতির দুরবস্থা সম্বন্ধেও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায় আইনের মাধ্যমে সতীদাহ বন্ধ করবার বিরোধিতা করে থাকলেও অন্যভাবে এ প্রথা বিলোপের এবং সাধারণভাবে নারী প্রগতির পক্ষে ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজ পর্দাপ্রথা বর্জন, বিধবা বিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহের অবসান, শিশুবিবাহ বন্ধ এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজও প্রধানত মাধব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবদান রেখেছে। গুজরাটে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্য সমাজও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করে। অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে থিওসফিক্যাল সোসাইটিও নারী প্রগতির সপক্ষে কাজ করে। নারী প্রগতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বেহরামজী মালাবারীর অবদানও সর্বজনবিদিত। প্রধানত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ফলেই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। আর তেমনি ভাবে ১৮৯১ সালের বিবাহের বয়স সংক্রান্ত আইন ছিল মালাবারীর চেষ্টারই ফলশ্রুতি।

এই শতকের প্রথম ভাগে নারী প্রগতির আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সংগে যুক্ত হয়ে আরও কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে। রমাবতী রানাডে, বরোদার গাইকোয়াড়, রায়সাহেব হরিদাস সারদা প্রভৃতি নারী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা অ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু এবং হেরাবাঈ টাটা নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৩ সালে ভারতীয় মহিলা সমিতি (Women's Indian Association) মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে নারী প্রগতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ করে। ১৯১৪ সালে সর্বভারতীয় মুস্লিম মহিলা সভা (All India Muslim Ladies' Conference) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১৯ সালের লাহোর অধিবেশনে পুরুষের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে। ১৯২৮ সালে ভূপালের বেগম এই সভার সভানেতৃত্ব করেন এবং নিজ রাজ্যে নারী প্রগতির সহায়ক বহু সংস্কার সাধন করেন। ১৯২৬ সনে সর্বভারতীয় মহিলা সভা (All India Women's Conference) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আজ পর্যন্ত এই সংগঠন নারী প্রগতির সপক্ষে আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজ করে চলেছে।

আধুনিক ভারতে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তিনি মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী ছিলেন নারী পুরুষের নিঃশর্ত ও সমান স্বাধীনতার সমর্থক, বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী, আর স্বাধীন প্রেমের ভিত্তিতে যুবক-যুবতীদের পরস্পরের জীবনসাথী বেছে নেবার পক্ষপাতী। বিধবা বিবাহ এবং নৈতিক কারণে বিবাহ বিচ্ছেদেরও তিনি পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নারী প্রগতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবত এই যে তিনি অগণিত ভারতীয় নারীকে জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। খাদি ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্যসূচির মাধ্যমে আবালবৃদ্ধবণিতা আমজনতাকে ব্যাপক গণ আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার করে জাতীয় শক্তির সামূহিক বিকাশ সাধনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল কথা। অন্তঃপুরবাসিনী ভারতীয় নারী গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করে শুধু যে ঘরের বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন তাই নয়, নিজের মহীয়সী শক্তি সম্বন্ধেও নূতন সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বস্তুত, বর্তমান ভারতে নারীশক্তির যেটুকু বিকাশ হয়েছে, তার কৃতিত্ব বহুলাংশে মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য। যে পরিবেশে আজ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নারী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, এবং দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদ অলংকৃত করা একজন শক্তিময়ী নারীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা প্রধানত গান্ধীজীরই সৃষ্টি। একাধারে নারী প্রগতি ও পেছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলোর উন্নতির প্রতীক হিসেবে একজন হরিজন নারীকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করাই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্ন। স্বাধীনতাত্তোর যুগে হিন্দু বিবাহ আইন, অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক আইন এবং শহরাঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলে এদেশের নারী সমাজের দুরবস্থার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে। কিন্তু তার ফলে বিপুল ভারতীয় নারী জাতির, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এবং এদেশের মুসলমান নারীদের সামগ্রিক দুরবস্থার নিরসন হয়নি। অহল্যাদেশ আজও তাই মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

।। ৩ ।।

আজও নারী জন্ম থেকেই পিতৃগৃহে অবাঞ্ছিতা। কারণ, বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনই আজও এদেশে নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে সাধারণত গণ্য হয়, এবং এর বাইরে নারীর কোন স্বাধীন সত্তা, কর্মসাধনা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজন আছে, খুব অল্প সংখ্যক মাতা-পিতাই তা মনে করেন। ফলে পিতৃগৃহের দেনার খাতাতেই শিশুকন্যার হিসেব লেখা থাকে। তার ভরণপোষণের ব্যয়, শিক্ষার ব্যয়, সবই অপচয়। তারপর তার বিবাহে প্রচুর অর্থব্যয়, এবং বিবাহের পরেও অনন্তকাল ধরে জামাইষষ্ঠী, পূজোপার্বণ, সাধভক্ষণ, সন্তানদের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি অসংখ্য কুপ্রথার কবলে পড়ে সারাজীবনের খরচের বোঝা পিতামাতার আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এককালে এ কারণে জন্মসময়েই অসংখ্য নারীশিশুকে হত্যা করা হত। আজ আর সে অবস্থা ঠিক নেই, কিন্তু কন্যাকে এখনও দায় হিসেবে গণ্য করাই স্বাভাবিক রীতি। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে তাই মেয়েকে শুধু ততটুকুই শিক্ষা দেয়া এবং নাচ-গান প্রভৃতি শেখানো হয়, যার ফলে সে সহজে বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠে আর আর্থিক বোঝা হিসেবে কিঞ্চিৎ হালকা হয়। আর বিপুল এ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক পরিবারে বিবাহের জন্য কন্যার দশ-বারো বৎসর বয়স হওয়া ছাড়া আর কোন গুণেরই প্রয়োজন হয় না বলে বিবাহের আগে অশিক্ষা, অনাদর আর পরিবারের দাসীবৃত্তি ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না।

কিন্তু বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন এদেশে নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য হলেও বিবাহ প্রথাকে মানবতাধর্মী এবং সুন্দর করে গড়ে তুলবার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা আজও হয়নি। বরঞ্চ বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বিবাহ এ সমাজে এক অশোভন, বর্বর ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। পঞ্চাশ বৎসর আগেও আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ষাট বৎসরের বৃদ্ধের বিবাহ হত। লেখকের পরিচিতা এক বৃদ্ধা আট বৎসর বয়সে তাঁর দুই বড় বোনের সঙ্গে একযোগে এক বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হন। তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বোনের বয়স তখন তেরো, এবং একমাত্র সে-ই বিবাহের সময় স্বামীর হাত স্পর্শ করেছিল। বাকী দুই বোন শুধু পেছনে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়া প্রথমার হাত ধরে আর তৃতীয়া দ্বিতীয়ার হাত ধরে। বিয়ের ছ' মাসের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে এই তিন বালিকা বিধবা মুণ্ডিতমস্তক, শ্বেতবসনা, পাথরের থালায় শাকাহারী এবং অর্ধাহারী হয়ে আজীবন আত্মীয়কুলের দাসীবৃত্তি করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। যৌবন না পেরোতেই তাদের প্রত্যেকের দেহ নুব্জ হয়ে পড়েছিল। ক্যাথারিন মেয়ো সম্ভবত ভারত বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তাঁর Mother India গ্রন্থে এদেশের সমাজে বালিকাদের অমানুষিক নির্যাতনের যে করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন, তা স্বাধীনতার আগে পর্যন্তও বহুলাংশে সত্য ছিল। বর্তমানে এই নির্যাতনের মাত্রা সম্ভবত বেশ কিছুটা কমেছে। কিন্তু শৈশবে কন্যাকে পাত্রস্থ করলে তার ভরণপোষণের ব্যয় এবং যৌতুকের পরিমাণ দুই-ই কম হয় বলে বাল্যবিবাহ ও বালিকা বধূর নিষ্ঠুর নির্যাতন আজও এ দেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চলছে। আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও সামাজিক চেতনা এবং আন্দোলনের অভাববশত বাল্যবিবাহ আজও বহুল প্রচলিত, এবং একমাত্র শহরবাসী মধ্যবিত্ত পরিবার ছাড়া আর প্রায় সর্বত্রই বাল্যবিবাহ এখনও অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার, শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার এবং ক্ষীণজীবী সন্তানের

জন্মও অনেকাংশে এ অমানুষিক কুপ্রথারই ফলশ্রুতি।

বয়ঃপ্রাপ্তা নারীদের বিবাহেও সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরের প্রকাশই প্রকটতর। বিবাহে অসুন্দরের আত্মপ্রকাশের প্রধান কারণ এই যে, বৈদিক সভ্যতায় প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্বাধীন প্রেমের ভিত্তিতে স্বনির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিবাহের পরিবর্তে বর্তমানে এদেশে পিতামাতা এবং সমস্ত আত্মীয়কুল দ্বারা পাত্র নির্বাচিত হয়। এর ফলে পাত্র-পাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রেমের অঙ্গীকার এবং যুক্তি ও মানবতাধর্মের ভিত্তিতে মহান সম্ভাবনাময় করে তুলবার পরিবর্তে অভিভাবকদের, এমনকি আত্মীয়সমাকুল উপজাতি বিশেষের কায়েমী স্বার্থ এবং অন্ধ কুসংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রথমত, জীবনসাথী হিসেবে শ্রেষ্ঠ দম্পতি নির্বাচনের পরিবর্তে ধর্মভেদ, জাতিভেদ, উপজাতিভেদ, গোত্রভেদ, মেলভেদ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও মানবতাবিরোধী কুসংস্কারের ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হয়। এ জাতীয় অসংখ্য ভয়াবহ কুসংস্কারের বাধা উত্তীর্ণ পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা স্বভাবতই এত নগণ্য যে আদর্শ বিবাহ, এমনকি সুস্থ বিবাহও এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, এই কুপ্রথার ফলে কনে-দেখা নামক প্রহসনকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার ভ্রষ্টাচার গড়ে উঠেছে। কনের রূপ দেখা, গুণ যাচাই করা, হাঁটা দেখা, বসা দেখা, কথা বলা দেখা, চুল দেখা, হাত-পা দেখা, সর্বাঙ্গের কোমলতা পরীক্ষা করা প্রভৃতি ব্যভিচারের মাধ্যমে বয়স্ক অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজনদের নানারূপে বিকৃত মানসিক প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে পরস্পরের জীবনসাথী হবার উপযুক্ততার বিচার হয় না। তৃতীয়ত, অভিভাবক এবং উপজাতিকুলের কায়েমী আর্থিক স্বার্থই এরূপ বিবাহে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পাত্র-পাত্রীকে উপলক্ষ করে উভয় পক্ষের লালসগ্রস্ত অভিভাবকেরা কেনাবেচা ও দর কষাকষি শুরু করেন। পণপ্রথার কল্যাণে এদেশে লক্ষ লক্ষ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সর্বস্বান্ত করে চলেছে। ভারতবর্ষে অগণিত কৃষক-মজুর পরিবারের চরম আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম কারণ এই যে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা তাদের একমাত্র সম্বল সামান্য জমিজমা কিংবা হাঁড়ি-কলসী বিক্রি করে অথবা মহাজনদের কাছে বন্ধক রেখে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং সারা জীবনে এ দেউলিয়া অবস্থা থেকে আর কখনো নিষ্কৃতি পান না। কনের ভবিষ্যৎ জীবনও অনেকাংশে যৌতুকের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ, যে বধূ যত বেশী যৌতুক নিয়ে শ্বশুরালয়ে আগমন করেন, সেখানে তার ততই বেশী সমাদর হয়। এক পরিবারের একাধিক গৃহবধূ থাকলে তাদের তুলনামূলক মর্যাদা স্থির হয় বিবাহের সময় প্রদত্ত যৌতুক এবং পিত্রালয়ের আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে। চতুর্থত, বিবাহের পরেও সারাজীবন পূজো-পার্বণ, জামাইষষ্ঠী, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন উপনয়ন এবং আরও বহু কল্পনীয় ও অকল্পনীয় উপলক্ষ সৃষ্টি করে বধূর পিত্রালয় থেকে যথাসম্ভব অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হয়। আর যে বধূর পিত্রালয় থেকে এই সরবরাহ ব্যবস্থা শিথিল হয়, শ্বশুরালয়ে তার মর্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী। সে শ্বশুরালয় আপাতদৃষ্টিতে যতই শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত হোক না কেন।

ভারতীয় নারীজীবনের নিষ্ঠুর কাহিনীর নিষ্ঠুরতম অংশ সম্ভবত হিন্দু বিধবাদের, বিশেষত তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিধবাদের অবমাননীয় জীবন। আগেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন কাল থেকেই বিধবাদের নির্যাতনের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক, অর্থাৎ বিধবাদের সম্পত্তির প্রতি আত্মীয়কুলের লোভ এবং এই অনাথাদের স্বাভাবিক ভরণ-পোষণের ব্যয় বহনে অনিচ্ছা। আজও এ অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলেও বিধবাদের অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন আজও অব্যাহত। শুভ্রবস্ত্র পরিধান, নিরাভরণ বেশ, নিরামিষ অর্ধাহার, কারণে অকারণে নিয়মিত উপবাস, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন ও পাথরের থালায় আহার আজও বিধবাদের জীবনের অলঙ্ঘনীয় বিধান। তরুণী বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ হিন্দু সমাজে আজও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। কুমারী মেয়ের দোজবরে বিবাহ বহুল প্রচলিত, এবং সম্পূর্ণ বিধিসম্মত বলে গণ্য হয়। কিন্তু সমাজের স্বনির্বাচিত অভিভাবকেরা ধর্মভ্রষ্ট হবার ভয়ে বিধবা নারীর ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ অপারগ। বড় বড় শহরে আজকাল কদাচিৎ এরূপ বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। এদিকে ধর্মের নামে এই কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারের অবৈতনিক দাসীবৃত্তি করাই বিধবাদের প্রধান কাজ। ধর্মীয় আচারের বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে হিন্দু বিধবাদের যে অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতন চলছে, সে দুর্বচনীয় ইতিহাস শুধু অশ্রুজল আর দীর্ঘশ্বাসেই রচিত হচ্ছে। ধর্মীয় ভণ্ডামির এই মুখোশ ছিঁড়ে ফেললে পৃথিবীর আর

সব দেশের, এবং এদেশের বৈদিক যুগের বিধবা এবং মুশ্লিম বিধবাদের মত হিন্দু বিধবাদেরও, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ এবং অন্যান্য সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রিক জীবন-যাপন করবার পথে কোন অন্তরায়ই থাকবে না। কারণ ধর্মীয় অলীক দর্শনের আবরণ ভেদ করে শোষণের নির্লজ্জ স্বরূপ সেদিন মানুষের চৈতন্যে তীব্র কষাঘাত হানবে।

অবিবাহিতা নারীদের জীবনও এদেশে বিশেষ বিড়ম্বনাময়। প্রাচীন কাল থেকে এদেশে বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য হবার ফলে অবিবাহিতা নারীর জীবন এ সমাজ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। তাই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অথবা উন্মাদ স্বামীর সঙ্গে, বহুস্ত্রীর মালিকের সঙ্গে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধের সঙ্গে, এমনকি গাছের সঙ্গে তরুণীদের বিবাহের রীতি কয়েক দশক আগেও এদেশে প্রচলিত ছিল। একমাত্র গাছের সঙ্গে এবং হিন্দু সমাজে বহুস্ত্রীর মালিকের সঙ্গে বিবাহ ছাড়া বাকিগুলো আজও কমবেশী প্রচলিত আছে। এরূপ অবস্থার আরেকটি কারণ এই যে, বড় বড় যৌথ পরিবারের পুরুষদের দৌরাত্ম্যে কুমারী মেয়েদের কৌমার্য রক্ষা করা কঠিন হত। আর কুমারী মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে তার পক্ষে হিন্দু সমাজে বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাদের সাধারণত বিষ খাইয়ে, কাপড়ে আগুন দিয়ে, গলায় ফাঁস এঁটে কিংবা জলে ফেলে দিয়ে হত্যা করে প্রচার করা হত যে তারা আত্মহত্যা করেছে। বর্তমান যুগে সে অবস্থা আর ঠিক নেই, কিন্তু নিজে কর্মসাধনায় রত, বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী নারীর পক্ষে সমাজে মর্যাদার স্থান গ্রহণ করা আজও দুঃসাধ্য। সর্বত্র এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের সিঁথির দিকে আর হাতের দিকে বারবার বিদ্রূপ কটাক্ষ হেনে তীব্র কৌতূহল ও মৌন ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করেন। নিজের অধিকারে বাসা ভাড়া করা কিংবা নিকট আত্মীয়ের আশ্রয় ছাড়া অন্য কোথাও থাকা, অথবা সামাজিক পরিবেশে সম্মানের লাভ করা অবিবাহিতা নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর এসব সমস্যাও বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ভারতে আজও কোন নারীর পক্ষে অবিবাহিত জীবন-যাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবিবাহিত পুরুষকে এদেশে সাধু-সন্ন্যাসী গণ্য করা হয়, কিন্তু অবিবাহিতা নারীকে অধঃপতিতা জ্ঞান করাই স্বাভাবিক রীতি। অথচ পৃথিবীর সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও নারী প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্মসাধনায় রত অনূঢ়া নারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে, এবং কোন উন্নত দেশে বিবাহ না করবার ফলে তাদের অমর্যাদার অবকাশ নেই।

হিন্দু সমাজের চেয়ে এদেশের মুশ্লিম সমাজে নারীর অবস্থা আরও করুণ, আর তার প্রধান কারণ সম্ভবত তাদের তুলনামূলক অশিক্ষা এবং আর্থিক অনগ্রসরতা। ধর্মের নামে মুশ্লিম পুরুষেরা সাধারণত স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করেন, এবং তাদের নিষ্ঠুর শাসনকে অস্বীকার করে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করা মুশ্লিম মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব বললেই চলে। বাল্যবিবাহ শুধু যে বহুল প্রচলিত তাই নয়, এটাই সাধারণ নিয়ম। ধর্মের মুখোশ-পরা কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মুশ্লিম পুরুষদের বিরোধিতার মুখে সরকার এ বিষয়ে নূতন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকায় পুরুষদের চারটি পর্যন্ত বিবাহের অধিকারও অব্যাহত আছে। কোরাণে যেসব অধিকার নারীকে দেয়া হয়েছিল, বাস্তবক্ষেত্রে তারও অধিকাংশই মুশ্লিম পুরুষেরা হরণ করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাস্তবক্ষেত্রে পুরুষের পক্ষে কারণে-অকারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু স্বামীর গুরু অপরাধেও নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ আদায় করা অসম্ভব বললেই চলে। পাত্রপক্ষই পাত্রীকে যৌতুক কিংবা দেনমোহর দেবে, আর সে যৌতুক বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীরই থাকবে, এটাই কোরাণের বিধান। কিন্তু হিন্দু সমাজের অনুকরণে আজকাল মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক আদায় করবার রীতি ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্ত্রীর পক্ষে দেন-মোহরের পুরো টাকা আদায় করা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন আইনের অভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও মুশ্লিম নারীরা পেছিয়ে রয়েছেন, কারণ মুশ্লিম আইনে আজও ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ সম্পত্তি লাভ করে। একমাত্র মুসলমান বিধবাদের অবস্থাই হিন্দু বিধবাদের চেয়ে অনেক উন্নত, কারণ তাদের সাধারণ জীবন-যাপনে কিংবা পুনর্বিবাহে কোন বাধা নেই।

॥ ৪ ॥

বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়, একটা জৈবিক প্রয়োজন মাত্র। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সমেত সমগ্র প্রাণী জগৎই এ কাজ করে থাকে। মানুষের মনুষ্যত্ব তার কর্মসাধনায় ও মানসিক বিকাশে, আর তা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া আর তার পরিবারের অবৈতনিক দাসীবৃত্তি করা অতএব নারীর জীবনের উদ্দেশ্য বা আদর্শ হতে পারে না। কোন নারী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, সধবা কি বিধবা, বহুসন্তানবতী, নিঃসন্তান কি সন্তানসম্ভবা, তা তার গুণের কিংবা মহত্ত্বের কোন প্রমাণই নয়, তার জৈবিক পরিস্থিতির একটা অপ্রাসঙ্গিক পরিচয় মাত্র। স্বীয় কর্মসাধনায় কৃতিত্ব এবং দেশ, সমাজ ও মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদানের মাধ্যমেই তার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয়। বিবাহিত নরনারীর পক্ষে প্রয়োজন বোধে সন্তান উৎপাদন ও সংসার পালন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ ও সমান জৈবিক দায়িত্ব। ঘরকন্না ও সন্তান প্রতিপালনের যাবতীয় কাজও উভয়ে সমান ভাবে ভাগ করে করাই যুক্তিসম্মত। তারপর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উভয়ের ব্যক্তিত্ব, শক্তি ও প্রতিভার প্রকাশ। একমাত্র স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতা, স্বামীর প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিতা এবং স্বামীর গরবে গরবিণী নারীর ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূল্য শূন্য। তিনি এক ব্যক্তিত্বহীন জীব বিশেষ এবং নারী প্রগতি তথা মনুষ্যজাতির প্রগতির অন্তরায় স্বরূপ। কোন নিষ্ঠাবান সমাজ সমাজ ব্যবস্থায় এহেন নারীর কোন স্বীকৃতি থাকা সঙ্গত নয়।

নারীর কর্মসাধনা প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এদেশের প্রায় সব কৃষক-শ্রমিক পরিবারেই, অর্থাৎ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পরিবারেই মহিলারা ক্ষেত-খামার, কলকারখানায় কাজ করেন, এবং এদিক থেকে তারা একটা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সমর্থ হন। কিন্তু তাদের এ কঠোর শ্রম প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কর্মসাধনার পর্যায়ে পড়ে না, কারণ এর সঙ্গে শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত মানসিক

প্রবণতা, বা যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। এই শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে, স্বামীর পরিবারের সার্মগ্রিক দাসীবৃত্তিরই নামান্তর মাত্র। তথাপি সংসার প্রতিপালনের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই শ্রমের একটা বিরাট সামাজিক মূল্য আছে। আর কলকারখানায় কর্মরতা শক্তিস্বরূপিণী ভারতীয় নারী স্বীয় আর্থিক স্বাধীনতা বশত অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক জীবনে নিজেকে শুধুমাত্র একটা যৌনযন্ত্র কিংবা অবৈতনিক দাসীরূপে ব্যবহৃত হতে দেন না। উচ্চশিক্ষা বিস্তার এবং আর্থিক প্রয়োজনের ফলে বর্তমানে শহরাঞ্চলে অল্পসংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারাও বিভিন্ন চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব চাকুরিতে ব্যক্তিগত প্রবণতার চাইতে সংসারের তাগিদই বেশী। কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই নারী আজও যৌনযন্ত্র এবং দাসী বিশেষ। তিনি একাধারে রান্না করেন, বাসন মাজেন, বাড়িঘর ঝাড়পোছ করেন, কাপড় কাচেন, ছেলেপিলেদের খাওয়ান-পরান, স্বামীর ফাই-ফরমাস খাটেন এবং কোনরকমে তার আরামের অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন, এবং পরিশেষে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হন। একটানা ক্লান্ত সুরে কাজের চাকা ঘুরে ঘুরে চলবার মাঝে নিজের সম্বন্ধে একবার ভেবে দেখবার শুভ মুহূর্তে দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা তার জীবনে আর আসে না কোনদিন। রবীন্দ্রনাথ তাই তাকে জীবনশেষের শেষ জাগরণের মুহূর্তেই তার মহীয়সী শক্তি সম্বন্ধে চৈতন্য দান করেছেন। পক্ষান্তরে উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীরা অপর নরনারীকে দাসদাসী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন বলে নিজেরা দাসী নন। কিন্তু কর্মহীনতা বশত আর্থিক দিক থেকে পরাধীন এবং সর্বআভরণভূষিত যৌনযন্ত্র বিশেষ। দেশ ও সমাজের বোঝাস্বরূপ এই পরগাছা-কুলের তথাকথিত অভিজাত মহিলাদের কোন উচ্চ আদর্শ বা কর্মসাধনা তো দূরের কথা, শাড়ি-গয়না, গাড়ি-বাড়ি ও যৌনক্রিয়া ছাড়া জীবনে আর কোন বিষয়ে এদের কোন ইন্টারেস্টই নেই। সময় ও সুযোগ এদের আভিজাত্যের ডানা বেয়ে অবিশ্রান্ত ঝরে যায়, কিন্তু চৈতন্যের ছোঁয়া জীবনে তাদের আর লাগে না কোনদিন। ভারতীয় নারী সমাজের এরাই কলঙ্ক।

স্বাধীন ও ব্যক্তিগত কর্মসাধনা নারীর আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হলে স্বভাবতই বিবাহ আর নারীজীবনের উদ্দেশ্য বলে গণ্য হবে না, শুধু একটা জৈবিক প্রয়োজন রূপে গৃহীত হবে মাত্র। কোন নারী অবিবাহিতা, বিবাহিতা কি বিধবা, তার এই জৈবিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত কর্মসাধনায় সাফল্য ও প্রতিভার পরিচয়েই তিনি নিজ অধিকারে দেশে ও সমাজে সম্মানের আসন অধিকার করবেন। এ বিষয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন জন্মগত পার্থক্য নেই। যা কিছু পার্থক্য তা শুধু ভ্রান্ত সামাজিক আচার-বিচারের বিশেষত ধর্মীয় কুসংস্কারেরই ফলশ্রুতি। যে নারীর জীবনে কোন স্বাধীন উদ্দেশ্য বা কর্মসাধনা নেই, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথও রুদ্ধ, তিনি যে-পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন।

আন্দোলনকে, যে নারী স্বীয় কর্ম-দক্ষতায় জীবিকা অর্জিত করেছেন তিনি কোন পুরুষ নায়ক জীবের সংগে যুক্ত না থাকলেও স্বগৌরবে মহীয়সী। সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন নারী-জীবনের এক মহান আদর্শ, এ 'থিওরি' নারীকে বন্দীভূত রাখবার উদ্দেশ্যে এদেশের গৃহকর্মাভিমুখ ও কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন পুরুষদের একটা হাতিয়ার মাত্র। এই তত্ত্বকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে অবমাননীয় জীবজন্তুর সংগে মানুষ সমাজের কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা বশত এদেশের নারী সমাজের একাংশও এই অপপ্রচারের শিকার হয়েছে। নারী শুধু পুরুষের ছায়া নয়, স্বীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নারী স্বাধীন সত্তা, অন্তর্নিহিত এই সত্য স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত নারী জাগরণ সম্ভব নয়।

নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও কর্মসাধনার আদর্শ গৃহীত হলে স্বভাবতই বিবাহেও আর পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন উপ-জাতির একটা কেনা-বেচার ব্যাপার থাকবে না। স্বাধীন প্রবণতায় জীবনসাথী বেছে নেবার অধিকার স্বাভাবিকই স্বীকৃত হবে। ফলে বর্তমানের কলুষিত বিবাহ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা হবে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ প্রেমের। আর স্বাধীন প্রেমের প্রতিবেদনের সে শুভলগ্নই হবে এদেশের পরাধীন, নির্যাতীত ও শোষিত নারী-জীবনের সংকাঙ্ক্ষিত। অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অবশ্য নরনারীর স্বাধীন ভালোবাসার বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপন করবেন যে, এর ফলে চিরসুখের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে না। পরন্তু পরিবারের স্থিতিশীলতা হ্রাস পাবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যেমন হয়েছে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে। তথ্য হিসেবে এ আংশিক সত্য হলেও তত্ত্ব হিসেবে যুক্তিনির্ভর নয়। কারণ স্বাধীন বিবাহে চিরসুখের গ্যারান্টি না থাকলেও অপরের দুষ্কর্মের ফল নিজে ভোগ করবার সম্ভাবনা নেই। আত্মীয়কুল দ্বারা অপাত্রে অর্পিতা নারীর দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার চেয়ে নিজের স্বাধীন কর্মফলে পাওয়া দুঃখ অনেক বেশী সহনীয় এবং যুক্তিগ্রাহ্য। চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বাধীন প্রেমের প্রতিষ্ঠা নারী-শক্তির জাগরণেরই শুভ সূচনা। সে শক্তির বহুমুখী প্রকাশে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া আমাদের নিজ দুর্বলতারই লক্ষণ মাত্র। দ্বিতীয়ত, যার সংগে হৃদয়ের কোন যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়নি, তেমন অপরিচিত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার মধ্যে একটা অতীব অসুন্দর দিক আছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কেবলমাত্র একটা জৈবিক সম্পর্ক রূপে গণ্য করলে তবেই শুধু এ বিরাট অসুন্দরকে সমাজ জীবনে গ্রহণ করা সম্ভব। তৃতীয়ত, প্রেমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ, পণপ্রথা, কনে-দেখা, তত্ত্ব আদায় প্রভৃতি কুপ্রথা সমাজ থেকে অচিরে দূরীভূত হবে, আর ধর্মভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি গভীরতর কুসংস্কারের মূলেও আসবে প্রচণ্ড আঘাত। নারী-পুরুষ সেদিন শুধু স্বপ্রকৃতির পরিচয়েই পরস্পরকে চিনবে।

বলা বাহুল্য, নারী জাগরণের পথে অনিবার্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, যার ফলে একদিকে ভারতের ঘরে ঘরে নারীজাতির চোখের সামনে বৃহত্তর পৃথিবীর দরজা খুলে যাবে, আর অন্যদিকে স্বাধীন কর্মসাধনার জন্য প্রস্তুত হবে ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। কিন্তু শিক্ষা এবং চৈতন্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তার জন্য প্রয়োজন ব্যবহারিক জীবনে মননশীলতা। আজকাল অনেক সময় দেখা যায় যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তা তরুণীরা, অত্যুৎসাহে, নতুন বন্ধুর সংগে মেলামেশা করে অবশেষে সবচেয়ে বিত্তশালী কিংবা ক্ষমতাশালী কিংবা প্রতিপত্তিশালী বন্ধুটিকেই অভিভাবকদের কাছে উপস্থিত করেন অথবা নিজেই বিবাহ করেন। এ বিপ্লব কিন্তু সে বিপ্লব নয়। দ্বিতীয়ত, অধিকন্তু ভারতীয় নারীকে সোনা-গয়নার মোহ পরিত্যাগ করতে হবে। ঘরে মজুত করা সোনা-গয়না দরিদ্র দেশের আর্থিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হতে পারে না। পরিবর্তে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা রাখলে, কিংবা অন্যভাবে আর্থিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক দরিদ্রতম দেশ হলেও এদেশে বহু সহস্র কোটি টাকা মূল্যের সোনা-গয়না ঘরে ঘরে মজুত পড়ে থেকে জাতীয় আর্থিক প্রগতিকে ব্যাহত করছে। তামা এবং উজ্জ্বল ধাতু অংগে ধারণ না করেও সৌন্দর্যচর্চা সম্ভব। পৃথিবীর কোন উন্নত দেশের নারী-জাতিরই ভারতীয় নারীদের মত সোনা-গয়নার প্রতি এই প্রবল আসক্তি নেই। তৃতীয়ত, নারী প্রগতির আন্দোলনের সংগে সংগে ভারতীয় নারীকে বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। কারণ, সমাজের তথা বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সংগে ব্যক্তি-জীবনের স্বাধীনতা একই সূত্রে গ্রথিত। পরিশেষে ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়ি-কতা, খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ, পূজোপার্বণ প্রভৃতি সংক্রান্ত এদেশের হাজার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। মনের এক কোণে বিভিন্ন কুসংস্কারকে যত্নে লালন করে আরেক কোণে স্বাধীনতার নীড় বাঁধা অসম্ভব। কালো এমনই জিনিস যে সব আলো শোষণ করতে সে নিজের রং বজায় রাখে। অতএব কালোকে বর্জন না করলে আলোর রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়

বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন শক্তিময়ী নারীর নেতৃত্বে এদেশের দুরন্ত যৌবন গড়ে তুলবে এক উত্তাল সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সে বিপ্লবে একই সংগে ধ্বংস হবে ধর্মভেদ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, বহুবিবাহ পরাধীন বিবাহ, কন্যাবিবাহ, পণপ্রথা এবং অন্ধকার জগতের আরও যত সব দুর্মর কুসংস্কার। কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জালিমদের তৈরী সহস্র বাধানিষেধের লৌহ কারাগার চূর্ণ করে ভারতের নারী সেদিন সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করবেন, শক্তির কম্পন সেদিনই আরম্ভ হবে এদেশের আকাশে বাতাসে। শক্তির স্পন্দনে সেদিন শিহরণ জাগবে এ সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায়। তার গতিবেগে চঞ্চল হবে বিশ্ব।

ঘরে-বাইরে

নায়িকা সন্ধানে

ডাক্তার ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁকে সবাই ডি জি বলে জানে তাঁর হাতে বাংলা তথা ভারতীয় ছায়াছবির প্রথম যুগের গল্প সুযোগ পেয়েই গড়েনি। অদ্ভুত সে অধ্যায়। আর্ট চিত্রকলাতেও প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব দেখলে জানলে কত কঠিন প্রথম অধ্যায়ের নিদর্শনেও, সময়ের বন্ধন পার হয়ে শিল্পী তার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। অভিনেতা কাহিনীও ডি জি-র কাছে বসে শোনা কাহিনী। তিনি বলছিলেন এই শতকের গোড়ার কথা।

সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেও যদি অভিনয় আর নাটকে নামতো, আত্মীয় পরিজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। হয়তো বা ছেলেটা বকাটে, হয়তো বা কুসংগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কতই না ভাবনা হতো তার জন্য। তা সত্ত্বেও সৃজনীপ্রতিভা চাপা থাকতে চায় না। ডি জি বলেন, শান্তিনিকেতনে গুরুদেব পড়াতেন ইতিহাস, পড়াতেন আবার অভিনয় করে। সে অভিনয়ের নেশা লেগে গেল তাঁর মনে। চিত্রকলার সৃজনী-শক্তিকে বাদ দিয়ে যেদিন ছায়াছবির জগতে এলেন সেদিন তাঁর সংগে এসেছিলেন নিতীশ লাহিড়ী। ফিল্ম কোম্পানীর স্থাপনা হলো। তার নাম হলো ইন্দো ব্রিটিশ ফিল্ম কোং—সালটা তখন ১৯১৮।

ফিল্ম কোম্পানী তো হলো, কিন্তু অভিনেত্রী সন্ধান করতে গিয়ে পল্লী-বিশেষে যোগাযোগের কথা ভিন্ন গতি নেই। সেযুগে গৃহস্থ বা অভিজাত ঘরের মেয়ে ছবিতে নামবার কথা ভাবতে পারতেন না। এদিকে পল্লীবিশেষে যাতায়াত নিয়েও নানা কথার সৃষ্টি হতে লাগলো। সব মাথা পেতে নেওয়ার পর ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ ডোমি-নিয়ন ফিল্ম লিমিটেড নামে দমদমে ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান গড়লেন এঁরা। উদ্বোধন করলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ। দেবকী বসু, কৃত্তিকা ঠাকুর, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ শিল্পীরা এগিয়ে এলেন। সব হলো কিন্তু মহিলা শিল্পীর বেলায় ওই এক বিভ্রাট। বাঙ্গালী মেয়ে তেমন ঘরের কেউ আসতে চায় না। মেয়েরা চাইলেও তাঁদের অভি-ভাবকরা আপত্তি করেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে দু'একটি এলেন। যেমন এলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক্যাপ্টেন ডি জন-এর কন্যা। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল রাধারাণী দেবী।

'ফেমস অব ফ্রেম' পদ্মিনীর জীবন-কাহিনী। লিখেছেন দেবকীবাবু, পরিচালক কল্লোল গোষ্ঠীর দীনেশরঞ্জন দাশ। গোল বাধলো আলাউদ্দিনের বেগম-এর ভূমিকা নিয়ে। কি করে উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া যায় তাই ভাবনা হয়ে দাঁড়ালো। ডি জি সন্ধ্যেবেলা ঘুরে ফেরেন [illegible]। একদিন ধর্মতলায় [illegible] ইহুদি একটি স্কুলের মেয়েকে দেখে মনে হলো বেশ খাসা বেগম হবে। তাকে একটি বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে দরজার কড়া নাড়লেন। খুলে দিলেন মধ্যবয়সী মহিলা। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, কি চাই। মহিলার নাম শ্রীমতী গ্যাম্পার। ইংলিশম্যান কাগজের ফটোগ্রাফার। ১০ টাকা মাইনে পান।

ডি জি প্রমাদ গুনলেন। মা মেয়েকে অভিনয় করতে দিতে রাজী নন। অনেক ভেবে তিনি পথ পেলেন একটি। ২০০ টাকা মাইনেতে ফিল্ম কোম্পানীর ফটোগ্রাফার হতে। রাজী হয়ে গেলেন শ্রীমতী গ্যাম্পার। এদিকে দমদমের ফিল্ম কোম্পানী তো অবাক। তাঁরা চান রূপসী তরুণী অভিনেত্রী। এঁকে দিয়ে কি হবে? শ্রীমতী গ্যাম্পার তাঁদের ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে খুব খুশী। নিজেই তুললেন মেয়েকে আনবার কথা। ব্যাস্ আলাউদ্দিনের বেগম এলেন। বেগম সাহেবার মাইনে মাসে পঁচিশ টাকা। ডি জি সবাইকে বোঝালেন ধরে নাও শিল্পীকে মাসমাইনে দেওয়া হচ্ছে ২২৫ টাকা। এই মেয়েই উত্তর কালের বিখ্যাত চিত্রতারকা সবিতা দেবী।

স্টুডিওতে আসতেন তখন অনেক নামকরা মানুষ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসতেন। তাঁরই চরিত্রহীনের কিরণময়ীর ভূমিকা নিয়ে গোল বাধলো আবার। কিরণময়ী কি আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে অভিনয় করতে পারবে। এক অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী, ডি জির বন্ধুপত্নী। ডি জি ভেবে চিন্তে কথা পাড়লেন। অধ্যাপক বললেন, নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে ঘরে রেখে আমার স্ত্রীকে কেন অভিনয়ে নামাতে চাইছো? তার উপর তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। ঘরে ফিরে ডি জি স্ত্রীকে বললেন, কাল থেকে ফিল্মের কাজে যেতে হবে। দেবকীবাবুর 'কাঁটা' ভূমিকায় অভিনয় করলেন শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরে অভিজাত মহিলাদের ছায়াছবিতে অভিনয় করতে আপত্তি করার আর কোন কারণ রইল না। [illegible] হয়েছিলেন।

অভ্যাস সহজে যায় না। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা চলে না। অভ্যাসকে আদরে আস্তে আস্তে করতে হবে। সিঁড়ি-থেকে ভুলিয়ে, প্রত্যেক ধাপে বদলানো দরকার। যেন সিঁড়ি দিয়ে নামার মত। একটি করে ধাপ এক-এক বারে, একটি করে পাইটা পেরোতেন একবারে পা ফেলে। বলেছেন মার্ক টোয়েন।

রোগের নাম মিনিমাতা

তথাকথিত সভ্য জগতের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে Pollution বা কলকারখানা ইত্যাদির আবর্জনা মিশ্রিত আবহাওয়া ও পারি-পার্শ্বিক বিদগ্ধ মানুষকে বিচলিত করছে। মানুষের নিজের হাতে তৈরী এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে চিনতে সময়ও লেগেছে। নোংরা পরিবেশের আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল বিশ বছর আগে জাপানের মিনিমাতা নামের জায়গাটি। প্রথম নাকি বিড়ালের দল উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কোন কোন মন্দভাগ্য মার্জার সমুদ্রে ডুবে মরেছিল। তারপর? তারপর মিনিমাতার মানুষদের কেউ কেউ কেমন যেন অস্বাভাবিক মাংসপেশীর সঙ্কোচন আর অবশ অসাড় হাত-পা নিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত হয়ে গেলেন।

দক্ষিণ পশ্চিম জাপানের সুন্দর শহর মিনিমাতাতে অবস্থিত একটি রাসায়নিক কারখানা অনেকদিন থেকে মাছধরার জেলেদের লোকসান পোষানো বলে কিছু ক্ষতিপূরণ দিচ্ছিল। মাছ যেন কেমন কমে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বিষাক্ত বাতিল আবর্জনা সমুদ্রে ফেলা বন্ধ করেনি। প্রতিষ্ঠান বড় হতে লাগলো, আবর্জনাও বেশী হতে লাগলো। মানুষও জানতো না তার ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ পর্যন্ত বিকলাঙ্গ শিশু হয়ে জন্ম নেবে। Pollution এর সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুরতার আরম্ভস্থল হিসাবে মিনিমাতার সাংঘাতিক রোগের নামকরণ হলো মিনিমাতা রোগ।

মিনিমাতা রোগ কিন্তু মিনিমাতায় আবদ্ধ থাকেনি। সম্প্রতি আরও অন্যান্য স্থান থেকে মিনিমাতা রোগের সংবাদ পাওয়া গেছে। সাংঘাতিক মিনিমাতা রোগ ভিন্ন যকৃৎ-এর নানা উপসর্গ, বেশী রকম রক্তের চাপ, দারুণ মাথাধরা ইত্যাদি দীর্ঘদিন আবর্জনাময় আবহাওয়ায় থাকার ফল বলে মনে করা হচ্ছে। এসব রোগ এত বিভিন্ন কারণে হয় যে সবসময় pollution-এর ফল বলে ধরা যায় না। মানুষ ভোগে যায় কিন্তু লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় হয় না। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে গর্ভস্থ ভ্রূণ-এর বিকার। placenta বা গর্ভের ফলে বিষ সঞ্চয় হয়ে উত্তরকালের মানুষকে পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বিকৃত-মস্তিষ্ক করে দেওয়া কি সাংঘাতিক। আবর্জনাময় জলের মাছ ভাবী মা হয়তো খেলেন, মায়ের কিছু হলো না, কিন্তু সবটুকু গরল গিয়ে ঠেকলো গর্ভস্থ সন্তানের গলায়।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই গরলের গন্ধ নিয়ে লোক বিচলিত। বড় বড় শহরে কি হয় তা আমাদেরও জানা নেই। অমন যে ছোটখাটো থাই মহিলা মানুষের, তাদের নিউইয়র্কের বাতাস জানালা দিয়ে আসতে দিতেও অনেকের সাহস নেই। বাতাসের আবর্জনায় ঘরের আসবাব পর্যন্ত চটচটে হয়ে যায়। শীতের কলকাতা দেখুন যে রাতে-কালোতে পঙ্কিল। শহরমুখী সভ্যতায় কোথায় কি হবে, ভবিষ্যতে রোগের কত উপসর্গ মানুষের অজানা কারণে হবে, কে জানে। তবু উপরে আতঙ্কের অবশিষ্টটুকু হচ্ছে pollution বা পরিবেশের দোষে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তার কোন চিকিৎসা নেই। ডাক্তার শাস্ত্রের অসাধ্য সব রোগ ছিল, ছিল ভাবী যুগকে বিষিয়ে দিতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনা আর নতুন নতুন বিজ্ঞানের বাহাদুরী এখন নিত্য নতুন দুঃখের কারণ বই কিছু থাকবে না।

শ্রীমতী

।। পঁচিশ ।।
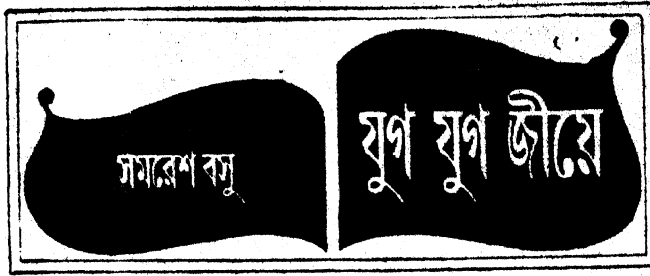
'কী ঘটেছে ফুলি ?' বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্বরের উদ্বেগের মধ্যে একটা বিরক্তির ঝাঁঝ।

শিউলী কিছু বলবার আগে মায়ের মুখের দিকে একবার দেখেছিল। যেন সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী শিউলী। মায়ের চোখ-মুখের অভিব্যক্তি সেইরকম ছিল, এবং বাবার বিরক্তির ঝাঁজও ওকে অনেকটা অপরাধী করে তুলেছিল যেন, যা আদৌ সত্যি না, পরে বুঝেছিল। শিউলী অন্য দিকে তাকিয়ে আগের দিনের সব ঘটনা বলেছিল। বলতে বলতে কখনো কখনো বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, উদ্দেশ্য, বাবা আরো রেগে যাচ্ছেন কী-না বোঝবার জন্য। বাবার ভ্রূকুটি-উৎসুক মুখ দেখে সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, একবার বলে উঠেছিলেন, 'মধুদি ? মানে হেডমিস্ট্রেস ? হুম্ ! তারপর ?'...শিউলী বাবার কাছে একটি কথাও বলতে ভোলে নি, মধ্যরাত্রের ঘটনা যা শুনেছিল, অকপটে বলেছিল।

সব শোনবার পরে বাবা দুই মুহূর্ত চুপ করেছিলেন, তারপরে কারোর মুখের দিকে না তাকিয়ে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত সাহস। সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেকে বের করে এনে মারের শোধ দেওয়া !'

বাবার স্বরে বিস্ময়ের সুর, কিন্তু তা প্রশংসার্থে কী না, শিউলী বুঝতে পারে নি। মা ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠেছিলেন, 'সাহস মানে? এত বড় অন্যায়, ছেলেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বের করে এনে মার! তাদের বাপ-মা পুলিসে দেবে না!'

বাবা যে উজানগামী, পরের কথায় সেই উল্টো স্রোত ঝলকিয়ে উঠেছিল, 'কিন্তু আমি তো রাখাল ত্রিদিবেশের কোনো দোষ দেখি না! ওই ছেলেগুলোকেই তো আমার নোঙরা আর কাপুরুষ বলে মনে হচ্ছে।'

কথাগুলো বলে বাবা মায়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শিউলীর দিকে তাকিয়েছিলেন। বাবাকে মনে হয়েছিল অন্য এক মানুষ, এক বিস্ময়কর পুরুষ, যিনি ওদেরই সঙ্গী, এবং বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে খুশি আর লজ্জার ঝলক লেগে গিয়েছিল। বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মা স্পষ্টতই রুষ্ট হয়েছিলেন, এবং সম্ভবত নিজেকে পরাভূত মনে করে-ছিলেন, বলেছিলেন, 'বেশ মস্তবড় কাজ করেছে তোমার ছেলে, মজুমদার বংশের মুখোজ্জ্বল করেছে, এখন গিয়ে জেল খাটুক, জেলের পাথর ভাঙুক।'

ঝাঁজের স্বরে কথাগুলো বলে মা আর বাবার সামনে দাঁড়ান নি, চলে যাওয়া ক্ষিপ্র গতিতেও বিক্ষোভ ফুটেছিল। বাবা সেদিকে তাকিয়ে দেখেন নি, চিন্তিত স্বরে, অনেকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'সেটা কোনো কাজের কথা না, জেল খাটবে কেন? বাবার স্বরে দ্বিধা আর উদ্বেগ ফুটেছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই গলার স্বর বদলিয়ে আবার বলেছিলেন, 'পাড়াটা তো ভালো না, ছোটলোকদের পাড়া। মদনারায়ণ দাসের গলি তো। বাপ্ ঠাকুরদার মতো ছেলেরা জন্মেই ব্যবসা আর দোকানদারি করতে যায়, লেখাপড়া ওদের কাছে গোমাংস।'

বাবা কথাগুলো শিউলী যা বোঝে, যে-একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল, কারোকেই ঠিক শুনিয়ে বলছিলেন না, রুদ্ধ স্বরে নিজের মনেই যেন বলছিলেন। শিউলী বলে উঠেছিল, 'শুধু ওপাড়ার ছেলে না, অন্য পাড়ারও ছিল।'

বাবা বলেছিলেন, 'অন্য পাড়ার হলেও, সেই এক গোত্রেরই সব। হরিহর দাসটা তো পাজীর পাঝাড়া। হয়তো থানায় নালিশ করার বুদ্ধি ও-ই দিয়েছে।'

বলতে বলতে বাবা দালান থেকে ঘরে ঢুকেছিলেন, এবং কয়েক মিনিট পরেই জামা কাপড় বদলিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ইতিমধ্যেই জ্ঞাতি-শরিকদের কনা চার-পাঁচ কাকা জ্যাঠা দাদারা এসে পড়েছিলেন। সংবাদটা যথেষ্ট তাড়াতাড়িই রটেছিল। তাঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে কাকী-জেঠিমাও কয়েকজন উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলের উদ্বেগ কতোটা ছিল বোঝা যায় নি, কৌতূহল তীব্র ছিল এবং একমাত্র জিজ্ঞাসা, 'রাখালকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে, কেন?'

বাবা কারোকে কোনো পরিষ্কার জবাব দেন নি, বলেছিলেন, 'ছেলেমানুষদের ব্যাপার। ঝগড়া মোকদ্দমা পুলিস থানা যারা করে বেড়ায়, এসব হচ্ছে তাদের বাজার গরম করার ব্যাপার। শোনো সব এদের কাছে।'

বলে, কারোকে ঠিক না শুনিয়ে দিয়েই বাবা দালান থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে-ছিলেন। শিউলী কিছু জিজ্ঞেস করতে, বারান্দা অবধি গিয়েও, কিছুই জিজ্ঞেস করেনি, কারণ সেটা পেছন ডাকা হয়ে যেতো। ও জানতে চেয়েছিল, বাবা কোথায় যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে দুজন জ্যাঠা ছাড়া সকলেই রান্নাঘরের দরজার কাছে

গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মায়ের কাছ থেকে বৃত্তান্ত শোনবার জন্য। শিউলী ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। মা হয়তো রান্না ঘরে কাঁদছিলেন, সকলের সান্ত্বনার কথা থেকে তা-ই মনে হয়েছিল, এবং তিন বছর বয়সের ভাইটির কান্নাও রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল। সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল, মা সন্তানসম্ভবা, যে-সন্তান অপ্রার্থিত, মায়ের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যেতো। কিন্তু শিউলীর বালিকাপ্রাণ উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়নি, নানান আতংকিত সংশয়ে ও জিজ্ঞাসায় মস্তিষ্ক পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পুলিস কি মেজদা আর ত্রিদিবেশকে মারবে? এতক্ষণ মারতে শুরু করেছে? পুলিসের মারের নানান বিভীষিকার শোনা কাহিনী তার মনে পড়েছিল। পুলিস—নামেই এক অতি ভয়ংকর বিভীষিকার মতোই মারাত্মক। যে-বিভীষিকার সংগে, চিন্তার মধ্যে জড়িত থাকে সরীসৃপের স্পর্শের মতো ঘৃণা। শিউলী ওর চোখের সামনে রাখালকে আহত রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিল, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল, মেজদা হাত জোড় করে কাঁদছে। কিন্তু কেন মারবে? পুলিস কি যাকে ধরে নিয়ে যায়, তাকেই মারে? পুলিস যে! পুলিস মারা ছাড়া কিছু জানে না। দড়ি দিয়ে বাঁধা, মারা ছাড়া পুলিস কিছুই জানে না। কিন্তু, রাখালকে পুলিস বেঁধে নিয়ে যায়নি। দাদাও সংগে গিয়েছিল। তবু কি পুলিস ওদের মারবে? দাদার সামনেই? শিউলীর আতঙ্কিত মনে পলকে পলকে জিজ্ঞাসা জেগেছিল, একের পর এক। ত্রিদিবেশদের বাড়ি থেকে কে গিয়েছে? ওর মামা? দাদারা কেউ? কিছুই জানতো না শিউলী। ওদের কি থানায় নিয়ে গিয়েই জেলে চালান করে দিয়েছে? বাবা কি সে জন্যই ছুটে চলে গেলেন? ত্রিদিবেশ কাল রাত্রে চা না খেয়েই চলে গিয়েছিল।

'দিদি, তুই কাঁদছিস?' বেলির স্বর শুনে সেই মুহূর্তেই শিউলী টের পেয়েছিল, ওর বুকের কাছে কেমন একটা কষ্ট লাগছে, মাথার মধ্যে ঝনঝন করছে। চোখে জল।

এক জ্যাঠার স্বর ঘরের মধ্যেই পিছনে শোনা গিয়েছিল, 'কেঁদে কী হবে, কাঁদিস না। রাখাল তো চুরি-ডাকাতি কিছু করে নি, কারোকে ছুরি-ডাণ্ডাও মারতে যায়নি। কল এলেকায়, বস্তিতে বাজারে রোজই খুন দাঙ্গা হচ্ছে। এ হলো ছেলেমানুষদের ঝগড়া বিবাদ মারামারি। নিশ্চয়ই ও-পাড়ার কোনো প্যাঁচোয়ার প্যাঁচ কষেছে। ছোটলোক তো! ছেলেপিলেদের মারামারি নিয়ে থানা পুলিস করছে। তবে ওই ছেলেটা ভালো না শুনেছি, ওই ত্রিদিবেশ না কী নাম।'

শিউলীর অনুভূতিসমূহ তখন, অতি তীব্র আলো অন্ধকারে নিকষ এবং ঝলকানো, যা অনেকটা দ্রুতগামী মেঘের নিচে জল স্রোতরেখার মতো। পলকে-পলকেই রঙ বদলায়, কোন থাকে বা ঝলকালিয়ে বাজে। ওর চোখের জল অচিরাৎ দাহ্য পদার্থে আগুন লাগার মতো ঝলকে উঠেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে বলেছে?'

জ্যাঠামশাই শিউলীর স্ফুরিত ঠোঁট লক্ষ করেননি, ওর অভিব্যক্তি বা স্বরে সম্ভবত সেরকম অনুমান তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল না, বলেছিলেন 'শুনেছি। জীবনের ভাগনে না কে ভাইপো? শুনেছি, লেখা-পড়া করে না, বিড়ি সিগারেট খায়, পাড়াতে ঘোরে। ওই ছেলেটার সংগে রাখালের মেশা ঠিক না।'

শিউলী জ্যাঠার দিকে তাকিয়েছিল [illegible] থমকেছিল ঠোঁট ঠোঁটের কুলে। প্রতিবাদের ভাষা নিশ্চয়ই তর্কের সৃষ্টি করবে, এবং তা শিউলীর করা উচিত হবে কী না স্থির করতে পারছিল না। জ্যাঠামশাই শিউলীর প্রাণ বিকৃতি লক্ষ করেননি, আবার বলেছিলেন, 'রাখালের ক্ষতি যদি কিছু হয়, ওই ছোঁড়ার জনাই হবে। প্রতাপ সে ছোঁড়াকে বাড়িতে আসতে দেয় কেন?'

শিউলী দাঁড়িয়ে শুনতে পারছিল না, সহ্যও করতে পারছিল না, এবং জ্যাঠামশাইয়ের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করেছিল মনে মনে। জ্যাঠামশাইকে কেবল অবিবেচক মনে হয়নি, বোকাও মনে হয়েছিল, কেননা জ্যাঠামশাই কেবল নিজের মন্তব্যই করছিলেন, শিউলীর দিকে তাকিয়ে দেখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। ও মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, 'শুনি শোন্। কী হয়েছিল, তুই নাকি সব ঘটনা জানিস? আমাকে আগাগোড়া ব্যাপারটা বল্ তো।'

'আমি কিছু জানি না।' স্পষ্ট অস্বীকারের মধ্যে শিউলীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। বেলি জ্যাঠামশাইয়ের দিকে দেখেছিল। জ্যাঠামশাইয়ের ভ্রূকুটি মুখে তখন বিস্ময় ফুটেছিল, অবাক স্বরে বলেছিলেন, 'জানিস না? তবে যে সবাই বলছে তুই মারামারির সময় সামনে ছিলি?'

শিউলী তখন জ্যাঠামশাইয়ের পাশ দিয়ে দরজার কাছে পৌঁছেছিল, বলেছিল, 'ত্রিদিবেশকে চারটে বদমাস ছেলে যখন মারছিল, তখন দেখেছিলাম।'

'কেন, মারছিল কেন?' জ্যাঠামশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন।

জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে পারুলও শিউলীদের স্কুলে পড়তো, শিউলীদের থেকে ওপরে পড়তো, পারুল সবই জানতো, অথচ বাড়িতে কোনো কথাই বলেনি। জ্যাঠামশাই কিছুই জানতেন না, অথচ ত্রিদিবেশকে বখাটে বলতে আটকায়নি। সমস্ত ব্যাপারটাকে উনি ছেলেমানুষের মারামারি ঝগড়া বিবাদ বলেই জানতেন। বাবা কাকা জ্যাঠামশাইরা এই রকমই হন। ছোটদের সব কিছুকে তাঁরা ছোট করে দেখেন। তিনি জানতেন না, ছেলেমানুষরা বড়দের মতো ইতরতা নোংরামি করতে পারে, এবং ছেলেমানুষরাই বড়দের মতো তার প্রতিবাদ করতে পারে, এবং শিউলী জানতো, তেরো বছরের বালিকা মেয়েদের দিকে পুরুষরা অনেক সময় কী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, যে কারণে, তেরো বছরের বালিকার মধ্যে সাবালিকার মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জ্যাঠামশাইয়ের প্রশ্নের মুখেই মোহন এসে দাঁড়িয়েছিল। শিউলী আর জ্যাঠামশাইয়ের কথার জবাব দেয় নি, দেবার কথা

মনেই ছিল না। মোহনকে দেখেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'ত্রিদিবেশদের বাড়ি গেছলে?'

মোহনের চোখে অনুসন্ধিৎসা এবং দ্বিধা। বলেছিল, 'গেছলাম। রাখালকেও ধরে নিয়ে গেছে নাকি?'

শিউলীর শুকিয়ে যাওয়া চোখ আবার ছলছলিয়ে উঠেছিল, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'আমি পড়তে বসেছিলাম।' মোহন বলেছিল, 'দিদি এসে আমাকে বললো, বাড়ির সামনে পাড়ার কয়েকজন নাকি বলাবলি করছে রাখাল আর ত্রিদিবেশকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। তা-ই শুনে ত্রিদিবেশদের বাড়ি আগে গেছলাম, তারপর এখানে এলাম। আমি জানতাম সবই, ত্রিদিবেশ কাল রাত্রে আমাদের বাড়ি গেছলো।'

ত্রিদিবেশ কাল রাত্রে মোহনদের বাড়ি গিয়েছিল কথাটা শোনা মাত্রই শিউলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'কখন?'

মোহন বলেছিল, 'রাত্রি আটটা-টাট্টা হবে।'

শিউলী মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, তারপরে একবার জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে। জ্যাঠামশাই মোহনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। ঘটনার কিছু শুনবেন তার মুখে সেই রকম প্রত্যাশা, কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কে? কাদের বাড়ির ছেলে?'

মোহন বলেছিল, 'আমার বাবার নাম চারুমোহন চক্রবর্তী।'

জ্যাঠামশাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'অ, চারুবাবুর ছেলে তুমি?'

ইতিমধ্যে কাকাদের দু'একজন শিউলী-দের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যেন রাস্তার কোনো ঘটনা ঘটে যাবার পরে একটা-একটা জটলার কাছে গিয়ে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন। রান্নাঘরে মায়ের কান্না তখন প্রশমিত হলেও জেঠি এবং কাকীমা-দের নানান রকম কথা শোনা যাচ্ছিল। পুলিসের আসা এবং চলে যাবার পরে গোটা বাড়িটার চেহারাই যেন বদলিয়ে গিয়েছিল এবং জ্ঞাতি অন্যান্য ভাইবোনেরাও আসতে আরম্ভ করেছিল, তাদের সঙ্গে পাড়ারও কোনো কোনো ছেলেমেয়ে এবং দু'একজন মহিলাও, যা থেকে বোঝা গিয়েছিল পাড়ায় এবং শহরে গ্রেপ্তারের বিষয় নিয়ে নানারকম আলোচনা চলছে। বাড়িতে বেশ একটা ভিড় লেগে গিয়েছিল।

শিউলী ভাবছিল, গত রাত্রে চায়ের কাপ না ছুঁয়ে নিঃশব্দে ত্রিদিবেশ এখান থেকে মোহনদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু এ-বাড়ির ঘটনার কোনো ছায়া মোহনের মুখে দেখা যাচ্ছিল না। জ্যাঠামশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ঘটনাটা কী ঘটেছিল মোহন, বলো তো শুনি?'

মোহন এসেছিল হাফপ্যান্টের ওপর সাদা খদ্দরের হাফশার্ট পরে। ও মোটামুটি ঘটনা যা ঘটেছিল, বলেছিল। জ্যাঠামশাই ঘর থেকে দালানে আসতে আসতে বলে-ছিলেন, 'অহ', ওখানেই গোলমাল হয়ে গেছে। আসলে উচিত ছিল বটতলায় ঘটনা ঘটে যাবার পরেই...।'

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কাকারা এবং অন্য জ্যাঠামশাই, সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘটনার বিষয় এবং উচিত অনুচিত আলোচনা শুরু করেছিলেন। মোহন শিউলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'দা নন্দদা কোথায়?'

'বড়দা মেজদার সঙ্গে থানায় গেছে। একটু পরে বাবাও বেরিয়ে গেল।' শিউলী বলেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'ত্রিদিবেশ কাল রাত্রে কী বলেছিল?'

মোহন স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল, 'সারা দিন যা যা ঘটেছে, সবই বলেছে।' শিউলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ, কী বললো?'

মোহন একটু যেন অবাক জিজ্ঞাসু চোখে চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'ওই তো, যা হয়েছিল তা-ই বললো। শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। ত্রিদিবেশ টাকুকে শাস্তি দেবার জন্য একটা ভীষণ মতলব করেছে।'

মোহনের উজ্জ্বল চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। শিউলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী?'

'এখন বলতে পারবো না।' মোহন বলেছিল, 'ত্রিদিবেশ এখন কারোকে বলতে বারণ করেছে।' বলেও মোহন হেসেছিল, সম্ভবত ত্রিদিবেশের মতলবের কথাটা মনে করেই এবং বলে উঠেছিল, 'ত্রিদিবেশটা পাক্কী আছে। টাকুকে ও ঠিক সাজা দেবে। আমাকে যে কেন ডেকে নিয়ে গেল না।'

মোহন আফশোস করছিল এবং পর মুহূর্তেই শিউলীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'ত্রিদিবেশদের বাড়িটা অদ্ভুত। কেউ থানায় যায় নি।'

'সে কি, কেউ না?' শিউলী অবাক স্বরে বলেছিল।

মোহন বলেছিল, 'কেউ না। আমি ওর মেজদাকে জিজ্ঞেস করতে বললো, 'কেন যাবো? আমাদের বলে কি ওসব গুণ্ডামি করতে গেছলো? গুণ্ডামি করেছে, এখন জেল খাটুক। আর না হয় তো হেডমিস্ট্রেস মধুদি এখন বাঁচাক। কাল তো খুব আদর করে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছলো।'

ত্রিদিবেশের মেজদার মুখটা শিউলীর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। মোহন আরো বলেছিল, 'ত্রিদিবেশের মামা বলছিলেন একেই তো ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার ওপরে হেডমিস্ট্রেস-টিস্ট্রেস লাই দিয়ে মাথায় তুলেছে। এর নাম শিক্ষা! এ সব হচ্ছে দিন দিন, লেখাপড়া সব গোল্লায় যাবে।'

'আর ওর মা?' শিউলী জিজ্ঞেস করেছিল।

মোহন বলেছিল, 'মাসীমাকে আমি দেখতে পাই নি।'

মোহনকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। শিউলী বলেছিল, 'আচ্ছা মোহন, পুলিস ওদের কী করবে?'

মোহনের মুখে অসহায় উদ্বেগ প্রকটিত হয়েছিল, বলেছিল, 'আমি জানি না।'

'মারবে?' শিউলী জিজ্ঞেস করেছিল।

'মারবে?' মোহন কথাটা যেন নিজেই জিজ্ঞেস করেছিল এবং সঠিক কোনো জবাব ও জানতো না, বলেছিল, 'মারবে নাকি? জানি না তো? মারবে কেন?'

কথাগুলো পর পর জিজ্ঞাসার সুরে উচ্চারণ করেছিল এবং তারপরেই বলেছিল, 'মনতোষের বাবার সঙ্গে থানার দারোগার খুব ভাব আছে। দারোগার সঙ্গে ঘুরেও বেড়ায়। নন্দদা গেছেন তো?'

মোহন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল। শিউলী বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে বোধ হয় মারবে না।' বালক মোহন যেন একটু স্বস্তির সন্ধান করছিল এবং বলেছিল, 'আমি বরং বকুলতলায় যাই। চন্দরদা কী বলেন শুনিগে, আঁ?'

শিউলী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়েছিল। মোহন যাবার আগে বলে গিয়েছিল, 'কলকাতা থেকে মধুদি এসে পড়লে মধুদি নিশ্চয়ই ওদের ছাড়িয়ে আনবেন।'

শিউলীর যেন সেই প্রথম মনে পড়েছিল
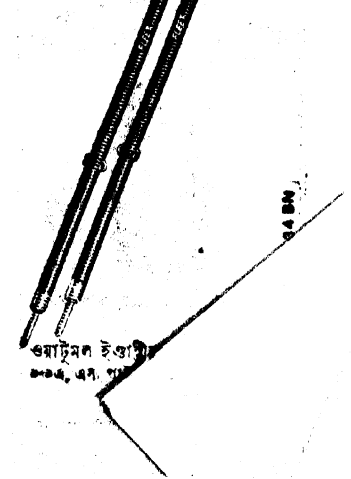
একটু পরেই স্নান করে খেয়ে ইস্কুলে যেতে হবে, ইস্কুলের পড়া কিছুই হয় নি, বা সেই দিনের ক্লাসের পড়া ছিল। কিন্তু পড়ার কথা চিন্তা করতে পারছিল না। কাকা জ্যাঠামশাইরা তখন উঠোনে নেমে কথাবার্তা বলছিলেন। উঠোনে একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গিয়েছিল। সেই সময় শৈবাল আর নমিতা এসেছিল। ঘরের মধ্যে বসে শংকা আর রাগের কথা ওরা বলাবলি করছিল। শংকা—ত্রিদিবেশ আর রাখালের জন্য রাগ—দুষ্কৃতকারীদের প্রতি, যার সঙ্গে জড়িত বয়স্ক অভিভাবকরাও।

বেলা নটার সময় বাবা আর বড়দা ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আগে রাখাল, পিছনে ত্রিদিবেশ। ওদের মুখে সংকোচের হাসি। শিউলী, শৈবাল আর নমিতার সঙ্গে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওদের চোখে শুদ্ধী-উপচানো বিস্ময়, বীর বন্দনায় উজ্জ্বল।

বাবা গলা তুলে বলেছিলেন, 'একটু খাবার-দাবার কিছু দাও, আর একটু চা।'

রাখালের সঙ্গে ত্রিদিবেশ দালানে ঢুকেছিল। শিউলীর দিকে তাকায় নি।

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

ডার্করুমের নানা ক্রিয়াকৌশলের মধ্য দিয়ে এক-একটি স্থিরচিত্র নিদর্শনে কত বিচিত্রতর রূপদান করা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত দিলীপ ভৌমিকের স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে। বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড় থেকে শুরু করে সন্ধ্যায় ও সকালে সমুদ্রের মনোরম রূপ, বলিরেখা সর্বস্ব বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার প্রতিকৃতি তথা বিশেষ কোন ক্ষণ-মুহূর্তে তোলা কোনও স্থিরচিত্র দেখে সাধারণ লোক মুগ্ধ হন। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় স্থিরচিত্র বহুকাল থেকেই প্রচলিত,

স্থিরচিত্র নিদর্শন —দিলীপ ভৌমিক

স্থিরচিত্র শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ছাড়া এ শ্রেণীর নিদর্শনে কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না, যদিও স্বাভাবিকতার দিক থেকে এগুলির মূল্য অনস্বীকার্য। জাপান ও পাশ্চাত্ত্য দেশে স্থিরচিত্র শিল্প আজ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, বিশেষ করে নিত্য নতুন ক্রিয়াকৌশলের উদ্ভাবনের সঙ্গে ঐ দেশগুলির স্থিরচিত্রশিল্পে ক্যামেরার চেয়ে ডার্করুমের পরীক্ষা কার্যকলাপের ভূমিকাই অধিক। দিলীপ ভৌমিক বিলেতে ও জার্মানীতে বিজ্ঞান বিষয়ে, উচ্চতর শিক্ষালাভ করে ফ্রাঙ্কফুর্টের ব্যাটেল ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সায়েনটিস্ট ও পরে ইলেকট্রনিক মাইক্রোগ্রাফি ও মাইক্রোফটোগ্রাফি ল্যাবরেটরীর প্রধান হিসাবে কাজ করেন। তাঁর স্থিরচিত্র নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়ে দিলীপ ভৌমিক প্রধানত এই নতুন ও উন্নততর ক্রিয়াকৌশলই দেখাতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর স্থিরচিত্র নিদর্শনগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। জানেন ত? দিলীপ ভৌমিক বললেন, আজকাল প্রতিযোগিতার যুগ—দোকানে কোন জিনিস কিনতে গেলেই প্যাকেটের ডিজাইনটি চোখে পড়বে, সুতরাং নিত্য নতুন স্থিরচিত্র বা ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য না থাকলে বাজারে কোনও জিনিস কাটবে না—বিশেষ করে রপ্তানী ব্যাপারে লাভবান হতে গেলেও পাশ্চাত্ত্য দেশের মত এদেশেরও সেইভাবে তৈরী হওয়া উচিত। সত্যি কথা। কালো সাদা ও রঙীন বিভিন্ন নিদর্শনেই দিলীপ ভৌমিক বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিল্পী আলোক ব্যবহারে যে দক্ষ তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ন্যুড নিদর্শনে। ওপর থেকে আলোক সম্পাতের ফলে স্থিরচিত্রটিকে খোদাই করা মার্বল মূর্তি মনে হয়। টোন পৃথকীকরণ, নেগেটিভ কপির ফিলটার ফয়েল এনলার্জমেণ্ট, ফ্রন্ট প্রোজেকসন, নেগেটিভ কাট-আউট ও অন্যান্য ক্রিয়াকৌশলের মধ্য দিয়ে দিলীপ ভৌমিক যে নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি দেখে ঠিক সাধারণ স্থিরচিত্র মনে হয় না—রেখা, রঙ ও আলোকবিন্যাসের বৈচিত্র্য গুণে সেগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই গ্রাফিক শিল্পবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শায়িতা নারী, বিয়ার গ্লাস, একই নেগেটিভের বিভিন্ন কপি অবলম্বনে রচিত রঙীন গোলাকার নিদর্শন—মহিলা ও টেবল ফ্যান এবং বিশেষ করে রেখা ও কারুকার্য প্রধান কয়েকটি নিদর্শনের নাম করা যায়। ডার্করুমের নানা ক্রিয়াকৌশলে রচিত নিদর্শনগুলি জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য স্থিরচিত্রশিল্পী একটি টিকাপত্র বিতরণ করেন। বলা বাহুল্য, উন্নততর এই স্থিরচিত্র প্রদর্শনী দেখে অনেকেই নতুন ক্রিয়াকৌশল বিষয়ে জানতে পারেন—বিশেষত এটি দেখে তরুণ স্থিরচিত্রশিল্পীরা লাভবান হবেন।

✻

সাংস্কৃতিক পরিক্রমার উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী অসিত পালের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে ২৫টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। তরুণ শিল্পী হিসাবে অসিত পাল সুপরিচিত—ইতিপূর্বে তিনি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তাছাড়া অন্যান্য যৌথ প্রদর্শনীতেও যোগদান করেছেন। সমকালীন রীতিতে কাজ করলেও শিল্পী সাবজেক্টিভিজমের পক্ষপাতী। প্রদর্শনীভুক্ত দুএকটি ছবি ইতিপূর্বেই দেখা—অবশিষ্টগুলির মধ্যে কয়েকটিতে শিল্পীর চিন্তাধারা ও অঙ্কনরীতির পরিচয় মেলে। শিল্পীর কাজে রঙ ব্যবহার রীতিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বিভিন্ন রঙ নানাভাবে ব্যবহার করে শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন—কয়েকক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন মুখ্যত সুন্দর কারুকার্যের অবতারণা করে। এই প্রসঙ্গে লাল ও বেগুনী রঙ অবলম্বনে রচিত কারুকার্য প্রধান ল্যান্ড ২-১৯৭৩-এর নাম করা যায়। পরিকল্পনা ও ড্রয়িং-এর দিক থেকে 'পয়েতা-১৯৭৩' অনেকের চোখে পড়ে। আর একটি

ওয়াল্স আপঅন এ টাইম —অসিত পাল

ছবিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—মিডনাইট ফ্লাওয়ার-১৯৭২। রেখা ব্যবহার ও সেই সঙ্গে রঙের নানা স্তরভেদের মধ্য দিয়ে শিল্পী এই ছবিটিতে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে অ্যানউন্সমেণ্ট-১৯৭৩, ওয়াল্স আপঅন এ টাইম ও বিশেষত কালি-কলমের ড্রয়িং ফসিল-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

✻

বিদেশের অঙ্কন শিক্ষা পদ্ধতিতে

রঙ ব্যবহাররীতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যেটি ঠিক এদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের কাছে দেখা যায় না। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত শিল্পী অঞ্জলি এলা মেনন-এর প্রদর্শনী দেখে কথাটি মনে এল। শিল্পী যে ফ্রান্সে অঙ্কণবিদ্যা শিক্ষা করেছেন তা বিভিন্ন নিদর্শন দেখেই জানা যায়। অধিকাংশই প্রতিকৃতি তথা মূর্তিপ্রধান। শিল্পী স্বভাবতই নানা গভীর রঙের পক্ষপাতী এবং ব্যবহার-রীতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সবগুলিতে না হলেও কয়েকটি ছবিতে একটি নিছক সরলতার আভাস মেলে, যেমন ১৩নং ছবি। দুএক স্থলে রঙ ব্যবহাররীতি দেখে গগাঁর কথা মনে পড়ে যায়, যেমন জেহরা। নতুনতর পরি-কল্পনা ও বিশেষ করে সবুজ রঙবৈচিত্র্যের জন্য বাগানে শায়িতা ঈভ অনেকের নজরে পড়ে।

*

প্রতি বছরের মত এবারেও স্থানীয় শিল্পীদের উদ্যোগে মার্কেট স্কোয়ারে চারুকলা মেলার উদ্বোধন হয়। বহু তরুণ ও শিক্ষার্থীর আঁকা নানা ছবি মেলাতে দেখা গেলেও সুপরিচিত শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য কোনও নিদর্শন এবারে চোখে পড়েনি। তা সত্ত্বেও মেলার উদ্দেশ্য যে অনেকাংশে সফল হয়েছে, তা প্রতি সন্ধ্যায় জনসাধারণের উপস্থিতি দেখে বোঝা যায়। অনেকেই মেলায় ঘুরে ফিরে নানা শিল্প নিদর্শন দেখে আনন্দ লাভ করেন, যদিও ক্রেতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম মনে হয়। বলা বাহুল্য, এবারেও কয়েকজন শিল্পী মেলায় বসে পেনসিলে প্রতিকৃতি আঁকেন এবং দর্শকদের মধ্যে অনেকেই স্বল্প পারিশ্রমিক দিয়ে নিজ নিজ প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেন। ছবি ছাড়া কয়েকটি ভাস্কর্য নিদর্শন, ২২ পল্লীর অঙ্কন প্রতি-যোগিতায় ছেলেমেয়েদের আঁকা কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন এবং সেই সঙ্গে [illegible]দ ও সংস্কৃতি পরিক্রমা সংস্থার উদ্যোগে রাখা কয়েকটি উল্লেখ্য সচিত্র বইও চারুমেলায় চোখে পড়ে। বর্তমান যুগের জীবনযাত্রায় ছবির প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষ করে ছবি কেনা বিষয়ে যাতে জনসাধারণ অধিকতর সচেতন হন সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শিল্পকলা বিষয়ে নানা আলোচনা সভা ও সুপরিচিত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একত্র করে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ বিষয়েও আলাপ আলোচনা হয় এবং সুপরিচিত শিল্পী সাহিত্যিক ও কলা-সমালোচক এগুলিতে যোগদান করেন।

চিত্রপ্রিয়
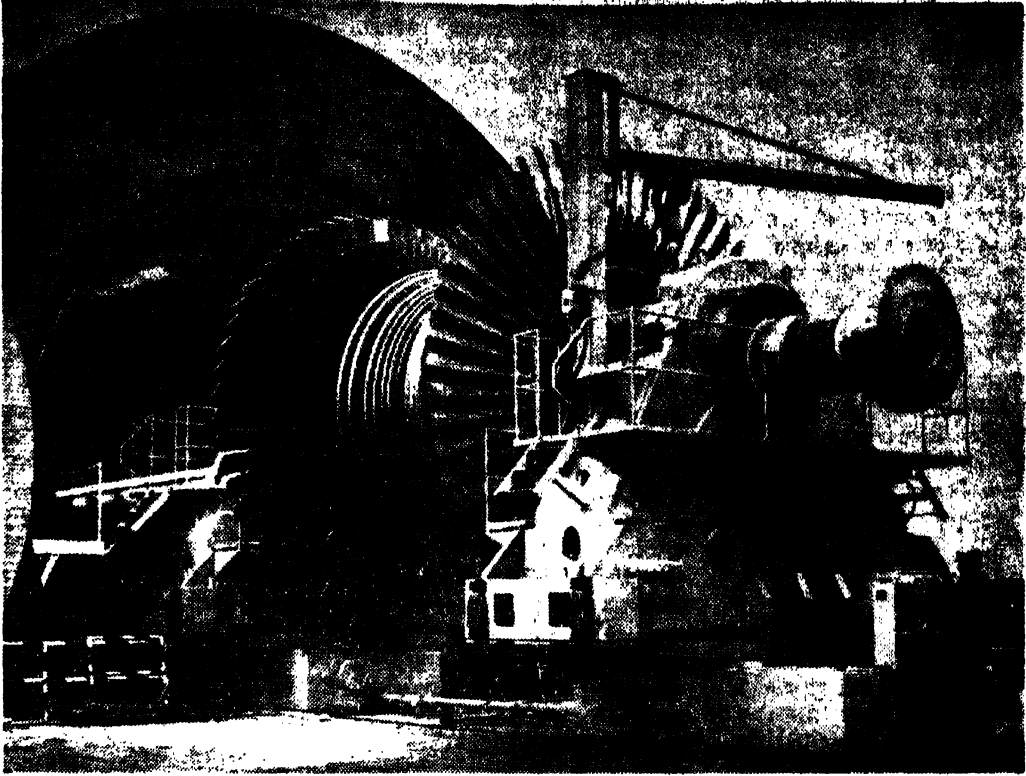
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ঠিক এই ধরনেরই বড় বড় টারবাইন পৃথিবীর নানা দেশে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সমস্ত টারবাইন আকারে যেমন বড়, প্রযুক্তিগত জটিলতাও এতে তেমনি প্রচুর। কাজে লাগানোর আগে শেষবারের মত এটিকে পরীক্ষা করে নেওয়াও একটি বড় রকমের সমস্যা। অথচ এ কাজটি না সেরে কোন টারবাইন বাজারে ছাড়া হয় না। ছবিতে অতিকায় একটি টারবাইনকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে লক্ষ করুন। পরীক্ষা করার কাজটি চলছে পশ্চিম জার্মানির মুলহাইম-আন-রুহর-এর একটি কারখানায়। পৃথিবীর বৃহত্তম ত্বরক যন্ত্রটি এখানে ওই টারবাইনটিকে সজোরে ঘুরিয়ে শেষবারের মত দেখে নেয়, ভবিষ্যতে ঘোরার সময় কোন অসুবিধে হতে পারে কী না। ২০ মিটার লম্বা এবং ১৩·৫ মিটার একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে রেখে এটিকে ঘোরানো হয়। এবং ঘোরানোর সময় ওই সুড়ঙ্গটি ১৬০ টন ওজনের একটি দরজা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। টারবাইনটি সুড়ঙ্গের মধ্যে যখন ঘোরে তখন তার সর্বোচ্চ গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০ মাইলের মত।

বিশ্ববিজ্ঞান

মৃত্যু যখন শিয়রে

দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ন যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জবাট-পর অবহুঁ ন যাওব,
সব কছু টুটাইব বাধা।

—রবীন্দ্রনাথ

পার্থিব এই জগৎ থেকে চিরপ্রস্থানের পালা শেষ করতে স্বাভাবিক মনের ক'জন মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কামনা করে বলা শক্ত। চির-অমরত্বলাভ মানুষের [illegible] আকাঙ্ক্ষা কী না সে প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দার্শনিকরাই হয়ত যোগাতে পারেন। তবু সত্য এই, জৈবিক ধর্মের একের পর একটি ধাপ অতিক্রম করে যখন কেউ তার জীবনের সমাপ্তি মুহূর্তের প্রান্তিকে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারে, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে তার চির-প্রস্থান এবার আসন্ন। মৃত্যু তার শিয়রে অপেক্ষমান। আর এই বোধ যখনই তার মধ্যে ঘনীভূত হয়, চিরায়ত আসক্তিমুহূর্তের মধ্যে ত্যাগ করে তাকে যেন এক পরম-বিমুক্তির দিকে ঠেলে দেয়। তখন মৃত্যুকে সে গ্রহণ করতে পারে কিনা, এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করতে পারেন একমাত্র দার্শনিক। তবু তারই জন্যে তার একমাত্র প্রতীক্ষা। সে বুঝতে পারে: 'বন্দরের কাল হল শেষ'।

পশ্চিম জার্মানির বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডঃ লোথার ভিৎসেল আর্ল্যাঙেন ইউনিভার্সিটি হসপিটেল-এর জনৈকা রোগিণীকে প্রশ্ন করেছিলেন একের পর এক। ভদ্রমহিলার বয়েস ৬৪। হাসপাতালে ভর্তি করার পর বিশিষ্ট চিকিৎসকরা তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। উপসর্গ ছিল অনেক। কখনও মাথা ধরা। কখনও হজমের গোলমাল। মাঝে মাঝে ভুল

বকছেন। অথবা পাথরের নিস্তব্ধতা নিয়ে শিলিভূত।

রোগটি কী?

বলা শক্ত। বলেছেন ডঃ ভিংসেল। 'আসলে তাঁর শরীরের মধ্যে সব কিছু যেন জট পাকিয়ে রয়েছে।'

মাঝে মাঝে তাঁর জ্বর হচ্ছিল। কোন কিছু খেতে চান না। আবার কখনও বা নানারকমের বায়নাক্কা। এটা খাব, ওটা খাব। ওকে ডেকে দাও, ওর সঙ্গে কথা বলব। আবার সাময়িকভাবে অতলস্পর্শী বিমর্ষতার মধ্যে কখনও বা তিনি ডুবে গেলেন।

আর এইভাবে চলল পর পর কয়েকদিন। চিকিৎসক এবং সেবিকারা প্রায় হিমশিম হয়ে উঠলেন। তবু যতটা সম্ভব ওঁকে সুস্থ করে তোলার জন্যে কোন ত্রুটিই তাঁরা রাখেন নি।

প্রশ্ন এই: রোগটা কী?

চিকিৎসকরা বললেন, বার্ধক্যজনিত রোগ।

অস্পষ্ট উত্তর। কারণ রোগ যখন, তখন বলুন, ক্যানসার, ডায়েরিয়া টিটেনাস কত রকমেরই তো রোগ আছে? তার যে কোন একটির নাম বলা যায় না?

চিকিৎসক বললেন, না। স্থূলে শারীরযন্ত্রের স্বাভাবিকতা বলতে যা বোঝায়—ওঁর শারীরযন্ত্র এখন তেমনটি নয়। দীর্ঘকাল পরিশ্রম করার পর আপনার মোটরগাড়িটি যেমন অকেজো হতে শুরু করে। আজ তার চাকার রিমটি ভাঙল। কাল পিস্টন খুলে গেল, অকর্মণ্যতার লক্ষণ তার সর্বাঙ্গে। নতুন গাড়ির পিস্টন খুলে গেলে বলা হয় বলছেন, পিস্টন নষ্ট হয়েছে, তাই গাড়ি এখন অচল। সেটি সারালেই গাড়ি চলবে। কিন্তু পুরনো গাড়ির অমন দশা হলে, সঠিক উত্তর কী দেওয়া যাবে, বলুন? তখন একটা কথাই বলা চলে, পুরনো গাড়ি। এ এখন ঝরঝরে হয়ে গেছে।

সেই রোগিণীর দশাও তখন তেমনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যত রকমের রোগের কথা লেখা আছে, তার সবগুলিই তাঁর মধ্যে যেন দানা বেঁধেছে। তেমন ক্ষেত্রে রোগের নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর একটিই হতে পারে: তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন।

বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রই এ ধরনের রোগীর জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়েই থাকেন। তাঁরা আগে থেকেই বুঝতে পারেন, পৃথিবীটা কখন তাঁর কাছে নিষ্প্রদীপ হয়ে যাবে।

ডঃ লোথার ভিংসেলও বুঝেছিলেন।

তাই, যথাসময়ে রোগিণীটিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, বলুন, আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? নিঃসংকোচে বলুন, কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? আমরা আপনাকে ভাল করে তুলতে চাই।

রোগিণীর সারা মুখে তখন অদ্ভুত নির্লিপ্ততা। তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। আপনারা অনেক কিছুই আমার জন্যে করলেন।' তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু-হাসির রেখা। মনে হল সেটুকু হাসিও যেন তাঁর কারোর কাছ থেকে ধার করা। তারপর বললেন, 'আমি জানি আমি মরতে চলেছি।'

ডঃ ভিংসেল প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করে বুঝলেন—?

রোগিণীর উত্তর: ভেতর থেকেই আমি বুঝতে পারছি। আমার অনুভূতিই এ কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। এখন ওষুধপত্র বা কোন রকম সেবা আমার জন্যে বৃথা।

ডঃ ভিংসেল: আপনি কি মনে করেন, মৃত্যুর পরও আবার জীবন আছে?

রোগিণী: শুধু বিশ্বাসই করি না। আমি জানি, মৃত্যুর পরও জীবন আছে।

ডঃ ভিংসেল-এর সঙ্গে ওই রোগিণীর এটাই শেষ কথাবার্তা। এর পর আর কারোর সঙ্গে তিনি কোন কথা বলেন নি। ভদ্রমহিলা কয়েক ঘণ্টা পরেই মারা যান। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে।

ডঃ ভিংসেল-এর বক্তব্য, এ ধরনের রোগীদেরই বলা হয় 'টারমিনাল কেসেস'। বাংলায় হয়তো বলা চলে বার্ধক্যজনিত রোগ। এ ধরনের মোট ১১০ জন রোগীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎকার করেছেন। সাক্ষাৎকার করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। ওই সব সাক্ষাৎকারের সময় রোগীরা মোটামুটিভাবে যা বলতে চেয়েছেন তার সার কথা: মৃত্যুকে কেউই আর তাঁরা ভয় পান না। বরং তাঁরা সবাই সজাগ যে, মৃত্যু অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার জন্যে তারা প্রস্তুত। পার্থিব জগতের প্রতি মুহূর্তে যত রকমের আসক্তি, সবই অপসৃত হয়। বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন—সব একাকার। পরিবর্তে একটি ধারণাই তাঁদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়: পৃথিবীর হাটে তাঁরা যেন পৃথক সত্তা। এ পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গে কোন সম্পর্কই যেন কোন দিন তাঁদের ছিল না। মৃত্যুকে নিজের বলেই তাঁরা স্বীকার করে নেন।

অবশ্য ওই ১১০ জনের মধ্যে মাত্র দুইজন ডঃ ভিংসেল-এর প্রশ্নে কিছুটা যেন চমকে উঠেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ভীতি এবং উদ্বেগের চিহ্ন তাঁদের সারা মুখে ফুটে উঠেছিল। তাঁরা বলেছিলেন, মৃত্যুকে তাঁরা চান না। এই পৃথিবীতে আরও কিছুকাল, তাঁরা বেঁচে থাকতে চান।

ওই ১১০ জন রোগীর প্রত্যেককে—যখন বোঝা গেছে কেউই আর তাঁরা বাঁচবেন না—ডঃ ভিংসেল সতর্কভাবে তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আপনি কি মনে করেন, মৃত্যু আপনাকে এবার গ্রাস করবে?

উত্তরে সবাই বলেছেন, জানি, এযাত্রা আমি মরব।

প্রশ্ন: দৈহিক কোন কষ্ট পাচ্ছেন? অথবা ঠিক অন্তিম মুহূর্তে যে ধরনের দৈহিক কষ্ট আমরা কল্পনা করি, যদি সেটা আসে, এমন সব কথা ভেবে আপনি ভয় পাচ্ছেন না তো?

উত্তর: না। ভয় কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?

প্রশ্ন: মৃত্যু এগিয়ে আসছে, এ কথা জেনেও মনের দিক দিয়ে আপনি কোন কষ্ট পাচ্ছেন না?

উত্তর: না।

ডঃ ভিংসেল বলেছেন, মাত্র দুইজন ছাড়া সবার মুখে এই একই ধরনের উত্তর। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মানুষ কীভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করে, এটা বুঝে নেওয়ার জন্যেই ডঃ ভিংসেল এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেছিলেন। এবং এর ফলে মিশ্র যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানীই নন, সর্বসাধারণের মনেও ওই অভিজ্ঞতা বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি ডঃ ভিংসেল-এর এই অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন পশ্চিম জার্মানির একটি মেডিক্যাল জার্নাল Medizinische Klinik

*

ডঃ ভিংসেল দেখেছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ওই ১১০ জনের প্রত্যেকেই অদ্ভুত শান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ওঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা আগেও মনের দিক দিয়ে যথেষ্ট স্বাভাবিক ছিলেন। এবং কম করেও প্রতি চারজনের মধ্যে একজন মৃত্যুর পনের মিনিট আগেও যে সব প্রশ্ন ওঁদের করা হয়েছিল, সেগুলি বুঝে ওঠার মত ক্ষমতা তাঁরা হারান নি। এবং যথাযথ উত্তরও দিয়েছেন।

চব্বিশ ঘণ্টা আগেই অর্ধেকেরও বেশী রোগী বুঝতে পেরেছেন, মৃত্যু এগিয়ে আসছে। ৫৬ জন বলেছেন: জীবন সম্পর্কে ওঁদের আর কোন তৃষ্ণা নেই।

ডঃ ভিংসেল মন্তব্য করেছেন: ১১০ জনের মধ্যে ৬১ জন বলেছেন, ওঁদের বিশ্বাস মৃত্যুর পরও জীবন আছে। হয়তো ওঁরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন। এবং রোগ যন্ত্রণা যত বাড়ে, ওঁদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসও যেন বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে বাঁচার জন্যে উৎকণ্ঠা কমে যায়। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দৈহিক কষ্ট যেন কষ্টই মনে হয় না। কিন্তু ঠিক অন্তিম মুহূর্তে হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মত ওঁদের অনেকেই যেন আবিষ্কার করেন: বেঁচে থাকটা দরকার।

মুশকিল এই, মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে কোন রোগীর অবস্থা কী পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, তার মানসিক অবস্থাটা

কী রকম, এ সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ যোগান খুবই শক্ত কাজ। কারণ সব কিছুই তখন এমন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে ঘটতে থাকে যে সে অভিজ্ঞতা একমাত্র যিনি মৃত্যু-পথযাত্রী তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব।

তবু যথেষ্ট সতর্কতার সংগে অনুসন্ধান চালিয়ে যেটুকু বিবরণ ডঃ ভিৎসেল যোগাতে সমর্থ হয়েছেন তার সবটাই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

যেমন ধরুন, ৩৪ বছর বয়স্ক একজন ক্যানসার রোগীর কথা। ডঃ ভিৎসেল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখন কেমন বুঝছেন?

উত্তরে রোগীটি বলেছিল, কেমন আবার, আমি তো জানি, আমার মৃত্যু আসন্ন। তবে বুঝতে পারছি না, মরতে আমি কেন ভয় পাচ্ছি না।

মৃত্যুর পূর্বে ওই রোগীর এটাই ছিল শেষ বক্তব্য।

ছিয়াত্তর বছর বয়েসের জনৈক ব্যাংক-কেরানীকে মৃত্যুর পূর্বে ডঃ ভিৎসেলের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: জীবনের সমস্ত আশা আমার মিটে গেছে। জীবন নিয়ে অনেক নাড়াচাড়াই তো করলাম। এর শক্ত পাথরের উপর বহুবার আমার পতন ঘটেছে। জীবনের ওপর আর কোন আকাংক্ষা নেই। জানি, ঘাতপ্রতিঘাতে আমি অনেকটা সোমত্ত হয়ে উঠেছি। তবু ভয় হয়, যদি বেঁচে উঠি, হয়তো আর বাস্তবের সংগে তাল ঠুকে চলতে পারব না।

জীবন সম্বন্ধে সংশয়? হয়তো বা। হাসি-কান্নার পর এক পরম নির্বিকল্পভাব হয়ত শেষ মুহূর্তে মানুষের সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করে বলেই, ফেলে আসা দিনগুলিতে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে যে সংগ্রাম এবং আগ্রহ—তার কিছুই তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে মুক্তিই যেন তার কাছে তখন একান্ত কাম্য হয়ে দেখা দেয়।

বস্তুত, মৃত্যুর ঠিক আগে মানুষের মধ্যে কী কী ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে। ওই সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল কোথাও বা এক রকম, কোথাও বা সম্পূর্ণ বিপরীত।

যেমন ধরুন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, প্রথম দিকে যখন কেউ ভীষণ কোন রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সে বিশ্বাসই করতে পারে না, সে কখনও মরতে পারে। তার মৃত্যু আসন্ন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন ক্রমে ক্রমে সে মৃত্যুর আরও কাছাকাছি হয়, তখন মৃত্যুর কথা বললেই সে ক্ষেপে যায়। তার উত্তর: আমি কেন? কেন আর কেউ নয়? এই সময় চিকিৎসক এবং রোগীর আত্মীয়দের যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

তৃতীয় পর্যায়টি অতিক্রান্ত হয় খুবে দ্রুত লয়ে। মৃত্যুপথযাত্রী তখন মনে-প্রাণে চায়, সে বাঁচুক। এর জন্যে দরকার হলে ঈশ্বরের সংগেও সে আপস করার চেষ্টা করে। কখনও বলে, হে ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও। তোমাকে আমি পুজো দেবো এবং ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্যায় কাটে পুরোপুরি প্রায় বিষাদের মধ্যে। মা অথবা বাবারা ভাবেন, 'আমি না থাকলে ছেলেমেয়েরা চালাবে কী করে? মৃত্যুপথযাত্রীর তখন নিকট আত্মীয়-পরিজনদের কথাই যেন একমাত্র ভাবনা।

পঞ্চম পর্যায়ে রোগী মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করে। বলতে পারেন, এই সময় থেকেই সে নিজেকে অন্তর্মুখী করে তোলে, পার্থিব জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

ডঃ ভিৎসেল-এর বক্তব্য, এই সময় রোগীর আত্মীয়পরিজনদের সামলানোটাই বড় দায়িত্ব। এবং সে কাজটিও খুব শক্ত হয়ে পড়ে।

তবে উল্লেখযোগ্য এই গবেষণার সব চাইতে বড় দিক এই: এক, যাঁদের ধর্মে অবিচল বিশ্বাস এবং যাঁরা মনে-প্রাণে নাস্তিক, তাঁদের কেউই মৃত্যুকে ভয় পান না। দুই, বয়স্কদের চেয়ে কম বয়স্করা মৃত্যুকে ভয় করে বেশী। তিন, স্ত্রী এবং পুরুষ মৃত্যুকে একইভাবে আমন্ত্রণ করে।

বলা বাহুল্য, ডঃ ভিৎসেল এবং তাঁর সতীর্থদের এই গবেষণা 'মৃত্যু'র মত একটি মানবিক প্রশ্নের সমাধানের পথ যে উন্মুক্ত করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমরজিৎ কর

লঘুসংগীতে রবীন্দ্র-আদর্শ

কয়েক বছর আগে পুলিনবিহারী সেন মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে জানতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী ব্যতীত অপর সূত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি কিরকম পাওয়া যায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেই সব স্বরলিপি খোঁজ করে দেখি সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয় এবং সেই সব গানের সুরও কোনও কোনও ক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্ন। সেই তালিকার কপি আমি রাখিনি, অতএব পেশ করা গেল না, কিন্তু কাজটা ইনটরেস্টিং লেগেছিল। কিছুকাল আগে সন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয় একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্পর্কে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে অনেকে রবীন্দ্ররচনায় এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের অনুরূপ বা সেই ভংগীতে গান লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে যখন গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচলন বাড়ল তখন এই ধরনের বেশ কিছু গান সেকালের গায়ক-গায়িকারা গেয়েছিলেন। এসব গানের সুরে হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ততটা ছিল না, কিন্তু লিরিক একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী। এই বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা এ পর্যন্ত কেউ বা কোনও সংস্থা করেছেন বলে খবর পাইনি। বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক হলেও অসুবিধা দুস্তর। কারণ, সেই গানগুলির একত্র সংগ্রহ দুর্লভ এবং সেই

রেকর্ডগুলিও আজ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তথাপি এর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা প্রচলিত সংগীতজগতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কিভাবে এবং কত ভাবে পড়েছে সেটা জানা দরকার। আর তাছাড়া বাংলা গানের রূপবদল কিভাবে ঘটে এসেছে তারও একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকা প্রয়োজন।

আগে বহু প্রসংগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর নির্মম অত্যাচার বড় কম হয়নি। একদা এদেশের বহু ব্যক্তিই রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না—বহু কটূক্তিই তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে; কিন্তু এও আশ্চর্য ব্যাপার যে বহু সভা সমিতিতেই রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে হত। গানের জন্য তাঁর প্রচণ্ড খ্যাতি ছিল। এ থেকে এইটা ভাবা স্বাভাবিক যে তাঁর সুরেই তাঁর গান গাওয়া লোকের পক্ষে উচিত ছিল:—কিন্তু তা হয়নি, উল্টোটাই ঘটেছিল। সাধারণ গায়ক-গায়িকা এবং অসাধারণ ওস্তাদদের মধ্যেও অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলম্বন করলেও সুর, তাল নিজেদের মতই করে নিতেন। এর ফলে রবীন্দ্রসংগীতের যে বিকৃতি ঘটল তা নিরতিশয় শোচনীয়। আমরা বাল্যকালে এরকম নমুনা অনেক শুনেছি এবং এরকম লেখাতেও দেখেছি। তখনকার দিনে নাকি এরকম বিশ্বাস ছিল যে, কথার ওপর রচয়িতার দাবী থাকলেও সুরের ওপর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবেই এটা মেনে নেননি, কিন্তু তিনি কাউকে 'না'-ও বলেননি। নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হবার বহু বৎসর পরেও এইরকম বিকৃত গান রেকর্ড হয়েছে এবং যথেষ্ট বিক্রিও হয়েছে। অনেকের ধারণা ঐইসব খবর কবিগুরুর কানে পৌঁছোতো না; কিন্তু তা সত্য নয়। সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের কাছে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় থাকতেন তখন কার এণ্ড মহালনবীশের দোকানে গিয়ে তাঁর গানের যে সব রেকর্ড বেরুতো সেগুলি মাঝে মাঝে শুনে আসতেন। অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হয়ে পড়ল তখনই তাঁর গানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। কিন্তু সেটা বেশীদিনের কথা নয়। তার পরেও তো অনেককেই তিনি নিরাশ করেননি। সুর ঠিক হয়নি, গাওয়ার ভংগীও যথাযথ নয়—তথাপি শিল্পী মনে কষ্ট পায় সেটা তিনি চাননি।

এই প্রসংগে একটা কাহিনী মনে পড়ল। পরলোকগত কালীপদ পাঠক মহাশয় নিজেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিনি 'মায়ার খেলা'-র একটি গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সামনে তাঁকে শোনাবার জন্যই। সুর অন্য রকম এবং তাতে ওস্তাদীও ছিল। রবীন্দ্রনাথ গানটি শুনলেন এবং সংগীতে দক্ষতার জন্য তাঁর প্রশংসাও করলেন:—তারপর মৃদু হেসে তাঁকে শুধু এইটুকু বললেন—'গানটা আমারই [illegible] হচ্ছে—তাই না ?' পাঠকমহাশয় [illegible] তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি [illegible] বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর [illegible] ভিন্ন ঢঙে গাওয়া উপভোগ [illegible] কিন্তু এই উক্তিতে কবিগুরু [illegible] নিজেই চিনে নিতে পারেন [illegible] তার প্রকারান্তর ঘটেছে—[illegible] অত্যন্ত ভদ্রতার সংগে [illegible] করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ [illegible] মহাশয় কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের [illegible] ওস্তাদী করে নিজস্ব [illegible] সেসব গান আমরা শুনেছি [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] শুনলাম—রবীন্দ্রনাথ [illegible] এইভাবে তাঁর গান [illegible] দিয়েছিলেন। [illegible] জ্ঞানবাবুকে রবীন্দ্রনাথের [illegible]

গাইতে শোনা যেত না। এ সংবাদ অবশ্য আমার জানা ছিল না—হয়ত অনেকেরই জানা নেই। একজন খুব খ্যাতনামা ওস্তাদ গায়ক (তিনি এখনও জীবিত) গাইতেন—'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ডাক দিয়ে সে যায়'। সে সুর শুনে অনেকে আহা উহু করতেন, কিন্তু সে-বিকৃতি নিরতিশয় পীড়াদায়ক ছিল। এও খুব বেশীদিনের কথা নয়। কিন্তু তারও আগের যুগে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে আত্মসাৎ করেছিলেন তাঁদের বিকৃতি ছিল আরও অন্য ধরনের। অনেকের আবার ভাল-মন্দ জ্ঞানও ছিল না—তাঁদের ধারণা ছিল, গান বস্তুটা এইরকম ভাবেই গাইবার; সেক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনার কিছু নেই।

এ গেল ভূমিকার একটা দিক—রবীন্দ্রনাথের বাণীকে নেওয়া কিন্তু সুরের সম্পূর্ণ দেশী-করণ। অপর দিকটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাণীর আদর্শটুকু গ্রহণ, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এটা আগের চেয়ে ভাল। কারণ, এই প্রভাবের ফলে সুরের দিক থেকে কিছু উন্নতি হতে বাধা—যদিচ গায়ক গায়িকার স্বভাবগত গায়ন-প্রণালীর জন্য সেই উন্নতির দিকটা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। বিষয়টি ব্যাপক:—অতএব এবারে শুধু অবতারণাটুকুই করে রাখি, বারান্তরে মূল বিষয়ে প্রবেশ করা যাবে।

রবীন্দ্রসংগীতে গবেষণা গ্রন্থমালা দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রসংগীতের সুপরিচিত অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস সম্প্রতি সুরংগমা সংস্থা থেকে তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করেছেন। গ্রন্থটির পরিচয় সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন—'এই খণ্ডের প্রথমাংশে বিভিন্ন প্রকার ছন্দ, উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতের তাল এবং রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত তাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত প্রচলিত তাল ও প্রবর্তিত তাল, এই দুই ভাগে, সর্বনিম্ন মাত্রা সমষ্টির তাল থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ সর্বাধিক মাত্রাসমষ্টির তালে রচিত গানগুলির স্বতন্ত্র তালিকা সংকলিত হয়েছে। [illegible] পর রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] বিশেষ আলোচনা [illegible] গ্রন্থের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [illegible] ও তাঁর প্রণালীর [illegible] মালার [illegible] নির্দেশ [illegible] গ্রন্থমালায় [illegible] লয়নির্দেশ [illegible] হয়েছে।'

এই [illegible] 'ডেটা' ও তালিকাবলি মাত্র ১০৩ পাতার গ্রন্থ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে বিধৃত হয়েছে। ছন্দ সম্পর্কে আমাদের সংগীতশাস্ত্রাদি 'বৃত্তরত্নাকর' নামক বৃহৎ ও প্রামাণিক গ্রন্থের উপর প্রধানত নির্ভর করেছেন। উক্ত গ্রন্থে আলোচনা ও উদাহরণ ব্যাপক এবং সংগীতের দিক থেকে সেগুলি বিশেষ সহায়ক। যাঁরা এই বিষয়টি আলোচনা করবেন তাঁরা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 'সংগীতের মুক্তি' নামক প্রবন্ধটি ভাল করে পড়ে নেবেন; কেননা ছন্দের সঙ্গে সংগীতের আলোচনা এই প্রবন্ধেই কবিগুরু বিশেষ-ভাবে করেছেন এবং তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রফুল্লবাবু যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি-গীতিমালায় প্রকাশিত তদীয় সংগীতচিন্তাকে তুলে ধরেছেন এর জন্য তাঁকে সাধুবাদ প্রদান করি। কোন্ গান কোন্ লয়ে গাইতে হবে সে সম্বন্ধে আজও অনেকেরই ধারণার অভাব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করে লয়নির্দেশের প্রণালী উদ্ভাবিত করেন। এইটি প্রায় অবহেলিত হয়েই ছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী একবার পাম অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে কথা প্রসঙ্গে আমাকে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তাও বোধ করি কিছু ছিল, —তা তিনি লিখে গেছেন কিনা জানি না। নানা দিক দিয়েই এই গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও রেফারেন্সের অনেক কাজে লাগবে। এই বইটি, যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা ও অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের বিশেষভাবেই সঙ্গে রাখা দরকার।

শ্রাঙ্গ‍দেব

চিঠি

সুরসাগর

'সুরসাগর' কথাটি বাংলা সংগীতের কিছুতে দেখিলেই তাহা ভাল ভাবে পড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, কারণ ইহার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ স্মৃতি জড়িত আছে। এই উপাধিটি শোভাবাজারের মহারাজা 'গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের সভাপতিত্বে সারস্বত মহামণ্ডল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিমাংশুকুমার দত্তকে তাঁহার বাংলা গানের সুর আরোপের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে প্রদান করেন। আমার দাদা গত হইয়াছেন

বাহির ১৩৩১ সালে। তাহার প্রায় বারো বৎসর পরে ১৩৬৩ সালে বাংলা গানের স্বরলিপি বই 'সুরসাগরের' বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বইটি দেখার জন্য খুবই আগ্রহ হইল। বইটিতে কবি শৈলেন রায় রচিত পচিশখানি বাংলা গানের স্বরলিপি আছে।. বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি এইরূপ ঃ 'সুরসাগর' কথা শৈলেন রায়; সুর ও স্বরলিপি হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, সন্তোষ সেনগুপ্ত। পড়িলে মনে হয় যেন উভয়েই সরকার ও স্বরলিপি কারক। লেখা উচিত ছিল, সুর হিমাংশু দত্ত সুর সাগর; স্বরলিপি সন্তোষ সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রী গোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, কিন্তু পরিচিত সন্তোষবাবুর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিলে তিনি বলিলেন যে, এটা তাড়াতাড়ি করাতে ভুল হইয়াছে তবে যদি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় সব ঠিক করিয়া দিব।
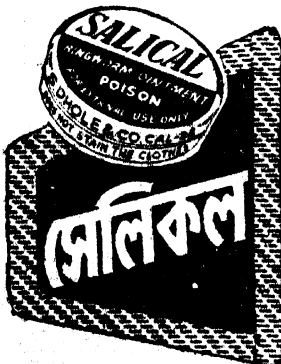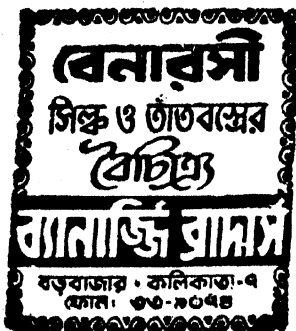
দানার গানের প্রচলনে বিঘ্ন হইবে একথা ভাবিয়া আমি আর এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করি নাই।

এগার বৎসর বাদে আবার 'সুরসাগর' দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাও প্রথম সংস্করণের মতই আমাদের অজ্ঞাতসারে। কিছুদিন হইল আনন্দবাজার পত্রিকাতে দুখানা চিঠি—একটী শ্রীগোপাল-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অপরটী 'কবি শৈলেন রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সুনীলা রায়ের— দেখিয়া বইখানি সংগ্রহ করিলাম। এই সংস্করণে আরও একটু উন্নতি হইয়াছে। গান রচয়িতার কোনও নামই নাই এবং প্রথম সংস্করণের মতই সুর ও স্বরলিপি হিমাংশু দত্ত সুরসাগর ও সন্তোষ সেনগুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরীর মত প্রকাশক যে কি করিয়া এরকম ভুল করিলেন তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। লেখকের স্ত্রী শ্রীযুক্তা রায় এ বিষয়ে ডি এম লাইব্রেরীকে জানাইলে প্রকাশক গোপালবাবু উত্তর দিয়াছেন ঃ (১) উপস্থিত তাঁহারা বই বিক্রী বন্ধ করিয়াছেন, (২) গান কয়টি আপনার স্বামী ৺শৈলেন রায় মহাশয় কপিরাইট হিসাবে দিয়াছিলেন। (৩) ছয়খানি গান সুরসাগরের ছিল, বাকী গানগুলি শৈলেনবাবুর ছিল। স্বরলিপি সব হিমাংশুবাবু করেছিলেন। (৪) এই বইএর বিক্রী একেবারে নাই। ২য় সংস্করণে শৈলেনবাবুর নাম দিই নাই যদি সুরসাগর হিমাংশুবাবুর নামে বিক্রী হয়। এর উত্তরে আমি বলিতে চাই (১) কিছুদিন আগেও বইটি কিনিতে পাওয়া গেছে, (২) শৈলেনবাবুর স্ত্রী বলেন যে, কোনও কপিরাইট দেওয়া হয় নাই। (৩) সুরসাগর হিমাংশুবাবু অন্ততঃ আমাদের জ্ঞাতসারে কোন গানই লেখেন নাই। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সবাই জানেন যে ৺হিমাংশুবাবু সুরকারই ছিলেন, নিজে কোনওদিন গান লেখেন নাই। লেখক হিসাবে হিমাংশুবাবুর নামে বই বিক্রীর কোনও প্রশ্নই উঠে না। আর সব স্বরলিপি যদি হিমাংশুবাবুই করিয়া থাকেন, তবে সন্তোষ সেনগুপ্তের নাম দেওয়ার সার্থকতা কি ?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সাম্প্রতিক কালে একটি সিনেমা বিষয়ক পত্রিকায় 'হিট সঙ'এর তালিকায় লেখা হইয়াছে 'প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল/তাজমহলের মর্ম্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল'—কথা শৈলেন রায়, সুর ও শিল্পী শচীন দেববর্ম্মণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গানটির সুরকার ৺হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। ভ্রমবশত নজরুলগীতি সংকলনেও সুরসাগর আরোপিত সুরের দুই খানি গান (১) আবেশ আমার যায় উড়ে যায় লেখক শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ এবং (২) বিদায়ের শেষ বাণী তুমি মোরে বোলো না কবিতা 'অজয় ভট্টাচার্য' প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে, কাজী সাহেবের এক খানা গানে সুরসাগর সুর দিয়াছেন।

শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত
কলকাতা

নতুন শিল্পী

গত ৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'দেশ পত্রিকার 'গানের আসর' বিভাগে 'নতুন শিল্পী, নতুন সৃষ্টি' শীর্ষক আলোচনাতে শ্রোতাদের নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্য সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

গান প্রচারের যতগুলি মাধ্যম আছে, বিশেষ করে রেডিও এবং রেকর্ড কোম্পানী-গুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন শিল্পীর গান ঘন ঘন প্রচার করেন ততক্ষণ কোন শ্রোতারই সেই শিল্পীর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কোনরূপ বাধা-নিষেধ গ্রাহ্য না করে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা যদি নূতন শিল্পীদের প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দেন, তাহলে নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের অভিনন্দন পাবেন; কোন ভীতির শাসনই তাঁদের বাধা দিতে পারে না এবং কোন যুগে দিতে পারেনি। তাঁদের এই মহান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রোতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা আমার মনে হয় ঠিক হয়নি।

আমার বেশ মনে আছে, যখন হেমচন্দ্র সোম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিরা গ্রামোফোন কোম্পানীতে যুক্ত ছিলেন তখন আমার বাবার গান হিজ মাস্টার ভয়েস থেকে প্রচারিত হত। অথচ আমার বাবা নিত্যানন্দ দাস থাকতেন পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে; হেমচন্দ্র সোম নিজে আমাদের বাড়ি এসে ঝুমুর গান সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে বহু শিল্পীর গান প্রচারিত হয়। ন' মাস দশ মাস অন্তর প্রোগ্রাম পান এমন বহু সুযোগ্য শিল্পী নির্মমভাবে অবহেলিত। তাঁদের নতুন সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকলেও, তাঁদের গান উপরোক্ত মাধ্যমগুলির মাধ্যমে ঘন ঘন প্রচারিত না হলে শ্রোতারা সে সব শিল্পী সম্পর্কে উদাসীন থেকেই যাবেন। গ্রামোফোন কোম্পানী ছাড়া দুয়েকটি বনেদী কোম্পানী কিছু সংখ্যক নতুন লোক-গীতির ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁদের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অভিনন্দন যোগ্য। সুতরাং, রেডিও ও রেকর্ড কর্তৃপক্ষের শ্রোতাদের দাবীর উপর নির্ভর না করে, নিজেদেরই এগিয়ে আসা উচিত নতুন 'শিল্পী,' তথা 'নতুন সৃষ্টি'র সন্ধানে।

অশোক দাস
আলিগঞ্জ

॥ তেতাল্লিশ ॥

"যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলি বন্দীশালা হতে মুক্তি পায় নব শষ্পদল,
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধ-বাক বাধা,
বন্ধ্যাতার অন্ধ দুঃশাসন—"

ইউরোপ ও আমেরিকায় বিপুল সাফল্য অর্জন করে উদয়শঙ্কর আবার ভারতবর্ষে ফিরে এলেন প্রায় তিন বছর পরে, ১৯৩৩-এর মে মাসের শেষের দিকে। ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর রাজনৈতিক সম্পর্ক যখন সুখের নয়—যখন দুই দিগন্ত কঠিন বিদ্রোহ ও কঠোর দমননীতির ঘোর কৃষ্ণছায়ায় আচ্ছন্ন, তখন উদয়শঙ্করের শিল্পকীর্তি বিদেশে উন্মোচিত করল ভারতের সংস্কৃতির অনির্বচনীয় রূপ।

উদয়শঙ্করের প্রত্যাবর্তনের বেশ কিছু আগে থেকেই বাংলার সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশিত হচ্ছিল। Herald Tribune লিখেছিল, "He has brought the orient to us"

The Boston Evening Transcript উল্লেখ করেছিল, "From head to heel every muscle moved as both an independent and co-ordinated means. There was a new and strange technique of the neck, a play of arms marvellous in range and implication."

তিন বছর আগে শিল্প ও শিল্পী-প্রেমিক যে সহৃদয় মানুষ অসাফল্য ও আর্থিক লোকসানের কথা অগ্রাহ্য করে অবহেলিত শিল্প শাখার এক অখ্যাত শিল্পীকে তুলে ধরেছিলেন কলকাতার অনেক দর্শকের সামনে—মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠালাভের পথ, সেই হরেন ঘোষই আবার উদয়শঙ্করের প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৃত্য প্রদর্শনের ব্যাপক আয়োজন করলেন।

কলকাতার কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপিত হল—

এম্পায়ার থিয়েটারে
বিশ্বজয়ী
উদয়শঙ্কর
ও
তাঁহার মোহন সম্প্রদায়
১৩ই জুন, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ছটায়
১৪ই জুন, বুধবার, রাত্রি ৯৷৷টায়
১৬ই জুন, শুক্রবার, সন্ধ্যা ছটায়
অগ্রিম টিকিট প্রাপ্তিস্থান
১৪০, কর্পোরেশন স্ট্রীট, কলিকাতা

কিন্তু কোথায় টিকিট! নিমেষে সব শেষ। ১৯৩০-এর অনুষ্ঠানে উদয়শঙ্কর একা, তাঁর ললাটে ছিল না বিজয়ের তিলক। তবুও তাঁকে চিনেছিল দেশের রসিকজন। কেননা যদিও সেদিন এমন মঞ্চ-সজ্জা ছিল না, ছিল না এত শব্দযন্ত্রী—এমন কি সেদিন উদয়শঙ্করের কোন নৃত্য-সঙ্গিনীও ছিল না, শুধু ছিল সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সেই বীজ আজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে।

এবার যেতে হবে বর্মায়। পরে পূর্ব-বঙ্গে, ঢাকায়। সেখান থেকে ফিরে আবার কলকাতায় হবে উদয়শঙ্করের নৃত্যের অনুষ্ঠান। তারপর ভারতবর্ষের আরও অনেক প্রদেশ ঘুরে পাড়ি দিতে হবে আবার আমেরিকায়। কিন্তু শান্তিনিকেতন দেখার ইচ্ছায় বড় অধীর হয়ে উঠলেন উদয়শঙ্কর। সেখানে তাঁকে এবার যেতেই হবে।

কিন্তু বর্মায় যাবার ঠিক আগে-আগে ১৮ জুন বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় কলকাতার টাউন হলে উদয়শঙ্করের প্রকাশ্য অভ্যর্থনার ব্যাপক আয়োজন করা হল। সভাপতি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ।

সভাপতি মহাশয় উদয়শঙ্করকে সভায় নিয়ে আসবার পর এই উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা গান গাইলেন তরুণ গায়ক কুমার শচীন দেব বর্মণ—

"উদয়-রবির মুকুট পরে উদয়, তুমি উদয় হলে—
আজকে ভারতমাতার কোলে।
কাব্য তোমার নাচের নূপুর, রূপ সাজয়ে লহর তোলে—
আজকে ভারতমাতার কোলে।"

কুমার শচীন দেব বর্মণের গান শেষ হয়ে যাওয়ার পর সভাপতি মহাশয় মাল্যদান করলেন উদয়শঙ্করকে। শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করলেন আশীর্বচন।

অম্বপূজা নৃত্যে উদয়শঙ্কর, সিমকী, কনকলতা ও সম্প্রদায়

আনন্দ নৃত্যে সিমকী, কনকলতা ও অম্বরদাস

পরে সন্তী দেবী গাইলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত—
নৃত্যের তালে তালে নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের
ছন্দ হে॥
তোমার চরণ-পবন পরশে সরস্বতীর
মানস-সরসে
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক
চিত্ত মম॥

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বললেন, "এই নৃত্যবিদ্যা হচ্ছে সাক্ষাৎ রাগ বন্ধ। নৃত্যকালে বাক্য অন্তরে নিহিত থেকে যায়, কেবল অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারাই সম্যক অর্থ সূচিত হয়। লয়ের অনুসারে পদবিন্যাস রসের তন্ময়তা আনয়ন করে এবং নর্তক নৃত্যের দ্বারা ভাব সকলের আবির্ভাব লোকের নিকটে সহজভাবে সুপ্রকাশিত করিয়া তোলেন।

"অনেক সাধনার পরে নটরাজের কৃপায় বঙ্গসন্তান উদয়শঙ্কর, তুমি সেই বিদ্যাকে লাভ করেছ, যে বিদ্যা—
মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিযুঙক্তে,
কান্তেব চাভিরময়তি অপনীয় খেদম
কীর্তিং চ দিক্ষু বিতনোতি,
করোতি চিত্তং,
কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব বিদ্যা।

"তোমার অধিগত এই বিদ্যা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গে তোমার দেশবাসী আমাদেরও জগজ্জনের কাছে ধন্য করুক—এই প্রার্থনা আমরা করছি শিল্প-দেবতার কাছে।"

সভাপতি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ উদয়শঙ্করকে নগরবাসীর সম্মান চিহ্ন-স্বরূপ কাঠের সংগঠিত নটরাজ মূর্তি উপহার প্রদান করলেন।

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে উপস্থিত হওয়ার আগেই বহু মহীয়সী বিদেশিনী দূরে থেকে ভালবেসেছিলেন এই সাধন ক্ষেত্রকে, রক্তকণিকায় গ্রহণ করেছিলেন ভারতের সংস্কৃতিকে। এবং এ দেশের মঙ্গল কামনায় তাঁরা উৎসর্গ করেছেন তাঁদের গৌরবময় জীবন। ভারতবাসী তাঁদের চিরদিন স্থান দেবে দেবীর আসনে অকম্পিত শ্রদ্ধায়। তাঁরা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁরা আমাদের নমস্য।

যদিও নৃত্যশিল্পী, তাহলেও সম্ভবত উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনী সিমকী চেয়েছিল ভারতবর্ষের ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে তার দেহ, তার মন প্রাণ। এবং হয়তো তার আত্মাও। কিসের অভাব ছিল ব্যারিস্টার পরিবারের দুলালী সিমনের?

অর্থ? ঐশ্বর্য কি তার ছিল না? যশ? সে কি ছিল না দুর্লভ পিয়ানো বাদিকা? তবে কেন সে হেলায় ছেড়ে দিল তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য—প্যারিসের সুখ সম্পদ ভারতীয় নৃত্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে? কেন? আচারে ব্যবহারে, নিয়মে সংস্কারে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কত না অমিল!

তবু এমনি করেই এক একজন জ্যোতির্ময়ী হঠাৎ পৌঁছে যায় স্বদেশ থেকে বিদেশে, অমিল থেকে চিরন্তন মিলে। সিমকী ভালবেসেছিল ভারতবর্ষকে, তার সকল মানুষকে—সাহিত্য দর্শন শিল্প ও শিক্ষাকে। তাই এমন দুরূহ রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে।

উদয়শঙ্করের সঙ্গে সিমকী ফেরে তার ছায়ার মতন। কলকাতার রাজপথ, অলিগলি কানন গঙ্গার শোভা—সবই তাকে বাঁধে নিবিড় মায়ায়। এদিকে উদয়শঙ্করের আমন্ত্রণ আসে নানা জায়গা থেকে। যেখানে যায় উদয়শঙ্কর, সিমকীও সেখানে যায় তার সঙ্গে। এই রকম এক ঘরোয়া আমন্ত্রণে কলকাতার ইন্দ্রপুরী ফিল্ম স্টুডিওতে সিমকীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হল বিখ্যাত গায়িকা গহরজানের।

একাগ্র চিত্তে তার মুখেই সিমকী শুনল ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পের কথা, শিল্পীদের কথা। গহরজান তাকে শোনাল ভারতবর্ষের আরও অনেক কাহিনী। সব শুনে যথাসময়ে সিমকী উদয়শঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে এল স্টুডিও থেকে।

বেরিয়ে এসে সিমকী উদয়শঙ্করকে বলল, "গহরজানের কথাবার্তা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অসাধারণ ভদ্রমহিলা তিনি!"

উদয়শঙ্কর সিমকীর উচ্ছ্বসিত উক্তি শুনে ঈষৎ হালকা স্বরে বললেন, "তুমি যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে তাকে বোধ হয় দেশের লোক ভদ্রমহিলা বলে না—" তিনি তাকে গহরজানের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললেন।

কিন্তু সিমকী কানে তুলল না উদয়শঙ্করের কথা। বলল, "লোকে যা-ই বলুক, এমন পরিচ্ছন্ন ভদ্রমহিলা আমি খুব কম দেখেছি।"

এই সিমকী তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের আর এক আমন্ত্রণের আসর থেকে অতিষ্ঠ হয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে চলে এসেছিল। কলকাতা নগরীতে তখন ইংগ-বঙ্গ সমাজের প্রভাব প্রবল। এই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা আলোকপ্রাপ্ত এবং উচ্চবিত্ত। সদ্য ইউরোপ ও আমেরিকা প্রত্যাগত এবং বিদেশী নৃত্যসঙ্গিনী সমভিব্যাহারে উদয়শঙ্কর যেন তাদেরই দলের। তাঁকে একটা পার্টি-টার্টি না দিলে চলবে কেন।

গঙ্গার ধারে বাংলোর মতন একটা ছিমছাম বাড়িতে ডিনার-কাম-ককটেইল পার্টির আয়োজন করা হল এক চাঁদনী রাতে। বাইরে দাঁড়িয়েছে অনেক ছোট-বড় গাড়ি। সেজেগুজে এসেছে কত নামকরা লোক, বড় ঘরের কত ছেলেমেয়ে। সিমকী আর উদয়শঙ্করের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে সকলে—ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে।

ওদিকে ফটাফট সোডার বোতল খোলবার শব্দ। দামী দামী বিলিতি মদের বড় বড় বোতল তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছে। লোক বেসামাল হয়ে মাঝে মাঝে বেফাঁস কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।

কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের কাণ্ড কারখানা দেখে

সিমকী হতভম্ব হয়ে বসে থাকল এক-দিকে। কিন্তু এই রকম আসরে আর এক মুহূর্তও তার থাকবার ইচ্ছা ছিল না।

একটু পরে সে অধীর হয়ে উদয়-শঙ্করকে বলল, "দাদা, কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ! আমি এখানে আর থাকতে চাই না। শিগগির বাইরে নিয়ে চল আমাকে।"

উদয়শঙ্কর সিমকীকে নিয়ে সরে পড়তে যাবেন, কিন্তু তার পথ রোধ করে দাঁড়াল অনেক বেসামাল ছেলেমেয়ে, "ওঃ উদয়, যাচ্ছ? চলে যাচ্ছ? ওঃ, প্লীজ ডোণ্ট গো! আমাদের ফেলে যেও না—যেও না শঙ্কর!"

কোন রকমে সিমকীকে নিয়ে উদয়-শঙ্কর বেরিয়ে এলেন বাইরে। এসে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পালিয়ে গেলেন ভদ্র ও উচ্চবিত্ত মাতালদেৱ সেই চাঁদনী রাতের আসর থেকে।

যেতে যেতে সিমকী বলল, "যাদের আসরে আজ দেখলাম—এই সব বড় ঘরের মেয়েদের চেয়ে গহরজান কত বড়!"

■

১৯৩৩-এর জুলাই মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় এবারকার মতন উদয়শঙ্করের নৃত্যের শেষ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। শেষ দিনে নাট্যমঞ্চে এসে অবনীন্দ্রনাথ উদয়-শঙ্করকে বললেন, "কাল আমার গুরুর আশীর্বাদ তুমি লাভ করেছ, আজ আমি শিল্প-দেবতার আশীর্বাদ তোমায় জানিয়ে গেলাম।"

উদয়শঙ্করের নৃত্যে সুরারোপের কথা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পৌত্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "এতকাল দেখে আসছি দেশী বাদ্যযন্ত্রগুলো স্টেজে উঠলেই কেমন থতমত হয়ে মিনমিন করে বলতো, নয় তথাকথিত ঐকতানের কোলাহল তুলতো কানের কাছে। উদয়শঙ্কর, তিমিরবাবু ও শিরোলী মশায় এবং আর একদল বালক বৃদ্ধ যুবা বাদ্যকরের হাতে পড়ে আমাদের অচল বোবা বাদ্যযন্ত্রগুলো হঠাৎ চলা-বলা শুরু করে দিয়েছে।"

শান্তিনিকেতনে যাবার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন উদয়শঙ্কর। তাঁর ম্যানে-জারকে বার বার তিনি বললেন, সেখানে যাওয়ার একটা দিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠিক করে দিতে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির আধার ও তাঁর আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় দেখার ইচ্ছায় সিমকীও শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৩-এর জুলাই, আষাঢ়ের শেষ ভাগে উদয়শঙ্কর গেলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে ফিরেছেন মাত্র কয়েক দিন আগে বিদ্যালয় খোলবার প্রায় সময় সময়। বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষ রোপণ উৎসব হয়ে গেছে।

এই অনুষ্ঠানের সাথে উৎসবে নৃত্যের একটি নতুন পরীক্ষা করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি আবৃত্তি করে চললেন তাঁর কবিতা এবং তার তালে তালে ভাবনৃত্য করলেন শ্রীমতী দেবী। গীত ও বাদ্য ছাড়াও শুধু যে ছন্দোময় আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য করা যায়, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল।

এই রকম পরীক্ষা করবার অনুপ্রেরণা কবি পেয়েছিলেন কয়েক বছর আগে আমেরিকায়। বিখ্যাত মহিলা নৃত্যশিল্পী রুথ সেণ্ট ডেনিস রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ভাবনৃত্যে রূপায়িত করে মার্কিন দর্শকদের প্রদর্শন করেন। তাঁর নৃত্য যথেষ্ট সমাদর পায় এবং বিশ্বভারতীর জন্যে কিছু অর্থও সংগৃহীত হয়। কবি কিন্তু সেই টাকা নিউ ইয়র্কের বেকারদের জন্যে দান করে এলেন।

শান্তিনিকেতনে এসে নতুন নয়নে চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন উদয়শঙ্কর। শেষ আষাঢ়ের প্রথম আবহাওয়া ছড়িয়ে আছে। গাছে-গাছে পাখির কূজন। আকাশ এখানে অনেক বড়। বাতাসের স্পর্শ কত মধুর।

উদয়শঙ্করকে আলিঙ্গন আপন করে সাদরে বরণ করে নিলেন রবীন্দ্রনাথ।

(ক্রমশ)

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়...

রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত রচনা

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি রামমোহনের একটি রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'সমগ্র বাংলা রচনা' সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে পুরোন পুঁথির অন্তরাল থেকে ছ'পাতার একটি জরাজীর্ণ তুলট কাগজে লেখা রামমোহন রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতের লেখা হলেও, আশ্চর্যের কথা, কাগজের দুদিকেই ছাপার মত লেখা। লেখাটি কোন ছাপা বইয়ের নকল বলে মনে হয়। কেননা কাগজের সাইজ থেকে আরম্ভ করে লেখার ঢঙটি পর্যন্ত ছাপার মত করে লেখা। লেখার মধ্যে কোন যতিচিহ্ন নেই, এক দাঁড়ি ছাড়া। কমা যতিচিহ্নের স্থানে কোলোন (ঃ) ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি যেভাবে লিখিত হয়েছে সেইভাবেই আমি এখানে লেখার ব্যবস্থা করেছি। সেটিকে কোনভাবে সম্পাদনার ব্যবস্থা করিনি। ছ'পৃষ্ঠায় মোট ২০টি গান লেখা হয়েছে। কোন গানের ওপরে কোন সুরে গীত হবে লেখা নেই। এই কুড়িটি গানের মধ্যে ছয়টি গান প্রকাশিত রচনাবলীতে নেই। তাছাড়া বিশেষ পাঠভেদ আছে দুটি সংগীতে। দুতিনটি সংগীতে সামান্য পাঠভেদ আছে। প্রথমে যে সংগীতগুলি ছাপা নেই সেইগুলি ও তারপরে পাঠভেদের দুইটি সংগীত এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। সামান্য পাঠভেদটি প্রকাশিত রামমোহন রচনাবলীর সঙ্গে কোথায় পাঠভেদ আছে, সেটির উল্লেখ করা গেল।

অপ্রকাশিত রচনা

পরমাত্মনে নমঃ

ভূমিকা

তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠায়ী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় ও তদ্বন্ধুগণ কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় বিরচিত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশক পারমার্থিক সমূহের ইদানীং লোপাপত্তি শংকায় এবং শিষ্ট লোক সকলের জ্ঞান সুনীতি বৃদ্ধির কারণ আমরা বহু যত্ন দ্বারা ঐ সকল গীতের সার সংগ্রহ পূর্বক গীতাবলী নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করিলাঃ বোধহয় যে ইহা তত্ত্বজ্ঞানার্থিদগের আশু গ্রহিতব্য হইবে ইহার ছাপার ব্যয়ের কারণ মূল্য চারি আনা মাত্র ॥

গীতাবলী

৯ গীত

ভুলনা নিষাদ কাল ঃ পাতিয়াছে কর্মজাল ঃ
সাবধানরে আমার মানস বিহঙ্গ॥
দেখ নানা বিষফল ঃ ও যে কর্মতরু ফল ঃ
গরলময় কেবল ঃ দেখিতে সুরঙ্গ॥
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন ঃ নিত্যসুখ
জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ঃ
সুন্দরতর নির্ভয় ঃ অমৃতাক্ত ফলচয়ঃ
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ॥

১১ গীত

ক্ষণমিহ চিন্তাকর সৎ স্বরূপ নিরঞ্জন।
[illegible] [illegible] খর্ব হবে নিশ্চয়॥
জন্মাবধি বিষয়কাল ঃ পশ্চাতে নিধান কাল ঃ
শেষ কাল অন্তকাল ঃ ভাবরে এখন॥
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি তাহাতে নাহিক
মতি ঃ এ তোমার কেমন রীতি ঃ ওরে ভ্রমময়
মন॥

১৭ গীত

[illegible] [illegible] মন প্রাণপণ [illegible]।
[illegible] বিষয়া বেলা [illegible] [illegible]॥
হইয়া আপনার দাস ঃ করো নানা অভিলাষ ঃ
না কাটিলে [illegible] ঃ [illegible] [illegible]॥
একেতে ভাবিয়া তত্ত্ব ঃ [illegible] কাঁদিয়া [illegible] ঃ
সেইভাবে কাল যাপ ঃ [illegible] তোমা ভব।
না করো [illegible] প্রীতি ঃ কর্মজালে
নিয়োজিত ঃ বুঝিলে না নিজ হিত আর কত
কব॥

১৮ গীত

আমি হই আমি করি ত্যাজ এই অভিমান।
উচিত হয় এই ভাবিতে
আপনারে যন্ত্র জ্ঞান॥
ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন ঃ
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন ঃ
তোমারে নিয়োজিত যে করে তার তো
পাও প্রমাণ॥
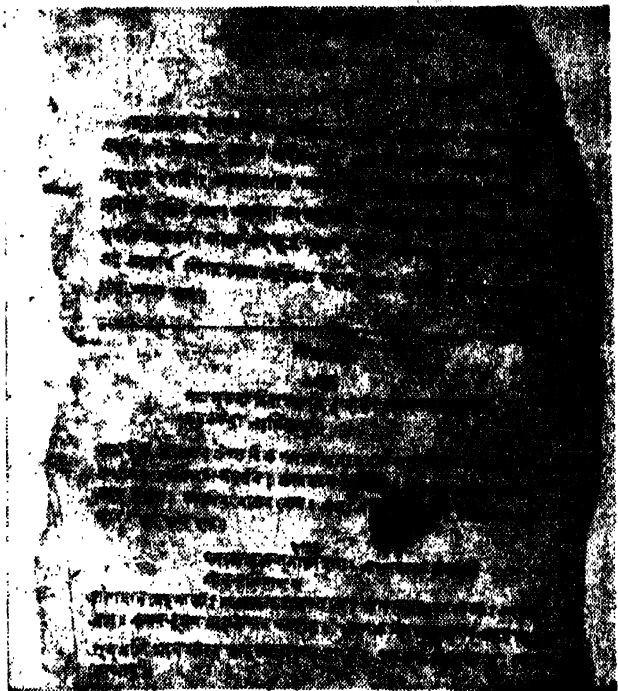
ভূমিকা ও ১ ২ গীতের প্রতিলিপি

গীতাবলী : ৩ ৪ ৫ ও ৬

গীতাবলী : ৭ ৮ ৯ ও ১০
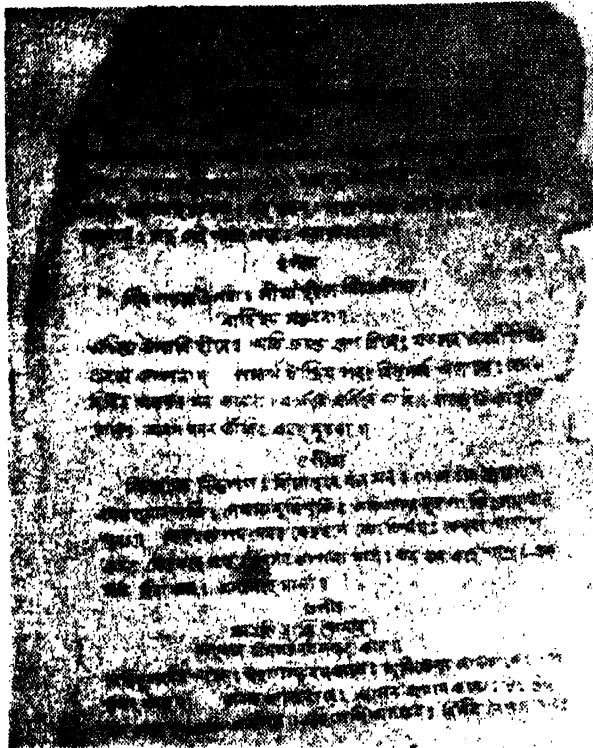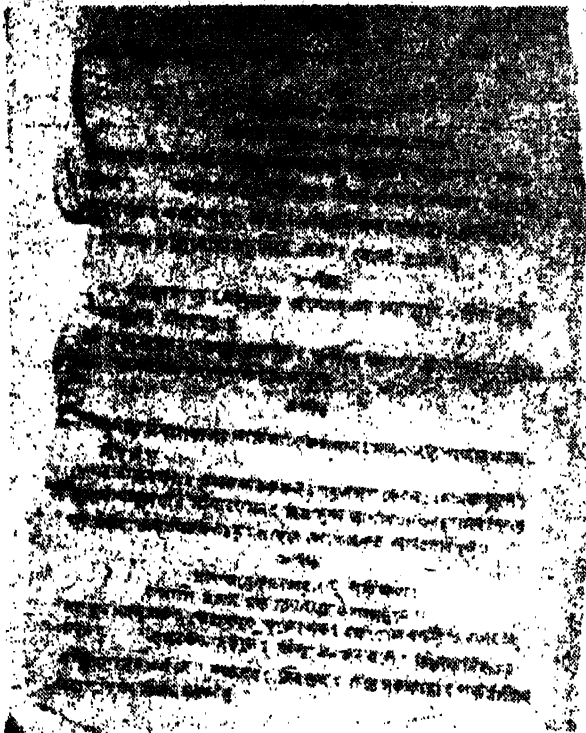
১৯ গীত

ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব : না জানিলে নিজ শিব।
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ॥
দেহ রথ আত্মারথী : বুদ্ধিকে কর সারথি :
ইন্দ্রিয় সকল অশ্বরাশ রজজু মন।
বিষয়ে বিরত হয়ে : মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে :
মায়া জিনি ব্রহ্মভাবে কর অবস্থান ॥

২০ গীত

বচন অতীত যাহা কয় কি বুঝান যায়।
বিশ্ব যাঁর ছায়া হয় : তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয় :
সাদৃশ্য দিব কোথায় ॥
যদ্যপি চাহ জানিতে :
ঐকান্তিক কর চিতে :
চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান :
নাহি কোন অন্য উপায় ॥

এখানে এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে যে, এই গীতাবলীর ভূমিকাতে লিখিত হয়েছে যে, এই গীতগুলি "শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ রামমোহন রায় ও তদ্বন্ধুগণ কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় বিরচিত।" এখানে একটা ধারণা হতে পারে যে উক্ত গীতগুলি রামমোহনের না হয়ে "তদ্বন্ধুগণ" বিরচিত। কিন্তু রামমোহন রচনাবলীতে বাকী ১৪টি গীত রামমোহনের বলেই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং এই ছয়টি গীতও যে রামমোহনের সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। দ্বিতীয়ত, 'তদ্বন্ধুগণ' শব্দটি মনে করা যায় গৌরবার্থেই [illegible] করা হয়েছে। আর বিশেষত যখন [illegible] ব্রহ্ম-সংগীতরূপে গৃহীত তখন [illegible]কভাবেই তদ্বন্ধুগণ শব্দটি এসে [illegible]। কেননা তদ্বন্ধুদের দ্বারাই এইগুলি গীত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তদ্বন্ধুরা উল্লিখিত হয়েছে।

পাঠভেদের সংগীত

পাঠভেদের সংগীত দুটি এখানে তুলে ধরলুম :

২ গীত

মন তোরে কে ভুলাল হায়।
কল্পনারে সত্য করি
জান এ কি দায় ॥
প্রাণদান দেহ যাকে : যে তোমার বশে থাকে :
জগতের প্রাণ তাকে : কর অভিপ্রায়॥ কখন
ভূষণ দেহ কখন আহার : ক্ষণেক স্থাপহ
ক্ষণে করহ সংহার : প্রভু বলি মান যারে
সম্মুখে না চাও তারে : এত ভুল এ সংসারে :
কে দেখে কোথায়॥

রামমোহন রচনাবলীতে (পৃষ্ঠা ৩৪৪) গানটি এইভাবে ছাপা হয়েছে :

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল ঠুংরী

কে ভুলাল হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়।

আপনি গড়িছ যাকে,
যে তোমার বলে তাকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূবণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বলি মান যারে,
সম্মুখে না চাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

পাঠভেদে দ্বিতীয় সংগীতটি হলো :

৮ গীত

ভয় করিলে যারে : না থাকে অন্যের ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥
জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে :
পুনর্বার ক্ষণমাত্রে নাশিবারে পারে :
জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
রামমোহন রচনাবলী (পৃষ্ঠা ৩৪১)
সংগীতটি ছাপা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :
ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়।
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়।

১১ ১২ ১৩ ও ১৪ সংখ্যক সংগীতের প্রতিলিপি
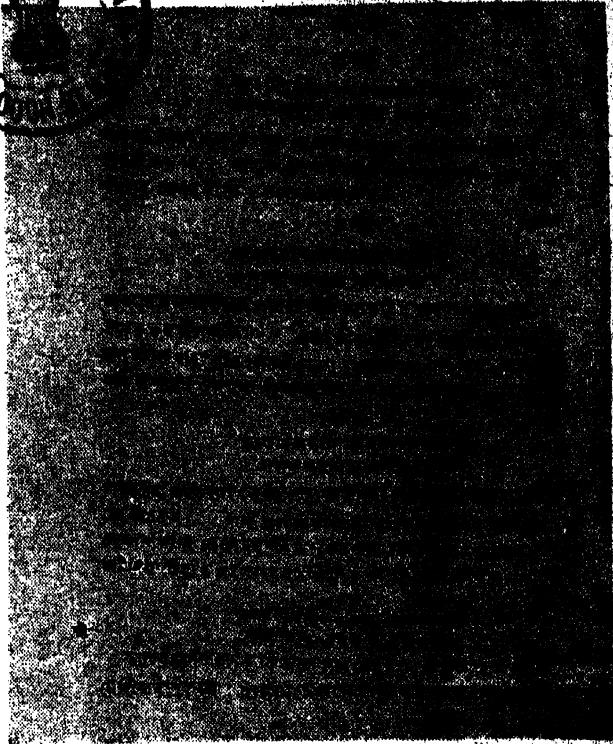
গীতাবলী ১৫ হইতে ২০

সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তারে এত ভাল নয়।

উপরের সংগীত দুইটির পাঠভেদ এত বেশি যে আমাদের বিস্ময় উৎপন্ন করে। পাঠভেদের কবিতাটি সুরের দিক থেকে প্রকাশিত কবিতাটি অপেক্ষা বেশী গ্রাহ্য। কারণ কোথাও ছন্দপতন হয়নি। হয়েছে প্রকাশিত গানটির বেলায়।

তা ছাড়া সামান্য সামান্য পাঠভেদ লক্ষিত হয়েছে। যেমন ৩৫১ পাতায় ২ সংগীতটিতে আছে—'স্নেহ কহ হল এত,' কিন্তু এটিতে আছে, "স্নেহ কহ হলো এত ঃ"। এ ছাড়া 'কালের দশনে'-এর স্থলে এটির অনুযায়ী হবে 'কালের দর্শনে'। 'অতএব'-এর পর কমা হবে অবশ্য (ঃ) চিহ্নগুলিকে কমা-তে পরিবর্তিত করলে। ৩৪৭ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে "সে কোথায় কার কর অন্বেষণ"-এর স্থলে এটির অনুযায়ী "সে কোথায় তুমি কার কর অন্বেষণ" হবে। তা ছাড়া ওই সংগীতেই হ পান "ক্ষণে আন ক্ষণে তারে"-এর স্থানে আছে "ক্ষণে আন ক্ষণে তবে"। ৩৪৯ পৃষ্ঠার শেষ গানটির "দৃষ্টিহীন মাঙ্গিকীন" হবে এই পুস্তিকার গান অনুযায়ী "মাঙ্গিকীন দৃষ্টিহীন"। এই-ভাবে অতি সামান্য সামান্য পাঠান্তরও পরিলক্ষিত হয়েছে।

পরিশেষে এখানে একটি কথা বলার আবশ্যকতা মনে করি। সেটি হলো এই গানগুলির প্রভাব। যে পুঁথিগুলির মধ্য থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে আমরা বংশানুক্রমিকভাবে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে এসেছি। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন সকলেই প্রায় কালীসাধক। তাঁদের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথির মধ্যে এটির আগমন কম গুরুত্বের কথা নয়। এই সংগীতগুলি ব্রাহ্ম সংগীত হলেও সাধকচিত্তে তাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এগুলিকে তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র মনে করেছেন। তাই সযত্নে রক্ষা করেছেন তন্ত্র সাধনার পুঁথির মধ্যে।

রামমোহনের রচনা যাতে লুপ্ত না হয়ে যায় সেই আশাতেই এই ক্ষুদ্র লেখাটির অবতারণা।

॥ ১০ ॥

'রাতারাতি তোমার বইয়ের চাহিদা বাড়িয়ে দিলাম কেমন—দেখলে তো!' বলেছিল রিনি।

'হাতাহাতিই দেখছি তো! 'এই যে—দ্যাখ না।' আমি বলেছি : 'দেখছিই না কেবল, দেখাচ্ছিও।'

বইয়ের বাজার ফলাও করার রিনির কায়দাটা বলতে গেলে প্রায় আমার প্রকাশকের মতই। এক কথায় অপূর্ব।

আমার অপূর্ব ব্যাখ্যানায় বিগলিত হয়ে এক গাল হেসে সে কয়—'তা তুমি বলতে পারো। তোমার আইডিয়া তো ছিল মই লাগিয়ে অপূর্ববাবুর দোতলায় উঠে তাঁর বইয়ের আলমারিতে গিয়ে উই ধরিয়ে দেওয়া, নয় কি? উই দিয়ে কাজ সারা... তাই না?'

'আমরা লেখক মানুষ, শব্দ আর অক্ষর নিয়েই আমাদের কারবার। তাই আমি নিঃশব্দে গিয়ে ঘুণাক্ষরে নিজের কাজ সারতে চেয়েছিলাম। ভগবান তো তোর মতন অমন চোখা চোখা অস্ত্র দেননি আমায় যে চোখ মুখ ঘুরিয়ে এই বেচনেওয়ালাদের কাবু করে কাজ বাগাবো। তোরা কটাক্ষ কর। স্রেফ হাসি দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারিস—সেই কাজ আদায় করতে আমাদের ঈশ্বর কাঠখড় পোড়াতে হয়, তা জানিস? আমার তাতেও হয় না।'

'আজে বাজে কথা রাখো। এই টাকাটা দিয়ে আমরা বইয়ের বিজনেস ফাঁদবো, তাই তো? একটার পর একটা বই বার করে যাবো, তোমারই বই। আর কী করে ব্যবসাটা গড়ে তুলতে হবে, বলি তোমায়। চার্লি চাপলিনের সেই ছবিটার কথা মনে আছে তোমার? এক সাথে দেখেছিলাম আমরা? জ্যাকি কুগানকে নিয়ে বইটা গো! মনে নেই কো? সেই জ্যাকি আগে আগে যেত রাস্তায়, যতো ইটপাটকেল হাতে নিয়ে আর তাই দিয়ে রাস্তার ধারের বাড়ি-গুলোর দরজা জানালার কাচের সার্সি ভাঙতে ভাঙতে যেত। আর তার পরেই চার্লি আসত সেই পথ ধরে—পিঠে কাঁচের বাণ্ডিল আর যন্ত্রপাতি বগলে—হাঁকতে হাঁকতে—ভাঙা সার্সি সারাই—সার্সি জানালা মেরামত করাবেন কেউ? মনে নেই তোমার?'

'থাকবে না কেন? চার্লির শহু কি ভোলবার নাকি? তা তুই কি আমায় ফার্স্ট বুক ধরে ব্যবসা শেখাতে লেগেছিস! পাখি পড়ানোর মতই?'

'কেন, একথা কেন?'

'অহা বিড্ এ মান গো টু দা কিড্—এতো সেই ফার্স্ট বুকের পড়া রে, এর মধ্যেই ভুলে যাব? সেই কিড-এর কাছেই যেতে বলছিস আমাকে?'

শুনে রিনি হাসতে থাকে—'মেমারি নেই নেই বলো! কী মেমারি তোমার গো।'

'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার দুষ্টু মেমারি আমার খুব।'

নিজের সাফাই গাই।

'তোমার বইটাই তেমন নাকি আর কাটে না, এই কথা বলছিল না অপূর্ববাবু?' সে বলে—'কিরকম কাটে, কাটানো যায় দেখিয়ে তো দিলাম? তেমনি তুমিও নিজের বই ছাপিয়ে শুরু করে দ্যাখো। দেখবে এমন যে অকাট্য তোমার বই তার জন্যই কেমন মারামারি কাটাকাটি পড়ে যায়।'

'তা তুই পারিস।' মানতে হয় আমাকে—'অঘটন ঘটন পটিয়সী বলে একটা কথা আছে না? তোদের মেয়েদের সম্পর্কেই কথাটা। তা তাদের ওপরেও তুই আবার এককাঠি—তুই অপটন পটন পটিয়সী।'

'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার! হাতের এই পঞ্জিকাখানা নিয়েই কাটিয়ে দ্যাখো না গিয়ে। হাতে হাতেই টের পেয়ে যাবে।'

সদুপদেশ দিয়ে সে সরে পড়ে। আমিও কম্প্লিমেণ্টারির পঁচিশ কপি বগলদাবা করে বেরুই। বাজারে আমার বইয়ের কাটতিটা হাতে হাতে বাজিয়ে দেখা যাক না!

রিনি শ্রীগুরু লাইব্রেরির থেকে আরম্ভ করেছিল। আমার জেহাদও সেখান থেকেই শুরু করা যাক।

..'চোরাই মালের কারবার করি না আমরা...'

মধ্বরের বই পাবেন দপ্তরিপাড়ায়। কিন্তু যুক্তে আমরা নেই মশাই!'

পত্রপাঠ বিদায়!

মুচকি হাসির সঙ্গে মিশ্রিত করে মিষ্টি কথায় এই মিছরির ছুরিটি এমনভাবে তিনি বসালেন যে, রাগ করার কোনো জো ছিল না।

পরে জেনেছিলাম যে উনিই শ্রীগুরুর মালিক শ্রীভুবন মজুমদার। এখন স্বর্গীয়। এবং এর পরে, ঢের পরেই, উনিও আমার খান চার-পাঁচ বই বার করেছিলেন এবং আরও পরে কপিরাইট নেওয়া থাকলেও, স্বত্বসমেত বইগুলি অমনি মুচকি হেসেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন একদিন আমাকে।

শ্রীগুরু থেকে সদ্যোজাত ঐ অভিজ্ঞতার পর সেদিন অন্য কোনো বইয়ের দোকানে আর যাইনি আমি।

ভাবলুম তার দরকার হবে না। আমার বন্ধুবান্ধবের এমন কিছু ঘাটতি নেই, তাদের কাছেই কাটিয়ে দিতে পারব এই কটা কপি। সেখানেই কাটতি হবে।

আমাদের বইয়ের চাহিদা প্রায় বউয়ের চাহিদার মতই সে রাতারাতি বাড়িয়ে দিয়েছে নাকি—বলছিল বিনি। সেই চাহিদা যেমন, মশারির মধ্যে, রাতারাতি রাতের পর রাত বাড়তেই থাকে, বেড়েই যায়, মশক-গুঞ্জনের মতই শুনতে হয় যে-গঞ্জনা, আমার বই নিয়ে বন্ধুদের কাছে তার পরখ করতে গিয়ে প্রায় হাতাহাতি বাধার যোগাড়!

বন্ধুরা যে এত দূর বন্ধুর হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। ধার চাইতে গেলেই তারা বিগড়ে যায় জানতুম, ধার দিলে পরেও প্রায় সেই দশাই দাঁড়ায়—বন্ধুত্ব আর টাকা উপে যায় এক সাথে। কিন্তু বই গছাতে গিয়েও, এমন কি, আবাআধি

দামেও যে তেমনতরটাই ঘটতে পারে আগে আমি জানতাম না।

বই বেচতে গিয়েই টের পাওয়া গেল মোট বারো আনাও দাম নয় কারও বন্ধুত্বের। হাসিমুখে বইয়ের মোট নিয়ে মুখের গুমোট নিয়ে ফিরতে হয়েছে। মোটা-মুটি এই লাভ।

নাঃ দরকার নেইকো। নগদ বিক্রির আশা সুদূর পরাহত, তার চেয়ে সেকালের সাবেক সেই বার্টার সীসটেম-এই ফিরে যাওয়া যাক। মালের বদলে মাল। মাল্য-বিনিময়ের মতই।

গোড়াতেই গেলাম বোস কোম্পানির ওষুধের দোকানে। শ্রীগুরুর পাশেই দোকানটা।

সেখান থেকে ডাঃ নলিনী সেনগুপ্তের প্রেসক্রিপশন মাফিক মার হাঁপানির মিকশ্চারটা নেওয়া হত। এখান থেকে বানিয়ে নিয়ে প্যাক করে পারসেলে মার কাছে পাঠাতাম নিয়মিত। আর মাঝে মাঝে তার এক আধ দাগ আমি নিজেও

মারতাম না যে তা নয়।

মার আমার হাঁপানির ব্যারাম ছিল। বেজায় হাঁপানি। ওই ওষুধটা খেয়ে উনি সুস্থ হতেন তার পরেই।

আমার হাঁপানি হয়নি। তখনো নয়। কিন্তু মা বলেছিল যে বাপের সম্পত্তির মতন মায়ের রোগ ছেলেতে বর্তায়। আমারও পরে নাকি ওই রোগ—উত্তরকালে উত্তরাধিকারে হবার।

হয়েছিলও। কিন্তু তখনো হয়নি। তবুও, প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান কিওর-এর মতই ওই ওষুধটার এক আধ দাগ সাবাড় করতাম। খেতে বেশ ওষুধটা। ওতে নাকি গাঁজার নির্যাস দেওয়া থাকে শুনেছি। খেলে একটুখানি মৌতাতের মতন হয় বটে। এখনও খাই মাঝে মধ্যে। খাবার পরে মগজ খোলে, বুদ্ধি খ্যালে, লেখাও খেলতে থাকে। আমার গল্পগুলি যে নিতান্তই গাঁজাখুরি হয় তা ঐ জন্যই কিনা কে জানে!

বোস কোম্পানিতে ঢুকে কাউন্টারের ওপরে তিনখানা অশ্বমেধ রাখলাম।

'আমার' এনসাইক্লোপিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত উপরিউক্ত ভদ্রলোক 'বই' তিনখানা একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন—'একই বই দেখছি। তা, তিনখানা কেন? একখানা দিলেই হয়। পড়তে দিচ্ছেন তো? ঐ একখানাই যথেষ্ট। একজনের কি দু তিনখানা বই পড়া যায় কখনো?'

'পড়ার জন্য পাচ্ছেন কেন? না, পড়ার জন্যে নয়' বলতে যাই।—'একজনের পড়ার পক্ষে একটাই অঢেল...আমি জানি। দুজনের পক্ষে যথেষ্টই।'

'ও! আমাদের তিন ভাইয়ের জন্য তিনখানা? কিন্তু পড়ার ফুরসং কি আছে মশাই আমাদের? পড়ি কখন?'

'না, পড়ার জন্যে দিই নি। ওষুধের পাউডার ইত্যাদি প্যাক করার কাজে কাগজ লাগে না আপনাদের? সেই সব পুরিয়া মোড়বার জন্যেই দেওয়া। যদি আপনাদের কাজে লেগে যায়।'

বইগুলি তিনি দ্বিতীয়বার নাড়লেন—'কখানাই বা কাগজ আছে? কটা পুরিয়াই বা হবে এতে? কদামে দেবেন?'

'বিনা মূল্যে। বিলকুল বার্টার সিসটেমে। আপনাদের এখান থেকে আমরা একটা মিকচার নিই না? ডাক্তার নলিনী সেনগুপ্তের হাঁপানির দাবাই? বারো আনা করে শিশি? আর এই দেখুন, বইগুলির দামও ঐ বারো আনা করেই। তিন শিশি মিকচারের বদলেই এই তিনখানা বই।' আমি কই।

'তা কী করে হয়? এভাবে কি বদল চলে নাকি? এক আধ পাতার কখানা পুরিয়াই বা হবে আর? বারো আনায় যে আমরা চার দিস্তা বাদামী কাগজ পাবো মশাই!'

'বাদামী না হলেও এটা বেশ দামী কাগজ। পিওর অ্যান্টিক পেপার। বারো টাকা রীমের নাকি। আর যদি নেহাত বাদামী হওয়ারই দরকার থাকে, বই তিনখানা ছাদের রোদ্দুরে শুকোতে দিন, দেখতে না দেখতেই কদিনে বেশ বাদামী হয়ে আসবে দেখবেন।'

কেমিস্টবাবু আদৌ তা দেখতে প্রস্তুত নন। মাথা নেড়ে, বস্তুত, একেবারে বসিয়ে দিলেন আমাকে।

সেখান থেকে ঢুকলাম শ্রীমানী মার্কেটে—তার পাশেই।...

এই রকম সারাদিন ধরে নানা জায়গায় নানান হুড়ুম্বা বড়ুয়া সেরে অবশেষে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে সাংগুভ্যালী চায়ের দোকানে এসে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ভাবিঃ আমার চা টোস্টের বিনিময়ে দোকানী ভদ্রলোক তিনখানা নিতে রাজি হলেন। তাও অনেক ভেবেচিন্তে। সাংগুহীন হয়ে চা টোস্ট নিয়ে বসা গেল। নুন-মাখানো টোস্ট গোঁফের গোড়ায় ছোঁয়াতেই ...

...'একি, এক সঙ্গে ক' কাপ নিয়ে বসেছো গো"

সেলুনে গিয়ে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে এসেছি, তারই প্রতিক্রিয়া।

কামানোটা তখনো ঠিক পুরো হয়নি... না না! গল্পের সেই জামাইবাবুর মতন নয়, একধার কামিয়েই ছেড়ে দেয়নি আমায়। একটু না কামাতেই খিদে পেয়ে গেল বেজায়, এক গাল খেতে চলে এসেছি এখানে। আবার এখান থেকে সেখানেই ফিরে যাব সটান—কামানোর সবটা সম্পূর্ণ করতে—এখনো চুলের ছাঁটাই শ্যাম্পু, হেয়ার ড্রেসিং, চুলের ওপর চাকিয়াতি—ঘাড়ের ওপর দলাই মলাই পাউডার মাখামাখি—কত কী বাকী।

এমন সময় দেখি কী, বিনি যাচ্ছে সামনে দিয়ে। দেখেই তাকে ডেকেছি—'বিনি, এই বিনি। আয় আয়। এখানে আয়। এদিকে গেছলি কোথায় রে?'

'ইস্কুলের ছুটির পর আমার বন্ধুকে একটুখানি এগিয়ে দিতে গেছলাম। এই ধারেই ওদের বাড়ি।' বিনি বলল—'এখানে বসে বসে করছো কী তুমি?'

'চা খাচ্ছি, দেখছিস না? চা টোস্ট ইত্যাদি, তোকেও খাওয়াবো, বসে যা।'

বিনি বসলো। —'এ কি! একসঙ্গে ক' কাপ নিয়ে বসেছো গো? চার কাপ! হঠাৎ এমন চা খাওয়ার ধুম কেন? পয়সা কোথায়?' আধ-খাওয়া চারটে কাপ সাজানো দেখছি!'

'পয়সা দিয়ে খাওয়া নয় রে, বিনিময়ে পাওয়া। এখন বল, ক' কাপ তুই খেতে চাস? বললেই দেবে। একুনি দেবে। ক' কাপ দেবে বল—এক...দুই...তিন?'

'রক্ষে করো। এক কাপই দেবে। তার বেশী খেলে রাত্তিরে ঘুম হবে না আমার। পরীক্ষার সময় এখন, জানো তো।'

দোকানদারকে এক কাপ চা আর খান ...

কাউন্টারের সামনে কাঁদিসগুলো রেখে তার একখানা থেকে এক আধটু তিনি পড়ে দেখছেন—মুখখানা যেন কী রকম করে। তাই দেখে শুধালাম—'পড়ে দেখছেন বুঝি বইটা? লাগছে কি রকম?'

'খুব ভালো লাগছে না।' স্পষ্টবাক্যে তিনি কন—'তবে কিনা, কেনা হয়ে গেছে যখন, এখন আর কী উপায়। আপনি কাপ চারেক চা শেষ করে বসে আছেন এদিকে। কিন্তু সত্যি বলতে...এক পাতাও আমি এগুতে পারিনি।'

'ভালো লাগছে না বুঝি?'

'ভালো না লাগলেও, বুঝতে পারলে লাগত হয়তো এক রকম, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতেই পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না? সে কী মশাই?' বিনি শুধোয়।

'বাংলা হরফে লেখা যখন, বাংলা বই-ই নিশ্চয়। কিন্তু ভাষাটা এর সত্যি সত্যি বাংলা কি? চায়ের দোকান খুলেছি বলে যে গণ্ডমূর্খ তা তো নয়, দু চারটে ভাষা রপ্ত আছে আমারও। কিন্তু তার কোনটা যে, ঠাওর পাচ্ছি না ঠিক। বাংলা নয়, অসমীয়াও নয়, হিন্দী যে তাও বলতে পারি না, তবে ওড়িয়া আমার জানা নেই। বাংলা হরফে ছাপানো ওড়িয়াই নাকি বইটা?'

'না, ওড়িয়া নয়, তবে উড়ে যাচ্ছে বটে বইটা!' বিনি বাতলায়।

'যাক্ গে, কেনা হয়ে গেছে যখন। আমার দোকানের চা টোস্ট খুব সুখাদ্য বলে সবাই...'

'বইটাও নেহাত অখাদ্য হবে না।' আমার অনুযোগ।

'হলেই বা কী! ভেবে দেখছি, ইতরভদ্র অনেকের পায়ের ধুলো পড়ে এখানে, তাদের জন্য দৈনিক পত্রিকা রাখতে হয়। তার একটা খর্চা তো ছিলই, আর খবরের কাগজ অবরের রাত পেরুলেই পুরনো, আবার নতুন কেনা। সেদিক দিয়ে দেখলে এই খান তিনেক বই অনেক দিন যাবে...আর যেতে যেতেও এর অনেকদিন। প্রথমে এর মলাট যাবে, তা যেতেও প্রায় মাস খানেক, তারপর খদ্দেরের থেকে পাতা খসাতে শুরু করবে। তাতেও কাটবে কয়েক মাস এমনি করেই... তবে এ বই কেউ নিয়ে পালাবে না, চোর যাওয়ার ভয় নেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। বাংলা ভাষা যদিও হক, এর কথাবার্তা এমন উলটো পালটা মশাই। কেউ এ বই নিয়ে কাটবে না, এই পড়তে বেশিক্ষণ বসেও থাকবে না।...মোটের ওপর খবরের কাগজের বদলে এগুলো টেবিলের ওপর ফেলে রাখলে ইন দি লং রান্ সস্তা পড়বে বলে বোধ হচ্ছে। তবে যদি কি এগুলোর ভাষা একটু বাংলা হত...'

'বাংলা ভাষাতেই লেখা, আমি লি...

একদম
নতুন

SAPPY
PEANUT CANDY
DALMIA UDYOG
স্যাপী

SAPPY
PEANUT CANDY

সুবোধ চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বাঙালীর মুখে মুখে ফিরত মধু কানের গান। বিশেষত গ্রাম-বাংলার মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল সেকালের বিখ্যাত গায়েন ও গীত-রচয়িতা মধু কানের ঢপ্‌-কীর্তনের গান। কেবল ভাবের বৈশিষ্ট্যে নয়, সুরের অভিনবত্ব ও পরিবেশন-নৈপুণ্যে এই গানগুলি সেদিন বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপকরণ হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছিল। অথচ আজকের বাঙালীর কাছে সেই ঢপ্‌-কীর্তনের কথা একেবারেই অপরিজ্ঞাত, এমন কি আধুনিক কালের সংগীত-রসিকদের কাছেও মধু কানের নাম প্রায় অপরিচিত।

সেকালের প্রচলিত কীর্তনের রীতিতে কিংবা 'নূতন পাঁচালী' গাওনার রীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়ে মধু কান সংগীতে নূতন রীতি প্রতিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করেছেন। সে যুগের বহু বিশিষ্ট সংগীত সাধক তাঁদের গান রচনায় এই নূতন রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন; তাই তাঁদের কাছে মধু কান ছিলেন নমস্য মানুষ।

মধু কান নামে তিনি সুখ্যাত খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর পুরো নামটি ছিল মধুসূদন কিন্নর। 'কান' শব্দটি সম্ভবত 'কিন্নর' পদবীরই অপভ্রংশ। এছাড়া এক-সময় এদেশে গায়েন সম্প্রদায়ের লোকদের 'কান' বলা হ'ত। হেরেসিম লেবেডফের একটি লেখায় এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত মধুসূদনের পূর্বপুরুষেরা গায়েন (Professional singer) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

মধুসূদনের বাবার নাম ছিল তিলক-চন্দ্র কিন্নর। ১২২০ সালে যশোহর জেলার উলশিয়া গ্রামের এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে মধুসূদনের জন্ম হয়। এঁদের চার ভাই-এর মধ্যে মধুসূদন ছিলেন জ্যেষ্ঠ। দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া শেখা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; অবশ্য পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় কোনরকমে অল্প অল্প পড়তে শিখেছিলেন, কিন্তু লিখতে পারতেন না।

ছেলেবেলা থেকেই মুখে মুখে গান রচনা করতেন তিনি; গানের গলাও ছিল তাঁর সুন্দর। এই গানের গলার জন্য বালক বয়সেই একাধিকবার যাত্রার দলে গায়েনের কাজ নিতে হয়েছে, কিন্তু বাবার শাসনের ভয়ে স্থায়ীভাবে যাত্রার দলে নাম লেখানো সম্ভব হয়নি।

যৌবনে গানের আকর্ষণ তাঁকে আর ঘরে বেঁধে রাখতে পারেনি। গান শেখার আগ্রহে তিনি গুরুর সন্ধানে বাড়ী ছেড়েছেন—শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছেন ঢাকার বিখ্যাত গায়ক ছোট খাঁর কাছে। সেদিন ছোট খাঁ মধুসূদনের গলা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দিয়ে নাড়া বাঁধিয়েছেন। মনের মত শিষ্য পেয়ে গুরু তাঁর সমস্ত বিদ্যা উজাড় করে দিয়েছেন; তবু শিষ্যের মন ভরেনি। ছোট খাঁর অনুমতি নিয়েই তিনি গিয়েছেন বড় খাঁর কাছে। ওস্তাদী গানে তখন ঢাকা অঞ্চলে বড় খাঁরই সবচেয়ে বেশী নামডাক। তিনি শিষ্য হিসেবে মধুসূদনকে পেয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তার সুরের ভঙ্গীটি অসাধারণ। তাল-লয় ও রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে তাকে নূতনভাবে পরিবেশন করার দিকেই মধু-সূদনের ঝোঁক বেশী। শুধু তাই নয়, মধুসূদনের গান রচনার ভঙ্গীটিও চমৎকার। পুরোনো কীর্তনের একটি কলি ভেঙে তিনি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গান রচনা করে নিতেন; তাতে আখরের এক-ঘেয়েমি থাকত না, বরং সুরের বৈচিত্র্য প্রকাশ পেত। পদাবলী কীর্তনের প্রতি মধুসূদনের বেশী আসক্তি দেখে তাকে বড় খাঁ পাঠিয়ে দিলেন যশোহর জেলার রায়খদিয়া গ্রামনিবাসী সংগীতসাধক রাধামোহন বাউলের কাছে। এই রাধামোহন বাউলই প্রকৃতপক্ষে মধু কানের সংগীত-গুরু। এঁরই কাছে মধুসূদনের ঢপ্‌-কীর্তন রচনায় হাতে খড়ি।

ঢপ্‌-কীর্তনের আদি রচয়িতা যে কে ছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা যায় না; তবে মধু কানই এর প্রধান গীতকার ও সুরকার। তিনি কেবল গান রচনা করে দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না—প্রতিটি গানের সুর নিজে তৈরী করে দিতেন। সুরের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব-বর্তীদের অনুসরণ প্রায়শই করতেন না—নিজেই রেয়াজ করতে করতে নূতনভাবে সুরের বিন্যাস সাধন করতেন।

ঢপ্‌-কীর্তনের গানে সাধারণত সুরের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য থাকত; এবং এগুলি সাধারণভাবে কীর্তনের মত পরি-বেশিত হলেও এতে আখরের কৃত্রিমতা বা একঘেয়েমি থাকত না। তাই এগুলি সেকালে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একটি প্রাচীন কাব্যে* এর উল্লেখ প্রসঙ্গে জানা যায়,—

'সংকীর্তন নানা ভাতি অপূর্বসুন্দর।
... ...
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর।
বাঙলার নব গান নূতন ঝুমুর।'

শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন যে 'নূতন ঝুমুর' বলতে সম্ভবত এই ঢপ্‌-কীর্তনকেই বুঝানো হয়েছে।

ঢপ্‌-কীর্তন আসলে পাঁচালী গানের নব-রূপায়ণ। কীর্তন গানে যখন গায়েনরা গানের চেয়ে আখর দেওয়ার রীতির উপর বেশী জোর দিতে গেলেন, তখন থেকে কীর্তন গানের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। একঘেয়েমি বর্জন করে নূতনত্বের আকর্ষণে সংগীতামোদী বাঙালী সমাজ আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন নূতন রীতির পাঁচালী গানের প্রতি। এই নূতন রীতির পাঁচালীতে গায়েনদের বিশেষ কোন সাজ-সজ্জা থাকত না। এর কিছু পূর্ব থেকে

---

* জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত 'করুণা-নিধান বিলাস'

আবার পুরুষ গায়েনদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে গায়েন রাখার রীতি প্রচলিত হয়। পরে পাঁচালীর দলে মেয়ে গায়েন রাখা একপ্রকার প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ঢপ্‌-কীর্তন মেয়ে গায়েনদের স্বরাই গাওয়ানো হত। মেয়ে গায়েনের মুখে পাঁচালীর ঢঙে অথচ নূতন রীতির গান শোনার জন্য সকলের মধ্যে আগ্রহ দেখা গেল; এমনিভাবেই ঢপ্‌-কীর্তনের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

মধুকানের গানেই ঢপ্‌-কীর্তনের সর্বাধিক প্রসার। তিনি প্রথম প্রথম বিভিন্ন শখের দলের জন্য গান রচনা করে দিতেন। পরে তিনি একটি পেশাদারী দল গড়ে তোলেন। তাঁর দলে প্রধানত গান গাইতেন মেয়ে গায়েনরা; কিন্তু অধিকাংশ আসরেই শেষ কয়েকখানি গান তিনি নিজে উপস্থিত মত আসরে বসে রচনা করে নিজের মুখেই পরিবেশন করতেন।

মধুকানের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সরল অনুপ্রাস বিজড়িত সুর-মাধুর্য। বাংলা গানে তখন একঘেয়েমি বা গতানুগতিকতার যুগ চলেছে। এই গতানুগতিকতার হাত থেকে উদ্ধার করে তিনি তাঁর গানে সুরের বৈচিত্র্য এবং সেই সঙ্গে ভাষার সৌকুমার্য ও ভাবগত ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে প্রথম শ্রেণীর সংগীত প্রতিভার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

মধুকানের ঢপ্‌-কীর্তনের গানগুলি প্রধানত ভক্তিভাবমূলক। তাঁর গানে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা বর্ণনায় চাতুর্যের পরিচয় ততখানি নেই, যতখানি আছে ভাবের ঐশ্বর্য। বৃন্দাবনের গোপ-বিহারী কৃষ্ণ এখানে চূড়ামণি নন: তিনি কল্যাণময় পরম প্রেমময় ভগবান। ভক্তিভাবের সাধনাতেই তাঁর আরাধনা। মধুকানের একটি গানে এই ভক্তিভাবের কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

। দেবগান্ধার—কাওয়ালী ।

সামান্যে কি রাধারে পায়।
বিনা আরাধনে কি পায় ॥
ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়,
মুক্তি শক্তি আছে যার পায়।
ত্যজে বিষয় বাসনা,
বল কামরে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা,
হৃদি পদ্মাসনেতে পায় ॥

আর একটি গানে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম ভাবাপন্ন চিত্তের রূপটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

। সুরট—কাওয়ালী ।

কি জানি কি হলো আমার মনে।
কি নয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দুনয়নে ॥
... ...
যে দিকে যাই যে দিকে চাই
দেখিতে কৃষ্ণ পাই,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণ বর্ণ, বুঝি কৃষ্ণ পাই;
কমলরূপ চিনি নে—কে সে,
নাম বুঝি তার হৃষীকেশ,
ধরিল আমার কেশে
সূদন বলে শেষে জানবে মনে ॥

মধুকানের কোন কোন গানে মিস্টিক ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়েছে। এগুলির সঙ্গে বাউল গানের একটা ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই শ্রেণীর গানগুলি পরবর্তীকালের লোকসংগীতের ধারায় কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ধরনের গানের একটি নমুনা:—

। ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

সে হাটের সুতো ভবের হাটে পাওয়া ভার
যার কলে হয় কলের সুত,
যার কলে হয় সুতাসুত,
যেখানে সেই নন্দসুত পারিবে এবার।

এবার সুতার বাজার গরম ভবের বাজারে,
সে হাটে নাই কমী-বেশী চলরে সত্বরে,
সে হাটের এমনি বাখান,
রবি-সুতের নাই আমদানী,
নাই সেথা অধিক রপ্তানী, হবে রে ব্যাপার ॥
সাধু মহাজন কেবল যাচ্ছে সে হাটে,
তা নইলে কে যেতে পারে সুতের নিকটে,
থেই হারালি ভবের তাঁতে,
চলরে তুই বৈকুণ্ঠেতে, সূদনে লয়ে যাও সাথে
দেখিতে বাজার।
সে হাটের সুতো ভবের হাটে পাওয়া ভার ॥

মধুকান তাঁর ঢপ্‌-কীর্তনে বিভিন্ন পালার গান রচনা করেছেন। মান, মাথুর এবং অক্রূর-সংবাদের পালাগুলিই তাঁর রচনা সৌকুমার্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁর এই পালাগুলির অনুসরণে সেকালে বহু কৃষ্ণযাত্রার দলের পালা রচিত হত। কেবল গানের বিষয়বস্তু নয়, তাঁর অননুকরণীয় সুরের ভঙ্গীটি সেকালে বহু বিশিষ্ট পালা রচয়িতার নিকট আকর্ষণীয় ছিল। তাই তখনকার দিনে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে 'মধুকানের সুর' কথাটির খুব প্রচলন ছিল। এই সুরের মোহময়তায় আকৃষ্ট হয়ে বহু বিশিষ্ট পালা রচয়িতা তাঁদের গানগুলিতে এই সুরের আরোপ করতেন; আসরের উপস্থিত শ্রোতৃবর্গও তাই চাইত। মধুকানের সুরে গান রচনায় সর্বাধিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন লোচন অধিকারী, সুবল দাস, শ্রীদাম দাস, পরমানন্দ, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পালা রচয়িতাগণ এবং দাশরথি রায়, মনোমোহন বসু প্রমুখ সঙ্গীত রচয়িতাগণ, মহাকবি মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় মধুকানের সঙ্গীতের দ্বারা কিছুটা পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কয়েকটি গানে মধুকানের সঙ্গীত-রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মধুকান তাঁর অধিকাংশ গানেই 'সূদন' ভণিতা ব্যবহার করেছেন। তিনি কেন মধুসূদন নামটি ভণিতায় ব্যবহার করতেন না, তার কারণ সম্পর্কে তিনি রসিকতা করে বলতেন—"মধু পাছে বিষ হয়, এই ভয়ে 'মধু' নাম দিতে আমার সাহস হয় না।" 'সূদন' ভণিতা ব্যবহারের অবশ্য একটি সংগত কারণের কথা জানা যায়। তাঁরই সমসাময়িক কালে মধুসূদন নামে দু-জন কবি যথাক্রমে 'জিতাষ্টমীর পালা' ও 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র রচয়িতা ও গায়েন হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁদের নামের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য সম্ভবত তিনি 'সূদন' ভণিতা ব্যবহার করতেন তাঁর গানগুলিতে। মধুকান তাঁর সমসাময়িক কালে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর তাঁর ঢপ্‌ কীর্তনের আসরের শ্রোতৃবর্গ কিন্তু ভণিতায় ভ্রূক্ষেপ করত না। তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুবর্ষী সুরের লহরী মাতিয়ে তুলত শ্রোতৃবর্গের প্রাণ-মন; তারা বিভোর হয়ে শুনত মধুকানের গানের সুললিত শব্দবিন্যাস, সরল অনুপ্রাস জড়িত সুর-ঝংকার এবং ভক্তিভাব বিমণ্ডিত আধ্যাত্মিকতার মাধুর্য। সেদিন বঙ্গ সংস্কৃতির বেদীতলে নিবেদিত হয়েছিল অভিনব সঙ্গীতের নৈবেদ্য, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নূতন এক ঐতিহ্যের ধারা।

১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ঢপ্‌-কীর্তনের আসরে মধুকান অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেদিনকার আসরে সুরট-মল্লার রাগিণীতে গান গাইতে গাইতে বুকে অসম্ভব ব্যথা অনুভব করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তিনদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থেকে মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

একদা জনপ্রিয় এবং বর্তমানে প্রায়-অপরিচিত এই বাঙালী গীতিকার ও সুর-সাধকের কথা আজ বাঙালীর কাছে নিষ্প্রাণ ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। একদিন তিনি যে এক ঐতিহ্যের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ অবলুপ্ত। অথচ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই ঐতিহ্যের দান বড় কম নয়। এই ঐতিহ্যকে কেবলমাত্র স্মৃতির উপকরণ করে রাখা সমীচীন হবে না। কারণ, কেবল স্মৃতি-রোমন্থনে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের প্রকৃত বিচার হয় না; বর্তমান ও উত্তরকালের ভাবসাধনায় তার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রভাবের মূল্য-নির্ধারণেই সেই ঐতিহ্যের প্রকৃত মর্যাদা।

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৪ ॥

ভারতের যে কোনো শহরেই একজন না একজন বাঙালী ডাক্তার, উকিল বা অধ্যাপকের দেখা পাওয়া যাবেই। বুলবুল বেশ কয়েকদিন অসুখে ভোগার পর যে ডাক্তারটিকে ডাকতে গেল, তাঁর নাম রাধাগোবিন্দ কর। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। সূর্যকে তিনি গ্রাহ্য করলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন, পেসেন্টকে এখানে নিয়ে এসো। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

সূর্য জানালো যে, রোগিণীর হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই।

ডাক্তার বললেন, হাঁটতে না পারেন মইজীকে বলো টাঙ্গা নিয়ে আসতে। আমার যাবার সময় নেই।

সূর্য তখন ইংরিজিতে বললো, পুরো ভিজিট দিলে ডাক্তারদের কি রুগী দেখতে যাবার নিয়ম নেই?

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মুখ তুলে তাকালেন। অবাক হলেও তিনি মুখের ভাবে তা প্রকাশ করেন না। সূর্যকে তিনি বাড়ির দারোয়ান-টারোয়ান মনে করছিলেন—অনেক চাকর বা দারোয়ানের চেহারাও সুদর্শন হয়। সূর্য ডাক্তারবাবুকে যে বাড়িটিতে নিয়ে যেতে চাইছেন—তিনি সেই বাড়িটির পরিচয় জানেন, সেই জন্যই আপত্তি। কিন্তু সে বাড়ির দারোয়ান ইংরেজি বলে না। তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি ধমকের সুরে বললেন, আমার ইচ্ছে না হলে আমি রুগী দেখতে যাবো না, আমাকে কেউ জোর করতে পারে?

সূর্য একদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলো। বুলবুলরা ওদের চেনা হেকিম সাহেবের ওষুধ খায়। কিন্তু কদিন ধরে কিছুতেই বুলবুলের কাশির রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। যে কয়েকজনের কাছে সে একজন বড় ডাক্তারের নাম জিজ্ঞেস করেছে, প্রত্যেকেই এই রাধাগোবিন্দ করের নাম বলেছে। কিন্তু কে জানতো, তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত?

এখানে রাগারাগি করে লাভ নেই, তাই সূর্য অনুনয় করে বললো, আপনি গেলে বিশেষ উপকার হতো। আপনি দয়া করে চলুন।

—ভিজিটকা রুপিয়া কৌন দেগা?

—ম্যায়—

চশমখোরের মতন ডাক্তার তক্ষুনি হাত বাড়ালেন। সূর্য একটি একশো টাকার নোট এক টাকার নোটের ভঙ্গিতে রাখলো টেবিলের ওপর। তিনি সেটা নিয়ে পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ালেন। আদেশ করলেন, আমার ব্যাগটা নিয়ে চলো। গাড়ি ডাকো।

গাড়িতে ডাক্তার একটাও কথা বললেন না। বাড়ির সামনে এসে নাক কুঁচকোলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়, অন্য একটি মেয়ে নামছিল—ডাক্তার এমনভাবে দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালেন, যাতে মেয়েটির হাওয়াও তাঁর গায়ে না লাগে।

বুলবুল বিছানায় শুয়ে আছে চোখ বুজে। কুলসম নামে একটি মেয়ে হাওয়া করছে মাথার পাশে বসে। ডাক্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এঃ, কি বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর ঘর! সব জানলা খুলে দাও। পর্দা সরাও!

বুলবুলের ঘরে খাট নেই, মেঝের ওপর পাতা বিছানা। সেখানে ডাক্তার বসলেন না। কুলসম ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এলো। সেখানে বসে, রুগী দেখবার আগে ডাক্তার সূর্যকে প্রশ্ন করলেন, ইয়ে জেনানা তুমহারা কৌন হ্যায়?

সূর্য বললো, সী ইজ মাই ওয়াইফ।

ডাক্তার বিশ্রীভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, জল গরম করতে বলো এক বাটি। রুগীকে উঠে বসতে বলো।

মনে হচ্ছে, তিনি সরাসরি রোগীর সঙ্গে কথা কথা বলবেন না। তা হলে চিকিৎসা করবেন কি করে?

তিনি কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বুলবুলের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টেথোসকোপটা বাড়িয়ে রাখলেন পিঠে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন এবং নিজেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলেন ঘন ঘন।

কুলসম গরম জলের বাটি নিয়ে এলো। আরও কয়েকজন এসে ভিড় করেছে দরজার সামনে। কুলসম সূর্যকে বললো, বাঙালীয়া, ভেটস আউর সাবুন উধার রাখ দিয়া—

ডাক্তার এবার সত্যি সত্যি চমকে উঠলেন। আপাদমস্তক দেখলেন সূর্যকে। তারপর কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাঙালী?

—হ্যাঁ।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর শুধু যে নীতিবাগিশ তাই নয়, অত্যন্ত বেশী রকমের প্রাদেশিক। রোগিণীর দিক থেকে নজর ফিরিয়ে তিনি ধমকে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?

সূর্য উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো।

—তুমি কোথায় থাকো?

—এখানেই।

—কেন?

—আপনি রুগীকে কি রকম দেখলেন?

ডাক্তার ততক্ষণে স্টেথোস্কোপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অবজ্ঞার সুরে বললেন, এখানে এর কিছু করার নেই। একে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

—ও হাসপাতালে যাবে না। যেতে চায় না।

—তা হলে আমার আর কি কথার আছে?

—ওর কি হয়েছে কি?

—ওর কি হয়েছে, তা যে-কোনো অন্ধও বুঝতে পারে। এক্স-রে নিতে হবে, থুতু পরীক্ষা করাতে হবে—কিন্তু তার আগেই সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায়, ওর দুটো লাংসই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আগে কোনো রকম চিকিৎসা করায় নি?

—আগে তো ঠিক বোঝা যায় নি।

—এরা সাধারণত বুঝতে দেয় না। রোগের চিকিৎসা করালে আর অন্য পুরুষ মানুষের সর্বনাশ করবে কি করে?

ডাক্তার শেষের দিকে বাংলায় কথা বলছিলেন বলে সূর্য একটু আশ্বস্ত বোধ করলো। বুলবুলের এসব কথার মর্ম বোঝার দরকার নেই। অন্য একজন সহৃদয় ডাক্তার ডাকলেই হবে। এই কাঠখোট্টা লোকটিকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

ডাক্তার গরম জলে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধুলেন। ওদের তোয়ালে না ছুঁয়ে বার করলেন নিজের পকেটের রুমাল। সূর্যকে বললেন, চলো।

বাইরের দরজা পর্যন্ত এসে সূর্য হাত তুলে নমস্কার করে বললো, আচ্ছা—

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা মানে? আমাকে চেম্বারে পৌঁছে দাও।

—আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি একটা গাড়ি ডেকে দিচ্ছি। আমি নিজে যদি না যাই।

—তোমাকে যেতে হবে।

—আমি তো এক্ষুনি যেতে পারছি না। পরে যদি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করি—

—পরে আবার কি? তুমি এখনো এখানে থাকবে নাকি? তোমাকে আমি এখানে থাকতে দেবো না। তোমার লজ্জা করে না? দেখে তো ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। বাঙালী জাতির কলঙ্ক!

সূর্য দৃঢ়ভাবে বললো, আমাকে এখানেই থাকতে হবে!

ডাক্তার আবার নাক কুঁচকে সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমার স্ত্রী যদি শোনে, আমি এই বাড়িতে চিকিৎসা করতে এসেছি, তা হলে আমাকে এলাহাবাদে গিয়ে গঙ্গায় চান করে আসতে হবে, তা জানো? তোমার কথা শুনে আমি এলাম, আর তুমি আমার কোনো কথা শুনবে না?

সূর্য চুপ করে রইলো।

—ঐ মেয়েটির জন্য আর চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

—আপনি তো ওর চিকিৎসার কথা কিছুই বললেন না।

ডাক্তার আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, নামকরা ডাক্তারদের একটা ট্র্যাজেডি কি জানো? তাদের হাতেই বেশী রুগী মরে। সকলে একেবারে শেষ সময়ে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। এখানে আসবার আগেই আমি জানতাম।

—আপনি কি বলছেন?

—হাসপাতালে নিয়ে যাও আর যেখানেই চিকিৎসা করো—মাস দু'একের বেশী ঐ মেয়েটি বাঁচবে না।

—মাত্র চার পাঁচ দিন আগেও সুস্থ ছিল, কোনো কিছু বোঝা যায় নি।

—মেয়েছেলেরা পারে, মেয়েছেলেরা পারে। ওদের অনেক কিছুই বোঝা যায় না। এই সব রুগীকে বিধান রায়, নলিনী সরকার বা আসরফউল্লার মতন ডাক্তাররা হয়তো বাঁচাতে পারে, আমি পারি না।

সূর্য স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। এ সব কি বিশ্বাস করা যায়? বুলবুল, এত প্রাণবন্ত বুলবুল—

ডাক্তার পকেট থেকে একশো টাকার নোটটি বার করে বললেন, নাও—

—না, না, আপনার ফি আপনি নেবেন না কেন?

আবার বাঁকা হাসিতে তিনি ধিক্কার দিলেন সূর্যকে। নোটটা মুড়ে বাজে কাগজের মতন তিনি ছুঁড়ে দিলেন। আর কোনো মন্তব্য না করে হাত তুলে ডাকলেন একটা চলন্ত টাঙ্গা।

সূর্য নিজের ঘরে ফিরে আসার পর অনেকে মিলে ঘিরে ধরলো তাকে। কি বললেন ডাক্তারসাব?

সূর্য হেসে বললো, খুব রাগ করলেন ওঁকে ডেকে এনেছি বলে। কিছুই হয়নি। সর্দি জমে গিয়ে রক্ত পড়ছে। অত বড় ডাক্তার এত ছোট অসুখ দেখেন না!

সকলে মত প্রকাশ করলো, তারাও এই কথাই বলেছিল। হেকিম সাহেবের দাবাই খেলে কোনো শক্ত অসুখ হয় না। বুলবুলকে আজই অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে না?

বুলবুল বিছানায় উঠে বসে ক্লিষ্টভাবে হাসতে চেষ্টা করছে। মুখখানা চুপসে গেছে এই কদিনেই; তবুও বিশীর্ণ চন্দ্রলেখার মতন একটা রূপ আছে সেই মুখে। চুলে চিরুনি পড়ে নি দু'তিনদিন।

সূর্য বললো, হ্যাঁ, আজ অনেক ভালো দেখাচ্ছে। ডাক্তারবাবু তো কোনো দাবাই পর্যন্ত দিতে চাইলেন না। বললেন, এমনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন সারা দিন ধরে সূর্য বারবার চোরা চোখে তাকাতে লাগলো বুলবুলের দিকে। আগের মতন আর সোজা তাকাতে পারছে না। জেলে থাকার সময় সে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে দেখেছিল। সকলেই তার দিকে দারুণ সমীহের সঙ্গে তাকাতো। যেন তার শরীরে লেগেছিল মৃত্যুর প্রগাঢ় গাম্ভীর্য। বুলবুলও অনেকটা সেই রকম। মাত্র দু'তিন মাস? এ কি স্বপ্ন?

সারা দিন সে বুলবুলকে হাসি খুশীতে রাখার চেষ্টা করলো। ভেতরে ভেতরে তার অসম্ভব দ্বন্দ্ব চলছে। এখন কি করা উচিত? হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করা উচিত নয়? তা হলে বুলবুলকে জানাতে হবে। হাসপাতালের খাটে বুলবুল একা শুয়ে আছে, এটা সে কিছুতেই কল্পনা করতে পারছে না।

জীবন থেমে থাকে না। সেদিনও অন্যান্য ঘরে সন্ধেবেলা বাবুরা এলো, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর ও তবলার আওয়াজ শুরু হলো, যারা বুলবুলকে ভালোবাসে খুব, তারাও এক সময়ে নেশাগ্রস্ত গলায় খিলখিল করে হাসে।

বুলবুলের ঘরে সেদিন আলো জ্বললো না। সন্ধে থেকে বুলবুলের আবার জ্বর এসেছে, মাঝে মাঝে কাশির দমকে বেঁকে যাচ্ছে পিঠ। সূর্য তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো বুলবুল। সূর্য জেগে রইলো ঠায়।

একাগ্র হয়ে শুনতে লাগলো বুলবুলের নিশ্বাসের শব্দ। এখন থেকেই তার ভয় হচ্ছে, হঠাৎ বুঝি নিশ্বাস থেমে যাবে। মৃত্যু জিনিসটা কি রকম, তার কোনো নির্বাচন নেই? পৃথিবীতে এত মানুষ রয়েছে, তবু বুলবুলকেই মরতে হবে কেন? বুলবুল জীবনকে এত ভালোবাসে, আনন্দ স্ফূর্তিতে তার কখনো কোনো ক্লান্তি নেই, সেই বুলবুলকে মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাবে? মৃত্যুর এলাকা কত বড়, তার বাইরে কোথাও বুলবুলকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না?

জানলার বাইরে একটা নিঃসঙ্গ তারা দেখা যায়। বড় বেশী জ্বলজ্বল করছে একটা সময় যেন তারাটা একটু সরে গেল মনে হলো। কে যেন বলেছিল তারা সরে যায়? কি এর মানে?

এক সময় শুনতে পেল কান্নার শব্দ। বুলবুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সূর্য তার পিঠে হাত দিয়ে বললো, এ কি, কাঁদছো কেন? এই, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

বুলবুল বললো, ডাক্তার সাহেব কি বলেছে আমি জানি। আমি আর বাঁচবো না!

সূর্যর হাতটা আপনিই গুটিয়ে এলো। মেয়েরা শুধু যে অনেক কিছু গোপন করতে পারে তাই নয়, অনেক গোপন খবরও জেনে যায় অনায়াসে।

(ক্রমশ)

একতারা ঝরনার পথে পাখি

প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

গয়া থেকে ৫৬ মাইল দূরে বিশাল পর্বতমালার মধ্য দিয়ে একতারার ঝরনা প্রবাহিত, অতি সুরম্য স্থান। অনেক পথযাত্রীর নিকট তার বর্ণনা শুনে দেখবার বাসনা ছিল বহু দিন থেকে। এবার সফরে এসে তা কার্যে পরিণত হবে মনে করে ঔৎসুক্য ও আগ্রহে যাত্রার আয়োজন করছি। সঙ্গে যাবে আমার দুই পুত্র এবং গয়ার কয়েকটি কর্মচারী ও সঙ্গী। তাই চলেছি মালপত্র নিয়ে মোটরে। ১১ই মে ১৯৫১, শনিবার রাত্রি। আমরা যখন একতারা ডাকবাংলায় পৌঁছালাম তখন প্রায় ১২টা রাত্রি। নিদাঘের রাত্রি। আমরা বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম এখান থেকে পাহাড়ের পাদদেশ প্রায় দেড় মাইল, তারপর অবরোহণ আধ মাইল।

প্রত্যূষে নিদাঘ ঋতুর পাখির জীবন শুরু হয় ভোর ৪-৩০টায়। অতএব উঠতে হবে খুব ভোরে। সকলের উৎসাহ এই সকাল বেলার ঝরনা-পথের পাখি দেখার অভিযান। রবিবার ভোর ৪টা। আমার ঘুম ভেঙে গেল, দূরের পাহাড় যেন ডাক দিয়েছে, পাখির ঘুম ভাঙার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও আমরা একটি দল, আমার পুত্রদ্বয় সহ বাহির হলাম ৪-৩০টায়। সঙ্গে দুটি দূরবীন নিয়েছি আর দর্শনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতে নোট বই ও পেন্সিল। আমার উৎসাহ সংক্রমিত হয়েছে সঙ্গীদের মধ্যে। অদূরে ঝাপসা পর্বতশ্রেণী। ঝরনা আমাদের পথে চলার উৎসাহ দিয়েছে। ভোর বেলার পাখির ডাক চিনে চিনে সঙ্গীদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি, সন্তর্পণে।

দূরে জঙ্গলের প্রান্ত থেকে ডাক শোনা যাচ্ছে হাট্টিমা পাখির—কুউক্ কুইক্ কুইক্ পিকুউক্ পিকুউক্ পিকুউক্! সাঁঝসকাল এদের এই ডাক শোনা যায় খোলা মাঠে, ঝোপঝাড়ে। এরা "মাঠে পাড়ে ডিম" এবং চেহারা ঢ্যাঙা তাই এদের নাম রেখেছি হাট্টিমা পাখি। বিশাল চোখের চারপাশ কালো মোটা টিট্টিভের সমজাতি এই কাজল-রেখা, তার পরে সাদা রেখা। বড় চোখের তারা হলদে। দিনের বেলায় জমিতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, দেখা হলে ছিটে দৌড়, পরে ধরাশায়ী হয়ে অলক্ষ্যগোচর হবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার রাত্রেতে এদের গতিবিধি। অন্ধকারে, চাঁদের আলোয় বিশেষ প্রজনন ঋতুতে এদের ডাক শোনা যায়। কুইক কুইক্ কুইক্ পিকুইক, পিকুইক।

তারপর শোনা যাচ্ছে ভারতীয় চিপ্‌পকের* অবিরাম ডাক, চক্ চক্ চক্ চড়ড়ড়ড়ড়......চক্ চক্ চক্ চড়ড়ড়ড়ড়। এদের স্বভাব কিছুটা পেঁচার মত, তবে এরা ভূচর। সূর্যাস্তের পর এরা নিঃশব্দ পক্ষ সঞ্চারণে দলে দলে অলক্ষ্য ভূমি বা বিশ্রাম স্থল থেকে উত্থান করে উড়তে আরম্ভ করে এবং কীট-পতঙ্গ শিকার করে। বসন্তে গ্রীষ্মেতে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত এদের ডাক শোনা যায়

সারস-চঞ্চু মাছরাঙা

অবিরাম। ভোরের অন্ধকারে আমরা শুনলাম চক্ চক্ চক্ চড়ড়ড়ড়—নিশাচর পাখিদের অন্তিম সঙ্গীত।

এবার বুলবুলির সুললিত কাকলি শুনেছি। তার কণ্ঠস্বরের নূপুরশিঞ্জন, ঊষার অভিনন্দন গীতি। খর্ব লতাগুল্মের রাজ্য মুখরিত করে তার মধুর ও উৎফুল্ল সঙ্গীত ভোরের আকাশকে করছে স্বপ্নাবেশময়। চলেছি উপত্যকার ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর বালুরেখার তীরবর্তী বক্ররেখা অনুসরণ করে। লাল ঝুঁটি টিট্টিভ উড়ে গেল। কণ্ঠী ঘুঘুর করুণ কূজন ঘুঘু...ঘু বনানীর মায়াকে বিস্তার করেছে। অদূরে ঝোপের মধ্য থেকে ডাক

ছোট মাছরাঙা

আসছে কুকো পাখির, হুপ্ হুপ্। ভারতীয় রবিন বা কালিশামা জোড়া নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। পুরুষ পাখিটি ডাকছে—হুউচ্! হুইচ। হুইচ্। কুচকুচে কালো পেট, পিঠ বাদামী কিন্তু কালোর সঙ্গে মিশে গেছে। উড়লে ডানার দু পাশে সাদা রেখা দেখা যায়। স্ত্রী গাঢ় বাদামী। উভয়ের লেজের নীচে লাল ছাপ খর্ব গুল্মের সর্বোচ্চ শাখার উপর বসে পুরোটি গাইছে। আবার নীচে নেমে যাচ্ছে পোকা খেতে, ফিরে গিয়ে বসছে শাখায় এবং ডাকছে হুইচ। হুইচ। হুইচ। মেরেটিও সুগায়িকা প্রজনন ঋতুতে আমি এর গান শুনেছি, বসার ভিতর প্রবেশ করার প্রকালে। বুলবুলির সংখ্যা বেড়েছে, তাদের কিঙ্কিনীর ঠুনঠুন সঙ্গীতের ঐকতান বনস্থলীকে পুলকিত করেছে।

এগিয়ে চলেছি ধীর পদবিক্ষেপে। ওই কুকো পাখি বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে। কোথাও হয়তো নীড় রচনা করছে। ঘন কৃষ্ণ ও বাদামী রঙের এই বৃহৎকায় কোকিল জাতির পাখি পরভৃত নয়, নিজেরা গৃহস্থালী পাতে। গহন বনের আবেষ্টনীতে একে চমৎকার মানিয়েছে। দূর থেকে সারস-চঞ্চু মাছরাঙার ডাক আসছে বিলাপের সুর, উদাত্ত ধ্বনি, কীয়ে...কো। কো।...কীয়ো কো। কো। অধিকতর কলরব করে ডাকছে বুলবুলি, যেন বনদেবীর সহচরী। কোথাও অদৃশ্য কাননতলে এদের নাচের ও গানের নিমন্ত্রণ। তারপর একবার শুধু নিশাচর "ভারতীয় চিপ্‌পকে"র শেষ ডাক চক্ চক্ চড়ড়ড়—চক্ চক্ চড়ড়।

কালিশামা আবার উড়ে গেল উঁচু ডালে। চার তানের গান। হঠাৎ চমক লাগে, শুনতে পাই জলের প্রবহধ্বনি। এগিয়ে দেখি অপরূপ দৃশ্য। ঝরনার জল ঢল বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কলকোলাহলে প্রপাতের বারি বহন করে।

আমরা ক্রমে গভীরতর উপত্যকায় এসে পড়েছি। ভরদ্বাজ পাখি উড়ে এসে বট গাছে বসেছে। ছোট্ট সবুজ পাখি, মাথার মুকুটটি লাল, চিবুক হলদে, কণ্ঠী লাল বাকি সবুজ।

* Indian Night Jar

পা টুকটুকে লাল। এর অন্য নাম ছোট বসন্ত বউরি, গয়লা বুড়ি। টংক। টংক। টংক। স্যাকরার পিটুনির মত এদের ডাক সারা গ্রীষ্মে শোনা যায়।

স্রোতস্বিনীর আশেপাশে ফাঁকা জায়গার বৃক্ষশিরে পাখিরা চলাফেরা করে, সেখানে ঘুরছি। বৃহৎ সারসচঞ্চু মাছরাঙা স্রোতস্বিনীর উপরে উঁচু গাছে বসে আছে। চমৎকার চেহারা। বাদামী মাথা, পিঠের উপরিভাগ ও পেট নারাঙী, ডানা পিঠ ও লেজ সবুজাভ, বিরাট রক্তরাঙা চঞ্চু। আবার উচ্চ বিলাপধ্বনি—কীয়ো—কো কো। কো।

এতক্ষণ পরে একটানা ডাক শোনা গেল ফটিক জলের পূর্ণ সঙ্গীতের প্রারম্ভিক আলাপ। সূর্য উঠেছে, কালিশামার শিস, সূর্যনমস্কারসূচক।

ক্রমে ঝরনার দিকে এগিয়ে চলেছি। বসন্তের অরণ্যশোভা দেখা হল না। ফুল ফোটার পালা প্রায় সাঙ্গ হল, মহুয়া গাছে ফল ধরেছে। সোঁদাল গাছে অসংখ্য সোনালী কর্ণভূষণ। করমচার ঘন পত্রান্তরাল থেকে ছোট ছোট সাদা তারকাসম ফুলের সৌরভ প্রভাতের সমীরণ আমোদিত করেছে, বন-জুঁইয়ের মত তীব্র সুগন্ধ। ফটিক জলের মিষ্টি মানবশিশুকণ্ঠ সদৃশ ডাক শোনা

ফটিকজল

গেল, 'দেবী!' অথবা 'বেবী!' পাখিকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পরিচিত ডাক। বনের মধ্যে অজানা অচেনা নানা লতাগুল্মের মিতালি বড়ই মনোরম।

টুনটুনি পাখি বৃক্ষশাখায় নেচে বেড়াচ্ছে ও পোকা শিকার করছে। হঠাৎ সে অন্তরাল থেকে ডাক দিল—টুই! টুই! টুই! তার পর উপরে তাকিয়ে দেখি হরিয়াল নীড় রচনার সামগ্রী সংগ্রহ করছে মহুয়া গাছের উচ্চতম শাখা থেকে, দূরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল। হরিয়াল সাধারণত দল বেঁধে বিহার করে কিন্তু এখন প্রজনন ঋতুতে দলছাড়া হয়ে ঘরকন্নার ব্যাপারে ব্যস্ত। ফটিক জল এখনো

ছোট বসন্তবউরি

পূর্ণ গানের পালা শুরু করে নি, শুধু তাদের খেয়াল-খুশি কর্কশ ডাক শোনা যাচ্ছে।

ওই যে সোনালী পিঠ কাঠঠোকরা ওই গাছেই প্রাতঃভ্রমণে ব্যস্ত, গাছের কাণ্ড থেকে শুরু করে উপরের শাখা পর্যন্ত লেজ ও পা দিয়ে ভর করে করে পদচারণ করছে। যেন কান পেতে কাঠের ভিতরের কীটের সাড়া পেয়ে ঠুকে ঠুকে তা বার করে ভক্ষণ করছে। হঠাৎ তার বিকট হাসির শব্দে বন মুখরিত হল, সে উড়ে গেল।

পীতকণ্ঠ চটক-চটকী প্রেম নিবেদন করছে, ভূতলে এবং মহুয়া গাছের শাখায়। পুরুষটির অসম্বদ্ধ প্রলাপ নিরাশ্রয় বৃক্ষ শাখায় তাদের প্রজনন ঋতুর আভাস দিচ্ছে। পুরুষ পাখিটিকে ডালপালার মধ্যে শব্দ অনুসরণ করে দূরবীণ লাগিয়ে লক্ষ করতে পারলে তার কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন হলদে রেখাটি গানের সময়ে প্রস্ফুটিত হয়। তেমনি সঙ্গীতরত টুনটুনির কণ্ঠের কৃষ্ণ রেখাটি কোনো বিরল মুহূর্তে পরিস্ফুট হয়।

ক্রমে পাহাড়ের নিকটবর্তী হচ্ছি। পাহাড়ের গায়ে রোদ পড়েছে। টিট্টিভ পাখির মনে শান্তি নেই। উপত্যকা মুখরিত করে ডাকছে "Did he do it?" যুগে যুগে এই প্রশ্নের উত্তর তার মেলে নি, তাই এই অশান্ত কলরব।

অকস্মাৎ রৌদ্রালোকিত মহুয়া গাছের উপরিভাগে এক ঝাঁক সাতসয়ালি উড়ে এসে বসেছে। এরা ব্যস্তবাগীশ হয়ে উঁকি মারার ভঙ্গীতে ক্ষুদ্রতম শীর্ণতম প্রশাখার প্রান্ত থেকে কীট সংগ্রহ করতে লেগেছে। এই চঞ্চল পাখিটির সমবেত ক্ষীণ কণ্ঠের ডাকটির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া কঠিন। কারণ এরা ঊর্ধ্বতম বৃক্ষশাখা-বিহারী। এবং অলক্ষ্যগোচর। পুরুষ পাখির

ছাইমাথা ও রাঙা দেহটির রঙ গাছের সবুজে মিশে অতি মনোরম দেখাচ্ছে। তার বেচারা মেয়েটি 'বাসন্তী রঙ সঙ্গিনী' (বনফুল) সদাসিদে আটপৌরে বেশ সর্বদা ধারণ করে থাকে।...গাছের উপর রঙেরহাট বসেছে, চেয়ে চেয়ে দেখছি। কিন্তু এ কি! সাততাড়াতাড়ি সাতসয়ালীরা যে চলে গেল বৃক্ষান্তরে আলতা রঙের ঝলক লাগিয়ে। বনফুল ডানা উপন্যাসে এদের সার্থক নাম দিয়েছেন আলতা-পরী"।

পত্রহীন ছোট গাছে একটি পুরুষ ফটিকজল নেমেছে। এরা পাতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। সকাল বেলায় এমনি নিচু গাছে কখনো কখনো সাক্ষাৎ মেলে। ওই যে পাখিটি মাটিতে নামল তৃণ সংগ্রহ করতে, নীড় রচনার কাজে লেগেছে নিশ্চয়। কারণ তাদের বাটির আকৃতির বাসা তৈরি করতে লাগে নরম ঘাস ও হালকা শিকড়ের অংশ।

সাতসয়ালি

৬টা বেজেছে। কণ্ঠীঘুঘুর কূজনধ্বনি ও ফটিকজলের গান শুনছি। অদূরে একটি দোয়েলের সুমধুর একটানা গান শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সে সাদা-কালোর ঝলক লাগিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল। দোয়েলের একটানা গানের মাধুর্য বর্ণনা-তীত। বাবুনার ক্ষীণ সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। মুনিয়ার সমান ছোট্ট পাখি, হলদে দেহ, চোখের ওপর সাদা রেখা, চশমার মত। বৃক্ষ-শাখাবিহারী। মানব-শিশুর কণ্ঠের সুরে তার ক্ষীণ সঙ্গীত।

পার্বত্য নির্ঝর প্রশান্ততর হচ্ছে। ছোট্ট মাছরাঙা ঝরনার জলের উপর দিয়ে

ড়ের। জলের স্রোতের গতি অনুসরণ করে এঁকে বেঁকে জলের উপর ছোট মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখনো বালির উপর বসছে, কখনো তীরবর্তী গুল্মের উপর এবং মাথাটা মাঝে মাঝে আন্দোলিত করছে, যেন মুদ্রাদোষ।

পারিজাত পতঙ্গভুক্ (Paradise Flycatcher) উড়ে গেল তার হালকা সাদা পুচ্ছ দুলিয়ে। হঠাৎ মনে হল যেন কল্পলোকের পক্ষীরাজ ঘোড়া বায়ুভরে ভেসে চলেছে দুগ্ধফেননিভ শ্বেত পুচ্ছটি আন্দোলিত করে। একাই এই দৃশ্য উপভোগ করছি, আর সকলে এগিয়ে গেছে।

একটি কাজলগৌরী পাখি উড়ে গেল। হলদে মাথা ও দেহ, শুধু ডানা কালো। চোখের উপর একটানা কাজলরেখা। বেনে বউয়ের সমজাতি, শুধু মাথা কালো নয়, হলদে। কলকাতার পাখির বাজারে এর সার্থক নাম কাজলগৌরী।

বনের মধ্যে ঢিবি ও গাছের নিকটে ছোট সুইচোরা উড়ছে। এখানেই নিশ্চয়ই কোথাও মৃত্তিকা গহ্বরে ক্ষেতের আলিতে, সুড়ঙ্গবাসা তৈরী করেছে।

প্রায় পাহাড়ের নিচে এলাম। এখানে অনেক উন্মুক্ত ভূমি। সঙ্গীরা ঝরনার দিকে এগিয়ে চলেছে, আমি একা। কাকোলাং ঝরনার কলধ্বনি নিকটতর হচ্ছে।......হঠাৎ বনের বাঁকে বিস্ময় লাগিয়ে দিল। ফটিকজলের প্রণয়জ্ঞাপক লীলা, বৃক্ষশাখার উপরিভাগে। প্রণয়িনীকে মুগ্ধ করার জন্য সে বৃক্ষশাখা থেকে অনতি-উচ্চে আকাশে উড়ে আবার নেমে এল পক্ষবিলোড়ন করে, আগগীন (স্কাইলার্ক) পাখির বিমানবিহার গীতির অনুকরণে। কিন্তু হরিতা পক্ষিনীর এখনো মন পায়নি এই স্বর্ণাভ প্রেমিক পাখি। কারণ দেখলাম পেলাম ... প্রতিদ্বন্দ্বী ফটিকজল তার পিছনে পিছনে ছুটে সারা হল। "আর কত দূরে ... মোরে, হে সুন্দরী?" তার ব্যাকুলতার পিছনে এই চাঞ্চল্য! কার হবে জয়, কে জানে?

এখন ৬-৪৫। কোন্ পাখির অজানা উচ্চ কণ্ঠের ডাক এই অঞ্চলে? দুই তানে এই ডাকটা শোনা যাচ্ছে এই রকম—কই ...

দ্বিতীয়টি কর্কশ ও তীব্রতর। দিকে দিকে এই গানের একতান ...

অনুসরণ করে চুপি চুপি কম্পিত বক্ষে বৃক্ষগুল্মের মধ্য দিয়ে গিয়ে দেখলাম অপূর্ব দৃশ্য! এতদিন যে পাখিকে কল্পনার চোখে ভেবেছি, তাকে এখন দেখছি বাস্তব চোখে —"পিট্টা"। প্রায় নয়টি রঙে গড়া এর বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল দেহ, তাই এর অন্য নাম "নওরং"। গাছের নীচু ডালে সে ডেকে চলেছে, অবিরাম। দুই তানের সুউচ্চ সঙ্গীত। নিকট মানুষ তার ভ্রূক্ষেপ নেই। মোরগের ভঙ্গীতে দেহ প্রলম্বিত করে মাথা

সুইচোরা

পিছনে প্রসারিত করে, এবং বক্ষ স্ফীত করে সে ডাকছে সুগম্ভীর চালে। ছোট টুকটুকে বেঁটে লেজ ক্রমাগত দোলায়িত করছে। পাহাড়ের সানুদেশ ও উপত্যকার গুল্মরাজি পিট্টার প্রেম-সঙ্গীতে মুখরিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এরা উত্তর ভারতের পাহাড়তলিতে এসে নীড় রচনা করে। সুতরাং অধুনা এ অঞ্চলে এরা আগন্তুক। এরা ভূমিজ, ঝরা পাতা সরিয়ে সরিয়ে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে পোকা খায়। যে পিট্টাকে কিছু পূর্বে দেখেছিলাম সঙ্গীতরত, দেখি সে হঠাৎ নীচে নেমে গেল ডাকের শেষে, ঝোপে জঙ্গলে।

পিট্টার এলাকা পেরিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথে চলেছি। এখানে ঘন উপত্যকার মধ্য দিয়ে জলধারার প্রকোপে নালার সৃষ্টি হয়েছে। গিরিপাদদেশে বনস্পতিরাজি সুনিবিড়। এমন সুশীতল গহনে পাখির সুমধুর সপ্ততানে শিস্ শুনে কৌতূহলী হয়ে সন্ধান করতে গিয়ে দর্শন মিলল "টিকেলের নীল পতঙ্গাক"। নীল ছোট পাখি। দেহের উপরিভাগ নীল, তলপেট বাদামী। অতিশয় নির্জনতাপ্রিয়। বৃক্ষশাখার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে, কচিৎ দেখা যায়, শোনা যায় অধিকতর। গহন ঝরনার আশেপাশে তার বিহারভূমি। সকাল সন্ধ্যায় সুমধুর শিস্ শোনা যায়।

বৃক্ষবিরল প্রস্তরসমাকুল সমুন্নত সোপানের পথ বেয়ে উপরে এসেছি।

সামনে কাকোলাং ঝর্না। বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছি। এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা সহজ নয়। বহু উচ্চ শিলাগাত্র বেয়ে এঁকে বেঁকে নেমেছে জলপ্রপাত। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঝর্নার ধারা পড়েছে প্রথমে একটি ছোট পার্বত্য হ্রদে, তারপর বারিধারা নেমেছে ধাপে ধাপে শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে। অতঃপর শৈলবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে পাষাণ কারা থেকে মুক্ত হয়ে নিম্নে অবতরণ করে উপত্যকার সমু-

ভূমিতে এসেছে। –ঝর্নার দুইপাশে উর্ধে গিরিগাত্রে বৃক্ষরাজি, অতিদূরে প্রায় দৃষ্টির অতীত। তারা পত্রহীন বেশে দাঁড়িয়ে আছে, বসন্তের নবসজ্জার পূর্বরাগ। জলধারা নেমেছে প্রবলবেগে বেলীর ভগ্ন পাহাড়ের গা দিয়ে ছুটেছে, কিন্তু একটি ধারা বিদ্যুৎ হয়ে শুভ্র, ফেনরাশি সৃষ্টি করে ভূগর্ভে পড়েছে।

ঝর্নার উৎসসন্ধানে গিরি সংকটের সংকীর্ণ পথ ধরে ক্রমে আরো উর্ধে গিরিশিখরে উঠে দেখলাম যে, বারিধারা বহুদূর থেকে প্রবহমান। দূরে আর একটি প্রপাত, তার নীচে কৃত্রিম হ্রদ। তারপর সেই ধারা সমতল সানুদেশ অতিক্রম করে শেষের প্রপাতটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।

নীচে হ্রদের দুই ধারে শানবাঁধানো সুশীতল মনোরম শান্তিপূর্ণ বর্ণধারা-মুখরিত বিশ্রাম স্থান। দক্ষিণে একটি ছোট সরাইখানা। সেখানে রসদসমেত মালপত্র রেখে সঙ্গীরা আশ্রয় নিয়েছে এবং আমাদের চড়ুইভাতির আয়োজন শুরু হয়েছে। আরো অনেক পথিকের দল রন্ধন, স্নান, অবগাহন ও বিশ্রামে নিরত।

উর্ধে চেয়ে দেখি অপূর্ব শোভা। প্রবল বেগে ঝর্নার ধারা হ্রদে নেমেছে। এইটি সকলের প্রিয় স্থান। গিরিগাত্র বিরাট লোহশৃঙ্খলের মালার দ্বারা বেষ্টিত ও নীচে প্রস্তরবেদী। এখানে দাঁড়িয়ে শিকল ধরে স্নান করলে প্রাণমন দেহ জুড়িয়ে যায় ও অবর্ণনীয় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ হয়।

ঝর্নার পার্শ্বে ফেনরাশিসিক্ত স্থানটিতে বসে আছি। নিরন্তর প্রবহমান জলের কলরোলে যে উদাত্ত সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে, বসে বসে কান পেতে তাই শুনছি এবং সেই সুরধুনীতে অবগাহন করছি।

চিরসুন্দরের কাছে মনে মনে নিবেদন করি—

তোমারি ঝর্নাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমার
ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে।

* * * *

আমি এই করুণ ধারার কলকলে
নীরবে কান পেতে রই আনমনে।

* * * *

নেশা আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে।

সামনে কাকোলাৎ ঝর্নার আশেপাশে নিশ্চয়ই পাখির সাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু রোদ উঠেছে, পাখি দেখছি না। নিম্নে যেখানে পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকা দিয়ে ঝর্না নেমে গেছে, সেখানে মাঝপথে একটি বিরাট আম গাছ। নিম্ন থেকে উর্ধে চলাফেরার পথে ওই আম গাছ পথিক পাখিদের সরাইখানা।

একটি শ্বেতভ্রূ পুলক পাখি (ফুল পাখি) (White-browed Fairtail Flycatcher) তার লেজের পেখম তুলে শাখার আশ্রয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এর লাস্যময় নৃত্যভঙ্গিমা অপরূপ, প্রসারিত লেজের প্রান্তভাগের সাদা ঝলক অতি মনোরম।

নীচে আম গাছের নিকটবর্তী হয়ে দেখলাম একটি কৃষ্ণচূড় নীল পতঙ্গভুক্ পোকা শিকার করে উড়ছে, আবার অপ্রয় শাখায় এসে বসছে। উজ্জ্বল আসমানী রঙের মাথা ও দেহ, ছোট্ট কালো ঝুঁটি। আম গাছের আলো-ছায়াতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। দূরবীনের গবাক্ষ দিয়ে দেখছি।

ঝর্নার নীচের স্নান-বেদীতে এবং শিলাগাত্রে প্রবাহিত ধারায় আমরা স্নান করলাম। আহারাদি সেরে সকলে সরাইখানায় বিশ্রাম করছি। সারা দুপুর নীচে তপ্ত লু বইছে, ভীষণ গরম।

বিকাল ৩টা পর্যন্ত সরাইখানায় বিশ্রাম করে আবার সকলে মিলে স্নান করলাম। উর্ধতম পর্বতসানুতে ওঠার প্রশস্ত পথ নেই। আবার নীচেই নামতে হবে এই পথ বেয়ে। সুতরাং আমি স্নানরত সঙ্গীদের পিছনে ফেলে নীচে নামতে লাগলাম দূরবীন নিয়ে।

একলা নীচে উপত্যকায় নেমে এসেছি। ঝরনা সেখানে ভূতলে প্রবহমান, বালি পাথর ও গাছগাছালির মধ্য দিয়ে। কলস্বনা নির্ঝরিণীর তীরে শিলাখণ্ডের উপর বসে আছি। বড়ই সুরম্য স্থানটি। জনশূন্য উপবন উপরে পর্বতমালা। গিরিপথ লঙ্ঘন করে ঝর্নার ধারা নেমে এসেছে, পাহাড়ের পাদদেশ প্রদক্ষিণ করে বঙ্কিম গতিতে বিসর্পিত। উপত্যকার শেষে সমভূমিতে প্রসারিত লঘু বনানী কণ্টকযুক্ত গুল্ম ও খর্ব বৃক্ষের আটবী, সর্বশেষে প্রান্তর। কোথায় কোন বাঁকে কোন্ পাখির সন্ধান মিলবে, কোন্ পাখির ডাক শুনব, তার প্রতীক্ষা করছি।

ঝরনার ধারে পত্রসমৃদ্ধ জামগাছে অনাড়ম্বর মুকুলিত জম্বু পুষ্পমঞ্জরী। বড় মনোরম দেখাচ্ছে। একজোড়া চন্দনা পাখি উড়ে গেল। উজ্জ্বল হরিতবর্ণ। পুরুষের চিবুকে বগলে নীল, পক্ষিনীর নীলাভ হরিত। চঞ্চল ও সুগায়ক অনুকারী পাখি, বহু পাখির ডাক অনুকরণ করে। ক্রমে সূর্য পাহাড়ের পিছনে নামছে। দিনের অবসান হচ্ছে, দীর্ঘ ছায়া গিরিগাত্র অধিকার করছে।

এমন সময় স্রোতস্বিনীর ওপারে পাহাড়ের পাদদেশে বৃক্ষরাজির মধ্যে দেখলাম "বিচিত্র বন-পেচক", বৃহৎ প্যাঁচা। এটি একটিমাত্র আতঙ্কগ্রস্ত পেঁচা যার শিং নাই। চমৎকার বাদামী কালো সাদা রঙ সুচারুরূপে চিত্রকরা দেহ। গভীর বনে অদৃশ্যভাবে থাকে। আমি সম্মুখীন হওয়াতে পেচকবর গাছপালার মধ্য দিয়ে উড়ে সরে গেল। অপর বৃক্ষশাখায় বসে নির্ভীকভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বাবুনা পাখি (White eye) গাছের উপর দল বেঁধে শিশুদের অনুকরণে কেঁপে বেড়াচ্ছে। ডুমুর গাছে ফল ধরেছে। বসন্ত বউরির প্রিয় স্থান। দূরে শ্বেতপুচ্ছ পারিজাত পাখি সুশোভিত, শালশাখার অন্তরালে লেজ লুকিয়ে উড়ছে।

পাহাড়ের পাদদেশে অপর একটি উপবনে চলেছি। অপর ক্ষণে আবার পিট্টা ডাকছে। একটি পিট্টা উড়ে এসে চঞ্চল গতিতে গাছের নিম্নশাখায় বসল। ঠোঁট ফাঁক, উত্তেজিত ভাব। তার পর টুপ্ করে মাটিতে নেমে অদৃশ্য হল। কাজল গৌরী বৃক্ষান্তরে উর্ধে উড়ছে, পক্ষ সংহরণ ও প্রসারণ করতে করতে যেন পতনোন্মুখ গতি রোধ করছে। পড়ন্ত রৌদ্রে তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

পাহাড় থেকে সঙ্গীরা বহুক্ষণ ধরে ঝরনায় স্নান সেরে নীচে নেমে গেছে।

এখন ৫-১৫ বেজেছে। সূর্য অস্তমিত হয়নি। বায়ু তপ্ত। বৈকালিক ম্লান আলোয় কালিশমার বেলাশেষের তান আকাশ-বাতাসকে উন্মনীন করেছে।

ডাক বাংলোয় ফিরে এসেছি, চায়ের আয়োজন হচ্ছে। আরাম কেদারা নিয়ে আমরা খেলার মাঠে বসে পাহাড়ের শোভা দেখছি। সঙ্গীর দূরবীন দুটি পরীক্ষা করে আনন্দিত হচ্ছে। অদূরে শস্যহীন ক্ষেতে লাল যটি টিটিভ বিচরণ করছে আর উপত্যকা মুখরিত করে উদাস সুরে ডাকছে Did-he-do-it।

সূর্য অস্তমিতপ্রায়। হুটিমা পাখির ডাক শুরু হয়েছে, কুইকা! কুইকা! টুইকা!... পিকুইকা পিকুইকা! সারা রাত সে থেকে থেকে ডাকবে। পাপিয়া ভরত আকাশে গাইছে ও তরঙ্গায়িত ছন্দে উড়ছে— সীঁ ই ই ই যা! সীঁ ই ই ই যা! প্রতি ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠছে, আর নামছে, লীলায়িত ছন্দে। অবশেষে গান শেষে নীচে নামল ঘনায়মান অন্ধকারে। পর্বতমালা ক্রমে বিলীন হল। সূর্য অস্ত গেল।

সকলে পথশ্রান্তিতে নিদ্রাতুর। একতলার বাংলোর বারান্দায় আবার আমাদের শয়নের আয়োজন এবং আহারান্তে অকাতর নিদ্রা।

শ্রীপ্রশান্ত রায় কর্তৃক চিত্রিত

এই নিবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি ছবি ভ্রমবশত গত সংখ্যায় প্রকাশিত "পাখি দেখার নেশায়" প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত

আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর

অন্নদাশঙ্কর রায়ের "আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর" যদিও একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ, তবু সমর্থনের পাল্লা আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একটু বেশী। নিরপেক্ষভাবে একটু ইস্রায়েলের দিকটাও দেখা যাক।

শ্রীরায় এক জায়গায় বলেছেন—ইহুদীদের বদ্ধমূল বিশ্বাস প্যালেস্টাইন তাদের সনাতন বাসভূমি। সেখানে ফিরে যাবার অধিকার তাদের ইহুদী হয়ে জন্মস্বত্ব। জাতিতে ইহুদী ও ধর্মে ইহুদী হলেই প্যালেস্টাইনের ন্যাশনাল হওয়া যায়। দু হাজার বছর বাইরে ঘুরে বেড়ালেও এর ব্যত্যয় নেই।" এ দু হাজার বছর ওরা কি স্বেচ্ছায় বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে? ইহুদীদের ইতিহাস যাদের কিছুটা জানা—এর উত্তরও তাদের অজানা নয়। আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে সরে যেতে ইহুদীরা বাধ্য করেনি। আরব-ইহুদী সংঘাতের প্রথম পর্বে প্যালেস্টাইনের আরবরা স্বেচ্ছায় তাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। Jaffa, Haifa এবং Galilee-তে সংঘাত তো এত প্রবল ছিল না, তবু বাস্তুত্যাগী সেখানেই বেশী। কেন? এ জন্যই যে তথাকথিত racist আরব নেতারা প্যালেস্টাইনের আরবদের মনে পাইকারী গণহত্যার ভয় ঢুকিয়ে দেয় যে, ইহুদীরা এসে পড়লে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করবে এই মর্মে। তাছাড়া রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে এ পালানোর পেছনে আরব নেতাদের সমর্থন ছিল। কেননা তাহলে সবাইকে বলা যাবে—দেখ, আরবদের কীরকম জোর করে তাড়ানো হচ্ছে। আর সবার উপরে ছিল আরব নেতাদের সামরিক চালের স্বার্থ। তারা চয়নি একটা বৃহৎ আরবগোষ্ঠী সেখানে থেকে তাদের operational freedom ব্যাহত করে। এই operational freedom যে কী বস্তু তা বোধ হয়

বুঝিয়ে বলতে হবে না। তা ছাড়া এটাও সত্য যে, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণেও আরবদের কিছু অংশকে চলে যেতে হয়। এটা সর্বকালে সর্বজায়গায় ঘটে থাকে। শ্রীরায় নিজেও স্বীকার করেছেন যে, প্যালেস্টাইনে আরবরা বহিরাগত। তিনি একজায়গায় বলেছেন—'সবাই আরবী ভাষায় কথা বললেও, প্রায় সবাই ধর্মে মুসলমান হলেও আরবরা আসলে সিরিয়ায়, লেবাননে, মিশরে, লিবিয়ায়, টিউনিসে আলজেরিয়ায় মরক্কোতে বহিরাগত। জর্ডানও অতীতে সিরিয়ার অন্তর্গত ছিল। প্যালেস্টাইনও তাই।' কাজেই প্যালেস্টাইনের অধিকার তারই—যার সে-মাটির উপর টান আছে। প্যালেস্টাইনের আরবদের যদি সত্যিই মাটির টান থাকত তবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা সেটা প্রমাণ করত।

শ্রীরায় আর এক জায়গায় বলেছেন—'ইউরোপীয় মানস এখন অপরাধবোধে জর্জর। ইহুদীদের জন্য খৃষ্টানরা এখন যেমন করে পারে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। আহা, বেচারিরা নিরাপদে বাস করার জন্য এক টুকরো জমি পেলে বর্তে যায়। দাও না কেন ওদের প্যালেস্টাইনের একাংশ।' কিন্তু এই প্যালেস্টাইনের একাংশ কি এমনিতেই ইহুদীদের হাতের উপর টুপ করে এসে পড়েছে? ইউরোপীয় মানসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকলেও ব্রিটেন পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর Balfour Declaralion-এর মাধ্যমে ইহুদীদের যে বাসভূমির অধিকার স্বীকার করা হয় ও পরে যা League of Nation-এর সমর্থন পায়—ব্রিটেন সুবিধেমত তা প্রথম সুযোগেই নস্যাৎ করে দিল। তারপর ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর U N Genaral Assembly-তে ভোটাভুটির পর এই partition বিশ্বজনমতের আইনত স্বীকৃতি পায়। আরবদের পক্ষে বেশীর ভাগ ভোট পড়ে মুস্লিম রাষ্ট্রগুলির। তাছাড়া, তারা পায় ভারত, গ্রীস ও কিউবার সমর্থন। রাশিয়া ও আমেরিকা partition-এর পক্ষে। কিন্তু ব্রিটেন ভোটদানে বিরত থাকে। এর বাহ্য। যখন প্রতিটি যায়গা থেকে ব্রিটেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেলে—তখন আইনত যে সব জায়গায় অধিকার ইস্রায়েলের হাতে আসবে—সেগুলো আরবদের হাতে ছেড়ে দেয়। কাজেই সংঘাতের সৃষ্টি—ব্রিটেন তার জন্য মুখ্যত দায়ী।

শ্রীরায় এক জায়গায় বলেছেন—'কিন্তু দেখা গেল ইস্রায়েলের মূলনীতি হল দুনিয়ার সব ইহুদীর জন্য দরজা খুলে রাখা। শুধু তাই নয়, তাদের ডেকে আনা। যাতে ম্যানপাওয়ার বাড়ে। এক কোটি ইহুদীকে যদি জায়গা দিতেই হয় তবে রাজ্যের সম্প্রসারণ ছাড়া গতি নেই। তাতে তাদের অনাগ্রহও নেই.....।' কিন্তু লোকসংখ্যায় অনুপাতে আরব লোকসংখ্যার একদশমাংশও ইস্রায়েলিরা না। আরও অনেক

সামরিক শক্তি পরিসংখ্যা অনুযায়ীও বেশী। তবে সম্প্রসারণ নীতি ইস্রায়েলরা পালন করে কী করে? আমেরিকার সমর্থনে? ওদিকে রাশিয়ার কি সমর্থন নেই? যতদিন না আরব আক্রমণের আশঙ্কা যাবে ততদিন ইস্রায়েল উত্তর জেরুজালেম, গোলাম হাইটস, শারম-এল শেখ, সিনাই ছাড়তে পারে না। এটা তদের অভিজ্ঞতার শিক্ষা।

ইস্রায়েলের কাছ থেকে আরবরা ঐক্যবোধ, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার শিক্ষা নিতে পারে। গামাল নাসেরের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আরব নেতার পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। সেরকম নেতার যতদিন না আবার আবির্ভাব ঘটে—আরবদের শুভদিন ততটাই পেছিয়ে যাবে।

তৈল-সংগ্রাম আরবদের শেষ হাতিয়ার। এতে ঘায়েল না হবার জন্য আরও অনেকের সঙ্গে ভারতকেও তৈলপ্রদান করতে হচ্ছে। কিন্তু এরকম একটা অচলাবস্থা সবাই মেনে নিলেও রুশ-মার্কিন দীর্ঘকাল মেনে নেবে না। তারা যৌথ শান্তিতে এগিয়ে এসেছে, এটা শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নয়—সারা পৃথিবীর পক্ষেই আশার কথা।

হিমাদ্রি ঘটক
বোম্বাই-৫৫

রূপদর্শীর সোচ্চার-চিন্তা

প্রতি সপ্তাহে 'রূপদর্শীর সোচ্চার চিন্তা' বিভাগটি রসাশ্রয়ী পরিবেশন গুণে বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ২৪ নভেম্বরের 'দেশে'র 'সঠিক লাইনে'র শিরোনামে একটি অপ্রিয় বাক্য বোধ হয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, 'কেউ যদি না বুঝে থাকো তবে কমরেড লেনিনের 'ওয়ান স্টেপ ফাদার অ্যানড টু স্টেপ মাদারস্' বইটা পড়ে নিও'। রূপদর্শী ভারতীয় কম্যুনিস্টদের পাকড়াও করুন তাতে কে-ই বা কি করছে, কিন্তু লেনিনকে নিয়ে এধরনের রসিকতা করা বোধ হয় একান্ত অনুচিত। লেনিন ভারতীয় কম্যুনিস্টদের 'ফাদার-মাদার' কিনা জানি না, তবে লেনিনের হাতে গড়া দেশ সোভিয়েতকে যে মাঝে মাঝে ভারতের 'ফাদার-মাদার'ত্ব নিতে হয় সেটা সকলের জানা। ব্রেজনেভরা আসে শুধু তাঁদের গার্জেনটা ঝালিয়ে নিতে—সামনে ভারত নতজানু।

ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়
হায়দ্রাবাদ-৩০

বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগ

২৪ নভেম্বর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' প্রসঙ্গে গ্রন্থকার হিসেবে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করার আছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শেই যে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগ ঘটেছিল, অমৃতলাল বসু ('পুরাতন প্রসঙ্গ'), কিরণচন্দ্র দত্ত ('নাট্যমন্দির'/শ্রাবণ, ১৩২০), ব্যোমকেশ মুস্তফী (বঙ্গীয় রঙ্গালয়/প্রাঙ্গণ শারদীয়া ১৩৮০) সাধারণী পত্রিকা (১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬), সুলভ সমাচার পত্রিকা (১৫ এপ্রিল, ১৮৭৩) প্রমুখ সেকালের সকলেই একবাক্যে তা স্বীকার করে গিয়েছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন একমাত্র মধুসূদনের লিপিকাররূপে কথিত জনৈক কৈলাসচন্দ্র বসু। ইনি ১২৮১ সনের ২২ বৈশাখ সোমপ্রকাশ পত্রিকায় লিখেছিলেনঃ— ... রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ যুবকরা কতগুলি বেশ্যা লইয়া রসব্যাপার নির্বাহ করেন, দত্তজ মহাশয়কে ওই কুৎসিত ব্যাপারের প্রবর্তক ও উৎসাহদাতা বলিয়া প্রচার করেন... আমি দত্ত কবিবরের প্রতিনিধি হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বেশ্যাভক্ত নটমণ্ডলীর কথা শুনিয়া, দত্তজ মহাশয়কে এ বিষয়ে দোষী মনে না করেন।' (বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র'। চতুর্থ খণ্ড)

প্রায়-অখ্যাত একজন লিপিকারের বক্তব্য অপেক্ষা সমকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ঐতিহাসিক, গবেষক এবং পত্র-পত্রিকার অভিমত অধিকতর প্রামাণ্য বিবেচনায় বরণীয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকেই আমি আমার গ্রন্থে স্থান দিয়েছি।

পরিশেষে জানিয়ে রাখি হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৯৪৫) গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্র বসুর উক্তি স্বরূপ যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার অংশবিশেষ (যেখানে অভিনেত্রী নিয়োগের ব্যাপারে মধুসূদনের সক্রিয় ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে, তা) আদপেই কৈলাসচন্দ্রের রচনা নয়। এবং আমার অপরাধ, আমি 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে যাচাই না করেই সমগ্র উদ্ধৃতিটি আমার গ্রন্থে ব্যবহার করেছি। অবশ্য উৎস হিসাবে ফুটনোটে হেমেন্দ্রনাথের বইয়ের উল্লেখ আছে।

শিশির বসু
কাঁচরাপাড়া

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

গত ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ (24th November 1973) তারিখের দেশ পত্রিকায় "ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব" পর্যায়ে শ্রীযুক্ত সুদেব রায় চৌধুরী আমার বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে যা ভুল আছে তাই জানাবার জন্য আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। পল থেরো ও সুদেববাবু আমার পাশে এসে বসলেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল। প্রশ্ন ও উত্তর যা হয়েছিল সে বিষয় সুদেববাবু হয়ত সম্পূর্ণ ভুল শুনেছেন বা ভুল বুঝেছেন। আমেরিকার সাহিত্যের বিষয় পল থেরোকে আমি কোনই প্রশ্ন করিনি, কাজেই তাঁর উত্তরগুলি আমাকে লেখা কথা নয় সেগুলি কাকে বলেছেন জানি না। সম্পাদক, সাংবাদিক ও পাঠকের জানা দরকার পল থেরোর সঙ্গে আমার কি বিষয় কথা হয়। তিনি সিঙ্গাপুর যাবার কথা বলেন এবং আমি তখন বর্মা দেশের বিষয় উল্লেখ করলাম। আমি সে দেশে মানুষ হয়েছি জেনে পল থেরো উৎসাহিত হয়ে তাদের বিষয় প্রশ্ন করেন। তারপর "বাংলাদেশ"এর লেখকদের বিষয় কথা হল। বাংলাদেশের সাহিত্যেরও কিছু আলোচনা হয়।

যমুনা নাগ
কলকাতা-২৯

সাহিত্য সংবাদ

সাহিত্য পাঠ

এ সংখ্যায় আমি কয়েকটি বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যাঁরা বাংলা সাহিত্য অতিকারের মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে চান, তাঁদের এই রচনাংশগুলি কোন্ লেখকের বা কোন পুস্তকের, তা চিনতে পারা উচিত। সব কটিই বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, তবে কালানুক্রমিক পারম্পর্য ইচ্ছে করেই রাখা হয়নি। যে-সব পাঠক পড়ামাত্র এগুলি চিনতে পারবেন, তাঁরা উত্তম পাঠক। যাঁরা সব কটি চিনতে পারবেন না, তাঁদের উচিত খোঁজাখুঁজি শুরু করা। এটা একটা সুন্দর খেলা হতে পারে। উত্তরগুলি আমি এক মাস বাদে জানিয়ে দেবো।

এই রকম খেলা আমি মাসে একবার চালাবার চেষ্টা করে যাব। এবারে শুধু গদ্য, আগামীবারে কবিতা। একটি কথা জানানো দরকার, এই খেলাটা নিতান্ত আমারই মতন সাধারণ পাঠকদের জন্য, পণ্ডিতদের জন্য নয়। কারণ, পণ্ডিতরা অনেকেই ফেল করবেন—যা অন্তত একশো বছরের পুরোনো নয়, তা যে তাঁরা পড়ে দেখেন না। এর মধ্যে অনেক আধুনিক লেখকেরও রচনার উদ্ধৃতি থাকবে। আর একটি কথাও বলার আছে, সঠিক উত্তরদাতাদের কোনো রকম পুরস্কার দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং আমার কাছে তাড়াতাড়ো করে চিঠি পাঠানো অনাবশ্যক। ইচ্ছে হলে জানাতে পারেন। বেশ কয়েক বছর আগে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত টুকরো কথায় এই রকম একটি খেলা চলতো, সে সময় বেশ জমে ছিল।

১। উত্তরের সারি সারি তিনটি জানলার তলাতে দেড় ফুট করে উঁচু সরু দাওয়া—সেইখানে বসে খড়খড়ি টেনে দেখি। পুরোপুরি একখানা ছবির মতো চোখে পড়তো না। বাড়ি, ঘর, গাছ—এরই নিচে একটা ময়লা সবুজ টান, তারপর আবার ছবি—ছাগল, মুরগী, হাঁস, খাটিয়া, বিচালির গাদা, খানিকটা চাকার আঁচড় কাটা রাস্তা—তারপর আবার সবুজ টান। এমনি করে খড়খড়ি ফাঁক করে আর একটা কমে কাঠের পাটা—এরই ওপর সব ছবি ও না-ছবিকে দুভাগ করে একটা সরু দাঁড়ি—খবরের কাগজের দুটো কলমের মাঝের রেখার মতোই সোজা—বেটা টানলে হয় ছবি, চাপলে হয় বন্ধ-ছবি দেখা।

২। সদাশিউ বলে, 'আসুন সকলে মিলে একটু 'প্রার্থনা' করা যাক। সকলে সেইখানে বসিল। বৈজনাথের দল, ফরওয়ার্ড ব্লকের দল, কিষাণ সভায় ছেলেটি, কম্যুনিস্ট পার্টির ছেলেটি আর বাকি সকলে তো আছেই। মেহেরচান্দজী 'রাষ্ট্রগগন কী দিব্বয় জ্যোতি' আরম্ভ করিলেন। আজ কাহারও প্রার্থনায় আপত্তি নাই; ইহাকে বাঙ্গ করিয়া চুটকি গান নাই। মেহেরচান্দজীর যে কলিটি মনে থাকে না, সেটি আগে হইতেই সকলে গাহিয়া দিল। পকেট হইতে কাগজখানি আর তাঁহাকে বাহির করিতে হইল না। সকলেই প্রাণপণে চিৎকার করিতেছে। এত চিৎকারের মধ্যে আর ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মোটরকারের শব্দ শোনা যাইবে না।

৩। খ্রীষ্টীয় বাংলা সাহিত্য বাড়িতে ঢুকত না; তাতে অবশ্য ক্ষতি ছিল কম; "ঈশ্বর জগৎকে এত প্রেম করিয়াছেন" যে, খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বাঙ্গালী সমাজে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে (তবে "পাপের বেতন মৃত্যু" কথাটিকে সাহেবী বাংলা না বলে দুঃসাহসিক আধুনিক উৎকৃষ্ট গদ্য বলতে ইচ্ছে করে)।......

আরেক মানা ছিল। খাতায় কোনো ইংরেজি শব্দ লেখাই নিষিদ্ধ। একদিন অনন্যোপায় হয়ে খুকী শব্দটির অর্থ লিখেছিলাম "এ লিটল গার্ল"। বড়ো সাহেব রেগে আগুন। নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম : "তবে লিখবো কি?" উনি বলেছিলেন, "খোকার উল্টো"। হায়, আমি যে খোকার অর্থও জানতাম না।

৪। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই আমি ইওরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকে ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

৫। ...একবার চাহিল রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিল জানালা দিয়া খানিক তফাতে মাথাই নদীর দিকে, তারপর দু' হাত বাড়াইয়া পুতুলের মত মাধবীলতাকে তুলিয়া লইল বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ মাঝে বিখ্যাত প্রৌঢ় বয়সী দৈত্যটির পুতুল খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

দেশ ৪১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় 'সাহিত্য সংবাদ'এ বামপন্থী সাহিত্য ও সমালোচনা সম্পর্কে আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই তথাকথিত বামপন্থী লেখকদের রচনা থেকে সবার আগে যা বাদ পড়ে, তা হলো, শিল্পগুণ। 'জীবনবোধ' 'বাস্তবতা' এসব নিয়ে এঁরাই সবার চেয়ে বেশী হইচই করেন, কিন্তু এঁদের লেখা পড়লে দেখা যাবে, এঁদের লেখার সঙ্গে এঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো যোগ নেই। এঁদের লেখার বিষয়, এঁদের অননুভূত সমস্যা। এঁরা 'সমাজ-সচেতনার' বিলাসিতায় ডুবে আছেন।

আর বামপন্থী সমালোচকরা যাঁরা সব সময় অন্যের মুখোশ খুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন, তাঁদের মুখোশ খুলে নিলে দেখা যাবে, চাষী, শ্রমিকদের প্রতি একরকম নকল সমবেদনা দেখিয়ে এঁরা আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছেন। কোনো গল্পে মিছিলের কথা থাকলেই 'সমাজতান্ত্রিক'

।

বাস্তবতার' পরাকাষ্ঠা দেখতে পেয়ে এ'রা বড় আহ্লাদ বোধ করেন। থিওরির প্রতি অনুভক্তির জন্য এ'দের অবস্থা অনেকটা আমাদের অফিসের বিজয়বাবুর মতো।

অফিসে আমার বসার জায়গার পাশে একটা ছবিওলা ক্যালেন্ডার টাঙানো ছিল। ফুটপাথে সব সময় যেমন দেখা যায় তেমনি রঙের জ্ঞানবর্জিত কাঁচা হাতে আঁকা মহাদেবের ছবি। বিজয়বাবু এসে ছবিটার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, অপূর্ব ছবি, না? আমি বললাম, কোথায় ভালো, একটা বাজে ছবি—

বিজয়বাবু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, বাজে? বলেন কি—মহাদেবের ছবি!

সুব্রত সেনগুপ্ত
কলকাতা ৭৩

॥ ২ ॥

প্রবন্ধটিতে যেমন কিছু সঠিক তথ্য আছে, ঠিক তেমনি কিছু ভুল এবং বিকৃত তথ্যও প্রবন্ধটিতে বর্তমান। সঠিক তথ্যগুলির জন্য প্রবন্ধকার যেমন ধন্যবাদার্হ তেমনি ভুল এবং বিকৃত তথ্য পরিবেশনের দায়িত্বও প্রবন্ধকার অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, "একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলার সময় এসেছে যে, যাঁরা তথাকথিত মার্কামারা বামপন্থী নন কিংবা এসব পার্টির সদস্য নন—এমন অনেক বাঙালী লেখকের রচনায় সত্যিকারের মানবতাবাদ এবং শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা প্রতিফলিত হয়।" কথাটা ঠিক, কিন্তু লেখক একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি যে, ঐ ধরনের লেখকের সংখ্যা কত এবং বর্তমানে এমন কোন্ অথবা কজন লেখক আছেন, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়, যিনি বা যাঁরা—কোন দল বা মতে বিশ্বাসী নন?

এর পর লেখক কবি বিষ্ণু দে সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, আমিও সে বিষয়ে প্রায় একমত। বিষ্ণু দে বামপন্থী কবি, এর কোন জোরালো প্রমাণ আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি। কোন বামপন্থী পত্রিকায় হঠাৎ একটা প্রগতিশীল কবিতা লিখে ফেললেই কোন কবিকে সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী আখ্যা দেওয়া যায় না। এবার প্রবন্ধের কিছু ভুল তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক্। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক বলেছেন, সাহিত্যে "অনেকদিন সে রকম কোন টাট্‌কা তেজী আন্দোলনের কথা শুনেছি না তো।" এই প্রসঙ্গে লেখককে—এ মাসে অনুষ্ঠিত (১৫ই এবং ১৬ই ডিসেম্বর) গণতান্ত্রিক লেখক, শিল্পী, গায়ক এবং কলাকুশলীদের সম্মেলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। এই সম্মেলনে শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী সহ বহু বিশিষ্ট লেখক শিল্পী এবং কলাকুশলীরা যোগ দিয়েছেন। সম্মেলন করাটাও তো এক রকম আন্দোলনের পর্যায়েই পড়ে। কেননা এখানে গত আন্দোলনের বিশ্লেষণ এবং আগামী আন্দোলনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এছাড়া অন্যান্য কিছু কিছু ব্যাপারেও গণতান্ত্রিক লেখক, শিল্পী এবং কলাকুশলীরা আন্দোলন করেছেন।

লেখক আরও বলেছেন, "সব মিলিয়ে আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলন সঞ্জাত উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্তই খুব কম।" লেখকের এই বক্তব্যকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। কেননা এমন অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য বামপন্থী পত্র পত্রিকায় এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকাতেও বের হচ্ছে। লেখক হয়ত সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় পান না। দিলে উপরোক্ত মন্তব্য তিনি করতেন না।

পাঠক মহাশয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শোধনবাদী কবি বলাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সুভাষবাবু তাঁর অতীত আদর্শের পরিপন্থী কাজ করে চলেছেন বর্তমানে এবং তার জন্য প্রকৃত বামপন্থীরা যদি সুভাষবাবুকে শোধনবাদী বলে থাকেন, তাতে পাঠক মহাশয়ের কি খুব একটা ক্ষতি হয়েছে? সুভাষবাবু যে বর্তমানে শোধনবাদী হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের "সুকান্ত সমগ্র" বইখানিতে সুভাষবাবুর লেখা "ভূমিকা"টি পড়ে।

তবে, "শুধু সমালোচনা আর গালাগালি করলেই তো আর সাহিত্য প্রগতিবাদী হয়ে ওঠে না...নিছক আশাবাদী আর জঙ্গী কথাবার্তা থাকলেই সেটা জনগণের প্রেরণার কারণ হয় না"—শ্রীযুক্ত সনাতন পাঠক মহাশয়ের এই উক্তিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

তরুণ দাশগুপ্ত
কলকাতা-৫১

॥ ৩ ॥

সনাতন পাঠক স্বীকার করেছেন যে, "সব মিলিয়ে আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলন সঞ্জাত উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্তই খুব কম"। লেখক হিসেবে ওঁর এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু তারপরে যে উনি আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন এর জন্যে দায়ী তথাকথিত মার্কামারা বামপন্থী লেখকরা—এ বিষয়ে আমি একমত নই। কারণ, প্রথমত আমার মতে সত্যিকার লেখক বলে স্বীকৃত হবার যোগ্য 'বামপন্থী' বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কেউ নেই। অর্থাৎ যাঁরা এককালে ছিলেন, যে কোন কারণেই হোক, তাঁরা তাঁদের লেখায় ধারা পাল্‌টে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত তথাকথিত বামপন্থী নন অথচ সত্যিকারের মানবতাবাদ এবং শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা লেখাতে প্রতিফলিত করছেন, এ রকম বাঙালী লেখকের সংখ্যাও আজ নেই। এবং সেখানেই আমার মত 'নিরপেক্ষ' সাহিত্যানুরাগীদের দুঃখ বা অভিমান। 'কমিটেড' লেখকদের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমরা কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার আশা করি না, যদিও বা কখনও তাঁদের হাত থেকে এরকম লেখা বেরোয়ও, তা ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কিন্তু যাঁরা নিজেদের কোন গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করেন না এবং সেজন্যে মনে মনে গর্বও বোধ করেন, তাঁরাই বা কি লিখছেন? তাঁরা কি শপথ করে বলতে পারবেন যে সত্যিই আজকের এই অবক্ষয়ী সমাজের কথা সর্বদা মনে রেখে তাঁরা খুবই চিন্তিত এবং সেই চিন্তার প্রতিফলন লেখার মাধ্যমে রূপ দিচ্ছেন যাতে দশজন তা পড়ে, ভাবনার ও আত্ম সমালোচনার সুযোগ পায়? অথচ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু সাহিত্যিকরা এ ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী সচেতন, আর তাই সেসব দেশের নাগরিকেরাও তাঁদের লেখার দ্বারা মনেপ্রাণে সত্যিকার অনুপ্রাণিত।

যে সব লেখক তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ মানুষের সমাজের অনেক ওপরের স্তরে বিচরণ করেন অর্থ, মান, প্রতিপত্তির দ্বারা সদশোভিত হয়ে, তাঁদের সাহিত্য আলোচনার জায়গা হোল চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীটের মত অভিজাত রেস্তোরাঁ ইত্যাদি, যা সাধারণ মানুষের কাছে আশ্চর্য স্বরূপ, তাঁরাই আবার জনগণের ব্যথা, বেদনাকে, শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তাকে সাহিত্যে রূপ দেবেন, এ কথা মহামূর্খ ছাড়া কে বিশ্বাস করবে? এ কি কখনও হয় না সম্ভব? আর এই উপলব্ধির জন্যে তো বেশী দূরে যাবার দরকার নেই। নিজেরা নিজেদের মনকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবো। যেমন, আমার কথাই ধরুন না কেন। চৌরঙ্গীর এক অট্টালিকার দশতলায় বসে অফিস করে, আজকের দিনের তুলনায় মোটামুটি বেশ ভদ্রগোছের একটা অঙ্কের মাইনে পেয়ে আমার পক্ষে কি কখনও সত্যিকার উপলব্ধি করা সম্ভব যে ওই অট্টালিকারই নীচে ফুটপাথে দিনের পর দিন যারা অর্ধাহারে, প্রায়ই অনাহারে, সংসার যাত্রা নির্বাহ করছে, তাদের মানসিকতা? যদি আমি কখনও বলি যে হ্যাঁ, উপলব্ধি করি বা করেছি ওদের কথা, তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা এবং পৃথিবীর 'এক নম্বর' মিথ্যে কথা।

আলোক মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১২

লেখক এসেছেন নেপালে। গাইড তাঁকে বলল, আপনি জ্যান্ত দেবী দেখবেন? উনি বিশ্বাস করলেন না, তা-ও কি হয় কি! লেখক অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। সেখানকার নামকরা মনোচিকিৎসক তিনি। পৃথিবীর নানা জায়গার রোগী তাঁর কাছে আসে। তাঁর একমাত্র চেষ্টা হল, ওষুধ ছাড়াই রোগীকে শারীরিক ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণায় রোগীদের আরাম দেওয়া যায় কিনা! ক্যানসার রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ওষুধে তেমন কমেও না। সুতরাং তিনি যন্ত্রণা উপশমের জন্য সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করতেন। কিন্তু লেখক নিজেই স্বীকার করছেন, এ-বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। মনের জোরে শরীরের বহু উপসর্গ দূর করার বিষয়ে তিনি খানিক খানিক জানলেন কিন্তু প্রাচ্য যোগী, সাধু, সন্ন্যাসী, অতীন্দ্রিয়-বাদীদের কাছে এ-বিষয়ে আরো জানবার এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার ইচ্ছে তাঁর হল। উদ্দেশ্য, সেই অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর নিরাময় সাধনায় লাগানো। তাই তাঁর নেপালে আসা।

গাইড বলল, দেবী হচ্ছেন আট বছরের মেয়ে। দু'দিন ব্যর্থ ঘোরাঘুরির পর বালিকা-দেবীর দর্শন মিলল ওপরের বারান্দায়। একটুখানির জন্যে। পেছনে তার মা পাহারা দিতে লাগল। পুরোহিতরা ঘিরে রইল। মেয়েটিকে দেখে লেখক খুব আঘাত পেলেন। তার মুখটি বড় করুণ। এলায়িত চুল সেই মুখকে ঢেকে রেখেছে। বড় বড় চোখ দুটি অস্বাভাবিক ঘোর-লাগা। যেন সর্বদাই শরীরে তার ভর হয়ে চলেছে। দেবী হওয়ার বিস্তারিত খবর লেখক পরে শুনলেন। তা যেমন বিচিত্র তেমনি নির্মম। একা সে এক অন্ধকার মন্দিরে থাকে। তার সমবয়সী কোন মেয়ের সঙ্গে সে মেশে না। বছরে একবার তাকে রথে চড়িয়ে পথ পরিক্রমা করা হয়। ভক্তরাই সে রথ টানে। কিন্তু এই মেয়ে যেই বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছবে অমনি তার শরীর থেকে দেবীত্ব ঘুচে যাবে। নেপালে কোন কোন বিশেষ জাতির বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি প্রবেশ করে। পুরোহিতরা ওই সব বাচ্চা দেব-দেবীকে খুঁজে বের করে। সেই প্রক্রিয়াটি বড় ভয়ংকর। মেয়েদের একা ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ভীষণ ভয় দেখানো হয়। বলির মোষ, ছাগল কিংবা অন্য জাতের পশুপক্ষীর ধড়মুণ্ড অন্ধকারে নৃত্য করে। এটা পুরোহিতদের কৌশল। সেই বিভীষিকা দেখে যারা শান্ত ও স্থির থাকতে পারে, তারাই দেবী বিবেচিত হয়।

কিন্তু যতদিন দেবীত্ব আর রাখা তাদের ঘিরে থাকে, ততদিন লোকে তাদের ভয় করে, মান্য করে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির পর

Strange Places Simple Truths. Ainslie Meares. Fontana-Collins. Price : 35 p.

দেবীত্ব ঘুচে গেলে কি পরিণতি হয় তাদের? তারা হয় তখন ডাইনি। লোকে তাদের তাই মনে করে। সেই একদা দেবীর কাছে কেউ ঘেঁষে না; কোন ছেলে তাকে বিয়ে করে না। তখন তারা এক ভীষণ অভিশপ্ত জীবন যাপন করে।

ভারত যোগী, সাধু-সন্ন্যাসী, অতীন্দ্রিয়বাদীদের শ্রীক্ষেত্র। সুতরাং লেখককে ওখানে অবশ্যই আসতে হবে। তিনি এলেন নতুন দিল্লীতে, যোগ সাধনার গবেষণা কেন্দ্রে। যোগাবস্থায় শারীরযন্ত্রের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। কিন্তু কেন্দ্রের কাজ তেমন হচ্ছে না, কেননা যথেষ্ট পরিমাণ যোগী পাওয়া যাচ্ছে না। মুক্ত যোগ সাধকরা টাকার বিনিময়েও গবেষণায় সহায়তা করতে রাজী হচ্ছেন না। তবু, লেখক কিছু কিছু অনুশীলনের ফলাফল হাতে-নাতে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন। কফিনের সাইজে কাচের এক ঢাকা বাক্স তৈরী করা হয়েছে দিল্লীর গবেষণা কেন্দ্রে। তার ভেতর এক যোগীকে বন্ধ করে ঢোকানো হল। ভারতীয় যোগ সাধকরা প্রায়ই একটি জিনিস দাবী করে থাকেন—শরীরী চেতনা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং জ্যান্ত গোর দেওয়া হলেও তাঁরা দীর্ঘকাল বহাল তবিয়তে থাকতে পারেন।

যোগীকে কাচের কফিনে ঢোকানোর উদ্দেশ্য, সেই দাবির সত্য-মিথ্যা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তদন্ত করা। কাঠের কফিনের মতো কাচের কফিনে অসংখ্য অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে কবরে হাওয়া ঢোকে, কিন্তু কাচের কফিনে সে-পথ বন্ধ। যোগীমহারাজ দশ ঘণ্টা কফিনে রইলেন। বেশ ধীর-স্থিরভাবেই ছিলেন তিনি। তার জন্যে তাঁর কোনো কষ্ট হয়নি। অথচ বাতাস বলতে তাঁর নিঃশ্বাস এবং সেই বাতাসে তখন বলতে গেলে অক্সিজেন নেই। আরো অবাক কাণ্ড, অত্যন্ত বেশী পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড সত্ত্বেও শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে হয়নি, হাঁপিয়ে দম বন্ধ হয়ে যায় নি। বেরিয়ে আসার পর ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল যোগীমহারাজের শরীর বেশ স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করছে! এর পর লেখক নিজে সম্মোহনবিদ্যা প্রয়োগ করলেন এক ডাক্তারের ওপর। অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারতবর্ষ কিন্তু সম্মোহনে অভিজ্ঞ তেমন একজন লোকেরও সন্ধান পান নি দিল্লির গবেষণা কেন্দ্র। তাই লেখক নিজেই এক ডাক্তারকে সম্মোহিত করে তার 'ব্রেন ওয়েভ' পরীক্ষা করে দেখালেন। এ বিষয়ে তাঁর বহু দিনকার এক ধারণা সত্য বলে বলে প্রমাণ হল। সাধারণ অবস্থায় ডাক্তারের ব্রেন-ওয়েভ আলাদা, কিন্তু ধ্যানস্থ বা সমাধিস্থ অবস্থায় তার এবং যোগীর ব্রেন-ওয়েভ একই রকম। লেখক বুঝলেন তাঁর ধারণা মিথ্যে নয়—সম্মোহনের সংগে ধ্যানস্থ অবস্থার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু বইটি পড়ে মনে হচ্ছে, লেখক মীয়ার্স—ভারতের আসল জায়গাগুলোয় যান নি। সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীরা যেখানে অবাধে বিচরণ করে ফেরেন। গঙ্গোত্রী, গোমুখে গেলে তিনি সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণাশ্রমকে দেখতে পেতেন। একশ' বিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি রামানন্দ স্বামী এখনো বেঁচে রয়েছেন। এঁদের কাছে হয়তো তাঁর অনেক প্রশ্নের সদুত্তর তিনি পেতে পারতেন। তা ছাড়া, চামোলী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কাশী—কোথায় সাধু বা যোগী

[illegible] আমেরিকা ফেরত [illegible] তিনি সাদ্দ তাঁর [illegible] যেন হয় তখনো বাজারে এই চাল চলন নি।

লেখক জ্ঞানার্জনের টানে টানে আরো বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। জানা এবং বেড়ানো দুই-ই একসঙ্গে হয়েছে এবং এই বইয়ে ওই দুই ভূমিকাই যথাযথ পালিত হয়েছে। বালি, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ইথিওপিয়া, তাইওয়ান, জাপান, ইরান—এক ধার থেকে তিনি সব জায়গায় ঘুরেছেন। ইরানে গিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, মুসলমান ধর্ম হচ্ছে আদতে পুরুষের ধর্ম; তেজী এবং বলবান। সেক্ষেত্রে খৃস্টধর্মের ধরন-ধারণ যেন অনেকাংশে মেয়েলী। তাই ইসলামের অগ্রগমন অব্যাহত রয়েছে; দক্ষিণ আফ্রিকার দেশসমূহে ইসলাম বিস্তার লাভ করছে—খৃস্টধর্ম নয়। ক্যাথলিক গীর্জার চেয়ে মসজিদ তাঁর ভালো লাগে। কারণ, গীর্জায় মূর্তি বা প্রতিমার ছড়াছড়ি। এমন কি সিসটাইন চ্যাপেলে মাইকেলেঞ্জেলো ঈশ্বরের ছবিই এঁকেছেন। অথচ কোন মসজিদে আল্লা বা মোহম্মদের মূর্তি নেই, ছবি নেই। আছে বিভিন্ন অলংকরণ এবং শিল্পখচিত লিপিমালায় কোরাণের শ্লোক আর ফুলের নকশা। হয়তো একই ফুল বারংবার উৎকীর্ণ। লেখকের মতে, ফুলের নকশা এমন এক শিল্পশৈলীতে উত্তীর্ণ যা শেষ পর্যন্ত ধ্রুপদী ফ্রয়েডীয় প্রতীকে গিয়ে দাঁড়ায়। মানুষের অবচেতন মনে নিশ্চয়ই এই প্রতীকের আবেদন রয়েছে। নকশাটি সুন্দর লাগে, ভালো লাগে কিন্তু এই ভালো লাগার পেছনে কি বোধ এবং কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রাম কাজ করছে তা মানুষ সচরাচর ভেবে দেখে না। লেখক মনের রোগীদের অনেক সময় আঁকতে দিয়েছেন, যাতে তারা মনের ভাব, মনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে পারে। বহুক্ষেত্রে তারা ওই রকম ফুলের নকশা করেছে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তাদের হৃদ স্পন্দন।

কিন্তু লেখকের রাশিয়া ভ্রমণ ভারি মজার; যদিও এখানে প্রসঙ্গটি খাপছাড়া ঠেকতে পারে। তবে বেড়াতে বেরিয়ে সব রকম অভিজ্ঞতার বর্ণনা করাই তাঁর যথোপযুক্ত কাজ। তাই তিনি লিখছেন: এনটুরিস্ট এজেন্সির গাইড মেয়েটি আমাকে পুরোপুরি তার মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলল। আমি যে-যে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, তার একজনের সঙ্গেও দেখা করতে দিল না। আমেরিকার ইউ-২ পাইলটের যেখানে বিচার হয়েছিল, ঘুরে-ফিরে সব সময় সেই হলটা দেখাত। এই ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব কতখানি তা নিয়ে কেবলই বক্তৃতা দিত এবং কথা খুঁজে না পেলে বারবার জিজ্ঞেস করত, "আচ্ছা, মার্কিনিরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছে কেন বলুন তো?"

এখন গেলে অবশ্য লেখক এ প্রশ্ন আর শুনতে পেতেন না। যাই হোক, গাইড মেয়েটি যখন কিছুতেই কোন করল না, নিয়ে গেল না নির্দিষ্ট চিকিৎসকদের কাছে, দিনের পর দিন টালবাহানা করতে লাগল এবং তিনি কিছুতে যখন বুঝিয়ে উঠতে পারলেন না যে, তিনি আদৌ আমেরিকান নন, তখন একদিন মেয়েটিকে জোর করে গাড়িতে পুরে ফেলে লেখক বললেন, চল তোমাদের এজেন্সিতে। মেয়েটি অফিসের কাছে নেমে বলল, দেখি আপনার চিঠিটা। অস্ট্রেলিয়ার থাকতে লেখকের এক বন্ধু তাঁকে একখানি চিঠি দিয়েছিল। তাতে পাঁচ-ছজন ডাক্তারের নাম-ঠিকানা এবং তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ছিল। লেখক এক ডাক্তারের শুধু নাম ও নম্বরটি দেখালেন। মেয়েটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে ছোঁ মেরে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লেখকও ছুটলেন কিন্তু তাঁকে পাহারাওয়ালা আটকাল। তিনি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন, তারা সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ল। ভেতরে তখন চিঠিটার ফোটোস্ট্যাট কপি হচ্ছে। এই রকম বহু মজার অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে এ বইতে। সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ সবাই এ বই পড়তে পারেন, পড়ে উপভোগ করতে পারেন।

অসিত গুপ্ত

শিল্পকলা

Ashit Paul : Paintings and Drawings. Artist International Publication. Das Gupta & Company Pvt.) Ltd., Calcutta-700012. Price : 7.50.

এই ছোট্ট, সুদৃশ্য সুমুদ্রিত পুস্তিকাটিতে শিল্পী অসিত পালের সাতাশখানি ছবির সেট ছাপা হয়েছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত পালের সমকালীন ভাব্য আবেগ সাহসিকতার সঙ্গে; গতানুগতিকতা বা গন্ডিবদ্ধতার তাঁর প্রাণ নেই। কিন্তু শিল্পীর পরিপূর্ণ পরিচয় বইয়ে নয়, ক্যানভাসের নৈকট্যে এবং রঙ ও তুলির ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে—তবু এই মুদ্রিত ছবিগুলিতে তাঁর চিন্তাভাবনার মূল সন্ধান করা যাবে।

শিল্পী ও সমালোচক অহিভূষণ মালিকের মুখবন্ধে জানা যাচ্ছে শিল্পী অসিত পাল বয়সে তরুণ কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা অল্প নয়। বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে নিরত সংগ্রাম করে তাঁকে শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখতে হয়েছে। যন্ত্রণা, জগৎ ও জীবনকে দেখার সরল ও মুগ্ধ দৃষ্টি তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর আঁকার বিষয় ও বস্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার ও বিভীষিকার মতো মনে হতে পারে। যেমন, তাঁর 'আপেল' নিছক উপাদেয় খাদ্য বস্তু নয়, তা একই সঙ্গে মানুষের আদিম পাপের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং তার জন্যই লাল রঙে একালীন রক্তাক্ত বিভীষিকাও টের পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে আপেল তার ধর্ম হারিয়ে রক্তমাংসে মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। শিল্পীর এই মানসিক স্বতঃক্রিয়া-ই একদা সার-রেয়ালিস্টদের আরাধ্য ছিল।

কিন্তু মুখবন্ধে অহিভূষণ জানিয়েছেন, শিল্পী অসিত পাল দালী প্রমুখ দিকপাল সার-রিয়ালিস্টদের মুগ্ধ ভক্ত হলেও তাঁর স্বাভাবিক অভিপ্রায় 'ফ্যান্টাস্টিক রিয়ালিজম'-এর দিকে—যা নাকি অধুনা অস্ট্রিয়ার জনপ্রিয় শিল্পসাধনা। পুস্তিকায় মুদ্রিত ছবিগুলি দেখে অবশ্যই শিল্পীর অদ্ভুত-বাস্তবতার প্রতি ঝোঁক লক্ষ করা যাবে, কেননা অধি-বাস্তবতাই মনের অন্তঃশীলা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অদ্ভুত বাস্তবতায় দাঁড়ায়। এই উদ্ভট-চেতনা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নয়, তা মূলে মনের অতলশায়ী অন্ধকারেই প্রোথিত। যিনি একাধারে ভাবুক ও শিল্পী তিনি সেই অন্ধকারেই পট ও প্রতিমা চিনে নেন। সেই কারণে গগনেন্দ্র সাধের ঘোড়া ইতিহাসের বহু পথ পার হয়, চলে যায় পার্থিব ছাড়িয়ে—শেষে তাঁর শৈশবের কাঠের ঘোড়ার এবং লোকায়িত মূর্তিতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। অসিত পালের 'মাই মন' (আমার মালিক) কল্পনায় এবং

উপস্থাপনার একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্ধ-নারীশ্বরের মধ্যে এখানে একটি লোকের শৈশবরূপ আমরা দেখেছি। তার আগাগোড়া উলঙ্গ শরীর, পদ্মবাগ পাতা দিয়ে ঢাকা, হাতে ফুল, ফুলটি নাকের কাছে ধরা, কিন্তু মুখটি তার মানুষের নয়, ঘোড়ার। শুধু হর্ষ-গোষ্ঠ নয় প্রচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন রসিকতাও প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ শিল্পীর বাস্তব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিচিত্র কল্পনা এমনভাবে মিশেছে যে, স্বভাববশত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে ছবিটি এক অনুপম আত্মা- ও অন্তর, বোধ ও বিস্তার লাভ করেছে।

আজকে নয়, উদ্ভট বাস্তবতা ও অন্ধকার স্মৃতি ছবিতে এবং লেখায় নানাভাবে, নানা মাপে বহুকাল ধরে অনুশীলিত হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক তরুণ শিল্পী অসিত পাল বর্তমান অবস্থায় চিরচরিত সুস্থতা দেখতে পাচ্ছেন না। তাই নিজে তিনি কখনো ভাঁড়, কখনো কাকতাড়ুয়া। এর মধ্যে কুৎসিতের কিছু নেই। এই অবস্থা সত্য। আর, সত্যই সুন্দর।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিত পাণ্ডে, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভাশিস দাশগুপ্ত—এই চারজন কবির একত্র কাব্যসংকলন **আলোকিত ইচ্ছার তরীগুলি** (পরিবেশক ঃ স্টাডিজ, কলকাতা-৯, তিন টাকা)। এঁদের চারজনের একসঙ্গে বই বেরুনোর কারণ এই নয় যে এঁরা কোনো বিশেষ সাহিত্য-আন্দোলনের বা কোনো দশকবৃত্তিক পরিধির অন্তর্গত। এঁদের দুটো পরিচয়। প্রথমটি বেশ মজার। 'মনুমেণ্ট কেন্দ্রিত সংস্কৃতি থেকে দূরের কবিজন' এঁরা। দ্বিতীয় সাযুজ্য ঃ 'বাংলা বিহারের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন নিজেদের যন্ত্রণা ভাবনা নিয়ে।' দ্বিতীয় পরিচয়টি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু 'মনুমেণ্ট কেন্দ্রিত সংস্কৃতি' ব্যাপারটা কী জানতে ইচ্ছে করে। ম্যাজিক দেখিয়ে দাঁতের মাজন, ধনেশ পাখির তেল, হৃত যৌবন উদ্ধারের সালসা, কুম্ভিত, ভাগবত ইত্যাদি রবিবাসরীয় সংস্কৃতি নাকি সারা সপ্তাহভর মিছিল-মিটিংয়ের উত্তপ্ত পরিবেশ—কোন্‌টির কথা বোঝাতে চেয়েছেন, কেনই বা চেয়েছেন, বোধগম্য হল না।

যাই হোক, যে-সংস্কৃতি থেকেই দূরে থাকুন আর যেখানেই থাকুন বাংলা কবিতার মূল ধারার কাছাকাছি থাকতে পারাটাই বড়ো কথা, জরুরী বিষয়। বেশীর ভাগ কবিতায় অবশ্য তার প্রমাণ নেই। তবু, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন 'যে আরশিটা একবার চিড় খেয়েছে/পরিষ্কার মুখ আর দেখা যাবে না তাতে কোনোদিনও/সংসারে একবার দুলে ওঠা ভ্রম/ঝাড়ের লন্ঠন-লাগের মত দোলাতে থাকবে তোমাকে...' (বিরহ), শুভাশিস দাশগুপ্ত জানান ঃ 'গভীর আত্মমগ্নতায় আমি হঠাৎ হঠাৎ/মানুষের মতো ব্যবহার করে ফেলি।/তখন আমি./ভালবাসি, কাপুরুষ হই./[illegible] চোখ জলে ভরে ফেলি./[illegible] খাঁজে খাঁজে অশ্রু ফুটে ওঠে' (এবং [illegible] হয় বিষয় পড়েনর) [illegible] পাওয়া যায়। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লোকগীতিটি সুরচিত, [illegible] কবিতায় [illegible]

সম্পর্কে সন্দেহের দোলায় দুলেছে বারবার। ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে যে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিল ক্রিকেটই তার জীবনের ট্রাজেডি।

বার্নসের অপরাধ কি? আজাদের সুপ্রসিদ্ধ লেখক কমলাকান্তের মুখে দিয়ে বলিয়েছেন—মনে মনে সবাই পাগল, কমলাকান্ত কিছু বেশি। সিডনি বার্নসও বেশি ছিলেন। খোলা কথার মানুষ।

অমার্জিত সভ্যতাবিতা যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিবিবেচনাহীন ব্যবহার যার স্বভাবধর্ম, সহজ দর্পমিশ্রিত সাহসে যে সদাসর্বদা স্ফীতবক্ষ, অপর দিকে শিষ্টাচার ও আচার আচরণে যার বালকোচিত সারল্য এবং রুচিও কদর্য, তেমন তাঁর দুর্যোগ-ঢাকা সত্য সন্ধানের হাতে মার খাবেই। সিডনি বার্নসও মার খেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অভিজাত ক্রিকেট সমাজে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—[illegible]

খেলার মাঠে

প্রদর্শনী ক্রিকেট ও সুঁটে ব্যানার্জী

শ্রীলঙ্কা সফরগামী নির্বাচিত ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের খেলাটি অতীত দিনের খেলোয়াড় সুঁটে ব্যানার্জীর সাহায্য ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইডেনে খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৫, ৬ ও ৭ জানুয়ারি। কলকাতায় এ বছরের বড় ক্রিকেট।

নিঃসন্দেহে খেলাটির আকর্ষণ আছে। কেননা যাদের নামে ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিক কালের খ্যাতি, এ খেলায় তাদেরই সমাগম। খেলা দেখার দিজন টিকিটের মূল্যও সাধারণ ক্রীড়ামোদির নাগালের মধ্যে। সুতরাং আমরা আশা করব যদিও বিদেশী দলের সফর ব্যবস্থা না থাকায় এবার ক্রিকেটের আমেজ সৃষ্টি হয়নি, তবু মহৎ উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে ক্রিকেট অনুরাগীরা ইডেনে ছুটবেন এবং দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য খেলোয়াড়রাও চিত্তাকর্ষক প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলবেন।

বাংলার কীর্তি-খ্যাত খেলোয়াড় এবং মহম্মদ নিসারের পর ভারতের সবচেয়ে ক্ষিপ্রগতির ফাস্টবোলার সুঁটে ব্যানার্জীর ক্রিকেট জীবনে প্রাপ্তির চেয়ে বঞ্চনাই বেশী। ক্রিকেট ছিল যার জীবনের ধ্যান জ্ঞান, তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী সমাদর পাননি ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পেয়েছেন অনাদর ও উপেক্ষা। অবসর জীবনে অর্থ সঞ্চয়ও করেননি। এই খেলাটির মাধ্যমে তার কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটলে সেটাও হবে তার শেষ জীবনের সান্ত্বনা।

হয়তো বাঙালী বলেই সুঁটে ব্যানার্জীর জন্য বাঙালী মাত্রেরই একটা দুঃখ আছে। কিন্তু ক্রীড়ামোদি সাধারণ ভারতবাসি, যারা ক্রিকেটের কূটনীতির ধার ধারেন না, তাঁদেরও কি সুঁটে ব্যানার্জীর জন্য আপশোস নেই? অত বড় খেলোয়াড়, বহু প্রতিনিধিমূলক খেলায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে তার ডাক পড়েনি একবার ছাড়া। তাও সুঁটে ব্যানার্জীর ক্রিকেট গগনের দীপ্তি যখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এবং কোথায়? না, ক্রিকেটারদের প্যারাডাইস নামে খ্যাত ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামের উইকেটে ১৯৪৮-৪৯ মরসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। সুঁটে ব্যানার্জীর বয়স তখন ৩৫ বছর।

সম্ভবত ওই টেস্টে খেলার সুযোগ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তৃপক্ষ তাদের পাপ স্খালন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৬-এ এবং ১৯৪৬-এ দু'বার ইংলন্ড সফর করিয়েও যাকে একটি টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি, ১৯৪৭-এ অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ও যার নাম সুকৌশলে ভুলে যাওয়া হয়েছে, তাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শক্তিশালী টেস্ট দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ডাকা হল ব্রেবোর্নের উইকেটে প্রথম চারটি টেস্টে উপেক্ষার পর। কিন্তু ব্রেবোর্নের ওই শক্ত মাটিতেই সুঁটে তাঁর বোলিং শক্তির ফসল তুলেছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ রানে ৪টি উইকেট দখল করে।

তরুণ যৌবনে সুঁটে ব্যানার্জী

সুঁটের বরাত মন্দ। ক্রিকেট দেবতাদের উপেক্ষার সঙ্গে ভাগ্যদেবীও ছিলেন তার প্রতি নিষ্করুণ। ওই খেলাটিতে অনায়াসে ভারত জিততে পারত, অবশ্য ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়ের জন্য দীর্ঘ ২১ বছর অপেক্ষা করতে হত না, যদি আম্পায়ার মশাই ওভারের দোষ বল এবং তারও নির্দিষ্ট সময় বাকি থাকতে আম্পায়ার স্টাম্পের উপর থেকে বেল তুলে না নিতেন।

সবাই ধরে নিয়েছিল জয় অনিবার্য। জয়ের বাকি ৬ রান, হাতে দুটি উইকেট। আম্পায়ারের দুর্বোধ্য আচরণে ভারত জিততে পারল না। জীবনের একমাত্র টেস্টে সুঁটে ব্যানার্জীও পারলেন না জয়ের নায়ক হতে। তবে হ্যাঁ, ওই সফরে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের একমাত্র পরাজয়ের মূলে সুঁটে ব্যানার্জীর অনেকখানি দান ছিল। এলাহাবাদে পূর্বাঞ্চল দলের জয়। সুঁটে ব্যানার্জী পেয়েছিলেন ৬৭ রানে ৭টি উইকেট।

বলা হয়ে থাকে, সুঁটে ব্যানার্জীর মধ্যাহ্ন জীবন ঢেকে রেখেছিলেন মহম্মদ নিসার, অমর সিং, সি. এস নাইডু, অমরনাথ, আমীর-ইলাহি, ভীনু মানকড় প্রভৃতি কুশলী বোলাররা। কথাটা অংশত সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বোধহয় বেশী সত্য, অধিকতর চতুর এবং কুশলী ক্রিকেট কর্মকর্তারা সুঁটে ব্যানার্জীর যোগ্যতা প্রমাণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ক্রিকেট নিয়ে তখন যে জোচ্চুরি খেলা হয়েছে সেটা 'ক্রিকেট' নয়। আজ সে সব কাহিনী লিখে লাভ নেই।

দৈহিক কাঠামো, শরীরের শক্তি সামর্থ্য হাতের জোর, লম্ফ, নিশানা এবং মনের দৃঢ়তা—ফাস্ট বোলারের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন সুঁটে ব্যানার্জী। তার উপর ছিল ব্যাটসম্যানের মনে ভীতি জাগানোর বিপুল বৈভব এবং ব্যক্তিত্বশক্তি। প্রকৃতির অকৃপণ দানে এবং অধ্যবসায় সাধনা ও ঐকান্তিকতার গুণে এক চৌকষ খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রতিনিধিমূলক খেলাগুলিতে তাঁর কৃতিত্বের নজির খুঁজলে দেখা যাবে

তিনটি দৌড়ে রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী শ্রীরূপা চ্যাটার্জী

হাতে পান লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে সি সি আই দলের পক্ষে এক ইনিংসে পেয়েছিলেন ৮৯ রানে ৬ উইকেট। উমরিগা, অমরনাথ, অমর সিং এবং মানকড়ের মত বোলাররাও দলে ছিলেন। ১৯৪১-৪২-এ দু' বারের রণজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাইকে মাত্র ৩৯ রানে শেষ করে দিয়েছিলেন ২৫ রানে ৮টি উইকেট দখল করে। ১৯৪৫-এ অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে পেয়েছিলেন ৮৬ রানে ৪টি ও ৮১ রানে ৪টি উইকেট। ১৯৩৫-এ ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক রাইডারের দলের বিরুদ্ধে উইকেট দখলে তাঁর সিংহ ভাগ। আর সরকারী বা বেসরকারী টেস্টে ভারতের প্রথম জয়ের মূলে তাঁর বড় অবদান ব্যাটিংয়ে। উজির আলীর নেতৃত্বে লাহোরে বেসরকারী টেস্টে জ্যাক রাইডারের দলকে ভারত হারিয়ে দিয়েছিল। ওই খেলায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুঁটে ব্যানার্জী ৭০ রান করে ভারতীয় ইনিংসের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন।

সূচনাকারী ব্যাটসম্যানের এই কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ ব্যাটসম্যান সুঁটের কৃতিত্বও স্মরণীয়। সে এক অদ্ভুত ইনিংস। ১৯৪৬-এর ইংলেণ্ড সফরে সারের বিরুদ্ধে শেষ জুটির দুজন, সুঁটে ও সারভাতের ২৪৯ রানের নতুন রেকর্ড ইংলণ্ডের মাঠে। সুঁটে ব্যানার্জীর জন্মের আগে সেটের জন্ম ১৯১৩ সালের ৩ অকটোবর। ১৯০৯ সালে উরস্টারের বিরুদ্ধে কেন্টের ফেয়ারার ও উলির শেষ উইকেটে যে ২৩৫ রানের রেকর্ডটি করেছিলেন সেটি ভেঙে দেন সুঁটে ও সারভাতে। ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান সারভাতে ১২৪ রানে নট আউট ছিলেন, ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান শরবিন্দু ব্যানার্জী করেছিলেন ১২১ রান। ১০ নম্বর ও ১১ নম্বর খেলোয়াড়ের সেঞ্চুরি করার একমাত্র নজির।

প্রথম বাংলায়, পরে রনজি ও দলীপের স্মৃতিপুত নবনগরে, জয়ারোহন বিহারে, প্রৌঢ়ে ভিলাইয়ে খেলাধুলোর প্রশিক্ষণে এবং অবসর জীবনে পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট ক্রিকেট কোচিংয়ে—কোথায় সুঁটে ব্যানার্জীর খেলাধুলোর অবদান নেই? খেলোয়াড় হিসাবে দর্শকদের আশার প্রতীক, শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীদের কাছে অসীম প্রাণের এক বিপুল আধার সুঁটে ব্যানার্জী।

অ্যাথলেটিকসে রেকর্ডের ছড়াছড়ি

রাজ্য অ্যাথলেটিকসে এবার রেকর্ডের ছড়াছড়ি। প্রথম দিন চারটি, দ্বিতীয় দিন ছয়টি এবং শেষ দিনে দশটি—মোট কুড়িটি রেকর্ড। তাছাড়া রেকর্ডের সমানও হয়েছে দুটি পাঁচেক ইভেন্টে। বেশীর ভাগ রেকর্ডই অবশ্য হয়েছে জুনিয়র ইভেন্টে। যদিও এখানে বয়স ভাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতায় নামার নজির আছে তবু সবাই বয়স কমিয়ে নেমেছে এমন কথা বলা চলে না। সুতরাং জুনিয়র ইভেন্টে ছেলেমেয়েদের ১২টি রেকর্ড করার মধ্যে উন্নতির পরিচয় অবশ্য স্বীকার্য। সিনিয়র বিভাগের আটটি রেকর্ডের মধ্যে বড় কৃতিত্বের অধিকারিণী ইস্টার্ন রেলের শ্রীরূপা চ্যাটার্জি, যিনি প্রতিদিন একটি করে রেকর্ড করেছেন। প্রথম দিন ১০০ মিটার দৌড়ে, দ্বিতীয় দিন ৪০০ মিটার দৌড়ে এবং তৃতীয় দিন ২০০ মিটার দৌড়ে।

কয়েকদিন আগে লুধিয়ানার অল ইণ্ডিয়া অ্যাথলেটিক মিটে শ্রীরূপা ১২·২ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন। রাজ্য অ্যাথলেটিকসে তাঁর ওই বিষয়ে সময় ১২·৪ সেকেণ্ড। লোহার বল ছোঁড়া এবং ডিসকাস ছোঁড়ার দুটি রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী ইস্টার্ন রেলের সুব্রতা দেবনাথও লুধিয়ানার কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তবু ওই দুজনের পাঁচটি এবং ৮০ মিটার হার্ডল রেসে কঙ্কা সেনগুপ্তের একটি রেকর্ড প্রমাণ করে অ্যাথলেটিকসে মেয়েরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। সে তুলনায় পুরুষদের

শট পাট ও ডিসকাসে রাজ্য রেকর্ড করেছেন সুব্রতা দেবনাথ

উন্নতির পরিচয় কম।

দুটি রেকর্ড হয়েছে পুরুষ বিভাগে। পোল ভল্টে রেকর্ড করেছে ইস্টবেঙ্গল-এর স্বপন দাস ৩·৭৫ মিটার লাফিয়ে। এই ক্লাবের মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি রেকর্ড করেছে ডেক থলনে।

উল্লেখ্য, ১৯৫৬-য় রাজ্য অ্যাথলেটিকসে দশ ইভেন্টের এই প্রতিযোগিতাটি শেষবার অনুষ্ঠিত হয়। সেবার ৪২৬৭ পয়েন্টে রেকর্ড করেছিল রেঞ্জার্স ক্লাবের ডি মিলনে। এবার ৪৪৫২ পয়েন্টে মৃত্যুঞ্জয় সে রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

বাংলায় অ্যাথলেটিকস চর্চার তেমন আগ্রহ নেই। আনুষঙ্গিক অ্যাপারেটাস নেই। অনুশীলনের তেমন পরিবেশ এবং স্থান নেই। তবু কিছু কিছু কোচের উৎসাহে এবং ছেলেমেয়েদের আন্তরিক চেষ্টায় রেকর্ড হচ্ছে—এটা আশার কথা।

একলব্য
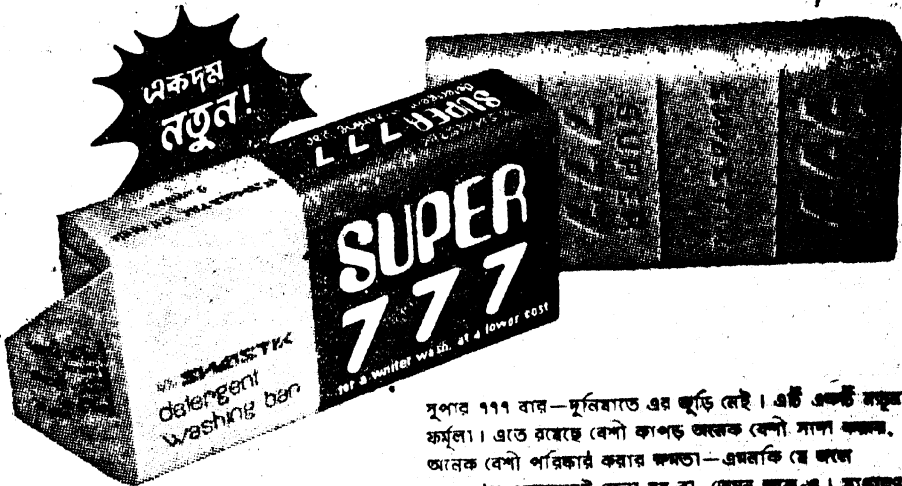
অরণ্যদেব লী ফক

প্লেনটা দিশেহারা হয়ে গেছে ...
এইবার আছড়ে পড়বে!
কী হচ্ছে ওর মধ্যে?
!!

যা হচ্ছে ...
এখন কী করব আমরা?
বাঁচতে চেষ্টা করব!

অপেক্ষমাণ হীরে-পাচারকারীরা
প্লেনটা ওখানে আছড়ে পড়ছে!
ওরা কেন প্যারাসুট পরে লাফিয়ে পড়ল না?
পালাও!

পাইলট অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে!
!
এক্ষুনি একে সরাও!

প্লেনের কন্ট্রোল হাতে নিলেন অরণ্যদেব
আছে! আছে!
আর বাঁচবার আশা নেই!

একেবারে মাটি ঘেঁষে প্লেনটা আবার শূন্যে উঠল!

তারপর আটকে গেল বম্বেকটা গাছের মাথায়!

ওরা বেঁচে নেই!
বিস্ফোরণ ঘটতে পারে!
হীরে-চোরেরা ওর মধ্যে রয়েছে .. ওদের ধরতে হবে!

'যদুবংশ' (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর'

মতামতের মন্তাজ
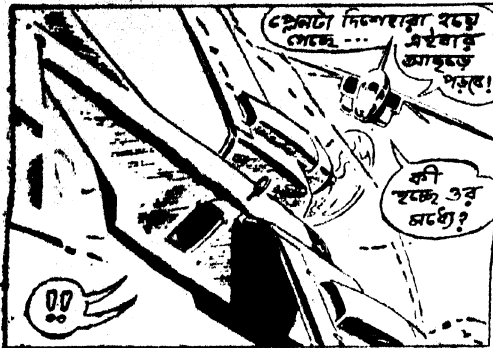
যেখানে সব কিছু দ্রব্যেরই মূল্যবৃদ্ধি সেখানে শুধু সিনেমার টিকিটের মূল্যহ্রাস হলে দর্শকরা খুশিই হবেন। এই মূল্যহ্রাস সব ছবির ক্ষেত্রে নয়, কোন কোন ছবির বেলায়। বলা বাহুল্য, সেটা প্রমোদ-কর প্রত্যাহারের জন্য। প্রমোদ-কর প্রত্যাহারের সঠিক কারণ ও স্পষ্ট নীতি জানা থাকলে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয় না। কিন্তু কোন্ ছবি কেন প্রমোদ-কর থেকে অব্যাহতি পায় সেটা চিত্রপ্রযোজকদের পক্ষে বোঝা দুষ্কর। প্রমোদ-কর রদের ব্যাপারটা পক্ষপাতহীন হচ্ছে কিনা এ নিয়ে চলচ্চিত্র মহলে এখন বিস্তর আলোচনা। এ নিয়ে উষ্মা সঞ্চারও অস্বাভাবিক নয়। কিছুকাল আগে একটি পৌরাণিক হিন্দীচিত্র কেন প্রমোদ-কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল তার সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। অনুরাগ হিন্দীচিত্রের প্রতি সরকারের সানুরাগ ব্যবহারের কারণও অজানা। যদি প্রমোদকর-মুক্তির বিশেষ কারণ, অন্তত এই দুটি চিত্রের ক্ষেত্রে পেশও করা হয় তবে একই কারণে অন্য ছবিও কেন করমুক্ত হবে না সেটাই জরুরী প্রশ্ন। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে নাটক সব পৌরাণিক চিত্রেই থাকে। মহৎ আত্মত্যাগের নজিরও অনেক হিন্দী ছবিতেই ছড়িয়ে আছে।

* * * *

প্রমোদকর প্রত্যাহারের ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে। এবং এক্ষেত্রে সরকারের সমদর্শিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। রাজ্য-সরকার যে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে চান সেটা এখন সংশ্লিষ্ট সকলেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অনুভব করছেন। চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাবার কাজেও সরকারের এখন সক্রিয় ভূমিকা। সরকার অর্থ সাহায্যও করছেন, তবে প্রমোদ-কর মুক্তির ভিতর দিয়ে যে আর্থিক সাহায্য তার সুযোগ, এখনও পর্যন্ত সকলে সমানভাবে পাচ্ছেন না। এখানেই ক্ষোভের কারণ দেখা দিতে পারে। অথচ কেন একটি ছবি প্রমোদ-কর থেকে অব্যাহতি পাবে সে সম্পর্কে কোন যুক্তিসঙ্গত নীতিও পালন করা হচ্ছে না। অবশ্য একটি-দুটি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে প্রমোদ-কর মুক্তি নিয়ে কেউই আপত্তি করবেন না। কিন্তু এখন অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় প্রমোদকর মুক্তি চাইলেই পাওয়া যায়। কমপক্ষে তিন-চার সপ্তাহের জন্য।

* * * *

তার চাইতে রাজ্যসরকারের অন্যান্য ব্যবস্থা বরঞ্চ ভাল। ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের দুর্গতি মোচনের জন্য কয়েকটি কাজে হাত দিয়েছেন। যদিও বাংলা ছবির সেনসার-ওয়াইজ রিলিজ সমস্যার সমাধানে কী পরিমাণ সহায়ক হবে বলা কঠিন। এই ব্যবস্থার ফলেও হয়ত

অনেক ছবির মুক্তি পিছিয়ে যাবে। ছবি সেনসার করার তাড়াহুড়ো আরম্ভ হয়ে গেলে এবং পর পর অনেকগুলি সেনসর-তারিখ জমে উঠলে ছবির মুক্তি পিছিয়ে যাওয়াই সম্ভব। তাছাড়া, বিশেষ সময়ের দিকে নজর রেখে ছবি সেনসর করাবার প্রবণতা দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক। তার চেয়েও বড় কথা, চলচ্চিত্রে সকলেই সমান এই কথা বলা কঠিন। গণতান্ত্রিক অধিকার আর যেখানে যত সুন্দরই হোক শিল্পরচনার ক্ষেত্রে সেটা বিভ্রাট ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে ফিলমকে শুধু ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে দেখলে ভুল হবে। শ্রেষ্ঠ কর্মকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। মুড়ি-মিছরির এক দর, অন্তত শিল্পের ক্ষেত্রে অচল। সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালককে যদি কোন গণতান্ত্রিক নিয়মে ছবির মুক্তির জন্য আট-নয় মাস বসে থাকতে হয়, তবে সেটা বাংলা ছবির পক্ষেও খুব কল্যাণজনক ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না।

* * * *

এই সব সমস্যার দিকগুলি আগেও আলোচনা করা হয়েছে। পুনরালোচনার দরকার এই কারণে যে নবগঠিত ডেভেলপমেনট বোরড, যদি এখনও সময় থাকে, এ ব্যাপারে নতুনভাবে চিন্তার সুযোগ পাবেন। তা বাদে শুধু প্রোডাকশান সেকটরই চলচ্চিত্র শিল্পের একমাত্র শাখা নয়। চিত্রপ্রদর্শন শাখাকে একেবারে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন হবে কিনা জানি না। চিত্রপ্রদর্শক শাখা অনেক মহলেই নিন্দিত হতে পারে। ওদের সপক্ষে কোন কথা বলাও বুঝি বিপদ! তবে এই শাখার অস্তিত্ব বা স্বাধীন ব্যবসার অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। ছবি দেখাবার ব্যাপারে চিত্রপ্রদর্শকদেরও কিছুটা পছন্দ-অপছন্দ বা মতামত থাকতে পারে। সেটা কেড়ে নেওয়া কতখানি যুক্তিসঙ্গত হবে বলা কঠিন। প্রসঙ্গত বলা যায়, নির্মিত সব বাংলা ছবিই, সেনসর তারিখের ভিত্তি ছাড়াই, মুক্তি পাচ্ছে। খুব বেশি ছবি পড়ে নেই, থাকলে বাংলা রিলিজ-চেন এখনই বাড়াবার দরকার হত। তার প্রয়োজন নবগঠিত বোরড এখনও তেমন অনুভব করছেন না। বোরড কেবল বাংলা রিলিজ চেন সম্প্রসারিত করার জন্য কয়েকটি হলের কথা ভেবে রেখেছেন। এখনই যে হলগুলি নেওয়া হচ্ছে না তার কারণ ছবির সংখ্যা অল্প। প্রোডাকশান বাড়লে হয়ত ওই সব হলের দরকার হবে। বর্তমানে প্রায় সব ছবি দেখানো হচ্ছে। এমন ছবিও মুক্তি পাচ্ছে যা তিন-চার সপ্তাহের বেশি কিছুতেই চলে না। ওই সব ছবির মুক্তি কিন্তু আটকাচ্ছে না। তাই সেনসর তারিখ অনুযায়ী চিত্রমুক্তির পরীক্ষা কি এখনই চালু করা দরকার?

অভিনেতৃ সংঘের নাট্য-উৎসব

নাট্যাভিনয়ে 'বাস্তবতা' অবশ্য চাই; অভিনয়ের জন্য চাই উচ্চমানের নাটক—যার আসল অর্থই বুঝি 'বিদেশ'! অভিনেতৃ সংঘ ৪ ডিসেম্বর থেকে রবীন্দ্র সদনে যে চারদিনব্যাপী নাট্যোৎসব করলেন, তার প্রত্যেকটা দিন বারবার করে এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মনে করতে সাহায্য করেছে, এ-দেশে বুঝি কোনো উচ্চমানের নাটক রচিত হয় নি। যদি হ'ত তবে এই উৎসবে তার একটিরও কেন উপস্থিতি দেখিনি? চারদিনের অভিনয়ের আগে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেওয়া হয়েছিল তাতেই বা কেন এ-প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা হয় নি? অনেকে অবশ্য বলবেন, কেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হঠাৎ নবাব' তো ছিল। অবশ্যই ছিল। কিন্তু 'হঠাৎ নবাব'-এর উৎস কি আসলে মলিয়েরের একটি নাটক নয়? ৫ ডিসেমবর, উৎসবের দ্বিতীয় দিন এ-নাটকটির মঞ্চরূপ পরিবেশনে যে সকল অর্থহীন কায়দা-কানুন করা হল তাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক ব্রেখটের পরে বুঝি আর একজন এলেন, যিনি নতুন এক 'এলিয়েনিয়েশন' থিয়োরীর প্রবক্তা। বলাই বাহুল্য তিনি অনুপকুমার। 'হঠাৎ নবাব'-এর মঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর। অভিনয়ের আগে এ-নাটক প্রযোজনা প্রসঙ্গে জনৈক শিল্পী তাঁর ভাষণে বললেন, রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নাটকের মধ্য দিয়ে নাকি কোনো বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখা যায় না। কথাটা কি সত্য? এবং ওই ভাষণেই জুর্দন খাঁকে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেওয়া হয়।

'হঠাৎ নবাব' কয়েকটি শক্তিশালী দল আগে অভিনয় করেছেন। এর 'জুর্দন খাঁ' চরিত্রে আমরা কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীকেও দেখেছি। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মিল অবশ্যই ছিল না। কিন্তু তাঁরা মোটামুটি জানতেন, ইলিউশন ব্রেক করার জন্য যা খুশি তা করা সংগত নয়। অভিনেতৃ সংঘ কিন্তু এখানে 'হঠাৎ নবাবকে' 'যা-ইচ্ছে তাই' নাটকে পরিণত করেছেন। নাট্যারম্ভে যে হাস্যকর দৃশ্যটির উপস্থাপনা করা হয়েছে তা যুক্তিরহিত। এখানে বরং নির্দেশনার চেয়েও অভিনেতা হিসাবে অনুপকুমারকে অনেক বেশি আন্তরিক মনে হবে। এবং নাটকে তিনি একাই একশো। 'জুর্দন খাঁ' চরিত্রকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ দিয়েছেন। বোধ হয় এ-কারণেই টিমওয়ারক এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মঞ্চে গাইয়ের যে দলটি উপস্থিত ছিল, বা নাচিয়ের দল—তারা ওই বিষয়ে কতখানি দক্ষ সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। অভিনয়ে অনুপকুমারের পাশাপাশি ঠাঁই

পেতে পারেন একমাত্র শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় আর নির্মল ঘোষ। মহিলা শিল্পীদের একজনও তেমন উল্লেখ্য কিছু মঞ্চে উপহার দিতে পারেন নি। 'হঠাৎ নবাব' নাটকের আর একটি আকর্ষক দিক ছিল এর মঞ্চ-সজ্জা। অভিনয় আর মঞ্চস্থাপত্য ছাড়া 'হঠাৎ নবাব'-এ টান বলে কিছুই ছিল না।

উৎসবের উদ্বোধন দিবসের নাটক ছিল 'রাজকুমার'। ক্লিফোর্ড ওডেটস-এর 'দি বিগ নাইফ' অবলম্বনে এর নাট্যরূপ রচিত। রচনা, পরিচালনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। চলচ্চিত্র জগতের একটি সমস্যা রাজকুমারের পারিবারিক জীবনে কী ভয়ংকর যন্ত্রণার দাবদাহ সৃষ্টি করেছিল তাই এর অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বর্ণিত। নাটকের শেষটা-মিলন-মধুর। রচনা সুন্দর। সংলাপ মর্মস্পর্শী। নাট্যসংকটের ক্রমিক উন্মোচন-অংশও সুরচিত। প্রয়োগে যথাসম্ভব বাস্তবতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং সে কাজে আলো আর মঞ্চসজ্জা সাহায্য করেছে অনেকটাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, রাজকুমার' কোন্ মহৎ বক্তব্যের আধার? নাটকে যে সকল আকস্মিক চরিত্রের আবির্ভাব, তারা কোন্ পরিণতিতে পৌঁছেছে? আর পরিণতিতেই যদি না পৌঁছয় তবে নাটকে সে-চরিত্রের দায়িত্ব কতটুকু? মনে হবে কেবল 'রাজকুমার'-এর যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার জন্যই যেন এত আয়োজন। যাঁরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে ব্যষ্টির সমস্যা কি এতই গুরুত্বের?

আগে বলেছি 'রাজকুমার' সুপ্রযোজিত। কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় দুর্বল, কয়েকটি-মাত্র বলিষ্ঠ। নির্দেশক সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায় নাটকের নাম ভূমিকাটির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। এ-চরিত্রের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণার দিকটি তাঁর অভিনয়ে যত স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই আমরা আশা করেছিলাম। রাজকুমার-এর স্ত্রী 'জয়া' রূপে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সহজেই আমাদের মন কেড়ে নেন। অসলে এ-চরিত্রের অসহায়তার দিকটি এমনিতেই আমাদের দুর্বল করে। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সময় বিশেষে এ-চরিত্রে গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব এনেছেন। এবং ভূমিকার সংগে অনেক ক্ষেত্রেই তা চমৎকার মানিয়েও গেছে। সুলতা চৌধুরীকে অতি-প্রগলভ মনে হয়। যদিও চরিত্রটিই প্রায় এ-ধরনের। কিন্তু দৃশ্য-বিশেষে তাঁকে তো সংযমীও দেখলাম। তবে কেন অভিনয়ের মধ্যে সমতা রক্ষিত হল না? শিপ্রা চক্রবর্তীর 'করবী' অসহ্য। শিল্পী হিসাবে শিপ্রার বোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলব না, কিন্তু এখানে আগাগোড়া তিনি যেন কোনো এক অভিনেত্রীকেই অনুকরণ করলেন। এই অনুকরণ আমাদের মনে এমন ধারণা এনে

"আলো আঁধারে" (পরিচালনা : ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে কুমারী বিপাশা ঘোষ ও আরতি ভট্টাচার্য

দেয় যে, শিল্পীর নিজের বলতে হয় কিছু নেই, নয়তো অনুকরণ করার নামে অন্য শিল্পীকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। মাতাল করবী কেবল কথাবার্তায় নয়, হাঁটাচলা, আচার আচরণেও বিশেষ শিল্পীকে হজম করার চেষ্টা করেছেন। দিলীপ রায়ের 'সুব্রত' এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'সুহাস' এখানে চরিত্রানুগ হতে পেরেছে।

সাত ডিসেম্বর অভিনেতৃ সংঘ তাঁদের উৎসবের তৃতীয় দিনে 'বিদেহী'র মঞ্চরূপ উপহার দিলেন। ইবসেনের 'গোস্টস' নাটকের এটি বঙ্গরূপে। রচনা নির্দেশনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। অভিনেতৃ সংঘ এর আগে, যতদূর মনে পড়ে, তিনবার 'বিদেহী' অভিনয় করেছিলেন। এবং এ সম্পর্কিত আলোচনাও এই পত্রে পূর্বে প্রকাশিত বলে জানি।

উৎসবের শেষ নাটক ছিল 'কুশবিদ্ধ কুবা'। কুবা অর্থে 'কিউবা'। আগে থেকেই রটে গিয়েছিল, এই নাটকটি নাকি উৎসবের শ্রেষ্ঠ উপহার। দেখেও প্রায় তাইই মনে হয়েছে। রবীন্দ্র-সদনের বিশাল মঞ্চ জুড়ে মোটা মোটা কাঠের কড়ি বরগা আর তক্তা দিয়ে খুব ভারী এবং জবরদস্ত গোছের একটি সেট করা হয়েছিল। সেটটির তিনদিক এবং ওপর অংশ নাটকের কাজে লেগেছে। ঘূর্ণায়মান স্টেজ যখন দৃশ্য পরিবর্তন করেছে ওই সময়ে আলোর কাজ দর্শক-চক্ষুকে চমৎকৃত না করে পারে নি। প্রযোজনায় খুবই জাঁকজমক। কিন্তু 'কুশবিদ্ধ কুবা' বুঝি আগাগোড়াই একটি ডিটেকটিভ নাটক। হয়তো কোনো প্রগতিশীল বক্তব্য রাখার জন্য এই নাটকের অবতারণা কিন্তু প্রযোজনা প্রয়োগের দশচক্রে সেই বক্তব্য দেখলাম অন্যরূপে প্রকাশিত। মেয়র এস্ট্রোমাদাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'পার্তি কম্যুনিস্তা'। পাঁচ হাজার পাউন্ড টি এন টি শক্তির বোঝা সাইকেলের রডে বেঁধে তাই দুই নবীন বিপ্লবীর যাত্রা। ওই সাইকেলটিই শেষে দেখা গেল নাটকের প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং বহু রকমের ভেল্কিও

[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বক্তৃতা করলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... হল কি? বাস্তব নাটক? তবে '[illegible]' মদের বোতল কি সি সরকারের 'ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার' মতন কেন অফুরাণ? পুলিস বা সৈন্যরা কেন চিরকালের বোকা? গল্পের গরু গাছে ওঠার মতন কেন নায়ক ধরা পড়তে পড়তে রক্ষা পান? এমন গণ্ডা-কয়েক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' আসলে বাস্তবতার নামে আমাদেরই 'ক্রুশবিদ্ধ' করেছে। উৎপল দত্ত রচিত এই নাটকটির সংলাপে আছে প্রচুর কাঁচা খিস্তি। যেন কিউবাতে কোনো ভদ্রলোকের বাস নেই। নাকি ও'রা এই খিস্তিকেই ভদ্র-ভাষা বলে গ্রহণ করেছে? এই রহস্য-নাটিকার প্রযোজনা তেমন বলিষ্ঠতা নিয়ে এলো কোথায়? সমীর মজুমদার আর দিলীপ রায় একদিকে, অন্যদিকে অশোক মিত্র এই তিন শিল্পীর কথার জাল রহস্যকে ঘনীভূত করতে সাহায্য করেছে। সমীর উৎপলীয় ভঙ্গিতে আগাগোড়া অভিনয় করেছেন। অশোক মিত্র এবং দিলীপ রায়ের নিজস্বতা ছিল। বাকি তেত্রিশটি চরিত্রের সবগুলিই প্রায় অকেজো। দলগত সংহতি সৃজনে এ'রা বিন্দুমাত্র সাহায্য না করায় নাটকের বহু অংশ প্রচণ্ড ক্লান্তি আনে।

সমাপ্তি দিবসের নাট্যাভিনয়ের আগে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন উৎপল দত্ত। 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' তিনি পরিচালনা করেন নি—একথা বলার পরেও, নাটকের শেষে অনুপকুমার বললেন, এটি উৎপল দত্ত নির্দেশিত। কার কথা সত্যি?

—প্র-ব-অ

শিল্পী-শিক্ষক আলি আকবর

[illegible] আলি আকবর কলকাতায়, এটাই বড় খবর। তিনি বিভিন্ন [illegible] বাজাচ্ছেন। সংগীতই তাঁর ভাষা। তবে গত ২৩শে ডিসেম্বর বিকেলে তিনি সাংবাদিক-দের ডেকেছিলেন কিছু মৌখিক আলাপের জন্য। তাঁর পাশে তখন উপস্থিত তাঁর তিন বিদেশী ছাত্রী এলেন, ক্যারল এবং স্তেফানী। একটু দূরে ছিলেন খাঁ সাহেবের তবলা সঙ্গী, তরুণ জাকির হোসেন খাঁ।

অন্যবারে আলি আকবর বিদেশে নিজের বাজনার কথা বলেন সাংবাদিক বৈঠকে। এবার বললেন ও'র সংগীত বিদ্যালয়ের কথা। বললেন, আমার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০। গ্রীষ্মে বেড়ে ২০০।২৫০ হয়। এবং বাস্তবিকই সিরিয়াস লোক। নিছক মাদকতা নিয়ে আসে না গান-বাজনায়। এবং খাঁ সাহেবের এই কথার যাথার্থ্য বুঝলাম ও'র ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে। প্রত্যেকেই রসিক, শিক্ষিতা এবং কলাবতী।

আলি আকবর বললেন, এবং এই জন্যই আমি ও-দেশে আমার বাজনার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি। দিনে ছ' ঘণ্টা বিদ্যালয়ের অফিসে বসি। বাকী সময় শেখাই। আর বছরের ১ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার খরচ (স্রেফ কলেজের) তোলার জন্য এখানে ওখানে বেনিফিট শো করে বাজাই। বলতে পারেন ওই কলেজই এখন আমার ধ্যান জ্ঞান।

খাঁ সাহেবের কলেজে সরোদ, সেতার ছাড়াও কথক নাচ, ধ্রুপদ, খেয়াল, বাঁশী, তবলা শেখান হয়। পণ্ডিত রবিশংকর সময় পেলে ওখানে গিয়ে শেখান। আর শিক্ষকদের মধ্যে আছেন (খাঁ সাহেবকে বাদ দিলে) শ্রীমতী লক্ষ্মীশংকর, চিত্রেশ দাস, শংকর

ও'র বিদ্যালয়ে ক্লাশ নিচ্ছেন আলি আকবর। তবলায় জাকির হোসেন। তানপুরা ছাড়ছেন এক মার্কিন ছাত্রী। সামনে মন্ত্রমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর দল

ঘোষ, আশিস খাঁ, নন্দদেশ, জাকির হোসেন এবং শ্রীমতী শংকর ঘোষ।

আমি এখানেও একটা মাইহার ব্যান্ড প্রস্তুত করেছি, বললেন খাঁ সাহেব। ওদের নিয়ে আমার বাবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব। দেখি কী হয়। ওদের মধ্যে কয়েকজন ভীষণ দুরন্ত হয়ে উঠেছে। এবং ওদের মধ্যে থেকে আমি কজন শিক্ষকও পেয়ে গেছি। ওদের অনুরাগ, শেখার এবং শেখাবার, আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই ওদের নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ায় আমার আনন্দও প্রচুর।

আলি আকবরের এই বিশ্বাস শ্রদ্ধার্হ। পরে এলেনের কথায় বুঝলাম বিদেশে কত নিঃস্বার্থ কর্মযোগের মধ্যে উনি ডুবে আছেন। এলেন বলল, এই গান শিখতে আমাকে অনেক কিছু দিতে হবে। কিন্তু আমি প্রস্তুত। যেদিন প্রথম গান শুনলাম খাঁ সাহেবের গলায় সেদিনই ঠিক করলাম আমি ওঁর কাছে ধ্রুপদ শিখব। লোকে ওঁকে সরোদিয়া বলে জানে। আমি ওঁর গান শুনেই মাতোয়ারা।

স্তেফানী বলল, উনি মহাপুরুষ। ক্যারল জানাল, ওঁর সঙ্গ পেয়ে আমরা ধন্য।

আসর শেষ হল খাঁ সাহেবের বিঁঝিট টেপ দিয়ে। ধ্রুপদ-আলাপও আমরা টেপে শুনলাম। বিদেশীরাই গাইছে। আর শুনলাম জোহান সেবাস্তিয়ান বাখের কম্পোজিশন নিয়ে খাঁ সাহেবের একটা হিন্দুস্তানী পেশকারী অর্কেস্ট্রার আঙ্গিকে।

—সংগীত সমালোচক

নব আনন্দলোকের বর্ষপূর্তি উৎসব

সম্প্রতি এক মনোরম ঘরোয়া পরিবেশে নব আনন্দলোক সংস্থা তাঁদের বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ অজিত ঘোষ। মধুছন্দা ঘটকের সুললিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠের পর সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল-গীতির মাধ্যমে একটি গীতিমাল্য তৈরী করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য রেবতী চ্যাটার্জি, মিত্র গাঙ্গুলী, কল্পনা মুখার্জি ও মধুছন্দা ঘটক। উদ্যোক্তারা ঐদিন দুটি আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমটি 'সার্থক শিল্পী গঠনে সংস্থার ভূমিকা' ও দ্বিতীয়টি 'নাট্য প্রযোজনা একটি যৌথ প্রচেষ্টা'। আলোচনায় যোগ দেন ডঃ অজিত ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও দেবনারায়ণ গুপ্ত। চারজন বক্তাই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং বাংলা মঞ্চ ও সিনেমা জগতের প্রখ্যাত শিল্পীদের নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করে দেখান কী ভাবে সার্থক শিল্পী হওয়া যায় এবং নাট্য প্রযোজনা কী ভাবে করতে হয়। আলোচনার পূর্বে সংস্থা-সম্পাদক বিগত বছরের কার্যাবলী বিবরণ পেশ করেন এবং শেষে অভিনেতা বঙ্কিম ঘোষ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

—প্রতিনিধি

গ্রীক নৃত্যানুষ্ঠান

গ্রীক নৃত্যানুষ্ঠান

ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আয়োজনের অন্তর্গত গত ২২শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ গ্রীক নৃত্যানুষ্ঠান (ডোরা স্ট্রাটাউ ট্রুপ) বিদেশী লোকগীতি এবং লোক-নৃত্যের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানরূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য। গ্রীস দেশ থেকে আগত এক বৃহৎ শিল্পীর দল তাঁদের দেশের নৃত্যগীতের যে পরিচয় উপস্থিত করলেন তা যে তাঁদের গ্রামীণ জীবন থেকে স্বতোৎসারিত সেটি উপলব্ধ করা গেছে অনুষ্ঠানের প্রথম মুহূর্ত থেকেই। ওবো এবং বেহালা ছাড়া যে-সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি সচরাচর কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। প্রধানত ঢাক ও ঢোল-জাতীয় তালবাদ্যের ছন্দের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিতে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কখনও হাত ধরাধরি করে, কখনও বা সারা মঞ্চ ছড়িয়ে গিয়ে ওরা যে নৃত্যের ছন্দ রচনা করেছে তার সঙ্গে এদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের লোকনৃত্যের কিছু সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

গ্রীসের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের নৃত্য এবং গীত ওঁরা পর-পর পরিবেশন করেছেন। ম্যাসিডোনিয়ার অন্তর্গত গোমিনিত্সার একটি রূপক-ধর্মী নাচ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। এই অনুষ্ঠানটি যদি-বা একটু নিষ্প্রাণ লাগও তাহলেও পরবর্তী পেলোপোনিস অঞ্চলের নৃত্যগীতে ওখানকার গ্রামাঞ্চলের প্রাণচাঞ্চল্য নিঃসন্দেহে সঞ্চারিত হয়েছিল। দক্ষিণ গ্রীসের প্রবীণা গায়িকা অ্যাফ্রোদিতি মাসিয়ার গান এই অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে সকলেরই প্রশংসা লাভ করেছে। একটি অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পীরাও প্রথমে গানে যোগ দিয়েছিল এবং অতঃপর তিনটি বেহালার সুরের সঙ্গে সারা মঞ্চ জুড়ে সহজ অথচ সুন্দর নাচের হিল্লোল তুলে একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে গেল। কিছু নতুন বাদ্যযন্ত্র দেখা গেল। তার মধ্যে ছড়ের সাহায্যে বাজানো তিনটি তারসম্বলিত ইউকিলিলি ধরনের ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রটির স্বর বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ওঁদের দলনেত্রী ডোরা স্ট্রাটাউ-এর সুদক্ষ পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটিই বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

—আনন্দবর্ধন

ভারতীয় রেলওয়ের লোকো কর্মীদের রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে লোকো কর্মীদের সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের দীর্ঘকাল থেকে যে বিবাদ চলছে তার কোন রকম ফয়সালা না হওয়ার দরুন লোকো কর্মীরা ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তার ফলে বিনা নোটিসে দূরপাল্লার বহু ট্রেন বাতিল করা হয়। রেলের এক মুখপাত্র এই ধর্মঘট সম্পর্কে বলেন : বর্তমান লোকো কর্মী আন্দোলনের জন্য দায়ী সকলের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেননা এই ধর্মঘট বেআইনী এবং ট্রেড ইউনিয়ন আইনের পরিপন্থী। কোনরকম নোটিস না দিয়ে বিনা প্ররোচনায় লোকো কর্মীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছেন। অন্যদিকে নিখিল ভারত রেলকর্মী ফেডারেশনের সভাপতি লোকোকর্মী এবং অন্যান্য রেল-কর্মীদের দাবির সমর্থনে সারা ভারত রেলকর্মী ধর্মঘটের হুমকি দেন। কর্মীদের দাবি উপেক্ষা করার জন্য তিনি রেল প্রশাসনের উপর দোষারোপ করেন। হাওড়া এবং শিয়ালদহে এ পর্যন্ত ৪০ খানা দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেন-গুলি বাতিলের ফলে গম, ডাল, সরিষার তেল, আলু, কপি প্রভৃতি আমদানিতে বিঘ্ন ঘটছে। কংগ্রেস সদস্যরা লোকো ধর্মঘটের সমালোচনা করেন। অপর পক্ষে বিরোধী সদস্যরা বলেন : যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা রূপায়ণ না হবার ফলেই লোকো কর্মীরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছেন। লোকো ধর্মঘট মেটাতে শ্রমমন্ত্রী শ্রীরেড্ডি রেলমন্ত্রী শ্রীমিশ্র ও লোকো কর্মচারী সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

দেশী সংবাদ

১৭ ডিসেম্বর—মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে একটানা ঘণ্টা দুই বৈঠক চলার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ জানালেন খুব আনন্দের খবর। হাউস স্টাফ ও ইনটার্নিদের ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাউস স্টাফ ও ইনটার্নিদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবেই মীমাংসা হয়। প্রস্তাবগুলি হল : (১) ইনটার্নিরা পাবেন মাথাপিছু ২৭৫ টাকা এবং শতকরা ১০ ভাগ বাড়িভাড়া ভাতা, (২) জুনিয়ার হাউস স্টাফ ৪০০ টাকা এবং (৩) সিনিয়ার হাউস স্টাফ ৪৫০ টাকা।

খোলাবাজারে ডালের দাম যখন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তখন সরকারী গুদামে দীর্ঘ দশমাস ধরে পড়ে থেকে থেকে প্রায় দশলাখ টাকার মসুর এবং কলাই ডাল নষ্ট হচ্ছে। গোডাউন ইনসপেকটররা বার বার তাদের রিপোর্টে খাদ্য দফতরকে এই কথা জানান।

১৮ ডিসেম্বর—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমুজফফর আহমদ আজ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ভোর পাঁচটায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আত্ম-গোপনে থাকবার সময় শ্রীআহমদের ছদ্মনাম ছিল কাকাবাবু।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আগামী ৫ বছরে রাজ্যগুলিকে ৯ হাজার ৩০৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পাবে ৮২২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট সুপারিশের ৮·৫৬ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ পাবে।

১৯ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সার্টিফিকেট ও মারকশিটের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অভিযোগ, ইতিমধ্যেই বহু ছাত্র জাল মারকশিট দেখিয়ে কলেজে কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ এ সম্পর্কে ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

কলকাতার জঞ্জাল সাফাই ব্যবস্থা আপাতত বানচাল। বুধবার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল সাফাই। আজও বন্ধ থাকবে বলে কর্মীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন। এমন কি ডিকা-দারের লোকদেরও তারা কাজ করতে দেননি এবং ভবিষ্যতেও দেবে না বলে জানিয়েছেন।

২০ ডিসেম্বর—টাকার অভাবে কলকাতা স্টেট ট্রানসপোর্ট করপোরেশন এখন নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখে। মাসের পর মাস ধরে রেলইয়ার্ডে ও সড়ক পরিবহণের গুদামে স্টেট বাসের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি এসে পড়ে রয়েছে। ছাড়াবার টাকা নেই। কর্মীরা বেতন পাবেন কিনা তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। স্টেট বাসের ব্যাংক তহবিলও শূন্য। আজ কোন একটি ব্যাংকের নামে স্টেট বাসের বারো টাকার একটি চেকও 'অনার' হয়নি।

সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কোন ভদ্রলোকের চুক্তি হয়নি। আজ মহাকরণে এক বৈঠকে যুব এবং ছাত্র নেতারা খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের ওই মন্তব্যে বিস্মিত হন। বৈঠকে ওই নেতারা এখন দাবি করেন, তাহলে সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিন। তাতেও ঘোষ রাজি হন নি। তিনি বলেছেন এই ব্যাপারটা তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন।

২১ ডিসেম্বর—অবশেষে হেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটিত হতে চলেছে বলে লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও তিনজন নিখোঁজ। এছাড়া ১৯৭১ সালে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে তিন ব্যক্তি মারা যান। পুলিসের অভিযোগ, মৃত ওই তিন ব্যক্তিও এই হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

২২ ডিসেম্বর—কলকাতা এনফোরস-মেনট বিভাগের জনৈক অফিসার বলেন : জাল-ভেজালে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য এমন খুব কমই আছে ভেজালকারীদের কল্যাণে যেসব অখাদ্যে পরিণত হচ্ছে না। ওষুধপত্রও ব্যাপকভাবে জাল হচ্ছে। কতকগুলি লাইফ সেভিং ইনজেকশন ও ক্যাপসুলেও জাল হয়েছে।

এবার বড়দিনের মধ্যে কলকাতার জঞ্জাল মুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। গত কয়েকদিন বিভিন্ন স্থানে যা জঞ্জাল জমেছে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৫ হাজার টন এবং পরিষ্কার করতে লাগবে ১২ থেকে ১৪ শত ট্রিপ।

২৩ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গত ১৫ আগস্ট নয়াদিল্লীতে ঐতিহাসিক লাল-কেল্লার সামনে যে কালাধারটি মাটির নীচে রেখে দিয়েছিলেন তাজ তা তুলে ফেলার চেষ্টা করলে সংসদের ২২ জন বিরোধী সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এঁরা জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, ডি এম কে ও সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য।

বিদেশী সংবাদ

১৭ ডিসেম্বর—'ইথিওপিয়ান হেরোলড' পত্রিকায় প্রকাশ : মধ্য ইথিওপিয়ায় যে শিলীভূত নরকঙ্কাল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিন লক্ষ বছর আগেও মানুষ দুই পায়ের উপর ভর করেই চলত। এই নরকঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ ডঃ কারল্ জোহানসন। সেই সঙ্গে পৃথিবীর প্রাণী ও তরুলতার শিলা-সংস্করণ।

১৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতি পাওয়ার সবরকম শর্তই মোটামুটি পূর্ণ করেছে। [illegible] প্রতি-রক্ষা ও বিদেশমন্ত্রী শ্রীআ[illegible] আহম্মদ একথা জানান। শ্রীআহম্মদ [illegible] সংসদের এক অধিবেশনে ঢাকা কর্তৃপক্ষ ১৯৫ জন পাক যুদ্ধবন্দীর বিচারের [illegible] ত্যাগ করতেও পরামর্শ দেন।

১৯ ডিসেম্বর—আজ [illegible] এক সামরিক শিবিরে বিমান ছিনতাইকারী ৩ জন আরব সন্ত্রাসবাদীকে (গত [illegible] কুয়ায়েতে বিমান বন্দরে আত্মসমর্পণের পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়) জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আটক আরবদের বিচার হবে কিনা কুয়ায়েত কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে কিছু বলতে নারাজ।

...**২০ ডিসেম্বর**—জেনারেল ফ্রাংকোর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ৭০ বছর বয়স্ক স্পেনের প্রধানমন্ত্রী এডমিরাল লুই ক্যারিরো ব্ল্যাংকো আজ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন। সরকারীভাবে দুর্ঘটনা বলে প্রচার করলেও, পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস যে এটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

২১ ডিসেম্বর—পশ্চিম এশীয় শান্তি আলোচনা আজ জেনিভায় শুরু হয়েছে। গত বছরে চার চারটি দ্বন্দ্বের ঝড় বয়ে গিয়েছে যে অঞ্চলের উপর দিয়ে সেখানে এক স্থায়ী শান্তির চেষ্টায় এই ধরনের আনুষ্ঠানিক বৈঠক এই প্রথম।

২২ ডিসেম্বর—পশ্চিম এশিয়া শান্তি সম্মেলনের প্রথম পর্যায় আজ জেনিভায় শেষ হয়েছে। সরকারী ঘোষণা : একটি বিশেষ সামরিক গোষ্ঠী সুয়েজখাল বরাবর সৈন্য অপসারণের ব্যাপারে এখনই কাজ শুরু করবে বলে বোঝাপড়া হয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর—পশ্চিম এশিয়ার এক শান্তি মানচিত্রের ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিংগার এবং সোভিয়েট বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে জানা গিয়েছে। সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এ খবর বেরিয়েছে।

Cover Printed by Ananda t Private Ltd.—Calcutta - 54.

৪১ বর্ষ] শনিবার, [illegible] ১৩৮০ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 12th January, 1974 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য— ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!

সূচীপত্র

রেশমের জামাকাপড় ধোয়ার জন্যে দরকার বিশেষ যত্ন

জেণ্টীল

রেশমের জামাকাপড় আর 'টেরীন', নাইলন, রেয়ন, প্রভৃতি সিন্থেটিক কাপড় খুব সূক্ষ্ম জিনিস। এগুলো খুব সাবধানে ধুতে হয় আর তার জন্যে দরকার শুধু **জেণ্টীল।** **জেণ্টীল** আপনার শাড়ী, অন্তর্বাস, শার্ট, স্কার্ফ প্রভৃতি নরম কাপড়ের বিন্যাস ও চাকচিক্য বজায় রাখে। **জেণ্টীল** দিয়ে বাড়িতে নিরাপদে আপনার নরম জামাকাপড় ধুয়ে নিন।

জেণ্টীল বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়েছে আপনার নরম জামাকাপড় ধোয়ার জন্যে—রেশমের কাপড়, সিন্থেটিক কাপড়, পশমের কাপড়—সব। **জেণ্টীল** আপনার জামাকাপড় ভালো ক'রে···সব ময়লা দূর ক'রে নতুনের মত মোলায়েম, ঝরঝরে ঝলমলে ক'রে রাখে।

জেণ্টীল—নরম জামাকাপড় সবচেয়ে নিরাপদে বাড়িতে ধোয়ার জন্যে

Shilpi HPMA 54A Ben

সূচীপত্র

কিন্তু এখন

দেশবিদেশে প্রমাণিত ফর্মুলা অ্যাম্বী স্কিন ফেয়ার ক্রিম পাওয়া যাচ্ছে, যা এই মালিন্য কমিয়ে দিয়ে ত্বককে তার স্বাভাবিক ফরসা আর উজ্জ্বল রঙ ফিরিয়ে দেয়, রোদে-পোড়া-কালো রঙ থেকে বাঁচায়।

রঙ ফরসা আর উজ্জ্বল করা ক্রীমের মধ্যে অ্যাম্বীরই বিক্রী পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী। অ্যাম্বী নিয়মিত ব্যবহার করলে আপনার সহজাত স্বাভাবিক ফরসা আর উজ্জ্বল রঙ আবার ফিরে পাবেন,—এ একেবারে সুনিশ্চিত! মাত্র দশদিন মেখে দেখুন,—হাতে-নাতে ফল পাবেন।

নিজের হাত আর উরুর রঙ মিলিয়ে দেখুন,—হাতের রঙ অনেক কালো, তাই না? খুবই স্বাভাবিক। কারণ, হাতে সবসময় রোদ লাগে। শরীরের অনাবৃত জায়গায় রোদ লাগলে ত্বক-কালো-করা পিগমেন্টের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিণাম: আপনাকে কালো দেখায়!

পৃথিবীর ৩১টি দেশে যাচাই করা এই আন্তর্জাতিক ফর্মুলা অ্যাম্বী এখন থেকে আপনারই জন্য, আপনার সেবায়!

বিদেশে বহু বছর ধরে লক্ষ লক্ষ নারী তাঁদের রঙের ছটা ফিরে পাওয়ার জন্য অ্যাম্বী ব্যবহার করে আসছেন। এখন এই বিশ্ব-বন্দিত ফর্মুলা ভারতে এসে গেছে, আপনার জন্য। অ্যাম্বীতে এমন একটি বিশেষ উপাদান আছে যা রোদের তাপ থেকে ত্বককে রক্ষা করে। অ্যাম্বী যে শুধু ত্বক-কালো-করা পিগমেন্টই দূর করে তা নয়। উপরন্তু রোদের হাত থেকে ত্বককে আড়াল করে রাখে, কালো হতে দেয় না। আয়নার সামনে দাঁড়ান, মাত্র দশদিনের মধ্যেই এর কার্যকারিতা বুঝতে পারবেন। ত্রিশদিনের মধ্যে আপনার ত্বক ফিরে পাবে তার সহজাত মনোহর কান্তি। অ্যাম্বী ত্বকের সমস্ত ছোপ ও দাগ দূর করে তাকে উজ্জ্বল, কোমল আর সুন্দর করে তোলে।

মনে রাখবেন, প্রথম ত্রিশ দিন অ্যাম্বী ব্যবহার করবেন দিনে দুবার করে। এতে আপনি আপনার সহজাত স্বাভাবিক ফরসা আর উজ্জ্বল রঙ ফিরে পাবেন। তারপর ব্যবহার করবেন প্রতিদিন একবার করে। ত্বককে রোদ থেকে বাঁচানোর এই রক্ষাকবচ আপনার আসল রঙ বদলাতে দেবে না।

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিউটি ডায়াগনস্টিশিয়ান শ্রীমতী শাহনাজ হুসেন অ্যাম্বী সম্বন্ধে কি বলেন, শুনুন:
"আমার ক্লিনিকে আমি অ্যাম্বী ব্যবহার করে দেখেছি। এই ক্রীম ভারতের জলহাওয়ায় বিশেষ কার্যকরী। এতে রঙ ফরসা আর উজ্জ্বল হয় তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের নানান খুঁত, যেমন ছোপ, দাগ, বসন্তের কালো দাগ ইত্যাদি দূর হয়। অ্যাম্বী ত্বককে মোলায়েম আর নরম করে তোলে।"

অ্যাম্বী

স্কিনফেয়ার ক্রীম
আপনার রূপ ও রঙের ছটা ফিরিয়ে দেয়।

নিকোলাস উৎপাদন

বম্বে, কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরে পাওয়া যায়।

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীবৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত

তালা-বন্ধ
কেন্দ্র শ্রীবসুকে পরামর্শ দিয়েছেন,
পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিসভায় যোগদানের চিন্তা
ত্যাগ করুন।
পশ্চিমবঙ্গ

আবহাওয়ার খবর

ভারতের খ্যাতনামা পলিটিক্যাল আবহাওয়াবিদ, ডক্টর জ্যোতি বসু বোম্বাই-এর এক মানমন্দির থেকে ঘোষণা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে বায়ুর চাপ হঠাৎ যে-রকম আলগা হয়ে গিয়েছে, তাতে আন্দোলনের আরেকটি সাইক্লোন সেখানে আসন্ন। কোথা থেকে এই সাইক্লোন উঠবে আর কোথায় গিয়ে আছড়ে পড়বে, ডঃ বসু এ কথা খোলসা করে না বললেও অন্য সূত্রে জানা যায় যে, অন্যান্যবারের মত এবারও এই পলিটিক্যাল সাইক্লোনের উৎপত্তি সম্ভবত কলকাতা থেকেই হবে। কেননা, কলকাতার উপর দিয়ে এখন নানা ধরনের রাজনৈতিক বায়ুর উষ্ণ ও শীতল স্রোত বয়ে চলেছে। এবং তারা ক্ষণে ক্ষণে দিক পরিবর্তন করছে। কাজেই, ডঃ বসুর মতে, এই সব এলোমেলো শীতোষ্ণ বায়ু-স্রোতগুলি এক সময় যুক্ত হয়ে পরিপুষ্ট হবে এবং ক্রমে এক মুক্তিষ্ঠ আন্দোলনের ঘূর্ণি-ঝড়রূপে পশ্চিমবঙ্গের উপর সবেগে আছড়ে পড়বে।

আপাতদৃষ্টিতে ডাঃ বসুর বিশ্লেষণ এক উদ্বেগজনক ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অন্যান্য পলিটি-ক্যাল আবহাওয়াবিদদের মতে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। তাঁরা মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বড় রকমের ডিপ্রেশন এখনই দেখা দেবে না। তবে স্থানীয় তাপমাত্রার তারতম্য ঘটলে তার প্রভাব বায়ুমণ্ডলে দেখা দেবে এবং তার ফলে সাময়িকভাবে বাতাসের গতিবেগ কিছু বাড়তে পারে। দু-এক পশলা বৃষ্টিও পড়তে পারে এবং রাত্রিকালে শীতের মাত্রা বৃদ্ধি এবং সকালের দিকে কুয়াশা হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের কোন সম্ভাবনা নেই।

যে-সকল আবহাওয়াবিদ এই মতের সমর্থক তাঁরা মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়ামণ্ডল প্রধানত তিনটি বায়ুস্রোতের দ্বারাই বর্তমানে প্রভাবিত। এই তিনের মধ্যে সব থেকে বলবান বায়ুস্রোতের নাম কংগ্রেস, তার পরেরটির নাম সি-পি-এম এবং তৃতীয়টির নাম সি-পি-আই।

যদিও অভ্যন্তরীণ বিপরীতমুখী নানা স্রোতের সংঘর্ষে প্রধানতম রাজনৈতিক বায়ু-স্রোতটির গতিবেগ খানিকটা মন্থর হয়ে এসেছে তবু, এই বায়ু-স্রোতের গতিপথের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কোনও দেখা যায় নি।

অ-রাজনৈতিক আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞগণ এই মতের সমর্থক তাঁদের এক মুখপাত্র আমাকে জানান, ডঃ বসু খুব একটা সহজ ভুল করে বসে আছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় রকমের সাইক্লোন আসন্ন, এই ভবিষ্যদ্-বাণী করবার সময় তিনি একটি বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী বায়ু-স্রোতটি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে না পড়লে, এই রাজ্যে এমন কোনও পলিটিক্যাল ঘূর্ণি-বাত্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়, যার আঘাতে এখানে বড় রকমের বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী বায়ু-স্রোতটি মূলত উত্তর-পশ্চিমের সব থেকে শক্তিশালী বায়ু-স্রোত, যার ভৌগোলিক নাম "ইন্দিরা-স্রোত", তারই অনুগ্রহপুষ্ট। অতএব, এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইন্দিরা-স্রোতের দ্বারা পরিপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী বায়ু-স্রোত এখনও কিছু দিন এই রাজ্যের রাজনৈতিক আব-হাওয়াকে প্রভাবিত করে রাখবে।
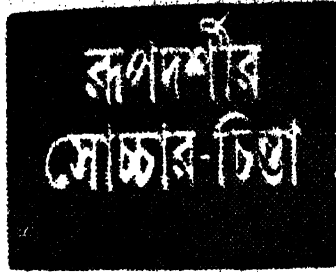
সম্প্রতি যে সোভিয়েত উপগ্রহ ভারতের আকাশ পরিভ্রমণ করে গেল, তার থেকে যে-সব রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, সেইগুলিও এই মতের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেন। সোভিয়েত উপগ্রহ প্রেরিত তথ্যাদিও এই কথাই বলছে, ভারতের পলিটিক্যাল আবহাওয়ায় "ইন্দিরা-স্রোতে"র প্রভাব এখনও প্রবল থাকবে। এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রবাহিত সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার বায়ু-স্রোত তাকে এখনও কিছু দিন আরও প্রবল করে রাখবে।

উক্ত মুখপাত্র বললেন, ডঃ বসুর মত একজন নামী পলিটিক্যাল আবহাওয়াবিদ যে এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তাঁর হিসাবের মধ্যে ধরলেন না, তার চেয়ে স্থানীয় তাপমাত্রার হেরফেরের উপর অযথা অধিক মাত্রায় নির্ভর করে, তাঁর পলিটিক্যাল ওয়েদার ফোরকাস্ট প্রকাশ করে দিলেন, এর দ্বারা এই কথাই বোঝা যায় যে তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়া ফোরকাস্টের সাম্প্রতিকতম তথ্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন।

সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রবাহিত সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার বায়ু-স্রোত এক দিকে যেমন ইন্দিরা-স্রোতকে প্রবল রাখতে সাহায্য করেছে, তেমনি উক্ত সোভিয়েত বায়ু-স্রোতের বিপরীত প্রভাবে সি-পি-আই বায়ু-স্রোত ইন্দিরা-স্রোতের আওতার মধ্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। এবার সোভিয়েত বায়ু-স্রোত সি-পি-এম বায়ু-স্রোতকেও এমন হঠাৎ আকর্ষণ করেছে যে, সে তার গতিপথ খানিকটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

এতদিন সি-পি-এম বায়ু-স্রোত সোভিয়েত এবং চীনা এই দুই সমাজ-তান্ত্রিক বায়ু-স্রোতকে সমদূরত্বে রেখে মধ্যাল ভবিষ্যতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এবার সোভিয়েত বায়ু-স্রোতের হঠাৎ আকর্ষণে সি-পি-এম বায়ু-স্রোতের মূল ধারাটি দ্বিধাবিভক্ত হবার মুখে এসে পড়েছে। একটি মুখের প্রবণতা সোভিয়েত ঘেঁষা হওয়া সত্ত্বেও আরেকটি মুখ চীনের টাইফুনের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারছে না।

উক্ত আবহাওয়াবিদগণের মতে ডঃ বসু এই সব ফ্যাক্টরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন বলেই, পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই আর একটি পলিটিক্যাল সাইক্লোন এসে আঘাত করবে, অতি উৎসাহে এই ভ্রান্ত ফোর-কাস্ট করে বসেছেন।

আবহাওয়াবিদগণের মুখপাত্র বলেন, সি-পি-এম বায়ু-স্রোত সোভিয়েত বায়ুর ঝাঁকুনি খেয়ে গতিপথ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে রাজনৈতিক আবহাওয়ামণ্ডলের যেখান দিয়ে প্রবাহিত হতে চেষ্টা করছে, সেটা সি-পি-আই বায়ু-স্রোতের গতিপথে গিয়ে আঘাত করবে এবং উভয় স্রোতে সংঘর্ষের ফলে উভয়েরই প্রবাহ [illegible] হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

সি-পি-আই বায়ু-স্রোত নিয়ে যারা গভীরভাবে গবেষণা করছেন, তাঁদের বুলেটিনে এমন কথাও প্রকাশ পেয়েছে যে "দক্ষিণপন্থীরা যে কাজ করতে চেয়েছে ডান দিক থেকে, সি-পি-এম বাম দিক থেকে সেই একই কাজ করছে। তাই ব্রেজনেভের ভারত সফরে উভয়েই অতীব বিক্ষুব্ধ।"

উক্ত মুখপাত্র বলেন, বামমার্গী দুটো প্রধান বায়ু-স্রোতের মিলন অকুণ্ঠ হয়ে অন্যান্য খুচরো বাম বায়ু-স্রোতগুলো এক সম্মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করলেও না-হয় রাজনৈতিক সাইক্লোনের স্বপ্ন দেখা যেত। কিন্তু সে সম্ভাবনা যখন নেই তখন ডঃ বসুর এই ফোরকাস্ট নিছক এক আবুহোসেনী খোয়াব ছাড়া আর কি?

দেবরাজ

মাদ্রিদে খুন

জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনে ক্ষমতা দখল করেন ১৯৩৬ সালে। দেশে তখন দারুণ অশান্তি; গৃহযুদ্ধ চলছে। সে যুদ্ধ লড়াই যখন শেষ হলো ২৮ মার্চ, ১৯৩৯ ফ্রাঙ্কো তখন দেশের সর্বেসর্বা। সরকারের রূপটা খোলসটা খুলে ফেলা হলেও তার চরিত্র আজো বদলায়নি। গণতন্ত্রের লেশ মাত্র স্পেনে নেই। সেখানে আছে নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্র। তার প্রাণপুরুষ জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তিনি হচ্ছেন কদিলো অর্থাৎ মহানায়ক, রাষ্ট্রপতি, স্পেনের একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল মুভমেন্ট অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের প্রধানও। ডিসেম্বরের যে পর্যন্ত তিনি আবার ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীও। বয়েস তাঁর ৮১। কিন্তু প্রতিপত্তি তাঁর একটুও কমেনি—এখনও তিনি যা চান স্পেনে তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তাঁর মুখের ওপর কথা বলে এমন বুকের পাটা সে দেশে কারুরই নেই। ভয় করে তাঁকে সবাই, কিন্তু ভক্তি করে কজন তা বলা শক্ত। তাঁর বিরোধীও দেশে আছে বিস্তর। কিন্তু তারা যা কিছু করে সে সবই লুকিয়ে। খোলাখুলি দল কেউ গড়তে পারে না স্পেনে, তাই বলে বেআইনী গুপ্ত দলের অভাবও নেই।

ইউরোপের দেশে দেশে যে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তার শেষ ঘাঁটি স্পেন। [illegible] হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে [illegible] জেনারেল ফ্রাঙ্কো। সে-যুগ [illegible] তিনি নিজেও [illegible], তাঁর সরকারও [illegible] তাঁর [illegible] আটকে নেই। কারণ তার কিছু আসে যায় না, পশ্চিমী সমাজে সে জায়গা উঠেছে। আর তার [illegible] দেশগুলোর সাহায্যও। বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের বিশেষ দহরম মহরম। এরই মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে মিতালি একটু বেশি। দিন কয়েক আগেও দু'দেশের মধ্যে একটা চুক্তি সই হয়েছে যার শর্ত হচ্ছে আমেরিকাকে নিজের এলাকায় তিনটে বিমানঘাঁটি আর একটা ডুবো-জাহাজের ঘাঁটি রাখতে দেবে স্পেন, তবে লড়াই চালাবার জন্যে যে সব সুবিধে দরকার তাও। এ সব সুবিধের বদলে আমেরিকা স্পেনকে দিচ্ছে প্রচুর টাকা। আমেরিকার সাধ স্পেনকে ন্যাটোর দলে টেনে, তাকে ইউরোপের [illegible] সামিল করা। স্পেনও তাতে অরাজী নয়।

কিন্তু স্পেনের মতো একটা স্বৈরতন্ত্রকে মিলতে গণতন্ত্রী ইউরোপকে রাজী করানো আমেরিকার পক্ষেও সহজ নয়। মার্কিন সরকারের ধারণা, সামান্য একটু গণতন্ত্রের পালিশ স্পেনের স্বৈরতন্ত্রের ওপর বুলিয়ে দিলেই তাকে খাঁটি গণতন্ত্র বলে ইউরোপের হাটে চালানো যাবে। সেই মন্ত্রই তাঁরা দিয়েছেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর কানে; আর কানের ভেতর দিয়ে তাঁর মরমেও পশেছে। তিনি এখন চান পশ্চিম ইউরোপের আসরে তাঁর ঠাঁই করে নিতে। তার জন্যে ফ্যাসিস্ট অপবাদ চাপা দিতে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে আসল রূপ ঢাকতেও তিনি তৈরি। সত্যিকারের গণতন্ত্র অবশ্য তিনি চান না। তবে পশ্চিম ইউরোপের আসরে ঢোকবার জন্যে ওপর ওপর কিছু রদবদল করতে তিনি রাজী। গেল বছর জুন মাসে তিনি তাই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তাঁর শূন্য আসনে বসিয়েছিলেন তাঁর গৃহযুদ্ধের আমলের প্রাণের বন্ধু অ্যাডমিরাল কারেরো ব্লাঙ্কোকে। জাতীয় আন্দোলনের তিনিও ছিলেন একজন চাঁই।

সেই হলো কাল, অ্যাডমিরাল ব্লাঙ্কোর তো সইলই না বুঝি বা জেনারেল ফ্রাঙ্কোরও। প্রধানমন্ত্রীগিরি অ্যাডমিরাল ব্লাঙ্কোর বরাতে সইল না—ছ' মাস যেতে না যেতে তিনি খুন হয়েছেন ২০ ডিসেম্বর। সেদিন সকালে একটা জেসুইট গির্জেয় প্রার্থনা সেরে তিনি যখন ফিরছিলেন তখন প্রবল বিস্ফোরণে উড়ে যায় তাঁর মোটরগাড়ি। সে বিস্ফোরণের এমনই জোর যে তাঁর গাড়ি ৫০ ফুট উঁচু গির্জের চুড়ো টপকে গিয়ে পড়েছিল তার পেছনের একটা বাড়ির তিন তলার বারান্দায়। ভাঙাচোরা গাড়ির ভেতর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যখন উদ্ধার করা হলো তখনও তিনি বেঁচে। কিন্তু হাসপাতালে যাবার তর সইল না—পথেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে। তাঁর গাড়ির ড্রাইভার আর বডিগার্ড সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে হত্যাকাণ্ড সেটা গোড়ায় চেপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন সরকার—বলেছিলেন রাস্তার গ্যাসের পাইপ ফেটে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। কিন্তু অমন আজগুবি গপ্প লোককে স্পেনের মতো স্বৈরতন্ত্রেও বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। কর্তারা শেষ পর্যন্ত পথে এলেন—ঘণ্টা কয়েক পরেই তাঁরা কবুল করলেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনায় মারা যাননি, তিনি খুন হয়েছেন। পরের দিন তাঁকে কবর দেওয়া হলো জাঁকজমক করে।

খুন যারা করেছে তারা ধুরন্ধর লোক। অনেক মাথা খাটিয়ে তারা উপায় বের করেছিল প্রধানমন্ত্রীকে খতম করবার। স্পেনের মতো দেশে সামনাসামনি গুলি করা কিংবা বোমা মারা অসম্ভব বললেই হয়, সে চেষ্টা তারা করেওনি। অনেক দিন ধরে তারা নজর রেখেছিল তাঁর চলাফেরার ওপর, দেখেছিল মাদ্রিদের সেরানো স্ট্রীটের জেসুইট গির্জেতে তিনি রোজ প্রার্থনা করে, সেখান থেকে ক্লাউদিও কোয়েলো স্ট্রীট ধরে ফিরে যান নিজের ডেরায়। ওই রাস্তায় একটা বাড়ির একেবারে নীচের তলার গোটা দুই ঘর তারা ভাড়া নিয়েছিল মাস দুই আগে। সেখান থেকে চুপি চুপি তারা রাস্তার মাঝ বরাবর মাটির নিচে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে সেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সাংঘাতিক প্লাস্টিক বোমা। দূরে আড়াল থেকে সে বোমা তারা ফাটিয়েছে বোতাম টিপে—[illegible] কাজ করতে হয়েছেই। দুজন লোকেরা নাকি শিল্পী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ঘর দুটো ভাড়া নিয়েছিল। পুলিশ যখন সে আস্তানায় হানা দিলে তারা তখন হাওয়া।

ব্যাপার দেখে তাক লেগে গেছে সবার দুনিয়ার। কারা ব্লাঙ্কোর হত্যাকারী সে ধাঁধার জবাব এখনও মেলেনি। জেনারেল ফ্রাঙ্কো লড়াই করছেন এই বলে যে, তিনি আর কিছু করতে পারুন আর নাই পারুন দেশে শান্তির বনিয়াদ পাকা করেছেন, এনেছেন স্থিতি। পাছে অশান্তির আভাস দেখা যায় তাই সে দেশে রাজনীতি করা বারণ, বারণ ট্রেড ইউনিয়ন করা। কিন্তু কড়া পাহারা এড়িয়ে রাজনীতিও চলছে—দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী দু দলেরই। চলছে শ্রমিক সংগঠন গড়ার কাজও। বেআইনী শ্রমিক সংগঠন চালাবার চক্রান্ত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন দেড় বছর আগে দশজন নেতা। যেদিন তাঁদের বিচার শুরু হয়েছিল সেদিনই সকালে খুন হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে। কেউ বলছেন খুন করেছে বাস্ক এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যদিও তাদের নেতারা অভিযোগটা অস্বীকার করেছেন। কারুর মতে এটা কম্যুনিস্টদের কীর্তি, কারুর মতে দক্ষিণপন্থী [illegible] ফ্যাসিবাদী ফালাঙ্গিস্টদের। তবে ফ্রাঙ্কোর চৌত্রিশ বছরের আমলে এই প্রথম রাজনৈতিক খুন হলো স্পেনে। গোটা ইউরোপেই ১৯৩৯ সালের পর কোনো বড় দরের নেতা আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাননি। সে বছর খুন হয়েছিলেন রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী কালিনেস্কু। মুখে না স্বীকার করলেও ঘাবড়ে গেছেন ফ্রাঙ্কো। প্রাণের বন্ধুর শেষকৃত্যের সময় তিনি গরহাজির ছিলেন বোধ হয় এই ভেবে, কী জানি কোনও অঘটন আবার না ঘটে যায়। তবে দশ দিন পরে তিনি বেছে নিয়েছেন কার্লোস নাভারোকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। মনে হচ্ছে গণতন্ত্রের ভেক ধরার ইচ্ছে তাঁর এই কাণ্ডের পরও যায়নি।

আমি দায়ী নই

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রাস্তার ঠিক ওপরে মুখ থুবড়ে মরে আছে একজন মানুষ ;
না, আমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী নই।
তাঁর বুকের কাছেই ছোট্ট একটা থালা,
থালায় একটুকরো অসমাপ্ত রুটি
মনে হয় মৃত্যুর আগেও সে খাচ্ছিল,
ওই ভিক্ষাক্ষুধ অম্লাংশে এখন এসে পড়েছে
ভোরের চকচকে সূর্য
—অনেকটা ছুরির মতো. অপলক হত্যার সৌন্দর্যে
আঁকা প্রকৃতির নিজস্ব একটি ছবি। কাছেই কয়েকটা কাক
কোথাও ডাকছে ডাকছে ডাকছে, কালো ওই সামান্য পাখিও
মানুষের আগে মৃত্যু টের পেয়ে শ্মশানকে সাবধান করছে।

দায়া, তুমি কার? যে থালায় তার, এবং যে খায়
খোরাক তারও! এই পরলোকগত শব.
দুটি ক্ষুধ হাতের অভাবে
শেষ নিশ্বাসের আগেও ছিনিয়ে নেয়নি কিছু : তাঁর পাশ দিয়ে
কতবার হেঁটে গেছে অস্বাদু মানুষ। ক্ষুধার প্রবল শব্দ
করতে করতে কোনদিন সে টেরই পায়নি কোনো প্রেমিকার
নরম সোনালী মাংস. শুধু শুনেছে অসংখ্য তৃপ্ত মানুষের
স্বর্গীয় উদ্গার। কেউ এখনো যেকোন একজন সম্পূর্ণ ভিক্ষুক
একবারও সঠিক বেঁচে না উঠেই. মরে গেছে ;
আকাশের কাক এখন বন্ধ দুটি চোখ
খাদ্য ভেবে হয়তো ঠোকরাবে!
আমি এই মৃত্যুর জন্য দায়ী নই : আমি তো আকাশ লিখি
লিখিনা মানুষ : আমি তো শিল্পের আঙ্করিক. আমি
শব্দকে ছন্দ করি. ছন্দকে শেখাই ভালবাসা ভালবাসাকে ছোটাই
শরীরের স্বাদু মুখে : কেননা প্রেমের কবিতা ছাড়া
কি কখনো কবিতা
হয়েছে? আমার তাই চোখে জল আসবে না
আমি নিজের ছায়ার ভয়ে আলো থেকে অন্ধকারে
দৌড়তে দৌড়তে বলবো এই মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই
দায়ী নই, জানো আমি দায়ী নই।

এই ভাবে

তুষার রায়

আমি খুব সুখী, কেননা দুটো আছে টানটান,
আমি লাল হয়ে উঠি লজ্জায়,
কেননা তারপরেই হয়ে যাবো সাদা।
এভাবেই লাল তারপরে সাদা. তারপরে
ব্যথায় নীল. অপমানে সবুজ,
আর হীনম্মন্যতায় কালো হতে হতে,
হঠাৎ অকস্মাৎ জ্বলে উঠবে ফিলামেন্ট,
তারপরেই লোড শেডিং অন্ধকার।

কালকে ছিলো সে. আমার ভালোবাসা.
সে চলে যেতে যা ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে,
যাসে যাসে ওই তো চরছে গাভী. দ্যাখো,
নীল কেমন লীন হয়ে যাচ্ছে আকাশে

ক্ষুধা

শামসুল আলম সাঈদ

বেহায়া ক্ষুধা প্রতি দিন কালের শরীর নিয়ে
আপোস যৌবনাক্রান্ত হাতে ফেলছে আমাকে,
ফেলছে হৃদয়ঘটিত নরম স্রোতের নদীতে
এক বিপরীত স্রোত-আরশি যেমন হামলাবাজ
আবোল তাবোল উত্তাপ দেওয়া উনুনে;

স্যাঁতসেঁতে হেঁশেলে অগভীর আলোকে এসে
পুরানো গৃহিণী তাই রাতের সম্ভার ঢাকা দেছে
এই ভোজ্য নিয়ে অবিশ্রাম জীবন শানাচ্ছে।

মৃত বন্ধুর জন্যে কয়েক লাইন

শান্তনু দাস

দেখো, একটা আকাশ গড়বো :
রক্তজবা কুসুমের মতো। যার
চাপ চাপ অন্ধকার বেয়ে—
নেমে আসবে—তামাটে শরীরে সেই মানুষের মতো এই মানুষেরা
মানুষ পেরিয়ে......
......আলপথে
সোনা রক্ত ঘামে চষা মাটি
মাখনের মতো ঘষে মুখে।
অথবা কি সুখে বলো
ভোরের ভাঁয়রো হবে লাঙলের গান।

তুমি বলেছিলে : বুকের আগুন হবে নদী :
হাপরের লাল আঁচে কলজেখানা সেঁকে
মইনুদ্দিন, কালু সাহা, মুমূর্ষু রমণী
বানাবে মারণ।
টুক টুক, ঠুক ঠুক ভেঙে যাবে মধ্যবিত্ত ঘুম,
রাত্রির সম্ভার শেষে দ্বিতীয় প্রহরে
জানলার ফোকর খুলে দেখে নেবে সব কিছু ঠিক আছে কি না,
দেখো হে. মনে রেখো. জেনো.
কালো আকাশেই হয় উল্কাপাত, ছুটে যায় ধূমকেতু কোনো
যুগে
যুগে।

সে আকাশ আজো আছে।
তোমার ছবির পাশে রেখেছি চন্দন, ধূপ,
জন্ম-রাতে কিনে আনি মালা।
আর
আমার টেবিলে থাকে রাত্রির ভর্জানি কিছু মদ,
ভালো লাগে কালকের বাসী স্বাদ
ভোরে,
জিভ দিয়ে চেটে নিই ঠোঁট.
মিয়ানো আখরোট দাঁতে কাটি।

তোমার মালার থেকে খসে পড়ে স্মৃতি ফুল
নিঃশব্দ সকালে ॥

এই আলোচনা-চক্রের অপর একটি আলোচ্য বিষয় ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি। রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন ডক্টর সিমহা ও অধ্যাপক অলক ঘোষ। আরও অনেকেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ডক্টর সিমহা ব্যাংক জাতীয়করণের পর মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির পরিবর্তন, ব্যাংকগুলির ঋণদান নীতির পরিবর্তন, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র-গুলিতে (Priority Sectors) কিভাবে ঋণ দেওয়া হচ্ছে ও সে ঋণ কতটা ঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। খোলাবাজারে সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় নীতি যে সফল হয়নি, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন। আমাদের দেশে ব্যাংক রেটের পরিবর্তন ও সিলেকটিভ ক্রেডিট কণ্ট্রোল বা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির উপর যে বেশি নির্ভর করা হচ্ছে তার উল্লেখ করে সব বক্তাই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সরকারের আয়-ব্যয় নীতির উপর। যে-হারে সরকার ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ বাড়িয়ে যাচ্ছেন তাতে রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি সফল হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ক্রিয়াকলাপ মূল্যায়ন করে অধ্যাপক অলক ঘোষ ব্যাংক-গুলির ঋণ-পরিকল্পনা বা Credit Planning-এর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সেমিনারে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার, বিশেষ করে Special Drawing Rights-এর নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। অধ্যাপক অলক ঘোষ ও ডক্টর সিমহা এই বিষয়ে আলোচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত সেনগুপ্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থ-ব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে, বিশেষ করে উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশ ও কমিউনিস্ট দেশগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেশের বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা। এই সমস্যার নানা দিক নিয়েও অনেকেই আলোচনা করেন। মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ যে অতিরিক্ত মুদ্রা-সরবরাহ, এ বিষয়ে সবাই একমত হয়ে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির হার আরও বাড়াবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উৎপাদন বাড়ানোই মুদ্রাস্ফীতির মুখ্য দাওয়াই—সব বক্তারই এটা ছিল প্রধান বক্তব্য।

এই আলোচনা-চক্রে আরও বহু বিষয় আলোচিত হয়—যেমন, উন্নয়ন ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপ ও ভারতের অভিজ্ঞতা, স্টক এক্সচেঞ্জের ক্রিয়াকলাপ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন, প্রভৃতি শিল্প প্রকল্পের মূল্যায়ণ ও খরচ-উপকার বিশ্লেষণ নীতি (cost-benifit analysis) নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য।

অ্যাডাম স্মিথের ২৫০তম জন্মবার্ষিকী

সম্প্রতি Socio Economic Forum-এর উদ্যোগে মৌলানা আজাদ কলেজে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথের ২৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল অ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা। আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর ভবতোষ দত্ত। বর্তমানের অর্থনৈতিক নীতি ও তত্ত্ব কতটা অ্যাডাম স্মিথের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, অথবা অ্যাডাম স্মিথের বিভিন্ন তত্ত্বের সমসাময়িক মূল্য কতটা আছে অধ্যাপক দত্ত সে বিষয়ে আলোচনা করেন। অ্যাডাম স্মিথের মতবাদের সঙ্গে আজকের দিনের মিশ্র-অর্থ-নীতির ধারণা কতটা সম্পর্কিত সে বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য। আলোচনা-চক্রের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। অধ্যাপক দত্ত অ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং অ্যাডাম স্মিথ যে সব সময়েই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন না, অথবা শুধু আইন ও শৃংখলা বজায় রাখা ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোন কাজ নেই—এ-জাতীয় ধারণা যে তিনি পোষণ করতেন না, অধ্যাপক দত্ত তারও উল্লেখ করেন। অধ্যাপক অলোক ভৌমিক অ্যাডাম স্মিথের জীবনীর উপর একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। Socio Economic Forum-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ-ধরনের আলোচনা-চক্র অ্যাডাম স্মিথের প্রতি অর্থশাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার একটি নিদর্শন।

সুব্রত গুপ্ত

সূর্যের বাচ্চারা সব

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য ওঠা দেখবে বলেই এই পাহাড়ী এলাকায় কয়েকটি পরিবার এসে জড় হচ্ছে। পরিবার মানে, বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ। তার মধ্যে যুবক-যুবতীর সংখ্যাই বেশী। প্রেমিক-প্রেমিকা।* মধ্য বয়েসী লোকজন আছে। শিশু বৃদ্ধও যে নেই এমন নয়। সদ্য বিয়ে-করা নবদম্পতি আছে। আছে কিছু টুরিস্টও।

সকলেই আসছে সূর্যোদয় দেখতে। অর্থাৎ ওই মূল কথা, সূর্যোদয় দেখবে বলেই আসা। অর্থাৎ সূর্যের জন্যেই। সূর্যের এক বিশেষ প্রকৃতি দর্শন করবে বলেই,—সূর্যের প্রত্যাশায়, দূরদূরান্ত থেকে পাহাড় পর্বত ঘেটে আসছে। সংকীর্ণ পথ। পাথরের ধুলো উড়িয়ে গাড়ির ধোঁয়া বের করতে করতে আসছে সকলে। আঁকা-বাঁকা এক টুকরো পাহাড়ী পথ। নির্জন। গাড়িগুলোও কানামাছি খেলার মত উঠে আসছে পাহাড়ের পথ ধরে। একদিকে বিশাল পাহাড়, আর অন্যদিকে ভয়ঙ্কর খাদ, দুটো দিক বাঁচানোর জন্যেই গাড়ির গতি কিছুটা টুইস্ট নাচের মত। টুইস্ট নাচ নাচতে নাচতেই গাড়িগুলো বেরিয়ে আসছে পথ বেয়ে।

পাহাড়ের গা চটিয়ে যে সরু সংকীর্ণ রাস্তাটুকু বের হয়েছে সেটা বেয়ে বেয়েই উঠে আসছে সূর্যপাগল লোকগুলো!

গোবিন্দ বলে, "সূর্যখেপা লোকজন এরা।" অক্ষয় বলে, "সূর্যের বাচ্চারা সব।"

অক্ষয়ের স্ত্রী রমলা বলে, "সূর্যের বাচ্চা তো সকলেই গো! মায় পোকামাকড় কীট-পতঙ্গ মানুষ গাছপালা সব।"

নির্মলের স্ত্রী সুমিত্রা ভ্রূকুটি করে বললো, "সূর্যের বাচ্চা বলতে আমরা অন্য জিনিস বুঝি।" বলেই বলল, "ছেলে বেলায় আমরা কালো মিশমিশে লোকজন দেখলে ঠাট্টা করে বলতাম—সূর্যের বাচ্চা যাচ্ছে।" কথা শেষ করেই সুমিত্রা হেসে উঠল।

সুমিত্রার কথায় অক্ষয় নির্মল গোবিন্দও একচোট হেসে নিল।

নির্মল অধ্যাপক লোক। সূর্যখেপা লোকজনের উদ্দেশে নির্মল বলে, "এরা হল শৌখিন সম্প্রদায়ের মানুষ। কেমন সুখী সুখী চাউনি দেখছেন না! আমাদের মত মধ্যবিত্ত নয়; রীতিমত অবস্থাপন্ন ঘরের লোকজন। দেখছেন না, ফ্লাস্ক, ওয়াটার বটল আর দামী ক্যামেরা সঙ্গে এনেছে।"

অক্ষয় বলে উঠল, "এটাই খুব ভুল বলালে নির্মল।" বলেই বলল, "মধ্যবিত্ত সমাজের লোকজন চিনতে গেলে এই জিনিসপত্র দেখেই চেনা যায়। অবস্থার বাইরে তাদের জিনিসপত্র।" একটু থেমে অক্ষয় বলল, "একগাদা ছেলেপুলে, অথচ একটা থালি আয়, আর ঘরে দেখ গাদাগুচ্ছের জিনিস-পত্র।" কথাটা বলেই অক্ষয় হেসে উঠল।

অক্ষয়ের কথায় সুমিত্রা রমলা সকলেই হেসে ফেলল।

সুমিত্রা বলে উঠল, "সত্যি, সামান্য একটা ক্যামেরা কি বাইনাকুলার কেনা তো নয়, মধ্যবিত্ত সমাজের লোকজন কি এ সবের জন্যে পিছপা হয়! জোর করেই এগুলো তারা কিনে ফ্যালে।"

সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজটাকে বিশ্লেষণ করছিল। নির্মল সুমিত্রার কথায় ঠিক হার স্বীকার করল না, বরং বলে উঠল, "তুমি যা-ই বল, আসলে এরা হল উচ্চমধ্যবিত্ত।" বলেই বলল, "দেখছ না—চেহারা, পোশাক, আদব কায়দা!" নির্মল উচ্চমধ্যবিত্ত কথাটায় জোর দিয়ে বলল, "এখানের হোটেলের খরচ-পত্রও নেহাত্ত কম নয়। আর সেই খরচপত্র করে এরা থাকছে কদিন।" নির্মল ওই সব পরিবারের সাচ্ছল্যের দিকটা তাকিয়ে বলল "টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, দামী হোল্ডল, স্যুটকেশ তারপর চাকর চাকরানী আয়া—একটা এলাহি ব্যাপার। কথায় কথায় ব্রান্ডি হুইস্কি খাচ্ছে, কেমন সুখী সুখী চেহারা, কবি কবি চোখে প্রকৃত দর্শন করছে। দেখছ না!"

"প্রকৃতি দর্শন!" বলেই গোবিন্দ বলে উঠল, "শুধুই প্রকৃতি দর্শন? প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিবাসী—অর্থাৎ ওই আদিবাসী, দুটো জিনিসকে সমানে দেখে যাচ্ছে বল।"

সকলে হেসে উঠতেই গোবিন্দ বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আদিবাসীদের সঙ্গে দহরম মহরম দেখছি তো!" একটু থেমে গোবিন্দ বলে উঠল, "তারপর কিছুদিন কাটিয়ে সূর্য দেখা শেষ করে চলে যাবে সূর্যখেপার দল।"

পাহাড়ের গা কেটে সরু একফালি পাথর খোঁড়া রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়েই সকলে গাড়ি ট্যাক্সিতে করে আসছে যাচ্ছে। যারা আসছে তারা সকলেই কি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন? না। মধ্যবিত্ত সমাজের লোকজনই বেশী আসছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত।

গোবিন্দ বলছিল, "ঠিকই, মধ্যবিত্ত ছাড়া এত বড় হুজুগে আর কে হবে।"

অক্ষয় খেপে গেল। বলল, "কি বলছ? মধ্যবিত্তরা হুজুগে! আমি বিশ্বাস করি না। বরং বলতে পারা যায় মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তরাই ভারতবর্ষের সম্পদ। যাবতীয় জ্ঞানী গুণীর আবির্ভাব হয় এদের ভিতর থেকেই।"

কদিন ধরেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়ি আসছে একটার পর একটা। সূর্য দেখার ঝক্কিটুকু পোয়াতে আসছে কায়ক্লেশে। আসছে, থাকছে, গাছ পাখি ফুল সব দেখে নিচ্ছে। তারপর ভোরে উঠেই ঔৎসুক্যের দৃষ্টি মেলে সূর্য ওঠাটুকু দেখছে। তারপর সেই সূর্য দেখার গল্পটুকু তাদের মুখ দিয়ে আবেগে খই ফোটার মত বেরোচ্ছে। 'ওফ কী দুর্দান্ত', 'অসাধারণ' এ সব বলতে বলতে মানুষগুলো বিদায় নিচ্ছে।

একদল যাচ্ছে, আবার আসছে একদল। সূর্যখেপার দল। পাহাড়ের কোল বেয়ে বেয়ে আসছে। কেননা, এটাই তো সূর্য দেখার মরশুম।

গোবিন্দর কথাবার্তাগুলো কেমন কাঠ-গোঁয়ারের মত। বলল, "সূর্যের চ্যালারা আসবে বলেই পাহাড়ের মাথায় হোটেল মালখানা রেস্টুরেণ্ট গজিয়ে উঠেছে দেখছ!"

গোবিন্দর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল একচোট। তারপর চোখ বাড়িয়ে দেখল এই সরকারী বাংলো অফিস, পি ডব্লু ডি বাংলো।

সত্যি পাহাড়টা বিশাল উঁচু। মানে এই পাহাড়ী পথটাই তো পঞ্চাশ মাইল। ওপর থেকে তলাকার দৃশ্য কিছুই দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায় তাও সামান্য। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র। পিঁপড়ের মত মানুষগুলো নীচে নড়ছে চড়ছে দেখা যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তাটুকু মানুষই খুঁড়ে নিয়েছে। একপাশে বিশাল পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণ, লতাগুল্মে ভরা। অন্য দিকে খাদ। অনেকখানি নীচে যেন আর এক পৃথিবী। পাহাড়ের ওপরে সূর্য দেখার এক আলাদা জগৎ।

এইমাত্র একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। আর অমনি গাড়ি থেকে নামল একগাদা সুখী সুখী মানুষ।

অক্ষয় একবার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে নেবার পর রমলাকে জিজ্ঞেস করল, "অনল উর্ণা দুজনে গেল কোথায়?"

(২)

গতকালই এসেছে অক্ষয়। সঙ্গে স্ত্রী রমলা, ছোট বোন উর্ণা। কলকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী উর্ণা। আর এসেছে অনল। অক্ষয়ের বন্ধুর ভাই। হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল অনল। ইন্টারভিউ দেবার পর কটা দিন অনল থেকে গেল অক্ষয়ের টা.খ্রিস্ট ক্লাবে। থেকে অক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল। রমলা অবশ্য একবার অক্ষয়ের ক্লাবকে ভ্রূকুটি করে বলেছিল—"চরকি ঘোরা ক্লাব।" অক্ষয় তাতে কিছু মনে করে নি। হো হো করে হেসেছিল শুধু।

অক্ষয়ের স্ত্রী, বোন, বন্ধুর ভাই ছাড়াও অনেকে এসেছে। নির্মল, সুমিত্রা, গোবিন্দ লতিকা। এরা সকলেই অক্ষয়ের বন্ধু বা বন্ধুপত্নী। সকলেই একসঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিল। এখানে পৌঁছানোর পর রাস্তায় বেরিয়ে কে কোথায় যে ছড়িয়ে পড়ল। অক্ষয় রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছুটা খোঁজাখুঁজি চালাল। দেখল, না—নির্মল সুমিত্রা গোবিন্দ লতিকা ওরা কাছে পিঠে কেউ নেই। অনল উর্ণাও অনেক আগে থেকে কোথা উধাও হয়েছে। এ পথে শুধু অক্ষয় আর রমলা পাশাপাশি হাঁটছে।

রমলা বলল, "সকলেই তো এক উদ্দেশ্য নিয়ে পথে বার হয় না। কে কী দেখতে এসেছে—সেটাই খুঁজছে এখন।"

অক্ষয় হেসে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এক যাত্রায় পৃথক ফল, কি বল!"

"ঠিক তাই।" বলে রমলা পাহাড়ী পথ ধরে অক্ষয়ের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

অনেকটা পথ হাঁটতে হবে ভেবে অক্ষয় একটা গল্প শুরু করবে কিনা ভাবল। সূর্য দেখার ব্যাপারেই একটা গল্প তার মনে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। রমলাকে একা পেয়ে অক্ষয় বলল, "ক'দিন পর পর সূর্য দেখতে না পেলে মনের কী অবস্থা হয় জান ত!" অক্ষয় এভাবে ভূমিকা করে ঘটনাটা শুরু করল। বলল, "ছেলেবেলার ঘটনা, তখন গ্রামে থাকি। মার্টিন ট্রেন ছাড়া অন্য কোন যান-বাহন ছিল না। গ্রামের বাড়িতে আমি আর মা থাকতাম। বাবা থাকতেন শহরে। মাসে তিন চার দিনের জন্যে বাবা বাড়ি আসতেন। সে সময় আমাদের বাড়ি তিয়াত্তর বছরের এক বৃদ্ধা এসেছিলেন। পিসিমার শাশুড়ী। আমরা 'শাশুড়ীমা' বলে ডাকতাম। বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই। একান্ত অথর্ব হয়ে পড়েছিল বলে আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল বুড়ি। তিনরাত্রি ছড়া টপ্পা গান করত। মাকে দিনরাত্রি জ্বালাতন করে মারত বুড়ি। ইয়ার্কি করত, ঠাট্টা করত কখনও। বুড়ি অনবরত বকবক করত বাড়িতে। বুড়ির কথা মায়ের কখনও ভাল লাগত, কখনও ভয়ানক বিরক্ত মনে হত মায়ের।" অক্ষয় বলল, "শেষের দিকটায় বুড়ির ভীমরতি হয়েছিল। চাঁদনী রাত দেখে বুড়ি তেল মাখতে বসত।" বলেই অক্ষয় হেসে উঠল। তারপর একটু থেমে বলল, "এদিকে গ্রামে বর্ষা নেমেছে। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। একনাগাড়ে চার দিন ধরে বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট-পুকুর সব জলে থইথই অবস্থা। একে মা মনসা তার ওপর আবার ধুনোর গন্ধ।" অক্ষয় বলল, "এমনিতে বুড়ি চান করে না, তাতে আবার বর্ষা নেমেছে। সুতরাং বুড়ির অবস্থা কাহিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকছে। না-চান করে জড়ভরত হয়ে বসে থাকছে বুড়ি।' অক্ষয় বলল, "এদিকে ক'দিন ধরে সূর্যদেবের পাত্তা নেই, সেই কবে থেকে যে অন্তর্ধান করেছে সূর্য। সারা দিন ধরে শুধু টপটপ ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। মানুষ কাকপক্ষী সব ভিজে ঠাণ্ডা। বুড়ি বসে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে আর মুখে কেবল সূর্যের স্তব পাঠ করছে। মাঝে মাঝে সূর্যদেবকে ডাকছে বুড়ি। তারপরই মাকে ডাকছে—বউ, কোথা গেলি গো! বউ!" অক্ষয় বলল, "মা-কে কাছে পেলেই বুড়ি বলছে—বউ এটা কর—বিষ্টি থামবে, ওটা কর—বিষ্টি থামবে।" অক্ষয় বলল, "বুড়ি সূর্যের স্বাদ পাবার জন্যে নানা রকম তুক গুণ দৈব চালিয়ে যাচ্ছে।" অক্ষয় বলল, "এক সময় মা-কে ডেকে বুড়িকে বলতে শুনলুম—ঈশান কোণে একলা মায়ের বেটীকে দিয়ে একটা পেতলা বাটি পুঁতে দে দিকিন; জল থেমে যাবে। আর কাঁহাতক এভাবে কেঁপে কেঁপে মরি।"

অক্ষয় একটু থেমে তারপর বলল, "বৃষ্টি তো একনাগাড়ে হয়েই চলেছে। এদিকে বুড়িও কেঁপে কেঁপে সারা হচ্ছে। একটুখানি সূর্যের দেখা পাওয়ার জন্যে বুড়ির সে কি আকুলিবিকুলি।" অক্ষয় বলল, "বাবা সেই রাত্রেই বাড়ি এল। জলকাদা বৃষ্টি মেখে বাড়ি ঢুকলো। তখন আমাদের ওদিকে মার্টিন ট্রেন চলত। মার্টিন ট্রেন চেপে বাবা এসেছে। এসেই খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছে মাত্র।" অক্ষয় বলল, "বাবা এসেছে আর সেই রাত্রেই বুড়ি মারা গেল। ওই বৃষ্টির রাত্রেই বুড়ি মারা গেল।" ঘটনার শেষটুকু বলে দিয়েই অক্ষয় শুরু করল, "রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ি উঠে এসেছে দেওয়াল ধরে ধরে। কম্বলমুড়ি দিয়ে এসে বাবাকে ডেকে বলছে—বড্ড জাড় পাচ্ছে বাবা, মরে গেনু আমি। একটু রোদ পোয়াবো নিয়ে চ'না।" ভাঙা ভাঙা গলায় বুড়ি বলে উঠল—"আমাকে একটু রোদ্দুরে বসিয়ে দেনা বাবা।"

অক্ষয় দরাজ গলা করে বলল, "বাবা করেছিলেন এক কাণ্ড। বুড়িকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দালানে বাসি করা থান কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে দুটো হ্যারিকেন জ্বেলে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বুড়ি বুঝতে পারেনি আসল সূর্য কিনা!" অক্ষয় বলল, যাই হোক, গায়ে উত্তাপ লাগার জন্যেই হোক কিংবা ঘোলাটে চোখে সাদাটে দেখতে পেয়েই বোধ হয় বুড়ি খুব আরাম করে রোদ পুইয়েছিল সে রাত্রে। ব্যাস, ওই রোদ

পোয়ানোই হল বুড়ির শেষ রোদ পোয়ানো।"

গল্প শেষ করে অক্ষয় রমলার দিকে তাকাল। যেন রমলা কি বলে সেটা শোনার অপেক্ষায়।

রমলা এ ঘটনাটা অক্ষয়ের কাছ থেকে আগেও শুনেছে। তবে এখন অনেক বিস্তৃত করেই শুনল। শোনার পর এখানের এই পাহাড়ী সূর্যের আলো গায়ে লাগিয়ে নিতে নিতে বলল, "আগেকার দিনের মানুষ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এখনকার মত অত বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের ধারত না।"

অক্ষয় হেসে বলল, "তা ঠিক। তবে এখনকার মানুষই কি সব বিজ্ঞান সচেতন? অনেক অনেক কুসংস্কারও জড়িয়ে আছে মানুষের মধ্যে।" অক্ষয় তারপর বলল, "মানুষ তো সংস্কারবদ্ধ জীব।"
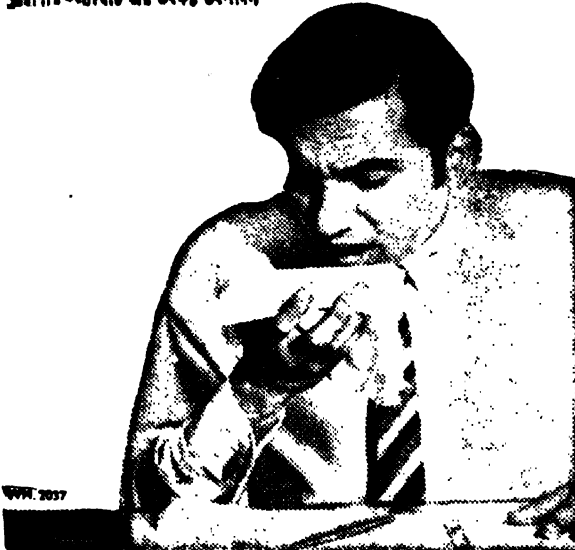
একটু থেমে অক্ষয় বলল, "বাবা ভয়ানক মানুষ ভালবাসতেন।"

গল্প করতে করতে ওরা দুজন অনেকটা এগিয়ে দল ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছিল। অক্ষয় জিজ্ঞেস করল, "অনল উর্ণা গেল কোথায়?"

(৩)

এখানে সূর্য ওঠার একটা নামডাক আছে, সূর্য ওঠার একটা মুহূর্ত রয়েছে বলেই এত কাণ্ড। সেই মজাটুকু দেখতেই এসেছে এত লোক। গোবিন্দ কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রাস্তায় হাঁটছিল।

এইমাত্র একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। অমনি গাড়ি থেকে নামল কিছু লোকজন। কয়েকটা যুবতী মেয়ে আজকালকার ঢং-এর ব্লাউজ শাড়ি পরে নামল। পেট খার করা বগল কাটা ব্লাউজ। শাড়ি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আঁট সাঁট করা। দুজন বিবাহিত মেয়ে এসেছে। দুজন যুবক মধ্যবয়েসী পুরুষ রমণী কজন আছে। স্ল্যাক আর বেলবটম পরা চার পাঁচটি যুবতী মেয়ে। মিনি স্কার্ট পরেও এসেছে দুচারটি যুবতী। সোয়েটার আলোয়ান, শীতের শাল কার্ডিগান এসবের ছড়াছড়ি। আহা, চুল তো নয়, যেন মাথার ওপর জড় করা বাবুই পাখির বাসা। কারো গায়ে জড়োয়ার গয়না, এ ছাড় কিছু নকল সোনা, কাচ পাথর বসানো হার, চন্দন কাঠের মালা পরেছে কেউ।

ঠিক গোবিন্দর কাছে এসেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা বেলবটম পরা মেয়ে পুরুষ ঘিরে ফেললে গোবিন্দকে। পুরুষগুলোর মাথায় গাজনের সন্ন্যাসীর মত চুল আর বোলতার চাকের মত এক জোড়া করে জুলফি। গোবিন্দ এদের দিকে তাকিয়ে কোনটা মেয়ে কোনটা পুরুষ বাছছিল। তারপর ভাবল, আহারে, সমাজের কিছু মূল্যবান মানুষই এরা বটে। সুখী মানুষ। এনারাই নাকি আমাদের দেশের যুবক। চেহারা পোশাকের ব্যাপার স্যাপারটাই আলাদা। মুখে সব সময় সাট্টা খেলার কথা। গোবিন্দর প্রায় আশ্চর্য হয়ে পড়ার কথা। কারণ গোবিন্দ যুবকদের একটি প্রতিভার কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। এনাদের মস্ত বড় গুণ হল খুব ভাল জুয়া খেলতে পারেন এনারা! গোবিন্দ মনে মনে হেসে উঠল—ওফ, মাইরী। বেলবটম পরা ইয়া লম্বা চুলের চমৎকার পৃথিবীটাই তৈরি করে রেখেছে পুরুষগুলোকে দেখে গোবিন্দর মনে হল —যেন আরব্য উপন্যাসের ডাকাত দল।

সব কিছু অসার মনে হওয়ার আগে গোবিন্দ ভাবল, তবু যাহোক তার বাচ্চাটি এতক্ষণে কান্নাকাটি ভুলেছে। বাচ্চাটা যে

রণে হোক কান্নাকাটি ভুল ওই অদ্ভুত চিত্র লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বশ্য বাচ্চাটা ভয়ানক কান্নাকাটি জুড়েছিল লই গোবিন্দ লাভিকার থেকে নিয়ে কান্না ালাতে ভোলাতে এসে পড়েছিল একদ্দূরে। িগ্যাস এসেছিল সে! ছেলের কান্নাও মল আর ছেলের বাবারও চক্ষুস্থির হয়ে ক্ষ সব দেখে শুনে।

গোবিন্দ ভাবল, সাক্ষাৎ সর্বখেপার দ। সেই দলটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে রাও করে ফেললে তাকে। বাইনাকুলার য়ে ওরা কিছুক্ষণ টানাহেঁচড়া কাড়াকাড়ি রল, কি সব আদিখ্যেতা দেখাল মেয়ে-রুষে মিলে। গোবিন্দর কাছে সব অসার ন হল। গোবিন্দ মনে মনে বলে উঠল—ী পৃথিবীটাই তৈরি করেছ মাইরী!

গোবিন্দ ওদের কাটিয়ে চলে যাবে ঠিক রেছে, এমন সময় যেন বেকায়দায় পড়ল। য়েগুলো ততক্ষণে হুল্লোড়বাজি শুরু রে দিয়েছে। গোবিন্দ মনে মনে গালাগাল রে উঠল, কিরে বাপু, ধাড়ি ধাড়ি মেয়ে, বয়ে দিলেই ছেলে হয়ে যাবে এমন বয়সেও —ছ্যা ছ্যা, একি ধিঙ্গিপনা! গোবিন্দ বলে ঠল—ধুত্তোরি, মোটা মোটা দামড়া নিয়ে এ বস্থায় মিনি স্কার্ট পরে সমানে পুরুষ-দের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে! গোবিন্দ ভুরু কোঁচকাল, 'আহা, মেয়ে তো নয়; যেন ফুটবলের হাফব্যাক!'

(৪)

নির্মল সুমিত্রা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে চলছে যুদ্ধের সময়কার কথাবার্তা। নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে, কথনও চলতে ফিরতে গিয়ে নির্মল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করছিল।

নির্মল বলল, "সেটা যুদ্ধের সময়। গোটা কলকাতায় তখন ঘোর অমানিশার রাত। অর্থাৎ ব্ল্যাক আউট চলছে। সব জায়গায় ব্যাফল ওয়াল হয়েছে। হাওড়া পুলের দু পাশে জালদেওয়া বড় বড় বেলুন উড়ছে। বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে এগুলো ওড়ানো হত। এদিক ওদিকে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। এ আর পি সেন্টার হয়েছে। মিলিটারি কনভয়, ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দ। বাড়ি বাড়ি কাচের শার্সি জানালায় ন্যাকড়া বা কাগজের পট্টি লাগানো হয়েছে। ঢ্যারা কাটা দাগ। বোমার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এ সব ব্যবস্থা।" নির্মল একটু কবিত্ব করে বলল, "ওই ঢ্যারাকাটা পট্টিগুলোকে দেখে কি মনে হত জান?" বলেই বলল, "যেন বলছে—না না না—যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ চাই না এমনি ভাব।"

সুমিত্রা নির্মলের কবিত্ব করা শুনে হেসে উঠল। নির্মল যথারীতি বলতে শুরু করেছে। বলল, "একবার বোমা পড়ার ভয়ে কলকাতা ফাঁকা হল, আর একবার সত্যি সত্যি কলকাতায় বোমা পড়ল সেজন্যে কলকাতা ফাঁকা।"

নির্মল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে একটু সময় নিল। তারপর বলতে শুরু করল। "তখন কলকাতা একদম ফাঁকা। দোকান পসার বন্ধ। সাইনবোর্ডগুলো ঝুলছে। আমাদের বাড়ির আশপাশের সব বাড়িতেই তখন তালা ঝোলানো। শুধু আমাদেরই পাড়াগাঁয় দিকে কোথাও যাবার জায়গা ছিল না বলে আমাদের কলকাতাতেই থাকতে হয়েছিল।" নির্মল বলল, "কলকাতায় থাকার ফলে বোমার ভয়টা সদা সর্বদা লেগেই ছিল।

এটুকু বলে নেবার পর এবার নির্মল এল আসল কথায়। বলল, "আমরা ক' ভাইবোন তখন খুব ছোট। দাদু আমাদের সব ভাইবোনকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। ইলেকট্রিকের পাট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাতে হ্যারিকেন জ্বালা হত। পাছে আলো রাস্তায় গিয়ে না পড়ে সেই ভয়ে দাদু টিমটিমে আলো জেলে নিয়ে তক্তপোশের তলায় ঢুকিয়ে আমাদের পড়াতেন। আমরাও ওই তক্তপোশের তলায় গুটিয়ে সুঁটিয়ে বসে পড়াশুনা করতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে-ছিলুম। টিমটিমে আলোয় তক্তপোশের তলায় ঢুকে পড়তাম, আর সাইরেন বাজলেই ছুটে উঠে গিয়ে কানে তুলো গুঁজে দিয়ে মেঝেয় উবুড় হতাম।" নির্মল বলল, "দাদুই আমাদের এসব শিখিয়ে দিয়েছিলেন—কানে তুলো গুঁজে মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কিভাবে চেপে ধরে শুতে হয়—সবই শিখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের। শোবার কায়দাটা দাদু শিখিয়ে দিয়েছিলেন।" নির্মল কায়দাটা দেখাল, "এভাবে থাকতে হত। অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজলে আবার হুড়মুড় করে উঠে আসতাম।"

নির্মল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের ঘটনা বলে যাবার পর বলল, "এভাবে একদিন

দুঃখ মিটল। কলকাতার লোকজন কলকাতায় ফিরে এল আবার! আলোর মুখের ঠুলি খুলে ফেলা হল। ঠুলি খোলার পর কলকাতা আবার আলোয় ঝকমকে হয়ে উঠল। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি হল জান?" বলে নির্মল বিষাদের গলা করে বলল, "দাদা মেজদা বড়দি—আমরা কেউই কিন্তু আলোর দিকে আর তাকাতে পারলুম না। সূর্যের আলো তো দূরের কথা, ইলেকট্রিকের আলোও সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ল আমাদের পক্ষে। দাদা মেজদা আমরা সকলেই চোখের কাছে হাত আড়াল করে পড়তাম। তাতেও দেখা যেত দু চোখের গোড়া দিয়ে দরদর জল গড়িয়ে পড়ত কেবল।" নির্মল বলল, "সব দেখে শুনে দাদু তো মহা চিন্তায় পড়লেন। মাঝে মাঝে বলতেন—তাইত, এদের সবার চোখগুলো কি খারাপ হয়ে গেল নাকি! ওফ আমি এদের কী সর্বনাশ-ই না করলাম।" নির্মল বলল, "শুনতে পেতাম দাদু দিনরাত আফশোস করে বলছেন—আহা, ভগবান এদের চোখগুলো আমিই খারাপ করে দিলাম। কম আলোয় পড়ে পড়েই ওদের চোখগুলো গেল।"

নির্মল বলল, "আমাদের বংশের ওই এক রোগ, ওই চোখের অসুখ আছে বলেই দাদু আরো বেশি করে চিন্তায় পড়লেন। শেষে আমাদের সকলকে নিয়েই ডাক্তারখানায় হাজির করলেন দাদু। তারপর গোটা ঘটনাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে লাগলেন।" নির্মল বলল, "ঘটনাটা বলার পরও দাদু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। শেষের দিকটায় দাদুর গলা ভেঙে গেল। কান্না কান্না গলায় দাদু বলে উঠলেন—ডাক্তারবাবু দেখবেন, এরা যেন চোখ ফিরে পায়। এরা শিশু, এঁরা তো কোন অন্যায় করেনি।"

নির্মল সিগারেট ফেলে দিল এবার। তারপর বলল, "ডাক্তারবাবু সব কিছু পরীক্ষা করে নেবার পর দাদুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—এরা সকলেই চোখ ফিরে পাবে। কিছু ভাববেন না। তবে ওদের সকলকে রোজ ভোরের আলো দেখাতে হবে। ভোরের নরম সূর্যের আলো হল চোখের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।"

নির্মল একটু থেমে বলে উঠল, "সে এক কেমন অদ্ভুত ঘটনা। ভোর হবার আগে থেকেই দাদু আমাদের সকলকে নিয়ে স্টেশনের দিকে বেরিয়ে যেতেন। আমরা সকলে দুড়দাড় করে ওভার ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে দাঁড়াতাম। সূর্য উঠত। ভোরের নরম সূর্যের আলো। তামার ছোট্ট থালার মত সূর্য। আর আমরাও সূর্যের আলো চোখে লাগিয়ে নিতাম। সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করতাম। আর সেই হাসাহাসি করতে করতে আমরা সূর্যের আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিতাম চোখে মুখে।"

(৫)

গোবিন্দ বাচ্চাকে কোলে করে হন হন করে হাঁটছিল। দূরে লতিকা দাঁড়িয়ে। লতিকার কাছ পর্যন্ত আসতে আসতে দু চারজনের কথোপকথন শুনতে পেল গোবিন্দ। সূর্যখেপা লোক। একজন বলে উঠল—"মুখুজ্জে, ভোরবেলায় আমাকে ডেকে সঙ্গে নিও ভাই। আমি আবার

রেলি রাইজ করতে পারি না।" সঙ্গে সঙ্গে মুখুজ্জে বললে—"আমি টাইমপিস রে শুচ্ছি। অ্যালার্ম দিয়ে রাখছি।" কথা লতে বলতে ওরা চলে গেল।

লতিকার কাছে এসে বাচ্চাকে লতিকার কোলে তুলে দিল গোবিন্দ। তারপর খালি য়ে মোরম মাড়িয়ে হাঁটছিল।

গোবিন্দ এবার খালি হাত হয়ে কথা বলছিল। বলল, "এই সূর্য দেখতে আসা মার উপনয়নের পর প্রথম সূর্য দেখা টোই যেমন অদ্ভুত তেমনি সুন্দর।" গাবিন্দ একটু থামল : "উপনয়নের তিদিন রাত্রে ঘর অন্ধকার করে বন্ধ হয়ে থাকতে হয়। সূর্যের আলো যেন ঘরে প্রবেশ না করে, এটাই নাকি নিয়ম। এ অবস্থায় সূর্যের মুখ দেখা বারণ।" গোবিন্দ বলল, "তিনদিন পর ভোরবেলা সূর্য দেখার জন্যে গেরুয়া পরা অবস্থায় মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে ভিক্ষেমা আমাকে নিয়ে গেল নদীতে চান করাতে। চানের পর আমাকে প্রথম সূর্য দর্শন করতে হবে।" গোবিন্দ বলল, "সে দিনটা আবার ছিল মেঘলা। আকাশে সূর্যদেবের দেখা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ সূর্য না দেখলে আমার ছাড়ান নেই। তা কি করব। আকাশ যেন ঝিমোচ্ছে। মুখ চুন পানা করে পড়ে আছে আকাশ।"

লতিকা জিজ্ঞেস করে উঠল, "কি হল? তোমার আর সূর্যের সঙ্গে মোলাকাত হল না?"

"না, হয়েছিল।" বলে গোবিন্দ বলে উঠল, "সবই হল। সূর্যও দেখা হল। তবে ওই এক ঝটকা। পাতলা মেঘ একটু-খানি সরে ফাঁক হয়ে যেতেই ঘ্যাচাঙ করে একবার দেখা হয়ে গেল। ভিক্ষেমা আর সবাই বলে উঠল, নিয়মরক্ষে। ব্যাস।"

গোবিন্দ কথা বন্ধ করে হাঁটছিল। লতিকা বলে উঠল, "সূর্য ছাড়া মানুষ জীবজন্তু কীটপতঙ্গ এক মুহূর্ত টিকে থাকতে পারত কি? সূর্যগ্রহণের সময় দ্যাখো না, ওইটুকু সময় সূর্য থাকে না বলে পৃথিবীময় জীবাণু ভর্তি হয়ে যায়!"

(৬)

অক্ষয় কিছুক্ষণের জন্যে রমলার কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। রমলা অন্য রাস্তায় লতিকার সঙ্গে যাচ্ছিল। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্যে অক্ষয় একেবারে একা।

অক্ষয়কে একা পেয়েই সেই আদিবাসী প্রৌঢ় লোকটা এগিয়ে এল। ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, "বাবুজী কি একা একা আইছেন, না-ফ্যামিলি সঙ্গে আছে?"

আদিবাসী প্রৌঢ়র মুখের দিকে তাকিয়ে অক্ষয় আশ্চর্য হয়ে গেল। তরপর জিজ্ঞেস করল, "কেন, কি ব্যাপার? একা থাকলে খুব ভাল হয় বুঝি?"

"জী হ্যাঁ, বাবু। একা একা থাকলে খুব ভাল হয়।" অক্ষয়ের কথায় প্রতিধ্বনি করেই প্রৌঢ় চাপা গলায় বলে উঠল, "ভাল জিনিস ছিল বাবু। কম বয়েস, টাইট ফিগার আছে বাবু। চলবে?"

অক্ষয়ের জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রৌঢ় বলে উঠল—"আপনার ঘরে পাঠিয়ে দেব রাত্তিরে? বাবু, রাত্তিরে পাঠাব?"

অক্ষয় এ কথার কোন জবাব দিল না। এ সবের সঙ্গে সূর্যের কোন সম্পর্ক আছে কি! ভাবতে ভাবতে অক্ষয় হাঁটতে লাগল। ঠিক রমলা যে পথে গিয়েছিল সেই পথ ধরে হাঁটতে লাগল অক্ষয়।

(৭)

অনল আর উর্ণা। ওরা অনেকক্ষণ দল ছাড়া। দলছুট হয়ে ওরা এখন পাহাড়ের একটা নির্জন জায়গায় বসে গল্প করছিল। নিচে ভয়াবহ খাদ। খাদের দিকে তাকিয়ে উর্ণা প্রথমেই আতকে উঠেছিল—"ওরে ব্বাস,এখন বুঝছি—আমরা কত উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি।" উর্ণা বলল, "এ-মা, দেখ—আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।"

অনল দেখল—সত্যি উর্ণার গায়ের লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে। তারপরেই সে খাদের দিকে তাকাল। নিচে—অনেক নিচে যেন আর এক পৃথিবী। কালো একরাশ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পৃথিবী। লোকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মত নড়াচড়া করছে সেখানে।

একটু পর উর্ণা ব্যস্ত হয়ে পড়ে বলল, "চল এবার উঠি। অনেকক্ষণ এসেছি আমরা। দাদা বউদি বোধ হয় খুঁজছে এখন।"

'হ্যাঁ, তাই চল। এবার ওঠা যাক।" বলে অনল উঠে পড়ল। দুজনে উঠে সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

অনল কিছুক্ষণ ধরে এদেশের শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে আলোচনা করছিল। জমি বণ্টন, উৎপাদন ও বণ্টন এ সব কথা বলে যাবার পর অনল লাফিয়ে একটা গাছের ডাল ভাঙল। তারপর এল ভিয়েৎনামের কথায়।

উর্ণা ইতিমধ্যে কিছু পাহাড়ী বুনো ফুল তুলে মাথায় খোঁপায় গুঁজে নিয়েছে। নিয়ে অনলের কথায় কান রেখে হাঁটছিল।

অনল বলল, "আমরা এখানে সূর্য ওঠা দেখতে এসেছি, অথচ ভাবতে পার একবার ভিয়েৎনামের কথা! ভিয়েৎনামের মানুষের কথা!" কথাটা এভাবে শুরু করে অনল বলল, "ভিয়েৎনামের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে পাঁচ-ছ বছর ধ'রে মাটির নিচে বসবাস করে আছে।" অনল বলল, "এমন অনেকে আছে যারা এখন পর্যন্ত সূর্যের আলো দ্যাখেনি।"

উর্ণা ঘাড় তুলে বলল, "সেই আদিম গুহা যুগ সৃষ্টি করেছে বল।"

"সৃষ্টি করেছে মানে—সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে।" বলে অনল বলল, "কারণ বোমা-বর্ষণ। ভিয়েৎনামের মাটির ওপরে চলছে প্রচন্ড বোমাবর্ষণ!" বলল, "ওই বোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই ওরা মাটির নিচে বছরে পর বছর বাচ্চাদের লুকিয়ে রেখেছে।"

উর্ণা কিছুটা ঔৎসুক্যের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল অনলের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "সূর্যের আলো ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি ক'রে বুঝি না! বছরের পর বছর সূর্যের আলো না পেলে মানুষ কি বাঁচে?"

অনল কিছুটা থামল। সত্যি, সূর্যের আলো ছাড়া কি ক'রে বেঁচে আছে? এ

প্রশ্নটা অনলের কাছেও সাংঘাতিক প্রশ্ন। অনল একটু থেমে কথাটার মর্ম উপলব্ধি করছিল—।

উর্ণা ঠিক এই জায়গা থেকেই আসল ঘটনাটা জানতে চাইছিল। বলল, "বুঝে দেখ, সূর্যের আলো নেই, অথচ শরীরটা টিকে থাকবে কি করে? একটা ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে ওরা বেঁচে থাকবে! ভাবতেই যেন কেমন লাগে!" বলেই উর্ণা বলল, "দেখ, আমার গায়ে আবার কাঁটা দিয়ে উঠেছে, দেখ। ওদের কথা ভেবেছি, আর অমনি।"

অনল আর উর্ণার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা সূর্যের বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করেছে।"

"ঠিক বলেছে। বিকল্প ব্যবস্থা না করলে থাকবে কি করে।" বলেই উর্ণা হাসি মুখ করে বলল, "তুমি ইঞ্জিনিয়ার বলেই কথাটা বলতে পারলে তবু।'

অনল বলল, "ইঞ্জিনিয়ারের কি আছে, একথা যে কেউ ভাবতে পারে।" বলে একটু থেমে বলল, "বিশ্বের সবচেয়ে পাজী বোম্বেটে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীরা ভিয়েৎ-নামের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে, প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে।" এটুকু বলে অনল বলল, "এই নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচবার ব্যবস্থাও ভিয়েৎনামীরা নিশ্চয়ই করেছে, আমরা সে-সব ইতিহাস পরে জানব। ওদের জীবনযাত্রা প্রণালী আমাদের আশ্চর্য করে দেবে একদিন। ওরা একদিন মাটির গহ্বর থেকে বেরিয়ে সূর্যোদয় দেখবে।"

(৮)

ওরা তিনজন এখন জড় হয়ে গেছে। এদিক ওদিক থেকে এসে মিলছে। গোবিন্দ লতিকা আর রমলা। তিনজন হাঁটতে হাঁটতে এখন তাদের গোটা দলটকে খুঁজছিল। গোবিন্দ বলে উঠল, "আরে, অক্ষয়দা কোথায় কেটে পড়ল?"

রমলাকে ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ বলল, "নাহ্ বউদি, দেখছি আপনি আর অক্ষয়দাকে ধরে রাখতে পারলেন না।"

রমলও হেসে উত্তর দিল, "কি করব বলুন, আমরা তো আর দেবী নই যে যখন তখন রূপ বদলে ফেলে স্বামীর মন জয় করব!"

গোবিন্দ কিছু বলার আগেই লতিকা চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা, সেই লোকটা গো!" কথাটা বলে লতিকা আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর রমলও দেখল লোকটাকে। বলল, "হ্যাঁ গো, সেই বিশ্রী লোকটাই তো যাচ্ছে!" গোবিন্দ অমনি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সেই সূর্য-মামা লোকটিই তো।"

লতিকা বলল, "কি জানি বাপু, লোকটাকে দেখলেই আমার বড় ভয় করে। কাল রাত্তিরে হোটেলে এসে কি কাণ্ডটাই না করলে!"

রমলা বললে, "একগাদা মেয়ে নিয়ে লোকটা যেন মই-মাডেন করছে। লোকটার সূর্য দেখাকে বলিহারি যাই।"

এখন সকলেই লোকটাকে দেখল। গত-কাল দুপুরে ওই সূর্যমামা লোকটা এখানে এসেছে। সঙ্গে একগাদা হিপিনি মেয়ে। সূর্যমামা নামটি গোবিন্দর দেওয়া। গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, "সঙ্গে একগাদা হিপিনি মেয়ে কেন? সূর্য দেখবে জানি, কিন্তু এতগুলো মেয়ে নিয়ে কি হবে" লোকটার মাথায় কাঁচাপাকা চুল। জুলফির দু-পাশ একদম সাদা।

গতকালের ঘটনা। সূর্যাস্ত দেখার পর সকলে যখন সন্ধ্যায় হোটেলে জড় হয়েছে তখনই লোকটা এসে হাজির হল। মদ খাওয়া চেহারা। স্লিপিং গাউন পরে মুখের সামনে এসে দু-হাত প্রসারিত করে বলল, "ডু ইউ ওয়ান্ট টু এনজয় আদিবাসী ড্যান্স?"

গোবিন্দ অক্ষয় নির্মল হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। গোবিন্দ আহত গলায় বলে উঠেছিল, "কি রে বাবা, এত মেয়েতেও হল না সূর্যমামার! আবার আদিবাসী দরকার?" নির্মল বলে উঠেছিল "আদিবাসীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছে শালা!"

অক্ষয় ঠাট্টা করার গলায় বলল, "লোকটা পাঁজী এনেছে কি জিজ্ঞেস করুন তো! কাল কটায় সূর্যোদয় হচ্ছে দেখব!"

লোকটাকে আচমকা এই হোটেল বাড়িতে দেখতে পেয়ে সকলের মনের মধ্যে ভয় আতঙ্ক হাসি ঠাট্টা সব মিলিয়ে কেমন এক অদ্ভুত অবস্থা তৈরি হয়েছিল। রমলা বলে উঠেছিল, "মিনসেটা যা শুরু করেছে, শেষে আমাদেরও না নাচতে বলে।" সুমিত্রা আস্তে গলায় রমলাকে বলেছিল, "সত্যি, লোকটা যদি আমাদের সব দেখতে চায় এখন!" বলেই তিনজনে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।

খাওয়ার টেবিল থেকে সকলেই এক সময় উঠে পড়ল। উঠে বাইরে কনকনে ঠাণ্ডায় মুখ ঢেকে নিয়ে হাঁটছিল। শুধু নির্মলের গলা শুনতে পাচ্ছিল সকলে। নির্মল বলছিল "সত্যি, পৃথিবীর একটা বয়েস হচ্ছে সভ্যতারও তো বাড়িয়ে যাবার সময় হল।' এটুকু বলে নেবার পর নির্মল বলেছিল "এই সব লোকের কি বয়েস হচ্ছে না অক্ষয়দা!"

ওরা তিনজন। গোবিন্দ লতিকা আর রমলা। তিনজন অন্য রাস্তা ধরল।

আর আন্দিতা ঘোরার সংগে সংগেই ওরা দেখতে পেল অক্ষয় এদিকে আসছে। হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে অক্ষয়।

(৯)

অনল বলল, "সভ্যতা আর শান্তি, দুটো কথা শুনতে শুনতে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে আমাদের।" বলল, "ভিয়েৎনামে শান্তি আসবে! কিসের শান্তি! কে শান্তি আনবে? তা হলে এতদিন ধরে নিশ্চয় অশান্তির আগুন জেলেছিল। অদ্ভুত ব্যাপার!" অনল ধিক্কার জানিয়ে বলল, ভিয়েৎনামের জনগণ তাদের দেশে থাকতে পারবে না? তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতন চলবে! কেন? সভ্যতার কত বয়েস হয়েছে? অনল একটু থামল। থেমে বলল, "ভিয়েৎনামের জনগণ এখনও অন্ধকারেই আছে। ওরা এখনও সূর্যোদয় দেখল না।"

উর্ণা জিজ্ঞেস করল, "ভিয়েৎনামের মাটির নিচে থাকা ছেলেমেয়েরা সূর্য দেখতে চায় না?"

অনল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "ছেলে-পুলের জাত, বায়না ধরে না আবার!" বলেই বলল, "বাচ্চারা যখন বায়না ধরে, তাদের মা-বাপকে বায়না ধরে বলে—আমাদের সূর্য দেখাবে চল। তখন তাদের বাপ-মা কি বলে জান?" অনল বলল, "ওদের বাপ-মা ছেলে-দের বোঝায়—মাটির ওপরে এখন যেও না, ওখানে বোমা পড়ছে।" তারপর বলে "দিন আসুক, আমরা সকলে একসঙ্গে সূর্যোদয় দেখব।"

উর্ণা ভিয়েৎনামের কথায় কেমন উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার বলল, "ভিয়েৎনামের জনগণ একটা সূর্য দেখতে চাইছে—ওদের সঙ্গে আমাদের ওই সূর্য দেখার অনেক অনেক তফাত।" উর্ণা উৎফুল্ল হয়ে বলল "ওরা সূর্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।"

অনল বলল, "ঠিক বলেছ।" বলেই চুপ-চাপ কিছুটা হাঁটতে লাগল।

একটু পর উর্ণা ব্যস্ত হয়ে বলল, "সূর্যাস্তের সময় হল। চল তাড়াতাড়ি। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

অনল রেগে গিয়ে বলল, "থাম। কিসের সূর্য দেখবে! রোজ দু বেলা সূর্য ওঠা আর সূর্যাস্ত দেখছি। তাতে কি এল গেল।"

কথাটা বলে অনল দুঃখের মত মুখ করে হাঁটতে লাগল।

(১০)

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, "স্বপ্নের কথাটা কি বলছিলে? কি একটা স্বপ্ন দেখেছ নাকি?"

নির্মল সিগারেট ধরাচ্ছিল। ধরিয়ে নেবার পর বলল, "স্বপ্নটা খুব অদ্ভুত!" বলে নির্মল স্বপ্নের ব্যাপারটা বলার জন্যে একটু সময় নিল। তারপর বলল, "কল-কাতায় সেদিন কি একটা আন্দোলনের ব্যাপার। মিছিলে মিছিলে কলকাতার পথ ঘাট অন্য মূর্তি নিয়েছে। সারা কলকাতায় শুধু বিক্ষোভ আর চিৎকার। গ্রাম গ্রামান্তরের লোক এসে জমা হয়েছে।" থামল নির্মল; বলল, "কত লোকসংখ্যা হয়েছিল তা বোধহয় বলতে পারব না। কী সব চেহারা যে দেখেছি তা ভাবতে গেলে এখনও শরীরে উত্তেজনা আসে।"

এটুকু বলে নেবার পর নির্মল বলল, "স্বপ্নের সঙ্গে অবশ্য মিছিল বা আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই।" বলেই বলল, "মিছিল পার হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে শুয়েছি। সেই রাত্রেই স্বপ্নটা দেখলুম।"

নির্মল বলল, "যেন সূর্যকে একান্ত করে পাবার জন্যে কোটি কোটি মানুষ বিশাল পৃথিবীটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে!"

সুমিত্রা ঘাড় তুলে জিজ্ঞেস করল, "কি বললে? পৃথিবীটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে!"

নির্মল স্বপ্নটাকে পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছিল। বলল, "সূর্যটা স্থির হয়ে আছে। শুধু ঝড়ের মত একটা প্রচণ্ড শব্দ গোটা স্বপ্ন জুড়ে। শব্দ করতে করতে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীটাকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে।"

সুমিত্রা উত্তেজনা বোধ করে বলল, "খুব চমৎকার স্বপ্নটা। বলিষ্ঠ স্বপ্ন।"

নির্মল বলল, "চমৎকার স্বপ্ন, তাই না!" বলেই বলল, "অন্ধকার থেকে আমাকেও পৃথিবীটাকে ঠেলতে হয়েছে। না ঠেলে পারলুম না। গোটা স্বপ্ন জুড়ে সারাক্ষণ আমি শরীরে টাটানি যন্ত্রণা ভোগ করেছি।" নির্মল বলল, "পৃথিবীকে ঠেলায় একটা কষ্ট আছে তো!" কথাটা বলে নির্মল একটু হাসল। তারপর সেই হাসি আর উত্তেজনা নিয়ে বাকি পথ হাঁটতে লাগল।

নির্মল এবার গলা ছড়িয়ে বলল, "অত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। অথচ স্বপ্নটা ভাঙবার পর কিছুই নেই, আমার সারা শরীর ধনুকের মত টান টান হয়ে গিয়েছিল।" আবার বলল, "তারপর থেকে কথাটা অনেককেই বলেছি। যত বলছি ততই উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে।"

কথা শেষ করে নির্মল কিছুটা পথ চুপ চাপ হেঁটে গেল।

সুমিত্রা বলল, "ওই দেখ, উর্ণা অনল। আবার বলল, "তারপর থেকে কথাটা বলবে?"

নির্মল আর সুমিত্রাকে কিছু না বলেই সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকল-"অনল—তোমরা এস শিগগির! একটা সাংঘাতিক গল্প শোনাব।"

নির্মল চিৎকার করল। পাহাড়ের গায়ে নির্মলের কথার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

উর্ণা অনল দূরে থেকে হাত নাড়ছে। নির্মল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওরা প্রায় ছুটতে ছুটতেই এগিয়ে আসছে নির্মলের দিকে। নির্মলের মুখের গোড়ায় সূর্য। সূর্যাস্ত দেখার লোকজনের ভিড়ের মধ্যেই নির্মল দেখল—অক্ষয় রমলা গোবিন্দ লতিকার দলটা এসে জড় হয়ে গেছে। এবার অনল উর্ণাও এসে গেল।

এক নজরেই ভালো লেগে গেল সুভাষচন্দ্রের। তবুও এদিক-ওদিক থেকে আর একবার দেখে নিলেন মূর্তিটি। তারপর প্রশংস দৃষ্টিতে ভাস্করের দিকে চেয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন, এটিই আমি নিয়ে যাবো। খুশি হয়েছি আপনার ভাস্কর্য দেখে।

পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র নিজে। অধিবেশন মণ্ডপের প্রবেশপথে স্থাপিত হবে পরলোকগত চিত্তরঞ্জনের এক স্মৃতি-বেদী। সুভাষচন্দ্রের খুব ইচ্ছে সেই স্মৃতি-বেদীতে দেশবন্ধুর এক মূর্তি থাকবে। দেশবন্ধুর মানসপুত্র তাই নিজেই খুঁজতে বেরিয়েছেন চিত্তরঞ্জনের মূর্তি। দেখলেন কয়েকটি, কিন্তু পছন্দ হলো না একটিও। এমন সময় শুনলেন প্রমথ মল্লিকের কথা। তাই এসে হাজির হয়েছেন প্রমথনাথের বাড়িতে।

সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে দেশবন্ধুর সেই আবক্ষ মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অধিবেশন মণ্ডপের দেশবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভে। প্রমথনাথের পাওয়া অগণিত পুরস্কার আর মানপত্রের মধ্যে দেশবন্ধুর সেমূর্তিটি ১৯২৮ খৃস্টাব্দের এক স্মরণীয় মুহূর্তের নীরব সাক্ষী হয়ে এখনও বর্তমান।

কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীর প্রচলন বহু দিনের। সেবারের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণও করেছিলেন প্রমথনাথ। তাঁর ছোট বড় তেরটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে দেখে বাংলা-লোভন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান লেবার রিভিয়ু'-এর সম্পাদক আর্নেস্ট কার্ক তুলেছিলেন কয়েকটি ফোটো। গুণগ্রাহী কার্ক এক ইতালীয় কলারসিকের মতামত জানার জন্যে তাঁকে দেখিয়েছিলেন ফোটোগুলি। প্রথম দর্শনেই ইতালীয় রসিক বলেছিলেন যে, ভাস্কর্যগুলি নিঃসন্দেহে কোন ইউরোপীয় ভাস্করের কাজের নমুনা। প্রত্যুত্তরে, পরের সংখ্যায়, ইণ্ডিয়ান লেবার রিভিয়ু-এর প্রচ্ছদে প্রমথনাথের 'সোল অব দি সয়েল' ভাস্কর্যটির ছবি মুদ্রিত করে ইতালীয় ভদ্রলোকের প্রতীতির অবসান ঘটিয়েছিলেন আর্নেস্ট কার্ক।

বিশ্বের তাবৎ দেশের ললিতকলা চর্চার ইতিহাসে এক অদ্ভুত পারম্পর্য আছে। সেটি হচ্ছে ভাস্করদের তুলনায় সব দেশে, সব যুগে চিত্রশিল্পীর সংখ্যা অধিক। এ আদর্শের ইতর বিশেষ বঙ্গদেশেও হয়নি। বঙ্গদেশেও ভাস্করেরা চিরকালই সংখ্যালঘু। হাতে গুণে বলা যায় এদেশে কয়জন ভাস্কর ছিলেন বা আছেন।

আধুনিক যুগের ভাস্কর্যকলায় যে বঙ্গসন্তান পথিকৃতের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন তিনি ঢাকার বারদী গ্রামের রোহিণী-কান্ত নাগ। ধ্রুপদী ভাস্কর্যের আকর্ষণে উনিশ শতকে রোমে তাঁর ভাস্কর্য চর্চা। যক্ষ্মার নিষ্ঠুর আক্রমণে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁকে পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করতে হয়। কর্মজীবনের সীমিত বৃত্তে ইউরোপে তাঁর যে ভাস্কর্য রচনা তা বোধ হয় কোনো-দিনই এদেশে এসে পৌঁছয়নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কবিপুত্র অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রোহিণীর ভাস্কর্য ফিরিয়ে আনতে

ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিক (প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গৃহীত আলোকচিত্র)

চেয়েছিলেন।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অর্ধশতক তাঁর শিল্পসৃষ্টি এদেশে এসে পৌঁছেছিল কী না তার সংবাদ দুর্লভ।

রোহিণীকান্তের পরে বিদেশে পা বাড়িয়ে যে দ্বিতীয় বাঙালী বিখ্যাত হন ছিলেন তিনি বিক্রমপুরের বহর গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ বসু। জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি এবং সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র ফণীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য শিক্ষা এডিনবরায়। রোদাঁ-র সান্নিধ্যে আসা ফণীন্দ্রনাথ 'রয়্যাল স্কটিশ অ্যাকাডেমির অ্যাসোসিয়েট হয়েছিলেন'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের পিবলস শহরে তাঁর পরলোকগমন ঘটে।

ফণীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে তৃতীয় যে বঙ্গসন্তান ভাস্কর্য রচনায় তৎকালীন সমাজে কিঞ্চিৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি ময়মনসিংহের নোয়াপাড়া গ্রামের কৃষ্ণকমল বর্মণ রায়ের পুত্র অশ্বিনীকুমার বর্মণ। স্যার উইলিয়াম রোটেনস্টিনের বন্ধু অশ্বিনীকুমারও তাঁর দুই পূর্বগামীর মত ইউরোপকেই করেছিলেন কর্মক্ষেত্র। ইংল্যান্ড প্রবাসী অশ্বিনীকুমারের ভাস্কর্য চর্চার যে সামান্য বিবরণ এদেশে পৌঁছেছিল তা থেকেই অনুমান করা যায় যে, তিনিও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন ভাস্কর্যকলায়। ইউরোপ থেকে সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষে পরিবেশন করেছেন ভাস্কর্যকলা সম্পর্কিত নানা রচনা। স্যার উইলিয়াম রোটেনস্টিনের চিত্রকলার সঙ্গে বাঙালী পাঠকসমাজের তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন বাংলা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে। প্রথমে ব্রাডফোর্ড, পরে লণ্ডনে তাঁর বসবাস। সম্ভবত, তাঁরও ফেরা হয়নি ভারতবর্ষে।

প্রমথনাথের অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য 'দুম ঘণ্টের'

বাঙালীর ভাস্কর্য চর্চার চতুর্থ প্রতিনিধি স্বনামধন্য হিরন্ময় রায়চৌধুরীর ইউরোপ যাত্রা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। লণ্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অব আর্ট'-এ এডোয়ার্ড ল্যানটেরির অধীনে শিক্ষা সমাপ্তির পর রয়্যাল কলেজের 'অ্যাসোসিয়েট' হয়ে দেশে ফিরেছিলেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। তিনিই 'রয়াল কলেজ অব আর্ট'-এর প্রথম ভারতীয় 'অ্যাসোসিয়েট' (এ আর সি এ)। বাংলার বাইরে, বিশেষত উত্তর প্রদেশেই, তাঁর ভাস্কর্যের নিদর্শন সহজলভ্য। কারণ, প্রথমে জয়পুরের মহারাজার আর্ট স্কুলে এবং পরে লখনৌর সরকারী আর্ট স্কুলে কেটেছে তাঁর শিক্ষাব্রতীর জীবন।

এঁদের পরে যাঁর নাম অনায়াসে করা যায়, তিনি প্রমথ মল্লিক। প্রমথ মল্লিকের সঙ্গে অবশ্য আরও একটি নামের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। একই যুগে ভাস্কর্যকলাকে অবলম্বন করে দেবীপ্রসাদ ও প্রমথনাথের আত্মপ্রকাশ হলেও অভিজ্ঞতা ও বয়সে প্রমথনাথ অগ্রজ। বয়সে পাঁচ বছরের জ্যেষ্ঠ প্রমথ মল্লিকের ক্রমপর্যায় স্বভাবতই দেবীপ্রসাদের আগে। তবে বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও খ্যাতির পরিধি দেবীপ্রসাদের যতটা বিস্তৃত, ততটা প্রমথনাথের নয়। রোহিণীকান্ত থেকে হিরন্ময় এই চার পুরুষের তিনি ব্যতিক্রমও বটে। কারণ, তাঁর পূর্বগামীদের সকলেরই ভাস্কর্য অনুশীলন বিদেশে। প্রমথনাথের উত্তরণের ইতিহাস কিন্তু স্বদেশেই।

১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৮৯৪) কলকাতার এক প্রাচীন পরিবারে তাঁর জন্ম পিতা যতীন্দ্রনাথ, মাতা মনোরমা দেবী। ছেলেবেলায় যেমন সকলের ছবি আঁকার ঝোঁক থাকে, তেমনি তাঁরও ছিল। স্কটিশ চার্চ স্কুলে পড়ার সঙ্গে চলত চারুকলার অনুশীলন। শেষে চারুকলার আকর্ষণে ভর্তি হয়ে গেলেন জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা ই বি হ্যাভেলের বিদ্রোহী ছাত্র রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্ত সরকারী আর্ট স্কুল ছেড়ে গড়ে তুলেছিলেন জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি। কুইন ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলির বছর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে স্কুলের নামের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল 'জুবিলি' কথাটি বৈঠকখানা রোডের এই আর্ট অ্যাকাডেমিতেই এক সময় ছাত্র ছিলেন ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু। বিগত যুগের বিশিষ্ট শিল্পী নরেন্দ্রনাথ সরকারেরও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা এখানে। সরকারী আর্ট স্কুল ছেড়ে আর এক বিদ্রোহী ছাত্র, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারও এসেছিলেন বৈঠকখানার এই বাড়িতে। প্রতিভাধর প্রতিকৃতি-শিল্পী অতুল বসুরও চিত্রবিদ্যার হাতে-খড়ি জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। শিল্পী অভয়চরণ দাসরায়, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকারও কোনো না কোনো সময়ে এখানেই ছাত্র ছিলেন।

চিত্রাঙ্কনের চেয়ে মূর্তি গড়ায় আসক্তি দেখে প্রমথনাথকে রণদাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন মডেলিং ক্লাসে। সেখানে তিনি নিজেই শেখান কী করে গড়তে হয় মাটির মূর্তি। ক্রমশ প্লাস্টারের ছাঁচ তোলাও করায়ত্ত হলো জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। নিয়মিত চার বছর যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন বন্ধ করে দিলেন স্কুলে যাওয়া-আসা। তখন বাড়িতে বসেই মূর্তি গড়েন আর মূর্তি ভাঙেন। এমন সময় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি

এক হ্যারিংটনের মুখচ্ছবি (ব্রোঞ্জ)। ভাস্কর্যটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত আছে

অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিলেন দুটি প্ল্যাস্টার রিলিফ। গুণগ্রাহী অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে যায় নাম-না-জানা ভাস্করের সে-কাজ দুটি। অবনীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখে একদিন এক ভদ্রলোক নিয়ে এসে হাজির করলেন তরুণ ভাস্করকে দাদা-ভাইয়ের কাছে। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল প্রমথনাথের অন্তরের কথা। 'শেখা শেষ হয়নি, আরো শিখতে চাই। মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছি একই জায়গায়'। হৃদয়বান গগনেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন প্রমথনাথের অন্তর্জ্বালা। অতএব অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে গেলেন তাঁকে বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকারের বাড়িতে। কারমারকার তখন কলকাতার বাসিন্দা। গগনেন্দ্রনাথের অনুরোধে সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে। প্রায় সমবয়সী গুরু পেয়ে প্রমথনাথও খুশী।

মহারাষ্ট্রের প্রথিতযশা ভাস্কর বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকারের (১৮৯১—১৯৬৭) কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় কেটেছে কলকাতায়। সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে তাঁর কলকাতা আগমন (১৯১৪) এবং সুরেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ। এই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি ছেড়ে পরে ঝাউতলা রোডে তাঁর বসবাস শুরু। সে সময়ে বহু বাঙালী বিশিষ্টজনের প্রতিমূর্তি তিনি রচনা করেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ডঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাধাচরণ পাল (কৃষ্ণদাস পালের পুত্র), অবনীন্দ্রনাথ এবং শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূর্তিগুলি কারমারকারের কলকাতা বসবাসকালেই রচিত হয়।

বছর দুয়েক কারমারকারের কাছে প্রমথনাথের ভাস্কর্য অনুশীলন। আগে পাথর খোদাই জানতেন না—শিখেছিলেন তাঁর কাছে। ইতিমধ্যে লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ভাস্কর্য সম্পর্কে আধুনিকতম শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কারমারকারের ইউরোপ যাত্রা (১৯২০)। তিন বছর পর পুনরায় যখন তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তন তখন প্রমথনাথের আবার যাওয়া-আসা শুরু তাঁর কাছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারে তাঁর বেশি দিন থাকা হলো না কলকাতায়। কোলহাপুরের মহারাজার আমন্ত্রণ এবং পুনার অশ্বারোহী শিবাজীর ব্রোঞ্জ মূর্তি রচনার জন্য তাঁর বোম্বাই প্রত্যাবর্তন। কারমারকার শিবাজীর মূর্তি রচনার প্রধান সহকারী হিসেবে প্রমথনাথকে বোম্বাই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রমথনাথ এক কথায় রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রকে বোম্বাই যাবার অনুমতি দিলেন না স্নেহান্ধ পিতা। ফলে বহির্জগতের বৃহত্তর পরিবেশের অভিজ্ঞতা লাভ তাঁর আর হলো না। তার থেকেও তাঁর বড় ক্ষতি হলো, ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। কারমারকার পুনার যে অশ্বারূঢ় শিবাজীর মূর্তি রচনার ভার পেয়েছিলেন তা ব্রোঞ্জের চৌদ্দ ফুট উঁচু মূর্তি। ইংল্যান্ড যাবার আগে কারমারকার প্রধানত মার্বেল এবং প্ল্যাস্টারের মাধ্যমেই রচনা করতেন তাঁর ভাস্কর্য। রয়্যাল অ্যাকাডেমি থেকে ব্রোঞ্জ ঢালাই শিখে আসার পর তাঁর উল্লেখযোগ্য ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য শিবাজীর মূর্তি। প্রমথনাথের আশা ছিল গুরুর সহকারীরূপে শিবাজীর মূর্তি রচনাকালে প্রতিটি অধ্যায়ের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, নিজের হাতে বড় কাজে সাহায্যের সুযোগও তাঁর হবে। কিন্তু পিতার নির্দেশে সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে নিজের অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সম্বল করেই তাঁর মানস-সিদ্ধির সংগ্রাম। প্রমথনাথের ভাস্কর্য চর্চার সে-অধ্যায় সমকালীন শিল্পী ও ভাস্করদের অজ্ঞাত হলেও পঞ্চাশোর্ধ্ব যে কোনো বিদগ্ধের স্মৃতিতে তিনি এখনও অম্লান। তাঁর ভাস্কর্যের প্রধান মাধ্যম প্ল্যাস্টার এবং প্ল্যাস্টারের মাধ্যমেই রচনা করেন নানা প্রতিকৃতি ও মনঃকল্পিত ভাস্কর্য। তাঁর প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যের উল্লেখ্য নিদর্শন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ ও মনোরমা দেবী। রিলিফ ভাস্কর্যেও তাঁর প্রগাঢ় পারদর্শিতা ছিল। রিলিফের মাধ্যমে কৃষ্ণদাস পাল, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি তাঁর নৈপুণ্যের মনোজ্ঞ স্বাক্ষর। সহপাঠী শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একাধিক চিত্রও তিনি ভাস্কর্যে রূপায়িত করেন।

আক্ষরিক অর্থে ভারতের প্রায় সব বিশিষ্ট প্রদর্শনীতেই তাঁর অংশ গ্রহণ এবং বহু পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র লাভ। কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট এবং সোসাইটি অব ফাইন আর্টসের

প্রমথনাথের একটি প্রতিকৃতি-ভাস্কর্য

প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর ভাস্কর্যকলার স্বীকৃতির যে সূচনা, তার পুনরাবৃত্তি বোম্বাই, সিমলা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব ফাইন আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে। তাঁর 'সান অব দি সয়েল' মাদ্রাজ ফাইন আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয় (১৯২৯)। ঐ বছরেই বাঙ্গালোরের 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস'-এর প্রতিযোগিতায় তাঁর শৃঙ্খলিত নারীমূর্তি 'ইন বণ্ডেজ' (অপর নাম 'ইয়রস ইন ক্যাপটিভিটি') নিয়ে আসে শ্রেষ্ঠ সম্মান। একই ভাবে পাঞ্জাব ফাইন আর্ট সোসাইটি, সিমলা ফাইন আর্ট সোসাইটি, বোম্বে আর্ট সোসাইটি এবং অন্ধ্র সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ান আর্ট (কোকোনদ) প্রদর্শনীতে তাঁর হিজ রিওয়ার্ড, এ পোজ, ডেথ ইন লাইফ, দি ম্যাসন, দি বোটম্যান এবং আরও কয়েকটি প্রতিকৃতি, স্টাডি ও রিলিফ অর্থ, পদক ও ফলকে সম্মানিত হয়। কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রতিষ্ঠার পর সেখানেও তাঁর ভাস্কর্য একাধিকবার পুরস্কৃত হয়।

প্রমথনাথের ভাস্কর্যের গুণগ্রাহী ছিলেন পার্সি ব্রাউন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রমথনাথের একাধিক মূর্তি ও রিলিফ রচনা। সরকারী আর্ট স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পার্সি ব্রাউন তখন

২—১১৬, ভূপেন খাখার-এর নিওরিয়ালিস্টিক টাইগার অন দি ব্রিজ, চমৎকার পরিকল্পনা ও ড্রয়িং বৈচিত্র্যের জন্য তি সি জন্মান্তর কম্পোজিশন ৬—১৭২ ও কম্পোজিশন রীতি ও কারুকার্যের জন্য কে পি ইথাম্বিন্তরনের '৫'-র নাম করা যায়। মধ্যকার গ্যালারীতে বহু অর্থাত্তিক, ছত্র-সুলভ নিদর্শন দেখা যায়—অধিকাংশই প্রতিকৃতি বা নিসর্গ দৃশ্য। এখানে সুকুমার দাসের হাকিক দি কার্স, হাকিক দি ক্রুয়েলটি (১০০) প্রথমেই সকলের চোখে পড়ে। বিদেশী প্রভাব থাকলেও এটির নতুনত্ব অনেকের ভাল লাগবে। অমল বেরার এন্ড অব ডিউটি (৩৪) বর্তিমূর্শে স্টাডি হিসাবে মন্দ লাগেনি। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে মানব বড়ুয়ার ডাক ল্যান্ড-

প্রশান্ত রায় (১৯০৭-১৯৭৩)

স্কেপ (২২) ও ২৩, ১৯১, ২৩০ ও ৩২৩নং নিদর্শনের উল্লেখ করা চলে।

দক্ষিণ দিকের নতুন গ্যালারীতে প্রধানত ভারতীয় রীতির নিদর্শন দেখা যায়। এখানে সর্বপ্রথম রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুসু (১৩) সকলের চোখে পড়ে। আদিবাসীদের প্রথাগত দেবী টুসুর পূজা উপলক্ষে কয়েকজন পূজার উপকরণ মাথায় নিয়ে ভোরবেলা একত্রে চলেছে। লোকচিত্র জাতীয় সরল রেখাভিত্তিক কয়েকটি মূর্তির অবতারণা ও অতি চাপা হলুদ ও ইন্দিগো-প্রধান সিঁদুরে রঙ ব্যবহার করে শিল্পী এটিতে চমৎকার রসসৃষ্টি করেছেন। এটি সম্পূর্ণ আধুনিকধর্মী—এটিকে এই গ্যালারীতে কেন রাখা হল বুঝি না। এর পরেই চোখে পড়ে এন চন্দ্রশেখর রাওয়ের লর্ড জগন্নাথ (২৭৩)—বর্ণপ্রধান ছবিটির মোটিফ ও কারুকার্যপ্রধান কম্পোজিশন লক্ষণীয়। বঙ্কিম ব্যানার্জির ভিলেজ-এ (১৭) সম্পূর্ণ দিশারীয় প্রভাব দেখা যায়। ফণিভূষণের গড অব পলিটিকস (২৩৬) কম্পোজিশন হিসাবে উল্লেখ্য যদিও বিদেশী প্রভাব ধরা পড়ে। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে ২১৫ ও ২৬২র নাম করা চলে। প্রিন্টের মধ্যে নির্মলেন্দু দাসের মাইসেলফ-ইন্টারন্যাশনাল নং ৩৩ (১৬) লিথোগ্রাফ নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ্য। আকার সৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে শান্তনু ভট্টাচার্যের উড-কাট (৪৬) অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে হরেন দাসের এচিং নিদর্শন গ্র্যাজুয়েল স্টেপস (১৫) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রকাশভঙ্গিমা ও বর্ণবৈচিত্র্যের দিক থেকে নন্দদুলাল কপূরের টুইচ বর্ড সোল (১৮৯) প্রশংসা দাবী করে। ভাস্কর্য বিভাগেও বিশেষ উল্লেখ্য নিদর্শন চোখে পড়েনি। অধিকাংশই প্রথাগত রীতিতে রচিত—

সাবলীল আকারের জন্য আলা মুকুন্দের মেডন উইথ পিচার (৮), আধুনিক কম্পোজিশন হিসাবে সাধন চ্যাটার্জির মুভমেন্ট ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড (৭২), সাবলীল দেহসৌষ্ঠবের জন্য অলোক সর্দারের উওম্যান ফিগার (২৯৭) ও প্রতিকৃতি হিসাবে জীবেন্দু ঘোষের পোর্ট্রেট-এর (১৫৬) নাম করা যায়।

*

গত সংখ্যায় প্রকাশিত চারুকলামেলা প্রসঙ্গে আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে। স্থানাভাবে গত সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখ্য বিষয়ে লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। এবারের মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল মেদিনীপুর ও কালীঘাটের পটচিত্র। মেদিনীপুরের সুপরিচিত হরেন্দ্রনাথ চিত্রকরের বহু পটচিত্র মেলায় দেখা হয় ও তিনি স্বয়ং পটচিত্র অঙ্কন পদ্ধতিও দেখান। তা ছাড়া বঙ্গীয় চিত্রকর উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে কালীঘাটের পটচিত্র নমুনাও দেখা যায়। শুধু তাই নয়, মেলায় কয়েকটি পটচিত্র বিক্রীও হয়।

পরলোকে শিল্পী প্রশান্ত রায়

শিল্পী প্রশান্ত রায় গত ২৯ ডিসেম্বর কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬। ১৩ বছর বয়সে প্রশান্ত রায় শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও ১৬ বছর বয়স থেকেই তিনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা শুরু করেন। সুদীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ শিক্ষাকালে তিনি গগনেন্দ্রনাথের সংস্পর্শেও আসেন। ১৯৫২ সালে তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনের কিউরেটর হিসাবে যোগদান করেন। শিল্পী হিসাবে প্রশান্ত রায় ছিলেন একেবারে প্রচারবিমুখ। সকলের অলক্ষ্যে আপনার মনে ছবি এঁকেই তিনি খুশী থাকতেন—প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৯৫১-৫২ সালে দিল্লীতে তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এবং পরে অপরের প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে গোয়ালিয়র ও লখনৌতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯৫৫ সালে প্রদর্শনী হয় বোম্বাইয়ে। দু বছর আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনী দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। প্রশান্ত রায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাধারার শেষ প্রতিভূরও বিলোপ ঘটল। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সরল ও অমায়িক। বিড়লা অ্যাকাডেমি ও অন্যান্য সংগ্রহশালায় তাঁর কয়েকটি শিল্পনিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

চিত্রপ্রিয়

॥ ছাব্বিশ ॥
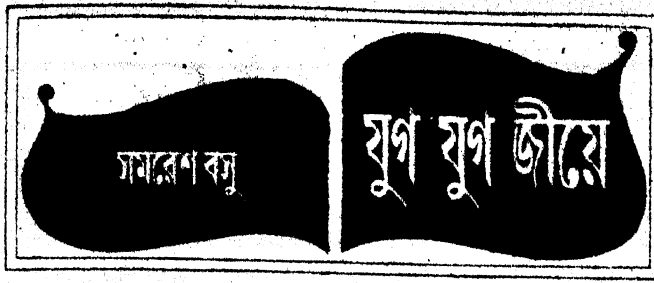
জ্ঞাতি সম্পর্কের কাকা জ্যাঠাদের দুজন এখনো ছিলেন। বাবা, মাকে চা জল খাবার দিতে বলে, তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন, কাকা জ্যাঠারাও সে-ঘরে গিয়েছিলেন। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, বাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। রাখাল বলেছিল, 'চল ত্রিদিবেশ, আমরা বাইরের ঘরে যাই।' শিউলী লক্ষ্য করেছিল, মা রুষ্ট বিরক্ত চোখে একবার মেজদা আর ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন কিন্তু তিনি বাবার কথা শুনতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। শিউলীদের সামনে দিয়ে যাবার সময় ত্রিদিবেশ ওদের দিকে তাকিয়েছিল, কোনো কথা বলেনি। মেজদা আর ও দুজনেই মুখ টিপে টিপে হাসছিল. ওদের হাসিতে কেমন একটা সঙ্কোচ আর অপরাধের ছাপ। শেফা বলেছিল, চল, ত্রিদিবেশদের কাছে শুনি, ব্যাপার কী হলো।'

সেই মুহূর্তেই মা ডেকে বলেছিলেন, 'শিউলি, উনোনটা খালি যাচ্ছে, তুই চায়ের জলটা বসা, আমি যাচ্ছি।'

খুব স্বাভাবিক আর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। শিউলী বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোরা যা, আমি আসছি।'

রান্নাঘরে গিয়ে নিজেকে কেবল পরিত্যক্ত বন্দিনী মনে হয়নি। কৌতূহলের তীব্রতা বর্ণনার কথা, ওর চোখ ছলছলিয়ে তুলেছিল এবং একটা তীব্র অভিমান বোধেও মন ভরে উঠেছিল, ত্রিদিবেশ ওর দিকে ভালো করে তাকায়নি, শেফা আর নমিতার দিকেই তাকিয়েছিল। কেটলিতে কাপে মেপে মেপে জল ঢালতে গিয়ে, গুনতে গিয়ে মনে মনে বলেছিল, বাবা, জ্যাঠা দাদা কাকা, এবং তার পরের কাপে জল গড়িয়ে কেটলিতে ঢালতে গিয়ে চলকে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। শেষতম কাপের জল ছিল ত্রিদিবেশের। শিউলী এক পলকের জন্য থমকে গিয়েছিল, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ঘাড় কাত করে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, ও চা করছে জেনে ত্রিদিবেশ যদি না খেতে চায়? বড়রা ছাড়া, ছোটদের মধ্যে একমাত্র ত্রিদিবেশই চা খায় এবং তা ওদের বাড়িতে নিষিদ্ধ না। তারপরেই ও পুরো এক কাপ জল ঢেলে, তাড়াতাড়ি উনোনে চাপিয়ে দিয়েছিল। ত্রিদিবেশ জানছে কী করে, কে চা তৈরি করছে—একথা ভেবেছিল, এবং আরো ভেবেছিল, বৌদি চা দিয়ে আসবে।

শিউলী চায়ের জল চাপিয়ে, দালানে গিয়ে, বাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাবা তখন বলছিলেন, 'বড়বাবু লোকটা খুব খারাপ না। ব্যাপার সবই বুঝতে পেরেছে। তবু রাখাল আর ত্রিদিবেশকে ধমক-ধামক করছে। বাড়ি থেকে ডেকে মেরেছে কী না, জিজ্ঞেস করাতে, ত্রিদিবেশটা ফস করে বলে দিল মেরেছি। লোক আর কাকে বলে। দারোগা যখন ধমকে জিজ্ঞেস করলো, কেন মেরেছো? ও বললো, ওরা আমাকে সবাই মিলে মেরেছে। দারোগা জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে সবাই মিলে মেরেছে, কেউ সাক্ষী আছে? ত্রিদিবেশ একবারে থেকে হরিহর দাস, মেয়েদের নাম, হেডমিস্ট্রেসের কথা, সব বলছে। হেড-মিস্ট্রেসের নাম করতে, আর সব ঘটনা বলাতে দারোগা, বেশ নরম হয়ে গেছে। আমি তো অশ্বিনী মোক্তারকে সঙ্গে নিয়েই গেছলাম, সে আমাকে বললো, ভালোই বলছে। দারোগা ভেবে চিন্তেই ওদের বলেছিল, মামলা মোকদ্দমা না করে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিতে। ওরা রাজী হয়নি, তবে সুবিধে যে করতে পারবে না, ওদের মুখ দেখেই বোঝা গেছে. সব ক'টা ছোটলোক।'

সেই সময়েই জ্যাঠামশাইয়ের গলা শোনা গিয়েছিল, 'মোদ্দা তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কী? মামলা হবে?'

বাবার স্বর শোনা গিয়েছিল, 'তা হবে। ফৌজদারি মামলা তো হবেই, তবে আসামীরা জুভেনাইল, প্রেসিডিঅর বোধ হয় অন্য রকম হবে। জানি না, অশ্বিনীই কী সব বলছিল। সে তো বলছে, ওই সব ছেলে-দের গার্জেনদেরও অপরাধের সঙ্গে জড়াবে।'

কাকার স্বর শোনা গিয়েছিল, 'রাখাল-দের বেল পাওয়ার জামিন কে হলো, অশ্বিনী মোক্তার?'

বাবার স্বর, 'না না, আমিই জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছি, দুজনকেই। ত্রিদিবেশের বাড়ি থেকে তো কেউ-ই যায়নি দেখলাম। আশ্চর্য ব্যাপার।'

'আশ্চর্যের ব্যাপার কিছু নয়।' জ্যাঠা-মশাইয়ের গলা, 'শুনেছি ছেলেটা নাকি লেখাপড়া করে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বখাটে। ওসব ছেলের জন্য বাড়ির লোকের মাথাব্যথা থাকে না।'

শিউলী উৎকর্ণ হয়েছিল জ্যাঠা-মশাইয়ের কথার জবাবে, বাবা বা আর কেউ কিছু বলেন কী না। বাবার গলাই শোনা গিয়েছিল, প্রতিবাদ না, অনেকটা সহানু-ভূতির সুরে, 'যা-ই হোক নিজেদের ছেলে বলে তো একটা কথা আছে। এমন না যে ছেলে রোজগার করে, পকেটে পয়সা কড়ি আছে, উকীল ডেকে নিজের বেল করাবে। আমি বেল না করালে তো ওকে হাজতে পুরে দিতো। তাতে তো আর বাড়ির সম্মান বাড়তো না। যাই হোক, ছেলেমানুষ তো।'

শিউলী বাবার প্রতিটি কথা শুনছিল, আর কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠেছিল, বাবাকে ঠিক ছোটদের মতো আদর করতে ইচ্ছে করছিল, ও নিজে ওর শিশু বয়সে বাবাকে যেমন আদর করতো। জ্যাঠামশাই আর কী বলছিলেন, সে-কথা শোনবার আগেই, মায়ের দৃষ্টি পড়েছিল ওর ওপর. জিজ্ঞেস করছিলেন, 'চায়ের জল বসিয়েছিস?' শিউলী ঘাড় কাত করে জানিয়েছিল, বসিয়েছে, এবং তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। তার আগেই মা বলে-ছিলেন, 'তোর ইস্কুল যাওয়া আছে তো। যা, চান টান করে নে, আমার রান্না হয়ে গেছে। তোর মেজদাকে বল, এখন খেয়ে এখন ইস্কুলে যেতে হবে।'

মা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলেন। বাবা তখন অশ্বিনী মোক্তারের বিষয়ে কিছু বল-ছিলেন; সে বিষয়ে শিউলীর তেমন কৌতূহল ছিল না, কারণ অনেক কথা ওর বোধগম্য ছিল না, কেবল একটা কথা বুঝতে পেরেছিল, থানা থেকে মেজদা আর ত্রিদিবেশকে ছেড়ে দিলেও ওদের নামে এখন মামলা চলবে। শিউলী ওদের বাইরের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়েছিল, শুনে-ছিল, শেফা নমিতা মেজদা ত্রিদিবেশ এবং বৌদিও, সবাই এক সঙ্গে গলা ছেড়ে হাসছে এবং পলকের মধ্যেই মেজদার গলা শোনা গিয়েছিল, 'এই, আস্তে! বাবার মেজাজ কিন্তু গরম হয়ে আছে। আমাদের হাসতে শুনলে ক্ষেপে আসবে।'

ঘরের হাসি থেমে যাওয়া মুহূর্তের নীরবতার মধ্যেই শিউলী ডেকেছিল, 'বৌদি, শুনে যা।' তারপরেই বলেছিল, 'মেজদা, মা তোকে চান করতে যেতে বললো, ইস্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে।'

ধরেছিল, এবং আশ্চর্য, দুর্জয় রাগের মধ্যেও একটা কষ্ট বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠেছিল, ও প্রায় ছুটে বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

স্নান করে, ইস্কুলে পৌঁছুনো পর্যন্ত, শিউলীর একটি কথাই বারে বারে মনে হয়েছিল, অথচ, যেহেতু ত্রিদিবেশ ঘরের মধ্যে একলা বসে থাবে, দেখতে কেমন খারাপ দেখায়, অতএব ইস্কুলের তাড়া থাকলেও ওর থাকা উচিত। ইস্কুলের পথে বন্ধুরা ওর জন্য গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। একটু দেরি হওয়ায় মধুদির গাড়ি ওরা দেখতে পায়নি, কিন্তু অবাক হয়েছিল নবনারায়ণের গলির মোড়ের বটতলায়, একজন পুলিসের সেপাই বগলে লাঠি নিয়ে হাতে খৈনি ডলছিল। মেয়েরা সবাই তা নিয়ে কথা বলাবলি এবং হাসাহাসি করছিল, এবং একটি মেয়ে বলে উঠেছিল, 'ছুঁচোগুলো আজ কোথায় গেল রে?' আশ্চর্য! নবনারায়ণ দাসের গলিটা এত নিরালা নিঝুম ছিল, যেন কার্ফিউ দিয়েছে। সেপাইটি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে, গোঁফের ফাঁকে মিটিমিটি হেসেছিল। শৈবাল একবার বলেছিল, 'ফুলি, তুই কিন্তু সেই থেকে একটা কথাও বলছিস না, হাসছিস না। কী হয়েছে, সত্যি বল না।'

'কিছু হয়নি।' গম্ভীর মুখে কথাটা বলার দরুনই বোঝা গিয়েছিল, কিছু হয়েছে।

শৈবাল অভিমানের সুরে বলেছিল, 'আচ্ছা দেখবো, পরে না বলে কেমন করে থাকিস।'

শৈবাল মিথ্যা বলেনি, একেবারে সব কথা নিজের মধ্যে গোপন করে রাখা শিউলীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওরা ইস্কুলে ঢোকবার মুখেই ওয়ার্নিং বেল বেজেছিল এবং ক্লাসে গিয়ে বসার পরে ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা বাজতেই মধুদির ঝি এসে শিউলীকে বলেছিল, 'তোমাকে হেড দিদিমণি ডেকেছেন।'

সকলেই অবাক কৌতূহলিত চোখে শিউলীর দিকে তাকিয়েছিল। সাধারণত মধুদির ঘরে কোনো মেয়েকে ডেকে পাঠানোর অর্থই হচ্ছে গুরুতর অন্যায় কিছু ঘটেছে। মধুদির ঘরে ডাক পড়া মানেই বুক কেঁপে যাওয়া। মধুদির ঘর থেকে কোনো মেয়েই শুকনো চোখে ফিরে আসে না, যতো উঁচু ক্লাসের মেয়েই হোক। ভুরু কুঁচকে উঠেছিল পলকের জন্য এবং নিমেষের মধ্যেই একটা আত্মজিজ্ঞাসা নিজের ভিতরটা পরিক্রমা করেছিল। কোনো অপরাধের চিন্তাই ওর মধ্যে ছিল না। ও মধুদির ঘরে গিয়েছিল।

মধুদি একজন টিচার গায়ত্রীদির সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওঁর মুখে হাসি ছিল। ওঁর স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন মিষ্টি সুরেই ডেকেছিলেন, 'শোনো শিউলী, এদিকে এসো।'

শিউলী কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমার দাদা আর ত্রিদিবেশকে নাকি আজ পুলিস আরেস্ট করে নিয়ে গেছলো? তুমি যা যা জানো আমাকে সব বলো।'

বলেই গায়ত্রীর দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'আপনি ক্লাসে যাচ্ছেন তো? ক্লাস এইট-এর এ-সেকশনের টিচারকে একটু বলে দেবেন, শিউলী পাঁচ সাত মিনিট বাদে যাচ্ছে।'

গায়ত্রীদি ঘাড় কাত করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শিউলী গতকাল রাত্রে রাখাল আর ত্রিদিবেশের মুখে যা শুনেছিল এবং আজ সকালে যা ঘটেছে, বাবার মুখে থেকে যা শুনেছে সবই বলেছিল। মধুদি শিউলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনেছিলেন এবং শিউলীর কথা শেষ হলে হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত ছেলে! সকলের মারধরের জবাবটা সইতে পারেনি। অতোটা সাহস না করাই ভালো ছিল, ওরা দল বেঁধে ওকে ভীষণ মারধোর করতে পারতো।'

মধুদির স্বরের মধ্যে স্নেহ যেন টলটল করছিল, যা শিউলীর মনকে বিরূপ করে তুলছিল। মধুদি আবার বলেছিলেন, 'সেইসব ছেলেদের অভিভাবকরাও অদ্ভুত লোক তো! কোথায় ছেলেদের শাসন করবে, তা না করে পুলিসকে জানিয়েছে? জেনেই রয়েছে, ব্যাপারটার গুরুত্ব বেড়ে গেছে।'

বলেই ঠোঁটে হাসি অথচ ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ, ত্রিদিবেশের বাড়ি থেকে থানায় কেউ যায়নি। আর মোহনকে কী বলেছে? এখন মধুদি বাঁচাক?'

মধুদি শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই বাঁচাবো। আমার হাতে যতোটা ক্ষমতা আছে, তা দিয়ে যতোটা বাঁচানো যায় বাঁচাবো। ওদের বাড়ির লোকেরা খুব গোঁড়া নাকি?'

মধুদি শিউলীর দিকে তাকিয়েছিলেন। শিউলী বিরূপ মন নিয়ে বলেছিল, 'ত্রিদিবেশ তো ইস্কুলে যায় না, পড়াশুনো করে না, ওকে সবাই বখাটে বলে।'

'সে সব আমি জানি, অনেকবার শুনেছি।' মধুদি বলে উঠেছিলেন 'ত্রিদিবেশ খুব পণ্ডিত বাড়ির ছেলে না শুনেছি।'

শিউলী আবার বলেছিল, 'ত্রিদিবেশ সিগারেট খায়, আমিও দেখেছি।'

মধুদি এক পলকের জন্য শিউলীর চোখের দিকে দেখেছিলেন এবং তারপরে হেসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। তোমার দেখছি ত্রিদিবেশের ওপর খুব রাগ। ও তো তোমার মেজদার বন্ধু।'

শিউলী বলেছিল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমার মেজদা সিগারেট খায় না।'

'বাহ্‌, এ তো ভালো কথা। ত্রিদিবেশের বন্ধু, তবু সিগারেট খায় না।' মধুদি খুশির স্বরে বলেছিলেন, এবং তারপরে একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, 'ত্রিদিবেশ ছেলেটা একটু ভিন্ন ধরনের। সব দিক থেকেই অকালে পেকে গেছে— পেকে যাওয়াই বা কী করে বলবো, এমনিতে ও অনেক কিছুই খুব সহজে বোঝে। আর্ট ইস্কুলের ই বি হ্যাভেলের বই দিয়েছি ওকে, সেটা বানান করে করে পড়ে। ওকে সুন্দর কোথাও না শিখেও, মানুষের শরীরের অ্যানাটমি সুন্দর জানে। সিগারেট-টিগারেট খাওয়ার মতো বাজে ব্যাপারগুলো যে কোথা থেকে শিখলো! এমনিতে তো ভারি মিষ্টি ছেলে, ভদ্র বিনীত। কোথাও নিশ্চয়ই একটা গোলমাল আছে, আর আমার মনে হয়, গোলমালটা ওর ফ্যামিলিতেই আছে। ওকে বোধ হয় ভালবাসবার মতো কেউ নেই, না?'

মধুদি আবার শিউলীর দিকে তাকিয়েছিলেন। শিউলীর মনে হয়েছিল, ওর মনে কেমন কষ্ট লাগছে। মধুদির প্রশ্নের কোনো জবাব ওর জানা ছিল না।

আবার বলেছিলেন, 'শুনেছি, ওর বাবা নেই, মাথার ওপরে মামা আর দাদারা আছেন। তাঁরা কেমন কিছুই জানি না, একটু অনুমান করা যায়। আশ্চর্য, থানায় ধরে নিয়ে গেল, বাড়ি থেকে কেউ গেল না? এতেই অনেকখানি বোঝা যায়। তোমার বাবাকে আমার নমস্কার জানিও, সম্ভব হলে আমি দেখা করবো। ইস্কুলের সেক্রেটারিকে আমি—' হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে শিউলী, তুমি ক্লাসে যাও।'

শিউলী ক্লাসে গিয়েছিল, কিন্তু জীবনে সেই প্রথম দিন, ক্লাসের পড়ায় ওর মনোযোগ ছিল না। ক্লাস টিচারদের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিল অনেকবার। বালিকার বুকে তখন এক ঘাড়-ফেরানো বালকের ছবি, যাকে কেউ ভালবাসে না। অতএব ভালবাসা জয়লাভ করেছিল, নিরালায়, অলক্ষে, সম্ভবত বালিকার নিজেরও অগোচরে। ত্রয়োদশী কী দেখেছিল? পঞ্চদশী হতে হতে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, বাইরের চেহারায় আচার আচরণে যে অস্বাভাবিক সাবালক, সে একটি নাবালক শিশু। সে বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে, দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁকে পূর্ণিমার চাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, তার ঠোঁট কাঁপছিল থরথর,—ভীরু, নিষ্পাপ, অনভিজ্ঞ। পঞ্চদশী ফিসফিস করে ডেকেছিল, 'ত্রিদিবেশ।'

ত্রিদিবেশ শিউলীর বিচ্ছিন্ন উন্মুখ ঠোঁটের দিকে তাকিয়েছিল। আনন্দ বিস্ময় এবং একটি সূক্ষ্ম অপরাধ বোধ ওর চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে।

ক্রমশ

১৮২৬-এ ছাপো নামগেল তাঁর আত্মীয় ও **মন্ত্রী** ভো-লককে গুপ্তহত্যা করায় ভো-লকের জ্ঞাতি ভাই কাঞ্ছুপ ভীত হয়ে আট শত লেপচা সঙ্গী সমেত আশ্রয় নেয় নেপালের আশ্রয়ে। এর অল্প দিন পরেই নেপাল ও সিকিমের মধ্যে সীমান্তবিরোধ দেখা দেওয়ায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বিরোধ মীমাংসার জন্য মেজর লয়েডকে পাঠান। এই বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে ইংরেজ সরকার লাভ করে সিকিমের দার্জিলিং অঞ্চল।

ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং মহকুমার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য লয়েডকে পাঠান। **১৮৩৬**-এর ডিসেম্বর মাসে লয়েড দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছান পাঁচজন দেশীয় সিপাহী সমেত। শাসনকার্যের জন্য লয়েড এক বছরের জন্য পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু, লয়েডের দার্জিলিংয়ে অবস্থান সে সময় সিকিম অথবা নেপাল খোলা মনে নিতে পারেনি। লয়েডের দার্জিলিংয়ে অবস্থানের কারণস্বরূপ ইংরেজ সরকারকে নেপাল দরবারকে বলতে হয় "Solely with a view to ascertain the nature of the climate and whether or not it would be adopted as a sanatorium for invalids."

ব্রিটিশ সিকিম নামে সে সময়ে পরিচিত সমস্ত অঞ্চলটির জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার। এই জনসংখ্যার মধ্যে ছিল তিন হাজার লেপচা, দু হাজার ভুটানী ও দু হাজার লিম্বু। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার লয়েডকে নির্দেশ দেয় "You should draw up a brief statement of the advantages of the place which should be published for general information accompanied by an invitation to the public to take long leases of the land for building or other purposes."

লয়েডের পর ১৮৪০-এ দার্জিলিংয়ের সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়ে নেপাল থেকে আসেন ডাঃ আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল। এই পদে তিনি ছিলেন দীর্ঘ বাইশ বছর। ডাঃ ক্যাম্বেলই প্রথম দার্জিলিংয়ে চা গাছের আবাদ আরম্ভ করেন, এবং ১৮৬৬-র মধ্যেই ৩৯টি চা বাগান দশ হাজার একর জমিতে গড়ে ওঠে। প্রধানত চা-বাগান ও রাস্তা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হওয়ায় ডাঃ ক্যাম্বেল দার্জিলিংয়ের পার্শ্ববর্তী রাজ্য নেপাল থেকে নেপালীদের দার্জিলিং অঞ্চলে আনেন। **২৮** মার্চ, ১৮৬১ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সিকিমের আর একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিবলে ব্রিটিশ নাগরিকরা সিকিমে অবাধে বাণিজ্য, ভ্রমণ এবং ইংরেজ সরকার রাস্তা নির্মাণের অধিকার পায়। এর পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিম্পংয়ে সিকিমের রাজা ও বাংলার ছোটলাট অ্যাসলে ইডেনের মধ্যে এক আলোচনার পর নেপালীরা প্রথম বসবাসের অধিকার পায় সিকিমের কয়েকটি বিশেষ এলাকায়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার দার্জিলিং ও সিকিমে নেপালীদের বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ায় ব্যাপকভাবে এই দুটি রাজ্যে নেপালীদের অনুপ্রবেশ ঘটায় লেপচারা নিজ বাসভূমিতে হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু। হারাতে থাকে তাদের চাষের জমি, এবং সেই সঙ্গে আঘাত আসে লেপচাদের কৃষ্টি, সমাজব্যবস্থা ও ভাষার উপর।

তিব্বতীদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই লেপচাদের আদি বন-পা ধর্মে লামাবাদের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় লেপচারা লামাবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য, ইংরেজ সরকার প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই ব্যাপকভাবে নেপালীদের দার্জিলিং ও সিকিমে অনুপ্রবেশে উৎসাহ দেয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপালীরা প্রথম সিকিমে বসবাসের সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই সেখানে নেপালীদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯১-এর সিকিমের জনগণনায় দেখা যায় এই অল্প সময়ের মধ্যেই ১৫০০০ নেপালী সিকিমে বসবাস শুরু করেছে। ঐ সময়ে সিকিমের মোট ৩০০০০ জনসংখ্যার মধ্যে লেপচাদের সংখ্যা ছিল ৫৮০০, ভুটানী ৫০০০ ও নেপালী ১৫৫০০। নেপালীদের অনুপ্রবেশ এবং সিকিম সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি [illegible] রিজলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বলেছিলেন,
"The influx of these hereditary enemies of Tibet is our surest guarantee against a revival of Tibetan influence."

পরবর্তী কালের ইংরেজ শাসনে লেপচাদের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে [illegible] থাকে তাদের [illegible] ভাষাও। সম্পূর্ণ লেপচা অধ্যুষিত কয়েকটি পার্বত্য গ্রাম থেকে প্রাপ্ত দলিল থেকে দেখা যায় যে, সে সময় শাসনকার্যে লেপচা ভাষা ব্যবহৃত হত। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকেও [illegible] লেপচা ভাষার [illegible] পরবর্তী [illegible] হয়েছিল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লয়েডের সময়।

[illegible] ১৮৩৮-এর ১২ অক্টোবর [illegible] বলা হয়েছে যে, [illegible] ছোট [illegible] বলাসন নদীর পূর্ব, মহা-

লেপচা ভাষায় প্রচারিত পরোয়ানার প্রতিলিপি

নন্দা নদীর পশ্চিমে এবং বড় রঙ্গীত নদীর দক্ষিণে যে সকল পর্বত মুলুক আছে তাহা শ্রীশ্রীকোম্পানী বাহাদুরকে লিখিয়া দিয়াছেন। যে সকল লেপচা, ভুটিয়া, মেচ ইত্যাদি রায়ত এই অঞ্চলে বসবাস করিতেছে তাহারা এই তারিখ হইতে কোম্পানী বাহাদুরের রায়ত হইল। সনদাদি দাখিল করিয়া দার্জিলিংয়ে হুজুরের কাছে খাজনাদি নির্দিষ্টভাবে দাখিল করিতে হইবে। এখন হইতে কোম্পানী বাহাদুরের আজ্ঞা ছাড়া অন্য কাহারও আজ্ঞা চলিবে না। রায়তের মধ্যে যা প্রার্থনা হয় দার্জিলিংয়ে হুজুরের কাছে জানাইলে যথাযথ বিচার হইবে এবং কোন অন্যায় হইবে না।'

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র দার জোলিং জেলাটি ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে লেপচাভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশ, নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সাথে যুক্ত হয়। এক বিরাট এলাকা [illegible] রাজ্যের সঙ্গে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের ফলে লুপ্ত হতে থাকে পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রাচীন ভাষা। লেপচা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণেতা মেইনওয়ারিং লেপচা ভাষা বিষয়ে অভিমত প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

"The language is a monosyllabic one and is unquestionably far anterior to the Hebrew or Sanskrit. It is pre-eminently an Ursprache, being probably, and I think, I may without fear of misrepresentations, state it to be, the oldest language extent."

লেপচা ভাষায় রয়েছে মোট ৫৬টি অক্ষর। প্রাথমিক স্বরবর্ণ "অ" ছাড়াও বর্ণগুলির সংখ্যা নিম্নরূপ :

আমু (ব্যঞ্জনবর্ণ)	—৩৫টি
থার্মাবন (স্বরবর্ণ)	— ৮টি
আকুপ-থার্মাবন	— ৯টি
রু-কেন্না	— ২টি
স্বরিত-উচ্চারণচিহ্ন	— ১টি

কয়েকজন ভাষাবিদের মতে লেপচা বর্ণমালার সঙ্গে তিব্বতের "উ-মেদ" বর্ণমালার কিছু মিল রয়েছে। অবশ্য ১৮টি লেপচা বর্ণমালার সঙ্গে "উ-মেদ" বর্ণমালার কোনও মিল নেই।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীতেই লেপচা ভাষায় 'নিউ টেস্টামেন্ট' ইত্যাদি প্রকাশ করেন ব্যাপটিস্ট মিশন। সম্ভবত মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত লেপচা ভাষায় প্রকাশিত এই প্রথম পুস্তক। এ সময় দার্জিলিংয়ে লেপচা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সচেষ্ট ছিল মিশনারী সংস্থাগুলি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেন্ড স্টার্ট লেপচা ভাষার মাধ্যমে প্রথম দার্জিলিংয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ করেছিলেন।

দার্জিলিং ও সিকিমের অন্যতম স্থান ও নদীর নামগুলির সঙ্গে লেপচা সভ্যতা কৃষ্টি বিকশিত। যেমন, সেন-চেন-লো (সেনচল) অর্থাৎ কুয়াশা-ঘেরা স্যাঁতসেঁতে পাহাড়; আলেবং (লেবং) অর্থাৎ জিহবার ন্যায় উদ্গত পাহাড়; রং-নিউ (তিস্তা নদী) অর্থাৎ সোজা সরল নদী; রাবদেনচি অর্থাৎ নৃপতির বাসস্থান ; পা-জক (পেসক) অর্থাৎ বন; ফক-লুট (ফালুট) অর্থাৎ আবরণহীন পর্বতচূড়া: সনদকফু অর্থাৎ সর্বোচ্চে অবস্থিত বিষাক্ত গুল্ম ; মহালদি (মহানদী) অর্থাৎ প্রবাহিত বক্র নদী, দারজিলিং কথাটির 'দার' শব্দের লেপচা ভাষায় অর্থ মহান ব্যক্তি, 'জি' শব্দের অর্থ দর্শন পাওয়া ও 'লেয়াং' শব্দের অর্থ স্থান অথবা দেশ। দারজিলিংয়ের লেপচা ভাষায় অর্থ যে স্থানে মহান ব্যক্তির দর্শন পাওয়া গিয়েছিল। লেপচা ভাষায় 'কুরসং' ফুল থেকে কারসিয়াং নামের উৎপত্তি। কালিমপং নামটি এসেছে লেপচা ভাষায় 'কালিয়েম' নামে এক ধরনের আর্কিড ফুল ও 'পং' অর্থাৎ পর্বতশিখর থেকে। শিলিগুড়ি নামটি হয়েছে 'শিলি' অর্থাৎ ধনুক ও 'গ্রি' অর্থাৎ প্রসারিত ধনুতন্তু। সোনাদা অর্থাৎ ভল্লুকের আশ্রয়স্থল।

লেপচাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিও অন্যান্য প্রাচীন জাতিগুলির পুরাণ-কাহিনীর ন্যায় উপভোগ্য। লেপচাদের একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে মহাপ্লাবন বিষয়ে। বহু যুগ আগে সমস্ত লেপচাভূমি যখন মহাপ্লাবনে প্লাবিত হয়ে যায়, তখন টেনডং পর্বতচূড়া জলের উপরে উঠে দাঁড়ায়। সেই সময় রক্ষা পায় শুধু এই পর্বতচূড়ায় আশ্রয়গ্রহণকারীরাই। পশ্চিম সিকিমের ৮৬১৩ ফুট উচ্চ এই পর্বতচূড়াটি দার্জিলিংয়ের মাল থেকে প্রতীয়মান। লেপচা ভাষায় পর্বতচূড়াটির নাম 'টুনডুং' অর্থাৎ ঊর্ধ্বারোহণ অথবা সিঁড়ি। স্বর্গে পৌঁছাবার সিঁড়ি নির্মাণের উপর লেপচা উপাখ্যানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দার্জিলিং ও সিকিমের কয়েকটি স্থান।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই আদিম জাতিটির ভাষা ও কৃষ্টি রক্ষার কোন প্রচেষ্টাই সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বে লেপচা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল বর্তমানে তাও বর্জিত। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ১৯৬৮ সালের দার্জিলিংয়ের ভয়াবহ বন্যার পর কয়েকটি লেপচা বস্তি পরিদর্শনের পর অনুতাপ করে বলেছিলেন, লেপচাদের স্বার্থ রক্ষার কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি। যেহেতু লেপচারা বর্তমানে সব থেকে দুর্বলতম অধিবাসী, সেজন্য তাদের রক্ষা করতে হলে পশ্চিম বাংলা সরকারের একটি পৃথক লেপচা বিভাগ থাকা উচিত বলে অধ্যাপক বসু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষা ও সভ্যতা রক্ষার জন্য Wheeler-Howard আইনের ন্যায় কোন আইন প্রণয়নও প্রয়োজন এই আদিম লেপচা জাতিটিকে রক্ষার প্রয়োজনে। ভারতের সংবিধানে যদিও সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অঙ্গীকার করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে লেপচা জাতির ভাষা রক্ষার জন্য কোন কার্যক্রম সরকারের এখনও নেই।

অদৃষ্টের পরিহাসে একদা যারা ছিল এক বিস্তৃত অঞ্চলের প্রকৃত মালিক—আজ তারা নিঃস্ব, শোষিত ও বিতাড়িত। আজ নিজ জন্মভূমিতেই লেপচারা হয়ে পড়েছে পরবাসী। লেপচা জাতির অস্তিত্বই বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এজন্য, লেপচা ভাষাবিদ মেনওয়ারিং দুঃখ করে বলেছিলেন, "But like everything really good in this world it has been despised and rejected. To allow the Lepcha race, and the language itself to die out would indeed be most barbarous, and inexpressibly sad."

লেপচাভূমির এই বিনম্রবচন জাতিটি কারো বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ করে না। নিজ বাসভূমিতে নিজেদের অস্তিত্বটুকু রক্ষার সম্ভাবনাও আজ সুদূর পরাহত হলেও এখনও তারা গান গায় :

সুম কানচু আম্বোক
পাতো পারু সারাত
ইয়ুকুম চংমুন রুমডক,
নাংথুক অদিয়ুম আদিয়াম
আগো আনিত মাতলুং
চক সায়ং তেক সায়াং
আতেন আনিত বেক-কা
রংকুপ লুংতেন না ধুপ
রংকুপ ফাত আর তেক॥

(অর্থাৎ : হে বিদেশী অতিথিরা, তোমরা পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে আমাদের লেপচাভূমিতে এসেছ। তোমরা সকলে গুণী ও মহান। তোমরা কালে আমাদের জন্মভূমিতে সুখে ও আনন্দে রয়েছ। আমরা লেপচারা তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই জন্মভূমিতে।)

॥ ১১ ॥

'লালিমা পাল পুং-কে চিনব না কেন? সে তো পরশুরামের পালার। কে না জানে।' বিনি বলে।

'পরশুরামের পালার সেই লালিমা এখন এই শিব্রামের পাল্লায়।' আমি জানাই: 'কাঁসারিপাড়ার অ্যামেচার যাত্রা দেখতে গেলিনে তো, অতো করে তোকে সাধলাম সেদিন। সেখানেই ঐ কচি সংসদ পালাটা হচ্ছিল, তাতেই ঐ লালিমা পাল পুং...'

'বুঝলুম। কিন্তু পালে বাঘ পড়লো কি করে?' সে জানতে চায়। 'শুনি তাই?'

'বাঘ? বাঘ কোথায় পাচ্ছিস?'

'তোমার মধ্যে। বাঘ ছাড়া তুমি কী? সব সময়ই বাগাবার তালে রয়েছো। স্বার্থ ছাড়া তুমি কিছু বোঝো নাকি? এমন কি, আমার কাছ থেকই কতো বাগিয়েছো, শোধ দেবার নামটি নেই।'

'তুই বড়ো চতুরের মেয়ে। তোর টাকার অভাব কী রে। আমার মতো কাজিন পেয়েছিস কতো ভাগ্যে তোর। এমন নাম-জাদা, প্রতিভাবান ভাই কটা আছে কার? সময়ে অসময়ে দু' পাঁচ টাকা ধার দিয়েছিস আমাকে তার জন্যে কেন খোঁটা দিচ্ছিস আবার?'

'কথা হচ্ছিল পালে বাঘ পড়বার...' সে কথাটা ঘোরায়।

'সেই কথাই। পালে বাঘ পড়াতে যায়নি। বাঘের এমন কিছু বাপ-মার দায় নেই। বাঘেই পাল পড়েছে বলা যায় বরং। ছোটদের গল্প লিখি না? তার লাভ এই, গায়ে পড়ে আমায় আলাপ করতে হয় না কারো সঙ্গে, ছেলেমেয়েরাই ভাব করতে আসে আপনার থেকে। কতো অচেনা ছেলেমেয়ের সঙ্গে যে পরিচয় হয়ে যায়! সেই সূত্রে তাদের বাড়ির সঙ্গে, মা বাবা দিদিদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়, স্বভাবতই হয়ে যায়। কী বলব তোকে। তাদের কারো বাড়ি গেলে যা খাওয়ায় ভাই...!'

'কই আমায় তো কখনো সঙ্গে নিয়ে যাও না!'

'ভয়ে। ভগবান ধানে-চালে মিশিয়ে দিয়েছেন না! ছেলেমেয়ে মিলেমিশে প্রায় একাকার। ছেলের সঙ্গে আলাপ হলে তার সূত্র ধরে মেয়েদের সাথেও ভাব হয়ে যাবে। অনিবার্য ভাবেই। কিন্তু ভয় তো সেজন্যে

ছেলেমেয়ে সব মিলেমিশে রয়েছে

নয়—মেয়েদের জন্য না। ঐ ভাইসভার্সার জন্যই।

'এত ভণিতা কেন গো দাদা, ভাইস-ভার্সার মানেটা কী?' সে শুধোয়—

'ভাইসভার্সার মানে যেসব বাড়িতে সুন্দর সুন্দর মেয়ের সঙ্গে সুপুরুষ সব ছেলেরাও আছে যে। ছেলেমেয়ে সব মিলে মিশে রয়েছে। আমি যেখানে চালের থেকে ধান আলাদা করব। ধনধান্যে ভরাট আমাদের এই বসুন্ধরার মতই, অন্নপূর্ণোদেরই বেছে নেব—মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে, তুই সেখানে সেই চালেরই বাছাই। বাচাল চাল ছেলেদেরই বেছে নিবি তো।' আমি বিশদ করি: 'আর আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার এই একটি মাত্রই বোন। তুই। নিজের বোন হারিয়ে তখন বনে বনে কেঁদে বেড়াতে হবে। কিন্তু ক্রন্দনের জন্য অন্য কোনো অরণ্যই বা পাই কোথায়? সেইজন্যই তো তোকে নিয়ে যাই না কোথাও।'

'বলেছি না, তুমি একটি স্বার্থপর?'

'সেই কথাই তো বলছি রে। সে সব জায়গায় যাই নিজের স্বার্থের দিকে নজর রাখতে, নিজের কাজ গোছাতেই—সেখানে তখন তাই করব, না তোর দিক সামলাব? সেখানকার ছেলেরা তোকে ঘিরে নজরানা দিতে লাগলে আমার গা জ্বালা করবে না? সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে আমার। একূলও গেল ওকূলও গেল—বিলকুল লোকসান।'

'কেন করবে গা জ্বালা? তুমি মেয়েদের সঙ্গে মিশলে তো গা জ্বলে না আমার।'

'মানে, আমি স্বার্থপর না? গা জ্বলবার কথাই তাই। তবে তোর কেন জ্বলুনি হবে। আমার প্রতি তোর যে তেমন টান নেই, প্রমাণ এই।'

'বুঝলাম, এখন বলো তো, এই লালিমা পাল কি খুব বড়লোকের বাচ্ছা? বড়লোক না হলে তো তুমি কোনো আত্মীয়ের ধার ঘেঁষো না, আর ধার ঘেঁষবার জন্যেই যতো বড়লোক বেছে বেছে আত্মীয়তা করো।...তা এই লালিমা ছোঁড়াটা কি...'

'তাতে দরকার কি তোর? তোর তো আর ধার ঘেঁষবার অভ্যেস নেই, কারো ধার ধারবার দরকারটাই বা কিসের!'

'জানি আমি, তুমি ভারী স্বার্থপর আর এক[illegible]ড়ে, ভালো করেই জানি!'

'তোর নিজেরই কতো সোর্স রয়েছে, নেই কি? তোর ক্লাসের বন্ধুদের বাড়ি গেলেই পারিস। সেখানে তাদের দাদারা রয়েছে, আলাপ জমবে। আলাপ থেকে প্রলাপ বিলাপ সব। সব সরষের ভেতরই ভূত থাকে রে! সব সরষের থেকেই তেল বেরয়। বের করা যায়, জানলে পরে। তুই কি আর আমার চেয়ে কিছু কম জানিস। বিদ্যাতে প্রায় আমার সমান হলেও বুদ্ধিতে?'

'হয়েছে হয়েছে। থাক।'

'থাকবে কেন? বললাম ভগবান ধানে

আর চালে, চালে আর তুষে—এক কথে দিয়েছেন। আমাদের দায় শুধু খুঁটে খাওয়ার—একটুখানি বাছ বিচার বোধ—এই! তুইও বেশ খুঁটে খেতে পারিস—আমাকে নাহক এই খোঁটা না দিয়ে।'

'দরকার নেই আমার খুঁটে খাবার। আমি বন্ধুদের বাড়িই যাইনে।' বলে সে গুম হয়ে যায়।

ওর মুখের (এবং মনেরও বোধ করি) এই গুমোট ভাঙতে কী করা যায় তাই ভাবি। বিনির মান ভাঙানো সোজা না।

তাছাড়া তার মনে আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করায় তার চেয়ে আমার নিজের ক্ষতিই বেশি, খতিয়ে দেখি।

বোন আর বন্ধুদের থেকেই আমার চিরকালের বরাত। সেকালে বিনির পয়ে পয়সা জুটত, ইদানিং যেমন ইতুর থেকেই আমার ইত্যাদি!

কোথায় কোন্ সুন্দর ছেলের সঙ্গে ভাব হয়ে আছে মনের ভেতর হাতড়াই। সুঠাম অথচ নির্দোষ কোন্ কিশোরের সঙ্গে আলাপ করে দেওয়া যায় ভেবে দেখি, কিন্তু কাউকেই তেমন খুঁজে পাই না।।

সুশ্রী ছেলেদের সঙ্গে ভাব হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের ক্ষণভঙ্গুর সৌন্দর্যের ন্যায়

দরকার নেই আমার খুঁটে খাবার

আমার ভাবও যেন কোথায় হারিয়ে যায়। সুদৃশ্য না হলে কারো সঙ্গে আমার আলাপ জমে না। তা বটে, কিন্তু সে আলাপ আর কতক্ষণ থাকে? সোনার পেঠে পার হয়ে আমি মুক্তাঙ্গনে গিয়ে পড়ি। হীরে মুক্তর রাজ্যে চলে যাই। পাদপীঠেই পড়ে থাকিনে, মন্দিরে প্রবেশ করি। সোনালি ছেলেদের ফেলে কি করে কে জানে রুপালি মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমে যায়—তারপর তাদের সঙ্গেই ঘুরি ফিরি। এই হয়ে থাকে। তার পর দেখেছি ছেলেরা আর ততটা পছন্দ করে না আমাকে। পরিচয়ের সূত্রপাতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত কখন যে নিজের থেকেই তারা ঘুড়ির মতন কোন আকাশে কেটে পড়ে পাত্তা মেলে না। পরিচয়সূত্রের লাটাইটা হাত-ধরা থাকলেও কখন যে পরস্পর মনের থেকে ছাঁটাই হয়ে যাই!

আপাতত ওর মুখের গুমোটটা কাটাবার জন্য চা-ওলাকে ফরমাস দিলাম—তিনখানা বইয়ের মোট দাম আজকেই চুকিয়ে নেওয়া যাক, কী বলেন? দুটো করে ডবোল মামলেট দিন আমাদের।'

'মামলেট না অমলেট? কী বলছো?' বিনির শিক্ষয়িত্রীসুলভ জিজ্ঞাসা।

'এক কথা। গোলাপ যে নামে ডাকো গন্ধ বিতরে। মামলেট আর অমলেটের একই রকমের স্বাদ বর্ণ গন্ধ...ওদের বোঝবার সুবিধের জন্যে বলতে হয়। এই বস্তুই চৌরঙ্গী পাড়ায় গেলে অমলেট হয়ে যায়। জানিস?'

এলো অমলেট। খেলো বিনি। এবং আমিও—বলা বাহুল্য।

তার পর আমি কথা পাড়লাম, 'বেশ তো, কী হয়েছে! লালিমার সঙ্গে আলাপ করে দেব তোর। ওর কোনো কোনটোন নেই খবর নিয়েছি, স্বভাবতই ওর সম্বন্ধে তেমন আমার উৎসাহ নেই বুঝলি?'

'ঐ সব পাংটাইপের ছেলের সঙ্গে আমি মিশতে চাইনে।' সে বলে, 'মেয়েলি ছেলেরা আমার দু চক্ষের বিষ।'

'আমারও। তবে ভাই, ছেলেলি টাইপের মেয়ে আমার কাছে দারুণ। কোনো ছেলের সঙ্গেই তার তুলনা হয় না।' আমি বলি—'এই যেমন তুই না! ছেলের মতন মুখ চোখ, ভাবভঙ্গী, আচার ব্যভার। যে মেয়েকে প্রায় ছেলে বন্ধু বলেই ভাবা যায়। সে যে মেয়ে তা মনেই হয় না কখনো।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি—'এ রকম আর একটি মেয়েই আমি দেখেছি কেবল—বোনের মতন বন্ধুর মতন। আমার কৈশোর কালে তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল আমার... ছেলে সেজে আমার সঙ্গে জেলেও গিয়েছিল সে, নন্-কো-অপারেশনের কাল। দারুণ অসুখের মধ্যেও কী সুখেই যে কাটিয়েছিলাম সেই কদিন!'

'তার কথা তো তুমি কখনো বলো নি আমায়?'

'কোথায় এখন সে? বিয়ে হয়ে গিয়ে তার পাত্তাই নেইকো আর—তোরও একাদন

তাই হবে রে! মেয়েরা ভারী হারিয়ে যায় ভাই।...'

'মেয়েরা হারাবেই।'

'সত্যি, তাদের কাছে জিতবার আশাই নেই একদম্‌। ইন্দ্রজিত আছে কিন্তু ইন্দ্রাণীজয়ী কেউ জন্মায়নি এখনো।'

'যাক, বাকী বইগুলোর কী গতি করলে শুনি?'

'কবরেজখানার থেকে মোড়ের মনোহারী দোকানটায় গেলাম—বইয়ের বদলে যদি সাবান টাবান কিছু পাওয়া যায়। সেই দোকানটা রে, দেখেছিস তুই, একটা ছোট্ট মেয়ে তার বাবার দোকানে বসে দেখা শোনা করে...দেখিসনি?'

'মোটেই সে ছোট্ট মেয়ে নয়। তুমি কাকে ছোটো বলো। প্রায় আমার বয়সীই সে—আমাদের ইস্কুলেই পড়ে।'

'তাই নাকি? তা মেয়েটা তো আমার হাতে বই দেখেই লাফিয়ে উঠলো, তক্ষুনি হাত থেকে কেড়ে নিলো একখানা...আমি বললাম, বইগুলো আমি বেচতে চাই...দাম দিতে হবে।'

'আপনার বই তো। এর আবার দাম কী! আমি এমনি নিলাম।'

'না, অমনি দেওয়া অসম্ভব। তুমি পয়সা না দাও তো ঐ দামের—বারো আনার কিছু দাও আমাকে এর বদলে। নিদেন একটা সাবান...।

'বইয়ের বদলে সাবান দিলে বাবা আর আস্ত রাখবে না আমায়—এমন ধোলাই দেবে না আমাকে. ঐ বই দিয়েই ধরে পেটাবে। সাবান না দিলেই সাফ করবে আমাকে বুঝেছো?'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এই বইগুলো কোথায় গছাই এখন বলতো?'

'আপনি সোজা কমলালয় স্টোরসে চলে যান। সেখানে এখন সেল চলছে—সস্তায় পাবেন সব কিছু...বিজ্ঞাপন দিয়েছে কাগজে।'

ভাবলাম সেই ভালো। পাড়ার ছোট দোকানের ওপর হামলা না করে হাইকোর্টেই আমার মামলা নিয়ে যাই। সামান্য সাবানকির ওপর বজ্রাঘাত করে কী হবে? চলে গেলাম সটান সেখানে। কপাল ঠুকে তাদের রিডাকশান সেলে ঢুকলাম। সাবান ব্লেড স্নো পাউডার ক্রিম টিম যা পাওয়া যায়—যথা লাভ। কিন্তু বই দেখেই তাঁরা ঘাড় নাড়তে লাগলেন, জানালেন, 'নামজাদা প্রকাশকরা আমাদের বই বিভাগে বিক্রির জন্য বই জমা দিয়ে যান বটে কিন্তু তা আমাদের কিনতে হয় না, বিক্রি হলে তার কমিশন পাই। কিন্তু আপনি বলছেন এর বদলে নগদ স্টেশনারি জিনিস চান, তা কী করে হয়।' জানলাম 'আপনাদের রিডাকশান সেল, এমন তাই শুনেই.' আমি জানালাম—'নিদেন একটা রুমালও কি পাওয়া যায় না এর একটা কি দুটোর বদলে।' তাঁরা বললেন, 'শুনেছেন ঠিকই। বিজ্ঞাপনে সেল বটে, মাল পাত্রের দামও খুব কমানো হয়েছে সে কথাও সত্যি, কিন্তু তা বলে এত দূরে কমানো হয়নি।' খুব কঠোর ভাষাতেই এ কথা বললেন। আমি বললাম, খদ্দেরদের সঙ্গে তাঁদের যদি এমনি ব্যাপার হয়, তাহলে তাঁদের দোকানে এই আমার শেষ পদার্পণ। তাঁরা জানালেন, আমার মত বহু মূল্য খদ্দের হারানো খুবই দুঃখের সন্দেহ কি, কিন্তু কী করবেন, তাঁরা নাচার। এত বড় দুঃখও তাঁদের কষ্ট করে সইতে হবে; উপায় নেই।'

তাদের একজন পিছু ডেকে বলল যেন, বইগুলো নিয়ে আমি একবার মেছোবাজারে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'শুনে তুমি কী বললে?' শুধায় বিনি।

'বলব কী আবার?' আমি বলি, বলবার কথা নয়, করবার কথা। তাও করেছিলাম, করিনি কি? মেছোবাজারের মেছুনিদের কাছেও গিয়েছিলাম। বইয়ের কথা শুনেতেই তারা রাজি নয়। চ্যাংড়াদের বই, একথাও বলেছি. চ্যাংড়ার বদলে কিছু চিংড়িই দাও না হয়। তাতে এক জেলেনী বললে কী জানিস? বললে যে এটা ঘটকালির জায়গা নয়। আলুওলা পটলওলার কাছেও গেছি, শাকসব্জিদেরও বাজিয়ে দেখেছি—কিন্তু সব বৃথা! মাংসওলার কাছেও গেছলাম। কিন্তু কথা পাড়তেই না তারা কাটারি নিয়ে এমন করে তেড়ে এল যে, দাঁড়াবার আর ভরসা পেলাম না সেখানে। সেই দণ্ডেই না পালিয়ে এলে এতক্ষণ হয়ত তার মুণ্ডহীন পাঠাদের কাটা লাশের পাশাপাশি ঠ্যাং বাঁধা ঝুলতে হত কিনা কে জানে!'

'দুর্গা দুর্গা!' বলেই বিনি শিউরে ওঠে।

'মেছোবাজারের থেকে সোজা এলাম শ্রীমানী বাজারে। মশলাপাতিওলাদের কাছে। মশলা বাঁধতে কাগজ লাগে—তারা যদি এক আধখানা......নিদেন মুড়িওয়ালীরা নিতে পারে। মুড়ির ঠোঙায় আমি বহুৎ নামীদামী লেখকের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

কালজয়ী অনেক রচনাকে, মুড়ির সহিত, অকালে আমার কালগ্রাসে পড়তে দেখা গেছে। অনেক যুগান্তকারী লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার সেইসূত্রেই।—

'কী হোলো?' শুধোলো সে।

'কিস্সু না। একখানা বইবাবদে দু আনার লবঙ্গ এলাচ তেজপাতা ইত্যাদি দিতেও কেউ প্রস্তুত নয়। উলটে যা দেমাক দেখালো, যা তেজ দেখলাম—বাপস্! তবে হ্যাঁ, শ্রীমানী বাজারের এক শ্রীমান একটু ভরসা দিয়েছে—একটুখানিই। গেটের মুখে যে-লোকটা মাখন বিক্রি করে—সে-ই। সে বলছে মাস কয়েক বাদে আসতে...ততদিনে তার মাখন পচলে, উত্তমরূপে পচার পর, সেই পচনশীল কিছুর বদলে এক-আধখানা নিতে পারে হয়ত...।

'তার মধ্যেও 'হয়ত' আবার?' বিনির প্রশ্ন—কয়েক মাস পরে কেন? এখন নিতে তার এত বাধা কিসের?'

'একটু কিন্তু আছে কি না এর ভেতর। ইতিমধ্যে তার একটা পুরের লাভের সম্ভাবনা রয়েছে! বাচ্চার দুধ গরমের জন্যেই নেবে তখন। কাটুতির বদলে উনুনেই কাটতি হয়ে যাবে বইগুলোর আগুনে বললে সে।...চ, ওঠ, এখান থেকে সালুনে যেতে হবে আবার। সেখানে কাজ বাকী রয়েছে। তুইও চল আমার সাথে।'

'সালুনে আবার তোমার কী কাজ? তোমার দাড়ি তো বেশ কামানোই, চুলও টিপটপ। তবে কেন আবার? তারা কি কোনো কপি কিনছে নাকি তোমার?

'কেনেনি ঠিক, কিনতে চায়নি সহজে, অনেক কায়দায় কয়েকখানা গছানো গিয়েছে। সালুনের লোকটা আমার এই চাওয়ার চোয়াও আনাড়ি—বইয়ের পাতা উলটে একটা গল্পের শিরোনাম দেখে কইল কথা বলার বিপদ! দেখেই বলল, এ বই তাদের কোনো কাজে লাগবে না। চুল ছেঁটেই তাদের হাতের কামাই নেই, কথা বলার ফুরসৎ কোথায়? কথা বললে তো বিপদ! না, এ বই তাদের চাইনে। এতে শিক্ষণীয় কী আছে? আমি বললাম—সে নেই যে, এ কথা কে বললে? মেয়েদের ববু ছাঁটি কী করে ছেলেদের মতো গড়ানো যায় তার কায়দা কৌশল বিশদরূপে এতে বিবৃত করা হয়েছে। এই শুনে সে তার সালুনের সহকর্মীদের মধ্যে গুনে খান কয়েক কপি নিয়েছে—নগদ দামে নয়—ঐ বাটারে। আরও অবার সর্ত আছে তাই, বইয়ের বদলি দামের মোট টাকাটাই চুল ছাঁটাই, দাড়ি কামাই, শাম্পু, হেয়ার ড্রেসিং ইত্যাদি সব কিছু এক সঙ্গে আজই এক নাগাড়ে সেরে উসুল করে নিতে হবে আমায়। এক চোটে তুলে নিতে হবে আমায়। রোজ রোজ ঐ খুচুখাচ কম্মো চলবে না। কী করি বল্—এক নাগাড়ে বসে তিন বার চুল ছাঁটলাম, বার পাঁচেক হেয়ার ড্রেসিং করে দিলো, সাতবার দাড়ি কামাতে হোলো। চুল ছাঁটার সাথে সাথে নোখকাটাও হোলো বার কতেক। সেই সকাল থেকে এই-ই চলছে। উঃ! যা জ্বলছে আমার সারা মুখ! সেই সঙ্গে নখের এই ডগাগুলোও ভাই!'

বিনি বললো, বোধহয় সান্ত্বনাচ্ছলেই, 'তোমার গালে একটু হাত বুলিয়ে দেব দাদা? ভারী ইচ্ছে করছে। সাতবার কামানো গালের মসৃণতা কেমন হয় নাগালে পরখ করার তার কৌতূহল। আমার মনে হয়।

'রক্ষে কর্! সাতবার কামাবার পর এমন রগচটা হয়ে রয়েছে গাল দুটো যে কাউকে এখানে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়ার সাহস হয় না আমার। এমন কি, যার সাথে ছাঁতনাতলাতেও যাওয়া যায় এমন কি তাকেও—তার সঙ্গে একটু গালাগালি করতেও আমি নারাজ। এমনি ছ্যাঁত ছ্যাঁত করছে না আমার জায়গাটা! সারা গাল।'

বলে স্পর্শকাতর আমার গালের ওপরে আমি নিজেই হাত বুলাই—গালের সঙ্গে হাতের এক ইঞ্চির সমান্তরাল রেখে। ঐ ব্যবধান বজায়ে সারা গালেই বেশ করে হাত বোলানো যায়। কিন্তু তার ঠেলাতেই উত্তম কর্তিত নোখের ওপর এমন চোট লাগে যে উঃ আঃ করে বারম্বার ফুঁ দিতে হয়। ওই ফুৎকারে আমার এই গালের এই গোদের ওপর নোখের যতো বিষ ফোঁড়া ওড়ানো যায় না। দাউ দাউ জ্বলতে থাকে। ক্ষুরের মত ধরালো এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি : উঃ! নিজের বই কাটানো যে কী ঝকমারি? আগে যদি জানতুম! আর কেউ যেন কখনো এমন কাজ না করে। এর চেয়ে বই কটার পেঙ্গু-বাই-পেঙ্গু দেড় বছর ধরে বাড়ি বসে দাড়ি কামিয়ে কাটাতে পারলেও আমার কোনো ক্ষতি ছিলনা—ওঃ! ...উঃ! আঃ! ইস্!

'তবে ফের আবার এখন যাচ্ছ কেন সেখানে? সেই সালুনে?'

'বাকীটা উসুল করাতে। উসুল না করিয়ে নিয়ে সে ছাড়বে না, বলে দিয়েছে। তেমন করলে ফের যেদিন এই পথে আমায় দেখতে পাবে ঘাড় ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রেখে বেয়ারিং ডাকের মত ওয়েল কামাই, ছাঁটাই নোখ কাটাই ড্রেসিং শাম্পু করে সব উসুল করিয়ে নেবে। ভালো করে চিনে রেখেছে সে আমাকে। নিজের এতদিনের দোকানের গুডউইল সে নষ্ট করতে পারবে না।'

'ও বাবা!'

'তবে এবার তুই সঙ্গে যাচ্ছিস্ তো। যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কী ব্যবস্থা?'

'বাকীটা তোকে দিয়ে উসুল করিয়ে নেব। নিতান্তই যদি নাছোড়বান্দা হয়।'

'তার মানে?'

'তার মানে তোর নোখ চেঁছে চুল ছেঁটে......।

'মেয়েরা কি চুল ছাঁটে নাকি? তারা তো চুল বড়ই রাখে মশাই! চুলের যত বাড় হয় ততই তাদের ভালো। তারা কি ভুলেও কখনো চুল......'

'সাবাড় করে না, বলছিস? তাহলে ঐ দাড়ি কামিয়ে...বেশি নয় আর দশ-বারো বারই মাত্র বাকী আছে বোধ হয়।'

'আমার দাড়ি বেরিয়েছে? মেয়েদের দাড়ি বেরয় কখনো? কী বলো যে!'

'আচ্ছা, না কামালে হবে কি করে রে! বালকের হয় না, ভদ্রলোকের হয়। দাড়ি বেরুলে তবেই না সে ভদ্রলোক। সে কি সহজে বেরুবার। তাকে আদর অভ্যর্থনায় কত কষ্ট করে আনতে হয়। না ওয়েল-কামালে কি সে আসে? না মশাই! আমারো গাল একদিন তোর মতই মসৃণ ছিল রে। তার পর এক নাগাড়ে কামাতে লাগলুম। রোজ রোজ। তবে না হয়েছে? দাড়ি আর টাকা, বুঝেছিস, কামালেই হবে—কামালে হয়, যতো কামাবে ততই আরো বাড়বে। টাকার মতই ঐ দাড়ি। হাতে হাতে বাজিয়ে দ্যাখ না একবার!'

'মানলাম। তোমার কথা তোমার লেখার মতই, এমন কি তোমার ঐ বইয়ের মতই অকাট্য।'

'তবে আর কি, শাণিত ক্ষুরের সামনে অম্লানবদনে তোর গাল পেতে দে—বীরাঙ্গনার মতই!'

'কিন্তু ও কর্ম আমার দ্বারা হবার নয়। ঐ দাড়ি কামানো।

'তুই বলছিস কী বিনি। সেকালের রাজপুত ললনারা যে আত্মজনকে বাঁচাতে শত্রুর তরবারির সামনে বুক পেতে দিত রে। আর তুই, দাদার জন্য তোর সামান্য এই গাল পেতে দিতে পারছিস নে? ছিঃ!'

'যাই বলো তুমি, আমি পরস্বাপহরণে যাব কেন? তোমার উপার্জন তুমিই ফুর্তি করে উপভোগ করো গে! আমাকে কেন জড়াও? তোমার কামাই আমি গাল পেতে নিতে পারব না। রাজপুত ললনাদের মত নই, এই ক্ষুরধার পরীক্ষায় আমি বরাবরের জন্য ফেল!'

(ক্রমশ)

জঞ্জাল সমস্যা প্রসঙ্গে

কয়েক মাস আগে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিউ-ইয়র্ক শহরের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার সহকারী প্রশাসক মাইকেল এস হিরশ মন্তব্য করেন, শুধু নিউ-ইয়র্ক শহরেই এখন দৈনিক যে পরিমাণ জঞ্জাল জমছে তার ওজন প্রায় বাইশ হাজার টন। তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে ভারতের সম্প্রসারণ কম বলে এখানকার অঞ্চল বিশেষে জঞ্জালজনিত সমস্যার চাপ অবশ্য কম। তবু গত এক দশকে এদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং শিল্প নগরীতে ক্রমে যে অনুপাতে বিভিন্ন রকমের জঞ্জালের চাপ বাড়ছে, যদি এখন থেকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার প্রতিরোধ না করা যায় তা হলে বড় রকমের ঝুঁকির দিকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'জঞ্জাল সমস্যা'র উপর দুদিনব্যাপী এক আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের স্বাগত জানাতে গিয়ে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস, কলকাতা আঞ্চলিক শাখার ডঃ এ এস ভাদুড়ী।

বলা বাহুল্য, গত দুই বছর ধরে পরিবেশ দূষিতকরণের উপর আমাদের দেশে সরকারী এবং বেসরকারী পক্ষ থেকে একাধিকবার বিভিন্ন কোণ থেকে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সব আলোচনাচক্রে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর কণ্ঠেই আমরা শুধু 'গেল গেল' রব শুনেছি। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ধুলো, ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস অথবা রাসায়নিক দ্রব্য কী ভয়াবহভাবে দ্রুত মানুষের জীবনকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে—বড় বড় সমীক্ষা এবং তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ওই সব বিজ্ঞানী আমাদের সামনে শুধু একটা ভয়াবহ ছবিই তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমী দেশের সমস্যা যে স্বতন্ত্র এবং এই মুহূর্তে অত বেশি ভয়ংকর নয়—একথা অল্পই শোনা গেছে। এবং এই সঙ্গে আরও একটি বড় কথা, অতীতে সমস্যার কথা যত বেশি বলা হয়েছে, সে তুলনায় ঠিক কী কী ধরনের উপায় অবলম্বন করে আগ্রাসী এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, সে সব সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলা হয় নি বললেই চলে। ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারস-এর উদ্যোক্তা-দের ধন্যবাদ। তাঁদের আলোচনাচক্রে এদেশের জঞ্জাল সমস্যার উপর যে সব সমীক্ষা সামনে তুলে ধরে বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বক্তারা বিভিন্ন ধরনের জঞ্জালের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে সব পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন, বলতে বাধা নেই, অন্তত শহর কলকাতায় অনুষ্ঠিত আর কোন আলোচনা-চক্রে এই জাতীয় সমস্যার উপর এমন স্পষ্টভাবে কেউ আলোচনা করেছেন কী না সন্দেহ।

ব্যাপার এই, এদেশেও প্রতি বছর নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হচ্ছে। তৈরি হয়েছে বড় বড় সার কারখানা। ওই সব কারখানার রাসায়নিক জঞ্জাল তাদের কাছাকাছি নদীতে এসে মিশছে। ফলে মাছের উৎপাদন কমছে।

ডঃ ভাদুড়ী বললেন, কলকাতার কথাই ধরুন। ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসেব, ভারতের বৃহত্তম এই শহরে ওই সময় প্রতি বর্গমাইলে শুধু ধুলি কণাই জমেছিল' ৬০০ টনের মত। এই ধূলিকণার দুই তৃতীয়াংশই কয়লার গুঁড়ো এবং ছাই। বাকি অংশের মধ্যে আছে মাটি, বিভিন্ন কল কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া রাসায়নিক কণা, আলকাতরা জাতীয় পদার্থ এবং নানা

ডঃ এ এস ভাদুড়ী

রকম দাহ্য সামগ্রী। বলা বাহুল্য, উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে পরবর্তী দশকে এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডঃ ভাদুড়ী কলকাতার জনস্বাস্থ্য প্রযুক্তি গবেষণাগার-এর সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কলকাতার বাতাসে গত কয়েক বছরে বিষাক্ত কার্বন মনোকসাইড গ্যাসের পরিমাণ দারুণভাবে বেড়ে গেছে। দশ বছর আগে এখনকার বাতাসে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে যেখানে এই গ্যাসের পরিমাণ ছিল ১০ ভাগ, এখন সেই পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ৩৫ ভাগে। এই গ্যাসের প্রধান উৎস মোটরগাড়ির জ্বালানি-পরিত্যক্ত অবশেষ। উল্লেখ করা যেতে পারে নিউ-ইয়র্ক শহরে পথে ঘাটে গাড়ির সংখ্যা কলকাতার তুলনায় বহুগুণ বেশি। অথচ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় সেখানকার বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ এখন এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ২৪ ভাগ মাত্র।

ডঃ ভাদুড়ীর বক্তব্য : কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি, কানপুর এবং মাদ্রাজ সহ ইতিমধ্যে মোট ১২টি জনবহুল শিল্পনগরীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে এদের মধ্যে কলকাতায় জঞ্জালের পরিমাণ সবচাইতে বেশি জমে। বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানো হয়েছে, সেখান থেকে নিয়ত বেরিয়ে আসছে সালফার ডাই-অকসাইড, নাইট্রোজেন অকসাইড প্রভৃতি গ্যাস। এই সব গ্যাস শুধু যে মানুষেরই ক্ষতি করে তা নয়, প্রত্যক্ষভাবে এর ওই অঞ্চলের পশুপাখি এবং শস্যেরও ক্ষতি করছে।

ডঃ ভাদুড়ীর অভিযোগ : কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে একটি কমিটি তৈরি করেছেন। ১৯৬৯ সালে অন্ততঃ জল-সংরক্ষণের ব্যাপারে কতকগুলি খসড়া প্রস্তাব রচনা করে লোকসভায় পেশ করাও হয়েছিল। হয়ত এ বছরেই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আইনও তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বায়ু দূষিতকরণের উপর কোন প্রস্তাবই এ পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি। ১৯৭০-এর মে মাসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অবশ্য বায়ু দূষিতকরণের উপর কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছিলেন, ১৯৭১ সালের জুলাই-এ প্রস্তাবগুলি পরীক্ষাও করা হয়। কিন্তু সেখানেই শেষ। তারপর এ নিয়ে কোন বিল পেশ করা এখনও পর্যন্ত হল না। সুখের কথা, বোম্বাই-এ বেসরকারী কিছু কিছু সংস্থা শহর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন। কলকাতার মত বিভিন্ন শহরে নাগরিকরা মিলেমিশে যদি তেমনভাবে কাজ করেন তাহলে পরিবেশ দূষিতকরণের ব্যাপারটা মোকাবেলা করা আশু সম্ভব হতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭০ নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন তাতে আশা করা গিয়েছিল, এ কাজটা শেষ পর্যন্ত আর পড়ে থাকবে না। ওই সময় বর্তমান লেখক স্বর্গত পীতাম্বর পন্থ-এর সঙ্গে এ নিয়ে কয়েকবার কথাবার্তাও বলেছিলেন। পন্থ তখন পরিবেশ দূষিতকরণ কমিটির অন্যতম পুরোধা। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় এই সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকারগুলি। প্রত্যেক রাজ্যে নানারকমভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। গাড়ি, কলকারখানা থেকে পরিত্যক্ত জঞ্জাল, পথে ছড়ানো ডাব, কাগজপত্র প্রভৃতির জঞ্জাল—এক এক রাজ্যে এক-এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। অথচ রাজ্যদপ্তরগুলি সে সব ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যাপার এই, পরিবেশকে জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখার জন্যে যে সব আইন তৈরির প্রয়োজন তার জন্যে দরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতা, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পুরোটা নয়। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির সাড়া কোথায়?

বলতে বাধা নেই, গত কয়েকমাস ধরে শহর কলকাতায় জঞ্জাল নিয়ে করপোরেশন এবং রাজ্য সরকার যা করছেন, পীতাম্বর পন্থের উক্তিই তা সমর্থন করে।

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, আইন যে করব, কার উপর ভিত্তি করে করব? ডেটা কোথায়? কোথায় কী ধরনের জঞ্জাল কী পরিমাণে জমছে, কীভাবে তারা জনস্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে পারে সে সবের উপর পরিষ্কার একটা ধারণা থাকলে তবেই তো বোঝা সম্ভব—এই আমাদের সমস্যা এই এইভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব?

প্রসঙ্গত প্রশ্ন। কারণ আমাদের দেশের বেশির ভাগ পরিকল্পনাই হয় মনগড়া। বাস্তবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক কম থাকে। বিজ্ঞানী মাত্রই জানেন, ইংরেজীতে 'প্যারামিটার' নামে একটি কথা আছে। বাংলায় হয়ত বলা যেতে পারে দিক বা কারণ। যে কোন সমস্যাই নানান দিক দিক বা নানা 'কারণে'র সঙ্গে জড়িত থাকে। সমাধানের কথা ভাবতে গেলে প্রথমে জানা দরকার কারণগুলি কী কী এবং তারা কী কী ঘটাচ্ছে। এসব জানার পরই সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। বলতে বাধা নেই গত কয়েক বছর ধরে পরিবেশ গেল গেল বলে চিৎকার যতটা করা হয়েছিল, কীভাবে গেল, কীভাবে যাওয়া বন্ধ করা যায়, সে সব কথা তেমন কিন্তু বলা হয় নি। তারও কারণ একটাই, বক্তাদের মনে জল্পনা ছিল, হাতে ছিল ভিনদেশী কিছু তথ্য, এ যেন পরের ছেলেকে দেখে নিজের ছেলে ভাবার মত। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সমস্যার ব্যাপারে উপযুক্ত

ব্যবহারের জন্য এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী এ কে মণ্ডল এবং টি ঘোষ শহর অঞ্চলের আবর্জনা, যেমন মল, মূত্র, ভাতের অবশিষ্ট প্রভৃতিকে সার তৈরির ব্যাপারে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সে সব দিয়ে বর্তমানে কোন কোন জৈব সার তৈরি করা সম্ভব, বিশদভাবে একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। মদ তৈরির কারখানা থেকে নিঃসৃত বস্তু-সামগ্রীকেও যে কতভাবে জৈব-সার তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এ পি ভি কোম্পানি লিমিটেডের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টস এবং মার্কেটিং ডিভিশনের ম্যানেজার শ্রী এম আর ভট্টাচার্য।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে এদেশের জঞ্জাল সমস্যা সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা পাওয়া অসম্ভব হবে না। এবং বিভিন্ন বক্তারা যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলি কার্যকর করে তুলতে পারলে শুধু জঞ্জাল সমস্যারই যে সমাধান হবে তা নয়, বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

সমরজিৎ কর

প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী

ব্রহ্মকুমারীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, ব্রহ্মাকে তোমরা প্রজাপতি বল তো? আমরা তাঁকে বলি প্রজাপিতা। তোমরা বল মরীচি, অত্রি, দক্ষ ইত্যাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র। সারা জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা প্রজার পতি অর্থাৎ 'মালিক'। আমরা বলি জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রজার পিতা, প্রাণীসমূহের জনক। কিছু বুঝলাম আর কিছু তাঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস দেখে প্রশ্ন বাড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, চুপ করে রইলাম।

ব্রহ্মকুমারী নাম হলে কি হবে, সম্প্রদায়ে
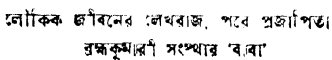
লৌকিক জীবনের লেখরাজ, পরে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী সংস্থার 'বাবা'

পুরুষ ও মহিলা দুই-ই আছেন। সে কথায় ওঁরা বললেন, মায়ের স্থান সবার উপরে, তাই তাঁরা ব্রহ্মকুমারীদের নামটাই আগে রেখেছেন। ব্রহ্মকুমারী কারো? তাঁদের পরস্পর ডাকার নাম দিদি বা বহিন। পুরুষরা ভাই। আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন তিনি বয়সে ছোট। তাই তিনি বহিন। একজন দিদিকে ডেকে আনলেন। তিনি সৌম্য, শান্ত, সুন্দর। মুখে হাসি ও স্থির মাধুরী। বললেন ব্রহ্মকুমারী সবাই। তুমিও ব্রহ্মকুমারী। মানুষে মানুষে যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং [illegible] সংসারে পারস্পর্য রচনা করা [illegible] কাজ। কেউ এ সংসারে আবদ্ধ না থেকে সহজ সরল [illegible] পারেন, তাঁরা [illegible]।

ব্রহ্মকুমারীদের সংস্থার স্থাপনার পিছনে কলকাতারই এক ধনী ব্যবসায়ীর প্রেরণা রয়েছে। তিনি ছিলেন জহরৎ এর কারবারী।

হীরের বেচা-কেনা ছিল তাঁর পেশা। নাম ছিল লেখরাজ। লেখরাজের রাজ-রাজড়া মহলে ছিল অবাধ গতি। কোথায় কোন রাজা নাকি সময়মত দেরী হওয়াতে তাঁকে কটূক্তি করেছিলেন। লেখরাজ গিয়েছিলেন মন্দিরে। ঈশ্বরের আরাধনায় তাঁর সময়ের হিসাব ছিল না। মনটা তাঁর কড়া কথায় দমে গেল। ফিরে এসে ব্যবসায়ের অংশীদারের হাতে কড়ির হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে পাড়ি দিলেন সিন্ধে। করাচী তাঁর ঘর। সেখানে ধর্মচর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে সাধনায় সময় কাটাচ্ছিলেন। দেশ বিভাগের পর মাউন্ট আবুতে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন আধ্যাত্মিক এক বিশ্ববিদ্যালয়। নাম তার হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আস্তে আস্তে বাংলা, বিহার, গুজরাট, তামিলনাড়ু, ইত্যাদি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে ব্রহ্মকুমারীদের ছোট বড় সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বাইরেও কোথাও কোথাও সংস্থার শাখা শুরু হয়েছে। ব্রহ্মকুমারীরা বলেন, বিশ্বজোড়া এই আধ্যাত্মিক পরিবার। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য যে পাঁচটি অচল পয়সা দক্ষিণা দেবে, সে-ই এই পরিবারের একজন হবে। কি এই পয়সা? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহংকার—এই পাঁচটি বিকার হচ্ছে পাঁচটি অচল পয়সা। এই পাঁচটি অচল পয়সা ভগবানের পায়ে উৎসর্গ করলে তবে ব্রহ্মকুমার বা ব্রহ্মকুমারী হওয়া যায়।

ব্রহ্মকুমারী সংস্থায় মেয়েদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী সর্বজ্ঞানের ভান্ডার। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগে লক্ষ্মী, তবে নারায়ণ, আগে রাধা পরে কৃষ্ণ এবং সীতা তার পর রাম। মাতা কন্যাদের জ্ঞান লাভে সমাজের জ্ঞানসুধা পান সহজ হয়। ব্রহ্মকুমারীদের প্রধানা একজন আরও একটি নূতন তথ্য বললেন। সিন্দুর বিন্দু থেকে নিয়ে যতরকম তিলক বা কপালের ফোঁটা সবই জ্যোতির্বিন্দু শিব'। শক্তির কল্পনায় তিলক রচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ তমোপ্রধান যুগ বলে বহু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বহুলোক বিশ্বাস করেন, কোন না কোন কারণে মহাবিনাশের পথে চলেছে পৃথিবী। আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিক দূষিত হয়ে উঠেছে, জন সংখ্যা বিস্ফোরণে আতঙ্ক
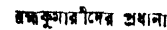
ব্রহ্মকুমারীদের প্রধানা

বাড়ছে, কত শত মারণাস্ত্র মানুষ স্বহস্তে তৈরী করছে। প্রত্যেকটি কি সাংঘাতিক ভবিষ্যতের সূচনার ইঙ্গিত! বিনাশের বিষাক্ত তীব্রতা থেকে বাঁচবার জন্য কি আকুল আকুতি চার দিকে। ব্রহ্মকুমারীদের শুভ্রবাস ও চিন্তায়, বিমল হাসায়ুক্ত নির্মল ব্যবহারেও সেই একই সন্ধানের চেষ্টা

(সি ১৮১৬৬)

দেখলাম। জানিনা কে কোনদিন কোন পথে কি লাভ করবে। তবে চেষ্টায় যদি অশান্ত মানবজীবনে অবলম্বন মেলে তবে তার মূল্য কম নয়।

যোগ এর যে মানে ব্রহ্মকুমারীরা দেন তা ভারী সুন্দর। যোগ হচ্ছে মিলন। কিসের মিলন? পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মিলন। মানুষ আজ পরমাত্মার সান্নিধ্য পান না, কারণ, যাঁরা তাঁর নাম করেন তাঁরাও সকলে সামীপ্য লাভের যোগ্য নন। প্রাণায়াম ইত্যাদি না করেও আত্মার আত্মিক উৎকর্ষ ঈশ্বরে মতি হলে হয়। সেই শ্রেষ্ঠ যোগ।

ব্রহ্মকুমারীদের প্রচারের মাধ্যম নানা প্রকার। এঁরা প্রদর্শনী ইত্যাদিতে সনাতন হিন্দু ধর্মই সর্বসাধারণকে জানাতে চান, কিন্তু সেখানে সংকীর্ণতা নেই। সেটাই বৈশিষ্ট্য।

টুকিটাকি

গ্যাস সিলিণ্ডারে রান্না করা এখন জনপ্রিয় হয়েছে। উপযুক্ত বিকল্প [illegible] নেই, কেরোসিন নেই বললেই [illegible] আছে। গ্যাস যে খুব নিরাপদ [illegible] নয়। প্রায়ই গ্যাস বাজার থেকে উধাও হয়। তবে পরিচ্ছন্ন রান্নার জন্য গ্যাস সিলিণ্ডার [illegible]।

গ্যাস সিলিণ্ডার থেকে গ্যাস লিক্ করছে বা বেরিয়ে যাচ্ছে কি না পরীক্ষা করার জন্য দেশলাই জেবলে দেখতে যাওয়ায় বিপদ আছে। যদি আগে থেকে গ্যাস লিক্ করে ঘরে জমে থাকে, তবে আগুন ধরে যাবার ভয় আছে।

গত ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে '৭৩-এর মার্চ পর্যন্ত LPG বা liquid petroleum gas থেকে ২৬টি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। খবর পাওয়া যায়নি এমন দুর্ঘটনাও নিশ্চয়ই আছে। দুর্ঘটনাগুলিতে ৪২ জন মারা গেছেন এবং ৫৮ জন আহত হয়েছেন। মৃত এবং আহতদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহিলা। দুর্ঘটনা ঘটেছেও রান্নাঘরে। সাবধান হলে সম্ভবতঃ এমন ঘটনাগুলি ঘটতো না।

যেখান থেকে গ্যাস লিক্ করছে বলে সন্দেহ হয় সেখানে [illegible] কাপড়ে [illegible] দিলে [illegible] লিক্ আছে কিনা।

যদি লিক্ থাকে তবে সিলিণ্ডারটি খোলা জায়গায় সরিয়ে গ্যাস কোম্পানিকে তৎক্ষণাৎ খবর দিন। অবশ্য তার আগে দেখে নেবেন, আপনি গ্যাস সিলিণ্ডারের কিছু খুলে রেখেছেন কি না।

যদি কখনও সন্দেহ হয় গ্যাস বেরিয়ে জমা হয়ে আছে, তবে কখনই বিদ্যুতের কোন সুইচ্ খোলা বা বন্ধ করবেন না। অনেক সময় সুইচ্ থেকে সামান্য ফুলকি হয়। তা থেকেও অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। খুলতে গেলেই যে শুধু ফুলকি ওঠে তা নয়, ইলেকট্রিক সুইচ্ বন্ধ করতে গেলেও ফুলকি ওঠে। গ্যাস জমা হয়ে থাকলে পাখা চালিয়ে গ্যাস উড়িয়ে দেবার চেষ্টাও করবেন না।

গ্যাস বেলুনের সিলিণ্ডার থেকেও সাংঘাতিক বিপদ হয়। গ্যাস বেলুনে গ্যাস ভরা হয় হাইড্রোজেন গ্যাসের সিলিণ্ডার থেকে। হাইড্রোজেন গ্যাস বিশেষ রকম সহজদাহ্য পদার্থ। কখন যে কি ঘটে যেতে পারে বলা যায় না। বিশেষ করে মেলায় বা বাজারে গ্যাস বেলুনের আশেপাশে ছেলেরা জমা হয়, এবং হঠাৎ দুর্ঘটনায় অনেক মর্মান্তিক পরিস্থিতি হওয়ার খবর পাওয়া যায়। বোম্বাইতে [illegible] পার্শ্বসংলগ্ন কোন এক [illegible] বাইরে জন্মাষ্টমী মেলা বসেছিল। [illegible] পর ছেলের দল ছুটলো [illegible] কিনতে। কোথা থেকে কোন [illegible] জ্বলন্ত [illegible] ছুঁড়ে [illegible] কিছু বোঝা যায় না। কিছু ঘটনা [illegible] মারা [illegible] গ্যাস সিলিণ্ডার [illegible]। [illegible] লোক [illegible] হলো। [illegible] বেলুন-ওয়ালা [illegible] হয়নি।

⁂

[illegible] একটি পরিবারবন্ধু। [illegible]

[illegible]

[illegible] দূরে রাখতে পারে।

শ্রীমতী

॥ ছয়াল্লিশ ॥

উদয়শঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন লণ্ডনে, ১৯২০ সালে। সে-বছর তিনি সবে ভর্তি হয়েছিলেন রয়্যাল কলেজ অব আর্টস-এ। অনেক পরে ভারতবর্ষে কোন এক সময় রবীন্দ্রনাথকে সেকথা বলেছিলেন উদয়শঙ্কর। রবীন্দ্রনাথের কিছু মনে পড়েনি।

বিশ্বকবির সঙ্গে উদয়শঙ্করের যোগাযোগ রাখার সমস্ত রকম উদ্যম ও বিধিব্যবস্থা করতেন হরেন ঘোষ। তিনি জানতেন তাঁর এক ছত্র আশীর্বচন উদয়শঙ্করের জীবনে কাজ করবে মন্ত্রের মতন এবং নৃত্যশিল্পও তার আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছের মানুষের সঙ্গে সে-সময় উদয়শঙ্কর সম্পর্কে আলোচনা এবং চিঠিপত্র লেখালেখি করতেন। উদয়শঙ্করের সদলবলে শান্তিনিকেতন যাত্রার দিন কয়েক আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরম স্নেহের পাত্র অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু,

ধূর্জটি, উদয়শঙ্করের সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার আছে। লোকটি সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার। সেটা আশ্চর্যের বিষয়। ওর মধ্যে বাইরে থেকে অহঙ্কারের ইনজেকশন চলছে বারে বারে, খুবই তীব্র ঝাঁজের। আর কারো হলে কনভালশনের উৎপত্তি হতো। ওর চিত্তে খুব একটা জোরালো বিনয় আছে—সেটা ওকে নিরাময় করে রেখেছে। আমার মনে হয় এইটি খাঁটি ওস্তাদের লক্ষণ। নিন্দার বাণবর্ষণে নিজের আত্মাভিমানেরই সহজ বর্ম কাজে লাগে—কিন্তু নিরন্তর প্রশংসার আক্রমণে যে মানুষ শরশয্যাশায়ী হয় না তার মধ্যে আর্টিস্টের অমরতা আছে। আর্টিস্টের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে নিরন্তর অসন্তোষ থাকে—তার থেকে বোঝা যায় যতটা তার সিদ্ধি তার চেয়ে তার বুদ্ধি অনেকটা বেশি। এইখানে তার অমরতার যথার্থ পরিচয়। এই জন্যে, হিসাবমতো ঠিক যতটা তার অংশ পাওনা সেটাকে ছাড়িয়েও তাকে আগাম দাদন দিতে মন সংকুচিত হয় না, বিনয় থেকেই বোঝা যায়, একদা শোধ করবার মতো তার দলিল আছে। উদয়শঙ্কর জানে আদর্শটা কী; সেই জানাটা যার অহমিকায় অস্পষ্ট হয়ে যায়নি, তার মধ্যে যদি স্বাভাবিক শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির সামনে মহৎ সাফল্য অপেক্ষা করে আছে বলে ধরে রাখা যেতে পারে—যদি না পথে কোনো অভাবনীয় ব্যাঘাত ঘটে। উদয়শঙ্করের সেই স্বাভাবিক শক্তি পথে চলেছে—স্ফূর্তির জুয়ারজোয়ারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে এলিয়ে পড়েনি। যে মানুষ নিজেকেই নিজে শেষ মাত্রায় দাঁড়িয়ে বলে নেই, সেই তো সম্বর্ধনার যোগ্য। বর্তমানের আধারে যেটুকু সত্তর ধরা যায় তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ—যারা অহঙ্কার করে, তারা সেই সীমার মহিমা কল্পনা করেই স্ফীত হয়ে ওঠে। উদয়শঙ্করকে জয়ধ্বনি করতে আমার ভালো লাগে, কেননা সে জয়যাত্রা করেছে, ইন্দ্রদেবের তপস্যা-ভোলানো ছোট বর নিয়েই সে থেমে যায়নি। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ—সেই মিষ্টান্নে জনসাধারণের পেট দু-দিনেই ভরে যায় তারপরে আসে অবসাদ। আমার বিশ্বাস, উদয়শঙ্কর তার চেয়ে বড়ো ভাণ্ডারের অধিকারী হবে। তার উপস্থিত কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে যদি কিছুমাত্র অসন্তোষ থাকে তবে তাতেও তার মহত্ত্বের সূচনা করে—যদি সে খর্বশক্তির মানুষ হতো তা হলে তার অল্পটুকু আদায় করে আমরা বলতুম বহুৎ খুব। আমরা তার মধ্যে যে অভাব দেখছি সেটা অসমাপ্তি, সেটা অপূর্ণতা নয়। এই তার অসমাপ্তি বৃহৎ পূর্ণতার অভিসারিক। ইতি ১৯ আষাঢ় ১৩৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

হরেন ঘোষ উদয়শঙ্করের নামের আগে 'বিশ্ববিজয়ী' বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু শুধু এইটুকু করেই নিশ্চিন্ত হলেন

রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্কর

না তিনি, তাঁকে আরও কিছু মর্যাদা দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দু-একদিনের জন্যে ১৯৩৩-এর জুলাই মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্যের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে আসছে। হরেন ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন।

একটা অভিনব কিছু করতে চেয়েছিলেন হরেন ঘোষ। বিশ্ববিজয়ী বিশেষণ ব্যবহার করলেও তিনি জানতেন বিশ্বকবি যদি প্রকাশ্য প্রেক্ষাগৃহে উদয়শঙ্করের গলায় মালা পরিয়ে দেন তা হলে কী সংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে দেশবাসীর মনে এবং মর্যাদার সিংহাসনে কত সহজে আরোহণ করতে পারবেন উদয়শঙ্কর!

প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে। নিজের আসন ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগলেন রঙ্গমঞ্চের দিকে। উদয়শঙ্করকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। তিমিরবরণ তাঁকে ঠেলা মেরে বললেন, 'শিগগির যান, কবি এইদিকে আসছেন—'

উদয়শঙ্কর মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে এসে দাঁড়ালেন কবির সামনে। তাঁকে প্রণাম করে গ্রহণ করলেন মালা। এবং যেমন ভেবেছিলেন হরেন ঘোষ, তাঁর প্রচারের মহিমায় গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর জীবন, তার শিল্প।

কিন্তু পরে উদয়শঙ্করের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের মাল্যদান যখন তাঁরই বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা আর একবার মনে করিয়ে দিল দেশবাসীকে এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার মতন আলোচনা চলতে লাগল চতুর্দিকে, তখন যেন ঈষৎ কুণ্ঠিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ আর এক পত্র লিখলেন ধূর্জটিপ্রসাদকে—

কল্যাণীয়েষু,

ধূর্জটি, উদয়শঙ্করের গলায় মালা দিয়েছিলুম, মনে করিনি ব্যাপারটাকে এত অত্যন্ত সার্থক বলে কেউ মনে করবে। ওটা একটা সৌজন্যের অলংকার, এ রকম অলংকারে কিছু অত্যুক্তি থাকতে বাধ্য, ব্যবহারটাকে যথাযথ অর্থসই করার চেয়ে তাকে মানানসই করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। উদয়শঙ্করের শক্তি আছে দীপ্তি নেই। খুব পাকা রকমে চালচিত্র বানিয়েছে নানা ভূষণে, কেবল প্রতিমা আনতে পারেনি। ও যে ভূমিকাটা দেখিয়েছে আমাদের দেশের আধুনিক নাচে তার অভাব আছে—সেই পাকা ভূমিকার অভাবে আমাদের নাচ আর্টের সুনিশ্চিত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে পারচে না। একদা আমাদের কাব্য সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ ছিল নেহাৎ ঢিলেঢালা, যথা "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।" সেই ঢিলেমি নেহাৎ অর্বাচীনের কলমেও আজ দেখা যায় না। অবশ্য ছন্দ ও ভাষার এই পাকা ভিৎ ইমারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও যথেষ্ট নয়, মন্দির বানিয়ে তোলবার হাতটাই রাজমিস্ত্রির হাত। সেই রাজমিস্ত্রি ব্যর্থ হয় যদি ভিতের কাজটায় ছেলেমানুষি থাকে। উদয়শঙ্কর আমাদের নাচের বিদ্যায় এই উপক্রমণিকাটা নিপুণ করে দিচ্চে। লোকে বুঝবে যেমন তেমন করে হাত নাড়লেই নাচ হয় না, ওর জন্যে সাধনা চাই। উদয়শঙ্করের সাধনা সুপ্রত্যক্ষ। এই সাধনার দুর্লভ অর্ঘ্য পেলে নটরাজ তার পরে বর দেবেন। স্টেজে উদয়শঙ্করকে দেখেছি—মনে হোলো যেন চিকে কাঁচুলিতে ষোড়শীকে দেখলুম। কাল শান্তিনিকেতনের ছোট মঞ্চে তার নাচ দেখলুম—নাচের সুঠাম সৌষ্ঠব স্পষ্ট দেখা গেল—বুঝলুম লোকটা যথার্থই গুণী বটে। কিন্তু এই গুণপনাকেও ছাড়িয়ে উঠতে হবে। যদি সেই সৃষ্টিশক্তি না থাকে তবু যা পেয়েছি সে কম নয়। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রান্তে এসেচে এই নাচ, তারপরে কৃতার্থতার স্বর্গলোকে আরোহণ করতে পারবে। সাফল্যের রূপ দেখবার পূর্বে প্রত্যাশার রূপ দেখা যায়—সেই রূপটা কাল রাত্রে দেখে খুশি হয়েছি—এখনো যা অনাগত, তার উদ্দেশে মালা দেওয়া চলে। আমার মালা বসন্তের শেষ বেলাকার মালা, এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে — উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা কিশোরী, সে মঞ্চের হাওয়ায় ওড়না উড়িয়েছে, আমার গলায় যা বাসি হলো, তার গলায় তা মানাবে। দিতে পারলে মন খুশি হয়। ইতি ২৫ আষাঢ় ১৩৪০।

রবীন্দ্রনাথ"

উদয়শঙ্করের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই প্রচ্ছন্ন স্নেহের ভিন্ন একটা কারণও হয়তো ছিল। উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের প্রায় দশ বারো বছর আগে অবহেলিত নৃত্য শিল্পকে মর্যাদা দেবার চেষ্টা যিনি প্রথম করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। সেদিন তাঁর ভাগ্যে ছিল শুধু নিন্দা অপযশ। সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর গলায় মালা দেবার কেউ ছিল না। ছিল না হরেন ঘোষের মতন ধীর স্থির নম্র ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ যিনি উন্মুক্ত করে দেবেন বিরাট যশোক্ষেত্রের কঠিন অর্গল।

১৯১৯ সালে নভেম্বরের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে যান। সেখানে স্থানীয় মণিপুরী সমাজ রাতে তাঁকে মণিপুরী নৃত্য দেখায়। এই নাচ দেখে মুগ্ধ হন রবীন্দ্রনাথ। এবং স্থির করেন শান্তিনিকেতনে এই নৃত্য প্রবর্তনের চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরা থেকে বিখ্যাত মণিপুরী নর্তক বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়েছিল। ছাত্ররা তার খোলের সঙ্গে নৃত্য শিক্ষা শুরু করে। এই নাচ ব্যায়াম ও নৃত্যের সমবায় বলা যেতে পারে—Rhythmic dance। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল বাঙালী ছেলের আড়ষ্ট দেহ নৃত্য ও ব্যায়ামের যুগ্ম সাধনায় সুন্দর হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্র জীবনীতে প্রভাত মুখোপাধ্যায় একথা লিখলেও শান্তিদেব ঘোষ স্পষ্টই বলেছেন, "নৃত্যকলার শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা থাকলেও গুরুদেব সে কথা প্রকাশ্যে তখন ঘোষণা করতে পারেন নি। তাঁকে বলতে হয়েছিল, এটি আশ্রম বালকদের উপযোগী মৃদঙ্গের তালের সঙ্গে ব্যায়াম শিক্ষা। বিশ্বভারতীর পাঠ্যসূচিতেও নৃত্যকলা বহু বৎসর শিক্ষণীয় বিদ্যা হিসেবে স্থান পায় নি। এর কারণ হল, বিদ্যালয়ের বা বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের অনেকেরই মন, তখন নৃত্যকলাকে সম্মানজনক বিদ্যা হিসেবে গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল না। পরবর্তী বৈশাখ মাসে গুরুদেব যখন ইউরোপে যান, তখন নৃত্য শিক্ষককে গ্রীষ্মের ছুটির পর আনাতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতি কালে মণিপুরী নাচের চর্চা বিদ্যালয়ে উৎসাহের সঙ্গে চলবে কি না সে বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল।"

বিখ্যাত মণিপুরী নর্তক নবকুমার শান্তিনিকেতনে নৃত্য শিক্ষক হয়ে এলেন আরও প্রায় সাত-আট বছর পরে। আগরতলায় ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবি মণিপুরী নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং তখনই স্থির করে ফেলেন এই নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে করবেন পাকাপাকিভাবে। নবকুমারের নৃত্য শিক্ষায় "নটীর পূজা" নৃত্যনাট্য সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "নটীর পূজা", প্রথম নৃত্য কলালক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করল মর্যাদার আসনে। এই নৃত্যনাট্য রচনার একটা মজার ছোট ইতিহাস আছে। ১৩৩২ সালের চৈত্রের শেষ ভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি দেখেন কথা ও কাহিনীর পূজারিণীর মূকাভিনয়ের আয়োজন চলেছে। এক মাস পরে তাঁর জন্মোৎসবে অভিনীত হবে।

রবীন্দ্রনাথ তখন এই কাহিনী অবলম্বন করে নাটিকা লিখতে শুরু করলেন। উদ্যোক্তারা তাঁকে বললেন, পুরুষ ভূমিকা বর্জিত নাটক চাই। কবি লিখছেন, "তাগিদে পড়ে লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরীণ তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময় মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

নটীর পূজা বৈশাখ ১৩৩৩-এর বসুমতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির জন্মদিনে পঁচিশে বৈশাখ এই নৃত্য নাট্যের অনুষ্ঠান হল শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যায়।

সাহিত্যরসিক যদুনাথ সরকার

ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের ভাবমূর্তি হল আচার্য যদুনাথ সরকারের। কিন্তু তাঁর সেই বিরাট ঐতিহাসিক প্রতিভার অন্তস্তলে যে একটা স্বচ্ছ সাহিত্যরসিকতার ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, সে দিকটা আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন। আমাদের কাছে এ তথ্যও কি তেমন পরিচিত যে যদুনাথের জীবনে সাহিত্যই আগে মুখ্য হয়েছে, পরে ইতিহাস!

বি এ পড়ার সময় যদুনাথ যদিও যুগপৎ ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নেন এবং উভয় বিষয়েই সসম্মানে উত্তীর্ণ হন, এম এ-তে তিনি কিন্তু পাঠ্যবিষয় করেন ইংরেজি সাহিত্য। এবং পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে রেকর্ড নম্বর পেয়ে।

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা নিয়ে যদুনাথ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এই অধ্যাপনার কাল পনের বছর। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৮ সাল। এর পর সাহিত্যের পথ ছেড়ে ইতিহাসের পথে পা বাড়ান, এবং ইতিহাসের অধ্যাপনায় তথা দুরূহ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে বিরোধ তো নেই-ই, বরং এদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে। পরস্পর পরস্পরকে চিনতে গূঢ়ভাবে সাহায্যই করে থাকে। সাহিত্যের পাঠ গভীর ভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত যদুনাথ তাঁর গবেষণালব্ধ ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রাবলী অমন জীবন্তরূপে বাঙ্ময় করতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই যদুনাথ সাহিত্যরসের আস্বাদ লাভ করেন। এ বিষয়ে সহায়তা পান তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে। যদুনাথ নিজেই বলেছেন, "আমার পিতার একমাত্র (কনিষ্ঠ) ভ্রাতা হরকুমার সরকার অল্পবয়সে...... বাংলা সাহিত্যে অগাধ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কাছে সব-ভালো বাংলা বই ও মাসিক...প্রকাশ হওয়া মাত্র আসত। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এইভাবে তাঁর কাছে আসে। এঁর কাছে আমি বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের আস্বাদ পাই।"

সাহিত্যের আস্বাদন এবং পনের বছর সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মধ্যেই যদুনাথের সাহিত্যপ্রীতি সীমিত থাকে নি। এই সময়ের মধ্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি কিছু কলমও চালিয়েছেন। অবশ্য তা সৃষ্টিধর্মী নয়। অন্তত ছাপার অক্ষরে প্রমাণ নেই। তাঁর এই সব রচনা হল সমালোচনামূলক। এবং এই সাহিত্যকৃতির প্রেরণা জাগে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে।

*

সে হল ১৩১২-১৩ সালের কথা। তখন বাংলা সাহিত্যের আসরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটা প্রচণ্ড রবীন্দ্র-বিরোধিতার আলোড়ন তুলেছেন। রবীন্দ্র-কাব্য দুর্নীতিপরায়ণ তথা অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য এই ছিল তাঁর অভিযোগ। প্রায় পনের বছর আগেকার লেখা সোনার তরী কবিতাটি বেছে নিয়ে তাঁর বক্তব্য—রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতা সম্পর্কে—তুলে ধরলেন 'কাব্যে অভিব্যক্তি' নামে এক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি তখনকার বিখ্যাত প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৩ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সময় যদুনাথ পাটনা কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্যের প্রতিবাদে লেখনী ধরলেন। ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসীতে 'সোনার তরী ব্যাখ্যা' নামে তাঁর প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ছাপা হয়। যদুনাথ সোনার তরীর একটা বোধগম্য গভীর জীবনবোধসম্মত ব্যাখ্যা দেন এবং তারপর মন্তব্য করেন, "রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ('সোনার তরী'কে এ ভাবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুরাতন-স্মৃতি-অভ্যস্তভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা করা যায় না; এবং না বুঝিতে পারিয়া অমনি নব-বাণীর দূতের প্রতি অথবা রবি-ভক্তগণের প্রতি মধুচক্রে ঢিল ছুঁড়িলে শুধু 'হাসির সমালোচনা' রচনা করা হয়।" তিনি যে রবীন্দ্র-ভক্তের দলে তা এই উক্তির মধ্যে বেশ ধরা পড়ে। এবং তাঁর সাহিত্যরস-দৃষ্টি যে কত স্বচ্ছ তার আরও প্রমাণ মেলে এর পরের উক্তিতে।—"কেবল একটি কবিতা বা অধ্যায়ে চক্ষু নিবিষ্ট রাখিলে, লেখকের মনের ভাব ধরা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু এমন কোনো লেখক নাই যাঁহার অনেকগুলি এক সময়ের রচনা পড়িলে অর্থবোধ অসম্ভব বা কঠিন।...আমাদের দেশের সমালোচকরা যদি ভাব-বিকাশ তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরনের কবিতাগুলি পাঠকসমাজে বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত। তাহা হয় নাই বলিয়া কি এগুলি অর্থহীন জটিলতা মাত্র, শুধু 'মিছে কথা গাঁথা'?"

পরের বছর, অর্থাৎ ১৩১৪ সালে, ঐ প্রবাসীতেই যদুনাথের আর একটা সাহিত্য প্রবন্ধ দেখতে পাই। প্রবন্ধটির নাম 'দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।' লেখাটি যদিও ১৩১৪ সালে ছাপা, আসলে কিন্তু এটি রচিত হয় ১৩০৯ সালে। এই তারিখ খেয়াল রেখে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার প্রথম দুই দশকের ফসল লক্ষ্য করে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হেমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চেয়েছেন। এই তুলনামূলক আলোচনায় তিনি বলেন যে, একশ্রেণীর কবিরা সমসাময়িক যুগের ভাব ও চিন্তার প্রতিধ্বনি করেন, আর একশ্রেণীর কবিরা হন ভবিষ্যতের দূত। হেমচন্দ্র হলেন প্রথম শ্রেণীর কবি, ইংলণ্ডের যেমন টেনিসন। যদুনাথ স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথকে ভবিষ্যতের দূত না বললেও ইঙ্গিতটা বুঝতে পারা যায়। যা স্পষ্ট করে বলেছেন তা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিবিম্বক। তাতে আছে সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশ ও বিশ্লেষণ। হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে সব ভাব প্রকাশ করেছেন তা অতি সরল ও সনাতন। কিন্তু "বর্তমান জগতের প্রশ্নগুলি এত সহজ নহে। সমাজ ও শিক্ষা যেমন বাড়িয়াছে, প্রশ্নগুলিও সেই সঙ্গে বড় জটিল ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।... আমাদের মধ্যে কেবল রবীন্দ্র এই নূতনতম যুগের ভাব অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আশ্চর্য সফলও হইয়াছেন।"

*

১৯০৮ অর্থাৎ বাংলা ১৩১৫ সাল থেকে যদুনাথ সাহিত্যের অধ্যাপনা ছেড়ে ইতিহাসের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে সাহিত্য নিয়ে লেখার

শুরু পড়ুন। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ্য। ১৯১০ সালে ভাগলপুরে এক সাহিত্য সম্মিলন হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন ও একটি অলিখিত ভাষণও দেন। এই সম্মিলনে যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা) এই ভাষণের শ্রুতিলিখন করেন। ১৩১৬ চৈত্র সংখ্যায় প্রবাসীতে তা ছাপা হয়।

ইতিহাসচর্চাকে পুরোপুরি গ্রহণ করার ফলে, হয় সময় অথবা অভিরুচির অভাবে, সাহিত্য নিয়ে স্বরচিত লেখা না লিখলেও যদুনাথ সাহিত্যকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারেননি। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তাঁকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এক নতুন ভূমিকায় দেখা যায়। এ ভূমিকাও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। ১৯১০ সাল থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনার ইংরেজি তর্জমা ছাপাবারপালা শুরু করেন। (উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথকে সব ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক পাঠকসমাজে পরিচিত করা। ইংরেজি পত্রিকা হিসেবে মডার্ন রিভিয়ু-র তখন খুবই সুনাম এবং প্রচার। এই তর্জমার পালা এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ—উভয় ব্যাপারের তৎকালিক সংঘটনা বিস্ময়কর।) উক্ত তর্জমার পালায় যদুনাথ ছিলেন পুরোভাগে। ঐ দু বছরে তিনি রবীন্দ্রনাথের সতেরটি লেখার তর্জমা করেন। তার মধ্যে আছে চারটি গল্প। গল্পগুলি হল: ঘাটের কথা, একরাত্রি, জয়-পরাজয় ও মহামায়া। অন্যগুলি হল প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, শকুন্তলা ও কালিদাস, নারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ইত্যাদি বিষয়ক। অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১১ সালে কবি তাঁর অচলায়তন নাটকটি যদুনাথকে "আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ" উৎসর্গ করেন।

তারপর দীর্ঘকাল অন্তে, তাঁর বয়স যখন প্রায় সত্তরের কোঠায়, যদুনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে আবার দেখা দেন রসজ্ঞ সমালোচক হিসেবে। এবার তাঁর বিষয়বস্তু বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র। ১৯৩৮ অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বঙ্কিম রচনাবলীর এক সুষ্ঠু ও প্রামাণ্য সংস্করণ বার করতে উদ্যোগী হন। এই কর্মকাণ্ডে যদুনাথ অনুরুদ্ধ হন বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখে দিতে। যদুনাথ ভূমিকাগুলি লিখে দেন। বেশ যত্নের সঙ্গে তিনি এই লেখাগুলি লেখেন। লেখাগুলির আয়তনও আছে। একসঙ্গে ছাপালে শ'খানেক পৃষ্ঠার একটা বই হয়ে যাবে।

এই ভূমিকাগুলিতে যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরানী, রাজসিংহ এবং সীতারাম—এই পাঁচখানি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা এবং সে-হিসেবে এদের গুণাগুণ বিশদ করেছেন। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে একমাত্র রাজসিংহকেই বঙ্কিম নিজে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, বাকিগুলির সম্পর্কে স্পষ্ট 'না' বলেছেন। কিন্তু যদুনাথ বঙ্কিমের উক্তি শিরোধার্য করেননি। তাঁর মতে "বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে একটি বড়ই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ ছিল যে, ইতিহাসের সত্য ঘটনামাত্র উপন্যাসের ভাষায় বিবৃত করিলে তবেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নামের যোগ্য; অর্থাৎ তাহাতে অধিকাংশ পুরুষগুলি ইতিহাসে পরিচিত ব্যক্তি হইবে, এবং অতি কম সংখ্যায় কাল্পনিক চরিত্র থাকিবে; কথাবার্তাগুলি প্রায়শঃ তাঁহার নিজের রচিত, কিন্তু বর্ণিত ঘটনা এবং বিষয়-পরিকল্পনা (প্লট) একেবারে নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে তোলা।" যদুনাথ জানাচ্ছেন, এই উপন্যাসগুলিতে (বস্তুত, যদুনাথ দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম, সাতখানি উপন্যাসকে ধরেছেন) ঐতিহাসিক চরিত্র তথা ঘটনা তথ্যগত দিক থেকে হয়ত জোরালো ভাবে নেই, কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটিতে "অতীত যুগের সমাজের, ঘরবাড়ীর, মানবচিন্তার, আচার ব্যবহারের অনেকাংশে সত্য চিত্র প্রতিবিম্বিত" হয়েছে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তথ্য উপাদান খোঁজেন, কিন্তু উপাদানের অভাববোধে বঙ্কিম নিজের কল্পনার সৃষ্টি দিয়ে আমাদের অতীত যুগকে নিজের সম্মুখে সৃষ্টি করে তার জীবনপ্রবাহ আমাদের কাছে এনে দেখালেন। অতীত যুগ এক "আলোক আলোকে" জীবন্ত হয়ে আমাদের কাছে ফুটে উঠল। এবং এই কারণেই এগুলি সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাস। অবশ্য এগুলিতে ইতিহাসের উপাদান স্থান কাল পাত্রে কতখানি ধরা পড়েছে, তার বিশ্লেষণে যদুনাথ তাঁর ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে যা জ্ঞাতব্য তথ্য সবই জানিয়েছেন। বঙ্কিমের কল্পনাদৃষ্টি যে কতখানি সত্যদৃষ্টি ছিল, ঐতিহাসিক যদুনাথ তার বিকাশ দেখে নিজেই বিস্মিত হয়েছেন। রাজসিংহ যখন লেখা হয় তখন আওরংজেব ও তাঁর কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদান অনেক কিছু অপ্রকাশিত ছিল। পরে অনেক উপাদান আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয় (যদুনাথ স্বয়ং যার মূলে)। সেই নতুন উপাদান ও তার তাৎপর্য যদুনাথ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন রাজসিংহের ভূমিকায় এবং তারই আলোকে রাজসিংহ ও আওরংজেবের যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে "বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র।" প্রসঙ্গত বলি, রাজসিংহের ভূমিকাটি সব চাইতে বড়।

১৩৪৫ সালে বঙ্কিম-শতবার্ষিক গ্রন্থে প্রথম ভূমিকা লিখতে শুরু করেন যদুনাথ। আনন্দমঠ দিয়ে আরম্ভ হয়। শেষ ভূমিকাটি লেখেন সীতারাম উপন্যাসের জন্যে, ১৩৫২ সালে। সীতারামের দৃশ্যপট যে রীতিমত ঐতিহাসিক সত্য তা যদুনাথ তাঁর অধিগত পাণ্ডিত্য ও তথ্যপ্রমাণাদির উদ্ঘাটনে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে এ বই য়ুরোপীয় সাহিত্যে রচিত হলে সেখানকার গুণিগণ একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে নিঃসন্দেহে স্থান দিতেন।

এই ভূমিকাগুলিতে যদুনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল" এই যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস মূলত লেখকের কল্পনার সৃষ্টি। ইতিহাস থেকে চরিত্র ও ঘটনার অবিকলতা টেনে আনলেই যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সার্থক হয়ে উঠবে, তার কোনো মানে নেই। বরং ইতিহাসে যা নেই অথচ ঘটতে পারত, এমন একটা আবেদন যদি লেখক পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে পারেন, তা হলেই লেখকের রচনা খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হতে পারে। ইতিহাসের পটভূমিতে সেই কালের জীবন যদি প্রাণবন্ত হয়, নতুন আলোকে আলোকিত হয়, তা হলেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা।

যদুনাথের এই বক্তব্যের মিল পাওয়া গেল বিলেতের টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্টের একটি লেখায়। উক্ত লেখা যদুনাথের শেষ ভূমিকাটি ছাপা হবার মাস দুই আগেকার। লেখাটি রয়াল হিস্টরিক্যাল সোসাইটিতে অধ্যাপক গুচ যে বক্তৃতা দেন তার ওপর ভিত্তি করে। অতীতের দৃশ্যপটে "যাহা হইলেও হইতে পারিত" এমন কাহিনী জীবন্ত করার মধ্যেই যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা, অধ্যাপক গুচের বক্তব্যে সেই কথার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সত্য ইতিহাসের মধ্যে একটা অভাব বোধ থাকে।—অতীতের নায়ক-নায়িকারা তাদের জীবনের প্রচ্ছন্ন দিকগুলি অনুদ্ঘাটিত রেখেই অন্তর্ধান করে। ফলে আধুনিক কাল অতীতকে শুধু ভাসা-ভাসা ভাবে চেনা যায়। পাঠক হৃদয়ে এই শূন্য স্থান পূর্ণ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস। গুচ সাহেব বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস আমাদের ক __ ইতিহাস বুঝতে __ কত

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১৫ ॥

সূর্য হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো তোমাকে আমি অত সহজে মরতে দেবো ভেবেছ? না। তোমাকে আমি মরতে দেবো না।

বুলবুল তার সজল চোখ দুটি তুলে বললো, আমি তো বাঁচতে চাই না।

সূর্য ক্রুদ্ধস্বরে বললো: মরা অত সোজা নাকি! আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দেবো না।

সূর্যর গলার আওয়াজে শিশুসুলভ দৃঢ়তা ছিল। যেন সে সত্যিই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে চায়। শুধু বুলবুলকে বাঁচাবার জন্যই নয়, মৃত্যুকে পর্যুদস্ত করার স্পৃহাও তার মধ্যে জেগে ওঠে। মৃত্যুকে সে তো অনেকবার অনেক রূপে দেখেছে। তাই তার রাগ বেশী।

বুলবুল আর কোনো কথা বলার বদলে কাঁদতে শুরু করে। যুক্তির বদলে কান্নাই তার পক্ষে প্রশস্ত মনে হয়। যদিও এই কান্না নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, নিজেকে ধ্বংস করার জন্য।

বুলবুলের এ-ধরনের যুক্তিবোধ সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় করে দেয়। তারপর সে বুলবুলের কাঁধ কাঁপিয়ে বলে, তুমি বলছো কি? তুমি মরতে চাও?

বুলবুল তার কৃশ মুখখানি তুলে বলে, আমি আর কেন বাঁচতে চাইবো বলো? আমার কি আছে?

—বুলবুল, আমি আছি! তুমি আমার কথা চিন্তা করছো না?

—বাঙালীয়া, আমি তোমার যোগ্য নই! আমি তোমাকে পেলাম না।

—তুমি এ কি বলছো?

—আমি ঠিকই বলছি!। আমি আর কি চাইতে পারি? আমার মতন মেয়ে আর কি আশা করতে পারে? তোমার মতন একজন পুরুষ, এত যার রূপ, এত বড় যার হৃদয়, তাকে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? তবু আমার ভাগ্যে সইলো না! আমার নসিবটাই খারাপ! আমার নিজের মা কিভাবে মারা গেছে তুমি জানো? ঠিক, আমারই মতন—

—বুলবুল, ছিঃ, এমন কথা বলে না। আমার মা কিসে মারা গিয়েছিলেন জানো? তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তা বলে, আমিও কি আত্মহত্যা করছি!

—বাঙালীয়া, তুমি কেন আত্মহত্যা করবে? তুমি আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাও!

—পাগলীর মতন কথা বলো না! তোমার কি হয়েছে কি, কিচ্ছু হয়নি!

সূর্য তার পরদিন থেকে তোলপাড় কাণ্ড করতে থাকলো। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের কাছে সে আর গেল না—তার বদলে সে অন্য তিনজন ডাক্তার ডেকে আনলো। সব রকম পরীক্ষা ও ফোঁড়াফুঁড়ি চললো। তখনো, পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে, যক্ষ্মাকে রাজরোগ মনে করা হতো। এর মধ্যে এক-জন ডাক্তার আবার অভিমত দিয়ে ফেললেন যে বুলবুলের মোটেই টি বি হয়নি। এক্স-রে রিপোর্ট সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়স্বরে তাঁর মত ঘোষণা করতে লাগলেন। এই ডাক্তারটি, যদিও ছিলেন এম বি বি এস, তবু ছিলেন জল চিকিৎসার ভক্ত। দিনের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে জল পান করিয়েই যে এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, তিনি তাই সুপারিশ করলেন। এবং, আশ্চর্যের বিষয়, বুলবুলের কিছু উন্নতি হতে লাগলো। তার জ্বর ছেড়ে গেল, কাশির দমকেও আর কষ্ট পায় না।

চিকিৎসার সময়ে প্রায় এক মাস সূর্য একবারও বুলবুলের পাশ ছেড়ে নড়েনি। সূর্যর স্বাস্থ্যজ্ঞান আছে, সে জানে টি বি রোগীর পাশে ও-রকম শুয়ে থাকা উচিত নয়, কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। ওদিকে, বুল-বুলের স্বাস্থ্যজ্ঞান নেই, সে জানে না, তার থুতু বা কাশি অন্য কেউ ছুঁলে কি হয়—তবু সে প্রত্যেক দিন সূর্যকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে অন্য কোনো ঘরে চলে যেতে। অন্য কোনো ঘর মানেই অন্য কোনো মেয়ের ঘর। এ বাড়িতেই আর তো কোনো খালি জায়গা নেই। সে কথা বুঝেও বুলবুল সূর্যকে চলে যাবার জন্য জোর করে। সূর্যকে অন্য কোনো মেয়ের হাতে সঁপে দিতেও তার কোনো আপত্তি নেই এখন। প্রতি রাত্রে এই বিষয়ে পনেরো-কুড়ি মিনিট কথা কাটাকাটি হয়ে উঠেছিল একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বুলবুল ঘুমিয়ে থাকার পরও সূর্য জেগে থেকেছে। তার ভিতরে সব সময় এই চাপা ভয়টা ছিল যে বুলবুল বুঝি যে-কোনো সময়ে নিঃশব্দে মরে যাবে। সূর্য মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চায়—সে কিছুতেই বুলবুলকে একা ছাড়বে না। কোনো কোনো দিন বুলবুলের বুকে খুব বেশী ব্যথা হলে সূর্য সেখানে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কাঁচুলি খোলার পর বুলবুলের উন্নত বুকে হাত বুলিয়ে সূর্যর মনে হয়েছে, কিছুই তো বদলায় নি। বুলবুল তো ঠিক সেই রকমই আছে। মৃত্যুটা তাহলে নিশ্চয়ই একটা অবাস্তব ঘটনা!

বুলবুল যখন অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে, সেই রকম সময়ে একদিন মাঝ রাত্রে সূর্য একটি ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল! সেদিন সূর্যর একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ ঝুমঝুম শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল।

সূর্য ধড়ফড় করে উঠে দেখলো, বুলবুল বিছানায় নেই।

বাথরুম অনেক দূরে, সেই জন্য ঘরের কোণে একটা বড় গামলা রাখা ছিল। বুলবুল সেখানে বসে আছে। সূর্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে দেখলো, বুলবুল গলায় হাত দিয়ে ইচ্ছে করে বমি করছে। গলগল করে বেরুচ্ছে কাঁচা রক্ত।

সূর্য কোমলভাবে বুলবুলের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, কি হয়েছে বুলবুল? তোমার বুকে ব্যথা করছে?

বুলবুল এক ঝটকায় সূর্যর হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, ছেড়ে দেও মুঝে—

সূর্য অবাক ভাবে চেয়ে রইলো বুলবুলের চোখের দিকে। বুলবুলের দৃষ্টি উন্মাদিনীর মতন। সে চিৎকার করতে লাগলো, নিকাল যাও! তুম্ মেরা ঘরসে নিকাল যাও!

বুলবুলের অসুখ পুরোনো হয়ে গেছে। এখন আর তার আকস্মিক চিৎকার শুনলে অন্য ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে আসে না। এই রাত্তিরেও কোনো কোনো ঘর থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসে। রক্ত-মাংসের উল্লাসময় যে জীবন, তা অন্য কারুর দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দৈত্যের হাতের খেলনার মতন সূর্য জোর করে বুলবুলকে কোলে তুলে নিয়ে আসে। বুলবুল ছটফট করে, সূর্যকে আঁচড়ে কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে দিতে চায়। সেই সঙ্গে তার মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতন বেরোয় অজস্র গালাগাল। এমনকি সূর্যকে সে রেণ্ডিকা বাচ্চা বলতেও দ্বিধা করে না। আশ্চর্য, যে নিজে রেণ্ডি, তার কাছেও রেণ্ডির বাচ্চাই একটা চূড়ান্ত গালাগাল।

পরপর কয়েক দিন বুলবুল সূর্যকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সে কিছুতেই আর সূর্যর সঙ্গে থাকতে চায় না। তার ব্যবহারে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সে আর নিজের ভাগ্যের সঙ্গে সূর্যকে জড়াতে চায় না। সে সূর্যকে মুক্তি দিতে চাইছে। বুলবুল তো আর সূর্যর গোঁয়ার্তুমির পূর্ব পরিচয় পায়নি!

দিন দশেক বাদে বুলবুলের অবস্থা আবার হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়ে। জল চিকিৎসার সেই ডাক্তার খুঁটিনাটি ব্যাপারে ভুল ধরে সূর্যকে তিরস্কার করেন। অন্য ডাক্তাররা বলেন, কাছাকাছির মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ছাড়া অন্য কেউ আর বুলবুলকে বাঁচাতে পারবে না। সূর্য আবার রাধাগোবিন্দ করের কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে তাঁকে ডেকে এনেছিল। তিনি খিটখিটে মেজাজ নিয়ে আবার এলেন, বুলবুলের সঙ্গে একটিও কথা না বলে ভালো করে পরীক্ষা করলেন—তারপর সূর্যকে বাংলাতে জানালেন, আর দিন দশেকের মধ্যে মেয়েটা এই পাপ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

সূর্যর দিকে ফিরে তিনি জ্বলন্ত চোখে বললেন, তোমারও মুক্তি!

ডাক্তার চলে যাবার পর সূর্য জিজ্ঞেস করলো, বুলবুল, তোমার কি ইচ্ছে করে? তুমি কিছু খেতে চাও? তুমি কোনো জিনিস চাও?

বুলবুল আগের তুলনায় অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে। সে তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাঙ্গালীয়া, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না!

সূর্য বুলবুলের উষ্ণ কপালে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে বললো, তোমাকে আমি কক্ষনো ছেড়ে যাবো না। আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই!

সূর্য একটু অন্যমনস্ক হতেই বুলবুল বিছানার ওপর উঠে দাঁড়ালো। টলটলে পায়ে একটু হেঁটে বললো, তুমি নাচ ভালোবাসো। আমি এখনো নাচতে পারি। দেখবে?

সূর্য এক লাফে বুলবুলের কাছে এসে তার কাঁধ চেপে ধরে ধমকে বললো, কি হচ্ছে কি?

বুলবুল হাসতে হাসতে শরীর দোলাতে লাগলো। পরক্ষণেই সূর্যর বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলো হু হু করে।

সব ব্যাপারটা অতি নাটকীয় মনে হয়। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কোনো নাটক নেই।

কয়েকদিন বাদে, বুলবুলের যখন কণ্ঠস্বর পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে, সেই সময় সূর্যর একটা কথা মনে পড়লো। বুলবুল এক সময় প্রায়ই বলতো, সে কখনো সমুদ্র দেখেনি। গোয়ালিয়ার ছেড়ে সে বাইরেই গিয়েছে খুব কম—তবু সে পাহাড় ও নদী দেখেছে, কিন্তু সমুদ্র দেখা হয়ে ওঠে নি। কয়েকবার সে সূর্যর কাছে আবদার করেছিল, বাঙ্গালীয়া, আমাকে একবার সমুদ্র দেখাবে?

সূর্যর মনে হলো, জীবনটা শেষ হয়ে যাবার আগে, বুলবুলের এই বাসনাটা অতৃপ্ত থাকে কেন? সে কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, বুলবুল তুমি সমুদ্র দেখতে যাবে?

বুলবুল চোখ অর্ধেক খুলে বললো, সেখানে তুমি আমার পাশে থাকবে তো?

—হ্যাঁ। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো?

—সেখানে আমার অসুখ কি কমবে? ওগো, আমার বড় কষ্ট—আমার কষ্টটা একটু কমিয়ে দাও না!

—এবার তোমার কষ্ট কমে যাবে।

—আমার বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে! আমি জীবনে কি পেলাম? বড় কষ্ট...তুমি বুঝবে না...সত্যি সমুদ্র দেখতে পারবো? তোমার পাশে দাঁড়িয়ে?

—নিশ্চয়ই। সমুদ্রের ধারে কারুর অসুখ থাকে না! সেই জন্যই তো সমুদ্রের কাছে যাবার কথা বললাম।

বুলবুলের মতন সামান্য মেয়ে তখন অসামান্য চোখে সূর্যর দিকে তাকায়। সূর্যর এই স্তোকবাক্য শুনে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের চেয়েও গভীরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, যদি আর একটা বছরও বাঁচতে পারতাম!

আর একটা বছর বাঁচলে বুলবুলের কোন্ পরমার্থ সাধিত হতো, তা সূর্য জানেন। তবু সে তীব্র ভাবে চিন্তা করতে লাগলো, মাত্র একটা বছর সে কোনো জায়গা থেকে ধার আনতে পারে না? তার নিজের জীবন থেকে অনেকগুলো বছর তো সে যে-কোনো মুহূর্তেই দিতে রাজি আছে!

ট্রেনে বুলবুলকে এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ঠাকুর সাহেবের সহায়তায় সূর্য একটা মস্ত বড় স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করলো। বুলবুলকে সে বোম্বাইতে নিয়ে যাবে। গাড়ির ঝাঁকানিতে পাছে বুলবুলের কষ্ট হয়, তাই সূর্য তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে রইলো। বুলবুল সূর্যর বাহু চেপে ধরে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, সত্যিই আমরা সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি!

সমুদ্র দেখার সম্ভাবনায় সে যেন ঠিক শিশুর মতন কৌতূহলী ও খুশী।

গোয়ালিয়ার শহর ছাড়াবার আগেই বুলবুলের হেঁচকি উঠতে লাগলো এবং অসম্ভব বমি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য বুঝতে পারলো, বুলবুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হাসপাতালের গেটে পৌঁছে বুলবুলকে গাড়ি থেকে নামাতেও হলো না। একজন ডাক্তার তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি একটু উঁকি দিয়েই বললেন, এ তো মুর্দা হ্যায়।

সূর্যর কোলে মাথা রেখে বুলবুল একটু আগেই মারা গেছে।

সূর্য কাঁধ দুটো অদ্ভুত করে অন্য দিকে মুখ ফেরালো। তার ঠোঁটে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছে। যেন, বুলবুলের মৃত্যুর জন্য নয়, বুলবুলকে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র দেখানো গেল না বলেই সে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

(ক্রমশ)

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

বারিদবরন ঘোষ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যেন একটি স্বসম্পূর্ণ সমাজ, একটি স্বশাসিত দেশ। উনবিংশ শতকে বাঙলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা এই একটি পরিবারের প্রযত্নেই প্রধানত লালিত ও বর্ধিত হয়। এমন একটি সংস্কৃতিবান পরিবারের কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

২৯ ডিসেমবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ ১৫ পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দে ইন্দিরা দেবীর জন্ম। জন্ম হয় বাঙলা দেশ থেকে অনেক দূরে বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুরের অন্তর্গত কালাদগিতে। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র এবং ভারতের প্রথম আই সি এস. কন্যার জন্মকালে বোম্বাই প্রদেশে কর্মে নিযুক্ত। মাতা জ্ঞানদানন্দিনী যশোহরের কন্যা, অসামান্যা সুন্দরী, অসাধারণ গুণবতী। বিবাহের পর আপন প্রতিভাবলে উচ্চশিক্ষিতা। এঁদের রুচিসম্মত লালনে ইন্দিরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিল। নিষ্ঠাশীল পরিবারের সন্তান হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাধীনচেতা; পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রাচীনপন্থী মনোভাবকে তিনি বহুসময়ে সমর্থন করতে পারতেন না। বিদেশী-প্রভাব-বর্জিত পরিবারের সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ অতিসহজেই স্ত্রী-কন্যা-পুত্রকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি আমেদাবাদ সেসন জজ, বোম্বাই প্রদেশে এ সময় পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে চাকরি করেছেন। ফার্লো-ছুটির জন্য তিনি আবেদন করেছেন। নিয়মানুসারে সেপ্টেম্বর মাসের আগে সে ছুটি পাওয়া যাবে না। সে সময়ে বেশ শীত পড়ে যাবে। শিশুরা শীতে কষ্ট পাবে ভেবে শীতের আগেই স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে পুত্র-কন্যাসহ বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন। ইন্দিরার বয়স তখন পাঁচ। লণ্ডন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাসেক্স জেলার ব্রাইটন নামক এক সমুদ্রতীরস্থ শহরে ইন্দিরারা বাস করতে লাগলেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ ছোট ভাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লণ্ডন পাড়ি দিলেন ২০-এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ তারিখে। এ হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাত যাত্রা। শিশু ইন্দিরাকে কাছে পেয়ে দূরপ্রবাসে রবীন্দ্রচিত্ত আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। সেই অনাবিল আনন্দ-মুখর সাহচর্যের কথা স্মরণ করে পরবর্তী কালে কবিগুরু তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল।" শৈশবের স্মৃতিচারণা করে ইন্দিরাদেবীও 'রবীন্দ্রস্মৃতি'-তে লিখেছেন, "রবিকাকা ছোট ছেলে স্বভাবতই ভালোবাসতেন—আমাদের ভাইবোনকে দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়। বিলেতে গিয়ে আমাদের সঙ্গ সেই যে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল, সেটা শেষজীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। ছেলেদের মন ভোলানোর তাঁর একটি উপায় ছিল, নানারকম মজা করে গান গাওয়া।"

॥ ২ ॥

দু' বছরের বেশি সময় বিদেশে কাটিয়ে ইন্দিরা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। বয়স তখন তাঁর সাত বছর। পড়াশুনোর জীবন আরম্ভ হল। ভর্তি হলেন, সিমলার অকল্যাণ্ড হাউস স্কুলে। ওখান থেকে কলকাতায় এলেন পারের বছরে। ভর্তি হলেন এবার লরেটো হাউসে। ছ' বছর এখানে পড়াশুনো করে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইন্দিরা এনট্রান্স পাস করলেন। এবার বাড়িতে বসেই পড়াশুনো আরম্ভ হল। পাশ করলেন এফ এ এবং বি এ। বি এ পাশ করলেন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত অধীত বিষয় ফরাসী নিয়ে। সেই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে-পুরুষ সবার নম্বর মিলিয়ে ইংরাজি বিষয়ে হলেন প্রথম; আর শুধু মেয়েদের মধ্যে প্রথম হলেন যোগফলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মেধাকে 'পদ্মাবতী পদক' দিয়ে সম্মান জানালেন।

ফরাসী ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি লা মার্টিনিয়ার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশুনো করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীর পক্ষে ফরাসীভাষা শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই ফরাসীভাষা শিক্ষায় অপরিমেয় উৎসাহ প্রদান করতেন। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—"আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসি শিখতুম বলে একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, কঁৎদলীল লা ফঁতেন প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। এখনো সেই বইগুলি শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে (রবীন্দ্রস্মৃতি)।"

এতো গেল তাঁর গতানুগতিক শিক্ষালাভের কথা। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, যে বাড়ির ঘটিবাটিতে জলতরঙ্গের আওয়াজ খেলে, বিশাল অট্টালিকার বৃহৎ কথাগুলিতে সংগীতময়তা প্রতিধ্বনিত হত, সে-বাড়ির মেয়ের শিক্ষা কতকগুলো পরীক্ষা পাশেই সমাপ্ত হয় না। সঙ্গীতে—কণ্ঠ এবং যন্ত্র উভয় ধারায়—ইন্দিরার ছিল স্বভাব-দক্ষতা। সাত বছরের মেয়ে সিমলার পাহাড়ের চূড়োয় বসে ব্রাহ্ম নেতা ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে শুনিয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত—'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।' উত্তরকালে এই বালিকাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভিজ্ঞ হিসাবে সুধীসমাজে পরিগণিত হয়েছিলেন।

ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে ইণ্টারমিডিয়েট থিয়োরী পরীক্ষায় (এর প্রশ্ন আসতো বিলেত থেকে) পাশ করে ইন্দিরা বালিকা বয়সেই ডিগ্রী লাভ করেন। দেশী-বিদেশী সঙ্গীতে তাঁর ছিল অনায়াস প্রবেশ। মধ্যবয়সে পৌঁছেও তাঁর নতুন করে গান শেখার আগ্রহ বেড়েছিল। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন কৈশোরে বদ্রিদাস সুকুলের কাছে, পরে মধ্যবয়সে রাঁচিতে প্রফেসর জ্যোদি রতিয়ার কাছে। কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর দরাজ ও ভরাট। স্বাস্থ্য ছিল অটুট।

যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যাপারেও ইন্দিরা সমান আগ্রহী ছিলেন। লরেটো কনভেণ্টের ছাত্রীর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। লরেটোতে সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট মিঃ স্লেটারের কাছে তিনি পিয়ানো বাজানা শিখেছেন আর বেহালা শিখেছিলেন মানজাটো নামক এক ইতালীয় বেহালা-বাদকের কাছে। পরবর্তী কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক বিলাতী-আঙ্গিকের গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন, পর্যন্ত পিয়ানো বাজানো তাঁর অন্যতম শখ ছিল। সেতারও তিনি ভাল বাজাতে পারতেন।

গানের সঙ্গে এস্রাজের সঙ্গত সবচেয়ে পছন্দ করতেন—বিশেষত মেয়েদের গানের সঙ্গে।

শৈশবে দেশী-বিদেশী গান যখন তিনি শিখতেন, তখন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীও তাঁর সঙ্গে শিখতেন। "আমার দিশী বিলিতী সংগীতের সর্বদা সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন সরলা দিদি। আমরা যা-কিছু শিখেছি, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে শিখেছেন ('রবীন্দ্রস্মৃতি')।"

॥ ৩ ॥

ইন্দিরার যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন আইনজীবী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইন্দিরা 'দেবী', 'দেবীচৌধুরানী' হলেন। প্রমথ চৌধুরী তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারি পাস করে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। কিন্তু সেকালের মধ্যেই তাঁর পড়াশুনোর গভীরতা ও সাহিত্যানুরাগের কথা ঠাকুরবাড়ির লোকেরা জেনেছিলেন। অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের পরিচয়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের সঙ্গী'। এ'র সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর বিবাহ হয়। ক্রমে প্রমথ চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের 'তরুণ বন্ধু' হিসাবে পরিগণিত হন। পরম স্নেহের ভাইঝিটিকে তিনি প্রমথবাবুর হাতে তুলে দেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।

ছাব্বিশ বছরের শিক্ষা ও চর্চা ইন্দিরা দেবীর নতুন জীবনে নতুন ফসল বয়ে আনল। 'সংগীতের সঙ্গে সাহিত্যের শুভ-পরিণয় সংঘটিত হল। গৃহস্থালীর কর্মের সঙ্গে স্বামীর মর্মসঙ্গিনী হলেন তিনি। রবীন্দ্র-বর্ণিত ইন্দিরার মুখের 'স্বর্গের কিরণ' তাঁর সংসারজীবনে স্নিগ্ধ দ্যুতি বিচ্ছুরিত করল' উভয়ের জীবন ভালবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর এমন একটি সুখের নীড় ভেঙে গিয়েছিল—বাংলা সাহিত্যের বীরবলের লোকান্তর ঘটেছিল।

॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবশিরোমণি বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-জীবনী রচনা করে নামকরণ করেছিলেন চৈতন্যভাগবত। কিন্তু বন্দনাশ্লোক থেকে শুরু করে শেষাবধি তিনি চৈতন্যদেবের নামোচ্চারণের সঙ্গে নিত্যানন্দের কথাও বলেছেন। ইন্দিরা-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলেও রবীন্দ্রনাথের কথা অতি সহজেই এসে পড়ে। স্নেহভাজন এই ভ্রাতুষ্পুত্রীর জীবন খুল্লতাতের স্নেহ ও যত্নে বর্ধিত ও পুষ্ট হয়েছে। ইন্দিরা দেবী নিজেই লিখেছেন, 'সিমলা থেকে নেমে এসে সেই যে বছর আটেক বয়সের পর কলকাতার স্কুলে ভরতি হলুম তখন থেকে প্রায় তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত রবিকাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষপ্রভাব আমাদের সাহিত্যজীবনকে গড়ে তুলেছিল, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি, হয়েছি, এমন কি ভেবেছি পর্যন্ত, তা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন।'

সুতরাং ইন্দিরা দেবীর বাকী জীবন-টুকু রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথা না বলে ইন্দিরা-স্মরণ সম্ভব নয়। রবি-পরিমণ্ডলে তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অরুন্ধতী — শান্তস্বভাবা, স্থিরদ্যুতি। বীরবল বশিষ্ঠ। ইন্দিরা দেবীর সংস্কৃতি-ময় জীবনকে আমরা অভিনয়, সাহিত্য ও সঙ্গীত—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে আলোচনা করছি—যেমন তিনি রবীন্দ্রজীবনকে দেখেছিলেন।

অভিনয় ॥ ঠাকুর-পরিবারে এমন একটি দিনও সম্ভবত অতিবাহিত হত না, যেদিন কোন-না-কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে না তুলত। নানা ছল-ছুতোয় নানা আবদার-অনুষ্ঠানে নাটকাভিনয় করা এই পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। নাটক লেখার জন্য তাঁদের বাইরে যেতে হত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক লিখতেন। রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' কতবার যে ঠাকুরবাড়ির ভিতরে-বাইরে অভিনীত হয়েছে তার হিসেব নেই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রথম অভিনীত হয়। এর পরে এই নাটকের একবার অভিনয় হয় লেডী ল্যান্সডাউনের সম্মানে। এই অভিনয়ের বিস্তারিত ও কৌতুককর বিবরণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘরোয়া' বইতে দিয়েছেন। এই অভিনয়ে 'লক্ষ্মীর' ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন বালিকা বিবি—ফুটফুটে মেয়ে ইন্দিরার ডাকনাম। অবনীনাথ লিখেছেন, "লক্ষ্মী সেজে বিবি যখন লাল আলোতে স্টেজে ঢুকত, আহা সে যে কি সুন্দর দেখাত।" এই অভিনয়ে বিবিকে গাইতে হয়েছিল, 'কেন গো, আপন মনে' গানটি। ইন্দিরা দেবী অবশ্য বলেছেন, তাঁর অভিনয়শক্তি তেমন ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সাহায্যার্থে তিনি বড় ভাশুর আশুতোষ চৌধুরীর প্ররোচনায় একবার 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ করেন। 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রথম অভিনয়ে ছোটদের তিনি নাচ শিখিয়েছিলেন।

'কালমৃগয়া' নাটকের অভিনয়েও একবার ইন্দিরা দেবী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এতে তিনি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ঊষা-দেবী বনদেবী সেজেছিলেন। স্মৃতিচারণায় ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—"আমি ও ঊষা-দিদি কালমৃগয়ায় বনদেবী সেজে 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গীতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া দেখাতাম, সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি।......আমি কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারিনে।" একবার এই নাটকটি তিনি প্রযোজনা করেছিলেন এবং অভিনয়েও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু অন্ধমুনি-বেশী দিনেন্দ্রনাথ ভাগিনেয় ঋষিকুমার-বেশী সঞ্জীবের মৃত্যুর পর তাকে 'খুটিয়ায় করে নিয়ে আসবে সে আমি দেখতে পারবো না' বলায় শেষ পর্যন্ত এর অভিনয় তিনি বন্ধ করে দেন।

'মায়ার খেলা' নাটকের একটি অভিনয়ে শান্তা-র ভূমিকায় সেজেছিলেন ইন্দিরা দেবী। এ নাটকটি অভিনীত হয় সত্যেন্দ্রনাথের বির্জিতলার বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায়। অভিনয় 'ভালো করতে' পারেন না বললেও তাঁর মনটি নাট্যরসে পূর্ণ থাকত। তাঁর সংবেদনশীল মনে নাটকের চরিত্ররা গভীর দাগ কাটত। একবার স্টার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর নাট্যরূপ 'বসন্ত রায়' দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্ত রায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলেন।

॥ ৫ ॥

অতি শৈশবেই ইন্দিরা দেবী সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দেন। এর মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি যে ভাষায় ও ভাবে পূর্ণ চিঠিগুলি দিতেন, সাহিত্যরসে মন আপ্লুত না থাকলে কিশোরীর পক্ষে সেগুলি বোঝা অসম্ভব হত। 'আমার যখন আন্দাজ ন' বছর বয়স তখন থেকেই অক্ষয় চৌধুরীকে কবিতায় চিঠি লিখতুম।'—বলেছেন ইন্দিরা দেবী।

আপন পরিবারের ও গোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখার জন্য ঠাকুরবাড়ি থেকে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যপ্রাণ পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে। বিশেষত শিশুমনের চর্চার জন্য রবীন্দ্রনাথ-পরিচালিত ও ইন্দিরা-জননী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত বালক পত্রিকার আবির্ভাব। এই পত্রিকায় ইন্দিরা দেবীর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। এটি রাস্কিনের একটি রচনার অংশবিশেষের তরজমা। প্রথম রচনাটি উল্লেখযোগ্য—কারণ তরজমার সাহায্যে বিদেশী সাহিত্যের রস আমদানি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস বিদেশকে উপহার দান—ইন্দিরার সাহিত্য-জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। অনুবাদকর্মে শৈশবাবধি প্রবণতা তাঁকে উত্তরজীবনে দক্ষ অনুবাদক হিসাবে পরিচিত করেছে।

'সাধনা' পত্রিকায় তিনি পিয়ের লোতি-র গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন মনীষী আঁদ্রে জিদ। এ'র গ্রন্থের অতিবিখ্যাত ভূমিকাটি ফরাসী থেকে অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী। অনুবাদটি প্রকাশিত হয়, প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্র'-এ। রেনে গ্রুসে-লিখিত L'Inde-এর বাঙলা সংকলনও এই

প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এটি প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায়।

অনুবাদ প্রসঙ্গে ইংরাজী অনুবাদের কথাও এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার ও রচনার তিনি ছিলেন দক্ষ অনুবাদক। সাধারণত অনুবাদে মূলভাষার রস পরিবাহিত হয় না। কিন্তু ইন্দিরা একদিকে যেমন ইংরেজীতে সুপটু, অন্য দিকে রবীন্দ্র-ভাবধারা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকায় তাঁর অনুবাদ-কর্ম সাহিত্যগুণোপেত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই তরজমাগুলি পড়ে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করতেন। তাঁর 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থের ইন্দিরাই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অধিকার ও আগ্রহের মূল কারণ কিন্তু বিলাতবাস বা সরে টাতে পড়া নয়। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুকূলে মনকে ইংরেজী সাহিত্যের রসে সিঞ্চিত করেছিলেন। পিতা সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, '...তাঁরা শুধু সাধারণভাবে ইস্কুলের পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বাবা-মায়ের কর্তব্য পালন শেষ করেননি, পরন্তু জন্মাবধি সাহিত্যে আমাদের উৎসাহ ও রুচির গোড়াপত্তন করে দিয়েছেন।" সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে বানিয়ানের রূপককাব্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস, অ্যারেবিয়ান নাইটস, গ্রিমদের আর হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথা, কারভ্যান্টিসের ডন কুইকসোট পড়তে দিয়েছিলেন। সাত বছরের বালিকাকে তিনি শেলির Sensitive Plant আর The Cloud, টেনিসনের May Queen এবং The Brook কবিতাগুলি সিমলার পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়াতেন। মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন টমাস মুরের Lallah Rookh-এর সুন্দর গল্পটির সঙ্গে।

গ্রন্থকীট ইন্দিরা-পঠিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিজে পড়ে শোনাতেন Hellen's Babies নামক ছোটদের বই। লুই ক্যারলের Alice in the Wonderland এবং Through the Looking Glass তাঁকে পড়তে দিয়েছেন। এডগার অ্যালেন পো-র সঙ্গে তিনিই ইন্দিরার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বড় হয়ে পড়েছেন Marie Bashkirtscheff-এর পত্রিকা আর অতি খ্যাত আমিয়েলের জার্নাল। উপন্যাসের মধ্যে পড়েছেন ওনিদা, এলিয়ট, ডিকেন্স, থ্যাকারে স্কট। উইকলি কলিন্সের 'হোয়াইট ওম্যান' তাঁর লোভনীয় মনে হত'—তিনি গাত্রবর্ণে গ্রন্থনায়িকার তুল্য ছিলেন—সেজন্য এই 'দুর্বলতা'। ট্রেনে যেতে যেতে বই পড়তে ভালবাসতেন বিবি। বারো বছরের মেয়ে বোম্বাই যাত্রার পথে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ট্রেনে পড়ে চলেছেন জর্জ এলিয়টের 'মিল অন দি ফ্লস'। গোল্ডেন ট্রেজারির কবিতাগুলি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে উদ্দীপ্ত করত। এডুইন আর্নল্ডের Light of Asia ছিল তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ। Col Meadows Taylor-এর লেখা Tara এবং Sita উপন্যাস দুটি ছেলেবেলাতেই তিনি হজম করেছিলেন।

এতক্ষণ ধরে আমরা তরজমা ও ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে ছিল তাঁর অধিক অনুরাগ। অধিক বই তিনি লেখেন নি। কিন্তু সামান্য ভূমাতে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিরন্তর পত্রযোগের ফলেই মনের ও রুচির এই প্রসারতা ঘটেছিল। 'ছিন্নপত্র'-য় তার চিহ্ন ইতস্তত বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ করে নানা কবিতাও রচনা করতেন। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৮৬) সেগুলি সংকলিত হয়েছিল। পূর্বেই দেখেছি তিনি বালক, ভারতী, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' 'বঙ্গলক্ষ্মী'-তেও তিনি লিখতেন। কিন্তু 'সবুজ পত্র'এই চর্চা করেছেন সবচেয়ে বেশী। বস্তুত, সবুজ পত্রেই তাঁর সাহিত্যমন অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পেয়েছিল। সকৌতুকে তিনি লিখেছেন, "......আমার যেটুকু রচনা-শৈলীর শিক্ষা হয়েছে সে ঐ সবুজ পত্রেরই দৌলতে। ১৯০২ সালের রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুঘটিত কাঠখোট্টা রচনার পর এই দশ-বারো বছরে সঙ্গগুণে বা যে কারণেই হোক, আমার লেখার যে উন্নতি হয়েছিল তার ফলে আমার সবুজপত্রে লেখা প্রবন্ধ সংগ্রহ সবেধন নীলমণি 'নারীর উক্তি' বইখানি তখনকার কালে অনেকের ভালো লেগেছিল (রবীন্দ্র স্মৃতি)।"

'নারীর উক্তি'-কে লেখিকা তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'সবেধন নীলমণি' বলেছেন। যদিও তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তবুও এই গ্রন্থটিই তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত করে দিয়েছিল। ১৯২০ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ সংগ্রহে বঙ্গনারীর মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে লেখিকার সুচিন্তিত মত সমাহৃত হয়েছে। এ পুস্তকে ছোট বড় সাতটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আছে, যেমন, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষা বিচার, গ্রীস ও রোম, প্যাটেল বিল প্রভৃতি। গদ্য যে কত পদ্যময় হতে পারে, Prose যে কত Poetic হতে পারে তার নিদর্শন সুরশিল্পী ইন্দিরা দেবীর এই মাধুর্যমণ্ডিত রচনাগ্রন্থটি। 'তা যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমন স-ছন্দ।' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র 'সেকালের আদর্শস্থানীয়া বঙ্গনারীর গুণগণনা করেছেন এই সাবলীল ছন্দোময় গদ্য রচনায়—'শ্রী যাঁদের সম্পদ, হ্রী যাঁদের ভূষণ, ধী যাঁদের সহায়; স্নেহ যাঁদের অগাধ, ক্ষমা যাঁদের অপার, ধৈর্য যাঁদের অসীম; ধর্ম যাঁদের বন্ধু, ধর্ম যাঁদের রক্ষক, মন যাঁদের সরল; বাক্য যাঁদের মধুর, সেবা যাঁদের অক্লান্ত; যাঁরা আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে কাতর, অতি অল্পে সন্তুষ্ট; সেই প্রাতঃস্মরণীয়া, সেকালের আদর্শস্থানীয়া পরিচিতা অপরিচিতা বঙ্গনারীকুলের উদ্দেশে এই সামান্য গ্রন্থখানি অর্ঘ্যস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হল। তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য যেন আমাদের একালে দিক-নির্ণয় করবার আলো দেখায়, তাঁদের সম্মিলিত শক্তি যেন আমাদের নবযুগের পথে চলবার বল দেয়।' আপন অন্তরে এই সকল গুণের সাধনা না থাকলে এদের আহ্বানে সামর্থ্য আসে না। ইন্দিরা দেবী এই সকল গুণের আধার ছিলেন।

তাঁর লেখা অন্য বইগুলি সংগীত-বিষয়ক। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একযোগে লিখিত 'হিন্দু সংগীত' গ্রন্থের (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) 'সংগীত পরিচয়' নামক প্রাথমিক অংশ তাঁর রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি হিন্দুস্তানী সংগীত সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এর সংগীত সম্পর্কে সাধারণের ভীতির কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে এক স্থানে যে লিখেছেন, 'ওস্তাদী গানের প্রতি সাধারণ অভক্তির কারণ, ওস্তাদদের কায়দাকানুন। তাঁদের অনাবশ্যক মুখভঙ্গী, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী এক কথায় মুদ্রাদোষ...' তা যথার্থ। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ কোন অবদান তিনি লক্ষ করেননি। উত্তরাপথ এবং দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীত-বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন। রাগ, তালের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি অঙ্গের সঙ্গীতের জাতি-নির্ণয় করেছেন। শুধুমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতেরও প্রাসঙ্গিক উল্লেখে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। তিনি গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজানোর পক্ষপাতী ছিলেন। —'গানের সংগতের জন্য এখনকার কালে তম্বুরার চেয়ে এস্রাজই বেশী উপযোগী বলে আমার বোধ হয়—বিশেষত মেয়েদের পক্ষে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে যাঁরা গান করেন, তাঁদের সকলকেই আমি এস্রাজ শিখতে অনুরোধ করি। কারণ এস্রাজ হালকা, মিষ্টি ও একটানা, সুতরাং সংগতের যন্ত্রের সব গুণই ওতে বর্তমান।' বিদেশী যন্ত্রের সঙ্গে দেশী যন্ত্রের তফাত কোথায় এবং হারমোনিয়ম সম্পর্কে তাঁর মতামতও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ভালো হারমোনিয়মে তাঁর আপত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথও একসময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে হারমোনিয়মের সঙ্গে গান গাইতেন। 'কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যেরূপ নিকৃষ্ট যন্ত্রে কর্কশ আওয়াজ বের করা হয়, তাতে আমাদের গান ঢেকে ফেলেও নষ্ট করে দেয়।' —ইন্দিরা দেবীর এই মত সর্বথা সমর্থনযোগ্য। সমগ্র প্রবন্ধটিতে হিন্দুস্তানী

গানের সম্পর্কে অনেক কথা বলেও দেশপ্রাণ ইন্দিরা দেবী গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাঙলা গানের অধিক প্রচারের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন; '...বাংলা গান যেমন বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে প্রাণে গিয়ে পৌঁছতে পারে, অপর ভাষার গান কখনই তেমন পারে না। ...বাংলা গানকেই বাঙালীদের সকল রকম ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে হবে।'

'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' ইন্দিরা দেবীর তৃতীয় গ্রন্থ (১৩৬১ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থে পূর্বরচিত গানের সুর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান লিখেছিলেন তার একটি বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত হয়েছে। সংগীত-পর্যায়ে তার আলোচনা করছি।

ইন্দিরা দেবী কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনাও করেছিলেন। 'বাংলার স্ত্রী-আচার' (১৩৬৩), 'পুরাতনী' (১৯৫৭ খ্রীঃ) মাতা জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা ও তাঁকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর সংকলন; নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচ শত গানের সংকলন 'গীতপঞ্চাশতী' (১৯৬০ খ্রীঃ)।

পিতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে

তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর ইংরেজী অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

'আত্মজীবনী' লেখার গোপন ইচ্ছাও তিনি পোষণ করেছিলেন। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (বিশ্বভারতী পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ এবং চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) এই ইচ্ছার আংশিক ফসল। এটা স্বাভাবিক, কারণ এই 'শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু'কেই তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিগণিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রভাত সংগীত' উৎসর্গ করেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রস্মৃতি বোধ করি সর্বাধিক পরিমাণে সংবদ্ধ হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীতে। এতে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, তাঁর গ্রন্থরচনা ও নানা প্রাসঙ্গিক তথ্যের যেমন উপস্থিতি আছে, তেমনি আছে পত্র-প্রাপিকার মনের গঠনের পরিচয়। বিভিন্ন সময়ে লেখা (আশ্বিন ১২৯৪ সাল থেকে অগ্রহায়ণ ১৩০২ সাল পর্যন্ত) এক শত প'রতাল্লিশটি পত্র 'ছিন্নপত্র'র প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়। এই পর্বের যাবতীয় চিঠি ইন্দিরা দেবী দুটি খাতায় নকল করে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লেখা এই সব চিঠি সম্পর্কে খুল্লতাতের মমতার অন্ত ছিল না— "আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই।......আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস, আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর—এই স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকাভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।" ইন্দিরা দেবী এই সুখদুঃখের ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থিক, প্রথম সম্পাদক।

'আনন্দসংগীত পত্রিকা' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনার ব্যাপারেও ইন্দিরা দেবী সংযুক্ত ছিলেন। এখানেই তাঁর সম্পাদক-জীবনের শুরু। সংগীত সঙ্ঘ নামক একটি সংগীত-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'সঙ্গীত বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা' হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবীর সহযোগিতায় তিনি শ্রাবণ ১৩২০ থেকে এর শেষ প্রকাশ আষাঢ় ১৩২৮ পর্যন্ত সম্পাদনা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন আলাপিনী মহিলা সমিতির মুখপত্র 'ঘরোয়া'-ও তাঁর উৎসাহ ও নির্দেশনায় প্রকাশিত হতো।

ইন্দিরা দেবীর আর এক পরিচয় আছে তাঁর পুস্তক সমালোচনায়। এগুলিতে তাঁর পাঠের বহুলতা ও গভীরতা, মনের প্রসার ও চিন্তার সামর্থ্য পরিস্ফুট হয়ে আছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭ এবং মাঘ—চৈত্র ১৩৫৮) তাঁর দুটি গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী'-র (১৩৫৭) সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, 'নারীর উক্তি'-র লেখিকা এর যোগ্য সমালোচনা করেছিলেন—'সকলের পড়বার মতন, সকলকে আনন্দ ও শিক্ষা দেবার মতন' এমন একটি 'সুচিন্তিত ও সুলিখিত সর্বাঙ্গসুন্দর' বই পেয়ে বঙ্গনারী হিসাবে তিনি গর্ববোধ করেছেন এবং 'বাংলার ঘরে ঘরে বইখানির বহুল প্রচার' প্রার্থনা করেছেন। দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে তিনি একসঙ্গে চারখানি বই-এর সমালোচনা করেছেন। বই চারখানি, কিন্তু হৃদয়সূত্রে গ্রথিত—প্রথম দুটির রচয়িতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে নারী' এবং 'সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী'; তৃতীয় গ্রন্থ 'বাংলার স্ত্রীশিক্ষা'—রচয়িতা যোগেশচন্দ্র বাগল; চতুর্থটি একটি স্মারকগ্রন্থ, বেথুন কলেজের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত—'বেথুন স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ সেন্টিনারি ভল্যুম'। এদের সমালোচনায় বিস্তারিত উল্লেখে বিরত থাকলাম। কৌতূহলী পাঠককে উক্ত সংখ্যাদ্বয়ের সঙ্গে

পরিচয়ের আহ্বান জানাচ্ছি।

সঙ্গীত রচনাও তিনি করেছিলেন। এর কয়েকটি 'সুরঙ্গমা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আমাদের ক্ষোভ আছে, ইন্দিরা দেবী কেন আর বেশী লেখেন নি। তাঁর কলমে সামর্থ্যের অপ্রাচুর্য ছিল না। লেখেন নি, কারণ আত্মপ্রচার তিনি সম্ভবত পছন্দ করতেন না; তাঁর জীবন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে পূর্ণ। তা ছাড়া সঙ্গীতের আনন্দময় লোকে তাঁর অধিষ্ঠান ছিল। 'রাজা' নাটকে কথা ও চোখের বাঁধনে রানী সুদর্শনা রাজাকে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি; অথচ দাসী সুরঙ্গমা অতি সহজেই সুরের রাজ্যে তাঁকে পেয়েছিল। ইন্দিরা সাহিত্যরাজের সুরঙ্গমা দাসী। অতি সহজেই সেই রাজাকে অনুপম রূপে পেয়েছিলেন।

॥ ৬ ॥

এবার সঙ্গীত-প্রসঙ্গে আসি।

সঙ্গীত-প্রসঙ্গ বলতে মোটামুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই বোঝাচ্ছি। কিভাবে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গীত-জীবন সূচিত হয় এবং তার চর্চার বিবরণ আগেই দিয়েছি। এবারে রবীন্দ্রসঙ্গীতসর্বস্ব জীবনের কথা বলতে চাইছি।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিগুরুর 'গানের ভাণ্ডারী' বলা হয়। ইন্দিরা দেবী তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'অছি'। তিনি কিন্তু কখনও রবীন্দ্রনাথের কাছে 'হাতেকলমে' গান শেখেন নি—"আমি রবিকাকার কাছে আলাদা করে বসে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না। কেবল বাড়িময় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত, তাই শুনে শুনে শিখেছি। পরবর্তীকালে বরং আমার বালিগঞ্জের কমলালয় বাড়িতে পিয়ানোর কাছে বসে তিনি আমাকে দু-একটা গান শোনাতে চেয়েছেন বলে মনে পড়ে, যেমন, 'কে গো অন্তরতর সে' প্রভৃতি।" অবশ্য তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গীত সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা চলত। নিজের প্রথম বয়সের গানের কথা তুলে একবার তিনি ইন্দিরা দেবীকে বলেছিলেন, "আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইসথেটিক।"

অতুলপ্রসাদ সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে গান শেখার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এঁরা ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখা কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনে শুনে সেগুলিও ইন্দিরা দেবী শিখে নিয়েছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত এই সব শেখা গানগুলি তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ভরাট গলায় শেখাতেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ইন্দিরা দেবীর অবদান ত্রিবিধঃ

এক : বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে গেছেন। যখনই কোন সঙ্গীতের শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তাঁর দ্বারস্থ হয়েছেন গুণীজন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁকে 'পুরোনো গানের একজন বিশ্বস্ত রক্ষক এবং প্রামাণ্য স্বরলিপিকাররূপে প্রথম থেকেই...উচ্চপদে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা করছেন'। এই পদ তাঁর অবশ্য-প্রাপ্য।

দুই : রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দী প্রভাব তাঁর কারণেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু গান এঁর সংগৃহীত হিন্দী সুরের ছায়ায় বর্ধিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীরা চিরকাল এ কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন। পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথ কর্মব্যপদেশে বোম্বাই-এ বাস করতেন। একবার কারওয়ারে থাকাকালীন একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে। তাদের কাছ থেকে কানাড়ী ভাষার কয়েকটি গান শুনে ইন্দিরা [illegible] শিখে নেন এবং পরে সেগুলি ভাঙার ফলে 'বড় আশা করে', 'পূর্ণচন্দ্রাননে', 'আজি শুভ দিনে', 'সকাতরে ওই কাঁদিছে' শীর্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলির সৃষ্টি।

তবে হিন্দী ভাষা থেকে ভাঙা গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসংগম' গ্রন্থে নিজের সংগৃহীত ও ভগ্ন হিন্দী গানের সুরে রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনার বিস্তৃত তালিকা প্রদান করেছেন। আমরা কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করছি :

রবীন্দ্ররচনা	মূল হিন্দী গান	রাগ তান
১। অন্তরে জাগিছ	কোন যোগী জয়ো	সোহাগ, ঝাঁপতাল
২। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ ত্রিতাল
৩। হৃদয়নন্দন বনে	উড়ত চন্দন নব	ললিতা গৌরী, ঝাঁপতাল

ইত্যাদি।

তিন : রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি বিশুদ্ধ স্বরলিপিকার। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হলে ইন্দিরা দেবী বহু আয়াস স্বীকার করে বহু বিস্মৃত-প্রায় গানের সুর স্বরলিপিবদ্ধ করেন। এসবের মধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও কালমৃগয়ার স্বরলিপি উল্লেখযোগ্য। মায়ার খেলার স্বরলিপি আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রায় দু'শো গানের স্বরলিপি তাঁর নিজের হাতে করা। এগুলির মধ্যে 'আমার যাবার সময় হল', 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে', 'মহাসিংহাসনে বসি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ বহু গান রচনা করেছেন। কিন্তু কেন জানি না, নিজে সেগুলির স্বরলিপি করতেন না। নিজের গানে নিজের দেওয়া সুর ভুলতে তাঁর মত দক্ষ সুরকার কেউ ছিলেন না। রূপ থেকে রূপে, এক সুর থেকে অন্য সুরে বিহারে

...র ছিল পরম আনন্দ। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র গানেরই স্বরলিপি করেছিলেন। এটি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকার ভাদ্র ১৩৪৯ সংখ্যায় (১ম বর্ষ সংখ্যা) তিনি এটি প্রকাশ করেন। গানটি—একি সত্য সকলি সত্য, 'কল্পনা' কাব্যে গানটির কিছু ভিন্নতর পাঠ মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব অদ্যাবধি চলে আসছে। এ নিয়ে অধিকারীদের মধ্যে যে মতানৈক্য হয়েছে তার অবসানকল্পে ইন্দিরা দেবী নিজের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত' নামে একটি প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪৯, প্রথম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি যে কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন, তা অবশ্যগ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, 'স্বরলিপি বা শ্রুতিলিপির সামান্য গরমিল উপেক্ষা করাই শ্রেয়'; 'গানের প্রকাশকাল ১৯১৫-এর পূর্ববর্তী হলে কলকাতায় প্রকাশিত উল্লিখিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য'; 'গানটি ১৯১৫-র পরবর্তী হলে, বিশ্বভারতী প্রকাশিত এবং বিশেষভাবে দিনেন্দ্র-বিরচিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য'; 'পূর্বস্বরলিপি ও বর্তমান গায়কীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হলে, শান্তিনিকেতনে প্রচলিত সুরকে প্রাধান্য দিতে হবে'।—'মোট কথা এই শুদ্ধিকর্মে সঙ্গীতভবনকে একটা বিশিষ্ট কর্তৃপদ গ্রহণ করতে হবে।'

এগুলির মধ্যে ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে লভ্য (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)—সংগীত প্রকাশিকা, বীণাবাদিনী, আনন্দসংগীত পত্রিকা এবং মায়ার খেলা। অন্য কয়েকটি রবীন্দ্র-স্বরলিপি গ্রন্থের সম্পাদনা ব্যাপারেও তিনি জড়িত ছিলেন।

রবীন্দ্র সংগীত ব্যতীত অন্য সংগীতেরও তিনি স্বরলিপি করেছেন এবং সুরারোপও করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ স্বামী প্রমথ চৌধুরী রচিত 'আজি সহসা বরষা এল বিমানচারী শীর্ষক গানটির কথা বলা যায়। গানটি তিনি মেঘমল্লার রাগে ও তালফেরতা তালে নিবদ্ধ করে স্বরলিপি নির্মাণ করেন। স্বসম্পাদিত আনন্দসংগীত পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয় (পরে বিশ্বভারতী পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত)।

সংগীতময় এস কণ্ঠস্বরটি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

॥ ৭

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ইন্দিরা দেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলিকাতা সংগীত সম্মিলনী, বেঙ্গল উইমেনস্ এডুকেশন লীগ, অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স, হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম প্রভৃতির তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেছিলেন।

১৯৪২-এর প্রথম থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন আমৃত্যু। বিশ্বভারতী সংগীত ভবনের তিনি প্র-নেত্রীরূপে সংগীত ভবনকে উৎকর্ষতা দান করে গেছেন। শান্তিনিকেতন আলাপিনী মহিলা সমিতির তিনি ছিলেন কর্ণধারকল্প।

দীর্ঘ সাতাশি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দিরা দেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছেন।

ইন্দিরা দেবীর সাহিত্য জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, তিনি পরিমাণগত বিচারে সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন গুণগত বিচারে। গুণগ্রাহী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নীরব সাহিত্য সাধিকাকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসাবে ঘোষণা করে 'ভুবনমোহিনী পদক' দানে পুরস্কৃত করেছিলেন।

বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা-ভবনে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ়, ইংরেজি ২৫-এ জুন ১৯৫১ তারিখে।

কলিকাতাবাসী তথা দেশবাসীর পক্ষ থেকে ইন্দিরা দেবীর অশীতিবর্ষের শুভারম্ভে আশুতোষ কলেজ হলে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ২৭ জুন ১৯৫৩, ১৩ আষাঢ়, ১৩৬০ তারিখে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মনস্বী অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। 'পট্টবস্ত্র, মৃণালগুচ্ছ, ধূপ, চন্দন ও দুই সহস্র রৌপ্যমুদ্রাসহযোগে একটি পুষ্প পাত্রে তাঁকে প্রণামী নিবেদন করা হয়।' অতুল গুপ্ত মহাশয়-রচিত মানপত্রে উৎকীর্ণ হয় : 'তোমারই মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই তাপসগণকে—সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে ও ধর্মে, ভাবে ও কর্মে জাতীয় নবজাগরণের যাঁহারা উদ্যোক্তা—তোমরা দিশারী, আমরা' অনুসারী। তোমাদের জীবনালোকে আমাদের পথ হোক উজ্জ্বল।'

এই বছরেরই নভেম্বর মাসে উত্তরায়ণের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতন মহিলা সমিতি তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৩) তাঁর অশীতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কলিকাতার সংগীত প্রতিষ্ঠান গীতবিতানের ছাত্র-ছাত্রীরা। এটি আয়োজিত হয় শান্তিনিকেতনের বহুখ্যাত আম্রকুঞ্জে।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য তিনি বিশ্বভারতীর অস্থায়ী-উপাচার্যরূপে বৃত হন। পর বৎসর উক্ত সারস্বত প্রতিষ্ঠান তাঁকে সর্বোচ্চ 'দেশিকোত্তমা' (ডি লিট্) উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

রবীন্দ্র চর্চায় তাঁর নিরলস ও ঐকান্তিক আগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ রবীন্দ্রভারতী সমিতি তাঁদের প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র পুরস্কার' তাঁকেই প্রথম অর্পণ করে যোগ্যতার সম্মান দেখান (১৯৫৯)।

॥ ৮ ॥

ইন্দিরা দেবী জন্মেছিলেন ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, পরবর্তী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর জীবন ব্যাপ্ত ছিল। এই কালের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে; ভারতী পত্রিকা, আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন নোবেল প্রাইজ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়েছে, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে, দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। দুটি শতকের উত্থান-পতনের তিনি সাক্ষী ও অংশভাক। তাঁর জীবনে দুটি শতক সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধা পড়েছিল।

ইন্দিরা দেবী লালিত হয়েছেন ঠাকুরবাড়ির সংগীতময় আবহাওয়ায়। শৈশবাবধি সংগীতচর্চা করে জীবনের শেষ দিন তাঁকে সম্পদময় করে তুলেছেন। 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন, গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সাহিত্যপ্রেমী বীরবলকে স্বামী রূপে পেয়েছেন। মনের প্রসারতার সামর্থ্যে সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের হরপার্বতীর মিলন ঘটেছে।

জন্ম হয়েছে তাঁর বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে বোম্বাই প্রদেশে, শৈশবে পাড়ি দিয়েছেন বিলাতে, শিক্ষিত হয়েছেন ইংরেজী বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে। ফিরে এসেছেন বাংলার মাটিতে, কলকাতায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে, শেষে শান্তিনিকেতনে। বিদেশ ও দেশ, বিদেশী সংস্কৃতি ও দেশীয় ধ্যানধারণা তাঁর জীবনে একীভূত হয়েছিল।

তিনি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম। আমরা তাঁর সংগীতময় ঐক্যবদ্ধ জীবনে উপরোক্ত ত্রিধারার ত্রিবেণী সংগম লক্ষ করেছি। তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই সংগমে আমাদের হৃদয়ের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি।

ম্যালথাসের অংক

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যার 'ঘরে বাইরে' বিভাগে শ্রীমতীর 'ম্যালথাসের অংক' শীর্ষক আলোচনায় কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে।

প্রথমত ম্যালথাসের তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি লিখেছেন, "সমান্তর বা arithmetical progress-এর মত মানুষ বেড়ে চললো।" কিন্তু ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে বা geometrical progression-এ (১, ২, ৪, ৮, ইত্যাদি) বাড়ে। খাদ্যোৎপাদন বাড়ে পাটিগণিতিক প্রগতিতে বা arithmetical progression-এ (১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি)। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি তাল রাখতে পারে না।

দ্বিতীয়, বর্তমান খাদ্যাভাবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বহুসমালোচিত ম্যালথাসের তত্ত্ব সত্য হয়ে উঠছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে আমরা কি ম্যালথাসের তত্ত্ব বিশ্বাস রাখতে পারি? বোধ হয় না। খাদ্যোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে সামগ্রিক সম্পদ উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিচার করা হয়। ব্যাপক অর্থে দেশে সম্পদ উৎপাদন বাড়লে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এইভাবেই কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বর (optimum theory of population) উদ্ভব হয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কাম্য জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। কাম্য জনসংখ্যায় মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। অধ্যাপক ক্যানান বর্ণিত সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থায় বা মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য নয়। তখন জনসংখ্যা সামান্য বাড়লেই জনাধিক্য ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে।

ভারতের খাদ্যাভাব, জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি (১৯৭১-এর জনগণনা অনুসারে বৃদ্ধির হার ২৪·৫৭%), দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খরা, বন্যা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ম্যালথাসের তত্ত্ব পরিত্যক্ত। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৃহীত কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটেনি। ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জনসংখ্যা অপেক্ষা উৎপাদন অধিক বাড়ছে। মাথাপিছু আয়ও ক্রমবর্ধমান [২১০ টাকা (১৯৫৭) থেকে ৫৮৯ টাকা (১৯৭২)]। অর্থাৎ ভারতে এখনও সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা এসে পৌঁছায়নি। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে ভারতের খাদ্যাভাব, অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির মূলে রয়েছে গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং অসম বণ্টন ব্যবস্থা, তাই অর্থনীতিবিদ সেলিগম্যান বলেছেন, "The problem of population is not one of mere number but of efficient production and equitable distribution." কিন্তু রেড্ডাওয় প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ বহুসমালোচিত ম্যালথাসের তত্ত্ব এবং গতিশীল অর্থব্যবস্থার অনুপযোগী কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব—এই দুইটির কোনটিকেই পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। এঁরা মধ্যপথে বিশ্বাসী। এঁদের মতে ভারতে এখনও জনাধিক্য না ঘটলেও গতি ঐদিকেই রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে সঠিক দৃষ্টি না দিলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও উৎপাদন এবং জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

বর্তমানে অবশ্য কুৎসিনস্কির "নীট পুনরুৎপাদনের হার" (Net Reproduction Rate) প্রণালীই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। ভারতে এই হার একের থেকে বেশী, সুতরাং জনসংখ্যা বাড়ছে। এই পদ্ধতি অনুসারে fertility এবং fecundity-র মধ্যে পার্থক্য আছে। সুতরাং এই প্রণালী ম্যালথাসের তত্ত্বর বিরোধী। এই প্রণালী অনুসারে জনসংখ্যা সর্বদা জ্যামিতিক প্রগতিতে বাড়ে না।

অমলেন্দু ভট্টাচার্য
হৃদয়পুর, বারাসত

পুষ্টি ও প্রসঙ্গ

'দেশ' পত্রিকায় ৮ই অগ্রহায়ণ, 'শ্রীমতী' রচিত "ঘরে বাইরে" রচনাটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করছি।

কোনও রচনায় চিনেবাদাম ও সয়াবীনের Botanical name উল্লেখ থাকলে মসুর ডালকে "Lens esculenta" নামে উল্লেখ করতে হয়, কেবল Lentil বললে চলে না। বাইবেলে মসুর ডালের উল্লেখ থাকলেই কি এ কথা বুঝতে হবে যে মসুর ডাল মানুষের চাষ করে ফলানো জিনিসের আদিম ইতিহাসের অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত?" বাইবেলের বয়স তো মাত্র হাজার দুয়েক বছর। মসুরের চাষ প্রথম হয় এশিয়া মাইনর কিংবা হিন্দুকুশ অঞ্চলে। পারস্যের প্রাচীন সভ্যতায় মসুরের উল্লেখ আছে।

ভারতীয় আহারে ডালের স্থান গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে, তবে খেসারী ডাল বা Lathyras aphaca বাদে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খেসারীর থেকে Lathyrism রোগের উৎপত্তি হয় যার একটি প্রধান উপসর্গ পা দুটি অবশ হয়ে যাওয়া।

শৈশবের অপুষ্টি ছোলার [illegible] সেরে যায় কি? শৈশবের অপুষ্টি [illegible] ভবিষ্যতের ডাক্তার গণ সক্ষম [illegible] সারে? Maluntrition is not a disease, but a cause of disease, কিংবা ঘুরিয়ে বললে: Diseases are the effects of malnutrition during childhood.

"শ্রীমতী" ডালের প্রোটিন সম্বন্ধে সবচেয়ে মারাত্মক মন্তব্য যেটি করেছেন তা হ'ল "ডালের প্রোটিন মাছ, মাংস বা দুধের প্রোটিনের সম মানের না হলেও প্রোটিন ত বটে।" প্রথম প্রশ্ন হল—১ থেকে ৫ বছরের শিশুকে প্রোটিন খাদ্য বা Proteinous food হিসেবে ডাল দেওয়া চলে কি? কারণ, শিশুর পেট তো তাহলে ডালের প্রোটিনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর বস্তুগুলিও প্রবেশ করবে যেমন— Carbohydrate, Fat, Vitamins, minerals ইত্যাদি। এই ধরনের unbalanced diet কোনক্রমেই শিশুর Proteinous Food হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, যদি ডালের প্রোটিন শিশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে কেবলমাত্র একটি ডাল থেকেই প্রোটিন সংগ্রহ করলে চলবে না। পুষ্টির জন্য যে তিনটি Amino acid অর্থাৎ methionine, trypto-phan এবং lysine মুখ্যত প্রয়োজন, সেই তিনটিতে মুগ, মসুর ও ছোলার প্রোটিনকে একটি বিশেষ Ratio-তে মেশালে তবেই একটি Balanced শিশু খাদ্য হতে পারে। তবে ডালে প্রোটিন খুব কম, মাত্র ২০—২৫%—অতএব, এতে আর কতটুকু পুষ্টি হবে?

পুষ্টি সম্বন্ধীয় রচনায় যে তথ্যটির অভাব লক্ষ্য করলাম তা হ'ল সুষম খাদ্য। একটি দেশী সুষম খাদ্য:

আটা	৭০%
চিনেবাদাম	২৫%
মাখন তোলা গুঁড়ো দুধ	৫%
	মোট—১০০%

সয়াবীনের Chemical Composition-এ আছে শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ প্রোটিন

প্রায় চল্লিশ ভাগ স্টার্চ, প্রায় কুড়ি ভাগ স্নেহ (Fat) এবং অতি সামান্য Vitamin-ous minerals এবং অন্যান্য micro-nutrients। গৃহস্থের পক্ষে সয়াবীনের রান্না খাওয়া কি বাস্তবে সম্ভব?

"দেশ"এর এমন একটি সর্বজনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই ধরনের রচনা প্রকাশের আগে একটু তথ্যগতভাবে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। কারণ, খাদ্য ও পুষ্টি অর্থাৎ Food and Nutrition সমগ্র বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার এবং গবেষণার বিষয়।

"শ্রীমতী" আমাকে মার্জনা করবেন।

ডাঃ ভাস্কর ঘোষ
কলিকাতা-২

মনসাপুজো ও ঝাপান

গত ১৭ই কার্তিক ১৩৮০, ১ম সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত মানিকলাল সিংহ মহাশয়ের "মল্লভূমের মনসাপুজো ও ঝাপান" প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগল। লেখা ঠাস বুনোনী। বিস্তৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঝাপানের পূর্ব-প্রস্তুতি (Preparatory period) এক সূচ বাদ পড়েছে। তাই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংযোজক হিসাবে সংক্ষেপে মন্তব্য করছি।

মানিকলাল বাবু অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখেছেন, '......বিভিন্ন গুণী দল চতুর্দোলায় চাপিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন।'—দেশ ৬৫ পৃষ্ঠা।

গ্রামাঞ্চলে পেশাদার গুণী দিয়ে ঝাপান করানো বহুল প্রচলিত আছে। চতুর্দোলায় ওঠার আগে কতকগুলো আবশ্যিক করনীয় নিয়ম আছে। সরাসরি সাপের হুড়াপি নিয়ে ঝাপানে ওঠা যায় না।

প্রথমত, আগন্তুক গুণীদল সেই গ্রামের প্রবীণ মন্ত্রবিদের (ওঝা) কাছে নিরাপত্তার জন্য নতি স্বীকার করে গুরুদেব হিসাবে বরণ করে নেয়। দ্বিতীয়ত, গুণীরা তাদের চেলাবৃন্দ, (শিষ্য) সাপের হুড়াপি নিয়ে মনসা দেবীর পুজো করেন। প্রতিমা না থাকলে, তুলসী মঞ্চের পাশে সীজ গেড়ে পুজো করা হয়। ঐ পুজোর সিঁদুর অষ্ট-ধাতু নির্মিত পাত্রে, অভাবে পাথরের থালাতে ঘি মিশিয়ে গুরু-চেলা সকলে নিজ নিজ কপালে টিপ গ্রহণ করেন। প্রবাদে আছে শত্রুপক্ষের গুণীরা কু-বিদ্যা (মন্ত্র) চালন করলে ঐ সিঁদুর টিপের দৈবক্রিয়ায় মন্ত্রের তেজ কমে যায়। তৃতীয়ত স্থানীয় বা পরিচিত অন্য কোন গুণী বা চেলা দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকলে, গুপ্তভাবে বিরুদ্ধাচারণ যাতে না করে তজ্জন্য কপালে টকটকে সিঁদুর টিপ পরিয়ে দলভুক্ত করা হয়। চতুর্থত, 'কাটনা' মন্ত্রপূতঃ সরষে ও মাটির জল দলের সকলকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

পৃথক পৃথক গুণী দল এই ভাবে প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করে ঝাপানে (চতুর্দোলায়) ওঠেন। ঝাপান দেখানো শেষে চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য পারিশ্রমিক মিটিয়ে স-সম্মানে বিদায় দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ঝাপান উৎসবের আড়ম্বর বা জৌলুস মোটেই কমে নি, উপরন্তু শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিবনাথ হাঁসদা
চিরুডি, পুরুলিয়া

বনস্পতির বৈঠক

গত ২২শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় 'আলোচনা'য় লাবণ্যকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'বিচিত্রার মালিক কোনো এক সুশীল মিত্র'র বাড়িতে অচিন্ত্যবাবুর উপস্থিতি সম্পর্কিত বনস্পতির বৈঠকের কথা নাকি 'কাল্পনিক কাহিনী।' কারণ, বিচিত্রার স্বত্বাধিকারী ছিলেন পত্রলেখকের পিতা সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু 'কোনো এক সুশীল মিত্র'র পুত্র হিসাবে বর্তমান পত্রলেখকেরও কিছু বক্তব্য এক্ষেত্রে উপস্থিত করা কর্তব্য মনে করি।

লাবণ্যবাবু প্রথমেই একটু ভুল করেছেন মনে হয়। সুশীল মিত্রর বাড়িতে অচিন্ত্যবাবুর নয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাতায়াত ছিল, এই কথাটাই সম্ভবত ওখানে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৩৪০-এর পর থেকে 'বিচিত্রা'র শিরোনামা পৃষ্ঠাটি খুললেই দেখা যাবে তাতে দুটি নাম বড় বড় টাইপে মুদ্রিত। সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালক—সুশীলচন্দ্র মিত্র। সুতরাং 'বিচিত্রা'র প্রসঙ্গে উপেন্দ্রবাবুকে যিনি চেনেন, সুশীলচন্দ্র মিত্রর কথা তাঁর অগোচর থাকবার কথা নয়, বিশেষত তিনি যখন নিজেকে 'বিচিত্রা'র স্বত্বাধিকারীর পুত্র বলে দাবি করছেন এবং সেই হিসেবেই ঘটনাটিকে 'কাল্পনিক' বলছেন।

আসল কথা, বিচিত্রা প্রকাশিত হয়েছিল দুটি পর্যায়ে, যদিও সম্পাদক ছিলেন বরাবরই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাগজটি একবার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় উপেন্দ্রবাবু সুশীল মিত্রর কাছে এটির দায়িত্ব নেবার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হন এবং তিনি সাগ্রহে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে সাহিত্যরসজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট প্রাপ্ত ফিলসফির অধ্যাপক। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরই সম্পাদনার ভার অর্পিত থাকে। এই সময় ২৫৯ আপার চিৎপুর রোডের শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ারকস থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৭।১ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট থেকে 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হোতো। ১৯৫৩ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুশীল মিত্র দীর্ঘকাল কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকবার জন্যই শেষ পর্যন্ত 'বিচিত্রা' বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং 'বনস্পতির বৈঠক'-এ অন্যান্য বিষয়ে তথ্যগত ভুলভ্রান্তি কি ছিল জানি না, কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখিত তথ্য যে নির্ভুল তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

ভাস্কর মিত্র
কলকাতা-১৯।

॥ ২ ॥

বনস্পতির বৈঠকে শরৎচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। শরৎ-বন্দনার আসর স্থির হয়েছিল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে—কিন্তু নির্ধারিত দিনে হরতাল ডাকায় গন্ডগোলে উৎসব আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। শরৎ-বন্দনার বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ছিলেন (শরৎবাবুর কথায়) সম্ভবত বেহালার প্রসিদ্ধ জমিদার মণি রায় মহাশয় এবং স্বর্গীয় ডাক্তার সুখময় চৌধুরী মহাশয়। উৎসবের দরুণ কিছু অর্থ সংগ্রহও সম্ভবত ডাঃ চৌধুরী করে-ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সে সময় মণি রায় মহাশয় ভারতের বাইরে যান।

এর অনেক পরে ১৯৩৩।৩৪ সালে স্বর্গীয় ডাক্তার মিহির রায়চৌধুরী সমভি-ব্যাহারে আমরা কয়েকজন মেডিক্যাল কলেজ থেকে শরৎবাবুর বাসভবনে যাই—উদ্দেশ্য তাঁর দস্তার নাটক বিজয়া সংগ্রহ করা। সে সময় কয়েকবার তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল।

ডাঃ সন্তোষকুমার দাস
কলকাতা-৭।

বাংলা বইয়ের বাজার

কাগজের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ার, শুনতে পাচ্ছি, প্রকাশক মহলে হাহাকার পড়ে গেছে। কাগজের দাম যে শুধু বেড়েছে তা-ই নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে কাগজ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। কাগজের অভাবে এ বছর স্কুল-কলেজের টেকস্‌ট বইও ঠিক সময় ছাপা হয়ে উঠছে না—সুতরাং সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির ওপরে যে আরও বড় আঘাত এসে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

আঘাত এলেই যে ভেঙে পড়তে হবে, তার কোনো কথা নেই। কাগজের দাম বাড়লে বইয়ের দামও বাড়বে, ফলে বিক্রি কমে আসবে—এই সহজ ফর্মুলা সামনে রেখে মুহ্যমান হয়ে পড়াটা কোনো কাজের কথা নয়। আমাদের দেশের প্রকাশকরা বইয়ের প্রচার বৃদ্ধি করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? এ ব্যাপারে আমাদের প্রকাশকদের তেমন কোনো কল্পনাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। বই ছেপে, বিজ্ঞাপন দিয়ে তারপর দোকানে দোকানে সাজিয়ে রাখাই একমাত্র কর্তব্য নয়।

আমাদের দেশের অনেকেই যে বই কেনেন না, তার কারণ এই নয় যে, সকলেই অনিচ্ছুক। তার মূলে কারণ, অনেকেই হাতের কাছে কিংবা চোখের সামনে বই পান না। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে প্রকাশককে চিঠি লিখে ভি পি-তে বই আনান মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যাঁরা অত্যুৎসাহী। তা ছাড়া ভি পি-তে নিতে গেলে দাম বেশী লাগে। কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রেই এমন হতে পারে, একখানা বই অনেক দিন ধরেই পড়ার ইচ্ছে—বেশ নাম-টাম শুনেছি, হঠাৎ যদি সে বইখানা হাতের কাছে কোনো দোকানে দেখি, পকেটে পয়সা থাকলে ঝোঁকের মাথায় সেখানা কিনে ফেলতে পারি। বেরিয়েছিলাম এক বাক্স সাবান কিনতে, কিন্তু সেই পয়সাতেই একখানা বই কিনে ফিরে এলাম—এমন দুর্বলতা সাহিত্য পাঠকদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু প্রকাশকরা এই দুর্বলতার কথা জানেন না।

বাংলা বই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। কলকাতার কথাই ধরা যাক। কলকাতার প্রধান বইপাড়া কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল। এ ছাড়া দক্ষিণ কলকাতায় কয়েকটি এবং উত্তর কলকাতায় নামমাত্র বইয়ের দোকান আছে। কিন্তু শহরের মূল প্রাণকেন্দ্র, ধর্মতলা—লালদীঘি এলাকায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও একটাও বাংলা বইয়ের দোকান পাওয়া যাবে না। বইয়ের দোকান আছে, কিন্তু কেউ বাংলা বই রাখে না। বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা এই ব্যাপারটাতে অপমানিত বোধ করেন না।

বই কেনে কারা? খুব গরীবদের বই কেনার সামর্থ্য নেই। খুব বড়লোকেরা সাধারণত বই-ফই-এর ব্যাপারে তোয়াক্কা করে না। বই কেনে সর্বংসহ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন মূলত চাকরি-নির্ভর এবং জীবনযাত্রার ধরনটা অনেকটা এই রকম: সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরই বাজার, তারপরই নাকে-মুখে কিছু খাবার গুঁজে অফিস পানে দৌড়। দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে টিফিন। ছুটির পর আবার ট্রাম-বাসে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফেরা, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে। তারপর হয়তো বাড়িতে ফিরে দেখা যাবে ইলেকট্রিক নেই, কিংবা কেরোসিন নেই। এটা নেই, সেটা নেই। মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। এর পরেও যদি এদের মধ্যে কারুর বই পড়ার স্পৃহা থাকে, সে কি আবার ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে কলেজ স্ট্রীটে যাবে বই কিনতে? এরকম চিন্তা যাঁরা করে থাকেন তাঁরা উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই না। ঐ সব চাকুরিজীবীরা বিনোদনের জন্য সপ্তাহে বা মাসে দুএকবার সিনেমা থিয়েটার দেখতে যায়, বইয়ের দোকান পর্যন্ত যাওয়ার আর ধৈর্য থাকে না। সুতরাং, ঐ সব লোকের জন্য বই সাজিয়ে রাখতে হবে তাদের আসা-যাওয়ার পথের ধারে, অফিস পাড়ায়, সিনেমা-থিয়েটার হলগুলির পাশেই, এমনকি মুদির দোকানেও। শেষ নামটি শুনে অনেকে ভুরু কোঁচকাবেন, কিন্তু বিদেশের অনেক জায়গাতেই মুদির দোকানে বহু বিদগ্ধ লেখকেরও বই বিক্রি হয়।

ক্রেতা কাছে আসবে না, ক্রেতার কাছে পৌঁছোতে হবে। পুস্তক প্রকাশনার জগতে এই প্রথাটার একটা নাম বুক ক্লাব। এই প্রথা বিদেশে তো বটেই, দিল্লিতেও বেশ সার্থকভাবে চলছে। অথচ কলকাতায় কোনো সাড়া শব্দ নেই। এই প্রথাটার কথা হয়তো অনেকে জানেন, যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্যই বুঝিয়ে দিচ্ছি।

চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে চললেও, এ দেশে এখনো এমন অনেক পরিবার আছে যারা মাসে অন্তত দশটা টাকা বই কেনার জন্য ব্যয় করতে পারে। এ রকম পরিবারের সংখ্যা এক লক্ষের কম নয়। মাসে দশ টাকা বই কেনার জন্য ব্যয় করলে বছরে একশো কুড়ি টাকা দাঁড়ায়। বুক ক্লাব তার সদস্যদের কাছ থেকে মাসে দশ টাকা করে চাঁদা নিয়ে জমায়। তারপর অনেকগুলো বইয়ের সচিত্র ক্যাটালগ তাদের কাছে পাঠিয়ে বলে, এর মধ্য থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা দামের যে কটা ইচ্ছে বই বেছে নিন না? অনেকে শুধু যে প্রলুব্ধ হবে তাই নয়, উপকৃতও হবে। আর সরাসরি বিক্রয় করলে, একশো কুড়ি টাকা নিয়ে একশো পঞ্চাশ টাকার বই দেওয়া যে ক্ষতিকর কিছু নয়, তা প্রত্যেক প্রকাশকই জানেন। সাধারণত বুক ক্লাবের তালিকায় শুধু যে গল্প-উপন্যাস-কবিতা সাহিত্য গ্রন্থ থাকে তাই-ই নয়, এর মধ্যে থাকে শিকার কাহিনী, ভ্রমণ, পক্ষীতত্ত্ব, রান্নার বই, ছোটদের কমিকস, এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি অনেক কিছু—যাতে পরিবারের সকলেরই পছন্দসই বই পাওয়া যায়।

মাসে দশটা টাকা অনেকে খরচ করতে পারে, কিন্তু নিজে গরজ করে দশটা টাকা পাঠাতে পারে না। পোস্ট অফিসে গিয়ে লাইন দিয়ে মানি অর্ডার করাও এক ঝামেলার ব্যাপার। আমার মতন এমন অনেক কুঁড়ে লোক আছে, যারা মনে মনে ভাবে, অমুক বইটা কেনার জন্য টাকা পাঠালেও হয়, কিন্তু আজ-যাবো কাল-যাবো করে আর হয়ে ওঠে না। সুতরাং, বিভিন্ন শহরে বুক ক্লাব নিযুক্ত এজেন্ট সদস্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাসের নির্দিষ্ট দিনে টাকাটা নিয়ে আসতে পারে।

যেখানে এজেন্ট নিয়োগ করা সম্ভব নয়, সেখানে আর একটি পন্থা খোলা আছে। বুক ক্লাবের সদস্যদের কাছে ঠিকানা লেখা, স্ট্যাম্প-আঁটা খাম পাঠিয়ে অনুরোধ করতে হবে, শুধু একটা দশ টাকার চেক লিখে এই খামে ভরে পোস্ট করে দিন। আপনাকে আর কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। বাকি সব দায়িত্ব আমাদের। এর মধ্যে শতকরা পঁচিশটা খাম হয়তো আর ফিরে আসবে না। সেটাও আগে থেকে ধরে রাখতে হবে। এই উপায়ে নিভৃত এলাকার চা-বাগানে কিংবা জাহাজে ভ্রমমান যে-সব পাঠক বই কেনার ব্যাপারে উৎসুক, তাঁরাও উপকৃত হতে পারেন। আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও গ্রামবাসের কাছে নেমে পড়ছেন। যে রাঁধে সে যেমন চুলও বাঁধে, তেমনি যে চাষ করে, সে বইও পড়তে পারে। [illegible] না, কারণ বই পায় না। তাদেরও [illegible] করা যায় এইভাবে।

এই সব প্রতিটি ক্ষেত্রে বুক ক্লাব বা প্রকাশকদের যে সৎ হতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। যাঁরা টাকা পাঠিয়েছেন, তাঁরা যাতে ঠিক সময়ে ঠিকঠাক বই পান—সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার। একবার বদনাম রটলে সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে। বড় বড় প্রকাশক এই দায়িত্ব অনায়াসে নিতে পারেন। তবে, সব ক্ষেত্রেই দেখতে হবে যে তাঁরা নিজেদের বই বিক্রি করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও সাহায্য করছেন, কিছুটা উপকারও করছেন। মশাই, ইচ্ছে হয়তো নিন, না হয় তো চলে যান—এই মনোভাব থাকলে কোনো ব্যবসাই সার্থক হয় না। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ বাঙালী ব্যবসায়ীরই এই মনোভাব।

সনাতন পাঠক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে "Futureo-ist" বলে এক ধরনের বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়; এঁরা রাশি রাশি বই লিখছেন। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্বন্ধে শিক্ষাদানও শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনা, কি ভাবে ভবিষ্যতের মোকাবিলা করা যায় তারই কলাকৌশল উদ্ভাবন। টফলারের বইটি এই শ্রেণীর [illegible]দের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বই।

ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষের কাছে নতুন নয়, নতুন যেটা সেটা হচ্ছে ভাবনার রূপটি। [illegible]দের মতে, আমাদের বর্তমান জনসমাজকে ভবিষ্যতের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রস্তুতি না থাকলে আমরা ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে না পেরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাব। টফলার বলছেন, এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে প্রায় ৫০,০০০ বছর। মানুষের এক এক জন্ম যদি ৬২ বছর ধরা হয় তবে বর্তমান সময় মানুষের ৮০০ নম্বর জন্ম। এই ৮০০ জন্মের পুরো ৬৫০ জন্ম মানুষের কেটেছে গুহায় বাস করে। গত ৭০ জন্ম মাত্র মানুষ লিখতে শিখে একে অন্যের সঙ্গে জ্ঞানের আদান-প্রদান করেছে। ছাপার অক্ষরের সুযোগ নিচ্ছে গত ছয় জন্ম। ঘড়ি আবিষ্কার হয়েছে চার জন্ম আগে। বিদ্যুৎচালিত মোটর গত দুই জন্মের ব্যাপার। আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসের প্রায় প্রত্যেকটিই আমাদের বর্তমান ৮০০ নম্বর জীবনে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আর কৃষিনির্ভর থাকছে না। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ওপর নির্ভরতা কমছে এবং পৃথিবী এক অতি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের এই জীবনে বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব উন্নতি আমাদের নানারকমের সমস্যার সম্মুখীন করার ফলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। বিজ্ঞান নিত্য নতুন জিনিস দেবে, তার ফলে মানুষকে জীবনে [illegible] করতে হবে। একেবারে নতুন নিয়ম কায়েম করতে হবে। মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে চিরন্তনী বলে কোনো কিছু থাকবে না, সবটাই হবে সাময়িকী। মানুষ শুধু নতুনকে নিয়েই সদাব্যস্ত থাকবে। আমাদের সমস্ত ধারণা [illegible] মধ্যে বিসর্জন দেবার জন প্রস্তুত থাকতে হবে।

"জন্ম মৃত্যু বিবাহ বলতে না পারে বর হ" এ বাণীর কোনো অর্থ থাকবে না। মানুষের জন্মও পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হবে। ভবিষ্যতে ভাবী মাতা ভ্রূণ-ব্যাঙ্কে ঢুকে তার প্রয়োজনের কথা বলবে—সে চায় তার ছেলে হোক ছ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, নীল চোখ, সোনালী চুল, বুদ্ধি ক্ষুরধার। কমপিউটারে মিলিয়ে নিয়ে ভ্রূণ-ব্যাঙ্কের কেরানী তাকে চাহিদামাফিক ভ্রূণ যোগান দেবে।

Future Shock by Alvin Toffler : Bantam Books, $1.25.

সেইটি নিয়ে মেয়েটি যাবে তার চিকিৎসকের কাছে। তিনি গর্ভে ভ্রূণটি স্থাপন করে দেবেন। তারপর মেয়েটির সন্তান হবে ঠিক সময়ে। মানুষের মৃত্যুও বিলম্বিত হবে অনেক। মানুষ প্রায় প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলাতে পারবে। অনেক সময়ই নকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আসলের চেয়ে ভাল হবে। এখনই প্রচুর লোক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের হৃদ্‌পিণ্ড চালু রেখেছেন। ভবিষ্যতে তাঁদের সংখ্যা অনেক অনে-ক বাড়বে। আর বিবাহ প্রথা ঘর বাঁধার প্রথাই উঠে যাবে হয়তো।

টফলার বলছেন, বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব উন্নতিতে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, রোগ, অজ্ঞানতা এবং নৃশংসতা দূর হয়ে যাবে। মানুষ যন্ত্রে পরিণত হবে না বরং তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ অসাধারণভাবে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মানুষের [illegible] এত সুযোগ থাকবে যে নিয়ম-মাফিক চলতে যারা অভ্যস্ত তাদেরই অসুবিধা হবে বেশী। সমস্যা হবে অতিরিক্ত স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ কি করবে তার।

মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তর এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের দ্বারা পরিবর্তিত হবে। এবং সেটা হবে আমাদের জীবদ্দশায় আগামী ২০ বছরের মধ্যে। কথাটা পুরো ঠিক নয়, এই পরিবর্তন আমাদের মধ্যে এরই মধ্যে এসে গেছে। পরিবর্তনের গতি আরো বাড়বে।

টফলার নরম মলাটের ৫৫০ পাতার ওপরের বইটিতে লোমহর্ষক সব বর্ণনা দিয়েছেন পৃথিবী কেমন হবে তার সম্বন্ধে। এই সব পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনের ধারণাই বদলে যাবে। 'সব পাখি ঘরে আসে' এ ধরনের কবিতা আর লেখা হবে না।

মার্কিনদের হুজুগে জাত বলে একটা বদনাম আছে। যে কোনো ব্যাপার নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হই-চই করতে ভালবাসে। সুতরাং টফলারের বই লাখে লাখে বিক্রী হয়েছে। খবরের কাগজে পত্র-পত্রিকায় নানা আলোচনা চলেছে। কেউ কেউ বলেছেন অসাধারণ বই, কেউ বলেছেন একদম বাজে। আমার নিজের মনে হয়েছে টফলার যা বলেছেন তার অনেকটাই সত্যি, বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসছে এবং আসবে সেটা অনস্বীকার্য এবং নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখতে আমাদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে সেটাও সত্যি কথা। তবে মানুষের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অসাধারণ। মানুষ এই ক্ষমতার অধিকারী বলেই এ পৃথিবীর সে অধিপতি। সুতরাং টফলার যে আতঙ্কগ্রস্ত চিত্র এঁকেছেন তাতে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। বিজ্ঞান যতই আমাদের জীবন বদলাক মানুষের কতকগুলি প্রবৃত্তি চিরন্তন। ঘরে ফেরার ইচ্ছা তার মধ্যে অন্যতম। শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাই তারা বার বার ফিরে যেতে চায়। তুলসীমঞ্চে প্রদীপ তাই স্মৃতিব্যাকুল করে তোলে। কলকাতা থেকে লন্ডন যেতে যখন তিন সপ্তাহ লাগত তখনো করত, আবার যখন তিন ঘণ্টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যাবে তখনও করবে। অ্যাপোলো দশের যাত্রীরা ছিলেন প্রথম মানুষ যাঁরা চাঁদকে সত্যিকারের কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের সেই চরম বিজয়ের মুহূর্তে কিন্তু তাঁদের ভগবানের কথাই মনে হয়েছিল। মানুষ ভবিষ্যতের মোকাবিলা ঠিকই করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। টফলারের আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই।

প্রিয় শর্মা

সংগীত : বাংলা গানের নানা কথা

বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক। রাজ্যেশ্বর মিত্র। জিজ্ঞাসা। ১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলকাতা-২৯। আট টাকা।

বাংলার অন্যান্য শিল্পকলার মতো বাংলা গানেরও আছে একটি নিজস্ব চরিত্র, কিন্তু বিশেষ গুণ যা তাকে স্বতন্ত্র্য দিয়েছে। উত্তর ভারতের সংগীতধারা থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং আকৃতিগত দিক দিয়ে সেই হিন্দুস্থানী সংগীত তার আদর্শ। কিন্তু বাইরের ওই চেহারাটুকু নিয়েই সে তুষ্ট থাকেনি। ব্যাকরণের কাঠামোর উপর সে প্রাণের বিকাশ ঘটিয়েছে, প্রচলিত রীতির উপর যোজনা করেছে নব নব মাত্রা। রসসৃষ্টির তাগিদে। ধর্ম, কর্ম, জীবন-বাসনার সঙ্গে বাঙালী তার সংগীতকে মিলিয়েছে; সংগীতের মধ্যে সে খুঁজেছে তার সাধনার, ভাব-অনুভবের বক্তব্যকে। বাংলা গান তাই শুধু স্বরলীলা বা সুরলীলা নয়, বাণী আর সুরের সমন্বয়ে সে সম্পূর্ণ। বাংলা গানে বাঙালীর অন্তরের কথা যুগে যুগে ব্যক্ত—সুর-সহযোগে। সেইভাবেই তার সংগীত সংগঠিত।

মোটামুটি এই মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে, রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত, দুই শতাধিক কালের, বিভিন্ন বিশিষ্ট বাংলা গীতিকারের সৃষ্টিকর্ম এবং বাংলা গানের নানা দিক নিয়ে লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ওই গীতিকার সুরকারদের সংগীত-সাধনা ও চিন্তার বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ এখানে পাই। লেখকের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত একটি অনুসন্ধানী, সংবেদনশীল মন। তাঁর বিচার তাই একই সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠ এবং মরমী। বিভিন্ন সময়ে রচিত ছত্রিশটি প্রবন্ধের এই সংকলন-গ্রন্থে বক্তব্যের কিছু পুনরুক্তি অবশ্যই ঘটেছে। প্রতি প্রবন্ধ মোটামুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ। সেই কারণে এক্ষেত্রে ওই পুনরুক্তির ব্যাপারটা অনিবার্য।

রবীন্দ্র-পূর্ব যে-সব গীতিকারের রচনার উপর এখানে আলোকপাত করা হয়েছে, সেই তালিকায় আছেন : রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), দাশরথি রায়, গোপাল উড়ে, অক্ষয়চন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র। রামপ্রসাদ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভ্রমাত্মক ধারণার নিরসন করে রাজ্যেশ্বরবাবু জানিয়েছেন, "রামপ্রসাদ যে সব গানই এক ছকে ফেলে রচনা করেছেন, এমন নয়।" এই উক্তির সপক্ষে দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে—"কালী হলি **মা রাসবিহারী" (ভৈরবী), "এমন দিন কি** হবে মা তারা" (সিন্ধু)। রামপ্রসাদী গানের ভিন্ন ভিন্ন ঢঙ ও গায়নরীতির কথাও তিনি বলেছেন। নিধুবাবুর টপ্পা এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালি গানের আলোচনা সবিস্তার, তথ্যসমৃদ্ধ।

তিনটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে সব কথা বলা অবশ্যই সম্ভব নয়। সে যাই হোক, তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নে মূল বক্তব্যগুলি লেখক প্রত্যয়ের সঙ্গে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করেছেন। "বাংলা গানে", লেখক বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে গেছেন—সেটি হচ্ছে সঞ্চারী।" অধুনা রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের হিন্দুস্থানী-ভাঙা অথবা টপ্পা অঙ্গের গানের খুব সমাদর। এইটুকুতে, ধ্রুপদ আর টপ্পায়, তাঁর প্রতিভার সীমা নির্ধারিত হলে রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ হতেন না, সেটা কেউ কেউ ভুলে যান। রাজ্যেশ্বরবাবু তাই বলতে দ্বিধা করেননি যে, পরবর্তী কালের গানেই রবীন্দ্রনাথ "তাঁর ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করেছেন। এই পরবর্তী কালের রবীন্দ্র সংগীতই প্রকৃত রবীন্দ্র-সংগীত।" রবীন্দ্রনাথের গানে গায়কের স্বাধীনতা নেওয়া চলে কি না, এই বহু-বিতর্কিত প্রশ্নের বিচারও পাঠকের মনোযোগ দাবি করে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গীতিকার-সুরকার : দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম, হিমাংশুকুমার দত্ত, দিলীপকুমার রায়। লেখক উদাহরণ সহযোগে দেখিয়ে দিয়েছেন, কোথায় এঁদের গানের বৈশিষ্ট্য। বাংলা গানকে এঁরা কি দিয়েছেন, মোটামুটি তারও একটি পরিচয় আমরা পাই। "বাংলা গানের নানা দিক" পর্বে কীর্তন, সারিগান, আধুনিক বাংলা গান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আলোচনা ও মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ।

আধুনিক বাংলা গান কতখানি আধুনিক এবং কতখানি গান, এ নিয়ে বিদগ্ধ মহলে আজ প্রশ্ন আর ব্যঙ্গোক্তি শোনা যায় ঠিকই, আবার আধুনিক গানের জনপ্রিয়তাও অস্বীকার করা কঠিন। আধুনিক গানের চাহিদা রয়েছে অথচ যোগ্য প্রতিভার অভাব এই সংগীত-জগতে। রাজ্যেশ্বরবাবুর কাছে এই অভাবটা দুঃখজনক। কিন্তু চাহিদাটাকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতে রাজী নন। তা ছাড়া অনেক অসাফল্যের মধ্যেও তো আদর্শ আর উদ্দেশ্যের একটা ব্যাপার রয়েছে। কোনও প্রচেষ্টাকে অবহেলার অর্থ, তাঁর মতে, **ইতিহাসের শিক্ষাকে অবহেলা করা।**

ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। ইন্ডিয়া পাবলিকেশনস, ৩ বৃটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য : আট টাকা।

বাংলার প্রত্যন্তপ্রদেশ ধলভূম, মানভূম এবং মল্লভূম। মানভূম এবং মল্লভূমের অস্তিত্ব এখন আর নেই। পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলায় এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমায় যথাক্রমে তাদের পরিচয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আদিতে এই সম্মিলিত ভূখণ্ডই ঝাড়খণ্ড। আসলে রাঢ় ও ঝাড় খণ্ড গাঙ্গেয় উপত্যকার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাঢ় ও ঝাড়খণ্ডের মিলিত গবেষণায় এবং পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে লোক সংস্কৃতি ও লোকবৃত্তের বহু হারানো সূত্র পাওয়া যেতে পারে। অতি সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে বাঁকুড়া জেলার বিশ হাজার বছরের এক বিস্ময়কর ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষণা, পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের কাজ একসঙ্গে হওয়া উচিত। তবেই জাতিতত্ত্বের প্রকৃত হিসাব ও পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ মেলে। এদেশে জাতিতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ সাধারণত ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করে। কখনো নরমুণ্ড, কখনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আবার কখনো শুধু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে একটি জনপদ বা নর গোষ্ঠীর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সংগীত বা সংস্কৃতি সেই সঙ্গে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা 'ঝাড়খণ্ডী লোক-ভাষার গান' সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হয়েছেন সম্ভবত সেই কথা ভেবে। গানগুলির কোন ভণিতা নেই, লিখিত রূপ নেই। মুখে-মুখে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে এইসব গান শুধু সামাজিক বা ঐতিহাসিক দিক থেকেই নয়, কিছু কিছু রচনার নিজস্ব সৌন্দর্যশৈলি রয়েছে অপরিমেয়। অর্থাৎ সাঁওতাল, মুণ্ডা ভূমিজ, মালা, মাঝি, মাহাতো মাহালি কামহার ইত্যাদি বিশেষ লোকসমাজের মানসিকতা ও কাব্যিক চেতনা এই গানগুলিতে পরিব্যাপ্ত। এর মধ্যেই পাওয়া যায় আদি অস্ট্রিকী ভাব ও ভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তনের আভাস।

যদিও বীরসা আন্দোলন থেকে আঞ্চলিক ঝাড়খণ্ডী আন্দোলন প্রথম প্রেরণা লাভ করে, তবু ঝাড়খণ্ডের এক স্বতন্ত্র

[illegible] এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কোনো কোনো জায়গায় পাওয়া যায়। [illegible] অবশ্য যেখানে-সেখানে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিবাসী সমাজেও ঝুমুর-গীতের ভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। যে-উৎসবের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসবের খানিক খানিক মিল পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডী লৌকিক সাহিত্যে 'অবদান' ঝুমুরে খ্যাত পরিচিত নাম। পাতা গীত জাপানী 'হাইকু'-র মতো পথ-চলতি মাত্রাল্প কাব্য। দাঁড়ঝুমুর মূলত এক স্তবকের কিন্তু ঝুমুর অনেকাংশে পদাবলীর তুল্য এবং এর আখ্যানবস্তু রাধাকৃষ্ণ ও দেহতত্ত্ব আশ্রয় করেছে। হয়তো সেই কারণেই ঝুমুর বাঙালী হিন্দু সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়। মধ্যযুগের শেষ ভাগে আদিবাসী সমাজের প্রায় সর্বত্র হিন্দুদের ধর্মীয় আন্দোলন গুরুতর প্রভাব রেখে যায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে মথুরা যাবার পথে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে, আদিবাসীদের অনেকে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হয়। ঝাড়খণ্ডের নামোল্লেখ 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র পাওয়া যাবে। সেইজন্য ঝাড়খণ্ডী ভাষার কিছু কিছু লোকসঙ্গীতে বিশেষ করে ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। অবশ্য বৈষ্ণববাদ ও শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার ভূমিকা এইসব গানে খুবই সীমিত। আধ্যাত্মিকতা কদাচ মানবিকতার মৌল গুণগুলিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। টুসু গান, ছো-গান, মঙ্গল-গীত, রাখালের গান, বিয়ের গান ইত্যাদি আরো লৌকিক গানের সংগ্রহ এ বইতে রয়েছে। লেখক দাবী করেন নি, এগুলিই সবশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। তবু ঝাড়খণ্ডের মানুষ, লোকভাষা ও লোকসঙ্গীতকে জানার পক্ষে আলোচ্য বইটি প্রয়োজনীয়। বিশেষ সাহায্য করবে ভাবী গবেষকদের।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

স্বর্গতা শেফালী নন্দীর নাম শুধু শিক্ষাবিদ হিসেবেই খ্যাত নয়, বেশ কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদ-গ্রন্থের রচয়িতা রূপেও তিনি পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন রচনার সঙ্গে পাওয়া একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির [illegible] সাহিত্যে [illegible]।

[illegible] তাঁর [illegible] আগ্রহী ছিলেন বলে তাঁর 'আজ চিন্তা' প্রবন্ধ-গ্রন্থে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব গভীর পরিণত চিন্তার নির্ভুল চিহ্ন ছড়ানো। 'কল্পনার চোখে পশ্চিম' গ্রন্থেও তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তাঁবু নগর' উপন্যাসটি। প্রকাশকের নিবেদন থেকে জানা গেল, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সুযোগ তিনি পান নি। তার আগেই অকাল মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তবু এই উপন্যাসটি পড়লে জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর বোধ, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জ্বলন্ত অনুভবের কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

'তাঁবু নগর' উপন্যাসের বিষয় দেশ বিভাগের পরবর্তীকালে একটি উদ্বাস্তু কলোনির নানান সমস্যামুখর দিনরাত্রির জীবন্ত আলেখ্য। পূবে রানাঘাট, পশ্চিমে বনগাঁ—সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম মামুদপুর। ছিন্নমূল একদল নরনারী এই গ্রামের ট্র্যানসিট ক্যাম্প আশ্রয় নিয়েছে। সামান্য সরকারী দাক্ষিণ্য আর বিপুল অবহেলা, কুচক্রীর অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেও জীবনের সজীবতা ও স্পন্দন বাঁচিয়ে রাখার দুঃসাধ্য চেষ্টায় এরা নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়েছে। স্কুলের পত্তন করেছে, একের বিপদে অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তবু শেষরক্ষা করতে পারে নি। কলকাতায় বাসা বেঁধেছে নরেন্দ্র আর শ্রীময়ী, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন রমানাথবাবু, দণ্ডকারণ্যের অচেনা মাটিতে চালান হয়েছে অস্থায়ী তাঁবু নগরের অন্যান্য বাসিন্দারা। শেফালী নন্দীর লেখার কৌশলটা এই যে, বিক্ষোভ ও জ্বালাকে সংহত করে নিপুণ হাতে একটি মানবিক কাহিনী ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি। উদ্বাস্তু সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করে তাদের সমস্যাকে গম্ভীরভাবে চিত্রিত করেছেন সংবেদনশীল কলমের আঁচড়ে।

*

কমল চৌধুরীর রক্তাক্ত ভিয়েতনাম (চিত্রাঙ্গদা পাবলিকেশনস্‌, দশ টাকা) তাঁর নিজের ভাষায়ঃ 'মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিবেকহীন হত্যাভিযানের আলেখ্য। ......নিঃসংকোচে বলতে পারি, এটি আমার কোনো মৌলিক ঘটনা নয়। বহু মানুষের পরিশ্রমের ফল।'

সুবিন্যস্ত আটটি অধ্যায়ে শ্রী চৌধুরী ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের একটি তথ্য নির্ভর ও মর্মস্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। নবম অধ্যায়ে তিনি এই যুদ্ধের একটি কালানুক্রমিক সূচী তৈরি করে [illegible]

[illegible]

*

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌র [illegible] শিক্ষা ও [illegible] সমাজ' ([illegible] প্রকাশনা, [illegible] টাকা [illegible] পয়সা) [illegible] শিক্ষা ব্যবস্থার [illegible] ইতিহাস থেকে আখ্যানেরই কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আভাস দিয়েছেন : "সমাজ শ্রেণীর পরিচালিত সমাজে কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসক কিংবা অপ্রত্যক্ষ' ঘটেছে, দেশে বিদেশে, সংক্ষেপে তার কিছু পরিচয় রাখা হয়েছে।" শিক্ষা সম্বন্ধে মার্কসীয় মতও একটি পৃথক প্রবন্ধে আলোচিত।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ বিস্তৃত আলোচনার শেষে যা প্রতিপাদ্য হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন তা তাঁরই ভাষায় : 'ধনপতিদের দ্রুত ধনবৃদ্ধি ও জনগণের দ্রুত দারিদ্র্য বৃদ্ধি ব্যতীত আর সব কিছুরই সংকোচন, শিক্ষারও সংকোচন।" আর একটি জিনিস তিনি বারংবার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, সোভিয়েত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিষ্কারের আদর্শ এবং এর সমালোচক যারা তারা সকলেই 'ধনতন্ত্রের পোষা।'

*

অপলা আর সুকান্তর কিশোর প্রেমের মাঝখানে হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়ে নানাভাবে বারবার যে বিরক্ত করতো সেই গোপলাভুতই পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত আই এ এস জি সি সরদার। অপলাকে ছেড়ে সুকান্ত তখন আমেরিকায়, প্রায় অজ্ঞাতবাসে। সুকান্ত অপলাকে পুনর্মিলিত করার ব্যাপারে গোপাল সরকারের নিঃস্বার্থ ভূমিকাকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন অসীমানন্দ মহারাজ তাঁর রঙীন বসন্ত (বসু মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ৫৫, চার টাকা) উপন্যাসে। উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ প্রবল, সংলাপও সর্বত্র স্বাভাবিক নয়—তবু গল্পের একটা তরতরে টান থাকায় পড়তে অসুবিধে হয় না।

*

আমেরিকার বিশিষ্ট গান্ধীবাদী চিন্তানায়ক রিচার্ড বি গ্রেগ মহাত্মা গান্ধীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে বেশ কয়েকখানি বই লিখেছেন। বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যবহুল বিচারশীল, গ্রেগের প্রত্যেকটি গ্রন্থই বিশেষ ভাবে সমাদৃত। বিশেষত, তাঁর 'দি পাওয়ার অফ নন ভায়োলেন্স' বইটি গান্ধীবাদের ওপর লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গান্ধীজীর অহিংসাবাদী দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা

আলোচনা করে গ্রেগ দেখিয়েছেন যে, নৈতিক যুযুৎসুর এই গান্ধীজী-প্রদর্শিত পন্থাতেই বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণ সম্ভবপর। পৃথিবীর যাবতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিশদ পরিচয় দিয়ে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি নানান যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যুক্তিনির্ভর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন যে, হিংসার সঙ্গে ভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকায় হিংসা মানুষের নৈতিক প্রতিষেধক হতে পারে না। 'প্রতিপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন করা, তার চিন্তাধারা এবং ফলাফল সম্পর্কে ধারণা বদলে দেওয়ার কাজটি একমাত্র গান্ধীজীর হৃদয় পরিবর্তক অহিংসার নীতিতেই সম্ভবপর।

শ্রীজ্ঞানদাকান্ত মিত্র গ্রেগের 'দি পাওয়ার অফ ভায়োলেন্স' গ্রন্থের একটি সুন্দর অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। গান্ধীবাদ সম্পর্কে একটি অবশ্যপাঠ্য বই হয়ে রইল তাঁর অনূদিত 'অহিংসার শক্তি' (প্রাপ্তিস্থান: মণ্ডল অ্যাণ্ড সনস, কলকাতা ১২, চার টাকা) গ্রন্থটি।

বর্ণময় বিদ্রোহী ক্রিকেটার

[২]

ক্রিকেট খেলার মনোজ্ঞের ইমারতের নতুন ভিত গড়ে ব্যাটের কানিকে যখন সিড বার্নস কীর্তিস্তম্ভগুলি তৈরি করেছিলেন তখনই ওঁর বিরুদ্ধে ক্রিকেটের নীতি লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ ওঠে। তারপর ব্রাডম্যানোত্তর অস্ট্রেলিয়ার বার্নস-এর যখন এক নম্বর ব্যাটসম্যানের সম্মান পাবার কথা, তখন ওঁর উপর আসে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের চরম আঘাত।

১৯৫১-য় জন গডার্ডের তত্ত্বাবধানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আসছে অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়া দলে বার্নসের স্থান অবধারিত। তাঁকে বাদ দিয়ে দল গড়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। নির্বাচিত ১৩ জনের মধ্যে প্রথম দিকে নামও ছিল সিড বার্নসের। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সিডনি মাঠের দেওয়ালে, রাজপথের পাশের বাড়ির গায়ে বড় বড় পোস্টার পড়েছে। তাতে লেখা—"বার্নস এল—বার্নস গেল।" ব্যাপার কী? না, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলী ১৩ জন খেলোয়াড়ের দল গড়ে যে তালিকা পাঠিয়েছেন বোর্ডের কাছে অনুমোদনের জন্য, বোর্ড সেই তালিকার একটি নামে আপত্তি জানিয়ে তালিকাটি ফেরত পাঠিয়েছে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে। আপত্তির কারণ ক্রিকেট ছাড়া অন্য কিছু।

বার্নস ভেবে পায় না তার নির্বাচনে আপত্তির কারণটা কি, যেমন ১৫ বছর বয়সে ভেবে পায়নি তার উক্তি সম্বন্ধে ওরিলির অট্টহাসির কারণ।

১৯৩৪ সালের কথা। ইংলণ্ড সফর করে ওরিলি ফিরে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। অবিসংবাদিতভাবে ক্রিকেট-বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে ওরিলি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার। অস্ট্রেলিয়ায় একটি ঘরোয়া খেলায় ১৫ বছরের একটি ছেলে ওরিলির বলের বিরুদ্ধে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করছে। ছেলেটিকে তেমন কেউ চেনে না। তবে পল্লীতে নাকি কিছু নাম করেছে। চমৎকার খেলল ছেলেটি। খেলার শেষে ড্রেসিং রুমে ছেলেটিকে খুঁজে বার করে ওরিলি পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাঃ ছোকরা, বেশ খেলেছ।' ছেলেটি প্রশংসায় গলে না গিয়ে বলল, 'তুমিও তো আজ বেশ ভাল বল করেছ।'

হো হো করে হেসে উঠলেন ওরিলি। ছেলেটি ভেবে পেল না অত ঘটা করে হাসির কারণ কি! যাদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সে খেলেছে তাদের মধ্যে এই লোকটিই তো সবচেয়ে ভাল বল করেছে। সে কথা স্বীকার না করবার কি আছে?

এই সহজ স্বীকৃতি, রাখ-ঢাক কথা না বলা, ক্রিকেটের সভ্য সমাজে কতগুলি ক্লাসিক রীতি লঙ্ঘন এবং ক্রিকেট কর্তাদের মন জুগিয়ে না চলতে পারার ফলেই সিডনি বার্নসের ক্রিকেট জীবন সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠেছিল। নিজ চরিত্রের উপর আরোপিত কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য তাকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে বোর্ডের পক্ষ সমর্থনকারী জনৈক জে এল রেঞ্চ-এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে হয়েছিল, যে মামলার কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক মিঃ জনসকেও। ক্রিকেটের ক্রীড়াঙ্গন থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্যাট ছেড়ে বার্নস কলম ধরেছিলেন। স্পষ্ট কথা লেখার জন্য ক্রিকেটের সমালোচক হিসাবেও তাঁর শত্রু-সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু বন্ধু না জুটেছিল, এমন নয়। যশ, অর্থ, খ্যাতি প্রচারও পেয়েছিলেন। আবার অপযশ, অখ্যাতি এবং উপহাসও কম পাননি। সবচেয়ে বার্নসের জীবনের বিড়ম্বনা, অতবড় ক্রিকেটার হয়েও বিদ্রোহী ক্রিকেটার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে ছিলেন।

কারণ, তিনি কারো পোঁ-ধরে থাকার পাত্র ছিলেন না—ব্রাডম্যানেরও না। চিন্তাধারা ছিল নিজস্ব। ছোটবেলার কথা। বার্নসের ব্যাট থেকে যখন মাঝে মাঝে বড় সংখ্যার রানগুলি বের হচ্ছে তখন কোন কোন শুভানুধ্যায়ী ওকে ক্রিকেটের বড় বড় বইগুলি পড়ার উপদেশ দিল। বার্নস ভাঁড়ামোর সঙ্গে বলল, 'লেখকরা নিজের নিজের স্টাইলের কথাই ঘটা করে লেখে। আমার নিজস্ব কিছু স্টাইলও তো থাকতে পারে।'

চিন্তা করায়, খেলায়, কথা বলায় ওই নিজস্ব স্টাইল এবং আচরণে শিশুসুলভ সারল্যই সমস্যার মূল কারণ। খেলা থেকে আনন্দ পাওয়াই সবচেয়ে বড় জিনিস বলে বার্নস মনে করতেন। টেস্ট ক্রিকেটকে মনে করতেন জীবন-সংগ্রাম। সেটা মজার ব্যাপার নয়, দেশের জন্য লড়ার প্রশ্ন।

বার্নসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? অনেক অভিযোগ। ১৯৩৮-এর সফরে ইংলণ্ডে গিয়ে ১৮ বছরের বার্নস নাকি বিনা অনুমতিতে মাঠের মধ্যে রাজা-রানীর ছবি তুলেছিল। ড্রেসিং রুম থেকে টোশাককে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল টেনিস খেলার জন্য। জীবনে অন্তত তিনবার ক্রিকেটের নীতি লঙ্ঘন করে বেড়া টপকে মাঠে ঢুকেছিল ব্যাট করার জন্য। ১৯৪৭-এ মেলবোর্ন মাঠে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট খেলার সময় বার্নস নিজের অ্যাডমিশন কার্ড বিক্রি করে দিয়ে বিনা টিকিটে গেট টপকে মাঠে ঢুকেছিল। ১৯৪৮ সালের [illegible] সফর থেকে ফিরে এসে ব্রাডম্যানের টেস্টিমোনিয়াল ম্যাচে [illegible] [illegible] ব্যাটিং করে [illegible]। ইয়ান জনসনের বল [illegible] বলেছিল—ব্যাট দিয়ে নয়, [illegible] কাটি দিয়ে [illegible]। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে [illegible] হিসাবে নির্বাচিত হবার প্রতিবাদে [illegible] জল পরিবেশনের জন্য মাঠে ঢুকেছিল [illegible] স্যুট পরে এবং পেছনে একটি [illegible] জোকারের বেশে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

গভীর বিষাদের সঙ্গে 'প্লেড ইট মাই ক্রিকেট' পুস্তকে এবং বিভিন্ন লেখায় বার্নস প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ করে গেছেন।

রাজা-রানীর ছবি তোলার ব্যাপারে লিখেছেন—মিথ্যা কথা, লর্ড গাউরির অনুমতি নিয়েই তিনি ছবি তুলেছিলেন এবং রাজা-রানীও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ছবি তোলার ব্যাপারে মাঠ কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির কারণ—মাঠে ছবি তোলার স্বত্ব নাকি আগে থেকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। বার্নস লিখেছেন, মজা মন্দ নয়। ছবি তুললাম আমি লর্ড গাউরির অনুমতি নিয়ে, আর তার স্বত্ব আগে থেকে বেচে দেওয়া হল, আমি কিছু জানলাম না!

টোশাককে টেনিস খেলতে টেনে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বার্নসের বক্তব্য: যখন আমাদের কিছুই করার নেই তখন ড্রেসিং রুমের অন্দরে গিয়ে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করায় কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?

গেট টপকে মাঠে না ঢুকে বার্নসের উপায় কি ছিল? আগের দিনের নট আউট খেলোয়াড় বার্নস মাঠে ঢুকতে গিয়ে দেখে তাড়াতাড়িতে অ্যাডমিশন কার্ডখানা হোটেলে ফেলে এসেছে। তাকেই প্রথমে ব্যাট করতে হবে। গেটকিপার যদি তাকে ঢুকতে না দেয়, কর্তৃপক্ষের কাউকে ডেকে না দেয়, তার কি করার ছিল। অ্যাডমিশন কার্ড ভুলে ফেলে এসে নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে। কিন্তু টেস্ট খেলার নট আউট খেলোয়াড়ের পক্ষে সময় মত মাঠে না নামলে কি আরও বড় ভুল হতো না। সুতরাং বেপরোয়া বার্নস নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেছিল গেট টপকে মাঠে ঢুকে। কৌতুকের সঙ্গে বার্নস লিখে গেছেন—বলা হয়েছিল বার্নস অ্যাডমিশন কার্ড বেচে দিয়েছে—সেই সব গর্দভদের কি করে বোঝাব—'সিডনি বার্নস' নাম লেখা কার্ড অপর কাউকে বিক্রি করা যায় না।

ব্রাডম্যানের টেস্টিমোনিয়াল ম্যাচে, খেলনা-ব্যাটে ব্যাটিং করা তো প্রদর্শনী খেলায় দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যই। এ ধরনের খেলায় যদি একটু মজা করা না যায় তবে খেলার মধ্যে আনন্দ কোথায়? টেস্ট খেলা তো আর রক্তারক্তি মারামারির জায়গা নয়।

সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে গেছে, তখনই কৃষ্ণণ জবাব দিয়েছে বিজয়ের সার্ভিস ভেঙে একাধিকবার। সবচেয়ে বড় কথা, বহুবার কৃষ্ণণের মারের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে র‍্যাকেটে তালি বাজিয়ে জোন্সের খেলার তারিফ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কৃষ্ণণ ও বিজয় অমৃতরাজের ফাইনাল খেলা এক উপভোগ্য টেনিস লড়াই।

জাতীয় ফুটবলে কেরলের জয়

জাতীয় ফুটবলের ৩৩ বছরের ইতিহাসে বিজয়ীর তালিকায় নতুন নাম যোগ হয়েছে কেরল। ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং রেলওয়েজ ও সার্ভিসেসকে নিয়ে আয়োজিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর তালিকায় এতকাল ৯টি দলের নাম ছিল। আর একটি যোগ হল।

জাতীয় ফুটবল এ বছর ৩৩ বছরে পদার্পণ করলেও খেলা হয়েছে কিন্তু ৩০ বার। ১৯৪২, ৪৩ ও ৪৮-এ জাতীয় ফুটবলের আসর বসেনি। ৩০ বারের প্রতিযোগিতার মধ্যে বাংলাই ফাইনাল খেলেছে ২২ বার, বিজয়ীর পুরস্কার সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছে ১৪ বার। ভারতীয় ফুটবলে যাদের পর্যাপ্ত প্রাধান্য, এবার সেমি-ফাইনালের দুটি খেলায় রেলওয়েজের কাছে হেরে গিয়ে তাদের বিদায় যেমন অপ্রত্যাশিত, কেরলের সর্বপ্রথম ফাইনাল খেলা এবং সন্তোষ ট্রফি লাভ তেমন তাৎপর্যপূর্ণ।

খেলোয়াড়দের নাম-এর দিক দিয়ে বিচার করলে কেরলকে অবশ্যই শক্তিশালী দল হিসাবে অভিহিত করা যায় না। তবে নিজেদের রাজ্যের আসরে তারা সমর্থকদের উৎসাহ পেয়েছে, ধারাবাহিকভাবে ভালও খেলেছে। দিল্লি, অন্ধ্র, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত করার পর ফাইনালে তারা রেলওয়েজকে ৩—২ গোলে হারিয়ে জাতীয় ফুটবলে জয়ের সম্মান পেয়েছে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। যদিও প্রতি-যোগিতার সব খেলা মিলিয়ে কেরল ৯টি গোল খেয়েছে, তবু করেছেও সবচেয়ে বেশী গোল—মোট ১৯টি।

ফুটবল দলগত খেলা, ১১ জন খেলোয়াড়ের পারস্পরিক যোগাযোগের খেলা। সেই হিসাবে দলের সাফল্যে সবারই কৃতিত্বের অংশ আছে। তবু সব ক্ষেত্রে যেমন থাকে, কেরলের সন্তোষ ট্রফি জয়ের ক্ষেত্রেও তেমন কয়েকজন খেলোয়াড়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন গোলরক্ষক রভি, ব্যাক দেব আনন্দ ও জাফর, হাফব্যাক হামিদ এবং ফরোয়ার্ড উইলিয়ামস ও মানি। অধিনায়ক
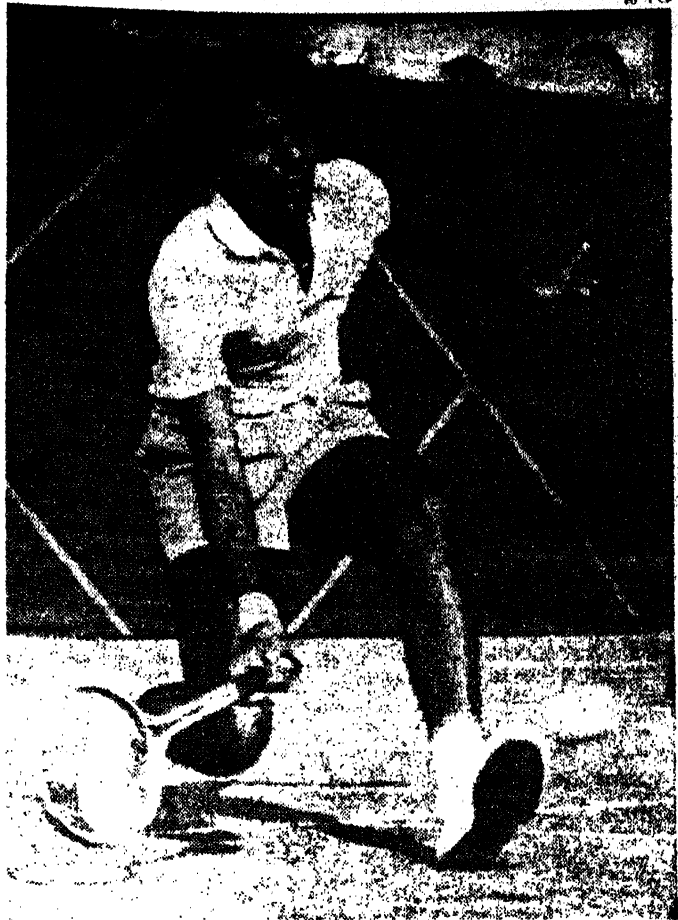
বিজয় অমৃতরাজ ফটো—দেশ

এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড, মানির ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। নেতৃত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা ছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা অর্থাৎ ফাইনাল খেলায় তিনটি গোলই করেছে মানি। জাতীয় ফুটবলের ফাইনাল খেলায় দ্বিতীয় হ্যাট্রিক। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ফাইনালে প্রথম হ্যাট্রিক করেছিল বাংলার হাবিব ১৯৬৯ সালে নওগাঁয় সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে।

জাতীয় ফুটবলে প্রথম বিজয়ী হলেও খেলাধুলায় কেরলের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অ্যাথলেটিকসে। জাতীয় ফুটবল জয়ের পর ফুটবল ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। ফুটবলে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনারও অভাব নেই। এবার তারা জাতীয় ফুটবলের আসর পেতেছে ফ্লাড লাইটের নীচে। ভারতে সর্ব-প্রথম ফ্লাড লাইটে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। সরকারের তরফ থেকেও কেরল ফুটবল সংস্থাকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়েছে। কোচিনের মহারাজা গ্রাউন্ডের কলেবর বাড়ানো হয়েছে যার ফলে ৪০।৫০ হাজার দর্শক খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছে। খবর, ফাইনালেই কমপক্ষে ৫০ হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিল। কলকাতায় ইডেন গার্ডেনসে খেলা হলে পৃথক কথা, ভারতের আর কোন ফুটবল মাঠে ৫০ হাজার দর্শক আসনের ব্যবস্থা নেই। বিজয়ী কেরল দলের প্রতি খেলোয়াড়কে সরকারের তরফ থেকেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এক হাজার টাকা করে পুরস্কার দিয়ে।

বাংলার ব্যর্থতা

জাতীয় ফুটবলের ৩০ বার প্রতি-যোগিতার মধ্যে এবার নিয়ে ৮ বার বাংলাকে ফাইনালে ওঠার আগেই বিদায় নিতে হয়েছে। কেরলের আসর থেকেই দুইবার। শুধু দুইবার ফাইনালে ওঠার ব্যর্থতাই নয়, কেরলে আয়োজিত জাতীয় ফুটবলের সঙ্গে বাংলা বোধ হয় এক অভিশাপের বাঁধনে জড়িয়ে আছে। মোট পাঁচবার ওই রাজ্যে সন্তোষ ট্রফির খেলা হয়েছে। তার মধ্যে

ব্যাকহ্যান্ডে জোরালো ভলি মারছে কৃষ্ণণ
ফটো—দেশ

মাত্র একবার ছাড়া বাংলা দল সন্তোষ ট্রফি নিয়ে ওখান থেকে ফিরতে পারেন। ১৯৫৫য় এর্নাকুলাম আসরে মহীশূরকে হারিয়ে জয়ের পর ৫৬র ত্রিবান্দ্রামে ফাইনালেই উঠতে পারেনি, ৬১তে কালিকটের ফাইনালে হেরেছে সার্ভিসেসের কাছে, ৬৬তে কুইলনের আসরে ফাইনালে হেরেছে অন্ধ্রের কাছে। এবার কোচিনে সেমি-ফাইনালে হারল রেলের কাছে।

কেরলের ফুটবল আসরের সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য রাজ্যেরও দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে। পাঁচবারের মধ্যে কোনবারই আগের বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়নের পক্ষে জয়ের সম্মান লাভ করা সম্ভব হয়নি। দুই একটি ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন দলকে হারতেও হয়েছে অপ্রত্যাশিত ভাবে। যেমন ১৯৫৫য় আগের বারে বিজয়ী বোম্বাইকে হারতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিহীন আসামের কাছে।

দুর্ভাগ্যের এই সব নজীরের সঙ্গে যদি এবারের দুর্ভাগ্যকে যোগ করি তবে সব ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সত্যিই কি দুর্ভাগ্য?

ভাবলে রেলের সেমি-ফাইনালের দুটি খেলাতেই রেলওয়ে দলের কাছে বাংলার পরাজয় কি যোগ্যতা ও দলগত শক্তি অনুযায়ী সঙ্গতিসূচক হল?

রেল টিম কাদের নিয়ে গড়া হয়েছিল? দু'তিনজন খেলোয়াড় বাদে কলকাতার মাঠের খেলোয়াড়দের নিয়ে। যাদের নামী নক্ষত্র এবং ক্রীড়ামোদীর সঙ্গে বাংলার নামী খেলোয়াড়েরা অনেকেই পরিচিত। কলকাতা মাঠে গালভরা নামের একটি নামও রেল দলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সেই রেল দলের কাছেই তারকাখচিত বাংলা দলের প্রথম খেলায় পরাজয় ০—১ গোলে, দ্বিতীয় খেলায় ১—২ গোলে।

খেলোয়াড়রা অবশ্যই মেশিন নয়। তাদের মন মেজাজ আছে, শরীরের চোট আঘাত আছে। শক্তি সামর্থ্য এবং নৈপুণ্য অনুযায়ী সবাই সব দিন সমান খেলতেও পারে না। সুতরাং একটি খেলায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত শক্তিহীন দলের কাছে অপ্রত্যাশিত পরাজয়েরও কৈফিয়ৎ আছে। কিন্তু পর পর দুটি খেলায় পরাজয়ের কৈফিয়ৎ নেই। বিশেষ করে খেলা যখন জাতীয় আসরে এবং দুটি খেলাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা দলের কোন দিক দিয়েই ঘাটতি ছিল না। খেলোয়াড়ের সংখ্যার দিক দিয়েও না। কম করে ২০ জন খেলোয়াড় নিয়ে বাংলা কোচিনে গিয়েছিল।

শুধু তো সেমি ফাইনালে রেল দলের কাছেই দুটি খেলায় পরাজয় নয়। শক্তিহীন রাজস্থানকে ৫—১ গোলে এবং আসামকে ৫—০ গোলে পরাজিত করলেও গ্রুপ লীগের প্রথম খেলায় পাঞ্জাবের সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র করা এবং কোয়ার্টার ফাইনালে সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে মাত্র ২—১ গোলের ব্যবধানে জয় কি বাংলার দলগত যোগ্যতার পরিচয়! সার্ভিসেস দলের এখন আর আগের সুনাম নেই। ফুটবলে কীর্তি তাদের অনেকখানি খর্ব হয়ে গেছে। তবু তাদের পরাজিত করতেও বাংলাকে কম বেগ পেতে হয়নি। বর্তমানে পাঞ্জাবের ফুটবলে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবে কলাকৌশল ও প্রথা প্রকরণের দিক দিয়ে বাংলার খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়দের তুলনা হয় না দুই একজন ছাড়া। সেই পাঞ্জাবই প্রথমে গোল করে ৮২ মিনিট পর্যন্ত এগিয়েছিল। বাংলার অধিনায়ক সুভাষ ভৌমিক গোলটি শোধ করে দলের পরাজয় এড়ায়।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে জাতীয় ফুটবলে এবার বাংলার ব্যর্থতার ছবিই বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। কোন কোন খেলোয়াড় ব্যক্তিগতভাবে ভাল না খেলেছে এমন নয়। যেমন অধিনায়ক সুভাষ ভৌমিক, ব্যাক সুধীর কর্মকার, হাফ ব্যাক গৌতম সরকার এবং উইঙ্গার সুরজিৎ সেনগুপ্ত নিজ নিজ ক্রীড়াদক্ষতায় দর্শকদের নজর

কোরটের মধ্যে হাতে-র‍্যাকেটে জাল দিয়ে কৃষ্ণণের খেলার তারিফ করছে বিজয় অমৃতরাজ
ফটো—দেশ

কেড়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই তাদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। ক্লাবকের কুকথায় কান দিতে গেলে অবশ্য বলতে হয় অনেকে আন্তরিকভাবে খেলেনি, দলের কোচ ও অধিনায়ক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল খেলার উপরও তার প্রভাব পড়েছে। মাঠে নেমে, বিশেষ করে জাতীয় প্রতিযোগিতায় নেমে কোন খেলোয়াড় আন্তরিকভাবে খেলেনি—একথা বিশ্বাস করতে অবশ্য প্রবৃত্তি হয় না। তবু যা রটেছে তার এক কণাও যদি সত্যি হয় তবে সেটা গভীর পরিতাপের কথা। বাংলার ফুটবলেও অমঙ্গলের চিহ্ন।

কোচিনের জাতীয় আসর থেকে ফিরে এসে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী কে জিয়াউদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ভারতে ফুটবল মানের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞ কোচ রহিমের মৃত্যুর পর প্রশিক্ষণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক ফুটবলের জ্ঞানসম্পন্ন কয়েকজন কোচের দ্বারা সে শূন্যতা পূরণ করা গেছে।

কথাটার মধ্যে অবশ্যই সত্যতা আছে। প্রতিটি খেলায় ৩.৩টি গোলের হিসাবে জাতীয় আসরের ৩৭টি খেলায় ১২২টি গোল হবার মধ্যেও আমাদের ফরোয়ার্ডদের গোল করতে না পারার অখ্যাতি অনেকটা কেটে গেছে। তবু কিন্তু এ বছরের খেলার মান উঁচুতে ওঠেনি, খেলা দেখে দর্শকদেরও মন ভরেনি এক নিজ রাজ্যের জয়ের সংবাদে কেরলের দর্শকদের আত্মতুষ্টি ছাড়া।

একলব্য

ওস্তাদ হাফিজ আলি খান মেমোরিয়াল মিউজিক ফেসটিভ্যাল

ওস্তাদ হাফিজ আলি খান স্মৃতি সংগীত সম্মেলন। মঞ্চের পশ্চাৎপটে ওস্তাদ হাফিজ আলি খানের বিরাট প্রতিকৃতি। সামনে বসে বাজাচ্ছেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান। পাশে পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ

বহু আলোচিত 'ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ স্মরণে সংগীত সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠান স্বর্গত শিল্পীর কনিষ্ঠ পুত্র আমজাদ আলী খাঁর। সারারাত্রির প্রথম আসরে আমজাদ বাজালেন মালকোষ। সরোদ হাতে বসার ঢঙে আমজাদ বাবার মত নন। কিন্তু বাজনার বসে এবং উচ্চবাদী গড়নতায় পিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাঁর। বাজনার প্রথম স্ট্রোক থেকেই সেটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আলোচ্য বাজনায় আলাপের প্রাথমিক অংশ কিছুটা চালিত ধ্রুপদাঙ্গ বাদনরীতির মত শোনাল। পিতার যে স্বচ্ছন্দ অথচ ভাবনাসম্পৃক্ত আলাপের উত্তরাধিকারী আমজাদ, সেই ছবি ধরা দিল আর একটু পরে। জোড়ের অংশ থেকে নিখুঁত ওজনের স্ট্রোক এবং মধ্যমের, ধৈবতের আন্দোলনের সামঞ্জস্য রেখে খরজ থেকে স্বরস্তরে টিপের সঞ্চরণ মালকোষের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আমজাদের বিশেষত্ব সুরের নৈপুণ্য। কিন্তু সেদিন সুরের বহুমুখ উল্লাস স্মরণযোগ্য হয়ে উঠল। তান কিংবা গমক মীড় কিংবা বাট, কিংবা নি সা গ ম ধ ম নি ধ, ম ধ নি সা নি ধ, ম ধ, গ ম, সা গ, নি সা গ ম ধ ম গ ম বিস্তার, কিংবা গতবাদনে সুরশৃঙ্গার স্টাইলের ব্যবহার, বারবার মাত্রার ছন্দের ব্যবহারে অমোদ কি ভাবপরণ—এ সমস্ত মিলেই আমজাদের বাজনাকে একটি পূর্ণতা দিয়েছিল। দু দুটি গৎ বন্দীশও আমজাদের মনোহর। দ্রুত গৎটি তার সূক্ষ্ম ছন্দের আবর্তনে গোলাম আলী খাঁর খেয়াল গায়কীকে মনে করিয়ে দেয়। গতের বোল অংশের বিস্তারের প্রাচুর্য তবলা শিল্পী লতিফ আহমেদ খাঁকে বোল বাজানোর অনেক সুযোগ দিয়েছিল। তবে ওঁর সঙ্গত আরও মাথা-মাথা হলে পারত (তাতে অনেক আহ্লাদ হত শ্রোতার, যেমনটি হয়েছিল বিলায়েত খাঁর সঙ্গে কিষেণ মহারাজের)।

আমজাদের ঝালা ছোট করে বাজান। ওঁর দ্রুতলয় গতি ঠিকই ছিল, তবে ওঁর ঝালা আমি আগে অনেক সন্তর্পণে লয়ে চড়াতে দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্কর পণ্ডিতের বাগেশ্রী বয়স্ক পাণ্ডিত্য এবং পরিবেশনগুণে একটি উত্তীর্ণ নিবেদন। বোল বানানোর সুচারু প্রস্তুতিও মনোমুগ্ধকর। এর উপর ছিল চমৎকার লয়দারী। ধরা, ছোঁড়া এবং ছাড়ার কায়দা শিল্পী মেপে মেপে দেখালেন। কৃষ্ণরাওজীর তানগুলি ভারি পরিষ্কার, এবং পরিমিত। গলার অবস্থা বার্ধক্যের জন্য তেমন ভাল নয়। কাজেই নাভীর থেকে উঠে আসা ভারী অঙ্গের গমকের সময় বেশ ক্লান্ত মনে হল তাঁকে। পরে বসন্ত বাহার রাগের খেয়ালে শিল্পীর গলা একদমই বসে গেল। তার সপ্তকে ক্রমাগত গলা ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং জটিল তানের অংশে কণ্ঠের অসুবিধেতেই রাগের সম্পূর্ণ মজাটা আর গানে ধরা দিল না। শেষে তিলং রাগের টপ খেয়ালে (একটা বিস্মৃতপ্রায় গায়নশৈলী) শিল্পী ফের মেজাজ খুঁজে পেলেন। জমাট গিটকিরি এবং বক্র তানে তিলঙের নিবেদন একটি বৈঠকী আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। অনেক পুরোনো বাংলা গান মনে পড়েছে শোনার সময়। কৃষ্ণরাওজীর শেষ নিবেদন ভজন। মোটের উপর ভাল।

সেতারী আবদুল হালিম জাফর খাঁ বাজালেন দরবারী কানাড়া। প্রথম পনের মিনিটের পর আর কোন নতুন কিছু পেলাম

'জন্দু ঠাকুরমা' (পরিচালনা : তপন সরকার) ছবিতে চিন্ময় রায় ও সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। নিভা দাস বেহালায় 'মালকোষ' শুনিয়েছেন। শিল্পীর মুনশিয়ানা আছে বটে, তবে কল্পনাশক্তি এখনও তেমন পরিণত হতে পারে নি। যোশরৎ আলি খানের সরোদে 'আভোগী' যথাযথ মর্যাদা পায় নি। প্রবীণ শিল্পী গৌর গোস্বামী বাঁশিতে 'শুদ্ধ কল্যাণ' ও 'হংসধ্বনি' শুনিয়েছেন। শিল্পীর গায়কী অঙ্গ পরিবেশনার ভঙ্গীটি মনোজ্ঞ। তবে তবলিয়া অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে আর একটু স্বাধীনতা দিলে সমীচীন হতো। মোহনলাল শর্মার হারমোনিয়মে 'গোরখ কল্যাণ' ও 'পাহাড়ী ঠুমরী' অসাধারণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সম্মেলনে দুটি তবলা লহরার অনুষ্ঠান শোনা গেছে। প্রথম দিনে শিল্পী ছিলেন শংকর ঘোষ, অন্য দিনে কানাই দত্ত। শংকর ঘোষ বিক্রম তালে (১৩ মাত্রা) নিবদ্ধ লহরা শোনান। কানাই দত্তের হাতে শুনেছি ঝাঁপতাল ও ত্রিতাল। উভয়েই তাঁদের অসামান্য নৈপুণ্য ও ছন্দোময় গতিশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন। বোলের বিভিন্ন পর্বের সন্নিবেশে কোথও কোন আড়ষ্টতা বা অস্পষ্টতা ছিল না। তবে মুখে 'বোল' বলার ব্যাপারে উভয়েই কিছুটা নিস্তেজ।

কণ্ঠসংগীতের আসরে প্রধানতম আকর্ষণ ছিলেন আমীর খাঁ। শিল্পী শোনালেন 'ভাটিয়ার', 'বৈরাগী ভৈঁরো' ও 'দেশকার'। শান্ত সংযত বিস্তার, সুষ্ঠ সরগম ও চিন্তাঋদ্ধ মিলনবোধ অনুষ্ঠানটিকে একটি মহনীয় ভাবরূপ দান করে। তবলা সংগত করেন শংখ চট্টোপাধ্যায়। গায়কের প্রতি তাঁর নিরভিমান আনুগত্য নির্দ্বিধায় প্রশংসনীয়। জ্ঞিতেন্দ্র অভিষেকীর দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভাল। শিল্পীর আবেগপ্রাচুর্য আছে, তবে কণ্ঠের ব্যাপ্তি কিছু কম। রাগ বিশেষের রীতিনীতি সম্পর্কেও প্রায়শই স্বাধীনতা নিয়েছেন। শিল্পীর কণ্ঠে শুনেছি 'কৌশিকী কানাড়া' ও 'ললিতে' খেয়াল, 'যোগিয়া' ভজন আর 'ভৈরবী' ঠুমরী। কলকাতায় নবাগত গুজরাটের শিল্পী রসিকলাল অন্ধেরিয়া কলাকৌশলে কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হলেও সুরময়তা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। তিনটি অধিবেশনে তাঁর নির্বাচিত রাগ 'বেহাগ', 'সাঁঝ', 'ধানী', 'রাগেশ্রী', 'কেদারা', 'কলাবতী'। একটি কাফী ঠুমরীও শুনিয়েছেন শিল্পী। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন 'রাগেশ্রী'তে খেয়াল এবং পরে একটি ঠুমরী ও দাদরা। প্রসূনের আবেগমণ্ডিত গায়কী সহজেই একটি সুরের পরিমণ্ডল রচনা করে তোলে। উদাত্ত কণ্ঠ ও মজলিসী ঢংয়ে 'দেবকোষে' খেয়াল শুনিয়ে শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রোতাদের অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর বাংলা টপ্পাটিও খুবই শ্রুতিসুখকর হয়। 'বরারি ভূপ' রাগাশ্রিত নিমাইচাঁদ বড়ালের আলাপ ও ধ্রুপদ অতি সুশৃঙ্খল হয়েছে। তাঁর বাণী নিক্ষেপের সতেজ সুস্পষ্ট রীতিটিও সার্থক ধ্রুপদের অনুকূলে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'কৌশিক' ধ্বনিতে খেয়াল ও পরের দুটি ঠুমরী কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা ও পরিবেশনার সাবলীলতার কারণে শ্রোতাদের কাছে সহজেই আদর পেয়েছে। তবে উঁচু পর্দায় শিল্পীর কণ্ঠ যথেষ্ট সহজ হতে পারে নি। আরতি বাগচির 'পূরিয়া কল্যাণে' খেয়াল ও 'খাম্বাজ ঠুমরী' একটি নিটোল অনুষ্ঠান। পরিণত আলাপ, আনুপূর্বিক বিস্তার, সূক্ষ্ম সতক তান ও সরগম এবং সর্বোপরি রাগরূপের প্রতি শিল্পীর ঘনিষ্ঠ সম্ভ্রম অনুষ্ঠানটিকে একটি সুসংহত লালিত্য দান করে। শান্তি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দক্ষিণী রাগ 'সরস্বতী' একটি সাবলীল প্রয়াস। তিনটি সপ্তকেই শিল্পীর কণ্ঠ অনায়াসে যাতায়াত করে। পূরবী মুখোপাধ্যায় 'যোগ' রাগে খেয়াল ও তরানা শুনিয়েছেন। তরানার বন্দিশটি খুবই মনোজ্ঞ। 'ঝুমরা' তালে নিবদ্ধ খেয়ালের বিলম্বিত পর্বটিও সুন্দর হয়েছে। কৃষ্ণা ঘোষের 'মারু বেহাগ' মোটামুটি। অনিমা রায়ের 'বাগেশ্রী' সুরেলা, তবে গায়িকার পরিবেশন রীতি নিয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। তানগুলি টপ্পা অঙ্গের আর বিস্তার ঠুমরীর রীতি অনুসারী বলে হয়তো কিছু জনের আপত্তি হতে পারে।

কত্থক নাচের আসরে মুখ্য শিল্পী ছিলেন রোশনকুমারী। অসাধারণ পায়ের কাজ, ছন্দোময়তা, অভিব্যক্তি ও কল্পনাশক্তির গুণে রোশনকুমারীর নাচ এখনও মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। রামগোপাল মিশ্রের তবলা সহযোগিতা যথাযথ হলেও শিল্পীর ভাবলেশহীন ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানের প্রাণময়তার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় নি। কত্থক নাচের অন্য শিল্পী ছিলেন ব্রজন মহারাজ। তাঁর নাচে তাঁর শিক্ষাগুরু বিরজু মহারাজের সুন্দর ছাপ রয়েছে। মিতা কর আর প্রিয়া ভট্টাচার্যের দ্বৈত কত্থকও খুব উপভোগ্য হয়। বয়স অল্প হলেও দুজনেই তাঁদের প্রয়াসে আন্তরিক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপারে আগ্রহী।

সংগীত সমালোচক

"তারকাসুর বধ" নৃত্যে নীরেন সেনগুপ্ত

ওস্তাদ হাফিজ আলি খান মেমোরিয়াল মিউজিক ফেসটিভ্যাল

ওস্তাদ হাফিজ আলি খান স্মৃতি সংগীত সম্মেলন। মঞ্চের পশ্চাৎপটে ওস্তাদ হাজিফ আলি খানের বিরাট প্রতিকৃতি। সামনে বসে বাজাচ্ছেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান। পাশে পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ

বহু-আলোচিত 'ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ স্মরণে সংগীত সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠান স্বর্গত শিল্পীর কনিষ্ঠ পুত্র আমজাদ আলী খাঁর। সারারাত্রির প্রথম আসরে আমজাদ বাজালেন মালকোষ। সরোদ হাতে বসার ঢঙে আমজাদ বাবার মত নন। কিন্তু বাজনার রসে এবং তন্ত্রবাদী গূঢ়তায় পিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাঁর। বাজনার প্রথম স্ট্রোক থেকেই সেটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আলোচ্য বাজনায় আলাপের প্রাথমিক অংশ কিছুটা চলিত ধ্রুপদাঙ্গ বাদনরীতির মত শোনাল। পিতার যে স্বচ্ছন্দ অথচ ভাবমাসম্পৃক্ত আলাপের উত্তরাধিকারী আমজাদ, সেই ছবি ধরা দিল আর একটু পরে। জোড়ের অঙ্গ থেকে নিখুঁত ওজনের স্ট্রোক এবং গান্ধার, ধৈবতের আন্দোলনের সামঞ্জস্য রেখে স্বর থেকে স্বরান্তরে টিপের সঞ্চরণ মালকোষের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আমজাদের বিশেষত্ব সুরের নৈপুণ্য। কিন্তু সেদিন সুরের বহুল উন্মোচনও স্মরণযোগ্য হয়ে উঠল। তান কিংবা গমক. মীড় কিংবা বাট, কিংবা নি সা গ ম ধ ম নি ধ, ম ধ নি সা নি ধ, ম ধ, গ ম, সা গ, নি সা গ ম ধ ম গ ম বিস্তার, কিংবা গতবাদনে সুরশৃঙ্গার স্টাইলের ব্যবহার, বাবার মনোহর ছন্দের ব্যবহারে আমোদ কি তারপরণ—এ সমস্ত মিলেই আমজাদের বাজনাকে একটা পূর্ণতা দিয়েছিল। দু দুটো গত বন্দীশও আমজাদের মনোহর। দুনী গতটি তার সূক্ষ্ম ছন্দের আবর্তনে গোলাম আলী খাঁর খেয়াল গায়কীকে মনে করিয়ে দেয়। গতের বোল অঙ্গের বিস্তারের প্রাচুর্য তবলা শিল্পী লতিফ আহমেদ খাঁকে বোল বাজাবার অনেক সুযোগ দিয়েছিল। তবে ও'র সংগত আরও মাখা-মাখা হলে পারত (তাতে অনেক আহ্লাদ হত শ্রোতার, যেমনটি হয়েছিল বিলায়েত খাঁর সঙ্গে কিষেণ মহারাজের)।

আমজাদের ঝালা ছোট করে বাজান। ও'র তুরন্ত গতি ঠিকই ছিল, তবে ও'র ঝালা আমি আগে অনেক সন্তর্পণে লয়ে চড়তে দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ও শংকর পণ্ডিতের বাগেশ্রী খেয়াল পাণ্ডিত্য এবং পরিবেষণগুণে একটা উত্তীর্ণ নিবেদন। বোল বানানের মুন্সীয়ানা প্রস্তুতিও মনোমুগ্ধকর। এর উপর ছিল চমৎকার লয়দারী। ধরা, ছোঁড়া এবং ছাড়ার কায়দা শিল্পী মেপে মেপে দেখালেন। কৃষ্ণরাওজীর তানগুলি ভারি পরিষ্কার, এবং পরিমিত। গলার অবস্থা বার্ধক্যের জন্য তেমন ভাল নয়। কাজেই নাড়ীর থেকে উঠে আসা ভারী অঙ্গের গমকের সময় বেশ ক্লান্ত মনে হল তাঁকে। পরে বসন্ত বাহার রাগের খেয়ালে শিল্পীর গলা একদমই বসে গেল। তার সপ্তকে ক্রমান্বয়ে গলা ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং জটিল তানের অংশে কণ্ঠের অসুবিধেতেই রাগের সম্পূর্ণ মজাটা আর গানে ধরা দিল না। শেষে তিলং রাগের টপ-খেয়ালে (একটা বিস্মৃতপ্রায় গায়নশৈলী) শিল্পী ফের মেজাজ খুলে পেলেন। জমাট গিটকিরি এবং বক্র তানে তিলংগের নিবেদন একটা বৈঠকী আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। অনেক পুরোন বাংলা গান মনে পড়েছে শ্রোতার সে সময়। কৃষ্ণরাওজীর শেষ নিবেদন ভজন। মোটের ওপর ভাল।

সেতারী আবদুল হালিম জাফর খাঁ বাজালেন দরবারী কানড়া। প্রথম পনের মিনিটের পর আর কোন নতুন কিছু পেলা

না তাতে। সবারে সবারে স্বরের প্রতিধ্বনি কানায় কানায়, কি হাল্কা কণ্ঠ কথা কি স্বরের সঙ্গে স্বরের কোন আলাপনের মত নিজস্ব ব্যক্তিক বৈদগ্ধ্য ব্যতীত বাগবাদনের মত একটা প্রকৃতিও দেখলাম না। আর তাছাড়া দরবারীর মত রাগে-অঙ্গের সেই গভীর উপলব্ধিতেটুকু কোথায়? নিঃসন্দেহে হালিম সাহেবের দরবারী খুব সুরেলা; কিন্তু তাতে যথোপযুক্ত কারুণ্য, ভাবনা এবং ব্যাপ্তির অভাব।

,গতেও ছন্দের জটিল কাজ আমরা পেয়েছি। খেমলাংগের প্রভৃত কাজ ছিল কিন্তু তর্বালিয়া শান্তাপ্রসাদের সাথ-সঙ্গতের পক্ষে অবকাশ সেখানে কম। তেহাই খুবই স্বল্প, তবে চিকণ। সামন্য ঠেকাদারীতে সন্তুষ্ট বুঝি হালিম জাফর।

শিল্পীর দ্বিতীয় নিবেদন মধ্যমী পিলুরই এক সংস্কৃত রূপ। মধ্যমী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

বেগম আখতারের সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখেছিলাম 'কলাসংগম' সংস্থার আসরের আলোচনায়। এই সম্মেলনে আমার সেই উক্তিগুলির সমর্থন পেলাম। চমৎকার গলা এখন শিল্পীর। প্রথম থেকেই গজল ধরে মাত করলেন। ক্রমশই দেখতে পাচ্ছি শিল্পী তাঁর গজল-ঠুংরীকে খেয়ালী সম্পদে ভরিয়ে তুলছেন। গজলের শব্দের বিন্যাসে কি ঠুংরীর (উনি 'কোয়েলিয়া' গেয়েছিলেন সেদিন) বোলচলনে যে মজা তিনি সৃষ্টি করেন তার যতটা কৃতিত্ব সুরের ঠিক ততটাই লয়কারীর। এও এক অমোঘ বড়হত্। বেগমের 'ও বেদরদী স্বপ্নমে আ যানা' গানটি সেদিন পূর্বের মতন সম্পূর্ণভাবে দেশওয়ালী গীত-ঢঙে নয়। কিছুটা গজলের মত করে গাওয়া।

সে রাত্রের বিশেষ অভিজ্ঞতা বিরজু মহারাজের কথক। কিষেণ মহারাজের সঙ্গতের সঙ্গে বিরজুর নাচ লয়কারীর তাজ-তহল। সে পরিচয় প্রথমেই পেলাম ও'র ততকারীতে। ততকারীরও যে একটা মূর্ছনা আছে তা বিরজুকে দেখলে বোঝা যায়। পরণ, টুকরোর কাজেও সেই নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য। অত্যন্ত জটিল কোন তেহাইকেও বিরজু মনোহর করে তুললেন চোখ এবং কানের পক্ষে। যখন শিল্পী 'সুরেলা নাচ'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন তখন ও'র মনে হয়ত এই কথাটাই ছিল। বিরজুর নাচে সুর কানে তো বটেই সুরেও ধরা দেয়। এবং তা আমরা দেখেছি ও'র 'ভাও'তে। তার আগে বলা দরকার বিরজু ছন্দের কারুকৃতিতে বিবিধ জন্তুর চলনের ঢঙগুলিও ধরে দেখিয়েছিলেন। এবং এ সমস্তই তেহাইয়ের আন্দাজে।

ঠুংরীর সঙ্গে ভাও ব্যতীত বিরজু রাধার আঁচল থেকে কৃষ্ণের বাঁশীতে রূপান্তরের যে ভংগী দেখালেন তা ভোলা যায় না। অথচ কী সহজ বাঁধা সেই ভাবান্তর। একটি ছোট্ট আবর্তনেই দেখলাম শিল্পী রাধার আঁচল থেকে কৃষ্ণের বাঁশী ধরেছেন।

কৃষ্ণের রাসলীলাতে ভাবের সৌকর্য দেখেছি বিরজুর। ঠুংরীর ভাওতে নায়িকা-রূপী বিরজু স্ত্রী-নৃত্যশিল্পীদেরও হার মানান।

রসজ্ঞের অনুরোধে শেষে শিল্পী ধামার নেচে দেখালেন। দুরূহ এই পেশ-কারিতে তিনি যা করে দেখালেন তার সুচারু ব্যাখ্যা জনৈক সংগীতামোদীর ব্যাখ্যায়—"বিরজুর নাচে এবং বোল-পাঠনে কমা, সেমিকোলোন, ফুলস্টপের জবাব নেই।"

সংগীত সমালোচক

গাঙ্গুলী কলেজ অব মিউজিক-এর সংগীত অনুষ্ঠান

গাংগুলী কলেজ অফ মিউজিকের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনটি ছিল সারা রাত্রির। এই সম্মেলনে কণ্ঠ সংগীতের চেয়ে যন্ত্র সংগীতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

তিন দিনের এই সংগীতের আসরে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল আলি আকবর খানের সরোদ বাদন। তাঁর অনু-ষ্ঠানের পূর্বে এই সংগীত মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীখানকে এক আড়ম্বরপূর্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে শ্রীখান সরোদ বাজিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। খান সাহেব মধ্যরাত্রে দরবারি কানাড়া রাগ দিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। মন্দ্র সপ্তকে এর সঞ্চালনে যে গাম্ভীর্য ও মাধুর্য তা মনে হয় খান সাহেবের মেজাজের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলে। জোড় অংগে যে সূক্ষ্ম মীড়ের অনায়াস সঞ্চালন ও মন্দ্র সপ্তক থেকে তার সপ্তক ছুঁয়ে নিমেষে মন্দ্র সপ্তকে এসে সুরের যে বিন্যাস তা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। তবে আলাপ ও জোড় অংশ গতের তুলনায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত, গতটি কিন্তু এতই মনো-মুগ্ধকর ছিল যে সংক্ষিপ্ত আলাপের ক্ষতিটা শ্রোতারা তাতে পুষিয়ে নেন। শ্রীখান পরে ঝিঁঝিট রাগে ছোট একটি গত বাজিয়ে শোনান শ্রোতাদের অনুরোধে। খান সাহেবের সংগে তবলায় সুন্দর সহযোগিতা করেন জাকির হোসেন। প্রবীণ সরোদ বাদকের সঙ্গে নবীন তবলা বাদকের সংগত খুবই মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

সম্মেলনের অপর উল্লেখযোগ্য যন্ত্র শিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্য সেতারে আহির-ললিত বাজিয়ে শোনান, রাগটি খুবই সুরেলা ও মেওয়াতী। শিল্পীর মেজাজটিও পরিচ্ছন্ন। শ্রীভট্টাচার্যের সঙ্গে তবলায় সংগত করেন শংকর ঘোষ। বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল এই সংগত।

এই তিন দিনের আসরে অন্যান্য যে যন্ত্র সংগীত পরিবেশিত তার মধ্যে শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদ এবং শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের তবলা লহরা উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে এক শিশু তবলা শিল্পী সুরজিত সেনগুপ্তের নাম উল্লেখের দাবি রাখে, শ্রীমান সুরজিতের বয়স কেবলমাত্র ১৩। এই অল্প বয়সেই শ্রীমান সেনগুপ্ত তবলা বাদনে যে দক্ষতা অর্জন করেছে তা তার ভবিষ্যত জীবনে এক উঁচুদরের তবলা বাদক হবার স্বাক্ষর রাখে। শ্রীমান সেনগুপ্ত আসরে তবলা লহরা শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

সম্মেলনে যেসব কণ্ঠশিল্পী অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী মীরা বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক, ডঃ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরবিকুমার কিচলু ও শ্রীবিজয়কুমার কিচলুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী মীরা বন্দ্যো-পাধ্যায় সুললিত কণ্ঠে পূরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান, শ্রীমতী বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রাগ বিন্যাস সহজেই পূরিয়া কল্যাণের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তবলায় সংগত করেন শ্রীমহাদেব চক্রবর্তী। ডঃ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় টোড়ি রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তাঁর গায়কী পদ্ধতিতে বিষ্ণুপুর ঘরাণার বৈশিষ্ট্য সহজেই ফুটে উঠে। শ্রীরবিকুমার কিচলু ও শ্রীবিজয়কুমার কিচলু দ্বৈত কণ্ঠে ভৈরো রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। এ'দের গান শ্রোতাদের তৃপ্তি দিতে পারেনি। যদিও গলার কাজ ছিল যথেষ্ট ও ধ্রুপদ কায়দার গমক ও লয়ের কাজ নিখুঁত ছিল তবু কেন জানি না এ'দের গান শুনে শ্রোতারা তৃপ্তি পাননি। তা ছাড়া রাত দুটোয় ভৈরোর মত প্রভাতী ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগকে এ'রা যে কেন বেছে নিয়েছিলেন তা বোঝা গেল না।

শেষ আসরের শেষ শিল্পী সুনন্দা পট্টনায়ক। ইনি বিলাসখানি টোড়ি রাগে প্রথমে আলাপ বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল ও পরে তারানা গেয়ে শোনান। সবশেষে তিনি একটি ভজন গেয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি করেন। বিলাসখানি টোড়ির বক্রগতি, অবরোহণে কোমল নিষাদ ও মধ্যমের পরিমিত ব্যবহার ও আলাপ অংগে স্বর বিন্যাস শ্রীমতী পট্টনায়কের গানকে প্রাণবান করে তোলে। তাঁর সাপাট ও ছুট তানগুলি ও সূক্ষ্ম মীড়গুলি রস-সমৃদ্ধ। তবলা সংগতে বিশ্বনাথ বোস নিজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখেন। **বিশেষ প্রতিনিধি**

অরণ্যদেব

সংঘর্ষ ঘটতেই। প্লেনের কনট্রোল হাতে নিয়ে অরণ্যদেব সেটা এড়িয়েছেন...
!!

পেপি ও পাইলট স্যাম ওর মধ্যে রয়েছে!
আছে ডায়মণ্ড! কে জানে মারা গেল কিনা!
মরুকগে, হীরাগুলো বাগাতে হবে!

কিন্তু প্লেনের দরজায় পৌঁছতেই...
হীরে আছে, কিন্তু আমিও আছি!
উঃ!
?!

?!
5/20

পালোসনে! দাঁড়া!
উঃ!

??

এখন খুলে বলো তো, ব্যাপারটা কী?
সত্যিই তুমি জানো না?
আগামী সপ্তাহে রহস্যভেদ (১৪)
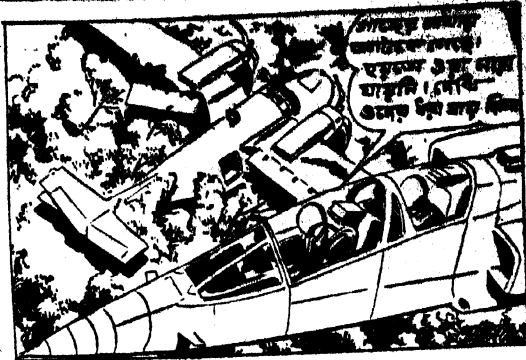
বাস ভাড়া সম্পর্কে কমিশনের রায় আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। কলকাতা এবং হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার শহর এলাকায় স্টেট বাস ও প্রাইভেট বাসের ভাড়ার ক্ষেত্রে দশ পয়সার একটি স্টেজ করার জন্য ব্যানারজি কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। কমিশন বলেছেনঃ দুই কিলোমিটার পর্যন্ত পথের দূরত্বের ক্ষেত্রে এই দশ পয়সার ভাড়া ধার্য করতে হবে। প্রয়োজনবোধে অবশ্য আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থা এই স্টেজের সীমা সামান্য পরিবর্তন করতে পারবেন। এই ব্যানারজি কমিশনই ইতিপূর্বে যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাতে বাস ভাড়ার প্রথম স্টেজ ঠিক করা হয়েছিল পনের পয়সা এবং সে ক্ষেত্রে দূরত্ব সীমা নির্ধারিত হয়েছিল সাড়ে তিন কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশ মত কলকাতা এবং হাওড়ার আর টি এ গত ১ ডিসেম্বর থেকে এই নিম্নতম ভাড়ার হার পনের পয়সা নির্ধারিত করে পুরাতন ভাড়ার হার প্রতি স্টেজে পাঁচ পয়সা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তার পর থেকেই ভাড়া বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে নানা গোলমাল ও আন্দোলন শুরু হয়। বাড়তি ভাড়া আদায় হচ্ছে না —এই কারণ দেখিয়ে গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে কলকাতা এবং শহরতলিতে প্রাইভেট বাসের ধর্মঘটও শুরু হয়। এখন এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিশনের এই সুপারিশ গ্রহণ করবেন। বাসে দশ পয়সার একটি স্টেজ আবার চালু করার সুপারিশ কমিশন কেন করছেন তার যুক্তি হিসাবে কমিশন স্পষ্ট করেই বলেছেন : জনগণের আবেগ বিবেচনা করেছেন। কমিশন তার রিপোর্টে একথাও বলেছেন যে, দশ পয়সার ভাড়ার জন্য জনসাধারণের একটা আবেগপ্রবণ মনোভাব রয়েছে। কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও একটা লোকপ্রিয় আবেগকে সরকারের উপেক্ষা করা উচিত নয়—বরঞ্চ মেনে নেওয়াই উচিত।

দেশী সংবাদ

২৪ ডিসেম্বর—অবশেষে লোকো-কর্মীদের ধর্মঘটের অবসান হল। দশ দিনের এই ধর্মঘটের ফলে সারা দেশের রেল চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারের কাছে কর্মীরা তাঁদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে বিবেচনার আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এই ধর্মঘটের জন্য কোন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সরকারের কাছে এ প্রতিশ্রুতিও তাঁরা আদায় করেন।

২৫ ডিসেম্বর—আসানসোল রানীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলে কয়লা কেলেংকারির সংগে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাঁদের মধ্যে ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের একজন পদস্থ অফিসার ও কোল মাইনস অথরিটির দুজন কর্মী রয়েছেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে পুলিশ মিসায় আটক করেছে।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর একজন সহকারী মুখ্য তথ্য অফিসার শ্রী ডি এফ ডিসুজাকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর সরকারী গোপনীয়তা আইন অনুসারে আটক করেছেন বলে জানা গিয়েছে। শ্রী ডিসুজাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

২৬ ডিসেম্বর—কলকাতা ও হাওড়ায় বে-সরকারী বাস মালিকদের বাস-পারমিট কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। জবাব দেবার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ২৯ ডিসেমবর বেলা এগারোটা পর্যন্ত।

উত্তর-পূর্ব ভারতে আজও শৈত্যপ্রবাহ সমানে বয়ে যায়। সেই সংগে তার হিম আততায়ী থাবায় নিহত শিকারের সংখ্যাও বেড়ে চলে। বিহারে আরও চৌদ্দজন এবং উত্তরপ্রদেশে আরও দুজন মানুষ মারা যান। এ নিয়ে এই দুই রাজ্যে মরসুমী হিমাঘাতে বলির সংখ্যা দাঁড়াল যথাক্রমে ১৪৪ ও ৬৮।

২৭ ডিসেম্বর—চালকল মালিকরা যদি চুক্তি না মানেন তবে তাঁদের সংগে জেলে দেখা হবে। আজ খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বলেছেন, জানুয়ারি থেকে মজুতবিরোধী অভিযান তীব্র করা হবে।

১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বৃহত্তর কলকাতায়, দুর্গাপুরে, আসানসোল এলাকায় বিধিবদ্ধ রেশনে চালের দাম প্রতি কে জি প্রকারভেদে ২৭ ও ৩০ পয়সা করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এপ্রিল মাস থেকে রেশনে গমের দামও বাড়ানোর কথা সরকার ভেবে দেখছেন।

২৮ ডিসেম্বর—পানজাব সরকার ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে তার কর্মচারিদের জন্য সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের কথা ঘোষণা করেছেন। এই মর্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করে বলা হয়েছে, সোম থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস চলবে। বেলা দেড়টায় আধ ঘণ্টার জন্য টিফিনের ছুটি থাকবে।

গৌহাটিতে আসাম সরকারের চিড়িয়াখানার গন্ডার দেখতে দর্শনার্থীরা টিকেট কাটেন। সে বাবদে আয় ছাড়াও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গণ্ডারের মূত্র বিক্রয় করে গণ্ডার পিছু মাসে ১৫০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত পান। প্রতি বোতল মূত্রের দাম ৬ টাকা। চাহিদাও খুব। হাঁপানি এবং পেটের ব্যথার চিকিৎসায় এই মূত্রের প্রয়োজন পড়ে।

২৯ ডিসেম্বর—আজ মহাকরণে পৌর দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখারজি সাংবাদিকদের জানান, কলকাতায় আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। তাঁর আশা, তাড়াতাড়ি কাজ হবে। কারণ, নির্দিষ্ট ট্রিপের বেশী কাজ করলে অতিরিক্ত পয়সা দেওয়া হবে। এভাবে কাজ চললে বর্তমান জঞ্জাল সাফাই করতে এক সপ্তাহের মত সময় লাগবে।

ভারতের খাদ্য করপোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিহার সরকারের প্রাক্তন শিল্প উন্নয়ন কমিশনার, বোম্বাইয়ের রিসারস, ডিজাইন অ্যান্ড স্যাণ্ডে অরগানিজাইশের একজন ডেপুটি ডিরেকটর, একজন লেঃ কর্নেল সহ মোট ২৭ জন সরকারী অফিসার এবং আরও ৪১ জনের বিরুদ্ধে গত মাসে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো সি বি আই অভিযোগ এনেছে।

৩০ ডিসেম্বর— অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশি আজ সকালে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১। তিনি অকৃতদার ছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ৩২ বছর তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। এ ছাড়া প্রায় ১১ বছর তিনি অজ্ঞাতবাস করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৪ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সয়ীদ চৌধুরী আজ পদত্যাগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছেন। জাতীয় সংসদের অধ্যক্ষ মহম্মদুল্লা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করলেন। বিচারপতি চৌধুরী একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা পাবেন।

২৫ ডিসেম্বর—বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ জেরারড কুইপার মেকসিকো সিটিতে হৃদরোগে মারা গিয়েছেন। জন্মসূত্রে নেদারল্যানডবাসী কুইপার ১৯৩৩ সালে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে মারকিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর।

২৬ ডিসেম্বর—সংবাদ সংস্থা তাস জানাচ্ছেন, দুই মানব আরোহীকে নিয়ে সোভিয়েত মহাকাশযান সোয়ুজ ১৩ আজ ভারতীয় সময় বেলা ২-২০ মিঃ-এ কাজাখস্তানে নেমেছে। প্যারাস্যুটটি ধীরে ধীরে ভূমি স্পর্শ করে বলেও তাস জানাচ্ছেন।

২৭ ডিসেম্বর—জাপানের রাজধানীতে প্রতি আড়াই মিনিটে একটি করে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে। টোকিও পুলিশ অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে তাতেই এই তথ্য জানা যায়। টোকিওতে এ বছর মোট ১৭৬টি খুন হয়েছে। ডাকাতি, নারীনিগ্রহ, সশস্ত্র হামলা ও অন্যান্য ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে ১ লাখ ৯০ হাজার।

২৮ ডিসেম্বর—সাত বছর [illegible] বারকলে-র একটি বালক এমন একটি [illegible] পেয়েছে যাতে কালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা ৬০ লক্ষ বছর আগের দৈত্যাকার ভালুক এগারিয়োরিয়ামের হাড় বলে চিনে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, হাড়টি ওই দৈত্যাকার ভালুকের সামনের পায়ের।

২৯ ডিসেম্বর—ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, সুপ্রিম কোরটের প্রধান বিচারপতি শ্রীআবু সাদাত মহম্মদ সায়েমকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ দিতে চাওয়া হয়েছে। শ্রী সায়েম কিন্তু এখনও তাঁর মত দেননি। তবে ওই মহল বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান নিজে শ্রী সায়েমকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

৩০ ডিসেম্বর—সম্প্রতি প্যারিসে প্রকাশিত রুশ লেখক আলেকজানডার সলঝেনিৎসিনের বইটি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আইনের লড়াই বাধতে চলেছে, এবং সেই লড়াইয়ের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে রুশ বিক্ষুব্ধ লেখক গোষ্ঠীর মরণ বাঁচনের প্রশ্ন।

NAVY CUT

MADE IN INDIA
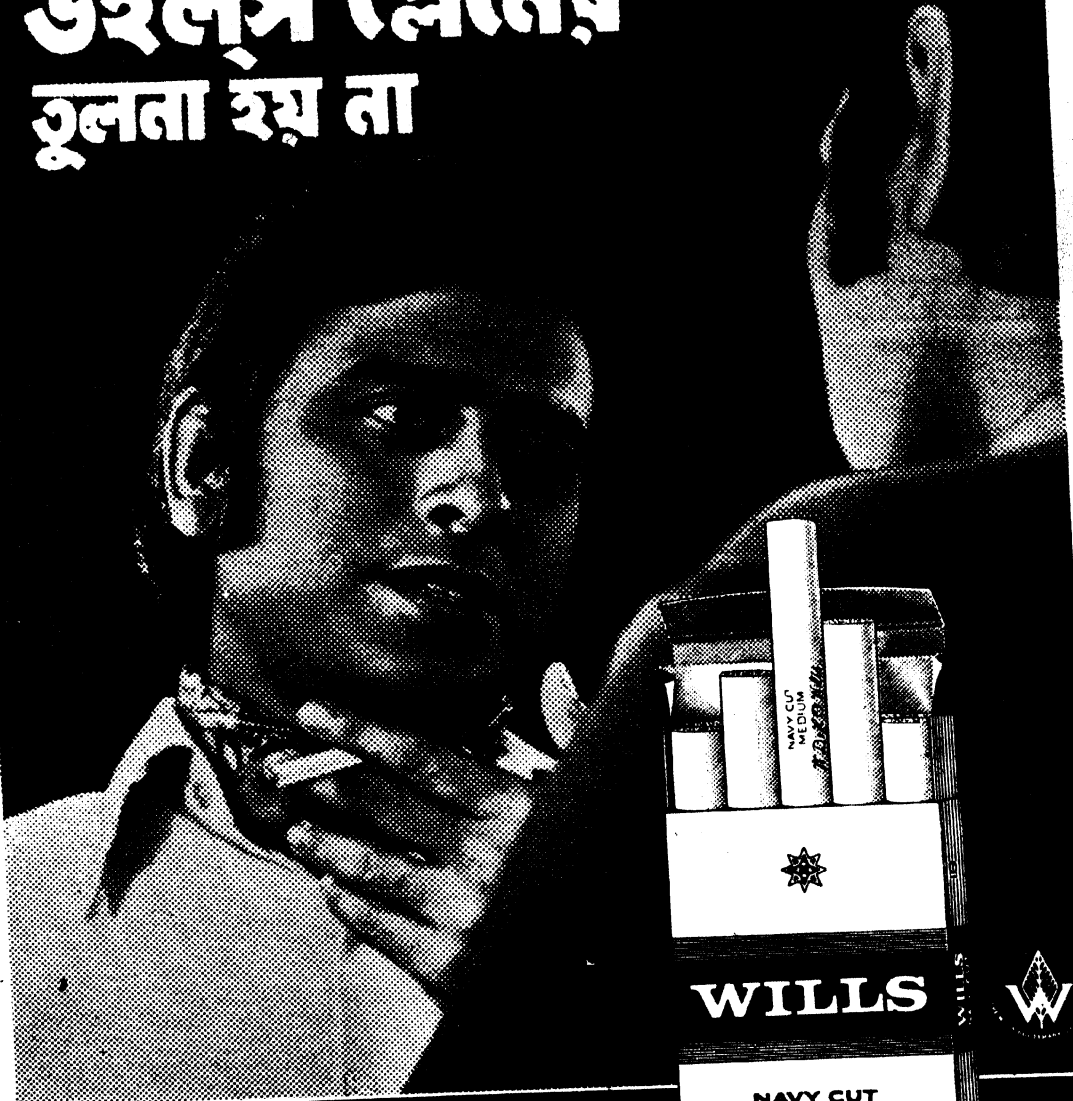
উইল্‌স প্লেন

খান—ভাল লাগবে

সর্বাধিক দাম : ৯০ পয়সায় ১০টি, স্থানীয় কর সাপেক্ষ

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

WP 7643-2

REGD. NO. C 2109

রকমারি রঙের বাহার

আপনার স্বপ্ন ICI ডুলাক্স পাকা রঙের ছোঁয়ায় রূপায়িত হয়ে উঠবে

★ আপনি যেমনটি চান, আপনার রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী উজ্জ্বল বা হাল্‌কা, রকমারি রঙের বাহার এনে দেয় সুশ্রী ও সুন্দর—ডুলাক্স।

★ ডুলাক্স দিয়ে রং করা জিনিস সহজেই ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় কারণ ডুলাক্স পুরোপুরি জল-নিরোধক।

★ নিখুঁত ফিনিশ—ডুলাক্স রঙে হেরফের নেই।

★ ডুলাক্স সত্যিকারের পাকা রং, ফিকে হবে না। আপনার রঙের স্বপ্নকে সার্থক ও স্থায়ী করবে।

নামজাদা কোনো ইন্‌টিরিয়র ডিজাইনারকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না।

কলকাতার সুপরিচিত ইন্‌টিরিয়র ডিজাইনার শ্রীকমল মজুমদারের মতে "আপনার দেওয়ালের রং সত্যি কেমন দেখাবে তা আপনার রং বাছাইয়ের উপরেই শুধু নির্ভর করে না, নির্ভর করে বাছাই রঙের গুণাগুণের উপরও। অবশ্য কোন্ জায়গায় কতটুকু লাগাবেন, আপনার রং পরিকল্পনা তার উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই সঙ্গে বিচার করে নিতে হবে প্রত্যেকটি ঘরের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য; তার আকার-আকৃতি, অঙ্গসজ্জা, ঘরের ভিতরকার আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাহলেই আপনার রং পরিকল্পনা হয়ে উঠবে স্বচ্ছন্দ আর বস্তুনিষ্ঠ। উৎকৃষ্ট রঙের কাজে তাই গোড়ার কথাটি হলো—বাজারের সেরা রং বাছাই"।

ডুলাক্স ইনফরমেশন সার্ভিসেস
পোঃ বক্স ১০২২২ কলিকাতা ৭০০০১৯

ডুলাক্স রং দিয়ে ঘর সাজান পরিকল্পনার একটি ফোল্ডার অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠাবেন।

নাম ....

ঠিকানা ....

পেশা ....

গৃহসজ্জায়—ডুলাক্স আপনার পরম বন্ধু

ডুলাক্স প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা :
দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ডুলাক্স—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড, লণ্ডন-এর ট্রেডমার্ক।
রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী : দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

ACCI (P) 7707

৪১ বর্ষ] শনিবার, ১২ মাঘ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 26th January, 1974 মূল্য—৬০ পয়সা [সংখ্যা

মিনাডেক্স সুস্থ রক্ত, মজবুত হাড়, ও ভালো দৃষ্টির জন্যে!

'সলু-রিসর্সিনল

এবার থেকে এই আনকোরা নতুন বাক্সে পাবেন। খুস্কি, মরামাস ও চুল-ওঠার অব্যর্থ হেয়ার টনিক

২৬ বছর ধরে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হেয়ার টনিক সলু-রিসর্সিনল এবার থেকে এই ঝকঝকে নতুন, পিলফার-প্রুফ বাক্সে পাওয়া যাবে।

'রিসর্সিন'-যুক্ত হেয়ার টনিক সলু-রিসর্সিনল চার ভাবে কাজ করে:

- সলু-রিসর্সিনল খুস্কি ও মরামাস চিরতরে নির্মূল করে।
- সলু-রিসর্সিনল চুলের গোড়া সতেজ ও পরিপুষ্ট করে তোলায় চুলের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় ও নতুন চুল গজায়।
- সলু-রিসর্সিনল চুল-ওঠা, অকালে টাকপড়া, ব্রণ ইত্যাদি নিবারণ করে।
- সলু-রিসর্সিনল চুলকে সুন্দর ও কমনীয় করে তোলে।

চুল সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকলে
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।
সব ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

সলু-রিসর্সিনল আগের দামেই পাবেন

পাস্তুর ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিমিটেড
২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

লেখক — পৃষ্ঠা

এই চায়ের জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে আপনাদের চাহিদাতেই

লিপটনের রুবি ডাস্ট

লিপটনের রুবি ডাস্ট চ
রাতারাতি লোকের ম জয়
করলো কেমন করে-বলুন তো?
এর মূলে কিন্তু আপনারাই।
কেননা, আপনারা চান
এমন চা-যার প্রতি প্যাকেটে
পাওয়া যাবে ঢের বেশি
কাপ চা, গাঢ় লিকার আর
মনমাতানো স্বাদগন্ধ।

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর

প্রতি প্যাকেটে পাবেন ঢের বেশি কাপ চা তাই এর কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে

সূচীপত্র

টাটার শ্যাম্পু

আপনার চুল শুধু সুন্দরই করে না-পরিপুষ্টও করে।

চুল হয় আগের চেয়ে মসৃন, আরও রেশমী-কোমল, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল !

দেদার ফেনা

উজ্জ্বল চুল-যা আয়ত্তে আনাও সহজ

টাটার শ্যাম্পু দিয়ে নিয়মিত ভাবে আপনার চুল পরিষ্কার করুন। দেখবেন, প্রতিবারই এর দেদার ফেনা কী অপূর্ব্ব কাজ করে। সমস্ত নোংরা ও ময়লা টেনে বার করে, চুল হয়ে ওঠে ঝলমলে পরিষ্কার, রেশমের মত কোমল …আর তা'র সঙ্গে মিষ্টি গন্ধও জড়িয়ে থাকে।

টাটার শ্যাম্পুর এক বিশেষ 'ন্যাচারাল সাইন' ফর্ম্মুলাই আপনার চুলে এমন উজ্জ্বল আভা সৃষ্টি করে…এর মূল উপাদানের স্বাভাবিক তেল মাথার চুল আর চামড়াও পরিপুষ্টি ক'রে তোলে।

পাবেন ৩ সাইজে। টাটার শ্যাম্পুই খরচের দিক থেকে সব দিকে সাশ্রয়। আপনার পছন্দমত যে-কোনো সাইজ বেছে নিন…দেখবেন প্রতি বোতলে কত দিন শ্যাম্পু করা যাবে।

OBM-2334-BEN

টাটার শ্যাম্পু-ভারতে সবচেয়ে বেশী-বিক্রীর শ্যাম্পু

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩
শনিবার ১২ মাঘ ১৩৮০
Saturday 26 January 1974

প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের চব্বিশ বছর পূর্ণ হল। পঞ্চবিংশ বছরে পড়ে আমাদের প্রজাতন্ত্র সাবালকত্ব অর্জন করেছে কিনা জানি না, তবে এই পঁচিশটি বছরের অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে না। পঁচিশটি বছর বড় কম নয়, কিন্তু কেন আমাদের এই অবস্থা? দুঃখের হলেও এ-কথা বলতে হয়, প্রজাতন্ত্রের যথার্থ গুরুত্ব আমরা আজও অনুভব করতে সক্ষম হইনি। সম্ভবত এর কারণ এই, দীর্ঘকাল ধরে রাজতন্ত্রের বন্ধনে ভারতবাসী যেভাবে আবদ্ধ হয়ে ছিল তার থেকে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও সেই মনোভাবের বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও সাধারণ মানুষ সচেতন নন যে, প্রজাতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে শাসককুলের ওপর নয়, জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় ও কর্মোদ্যোগে। স্বভাবতই আমরা রাষ্ট্রের সঙ্গে হৃদয় এবং কর্মের যোগাযোগ ঘটাতে পারি না; মনে করি—রাষ্ট্র কোন্ পথে যাচ্ছে তার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে কি ঘটছে না তার সামাজিক প্রগতির কোথায় বাধা তা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। এই ধারণা শুধু যে ভুল তা নয় আমাদের প্রজাতন্ত্রের পক্ষেও বিপজ্জনক। কাগজে-কলমে জানানো রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রী বলে স্বীকৃত হলেই তা প্রজাতন্ত্রী থাকে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার স্বেচ্ছাকৃত যোগাযোগ এবং দায় বহনের ওপর, সুবিবেচনাপ্রসূত কাজকর্মের ওপর এবং শুভ বোধের ওপর তা নির্ভরশীল।

এ কথা বলার দরকার করে না যে দেশের আজ কী অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি আজ প্রায় রুদ্ধ। সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, দেশব্যাপী অনাচার, বিশৃঙ্খলা ক্রমশই জাতিকে দুর্বল করে তুলছে। এই ধরনের মনোভাব ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে কখনই সফল করে তুলতে পারবে না। উদ্যোগ, নিষ্ঠা, দেশের মানুষের প্রতি মমতা, কর্ম এবং দায়িত্ববোধই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে পারে। আজকের দিনে আমরা কামনা করব, ভারতবাসী যেন দেশের কল্যাণকে আরও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন।

সুভাষচন্দ্র স্মরণে

তেইশে জানুআরি আমাদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। বাঙালী হিসেবে শুধু নয় ভারতীয় হিসেবেই আমরা মনে করি, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা দেশের মানুষের মনে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন করে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র তার অন্যতম। হয়ত একথা বলা যায়, গান্ধীজী কিংবা নেহরুর মতনই সুভাষচন্দ্র এমনই একজন রাষ্ট্রনেতা যিনি রাজনীতির বাইরেও একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমাদের হৃদয়াসন অধিকার করে আছেন। সুভাষচন্দ্রের এমন একটি চরিত্র ছিল—যা পেশাদার রাজনীতিবিদের থাকে না। তিনি ছিলেন সর্বকালের মানুষের সাহস, আবেগ, সহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম এবং সংগ্রামী মনোভাবের প্রতিমূর্তি। বাঙালী অন্তত জানে তিনি একসময়ে তারুণ্যের শৌর্য ও শক্তিকে কোন্ মহত্ত্বে মণ্ডিত করেছিলেন। জাতীয়তাবাদে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, স্বদেশের মুক্তির জন্যে তাঁর ঘরে-, বাইরে সংগ্রাম আজ ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছে। আর এই সর্বত্যাগী মানুষটির দুঃখ বরণের সেই দীর্ঘ কাহিনী তো কারও অজানা নয়। কিন্তু যে সুভাষচন্দ্রকে পেয়ে বাংলা ও বাঙালী গর্বিত আজ তাঁর উত্তরসাধক কই? যে মন্ত্রে একদা সুভাষচন্দ্র সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই মন্ত্র আজ কোথায়? সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে এ আক্ষেপ আজ আমাদের থেকে যায়। তাঁর পুণ্য জন্মদিনে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
দাম : ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
| ৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত
টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক —৩৫.৭০ টাকা
ষান্মাসিক—১৮.২০ „
ত্রৈমাসিক — ৯.২০ „

বিমান ডাকে
বার্ষিক —৮৬.৭০ টাকা
ষান্মাসিক—৪৪.২০ „
ত্রৈমাসিক—২২.১০ „

বিদেশে—
জাহাজ ডাকে—
বার্ষিক —৫৮.৬৫ টাকা
ষান্মাসিক—২৯.৯০ „

আমাদের লন্ডন অফিস মারফৎ
বার্ষিক --১৭৪.০০ টাকা
ষান্মাসিক— ৮৭.০০ „
ত্রৈমাসিক — ৪৪.০০ „

চাল-এবং-অন্যান্য
খাদ্যশস্য
তেল
চিনি
কেরোসিন

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এখনো সময় [illegible] করে সোনা ও রূপসী
পাহাড় শিরীষচূড় [illegible] কেন বহে যায়?
এই শীতে হেমন্তের আগে আগে কেন করে খেলা
নিশ্চিত আমলকিবনে হাওয়া দিয়ে এবং না দিয়ে
এখনো ও কেন একা ক্রমবর্ধমান মেঘে-শীতে
উল্টোপাল্টো করে [illegible] পায় ভালোবাসা পায়!

২
দীর্ঘ ও সুদীর্ঘ ঘাস, তারই মধ্যে তালগাছ একাকী
পরিচ্ছন্ন নয়, নোংরা - অবশ্য শীতল মেঘেভরা
যেন জল মাছ কিংবা পাথরে যেন বা অশ্রুজল
নুনে ও স্মৃতিতে ভরা বিষণ্ণ আবেগী মুক্তকেশী!
ভোলা কি তাকেও যায়? অংশে ও সমগ্রে পড়ে টান
নিতে হয় কোলে তুলে ছেলে যেন অন্ধ, তা-ও যেন—
ভোলা কি তাকেও যায় মনে-মনে মস্তিষ্কে এবং
একাকী যদি সে হয়, মুখাপেক্ষী প্রকৃত একাকী!

৩
প্রজাপতিদের সঙ্গে এখানে সে খেলা করে গেছে......
এই শীতে, ঘাসে আর মুখোমুখি নদীর হাওয়ায়
খেলা করে গিয়েছে সে, আজ নেই আমার সহিত
যেখানে পাহাড় আছে, নদী আছে, সরলতা আছে
সেইখানে...

৪
ভালো যে বেসেছে তাকে ভালোবাসা দিতে ব্যথা লাগে
বরং, তাকেও কিছু দেওয়া যায় শস্যের সহিত
খড় ও ক্ষেত্রের শূন্য, হাহাকার, দুঃখের প্রকৃতি......
এই সব

৫
সবুজ ঘিরেছে তাকে, শস্য বড়—যা কিছু সোনালী
সব দিয়ে মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে গেছে
এইভাবে, তবু যায় মানুষেরই গন্তব্যবিহীন
আলুথালু, পথরেখা ঐদিকে - এদিকেও যায়
অর্থাৎ ফিরেও আসে মনে-মনে খেয়ালের মতো
গোপন নামের মতো, যেন সাপ, স্বপ্ন, দুঃখ যেন
অনভিনিবেশে যেন পথে পথে পাগলে পোড়াতে।

স্বপ্ন

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
ক্রমশ হাত-বদল হচ্ছে পৃথিবীর—
চাঁদ এসে বন্দী হচ্ছে আমার বাগানে,
ডেঁয়ো-পিঁপড়ে চ'লে যাচ্ছে গাছের বাকল থেকে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
তরুণ কবি আমার বলছে দুয়োরের দিকে চ'লে যেতে—
যেখানে চন্দ্রাহত মোষ লাফ দেয় জলার ওপর,
মাঝরাতে বাসা-বদল করে দুটো ঝিঁঝি পোকা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি
ঘুম ভেঙে গেছে আমার, আমি এখন সদা জাগ্রত॥

গতানুগতিক

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেরি না করে গুছিয়ে নাও স্ত্রী পুত্র সংসার
দেরি না করে সাজিয়ে তোল ব্যাবিলনের বাগান
আশেপাশেই তো ছড়িয়ে আছে জীবনবীমার অফিস
—চড়া সুদের প্রতিশ্রুতি—জমিয়ে যাও খাতায়
আপেল আঙুর নাসপাতি জাম
পর্যটকের পকেট কেটে অম্লমধুর আম।

যে যার পারো গুছিয়ে নাও সময় বড় কম
যে যার পারো দেয়াল তোল নিরাপত্তার দায়
সময় বড় কম—
রক্তক্ষয়ী সেই কাঁটাগাছ সিন্দুককে ঘিরে
পাশবালিশে জড়িয়ে ওঠে কালীমনসার ঝাড়।

লেটার অফ ইনটেনট

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী সেকটরে শীঘ্রই একটা ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রি যাতে গড়ে তোলা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় লেটার অফ ইনটেনট আমাদের শিল্পমন্ত্রী সংগ্রহ করতে পেরেছেন। শিল্পমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে আমরা জানতে পেরেছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দিল্লীর বিমাতৃসুলভ মনোভাবের দরুণ এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রকল্পটি প্রায় আমাদের হাতছাড়া হতে বসেছিল। কিন্তু শিল্পমন্ত্রীর তারুণ্যের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির লেটার অফ ইনটেনট পশ্চিমবঙ্গেরই হস্তগত হয়েছে।

দিল্লীর বিশেষ সংবাদদাতাদের সংগে এই সম্পর্কে যোগাযোগ করলে তাঁরা জানান, ভারতের প্রথম ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রিটি নিজের আওতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারই দিল্লীতে জোর তদ্বির চালান। তার মধ্যে উত্তর প্রদেশ, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, পণ্ডিচেরি তামিলনাড়ু, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের দাবীর জোর ছিল খুবই বেশী। এক সময় মনে হয়েছিল উত্তর প্রদেশ অথবা মহারাষ্ট্র, এদের কারোর হাতেই এই ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির লেটার অফ ইনটেনট বা অনুমোদন পত্রটি চলে যাবে।

তামিলনাড়ু এবং পণ্ডিচেরির ডি-এম-কে সরকার ঠিক এই মুহূর্তে একযোগে আসরে নামেন। ডি-এম-কে মহল অধিকার-গত প্রশ্ন তুলে জানতে চান, ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির ব্যাপারে উত্তর প্রদেশ বা মহা-রাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কোন কারণে? বেগতিক দেখে মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশের অনুকূলে নিজের দাবী প্রত্যাহার করে নেয়। এতে উত্তর প্রদেশের কেস আরও জোরদার হয়ে দাঁড়াল। উত্তর প্রদেশ সরকার জানান, সামনেই নির্বাচন, স্থির সংকল্পিত। কাজেই উত্তর প্রদেশই এখন শাসক গোষ্ঠীর ইমেজ তৈরির সব থেকে বেশী জরুরি। সেই কারণেই উত্তর প্রদেশ ইমেজ বিল্ডিং ইন-ডাস্ট্রির অনুমোদন পত্র বা লেটার অফ ইনটেনট বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবার সব থেকে যোগ্য পাত্র।

উত্তর প্রদেশের দাবীর যৌক্তিকতা অনেকেই অস্বীকার করতে না পারলেও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে একটা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। নির্বাচন কি শুধু শাসক গোষ্ঠীর একার? তা যদি হয়, তবে গণতন্ত্রের মর্যাদা আর রইলো কোথায়? আবার গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নির্বাচন যদি শুধুমাত্র শাসক গোষ্ঠীর একার ব্যাপার না হয়ে থাকে, তাহলে শাসক গোষ্ঠীর বিরোধিতা যারা করছেন বা করবেন, তাঁদেরও ইমেজ তৈরির দাবী [illegible] যার না। সেক্ষেত্রে একমাত্র সেক্টরে ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রি গড়ে উঠলে বিরোধী পক্ষ তার সুবিধা পাবে কি করে?
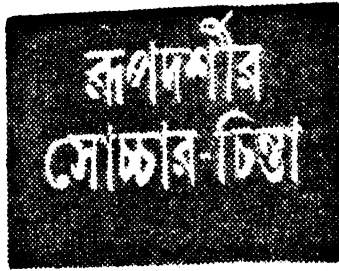
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে এই মৌলিক প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিতভাবে যখন উত্থাপিত হয়, তখন অনেক সদস্যই একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। কারণ, এ ঝামেলা যদি ওঠে, তাহলে তা মিটতে রাত কাবার হয়ে যাবে। অথচ মাননীয় সদস্যগণের ডিনার এনগেজ-মেনট রাখবার সময় হয়ে এসেছে। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি উঠে বললেন, পশ্চিমবঙ্গই হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে শাসক গোষ্ঠী শাসক এবং বিরোধী এই বিপরীত ভূমিকার পবিত্র দায়িত্ব আশ্চর্য দক্ষতার সংগে পালন করে আসছে। কাজে কাজেই ভারতের প্রথম ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির অনুমোদনপত্র বা লেটার অফ ইনটেনট পশ্চিমবঙ্গকে দিলে ঃ

(এক) ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রি যোজনামন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রীয় সেকটরেই গড়ে উঠবে, এবং

(দুই) শাসক এবং বিরোধী এই উভয়েই তার সুবিধা ভোগ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধির এই অপ্রত্যা-শিত প্রস্তাব জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সদস্যগণকে ক্ষণকালের জন্য মুহ্যমান করে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি অতঃপর মাননীয় সদস্যগণকে ধাতস্থ হবার কোনও সুযোগ না দিয়েই সুকৌশলে ডিনার এনগেজমেনটের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন, "আমাদের হাতে সময় আর বেশি নেই আমি জানি, তাই আমার আর ইচ্ছে ছিল না আপনাদের আটকে রাখি। তবু আমার বক্তব্য প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেশ করতে যতটুকু সময় দরকার আমি তার বেশী এক মুহূর্তও আপনাদের ধরে রাখব না।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধির এই ঘোষণায় পর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি অব্যাহতি পাবার জন্য সকল সদস্যই পশ্চিমবঙ্গের অনুকূলে ভোট দেন।

আমাদের শিল্পমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির অনুমোদন পত্র বা লেটার অফ ইনটেনট পশ্চিম-বঙ্গে বাগিয়ে আনার সবটুকু কৃতিত্ব আমাদের ভক্তবৎসল শিল্পমন্ত্রীকেই দেন। ঐ মহল থেকে জানা যায়, শিল্পমন্ত্রী এই লেটার অফ ইনটেনটটা যাতে কিছুতেই হাত ছাড়া না হয়ে যায় তার জন্য এবার যথেষ্ট আটঘাট বেঁধেই এগিয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয় ধার্মিক মানুষ। তাই জানেন উপরের কৃপা কী করে পেতে হয়। এই কঠিন প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হবার কাল তিনি অহোরাত্র নাম গানের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। এবং যতদিন না ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির অনুমোদন পত্র সরকারীভাবে হাতে এসে পৌঁচেছে ততদিন তুলসী পাতার রস সহযোগে শুধু মুরগির মালপো ভক্ষণ করেছেন।

শিল্প দফতরের জনৈক মুখপাত্র বলেন, লেটার অফ ইনটেনটের ব্যাপারে পর পর কয়েকটা মিসহ্যাপ ঘটে যাওয়ায় অসুবিধা-জনক যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির অনুমোদন পত্র বা লেটার অফ ইনটেনট-এর লড়াই-এ জয় লাভের ফলে আমাদের ইমেজ এখন যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির অনুমোদন পত্র পেয়ে আমাদের সুবিধাটা কী হবে, একটু যদি বলেন।

শিল্প-মুখপাত্র উত্তরে জানান, আরে মশাই, আসল জিনিসটাই তো আমরা পেয়ে গিয়েছি। এই যে এত সব শোনেন, শিল্পা-য়ন, খাদ্যোৎপাদন, নিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্র-সারণ, হ্যানো ত্যানো কত কী এসব আসলে কী দেয়? দেয় তো ... ভালো ইমেজ। অর্থাৎ ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই তো! আর তার জন্য শিল্প লাগাও, চাষ বাড়াও, জিনিসপত্রের দাম কমাও। দূর দূর। আমরা মশাই ও লাইন নেই। আমরা এবার খোদ ইমেজ বিল্ডিং শিল্পই স্থাপন করছি। বুঝলেন। যার যার পছন্দ মত ভাবমূর্তি বা ইমেজ নেতারা অরডার দেবেন আর কলে তৈরি হয়ে যাবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

উক্ত মুখপাত্র অতঃপর যে কর্মসূচীর খসড়া দেখালেন, তাতে দেখা গেল, দোলের দিন আমাদের শিল্পমন্ত্রী একটা তুলসী কাঠের বাকসে ইমেজ বিল্ডিং ইনডাস্ট্রির অনুমোদন পত্রটি ভরে, নামাবলী ঢাকা দিয়ে সেটাকে মাথায় নিয়ে নগর সংকীর্তনে বের হবেন। হরি! হরি!

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে 'উদয়-শংকর' প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

একই পথের পথিক

লেখরাজ

চব্বিশ বছর আগে ভারতবর্ষে যখন প্রজাতন্ত্রী সংবিধান চালু হলো ২৬ জানুয়ারি তখন সে পথের পথিক এশিয়াতে খুব বেশী ছিল না। রাশিয়াকে বাদ দিলে গোটা নয় এশিয়ার দেশে তখন প্রজাতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম ছিল। তাদের মধ্যে কুলীন ছিল চীন প্রজাতন্ত্র। তার পত্তন করেছিলেন ১৯১২ সনে ডঃ সান ইয়াতসেন। তার ন বছর পরে আর একটা প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব হলো এশিয়াতে। সেটি অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়া মুস্তাফা কামালপাশার তুর্কী প্রজাতন্ত্র। পর্যুদস্ত ব্রিটিশ ফৌজকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছিলেন তুরস্কের নব নায়ক কামাল পাশা। ব্রিটিশ সিংহকে এশিয়া থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেবার ফরমান তিনি জারী করেছিলেন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এর পর প্রজাতন্ত্রের মঙ্গলদীপ জ্বলে উঠলো সোভিয়েট এলাকার বাইরে এশিয়ার প্রথম কম্যুনিস্ট দেশ মঙ্গোলিয়াতে ১৯২৪ সনে। তিন বছর আগেই চীন সাম্রাজ্যের মায়া কাটিয়ে স্বতন্ত্র হয়েছিল মঙ্গোলিয়া, কিন্তু প্রজাতন্ত্র হয়নি।

স্বাধীনতার ঢল নামলো এশিয়াতে বিশ শতকের পাঁচের দশকে। তার তোড়ে ভেসে গেল উপনিবেশের বিরাট বোঝা পিঠে নিয়ে বিশাল ঐরাবতের দল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, জাপানী কেউ পার পেল না। এশিয়ার যে সব দেশ তারা কবজা করেছিল সে সব তো গেলই যে সব দেশকে গোলাম না বানিয়েও তাদের ওপর প্রভুত্ব খাটাতো তারাও দিব্যি লায়েক হয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করলে। একের পর এক স্বাধীন হয়ে গেল এশিয়ার ছোট-বড় বিস্তর দেশ। চুরমার হয়ে গেল ইংরেজদের বিশাল সাম্রাজ্য যেখানে সূর্য কোনও দিন ডুবতো না। তার ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এলো একে একে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল যার নাম পালটে হয়েছে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, দক্ষিণ ইয়েমেন, সাইপ্রাস, বাহরিন, হালফিল বাংলাদেশ। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের চিতার ওপর জেগে উঠলো হাজার দ্বীপ নিয়ে গাঁথা মালা সাগরিকা ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোচীনে ফরাসীদের সাধের ইমারত ভেঙে তৈরি হলো ভিয়েতনাম, লাওস আর ক্মের অর্থাৎ কাম্বোডিয়া। জাপানীদের কবল থেকে মুক্তি পেল কোরিয়া, আমেরিকানদের কাছ থেকে ফিলিপিনস।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো তখন চীনে চলছে গৃহযুদ্ধ, ভিয়েতনামে লড়াই। চীন তখনও কম্যুনিস্টদের দখলে আসেনি দুনিয়ার মানচিত্রে ভিয়েতনামের নামটা পর্যন্ত ওঠেনি—তার পোশাকী নাম তখনও ফরাসী ইন্দোচীন। ব্রিটেনের রাজবংশের সঙ্গে সব সম্পর্কের পাট চুকিয়ে ভারতবর্ষ যখন প্রজাতন্ত্র হলো তখন চীনের গৃহযুদ্ধের শেষ পর্ব চলছে। গোটা দেশটাই এসে গেছে কম্যুনিস্টদের দখলে এক ফরমোজা আর তার আশেপাশের গোটাকয়েক ছোট ছোট দ্বীপ ছাড়া। ১৮৯৫ সনে ফরমোজা গ্রাস করেছিল জাপানীরা, তাদের হাত থেকে ওটিকে উদ্ধার করেন মার্শাল চিয়াং কাই-শেক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন কী আর তিনি ভাবতে পেরেছিলেন সে দ্বীপই হবে তাঁর শেষ জীবনের আশ্রয়। দলবল নিয়ে তিনি ফরমোজায় আস্তানা বেঁধেছেন ১৯৫০ সন থেকে। ফরমোজার নাম দিয়েছেন তিনি রিপাবলিক অব চায়না অর্থাৎ চীন প্রজাতন্ত্র। খাস চীনেরও সরকারী নাম প্রজাতন্ত্রী চীন। কম্যুনিস্টরা সেখানে জমিয়ে বসেছে ১৯৫০ সন থেকে যদিও প্রজাতন্ত্রী চীন পত্তনের কথা ঘোষণা করেন মাও সে তুং ১ অক্টোবর ১৯৪৯। পয়লা অক্টোবরই তার জন্মতিথি।

উপনিবেশবাদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করতে হয়েছে এশিয়ার অনেক দেশকেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে ভিয়েতনামের যত খোয়ার হয়েছে এমন আর কোনও পরাধীন জাতের বোধ হয় হয়নি। পুরোনো উপনিবেশবাদ আর নয়া উপনিবেশবাদ দুটোর সঙ্গেই তাকে পাঞ্জা কষতে হয়েছে, রক্ত দিয়ে শোধন করতে হয়েছে দেশের স্বাধীনতাকে। কার সঙ্গে তাদের লড়াই করতে না হয়েছে? পর্তুগীজ, ফরাসী, জাপানী, চীন, ইংরেজ কেউ বাদ যায়নি। শেষ বেশ মার্কিনীরা। তার ওপর চলেছে ঘরোয়া লড়াই উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের। পর্তুগীজ ফরাসী জাপানী কেউ টিঁকতে পারেনি ভিয়েতনামে, মানে মানে সরে পড়তে হয়েছে চীনে আর ইংরেজ ফৌজদেরও। মাথা হেঁট করে পালিয়ে মান বাঁচিয়েছে ইয়াঙ্কি বাহিনীও। দু ভিয়েতনাম কিন্তু এক তো হয়ইনি তিন টুকরো হবার পথে। প্রজাতন্ত্রী সরকার তিন মুল্লুকেই চালু। দু মুল্লুকে কম্যুনিস্ট শাসনও। ডামাডোল আপাতত থেমেছে ভিয়েতনামে আর লাওসে। তা কিন্তু চলছে কম্বোডিয়াতে আজও। অকম্যুনিস্টরা দেশে প্রজাতন্ত্রী ক্মের প্রজাতন্ত্র গড়েছে তবে জোর বেশী লাল রাজকুমার সিহানুকেরই। তাঁর কম্যুনিস্ট ফৌজেরই দখলে দেশের বেশির ভাগ এলাকা।

ফিলিপিনস ছিল দুরকম রকমার আঁচলে বাঁধা ১৯৬৪ সন পর্যন্ত। দেশটা ছিল স্পেনের উপনিবেশ। ১৮৯৮ সনে মার্কিন-স্পেন যুদ্ধের সময় ফিলিপিনস থেকে স্পানিশদের হটিয়ে দেয় মার্কিনীরা। কথা ছিল তারা ফিলিপিনোদের হাতেই দেশ শাসনের ভার তুলে দেবে। তা কিন্তু হয়নি। ১৮৯৯ সন মুক্তিযোদ্ধারা প্রজাতন্ত্রী ফিলিপিনস গড়ে তুলেছিল। তাদের সে দাবি মার্কিনীরা মানেনি, ফৌজ পাঠিয়ে জব্দ করে জাতীয়তাবাদীদের। বেশ কিছুদিন ফৌজী শাসন চালু ছিল সে দেশে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মার্কিন সরকারের সুমতি হয়। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের আমলে মঞ্জুর হয় স্বাধীন ফিলিপিনসের প্রজাতন্ত্রী সংবিধানের খসড়া। স্বাধীন হলো ফিলিপিনস ১৫ নভেম্বর ১৯৩৫। কিন্তু তার বরাতে আরও দুঃখ ছিল লেখা আছে তা বোঝা গেল ১৯৪১ সনে যখন জাপানীরা দখল করলো ফিলিপিনস। চার বছর লেগেছিল ফিলিপিনোদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেতে। ফিলিপিনসের চোট তবু অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। কোরিয়া জাপানীদের তাঁবে ছিল ১৯১০ সন থেকে। তারা বন্দিদশা ঘুচলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সনে। কিন্তু সংহতি আর রইলো না। দেশটা দুভাগ হয়ে আছে সেই থেকে। দু ভাগেই প্রজাতন্ত্রী সরকার—তবে এক ভাগ কম্যুনিস্ট আর এক ভাগ নয়।

ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র হলেও কমনওয়েলথ ছাড়েনি। ১৯৫০ সনে সেটা ছিল একটা নতুন পরীক্ষা। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতের মধ্যে ব্রহ্মদেশ প্রজাতন্ত্র আগেই হয়েছে কিন্তু কমনওয়েলথের গাঁটছড়া খুলে ফেলে। বিলেতের অধীন দেশ যারা স্বাধীন হয়েছিল এশিয়াতে তাদের মধ্যে ব্রহ্মদেশই সাবেক রাজার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখেনি। যারা কমনওয়েলথে থেকে গেল তারা সবাই বিলেতের রাজারানীকে নামে অন্তত নিজেদের প্রধান বলে মেনে নিয়েছিল গোড়ায় গোড়ায়। সে রেওয়াজ ভেঙে দিলে ভারতবর্ষ প্রথম। তার পর একে একে তার সঙ্গী হয় আরও অনেক দেশ এশিয়ার বাইরেও। প্রজাতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়েছে কমনওয়েলথে থেকেও এশিয়ার আরও চারটে দেশ সাইপ্রাস, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানও প্রজাতন্ত্র বনেছিল ১৯৫৬ সনে। তবে সেটা ছিল নিতান্তই ঠাট। আর সে দেশ কমনওয়েলথ ছেড়েও দিয়েছে গোঁসা করে। তার নতুন সংবিধানেও অবশ্য প্রজাতন্ত্রী ছাপ মারা। কিন্তু আসলে সেটা ভুট্টোতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। খোলসেও সে প্রজাতন্ত্র কতদিন টিঁকবে তা বলাও শক্ত। পাকিস্তানের ইতিহাস তো অন্য কথাই বলে।

MAFATLAL GROUP

ফুড করপোরেশন ও পশ্চিমবঙ্গের চাল সংগ্রহ

জানুয়ারী মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও চালের দাম কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ধান বা চাল সংগ্রহের পরিমাণ খুবই সামান্য হয়েছে। পাঁচ লাখ টন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হলেও চাল সংগ্রহের পরিমাণ এক লাখ টনের বেশি হবে বলে মনে হয় না। ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধান সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ মেট্রিক টন; ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধান সংগ্রহের পরিমাণ হয়েছে ১৪,৫০০ মেট্রিক টন। ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মিল-মালিকরা ফুড করপোরেশনের কাছে ৩৪,৯২৫ মেট্রিক টন চাল বিক্রি করেছিলেন; ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মিল-মালিকদের চাল বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩,৭০০ মেট্রিক টন। অথচ ১৯৭২-৭৩ সালে ধান ও চাল সংগ্রহের জন্য ফুড করপোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যক্ষ ক্রয়ের এজেন্ট ছিলেন ২২৬০ জন; এ-বছর অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে ধান ও চাল সংগ্রহের জন্য ফুড করপোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যক্ষ ক্রয়ের এজেন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৭৮; অথচ গত বছরের তুলনায়ও এ-বছর ধান ও চাল সংগ্রহের পরিমাণ কম হয়েছে। কেন এমন হয়েছে? ধান ও চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ফুড করপোরেশনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের-ফুড করপোরেশনের নয়। ফুড করপোরেশন কী দরে ধান অথবা চাল কিনবে তা ঠিক করে থাকেন রাজ্য সরকার। ফুড করপোরেশনের দায়িত্ব হল টাকা ও ব্যাগ নিয়ে বাজারে ধান ও চাল ক্রয়ের জন্য এজেন্টদের প্রস্তুত রাখা। এ-বছর এজেন্টের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে; সমবায় সমিতিগুলিকেও এজন্য এক কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফুড করপোরেশন যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাজার থেকে ধান ও চাল সংগ্রহ করতে পারছে না, তার প্রধান কারণ হল, খোলা বাজারে ধান ও চালের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বৃত্ত অঞ্চলেও ধানের বাজার-দর কুইন্টাল প্রতি গড়ে ৭৩ টাকা থেকে ১১০ টাকার মধ্যে। ফুড করপোরেশনের আঞ্চলিক ম্যানেজার শ্রী এস এস দত্ত সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে বিভিন্ন জেলায় ধানের বাজার-দর সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় ৭৩ টাকা কুইন্টাল হিসাবে ফুড করপোরেশনের পক্ষে বাজার থেকে ধান ও চাল সংগ্রহ করা কত কঠিন। বর্ধমান জেলায় ধানের কুইন্টাল প্রতি বাজার-দর হল ৭৩ টাকা থেকে ৯০ টাকার মধ্যে; বাঁকুড়া জেলায় বাজার-দর হল ৮০ টাকা থেকে ৯৫ টাকার মধ্যে; হুগলী জেলায় বাজার-দর হল ১০৫ টাকা থেকে ১১০ টাকার মধ্যে; মেদিনীপুর ও মালদহ জেলায় ধানের কুইন্টাল প্রতি বাজার-দর হল যথাক্রমে ৯৫ টাকা থেকে ১০৫ টাকা এবং ৯০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। তুলনামূলক ভাবে জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও পশ্চিম দিনাজপুরে ধানের বাজার-দর কিছু কম। জলপাইগুড়িতে ধানের কুইন্টাল প্রতি বাজার-দর হল ৭৫ টাকা থেকে ৭৮ টাকা; বীরভূম ও পশ্চিম দিনাজপুরের বাজার-দর হল যথাক্রমে ৭৩ টাকা থেকে ৭৯ টাকা এবং ৭৩ টাকা থেকে ৭৫ টাকা। ফুড করপোরেশনের পক্ষে ৭৩ টাকার বেশি দাম দিয়ে এক কুইন্টাল ধান কেনা সম্ভব নয়। সুতরাং সরকার যদি খোলা বাজারে ধান ও চালের দাম কমাতে না পারেন তবে ফুড করপোরেশনের পক্ষে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে নির্দিষ্ট দামে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান ও চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়িত্ব ফুড করপোরেশনের নয়—রাজ্য সরকারের। সরকারের উচিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে খোলা-বাজারে ধান ও চালের দাম কমানো—তা না হলে খাদ্য সংগ্রহ নীতিও ব্যর্থ হবে এবং ভবিষ্যতে রেশনিং ব্যবস্থায় বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হবে। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠেছে। অথচ দেশে এ-বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। তবুও কেন খাদ্য-সামগ্রীর দাম কমছে না? সরকার খাদ্য সামগ্রীর দাম কমাবার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন এবং এই ব্যর্থতার বলি হয়েছে জনসাধারণ।

সরকারী আয়-ব্যয় নীতির সংস্কার সম্পর্কে অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক

অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। ভারতের সরকারী আয়-ব্যয় নীতির সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এই অর্থনীতিবিদ কলকাতায় এসেছিলেন। এখানে Indian Chamber of Commerce-এর সভায় অধ্যাপক ক্লার্ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। তাঁর মতে ভারত সরকারের উচিত সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে এনে রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখা। তাছাড়া ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের পরিমাণ সীমিত রাখার উপর অধ্যাপক ক্লার্ক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিগত আয়করের সর্বোচ্চ হার ৯৭ শতাংশ থেকে (যা বর্তমানে চালু আছে) ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো উচিত। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমানো এবং ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের পরিমাণ সীমিত করা সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন। তবে ব্যক্তিগত আয়করের সর্বোচ্চ হার কতটা কমা উচিত সে সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে।

অধ্যাপক ক্লার্ক মনে করেন, আমাদের উন্নয়ন-কর্মপন্থার প্রধান অংশ হওয়া উচিত

রপ্তানি ও কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। তাঁর মতে শহর-অঞ্চলে অধিকতর কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার এবং সুষম শিল্পোন্নয়নের পূর্ব শর্ত হল কৃষিক্ষেত্রে বর্ধিত হারে উন্নয়ন। অধ্যাপক ক্লার্ক ভারতের ক্ষেত্রে কৃষি-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির ব্যবস্থা না করেই ইস্পাত ও গুরুভার শিল্পে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগের সমালোচনা করেছেন। জমিতে আরও সার সরবরাহ করার জন্য আগে থেকেই যদি আরও বিনিয়োগের ব্যবস্থা থাকত, তবে কৃষির উৎপাদন আরও বেশি হত এবং খাদ্যশস্যের এত অভাব হত না বলে অধ্যাপক ক্লার্ক মনে করেন। কৃষির উন্নতি না হলে বেকার সমস্যার তীব্রতা আরও বাড়বে বলে অধ্যাপক ক্লার্ক মনে করেন: কেন না, ভারতের ৭০ শতাংশ শ্রমিক কৃষির উপর নির্ভরশীল। জমির উপর করের বোঝা কিছু পরিমাণে বাড়াবার পক্ষেও অধ্যাপক ক্লার্ক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ক্লার্কের বিভিন্ন মতামত প্রণিধানযোগ্য।

সুব্রত গুপ্ত

জননী

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

খুব ভোরেই পূবের দাওয়ায় রোদ এসে ছড়িয়ে পড়ে। শীতকালের রোদ, ডিমের কুসুমের মত নরম লাল। শুধু ঐ রোদটুকুর জন্য হেমপ্রভার জরাজীর্ণ মুমূর্ষু শরীরটা আকণ্ঠ পিপাসার্ত হয়ে ওঠে। বার্ধক্যের নিয়ম অনুসারে ঘুম ভাঙে সেই কত আগে। তখনও অন্ধকার কাটে না, শুধু তরল হতে থাকে মাত্র, কাকের ডাক শোনা যায় কি যায় না, সূর্যোদয়ের তখনও কিছু বিলম্ব থাকে। শীতকালের দীর্ঘ রাত তখন শেষ হওয়ার মুখে এসে কঠিনতম হীম-শীতলতায় আক্রান্ত হয়, আর শরীরের মধ্যকার উত্তাপ তৈরির যন্ত্রপাতিগুলো এখন সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যাওয়ায় ভিতর থেকে ঠাণ্ডা উঠে আসতে থাকে হুহু করে, আবার বাইরে থেকেও যেন অবয়বাবশিষ্ট গভীর ঠাণ্ডা একখানা মোটা ভারী চাদরের মত সর্বাঙ্গ জাপটে ধরে। তখন হেমপ্রভার জীর্ণ হলদে পাতার মত দু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কেবল বু বু বু-জাতীয় একটা শব্দ বেরোয় —সে যেন সকালের প্রার্থনায় সূর্যের প্রার্থনায় রোদ আর উত্তাপের প্রার্থনায় এক অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ।

এই সময় হেমপ্রভা একজোড়া হালকা পায়ের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন কখন গৌরী আসবে। গৌরী হেমপ্রভার ষোল বছরের নাতনি। আজ বছরখানেক হল কোমরটাও গেছে হেমপ্রভার। এমন সাধ্য নেই যে, নিজের চেষ্টায় উঁচু খাট থেকে একা একা নীচে নামেন, তারপর ঠুকঠুক করে গিয়ে বসেন পূবের দাওয়ায় রোদে। যেমন বসেছেন গত শীতেও। এখন শুধু অসহায়ের মত বসে থাকা আর কান পেতে রেখে আকুল চোখে তাকিয়ে থাকা। গৌরী আসবে। এসে প্রায় পাঁজাকোলা করে নামাবে তাকে খাট থেকে,- ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে পূবের দাওয়ায় দেয়াল ঘেঁষে, যাতে পাঁচজনের আসা-যাওয়ার পথে তিনি একটা বাধার মত অবস্থান না করেন।

আবার এটাও মনে মনে জানেন হেমপ্রভা আসলে তার নিজের আগ্রহ আকুলতার জন্য

রোজই মনে হয় গৌরী বড় দেরি করছে, হয়তো গৌরী আজ ভুলে গেছে তার কথা, যেমন প্রায় ভুলে গেছে আর সকলে, হয়তো ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে স্কুলে চলে গেছে, দৈনন্দিন করণীয় কাজের কথাটা বেমালুম উবে গেছে তার মন থেকে। কথাটা ভেবেই হেমপ্রভার হাত-পা যেন আরো ঠাণ্ডা আরো অসাড় হয়ে আসে, পাথির খাঁচার মত বুকের ভিতরে প্রাচীন হৃদপিণ্ডটা যেন ধুক ধুক করে চলতে চলতে পলকের জন্য থেমে গিয়ে আবার ঝাঁকি খেয়ে চলতে থাকে দ্রুত। ভেবে দিশা পান না হেমপ্রভা, যদি তাই হয় তা হলে তিনি কি করবেন। শীতলতার চৌবাচ্চার মত এই ঘরের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে ঠাণ্ডায় জমে যেতে যেতে এক সময় তার ক্ষীণ শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে যাবে, চোখের তারা নিষ্পলক হাত-পা সংজ্ঞাহীন বুকের ভিতরটা নিস্পন্দ। কিন্তু তখনও কেউ আসবে না এ ঘরে, কেননা এই ঘর এই ঘরের বাসিন্দা হেমপ্রভা এই বাড়ির অন্যান্য মানুষের কাছে প্রায় অস্তিত্বহীন অনাবশ্যক।

তাই গৌরীর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ হেমপ্রভা। গৌরী নিজে থেকেই তার দায়িত্বটা নিজের উপর টেনে নিয়েছে। কেউ তাকে বলে দেয় নি, বাধা করে নি কেউ তবু গৌরী নিজের ভিতরের তাগিদেই দেখা-শোনা করে এই জীর্ণ জরাগ্রস্ত সত্তরের উপর বয়স বৃদ্ধাকে—যে কিনা তার পিতার জননী—পিতামহী। ভোর বেলা স্কুলে যাওয়ার সময় সে নিত্য রোদে বসিয়ে দিয়ে যায় হেমপ্রভাকে, স্কুল থেকে ফিরে আবার শুকনো কাপড় তোলার মত ঘরে তুলে নেয় নিয়মিত। নিজের হাতে স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে কোনো কোনো দিন খাইয়েও দেয় বুড়িকে। এখন অনেক সময়ই হেমপ্রভার প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা বর্তমান থাকে না। হয়তো খেতে খেতেই ঘুমে ঢুলে পড়েন নয়ত নষ্ট করে ফেলেন কাপড়। তখন গৌরীর অনেক কাজ বাড়ে। এই সব সময় গৌরী সাবধানে তার নিজের মুখরা মায়ের রক্তিম চোখ আর ধারাল জিভের আওতা থেকে হেমপ্রভাকে সামলে সামলে রাখে। অভাবে অনটনে সংসারের নানা চাপে দুঃখে জর্জরিত গৌরীর মা—হেমপ্রভার এক সময়ের বড় আদরের রাঙা বউ—করুণা নিজের নামকরণকে আর সার্থকতায় মণ্ডিত করে তুলতে পারে না। সর্বদাই তার মেজাজ চড়ে আছে সপ্তমে, সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও সে হঠাৎ তর্জনগর্জন শুরু করে, তখন আর তার কথাবার্তায় কোনো রাখঢাক থাকে না। নিষ্ঠুর মন্তব্যের সুচাগ্র শর কার মর্মমূলকে কিভাবে কতখানি বিদ্ধ করল তা লক্ষ করার মত মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে করুণার।

যন্ত্রণায় কাতর মুখ নিয়ে হেমপ্রভা বলেন, "অমন করে বলিস না লো রাঙা বউ। আমার সঙ্গে কি তোর জ্বালনা সম্পর্ক। আমি তোর শাউড়ি হই লো।"

উত্তরে করুণা দ্বিগুণ উষ্মায় ঝংকার দিয়ে ওঠে, "শাশুড়ী হয়ে কি মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি। কুটোটি ভেঙে উপকারে লাগার নাম নেই, শুধু চারবেলা খাওয়ার মহোচ্ছব—"

আহত ভঙ্গীতে হেমপ্রভা চিঁ চিঁ করে জবাব দেন, "অমন কথা বলিস নি লো। জিভ খসে যাবে। বুকে হাত দে সত্যি করে বল দিনি যখন গতর ছিল তখন করিছি কি না। তোর একটা করে ছেলেমেয়ে হয়েছে তখন সামাল দেছে কোন অভাগীর বেটী..."

কথাটা মিথ্যে বলেন নি হেমপ্রভা। প্রত্যেকবারই বাচ্চা হওয়ার সময় করুণাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলত। শয্যা শায়ী হয়ে থাকত সে মাসের পর মাস। সেই সময়ে হেমপ্রভা প্রতিবারই যেন দশভুজা হয়ে সব দিক সামলেছেন। তখন দেহে অসুরের ক্ষমতা ধরতেন তিনি। বিধবা হয়েছিলেন কম বয়সে। বেশী বেলায় পাথরের থালাতে আড়াই পো থেকে তিন পো আলো চালের ভাত খেতেন একবার আর রাত্রে খাঁটি গরুর দুধ। অফুরন্ত প্রাণশক্তি শুষে নিতেন দৈনন্দিন আহার্য থেকে, আবার তা ছড়িয়ে দিতেন অকৃপণভাবে সংসারের সেবায়। করুণা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকত বিছানায় আর হেমপ্রভা এক হাতে সংসার সামলাতেন অসুস্থ করুণার সেবাশুশ্রূষা করতেন, আবার নবজাত সন্তানের দেখাশোনাও ছিল তার কর্তব্যের মধ্যে।

যে কারণে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে হেমপ্রভার এক নিগূঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। করুণার সন্তানসংখ্যা অনেক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকে থেকেছে মোটে দুটি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বেশীর ভাগ আঁতুড়েই মারা গেছে, দুটি কয়েক মরেছে দু'তিন মাসের হয়ে। নাড়িতে কি যেন একটা দোষ ছিল করুণার। টিঁকে যাওয়া ছেলে মেয়ে দুটি খুব কম বয়সে হেমপ্রভাকেই মা বলে ডেকেছে, হেমপ্রভার সঙ্গেই ছিল তাদের যত আব্দার আবদার। নিজের মাকে খুব কাছে থেকে বড় একটা পায় নি তারা। সুতরাং, আজ গৌরী হেমপ্রভার জন্য যেটা করে সেটা কর্তব্যজ্ঞান থেকে করে না, করে প্রাণের টানেই। আর একজন ছিল, যে হেমপ্রভার হয়ে করুণার সঙ্গে সমানে ঝগড়া করত হেমপ্রভার অপমানে অনাদরে রুখে দাঁড়াত গোঁয়ারের মত, সেই বাইশ বছরের তরতাজা জোয়ান নাতি বিশু আজ প্রায় মাসখানেক ধরে কি যেন একটা কঠিন অসুখে বিছানায় শুয়ে আছে। তার কলেজ যাওয়া বন্ধ, খেলাধুলো বন্ধ। আজ কতদিন হল সে আর আগের মত এসে হেমপ্রভাকে ঠাকমা বলে জড়িয়ে ধরে না। হেমপ্রভা বুঝতে পারেন না বিশুর কি রোগ হল।

হেমপ্রভাকে কেউ কিছু বলে না। করুণার তো কথাই নেই—কিছু জিজ্ঞেস করলেই কেবল খেঁকিয়ে ওঠে। ছেলে মধুসূদনের বয়স বাহান্ন পঞ্চান্ন হবে। তার রগের ধার ঘেঁষে দুপাশের চুলে পাক ধরেছে, মাথার তালুতে চুল পাতলা হয়ে হয়ে টাকের আভাস। সে তার নিজের অফিস কাজকর্ম রোজগারপাতির ধান্ধাতেই সর্বদা ব্যস্ত, আর কোনো দিকে তাকানোর অবকাশ নেই তার। নানা রকম দুশ্চিন্তায় তার কপালে কতগুলো নিয়মিত খাঁজ, মুখ-ভঙ্গীতে রাজ্যের বিরক্তি স্থায়ীভাবে বিরাজিত। হেমপ্রভার সঙ্গে তার কথা হয় কচিৎ কদাচিৎ। শেষ কবে যে মধুসূদন তাকে মা বলে ডেকেছে চেষ্টা করেও মনে করতে পারেন না তিনি। বস্তুত পঞ্চাশোত্তীর্ণ প্রৌঢ় মধুসূদনের জীবনে এখন হেমপ্রভার আর কোনো ভূমিকাই নেই। নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে যে সংসার সাজিয়ে তুলেছে এখন তার মধ্যেই মগ্ন সে। সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধব আছে তার, যাদের সঙ্গে সে রাজনীতি নিয়ে নানা জাতের আলাপ-সালাপ করে, তাসটাস খেলে সময় পেলে। আর নানারকম ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার আছেই হাজির থাকে করুণা, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পাপী জীবনসঙ্গিনী, যে তাকে গঞ্জনা দেয় পরামর্শ দেয় অসুস্থ হয়ে পড়লে উদ্বিগ্ন মুখে সেবা করে। হেমপ্রভা বাড়িতে আছেন এই পর্যন্ত।

মধুসূদনের কাছে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পান না হেমপ্রভা, অগত্যা গৌরীকেই জিজ্ঞেস করেন, "ওলা গৌরী। আমায় বল দিনি কি হল বিশুর—"

পনের ষোল বছরের মেয়ে গৌরী অত কিছু জানে না বোঝে না। সে শুধু তার পিতামহীকে সামলায়, "দাদার খুব অসুখ গো ঠাকমা। খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। তুমি যেন এখন মা-বাবাকে কিছু বলতে যেও না।"

নাতনির উপর একটু উষ্মা প্রকাশ করেন হেমপ্রভা, "তুই আর আমায় সেকাসনি বাপু। বলে এ্যাং পড়ায় ব্যাং লেকায় খোপার গাধা গান শেকায়—। আমার হল গে সেই দশা। অমন জোয়ান মদ্দ ছেলেডার কি হল আমায় কেউ কিছু বলে না, কি চিকিচ্ছেটা হচ্ছে তাও জানিনে—"

হেমপ্রভার ছড়া কাটা শুনে বিষন্নভাবে হাসে গৌরী, "হ্যাঁ গো ঠাকমা। ঐ চিকিচ্ছে নিয়েই নাকি গণ্ডগোল বেধেছে। সে দিন বড় ডাক্তার এসেছিল তো, বলছিল চিকিৎসা বিভ্রাট। আগের ডাক্তার নাকি ভুল চিকিচ্ছে করেছে, কড়া কড়া ওষুধ খাইয়েছে রাজ্যের, দাদার ভেতরটায় নাকি সব ঘা হয়ে গেছে—"

বসে হেমপ্রভা, গুম হয়ে যায়। তারপর বিড়বিড় করে বলেন "কি যে হয়েছে এখন কাল। খালি ওষুধ আর ডাক্তার। এর চেয়ে একদিন গুড়ো করে শিউলিপাতার রস দে মেড়ে মকরধ্বজ খেলি কাজ হয় ঢের। আমি বলছি সুদনকে। ঠিক বলব—"

পরের দিন সকালেই সাহসে বুক বেঁধে হেমপ্রভা ধরলেন মধুসূদনকে। বড় ডাক্তারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে মধুসূদন ঘরে ফিরছিল। পুবের দাওয়ার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসার পথ। দুশ্চিন্তায় গাম্ভীর্যে তার মুখখানা থমথম করছে। হেমপ্রভা ডাকলেন, "ও সুদন, সুদন রে—"

দাওয়ার উপর উঠে এসে মধুসূদন দাঁড়াল হেমপ্রভার সামনে। বিরক্তভাবে বলল, "কি বলছ। বল—"

"বিশুকে কি চিকিচ্ছে করাচ্ছিস? ওর অসুখ তো অনেক দিন হয়ে গেল—"

মধুসূদন জবাব দিল, "করাচ্ছি করাচ্ছি। ঠিক চিকিৎসাই হচ্ছে।"

হেমপ্রভা বললেন, "তার চে এক কাজ কর দিনি। শিউলিপাতার রস দে মেড়ে মকরধ্বজ খাইয়ে দে।"

"মকরধ্বজ। শিউলিপাতার রস দিয়ে। কি হবে তাতে?"

"সব রোগ হরে যাবে। একেবারে ধন্বন্তরির নিজের হাতে দেয়া ওষুদ। তুই তখন খুব ছোট। মনে নেই তোর। আমাদের গাঁয়ের পালান মিদ্যের বেটা হারান মিদ্যের খুব অসুক হল সেবারে। সব বড় বড় ডাক্তার মায় লালমুখো গোরা, সদর থেকে এসে জবাব দে গেল। কান্নাকাটি পড়ে গেল পালান মিদ্যের বাড়িতে। তখন কবরেজ রামরতন সেন এসে ঐ বিধেন দিলে। শিউলিপাতার রস দে মেড়ে মকরধ্বজ খাও। দিনে তিনবার। সাত দিনের মধ্যে হারান মিদ্যে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলে। একেবারে তাজ্জব গেল সবাই—"

এ সব বকবকানি শোনার সময় নেই মধুসূদনের। ধৈর্যও নেই। সে হেমপ্রভার কথার মধ্যেই দাওয়া থেকে নেমে চলে গেল। খানিক পরে খেয়াল হল হেমপ্রভার। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে লাগলেন, "ও সুদন। সুদন। কোথায় গেলি। আমার কথাডা শুনলিনে। দে বাবা, খাইয়ে দে একটু। শিউলিপাতার রস দে মেড়ে মকরধ্বজ। বিশু ভাল হয়ে যাবে দেখিস। সুদন রে—"

ঠিক এই সময় কল্যাণী বাসি কাপড়ের ডাঁই নিয়ে কলতলার দিকে যাচ্ছিল। হেমপ্রভার বকবকানি কিছুটা কানে গেল তার। বিরক্তির ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধারাল গলায় বলল সে, "আবার সাতসকালেই ঐ ব্যস্ত মানুষটাকে ডাকাডাকি করছেন কেন? একেই জানান খুঁজতে মাথার ঠিক নেই মানুষটার।"

থতমত খেয়ে গেলেন হেমপ্রভা। কল্যাণীকে দেখলে খুব ভয় পান। আজ অবশ্য পারেন না খুব কম বয়সে তার সুদনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কল্যাণীকে পছন্দ করে ঘরে এনেছিলেন তিনি। দশ এগার বছরের ফুটফুটে মেয়ে শাড়ি সামলাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত বারবার। পিছনের আঁচতলায় ঘর কেউ হাঁটু উপরে কাপড় তুলে খাপরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গপ্পা যম না খেলত করুণা একা একাই। জেলা স্কুল থেকে সে বছর সুদন ম্যাট্রিক দিচ্ছে। টুকটুকে সুন্দর বউটিকে হেমপ্রভা আদর করে রাঙাবউ বলে ডাকতেন—

তাড়াতাড়ি হেমপ্রভা দন্তহীন মুখে একগাল হাসি টেনে নিয়ে এলেন। হাসি মুখেই বললেন, "ও রাঙাবউ। বলি কিছু খেতে চেতে দিলি নে। বেলা যে অনেক হল।"

হঠাৎ যেন কল্যাণীর মাথার মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে গেল। সে সেইখানেই ঘুরে দাঁড়িয়ে থরথর কণ্ঠে বলল, "ভোর সকাল থেকেই খাই খাই শুরু করেছেন। আর কবে আপনার খাই খাই ঘুচবে। সব তো খেয়েছেন একে একে, এখন শিব রাত্তিরের সলতে ঐ নাতিটা কে না খেয়ে বুঝি খাই মিটবে না আপনার—"

আহত ব্যথিত মুখভঙ্গীতে হেমপ্রভা বললেন, "বলিস নে রাঙাবউ, অমন করে বলিস নে। বিশু আমার চোখের মণি বুকের পাঁজর নিশ্বেসের হাওয়া। ওকে জড়িয়ে আমাকে ও কথা শোনাস না। ওর জন্যে

আমি আমার জেবনজা দে দিতে পারি।"

"আহা হা। মরে যাই ঢঙের কথা শুনে। তাই দিন না দ'খ। ভালয় ভালয় পথ দেখুন না ওপারের—"

হঠাৎ খুব দার্শনিক ভঙ্গীতে উদাস সুরে জবাব দেন হেমপ্রভা, "এ ত হেঁটে যাওয়ার পথ নয় রাঙা বউ যে, ইচ্ছে হলেই চলে যাব। ঝোলাঝুলি নে সেজেগুজে তো ঘাটে এসে বসে আছি। নেয়ে তো আসে না নৌকো নে—"

"দুটো দিন খাওয়া বন্ধ করে দিন না। দেখবেন নেয়ে ঠিক এসে গেছে।" করুণার শানিত কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ঝকমকানি।

হেমপ্রভা কিন্তু জিভ কেটে জবাব দিলেন, "সে তো আত্মহত্যা হয়ে যাবে রাঙাবউ। আত্মহত্যার পাপ লাগলে নরকে যেতে হবে যে—"

বিশু মারা গেল রাত এগারটা নাগাদ। হেমপ্রভা তখন নিজের ছোট চৌখুপি ঘরে ছেঁড়াখোড়া লেপ কাঁথার মধ্যে বোঁচকার মত হয়ে আছেন। এই ঘুম আসে আবার ছুটে যায়। তন্দ্রার মধ্যে নানা রকমের স্বপ্ন দেখেন। বেশীর ভাগই অতীত দিনের সুখ স্বপ্ন। নিজের যৌবনকালের দিনগুলো দেশ গাঁয়ের দিনগুলো উজিয়ে ফিরে আসে অন্ধ চোখের ওপাশে অন্ধকার পটভূমিতে ছায়াবাজির মত। তার মধ্যেই মগ্ন হয়েছিলেন হেমপ্রভা। এত বড় একটা দুর্ঘটনার সংবাদ তার কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কেউ ছিল না।

চিৎকার করে কাঁদার মত বাড়িতে কেউ নেই। অমোঘ মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চয়তায় পৌঁছেই করুণা একটা বুকচেরা বিপুল আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল প্রতিবেশিনীদের জিম্মায়। মধুসূদনের ধাত যেন শক্ত লোহা দিয়ে গড়া। সে ধীর স্থির শান্ত হয়ে রইল। একমাত্র উপযুক্ত ছেলেকে অকালে হারানোর বেদনা যেন তীরের মত তার নিরাসক্তির কঠিন বর্মে ব্যর্থ আঘাত হেনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। সদ্য যৌবনে উপনীতা গৌরী বয়সের স্বাভাবিক ও স্বভাবশালীনতা ও শোভনতা বোধ থেকেই চেঁচিয়ে কাঁদল না। কাঁদল ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে। বেদনা ও শোকের বিপুল ভার ধারণ করতে গিয়ে তার ছোট্ট বুকটুকু যেন ভেঙে যাচ্ছিল। ওর মধ্যেই গৌরীর মনে পড়েছিল হেমপ্রভার কথা। একবার মনেও হয়েছিল হেমপ্রভার ঘরে গিয়ে তাকে জাগিয়ে সংবাদটা দিয়ে আসে। পরক্ষণেই ভিন্ন একটা বিবেচনা বোধ তাকে নিরস্ত করেছিল। বুড়ি তার নাতিকে ভালবাসে আপন প্রাণের চেয়ে বেশী। ক্রমে সে জানবেই। কিন্তু এখনই অচমকা তাকে এত বড় একটা আঘাত না দেওয়াই ভাল।

খবর ছড়ায় বাতাসের মুখে। অত রাত্রেও কি করে যেন বিশুর বন্ধুরা সব জেনে গেল তার মৃত্যুর কথা। ধীরে ধীরে সবাই এসে গেল। বিশুর পাড়ার ক্লাবের বন্ধুরা। কয়েকজন কলেজের সহপাঠী। মধুসূদন অবিচলিতভাবে শেষকৃত্যের ব্যবস্থায় রত হল। টাকা বার করে বিশুর বন্ধুদের কাউকে পাঠাল খাটিয়া আনতে কাউকে ভার দিল ফুল আর খই কিনে আনার। সব ব্যবস্থা চুকিয়ে শবযাত্রীর দল যখন হরিধ্বনি দিয়ে বিশুর ফুলে ফুলে ঢাকা শরীর বয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল তখন রাত দুটো কি আড়াইটে হবে।

ভোরবেলা যখন গৌরী হেমপ্রভাকে ধরে এনে পুবের দাওয়ার দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দিল তখনও করুণার জ্ঞান হয় নি। মধ্যে দু'একবার চেতনা ফিরে আসার উপক্রম হয়েই আবার তলিয়ে গেছে সংজ্ঞাহীনতার অবশ অতল গভীরতায়। অবিরল কান্নার ফলে গৌরীর দু চোখ ফোলা ফোলা। তার সমগ্র চেহারাতেই সর্বনাশের এক নিখুঁত ছবি। হেমপ্রভার সামনে সে নিজেকে অতি কষ্টে সামলাচ্ছিল।

হেমপ্রভা বললেন, "ওলা গৌরী। তোর কি হয়েছে লা?"

সংক্ষেপে উত্তর দিল গৌরী, "কিছু হয় নি।"

শীর্ণ দুখানি করতল মেলে নিস্তেজ রোদের ক্ষীণ তাপটুকু শুষে নিতে নিতে গৌরীর মুখ দেখলেন হেমপ্রভা ছানিপড়া চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে, "তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীল তা খারাপ করল না কি?" তারপর সর্বনাশের কালো ছায়াটিকে যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারলেন, "হ্যাঁ লা, বিশু কেমন আছে আজ?"

আগ্রাসী কান্নার দাপটে গৌরীর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। পলকপাতে দু চোখের

দৃষ্টি অপলক অবস্থা। কান্নাক্রম বলতে পারল গৌরী, "জল।"

বলাই দৌড়ে দাওয়া ছেড়ে ওপাশের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

একা একা চুপ করে বসে রইলেন হেমপ্রভা। মাঝে মধ্যে সামনে দিয়ে হাঁটা হাঁটি করছে যারা তাদের কাউকে চিনেন না তিনি। সব অচেনা মানুষ। ...রদের তাপ খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প বাড়ছে। আস্তে আস্তে তিনি সেই শীত ও ঠাণ্ডার জবরজং খোলসটা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছেন। চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা সক্রিয় হচ্ছে। সহজ ও স্বাভাবিক হচ্ছে। দুচোখের জুলজুলে দৃষ্টি মেলে হেমপ্রভা চারপাশে তাকাচ্ছেন আর অবাক হচ্ছেন ক্রমেই। সব যেন কেমন রহস্যময় ঠেকছে। মধুসূদন কোথায়? রোজ সকালে গাড়ি করে যে ডাক্তার আসে সে তো এল না আজ। রাঙা বউটাই বা কি করছে? এতক্ষণ একবারও তো তার সেই ধারাল গলার স্বর কানে এল না। গৌরীটাই বা কেমন। সেই যে তাকে এনে বসিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর একবারও এল না ইদিকপানে। হেমপ্রভা কণ্ঠস্বর অল্প উঁচুতে তুলে ডাকলেন, "ও সুদন, সুদন রে—। ও গৌরী—। রাঙা বউ—"

কোনো সাড়া নেই। কেউ সাড়া দেয় না। কি হল রে বাপু। বাড়ি না শ্মশানে বসে আছেন তিনি। ভাবতে ভাবতে অবাক হতে হতে ঝিমুনি আসে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে সেই ঝিমোয় হেমপ্রভা। তখন চোখের সামনে এই বাড়ি ঘর উঠোন পুবের দাওয়া কিছুই থাকে না। তার পরিবর্তে দেখা দেয় অঙ্কিত সবুজ বনের মধ্য দিয়ে শুঁড়ি পথ, খিড়কির পুকুর, বাঁশের মাচান দেওয়া পুকুর ঘাট, একটি ষোড়শী বধূ ঘাটে বসে চাল ধুচ্ছে। সেই বধূটিই হেমপ্রভা। ওপারে ...গালের মধ্যে হাতছিপ ফেলে বসে আছে তরুণ সুদর্শন এক যুবক। টেরিবাগানো মাথার চুলে অনেকগুলো ঢেউ। কি যেন নাম ছিল মানুষটার। মধুসূদনের বাপ। হঠাৎ একটি দুরন্ত ছেলে লাফিয়ে পড়ল শান্ত নিস্তরঙ্গ পুকুরে, চারদিকে উপরে ছিটকে উঠল জল। সেই জল ধোঁয়ার মত কুয়াশার মত চার পাশে ছড়িয়ে পড়ল, ব্যাপ্ত করে দিল চরাচর। ওপারের মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে এক ...হারা তরুণী বিধবা ব্যাকুল স্বরে ডাকছে, "উঠে আয়। উঠে আয় বাবা। ঠাণ্ডা লেগে যাবে রে। ও সুদন। সুদন রে—"

ঝিমোতে ঝিমোতে ঢুলে পড়েছিলেন হেমপ্রভা। চমকে তন্দ্রা ঘুচে গেল ঠোঁট নামে নিশ্চয়ই। তাকিয়ে দেখলেন সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মধুসূদন। একটা বাজে পোড়া তালগাছের মত চেহারা। শ্মশান থেকে সদ্য প্রত্যাগত। খালি পা। সকাল থেকে জমে ওঠা রহস্যের বাষ্পটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। পলকপাতে বিপুল সর্বনাশটা স্বরূপে ধরা দিল হেমপ্রভার চোখের সামনে। দুটো শীর্ণ হাত দুপাশে মেলে দিয়ে হেমপ্রভা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "সুদন। আমার সুদন—। সুদন রে—"

"মা—। মাগো—" কতদিন কত যুগ পরে মধুসূদন আবার মা বলে ডাকল। মা বলে ডেকে হেমপ্রভার প্রসারিত দুই বিশীর্ণ বাহুর বন্ধনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শুকনো বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে এতক্ষণের শক্ত মানুষটা এইবার অবাধ ভাষায় হাহাকার করে কেঁদে উঠলো, "মা। মা গো। বিশুকে রেখে এলাম। সে আমাদেরকে ফেলে রেখে চলে গেল। মাগো—" হেমপ্রভার দুচোখের ছানিপড়া দুটি চোখের জলের আস্তরে একেবারে অস্পষ্ট। ঝরঝর করে চোখের জল ঝরে পড়ছে শুকনো লোলচর্ম গাল বেয়ে। তিনি মধুসূদনের মাথার রুক্ষ চুলে ঝরে পড়া বাঁশপাতার মত হিল-হিলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর শিথিল কাঁপা ঠোঁটে অস্ফুটে বিড়বিড় করে বলছেন, "সুদন। ওরে সুদন। সুদন রে—"

আর তখন হেমপ্রভা তার শুষ্ক শীর্ণ দড়ির মত পাকান দুই স্তনের খুব গভীরে একটা শিরশিরানি অনুভব করলেন। চরম বিষাদের মধ্যেও এক অসহ্য পুলকের শিহরণ তার প্রায় অসাড় শরীরের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। একমাত্র সন্তান মধুসূদন জন্মানর দুদিন পরে স্তনে দুধ আসার ক্ষণে এই শিরশিরানি এই পুলক ও শিহরণ জীবনে এর আগে একবারই অনুভব করেছিলেন হেমপ্রভা।

সুবর্ণা ঘোষ
অশোকলাল ঘোষ

একটি অনালোচিত দিক-১
১৮২২-২৩ সাল

হিন্দু কলেজের আদি পর্বের ইতিহাস বার বার আলোচিত হয়েছে। যেমন গবেষকরা তেমনি সাধারণ স্মরণীয় বরণীয়েরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের অনেকের পরিবেশন বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, হিন্দু কলেজের অগ্রগতির এক বিশেষ লগ্নে [১৮২২-২৩ সাল] পৌঁছে প্রত্যেকেই যেন চোখে কাপড় বেঁধে পথ চলেছেন। বর্তমান চেষ্টা সেই বিশেষ কালের অনালোচিত দিকটির প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা সভা বসে ১৮১৬ সালের ১৪ মে। এদেশীয় জ্ঞানবান এবং বিত্তবান উভয় শ্রেণীর উচ্ছল জয়ধ্বনি ও শ্বেতাঙ্গ সহযোগিতার অকুণ্ঠ আশ্বাসের মধ্যে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি উক্ত কলেজে বিদ্যারম্ভ হয় এবং তিন মাস যেতে-না-যেতে ছাত্র সংখ্যা ২০ থেকে ৬৯এ পৌঁছয়। তবুও নানা কারণে আর্থিক অসঙ্গতি দেখা দেওয়ায় ১৮২৩ সালের ১৯ জুন হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এই সময়কার [১৮২২-২৩] অবস্থা সম্পর্কে হিন্দু কলেজ পরিচালকমণ্ডলীর নিজস্ব মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

There never has been any system of instruction established in Calcutta that in the same length of time has been crowned with equal success in giving the Hindoo natives a correct knowledge of the English language and accurate conception of some of the most useful branches of European science. The number of students fluctuated between 80 and 100, some of those who left being appointed to high responsible situations and having brought great honour to the place of their education [—Proces, Bagal Mod. Review 1955]1

প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবর্ষ পূর্তি কালের মূল্যায়ন, — অখণ্ডভাবে সমৃদ্ধিবধা ঘটেছিল বটে কিন্তু The Hindu College prospered as an academic institution! ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের ১৮৫৩ সালের বিবেচনায় The Hindoos continued to manage the Institution with a fair amount of success till 1823 [Mouat: Hin. Cal. 1853]

এ কথা শুধু ভেতরের মানুষদের নয়। ১৮২৩ সালের ৮ মার্চ সমাচার দর্পণের সংবাদঃ "হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর কেহ ২ সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছে...এবং যাহারা এখন কলেজে আছে তাঁহাদের মধ্যে কতক বালক এই প্রকার কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে।" ১৮২২ সালের ২৬ জানুয়ারির সংবাদ, হরিমোহন ঠাকুর প্রমুখ ৯২জন হিন্দুপ্রধান ঈস্ট বিদায়-সভায় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন "বোধ হয় যে অচিরকালে বিদ্যানীতিজা সুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে।"—[সংসেক ১]।

এ সকল চিত্র অতিশয় আশাপ্রদ চিত্র। কিন্তু এই কি ১৮২২-২৩ সালের হিন্দু কলেজের বাস্তব চিত্র?

সমসাময়িক দলিলপত্রে যে-সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অস্বস্তিকর।

কলের হিসাব

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা তথা য়ুরোপীয় এবং এশীয়

সাহিত্য বিজ্ঞানে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য [The primary object of this Institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian languages, and in the literature and science of Europe and Asia.—Rul I.] এবং সমসাময়িক সাক্ষ্য মতে হিন্দু কলেজের ছাত্রের আনকোড়া নতুন পড়ুয়া ছিল না, বেশ কিছুকাল অনাত্র-পড়া ও কিছু পরিমাণে ইংরেজী জানা ছাত্রদের নিয়ে স্কুল আরম্ভ করা হয়েছিল। এইরূপ মানের ছাত্রদের বছর ছয়েক য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধানে উন্নততর প্রথায় শিক্ষাদানের পরবর্তী অবস্থা নিম্নরূপ।

ইংরেজী ভাষা, য়ুরোপীয় সাহিত্য।—At this moment [Jan. 1825] best educated scholars are as little familiar with our literature as they were when they entered the college . . Enfield's speaker and Blaire's Exercises are the only books used . . . [—GCPI Copybook I, 26.1.1825, W.B Archives.]

সংস্কৃত ভাষা, বাংলা ভাষা; সংস্কৃত-বাংলা ভিত্তিক ভারতীয় সাহিত্য।—১৮২২-২৩ সালে শ্রেণীসংখ্যা ছিল, ১০, শিক্ষক সংখ্যা ১। বড়তি মন্তব্য অনাবশ্যক।

বিজ্ঞান শিক্ষা।—১৮১৯ সাল পর্যন্ত এদেশীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী কোন বই ছিল না; ১৮২৩ সাল পর্যন্ত Joyce's Scientific Dialogues এর এক তৃতীয়াংশ মাত্র [অ্যাস্ট্রনমি, মেকানিকস] প্রকাশিত হয়েছিল [CSBS Rep. 1817-23]

১৮২৩ সাল পর্যন্ত হিন্দুকলেজে কোন বিজ্ঞান শিক্ষক ছিল না। [১৮২৪ সালের বিজ্ঞান শিক্ষক Ross নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি চিঠিপত্রের ও পূর্বোক্ত ২৬-১-২৫ রিপোর্টের সাক্ষ্য,—বিজ্ঞান পড়াবার মত যোগ্যতা বা সময়, এমন কি সাধারণ গণিত পড়াবার মত সময়ও, দ্য আনসেলমে আদি শিক্ষকদের ছিল না, GCPI Papers, W.B. Arch.]

১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হিন্দু-কলেজে পড়া স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমাচার দর্পণের সাক্ষ্য, —এই পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ক কোন প্রশ্ন করা হয়নি। [সংসেক ১]।

শিক্ষাবিভাগের ১৮২৫ জানুয়ারির মন্তব্য —The young men never advanced beyond the earliest rules of arithmetic and even vulgar fractions are beyond their attainment [—GCPI Copybook I, 26.1.25].

পরিচালক মণ্ডলীর নিজস্ব স্বীকৃতি, —বিজ্ঞান পড়ানো হত না। তাঁদের ১১-৯-১৮২৩-এর কথা,—তখন শুধু বিভিন্ন ভাষা [ইংরেজী, ফার্সী, সংস্কৃত] শেখানো হত, অর্থাভাব হেতু the wider objects of the College could not be fulfilled.—[Procs Bagal, MR 1955].

হিন্দুকলেজের পক্ষে দাবী করা হয়, ১৮২২-২৩ সালের ছাত্রেরা accurate conception of some of the most useful branches of European sciences আয়ত্ত করেছিল। পর্যাপ্ত পুস্তক নেই, উপযুক্ত শিক্ষক নেই, পরীক্ষা নেওয়া হয় না, পড়ানোও হয় না, অথচ নানা য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের accurate conception আয়ত্তে এসে যায়,—এরূপ শিক্ষণ প্রণালী ১৮২৩ সালে দূরের কথা, আজও উদ্ভাবিত হয় নি।

সাধারণ অবস্থা ও সম্পর্কে ডক্টর উইলসনের মূল্যায়ন ১৮২১-২৩ সালে the institution was reduced to a mere elementary school with about 30 or 40 boys . . it had fallen into a condition of neglect from which there seemed to be little prospect of reviving it [—Lords Com. Rep. 1852-53, Evidences p 256] শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা যে সংকুচিত করা হয়েছিল, তার পর্যাপ্ত ইঙ্গিত হিন্দুকলেজ কার্যবিবরণী থেকেও পাওয়া যায়। ১৮১৭ সালে ৮০ ভাড়ায় বাড়ি নেওয়া হয়েছিল, বিদ্যালয়টি ১৮১৮ সালে ৬০ ও ১৮১৯ সালে অনধিক ৪০ ভাড়ার বাড়িতে উঠে যায়। [শেষোক্ত বাড়িটির ভাড়া ৭০ বলা হয়েছে, কিন্তু ১৮৩০ সালের সংবাদ, ঐ বাড়ি ডাফ সাহেব ৪০ ভাড়ায় পেয়েছিলেন। স্মরণীয় ১৮১৭-৩০ সালের কলকাতা জমি-বাড়ির ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।]

কৃতিত্ব, যশোলাভ।—পরিচালক মণ্ডলীর দাবী: ১৮২৩ সালের পূর্বেই কোন কোন ছাত্র কলেজের পড়া শেষ করে নানা দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত হন এবং brought great honour to the place of their education. বাস্তব অবস্থা,—একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন তাঁদের এক-জনেরও নাম-পরিচয় [একাল-এর কথাই উঠে না] পরবর্তী দশক পর্যন্ত পৌঁছয় নি; এমন কি আলোচ্য দশকেও [১৮২১-৩০] বার্ষিক পরীক্ষা বিবরণীর বাইরে কোথাও উল্লেখের যোগ্য বিবেচিত হয় নি। এবং স্কুল সোসাইটির ছাত্র ভিন্ন কারো নাম আদৌ কোন বিবরণীতে স্থান পায় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম, শিবচন্দ্র [চরণ] ঠাকুর। (সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্কাইভে শিবচন্দ্র সম্পর্কিত কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে; সে-সকলের মূল্যায়ন করা হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলে পরবর্তী অংশে পরিবেশিত হবে।)

চেষ্টার হিসাব

অন্য দেশেও, বিশেষ করে যা ফলেষুর দেশ ভারতবর্ষে, শুধু ফলের হিসাবের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না। হিন্দু কলেজ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কালের চেষ্টা যত্নের চেহারাটাও দেখা ভাল।

১৮১৬-১৭ সালে কি বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে হিন্দু কলেজের শুভারম্ভ হয়েছিল সে কথা সকলেরই জানা। পরিচালক সমিতির [কমিটি অব ম্যানেজার্স-এর] একাধিক সদস্য [বর্ধমান-রাজ তেজচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, গোপীমোহন ঠাকুর, সূর্যকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাজকৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গা নারায়ণ দাস] যে died in harness সে-কথাও জানা আছে। যে-কথাটা জানা নয় অথচ তৎকালীন দলিল-পত্র মতে যা বাস্তব সত্য, তা এই যে, হিন্দু কলেজের ১৮২২-২৩ সালের কর্তাব্যক্তির প্রায় [ ] কেউই তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি, টাকা দেন নি, সময় দেন নি, অবশ্য করণীয় করেন নি।

১৮২২-২৩ সালে কোন দেশীয় প্রধান হিন্দু কলেজে এক পয়সাও সাহায্য করেন নি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না এমন নয়, অর্থাভাবে শিক্ষক ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল; [Procs Bagal, M R 1955]। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের অর্থ ছিল না, এমনও নয়। একজন কোটিপতি [বর্ধমান-রাজ] ও একাধিক অর্ধ কোটিপতি [গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব প্রভৃতি] তখন হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। এবং এঁরা অনেকেই মুক্তহস্ত ছিলেন, একমাত্র নৃত্য-গীত পরিবেশনে কোন কোন ব্যক্তি এক রাত্রিতে যা খরচ করতেন তাতে হিন্দু কলেজের একাধিক বৎসরের কাজ চলার কথা। বেঙ্গল হরকরার ১৮২৩ নভেম্বরের সংবাদ: not an uncommon thing for one of these Baboos to expend several lakhs of rupees in the course of a few nights [Asiatic Jr. 1824] হিন্দু কলেজের জন্য তখন বৎসরে ৮—১০ হাজার টাকা দরকার হত।

সূচনা কালে হিন্দু কলেজ কমিটি অব ম্যানেজার্স-এর দেশীয় সদস্য সংখ্যা ছিল ৭, সম্পাদক সহ ৮। ১৮১৮ জানুয়ারিতে রাধাকান্ত দেব ও গুরুপ্রসাদ বসু উক্ত কমিটির শক্তি বৃদ্ধি করেন। শতাবধি ছাত্রের বিদ্যার্জন তদারকী করার পক্ষে এঁদের যে-কোন একজনের সাহায্য যথেষ্ট বিবেচিত হবার কথা। হিন্দু কলেজ কার্যবিবরণীর সংবাদ—১৮২১ সালের ১৫ জুলাই তারিখে দেশীয় সেক্রেটারি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন কমিটির কাছে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কারণ, "I am well aware, gentlemen, that none of you can spare sufficient time [Procs, রামকমল সেন সম্বোধ]। মধ্য ১৮২১-এর পুরস্কার [অর্থাৎ সেক্রেটারির অনুরোধ ক্রমে] পরিচালক সমিতি Superintending Manager রূপে রাম-

কমল সমকে গ্রহণের পরের। অবশ্য:—No person of any consideration, Native or European took any interest in it [Wilson, Lords Com. Rep. 1852-53.]

আমরা ভাবতে পারি,—গবর্নর ডাইরেক্টরেরা মুখ্যত নীতি নির্ধারক ছিলেন কলেজের স্থায়ী কাজগুলোর দিকে মনোযোগ দিতেন, খুঁটিনাটি ব্যাপারের খবরদারি করার সময় পেতেন না; আর তারই ইঙ্গিত রয়েছে দেশীয় সম্পাদকের পত্রে। ধরতে পারি। কিন্তু হিন্দু কলেজ কার্য বিবরণী এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় নারাজ।

'উচ্চতর শ্রেণীর কাজের মধ্যে কলেজের জন্য বাড়ি তৈরির তুলনায় গুরুতর কাজ অল্পই ভাবা যায়। উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ কমিটি গঠিত হয় ১৮১৬ সালের ২৭ মে তারিখে। বর্ষকাল সেজন্য কমবেশি লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ি তৈরিতে ৪০,০০০৲-এর বেশি পড়ত না, [সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গণে হিন্দু কলেজ ভবনের জন্য এর অর্ধেক টাকার দরকার হয়]। অথচ ১৮২৩ সালের পরিস্থিতি, হিন্দু কলেজের জন্য জমি বাছাই পর্যন্ত হয় নি।

দ্বিতীয় বড় কাজ, এককালীন ও বার্ষিক দান সংগ্রহ। সেজন্য প্রয়োজন, নিজেদের যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া, এবং বাইরের সাহায্য লাভের জন্য উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা। নিজেদের সাধ্য ও সাধিতের হিসাব আগেই নেওয়া হয়েছে। প্রচার সম্বন্ধে দেখা যায়, বার্ষিক সভা ডাকা হয়নি, বার্ষিক রিপোর্ট [তৈরি যদিই হয়ে থাকে] প্রকাশ করা হয়নি, প্রাপ্ত-দান বিজ্ঞাপিত করা হয় নি। অন্যরূপ প্রচারের কথা তোলাই যায় না।

'বার্ষিক সভা ডাকা হয়নি'—এ সংবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সাহায্যকারীদের [চাঁদাদাতাগণ] বার্ষিক সভায় কাজকর্মের বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করা আবশ্যিক ছিল।—"There shall be an annual general meeting of the subscribers at which a report shall be made to them of the state of the funds and progress of the Institution. [নিয়মাবলী ৩৪ ধারা]

আর একটি বড় কাজ,—উপযুক্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করা। ১৮২২-২৩ সালের পরিস্থিতি, [সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে] বার্ষিক ডাইরেক্টর নির্বাচন [নিয়মাবলী ১৭, ২৬ ধারা] পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল।

ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষার মান যেখানে বর্ণিত রূপে, যেখানে শুধু বিপুল আয়ের নয় বিপুলতর ব্যয়ের [প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার দেউলে হয়ে গেছে] খ্যাতিসম্পন্ন লক্ষপতি কোটিপতি কর্তৃক পরিচালিত [একটি বিদ্যালয়কে মাসিক ১০০—১৫০৲ ঘাটতি পূরণের জন্য শিক্ষক বিদায়ের পথ নিতে হয়। যেখানে প্রয়োজনীয় অর্থের পাঁচ গুণ অর্থ হাতে থাকা সত্ত্বেও ৬-৭ বৎসর বাড়ি তৈরি দূরের কথা, জমি বাছাই পর্যন্ত হয় না। এবং, এই সকল কর্তাব্যক্তিরা বে-আইনীভাবে যাবতীয় কর্তৃত্ব নিজেদের অনপত্য অধিকারে রাখেন, সেখানে দেশীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মনে খটকা জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দু কলেজের এই অবস্থার প্রতিফলন তো এ যাবৎ পরিবেশিত কোন চিত্রে পাওয়া যায় না। এই দিকটি অনালোচিত রেখে হিন্দু কলেজের বাস্তব ইতিহাস রচনা করা কি সম্ভব?

॥ ৩ ॥

হিন্দু কলেজের প্রামাণিক ইতিহাস রচনার পক্ষে ১৮২২-২৩ সাল একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মত আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। হয় হিন্দু কলেজ কার্যবিবরণীর সাক্ষ্য, সরকারি শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগের [হস্তলিখিত/মুদ্রিত] দলিলপত্রের সাক্ষ্য, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্য, রাধাকান্ত দেব আদির বিচারে হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় জনক উইলসনের সাক্ষ্য,—কোনও উপায়ে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিতে হবে, নতুবা মেনে নিতে হবে "তৎকালীন হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ যে কারণেই হোক এই বিশেষ সময়টিতে [১৮২২-২৩] হিন্দু কলেজ থেকে তাঁদের সহযোগিতা তুলে নিয়েছিলেন।" এবং দ্বিতীয় বিকল্পের [সহযোগিতা প্রত্যাহারের] ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত কারণ খুঁজে বার করতে হবে।

আমাদের ব্যবহৃত তথ্যমূলে সমূহের সঙ্গে যাঁদের সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন এখানে-ওখানে দু একটি ত্রুটিপূর্ণ

বা অসম্পূর্ণ ব্যাপার যদিইবা আবিষ্কার করা যায়, সামগ্রিক ভাবে ওই সকল সাক্ষ্য উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ দ্বিতীয় পথই এক মাত্র পথ, অর্থাৎ মানতে হবে, ওই বিশেষ লগ্নে রাধাকান্ত দেব আদি হিন্দু প্রধানগণ যে কারণেই হোক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক হিন্দু কলেজী শিক্ষা হিন্দু সমাজের পক্ষে অগ্রহণীয় বিবেচনা করেছিলেন।

এ ব্যাখ্যা বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া যে কারণেই হোক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বাহুল্য নয় তা এই যে, সেকালের বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাদের বিশ্লেষণী বাক্তিরেকই অনুরূপ সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছিলেন।

এদেশীয় সাক্ষ্য

আমাদের অভিজ্ঞতা,—এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না। এবং যখন আসে আমরা আগ বাড়িয়ে সে-সুযোগ গ্রহণ করি। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদে একবার এরূপ সুযোগ এসেছিল। দেখা গেল, হিন্দু কলেজে অর্থ-সাহায্য করলে একদিকে বংশধরদের বিদ্যালাভ হয়। অপর দিকে নিজেদের সরকারি খেতাব-খেলাত মেলে। এরূপ অবস্থায় বহু বিত্তশালী জনের হিন্দু কলেজে সাহায্য দেওয়ার কথা, ১৮১৬-১৭ সালে অনেক দিয়েওছিলেন। সমসাময়িক দলিলপত্রের সাক্ষ্য,—হিন্দু কলেজ উদ্যোগে রাধাকান্ত দেব শীর্ষক হিন্দু প্রধানগণের একচ্ছত্র অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর [অর্থাৎ ১৮১৯ সাল থেকে, তারপর আর বার্ষিক সভা ডাকা, বার্ষিক ডাইরেক্টর নির্বাচন হয়নি] যতদিন ঐ অধিকার অখণ্ডিত ছিল [অর্থাৎ ১৮২৪ সাল অবধি, তারপর থেকে নূতন দানের ওপর সরকারি তদারকির ব্যবস্থা করা হয়], কোনও দেশীয় ব্যক্তি হিন্দু কলেজে এক পয়সাও সাহায্য করেন নি। লক্ষণীয়, সরকার কর্তৃক তদারকির ভার নেবার বছর দেড়েকের মধ্যে প্রায় লাখ টাকা দান পাওয়া যায় [বৈদ্যনাথ রায় ৫০,০০০, হরিনাথ রায় ২২,০০০, কাশীকান্ত ঘোষাল ২০,০০০]। এও লক্ষণীয় যে, এই সকল দান পূর্বের [১৮১৬-১৭] ন্যায় [মূল ধনবিনিয়োগের অধিকার সহ] হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় নি, দেওয়া হয়েছিল সরকারকে। এরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

বিদেশীয় সাক্ষ্য

বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ দাতাগণ কেন ১৮২৫—২৬ সালে সরাসরি হিন্দু কলেজে দান পাঠান নি, কিংবা কেন ১৮১৯-২৪ সালে তাঁরা আদৌ কোনরূপ সাহায্য করেন নি, এ জাতীয় প্রশ্নের একাধিক উত্তর থাকা সম্ভব। "তাঁরা হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছায় সন্দিহান ছিলেন বলে হিন্দু কলেজে সাহায্য করেন নি" এইটেই একমাত্র বা সর্বাধিক সম্ভবপর উত্তর নয়। এই উত্তরটি আমাদের মনে আসার অন্যতম কারণ সমকালীন কালের শ্বেতাঙ্গ মহলের ব্যবহার।

১৮১৬ সালের শ্বেতাঙ্গরা কলকাতা বহুত্তর না হোক অধিকতর গরিষ্ঠাংশ কিরূপ আগ্রহের সঙ্গে হিন্দু কলেজ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তার সাক্ষী তৎকালীন প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকা। কোন কোন শ্বেতাঙ্গের আশঙ্কা ছিল হিন্দু মহলে সন্দেহ জাগাতে পারে যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ছদ্মবেশে য়ুরোপীয় ধর্ম ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে তাঁরাও বর্ষকাল মধ্যে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন [East, CSBS Rep. 1817-23, Hastings Farewell Speeches, G2ov. Gaz. 1823]

দেখা যায়, এই সকল শ্বেতাঙ্গ বহু পুরুষগণ [হেস্টিংস, ঈস্ট, হ্যারিংটন বেইলী প্রভৃতি] ১৮১৭ সাল থেকে বৎসরের পর বৎসর এদেশে শিক্ষা বিস্তারের অন্যান্য যাবতীয় উদ্যোগে [স্কুল বুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি] মুক্ত হস্তে দান করতে থাকলেন, কিন্তু একজনও কখনও এক কপর্দকও হিন্দু কলেজ ফাণ্ডে দিলেন না। এমন কি প্রকাশ্য সভায় খ-বাক্ত [East] সমাগত হিন্দু প্রধানদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন I hope my being a Christian . . . will be no reason for your refusing my subscription. এবং উত্তরে শুনেছিলেন No, not at all, we shall be glad of your money,—[Lord Com. Rep. 1852-53], তিনি পর্যন্ত একটি পাই-পয়সা দিলেন না। 'হিন্দু মনে সন্দেহ জাগাতে পারে' এই ভয়ই যদি এরূপ দান-সংযমের কারণ হত, বড়লাট সহ শতাবধি শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ নিজেদের কর্তৃত্বাধীন স্কুল সোসাইটির মারফৎ হিন্দু কলেজের [প্রায় ?] যাবতীয় ছাত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ঝুঁকি নিতেন না, কিংবা হিন্দু সন্তানদের শিক্ষাদানে ট্রেনিং নেবার জন্য ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের ন্যায় কট্টর খৃষ্টধর্ম প্রচারব্রতীর স্কুলে শিক্ষার্থী পাঠাবার সাহস করতেন না। বলা বাহুল্য, ঈস্ট-হ্যারিংটন হিন্দু কলেজে ১০০—১০০০ চাঁদা দিলে হিন্দু মনে যে-পরিমাণ সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা ছিল, অনুসৃত কার্যক্রম তার তুলনায় বহু গুণে সন্দেহজনক।

হিন্দু কলেজে অর্থদান বিষয়ে দেশীয় বিদেশীয় মহলের মোটামুটি একই ধরনের ব্যবহার। বৈদ্যনাথ রায় আদির দানের সুদ হিন্দু কলেজের সেবার্থে ব্যয় করা চলে কিন্তু মূল দান হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া যায় না। ঈস্ট-হ্যারিংটনের সাহায্য থেকে স্কুল সোসাইটি মারফত ছাত্র পাছে হিন্দু কলেজে দিতে বাধা নেই, কিন্তু তাদের চাঁদা থোক দান হিসেবে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া যায় না। এই দুই, পরস্পর থেকে ভিন্ন কিন্তু সমান্তরাল ধারার ইঙ্গিত এই যে, সরাসরি হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে টাকা দিলে সে-টাকা যথাযথ ব্যয় না হতে পারে এরূপ আশঙ্কা সম্ভবত অনেকেরই মনে জেগেছিল।

আমরা এক দিকের বিবেচনা য়ুরোপীয় মহলের চিন্তার স্বরূপ [illegible] তোলে। সর্বপ্রথম য়ুরো-ভারতীয় যৌথ উদ্যোগ হিন্দু কলেজে য়ুরোপীয় সদস্য সংখ্যা ছিল মোটামুটি ভাবে এদেশীয় সদস্য সংখ্যার অর্ধেক। বাকি দুই-[illegible] মধ্যে অনুরূপ উদ্দেশ্যে আরো দুটি সংস্থা গঠিত হয়, স্কুলবুক সোসাইটি [১৮১৭] স্কুল সোসাইটি [১৮১৮]। [illegible] দুটির একটিতেও এদেশীয়গণকে [illegible] কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এও লক্ষণীয় যে স্কুলবুক সোসাইটির য়ুরোপীয় সদস্যগণ প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত গণের দ্বারা 'নির্বাচিত' [elected] হয়েছিলেন এবং পরে দেশীয় সদস্যরা য়ুরোপীয় সদস্যগণ কর্তৃক 'মনোনীত' হন। এ সকলে সংশয় গরিষ্ঠপূর্ণে ইঙ্গিত স্বার্থহীন।

হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্য

কথা উঠতে পারে, কালটা দেড়শ' বছর পিছিয়ে বটে, কিন্তু স্থান ও পাত্র এই বঙ্গভূমি—বঙ্গবাসীই তো, এবং দলাদলির অভ্যাস আমাদের আবহমান কালের। রাধাকান্ত দেব শীর্ষক গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন হিন্দু কলেজে বৈদ্যনাথ রায় আদির সাহায্য না করার কারণ সম্ভবত রাধাকান্ত দেবের প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত বা দলগত বিদ্বেষ, উক্ত গোষ্ঠী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী নন এরূপ সন্দেহ নয়। ঈস্ট-হ্যারিংটনের সর্বজ্ঞ ছিলেন না, তাঁদের মূল্যায়নে ভুল হওয়াও সম্ভব। আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলা কঠিন, এ বিষয়ে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মূল্যায়নও সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় বর্তমান।

১৮২৪ সালের এসিয়াটিক জার্নালসহ একাধিক সাময়িক পত্রের সাক্ষ্য—১৮২৩ সালের শেষাশেষি কলকাতা শহরে [১৮১৬-১৭ হিন্দু কলেজ ও ১৮২১-২৪ সংস্কৃত কলেজের বাইরে আর একটি] তৃতীয় হিন্দু কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা, সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা। ১৮১৬ সালের গ্রীষ্মকালীন ঘোষণা ছিল:—"ইংরেজী ভাষা, য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিহনে আমরা হিন্দুরা বাঁচার মত বাঁচতে পারব না। নীতির ক্ষেত্রে চাই য়ুরোপীয় নীতি, ধর্মের ক্ষেত্রে পালনীয় general duty to God !" ১৮২৩ সালের শীতকালীন ঘোষণা :

"শিখতে হবে সংস্কৃত ভাষা, পড়তে হবে বেদান্ত, কারণ বেদান্ত হচ্ছে The most beneficial and useful science", অবশ্য কথাটা বলা হল ধর্মোন্নতির [advancement of Hindu religion] সূত্রে। দেখা যায় উক্ত ঘোষণা মোটামুটি একই গোষ্ঠীর কণ্ঠনিঃসৃত। হিন্দু কলেজের অন্তত এই কয়জন গবর্নর-ডাইরেক্টর উক্ত তৃতীয় হিন্দু কলেজ উদ্যোগের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন—রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসাদ বসু, রামকমল সেন।

ইংরেজী ভাষা ও য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য যাঁরা স্কুল স্থাপন করেন, সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার জন্য টোল প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, অপরাধ তো নয়ই। বরং সমন্বয়বাদীরূপে বাড়তি প্রশংসাই তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু নিজেদের প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত একটি স্কুল যখন অর্থাভাবে উঠে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অপর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। এই সঙ্গে প্রয়োজনের দিকটাও ভাববার। ইতিমধ্যে ভারত সরকার মোটামুটি একই পাঠক্রম বিশিষ্ট একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন, তার জন্য বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এরূপ অবস্থায় তড়িঘড়ি আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হিন্দু কলেজের গবর্নর-ডাইরেক্টরদের পক্ষে তো বটেই অপর কোন গোষ্ঠীর পক্ষেও বিস্ময়কর। এই উদ্যোগের অস্বাভাবিকতা সেকালেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল: India Gazette জনৈক পাঠক লিখেছিলেন : A great number of wealthy natives of Calcutta . . . . . resolved, in imitation of the Sanskrit College lately established by Government, to establish an Academy for the instruction of Hindoo youths in their original sacred books . . . For this purpose donations were made. The peculiar origin of this institution seems to entitle it to attention. I.G., 8.1.24. peculiarly উক্ত উদ্যোগের শুধু প্রয়োজনের দিকের নয়। এই সূত্রে মনে রাখবার, শাস্ত্র চর্চার জন্য শত শত টোলচতুষ্পাঠী তখনকার বঙ্গদেশে ছিল, প্রায় প্রতি বৎসর একটি দুটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু সভা ডেকে, কমিটি গড়ে, পত্র পত্রিকা মারফত সর্বসাধারণের সাহায্য আহ্বান করে টোল স্থাপনের সম্ভবত এইটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত। এ অবস্থায় স্বভাব-নিন্দুকের বাইরের লোকেরও মনে হতে পারে, ওই চেষ্টার অন্তত একটি উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষা, শাস্ত্র চর্চা প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার দানের কথাটা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করা। লক্ষণীয়, উক্ত বিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেজন্য বিশেষ চেষ্টাও আর করা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা অনিবার্যরূপেই আমাদের মনোযোগ দাবি করে। অর্থ সাহায্যের জন্য হিন্দু কলেজের একটি আবেদন ওই সময় [১৮২৩ ডিসেম্বর] সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। হিন্দুরা কলকাতা হিন্দু কলেজের ন্যায় একটি বিদ্যালয় অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে; তার যথাযথ ব্যবস্থা করা তাদের সাধ্যাতীত,—এই দুই বিবেচনার ভিত্তিতেই সাহায্য চাওয়া এবং দেওয়া। এরূপ অবস্থায় ওই একই গোষ্ঠী কর্তৃক অপর একটি বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা তোলা হতে থাকলে যে হিন্দু কলেজের আবেদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা উপলব্ধি করবার মত বোধশক্তি রাধাকান্ত দেব আদির ছিল না বললে তাঁদের অপমান করা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণের আর যা কিছুই অভাব থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। তাঁরা যদি ১৮২৩ সালের ২৭।২৮ ডিসেম্বর হিন্দুকলেজের ডাইরেক্টর গুরুপ্রসাদ বসুর গৃহে সমবেত হয়ে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে তৃতীয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে থাকেন, এই বিশ্বাসেই করেছেন যে, আদি হিন্দুকলেজের মুক্তকরণ দান হিন্দুকলেজের বাইরে।

১৮২৪-২৬ সালের কলকাতা এবিষয়ে আরো কিছু বলে। ওই সময়-কালে ৪টি পরিবার শিক্ষাখাতে মোটা দান করেন, বৈদ্যনাথ রায়, হরিনাথ রায় সপুত্র কালীশংকর ঘোষাল ও হিন্দু কলেজের ডাইরেক্টর গুরুপ্রসাদ বসুর পরিবার। হিন্দুকলেজের সহিত সম্পর্কশূন্য প্রথম তিনজনের দান হিন্দুকলেজের সেবায় ব্যবহৃত হয়, হিন্দুকলেজের ডাইরেক্টরের দান হিন্দুকলেজের বাইরে।

হিন্দুকলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র যে সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসী তার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনি হিন্দুকলেজের ডাইরেক্টর রামকমল সেন [যোগদানের তারিখ ১-১-২৪ অর্থাৎ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রায় ২ মাস পূর্বে] প্যারীচাঁদ মিত্র, রামকমল সেন, সম্বোধি।

হিন্দুকলেজে সরকারী সাহায্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কলেজের পরিচালক-মণ্ডলীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে ১৮২৫ সালের ৬ জুন। গবর্নর ডাইরেক্টর-

দের মধ্যে একজন মাত্র ঐ বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন।
[GCPI copy book I, WB Arch.]

রাধাকান্ত দেবের সাক্ষ্য

সাল ১৮২৪, তারিখ ৮ মার্চ। হিন্দু-কলেজের দিক থেকে বিবেচনা করলে তখনো উক্ত উদ্যোগে অখণ্ডিত রাধাকান্ত-পর্ব চলছে। এবং ইতিমধ্যে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু সমাজপতিগণ সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কাল এদেশে য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান চর্চার প্রসারকল্পে যথাসাধ্য করবার সুযোগ পেয়েছেন। পূর্বোক্ত তারিখে রাধাকান্ত দেবের তৎকালীন কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যাবতীয় বক্তব্য স্বয়ং রাধাকান্ত দেবের স্বমুখে শোনার পর বিশপ হেবার তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন ঃ

Speaks English well and has read many of our popular authors . . . has been very laudably active in forwarding . . . the education of his countrymen. He is secretary gratuitously to the Calcutta School Society and has himself published some elementary works in Bengalee. With all this he is believed to be a

great bigot in the religion of his country's gods. (Heber's Jr. 8.3.24] তিনি যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য কখনো কিছু করেছিলেন সেবিষয়ে একটি শব্দও নেই।

এ সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখবার।

১। With all this he is . : . . a begot ইত্যাদি লিখতে গিয়ে, 'রাধাকান্ত দেব পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ছিলেন' এরূপ কিছু জানা থাকলে, হেবার সে-কথার উল্লেখ না করে পারতেন না, কারণ bigotry'র সূত্রে এটেই সব চাইতে প্রাসঙ্গিক কথা।

২। রাধাকান্ত দেব আত্মগুণ কীর্তনে পরান্মুখ ছিলেন না। বেণ্টিক সরকারের কাছে নিজ কীর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে ১৮৩৩ সালের পরিণততর বয়সের রাধাকান্ত দেবের যোগ করতে বাধে নি যে, ঈস্ট-হেস্টিংস বিদায় মানপত্র তাঁর রচনা এবং তিনি read them before those gentlemen [সংসেক ১]। এই পরিচয়-পত্রও বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। দেখা যায় তাতে স্কুলবুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির সূত্রে তাঁর নানাদিকের তৎপরতার উল্লেখ আছে; এক সময়ে যে তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিকে কোন এক পুস্তকের কিয়দংশ তর্জমা করে পাঠিয়েছিলেন তার উল্লেখ, এমন কি তাঁর শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ উপহার পেয়ে বহু সজ্জন যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন তার পর্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে ওই পত্রের একমাত্র বক্তব্য "Babu Radhakant Deb, who is a Director of the Hindu College." অথচ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠায়, পরিচালনায় রাধাকান্ত দেব আদির ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস যদি অংশতও সত্য হয়, যেমন ১৮২৪ সালের তেমনি ১৮৩৩ সালের রাধাকান্ত দেবের সর্বাধিক আয়াসসাধ্য প্রয়াস এবং সর্বোত্তম সৃষ্টি ১৮১৬-২৩ সালের হিন্দুকলেজ।

শিক্ষাবিভাগীয় সাক্ষ্য

এবিষয়ে [১৮২২-২৩ সালের কলকাতায় সাধারণভাবে হিন্দুপ্রধানগণ এবং বিশেষভাবে হিন্দু কলেজের পরিচালকগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভে আগ্রহী ছিলেন কি না, এবিষয়ে] তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের দুজন দিকপালের সাক্ষ্য বর্তমান।

একজন সম্পাদক হোরেস হেম্যান উইলসন। এঁর সাক্ষ্য এই জন্য বিশেষ মূল্যবান যে, ইনি হিন্দু কলেজ পরিচালকবর্গের মধ্যমণি রাধাকান্ত দেবের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। অপর দুই ডাইরেক্টর রামকমল সেন ও গুরুপ্রসাদ বসুর কর্মপ্রতিভা এই উইলসনের সাহায্যেই সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। এও উল্লেখযোগ্য যে, রাধাকান্ত দেব আদির বিবেচনায় উইলসন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় জনকতুল্য।

এই উইলসনের অভিমত:—১৮২২-২৩ সালের কলকাতায় গণ্যমানদের মধ্যে একজনও হিন্দু কলেজের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না [No person of any consideration Native or European took any interest in it—Lords Com. Rep. 1852-53]. তার পরামর্শ হিন্দু কলেজকে বাঁচাতে হলে দেশীয় নেতৃত্বের অবসান ঘটাতে হবে. If the College is to flourish native influence must be as much as possible excluded . . . the school [also] would be conducted on much better principles if it had other Managers [Wilson's Report 1823. Mount, Hin. Col. 1853].

অপর সাক্ষী, একদা [১৮১৬] হিন্দু কলেজের সহ-সভাপতি, তিন বৎসর পর [১৮১৯-২২] হিন্দু কলেজের পক্ষে নিযুক্ত লন্ডন এজেন্ট, জন হার্বার্ট হ্যারিংটন। তাঁর ১৮২৪ সালের কথা:—হিন্দুরা আদৌ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা চায় না; যে বলে তারা ওইরূপ শিক্ষায় আগ্রহী সে মিথ্যা বলে।

হ্যারিংটনের এই সাক্ষ্যের মূল্য, তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তারে ও গভীরতায়, এবং তাঁর বক্তব্যের স্বার্থহীনতায়। কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রাধাকান্ত দেবের জন্মের [১৭৮৪] পূর্ব [১৭৮০] থেকে; এবং তিনি খুব সম্ভবত স্বকর্ণে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আদি হিন্দু প্রধানগণকে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার প্রস্তাবে জয়ধ্বনি দিতে শুনেছিলেন। ওই জয়ধ্বনির দোহাই দিয়েই হ্যারিংটন

[illegible] হিন্দু কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের [illegible]—

"I will conclude with bearing my humble testimony after a residence of thirtyeight years in Bengal to the confidence of the inhabitants of that country in the purity and benevolence of the motives which have influenced the institution of schools for.......affording to them the means of acquiring . . . a competent knowledge of the English language with some degree of proficiency in the literature and science of Europe [CSBS Rep. 1817-23]

এইরূপ অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসসম্পন্ন হ্যারিংটন ১৮২২ সালের ডিসেম্বরে এদেশে ফিরে আসেন বহুমূল্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এবং দেখা যায়, ফিরে আসার ১৩ মাসের মধ্যে তিনি হিন্দুদের পশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অনাগ্রহ বিষয়ে এত দূর নিঃসংশয় হন যে সরকারী ভাবে লিখতে পারেন, হিন্দুরা এইরূপ শিক্ষালাভে আগ্রহী রামমোহন রায়ের এই বক্তব্য does not......express the opinion of any portion of the natives of India [GCPI Procs. 1823-24, W.B. Archives].

সহ-সভাপতি হিন্দু কলেজ, সভাপতি স্কুল সোসাইটি, লণ্ডন এজেণ্ট হিন্দু কলেজ এবং সর্বশেষে সভাপতি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন [১৮২৩-২৭] হ্যারিংটনের ন্যায় এক ব্যক্তির এরূপ মত-বদল পথচারীর মন্তব্য, হাটবাজারী গুজব বলে হয় না। ১৮২৩ সালের শিক্ষা-অধিকর্তা হ্যারিংটনের পক্ষে ওই জাতীয় গুজব কানে আসা মাত্র যুগ-যুগ পরিচিত রামকমল সেন, ডেকা-লক্ষ রকে, রামকমল সেনকে, গুরুপ্রসাদ বসুকে, রসময় দত্তকে, সর্বোপরি স্কুলবুক সোসাইটির সদস্য, স্কুল সোসাইটির সম্পাদক হিন্দু কলেজের সর্বাধিক সক্রিয় ডাইরেক্টর রাধাকান্ত দেবকে জিজ্ঞাসা করবার কথা।—একি সত্য যে আপনারা মত বদলেছেন? এবং তাঁদের বাচনিক ও কার্যগত উত্তরের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার, কথা। সে-সিদ্ধান্ত যদি এই হয় যে ভারতীয়রা—continue to hold European literature and science in very slight estimation......the Maulavi and Pundit........are not disposed to regard the literature and science of the West as worth the labour of attainment; এবং the Government had....little or no choice and if they wished to confer an acceptable boon upon......the Hindu population......, they could do so only by placing the cultivation of Sanscrit within their reach; any other offer would have been useless; tuition in European science being *neither amongst the sensible wants of the people, nor in the power of the Government to bestow* [Itas. ours],

মনে করা সঙ্গত যে হিন্দু কলেজের তৎকালীন পরিচালকগোষ্ঠীর বাচনিক তথা কার্যগত সাক্ষ্য এই মর্মের ছিল।

এই সূত্রে অবশ্য মনে রাখবার যে, শেষোক্ত মন্তব্যটি [GCPI letter 18.8.24] হ্যারিংটন শীর্ষক শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক লণ্ডন কর্তৃপক্ষের [court of Directors letter 18.2.24] তীব্র তিরস্কারের উত্তরে লিখিত। এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের সহিত সর্বাধিক সংশ্লিষ্ট হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর মতামতকে সরিয়ে রেখে, অপর কোন মহলের পরামর্শের ভিত্তিতে লণ্ডন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠালে উক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তীব্রতর তিরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল এবং হ্যারিংটন কমিটি অবশ্যই তা জানতেন।

আরো একটি প্রাসঙ্গিক কথা এই যে, একদিকে রাধাকান্ত দেব শীর্ষক বৃহত্তর গোষ্ঠী ও অপরদিকে রামমোহন রায় শীর্ষক ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী, এই দুই গোষ্ঠীর বাইরে শিক্ষা বিষয়ে মতামত দেবার মত অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ১৮২৩-২৪ সালের হিন্দু কলকাতায় ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি হ্যারিংটন মন্তব্য করেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলে রামমোহনের ওকালতি *does not express the opinion of any portion of the natives of India*, আমরা যুক্তি তো মানতে বাধ্য, এই natives of India-র অন্যতম প্রধান, সম্ভবত প্রধানতম পুরুষ সদনমধ্যে রাধাকান্ত দেব।

॥ ৪ ॥

আমরা এযাবৎ যে-সকল সাক্ষ্য ব্যবহার করেছি, তার প্রত্যেকটি সেই সময়কার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদত্ত। এবং প্রত্যেকটি অপরিচিত তথ্যের বেলায় তথ্য-মূল নির্দেশিত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে যে-সকল তথ্যমূল পাওয়া যায় না, সে সকলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের নামও দেওয়া হয়েছে। যে-কেউ সামান্য একটু শ্রম স্বীকার করলেই যাবতীয় তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির দরুণ বা অংশবিশেষের অনুল্লেখ হেতু, কোন সাক্ষ্যের অর্থবিকৃতি ঘটেছে কি না, তাও বিচার করে দেখা সম্ভব।

এই সকল সাক্ষ্যের ইঙ্গিত নিম্নরূপ।

॥ ক ॥ ১৮২২-২৩ সালে হিন্দু কলেজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ৬।৭ বৎসরেও কলেজের নিজস্ব বাড়ি হয়নি। তাকে প্রথমে ৮০ থেকে ৬০ উক্ত পরে ৬০ থেকে ৪০ ভাড়ার বাড়িতে উঠে যেতে হয়েছে। ১৮১৭-১৯ তিন বৎসরে দুবার বাড়ি বদল এবং উঠতি ভাড়ার যুগে ৮০ থেকে ৪০ টাকায় নামার তাৎপর্যও লক্ষণীয়। এও মনে রাখবার যে ১৮২৪ সালে একই কর্তৃপক্ষ একই বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০ টাকা ভাড়ার বাড়ি নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন [GCPI. Procs. WBA].

শিক্ষক সংখ্যা সূচনাতেই অপর্যাপ্ত ছিল। তাঁদের মধ্যেও একাধিক ব্যক্তিকে ছাটাই করা হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষক আদৌ নিযুক্ত হয়নি। ফলে একমাত্র ভাষা শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

স্কুল সোসাইটির ৩০ জন ছাত্রের বাইরে হিন্দু কলেজের নিজস্ব ছাত্র আর কেউ ছিল না অথবা তাদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হত না। [নিয়মাবলীর ৭ম ধারা মতে প্রকাশ্য পরীক্ষা আবশ্যিক ছিল]

॥ খ ॥ কোন কোন দিকের দুর্দশা মোচন সহজসাধ্য ছিল কিন্তু কোন চেষ্টা করা হয়নি।

গৃহ নির্মাণ। ১৮২৫-২৬ সালে হিন্দু কলেজের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গণে যে গৃহ নির্মিত হয়, তাতে ব্যয় হয়েছিল মোটামুটিভাবে ২০,০০০৲। এই সংখ্যার ৫ গুণ অর্থ ১৮১৭ সাল থেকে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল, তাঁরা ইচ্ছে করলেই কলেজের নিজের বাড়ি হতে পারত।

আর্থিক সংগতি। সম্ভবত শতাধিক হিন্দু প্রধান হিন্দু কলেজের জন্য লক্ষাধিক টাকা [১,১৩,১৭৯-৩-৯ পাই] দান করেছিলেন। মোটামুটি ভাবে এঁদের মধ্য থেকেই ৯২ জন হিন্দু প্রধান ১৮২২ জানুয়ারিতে হিন্দু কলেজের প্রধান স্থপতি ঈস্টকে তাঁর চেষ্টা যত্নের উল্লেখ করে মানপত্র দেন। এঁরা অনেকে [illegible] বৎসর দুর্গাপূজোর সময় পূজো উপলক্ষে সমাগত অতিথি সজ্জনের আপ্যায়নের জন্য মদ ও গোমাংস ক্রয়ে [১২।১০। ১৮২৬ সালের গভর্নমেণ্ট গেজেট দ্রষ্টব্য] যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও সম্ভবত হিন্দু কলেজের বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট হত। অন্য দিক দিয়ে দেখলে ওই গোষ্ঠীর ২০।২৫ জন মাত্র পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র-ভাগিনেয় ছাত্র বেতন দিয়ে পড়াশোনা করলে শিক্ষক বিদায়ের মাধ্যমে কলেজের অর্থব্যয়ে সমস্যা ঘটাতে হত না। [১৮১৯ সাল থেকে বিনা বেতনে বিদ্যা বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু বেতন দিয়ে পড়বার সুযোগ ছিল। সে সুযোগ একজনও নেন নি।]

ণ। তৎকালীন কর্তৃপক্ষ অন্তত তিনটি ত্র কলেজের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করেছেন হিন্দু কলেজের অর্থ সাহায্যের বেদন সরকারের বিবেচনাধীন থাকার য় কলেজের গভর্নর ডাইরেক্টরেরা কে কথায় বা আচরণে বা উভয়ত কারকে জানতে দিয়েছেন যে তাঁরা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী । [হ্যারিংটন সূত্র]।

ঐ একই পরিস্থিতিতে কলেজের র্তা ব্যক্তিরা অনেকে সরকার সহ কলকে জানতে দিয়েছেন যে [তাঁদেরই তিষ্ঠিত/পরিচালিত একটি কলেজ র্থাভাবে উঠে যেতে বসেছে এমন বস্থায়] তাঁরা অপর একটি কলেজ াপনের জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত. বেদান্ত কলেজ উদ্যোগ]।

১৮২১-২৩ সালের পরিস্থিতি. ০ জন গবর্নর-ডাইরেক্টরদের মধ্যে এক- নও উপযুক্ত সময় দেন না, অবশ্য রণীয় করেন না। এরূপ অবস্থাতেও র্ষিক ডাইরেক্টর নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়মাবলী ১৭, ২৬ ধারা] বেআইনী াবে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

এই সকল প্রমাণিত/প্রমাণসম্ভব থ্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনি- ার্য হয়ে ওঠে, তার সব চাইতে নিরীহ পে :—১৮২২-২৩ সালে রাধাকান্ত দেব মুখ হিন্দু কলেজের কর্তাব্যক্তিরা কান কারণবশত হিন্দু কলেজের লাভ- তি উন্নতি-অবনতি বিষয়ে নিস্পৃহ ছলেন তার ফলে [কিংবা এরূপ বস্থায় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারণে] হিন্দু কলেজের অধোগতি ঘটে এবং উইলসন দি অনেকে এই বিশ্বাসে উপনীত হন য, দেশীয় কর্তৃত্বের অপসারণ ভিন্ন হন্দু কলেজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। নিস্পৃহতার বদলে 'অক্ষমতা' মনে করলে সিদ্ধান্তটি আরো নিরীহ হতে পারে। কিন্তু হিন্দু কলেজের তৎকালীন পরি- চালকেরা ৬।৭ বৎসরে উপযুক্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও কলেজের বাড়ি তৈরি করতে কিংবা বার্ষিক সভা ডাকতে, দান প্রাপ্তি প্রচার করতে কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে কিংবা নিজ নিজ সন্তান- দের পড়াশোনার জন্য ছাত্রবেতন দিতে অক্ষম ছিলেন এরূপ কথা সজ্ঞানে বলা কঠিন।

এই নিস্পৃহতার উল্লেখ ও তার উপ- যুক্ত ব্যাখ্যা এড়িয়ে গিয়ে হিন্দু কলেজের সার্থক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয় এবং এযাবৎ প্রচারিত হিন্দু কলেজ বিষয়ক কোন বক্তব্যেই তা বিবেচিত হয় নি। এ- অবস্থায় আমরা হিন্দু কলেজের ইতি- হাস পুনর্লিখন বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা দেখতে পাব, হিন্দু কলেজ আদি পর্বের শুধু ১৮২২-২৩ সালই নয়, আগের পরের প্রত্যেকটি বৎসরেই অনুরূপ অনালোচিত এবং অস্বস্তিকর দিক বর্তমান। এবং যে সকলের মিলিত ইঙ্গিত, হিন্দু কলেজ সম্পর্কে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে এতকাল আমরা প্রত্যেকে যা জেনে এবং কেউ কেউ অপরকে শিখিয়ে এসেছি, বাস্তব অবস্থা শুধু যে তা থেকে ভিন্ন ছিল তাই নয়, বাস্তব অবস্থা কোন কোন দিকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

তথ্যসূত্র পরিচয়

১। Procs. — Proceedings of the Hindoo College. [Bagal — যোগেশচন্দ্র বাগলের হিন্দু কলেজ বিষয়ক প্রবন্ধ চতুষ্টয়, Modern Review 1955; সম্বোধি= প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত রামকমল সেনের জীবনী, বাংলা অনুবাদে সংযোজন; Mouat—Selections from the records of the Bengal Govt. No. XIV App. vi : History of the Hindoo College. F. J. Mouat, 1853].

২। GCPI— সরকারী General Committee of Public Institutions -এর দলিল পত্র, Proceedings, Correspondence ইত্যাদি West Bengal Archives.

৩। Court of Dirs. = W. B. Archives রক্ষিত 'General Letters' between the London Court of Directors [EIC] & the Indian Govt.

৪। Lords Com. Rep. = Second Report ... Select Committee of the House of Lords, 1852-53.

৫। CSBS — Reports of the Calcutta School Book Society 1817-[illegible].

৬। EAST — Hindoo College Letters, quoted in Lords Com. Rep.

৭। EAST — Suggested Reforms in India [—একটি ৬০।৭০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট তারিখ ১ জানুয়ারি ১৮১৬। এই রিপোর্টে রামমোহন রায় সহ তৎকালীন বঙ্গদেশ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মন্তব্য আছে। এই দলিলটি গত ১০০ বৎসরে কোথাও আলোচিত হয় নি। গুরুত্বের দিক দিয়ে পুনঃ প্রকাশযোগ্য কি না বিবেচনা করা হচ্ছে।]

॥ আটাশ ॥

মন্দিরের দাওয়ার সামনে শিউলীকে দাঁড় করিয়ে ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'দাঁড়াও এবং সামনেই ঝুঁকে পড়ে এক টানে মূল শুদ্ধ একটি বিষকাটার গাছ তুলে নিয়েছিল। শিউলী উদ্দেশ্য বুঝে ওঠবার আগেই ত্রিদিবেশ মন্দিরের দাওয়ায় জমা মনে হয়েছিল, এমনটা কেবল ত্রিদিবেশেরই ঝাপটা দিয়ে ধুলো সাফ করেছিল। শিউলীর মনে হয়েছিল, এমনটা কেবল ত্রিদিবেশের মাথায় আসতে পারে আর কারোর না। ঝাপটার ঝাপটায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, পুরনো দিনের বাঁধানো শান-ভেঙে যাওয়া, ফেটে যাওয়া ফাটলের বুকে অস্পষ্ট লাল ছোপ দেখা গিয়েছিল এবং ত্রিদিবেশ যখন ধুলোয় ঝাপটা দিচ্ছিল তখন শিউলীর শরীরটাও যেন তার গায়ে ঝাপটা খাচ্ছিল, কারণ সে শিউলীকে সব সময়েই এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। শিউলীর এক আবেগে ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা তখনো কাটেনি, এবং ওর মাথায় কেবল 'হাসনুহানা' শব্দটা, গন্ধের সঙ্গে পাক খাচ্ছিল। তথাপি ত্রিদিবেশ যখন বলেছিল, 'বসো', ও মাথা নেড়েছিল, কারণ ওর ঘোর আর আচ্ছন্নতার মধ্যেও আশ্চর্যরকম ভাবে একটি ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল, ধূমাবতীর পোড়ো যতোই নিরিবিলি হোক, হঠাৎ কারোর এসে পড়া একেবারে অসম্ভব না, অতএব মন্দিরের দাওয়ার মতো খোলা উঁচু জায়গায় বসা যায় না। ও মাথা নেড়ে পশ্চিমের আঁশশ্যাওড়ার ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়েছিল।

ত্রিদিবেশ প্রথমে শিউলীর আঙুলের ইশারায় হদিস করতে পারে নি, প্রস্তুত দৃষ্টিতে আশশ্যাওড়ার ঝোপের দিকে তাকিয়েছিল। শিউলীর আবার মনে হয়েছিল ত্রিদিবেশ কতো অনভিজ্ঞ, নিচু স্বরে বলেছিল, 'যদি কেউ এসে পড়ে?'

ত্রিদিবেশ বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ, শৈলী-বুড়ি আসতে পারে, ওর গরু এই পোড়োয় বেড়ায়।'

শিউলী ত্রিদিবেশের হাতধরা হয়ে পা ফেলতে ফেলতে শৈলীবুড়ির কথা ভেবে-ছিল। শৈলীবুড়ি ধূমাবতীর পোড়োর দক্ষিণ সীমানাতেই তার স্বামীর ভিটায় একটা ভাঙা বেড়ার ঘরে থাকে। সে সব সময় বকবক করে, বকবকিয়ে, দিনকাল ক্রমেই কতো খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং লোকজনেরা, বিশেষ করে, তার চেনাশোনা প্রতিবেশীরা, কতো শয়তান হয়ে উঠছে দিনকে দিন এবং মেয়েগুলো কী রকম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে সব কথা সে অতি অকৃত্রিম প্রাকৃত ও ইতর ভাষায় বলে—যা শোনা যায় না। পাড়ার ছেলেরা সব সময় তার পিছনে লেগে থাকে, কখনো কখনো ইটপাটকেলও ছোঁড়ে, তখন শৈলী-বুড়ির গালাগালের ভাষায় কানে আঙুল দিতে হয়, কারণ ছেলেদের সে পুনরায় মাতৃগর্ভে ফেরত পাঠাবার শপথ নেয় এবং ছেলেরা যা-ই বুঝুক, ওদের পিছনে লাগার উদ্দাম লাফড় নষ্ট কমে না। শৈলীবুড়ি কালো, খুলে, ঈষৎ কোমর-ভাঙা, মাথার সাদা চুলে কদম ছাঁট। লোকের ধারণা, বুড়ির টাকা আছে। কিছু সোনাদানাও আছে এবং গরু আছে, সে দুধও বিক্রি করে। সংসারে তার কেউ আছে বলে দেখা যায় না, শোনা যায় নি। তবে তার একজন স্বামী ছিল এবং সেই 'সোয়ামির ভিটেয়' সে বাস করে, এ কথা সে নিজেই বলে, কিন্তু কেন যে সে সব কিছুকে মন্দ বলে বোঝা যায় না।

'মন্দিরটার ভেতরে আমি একদিন একটা খুব সুন্দর চন্দ্রবোড়া সাপ দেখেছিলাম।' ত্রিদিবেশ বলেছিল।

খুব সুন্দর চন্দ্রবোড়া শুনে শিউলী অবাক হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'খুব সুন্দর?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'খুব সুন্দর। নীল রঙের সঙ্গে অল্প একটুখানি মেটে রঙ মেশালে যেমন হয়, সেই রকম ছিল তার গায়ের রঙ, আর সাদা ফুল ফুল ছাপ।'

শিউলী মনে মনে আরো অবাক হয়েছিল। কারণ, সাপের এমন বর্ণনা ও আর কখনো শোনেনি। এবং সাপের গায়ে যে সাদা ফুল ফুল ছাপ থাকতে পারে ভাবতেই পারে নি। তাই আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওরা কামড়ায় না?'

'পাঁচ পাপড়ি টগর একটু ছোট হলে যেমন হয়, সেই রকম।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'বিভীষণ আর জগা তখন মাচকুন্দের তলায় গাঁজা খাচ্ছিল। আমি সাপটার কথা বলতে ওদের কী হলো জানি না, ওরা আমাকে গাঁজার কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বললো, তুমি বাবার বাহনকে দেখতে পেয়েছ, আমাদের একটু পেসাদ করে দিয়ে যাও।'

ত্রিদিবেশ হেসেছিল আর শিউলী ভেবেছিল, এরকম অদ্ভুত ঘটনা ত্রিদিবেশের জীবনেই ঘটে কিন্তু পেসাদ করে দিয়ে যাও শুনে, ব্যাপার অনুমান করেও জিজ্ঞেস করেছিল, 'পেসাদ করে দিয়ে যাও মানে কী?'

ত্রিদিবেশ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমাকে গাঁজা খেতে বলেছিল।'

'খেয়েছিলে নাকি?' শিউলী প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ত্রিদিবেশের হাতধরা, গা ছোঁয়া শিথিল শরীর একটু শক্ত হয়ে উঠেছিল এবং চোখে উদ্বেগ ফুটেছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'বাহ্, গাঁজা খাওয়া

তো গাঁজা খেতে শিখি নি।

শিউলী নিশ্চিন্ত হলেও আবার জিগ্যেস করেছিল, 'তুমি বুঝি এই ধূমাবতীর দোড়ায় আসো?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসি।'

'কেন? কার সঙ্গে?' শিউলী জিজ্ঞেস করেছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'কারো সঙ্গে না, একলাই আসি। দু'একদিন মোহনও আমার সঙ্গে এসেছে। মোহন আজকাল মাঝে মাঝে সিগারেট খায় তো। এখানে এসে খায়।'

শিউলীর কিশোরী বুক থেকে যেন একটা উৎকণ্ঠিত কষ্টের ভার নেমে গিয়েছিল। কেননা, ত্রিদিবেশ ধূমাবতীর নিরালায় আসে শুনেই ওর মনে কাঁটার মতো সেই সব মেয়েরা খচখচিয়ে উঠেছিল, যাদের সঙ্গে ত্রিদিবেশ খেলা করে। ত্রিদিবেশ ওর হাত ধরেছিল, এবং মাঝে মাঝে শিউলী ওর সামান্য অনুভূতির মধ্যেও কেমন যেন লজ্জা বোধ করছিল, যার সঙ্গে একটা সুখের অনুভূতিও ছিল, কারণ ত্রিদিবেশ সজাগ না থাকলেও শরীরের স্পর্শের অনুভূতি শিউলীর অনেক তীব্র ছিল। আশশ্যাওড়ার ঝাড়ের দিকে আঙুল দেখালেও শিউলী হাঁটছিল মন্দিরের পিছন দিকে, সেখানে বনশিউলীর ঝাড়ে মুচকুন্দের ছায়া পড়েছে। শিউলী আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'সাপটা তোমাকে দেখে কিছু করলো না?'

'না।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'সাপটা যেন দেওয়াল ঘেঁষে লম্বাভাবে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি বিভীষণ আর জগাইর কথার কোনো জবাব না দিয়ে আবার চন্দ্রবোড়াকে দেখতে গেছলাম, তখন দেখছি চন্দ্রবোড়াটা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'

শিউলীর গায়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠেছিল। ও ত্রিদিবেশের গায়ে আরো একটু নিবিড় হয়েছিল এবং বনশিউলীর জঙ্গলের দিকে, ঝরাপাতা মাটির দিকে তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার ভয় করে নি?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'না, ওকে দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল।'

শিউলী আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিভীষণ আর জগা কে?'

'ওরা বাগদিপাড়ার লোক, আমার থেকে একটু বড়। এখানে মাঝে মাঝে লুকিয়ে গাঁজা খেতে আসে।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'তারপরে দু'দিন বাদে আমি আবার এখানে এসেছিলাম সাপটা আছে কী না দেখতে। মন্দিরের কাছে যেতেই একটা পচা গন্ধ আমার নাকে আসে, দেখি কি মন্দিরের বাইরে চন্দ্রবোড়াটা মরে পড়ে আছে। তার মাথাটা থ্যাঁতলানো, গায়ে রক্তের দাগ। বোধ হয় বিভীষণ আর জগাই তাকে মেরে ফেলেছিল। নাকি আর কেউ, কে জানে? পরে আমি ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিল ওরা নাকি মারে নি। আমি সাপটার ছবি এঁকেছি, তোমাকে দেখাবো।'

শিউলী তখন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মন্দিরের পিছনে একটু খোলা পরিষ্কার জায়গা পেয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল, মুচকুন্দের ছায়ায় জায়গাটা অনেকখানি আড়ালে কিন্তু ছবি আঁকার কথা শুনে অবাক হয়ে গেছিল, 'সাপের ছবি এঁকেছো?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ। তোমাকে দেখাবো, মধুদিকেও দেখিয়েছি।' বলে ত্রিদিবেশ একটু হেসে উঠেছিল।

মধুদির নাম শোনা মাত্র আবার যেন কিশোরী প্রাণে একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে উঠেছিল এবং ত্রিদিবেশের হাসিটা যেন কেমন অনেক সন্দিগ্ধ ঘটনার সংকেত করেছিল। শিউলী ত্রিদিবেশের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ত্রিদিবেশের মুখে তখনো সেই হাসি, বলেছিল, 'এখানে বসবে?'

শিউলী কোনো জবাব না দিয়ে পিছনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল, ত্রিদিবেশও সঙ্গে সঙ্গে সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল, শিউলীর হাত ছাড়ে নি, এবং বলেছিল, 'মধুদি বলেছিলেন, আমি নাকি সাপ আঁকি নি, একটা সুন্দর শাড়িপরা মেয়ের ছবি এঁকেছি।'

শিউলীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়েছিল। ঈর্ষা বয়স মানে না, সম্পর্ক মানে না, কারোর কোনো স্বাতন্ত্র্যকেও মানে না। শিউলী মনের কষ্ট চেপে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি বুঝি মধুদিকে সব দেখাও?'

'সব।' ত্রিদিবেশ অনায়াস সহজ আনন্দে বলেছিল, 'আজকাল আমার সব আঁকাই মধুদিকে দেখাই। তারপরে শোনো মধুদি কী বললেন। মধুদি বললেন, তিনি সেই চন্দ্রবোড়ার মতো রঙের শাড়ি পরবেন। আরো কি বললেন জানো, বললেন সত্যি সত্যি হয়তো সাপের গায়ের রঙটা সেই রকম ছিল না, আমি সেই রকম দেখেছি, আর আমার দেখাটাই নাকি ঠিক। বললেন, যে কোনো জিনিসকে আমি যে রকম দেখবো, সেটাই ঠিক দেখা হবে। এরকম কেন বললেন, আমি জানি না। কয়েক দিন পরে মধুদি ঠিক সেই চন্দ্রবোড়া রঙের শাড়ি পরেছিলেন।'

শিউলীর মনে হয়েছিল, ওর বুকের ভিতর থেকে একটা কিছু নিষ্কুণ্ডল হয়ে পাক খেয়ে গলার কাছে উঠে আসছে, যা সুন্দর চন্দ্রবোড়ার থেকে ফণাসিত নাগের মতো। গলায় কথা ফুটতে চাইছিল না, তবু জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি মধুদিকে খুব ভালবাসো, না?'

'মধুদি আমাকে খুব ভালবাসেন।' ত্রিদিবেশ শিউলীর মুখায় কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখেই বলেছিল।

শিউলী কোনো কথা বলে নি, মাথা নিচু করেছিল এবং মনে মনে স্থির করছিল কোনো কথা না বলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবে এবং যাবার আগে বলে যাবে, তোমার সঙ্গে আমি আর মিশবো না।

কিন্তু ওর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, 'তুমি মধুদিকে আমার থেকেও বেশি ভালবাসো।'

শিউলীর স্বরে ছিল গভীর অভিমান আর ত্রিদিবেশ হো হো করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'মধুদিকে আমি তোমার মতো ভালবাসবো কেমন করে। মধুদি আমার থেকে কতো বড়। মধুদিকে বুঝি সেভাবে ভালবাসা যায়? তুমি ভারি বোকা তো?'

শিউলী ত্রিদিবেশের চোখের দিকে তাকিয়েছিল, দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া। সব সন্দেহের জন্য ত্রিদিবেশই দায়ী ছিল, কারণ ত্রিদিবেশের জীবনযাপন আচার আচরণ অনেক কিছুই দিশা দেয় নি। তাকে সবটুকু বুঝে ওঠা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি মধুদির প্রতি মুগ্ধ স্নেহের কথাও কখনো ভুলতে পারতো না এবং কিশোরী মনে একটি বিশ্বাস জন্মেছিল, মধুদির মতো মহিলার কাছে সব বয়সের পুরুষই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নত হতে পারে।

ত্রিদিবেশও শিউলীর চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং ওর ঝকঝকে চোখ হাসি চিকচিক করছিল, বলেছিল, 'তুমি তো আলাদা। মধুদি তো মধুদি, তাঁকে আমি দিদি বলি, তিনি আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। এক এক সময় আমার মনে হয় মধুদি যদি আমার আত্মীয় হতেন, সত্যিকারের দিদি হতেন তা হলে কতো ভালো হতো।'

এ কথার বলার সময় ত্রিদিবেশের একটি নিঃশ্বাস পড়েছিল এবং ওর হাসিমুখে ক্ষণিকের জন্য একটু ছায়া পড়েছিল। শিউলীর মন একটু শান্ত হয়েছিল, কিন্তু প্রাণের সমস্ত দিগন্ত আলো ছিল না, বলেছিল, 'সেই জন্য বুঝি তুমি যা আঁকো সবই আগে মধুদিকে দেখাও? আমাকে তো দেখাও না??'

ত্রিদিবেশ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবাক স্বরে বলেছিল, 'তুমি যদি আমার আঁকা দেখতে চাও, এখন থেকে আমার সব আঁকা আগে তোমাকে দেখাবো। আজকাল ছবি আঁকতে বসলে তোমার কথা আমার মনে পড়ে যায়।'

'আমার কথা?' শিউলী যেন খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ, কেন জানি না তোমার কথা মনে পড়ে যায় আর আঁকা হয়ে গেলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে প্রথমেই মধুদির কথা মনে পড়ে আর মনটা কেমন খচখচ করতে থাকে—আঁকাটা বোধ হয় মধুদির ভালো লাগবে না। আমার কোনো কোনো ছবি মধুদির মোটেই ভালো লাগে না, আর তখন মধুদির মুখটা কেমন ভার হয়ে ওঠে। আমার মন এত খারাপ হয়ে যায়, নিজের ওপর এত রাগ হয় যে ছবিটা নিয়ে এসে আমি ছিঁড়ে ফেলি।'

শিউলীর স্বরে বিস্ময় উৎকণ্ঠা ফুটেছিল, 'ছিঁড়ে ফ্যালো?'

'হ্যাঁ, ছিঁড়ে ফেলি।' ত্রিদিবেশ বিষণ্ণ মুখে বলেছিল, 'খুব রাগ হতে থাকে, মনে হয় আর কখনো ছবিই আঁকবো না। কিন্তু থাকতে পারি না, আবার আঁকি, আবার সেই মধুদিকেই দেখাতে নিয়ে যাই। মধুদি ভালো বললে, তখন খুব আনন্দ হয় আর দৌড়ে কোথাও গিয়ে তখনই একটা সিগারেট খেয়ে ফেলি।'

শিউলী এমন বিস্ময়কর কথা আর কখনো শোনে নি। ওর প্রাণের দিগন্তে তখন আবার আলো বিকীর্ণ হচ্ছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল, 'সিগারেট খেয়ে ফ্যালো?'

ত্রিদিবেশ হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আনন্দ হলে কোথাও পালিয়ে গিয়ে আমি সিগারেট খাই। আর মনে হতে থাকে, আমি এমন ছবি আঁকবো, লোকে বলবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো ছবি এঁকেছি আমি।'

শিউলী অবাক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কার মতো বললে?'

'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।' ত্রিদিবেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছিল এবং আরো বলেছিল, 'মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফেল। এঁদের পরেও আরো অনেকের নাম আমি শুনেছি মধুদির কাছে, মধুদি বলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে যে সব বই আছে তিনি আমাকে তা পড়তে দেবেন। মধুদি আমাকে গোয়ার ছবি দেখিয়েছেন। মাতিস, পল গগাঁ, ভ্যান গগ্ আর রবি ঠাকুরের ছবি দেখিয়েছেন। তুমি জানো, রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো ছবি আঁকতে পারেন?'

শিউলী ওর অনভিজ্ঞ সরল বিস্ময়ে বলেছিল, 'না তো!'

'আমি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছি।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'কিন্তু তাঁর ছবি খুব অদ্ভুত, আমি এখনো সব বুঝতে পারি না, তবু জানো শিউলী, ছবিগুলো দেখতে দেখতে আমার যেন কী সব মনে হতে থাকে।'

'কী সব?'

'আমি তা বলতে পারি না।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'আমার তখন কি মনে হয় জানো, অনেক কিছু আমার মনের মধ্যে হয় আর আমি নিজেই তা যেন ঠিক বুঝি না। তুমি যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলতে পারবো না। শুধু ছবি দেখেই না, অনেক সময়েই আমার অনেক কিছু মনে হয় সেগুলো কী, আমি বুঝতে পারি না।'

শিউলী যেন ত্রিদিবেশের চোখের তারায় এক রহস্যের দ্যুতি দেখতে পাচ্ছিল এবং ওর নিজের প্রাণও দ্যুতিময়ী হয়ে উঠছিল, অথচ ত্রিদিবেশের কথা ও সব বুঝতে পারছিল না। যাকে বলে ভাব-ভোলা—ত্রিদিবেশকে ওর সেই রকম লাগছিল এবং সেই ত্রিদিবেশকে দেখে ওর এত ভালো লাগছিল যা একেবারে নতুন মনে হয়েছিল, নিখাদ আবেগে ওর মন পূর্ণ হয়েছিল। ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ওই সব নামগুলো মনে রাখো কেমন করে যাদের নাম বলছিলে?'

'তাঁদের নাম আমি কখনো ভুলি না। আমি তাঁদের জীবনের অনেক কথা পড়েছি। তাঁরা কী ভাবতেন আর কী করে ছবি আঁকতেন।' ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'তবু আমি সব কথা ভালো করে পড়তে পারি না, আমি তো ইংরেজি পড়তে শিখি নি।'

শিউলী যেন বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি ইংরেজিতে সে সব পড় নাকি?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ, তাঁদের বিষয়ে বাংলায় খুব কম লেখা হয়েছে, প্রায় কিছুই লেখা হয় নি। মধুদি আমাকে বলেছেন, পড়তে পড়তে বুঝতে পারবে। বারে বারে পড়বে তা হলে বুঝতে পারবে। সত্যি কথাই, ইস্কুলের বই পড়ে আমি যা বুঝতে পারি না, এ সব বই পড়ে আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি। কেমন করে বুঝতে পারি আমি জানি না। মোহন অবাক হয়ে যায়।

মোহন, আমার কথা শুনে বইগুলো পড়ে, বলেছিলাম 'ঠিক ধরেছো।'

অবাক শিউলীও, শুধু অবাক না, মনে হয়েছিল আর এক নতুন ত্রিদিবেশকে ও দেখছে, যার সবটাই যেন সংসারছাড়া, বিস্ময়ে ভরা, যা ওকে মুগ্ধতার এক অনির্বচনীয় চমৎকারিত্বে নিশ্চুপ করিয়ে দিয়েছিল, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে নি, ত্রিদিবেশের মুখের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়েছিল।

ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলো তো?'

'কিসের কী?' শিউলী জিজ্ঞেস করেছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছো?'

ত্রিদিবেশের স্বরে কেমন একটা সন্দেহ আর দ্বিধা ছিল। শিউলী বলেছিল, 'তোমাকে, আমার কেমন অদ্ভুত লাগে।'

'অদ্ভুত?' ত্রিদিবেশ অবুঝ সুরে জিজ্ঞেস করেছিল।

শিউলীর মুখে রক্তের ছটা লেগে গিয়েছিল, ঠোঁটের হাসিতে লজ্জা। চোখ সরিয়ে নিয়েছিল ত্রিদিবেশের চোখ থেকে। বলেছিল, 'হ্যাঁ, ভীষণ ভালো।'

সেটাই ছিল শিউলীর অদ্ভুত শব্দের অর্থ এবং কথাটা বলেই ও ঘাড় হেলিয়ে মাথা ছুঁইয়েছিল ত্রিদিবেশের কাঁধে। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎচমকের মতো কথাটা মনে ঝলকিয়ে উঠতেই ত্রিদিবেশের গালে হাত দিয়ে নিজের দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি তুমি আমার নিঃশ্বাসে হাসনুহানার গন্ধ পেয়েছ?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ' এবং মুখ নামিয়ে নিশ্বাস টেনে বলেছিল, 'এই তো এখনো পাচ্ছি, ঠিক যেন হাসনুহানা ফুলের গন্ধ।'

ত্রিদিবেশের চোখের দিকে তাকিয়ে শিউলী একটা ভ্রুকুটি ঝিলিক হেনেছিল। বলেছিল, 'কিন্তু হাসনুহানা গন্ধের কিছুই তো আমি মাখি নি।'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'তোমার গা থেকে গন্ধ আসছে না, নিঃশ্বাস থেকে, তোমার নিঃশ্বাসে।' ও যেন গন্ধের মোহে নাসার স্ফীত করেছিল।

'আমি কি তবে হাসনুহানা ফুল খেয়েছি?' শিউলী হেসে উঠেছিল।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'আমি কি বলেছি নাকি? হাসনুহানা ফুল আবার কেউ খায়? কিন্তু তোমার ভেতর থেকে সেই গন্ধ আসছে, সত্যি—।' যেন আরো কিছু বলতে গিয়েও না বলে শিউলীর টিকলো নাকের সঙ্গে ওর নাক ঠেকিয়েছিল আর শিউলী অনুভব করেছিল ত্রিদিবেশের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা এবং একটা গন্ধও, যা ব্যাখ্যা করতে পারে না, কিন্তু সে গন্ধ খারাপ ছিল না। ত্রিদিবেশ ওর ঠোঁট দিয়ে শিউলীর ঠোঁট স্পর্শ করেছিল শিউলীর ঠোঁট আপনা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং চোখ বুজে ত্রিদিবেশের দুটি ঠোঁটকে নিজের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দুজনের নিঃশ্বাসের সংঘাতে সন্ন শব্দ বাজছিল। ত্রিদিবেশ ওর পিঠ বেষ্টন করে এক হাত দিয়ে ধরেছিল। শিউলী চুম্বন বিচ্ছিন্ন না করে ত্রিদিবেশের দিকে খানিকটা ফিরে তার বুকের পাশে জড়িয়ে ধরেছিল এবং হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দে চুম্বনচ্ছিন্ন ঠোঁট সরিয়ে শব্দের লক্ষ্যে তাকিয়েছিল। কিছু দেখতে পায় নি। তার পরে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়েছিল, বলেছিল, 'কেউ এসে পড়ে যদি?'

ত্রিদিবেশের মাথায় সে রকম কোনো ভাবনা ছিল না, বলেছিল, 'কেন আসবে?'

শিউলী অবাক ভ্রুকুটি করে হেসেছিল, 'কেন আবার? সেই বিভীষণ জগৎটা যদি পাঁজা খেতে আসে?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'আমি ভয় পাই না।'

শিউলীর সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু ওর প্রাণে অনেক ভয় ছিল। ওকে কেউ সেইভাবে দেখতে পাবে অকল্পনীয় ছিল এবং ভেবে মনে মনে শিহরিত হয়েছিল। ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'শিউলী, তোমার চোখ দুটো কেমন লাল দেখাচ্ছে।'

'তোমারো।' শিউলী বলেছিল।

ত্রিদিবেশ শিউলীকে নিরীক্ষণ করে দেখেছিল—যেন ভেঙে ভেঙে ভাগে ভাগে ওর চোখ, কোল, কোমর, বুক গলা মুখ। তারপর গলা বলেছিল, 'আমার চুমো খেতে ইচ্ছে করছে।'

শিউলীর চোখের তারায় ঝিলিক লেগেছিল, বলেছিল, 'কে বারণ করেছে?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'রক্ত বেরোয় যদি?'

'বেরোলেই বা!' শিউলী সাবলীলতায় বলেছিল।

'তোমার ঠোঁটে দাগ থাকবে, এখনই কেমন নীলচে দেখাচ্ছে।'

শিউলী হেসে বলেছিল, 'আমার ঠোঁট দরজায় ঠুকে গেছে তা-ই রক্ত জমে গেছে।'

মা এবং সকলের সামনে যে কৈফিয়ত তৈরি করে রেখেছিল সেই কথাই বলেছিল। ত্রিদিবেশ তথাপি গাঢ় চুমো খায় নি, শিউলীর ঠোঁট স্পর্শ করে বলেছিল, 'আমি তোমার ছবি আঁকবো।'

'কোথায় আঁকবে?'

'তোমাদের বাড়িতে?'

শিউলীর চোখে দ্বিধা আর সন্দেহ জেগেছিল, 'বাবা মা রাগ করবে না?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'কেন রাগ করবেন? আমি তো লুকিয়ে তোমার ছবি আঁকবো না, সকলের সামনেই আঁকবো। আর যখন—।'

ত্রিদিবেশ কথা শেষ না করে শিউলীর বুকের দিকে তাকিয়েছিল। অন্তর্বাসহীন ডোরাকাটা ছিটের জামায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না যেন তরল দোলায় টলটল করছিল, সেখানে আঁচলের মেঘছায়া ছিল না। শিউলীর হাত আপনা থেকেই ওর বুকে উঠে এসেছিল, ফিসফিস স্বরে উচ্চারণ করেছিল, 'কী?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'আমি একদিন তোমার সারা গা খুলে দেখবো, আমি তোমার খোলা গায়ের ছবি আঁকবো।'

শিউলী লজ্জায় দু হাতে ত্রিদিবেশকে জড়িয়ে যেন ভয়ের স্বরে বলে উঠেছিল, 'না না না, তা কেন?'

ত্রিদিবেশ বলেছিল, 'আমার মনে হয়, যাদের সারা গা খুলে ছবি আঁকা হয় তুমি সেই রকম সুন্দর।'

শিউলীর অনুভূতিতে একটি গভীর লজ্জা ও সুখের উষ্ণতা যেন দপদপ করছিল, তথাপি ত্রিদিবেশের বুকের কাছে মুখ ঘষে বলেছিল, 'না, আমি তা পারবো না।'

এই সময় পিছনে বনশিউলীর ঝাড়ে শুকনো পাতায় ও ডালের ঝাপটায় কাদের দ্রুত আগমনের শব্দ বেজে উঠেছিল।

(ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

সোসাইটি অব ওয়ার্কিং আর্টিস্টস-এর
পীসভানুন্দ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাদের
মে বার্ষিক যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন
ন। প্রদর্শনীতে আটজন শিল্পীর
টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। গত কয়েক
রের মধ্যেই এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ
াম অর্জন করেছেন—তার কারণ, এঁদের
সকলেই অবসর সময়ে নিষ্ঠাসহকারে
মিতভাবেই কাজ করে থাকেন।
র্শনীটির অধিকাংশ নিদর্শনেই প্রগতি-
দর পরিচয় পাওয়া যায়, ড্রয়িং-এ নতুন
তাধারার অভাস মেলে। সুবল পালের
ূর্ত কমপোজিশন (পেণ্টি-২) অনেকেরই
খে পড়ে। কঙ্কলজাতীয় হাল্পার চিত্র-
দার নিদর্শনগুলি পরীক্ষামূলক, ১নং মন্দ
গেনি। সলিল ভট্টাচার্যের সর্মবিমূর্ত
নাগুলি প্রতীকমূলক ও সমকালীন-
ক্ষরীতিতে তিনি একটি বৈশিষ্ট্য বজায়
খে চলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে রেখাজালে
ড়ণ্ট হলেও দু-একটি চোখে পড়ে, যেমন
নস্ট দি গ্রে কার্টেন ৪। সুকুমার দাস
র রচনায় গ্রাফিক জাতীয় বিশেষত্ব বজায়
খেছেন। এই প্রসঙ্গে নিসর্গ দৃশ্যশ্রেণীর
মপোজিশন ৪৯-এর নাম করা চলে। মানব
দুয়ার কাজে কারুকার্যের প্রাধান্য দেখা
র। যেমন সেলফ স্লাটার। সুকৌশল
ব্যবহারের দিক থেকে ফেস্টিভ লাইট
নেকের ভাল লাগে। অযথা বিস্তারিত-
বে হলুদ রঙ না ব্যবহার করলে কমলা
ায়ের রিল্যাকসেশন রসোত্তীর্ণ হত। তবে
মপোজিশন হিসাবে ডন সকলের চোখে
ড়ে। অরুণ মুখার্জীর রঙীন ড্রয়িং
দর্শনগুলিতে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের
রিচয় পাওয়া যায়, বিশেষত নীল রঙের
য়েকটি টানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ছোট
ট মূর্তির অবতারণা অনেকের দৃষ্টি
াকর্ষণ করে (৪নং)। ড্রয়িং-এ যে তাঁরুর
ার কাপড়ে সিদ্ধহস্ত তা তাঁর নিদর্শনগুলি
খেই বোঝা যায়। পরিকল্পনায় শিল্পী
হস ও চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন—৩,
ও ৬নং উল্লেখ্য। অনিমেষ সেনগুপ্তের
য়িং নিদর্শনের মধ্যে কয়েকটি ঠিক স্পষ্ট
য় ওঠেনি। তবে নারীদেহের নিম্নভাগ
বলম্বনে আঁকা ভাস্কর্যধর্মী নিদর্শনটি
নেকের চোখে পড়ে (৩৩)।

*

কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে যে, সব বিভাগেই যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল কলেজে অনুষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনীতে। মনে রাখতে হবে যে এটি ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী, সুতরাং সেই হিসাবেই এটিকে বিচার করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে অধিকাংশ স্থলেই শিক্ষার্থীগণ আপন আপন চিন্তাধারা ও পছন্দমত রীতিতে কাজ করেছেন। তবে কোন বিভাগেই নিজস্ব পরীক্ষামূলক কোন নিদর্শন চোখে পড়েনি। ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং, মিউরাল ও ভাস্কর্য বিভাগে আশানুরূপ কোন নিদর্শন দেখা যায়নি। জলরঙ, গ্রাফিক ও স্কেচ বিভাগে প্রশংসনীয় কয়েকটি নিদর্শন চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে চাপা রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত গৌতম ভৌমিকের নিসর্গ দৃশ্য (ওয়াটার কালার), সুকৌশল নীল রঙ বিস্তারের জন্য শৈবাল ঘোষের অ্যাটমসফিয়ার ইন গোল্ড, ও বিশেষ করে মানব দেব-এর জাল রং-এর নাম করা যায়। প্রদর্শনীতে গ্রাফিকের উল্লেখ্য কয়েকটি নিদর্শন চোখে পড়ে—যেমন রেবন্ত গোস্বামীর ক্যাভালরি—এটির ড্রয়িং ও গতিশীলতা লক্ষণীয়। লিথোগ্রাফ নমুনা হিসবে সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শূন্য পার্ক ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য কল্যাণ তলাপাত্রের রুইনস অব চিতোর-এর নাম করা চলে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সুজিত দত্ত ও মধুমিতা ব্যানার্জীর স্কেচ উল্লেখ্য। ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং বিভাগে বিশেষ আকর্ষণীয়

সার্নবিম —সলিল ভট্টাচার্য

কোনও ছবি চোখে পড়েনি। তবে ড্রয়িং ও নিছক সরলতার জন্য ধর্ম পালের মহালক্ষ্মী অনেকের নজরে পড়ে। মনোজ মিত্র তাঁর স্কেচজাতীয় রচনা টি স্টল-এ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। স্টিল লাইফ নমুনা হিসাবে ধর্ম পালের নেচার স্টাডি ও নীতা চৌধুরীর ফ্লাওয়ার স্টাডি মন্দ লাগেনি।

দি লাস্ট লাইট —বুদ্ধদেব দত্তরায়

ড্রয়িং ও পেন্টিং বিভাগে কয়েকটি প্রশংসনীয় রচনা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে দীপালি ভট্টাচার্যের পার্বত্যপথ প্রধান মোশনলেস, সুন্দর আলোছায়া বিন্যাসের জন্য বুদ্ধদেব দত্তরায়ের দি লাস্ট লাইট, সুস্মিত রায়ের প্রতীকমূলক লাল রংপ্রধান গোল্ড রাশ ও সাররিয়ালিস্টক কমপোজিশন সি থ্রু মাই লাভস আইজ, স্বচ্ছ রঙ ব্যবহারের জন্য অজয় দাসের মিরর, অলোক ভৌমিকের নীল রঙের স্তরভেদ প্রধান রীতিমধুর হুইসপার ও সুসীম দাসের লাইফ স্টাডি (ন্যুড) ও খলিজরে (প্রতিকৃতি) নাম করা যায়। মিউর‍্যাল বা প্রাচীরচিত্র বিভাগে দেশীয়

পুতুল অবলম্বনে রচিত বাণী দাসগুপ্তের মোজেইক অনেকের ভাল লাগে। মিশরীয় প্রভাব থাকলেও কমপোজিশন হিসাবে স্নিগ্ধা ঘোষের নিদর্শনও দু-একজনের চোখে পড়ে। মডেলিং ও ভাস্কর্য বিভাগে প্রথমেই রমেশ সিংহের ক্রিশ্চিয়ান গার্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমূর্ত আকার ও নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্যদান লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে অপূর্ব সাহার মাই পেন্ট-ও উল্লেখ্য। নেগেটিভ ফর্মের মধ্য দিয়ে একটি কুকুরের প্রতীকমূলক আকারের সরলীকরণ করে শিল্পী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কমার্সিয়াল বিভাগে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে রেকর্ড কভার, ক্যালেন্ডার, ফোল্ডার, জ্যাকেট, প্রাচীরপত্র, প্যাকেজিং-এর নানা সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। পরিকল্পনা ও সজ্জাপদ্ধতির দিক থেকে বিচার করলে অনেকেই প্রশংসা দাবী করতে পারেন। প্রাচীর-পত্র রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সরোজ গুহরায় (ট্যুরিস্ট ব্যুরো), নীরেন সাহা (কঙ্কালসার বালক WHO)-র নাম উল্লেখ্য। প্রেস বিজ্ঞাপনের মধ্যে পরিকল্পনার দিক থেকে (বিভিন্ন দেশের নামাঙ্কিত কার্ড মুখে নিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে) শৈবাল ঘোষের নিদর্শন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে হরেন মল্লিকের প্রেস বিজ্ঞাপনও (মোটর অন হুইলস) দ্রষ্টব্য। শো-কার্ড ও প্যাকেজিং-এ যাঁরা প্রশংসা দাবী করেন তাঁদের মধ্যে নির্মল বর্মণের (কয়েকটি বৃত্তের ওপর সুপারইমপোজ করা নৃত্যরত মূর্তি) নাম করা যায়। প্রদর্শনীতে বাটিক, চামড়া ও কাঠ খোদাইয়েরও বহু নিদর্শন দেখা যায়। বাটিক কমপোজিশনের মধ্যে জহর সাহার বিমূর্ত নিদর্শন ও সান্ত্বনা দাসের বুদ্ধ অনেকের চোখে পড়ে। কাঠ খোদাই নিদর্শনগুলির মধ্যে খোদাই করা ট্রে, ফুলদানী, পাত্র ও ধনঞ্জয় অধিকারীর মাছ উল্লেখ্য।

শিল্পী মুকুল প্রসাদ আকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। মুকুল প্রসাদ ছয় বছর আগে কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি মালদহে প্রথম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন ও পরে বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতেও যোগদান করেন। এই শিল্পী প্রধানত প্রতিকৃতি ও মুখমণ্ডলের স্টাডির মধ্য দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিকৃতি বা মুখমণ্ডল ঈষৎ বিকৃত করেছেন, তবে দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলেই রসসৃষ্টি করতে পারেননি। তা সত্বেও স্কেচ জাতীয় দু-একটি নিদর্শন মন্দ লাগেনি—যেমন স্টোজাম। বুরুশের কয়েকটি বলিষ্ঠ টানের মধ্য দিয়ে স্কেচটির মধ্যে [illegible]চিত ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর রঙের স্তরভেদের মাধ্যমে দুই এক ক্ষেত্রে তিনি বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন, যেমন ডার্ক লেডি-তে। অন্যান্য ছবির মধ্যে স্কেচ-এর নাম করা যায়।

ওড়িশার কুটীর ও হস্তশিল্প সামগ্রী যে কত সুন্দর ও বিচিত্র তার প্রমাণ পাওয়া গেল অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ডের ডিজাইন সেন্টার ও ওড়িশা কো-অপারেটিভ হ্যান্ডিক্রাফটস অর্গানিজেশনের যৌথ উদ্যোগে ডিজাইন সেন্টারে আয়োজিত এক বিরাট প্রদর্শনীতে। [illegible]কই, প্রাচীন পটচিত্র থেকে শুরু করে রূপা ও মহিষের শিং, হ্যান্ডব্যাগ, বটুয়া, কুশন, অ্যাপ্লিক, রঙীন ছাতা ও তরাসা, চাঁদোয়ার নানা নিদর্শন একত্রে দেখে অনেকেই অভিভূত হন। প্রদর্শনীতে যে সমস্ত বিভিন্ন হস্তশিল্প-নমুনা দেখা যায় তাদের মধ্যে আলঙ্কারিক পাড় ও আঁচল সংযুক্ত তাঁতের ও তসরের শাড়ি, স্কার্ফ, কাঠ ও পাথর খোদাইয়ের ছোট-বড় নানা মূর্তি, চিত্রাঙ্কিত তালপাতার পুঁথি, সারপেনটিনা পাথরের তৈরী ব্যবহার্য পাত্রাদি, ঢোকরার ছোট বড় নানা মূর্তি, কাঠ ও কাগজমণ্ডের মুখোশ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে, নানা রঙের রঙীন সুতায় ঘেরা বড় বড় দীপাধার ও লোনলী ঘাসের তৈরী নানা বস্তু সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ নিদর্শনই গৃহশোভার উপযোগী—সুতরাং এ জাতীয় প্রদর্শনীর যত বেশী অনুষ্ঠান হয় তত দেশের জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গল।

চিত্রপ্রিয়

জুতো

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জুতোটা কিনতে অনেক কসরত করতে হল। জুতো কেনা আর চুল কাটা প্রায় একই ব্যাপার। অনেক পাঁয়তাড়া কষে তবেই চুল কাটা যায়, তবেই জুতো কেনা যায়। প্রথমত পুরোনো জুতোর একটা আলাদা সোহাগ আছে, পুরোনো স্ত্রীর মতই। সেই সোহাগ ছেড়ে নতুন জুতোর সহজে পা গলাতে ইচ্ছে করে না। টাকাটা অনেক দিন ধরেই পকেটে ঘুরছিল। রোজই ঘুরে ঘুরে বাড়ি ফিরে আসছিল। আর প্রতিদিনই সেই টাকা থেকে একটা দুটো খরচ হয়ে যাচ্ছিল। শেষে প্রায় মরিয়া হয়ে এক সন্ধ্যায় জুতো-জোড়া কিনেই ফেললুম। শো-উইন্ডোর কাচে নাক ঠেকিয়ে প্রথমে সবরকমের জুতো যতটা সম্ভব সময় নিয়ে পরিদর্শন করে ফেললুম। উইন্ডোর কাচটা এমন পরিস্কার যে কাচ আছে কি নেই বুঝতে না পেরে মাথাটা কাছে আনতে গিয়ে নাকটা ধাঁই করে কাচে ঠুকে গেল। চোখ দিয়ে একটু জলও বেরুলো। আশেপাশে লোক ছিল। পাছে তাঁরা ভাবেন—লোকটা গেঁয়ো ভূত, তাই নাকটা কাচেই ঠেকিয়ে রাখলাম—যেন কাচে নাক ঠেকিয়ে জুতো দেখাই আমার অনেক দিনের অভ্যাস। জুতোর পাশে যেসব টিকিট খাড়া করে রাখা ছিল তাতে দামের বহর দেখে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করল। কাচ থেকে নাকটা তুলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলুম। পাশ দিয়ে একজন সুন্দর চেহারার মহিলা যাচ্ছিলেন। মহিলাদের দেখলেই আমার কী রকম আপনার লোক বলে মনে হয়। ভাবলাম মহিলাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করি—এত দাম দিয়ে আমার একজোড়া জুতো কেনা উচিত হবে কি না? আসলে আমি তখন আমার এই কেনার ব্যাপারে একটা জোরালো নৈতিক সমর্থন খুঁজছিলুম। ভদ্রমহিলাকে পায়ের জুতোটা দেখিয়ে বলতুম—এই অবস্থা! উপরের সাজটাই আছে তলাটা নেই বললেই চলে। পায়ের তলাটাই জুতোর তলার কাজ করে। মসৃণ পিচের রাস্তায় নো-প্রবলেম, কেবল খোয়া-ওঠা রাস্তায়, পিচ-গলা রাস্তায় কিম্বা বর্ষার রাস্তায় বড় কষ্ট দেয়। এখন বলুন—আমার এই সংকটজনক অবস্থায় একটা জুতো কেনা উচিত নয় কী? ভাবতে ভাবতেই ভদ্রমহিলা অনেক দূরে চলে গেলেন। মহিলাদের সামান্য একটু উসকানিতে কী না করা যায়। লেডি ম্যাকবেথের কথায় এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল, যার ধাক্কায় আজও পর্যন্ত কলেজে কলেজে ছেলেদের প্রাণ যায়। সামান্য এক জোড়া জুতো কেনা তো কিছুই নয়। ভদ্রমহিলার শরীরের শেষ দৃশ্যমান অংশটুকু চোখের বাইরে চলে যাবার পর আবিষ্কার করলুম—সাহসের অভাব ঘটেছে। চাঙ্গা হবার জন্যে কাছাকাছি একটা দোকানে গিয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসলুম। সত্যি, চায়ের কী গুণ! চা খেতে খেতেই মনের কোণে একটা মরিয়া ভাব চিনচিন করে উঠল। যা থাকে বরাতে, জুতো আজ আমি কিনবই।

সকলেরই পায়ের একটা সোজা মাপ থাকে। আমার সবই উলটো। পাঁচ নম্বর পায়ে ঢোকে না, আবার ছ' নম্বর হুপ্ হুপ্ করে খুলে যায়। দোকানের বিক্রেতা এক নজরে আমার পা-টা দেখে নিয়েই বললেন—পাঁচই আপনার সাইজ। কথাটা বলেই এক টিপ নস্যি নিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই বেয়ে টঙে উঠে গেলেন। সেখানে পরপর জুতোর

বাক্স ভাই করা। এক বার বাক্সের উপর দিয়ে হাতের একটা আঙুল সড়াক করে উপর থেকে নীচে নামিয়ে এনে একটা বাক্স অদ্ভুত কায়দায় টেনে বের করে নেমে এলেন।

ভদ্রলোকের মইয়ের উপর ওঠা আর নামাটা যেমন গ্রেসফুল, তেমনি জুতোর বাক্সটাকে খুলে জুতো দুটোকে তলায় তলায় ঠাস্ ঠাস্ করে ঠুকে আলতোভাবে হাতের উপর ডিগবাজি খাইয়ে হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গীটিও চমৎকার। শুধু এইটুকু খেলা দেখাবার জন্যেই আমি কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। ভদ্রলোক আমার ডান পাটাকে জুতো পরাবার বাক্সের উপর টেনে নিয়ে, জুতোটা আঙুলের উপর লাগালেন। আমার নিজের চেষ্টায় পা ঢুকলো না। ভদ্রলোক একটু ধমকে দিলেন—দূর মশাই ঘোড়া দেখলে দেখি খোঁড়া হন। আয়েস করে পা ঢোকালে ঢোকে? একটু উঠে ঢোকাবার চেষ্টা করতে হয়। ভদ্রলোকের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উঠে একটু বেশী চাপ দিতেই, জুতোর গোড়ালিটা একটু দোমড়ালো মাত্র, আমার অবাধ্য পা কিন্তু সেই জুতো আর জুতোর মধ্যকার শূন্যতার মাঝখানে বিদ্রোহীর মত রয়ে গেল। পাছে গোড়ালি মচকে জুতো ড্যামেজ হয়ে যায় সেই ভয়ে ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে উঠলেন—আহা, করেন কি, করেন কি! সব কিছুই সইয়ে সইয়ে ঢোকাতে হয়। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জুতো পরাবার জিভ কোথা থেকে একটা যোগাড় করে নিয়ে এলেন। জিভটাকে পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে ভীষণ একটা কাণ্ড করলেন। পায়ে সুড়সুড়ি লাগছিল বলে আমি মাঝে মাঝে কুঁচকে যাচ্ছিলাম। তাতে ভদ্রলোক বিরক্ত হচ্ছিলেন—মেয়ে-ছেলেকেও হার মানালেন। অবশেষে দুজনের প্রাণপণ চেষ্টায় পা ঢুকল।

—নিন, এবার হেঁটে দেখুন—

দোকানের চালাও দড়ির পাশাপাশে ল্যাং-চাতে ল্যাংচাতে দু-কদম হেঁটে ফিরে এলুম নিজের আসনে, যেখান থেকে স্টার্ট করে-ছিলুম সেইখানেই। খাটো একটা জুতো পরাবার একদিক উঁচু একদিক গড়ানে টুলের উপর বসে হাসি-হাসি মুখে ভদ্রলোক আমাকে বিজয়ীর সম্মানে রিসিভ করলেন—

—কী বলেছিলুম কি না! পাঁচই আপনার সাইজ?

—কিন্তু ভীষণ যে লাগছে। মাথার বাথার মত লাগছে।

—সব মনের ভুল মশাই। ও-রকম মনে হয়। বাঙালী তো মরেই আছে, তাহলে লাগে কী করে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—আমি বোধহয় বেঁচে আছি তাই এত লাগছে। পায়ে পক্ষাঘাত না হলে এ জুতো পায়ে রাখে কার বাপের সাধ্য! এ জুতো পা থেকে খুলবে তো না, কেটে বের করতে হবে!

ওয়াক এ মাইলের মহড়া চলল—

ভদ্রলোক আমার ভয় দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। শেষে পকেট থেকে নস্যি বের করে এক টিপ নিয়ে আমায় বললেন—নেবেন?

—নস্যি আমি নিই না।

—একেবারে এলেবেলে আপনি। শুনুন, প্রথম প্রথম সব নতুন জিনিসই একটু লাগে, পরে ঠিক হয়ে যায়। জুতো কী মশাই গোলাপের পাপড়ি, না ঘাসে ঢাকা জমি, না পারসী কার্পেট! গরুর চামড়ায় পেরেক সেঁটে পাদুকা হয়। আপনার মত আউ-পাতালে লোকের তুলোর বা পশমের জুতো পরা উচিত।

আমি ভদ্রলোককে একটু শান্ত করে বলি—আহা, রাগছেন কেন? সবই জানি, কিন্তু জুতোটা তো সাইজ মত হওয়া চাই?

—সাইজ? ভদ্রলোক যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। —বেসাইজের লোক আপনি, সাইজ খুঁজছেন। কটা লোকের পায়ে মশাই জুতো ফিট করে! জুতোতেই পা ফিট করাতে হয়। ২৪ বছর ধরে জুতো বেচছি—আমাকে ফিটিং শেখাবেন না। আমার কাছে শুনে রাখুন, পরে কাজে লাগবে—জুতোতে পা ফিট করাতে হয়, চশমায় চোখ, স্ত্রীতে স্বামী।

কথা বলতে বলতেই জুতো প্যাক হয়ে গেল। জুতোটাকে অদ্ভুত কায়দায় যে-ভদ্রলোক বিল করছিলেন, তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—বিল করুন!

আমার খুঁতখুঁতুনি তখনও গেল না—জুতোটা ঠিক ফিট করল না, ঠিক ফিট করল না।

ভদ্রলোক এবার বেশ রেগেই বললেন—আবার সেই ফিট ফিট করছেন? শুনলেন না? জুতো কারুর ফিট করে না। জীবনে খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোকেরা কখনও সুখী হয় না। যা পাবেন তাই পরবেন, যা পাবে. তাই খাবেন।

জুতোর বাক্স বগলদাবা করে বেরিয়ে এলুম। বাপ্স, কি পাল্লায় পড়েছিলুম। নতুন জুতো পরেই তো আর রাস্তায় বেরোনো যায় না। জুতো পায়ে ব্রেক করতে হয়। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জুতো জোড় বের করে পায়ে ঢোকাতে গিয়েই ছিমসিম। জুতো-পরার চামচে ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল শীতকালে ঠোঁটে লাগাবার জন্য এক টিন পেট্রোলিয়াম জেলী ছিল তাকে তোলা। খানিকটা জেলী গোড়ালিতে লাগিয়ে একটু চাপ দিতেই পা ঢুকে গেল। পাঞ্জায় আর আঙুলে ভীষণ চাপ লাগল। পায়ের পাঁচটা আঙুল একটা আর একটার ঘাড়ে উঠে, এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে জুতোর সামনের দিকটায় একটা অসম্বাধের সৃষ্টি করল। কিন্তু জুতোটা যে বেশ ছোটখাটো মাপসই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমে দাঁড়াতে একটু অসুবিধে হল। পায়ের প্রধান শিরার ওপর চাপ পড়ে পা টনটন করছিল। শুনেছি ব্যথা বেদনার উপলব্ধি মনেই হয় মানুষ ব্যাপার। কত লোক তো অবলীলাক্রমে কাচের উপর আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। চড়কগাছে চোপে পিছনে লোহার হুক গেঁথে বনবন করে ঘোরে। মহাত্মা ভীষ্ম তো শরশয্যায় শুয়ে শেষ কটা দিন কাটিয়ে গেলেন। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে পেরেক বেঁধা হয়ে কেবল হাসি-হাসি মুখে কয়েক দিন কাটিয়ে দিলেন, আর আমি সামান্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব না...

স্বামীজী বলেছেন... যথার জায়গা থেকে মনটাকে তুলে নেবার কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারলে দৈহিক যন্ত্রণার কোন উপ-লব্ধিই থাকবে না। শোবার ঘরের মেঝেতে এক-পা হাঁটি আর সেই কৌশলটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করি। কতক্ষণ পায়চারি করে-ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ দেখি নিচের ফ্ল্যাটের ছেলেটি উপরে উঠে এসেছে—বাবা বলে পাঠালেন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা হল আমরা নিচে কেউ চোখ বুজোতে পারছি না, আপনি তো আগে কখন এমনভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা জুতো পায়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতেন না।

—তাই নাকি? তবে জেনে রাখ, যতক্ষণ না এক মাইল হাঁটা শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ আমাকে হাঁটতেই হবে। তুমি জান না—আফটার সাপার ওয়াক এ মাইল।

ছেলেটিকে বিদেয় করে—ওয়াক এ মাইলের মহড়া চলল। না দেখলেও অনুমানে বুঝলাম আমার ঘরের নিচে একটি পরিবার কেমন আতঙ্কে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা বাজল ঢং করে, পাপোশের উপর জুতো জোড়া খুলে রেখে, বিছানায় পা তুলে বসলাম। হাতে বার্নলের টিউব। ক্ষতবিক্ষত পায়ের চিকিৎসায় মিনিট পনের কাটল।

আমার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দফতর অফিসে প্রথমেই যাঁর নজরে পড়ল, তিনি হলেন বড়-

বাবু। বড়বাবু ইদানীং আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও একটু মাথা ঘামাচ্ছেন। দুর্জনে বলে—বড়বাবুর নাকি একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। লম্বা চওড়া। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। ডাকসাইটে মেয়ে। বড়বাবু বললেন—নতুন জুতো পরলে প্রথম প্রথম একটু আধটু ফোসকাটোসকা হবেই বাবা। এ কি সাহেববাড়ির জুতো! আমাদের যৌবনকালে সব পরতুম। পায়ে জুতো আছে কি নেই বোঝাই যেতো না। হাঁটলে একটা মোলায়েম মচমচ আওয়াজ হত। সেই শব্দটার অনুসরণ করে মাইলের পর মাইল চলা যেত। জুতোটা কি তোমার একটু টাইট হয়েছে?

—একটু বোধ হয় হয়েছে। আমার পায়ে জুতো ঠিক লাগে না। সাইজের গোলমাল আছে। পাঁচ আর ছয়ের মাঝখানে—

—ওই তো মুশকিল বাবা। সেই মধ্যবিত্তের সমস্যা। মাঝামাঝি থাকার বিপদ।

বড়বাবু একটা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। পায়ের মাপ আর জুতোর মাপের গোলমালের ফাঁকে মধ্যবিত্তের উপমা ঢুকিয়ে বেশ একটা ইনটেলেকচুয়েল ঘুঘু ঢুকিয়েছেন ভেবে কেমন একটা গদগদ ভাব মুখের চেহারায় ফুটে উঠল।

বড়বাবুর পাশে বসেন টাইপিস্ট কালীবাবু। একমাথা পাকা চুল। ঠোঁটের উপর ঝাঁটা গোঁফ। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন। মেয়েদের দিকে মিটিমিটি চান। কিছু টাইপ করতে দিলেই মহা বিরক্ত। গল্প করতে পারলে মহা খুশি। কালীবাবু বললেন—জুতো সব সময় বড় কিনবে। বড় জুতো ছোট করা যায় সুকতলা কতলা দিয়ে। কিন্তু ছোট জুতোকে বড় করা, বুঝলে কি না, ভেরি ডিফিকাল্ট।

বড়বাবু বললেন—জুতো বড়ও ভাল না, ছোটও ভাল না। ঠিক ঠিক মাপের হতে হবে। তুমি জুতোর কি বোঝ কালী। সারা জীবন তো টায়ারের চটি পায়ে দিয়েই কাটালে।

—টায়ারের চটি পায়ে দেয়া শুরু করেছি, মেয়ের বিয়ের পর, তার আগে আপনি আমার পায়ে গ্রিসিয়ান দেখেননি?

—তুমি জুতোর কথা আমাকে বলতে এস না। এখনও রবিবার আমার বাড়িতে গেলে দেখবে, দুপুর বেলা ঘুমটুম ছেড়ে আমি বসে আছি, চারদিকে ছড়ানো কমসেকম পনের জোড়া জুতো। এক-একটার এক-এক রকম ধাত।

—জুতো আপনিও আমাকে দেখাবেন না। আমার বাবা ছিলেন জি পি ও-র বড়বাবু। কমসে কম ষাট জোড়া জুতো ছিল বাড়িতে। বাবার তো কথায় কথায় জুতো—এক-একটার এক-এক রকম স্বাদ।

বড়বাবু ফাইলের মধ্যে থেকে ঠাসা দু পাতার একটা ড্রাফট বের করে কালীবাবুকে ধরিয়ে দিলেন। দুটোর মধ্যে চাই। বড়বাবুর সঙ্গে তর্ক করার শাস্তি। কালীবাবু বেজার

পোয়াটাক দই কিনে জুতোটাকে খাওয়াও।

মুখে বাক্স পেটাতে বসলেন।

—তুমি এক কাজ কর, অরিন্দম বড়বাবু একটা রাস্তা বাতলালেন—পোয়াটাক দই কিনে জুতোটাকে খাওয়াও।

আমি বোকার মত প্রশ্ন করলুম কীভাবে ঘোল করে?

—আরে না না। একটা নাকড়া দিয়ে থ্যাপ থ্যাপ করে জুতো দুটোর আষ্টেপৃষ্ঠে মাখিয়ে ফেলে রাখবে একদিন, দেখবে নরম তুলতুলে হয়ে গেছে।

—আরে না না, দই মাখিয়ে কী হবে? কালীবাবু টাইপ করতে করতেই বললেন। বড়বাবু একবার কটমট করে তাকালেন। কেন কাজ হল না। কালীবাবু তখন মরিয়া। টাইপের হাত থেকে যখন নিষ্কৃতি পেলেন না, তখন বড়বাবুকে খাতির করার কী মানে। কালীবাবু বললেন—দইটা ঘোল করে খেও। জুতোটাকে জলে ভিজিয়ে লাশে চাপিয়ে রাখ একদিন। দেখবে ঠিক হয়ে গেছে।

—লাশে মানে? বেশ অবাক হলুম। লাশ মানে তো মৃতদেহ। শেষে কি জুতোর জন্যে শব সাধনা করতে হবে?

—অরে দূর। বড়বাবু ঠোঁট উল্টে কালীবাবুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেন। কিছু জানে না। লাশ নয়, লাশ নয়। আসল শব্দটা হল লাস্ট—শু লাস্ট। জুতোর দোকানে দেখনি, সারি সারি ঝোলে—কাঠের তৈরি পায়ের পাতার মত দেখতে। আচ্ছা তোমার অত হাঙ্গামার দরকার কী? তুমি জুতো জোড় আমার বাড়িতে পৌঁছে দিও। মালু এইসব ব্যাপারে এক্সপার্ট।

মালু হল বড়বাবুর সেই ম্যাগনাম মেয়ে, ভাল নাম মল্লিকা। রাতে বাড়ি ফিরতেই, নিচের ফ্ল্যাটের প্রতাপবাবু সিঁড়ির মুখে হাত জোড় করে বললেন—আমার স্ত্রীর বড় অসুখ। আজ আর দয়া করে ওয়াক-এ-মাইল করবেন না। এই নিন, আমি একটা হজমের জন্যে এনজাইম কিনে এনেছি। একটা ক্যাপসুলেই একশো মাইল হাঁটার এফেক্ট পাবেন।

ওষুধের ফাইলটা হাতে নিয়ে উপরে উঠে এলুম। পায়ের যা অবস্থা, জুতো আজ আর পায়ে উঠবে না। পাপোশের উপর জুতো দুপাটি নির্দোষের মত বসে আছে। চকচকে শরীরে মিহি ধুলো জমেছে। একটা ব্রাশ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে জুতো যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিলুম।

তিন চার দিন পরে পাটা একটু সুস্থ হতেই, আহাম্মকের মত একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেললুম। সকালে চানটান করে খাওয়া-দাওয়ার পর, কি খেয়াল হল, নতুন জুতোর একবার পা গলাবার ইচ্ছে হল। জুতো দুপাটি সহজেই পায়ে উঠে এল। আশ্চর্য! এ কি তাহলে সকলের জুতো? বিকেলে পা গলাতে ঝটাফাটি, সকালে সোজি। জুতোর মুখে হাওয়ার শীতের কামড় লেগেছে। নতুন জুতো পায়েই সাহস করে অফিসে চলে এলুম। সাহস করে রাস্তায় পরে না বেরোলে আর কবে বেরোবো। পয়সা খরচ করে কেনা, পরার জন্যেই তো। অত পয়সা নেই যে কথায় কথায় জুতো কিনবো।

বাড়ি থেকে বাস স্ট্যান্ড অবধি রিকশায় আসি। সেখান থেকে বাস। অফিস পাড়ায় বাস থেকে নেমে খানিকটা হাঁটতে হয়। বাসে উঠার সময় এক ভদ্রলোক জুতোটা মাড়িয়ে দিলেন। বিশ্রী একটা দাগ হয়ে গেল। ভদ্রলোক এর চেয়ে যদি আমার মুখে এক ঘা জুতো লাগাতেন, কিছু বলার ছিল না। বাসে বসে, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলাম। ঘনঘন মুখ মুছছি। মুছতে মুছতে এক ফাঁকে নিচু হয়ে ঝট করে জুতোর ডগাটাও মুছে নিলুম। এমন কায়দায় মুছলুম, আশেপাশে কেউ বুঝতেই পারল না। মুখ মোছা আর জুতো মোছা এমন কায়দায় মিলিয়ে দিলুম, ধরার উপায় নেই। বাস থেকে নেমে অফিস, পৌনে এক মাইলের মত দূরত্ব। প্রথমে একটু কষ্ট লাগছিল। মনের জোরে সে কষ্ট কাটিয়ে উঠলুম।

লিফ্‌ট থেকে নেমে অফিসের করিডরে যখন হাঁটছি জুতো থেকে মৃদু মচমচ আওয়াজ উঠছে, আর সেকি অসাধারণ জুতোর জেল্লা। অফিসের চেয়ারে বসে যখন কাজ করি, জুতো খুলেই রাখি, পাটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। পায়ের তলায় পাদানির উপর পা দুটোকে টান করে পাশাপাশি ফেলে রাখি। চারটে সাড়ে-চারটে নাগাদ মহা বিপদে পড়লুম। জুতোর মধ্যে কিছুতেই আর পা ঢুকতে চায় না। বড়বাবুর ঘন ঘন তলব, অথচ কিছুতেই পায়ে ঢোকে না। শেষে খালি পায়েই দৌড়ে গেলুম। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ধুতির কোঁচা

পা ফোলা কমে যাবে। পা দুটো দেখছি কেমন আমসত্ত্বর মত পাতলা পাতলা হয়ে গেছে।

—কিন্তু এখন কি হবে? অফিসে থাকতে বাড়ি যেতে হবে।

—তা কেন? তুমি এক কাজ কর। বড় কর্তা চলে গেছেন, তুমি ওই ঘরে চলে যাও। ঘরে একটা ডেক চেয়ার আছে সেইটায় শুয়ে পড়ে পা দুটো উঁচু করে জানালার উপর তুলে দাও। ঘণ্টাখানেক ওইভাবে থাকলে পা ফুলসে যাবে।

বড়কর্তার কামরা গঙ্গার দিকে। ডেক চেয়ারটা একটা পার্টিশানের আড়ালে গঙ্গা-মুখো ঘোরানো। বড়কর্তা প্রকৃতি প্রেমিক। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে মুখে পাইপ দিয়ে এই চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গঙ্গা, জাহাজ, উন্মুক্ত আকাশ ইত্যাদি দেখে থাকেন।

পা দুটো উঁচু করে জানালার উপর তুলে দিয়ে আরাম করে আরাম-কেদারায় বসলুম। সূর্য তখন অস্ত যেতে বসেছে। আকাশে তখন শুকনো চাষের ক্ষেতের মত কোদালে মেঘ জমেছে। সূর্যের আলো পড়ে সোনার মত দেখাচ্ছে। ফুরফুরে হাওয়া আসছে। এত ভাল লাগছে। মনে হল একটা কবিতা লিখে ফেলি—মালু, তুমি আমার গোল আলু, সব সময় তুমি যেন আলুথালু। কবিতা বেশী দূর এগোলো না, এর পর কী যে হল বলতে পারব না। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই সর্বনেশে ঘুম। যে ঘুমের জন্যে মাসের মধ্যে অন্তত দশ দিন আমি বাড়ির স্টপেজে, কি অফিসের স্টপেজে নামতে পারি না। টার্মিনাসে বাস লেগে যায়, আমি তখন হাঁ করে ঘাড় কাত করে ঘুমোই। যে ঘুমের জন্য আমি যশিডি স্টেশনে নামতে গিয়ে পাটনা চলে গিয়েছিলুম, আবার পাটনা থেকে ফিরতি পথে ঘুমোতে ঘুমোতে হাওড়া চলে এসেছিলুম। দুবারই ঘুমের চোটে যশিডি নামা হয়নি। যে ঘুমের জন্য ইদানীং বাসে বা ট্রামে বসার জায়গা পেলেও বসি না। ঘর অন্ধকার। যে আকাশে রোদ ঝলমল করছিল সে আকাশে এখন ঝকঝক করছে এক ঝাঁক তারা। সর্বনাশ! রাত প্রায় সাড়ে আটটা। ঘরের দরজা টেনে দেখি বাইরে থেকে বন্ধ। কেয়ারটেকারের লোক এসে কখন চাবি দিয়ে চলে গেছে। পার্টিশানের পেছনে ছিলুম, দেখেও দেখেনি হয়তো। এখন উপায়। ডাকলেও সাড়া পাব না। এই সব আকাশ ছোঁয়া বাড়ির কে কোন তলায় আছে কে জানে? কেয়ারটেকার আছেন একতলায়। দারোয়ানরা আছে পাশের একটা ছোট ব্লকে। বহু দূরে ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে একজন দুজন পিঁপড়ের মত খুদে খুদে লোক চলেছে।

ভীষণ রাগ হল নিজের উপর। সারা রাত থাক পড়ে এই ঘরে। তারপর চুরির দায়ে ধরা পড়। অনেক ভেবে ঠিক করলুম ঘরের ডিরেক্ট লাইন থেকে কেয়ারটেকারকে ফোন করব। ভয় হল। যদি জিজ্ঞেস করেন কি করতে ঢুকেছিলেন এই ঘরে? তারপর একলা না এসে যদি পুলিস নিয়ে আসেন। তার চেয়ে বড়বাবুকে ফোন করি। ওরে বাবা, একটু কেয়ারটেকারকে বলে দিন, কি অবস্থায় যে পড়ে আছি। আটকে পড়েছি।

অনেকক্ষণ ধরে ফোন বেজে গেল, তার পর নারীকণ্ঠে হ্যালো। কে হতে পারে? বড়বাবুর স্ত্রী অথবা মালু।

কাকে চাই? বড়বাবুকে দিন না। কে আপনি? অরিন্দম। নামটা শুনেই ভদ্রমহিলা শীৎকার দিলেন—ও মা। বুঝলুম—মালু। বড়বাবুর গলা শোনা গেল।

—সে কি হে। তুমি এখন অফিসে? আটকা পড়েছ। মাই গড। পায়ের খবর কি? জুতো ঢুকেছে?

জুতোর কথা বলাতে খেয়াল হল। আশ্চর্য! জুতো কখন কিভাবে পায়ে ঢুকে এসেছে খেয়াল করিনি। ভয় এমন ভয়ে শুনেছি অনেক কিছু, ছোট হয়ে যায়। হাত-পাও যে ছোট হয়ে আসে এই প্রথম দেখলাম।

—আজ্ঞে হাঁ, জুতো পায়ে ঢুকেছে।

—দেখেছ কেমন দাওয়াই দিয়েছি। আমার মেয়ে ফোন ধরেছিল। তোমার গলা চেনে না; কিন্তু তোমার নাম অন্তত হাজার বার শুনেছে আমার মুখে। একদিন এস না। সকাল থেকে থাকবে, খাবে, হইহই করবে, বেড়াবে, মালু ভীষণ বেড়াতে ভালবাসে অথচ সঙ্গী পায় না।

মহা জ্বালায় পড়া গেল তো। একটু রেগে গেই বলতে হল—এখানে তো সারা রাত থাকা যায় না। আপনি কেয়ারটেকারকে একবার ফোন করে বলুন—কেন, কিভাবে আটকে গেছি, তা না হলে সন্দেহ করে পুলিসের হাতেই দিয়ে দেবে। একটু তাড়াতাড়ি করুন রাত প্রায় নটা বাজল।

—আরে সে তুমি ভেবো না। কেয়ার-টেকার আমার দেশের লোক। আরে তুমি তো এক কাণ্ড করেছ হে, এই দেখ মালু শুনে হাসছে, বলছে ঘুম বটে। শুনতে পাচ্ছ না ওর হাসি।

ওঃ কী যন্ত্রণা। আমি একবার হ্যা হ্যা করে হেসে বললুম—শুনেছি, শুনেছি: আমি ছাড়ছি কেয়ারটেকারকে বলুন।

ফোন ছেড়ে, বড় কর্তার ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসে, পোঁ পোঁ করে দুবার ঘুরে নিলুম। সেই নির্জন অফিসঘরে আমি একা। চারিদিক অন্ধকার। এই বড় বাড়ি থেকে অনেকেই লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। হঠাৎ ঘরের বাইরে করিডরে একটা খসখস আওয়াজ শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই সব অশরীরী আত্মাদের কেউ নয়তো। গঙ্গার দিক থেকে একটা হাওয়া এল। টেবিলের উপর ফাইল খড়মড় করে উঠল।

সাড়ে নটা বাজার পর কেয়ারটেকার এলেন। কেয়ারটেকার আমাকে দেখে হেসে বললেন—এই যে, নেই কোনো ... কয়েক কর্তার আমল থেকে বাড়ি রয়েছে, এখানেই লোপাট হয়েছে কত লোক। দুজনকে বাঁচিয়েছি। ...নিচে নেমে দেখলুম একজন ম ... রাস্তা নেমে পেলুম। রাস্তার ওদিকে পাড়া। রাস্তায় একটাও লোক নেই। ... আমাকে কাঁদাচ্ছে। ...একটা ট্রাম পেয়ে গেলুম। একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের পেছনে একটা সিটে জানালার ধারে আরাম করে বসলুম। অনেক রাত হয়ে গেছে। কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার। দরওয়ান, কিভাবে আমাকে দেখছিল—যেন আমি একটা চিড়িয়াখানার জীব।

ট্রামটা বেশ জোরেই চলছিল। ফুর ফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। জুতো দুপাটি খুলে রেখে পা দুটোকে একটু উঁচু করে সামনে ছড়িয়ে ঘরের মত করে বসেছিলুম। ভয়, আবার না ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে চোখ বুজে আসছিল। অথচ জোর করে চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করছিলুম। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা জায়গায় নিজেকে রেখে, পথটুকু পার করে দিলুম। ট্রাম প্রায় গন্তব্যস্থলে এসে গেছে। পা নামাতে গিয়ে একটু শঙ্কিত হলুম। এতক্ষণ পা দুটো সিটের মধ্যখানে শূন্যে ঝুলছিল, হয়ত রসস্থ হয়ে ফুলে উঠেছে, এখন যদি পা না ঢোকে। ভয়ে ভয়ে পা নামালুম। না কোন অসুবিধেই হল না। জুতো দুপাটি পরার পর মনে হল ঈশ্বরের কৃপায় একজোড়া খড়মে পরিণত হয়েছে। খুবই সাত্ত্বিক জিনিস। খড়ম পায়েই উঠে, দাঁড়ালুম। ট্রামে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। দূরে এক কোণে কনডাকটর হিসেব মেলাচ্ছে। রক্তদৈত্যের মত খড়ম পায়ে খটাস খটাস করতে করতে শেষ ট্রাম থেকে নেমে এলুম। কানে এল কনডাকটারের মন্তব্য—আজব কলকাতা। কত রকমের ফ্যাশান যে উঠবে।

অমিতা মল্লিক সংবাদপত্র জগতে সুপরিচিতা। বিভাগীয় লেখায় অর্থাৎ Columnist হিসাবে তাঁর স্থান অগ্রণীদের মধ্যে। স্বনামে column যখন সবাইকে দেওয়া হতো না, সে সময়ে তিনি স্টেটসম্যান (দিল্লী) কাগজে নিজের নামে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি সে কাগজের ছায়াছবি বিভাগে লেখেন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া দৈনিকের তিনি রেডিও ও টেলিভিশন বিভাগে লেখেন। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে রবিবারের রঙ্গীন, সচিত্র অভিনব সন্নিবেশটিতে লেখেন রাজধানী নূতন দিল্লির নানা বিষয় নিয়ে। তছাড়া সাক্ষাৎকার তাঁর বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র। তাঁর কত সাক্ষাৎকার পড়েছি তার সীমা নেই। সাক্ষাৎকারের মানুষগুলিও জীবনের কত শত ক্ষেত্রের তারও ঠিকানা নেই। হিচ্‌কক্ থেকে রোজেনথল, মহেশ যাগী থেকে ভারতীয় বিমানবহরের চেয়ারম্যান প্রতাপ লাল পর্যন্ত সমান দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছেন অমিতার হাতে।

হাস্য কৌতুক, আমোদ মজা, রহস্য, পরিহাস, ঠাট্টার ছলে জরুরী তথ্য পরিবেশন অমিতা মল্লিকের বৈশিষ্ট্য। হিচকেকের সঙ্গে ইনটারভিউর সময় অমিতা তাঁকে বলেছিলেন, "I hope there's nobody under the chair।" হিচকক রহস্য ও অপরাধমূলক ছবির জন্মদাতা। তিনি কম গেলেন না। সমান কৌতুকে বললেন, "I am no small body myself।"

ঠিক ঐভাবেই কৌতুকের ঝোঁক সংবাদপত্রের বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ লেখেন অমিতা। একবার লিখেছিলেন একটি ছোট প্রবন্ধ যাকে middle বলা হয়। ক্যানাডায় এক রন্ধনকের সহযোগী মুখভার করে ক্ষুণ্ন মনে ছিল। অমিতা তো মনে করলেন, তার বুঝি বা পত্নীর সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে। ওমা, জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, ব্যাপার একেবারে অন্য। সহযোগীটি মনের দুঃখ বুঝিয়ে বললেন, আমার পাচক কর্তাটি আমায় ঠিক বোঝেন না।

সাংবাদিকতার সব দিকে অমিতা প্রতিভাশালিনী। বেতার বা টেলিভিশন সব মাধ্যমে সমান দক্ষতা। মানুষের কথা বলতে তাঁর নিপুণতা সবচেয়ে বেশী। দরদ সেখানে কানায় কানায় পূর্ণ। উত্তর মেরুর এস্কিমো, লাদাখের শিখরে জওয়ান অথবা ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সবাই সমান মমতার অংশীভূত। গল্প করতে বসলেও অমিতার উৎসাহ উছলে পড়ে যখন সে নানা দেশের নানা মানুষের সংগে পরিচয় আর তাদের প্রীতির কথা বলতে বসে। দেশ বিদেশে বৈচিত্র্যময় ভ্রমণও তো সে কম করেনি। উত্তর মেরুতে এসকিমোদের সংগে বড়দিন কাটানোর ঘটনা সেদিন বলছিলেন। ক্যানাডার সামরিক বিমান বহরের প্লেনে তাঁর যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাজেই তাঁকে সৌজন্য দেখিয়ে স্কোয়াড্রন লিডার বানাতেও হয়েছিল। এই স্কোয়াড্রন লীডার মল্লিক এসকিমোদের ঘর সংসারে ঘুরে ফিরে তাদের ইগলুতে আপ্যায়িত হয়েছিলেন।

ক্যানাডার এয়ারফোর্স প্রত্যেক বড়দিনে এসকিমোদের উৎসবে আমন্ত্রণ করেন। এসকিমোরা সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে বেঁচে আছেন কারণ তাঁদের দেশে তথাকথিত সভ্য মানুষ বেশী দিন থাকতে পারে না। অমিতা বলছিলেন সীলের তেলের প্রদীপ জেলে ইগলুর ভিতরে বরফের আসনে লোমশ কোন আস্তরণ বিছিয়ে মানুষগুলি আনন্দে দিন কাটায়। এসকিমো কথাটির মানেই Eater [illegible] এসকিমোদের যেন্ত ইণ্ডিয়ানরা এই নাম দিয়েছিল কারণ তারা [illegible] রান্না না [illegible] যে যা [illegible] করত [illegible] মাংস খাওয়ার [illegible] তারা [illegible] বেঁচে থাকতে [illegible] সংগে যাঁরা বড়দিনের [illegible] গিয়েছিলেন তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন প্যাকেট প্যাকেট নুন! বড়দিনের উপহার কি চান আগে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাতে শান্তিপ্রিয়, সরল এসকিমোরা নুনকে শ্রেষ্ঠ উপহার মনে করেছিলেন। মাংস শুকনো করতেও নুন চাই। খ্রীষ্ট মাসের আগের সন্ধ্যার উৎসব। এসকিমোদের জিজ্ঞাসা করা হলো কি খেতে তাঁরা ভালবাসেন। একজন তাঁদের মধ্যে সভ্যতার সংস্পর্শে কিছু খেয়ে দেয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রভাবে এসকিমো অতিথিরা খেতে চাইলেন "আইরিশ স্টু"। বড়দিনের পুডিং নয়, টার্কি নয়, কেক নয়—সাদামাঠা, একেবারে অনাড়ম্বর আইরিশ স্টু! এ যেন ডাক্তার কুক্-এর এসকিমো ভৃত্যের গল্পের মত। তার নাম ছিল এটুকিশুক এটুকিশুক বলেছিল, কোন এসকিমো বাইরের জগতের বিশেষ কিছু জানে না।

অমিতার সাংবাদিক জীবন শুরু হয় বিয়ের পর। তার আগে তিনি ছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্মচারী। তখন নিয়ম ছিল স্বামী-স্ত্রী একই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ

অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কাজ করতে পারবেন না। কাজেই রেডিওর কর্মীকে বিবাহ করে তাঁর নিজের কাজে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। তারপর ইউনাইটেড নেশনস-এ কাজ করেছেন কিছুদিন সাংবাদিকতার আরম্ভে টাইমস অব ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিকে মহিলা ও শিশু বিভাগ পরিচালনা করেন। গৌহাটি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কন্যা তিনি। গৃহস্থালীতেও যথেষ্ট আগ্রহ অমিতার। বিশেষ করে রান্নায়। ভাল রান্না করতে, লোকজনকে যত্ন করে খাওয়াতে ভালবাসেন। শত কাজ সত্ত্বেও আপনি গেলে চা পরিবেশনটি করবেন নিজে হাতে। ভারী সুন্দর করে, নিপুণ গিন্নিটির মত।

অমিতার সাংবাদিক জীবনের সৃষ্টি তাঁর বইখানা "The year of the Vulture" ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লেখা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা কিনেছেন বহু মূল্য দিয়ে। মূল্য দিয়েছেন মানুষের প্রাণ দিয়ে। তাতে নারীর দান কম নয়। অমিতা বইখানার গোড়ায় লিখেছেন একদিন সকালে উঠে কাগজে দেখলেন "women weep for help।" খবরটি ছোট্ট কিন্তু তাতেই তাঁর লেখিকা মন প্রেরণা পেয়েছিল। খবরটির বাকীটুকু weaping women on the banks of the Padma in East Bengal today shouted across the rivers to the Indian villagers, "they have killed our men and they have burnt our homes. They have taken away our daughters and shot our sons, will you not help us? Please come to our help, otherwise what shall we do?"

পূর্ব বাংলায় পদ্মার তীরে নারী কেঁদে চীৎকার করে অপর তীরে গ্রামবাসীদের ডেকে কয় : ওরা আমাদের পুরুষগুলিকে মেরেছে আর আমাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। ওরা আমাদের মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আর ছেলেদের গুলি করেছে। আপনারা কি সাহায্য করবেন না? আমাদের সাহায্য করুন, না হলে আমরা কি করবো?

এই প্রেরণাই বইখানাকে প্রাণবন্ত করেছে। লেখিকা ভেবেছিলেন কেবল দেখবেন আর শুনবেন কিন্তু যা লিখেছেন তা দেখা আর শোনার উপরে নিজের মর্মবেদনা মেশানো চোখের জলের কাহিনী। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের বিভীষিকা স্মৃতি মাত্র হতে পারে, কিন্তু এ স্মৃতি উত্তরকালের মানুষকে সাবধান করে দেবে। সে-কারণে অমিতার বইখানা চিরকালের। প্রত্যেকের পড়ে দেখবার যোগ্য।

একটা জাতির জন্ম শত বেদনা জড়িত কাহিনী। Vulture বা শকুনির বছর ১৯৭১ পিছনে রয়েছে, কিন্তু একটি করে সাক্ষাৎকারের কথা লিখে লেখিকা আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন মানুষের চরম দুঃখের কাহিনী যা হয়তো অনেকটাই অজানা থেকে যাবে। সেই অজানার ভাণ্ডার থেকে আহরণ করা বলেই তাঁর লেখা এত মর্মস্পর্শী। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে বই অনেক লেখা হয়েছে। অমিতার বইখানা মায়ের [illegible]তের দরদ দিয়ে লেখা বলে আমাদের ভাল লেগেছে।

…মতী

একা এবং কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯৭ ॥

জাহাজ ছাড়বে কোচিন থেকে। পংকজকে সংগে করে নিয়ে গিয়ে একদিন আমার পাসজ বুক করে নিয়ে এলাম। পংকজকে সব কথা খুলে বলতেই হয়েছে। একা একা সব কিছুর ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যাতীত হয়ে উঠছিল। অন্তত আলোচনা করার জন্যও তো একজন কারুকে দরকার। রেণু এখন থিয়েটার নিয়ে খুব ব্যস্ত।

পংকজের সংগে কিছুদিন আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর পংকজের সংগে আর দেখাই হতো না। পংকজ ভালো ছাত্র হিসেবে খুব সুনাম করেছে, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ঘুরে বেড়ানোকে সে বাজে সময় নষ্ট বলে মনে করে। আগেকার তুলনায় পংকজ এখন অনেক গম্ভীর। অন্যান্য সংগীদের হারিয়ে আমাকে আবার আমার এক বাল্যবন্ধুর কাছেই ফিরে যেতে হলো।

পংকজ প্রথমে আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই উড়িয়ে দিয়েছিল ছেলেমানুষি বলে। ধমক দিয়ে বলেছিল, বোকার মতন এম-এ-টা কমপ্লিট করলি না কেন? তা হলে কোনো কলেজে লেকচারারের কাজ পেয়ে যেতিস। বিদেশে গিয়ে কি হাতি-ঘোড়া হবে?

কিন্তু আমার কাছে বিদেশ যাত্রা মানে শুধু জীবিকার্জন নয়। আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই রয়েছে আমার মুক্তির পথ। এই বদ্ধ গণ্ডি ভেঙে আমাকে বেরতেই হবে।

পংকজ ইচ্ছে করলেই একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিতে পারতো। কিন্তু পংকজ বিদেশ বিমুখ। আমাকে আবার বললো, অন্য দেশে গিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকতে তোর ভালো লাগবে? আমি তো ভাবতেই পারি না।

আমি বললাম, কোনো একটা দেশেই আমি বেশী দিন থাকবো না। ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। নাগরিকত্ব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এখানেই বা কি ভালো আছি?

বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর পংকজ আমাকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল। পংকজের মাথা ঠাণ্ডা, সে সব দিক চিন্তা করতে পারে। কোনো রকম কাজকর্ম না জুটিয়ে হঠাৎ জার্মানি চলে যাওয়ার প্রস্তাবটা ও বাতিল করে দিল প্রথমেই। অজানা অচেনা দেশে ওরকমভাবে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি অবশ্য বলেছিলাম যে, আমি দরকার হলে কুলিগিরি করতে পারবো। পংকজ হেসে উঠেছিল সেই কথা শুনে। বলেছিল, এ তো আর কলকাতা শহর নয় যে, যে ইচ্ছে সেই এসে যা খুশি করবে। ওসব দেশে কুলিগিরি করতে গেলেও সরকারের অনুমতি লাগে। আর, নিজেকে চিনতে শেখ। দরকার হলে যারা কুলিগিরিও করতে পারে, তারা অন্য টাইপের মানুষ। তুই পারবি না। তুই না খেয়ে কিংবা অভিমান করে মরবি।

পংকজ বললো, প্রথমে আমার ইংলণ্ডে যাওয়া উচিত। ওখানে বিষ্ণু আছে, তার কাছে থাকতে পারবো কয়েকদিন। বিষ্ণু অনেক রকম সাহায্য করতে পারবে, দরকার হলে জার্মানিতে চিঠিপত্র লিখে কাজের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। মোট কথা, দেশের বাইরে গিয়ে প্রথমেই অকূল পাথারে পড়বো না।

এই উপায়টাই যে যুক্তিসম্মত, তা মেনে নিতেই হয়। তবে, একটা জিনিস আমি দৃঢ়ভাবে ঠিক করে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে আমি কিছুতেই থাকবো না। ইংরেজ জাতটার ওপর আমার জাতক্রোধ রয়ে গেছে, ওদের কাছে শিক্ষা কোনোক্রমেই কৃপা চাইবো না। যদি প্রচুর টাকা নিয়ে বেড়াতে যেতে পারতাম, সে আলাদা কথা।

বিষ্ণুকে চিঠি লেখার পর অতি দ্রুত উত্তর চলে এলো। বিষ্ণুর দারুণ উৎসাহ। বিষ্ণু ইদানীং ওর সব চিঠিতেই ক্যারল নাম্নী একটি মেয়ের কথা লিখছে। সেই ক্যারল নাকি ওর প্রতি... দারুণ ... আমি যেন ক্যারলের জন্য খাঁটি দার্জিলিং ... নিয়ে যাই কয়েক পাউন্ড।

পংকজের চেষ্টাতেই একটা কার্গো জাহাজের টিকিট কাটা হলো সস্তায়। পংকজের সাহায্য না পেলে পাসপোর্টও অত সহজে হতো না। পংকজরা কলকাতার পুরোনো লোক, অনেক রকম জানাশুনো। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং পুলিস বিভাগে ছড়িয়ে আছে। সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংগে ... আমার পুলিস ভেরিফিকেশনে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আর একজন ... মুখার্জির সন্ধান পাওয়া গেল যে দাদাদের ... সম্পর্কে এবং দু বছর জেল খেটেছে। পুলিস এই দুই বাদল মুখার্জির রেকর্ড গুলিয়ে ফেলেছিল, আমার নামে ছিল জেল খাটার অভিযোগ —পংকজের এক পুলিস আত্মীয়ের সহায়তায় সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ায় আমার অন্য অসুবিধাগুলোও দূর হয়ে যায়। দুর্বল ... এই, যার ঘুষ দেবার ক্ষমতা আছে, কিংবা ... মহলে চেনাশুনো আছে, ... কোনো ব্যাপারেই কোনো অসুবিধে হয় না।

আমার টাকা খরচ ... টিপে টিপে। রেণুর টাকাটা এখনও ছুঁইনি।

[illegible] টাকা থেকে জমিয়ে জমিয়ে দু'শো টাকা পুঁজি করেছিলাম—বইটাই বিক্রি করে আরও দু'শো টাকা জুটলো। পঙ্কজ ধার দিয়েছে সাত শো টাকা, খলপুরে [illegible] কাছে চিঠি লিখে আরও পাঁচ শো টাকা পাওয়া গিয়েছিল। লণ্ডনে যখন নামবো, তখন আমার হাতে কয়েক পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকবে।

পঙ্কজ টাকা বাঁচাবার আর একটা ব্যবস্থা করে দিল। কারগো জাহাজ ঠিক নির্দিষ্ট দিনে নাও ছাড়তে পারে। তা হলে আমাকে কোচিনে কয়েক দিন হোটেলে থাকতে হবে। পঙ্কজের এক জামাইবাবু থাকেন মহীশূরে, বিরাট চাকরি করেন, একটা ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার। আমি জাহাজ ছাড়ার কয়েক দিন আগেই মহীশূরে গিয়ে পৌঁছবো। জামাইবাবুকে অফিসের কাজে প্রায়ই গাড়ি নিয়ে উটকামণ্ড, এর্নাকুলাম যেতে হয়। উনি ঠিক দিনে আমাকে কোচিনে জাহাজে তুলে দেবেন। একজন চেনা কেউ জাহাজে ওঠার সময় আমার পাশে থাকবেন, এটা ভেবে আমি একটু ভরসা পাই। কখনো একা একা দূরে কোথাও যাইনি।

আর আট দিন পরে যাত্রা। বাড়ি ফিরেই শুনলাম, রেণু এসে অনেকক্ষণ বসে ছিল। মা বললেন, এইমাত্র তো গেল, তোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়নি?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

—প্রায় এক ঘণ্টা বসে ছিল বেচারা।

—কোনো দরকার ছিল?

—তিনখানা টিকিট দিয়ে গেছে আমাদের। ও কি একটা থিয়েটার করছে, আমাদের সবাইকে বিশেষ করে যেতে বলেছে। তোর বাবা যাবে কি না জানি না তুই আমাকে নিয়ে যাবি তো?

আমি কার্ডটা দেখলাম। যেদিন রেণুদের থিয়েটার, তার আগের দিনই আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপবো। রেণু যখন মঞ্চের ওপর কৃত্রিম কাহিনীর দুঃখের দৃশ্যে কাঁদবে, সেই সময় আমি দু-তিনটে প্রদেশ পার হয়ে গেছি।

খুব উৎসাহ দেখিয়ে মাকে বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, রেণুরা যে নাটক করছে, তুই নেই তার মধ্যে? তুই কিছু করছিস না?

মা ধরেই নিয়েছিলেন, আমাকে বাদ দিয়ে রেণু কখনো কিছু করতেই পারে না। অনেকগুলো বছর ধরে এই রকমই হয়ে আসছে।

মায়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। এখনো মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। মায়েদের কি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যাতে সন্তানের মিথ্যে কথা অনায়াসেই ধরে ফেলতে পারে।

অবহেলার সুর ফুটিয়ে বললাম, আমাকে অনেক করে ধরেছিল, কিন্তু আমার একদম সময় নেই। মাঝে মাঝে রিহার্সালে যেতে হয় অবশ্য।

—সময় নেই? কি এমন রাজকার্য করছিস?

—খাবার দাও না, খিদে পেয়েছে। খুব কড়াইশুঁটির কচুরি খেতে ইচ্ছে করছে।

—ইচ্ছে করছে তো দোকান থেকে কিনে নিয়ে আয়!

—কেন, তুমি বানাতে পারবে না? আগে তো বানাতে—

—আহা-হা! বললেই হলো কিনা!

একমাত্র খাবারের কথা তুলেই মাকে অনামনস্ক করে তোলা যায়। আমি কিছু খেতে চাইলে মা শত অসুবিধে সত্ত্বেও সেটা করে দেবেনই। বাড়ির বেকার ছেলে সাধারণত খাবার-দাবারের জন্য বায়নাক্কা করতে লজ্জা পায়। আমারও লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কয়েক দিন ধরে আমি ছোট ছেলের মতন আদুরে স্বভাবের অবুঝ হয়ে উঠছি। নিজে মনে মনে বুঝতে পারলেও দমন করতে পারি না। আমার যা যা প্রিয় খাবার, তা এক-একদিন এক-একটা তৈরি করে দেবার জন্য আবদার তুলছি। এখন চালতা পাওয়া যায় না। তবু আমি কয়েক দিন ধরে চালতার ডালের কথা বলায়—মা শিয়ালদা বাজারে বাবাকে পাঠিয়ে চালতা খুঁজে আনিয়েছেন। আমি নির্লজ্জের মতন সেই ডাল একবাটি খেয়ে আর এক বাটি চেয়েছি।

এইসব খাবার খেয়েও ঠিক তৃপ্তি হয় না, মনটা বিষাদে ভরে যায়। বারবার মনে হয়, আমি চলে যাবো। আমি আর সারা জীবনে কখনো চালতার ডাল খাবো না। অন্তত মায়ের হাতের রান্না আর খেতে পাবো না। যদিও আমার চলে যাওয়া মানে চিরবিদায় নয়, তবু এই রকম মনে হয়।

ভেতরে ভেতরে আমার অসম্ভব উত্তেজনা, তবু বাইরে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্য আমি সদাসতর্ক। একটু এদিক-ওদিক হলেই মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাবো। তবু মা মাঝে মাঝে আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকান। কিছু সন্দেহ করেছেন কি? কিংবা আমারই চোখের ভুল।

প্রস্তুতি চলছে অত্যন্ত গোপনে। একটা সুটকেশ কিনে পঙ্কজের বাড়িতে রেখেছি। প্রভাস জামাইবাবু যে ওভার-কোটটা দিয়েছিলেন, সেটাও একদিন সরিয়ে দিয়েছি পঙ্কজের সঙ্গে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কিছুই বাড়িতে আনিনি। একটা সুটও করাতে হয়েছে। গরম গেঞ্জি, প্যান্টস, ড্রয়ার অন্যদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় হয়েছে। আমার মধ্যে এখনো বাঙালত্ব রয়ে গেছে, কি কি বিছানাপত্তর নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম—পঙ্কজ খুব ঠাট্টা করেছে তাই নিয়ে। বিলেতে কেউ বেডিং নিয়ে যায়, শুনেছিস? বাঙাল কোথাকার!

রেণুর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে। প্রতিদিন একখানা করে চিঠি বিনিময় হয়। কোনো কোনোদিন রেণু এক সঙ্গে দুটো চিঠিও লেখে। চিঠিগুলো ডাকে আসে, অনেক দিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি। যাবার আগে রেণুর সঙ্গে দেখা না করে চিঠিতেই সব কথা জানিয়ে যাবো ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু সেই চিঠিটা আর কিছুতেই মনঃপূত হয় না। অনেকবার লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেলতে হলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, খুব সংক্ষিপ্ত চিঠিতেই আসলে সব চেয়ে বেশী কথা বলা যায়। রেণু, আমি [illegible] যাচ্ছি। আবার দেখা হবে। ভালো থেকো। ইতি বাদল।

একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের পৃষ্ঠার ঠিক মাঝখানে এই তিন লাইনের চিঠিটা লিখে ফেললাম। বেশ পছন্দ হলো। ভালো দেখাচ্ছে। রেণু সব বুঝতে পারবে। রেণুকে আমার মনের সব কথা খুলে বোঝাতে হবে কেন? ওর তো নিজে নিজে বুঝে যাওয়া উচিত।

অনেক স্থির সিদ্ধান্তই দু-এক মুহূর্ত পরে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। চিঠিখানা লিখে, স্ট্যাম্প সেঁটে ডাকে ফেলার জন্য তৈরি হবার পরও আমি অন্ধের মতন ছুটে গেলাম মল্লিকদের বাড়ির সামনে। যেখানে রেণুদের নাটকের রিহার্সাল হবার কথা। সেখানে ওরা নেই। আজ ওদের স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে স্টার থিয়েটারে। রাস্তা পেরিয়ে চলে এলাম স্টার থিয়েটারে। যেন আর এক ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টাও অপেক্ষা করা চলবে না—এই বিশেষ মুহূর্তেই রেণুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

দেবুদা আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই যে ভাই, আপনি এসে গেছেন। খুব ভালো হয়েছে। আপনি গোটা নাটকটা দেখে একটু অনেস্ট ওপিনিয়ান দিন তো! মন রাখা কথা বলবেন না, অনেস্ট ওপিনিয়ান চাই কিন্তু। যদি কিছু সাজেসশান থাকে—

দেবুদা ভাঁড়ে চা খাচ্ছিলেন। একজন কাকে ডেকে বললেন, এই বাদলবাবুকে চা দে রে!

দেবুদার সঙ্গে মাঝে দু' তিনবার দেখা হয়েছে। প্রত্যেকবারই ওঁর ব্যবহারে অতিরিক্ত খাতিরের ভাব থাকে মনে হয়। ওঁর বন্ধুর ছোট ভাই হিসেবে আমাকে একটা মূল্য দেবার তো কোনো কারণ নেই। তা হলে, উনি আমাকে নিয়েছেন রেণুর বন্ধু হিসেবে। উনি আমাকে লাগাতে চান

না। অত্যন্ত চতুর লম্পটরা এরকম হয়।

এসব ব্যাপারেও আমি অসহায়। কেউ বেশী খাতির করলেই আমি অতি বিনয়ে একেবারে বিগলিত হয়ে যাই। মুখ দিয়ে একটাও সত্যি কথা বেরোয় না। আমি বললাম আপনার নাটক তো দুর্দান্ত হচ্ছে. আমি যেটুকু রিহার্সাল দেখছি...

উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে রেণু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো মঞ্চের ওপর উঠে আসার জন্য। তখন বিরতি চলছে। অডি-টোরিয়ামে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেবুদা গল্প করায় ব্যস্ত। মঞ্চটা ফাঁকা।

আমি একটু শঙ্কিতভাবে এদিক-ওদিক তাকালাম। আমি ওপরে উঠে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না তো! পর-মুহূর্তেই সাহস সঞ্চয় করে ওপরে উঠে এলাম।

রেণুকে রাজেন্দ্রাণীর মতন দেখাচ্ছে। রেণুকে আমি বেশী সাজাগোজ করতে কখনো দেখিনি। নাটকে জমিদার-দুহিতা সেজেছে বলেই এত জমকালো পোশাক। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কখন এসেছো?

—অনেকক্ষণ। তোমাদের অভিনয় দেখ-ছিলাম। নাটকটা সত্যিই খুব দারুণ হচ্ছে —মানে, সকলেরই বেশ ভালো। অ্যামেচার গ্রুপ হিসেবে এত ভালো প্রোডাকশান—

বেশ কয়েক মিনিট আমি নাটক সম্পর্কে কথা বলে গেলাম।

রেণু বললো, কার্ড দিয়ে এসেছি। মাসীমা, মেসোমশাই আসবেন তো?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন। মায়ের তো দারুণ আগ্রহ—শোনো, তোমরা খবরের কাগজের লোকদের কার্ড দিয়েছো? পরিচয় পত্রিকায় আমার এক বন্ধু আছে, তাকে বলে দিতে পারি—

আমার ঔদাসীন্য দেখে রেণু যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যই আমি বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম। যদিও আমার বুকটা ঈর্ষায় হা-হা করে জ্বলে যাচ্ছিল। সেই ঈর্ষার কি প্রচণ্ড উত্তাপ! কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়, এমন কি দেবুদাকেও নয়—সমগ্র নাট্য-জগৎকে আমি ঈর্ষা করছিলাম—কেন তারা রেণুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? যাবার আগে কয়েকটা দিন কি রেণুকে আমার সর্বক্ষণের জন্য পাওয়া উচিত ছিল না? ঠিক এই সময়েই রেণুকে নাটকের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে? তবু আমার মুখে হাসি মাখানো।

নাটকের কথায় রেণু আনন্দ পাচ্ছিল। ওর বাড়ির দমবন্ধ পরিবেশ থেকে একটু মুক্তির জন্য রেণু যেন এই নাটকটাকে পেয়েছে।

—পরের সীন কখন আরম্ভ হবে?

রেণু হেসে বললো, একটু দেরি আছে। একটা বন্দুকের শব্দ করতে হবে— কিছুতেই শব্দটা ঠিক হচ্ছে না।

আমি বললাম, আচ্ছা, স্টেজের পাশে কোথাও একটা গ্রীনরুম থাকে না? আমি কখনো দেখিনি। ঘরটা কি সত্যিই সবুজ?

রেণু আবার হাসতে হাসতে বললো, গ্রীনরুম দেখবে? এসো আমার সঙ্গে।

বাঁ দিকের উইংসের পাশ থেকে মঞ্চের ওপর দিয়েই রেণু আমাকে ডান দিকে নিয়ে এলো। মঞ্চের ওপর দিয়ে যাবার সময় আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আগে কখনো আমি মঞ্চে উঠিনি, এই প্রথম অথচ আমি অভিনেতা নয়। আমি বাদক হলেও আমার পাশে রেণু নেই—ও এক জমিদার-নন্দিনী। আমি একবার রেণুর মুখের দিকে আর একবার অডিটোরিয়ামের দিকে তাকালাম। এখানে আমি কি বিশ্রী রকমের বেমানান!

মঞ্চের ওপর দিয়ে যেতে যেতেই রেণু জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাইরে যাওয়ার কিছু ঠিক হয়েছে?

আমি বললাম, এখনো বিশেষ কিছুই ঠিক হয়নি।

মঞ্চের ওপর তো মানুষ মিথ্যে কথাই বলে।

ডান দিকের উইংসের পাশে অনেকে চা খেতে খেতে জটলা করছিল। দেওয়ালে গিরিশ ঘোষের একটা মস্ত বড় ছবি। রেণু আমাকে নিয়ে এলো গ্রীনরুমে। সৌভাগ্য-বশত সেখানে কেউ ছিল না। একটা মেকআপের তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎবেগে রেণুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

রেণু আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। রেণুকে আমি যতবারই চুমু খেয়েছি, রেণু আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আমাকেও এমন সব অসম্ভব জায়গা ও সময় বেছে নিতে হয়! যখন ইচ্ছে তখনই রেণুকে পাই না বলেই যে আমি এ রকম করি, তা কি রেণু বোঝে না?

ত্রাস ও ক্ষোভ মেশানো গলায় রেণু বললো, তুমি কি কিছুতেই এসব ছাড়বে না?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—তুমি যদি এই রকম ব্যবহার করো...

আমি আবার হাত তুলতেই রেণু সরে গিয়ে দরজার কাছে এমন জায়গায় দাঁড়ালো, যাতে ওকে বাইরে থেকে দেখা যায়। যাতে আমি ওকে আর ধরতে না পারি।

আমি বললাম, ভয় নেই, আমি আর কিছু করবে না। আমি ক্ষমা চাইছি। রেণু, আমাকে একটা কথা দেবে? আমাকে একদিন তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবে?

—আবার ঐসব কথা? আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না।

—আজ নয়। কোনো একদিন তুমি আমাকে তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবে? শু

(সি-১৮৪১)

ফিরে যাও, তা হলেই হবে।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

—রেণু, আমার বাইরে যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেছে।

—কবে?

আমি ইচ্ছে করেই দিন দশেক পরের একটা তারিখ বললাম। রেণু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। ওর নাটকের ফাইনাল অভিনয়ের আগে কোনোরকম বিঘ্ন ঘটাতে আমি চাই না।

—তোমার যাওয়ার দিন আমি স্টেশনে যাবো।

রেণু জানে না, আজই ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়ে গেল।

আমার ট্রেন বিকেলবেলা। সকাল থেকে হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করতে লাগলাম। শেষ মুহূর্তে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাবো না তো? জানতে পারলে মা কিছুতেই যেতে দেবেন না। একমাত্র ছেলে হওয়ার অনেক ঝামেলা। কত লোক দিব্যি টিকিট কেটে প্রকাশ্যে আনন্দ করতে করতে বিদেশে যায়। বাড়ির সব লোক স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসে। আমার বেলায় এত লুকোচুরি, গোপনতা। শেষ সময়টুকুও সুখের হবে না।

বাবা খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় বেরিয়ে গেলেন। সেদিনকার সেই চাকরির ঘটনার পর থেকে বাবার সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুবই কমে গেছে। বাবাকে এখন সব সময়েই চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়। বাবার কাছ থেকে আমার বিদায় নেওয়া হলো না।

মা-ও শুয়ে পড়লেন একটু বাদে। দু দিন ধরে মায়ের ডান পায়ের পাতাটা একটু ফুলেছে। ইদানীং বাতের কষ্ট পাচ্ছেন। আমি মায়ের ঘরের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। পঙ্কজরা অপেক্ষা করছে। আমার এক্ষুনি যাওয়া উচিত, তবু যেতে পারছি না। এর আগে বাইরে কোথাও গেলে মাকে প্রণাম করেছি। আজ প্রণাম করার প্রশ্নই ওঠে না। একটা কথা অন্তত বলা উচিত, কিন্তু কি বলবো? যে-কোনো কথা বলাই বিপজ্জনক। বুদ্ধ কিংবা চৈতন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন—তখন কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে যাননি। আমি তা জানি, কিন্তু আমি তো সন্ন্যাসী হতে পারিনি!

মা ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি প্রণাম করে পালাতে পারতাম। কিন্তু মা 'মরণের পরপারে' নামে একখানা বই খুলে শুয়েছেন। এই বই পড়তে পড়তে কারুর ঘুম আসে?

বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছি। একবার দেখলাম, মা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বইখানা ওল্টানো। কিন্তু আমি ঘরে পা দিতেই মা বললেন, কি রে? কিছু চাইছিস?

—না।

—কোথাও বেরুবি নাকি?

আমার আর সময় নেই। আমার আর সময় নেই। মাথায় একটা বুদ্ধি এলো সেই মুহূর্তে। পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখ মোছার ছলে সেটা ফেলে দিতে চাইলাম মায়ের পায়ের ওপর। দূর ছাই, সেটা ঠিক পায়ের ওপর পড়লো না। সেটা তুলতে গিয়ে মায়ের পায়ের সঙ্গে আমার পা ছুঁয়ে গেল। গুরুজনের পায়ে পা ঠেকলে প্রণাম করতে হয়। এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। টপ করে মাকে প্রণাম করে বললাম, মা, আমি একটু ঘুরে আসছি!

আর কোনো কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম এক বস্ত্রে। পঙ্কজের বাড়িতে ভাস্করও অপেক্ষা করছিল। ভাস্কর দু' দিন ধরে কলকাতায় আছে। ওর এখন ছুটি নেই—ভাস্কর যে আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যই কলকাতায় থেকে গেছে আমি জানি। কিন্তু ও সে কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না। মুখে বলছে, ওর কত সব জরুরি কাজ আছে, বাড়ির ব্যাপার। ভাস্কর কারুর কাছেই নিজের কোনোরকম দুর্বলতা দেখাতে চায় না।

আমি পৌঁছতেই ভাস্কর ধমক দিয়ে বললো, তুই কি ডোবাবি নাকি? আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি! আমি তো ভাবছিলাম, তোর বদলে আমিই চলে যাবো।

আমার গলা ভারী হয়ে আছে, সহজে কথা বলতে পারছি না। ভাস্কর নিজেই দৌড়াদৌড়ি করে ট্যাক্সি ডেকে আনলো। পঙ্কজ জিনিসপত্র সব তুলে দিয়ে বললো, চল, চল, ট্রেন না মিস করিস।

ট্যাক্সি ছাড়ার আগে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, আর কেউ যাবে না? আর কারুকে বলিসনি?

—না।

—রেণুকেও না?

পঙ্কজ বললো, চল, এখন আর ওসব ভাববার সময় নেই। বলেই নি যখন—এখন আর কি করা যাবে!

ভাস্কর আমার সঙ্গে রেণুর ব্যাপারটা জানে। ভেংচি কেটে বললো, ইডিয়েট, এই সময় মান-অভিমান করার কোনো মানে হয়? এখনো যথেষ্ট সময় আছে, যদি বলিস তো রেণুকে বাড়ি থেকে তুলে নিতে পারি।

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে না না বলতে লাগলাম। ভাস্কর আপন মনে হেসে উঠলো।

হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলাম, তখন সত্যিই বেশী সময় ছিল না। জায়গা রিজার্ভ করাও ছিল না। ভাস্কর আর পঙ্কজ উঠে পড়ে ঠেলাঠেলি করে থার্ড ক্লাস কামরায় আমার জন্য জানলার ধারেই একটা জায়গা ঠিক করে ফেললো। বন্ধুরা না থাকলে আমি কি করতাম?

আমাকে বসিয়ে দিয়েও ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে ছোটাছুটি করতে লাগলো। পঙ্কজ কিনে আনলো কমলালেবু আর আমার পছন্দমতন এক গাদা সিগারেটের প্যাকেট। ভাস্কর কয়েকটা গুলিসুতো আর ছুঁচ কিনে এনে একটা প্যাকেটে মুড়ে দিয়ে বললো, রেখে দে, দেখবি অনেক দরকারে লাগবে। হঠাৎ যদি প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যায়—

হুইশল দেবার পর ট্রেন নড়ে উঠলো। আমি ওদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। পঙ্কজ বললো, মাইশোরে পৌঁছেই একটা চিঠি দিস। জামাইবাবুকে বলিস—

ভাস্কর চালাক ছেলে। ও ঠিক বুঝেছিল, শেষ মুহূর্তে আমার চোখে জল আসবে। সেই জন্যই ওর নাকের ওপর দু হাতের আঙুল জুড়ে, যাকে প্যাঁক দেওয়া বলে, সেইরকম অদ্ভুত ভঙ্গি করতে লাগলো। আমি না হেসে পারলাম না।

মেরি লুই বার্ক

এদেশের সবই ও'র ভাল লাগে—এদেশের মাটি, এদেশের নরনারী, এদেশের গাছপালা সব। কারণ, ও'র নিজের ভাষায় ঃ এটা ঠাকুরের দেশ, এটা স্বামীজীর দেশ, এটা আধ্যাত্মিকভাবে পুষ্ট প্রাচীন সভ্যতার দেশ।

ও'র নাম মেরি লুই বার্ক। আমেরিকান। বেদান্ত নিয়ে পড়াশুনা করা এবং স্বামীজী নিয়ে গবেষণা করা ও'র প্রধান কাজ। গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে নিরলসভাবে এই কাজ করে চলেছেন শ্রীমতী বার্ক। স্যানফ্রানসিসকোর বেদান্ত সোসাইটির কাছেই থাকেন। ঠাকুরের দেশ, স্বামীজির দেশ, আধ্যাত্মিকভাবে পুষ্ট সভ্যতার দেশ ভারতে এসেছেন এই প্রথম।

স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সনে। বইয়ের নাম 'আমেরিকায় বিবেকানন্দ—নতুন নতুন আবিষ্কার।' স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ বই প্রকাশিত হয়েছে অতি সম্প্রতি। দীর্ঘ গবেষণার ফল। নাম ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ পশ্চিমে তাঁর দ্বিতীয় পর্যটন ঃ নতুন নতুন আবিষ্কার।

স্বামীজী সম্পর্কে সম্প্রতি এদেশে যাঁরা সবচেয়ে বেশি গবেষণা করছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান, অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু। শ্রীমতী বার্কের প্রথম বই সম্পর্কে শংকরীবাবু ১৩৭০-৭১ সনে জয়শ্রী পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ "গভীর আনন্দ এবং কিছু লজ্জার সঙ্গে স্বামীজী বিষয়ক একখানি মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি। লজ্জার কারণ—এই গ্রন্থ পড়ে অন্তত বুঝলুম, আমরা আমাদের জাতীয় নায়কদের সম্বন্ধে কত উদাসীন—'আমাদের বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে সর্বশেষ বিরাট গ্রন্থ এল পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে আমাদের কাছে! কিন্তু লজ্জা থেকে বড় হয়েছে গৌরববোধ—যে গৌরব আমরা বোধ করি যে-কোনও মহান চরিত্রের সর্বজনীন বন্দনায়। বিবেকানন্দের মত চরিত্রকে কোন্ দেশের মানুষ উপস্থিত করলেন সেটাই বড় কথা নয়। তাঁকে যে বুঝলুম শেষ পর্যন্ত সেটাই বড় কথা।......শ্রীমতী বার্কের এই গ্রন্থকে মহাগ্রন্থ বললাম, মহাগ্রন্থ শব্দের পূর্ণ তাৎপর্য মনে রেখে। এই গ্রন্থ বিপুলায়তন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তম সংযোজন শুধু নয়—ঐ সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রচনা। এবং, স্বামীজীর জীবনীর ব্যাপারে গ্রন্থটির এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যত্র পাওয়া যায় না।......শ্রীমতী বার্কের এই বই বেরুবার পর তাঁর রচনা উল্লেখ না করে বা তা থেকে তথ্য না নিয়ে বিবেকানন্দ-বিষয়ে কিছু লেখা সম্ভব নয়।"

*

এই শ্রীমতী বার্কের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল বেলুড় মঠে, ভরত মহারাজের ঘরে বসে। ভারত দর্শনে বেরিয়ে প্রথমেই এসেছেন বেলুড় মঠে। সেখানেই আছেন। এর পর অন্তত ছ মাস ধরে এই দেশ ঘুরবেন। এই মহান দেশকে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করবেন।

বয়স এখন প্রায় ৬০। গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বেদান্ত নিয়ে, ভারত নিয়ে ঠাকুর ও স্বামীজীকে নিয়ে গবেষণা করছেন। ও'র নিজের ভাষায় ঃ আমি তখন খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথাও মনের মত পথের কোনও সন্ধান পাচ্ছিলাম না। এই সময় এলাম বেদান্ত সোসাইটির সংস্পর্শে। স্বামী অশোকানন্দের সংস্পর্শে। নতুন পথের সন্ধান পেলাম। নতুন জীবন পেলাম। নতুন শান্তি পেলাম। তারপর থেকে আমি ওই পথেই চলছি।

শ্রীমতী বার্ক মনে করেন, এই পথের সন্ধান এখনও পাশ্চাত্ত্য জগতের অনেকেই পান নি। যদি পেতেন তাহলে পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু সমস্যা মিটে যেত। পাশ্চাত্ত্যের মানুষও শান্তি পেতেন।

তাঁর মতে ঃ আমেরিকায় বা পাশ্চাত্ত্যে যে হিপিদের ছড়াছড়ি সেটার মূল কারণ, নতুনরা সবাই পাশ্চাত্ত্য জগতের অতি-পার্থিবতাকে মোক্ষ বলে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাঁরা অনেকেই তাঁদের অভিভাবকদের পার্থিব জগতে অতিশয় আসক্তিকে ঘৃণা করেন। তাঁরা তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। বেরিয়ে আসছেনও।...কিন্তু মুশকিল হয়েছে, তাঁরা জানেন না অতি-পার্থিবতাকে ত্যাগ করে কোন্ পথে যাওয়া উচিত। কোন পথ তাঁদের চিত্তে শান্তি এনে দিতে পারে। তাই তাঁরা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ আবার নানা মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পার্থিব জগতকেই ভুলতে চাইছেন।

কিন্তু শ্রীমতী বার্ক মনে করেন না, ও-পথে তাঁরা শান্তি পেতে পারেন বা তাঁদের সকল প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। তাঁর ধারণা তাঁরা সব পেতে পারেন বেদান্তে তাঁরা সব পেতে পারেন ঠাকুর ও স্বামীজীর বাণীতে।

কৃষ্ণ চেতনার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় শহরে শ্রীমতী বার্কের তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। তাঁর ভাষায় ঃ যখন ওদের দেখি পথ দিয়ে দল বেঁধে কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে চলেছেন, তখন বেশ ভালই লাগে। কিন্তু শুধু নাম সংকীর্তন আধুনিক জগতের, আধুনিক মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সেটা পারে একমাত্র ঠাকুরের বাণী, স্বামীজীর বাণী, স্বামীজীর নির্দেশ।

শ্রীমতী বার্ক তাই স্বামীজীর বাণী প্রচারকে নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেছেন এবং প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তাই করে চলেছেন।

মেরি লুই বার্ক

— বরুণ সেনগুপ্ত

॥ ১৩ ॥

সরকার লেনের মোড়ে কালিকে ছেড়ে নিজের বিছানায় ফিরে এসে বাঁচলাম যেন। সারা দিনের লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নিয়ে বসা গেল।

বসলাম না বলে শুয়ে পড়লাম বলাটাই ঠিক। যতো বেহিসেবী কাজের মত হিসেবের কাজও ঐ বিছানাতেই বেশ হয় আমার ধারণা।

অংকশায়িনীদের ন্যায় অংকরাও এসে নির্বিবাদে মিলে যায় বিছানায়।

সারাদিনভর কত না পতন অভ্যুদয় হল আজ। প্রেমেনের পরামর্শমত দেবতার জন্ম দিলাম আজকেই। আর আজই আমার সম্মুখে এক দানবীকে জন্মাতে দেখলাম। প্রায় অপাপবিদ্ধা এক রূপসী কিশোরীর এক অভদ্র রূপ প্রকাশ পেল।

এই মেয়েটিকে নিয়ে আমি কী করব এখন? যে পরিবেশে সে মানুষ, তার থেকে ছাড়িয়ে আনার কোনো প্রশ্ন নেই, সে আমার সাধ্যের বাইরে কিন্তু সেই পরিবেশের মধ্যে থেকে, সেই পরিবেশের থেকে ছাড়িয়ে ওঠার সামর্থ্য ওকে যোগাবার কি শক্তি আছে আমার?

এর রূপান্তর-সাধন কি আমার দ্বারা সম্ভব?

একে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার কিছুটা দায়িত্ব তো নিজের ঘাড় নিয়েছি কী করা যায় এখন?

পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু কী করে বদলাই ওই মেয়েটাকে?

মার কথাটা মনে পড়ে আমার......

আমার জীবনধারাটা কি করে বদলানো যায় বলতে পারো মা? শুধিয়েছিলাম মাকে একবার।

তার আগে ঐ প্রশ্নই আমি শুধিয়েছিলাম বাবাকেও।

'এই জীবনে আর কী করে বদল হবে তার? প্রাক্তন আছেন না প্রারব্ধ নেই? তার ফলাফল যাবে কোথায়? আগের জন্মে যা যা করেছিস, যা হতে চেয়েছিলি—সেই রকম অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিস—তার সবই তোর এই জন্মে ফলবার। তাই রকমের জীবনধারা পেয়েছিস এই হেতু। চাইলেই কি আর তা পালটানো যায়? তার জন্য চেষ্টা করতে হবে, সাধনা করতে হবে, একটুন করে চাইতে হবে, তবে যদি তা একটুক পালটায়। পরজন্মে যদি সেরকমটা হতে পারিস।

বাবা বলছে যে—বাবার কথাটাও আমার কথার সঙ্গে জুড়ে দিলাম। তা হলে কি অন্য জীবন পাবার জন্য আমাকে দেহান্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে? জীবনান্ত না করে কি জীবনান্তর হবে না আমার? মনের মত বাঁচবার খাতিরে মরতে হবে আমার?

কে বললে? মার ইচ্ছা হলে এই জন্মেই [illegible]

হয়, এই [illegible] করলে [illegible] প্রায়শ্চিত্ত [illegible] কৃপা করলে—তিনি চাইলেই হয়।

কিন্তু তাঁকে দিয়ে [illegible] কি করে?

তিনি চাইলেই হবে—তুই চাইলেও হবে। তুই তাঁর কাছে চাইবি, সরল বুদ্ধিতে তিনি তোর চাওয়ামতন চাইবেন, হবে, [illegible]। নিমেষের মধ্যে দেখবি। [illegible] হতে থাকবে। [illegible]

না চেয়ে পারে রে? চেয়ে দ্যাখ না।

কেমন করে?

পরশমণি যেমন লোহাকে সোনা করে দেয়—ছুঁয়েই না! সেই রকম। কেন, কবি বলেননি, এই জীবনেই ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর। তিনি কতো রকমের জীবনধারণ করেছেন জানিস? কতো রকমের হয়েছেন যে এক জীবনে। বড় হলে জানবি। এক জীবনেই যে কতো রকমের জীবনসাধনা তাঁর।

সত্যি বটে। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহ-জীবন স্বর্ণময় হয়ে যায় বটে নিমেষেই। মিথ্যে নয়।

আমার জীবনেই তা ঘটেনি কি? সবার জীবনেই ঘটে থাকে বোধ হয়।

এই জীবনেই ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর। তার আগের লাইনটি কী ছিল? এই লাইন: সুন্দর হে সুন্দর! সুন্দরই জীবনের সেই স্পর্শমণি, যার ছোঁয়াচে লোহা জন্মের মতন বদলে যায়। সোনার হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

রিনি কি সত্যি আমায় বদলে দেয়নি একেবারে? যার ঐ কথার পরই আমি ভেবে দেখেছিলাম। মুখের সন্দেশের ভাগ দেওয়ার ছলে রিনির সেই মুহূর্তের ছোঁয়ায় কি আমার নতুন উন্মেষ ঘটেনি? বদলে যাই নি আমি?

সেই দিনই তো রাত্রিশেষে আমার জীবনের প্রথম কবিতার স্বতোৎসার ঘটেছিল—সেই কোকিল ডাকে! সেই...কোকিল ডাকে / ভোরের ফাঁকে/আমশাখে/ভোরের বাতাস আর যে চিরে/হঠাৎ ধীরে/মনে পড়ে ছেলেবেলার/বন্ধু খেলার / মিলনমেলার বান্ধবীকে/লোকের ভিড়ে/এই গড্ডলে/পাই ফিরে ফের/নিবিড় করে/মোর জীবনের প্রথমাকে......"

কিন্তু সে করেছিল রিনি। সেই পরির ছোঁয়াতেই আমার এই পরিবর্তন এসেছিল। সে ছিল সুন্দর, ছিল স্পর্শমণি। তাই সে নিজের স্পর্শ দিয়েই নিমেষেই আমায় বদলে দিতে পেরেছিল।

কিন্তু আমি তো সুন্দর নই, স্পর্শমণিও না। তার ছোঁয়াচে যদি আমি সোনা হয়েও থাকি, কাউকে সোনা করার সাধ্য হয় নি আমার। লালির জীবন, লালিকে, আমি বদলাই কী করে?

মা বলেছিল আমায়, কেন তোর জীবন বদলে নিতে চাচ্ছিস বল তো? কী হতে চাস তুই? রবিঠাকুরের মতন কবি? কিন্তু তা তুই হতে চাইছিস কেন?

এমনি।

এমনি কী রে! তা হলেও তোর লাভটা কী হবে? রবিঠাকুর তো হতে পারবি না, হেমচন্দ্র ও'র মতন কাছাকাছি কিছু হয়তো হতে পারিস। কিন্তু তা হলেও তোর কিছুই

তোকে তোর মতন হতে হবে তো?

হবে না। তোর তুই হওয়াটাই ব্যর্থ হবে।

কেন? রবি ঠাকুর হওয়াটা কি ব্যর্থ হওয়া?

সেটা রবি ঠাকুরের পক্ষেই সার্থক। তাঁর হওয়া তাঁকেই সাজে। তুই তেমন ধারা হতে গেলে নিছক না-হওয়া হবি। তোকে তোর মতন হতে হবে তো।

সেটা কী? নিজের হয়ে কেমনতর হবো আমি?

সেটা মা-ই জানেন। আমি তার কী জানব। তবে এ কথা তোকে বলতে পারি, বদলাবার জন্য দেহান্তরের দরকার নেই। ভাষান্তর হলেই হয়ে যায়। ভাষান্তর থেকেই রূপান্তর ঘটে। জীবনের ভাষা-বদলের সাথে জীবনভাষাও বদলে যায়।

কি করে আমার ভাষান্তর করব বলো—যদি নিজের রূপান্তর চাই?

আপাতত ঐ রবি ঠাকুরই পড়। কাশীরাম কৃত্তিবাসও। সেই সঙ্গে বঙ্কিম দীনবন্ধুও পড়বি—তাদের ভাষার স্রোত তোর মনের ওপর দিয়ে বয়ে যাক। ভাষার স্রোতের সঙ্গে ভাবের ধারা ওতপ্রোত। সেই প্রবহমানতার ভেতরই মনের ওপর তোর ভাবের পলি পড়তে থাকবে, জমতে থাকবে তোর অগোচরে—আর তাই জমে জমে সাগর মোহানায় যেমন নবদ্বীপ গজায় না, তেমনি নতুন এক নবদ্বীপের মতই নবরূপে তুই দেখতে পাবি নিজেকে—নব চৈতন্যের নিত্যানন্দের এক নবদ্বীপ।

মার উপদেশ মতন রূপান্তরসাধনে লালির ভাষান্তরণ শুরু করা যাক কাল থেকেই। রবীন্দ্রনাথের কথাকাহিনী দিয়েই আরম্ভ হোক। কবি কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের পয়ার ত্রিপদীর পায়ে বাঁধা পড়ুক

মেয়ে এ নয়—আমার বেলায় যেমনটি ঘটেছিল। অবশ্যি আমিও কাশীরাম কৃত্তিবাস নিয়েই পড়িনি, পড়েছিলাম, সেই সাথে বঙ্কিম দীনবন্ধু রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সবাইকে যুগপৎ আক্রমণ করেছি কিন্তু সে ছিল পাড়াগাঁর নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ—নিরুদ্বিগ্ন জীবন, আর এই শহরে মেয়ের এত রকমের চিত্তবিভ্রমের মাঝখানে কেবল পড়ার বইয়ের টানাপোড়েনে আটকে থাকা সম্ভব নয়। ওকে কথাকাহিনীর ছন্দোবন্ধেই বাঁধা যাক গোড়ায়। তারপর ক্রমশ কল্পনার খেয়ায় সোনার তরীতে পাড়ি জমিয়ে হয়তো ওর মধ্যেই একদিন আমার মানসীর আবির্ভাব দেখব, এমন কি, সুদূরে আকাশ-সীমায় বলাকার মতই এই দুরন্ত মেয়েকে উড়ন্ত দেখব হয়ত একদিন।

এদিকেও রাজর্ষির হাতে-খড়ি হয়ে নৌকাডুবির থেকে উঠে চোখের বালির বালিয়াড়ি পেরিয়ে যক্ষ, গোরার থেকে শুরু করে ঘরে বাইরের পালা সাঙ্গ করে শেষের কবিতায় এসে পৌঁছাক, তার পরে তো শরৎচন্দ্র রয়েছেই।

জ্বলন্ত দীপের ছোঁয়ায় যেমন অন্য প্রদীপ জ্বলে ওঠে, তেমনি এক দীপ্ত মনের জ্বালা দিয়ে নিজের মনান্তর—সৃজনের জন্য শরৎচন্দ্রের মতন মোক্ষম আর হয় না। তাঁর মর্মস্পর্শী রচনার ছোঁয়াচ ঠিক স্পর্শমণির মতই মানুষের মনকে বদলে দেয়—অবলীলায় তার অজান্তেই, মিথ্যে নয়।

মা বলতেন, বাক্-এর সঙ্গে অর্থ জড়ানো—হরপার্বতীর মতই। আর, অর্থ মানেই রূপ—ঐ বাকের প্রকাশ। চণ্ডীতে মা বলেছেন, আমিই সেই বাক্। আর আমার থেকেই এই সব, সবাই, অফুরন্ত বিশ্বজগৎ।

বাইবেলেও তাই আছে নাকি। নিরন্ধ্র তমসার মধ্যে কার উচ্চারণায় উদ্গীত হল প্রথম বাণী: লেট দেয়ার বি লাইট এবং সঙ্গে সঙ্গে, দেয়ার ওয়াজ লাইট।

তারপর বাক্-এর সেই ... মে অর্থ থেকে কত অর্থ—অর্থান্তর, ... না রূপ-রূপান্তর, কতো কী হোলো যে!

লালির সাথে এখন বাক্যবিনিময় হতে থাকে। মহান স্রষ্টাদের মহৎ বাণীর সঙ্গে মুখোমুখি হোক ও। শুধু রবীন্দ্রশরৎ নয়, বঙ্কিম দীনবন্ধু, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পর্যন্ত। এইভাবে রিনির ঋণ আমি লালিকে শোধ করি। আর এই করে করেই ওই বস্তির মেয়ে একদিন শ্রীবস্তির কন্যা হয়ে উঠবে একদিন। দেখতে দেখতেই।

বিয়ে না করি, নাই করতে পারি, সে আমার বাগদত্তা হয়ে থাক। আমার এবং মার।

(ক্রমশ)

ডঃ এস এল কোঠারি। সভাপতি : পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

দিনের বেশী এই কংগ্রেস চলার কোন মানে হয় না। আর এই তিন দিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর গবেষণামূলক আলোচনাচক্র না চালিয়ে যদি জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা বেশী করে করা যায়, আমার মনে হয়, তাতে বিজ্ঞানীরা অনেক বেশী লাভবান হতে পারেন।

প্রশ্ন : জনপ্রিয় বক্তৃতা বলতে বিশদভাবে কি আপনি বোঝাতে চাইছেন?

অধ্যাপক মল্লিকের উত্তর : দেখুন, নিজেদের নিজের গবেষণাগারে আজকাল যে ধরনের কাজ আমরা করে থাকি তার বেশীর ভাগই তো স্পেশালাইজড ফিল্ড। যার অর্থ, আমার ডিসিপ্লিনের কাজ আমার ডিসিপ্লিনের লোকেরাই বুঝতে পারেন। অন্য কোন ডিসিপ্লিনের কাজ আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সব সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন নতুনভাবে মোড় নিয়েছে। এখন যিনি জীবকোষ রসায়ন বা রেডিয়েশন কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করছেন, প্রয়োজনে তাঁকেও প্রাণিবিজ্ঞানের ব্যাপারে জানতে হয়। যিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁকে এখন আর গণিতচর্চার ব্যাপারে বিমুখ হলে চলে না। অথবা ধরুন, কেউ হয়তো কাজ করছেন বাইওজেনিক বাইওলজির ওপর। তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান দুই জানতে হবে। অবস্থা যখন এমন, তখন এমন তো করা যায়, বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মানুষ একত্রিত হন, বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সামনে বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে এমন কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন। এতে করে সবাই লাভবান হতে পারেন।

ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ জে পি মিত্তলও বললেন, বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভাগীয় আলোচনাচক্র নীচু মানের। পেশাগতভাবে ঐ সব আলোচনার মূল্য অনেক কম। বরং উদ্যোক্তারা যদি আরও বেশী পপুলার লেকচারের ব্যবস্থা করতেন তাতে আমরা অনেকেই লাভবান হতে পারতাম।

এবং ঐ একই ধরনের মন্তব্য করেছেন জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদ্য মনোনীত ফেলো এবং বিশিষ্ট জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্ত, এলাহাবাদ বিশ্ব-

অধ্যাপক বি সি হালদার। সভাপতি : রসায়ন বিভাগ

শ্রী[illegible] নাথ। সভাপতি : ভূ-তত্ত্ব এবং ভূগোল বিভাগ

বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এফ সি আউলাক, ডঃ এ আর ভারমা এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ আর পি রায় প্রমুখ। এঁরা সবাই প্রবীণ বিজ্ঞানী।

*

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৬১তম সাধারণ অধিবেশন এ বছর বসেছিল নাগপুরে। অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয় ৩১ ডিসেম্বর। ৩ জানুয়ারি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক আচরিত প্রথা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। মূল সভাপতি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট গণিতবিদ ডঃ রতনশংকর মিশ্র।

ট্রেন এবং অন্তর্দেশীয় বিমান চলাচল ব্যবস্থার বিপর্যয়ের দরুন সদস্যদের একটা বড় অংশ এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে চার পাঁচ হাজারের মত বহিরাগত সদস্যের আসার কথা ছিল কিন্তু এসেছিলেন এক হাজারেরও কম। ওঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন বিদেশী কৃতী বিজ্ঞানী।

শ্রীমতী গান্ধীর উদ্বোধনী ভাষণে দেশের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান একবার বিশেষভাবে লক্ষ করার মত জাতীয় সমৃদ্ধির জন্যে তাঁরা সমবেতভাবে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করুন—তাঁর বক্তৃতার এটাই ছিল মূল বিষয়বস্তু।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মিশ্র বিশ্লেষণ এবং যুক্তির সাহায্যে মুখ্যত গণিতশাস্ত্রের বহুমুখী এবং সুদূরপ্রসারী ভূমিকার কথা আলোচনা করলেন। বললেন অনেকেই মনে করেন, এখন বিশুদ্ধ গণিত পড়ে কি হবে? অথচ একটু চিন্তা করলে দেখা যায় বিশুদ্ধ এবং প্রায়োগিক গণিতের মধ্যে পার্থক্য কি তেমন [illegible]

অধ্যাপক আর এস সিং। সভাপতি
উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক শর্মা বললেন, নৌচালনার প্রয়োজনে এক সময় ত্রিগোনোমিতির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে গণিত-শাস্ত্রের এই প্রায়োগিক অধ্যায়টি গিয়ে দাঁড়াল বিশুদ্ধের পর্যায়ে। আবার দেখুন, ১৯১০ সালে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী জেমস জিনস গ্রুপ থিওরি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ বস্তুটি বাদ দেওয়াই ভাল। কারণ, পদার্থবিজ্ঞানে এই তত্ত্ব কোন কাজেই আসবে না।' কিন্তু ওসওয়াল্ড ভেবলেন তাঁর এই উক্তি সমর্থন করতে পারেন নি। পরবর্তী কালে দেখা গেল এই গ্রুপ থিওরিই আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের বিশিষ্টতম মণির আসন দখল করে বসল। পদার্থের অন্যতম মৌল কণা বেরিওন ওমেগা মাইনাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই তত্ত্বই প্রথম খবর যোগায়। পরে গবেষণাগারে তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

অধ্যাপক মিশ্র বললেন, পাশ্চাত্যের যে-কোন দেশের গণিতের পাঠক্রমের সংগে আমাদের গণিতের পাঠক্রমের পার্থক্য তেমন একটা কিছু নেই। যেটা দরকার সেটা হল সুষ্ঠু পঠনব্যবস্থা। এ ব্যাপারে ক্রমে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। তিনি আরও বলেন, সমাজ-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পরিবেশ দূষিত-করণের উপর গবেষণা, সর্বত্র, গণিতের সাহায্য আমাদের চাই-ই। এর জন্য সামগ্রিক পঠন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

চীন দেশের একটি উপমা উদ্ধৃত করে অধ্যাপক মিশ্র বললেন ধরুন, একদিন কাউকে আপনি একটি মাছ উপহার দিলেন। সে ওই দিনই মাছ খেল। কিন্তু কি করে মাছ ধরতে হয় এ শিক্ষাটা কাউকে যদি দেওয়া যায়, সে চিরদিন মাছ খেতে পারে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য, শিক্ষার ব্যবস্থাটা এমন হওয়া দরকার যাতে যে কেউ তাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারেন।

✻

রুটিনমাফিক নাগপুর বিজ্ঞান কংগ্রেসেও কয়েকটি জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা

অধ্যাপক এল আর কে তোপর। সভাপতি : নৃতত্ত্ব এবং প্রত্নবিদ্যা বিভাগ

হয়েছিল। যেমন, উদ্ভিদের অসমাহিত রোগ সমস্যা নিয়ে বলেছেন অধ্যাপক টি এস সদাশিবম, ডঃ নীলরতন ধর পরিচালিত 'সবুজ-বিপ্লবের ওপর আলোচনাচক্র, ডঃ এম এস স্বামীনাথনের 'ইনডিয়ান এগ্রিকালচার অ্যাট দ্য ক্রস রোড', অধ্যাপক এ জেগেশ্বরা রাও-এর 'স্বপ্ন এবং নিদ্রা', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসুর 'এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' এবং ডঃ এ আর ভার্মার 'ক্রিস্টেল গ্রোথ' প্রভৃতি।

অধ্যাপক জেগেশ্বরা রাও-এর স্বপ্ন এবং নিদ্রার উপর আলোচনা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। কি পর্যায়ে মানুষের চোখে ঘুম আসে, স্বপ্নের সঙ্গে ঘুমের কি সম্পর্ক অধ্যাপক রাও অদ্ভুত বচনভঙ্গীতে যেভাবে সে সব ব্যাপার বিশ্লেষণ করেছেন, এক কথায় তা অনবদ্য। ডঃ নীলরতন ধর প্রবীণ বিজ্ঞানী। গত কয়েক বছর ধরেই সবুজ বিপ্লবের উপর তিনি অনেক কথাই বলেছেন। এবারও বললেন। তাঁর বক্তৃতা খুবই মনোগ্রাহী। কিন্তু এবার মনে হয়েছে কতখানি তা তথ্যনির্ভর বলা শক্ত। যখন তাঁর বক্তৃতা শুনছিলাম, পাশ থেকে একজন মন্তব্য করলেন, ডঃ ধর আজকাল 'সায়ান্স ফিকসন করছেন।' এবং আরও অদ্ভুত লাগল, ঐ সভায় জনৈক প্রবীণ বিজ্ঞানী কৃষিবিজ্ঞানের উপর বলতে উঠে রেফারেন্স হিসেবে পাঠ করলেন কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার 'কাটিং'। বিজ্ঞানীদের সভায় প্রমাণ কোন গবেষণাপত্র থেকেই রেফারেন্স দেওয়া হয়ে থাকে এতদিন এটাই জানা ছিল। কারণ একমাত্র গবেষণাপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলীই নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়। তা না করে সংবাদপত্র থেকে রেফারেন্স নিয়ে বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা—এটা কি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অসারতার কথাই প্রমাণ করে না? এ থেকে আমাদের অগণ্য বিজ্ঞানী সম্পর্কে উপস্থিত [illegible] বিজ্ঞানীরা কি ভাবলেন?
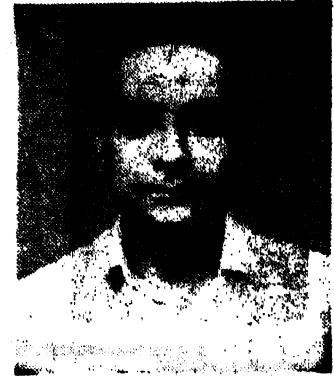
[illegible] ১ [illegible] বসু গত বছর [illegible] আরও [illegible] বড় ক্লাসের [illegible] বিজ্ঞান [illegible] বেশানে, তুলে [illegible]। তা [illegible], বিজ্ঞা [illegible] বাড়ছে, সেই [illegible] বাড়ছে [illegible] বিজ্ঞানী [illegible] ছেলে-মেয়েরা [illegible]-সি [illegible] করে শিক্ষকের কাছে [illegible] আমার কি করব'

ডঃ বি আর সেনগুপ্ত। সভাপতি : পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান

ডঃ এইচ এল চৌধুরী। সভাপতি : প্রাণিবিজ্ঞান ও পতঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগ

ডঃ বি চৌধুরী। সভাপতি : কৃষি বিজ্ঞান

ডঃ অজিতকুমার মাইতি। সভাপতি ঃ শারীরবিজ্ঞান

বলে। সরকার গোঁজাতালি দেবার মত করে 'ডোনাস অ্যান্ড এইডস' দিয়ে কত দিন এ সমস্যা জিইয়ে রাখবেন? বলা বাহুল্য, অধ্যাপক বসুর এই প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্যাপক এই সমস্যাটি নিয়ে আরও বেশী আলোচনা এবং অনেকে মিলে কি করা যেত না?

*

বিভাগীয় আলোচনাচক্রগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় আমি যাচ্ছি নে। সমালোচকরা যাই বলুন, কয়েকটি আলোচনাচক্রে যথেষ্ট আন্তরিকতা এবং যথাযথ মানের পরিচয় অবশ্যই কেউ কেউ দেখেছেন। যেমন ধরুন, ডঃ এ কে মাইতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শারীরবিজ্ঞানের উপর আলোচনাচক্র। এখানে দেখলাম গণিতের সাহায্যে জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশের চেষ্টা। দেখলাম, ডঃ সুজাত মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম গবেষণার ফলাফল। গত কয়েক বছর ধরে ডঃ মুখোপাধ্যায় প্রায় ৫৭ জন রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমে কেউ ছিল মেয়ে, পরে তাদের মধ্যে পুরুষের গুণাবলী ধরা পড়েছে। কেউ বা পুরুষ হয়ে জন্মেও (অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে) পরে মেয়ের গুণাবলী অর্জন করেছে। প্রজননগত এই যে ত্রুটি—যা সমাজ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একটা বড় রকমের সমস্যা—ডঃ মুখোপাধ্যায় ওই আলোচনাচক্রে প্রমাণাদি সহ যেভাবে বিশ্লেষণ করলেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ডঃ এক এস কোঠারির 'ইনটার‍্যাকশন অব স্লো নিউট্রনস উইথ সলিড্‌', বসু-সংখ্যায়নের উপর ডঃ বিশ্বাসের বক্তৃতা অথবা শ্রীমুক্তিনাথ-এর ভারতে ফসফোরাইট সম্পর্কিত সমস্যার উপর আলোচনা শুধু তথ্যনির্ভরই ছিল না, উপস্থিতমণ্ডলীকে ঐ সব আলোচনা যথেষ্ট খোরাক যুগিয়েছে।

*

তবু বলব, এই অধিবেশনে আরও কতকগুলি ব্যাপারে জোর দেওয়া উচিত ছিল। [illegible] আরও [illegible] বিজ্ঞান কংগ্রেসের [illegible] লোকের ভূমিকায় যেন সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকেই এখনও [illegible] সত্যেই [illegible] বিজ্ঞান [illegible] গেছেন। [illegible] অধিবেশনে [illegible] কথা বলায় [illegible] না?

কারকজন তরুণ গবেষক অভিযোগ করলেন, আর সায়ান্স কংগ্রেসে পেপার দিয়েই বা কি লাভ, বলুন? পড়বে কে? তা ছাড়া পেপার দেওয়া হল 'ভবিষ্যৎ'। ওঁরা গ্রহণও করলেন। কিন্তু অত পেপার সেমিনারে পড়ার সুযোগ কোথায়? একটি সেমিনারে পেপার পড়ার সুযোগ পায় বড় জোর তিন-চারজন। এক একজনের জন্যে সময় বরাদ্দ পাঁচ থেকে আট মিনিট। এটুকু সময়ে কি পড়বেন, বলুন? তা ছাড়া আলোচনা যখন চলে, স্যাররাই কথা বলেন বেশী। স্যাররা ভুল করলে আমাদের চেপে যেতে হয়। প্রতিবাদ করলে বিপদ আছে।

জানি না এ অভিযোগ কতটা সত্য। কিন্তু অভিযোগ কানে শুনেছি।

প্রশ্ন এই, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পিছিয়ে গেল। কেন গেল? অথবা ধরুন, এই পরিকল্পনার ব্যাপারে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা কি ভাবছেন। এর ভাল মন্দ এই পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে তাঁরা কি পাচ্ছেন, কি পাচ্ছেন না—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বৃহত্তম এই অনুষ্ঠানে এত যে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ যোগ দিলেন, অনেক কথাও বললেন—সে সব ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা যেত না? জাতীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু 'ফ্রেম'-এর আভাস তো এখানে তৈরি করা যেত? অথবা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং

অধ্যাপক এইচ এন আদমখানা। সভাপতি ঃ মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা বিজ্ঞান

শ্রীজীবন দত্ত। সভাপতি ঃ প্রযুক্তি বিজ্ঞান এবং ধাতু বিজ্ঞান

কারিগরি গবেষণা পর্ষৎ যে সব নতুন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীরা তার যথার্থতা নিয়ে তো আলোচনা করতে পারতেন? এ প্রশ্ন নাগপুরে বসেই কয়েক ডজন বিজ্ঞানীর সামনে রেখেছিলাম। আমার প্রশ্ন তাঁরা সমর্থন করেছেন। কিন্তু সেখানে এ ধরনের কোন উদ্যোগই আমার চোখে পড়ে নি।
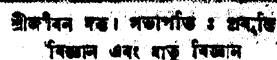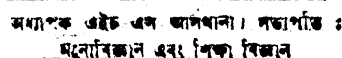
আমাদের বড় রকমের দুর্ভাগ্য, বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার মত সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা এ-দেশে এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কেউ বলছেন আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান লেখ, সাধারণ লোক বুঝতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন এই—কিভাবে লেখা উচিত, কোন বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া দরকার, ইতিমধ্যে এই কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সাহায্যে ব্যাপারটাকে আরও কিভাবে ফলপ্রসূ করে তোলা যায়, অথবা ধরুন, সংবাদ এবং সাময়িক পত্র এবং বেতার মাধ্যমকে এ ব্যাপারে আরও কত ভালভাবে কাজে লাগানো সম্ভব, এ সব নিয়েও তো বিজ্ঞানীরা কিছুটা আলোচনা করতে পারতেন?

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ভারতের বিজ্ঞান সমাজের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী। অতএব বলা চলে, দেশের বিজ্ঞান এবং কারিগরি সমস্যার উপর স্বাধীনভাবে আলোচনা করার সব চাইতে বেশী সুযোগ এই প্রতিষ্ঠানেরই আছে। তা যদি হয়, বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিচালকবৃন্দ গতানুগতিকতা ত্যাগ করে যে সব অভিযোগ উঠেছে তার কতখানি সত্যি, এবং যদি কিছুটাও সত্যি হয়, কিভাবে সে সব ত্রুটি দূর করা যায় যদি সেটা ভেবে দেখেন, ভবিষ্যতে অনেকেই তাতে হয়তো উপকৃত হতে পারবেন।

সমরজিৎ কর

রক্তমৃত্তিকা

মৃণাল গুপ্ত

নদীনালার দেশ এই বাংলা। নদনদীর অকৃপণ দানে উত্তর বাংলা যে পলিমাটিতে গঠিত, সেই নরম পলিমাটি আর প্রতিকূল জলীয় আবহাওয়া কোন দিনই কোন ঐতিহাসিক নজীরকে কালজয় করে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে মুসলমান-পূর্ব যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের বিচিত্র যে ধারা বাংলাদেশকে স্পর্শ করেছিল, তার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এ দেশের মাটির উপর খুঁজে পাওয়া রীতিমত দুঃসাধ্য। তবুও ভৌগোলিক প্রতিকূলতার দেশ এই বাংলার বুকে এমন কয়েকটি উঁচু উঁচু ঢিপি বা ডাংগা কোন কোন এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে, যাদেরকে কেন্দ্র করে প্রকৃত ইতিহাস-সন্ধানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন ইতিহাসের প্রত্নসম্ভার আবিষ্কারের আশায় ব্রতী হতে পারেন। পশ্চিম বাংলার ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যে বিস্তীর্ণ রাঢ়ভূমি, তারই কোন কোন স্থানে এ ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সম্ভাবনাপূর্ণ একটি স্থান হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ রাজবাড়ির ডাঙ্গার উপর গত '৬২ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য চালিয়ে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। প্রত্ন-উপাদানের অপ্রতুলতায় বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস আজও আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে স্বচ্ছ নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ মহাজনপদের কাল থেকে ষষ্ট পরবর্তী গুপ্তযুগ পর্যন্ত উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তদানীন্তন বাংলাদেশকে এক স্বাধীন রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতায় কখনোই আমরা ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখিনি। গুপ্ত পরবর্তী খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শুরুতেই প্রথম দেখি গৌড়ভূমির প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে উত্তর ভারতীয় রাজনীতির গতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গৌড় তথা বঙ্গদেশকে এক বৃহত্তর পরিচিতির ব্যঞ্জনায় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই সমকালীন পূর্ব ভারতীয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্নায়ুকেন্দ্র কর্ণসুবর্ণ যে এই রাঙামাটি অঞ্চলেই একদা অবস্থিত ছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্য তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে। ঐতিহাসিক রাঙামাটি অঞ্চল ও তার খননকার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরবার প্রয়াসেই এই মুখবন্ধ।

[illegible] বাংলার [illegible] বিহারের [illegible] জ্যোতিষ্কবী [illegible] মুর্শিদাবাদ [illegible] দুটো [illegible] দক্ষিণে [illegible] পাড়ের নাম বাগরী, পশ্চিম পাড়ের নাম রাঢ়। রাঢ় এলাকায় তুলনায় বাগরী এলাকাকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলেই ধরে নেওয়া হয়। নবাবী মুর্শিদাবাদের যা কিছু ভগ্ন-স্মৃতি তা এই বাগরী এলাকাতেই চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে রাঢ় অঞ্চল প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। ১৯২৮ সালের এক সরকারী প্রত্ন সমীক্ষানুযায়ী জেলার এই রাঢ় অঞ্চলকে যুগক্রমে দুটো ভাগে চিহ্নিত করা যায়। দক্ষিণে সালার অঞ্চল থেকে উত্তরে চিরুটী ও পশ্চিমে পাঁচথুপী,—

চূনবালি নির্মিত অপূর্ব মুখভঙ্গিমা সমন্বিত গুপ্ত যুগের নারীমূর্তির মুখ
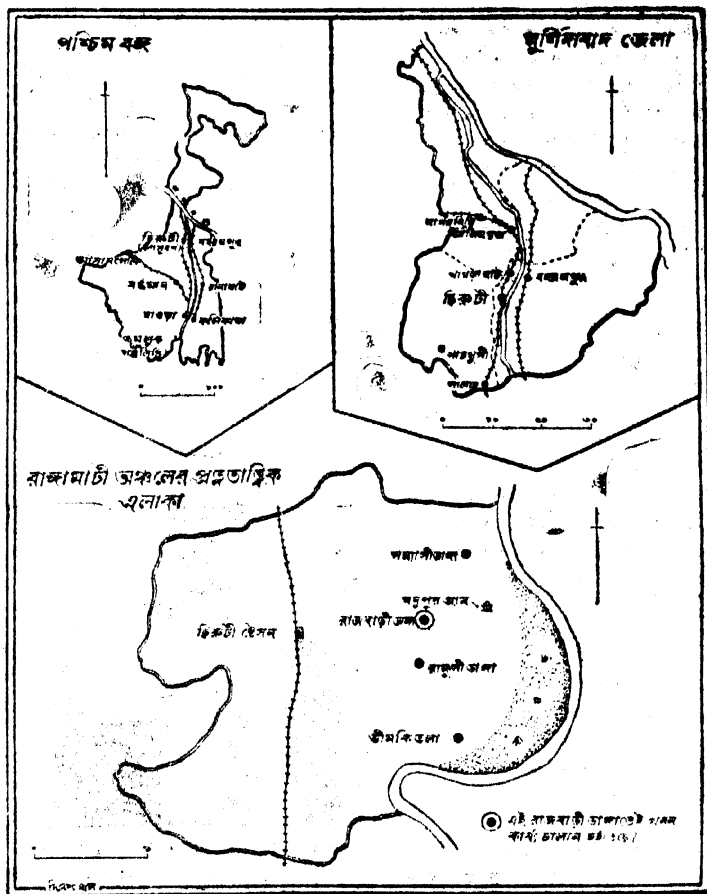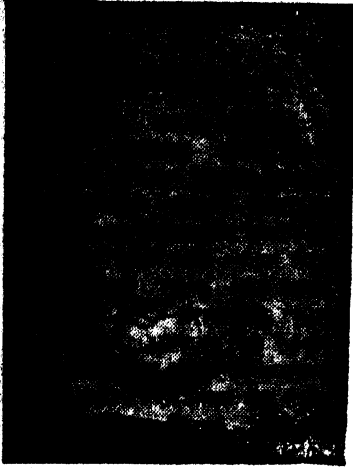
এই ত্রিভূজাকৃতি ভূভাগটিকে গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগ থেকে খ্রীঃ ৭।৮ শতকের ইতিহাসের উপকরণে সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে ধরা যেতে পারে। উত্তরে জঙ্গীপুর মহকুমার মহীপাল, মণিগ্রাম, সাগরদিঘী এলাকাকে পাল সেন যুগের প্রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে ধরা হয়। রাঙামাটি অঞ্চলটি রয়েছে প্রথমোক্ত ভাগে—বহরমপুর শহর থেকে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। হাওড়া-আজিমগঞ্জ রেলপথের ছিরুটী (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) স্টেশনে নেমে মাইলখানেক পূবে হেঁটে এই অঞ্চলে পৌঁছানো যায়।

॥ ভূ-বিবরণ ॥

যদি কোন প্রাচীন নগরী বা জনপদ কোন নৈসর্গিক কারণে বা বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হয়, তখন সেখানকার ভগ্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের উপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের গুল্ম জন্মিয়ে ও যুগক্রমে তার উপর মাটির আস্তরণ পড়ে সমস্ত পরিত্যক্ত নগর বা জনপাদটাই উঁচু উঁচু ডাঙ্গা বা মাটির ঢিপির অন্তরালে হারিয়ে যায়। কালক্রমে সেই ডাঙ্গাগুলোর উপর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে থাকে অসংখ্য ভগ্ন মাটির পাত্র, পাথরের টুকরো, আর ইটের খোলামকুচি। এটাই হচ্ছে যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বহিরাবরণের মোটামুটি চেহারা। ঠিক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রায় মাইল ছয়েকের পরিধি বিশিষ্ট একটি এলাকা চোখে পড়ে এই রাঙামাটি অঞ্চলে। এই এলাকার মধ্যে পড়ে যদুপুর, মধুপুর, গোবিন্দপুর, রাঙামাটি, চাঁদপাড়া, আঁরোয়া, সংস্কার, মাঝিরা প্রভৃতি গ্রাম। এই এলাকার অধিকাংশ জায়গার মাটির রং লাল। ভূমি [illegible] সমতল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঁচু-নীচু। ওপরকার নরম মাটির আবরণটা বিছুটা সরালেই প্রাচীন ইট ও পাথরের মাটি বেরিয়ে আসে। এই এলাকার উঁচু ঢিপি বা ডাঙ্গাগুলোর মধ্যে দুটো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ—রাক্ষসী ডাঙ্গা ও রাজবাড়ি ডাঙ্গা। ৩০ ফিট উচ্চতার ও ৭০০ ফিট পরিধি বিশিষ্ট রাক্ষসী ডাঙ্গার অবস্থান রাঙামাটি চাঁদপাড়া গ্রামের কাছে। এই ডাঙ্গার প্রায় ১/৪ মাইল উত্তর-পূবে রাজবাড়ী ডাঙ্গা দাঁড়িয়ে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা ১০/১২ ফিট। তবে অন্যান্য ডাঙ্গার চেয়ে এর পরিধি অনেক বেশী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুধীররঞ্জন দাসের নেতৃত্ব এই রাজবাড়ি ডাঙ্গার উপরই বর্তমানে খননকার্য চলছে। পুরোপুরি ডাঙ্গা না হলেও, এই অঞ্চলের আর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হচ্ছে ভিমকীতলা। অতীতে ভাগীরথী রাঙামাটি অঞ্চলের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হতো। বর্তমানে ভাগীরথী এই রাঙামাটির অধিকাংশ এলাকাকে বিধ্বস্ত করে প্রায় মাইল দুয়েক পূবে সরে গেছে। গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ বর্তমানে 'বাঁওড়' নামে চিহ্নিত হচ্ছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড এই অঞ্চলের ভূমি-বিন্যাস সম্পর্কে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন।

॥ প্রাপ্ত প্রত্ন-উপকরণ ॥

এ ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন প্রকার সুপরিকল্পিত খননকার্য ছাড়াও, চাষ আবাদের সময় মাঝে মাঝে যে মূল্যবান প্রত্নউপকরণ আবিষ্কৃত হবে, একথা স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ধরনের আবিষ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন কতগুলো অনভিজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে, যাদের কাছে ওগুলোর মূল্য সামান্য পাথর বা খোলামকুচির চেয়ে বেশী কিছু নয়। স্থানীয় লোকমুখে ও প্রাচীন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন যুগে এ অঞ্চল থেকে যে সমস্ত প্রত্নউপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তাঁর গ্রন্থে (১৯০২-১৯০৩) উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের মূর্তিপ্রাপ্তি ছাড়াও এই রাজবাড়ি ডাঙ্গা থেকে দুটো সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। ১৯৫৭-৬০ সালে এই অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে আমি কিছু মূল্যবান প্রত্ন-উপকরণ সংগ্রহ করি। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল আড়াই ফুট দীর্ঘ খৃঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দুষ্প্রাপ্য লকুলিশ
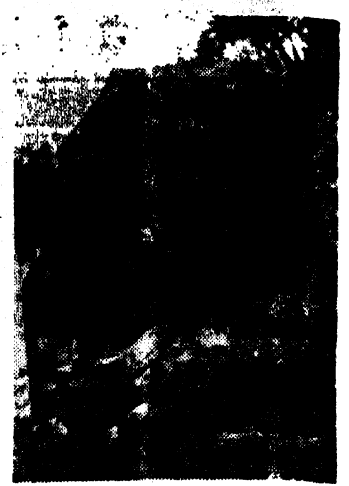
খৃঃ ৭-৮ম শতকের অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি

মূর্তি, খৃঃ নবম-দশম শতকের বৌদ্ধ তারা মূর্তি ও রাজবাড়ি ডাঙ্গা থেকে সংগৃহীত বৌদ্ধসূত্র সম্বলিত একটি পোড়ামাটির সীল। এগুলির সমস্তই বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। স্থানীয় রাজা শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠের নির্মাণকার্য চালাতে গিয়ে কিছু প্রত্নউপকরণ সংগৃহীত হয়। এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য চুনবালি নির্মিত অপূর্ব মুখ-ভঙ্গিমা সম্বলিত গুপ্তযুগের নারী মূর্তির একটি মুখ। নিম্বপত্রাকৃতি অর্ধ-নিমীলিত আঁখি স্ফুরিত অধরোষ্ঠ ও ভূষণময় কর্ণে ভূষিত লাবণ্যঘন মুখমণ্ডলটি বাংলাদেশের শিল্পশৈলীর একটি অনন্য সংযোজন। '৬৪ সালে ডক্টর সুধীররঞ্জন দাস মহাশ[য়] এই এলাকা থেকে খৃঃ ৭-৮ম শতকের অষ্ট ভূজা-মহিষমর্দিনী মূর্তি সংগ্রহ করেন।

॥ প্রচলিত কিম্বদন্তী ॥

এমন কোন ঐতিহাসিক স্থান খুঁজে বের করা কষ্টকর, যাকে কেন্দ্র করে সাধার[ণ] মানুষের মনে কোন কিম্বদন্তীই বা[সা] বাঁধেনি। সাধারণ মানুষ ইতিহাসের সঠি[ক] ধারাবিবরণী বা সাল-তারিখের নির্ভু[ল] নির্ঘণ্ট নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা ইতি[-] হাসের সামান্যতম উপাদানকে অবলম্বন ক[রে] কিম্বদন্তীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় খোঁ[জে]। রাঙামাটি অঞ্চলের ভূগর্ভে অতীত ইতি[-] হাসের যে উপাদান লুকিয়ে রয়েছে, স্থানী[য়] লোকেরা সে সম্পর্কে উদাসীন হতে পা[রে] কিন্তু রাঙামাটির উঁচু উঁচু ডাঙ্গা ত[থা] ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইটপাথরের সা[থে] কিম্বদন্তীর যে মায়াজাল জড়িয়ে র[য়েছে] সে সম্পর্কে তাদের আগ্রহ অপরিস[ীম]। রাঙামাটির প্রতিটি ডাঙ্গার নামকর[ণের] সাথেই জড়িয়ে রয়েছে এক একটি প্রা[চীন] মধুর কিম্বদন্তী। রাক্ষসী ডাঙ্গার ন[াম]

কবগ্রের পেছনে রয়েছে রাক্কস-খোক্কসের এক আকর্ষণীয় গল্প। সাধারণ মানুষ বলে, রাজবাড়ি ডাঙ্গায় ছিল দাতাকর্ণ ও শশাঙ্কের রাজবাড়ি। রাজবাড়ি ডাঙ্গার উপর দাঁড়িয়ে তারা লুপ্ত রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশের এমন নিখুঁত বর্ণনা দিতে শুরু করে, মনে হয় এখানকার ইতিহাসের যা কিছু পট পরিবর্তন সবই যেন তাদের চোখের সামনেই ঘটে গেছে। এই অঞ্চলে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিম্বদন্তী রয়েছে দাতা-কর্ণকে কেন্দ্র করে। কিম্বদন্তী রয়েছে, কর্ণ-পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাশনের সময় লঙ্কা থেকে একবার বিভীষণ এখানে এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। তখন তিনি কর্ণ-পুত্রের কল্যাণার্থে আড়াইদণ্ড স্বর্ণবৃষ্টি করিয়েছিলেন এখানে। সেইজন্যই নাকি এখানকার মাটির রং সোনার মত লাল। এ ধরনের বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য অনেক কিম্বদন্তীই ছড়িয়ে রয়েছে রাঙামাটি অঞ্চলের সর্বত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই কিম্বদন্তীগুলো অর্থহীন মনে হলেও এদের মধ্যেই অনেক সময় লুপ্ত ইতিহাসের কিছু কিছু ছিন্নসূত্র লুকিয়ে থাকে।

॥ রাঙামাটিই কি কর্ণসুবর্ণ ॥

আমাদের দেশে কোন প্রামাণিক প্রাচীন ভৌগোলিক ইতিহাস না থাকায় প্রাচীন জনপদগুলোর স্থান নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক-বৃত্তান্তের উপর আমাদের বেশ কিছুটা নির্ভর করতে হয়েছে। কর্ণসুবর্ণ নগরীর স্থান নির্দেশের ক্ষেত্রেও কর্ণসুবর্ণে ভ্রমণকারী য়ুয়ান-চোয়াঙের বর্ণনার উপরই আমরা বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, য়ুয়ান-চোয়াঙের বাংলায় ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত ও ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে পরস্পরবিরোধী উক্তি এই নগরীর স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এতদিন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম সিংভূম ও বড়ভূমের সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কর্ণসুবর্ণ নগরের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করতেন। মার্টিন, বেগলার, লেয়ার্ড প্রভৃতি পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় কর্ণসুবর্ণ নগরীর স্থান নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। জীবনচরিত ও সি-ইউ-কির (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) তুলনামূলক আলোচনায় এ-কথা স্পষ্ট হয় যে, জীবন চরিতে বিবৃত পথ-নির্দেশ অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ, নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্য। জীবন চরিতের বর্ণনানুসারে য়ুয়ান-চোয়াং পুণ্ড্রবর্ধণ হতে দক্ষিণ-পূর্বে ৯০০ মিঃ পথ অতিক্রম করে কর্ণসুবর্ণ নগরীতে আসেন। এবং কর্ণ-সুবর্ণ থেকেই দক্ষিণ-পূর্বে সমতটে যান। ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুযায়ী কামরূপ হতে সমতট ও তাম্রলিপ্ত হয়ে কর্ণসুবর্ণে আসার কোন যুক্তি নেই। বেভারিজ সাহেব তুলনা-

লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ও আশুতোষ মিউজিয়মে প্রদত্ত দুষ্প্রাপ্য লকুলিশ মূর্তি, (খৃঃ ৫-৬ শতক)

মূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে জীবনচরিতের বর্ণনা অনেকাংশেই যথার্থ। এবং তিনিই প্রথম ইঙ্গিত করেন রাঙামাটি অঞ্চলই হচ্ছে কর্ণসুবর্ণ নগরীর প্রাচীন অবস্থান। কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলের আবহাওয়া, ভূমি ও শস্যসম্ভার সম্পর্কে য়ুয়ান-চোয়াং যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন বর্তমান রাঙা-মাটি অঞ্চলের সাথে তার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। দু এক শতক পূর্বে রাঙামাটি অঞ্চলকে যে 'কানসোনা', 'কর্ণস্বর্ণ', 'কানসোনা কা গড়' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হতো, কোন কোন নথিপত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এই নামগুলো কর্ণসুবর্ণ নামেরই অপভ্রংশ। অতীতে এখানে যে সকল প্রত্ন-উপকরণ পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশেরই সময়কাল কর্ণসুবর্ণের সমসাময়িক। এই সব সূত্রের উপর নির্ভর করে এতদিন ঐতিহাসিকেরা রাঙামাটি এলাকাকেই কর্ণসুবর্ণের সম্ভাব্য স্থান হিসাবে অনুমান করেছেন মাত্র। সকল অনুমান ও মতদ্বৈধতার অবসান ঘটিয়েছে '৬২ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খননকার্য। অনভিযোগ্য প্রত্নবস্তুকরের উপর নির্ভর করে খননকার্য প্রমাণ করেছে যে, রাঙামাটি অঞ্চলেই খৃষ্টীয় ৭ম শতকে কর্ণসুবর্ণ নগরীর অবস্থান ছিল।

॥ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥

খৃঃ সপ্তম শতকে শশাঙ্কের সময়ই গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল শৌর্যে বীর্যে উন্নতির চরম শিখরে। শশাঙ্কের

খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত রাজবাড়ী ডাঙ্গায় ব্যাপক বসতির ধ্বংসাবশেষ

মৃত্যুর পর ৬৩৮-৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ান-চোয়াঙ কর্ণসুবর্ণ নগরী পরিভ্রমণ করে যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন তা থেকেই তৎকালীন কর্ণসুবর্ণ নগরী সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব। সপ্তম শতকের কর্ণসুবর্ণ প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর ও সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট কেন্দ্র। পাঁচ মাইল পরিধিবিশিষ্ট জনবহুল নগরীর অধিবাসীরা ছিল খুব অবস্থাপন্ন ও সচ্ছল। সে সময়ে নগরীতে পঞ্চাশটিরও বেশী দেবমন্দির ছিল। বৌদ্ধ বিহার ছিল দশটিরও ওপরে। বিহারগুলোতে দু হাজারেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুর বসবাস ছিল। নগরীর অনতিদূরেই ছিল বিদ্যাচর্চার সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল লো-টো-মি-চি বা রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহার। (রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম পরবর্তী কালে রাঙামাটি হওয়া স্বাভাবিক।) এই বিহারের কাছেই ছিল রাজা অশোকের নির্মিত একাধিক বৌদ্ধ স্তূপ। গৌতম বুদ্ধের কর্ণসুবর্ণে ধর্ম প্রচারের সময় যে সমস্ত স্থান তাঁর পবিত্র স্মৃতির সাথে জড়িত, সম্রাট অশোক সেই সমস্ত পবিত্র স্থানেই স্তূপগুলো নির্মাণ করান।

য়ুয়ান-চোয়াঙের এই বর্ণনার উপর যদি নির্ভর করি, তবে কর্ণসুবর্ণের ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকেই টানা যেতে পারে। কর্ণসুবর্ণে গৌতম বুদ্ধের আগমন সম্পর্কীয় য়ুয়ান চোয়াঙের এই উক্তি যদি যথাযথ হয়, তবে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শো বছর পূর্বেও অন্ততপক্ষে একটি বিশিষ্ট জনপদ হিসাবে রাঙামাটি অঞ্চলের যে গুরুত্ব ছিল, একথা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। কারণ বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই কোন জনমানববিবর্জিত স্থানে এসে ধর্মপ্রচার করেন নি। কিন্তু বুদ্ধদেব আদৌ বঙ্গদেশে এসেছিলেন কি না, এ সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের "কোষপ্রবেশ্য রত্ন-পরীক্ষা" অধ্যায়ে উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে পূর্বদেশে এক সৌবর্ণকুড্যকের উল্লেখ রয়েছে। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের সুপ্রাচীন সৌবর্ণকুড্যকই বর্তমানের রাঙামাটি অঞ্চল। এবং এই সৌবর্ণকুড্যকই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে কর্ণসুবর্ণ নামে চিহ্নিত হচ্ছে। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুমান প্রামাণিক হলে, খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক তিন শো বছর আগে বর্তমানের রাঙামাটি অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত জনপদই শুধু নয়, উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র নির্মাণেরও যে অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল এ কথা সহজেই অনুমেয়। ১৮৩৪ খ্রীঃ মালয়ের ওয়েলেসলি জেলার এক বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে একটি প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিটির একটি ছত্রে লেখা রয়েছে, "মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকা বাস।" রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের দীর্ঘ সমুদ্রপথ শুভ হোক—এ ধরনের একটি কামনা লিপিটির মধ্যে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিপিটি খ্রীঃ ৫ম শতকের। অনুমিত হয় যে, রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা উপলক্ষে এই রাঙামাটির কোন বৌদ্ধ বিহারের শ্রমণদের পক্ষ থেকে এই শুভ কামনাটি জানানো হয়েছিল। খ্রীঃ ৫ম শতকেও এই রাঙামাটি অঞ্চলের অধিবাসীরা যে সমুদ্রপারের দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, এ কথা এই লিপিটি থেকেই প্রমাণিত হয়। বাপ্পাঘোষবাট পট্টোলী থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্ট-পরবর্তী ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। পরবর্তীকালে সম্ভবত শশাঙ্ক এই জয়নাগকে পরাস্ত করেই কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। উপযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের অভাবে বাংলার প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের জীবন-ইতিহাস আজও আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। শত্রুপক্ষের বিবরণী, কয়েকটি মুদ্রা, তাম্রশাসন এবং সীলমোহর থেকে শশাঙ্ক সম্পর্কে যে তথ্য উদ্ধার করা যায় তাতে দেখা যায় যে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন খণ্ড জনপদগুলোকে শশাঙ্কই প্রথম ঐক্যবদ্ধ করেন। এবং এই কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে এক বিশাল গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্ক কতদিন পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা ঠিক যে, শশাঙ্ক ৬০৩ খ্রীঃ থেকে ৬১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত গৌড়াধিপতি ছিলেন। নিধনপুরের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কর্ণসুবর্ণ কিছুকালের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মানের অধিকারে আসে। এর পর দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণের কোন ইতিহাস জানা যায় না। তবে বহুদিন

রক্তমৃত্তিকা বিহারের মূল্যবান সীলমোহর

পর্যন্ত এই অঞ্চল যে রাঙামাটি নামে পশ্চিম বাংলার একটি জনবহুল ও বিশিষ্ট জনপদ হিসেবে চিহ্নিত হতো, প্রাচীন কয়েকটি মানচিত্রে ও মুঘল আমলের কিছু প্রাচীন গ্রন্থে তার সাক্ষ্য মেলে। ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড এসিয়াটিক রিসার্চে উল্লেখ করেছেন যে, রাঙামাটি দ্বাদশ শতকে সিংহলের রাজা কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

॥ রাজবাড়ী ডাঙ্গা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ॥

প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরীর সম্ভাব্য স্থান হিসেবে রাঙামাটির যৌক্তিকতার সঙ্গে নির্বাচন করার প্রাথমিক কৃতিত্ব ১৮৯২ সালে বেভারিজ সাহেবের। কিন্তু কর্ণসুবর্ণ নগরীর সন্ধানে দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের উপর কোন যথাযথ খননকার্য চালানো হয়নি। ১৯২৮ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা এই এলাকার রাক্ষসী ডাঙ্গার উপর এক পরীক্ষামূলক খননকার্য চালিয়ে বিভিন্ন প্রত্ন উপকরণসহ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ।৭ম শতকের এক বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের উপর কোন বিস্তারিত খননকার্য চালানোর প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘকাল পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুধীররঞ্জন দাস মহাশয় '৬১ সালে রাঙামাটি এলাকার উপর অনুসন্ধান চালিয়ে রাজবাড়ী ডাঙ্গার উপর খননকার্য চালাবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬২ সাল থেকে তাঁরই নেতৃত্বে বিস্তীর্ণ রাজবাড়ী ডাঙ্গার উপর মাঝে মাঝে খননকার্য চলছে। খননকার্যের প্রথম বৎসরেই তাঁদের উদ্দেশ্য আশাতীতভাবে ফলবতী হয়। রাজবাড়ী ডাঙ্গায় হুয়েন চোয়াঙ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ নগরীর রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের স্থান নির্দিষ্টকরণই এই খননকার্যের অসামান্য সাফল্য হিসাবে ধরা হয়।

এ ছাড়া বিগত কয়েক বছরের উৎখননে রাজবাড়ী ডাঙ্গায় আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন যুগের বসতির ব্যাপক চিহ্ন। বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্ত প্রত্ন-উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে এই বসতির ভগ্নাবশেষগুলোর সময়কাল ধরা হয়েছে খ্রীঃ ২য়-৩য় শতক থেকে শুরু করে খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে। ১৯৬২ সালের খননকার্যে প্রাপ্ত পাঁচটি ভিন্ন পর্বের (phase) বসতির চিহ্নের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বসতির চিহ্ন নিঃসন্দেহে খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতকের পূর্বের। প্রথম পর্বের বসতি যে ভাগীরথীর প্লাবনে বিনষ্ট হয়েছিল তার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। তৃতীয় পর্বের বসতির কেন্দ্র রয়েছে এক বিরাট বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ যার সময়কাল খ্রীঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে সপ্তম-অষ্টম শতকের মধ্যে। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ বিহারের সুগঠিত প্রশস্ত সিঁড়ি ও মেঝে বৌদ্ধ স্তূপের বৃত্তাকার ভিত্তিতল প্রভৃতি। পরবর্তী পর্বের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চোখে পড়ে দেয়ালপরিবৃত পবিত্র স্থানের চৌকো চিহ্ন। '৬৩-৬৪ সালের উৎখননে প্রাপ্ত এ ধরনেরই মোট ছয়টি পর্বের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল দ্বিতীয় পর্বের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রোথিত একটি নরমুণ্ড। তৃতীয় পর্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি বিরাট দগ্ধ শস্যগোলা যার মধ্যে পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোড়া ধান ও গম। এই ধান ও গম নিয়ে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জিরি রেডিও কার্বন পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই শস্যগোলা খ্রীঃ ৮ম-৯ম শতকের কোন এক সময়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। '৬৪-৬৫ সালে উৎখননে তৃতীয় পর্বের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে এক পঞ্চরত্ন মন্দিরের আকর্ষণীয় গঠনবিন্যাসের ধ্বংসাবশেষ। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে যুক্ত এক আচ্ছাদনযুক্ত প্রশস্ত সিঁড়ির গঠনবিন্যাসকে পূর্বভারতীয় স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে এক অনন্য নিদর্শন বলে দাবি করা হয়েছে।

বসতিচিহ্ন ছাড়া পরবর্তী উৎখননের ফলে যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রত্ন-উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রয়েছে ছাঁচে ও হাতে তৈরী পোড়ামাটির মূর্তি, চুনবালি-নির্মিত বিভিন্ন মূর্তির মুখমণ্ডল, খ্রীঃ ৭ম-৮ম শতকের তাম্রনির্মিত চক্র, ৮ম-৯ম শতকে ব্রোঞ্জনির্মিত বৌদ্ধ ও গণেশ মূর্তি প্রভৃতি। দুটো পোড়ামাটির মূর্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। একটি পরবর্তী গুপ্তযুগের লৌকিক দেবতার, অপরটি মস্তকের

লেখক কর্তৃক সংগৃহীত খৃষ্টীয় [illegible] শতকের বৌদ্ধ তারা মূর্তি

পশ্চাতে চক্রাকৃতি চালি সহ প্রাক গুপ্তযুগের নারীমূর্তি। রাজবাড়ি ডাঙ্গার উৎখননকে সবচেয়ে ফলবতী করেছে পোড়ামাটির সীলমোহর। বাংলাদেশের অন্য কোথাও উৎখননের ফলে এত পর্যাপ্ত পরিমাণে সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়নি। রাজবাড়ি ডাঙ্গায় পাওয়া গেছে ধর্মীয় সংস্থার অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের সীলমোহর, ব্যক্তিগত সীলমোহর ও ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে প্রদত্ত বৌদ্ধ সূত্র সহ সীলমোহর। বিহারের একাধিক সীলমোহরে ওপরে রয়েছে দুই পাশে দুই হরিণ সহ ধর্মচক্র এবং তার তলায় প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'শ্রী রক্তমৃত্তিকা মহাবৈহারিক ভিক্ষুসংঘস্য'—অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ভিক্ষু সংঘের। রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের নাম উল্লিখিত এই ধরনের সীলমোহর, প্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য প্রত্ন-উপাদানের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, প্রাচীন বাংলার বিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারটি এই রাজবাড়ি ডাঙ্গাতেই অবস্থিত ছিল। যেহেতু হুয়েন চায়াং বলেছেন যে, কর্ণসুবর্ণ নগরীর পাশেই তিনি বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারটি দেখেছিলেন, সেহেতু এ কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে রাজবাড়ি ডাঙ্গার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই কর্ণসুবর্ণ নগরীর অবস্থান ছিল। রাজবাড়ি ডাঙ্গায় প্রাপ্ত আর একটি আকর্ষণীয় সীলমোহরের মধ্যে খোদিত 'হোরা' (Horae) নামে একটি রোমান অক্ষর। এই সীলমোহরটি প্রাপ্তির ভিত্তিতে এই অঞ্চলের সঙ্গে রোমীয় জগতের যোগসূত্রের বিভিন্ন দিকের বিষয় অনুমান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে রাঙামাটি এলাকার উপর বিস্তারিত খননকার্য নিশ্চয়ই আরও কৌতূহলোদ্দীপক প্রত্নবস্তুর সন্ধান দেবে।

এখন পাবেন দুটি সাইজে। আসুন, মাখুন
এই সাবান! উপভোগ করুন এর সমৃদ্ধ ফেনার
মোলায়েম স্পর্শের যত্ন! খুশিতে ভরবে মন, স্নিগ্ধ
হবে দেহ—ঝলমলে সোনালী রোদে সদ্য ফোটা
গোলাপের মত! মোতি—আপনারই জন্য!

পাবেন তিনটি মনমাতানো
সুরভিতে—চামেলি, গোলাপ আর
খসখস। আজই আনুন মোতি।
কাল থেকে মগ্ন হয়ে যান
নতুন বিলাসিতায়!

মোতি
বিলাসপূর্ণ স্নানের সাবান
এখন পাবেন দুটি সাইজে

OBM-2384BEN.

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ— ভারত-কোষ"

'দেশ' পত্রিকার ১৪ই পৌষ ১৩৮০ সংখ্যায় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-এর 'ভারত-কোষ' প্রসঙ্গে আলোচনা এই বিষয়ে কিছু আলোকসম্পাতের সুযোগ আমাকে দিয়েছে। কতকগুলি বিষয় বাঙলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের গোচরে আনার প্রয়োজনেই এই চিঠির অবতারণা।

এক যুগেরও বেশী আগে ৬।২।৬১ তারিখের এক পত্রে পরিষদের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানান—

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ 'ভারত-কোষ' নামে বাংলা ভাষায় একখানি প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন।... এই কোষ গ্রন্থে 'ভারতে' 'কৃষি'-সম্পর্কে একটি আলোচনা সন্নিবেশিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্তার পরামর্শক্রমে 'ভারত-কোষে'র সম্পাদক সমিতি আপনাকে উহা লিখিবার দায়িত্ব দিতে চান।...'

সম্মতিদানের পর আলাপ-আলোচনার দ্বারা প্রসঙ্গ-সূচী রচনা করা হয় এবং অনুমোদনের পর প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছিয়ে দিই। ইতিমধ্যে ১৯৬২, ৫ই এপ্রিলের আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারত-কোষ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহাতে উল্লেখ থাকে যে, এই প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থে প্রধান বিভাগ থাকবে ২১টি এবং সেগুলির পৃষ্ঠসংখ্যা এবং লেখকের নাম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। কৃষির জন্য ২৫ পৃষ্ঠা এবং লেখকরূপে আমার নাম উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, ১ম খণ্ড ১৯৬২-তে প্রকাশিত হবে। কিন্তু তা ১৯৬৩-তেও হয় না, হয় ১৯৬৪'র শেষের দিকে।

আমি নূতন কাজে কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে আসি ১৯৬৩ সালের গোড়ায়। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর আমি জানতে পারি যে, বিভিন্ন বিভাগ বা বিষয়রূপে প্রকাশ না করে ভারত-কোষ কর্তৃপক্ষ আক্ষরিক অনুক্রম অনুযায়ী পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করবেন। কাজেই আমার এই বিপুল শ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয় কেননা ভারত কোষের নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশিত প্রবন্ধের অক্ষরসংখ্যা অনুযায়ী সম্মান-দক্ষিণা প্রাপ্তব্য। যদিও দক্ষিণার চেয়ে ভারত-কোষের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বেশী সম্মানিত বোধ করেছি। কিন্তু এখানে সম্মানও গেল, দক্ষিণাও জুটল না। কিন্তু ধাক্কা খেলাম ২য় খণ্ড প্রকাশের পর, যখন দেখতে পেলাম যাকে Pirating বা দিনে
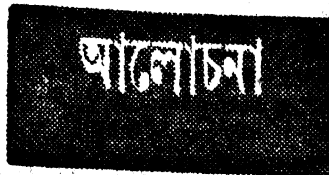
ডাকাতি বলে তাই ঘটল। আমার লেখা ভারতে কৃষির মূল লেখার উপর হাত বুলিয়ে অন্য লেখকের নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। মূল ২১ জন লেখকের জায়গায় বহু-সংখ্যক লেখকেরও আবির্ভাব ঘটল। আর নীরব থাকা সমীচীন বিবেচনা না করে একটি অপ্রিয় চিঠিতে জানাই—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট থেকে আর যাই হোক Pirating আশা করা যায়নি। প্রবল প্রতিবাদের ফলস্বরূপ আমার পূর্বেকার লেখার অন্তর্গত যে বিষয়গুলি আক্ষরিক ক্রম অনুযায়ী সন্নিবেশিত হতে পারে সেগুলি নূতন করে লেখার অনুরোধ এল এবং কিছু কিছু ক্ষুদ্রতম বিষয়ও দূর হল। উভয়পক্ষেই পূর্ণ সহযোগিতার অনুপাত পুনরায় হল। অভিযোগের আর কোনো কারণ থাকল না।

কিন্তু শ্রীরায়ের পত্রে উল্লিখিত ৫ম খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠার পরের মশলাবলী সম্পর্কে ওঁরই উল্লেখ করা 'দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে জানাই আমার লেখা 'মশলা' প্রবন্ধটি সম্পাদকের স্বেচ্ছাচারমূলক ছাঁটাইয়ের ফলে অনেক দিনের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে; কেননা, মশলাগুলির শুধুমাত্র নাম জানার জন্যই কোষ-গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। তাদের চাষ, ব্যবহার, গুণাগুণ এবং তাদের মধ্যেকার রাসায়নিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ভারত-কোষ কর্তৃপক্ষের ফরমায়েশ অনুযায়ী লিখিত 'মাটি', 'শিমুল-তুলো' এবং 'শস্য-বিন্যাস' প্রবন্ধগুলি কোষ-গ্রন্থে স্থান পায়নি। 'মাটি'-র জায়গায় মৃত্তিকা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে অন্য লেখকের

(দেশ ১৯৭৪৭)

[illegible] জন্য কে [illegible] জন্যে কে? দেশের [illegible] হয়ে [illegible]-গ্রন্থ [illegible] এবং উপযুক্ত [illegible] "[illegible]" হয়েছে [illegible] আগে ন্যায় [illegible] কলিকাতা [illegible] বাঙ্গলা ভাষার [illegible] প্রামাণ্য গ্রন্থ [illegible] উল্লেখ [illegible] নেই, সেই [illegible] বাঙ্গলা ভাষায় ঐ সময়ই [illegible] [illegible]দের ভারত 'বিবরণ'-এর উল্লেখ। শুধু তাই নয়, উল্লেখ নেই এই দুই [illegible]ই রচয়িতা স্বনামধন্য, সুপণ্ডিত এবং [illegible] জাতীয়তাবাদী অধ্যক্ষ আমার [illegible] স্বর্গত রজনীকান্ত গুহের।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ বাঙ্গলা কোষ-গ্রন্থে না থাকার কারণ মনে হয় সেই একই ইংরেজী সূত্র অনুসন্ধানপ্রবণতা, যার ফলে কার্পাস প্রবন্ধে ভারতে কার্পাস চাষে তুষারহীন দিবসের উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি এ সমস্ত উল্লেখ করছি অতীব দুঃখের সঙ্গে এই কারণে যে, এক দিকে যখন ক্ষুদ্রতা এবং নীচতা আত্মকলহের গণ্ডী ছাড়িয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও প্রবেশ করছে তখনই দেখতে পাই ভারতের অন্য প্রান্তে কান্নাড় সাহিত্য সভার একটি নূতন ৪-তলা ভবনের উদ্বোধন করছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

আর সকলের কথা বাদ দিলেও সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়রাও কি শুধু-মাত্র এই কোষ-গ্রন্থে তাঁদের নামোল্লেখেই সন্তুষ্ট? তাঁদের কি আর কোনও দায়িত্ব নেই?

যে রমেশ ভবন আমাদের যৌবনে সভায়, সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠত আজ তা ধূলিধূসর, জরাজীর্ণ। সাহিত্য পরিষদ ভবন যে-কোন বহিরাগতের করুণার উদ্রেক করে। ভারতের অধিকাংশ ভাষাভাষী অঞ্চলে অনেক বৃহদাকার সচিত্র কোষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে বহু অর্থ ব্যয়ে, অথচ ৫ খণ্ড বাঙ্গলা কোষ-গ্রন্থ ১২।১৩ বছরে প্রকাশ করার এই দুঃখ ইতিহাস। এখনও সময় আছে বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী এবং শিক্ষিত জনগণের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার, মোড় ফেরাবার—আত্ম-কলহহীন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

মুরারিপ্রসাদ গুহ
নয়াদিল্লি-৫

পাখি দেখার নেশায়

"দেশ" পত্রিকার ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যায় উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রচিত "পাখি দেখার নেশায়" প্রবন্ধে একটি [illegible] লক্ষ করলাম।

৭৭২ ও ৭৭৩ পাতার দুটি ছবির [illegible] [illegible] এই [illegible] Anser anser [illegible] Greylag Goose-এর প্রচলিত বাংলা নাম [illegible]। Night Heron বা Nycticorax nycticorax-এর প্রচলিত নাম [illegible]—রাতচরা বাচকা বক নয়। [illegible] পাতার নিচের ছবিকে লেখক সুইচোরা বলেছেন, এটি বাঁশপাতি বা নরুণচেরা নামেই বেশী পরিচিত। একই পাতায় ডুবুরী পাখি হিসেবে পানকৌড়ির নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গয়লা পাখিটি ডুব সাঁতারে আরও পটু। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, এবছর রবীন্দ্র সরোবরে গোটাচারেক গয়লা এসেছে।

পরের পাতায় লেখক দোয়েল ও বেনে-বউ পাখিদের গ্রীষ্মের আগন্তুক পাখি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে শীতেই এদের বেশী দেখা যায়। এই শীতে দু-জোড়া বেনেবউ ও এক-জোড়া দোয়েলকে রবীন্দ্র সরোবরে ঘোরাফেরা করতে লক্ষ্য করেছি। ৭৭৬ পাতায় লেখক "বিচিত্র পুচ্ছযুক্ত" পাখিদের মধ্যে বেনে বউয়ের কথা বলছেন। কিন্তু বেনেবউয়ের ল্যাজ অতি সাধারণ, হলদে ও কালো। একই জাতীয় পাখি বলে অভিহিত সদাসোহাগী পাখির অস্তিত্ব জানা নেই। অবশ্য Muscicapidal অর্থাৎ শালভাশ বংশের পাখির কারো-কারো সুন্দর ল্যাজ আছে, যেমন চাকদোয়েল, শা-বুলবুল।

Metopidal বংশের অর্থাৎ Jacana জাতীয় পাখিদের লেখক জলফেপি বলেছেন; এরা জলপিপি নামে পরিচিত—পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণ এই নামই ব্যবহার করেছেন ১৩৬৬ সালের সংস্করণের ২৫৩ পাতার শেষ পংক্তিতে:—

"নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্র-গন্ধ উঠিতেছে, কলমীশাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে,......"

এ-ছাড়াও প্রবন্ধটিতে বেশ কয়েকটি ভুল বৈজ্ঞানিক নামের ব্যবহার চোখে পড়ল (বন্ধনীর মধ্যে)। তার পাশে সঠিক নামগুলো লিখে পাঠালাম।

সোনালী প্লোভার— (Pliurialis Apricaria) Pluvialis Dominica; শ্যামা—Kiftacineal Malabacia) Copsyclus Malabaricus; সিপাহি বুলবুল—(Otocompsa Jocosa) Pycnonotus Jocusa; পাপিয়া—(Hicrocoecyx Varjus) Cuculus Varius; চকা-চকি বা চখা-চখি—(Cascara Ferruginea); Tadorna Ferruginea।

শুভময় চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৪৫

ভারতের নারী

[illegible] 'দেশ'-এ [illegible] ভারতের 'নারী' প্রবন্ধে প্রাচীন [illegible] নারীর অবস্থা [illegible] একপেশমী, [illegible] করা হয়েছে। [illegible] সমাজব্যবস্থায় [illegible] অনুসন্ধান করতে হলে ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মননের প্রয়োজন। সমাজব্যবস্থার প্রথম থেকেই নারীজাতির কপালে পুরুষদের কাছ থেকে প্রশংসা ও নিন্দা দুইই জুটেছে। শারীরিক গঠন ও দৈহিক শক্তির পার্থক্য চিরকালই নারী-পুরুষের মধ্যে একটা ভেদ বজায় রেখে এসেছে। ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন, 'Physical prowess, bodily vigour and muscular strength thus naturally established man's permanent superiority over woman.' সব সমাজেই এই চিত্র, 'There was no woman question in Athens because all women were as mere vegetables' ...... (History of women, Davice).

বৈদিক যুগে ভারতীয় সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটলেও নারীর মহিমা কতটা স্বীকৃত ছিল, তা বিতর্কিত। নিয়োগ, সতীদাহ ইত্যাদি সংস্কার কলঙ্কজনক হলেও ধর্মীয় অনুশাসনের একটা কল্যাণকর দিক আছে। হিন্দু সমাজে নারীর হীনস্থানের জন্য ধর্মের অনুশাসন ছাড়া লেখক রাজনীতি, অর্থনীতি, যৌনসম্বন্ধ প্রভৃতির প্রভাবকে এড়িয়ে গেছেন। শাস্ত্রকারদের উপহাস করলেই সমাজকাঠামোর সব গলদের উৎস সন্ধান করা যায় না। প্রজনন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারণার অভাব শুধু ভারতবর্ষ কেন, সব দেশেই ছিল। বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ কাব্য-নাট্য-সাহিত্যে নারীজাতির সম্বন্ধে বহু পরস্পর-বিরোধী উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। লেখকের মত, 'হিন্দু শাস্ত্রমতে স্ত্রীর কোন স্বাধীন সত্তা নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে এক গৃহপালিত পরাধীন প্রাণী মাত্র'। মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করার পিছনে হয়তো তাদের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করাই উদ্দেশ্য ছিল। বাইবেলেও কিন্তু বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকেরা কখনো পুরুষের প্রভুত্ব অস্বীকার করবে না এবং সর্বদা তাদের অধীনে থাকবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশো বলছেন, 'Girls should be early subjected to restraint. This misfortune, if it be really one, is inseparable from their sex.' প্রাচীন প্যালেস্টাইনে মেয়েদের পণ্য-রূপে দেখা হত। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কোন degree দেওয়া হত না। কেমব্রিজে ছাত্রীরা degree পেলেও ভোটাধিকার পায় নি। সব যুগে সব দেশেই পুরুষশাসিত

[illegible] পুরুষেরা স্ত্রীজাতির জন্য নিজেদের [illegible] বিধিনিষেধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। হিন্দু সমাজেও এর ব্যতি-ক্রম ঘটেনি। আমাদের শাস্ত্রে আবার অনেক উদার ও সমদর্শী দৃষ্টিরও সাক্ষাৎ মেলে। ভারতীয় সাহিত্যে ও শাস্ত্রে দাম্পত্যজীবনের আদর্শ [illegible] অনেক তথ্য ও তত্ত্বের পরিচয় পাই। বৈদিক বিবাহমন্ত্রে স্বামীস্ত্রীর পর-স্পরের প্রতি সমান আনুগত্য দেখানো হয়েছে। খ্রীষ্টান বিবাহ-অনুষ্ঠানে শুধু স্ত্রীকেই স্বামীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। ১৯২৮ সালেও ব্রিটিশ পার্লা-মেন্ট স্ত্রীর শপথ থেকে আনুগত্যের অংশ-টুকু তুলে দিতে অস্বীকার করে। আগস্ত-স্বের মতে, স্ত্রীপরিত্যাগী স্বামীকে গাধার চামড়া গায়ে দিয়ে ছয় মাস পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে নিজের পাপকাজ ঘোষণা করে ভিক্ষা করতে হবে। ভার্যাত্যাগকারীর নিষ্কৃতি নেই, সে ব্যক্তি মামলায় সাক্ষী হওয়ার যোগ্য নয় ইত্যাদি মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এসব মানা হত না। ভারতীয় আদর্শে নারী অবধ্য। কৌটিল্য অভিভাবক-হীন নারীদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে বলেছেন। কনফুসিয়াসও মেয়েদের স্বতন্ত্রতা অস্বীকার করেছেন। অ্যারিস্টটল বলছেন 'Like atisans, slaves and traders women should occupy a subordinate position.' রোমান আইনে কোন আইনগত ব্যাপারে স্ত্রীকে স্বামীর কন্যারূপে বিবেচনা করা হত।

পুরুষের বহুবিবাহ, নারীর [illegible] প্রভৃতি ব্যাপারে স্মৃতিকারগণ [illegible] ক্ষেত্রে হৃদয়হীন উক্তি করেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সহসা কোন আন্দোলন হয় নি। তার জন্য কেবল স্মৃতিকারদের দায়ী করলে সবার দায়িত্ব এড়ানো যায় না। নরনারীর বিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে মতামতগুলি সবই সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। যেমন বিবাহে কন্যাকে অলংকারাদি দানের কথা থাকলেও যৌতুক বা বরপণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। বর্তমানের আসুরিক পণপ্রথা অতি আধুনিক সভ্য সমাজের দান। কৌটিল্য গান্ধর্ব প্রভৃতি কয়েকটি বিবাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নিয়েছেন। মনুর মতে স্বামী উন্মত্ত, পতিত ক্লীব, নির্বীজ ও কঠিন রোগাক্রান্ত হলে বিচ্ছেদ চলতে পারে। মনু বাল্যবিবাহের (গৌরী-দান বা নগ্নিকাদান) ভয়ানক পক্ষপাতী হলেও বলেছেন যে, উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলে পিতার উচিত কন্যাকে আজীবন অবিবাহিতা রাখা। বাল্যবিবাহের মূলে যৌনজ্ঞানের অভাব, ধর্মের গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণও অনেকাংশে দায়ী। প্রাচীন রোমে, টিউডর যুগে ইংল্যাণ্ডে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের আইনে পাত্রপাত্রীর বিবাহযোগ্য বয়স ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ১২। সুতরাং ভারতীয় স্মৃতিকারদের ক্ষেত্রেই তৎকালীন সমাজের ধারাকে অস্বীকার করে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কি করে আশা করি? অবাধ্য স্ত্রীর উপর বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত পশ্চিমের দেশগুলিতে অনেককাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। মধ্যযুগে রাশিয়াতে বিবাহে কন্যার পিতা জামাতাকে একটি বেত প্রদান করতেন প্রভুত্বের নিদর্শনস্বরূপ। চসার অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক প্রহারের উল্লেখ করেছেন। জার্মানীতে প্রবাদ ছিল a woman and an ass existed only to be beaten.

তাই, দু হাজার বছর আগেকার হিন্দু শাস্ত্রে কচিৎ এরকম কিছু থাকলে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
চুঁচুড়া
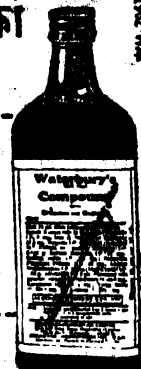
জাগরণের কাহিনী

সম্প্রতি কালীচরণ ঘোষ লিখিত "জাগরণ ও বিস্ফোরণ" নামক গ্রন্থের দুটি খন্ড পাঠ করার সৌভাগ্য হলো। যে শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সব গ্রন্থ রচিত হয়, তার দৃষ্টান্ত আজকাল ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। এই লেখকেরই লেখা ইংরেজী বিরাট গ্রন্থ 'দা রোল অব অনার' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় ও গবেষণায় এঁর দান কতখানি। এবার তিনি বাংলায় আর একটি বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন।

খবরের কাগজের শোক-সংবাদে আজকাল মাঝে মাঝেই দেখা যায় এক একজনের মৃত্যুর খবর: যিনি এক সময় প্রখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন। কচিৎ তাঁদের ছবি ছাপা হয়, অনেক সময়েই হয় না। অধিকাংশ পাঠকের কাছেই ঐ সব নাম অজানা, মনে কোনো রেখাপাত করে না, শোক-সংবাদেও তাঁদের জীবন-কাহিনী থাকে যৎসামান্য। যে মানব এক সময় দেশের জন্য জীবন তুচ্ছ করেছিলেন কিংবা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকারে—দেশ স্বাধীন হবার পরও তাঁদের এমন অবহেলিত মৃত্যুর কথা চিন্তাও করা যায় না। অথচ এ রকমই হচ্ছে। এ-কালের মানুষ দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। ভারতীয়রা বোধ হয় এমনিতেই বড় ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি। ইতিহাস-জ্ঞান যাদের নেই, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও থাকে না।

আমাদের দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথাই এখন সব সময় বেশী করে বলা হয়। কিন্তু গর্ব করার মতন যে কয়েকটি বিষয় আছে, তা ছেলেমেয়েদের জানাবার ব্যবস্থা নেই। অসমসাহসী এবং আত্মত্যাগী যে সব মানুষের জন্য আমাদের দেশের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলের কীর্তিকলাপ না জেনে ভবিষ্যৎ তৈরি হবে কি করে? তাঁদের সুকীর্তি এবং ব্যর্থতা—দুটোরই বোধ হয় জানার দরকার আছে।

দুঃখের বিষয়, গোটা স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে একটি কোনো নির্ভরযোগ্য বিস্তৃত তথ্যমূলক বই আজও লেখা হয়নি। বিভিন্ন অধ্যায়ের কাহিনী কিছু আছে বটে। আর আছে সরকার প্রকাশিত কিছু নীরস তথ্যপঞ্জী। সব চেয়ে পাঠযোগ্য অবশ্য, কয়েকজন প্রাক্তন বিপ্লবী বা রাজনৈতিক কর্মীর লেখা আত্মজীবনীগুলি। কিন্তু আত্মজীবনী আর ইতিহাস এক নয়। আত্ম-জীবনীগুলিতে বার বার নিজস্ব দলের কথাই স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। আর, ইতিহাস [illegible] যে [illegible] চলে, তার

অধিকাংশই ন্যাকামি ও উচ্ছ্বাস ভরা। বাঙালীদের রচনার আর একটি দোষ, তাঁদের লেখাগুলো পড়লে মনে হয়, বাংলা ছাড়া যেন আর কোথাও কিছু বৈপ্লবিক কাজকর্ম সংঘটিত হয়নি। বাঙালী স্বদেশীদের প্রাধান্য সত্ত্বেও সর্বভারতীয় চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা বাঞ্ছনীয়।

কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা অকারণ উচ্ছ্বাসবর্জিত এবং তথ্যসম্মত। তাঁর কোনো লেখাতেই 'আমি'র অনুপ্রবেশ নেই, এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। রীতিমতন বার্ধক্যে পৌঁছেও তিনি অহমিকাশূন্য হয়ে ইতিহাস-গবেষণা করে যাচ্ছেন।

অবশ্য, কালীচরণ ঘোষের লেখাও সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই শুধু এ দেশের মুক্তি আনতে চেয়েছিলেন, তিনি শুধু তাঁদেরই ইতিহাস রচনায় ব্রতী। গান্ধীজীর আগমনের পর এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা যে আর একটি পৃথক রূপ নেয়—তিনি সে বিষয়ে আগ্রহী নন। সেইজন্যই তাঁর বৃহদাকার রচনায় গান্ধীজীর উল্লেখ থাকে যৎসামান্য, নেহরু-প্যাটেল-আজাদের [illegible] আজাদদের নামও চোখে পড়ে না।

স্বাধীনতার পর গান্ধীজী এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকার কথাই অস্বীকার করে গেলেন। ক্ষমতায় আসবার পর কংগ্রেস বড় গলায় প্রচার করতে লাগলেন, শুধু তাঁরাই এনেছেন দেশের স্বাধীনতা। সেই রকম সশস্ত্র বিপ্লবীরাও স্বাধীনতার আগে বা পরে গান্ধীবাদীদের সুনজরে দেখতে পারেন নি—গান্ধীজীর ভূমিকাও তাঁরা স্বীকার করতে চান না। এর ফলে তাঁরা আরও বেশী সরকারী অনীহা অর্জন করেছেন। স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর লাগলো সংগ্রামীদের কোনো প্রকার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চিন্তা করতে।

সুতরাং, কালীচরণ ঘোষের বইখানি শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসের কথা মনে রেখেই পড়তে হবে। তাঁর প্রত্যেক বইতেই একটি পরিকল্পনা থাকে। পূর্বোক্ত ইংরেজী বইতে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁদেরই ওপরে, যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ দিয়েছেন।

এই বইতে তিনি মোটামুটি জোর দিয়েছেন বাংলা দেশের আন্দোলনের ওপরেই। প্রথম খণ্ডে বিদেশী ঔপনিবেশিকতার পটভূমি এবং জাতীয়তা-বোধের উন্মেষের কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বাংলা দেশের প্রতিটি ঘটনার

ছিলেন। যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন কিংবা অন্তত তিন বছর কারাবাস করেছেন—তাঁদের একজনের কথাও উনি বাদ দিতে চান নি। তাঁর মনে বোধ হয় এইটাই ছিল প্রধান চিন্তা—একজনের নামও যেন হারিয়ে না যায়। কত অজস্র ঘটনা, কত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাতেও যে কত যুবকের পাঁচ বছর দশ বছর কারাদণ্ড হয়েছে—তা এই বই না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। সামান্য একটা ডাকাতির প্রস্তুতি বা গোপনে একটা আগ্নেয় অস্ত্র রাখা—এই জন্যই কঠোর দণ্ড, এমনকি কালাপানি পর্যন্ত। এত ছোট ছোট ঘটনা, ইতিহাসবদ্ধ রাখা একটা অসম্ভব কথা। পড়তে পড়তে আমারও অনেক সময় মনে হয়েছে, কোথায় কোন্ গ্রামে উনিশ শো ত্রিশ-একত্রিশ সালে কয়েকজন যুবক স্বদেশী-ডাকাতি করতে গিয়ে সর্বমোট বাহান্ন টাকা পেয়েছিল, তার ফলেই তিন বছরের অধিক কারাদণ্ড—এই ঘটনাও কি এখন আমাদের জানার দরকার আছে? তখনই বুঝতে পারি গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, একজনও যেন হারিয়ে না যায়। পাঠকের মনে এই প্রশ্নও জাগবে, এত সব ঘটনা তিনি পেলেন কোথা থেকে? বুঝতে অসুবিধে হবে না, দীর্ঘকাল ধরে পুলিস রিপোর্ট ঘেঁটে ঘেঁটে এগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। কে তাঁকে এই কাজ করার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছিল? একেই বলে সাধনা।

তাঁর গ্রন্থখানি মহামূল্যবান সন্দেহ নেই। তবু কয়েকটি প্রশ্ন আছে। তিনি এত বিরাট ক্যানভাস নিয়েছেন যে, সেইজন্য অনেক ঘটনাই অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এত সংক্ষেপে এত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনায় ফলে (বিশেষত প্রথম খণ্ডে) অতি সরলীকরণের ভাব এসে গেছে। আর, যে সব ঘটনাগুলি বহুবিদিত, তাতে নতুন কোনো আলোকপাত আশা করেছিলাম। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ইতিহাস পড়তে পড়তে একালে আমাদের মনে অনেকগুলো খটকা জাগে। তার উত্তর কে দেবেন? কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা রাখছি মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নেবার পরও কিছু দিন বাংলার বিপ্লবীরা তাঁর খরচা চালাবার জন্য টাকা পাঠাতেন, তিনি ফিরে এসে আবার নেতৃত্ব দেবেন বলে, এ কথা কি ঠিক? তিনি ফিরে না আসায় বিপ্লবীরা কি হতাশ হয়েছিলেন? বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে কি নরেন গোঁসাইয়ের ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল? প্রীতিলতা আত্মহত্যা করলেন কেন? যাঁরা দু' দশ বছর জেল খেটেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন জেল থেকে ফিরে আবার রাজনৈতিক কর্ম করেছেন? আমরা কয়েকজনের কথা মাত্র জানি। কিন্তু যে সহস্র সহস্র যুবকের নাম আমরা এখানে পাই—দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁদের মধ্যে কতজন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন?

সনাতন পাঠক

।। চিঠিপত্র ।।

খাঁটি পাঠক

৪১ বর্ষ ৭ সংখ্যায় (১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩) সাহিত্য সংবাদ বিভাগে পাদটীকায় সনাতন পাঠক সাহিত্যের নকল পাঠক সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছেন তা অত্যন্ত সময়োচিত, এবং সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। সত্যি, লক্ষ করবার মতোই ব্যাপার যে, এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় দু'চারখানা বই পড়ে (কিংবা না পড়ে) কিংবা বিজ্ঞাপন মুখস্থ করে প্রায়ই এমন ভাব দেখান যে সব কিছুই যেন তিনি হজম করে ফেলেছেন। খুবই অবাক হবার কথা, আমাদের মধ্যে অনেকেরই মানসিকতার এমন ব্যাপার-স্যাপার যে একেবারে ঘটে না তা বুকে হাত দিলে এই মুহূর্তে অনেকেই অনুভব করে যুগপৎ চমকিত এবং বিস্মিত হয়ে পড়বেন। এই ব্যাপারগুলি হয়, হচ্ছে, এবং হবেও। আসলে মানুষ অভ্যেসের অধীন। সুতরাং সংশ্লিষ্ট তথাকথিত সাহিত্যপাঠকের প্রতি আমাদের নিবেদন, আর ভণ্ডকতা নয় এবং আর দেরি নয়, পণ্ডিত সাজতে গিয়ে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে আর বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি করবেন না বরং সনাতন পাঠক নির্দেশিত শপথ নিন কিংবা নিয়মিত সাহিত্য পাঠের অভ্যেস করুন। জানবেন, সত্যিকারের পাঠকের আজ দারুণ অভাব।

জয়শঙ্কর রায়চৌধুরী,
কলিকাতা-৭০০০৩৩।

কোনো কিছুর বর্ণনা দিতে গেলে, আমরা সাধারণত যার বর্ণনা দিচ্ছি তার ওপর আমাদের ব্যক্তিত্ব আরোপ করে ফেলি। এমন সব শব্দ ব্যবহার করি যেন টেবিল, চেয়ার, নদী, রাত্রি এদেরও প্রাণ আছে, অনুভব করার ক্ষমতা আছে, এরাও মান-অভিমান করে। একাকিনী রাত্রি, বিষণ্ণ বিকেল, মুখর নদী, ক্রুদ্ধ ঢেউ—এরকম ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। যদিও রাত্রি যে মানুষের মতো কারো সঙ্গ-কামনা করে এমন কখনও শোনা যায়নি। বিষণ্ণ বিকেল বললে আমাদের মনের বিষণ্ণতাই বিকেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, নদী কখনও কথা বলে না, কতকগুলো অজ্ঞাত কারণেই ঢেউ বাড়ে কমে, তাদের ক্রোধ বা সমবেদনা কিছুই বোধ হয় নেই।

ছবিতে, গল্প-উপন্যাসে, কবিতায় বহুকাল ধরেই এভাবে বস্তুকে বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করে দেখানোর রীতি চলে আসছে। কিন্তু একদল শিল্পী লেখকের এটা পছন্দ হলো না। তাঁদের বক্তব্য : দোহাই, বস্তুর চরিত্রে কিছু অতিরিক্ত যোগ করবেন না, কিছু বাদও দেবেন না। তারা যা সেই চেহারা, সেই চরিত্র নিয়েই শিল্পে উপস্থিত হোক।

এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ন্যুভো রোমা' বা নতুন উপন্যাস আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম ফরাসী লেখক আঁলা রবগ্রীয়ে।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাস The House of Assignation লেখকের পঞ্চম উপন্যাস।

রবগ্রীয়ের আগের লেখা আর একটি উপন্যাস Dans le labyrinthe-এ লেখক পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তারা যেন এই উপন্যাসে শুধু বস্তু, ভঙ্গি, শব্দ এবং যেসব ঘটনা দেখেন যা তকে জানানো হচ্ছে, এঁদের ওপর পাঠক যেন বেশী বা কম তাৎপর্য আরোপে প্রয়াসী না হন।

রবগ্রীয়ে অন্যত্র বলেছেন যে, বস্তু ক্রমশ তার অনিশ্চয়তা এবং গোপনীয়তা হারিয়ে ফেলবে, তার মিথ্যা রহস্যময়তা ত্যাগ করবে।......বস্তু আর নায়কের অস্পষ্ট আত্মার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব হবে না।

ওপরের কথাগুলো বর্তমান উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আঁলা রবগ্রীয়ের আর একটি ধারণা, উপন্যাসের তথাকথিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের চলাফেরা ভাবভঙ্গির বর্ণনাই যথেষ্ট আর এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই তাদের অন্তর্বর্তী বাস্তবতার (inner reality) উন্মোচন সম্ভব।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের প্রথমে লেখক বলেছেন :

লেখক প্রথমেই পরিষ্কার করে বলতে চান যে, এই উপন্যাসের কোনদিক থেকে হংকং-এর বৃটিশ এলাকার জীবনবৃত্তান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য নেই।

The House of Assignation by Alain Robbe-Grillet. Calder & Boyars. London. 80 p.

এরপরই রবগ্রীয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, যদি কোনো পাঠকের ধারণা হয় যে এই উপন্যাসে বর্ণিত স্থান বাস্তবের সঙ্গে মেলে না তবে লেখকের উপদেশ, পাঠক যেন সেখানে আবার গিয়ে দেখেন কারণ ওখানে সবকিছু দ্রুত পাল্টে যায়।

আবার হংকং যদিও অনেক সময় বাস্তবের হংকং-এর সঙ্গে মিলে যায় তবে লেখক বলবেন তা সমাপতন মাত্র।

কারণ, বাস্তবের হংকং এবং লেখকের কল্পনার হংকং উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে, এই উপন্যাসে তথাকথিত বাস্তব জগৎ এবং কল্পনার জগতের সীমারেখা মুছে গেছে।

আগেই যা বলেছি, এই উপন্যাসে আগাগোড়া বর্ণনা করা হয়েছে, উপন্যাসের চরিত্র আর তার পাশের বস্তুর আকার আয়তন, অবস্থান আর ভঙ্গি।

লেখক এই উপন্যাসে মানুষের মন নিয়ে গবেষণা না করে, একজন সৃজনধর্মী লেখক হিসেবে, উপন্যাসের চরিত্রের মানসিক অবস্থার সরাসরি বর্ণনা দিতে চেয়েছেন একেবারে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়।

আমরা যখন 'সময়' শব্দটা ব্যবহার করি তার একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। আঁলা-রবগ্রীয়ে অনেক সময় তাঁর উপন্যাসে এই সময় বা জাগতিক সময়কে থামিয়ে দিতে চেয়েছেন। যেমন কোনো উপন্যাসে দেখা যায় বিশেষ কোনো ঘটনার সময় নায়কের হাতের ঘড়ি বন্ধ গেছে বা যেমন এখানে একটি চরিত্রের মৃত্যুর সময় অ্যালার্ম ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

The House of Assignation পড়ার সময় আরও চোখে পড়ে, এখানে যেসব ঘটনা বা দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, সে বর্ণনারও কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। যেমন, এই উপন্যাসের আরম্ভ লেখকের কল্পনা দিয়ে। কল্পনা নৃত্যরতা কোনো মেয়েকে নিয়ে, যার কাঁধ খোলা বুকের অনেকখানি খোলা।

কিন্তু কখন লেখকের কল্পনা ভেঙে

গ্রন্থ প্রচ্ছদ
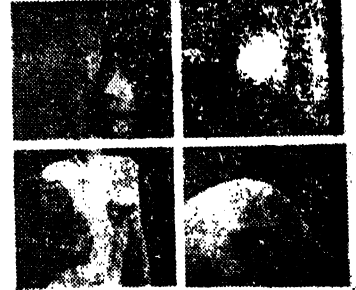
উপন্যাসের ঘটনা শুরু হয়ে যায়। কখন পাঠকের চোখের সামনে লেডী আভার ভিলার অনুষ্ঠান দৃশ্য ভেসে ওঠে। লেডী আভার ভিলায় আমন্ত্রিত দর্শকদের সামনে ভয়ার্ত চোখে তার শরীরের দুদিকে দুহাত তুলে দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে। আর বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি কুকুর অন্য একটি মেয়ের নির্দেশে জাপানী মেয়েটির শরীরের সমস্ত আচ্ছাদন, শেষ তিনকোণা সিল্কের টুকরো পর্যন্ত থাবা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। এইসব দৃশ্যের বর্ণনা চলতে চলতে কখন শহরের কোনো রাস্তার বর্ণনা শুরু হয়ে যায়। হংকংএর রাস্তায় আঁটোসাটো পোশাক পরা যে মেয়েটিকে দেখি, আর সঙ্গী একটি কুকুর, যে কুকুর সময় প্রায় কোনো দিকেই তাকায় না, একটু আগেই তাকে বা তার মতই আঁটোসাটো পোশাকে লেডী আভার ভিলার অনুষ্ঠানে দেখেছি, তারও সঙ্গী একটি কুকুর। এই-রকম চলতে থাকে। এর মধ্যে খুনের কথা আছে। চোরাই চালান আছে। এইভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য।

এইভাবে উপন্যাসে যেসব চরিত্র উপস্থিত করা হয়েছে সাধারণত উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা উপন্যাসে যে স্থান পান, যে গুরুত্ব নিয়ে তারা উপস্থিত হন The House of Assignation এ তারা সে গুরুত্ব পাননি।

চরিত্রগুলির চিন্তাভাবনা, বিবর্তন এসব কিছুই লেখক এ উপন্যাসে বর্ণনা করেননি। কারণ, তাঁর মতে, চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে অতীতের ব্যাপার। উপন্যাসে এখন যা বর্ণনা করা হয় তা হলো, কোনো নির্দিষ্ট কাল। পৃথিবীর ভাগ্য আর কয়েকজন ব্যক্তি বা পরিবারের উত্থানপতনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়।

শেষ করার আগে বলা যেতে পারে, অ্যালা রবগ্রীয়ের The House of Assignation পড়তে পড়তে আমার যা মনে হয়েছে, এই আলোচনায় আমি শুধু তাই উল্লেখ করেছি। হয়তো অ্যালা রবগ্রীয়ের কোনো কোনো প্রস্তাবকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু আপাতত আমার আলোচ্য লেখক কিভাবে কি করতে চেয়েছেন অন্য কিছু নয়।

সুব্রত সেনগুপ্ত

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রচর্চাঃ অধ্যাত্মবাদ

ভারতীয়-অধ্যাত্মবাদ ও রবীন্দ্রকাব্য। স্বামী মহানন্দ ঃ প্রকাশক স্বামী সুরেশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী (বীরভূম)। মূল্য ঃ পনর টাকা।

বইটি গবেষণাগ্রন্থ। মূলতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর অধ্যাত্ম-ভাবনার পরিদর্শন করেছেন লেখক। নাথধর্ম, সুফীধর্ম ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে লেখক ধারবাহিক ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ দেখিয়েছেন। তারপরে উপনিষদ-প্রসূত ভাবধারা যেমন-ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার ক্রমিক ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে সেই ভাবধারাগুলির বিভিন্ন ও বিচিত্র যোগ দেখিয়েছেন। ঔপনিষদিক চিন্তার পরিস্কার বিশ্লেষণ ও রবীন্দ্র-অনুভূতির সঙ্গে তার স্পষ্ট যোগাযোগ এই অধ্যায়টিকে বিশেষ মূল্যবান করেছে বলে মনে করি। পরের অধ্যায়ে রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মচিন্তার যোগাযোগ দেখানো হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক কাজ করেছেন তবু ধারণার পরিচ্ছন্নতার ও [illegible] মুগ্ধ করবে।

পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কসূত্রে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা যে গড়ে উঠেছে 'বালক রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে তার তথ্যপূর্ণ বিবরণ আছে। এই অধ্যায়টি রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার অব্যবহিত পূর্বে দিলে ভালো হতো। সুফীদর্শন মধ্যযুগের যেসব ভারতীয় সাধকের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে তাঁদের চিন্তার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লেখক বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে শুরু করে দারাশিকো পর্যন্ত বহু সাধকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার যোগ দেখিয়েছেন। বৈষ্ণবধর্ম, বাউল-তত্ত্ব, গীতা ও পাশ্চাত্ত্যদর্শন-এই তিনটি অধ্যায়ও রবীন্দ্রচিন্তার সমৃদ্ধি-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এর পরে প্রভাতসংগীত, নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ, শারদোৎসব, অচলায়তন রাজা ডাকঘর, বিসর্জন—এই ছয়টি রবীন্দ্র-নাটকে ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার প্রতিফলনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যদিও রবীন্দ্র-রচনার বিবর্তনের ক্রম তাতে রক্ষিত হয়নি।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন দিকগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে ঠিকই কিন্তু বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও কোথও কোথাও আছে। একটি মহৎ প্রতিভা শুধুই বিচিত্র চিন্তা-ধারার যোগফল নয়। স্বীকরণের মুহূর্তে মূল চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্যও ঘটে যায়। বোধ হয় একটি অধ্যায়ের প্রয়োজন ছিল যাতে এই বহুধা ও বিচিত্র চিন্তাধারা কীভাবে যোগে-বিয়োগে স্বকীয়চিন্তাকে গড়ে নিয়েছে তা দেখানো এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রসঙ্গ এনে বুঝিয়ে দেওয়া ভারতীয় সাধনার মোল দিকটির সঙ্গে যে বিদেশী দর্শনের সাদৃশ্য আছে তাকেও কীভাবে রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

ছোট গল্প

মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ। দিব্যেন্দু পালিত। অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬। দাম পাঁচ টাকা।

দিব্যেন্দু পালিতের শেষতম গল্প সংকলন 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণের' গল্পগুলোর নাম দুঃসময় অসুখ, অপমান, এইরকম। সংকলনে যখন তিনটিই গল্প নেই, আরও গল্প আছে, তখন অন্য নামের গল্পও অবশ্যই আছে কিন্তু লেখকের মেজাজ বলতে যা বোঝা যায়, তা ধরা পড়ে দিব্যেন্দুর এই তিনটি গল্পের নামে। দিব্যেন্দুর গল্পের বিষয় যতটা প্রেম, তার চেয়ে বেশী অপ্রেম। যদিও এই সংকলনে 'সুখ' নামেই একটা গল্প আছে, কিন্তু সে গল্পেরও বিষয় অসুখ, সুখ নয়।

এই সংকলনের গল্পগুলো পড়তে পড়তে দিব্যেন্দুর গল্প আরম্ভ করার রীতি আমার কাছে আলাদাভাবে উল্লেখের উপযুক্ত মনে হয়েছে। লেখক বোধ হয় গল্পে ভূমিকা টুমিকা বিশেষ পছন্দ করেন না। প্রায় সব গল্পেই তিনি ছোট্ট একটি বাক্যে, ছোট একটি ধাক্কায় পাঠককে একেবারে গল্পের মাঝখানে উপস্থিত করে দেন।

সংকলনের শেষ গল্প 'দাঁত' গল্পের নায়ক এমন একটি চরিত্র যে তার পরিবেশের সঙ্গে এমনকি নকল ব্যবহার করেও খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছে। নায়কের দাঁতের অসুখ দিয়ে গল্পের আরম্ভ। ডাক্তারের কাছে গিয়ে নায়ক জানতে পারল তার দেরী হয়ে গিয়েছে। আরও আগে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। এদিকে বাড়িতে সে স্ত্রীর সঙ্গে অফিসে এম ডি-র সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করছে। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে সব দাঁত তুলে নকল দাঁত নিতে হল। নকল দাঁতের সঙ্গে সে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তার প্রায় অজ্ঞাতসারে তার অফিসের পরিস্থিতি, শ্রমিক-মালিক বিরোধ যেখানে পৌঁছয়, সে হঠাৎ টের পায়, এই বিরোধে সে মালিকের 'হাতের তাস' পরিণত হয়েছে। তখন তার মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে 'এটা কি ঠিক হলো?'

গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই, কোম্পানীর ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা তার গোপন অস্ত্রাগার আবিষ্কার করে ফেলেছে। তখন নকল দাঁতের পাটি তাড়াতাড়ি মুখে ভরতে গিয়ে নায়কের হাত কাঁপতে থাকে। নকল দাঁত কিছুতেই মাড়িতে বসতে চায়না। হয়তো তার মাড়ির মাপ ছোট হয়ে গেছে।

এইভাবে অধিকাংশ গল্পেই ছোট ছোট স্মার্ট সংলাপ, খণ্ড খণ্ড ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক পাঠককে সরাসরি গল্পের সমস্যার সম্মুখীন করে দিতে পেরেছেন। সেজন্য মুগ্ধির সঙ্গে কিছুক্ষণের রেশ শুধু কিছুক্ষণ নয়, অনেকক্ষণ থাকে।

রাজনীতি

বাহাত্তরের ভোট। নিরপেক্ষ সাংবাদিক। অনির্বাণ প্রকাশনী, ৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন, কলকাতা-১২। মূল্য : দশ টাকা।

১৯৭২ সালে পশ্চিম বাংলায় যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, যে নির্বাচনের ফলে আজকের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন, সেই নির্বাচন বহু কারণেই ইতিহাস হয়ে আছে। নির্বাচনকে সাধারণত জনসাধারণের রায় বলেই মেনে নিতে হয় এবং কোন একটি নির্বাচনের ফল কী দাঁড়াবে তা রাজনীতির ভাষ্যকারেরা আগের আগের নির্বাচনের ফল এবং বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে খানিকটা অনুমান করে নিতে পারেন। দেখা গেছে ফল যা হয় তাকে 'নিয়মে গেল' বলতে বাধা হয় না। বাহাত্তরের নির্বাচন কিন্তু রাজনৈতিক পণ্ডিতদের পথে বসিয়েছে, এমন কি বিজিত ও বিজেতা দলকেও অবাক করে দিয়েছে। '৭২-এর সেই বিশাল ভোটযুদ্ধের ধুলো এখন অনেকটা থিতিয়েছে। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ সময়ের স্রোতে প্রায় কুড়ি মাস দূরে ভেসে চলে গেছে। সময়ের ডাক্তারিতে অনেক ক্ষতস্থানের জ্বালা কমে গেছে। অবশ্য কৌতূহল যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তা আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়লে কিছুটা কমবে কিম্বা বাড়বে।

নিরপেক্ষ সাংবাদিক, সাংবাদিকের কৌতূহল নিয়েই তথ্য অনুসন্ধানে নেমেছিলেন। তাঁর নিজস্ব মতামত বা সত্যানুসন্ধানের ফলাফল এই গ্রন্থে দীর্ঘ হতে পারেনি স্থানের অভাবে। প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্ন দলের দলনেতাদের বক্তব্য এবং ২২ জন খ্যাতিমান সাংবাদিকদের মতামত। সুতরাং বইটি যে কোন পাঠক তাঁর নিজস্ব ধারণায় সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করার স্বাধীনতা হারাবেন না, তবে প্রভাবিত হবার আশঙ্কা থেকে যায়।

নিরপেক্ষ সাংবাদিক অল্প পরিসরে তাঁর নিজস্ব তদন্তের যে রায় প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি স্পষ্টই কোন একটি দলের প্রতি তাঁর দুর্বলতা মেনে নিয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন : 'বাহাত্তরে নির্বাচনে এত অধিক সংখ্যক সিটে এত ভীষণ ভাবে জালিয়াতি করা হয়েছে যাতে গত নির্বাচনটি একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।'

চিকিৎসাশাস্ত্র

আয়ুর্বেদের প্রাথমিক তত্ত্ব। রাজ শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। প্রকাশিকা প্রীতিলতা দেবী। পরিবেশক—মহেন্দ্র লাইব্রেরী ও অন্যান্য। মূল্য পাঁচ টাকা।

কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার আলোচ্য গ্রন্থে আয়ুর্বেদের মূল ভিত্তির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের যে নীতিগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিককালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য গ্রন্থকার দীর্ঘদিনের গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বকীয় ভিত্তিভূমিতে যুগোপযোগী করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রন্থটি সমস্ত চিকিৎসক সমাজ, শিক্ষার্থী ও গৃহস্থ পরিবারবর্গের বিশেষ উপকারে আসবে। জনকল্যাণে গ্রন্থটির প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এখনকার পাঠক কবি হীরালাল দাশগুপ্তকে মনে রেখেছেন কি না জানি না। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষের 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থের পাঠকের কাছে কবি হীরালাল অল্প আঁচড়ে জীবন্ত এক আশ্চর্য মধুর ব্যক্তিত্ব। বৈঠকের বহু অবিস্মরণীয় কৌতুককর ঘটনার একটিকে কবি-সাহিত্যিক সুধীন রায়ের সঙ্গে কবি হীরালাল দাশগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে রসালো তর্কবিতর্কের খবর সম্পাদকমশাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসসিদ্ধ বৈঠকী ভঙ্গিতে শুনিয়েছিলেন। সেদিন তর্কে পরাভূত কবি সুধীন রায় পরদিবসেই একটি চিরকুটে চারলাইনের এক স্মরণীয় ছড়া লিখে পাঠান সম্পাদক মহাশয়ের হাতে। বিষম মজাদার সেই ছড়াটি এখনো স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেঃ

'যে-হীরালাল শিকার করেন
সেই হীরালাল অন্য,
এই হীরালাল পদ্য লেখেন
মানুষ মারার জন্য।'

এর উত্তরে কি না জানি না, সম্প্রতি প্রকাশিত হীরালাল দাশগুপ্তের বহু-প্রতীক্ষিত কাব্যগ্রন্থ **এবং যদিও তথাপি কবিতা**-র (নবজাতক প্রকাশন, তিন টাকা) এক জায়গায়, দেখা গেল, তিনি লিখেছেনঃ 'আমার দু' চোখে নেই জ্বলজ্বলে জংগলের জ্বালা/তপ্ত রক্ত লালসায় লালা নেই আমার জিহ্বায়!/নেশা নয় পশু হত্যা করা/পেশা নয় মানুষ শিকার।/আমি এই আমার কবিতা/অশ্রুমতী বেদনায় নীল/ছন্দোবতী আনন্দ সবুজ!/আমার ছন্দে কাঁপে যতো ভাঙা মানুষের ভাঙা ভাঙা প্রাণ।' (নিঃসঙ্গ কাপ্তেন)।

১৩৪৪ থেকে '৭৯—চার দশকের বিচ্ছিন্ন কাব্যচর্চার ফসল থেকে বাছাই-করা এই সংকলনে তবু কবি হীরালাল দাশগুপ্তকে নির্ভুল চিনে নেওয়া যায় যাঁর কবিতা 'অশ্রুমতী বেদনায় নীল' এবং ছন্দোবতী আনন্দ সবুজ।' ছন্দের ওপর তুমুল দখল, শব্দের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ততা, গভীর ভাবনায় সঞ্চারী মন,—ছিল, সমস্তই ঠিক-ঠিক ছিল। তবু তাঁর কাব্যচর্চা এত অনিয়মিত কেন, কেন তিনি পরিণতির পর্যায়ক্রম ধৈর্য নিয়ে অতিক্রম করতে উৎসাহী হলেন না—এই সংকলনের পাঠককে সেই ভাবনা নিঃসন্দেহে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ করে তুলবে। 'বাঘের কপিশ চোখে হরিণের মৃত্যু-ছায়া নাচে', 'প্লাবনের ধারা হলো আকাশের চিরন্তন বেদনা-সংগীত', 'জায়া ও মানুষ/পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার চিরন্তনী ক্রৌঞ্চমিথুন' কিংবা 'দিনের কর্ম মর্মের জানাজানি/শরীরে শরীরে রজনীগন্ধা রাত' —ইতস্তত ছড়ানো এ-রকম অজস্র স্মরণীয় পংক্তির দক্ষ রূপকার হীরালাল দাশগুপ্তের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের জন্য অপেক্ষার সময় বহু আগেই পার হয়ে গেছে। তবু এখনো পাঠক সাগ্রহ প্রতীক্ষা করবে। কেননা, তিনি আবার কলম ধরেছেন।

বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের সাথী-ইন্‌ক্রিমিন!

[illegible] সরে [illegible] সম্পাদকের জন্য আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি অবশিষ্ট [illegible] ভারতীয় দলের সঙ্গে অনিবার্যভাবে [illegible] অজিত ওয়াদেকরের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল এখন শ্রীলঙ্কা সফর করছে। স্বল্পকালীন সফর। তিন সপ্তাহে ৬টি খেলা। চারদিন-ব্যাপী দুটি বে-সরকারী টেস্ট, তিনদিনের একটি এবং দুইদিনের তিনটি খেলা। শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরে এসে ওই দলটি অবশিষ্ট দলের সঙ্গে আর একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে বাঙ্গালোরে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অফিস সম্পাদক শ্রী এন ডি কারনারকারের সাহায্যের জন্য। দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ, শ্রীলঙ্কা সফরের খেলা এবং রণজি প্রতিযোগিতার বাকি খেলাগুলিতে খেলোয়াড়দের গুণাগুণের ভিত্তিতে গড়া হবে আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলন্ড সফরের ভারতীয় দল।

দল গড়ার সমস্যা

শ্রীলঙ্কা সফররত ভারতীয় দলের ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৭ জন খেলোয়াড় রয়েছে যারা সরকারী টেস্ট খেলেছে। মনকড়, কারশন ঘাউড়ি, গোপাল বসু, ব্রিজেশ প্যাটেল, সোলকার, শিভলকার প্রভৃতি কয়েক বছর থেকে বড় ক্রিকেটের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এদেরই সঙ্গে বড়দের ক্রিকেট ক্ষেত্রে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে সুধীর নায়েক, সুনীল বেঞ্জামিন, পার্থসারথি শর্মা, হেমন্ত কানিৎকার, দিলীপ দোশি, সমর চক্রবর্তী, অমিতাভ রায় প্রভৃতি। যারা শ্রীলঙ্কা সফরে যায়নি, যেমন বিষেণ সিং বেদী, আবিদ আলী, এরাপল্লী প্রসন্ন, ভগবৎ চন্দ্রশেখর তো ক্রিকেটের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েই আছে। পেকার এবং অমরনাথ ভ্রাতৃদ্বয়েরও যোগ্যতার দাবী আছে। এ ছাড়া ইংলন্ড প্রবাসী উইকেটকিপার ফারুক এঞ্জিনিয়ারের ইংলন্ড সফরের দলে অন্তর্ভুক্তি তো অনিবার্য বলেই ধরা যায়।

ক্রিকেট এমন একটি খেলা যার সঙ্গে ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িত। বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানও এক বলে বোল্ড হয়ে যেতে পারে। বিশ্বশ্রেষ্ঠ বোলারও সারাদিন বল করে বিনা উইকেটে প্যাভিলিয়নে ফিরতে পারে। বিভিন্ন ধরনের বলের মোকাবিলা করার ভঙ্গি, খেলার পদ্ধতি, হাতের স্ট্রোক এবং ধারাবাহিকভাবে ভাল রান করার ক্ষমতাই ব্যাটসম্যানের গুণাগুণ বিচারের ভিত্তি। বোলারের গুণের বিচার বলের লেংথ, লক্ষ, নিশানায় এবং সুইং ও স্পিন করাবার ক্ষমতায়।

এই সব গুণের তুলনামূলক বিচারে বহু তরুণ খেলোয়াড়ের মধ্যে পার্থক্য হয়তো উনিশ-বিশ কিংবা আঠারো-বিশ।

খেলার মাঠে

ইডেনে শ্রীলঙ্কা সফরকারী দলের অধিনায়ক ওয়াদেকারের হুক মারার ভঙ্গী

[illegible] ও [illegible] দলের পাওয়ার [illegible] বলী। [illegible] খেলোয়াড় [illegible] কথা। পেস বোলারদের [illegible] অমিতাভ রায় ও [illegible] রাজস্থানের পার্থসারথি [illegible] হেরফের হয়। ওপেনার হিসাবে বোম্বাইয়ের সুধীর নায়েক এবং বাংলার গোপাল বসু প্রায় সমকক্ষ। [illegible] এক নম্বর উইকেটকিপারের [illegible] পর দুই নম্বর হিসাবে কার দাবি বেশী? রাজস্থানের সুনীল বেঞ্জামিনের? না, কর্ণাটকের কৃষ্ণমূর্তির? সুতরাং ইংলন্ড সফরের জন্য দল গড়ার কাজটা খুব সহজ নয়। এবং যাদের নিয়েই দল গড়া হোক, কোন কোন মহলে অসন্তুষ্টি থেকে যাবেই।

সম্ভবত অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে কারো দ্বিমত দেখা দেবে না। অধিনায়ক হিসাবে বর্তমানে অজিত ওয়াদেকরের পরিপূরক পাওয়া শক্ত। মনসুর আলির প্রশ্ন উঠলে অবশ্য পৃথক কথা। তবে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মুখপাত্ররা এখন মনসুরমুখী নন।

ইডেনে সুঁটে ব্যানার্জি বেনিফিট ম্যাচেও ওয়াদেকর দল-নেতৃত্বে এবং ব্যাটের বিক্রমে তার যোগ্যতার প্রমাণ রেখে গেছেন। ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তিনি খেলাটিকে চিত্তাকর্ষক করতে চেয়েছিলেন, আর ব্যাটে তো দর্শক চিত্ত জয় করে গেছেনই। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪ রান করলেও ১৯টি বাউনডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারী সহযোগে করা তাঁর অপরাজিত ১৪০ দ্বিতীয় ইনিংসটি ইডেনের সাম্প্রতিক-কালের খেলায় এক উপভোগ্য ইনিংস। মাত্র ১১০ মিনিটে তাঁর শতরান পূর্ণ করাও গতানুগতিকতার বাঁধ ভেঙ্গে গতির ধারা যোগ করা। উপভোগ্য হয়েছে অবশ্য অনেকের ইনিংস। বিশ্বনাথ (৬৫) পেলব কব্জির শিল্পকর্মে, মদনলাল (৪২), সুধীর নায়ক (৬৫), পার্থসারথী শর্মা (নট আউট ৬৪) এবং বেঙ্কটরাঘবন (নট আউট ৪০ ও নট আউট ৫২) মারের চটকে প্রদর্শনী ক্রিকেটের মেজাজ বজায় রেখেছে। বলে বেশ কিছুটা ভেল্কি দেখিয়েছে অমিতাভ রায় মাত্র ৬৮ রানে মানকড়, ওয়াদেকার, বিশ্বনাথ ও ব্রিজেশ প্যাটেলের উইকেট নিয়ে।

জাতীয় ভলিবল

বাঙ্গালোরের আসর থেকে জাতীয় ভলিবলের বিজয়ীর পুরস্কার নিয়ে বাংলার মেয়েরা ফিরে এসেছে। জাতীয় ভলিবলে বাংলার মেয়েদের এই প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ

লাভ। এবার বাংলার ছেলেদের ভূমিকাও আশাপ্রদ। কোয়ার্টার ফাইনালে কেরলের কাছে ১—৩ গেমে হেরে গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিলেও বাংলার পুরুষ দল গ্রুপ লীগে গুজরাট, আসাম, অন্ধ্র প্রদেশ এবং পাঞ্জাবকে পর পর পরাজিত করে। সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ জয় গত দুই বছরের টানা চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে।

বাংলার মেয়েরা মহারাষ্ট্র, মণিপুর ও পাঞ্জাবকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে ওঠে তামিলনাড়ুকে একটিও গেম না দিয়ে। সেমি ফাইনালে ০—৩ গেমে পরাজিত করে গুজরাটকে। ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেরলের বিরুদ্ধে জয় ৩—২ গেমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। এবং বলবার কথা, প্রথম দুটি গেম হারিয়ে পর পর তিনটি গেম লাভ।

রূপা ব্যানার্জীর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ

বার বার তিনবার এবং বিয়ের পর। মাস আড়াই আগে বিয়ের আসরেই রূপা ব্যানার্জি (মুখার্জি) কথা দিয়েছিল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন না হয়ে টেবল টেনিস খেলা ছাড়বে না। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ৩৫তম জাতীয় টেবল টেনিসে রূপা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফাইনালে তামিলনাড়ুর পি বৎসলাকে খুব সহজে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করে। ১৯৭২-এর ফাইনালে উঠে রূপা হেরে যায় মহারাষ্ট্রের কাইতি ডার্জিম্যানের কাছে, ১৯৭৩এ নিজ রাজ্যের ইন্দু পুরীর কাছে। ইন্দু এবার বাছাই তালিকার শীর্ষ স্থান

বিয়ের আসরে কনে রূপা মুখার্জী, বাঁদিকে ইন্দু পুরী। ওখানেই রূপা বলেছিল, জাতীয় চ্যাম্পিয়ন না হয়ে খেলা ছাড়বে না

পেয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাজে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ায় খেলেনি। তাতে অবশ্য রূপার কৃতিত্ব খাটো হয়ে যায়নি। কেননা, দুই নম্বর বাছাই রূপা ফাইনালে যাকে হারিয়েছে, তামিলনাড়ুর উঠতি মেয়ে সেই পি বৎসলার নামী মেয়েদের হারানোর কৃতিত্ব রয়েছে। ৪ নম্বর বাছাই কর্ণাটকের কে আর সরস্বতী এবং ৫ নম্বর বাছাই মহারাষ্ট্রের নন্দিনী কুলকর্ণীকে হার স্বীকার করতে হয়েছে পি বৎসলার কাছে।

শুধু সিঙ্গলসেই চ্যাম্পিয়ন নয়, অন্ধ্রের মীরকাশিম আলীকে সঙ্গী নিয়ে খেলে রূপা ব্যানার্জী মিক্সড ডাবলসের বিজয়ীর পুরস্কারের ভাগ বসিয়েছে মহারাষ্ট্রের মিক্সড জুটি ডি নরসুন্দর ও কলাবতী সীতারামকে ফাইনালে পরাজিত করে। মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালে মহারাষ্ট্রের শৈলজা সালোখে ও কাশ্মীরা পাটেলের কাছে রূপা ও বীণা পটবর্ধন হেরে না গেলে রূপা ট্রিপল ক্রাউনের অধিকারিণী হত।

সাত আট বছর ধরে যে মেয়েটির খেলাকে কেন্দ্র করে টেবল টেনিস ভক্তদের আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, সবার মুখে মুখে ফিরেছে যার নাম, সেই রূপা ব্যানার্জীর এবার বোধ হয় টেবল টেনিস ছাড়ার পালা। কেননা ফেব্রুয়ারিতে তার কানাডা যাবার কথা অতীত দিনের টেবল টেনিস খেলোয়াড় স্বামী প্রসাদ ব্যানার্জির কাছে।

মহিলা বিভাগের জাতীয় চ্যাম্পিয়নের তালিকায় রূপা ব্যানার্জি যেমন নতুন নাম তেমন পুরুষ বিভাগের এবার নতুন চ্যাম্পিয়ন দিল্লির মনজিৎ দুয়া। ৪ নম্বর বাছাই মীরকাশিম আলী, শীর্ষ বাছাই নীরজ বাজাজ এবং ৩ নম্বর বাছাই গৌদালুর জগন্নাথকে পর পর পরাজিত করে পাঁচ নম্বর মনজিৎ দুয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

একলব্য

নতুন ভূমিকায় নিখিল নন্দী

তেহরানে আয়োজিত এশিয়ার ফুটবল কোচদের কোচিং কোর্স থেকে দুই খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় নিখিল নন্দী ও সালাম সনদ নিয়ে ফিরে এসেছে। ভারত থেকে এই দুজন কোচকেই এবার তেহরানে পাঠান হয়েছিল।

যদিও এশিয়ার কোন দেশে এশিয়ার কোচদের জন্য এই কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়, তবু 'ফিফা' অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন এই শিক্ষাক্রমের পৃষ্ঠপোষক। এবং 'ফিফা'র প্রধান কোচ ডেটমার ক্র্যামার সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে এই কোচিং কোর্স পরিচালনা করেন। ১৯৬৯-এ টোকিও কোচিং কোর্সে সনদ পেয়েছে প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, বাসা ও বলরাম। ১৯৭২-এ কুয়ালালামপুর কোচিং কোর্স থেকে সনদ নিয়ে এসেছে অরুণ ঘোষ ও জার্নেল সিং।

তিন মাসের স্বল্পকালীন কোর্স। অতীত দিনের নামী খেলোয়াড়, ফুটবল সম্পর্কে যাদের ধারণা স্বচ্ছ এবং কোচিংয়েও যেন কিছুটা দক্ষ, সাধারণত তাঁরাই কোর্সে যোগ দেন কোচিং সম্পর্কে আরও জ্ঞানলাভের জন্য। তেহরানের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল এশিয়ার ৬০ জন কোচ। নিখিল ও সালাম সহ সনদ পেয়েছে ৩৮ জন।

ফুটবল খেলা থেকে অবসর নেবার পর নিখিল নন্দী পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস থেকে ফুটবলের কোচিং কোর্স পাশ করে ১৯৬২ সালে। ওর কোচিংয়ে রেলওয়েজ দল ১৯৬৪-তে ফাইনালে বাংলা দলকে হারিয়ে জাতীয় ফুটবলে বিজয়ীর সম্মান পায়। সুতরাং কোচ হিসাবে নিখিলের যোগ্যতা আগেই প্রমাণিত।

সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলাম, তেহরান থেকে নতুন কি শিখে এলে?

নিখিল বলল, বেশ শক্ত কোর্স প্র্যাক্টিক্যাল ও থিওরিটিক্যালের জন্য প্রতিদিন আমাদের ৯ ঘণ্টা ১০ মিনিট করে খাটতে হয়েছে। তাছাড়া রাত্রিতেও পড়াশুনা করতে হয়েছে। থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যাল মিলিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ২২টি বিষয়ে। প্র্যাক্টিক্যালের মধ্যে আছে (১) ফুটবল টেকনিক, (২) ট্যাকটিকস ও স্ট্রাটেজী, (৩) ফিজিক্যাল ফিটনেস, (৪) বাস্কেটবল হ্যান্ডবল ও ভলিবল খেলা, (৫) পেন্ডুলাম সিস্টেমে প্র্যাক্টিস, (৬) জগিং এবং অন্য শারীরিক কসরৎ।

থিওরিটিক্যালের মধ্যে রয়েছে—(১) কোচিংয়ের পদ্ধতি, (২) ট্যাকটিকস ও স্ট্রাটেজি, (৩) খেলার আইন কানুন, (৪) ফিজিওলজি, (৫) অ্যানাটমি, (৬) সাইকোলজি, (৭) ফিজিওথেরাপি, (৮) পেডাগগি, (৯) অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও অর্গানিজেশন, (১০) মেথড ও কাউন্টার মেথড ইত্যাদি।

'আধুনিক ফুটবলের মধ্যে—নিখিল জানাল—অনেকদিন আগে থেকেই ধুপে

স্ট্রাটেজি যোগ হয়েছে। বর্তমানের প্রথা-প্রকরণ এবং পদ্ধতি আরও বিজ্ঞানসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাও প্রচুর। যেমন কোন দল হয়তো ৪+৩+৩ প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত। প্রতিপক্ষ দলের খেলার পদ্ধতি ৪+২+৪ হয়, কিংবা তারা অন্য পদ্ধতিতে খেলে তবে তাদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, কিভাবে কাকে দিয়ে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলোয়াড়টির উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ের উপর এখন বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পেণ্ডুলাম সিস্টেমও বর্তমানের কোচিংয়ে নতুন সংযোজন। গ্রাউণ্ড ট্যাকলিংয়ে খেলোয়াড়রা স্বাভাবিকভাবেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জমির উপর বল কন্ট্রোল করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু বল যখন শূন্যে থাকে তখন ধাবমান প্রতিপক্ষের বাধা এড়িয়ে সেই বলকে ঠিকভাবে হেড করে নিজের আয়ত্তে আনা বা নিজ খেলোয়াড়কে দেওয়া অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। তাছাড়া কতটা লাফালে বল মাথায় পাওয়া যাবে বা কতটা লাফালে বলের লাইনে পা এনে ঠিকভাবে মারা যাবে, তার জন্যই পেণ্ডুলাম সিস্টেমের শিক্ষা। ১২ ফুট উঁচু একটি পোলে খেলোয়াড়ের লাফের সামর্থ্য অনুযায়ী বল ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সুতোয় সঞ্চালিত ওই সব ঝুলানো বলের গতি লক্ষ্য ও নিশানা বুঝে খেলোয়াড়দের মাথা বা পা দিয়ে বল মারার অনুশীলন করতে হয়। স্কুলে সাধারণ শিক্ষা দেবার জন্য এখন বি এ পাশ করার পর বি টি কোর্স অপরিহার্য, তেমন ফুটবলের কোচ হবার পর পেডাগগি অর্থাৎ শিক্ষণ পদ্ধতির সম্যক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়।

নিখিল বলল, খেলোয়াড় হিসাবে আমি কতটুকু সফল, কতটুকু দিতে পেরেছি দেশকে জানি না, তবে যে আন্তরিকতা নিয়ে ফুটবল খেলেছি, আগামী দিনের খেলোয়াড়-দের তৈরী করার কাজে সে আন্তরিকতার কোন অভাব হবে না।

নিখিল নন্দী বাংলা তথা ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম, যে ১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে, কলকাতায় 'বেস্ট প্লেয়ার অব দি ইয়ার'-এর সম্মান পেয়েছে, প্রায় পনেরো বছর ধরে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলেছে শৌর্য ও সৌন্দর্য মিশ্রিত শান্ত মহিমায়।

শুধু নিখিল কেন, নন্দী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কারো খেলার মধ্যে বলদৃপ্ত গা-জোয়ারি ফুটবলের ছাপ ছিল না। ওরা ফুটবলের এক বিশেষ ঘরানার অধিকারী। অজিত-অনিল-নিখিল-সুনীল—চার ভাই-ই ফুটবলে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রথম তিনজন হাফব্যাক হিসাবে, কনিষ্ঠ সুনীল ইন খেলোয়াড় হিসাবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়,

ফিফার প্রধান কোচ ডেটমার ক্র্যামারের সংগে লালাম ও নিখিল নন্দী

জ্যেষ্ঠ অজিত নন্দী, যিনি গত বছর পরলোকগমন করেছেন, তিনি ১৯৩৮-এ আই এফ এ একাদশের সংগে অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলেন। মধ্যম অনিল নন্দী ছিলেন ১৯৪৮-এর লণ্ডন অলিম্পিকে ভারত দলের খেলোয়াড়। মেলবোর্ন অলিম্পিকে নিখিলের খেলার কথা আগেই বলেছি। কনিষ্ঠ সুনীলও ভারত দলের জার্সি গায়ে চড়িয়েছে। খেলেছে সিংহলের বিরুদ্ধে।

চার ভাইয়েরই প্রচুর খেলা দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। পিছন দিকে তাকিয়ে আজ মনে করতে পারছি না কোন ভাই খেলতে নেমে অহেতুক ফাউল করেছে বা কোনদিন অ-খেলোয়াড়সুলভ আচরণ করেছে। মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে চারজনেরই আদর্শ স্পোর্টসম্যানের ভূমিকা ছিল। অথচ কর্তব্যে কঠিন, নিষ্ঠায় অবিচল এবং লক্ষ্যে অভ্রান্ত ছিল চারজনই।

নিখিলই সেদিন একটি ঘটনার কথা বলছিল। ১৯৫২ সালের কথা। হেলসিংকি অলিম্পিকে দল গড়ার জন্য কলকাতায় কোচিং ক্যাম্প বসেছে। কোচ রহিমের নেতৃত্বে খেলোয়াড়রা অনুশীলন করছে। হাফব্যাক পজিশনের জন্য কোচিং ক্যাম্পে ডাকা হয়েছিল হায়দরাবাদের নূর, মহীশূরের বন্ধুগম, কলকাতার নিখিল নন্দী, এস রায় (পল্টু) ও গোকুলকে। প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পল্টু রায় কোচিং ক্যাম্পে যোগ দিতে পারল না। বন্ধুগমও কলকাতায় আসতে পারল না ছুটি না পাওয়ায়। অথচ দল গড়া হল হাফব্যাক হিসাবে নূর, বন্ধুগম ও এস রায়কে নির্বাচিত করে। গোকুল হাফব্যাকের বদলে ইন খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হল।

"কোচিং ক্যাম্পে আমি কিন্তু দলভুক্ত হবার আশ্বাস পেয়েছিলাম। সবাই বলেছিল আমার স্থান বাঁধা। কিন্তু কি যে হল বুঝতেই পারলাম না। মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, বড় ক্লাবের খেলোয়াড় না হলে কিংবা খুঁটির জোর না থাকলে দলে স্থান পাওয়া যায় না। ইস্টার্ন রেলে থাকলে কোনদিনই ভারত দলের জার্সি গায় দিতে পারব না। তাই ফুটবলের ট্রান্সফার শুরু হতেই মোহনবাগান ক্লাবে খেলব বলে ছাড়পত্রে সই করেছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলাম না। রেলের কর্তৃপক্ষ চাপ দিতে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে বাঘাদা (টি সোম) বললেন, কেন, তোর দাদা রেল দল থেকে অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পায়নি? তোর কি বা বয়স। ভাল করে খেল। অলিম্পিকে তুই একদিন খেলবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

নিখিল আবার রেল দলেই ফিরে এসেছিল এবং কঠিন প্রতিজ্ঞায় ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করে নিয়েছিল। ওই সময় থেকে ষাট পর্যন্ত ভারত দলের লেফট আউট হিসাবে নিখিলের যোগ্য পরিপূরক কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, চীন, ইরান, যুগোশ্লাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে যেসব দল খেলতে এসেছে, প্রতি খেলায় নিখিলের স্থান ছিল বাঁধা। চমৎকার ছিল ট্যাকলিং ডিস্ট্রিবিউশন ও অ্যান্টিসিপেশন। জাতীয় ফুটবলে বাংলার পক্ষে চারবার এবং ভারতীয় রেলওয়েজ দলের পক্ষে দুবার খেলেছে নিখিল। তাছাড়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে, দূরপ্রাচ্য সফরে, ১৯৫৮-র এশিয়ান গেমসেও নিখিল ভারত দলে খেলেছে। এশিয়ান গেমসে ও ছিল দলের সহঅধিনায়ক।

নিখিলের নিজের মতে ওর শ্রেষ্ঠ খেলা ১৯৫৬-র চীন অলিম্পিক দলের বিরুদ্ধে যে দলটি মোহনবাগানকে ৮—১ গোলে এবং মহমেডান স্পোর্টিংকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ০—৩ গোলে হেরে গিয়েছিল আই এফ এ একাদশের কাছে। আই এফ এ দলে অসাধারণ খেলেছিল নিখিল। সুতরাং ফুটবলে ও আমাদের অনেক কিছু শিখবার। আরও দেখার আছে কোচের নতুন ভূমিকায়।

—অনুকূল

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

ডায়ানার বাগানে
অনেকদিন হল জঙ্গলের বাইরে আছি। রাজা নিশ্চয়ই ভাবছে। ওকে একটা চিঠি লেখা দরকার।
আচ্ছা, 'গভীর অরণ্যে' চিঠি পৌঁছয় কী করে?
নতুন গল্পের শুরু

অনেক রকম
আছে। তোমরা
ভাবতেও পারবে
না!
আমার খুব জানতে
ইচ্ছে করছে,
বল না?

ধর, আমি যখন চিঠি লিখি, তুমি পাও কী করে?
যেমন করে রাজা এই চিঠিটা পাবে।
6/3

'প্রথমে চিঠিটা মইটাম পোস্ট-অফিসে পৌঁছবে।'
মিঃ ওয়াকারের কোন চিঠি আছে?
হ্যাঁ, এই যে।

অনেক সময় দৌড়বাজেরাও পালা করে চিঠি বয়ে নিয়ে যায়। এতে অবশ্য দেরি হয়। কারণ তারা প্রত্যেক গ্রামে থামতে থামতে যায়।

তারপর তাদের হাত থেকে সেই চিঠি বাঁদরের মেলে ছুটে চলে।
আহা দৃশ্যটা দেখতে ইচ্ছে করছে!

ঢাকের শব্দে খবর পৌঁছয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। কিন্তু ওতে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। অন্তত দূরগামী কোন খবর ওতে পাঠানো মুশকিল।
গভীর অরণ্যে অরণ্যদেব...

সবচেয়ে ভাল পিয়ন হচ্ছে 'ফ্রাকা'।
১

[illegible]। চিত্রপরিচালক কুরোসাওয়া

বড় শিল্পী বা স্টার জাপানের চলচ্চিত্রেও আছে। যেমন মিফ্যুনে। তাঁর সঙ্গেই এদেশের দর্শকদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন ছবিতে মিফ্যুনের বিভিন্ন চেহারা, বিভিন্ন ভূমিকা। একটির সঙ্গে অপরটি মেলে না। কোন ম্যানারিজম নেই তাঁর আচরণে বা অভিব্যক্তিতে। একবার কোন শিল্পীকে যে-ভাবে ভাল লাগল সে-ভাবেই তাঁকে বার বার উপস্থিত করার মতো বোকামি বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশের চলচ্চিত্রেই নেই, একমাত্র বাংলা সিনেমা ছাড়া। বক্স-অফিসে এই বোকামির সাজা মেলে প্রাণ কিন্তু তবু শোধরাবার চেষ্টা নেই।

• • •

এবারকার জাপানী ছবিগুলো দেখেই বাংলা ছবির দৈন্য আরও বেশি বোঝা গেছে। জাপানী ছবি ইংগমার বেয়ারিম্যান বা জাঁ-লুক গদারের ছবি নয়। প্রধানত দেশীয় ছবি,—প্রাণস্পর্শী অথচ শিল্পমণ্ডিত। কুরোসাওয়ার ছবির সঙ্গে এখানকার দর্শকদের পরিচয় বেশি। রসোমন বা রেড বেয়ার্ড-এর মতো ছবি তৈরির চেষ্টাই হোক না কেন? তাঁদের ছবির গুণেই তাঁদের ইনডাস্ট্রি বেঁচে আছে। দিনের পর দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। এখানে শুধু বিলাপ—অক্ষমের বিলাপ। তাঁরা এটা পাচ্ছেন না ওটা পাচ্ছেন না। তাঁদের এই সুবিধা চাই ওই সুবিধা চাই। তাঁদের নাকি সকলেই মেরে রেখেছে। নিজেরাই যে নিজেদের মেরে রেখেছেন এই সত্যটা তাঁরা কবে বুঝবেন জানি না। ভাল ছবি করার মুরোদ নেই, শুধু অভাবের কাঁদুনি গেয়ে কি পার পাওয়া যায়? এঁরা এখন বাঁচবার জন্য কেবলই বাইরের সাহায্য চাইছেন। তার চাইতে নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করুন। ভাল ছবি তৈরির চেষ্টা করুন। ইনডাস্ট্রি তাতেই বাঁচবে।

বোম্বাই বিচিত্রা

এদেশের সবে ধন নীলমণি আর্ট থিয়েটার বোম্বাই-এর আকাশবাণী প্রেক্ষাগৃহে আজ অবধি যত ছবি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে বিভূতিভূষণ লিখিত, সত্যজিৎ রায় নির্মিত 'অশনি সংকেত' বিনা দ্বিধায় সফলতম। গত একমাস যাবৎ হৈ হৈ করে চলছে হাউসফুল অশনি সংকেত, এবং যদি অন্য কোনো অনিবার্য কারণে 'অশনি সংকেত'কে উঠিয়ে দেওয়া না হয় তা হলে অনায়াসে আরো অনেক সপ্তাহ এমনিই চলবে। 'কিন্তু কেন? কেন চলবে 'অশনি সংকেত'? আমরা কেউ প্রশংসা করিনি তবু কেন এমনভাবে চলছে অশনি সংকেত?' প্রশ্ন করলেন এক নাক-উঁচু চিত্র সমালোচক। তিনি কিঞ্চিৎ [illegible] অবস্থায় ছিলেন তাই পরিবেশ তাঁর প্রশ্নকে তেমন প্রশ্রয় দিল না, কিন্তু সমালোচক তো সাধারণ মানুষ নন; অনাদৃত প্রশ্ন গুটিয়ে নেওয়া তাঁর পেশাবিরুদ্ধ, সুতরাং প্রশ্ন পুনরাস্থাপিত হোলো, সমালোচক সুধীজনের কাছে জানতে চাইলেন, কেন এমন হোলো? পুরো বোম্বাই প্রেস যে ছবিকে নিন্দা করেছে, সেই ছবি এমন হৈ হৈ করে চলছে কি করে? আপনারা কেউ-ই কি আমাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করেন না?' এইবার পরিবেশের পরিধিতে একটু মুচকি হাসির ঢেউ উঠলো, সম্ভবত কোনো বড় চাকুরে সেই ঢেউ-এর দোলায় দুলে ঈষৎ হেসে বললেন, 'অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সমালোচনার কল্যাণেই 'অশনি সংকেত' এত ভাল চলছে।' সমালোচক ভ্রূকুঁচকে বললেন, 'আপনি কি ঠাট্টা করছেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে না, তেমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনারা নিশ্চয়ই সমালোচনা করবার জন্য বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু আপনাদের সমালোচনা বোঝবার জন্য যে ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন, সে শিক্ষা অন্তত আমার নেই; ইদানীং কালে যেসব ছবিকে আপনারা প্রশংসা করেছেন সেই সব ছবি এবং আপনাদের সমালোচনা আমার মত সাধারণ, শিক্ষিত সহজ পাঠক-দর্শকের কাছে শুধুই দুর্বোধ্য।' সমালোচক এতক্ষণে রঙের আকাশ থেকে নেমে এসেছেন, বললেন 'আপনি নিশ্চয়ই কোনো সওদাগরি অফিসের কর্তাস্থানীয় কেউ। কথার ওপর আপনার দখল আছে, কিন্তু তাই বলে আমার প্রশ্ন এড়ালে চলবে না। বলুন, আপনি 'অশনি সংকেত' দেখেছেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সমালোচকের স্বর আরো কঠিন, 'আমার সমালোচনা পড়ার আগে না পরে?' ভদ্রলোক অনন্ত বিনয় সহকারে হাসলেন, বললেন, 'আপনাদের সমালোচনা পাঠের পর।'

সমালোচক : তার মানে আমাদের মতামতকে আপনি গ্রাহ্য করেন না?

ভদ্রলোক : একটু সাজিয়ে বলি, পাঠ করি, কিন্তু প্রভাবিত হই না; তাছাড়া 'অশনি সংকেত' যদি আপনাদের কথামত খারাপ ছবিও হোতো তবু দেখতাম কারণ সত্যজিতের ছবি আমাদের মত দর্শকের কাছে প্রিয়জনের আমন্ত্রণ—অগ্রাহ্য করার অধিকার নেই। সত্যজিতের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আর আমাদের তার প্রতি কোনো কর্তব্য থাকবে না, এটা কেমন কথা?

সমালোচক : তার মানে আপনি প্রেজুডিজড, আপনি অন্ধভক্ত।

ভদ্রলোক : দেখুন স্যার, 'ভক্ত' যখন, তখন প্রেজুডিজড একটু হবোই, আর একটু আধটু অন্ধ হওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়—

সমালোচক : ভক্তের সঙ্গে সমালোচ-

কের আলোচনা অসম্ভব—

ভদ্রলোক : সেকথা ঠিক, আসলে আপনি অনেক জ্ঞানী, অনেক বড়, তাই সত্যজিতের সমালোচক, আর আমার জ্ঞান সাধারণ বোঝাবুদ্ধির সীমানায় সংকুচিত তাই আমি সত্যজিৎ রায়ের মতো শিল্পীদের ভক্ত—

সমালোচক : বড় মানুষের ভক্ত তো সবাই হয়, যারা বড় মানুষের বিরোধী—তাদের ভক্ত হতে গাট্‌স চাই, আপনাদের গাট্‌স নেই, আপনি 'অশনি সংকেত' দেখেছেন, তবু তাকে খারাপ বলার সাহস নেই আপনার, আর আমাদের গ্রুপ-এর নাইনটি পারসেণ্ট ইন-টেলেকচুয়ালস 'অশনি সংকেত' না দেখেই কেবল আমাদের আলোচনা পড়েই সত্যজিৎকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে...

ভদ্রলোক : আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে এও আর এক 'অশনি সংকেত'। উনিশশো তেতাল্লিশে শস্য ছিল, সমাজ ছিল, তবু দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, মানুষ ভয়ে মাটির ঘর ছেড়ে এসে পাথরের ফুটপাথে প্রাণ দিয়েছিল; তেমনি উনিশশো তেয়াত্তর-চুয়াত্তরে মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, তবু মানুষ ব্যবসায়ী-বুদ্ধিজীবীর মুখে ঝাল খাচ্ছে।

সরল শর্মা

শতাব্দীর সংলাপ/ রাখাল দাশ ও কল্পনা মুখোপাধ্যায়

শতাব্দীর সংলাপ

রূপমায়া

এই শতাব্দীর বহুবার শোনা অনেক সংলাপই "শতাব্দীর সংলাপ" নাটকে আছে। বলতে গেলে নাটকটি সংলাপের ভারেই ভারাক্রান্ত। কিছু কিছু সংলাপে দর্শক মজাও পান। কিন্তু গভীর জীবনবোধের তেমন কোন সংলাপ নাটকে অনুপস্থিত। নাটকের মধ্যে বলিষ্ঠ অথবা গভীর কোন বক্তব্য নেই, তথাপি নাট্যকার ও নির্দেশক রাখাল দাশ সাধুবাদ পাবেন নাট্যকাঠামোর বৈচিত্র্যের জন্য। নাটকের মধ্যে নাটক। বাস্তব জীবনের সঙ্গে অভিনীত নাটক কোথাও কোথাও কোথাও এক হয়ে যাচ্ছে—নাটকের এই গুণটি প্রশংসনীয়। নাটকের নায়ক প্রতাপ গুপ্ত আসলে খলনায়ক। ওই চরিত্রের অভিনেতা রাখাল দাশ পাঁচ-ছটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কখনো তিনি থিয়েটারের মালিক, কখনো অভিনেতা, কখনো সুযোগ সন্ধানী জননেতা, আবার কখনো বা দুর্নীতিপরায়ণ ডাক্তার। একই মুখ, একই চেহারা, একই উদ্দেশ্য, কেবল বার বার মুখোশ বদল করছে—এই পরিকল্পনাটি খুবই কার্যকরী। কিন্তু যে চরিত্রকে খলরূপে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তাকে দুটি ভালমানুষের চরিত্রে (নায়িকার বাবা ও নায়িকার প্রেমিক) মঞ্চে না আনলেই ভাল হত। এতে ইলিউশন খানিকটা নষ্ট হয়। নাট্যকার নিনাদ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে নির্মল চক্রবর্তী বেশ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। কমলাক্ষর চরিত্রে সুধীর সরকার প্রথম দিকটায় স্বাভাবিক অভিনয় করছিলেন কিন্তু শেষের দিকে তিনি কিছুটা অতি-নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। নায়িকার চরিত্রে কল্পনা মুখোপাধ্যায় খুবই সাবলীল অভিনয় করেছেন। এ নাটক আর একটু বড় মঞ্চে অভিনয় হলে ভাল হয়।

ওস্তাদ হাফিজ আলী স্মৃতি সংগীত সম্মেলন

আরও ক'জন শিল্পী

ওস্তাদ হাফিজ আলী স্মৃতি সংগীত সম্মেলনের নাচের অনুষ্ঠানে হতাশ করেছিলেন সিতারা দেবী। কথক নাচের ব্যাকরণ তিনি জানেন, রসটুকু বিস্মৃত হয়েছেন। ভাওয়ের নৈপুণ্যও সিতারার মধ্যম পর্যায়ের। কিষেণ মহারাজের ওস্তাদী সঙ্গতের সঙ্গে তাই ও'র ততকার, তেহাই, চক্রধর কি না ধিন ধিন না বেশ তৈরী দেখালেও উত্তীর্ণ নিবেদন হয়নি। বালগোপালটিও শিল্পীর বালসুলভ। মীরার ভজনটি কারণ্যবিহীন, তুলসী ভজনটিও (যেটি প্রায় ঠুংরীর মত শুনিয়েছিল গানে) নতুন আন্দাজে ঢালা হলেও আহ্লাদের অবকাশ রাখেনি। ঝাপতালের নাচে সিতারার কাজ কিছুটা মর্জালশী। এবং অচ্ছন মহারাজের কম্পোজিশনের ময়ূর নাচে সিতারা ঠিক ময়ূর সাজতে পারেননি ভাবের সর অভাবে। বরং ও'র প্রদোষ নৃত্যের বাখানটুকু অনেকটা আঁটোসাটো, কিছুটা চমৎকারও বটে।

সেতারী ইমরাৎ খাঁ এই সম্মেলনে তাঁর [illegible] বয়সের বাদনকৌশল এবং রাগ-চিন্তার সুন্দর প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন।

ওঁর সঙ্গে দ্বিতীয় সেতারে ছিলেন ওঁর কিশোর পুত্র নিশাৎ। তবলায় ছিলেন লতিফ আহমেদ খাঁ। এক কথায় বলা চলে ইমরাৎ খাঁর ইমন কল্যাণ এবং পরে ভাটিয়ালী-বাউল চমৎকার।

ইমরাৎ খাঁর বাজনা রসিকের মনে ধরে প্রধানত তার সুরেলা বিস্তারের জন্য। আলাপে এত পল পল বিচার এবং সুরের লেপন ইমরাতের হাতে এর আগে বড় একটা শুনিনি। নিছক তৈরী গানের মত করে বাজিয়ে শিল্পী নিখাদ আলাপের কথা ভেবেছিলেন এই পরিবেষণায়। রাগচিত্রের ব্যাপারেও তিনি অতীব সাবধানী ছিলেন। প্রত্যেকটি আলাপ-স্তরে নতুন ইঙ্গিত যোজনা করেছিলেন সে সময় নিশাৎ খাঁ। এত কম বয়সে এত সুরের গভীরতা শ্রোতাকে বিস্মিত করেছে। এবং অক্লেশে বলা চলে নিশাৎ ভাবীকালের এক শক্তিমান শিল্পী। ইমন কল্যাণের মত বড় রাগে এত বক্তব্য এই বয়সে একটা আশাতীত ব্যাপার।

ইমরাৎ-নিশাতের গৎবাদনেও সুরের প্রাচুর্য ছিল। তানের বাহুল্য সত্ত্বেও পুনরাবৃত্তি বিশেষ একটা ছিল না এবং আরও উল্লেখযোগ্য, উভয় শিল্পীর বাজনাতেই বিস্তৃতির নজর সজাগ ছিল। অবশ্য যে সামান্য অভাব আমরা দেখলাম তা হল লয়ের ব্যবহারে কিছুটা অযত্ন যার প্রকাশ দুটো চারটে অনিপুণ তেহাইতে। ঝালাতে অবশ্য বাজনার চরম উৎকর্ষ ফুটে উঠেছিল এবং সে পর্যায়ে লতিফ আহমেদের সঙ্গতও অতি উচ্চ মানের হয়ে ওঠে। তাছাড়া ইমরাতের খেয়ালাঙ্গের বোল-বিস্তারের সময় লতিফের দিল্লী বাজের অনেক চিকণ কাজ আমরা দেখেছি। ইমরাতের গত ধরা ছিল তিন তালে।

সম্মেলনের একটা উল্লেখযোগ্য গানের আসরেও আমরা শুনেছি ইমনকল্যাণ। শিল্পী ভীমসেন যোশী। কিরাণা ঘরানার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে গেয়েছিলেন শিল্পী। গমক মীড় কি তানের সৌকর্য এবং নন্দনীয় পারম্পর্য রাগের এ রকম উন্মোচন রসিক এবং সাধারণ শ্রোতা উভয়কেই উন্মত্ত করে। রাগবিস্তারের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখলেও যোশীজীর ইমনকল্যাণ খুব উৎকৃষ্ট নিবেদন হিসেবে সূচিত হবে। তিন সপ্তক জুড়ে তান, মিহি গমক, কিংবা তীক্ষ্ম মীড় ইত্যাদি পরিবেষণে শিল্পীর গলা বিলকুল যন্ত্রের মতন সঞ্চারী হয়ে উঠেছিল। পরের পিলু নিবেদনেও ভাব-রসের মাধুর্য ছিল। এবং শেষের 'যো ভজে হরিকো সদা' গানে ভজনের একটিই বিশেষণ হয়—অসাধারণ।

কিরাণা ঘরানার অপর শিল্পী গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল গেয়েছিলেন মারু বেহাগ আভোগী এবং বসন্ত। শ্রোতার বিনোদনে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী আভোগী কানাড়া। পূর্বাঙ্গের এই রাগের আদত মজা স্বরের গাম্ভীর্য এবং সুরের আন্দোলনে। শিল্পীর উদাত্ত-গম্ভীর গলায় এর মজা একেবারেই প্রথম স্তরের হয়ে ওঠে। কানাড়ার অঙ্গ একটা কারুণ্যও মূর্ত ছিল নিবেদনে। মধ্যম, ধৈবত এবং নিষাদের সুষমামণ্ডিত প্রয়োগে রাগের চরিত্রটুকু আদ্যোপান্ত মনোহর হয়েছিল। তাছাড়া দুরূহ গমকের সাহায্যে শিল্পী গানে এক ধরনের ব্যাপ্তিও এনেছিলেন। অলংকরণের মাধ্যমে রাগকে মাদকতাময় করে তোলার ব্যাপারে গাঙ্গুবাঈ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাগের বিস্তারেও দক্ষতা দেখলাম যথেষ্ট। এবং এই নৈপুণ্য ছড়িয়ে পড়েছিল বসন্তেও।

—সংগীত সমালোচক

গুজরাটে ব্যাপক হাঙ্গামা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে একদিন বনধের ডাক দেওয়া হলে ১০ জানুয়ারি গুজরাটের নানা শহরে ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে বহু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। পুলিশের গুলিতে ৫জন নিহত এবং বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধে বহু লোক আহত হয়েছে। দুই দিন গুজরাটের গুরুতর গণ্ডগোলে নিহত হয়েছেন মোট দশজন। আমেদাবাদ প্রভৃতি বহু অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার জন্য কারফু জারি করা হয়। বর্তমান আন্দোলনের তৃতীয় দিনে বহু স্থানে মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শুক্রবার বরোদা শহরের একটি ন্যায্য মূল্যের দোকান লুট করার সময় পুলিশ গুলি চালায়। বরোদা শহরে সৈন্য ডাকা হয়। সেখানে পুলিসের গুলিতে ৬ জন নিহত হন। কোন কোন অঞ্চলে পুলিশের সাহায্যার্থে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ডাকা হয়। বিশ নগর শহরে গুলিতে নিহত হয়েছেন দুজন এবং আহত হয়েছেন চারজন। ১৪ আগস্ট কমিটি আগামী ২৫ জানুয়ারী বনধের ডাক দিয়েছেন এবং পরের দিন প্রজাতন্ত্র দিবসের সমস্ত অনুষ্ঠান বয়কট করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্য জুড়ে খাদ্য হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাটের তিনজন প্রবীণ মন্ত্রী দাবি জানিয়েছেন, কেন্দ্রকে হয় খাদ্য অঞ্চল তুলে দিতে হবে নয়ত সারা খাদ্যশস্য চলাচলের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

দেশী সংবাদ

৭ জানুয়ারি—ভারত ইলেকট্রনিকস থেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রেডার যন্ত্র উৎপাদন শুরু হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই ইউনিটটি উদ্বোধন করবেন মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে। এই ইউনিটটি তৈরিতে খরচ লেগেছে এগার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ রবিবার পানজাব থেকে যে ছয় শ' বস্তা চাল পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে সাড়ে তিন শ' বস্তাই চাল নয়, স্রেফ চালের খুদ। এই খুদ চালেরই কিছু নমুনা ২টি ক্ষুদে প্যাকেট করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রীকে দেখাবার জন্য।

৮ জানুয়ারি—দিল্লি পুলিস গাড়ির ভুয়া পারমিট সংক্রান্ত রহস্যের পুরোটাই কবজা করে ফেলেছেন বলে দাবি করেন। গতকাল কেন্দ্রীয় ভারি শিল্পমন্ত্রকের দুজন আপার ডিভিশন কেরানী সহ আরও সাত ব্যক্তিকে তারা গ্রেফতার করেছেন। সরকারের কাছে গাড়ির পারমিটের ব্যাপারে যে বিশেষাধিকার কোটা আছে তা নিয়ে একটি দল ভুয়া পারমিটের কারবার করত।

হেমন্ত বসু হত্যা মামলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত চালানোর পর কলকাতার গোয়েন্দা পুলিস আজ নকশালপন্থী বলে বর্ণিত ৬ জনকে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী জি বি ঘোষের আদালতে হাজির করে। হত্যাকাণ্ড, চক্রান্ত, বিনা লাইসেনসে আগ্নেয়াস্ত্র, ছোরা, বর্শা, বোমা প্রভৃতি রাখার অভিযোগে আসামীদের গ্রেফতার করা হয়।

৯ জানুয়ারি—সাত দিনের মধ্যে জিনিস-পত্রের দাম না কমলে ছাত্রপরিষদ ব্যাপক আন্দোলনে নামবে। পরিষদের কর্মসমিতি ঘোষণা করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি থেকে ফিরে এলে তাঁকে সাতদিনের 'সময়' দিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দরদামে ছাত্রপরিষদ এবং যুব কংগ্রেস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

জীবনবীমা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীদের মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত হবে বলে মনে হয় আসন্ন। পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসে আংশিক লক-আউট কার্যকর হওয়ার দু'পক্ষই আজ হুমকি দিয়েছেন—এখানেই থামবে না আরও ব্যবস্থা নেব।

১০ জানুয়ারি—[illegible] শহরে আজ রাতে সেনাবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অগ্নিসংযোগ বা লুঠতরাজ করতে দেখলেই সেনাবাহিনীকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—পুলিসের ইনসপেকটর জেনারেল এই কথা জানিয়েছেন। আকাশবাণী থেকে ইনসপেকটর জেনারেলের ওই ঘোষণা বার বার প্রচার করা হয়েছে।

আজ সকালে জামসেদপুর থেকে ৩০ মাইল দূরে ঘাটশিলার কাছে জাতীয় সড়কে একটি ট্রাকের সঙ্গে রাঁচী অভিমুখী একটি ট্যুরিস্ট বাসের মুখোমুখী সংঘর্ষ হলে অন্ততপক্ষে ৯ জন মারা যায়। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও আছেন। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর।

১১ জানুয়ারি—বিবেকানন্দ সেতু পার হতে কোন 'টোল' দিতে হবে না। আজ রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ৪২ বছরের পুরনো পথ শুল্ক উঠে গেল। এখন থেকে সেতু পারাপারের মুখে কোন গাড়িকে শুল্ক মেটাবার জন্য থামতে হবে না। সেতু-পথ এখন সকলের জন্য খোলা।

এখন থেকে দু' মাস রেশনের দোকানে কেজি ২৫ পয়সা দামে লবণ বিক্রি করা হবে। রাজ্যের খাদ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, লবণের দাম নিয়ে কালোবাজারী চলায় তিনি খাদ্য কমিশনারকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

১২ জানুয়ারি—গত তিন বছর ধরে কলকাতা মহানগরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামান্যই কাজ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এই বাবদ আর্থিক সাহায্য "সীমিত" করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে রাজ্য সরকারী সূত্রে জানা যায়। এজন্য এ পর্যন্ত ১০৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে উন্নতি আশানুরূপ নয়।

আজ দুর্গাপুর প্রজেক্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সারাদিন এক কোটাও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়নি। এদিন সকালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দু' নম্বর ইউনিটে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। নানান জায়গা থেকে দমকল আসে। আট ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিবিয়ে ফেলা হয়।

১৩ জানুয়ারি—এল আই সি'র চেয়ারম্যান শ্রী কে আর পুরি আজ বলেন, ধর্মঘটের ফলে অন্য ডিভিসনগুলিতে কাজের ক্ষতি হলে জীবনবীমা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ সেগুলিতেও লক-আউট ঘোষণা করতে বাধ্য হতে পারেন। তিনি জানান, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি পূরণের জন্য করপোরেশন ৬ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

বিদেশী সংবাদ

৭ জানুয়ারি—পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টো বলেছেন, আফগানিস্তানের "শত্রুতা-মূলক নীতি-র জন্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ফরাসী পত্রিকা একসপ্রেস-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "একজন বাঁদর যা করতে পারে অন্য বাঁদরের তা করতে বাধা কী?" পাকিস্তান রেডিও এখন আফগানি-স্তানের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাচ্ছে।

৮ জানুয়ারি—মারকিন ভাইস প্রেসিডেনট জেরালড ফোরড আজ হুমকি দিয়ে বলেছেন, আরবরা যদি আমেরিকায় তেল পাঠানো বন্ধ করে তাহলে আমেরিকাও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ-গুলিতে খাদ্যের জাহাজ পাঠানো বন্ধ করে দেবে। তবে শ্রীফোরড বলেন, এমন পরিস্থিতি যাতে না হয়—তার ব্যবস্থা খুব সহজেই করা যায়।

৯ জানুয়ারি—রাষ্ট্র পরিচালিত দামাসকাস বেতার থেকে বলা হয়েছে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আরব দেশগুলির উপর বলপ্রয়োগ করতে চেষ্টা করে তা হলে আরব দেশগুলির সমস্ত পেট্রোল খনি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আরবেরা সম্পূর্ণ ভাবেই প্রস্তুত।

১০ জানুয়ারি—৫ লক্ষ মানুষের এক সুশৃঙ্খল জনতা ২০ জানুয়ারি ঢাকার রাস্তায় নামবেন। উৎপীড়ক ও দুর্নীতিগ্রস্ত গণবিরোধী সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে উগ্র বাম জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা মেজর জলিল এবং যুবনেতা আবদুর রব এই হুমকি দিয়েছেন।

১১ জানুয়ারি—আফগানিস্তানের বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদের জন্য একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পাকিস্তান সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। গত সেপটেম্বরে এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। আফগান বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেন যে, এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁদের হাতে উপযুক্ত নথিপত্র আছে।

১২ জানুয়ারি—টিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বরগুইবা এবং লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদাফি আজ এই দু'টি দেশের সংযুক্তির কথা ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে তাঁরা একটি চুক্তি সই করেছেন। ঘোষণায় জানানো হয়—নতুন সংযুক্ত রাষ্ট্রের নাম হবে ইসলামিক আরব প্রজাতন্ত্র।

১৩ জানুয়ারি—চীন ও পাকিস্তানের ক্রম-বর্ধমান সামরিক সম্পর্ক একদিন এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো চীনের সফররত সামরিক প্রতিনিধি দলের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজ সভায় একথা বলেছেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

৪১ বর্ষ

(১ সংখ্যা থেকে ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত)

—ধ—

—ন—

—প—

—ফ—

—ব—

—ভ—

—ম—

—য—

—র—

—শ—

—স—

—হ—